মাসিক বসুমতী

দ্বিতীয় বর্ষ—প্রথম খণ্ড

সন ১৩৩০ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত।

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মেসিন-প্রেসে'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[বৈশাখ হইতে আশ্বিন, ১৩৩০]

চিত্রসূচী—বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

ত্রিবর্ণ চিত্র—

একবর্ণ চিত্র—

রেখা-চিত্র—

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

২য় বর্ষ | ১ম * বৈশাখ, ১৩৩০ * খণ্ড { ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃতম্

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো,
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালম্।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখাব্ধৌ,
সন্তাপসংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১ ॥

দুর্ব্বারঘোরভবদাবদিদহ্যমানো,
জঙ্গম্যসে মলিনবাসনয়া সুখাপ্ত্যৈ।
নীচাশ্রয়ং কথমতো যদি শান্তিকামঃ,
সন্তাপসংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ২ ॥

শাস্ত্রেষ্বনাপ্তসু কথং হি তব প্রবৃত্তি-
দুর্স্তর্কজালমিহ দেশিকবাগ্বিরুদ্ধম্।
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজ মন্দবুদ্ধে,
সন্দেহবিভ্রমহরং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৩ ॥

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তি-
স্তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন নিসেব্যমানে।
বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ভববন্ধহেতূন্,
সন্ত্যক্তকামকনকং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৪ ॥

ভার্য্যামশেষগুণভূষিতভক্তিযুক্তাং,
যোষাঞ্চ কামবশগাঃ সকলাং তথৈব।
দূরাং প্রণম্য জিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা,
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম ॥ ৫ ॥

রে বিভ্রান্ত ভোগসুখে কেন রে নিরত,
মোহবশে নিরন্তর ভ্রম' দীর্ঘ পথ ?
সুখাব্ধিতে বিশ্রামের যদি মনোরথ
ভজ ভবদুঃখহর রামকৃষ্ণ পদ। ১।

জ্বলিতেছ দুর্নিবার ভব দাবানলে,
ফিরিছ বাসনাবর্ত্মে সুখ পাবে ব'লে,
নীচাশ্রয় কেন, শান্তি যদি মনোগত,
ভজ ভবদুঃখহর রামকৃষ্ণ-পদ। ২।

অনাপ্তশাস্ত্রের বাক্যে কেন তব রতি,
গুরুবাক্যপ্রতিকূল কুতর্কে কুমতি,
কুসিদ্ধান্ত ছাড়ি মূঢ় জ্ঞানে হও রত,
ভজ রে সংশয়হর রামকৃষ্ণ-পদ। ৩।

হেরি সদা অনুরাগ কামিনী-কাঞ্চনে,
ভোগে কোথা তৃষ্ণাক্ষয় ?—বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে
ভববন্ধহেতু কাম,—শৃঙ্খল নিয়ত,
ভজ কামহেমত্যাগী রামকৃষ্ণ-পদ। ৪।

নানা গুণে অলঙ্কৃতা—ভার্য্যা ভক্তিমতী,
ভোগসুখে অনুরক্তা শতেক যুবতী,
মাতৃজ্ঞানে দূরে রাখি, হইলা প্রণত ;
ভজ কামগন্ধহীন রামকৃষ্ণ-পদ। ৫।

সংস্পৃশ্য ধাতুনিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ,
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যো ভবেজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য-
স্তং ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৬॥

প্রেম্নঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং,
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।
তৎপ্রাপ্তুমিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্দ্রচিত্তান্,
কুর্ব্বন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৭॥

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো,
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতু-শূন্যঃ।
যৎ প্রেমহেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং,
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৮॥

প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না,
ত্বন্তর্হিতে ভবতি ভাব-বিকারযুক্তা।
আরাদ্গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভক্তে,
প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৯॥

সংসারদুঃখবিকৃতো ভজনানুরাগঃ,
শুদ্ধীকৃতঃ প্রিয়কথাকরুণাকটাক্ষৈঃ।
আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা-
স্তং ধর্ম্মমোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ১০॥

যোগৈশ্চ সাধনশতৈঃ ফলমাপ্যতে যৎ,
যদ্বা সুখং ভবতি চিত্তনিরোধনেন।
যৎসন্নিধিং মুহুরুপেত্য পুমাঁল্লভেত্তৎ
তং শান্তিশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ১১॥

নারায়ণং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং,
দৃষ্ট্বা শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাম্।
ভৃত্যায়তেঽপ্যখিলভূতমহেশ্বরো য-
স্তং স্বাভিমানরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ১২॥

স্বর্ণরৌপ্য ধাতুস্পর্শে কাঁপে কলেবর,
সংজ্ঞাহীন বক্র চারু অঙ্গুলিনিকর,
বিলুপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি—সদ্যঃ জড়বৎ,
ভজ ত্যাগপটু যোগী রামকৃষ্ণ-পদ। ৬।

পরিশুদ্ধ প্রেমরূপী বিমল পবিত্র,
সুধী জানে স্বার্থহীন মহান্ চরিত্র,
চাহ হেন প্রেমময় ভাবরসাস্পদ,
ভজ ভক্ত-প্রেমনিধি রামকৃষ্ণ-পদ। ৭।

স্নেহে মাতা, প্রেমে পিতা, সখ্যভাবে ভ্রা
অহেতু করুণাসিন্ধু শুনি' জয়গাথা।
অতুল যাঁহার প্রেম, ভক্তি-কোকনদ,
ভজ সদা প্রেমসিন্ধু রামকৃষ্ণ-পদ। ৮।

পতি-সম্মিলনে যথা প্রফুল্ল ললনা,
বিচ্ছেদে বিরহবশে ক্ষুব্ধা আনমনা,
ভক্তসঙ্গসুখে সুখী—বিরহে আহত,
ভজ প্রেমমূর্ত্তি গুরু রামকৃষ্ণ-পদ। ৯।

বিকৃত সংসার-দুঃখে, যাচে ধর্ম্মবল,
করুণায় প্রিয়কথা কন অবিরল,
আশ্বাসিয়া শিষ্যে দেন পৌরুষ-সম্পদ্,
ভজ ধর্ম্মমোক্ষদাতা রামকৃষ্ণ-পদ। ১০।

যোগে আর শতবিধ সাধনে যে ফল,
চিত্তবৃত্তিনিরোধে যে আনন্দ বিমল,
যাঁহার মুহূর্ত্তসঙ্গ হেন ফলপ্রদ,
ভজ শান্তিসুখদাতা রামকৃষ্ণ-পদ। ১১।

পুরুষে পুরুষে যেই হেরে নারায়ণ,
রমণীতে রমণীতে জননী দর্শন।
বিশ্বের ঈশ্বর সদা দাসভাবে নত,
ভজ অভিমানশূন্য রামকৃষ্ণ-পদ। ১২।

নাধীতশাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা
নাধীতবেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
নাধীততন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্ম্মবক্তা
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৩ ॥

অনধীত শাস্ত্র, সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী,
অনধীত বেদ, মুখে স্ফুরে বেদবাণী,
অনধীত তন্ত্র, ক'ন কুলতন্ত্র যত,
ভজ মূর্ত্ত্য তত্ত্ববোধ রামকৃষ্ণ-পদ। ১৩।

নির্ব্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী,
নিষ্কর্ম্মকোঽপি সততং পরকর্ম্মকর্ত্তা।
নির্দ্দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং,
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

বাসনারহিত, নিত্য পরহিতে ব্রতী,
পরকর্ম্মপর যোগী নির্ব্বাণমূরতি,
নির্দ্দুঃখ পরের দুঃখে ব্যথিত সতত,
ভজ দুঃখে অকাতর রামকৃষ্ণ-পদ। ১৪।

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতো নিজপার্ষদৈর্যো,
গায়ন্ হসন্ ভগবতঃ সুখয়ন্ প্রসঙ্গৈঃ।
তারাগণৈরিব বিধুর্দ্যুতিমত্র ধত্তে,
তং স্বর্গশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৫ ॥

ভক্তজনপরিবৃত পার্ষদের সহ,
নৃত্য-গীত হরিকথা চলে অহরহঃ,
তারাদলমাঝে বিধু,—দ্যুতিমধ্যগত,
ভজ স্বর্গসুখদাতা রামকৃষ্ণ-পদ। ১৫।

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যপি শম্ভুভক্তৈঃ,
কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষ্ণবশেখরৈশ্চ।
জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঃ,
সংজ্ঞায়তে চ তমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥

শাক্ত দেখে কালীরূপা, শৈব দেখে শিব,
বৈষ্ণবশেখর, কৃষ্ণ-প্রেমের ত্রিদিব,
জ্ঞানীরা পরমহংস জানি ভক্তিনত,
ভজ রে পরম দেব রামকৃষ্ণ-পদ। ১৬।

ভ্রমন্নানাযোনৌ বহুবিধশরীরং পরিগতঃ,
সুখং নাল্পং লেভে কনকযুবতিভোগবিষয়ৈঃ।
ইদানীং জ্ঞাত্বা ত্বাং প্রণতসুহৃদং শান্তিসুখদং,
বিরক্তোঽহং যাচে তব চরণয়োর্ভক্তিমচলাম্ ॥ ১৭ ॥

বহু দেহ ধরি' বহু যোনিতে ভ্রমণ,
কামিনী-কাঞ্চন ভুঞ্জি' সুখী নহে মন,
তুমি প্রণতের বন্ধু চিনেছি তোমায়,
যাচি শান্তি নিত্যা ভক্তি তব রাঙ্গা পায়। ১৭।

গৃহীত্বা ভ্রান্তং মাং কুমতিবিষয়াশাপরিবৃতং
সদা রক্ষ ব্রহ্মন্, কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ।
কৃপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে,
বিবেকং বৈরাগ্যং পরমমপি মে দেহি ভগবন্ ॥ ১৮ ॥

কুমতি, বিষয়-আশা-মুগ্ধ মোর মন,
গহন কুপথে দুঃখ পাই অনুক্ষণ।
রক্ষা কর দুঃখ হতে কৃপাসার-দানে,
বিবেক-বৈরাগ্য দাও শোকদগ্ধ-প্রাণে। ১৮।

যো ভজেৎ পরয়া ভক্ত্যা রামকৃষ্ণং ভবান্তকম্।
ভববন্ধাদ্বিনির্মুক্তঃ সদ্যো ভবেন্ন সংশয়ঃ ॥

প্রাণে পরা ভক্তি-সুধা রামকৃষ্ণ ভজে,
সদ্যঃ ভববন্ধমুক্ত—তাঁর পদরজে ॥

ইতি শ্রীমৎ অভেদানন্দস্বামিনা বিরচিতং শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃতং।

ইতি শ্রীমৎ অভেদানন্দ-স্বামিকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃত।

বোম্বাই ও বাঙ্গালা

বোম্বাই সহরে কোন সাধারণ জনসভায় বক্তৃতা করিতে আমার স্বভাবতঃই একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। বোম্বাইবাসীরা খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালীর সাহায্যকল্পে প্রায় এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং উত্তরবঙ্গে প্লাবনপীড়িত স্থানের অধিবাসীদিগের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন। তাই আহূত হইয়াও বোম্বাই সহরে উপস্থিত হইবার সময় আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, পাছে বোম্বাইবাসীরা মনে করেন, আমি আবার ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতেও পারি না।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

বোম্বাইয়ের সহিত যখন বাঙ্গালার তুলনা করি, ত বাঙ্গালার দৈন্যে লজ্জিত হই দৈন্য কি কেবল অর্থের? (কি ব্যবসার ক্ষেত্রে বোম্বাইব বাঙ্গালীকে বহু পশ্চাতে যে গিয়াছেন? তাহা নহে—স ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর ব শোচনীয়।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকগত গোপালকৃষ্ণ গো বাঙ্গালীর প্রশংসা করিয়া ব ছিলেন—ভারতে ভাবে প্রবর্ত্তনে বাঙ্গালীই অগ্রণী; আজ বাঙ্গালা হ যে ভাবস্রোত উদ্গত হয়, আগামী কল্য তা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি সে দিন ক

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর।

জগতে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ও বর্ত্তমান লেখকের, ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যে কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন, প্রায় ৩০ বৎসর

কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং।

পূর্ব্বে তাহার উদ্বোধনের জন্য বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতিপদে বৃত করা হইয়াছিল।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে গোখলে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ কি আর তাহা লইয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি? আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতার দণ্ড বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হস্তচ্যুত হইয়াছে। দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যদিগের মধ্যে বাঙ্গালী কোন্ স্থান অধিকার করিতেছে? বোম্বাই ও মাদ্রাজ যেন প্রাধান্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে।

আমার বন্ধু গোখলে মহাশয় সর্ব্বদাই বলিতেন, রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রে দাদাভাই নৌরজী তাঁহার পিতামহ আর মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে তাঁহার পিতা। এই দুই জনের পদপ্রান্তে তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা। এই শেষোক্ত মহাত্মা অর্থনীতিবিষয়ে যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে ভারতবাসীর চক্ষু ফুটিয়াছে। তিনি গতানুগতিকত্ব ত্যাগ করিয়া—ইংরাজ অবাধবাণিজ্যনীতির প্রচারকদিগের মত পরিহার করিয়া, অর্থনীতির মূলতত্ত্ব প্রযুক্ত করিয়া ভারতীয় অবস্থাব্যবস্থার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি অর্থনীতিবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকল বহুমূল্য। তদ্ভিন্ন তিনি ইতিহাসেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজনীতিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। অথচ তিনি রাজকার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে গোখলেরই মত আর এক জন স্কুলমাষ্টার—মিষ্টার যোশী যে সব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অর্থনীতিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার বুঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গভীর জ্ঞানে বোম্বাইয়ের কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাংকে পরাভূত করিতে পারেন, নবভারতে এমন অধিক লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। Sacred Books of the East গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার 'ভগবদ্গীতা' ভারতবাসীর একমাত্র গ্রন্থ বলিয়া আমাদের মুখরক্ষা করিয়াছে। বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক যদিও ব্যবহারাজীবী ছিলেন, তথাপি এক জন সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক দিন বাঙ্গালায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার ছাত্র এখনও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ বিভাগে যশস্বী। কিন্তু এ বিভাগেও বোম্বাই বাঙ্গালাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাউদাজী (রামকৃষ্ণ বিঠল) ও ভগবান্ লাল ইন্দ্রাজী এই ক্ষেত্রে বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের যশ কেবল ভারতেই আবদ্ধ নহে। তিনি প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রে

অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। ইংরাজী কোথাও কোন শিলা-লিপির বা তাম্র-শাসনের সন্ধান পাইলে সকল অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিতেন। কথিত আছে, তিনি ভাল-রকম ইংরাজীও জানিতেন না।

'ভারত-তিলক' তিলক বোম্বাই-বাসী। রাজনীতিকে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আলোচ্য না রাখিয়া কেমন করিয়া জনসাধারণের করিতে হয়, তাহা তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্ভীকতার তুলনা ছিল না। আবার, গণিতে ও প্রত্নতত্ত্বে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজনৈতিক অপরাধে তিনি প্রথমবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে ম্যাকস্‌মূলার প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রাসবিহারী ঘোষ।

প্রথম সিনিয়ার র‍্যাংলার বোম্বাইয়ের লোক। আর্থিক ব্যাপারে বোম্বাইয়ে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম করিতে পারা যায়; ইঁহাদের মধ্যে সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, সার ফজুলভয় করিমভয়, সার ভিঠলদাস ঠাকুরসি ও মিষ্টার দালালের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কংগ্রেসের অন্যতম সেবক পরলোকগত পরমেশ[্বরন পি]ল্লে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে Representative Indians না[মক] পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষের [বিভিন্ন] প্রদেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বিবরণ আছে। তা[হার] ভূমিকায় তি[নি] লিখিয়াছিলেন ভিন্ন [ভিন্ন] প্রদেশে ভিন্ন [ভিন্ন] শ্রেণীর লো[কের] আবির্ভাব [হই]য়াছে। মাদ্র[াজে] রাজনীতিক দি[গের] আবির্ভাব। বো[ম্বা]ইয়ে লোকহিত অনুষ্ঠানের [প্র]াধান্য। বঙ্গে বৃ[হৎ] অনুষ্ঠানের বিশেষ ধর্ম্মা[নু]ষ্ঠানের নেতৃগ[ণের] উদ্ভব — Beng[al] has been t[he] birth place [of] leaders [of] large mov[e]ments, main[ly] religious.

তিনি সম্ভব[তঃ] রামমোহন র[ায়,] কেশবচন্দ্র [প্র]ভৃতির জন্মভূমি বলিয়া বঙ্গদেশকে এই সম্মানে সম্মানি[ত] করিয়াছিলেন। আর—তখন আর এক জন অসাধা[রণ] শক্তিশালী ব্যক্তির কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল—[In] Bengal a new religious leader has arisen[.] তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

আর বোম্বাই যাঁহার আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছে, তি[নি] ভারতের মুক্তিকামনার মূর্ত্ত বিকাশ—মহাত্মা গন্ধী

আমার বড়ই দুঃখ হয়, তিনি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

এক কালে বাঙ্গালা সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী ছিল। বোম্বাইয়ের যে কোন সভায় উপস্থিত হইলে বুঝিতে পারা যায়—সে কথা লইয়াও আমরা আর গর্ব্ব করিতে পারি না। বোম্বাইয়ের সভায় বহু শিক্ষিতা মহিলা সভাস্থলে সম্মুখের আসনগুলি অলঙ্কৃত করেন। সে দৃশ্য তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় ভগিনীদিগের হৃদয়ে বিস্ময় সঞ্চার করিবে—হয় ত বা হিংসারও উদ্রেক করিবে। কারণ, বাঙ্গালায় পর্দ্দার পাহারা এতটুকুও শিথিল হয় নাই—মহিলারা যেন বাড়ীর বারান্দায় আসিতেও নিন্দার ভয় করেন। পল্লীগ্রামে তাঁহাদের গতায়াতের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, সহরে তাহাও নাই; আবার সহরের আদর্শ পল্লীগ্রামে অনুকৃত হইয়া পল্লীগ্রামেও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। এরূপ অবস্থায় মহিলাদিগের পক্ষে উচ্চ শিক্ষালাভের আশা কিরূপে করা যায়? বঙ্গদেশে কেবল খৃষ্টান বা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের দুই চারি জন মহিলাকে স্বচ্ছন্দে বাহির হইতে দেখা যায়। আমেদাবাদে ও

বাল গঙ্গাধর তিলক।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেশবচন্দ্র সেন।

বোম্বাই সহরে কলেজেও মহিলারা পুরুষছাত্রদিগের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশে মহিলাদিগের শিক্ষালাভের নানারূপ ব্যবস্থা আছে। পুনার সেবাসদনের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন; অধ্যাপক কার্ব্বের নারী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানের জন্য পরলোকগত সার বিঠলদাস ঠাকুরসী ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট বহু "বনিতা-বিশ্রাম" বিদ্যমান।

রামমোহন রায়।

হিন্দু ও পার্শী মহি সাগরসৈকতে স্নিগ্ধ স সেবন করিতে দেখা কলিকাতায় এরূপ ব যেন কল্পনারও অ বলিয়া মনে হয়

কোন বাঙ্গ বোম্বাইয়ে উপ হইলে প্রথমেই বিস্মিত হয়েন—ব কাতা দুইটি, বো একটি। কলিকা একটি নাম—প্রা পুরী (City of Pa ces) কিন্তু সে চৌ অঞ্চলের অর্থাৎ সহ যে অংশে য়ুরোপী বাস করেন, সেই অং বর্ণনা। কোন য়ুরো

বোম্বাই সহরে মহিলাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শত শত

বা মার্কিণ পর্য্যটক কলিকাতায় গ্রাণ্ড হোটেলে পা সম্মুখে জাহ্নবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ময়দান ও পার্শ্বে বড় বড় ইমারতে ইংরাজ বণিকদিগের বিপণি "হৌস" প্রভৃতি দেখিয়া মনে করেন, বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের আদি রাজধানী কতই সমৃদ্ধিশালিনী! কিন্তু কেহ যদি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উত্তরে বাঙ্গালী

ভাটবাজী।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে।

টোলায় কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দাদিগের আবাস-ব্যবস্থা দেখেন, তবে তাঁহার ভ্রম ঘুচিতে বিলম্ব হয় না। এঁদো গলি-আবর্জ্জনাপূর্ণ বস্তি, আর মধ্যে মধ্যে জীর্ণ অট্টালিকা. সে যেন স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে।

কেবল কি তাহাই? এক জন বিদেশী যদি হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া গঙ্গার সেতু পার হইয়া হ্যারিসন রোডে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করেন, তবে বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি বুঝিতেই পারিবেন না যে, কলিকাতার সহিত বাঙ্গালীর প্রকৃতপক্ষে কোন সম্বন্ধ আছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ব্যবসায়ীরা বিদেশী—শ্রমজীবীরাও হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী কোথায়? জার্ম্মাণযুদ্ধের ফলে প্রভূত অর্থলাভ করিয়া মাড়োয়ারীরা যখন যে কোন দামে কলিকাতায় ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সওদাগরদিগের পত্র 'ক্যাপিটাল' বলিয়াছিলেন,—অল্পদিনেই কলিকাতা

মহাত্মা গন্ধী।

মিঃ দালাল ও তাঁহার পত্নী।

বাদশাহ নৌরজী।

দেখিলে মনে হইবে, যেন পশ্চিমের একটা বড় সহর—Calcutta will become a first-class U. P. town.

বাঙ্গালীকে পাওয়া যাইবে সকালে ৯টা ১০টার সময়, আর বৈকালে ৫টা ৬টার সময়। তখন সেতুর উপর দিয়া পিপীলিকার শ্রেণীর মত বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে যাইতে বা আসিতে দেখা যায়। বাঙ্গালী কেবল কেরাণী।

বিদেশী পর্য্যটক যদি হ্যারিসন রোড হইতে একবার মুর্গীহাটা অঞ্চলে গমন করেন, তবে সে অঞ্চলেও কেবল বিদেশীদিগকে দেখিতে পাইবেন, অসংখ্য দোকানে বিদেশী পণ্য—মালিক—দিল্লী ওয়ালা মুসলমান, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাশী আ-

ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

র্ম্মাণী, ইহুদী—বাঙ্গালী নাই। তাহার পর ষ্ট্রীট হইতে চৌরঙ্গী—ব্যাঙ্ক, আফিস সর্ব্বত্রই পীয়ের অধিকার। কেবল বড় বড় সও আফিসে, আর সরকারী দপ্তরখানায় সহস্র বাঙ্গালী কেরাণী ডেস্কের উপর খাতা লিখিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের স্নায়ুমণ্ডল কলিকাতার বাণিজ্য, ধনরত্ন, এমন কি, অনেক স্থলে স্বামিত্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া

আর বোম্বাইয়ে? সরলমতি বাঙ্গালী বো আসিয়া সহর দেখিতে বাহির হইয়া হয় ত জি করিবেন, "ইংরাজটোলা কোথায়?" বোম্বাইবাসীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয়, ইহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন আর পারিলে নিশ্চয়ই হাস্যসংবরণে সমর্থ হ না। বোম্বাইয়ের সমুদ্রকূলে—বন্দরের আপোলো বন্দর, কোলাবা, মালাবার হিলস এ স্থানে যে সমুন্নত সৌধশ্রেণী সগর্ব্বে দণ্ডায়মা

সকলের স্বত্বাধিকারী ও অধিবাসী প্রায়ই সেই অঞ্চলের লোক—পার্শী,ভাটিয়া বা বোরাসম্প্রদায়ের মুসলমান। ইঁহারাই বোম্বাইয়ের বড় বড় কাপড়ের কলের মালিক। তদ্ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ইঁহাদের করতলগত। বোম্বাইয়ে য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী যে নাই, এমন নহে; তবে তাঁহারা একরূপ মাথা গুঁজিয়া আছেন। কলিকাতায় যেমন শ্বেতাঙ্গ সওদাগরদিগের সভা,বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রভুত্ব,বোম্বাইয়ে তেমনই ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বারের প্রভাব। বোম্বাইয়ের মুসলমানরা—খোজা, বোরা ও কচ্ছে মেমন—যেন ব্যবসায়ে স্বভাবজ অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া যখন বোম্বাই বন্দরে নামিতেছি, তখন আমার সহযাত্রী এক ভাটিয়া ব্যবসায়ী যুবক সমুদ্রসলিলে ভাসমান একখানি হাজার টনের জাহাজের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন—উহার মালিক এক জন বোরা। এইরূপ বড় জাহাজ বোম্বাই হইতে আরবসাগরে, পারস্যোপসাগরে,এমন কি,আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত পণ্য লইয়া গতায়াত করে। এই মুসলমানরা পুরুষানুক্রমে ব্যবসাব্যপদেশে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা নাখোদা নামে পরিচিত। ইঁহাদের অনেকের কোটি কোটি টাকা কারবারে খাটিতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আবার

আবার বরষ আসে তরুপত্র লতা হাসে
পুষ্পিত শোভায়
সবুজে ঘেরিয়া দেশ কচি কিশলয়-বেশ
ধরণীর গায়,
প্রকৃতির মহোৎসব চৌদিকে মুখর সব
গীত গন্ধে ভরা,
তরু শিরে গায় পিক ঝঙ্কারিয়া দশদিক্
মোহমুগ্ধ ধরা,
মিলন বারতা আনে, কোকিলের মধুগানে
চিত্তে আশা নব,
অতীত মুছিতে নারে পুরাতন বারে বারে
স্মৃতি আনে সব,
হৃদয়ের পাতে পাতে যে চিত্র নিশীথ রাতে
নিত্য উঠে জাগি,
তা'রে নাহি ভুলা যায় নূতনের মমতায়
তিলেকের লাগি।
তরুণের ভালবাসা নব দিবসের আশা
কল্পনা জাগায়,
মনে মনে কত চাই বরষে কভু না পাই
তবু ভ্রান্ত হায়,
নবীন দেখিলে পরে আকাঙ্ক্ষায় চাপি ধরে
বর্ষ আগমনে।
যে যায় তা' একেবারে বিরহের পারাবারে
বিসর্জ্জন সনে,
স্মৃতি জাগাইয়া তুলি আনে প্রিয়মুখগুলি
কত প্রেম প্রীতি,
পুরাতনে পূর্ণ বিশ্ব, নূতনের নব দৃশ্য
আনে না বিস্মৃতি।
ভাবি আজি তারি কথা অন্তর ভরিয়া ব্যথা
সব শূন্য তায়,
আঁখি পাতা আসে ভরি অতীতে স্মরণ করি
নূতনে কি পায়?

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

স্বারাজ্য বনাম সাম্রাজ্য

স্বধর্ম্ম বনাম পরধর্ম্ম।

মামলাটা বাস্তবিক স্বধর্ম্মের ও পরধর্ম্মের মধ্যে। গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

এই ভাগবতী বাণী পাঞ্চজন্য-নিনাদে আজ ভারতের সর্ব্বত্র জাগাইয়া তুলা প্রয়োজন হইয়াছে। স্বধর্ম্ম বলিতে ভগবান্ প্রত্যেক জীবের নিজস্ব প্রকৃতির যে ধর্ম্ম, তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবপ্রকৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া মোটের উপরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যাহার প্রকৃতি তামসিক, তাহার ধর্ম্মও তামসিকই হইবে। এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়াই এই তামসিক প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে রজঃপ্রাধান্য লাভ করিয়া রাজসিক হইয়া উঠিবে। প্রকৃতি যাহার তামসিক, প্রকৃতি যাহার নিদ্রা, আলস্য, মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে রাজসিক ধর্ম্মের অনুসরণ সহজ হয় না, ক্লেশকর হইয়া উঠে। যাহা ক্লেশকর, তাহাতে জীবের অনুরাগ জন্মে না। অনুরাগ ব্যতীত অন্তরের পরিবর্ত্তনও হয় না। তামসিক প্রকৃতির পক্ষে রাজসিক ধর্ম্মের অনুশীলন বাহিরের অনুষ্ঠানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে; যজমানের অন্তরকে স্পর্শ করে না। তাহা ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়াই রহে। আবার প্রকৃতি যাহার রাজসিক, সুখ এবং প্রভুত্ব যে চাহে, সুখ এবং প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা যাহার প্রকৃতির অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে, তাহাকে ত্যাগপ্রধান সাত্ত্বিক বিশ্ব-ধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করিলে তাহাও ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়াই রহিবে। সেইরূপ প্রকৃতি যাহার সাত্ত্বিক, নির্লোভ; অমানিত্ব, অদম্ভিতা, সত্য এবং সারল্য বা ঋজুতা যাহার সহজসিদ্ধ বা স্বভাবসিদ্ধ, তাহাকে রাজসিক বা তামসিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইলে, ইহাও ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। যাহার প্রকৃতি যাহা নহে, সে তাহা করিতে গেলে, ভাল করিয়া তাহা করিতেও পারে না, অথচ সকল দিকেই কেবল নিষ্ফলতা আহরণ করে। এই জন্যই ভগবান্ কহিয়াছেন যে, বরঞ্চ অসম্যক্ আচরিত বা বিগুণ স্বধর্ম্ম বা প্রকৃতিগত ধর্ম্মও সম্যক্-আচরিত ... প্রকৃতিবিরুদ্ধ পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের প্র... অনুযায়ী যে ধর্ম্ম, তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়া জীব... সংসারে সাংসারিক অর্থে বিনাশও প্রাপ্ত হয়, ত... শ্রেয়স্কর। কিন্তু পরধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভয়াবহ। তা... জীবের একূল ওকূল দুই কূলই নষ্ট হইয়া যায়।

জীবের যেমন একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে, ভিন্ন সমাজেরও সেইরূপ একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে। এ... ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বিশিষ্ট সমাজ-প্রকৃতি, ইহাই ইংরা... যাহাকে নেশনত্ব বা nationalism কহে। ইহাই ... অর্থ। য়ুরোপের আধুনিক চিন্তানায়কদিগের মধ্যে জো... ম্যাট্‌সিনিই কেবল এই কথাটা ধরিয়াছিলেন। ম্যাট্‌... ন্যাশনালিটিকে—individuality of a people— সংজ্ঞা দিয়াছেন। Individualityর অর্থ আজকাল অ... ব্যক্তিত্ব করিয়া লইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন লোকের আকা... এবং প্রকৃতিগত যে বৈশিষ্ট্য, তাহারই নাম ব্যক্তিত্ব। ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আকারগত যে সকল বৈষম্য অ... তাহা চাক্ষুষ; সকলেই তাহা দেখিতে পায়। এই আক... গত বৈষম্যের বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই দেখিবামাত্র আ... যদু যে শ্যাম নহে, ইহা বুঝিতে পারি। ইহা ব্যতীত ... ভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠের স্বর, পদের শব্দ, চলন-ভঙ্গী ... কথন-ভঙ্গীও বিভিন্ন। চক্ষুতে যখন তাহাদিগকে দেখি... পাই না, তখনও এই সকলের দ্বারা অন্ধকারে শ্যাম আ... তেছে না যদু আসিতেছে, শ্যাম কথা কহিতেছে না ... কথা কহিতেছে, ইহা বুঝিতে পারি। আবার সু... প্রবাস হইতে ইহারা যখন বেনামী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচা... করে, তখনও তাহাদের রচনা-ভঙ্গী বা 'এবারত' দে... অনেক সময় কোন্‌টা শ্যামের লিখা, কোন্‌টা যদুর লি... তাহা ধরিতে পারি। আর মুখের চেহারায় বা কণ্ঠের ... বা পদের শব্দে ইহাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন ব্যক্ত ... সেইরূপ লিখন-ভঙ্গীতে বা 'এবারতে'র মধ্যে ইহা...

মানসিক বৈশিষ্ট্যটাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মানুষের শরীরের যেমন একটা চেহারা আছে, সেইরূপ চিন্তারও একটা চেহারা আছে। এই চেহারাটাই লিখন-ভঙ্গী বা 'এবারতের' মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এই স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য শেষ হয় না। তাহারা জীবনে যে ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়া যে লক্ষ্যের বা আদর্শের অনুসরণ করে, কে কোন্ বস্তু বা বিষয়কে পরমপুরুষার্থ বলিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহার মধ্যেও বিশেষভাবে এই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যটা ফুটিয়া উঠে। এ সকলই মানুষের ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ। এই সকল লক্ষণের দ্বারাই আমরা এক মানুষকে অপর মনুষ্য হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের এই যে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ইংরাজীতে ইহাকেই Individuality কহে। সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের সার্ব্বজনীন ভূমিতে মানব-প্রকৃতির সাধারণ সাম্যের উপরে এই ব্যক্তিত্বের বা বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বারা সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতির সার্ব্বজনীন সামান্য ধর্ম্মটা নষ্ট হয় না; পরন্তু বিচিত্রভাবে বিভিন্ন আকারে এই সাধারণ মানব-ধর্ম্মই এই সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া প্রকৃষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। এ সকল বৈশিষ্ট্য একত্বকে নষ্ট করে না, কেবল বৈচিত্র্যের দ্বারা এই একত্বকে ফুটাইয়া তুলে। গীতা যাহাকে স্বধর্ম্ম কহিয়াছেন, আর শান্তিপর্ব্বে যাহাকে বিশ্বধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও সেইরূপ মানব-প্রকৃতির সাধারণ একত্বের কিংবা আধুনিক পরিভাষায় বিশ্বমানবত্বের কোনও বিরোধ নাই। মানুষের স্বধর্ম্মের ভিতর দিয়াই বিশ্বধর্ম্ম ফুটিয়া উঠে, ভয়াবহ পরধর্ম্মের ভিতর দিয়া নহে। সেইরূপ ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবত্ব ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া দিলে বিশ্বমানবত্ব পরিণামে পশুত্বের সহিত এক ক্ষেত্রে যাইয়া দাঁড়ায়। তাহার দ্বারা বিশ্বমানবত্ব ফুটিয়া উঠে না; উঠিতেই পারে না।

যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির এক একটা ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজেরও এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই ম্যাট্সিনি nationality বা নেশনত্বের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বা নেশনের এই বৈশিষ্ট্যেরও কতকগুলি লক্ষণ আছে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণার মত এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও কতকগুলি বহিরঙ্গ ও কতকগুলি অন্তরঙ্গ লক্ষণা আছে। বহিরঙ্গ লক্ষণা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির শরীরের গঠন এবং সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহগঠন সম্বন্ধে নিগ্রোসমাজের, চীন ও জাপসমাজের এবং যাহাদিগকে মোটের উপরে আর্য্য বলে, য়ুরোপের এবং এসিয়ার সেই সকল সমাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোককে দেখিলেই তাহাদের চেহারা দিয়াই তাহারা কে, কোন্ সমাজের অন্তর্গত, অথবা সাধারণ মনুষ্যজাতির কোন্ শাখাভুক্ত, ইহা জানিতে পারা যায়। ইহাই হইল সামাজিক বৈশিষ্ট্যের একটা বহিরঙ্গের বা বাহিরের লক্ষণের কথা। ইহা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন সমাজের গঠনও বিভিন্ন। কোনও সমাজগঠন সামরিক। সমরক্ষেত্রে যেরূপ সেনাপতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, সমাজেও সেইরূপ সমাজপতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজের প্রতিষ্ঠা এই সামরিক কাঠামের উপরে, সে সমাজে সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা বা খেয়ালই সমাজ বা রাষ্ট্র শাসনের নিয়ামক হইয়া রহে। সাধারণ সামাজিকগণকে বা প্রজাবর্গকে সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতি নিজের খেয়ালমত যখন যে আদেশ করেন, তাহাই মানিয়া চলিতে হয়। এই সমাজগঠনকে একতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্র সমাজ-গঠন কহে। আবার কোনও কোনও সমাজের গঠন অন্যরূপ। তাহা সমাজপতির বা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার বা খেয়ালের দ্বারা নিয়মিত হয় না। এ সকল সমাজের গঠন, প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র। এই সমাজগঠনে সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতি সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন না; তাঁহার সে অধিকার নাই। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজের বা রাষ্ট্রের শাসন-সংরক্ষণ কার্য্যের নায়কত্বই তাঁহার অধিকার বা কর্ত্তব্য। রাজা এবং প্রজা এ সকল সমাজে উভয়ে একই বিধানের অনুগত হইয়া চলেন। সমাজ-বিধান বা রাষ্ট্র-বিধান রাজাকেও শাসন করে, প্রজাকেও শাসন করে; রাজা

প্রজা উভয়েরই উপরে এই সমাজবিধান বা রাষ্ট্র-বিধান সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোনও সমাজে অর্থব্যবহার এবং রাষ্ট্র ব্যবহার economics এবং politics সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্ব-স্বার্থের পরস্পরের প্রতিযোগিতার দ্বারা নিয়মিত, কোনও সমাজে অর্থব্যবহার এবং রাষ্ট্রব্যবহার উভয়ই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্ব-স্বার্থের সমীকরণের এবং সমবায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের গঠন বিভিন্ন। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোকের চিন্তার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। এই বিশ্বসমস্যার দ্বারা মানবমাত্রেরই চিন্তার উন্মেষ হইয়া থাকে। এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি কোথা হইতে? স্থিতি কিসের উপরে? গতি কোন্ দিকে? পরিণতি কি? এই সকল প্রশ্নই মানুষের সমক্ষে এই বিশ্ব-সমস্যাকে জাগাইয়া তুলে। এই বিশ্বের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ কি? বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব কোথায়? ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সমন্বয় কিরূপে হয়? এই সকল প্রশ্নের মুখেই মানুষের চিন্তা ফুটিয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সমষ্টিগত চিন্তা এবং সাধনা বিভিন্নভাবে এই বিশ্বসমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সাহিত্যে, দর্শনে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মবিধানে কোন্ সমাজ কি ভাবে এই বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সাহিত্য, দর্শন, ললিতকলা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ইতিহাসের মধ্যে তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতির অন্তরঙ্গ লক্ষণ এবং তাহাদের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির বিশিষ্ট গতি এবং নিয়তির প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকলের দ্বারাই কোন্ সমাজের বা আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তার পরিভাষায় কোন্ নেশনের, বৈশিষ্ট্য বা ম্যাট্‌সিনির কথায় Individuality কি, ইহা ধরিতে পারা যায়।

এই বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের স্বধর্ম্ম। এই সামাজিক স্বধর্ম্ম অর্থে নেশনত্বের বা nationalityর একটা নিজস্ব স্থান এবং অধিকার আছে। যে সমাজ আপনার বৈশিষ্ট্য হারায়, তাহার বাঁচিয়া থাকার আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। এই অর্থে নেশনত্বের বা Nationalityর দাবী অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ভূমিসাৎ করিয়া এ একাকার বা নিরাকার বিশ্বমানবত্বের প্রতিষ্ঠার আত্মঘাতী। তাহাতে বিশ্ব-মানবকে একেবারে "জগন্নাথ" করিয়া তুলা হইবে। মানবের সৌষ্ঠব ও সার্থ যেমন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্য, শক্তি, স্বাতন্ত্র্য সুসমাবেশের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে, সে বিশ্ব-মানবের সৌষ্ঠব এবং সার্থকতাও ভিন্ন ভিন্ন ম সমাজের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং সেই সকল বৈ ষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিয়া পরস্পরের সঙ্গে সুসমাবিষ্ট কি উপরেই নির্ভর করে। নেশনত্বের বা সামাজিক বৈশি দাবী অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। বিশ্বমানবকে মানবসমাজের অঙ্গিরূপে দেখিতে হইবে। ভিন্ন মানবসমাজ, অঙ্গিস্বরূপ যে বিশ্ব-মানব, তাহারই অঙ্গকে ফুটাইয়াই অঙ্গীর পরিপুষ্টিসাধন করিতে অঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিয়াই অঙ্গীকে বাঁচাইয়া রা হয়। য়ুরোপ যাহাকে নেশন কহে, আর যাহাকে f ম্যানিটি (Humanity) বলিয়া কল্পনা করে, সে বস্তুর সঙ্গে সত্য নেশনের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। এ কথ ভুলিলে চলিবে না। য়ুরোপ নেশন কাহাকে ব তাহাও বুঝে না; হিউম্যানিটি (Humanity) কাহ বলে, তাহাও ধারণা করিতে পারে নাই। সেই জ য়ুরোপে নেশনের নামে কেবলই রেষারেষি ও মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছে। য়ুরোপ যদি Humanityকে অর্থে বুঝিত, তাহা হইতে নেশন-অভিমানে অ হারা হইয়া প্রতিযোগী নেশনের বিনাশসাধনে আপন নিয়োগ করিয়া একই সঙ্গে নিজের এবং বিশ্ব-মান বিনাশে উদ্যত হইত না। একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অ মধ্যে যে সম্বন্ধ, অঙ্গিস্বরূপ যে বিশ্বমানব, তাঁহার ম ভিন্ন ভিন্ন মানবসমাজের বা নেশনেরও সেই সম্ব য়ুরোপ এই কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে। বিশ্ব-মানবের স ভিন্ন ভিন্ন সমাজের যে সম্বন্ধ, সমাজের ভিতরে ভিন্ন f ব্যক্তির বা শ্রেণীরও পরস্পরের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। সম অঙ্গিস্বরূপ। সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং শ্রে সমাজ-অঙ্গীর অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু য়ুরোপে এই সব সমাজ-অঙ্গ নিজের অঙ্গীকে ভুলিয়া গিয়া এক অঙ্গের স সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া রেষারেষি ও মারামারি করিতেছে

এই অসম্যক্ দৃষ্টির ফলে য়ুরোপ আত্মহত্যার পথে চলিয়াছে; সত্য এবং শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। আমরাও কি এই পথেই চলিব? ইহাই ভারতের মনীষার সমক্ষে আজিকার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরু সমস্যা। স্বারাজ্য বনাম সাম্রাজ্য—এই মামলা এই সমস্যাটাকেই আমাদের সমক্ষে প্রকট করিয়াছে। এই সমস্যার মীমাংসার উপরে আমাদের বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে।

সোজা কথায় আধুনিক ভারতবর্ষ বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতে যাইয়া আত্মঘাতী পরধর্ম্মের পথ বা য়ুরোপের পথ ধরিয়া চলিবে, না নিজের সনাতন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য স্বধর্ম্মকে আঁকড়াইয়া ধরিবে—ইহাই মূল প্রশ্ন। য়ুরোপের পথে সংগ্রাম, ভারতের পথে শান্তি; য়ুরোপের পথে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভারতের পথে আন্তর্জ্জাতিক সমবায়। ভারত কোন্ পথ ধরিবে? সম্মুখে দুই পথই দেখিতে পাই। পথসন্ধিস্থলে আজ আমরা আসিয়া দাঁড়াই
ধরিব, তাহারই দ্বারা ভারতে
হইবে।• এই কথাটা ভাল
বনাম সাম্রাজ্য এই মোকর্দ্দম

নির্ভীক্

মাঝ দরিয়ায় উঠেছে ঝড়—দুল্‌ছে তরীখান
ডুব্‌তে পারে ডুব্‌তে পারে—ও মাঝি, সাবধান!
গহন মেঘে গগন ঢাকা,
দিক্ বিদিকে আঁধার মাখা,
দুল্‌ছে নদী, দুল্‌ছে তরী কাঁপ্‌ছে আমার প্রাণ,
ডুব্‌তে পারে নৌকা তোমার—ও মাঝি সাবধান!

সামাল, সামাল, ও মাঝি ভাই,—ওরে ও নির্ভীক্
ত্যাখ্‌রে আবিল কুহেলিকায় ঢেকেছে দশদিক্।
বাঁচ্‌তে যদি ইচ্ছা থাকে
ভিড়াও তীরে নৌকাটাকে,—
কূল ছাপিয়ে জল ছুটেছে—ঐ ডেকেছে বাণ,—
নৌকা তোমার ডুব্‌তে পারে—ও মাঝি, সাবধান!

বাদল ধারা আস্‌ছে নেমে বিজুলী খেলায়,
মত্ত-মাতাল বাদল বাতাস ছুটেছে দমকায়,
ছিন্ন হ'ল পালের দড়ি,
মরণ-নাচন্ নাচ্‌ছে তরী,
উদাস মাঝি নির্ভয়ে ঐ গাইছে ব'সে গান—
—রাখ্‌বে রাখো, মার্‌বে মারো, দয়াল ভগবান্!

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

গরীবের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল, বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। আফিসের কেরাণী, দ্বারবান্, ঝাড়্দার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদল যথা-নিয়মিত সময়কে পাছে না ধরিতে পারে, তাহারই জন্য পশ্চিমের এই দুরন্ত শীতকেও উপেক্ষা করিয়া খালি গায়ের উপর কেহ এক খাব্লা তেল চাব্ড়াইতেছে, আবার কেহ বা জামাজোড়া খুলিতে না পারিয়া শুদ্ধই মাথা ঝুলাইয়া, মাথার চুলগুলা ভিজাইয়া লইতেছিল। এইরূপ কাকস্নানের প্রধান উদ্দেশ্য চুলগুলার মধ্যে সুচারুভাবে টেরী কাটা। নতুবা শারীর-স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই, বরং কিছু বিরুদ্ধ সম্পর্কই দেখা যায়।

এ ছাড়া আজকাল আর একজাতীয় জীবকেও এই আফিস ইস্কুলের অধিবাসীদিগের মতই শীতবর্ষানির্ব্বিশেষে সাতসকালে দু'টি নাকে মুখে গুঁজিয়া প্রায়ই অ-স্নাত—অ ভুক্ত অবস্থায় সারাদিনের মত বাড়ীর বাহির হইতে হয়। তাহাদের দুরবস্থা আবার আর এক কাঠি উপরে! সে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদল। স্কুলের গাড়ীর ভয়ে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে এতই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় যে, পুরা হপ্তাটা স্নান ত হয়ই না, আহারটাও অর্দ্ধেক দিন না হওয়ার সামিল। কারণ, বাসনমাজা ঝিয়ের কামাই মাসের মধ্যে অমন পঁচিশ দিনই, খোকাখুকীদের না ধরিলে, বিছানাটা না তুলিলে, নেকড়াগুলা না কাচিলে, বাবা বা দাদার তেল-টুকু, গামছাখানা, ধুতিখানি ঠিক করিয়া না রাখিলে দ্বিভুজা-মাতা চতুর্ভুজা হইয়াও যে আধসিদ্ধ ডাল-ভাতটা জোগান দিতে পারিয়া উঠেন না। বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ছাই তুলিয়া, ছেলেকে দুধ দিয়া তাহার উপর মেয়ের কাছে কণামাত্রও সাহায্য না পাইলে, সূতিকা-রোগ-জীর্ণা মাতা বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সব কয়টিকে কেমন করিয়া সাড়ে নয়টার ভিতর সারাদিনের রসদ যোগান দেন। বিশেষতঃ সারা সহর ঘুরিয়া মেয়ে সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া মেয়ে-স্কুলের গাড়ী বেশীর ভাগই সাড়ে আটটা নয়টার মধ্যেই আসিয়া পৌছে।

পৌষমাস, যেমন প্রবল শীত পড়িয়াছে, তেমনই এ
বর্ষা দেখা দিয়াছে। একদিকে মেঘ ও একদিকে
শার স্থূল অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া ধরণীবক্ষে দিনের আ
অবতরণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বেলা
বাজিলেও মনে হইতেছিল, সবেমাত্র বুঝি এই ভোর
য়াছে। একে ত শীতের ভোরে পাখীরা সহজে সাড়া
না, তাহার উপর বৃষ্টির দৌলতে কাকপক্ষীরা সকলেই
দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া আছে, কাহারও আর সাড়
পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু জীবজগতের সর্ব্বত্র ত আর এ
নিয়ম চলে না, মনুষ্যজীবের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদে
আর কাহারও ভরা কলসীতে ঠোঁট ডুবাইয়া, বাড়াত
মুখ জুবড়াইয়া বেড়াইলে দিন চলিবে না, কাযেই
বর্ষা, আতপ এবং হিমকে পরাস্ত করিয়াই তাহাকে পে
চেষ্টা দেখিতে হইয়াছে। আরামের এবং বিরামের
লইয়া তাহাদের জন্ম হয় নাই, তবে ইহারই মধ্যে যাহ
সুকৃতিবলে অপরের বাড়া ভাত খাইবার মত বুদ্ধি ও
লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

এলবার্ট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড ওমনিবস্
দুইটি শীর্ণ ও বৃহদায়তন কালো ঘোড়ার দ্বারা বা
হইয়া, সহরের প্রান্তভাগে অনেকগুলা পড়োবাড়ী, খো
ঘর ও কালকাসন্দা, ঘেঁটু ও বাঁশবাগানের পাশাপ
একখানা অর্দ্ধভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁ
ইল। পিছনের পাদানীতে আড়ষ্টভাবে উপবিষ্টা মা
'চুমুরী' শাড়ী ও ছেঁড়া 'ঝুলা'-পরা বালিকা-বিদ্যালয়ের 'দ
নামিয়া পড়িয়া, ক্রমেই অসংস্কৃত জীর্ণ অথচ সুবৃহৎ অ
লিকাটির প্রবেশদ্বারের মধ্যে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে উচ্চক
আহ্বান করিল—"নিলাবউমা! হো নিলাবউমা! গা
আয়া।"

বাড়ীর ভিতরদিক হইতে একটি উদ্বেগ-বিপন্ন কণ্ঠস্ব
তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "ওই শোন মা! আমি
বল্ছি তোমায়, যে, আজ কিছুতেই আর খাওয়া হ
উঠবে না, তা তুমি কিছুতেই শুনলে না ত! এখন?"

"ও মা! মোটে যে খোলা দুটি গরাস ভাত মু

দিইছিলি, উঠ্‌ছিস কি বল্? দুধওয়ালী মাগীও ত এখনও এলো না যে, দুধ একটু গরম ক'রে দোব। আজ না হয় না-ই গেলি, মা!" মায়ের কণ্ঠ হইতে এই ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রতিবাদটুকু বাহির হইল।

মেয়ে কিন্তু এই সুযুক্তির সমর্থন করিল না; সে অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমার ত অর্দ্ধেক দিনই এই রকম; না গেলে ফাইন দিতে হবে যে, আর সে পয়সাও ত তুমি দেবে না। মা মা! রোজ রোজ সব্বার সাম্‌নে আমায় দাঁড় করিয়ে দেবে, সে আমি পার্‌বো না, বাপ্‌! তার চেয়ে না খাই না-ই খেলুম, আমি—"

দাই হরমতিয়া অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া, ডাকিয়া উঠিল, "নীলি বউয়া! জল্‌দি আইয়ে বউয়া, মাইজি লোগ কেত্তা বোল্‌তা হ্যায়, আপ ত আপমেসে কুছ্ শুমাথা; তব ফিন্ কাহে এত্তা দেরি করতেহেঁ!"

"ও মা! মা না, তুমি আর কিছু বলো না, মা! এ দাই! তুরন্ত ম্যয় আতেহেঁ—"

দুই তিন মিনিট পরেই একটি বছর এগার বারো বৎসরের মেয়ে একখানা আধময়লা মিলের সাড়ী ও ছিটের জামা পরা, হাতে তার গাছকতক কাচের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ চুলের পিছনে একটা আধখোলা প্রকাণ্ড খোঁপা, একগাদা ময়লা ও মলাটখসা বই-খাতা বগলে চাপিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"হা, নীলি বউয়া! আপ কেত্তা দেরি কিয়া!—" এই মন্তব্য করিয়া দাই মিলিটারী ধরণে পা ফেলিয়া গাড়ীর দরজা খুলিতে অগ্রসর হইয়া গেল এবং মেয়েটি গাড়ীর পাদানীতে পা দিবার পূর্ব্বেই তাহার সহাধ্যায়িনীমণ্ডলী হইতে কলরব উঠিয়া পড়িল—

"বাব্বা! নীলিমা! তোমার যে আর সাজা-গোজার শেষ হয় না, ভাই! এতক্ষণ ধ'রে হচ্ছিল কি, শুনি?"

"রোজই ত' ভাই, তোমার দরজায় আমাদের তিন ঘণ্টা ক'রে সময় লাগবে, আমরা তবু তোমার কত আগে বেরিয়েছি, তোমারই বা এত দেরি কিসের জন্ত হয়, ভাই!"

আর এক জন বলিল, "ও মা! তবু চুলটা ত চারদিন থেকে ওই রকমই বাঁধা আছে। তুই কি কুঁড়ে, ভাই! আমি দেখ্ আজ চান করতে পারিনি, তবু চুলে 'কেতা' ক'রে ফিতে বেঁধে নিইচি। তুই, ভাই, যেন কি!"

নীলিমা ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের মধ্যে নিজের আসন গ্রহণ করিয়া অপরাধীভাবে জবাব দিল, "আমাদের যে ভাই বামা পিসীর অসুখ করেছে, মারও শরীরটা ভাল নেই, তাতে এই বৃষ্টি-বাদলা, রান্না হ'তে অনেক দেরী হয়ে গেল, তবু আমি ঠিক গোণা দুটি গরাস মাত্র ভাত মুখে দিয়েই—যেম্‌নি দাইএর সাড়া পেয়েছি, অম্‌নি উঠে প'ড়ে ম'ার মানা না শুনেই পালিয়ে এলুম।"

এই বলিয়াই মায়ের পরিম্লান ছল্‌ছলে মুখ-চোখ মনে পড়ায় তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা মৃদুশ্বাস উঠিয়া আসিল। কিন্তু তাহার বান্ধবীগণ সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই তীব্র বিদ্রূপের তীক্ষ্ণস্বরে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

অণুকা বলিল, "ও মা! বাদ্‌লা-বৃষ্টি কি শুধু তোমাদেরই বাড়ীতে হয়েছে না কি? সারা সহর শুদ্ধ লোকদের কি ক'রে রান্না-বান্না হলো, শুনি?"

সুষমা ঠোঁট টিপিয়া মন্তব্য করিল, "তা ভাই, নীলির মা যদি কালিয়া-পোলাও চড়িয়ে থাকেন ত সে কি ক'রে এর মধ্যে শেষ হবে বল্? আমরা শুধু খিচুড়ী আর আলু-বেগুন ভাজা খেয়ে এসেছি বই ত নয়।"

মনোরমা একটা দুই কাঠির গলাবন্ধ, এই গাড়ীর ঝাঁকানীকেও উপেক্ষা করিয়া, মনোযোগের সহিত বুনিতেছিল, যেন এই সময়টুকুর জন্তও তাহার সেই লাল পশমের সেলাইটুকু বন্ধ থাকিলে, কি জানি, কি অনর্থই বা ঘটিয়া যাইবে,—সেও অকস্মাৎ নিজের সেই একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া, মুখ তুলিয়া ও মাথা ফিরাইয়া, সুষমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, "বলি সুষি! তুই বুঝি আর এ সহর খুঁজে পোলাও রাঁধাবার লোক দেখতে পেলি নে? তাই নীলির মায়ের ঘাড়ে ওর দায় ফেল্লি? হ্যাঁ ভাই নীলি! আজ তোদের কি রান্না হয়েছিল, বল্ তো?"

এই প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ভিতরকার রহস্য এ সমাজে নিতান্তই অপ্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া এ কথায় সকল মেয়েরই ঠোঁটের আশে পাশে তৎক্ষণাৎ কিছু কিছু হাসির আভাস খেলিয়া গেল। কোন মেয়ে বা সামলাইতে না পারিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। নীলিমার গণ্ড ও কর্ণমূল

আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে নিজের লজ্জা-বিপন্নতা সযত্নে রোধচেষ্টা করিতে করিতে শান্ত ঔদাস্যে উত্তর করিল, "আজকের দিনে আর অন্য কি হবে? খিচুড়িই চড়েছিল, মা তাই থেকে হাতায় কেটে আমায় দু'টি তুলে দিয়েছিলেন, তাও আবার গাড়ী এসে পড়লো ব'লে—"

অণুকা প্রশ্ন করিল, "আজ তা হ'লে তোর মা নিশ্চয়ই তোকে জলখাবারের জন্য পয়সা দিয়েছেন? আমি, ভাই, আজ চানাচুর আর রসগোল্লা কিনবো! মনু, তুই কি কিনবি? নীলি, তুই?"

মনোরমা বোনা বন্ধ করিয়া তখনই জবাব দিল, "আমি আজ ঝালবড়া আর গোলাপী রেউড়ির কথা ভেবে রেখেছি। কিন্তু নীলি নিশ্চয়ই ও সব কিনবে না, সে আজকের দিনে লেডিকেনী, রাবড়ী আর মতিচুর কিনতে দেবে, কেমন ভাই, নীলিমা? কেমন তোর 'মেনু' তৈরি ক'রে দিলুম বল ত?"

নীলিমার নাম নীলিমা হইলেও সুষমা বা মনোরমার অপেক্ষা রং তাহার অনেকটাই সাফ, তার সেই ফরসা মুখ এই ব্যঙ্গোক্তিতে অনেকখানি লাল দেখাইলেও মুখে সে একটু হাসিয়া বলিল, "'মেনু' ভালই হয়েছে; কিন্তু খাবার আজও আমি কিনবো না, বাজারের খাবার আমার পেটে সয় না, সে তোমরা জানই তো?"

"হ্যাঁ, তা' বটে!" এমন সুর করিয়া মনোরমা এই কথাটা বলিল যে, বাকি মেয়েরা ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহই আর হাসি চাপিতে পারিল না; কেবল নীলিমাই তাহাদের সেই হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াও হাসিতে ত পারিলই না, উপরন্তু তাহার সমস্ত মুখটা অপমানের লজ্জায় অধিকতর রাঙা হইয়া উঠিল।

ইহার ভিতর তাহাদের সুবৃহৎ যান গমগম শব্দে সমস্ত সহরের রাস্তা কাঁপাইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে ভিতরের মেয়েরা হুড়াহুড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আজও তাহারা 'লেট' আসিয়াছে। স্কুলের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে এবং দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, সেদিনও সুলোচনাদি'র মুখের চেহারা বেশ সুপ্রসন্ন নয়। ইহা দেখিয়া সকল মেয়েই একসঙ্গে ভ্রূকুটী করিয়া ভয়-বিপন্নমুখী নীলিমার আনত মুখের দিকে এমনই ভাবে চাহিল যে, তাহার এ অর্থ করাও অসঙ্গত হয় না—এই সব কোপ-কটাক্ষে সে যদি ভস্ম হইয়া যায় ত হয় ভাল। তাহা হইলে ত' আর রোজ রোজ তাদের 'ঝি না থাকার', 'মায়ের অসুস্থতার', 'বাপের কোন কিছুর' দরুণ ভাত না হওয়ার দায়ে সবাইকার এই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেমেয়ের গালভরা বাহারে নাম রাখিতে যদি কিছুমাত্র পয়সা খরচ হইত, তাহা হইলে নীলিমার পিতা অনুকূলচন্দ্র কখনই তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণলতার উপর তাঁহার ছেলেমেয়েদের নামকরণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে আজও আমাদের কর্তৃপক্ষীয়গণের অনবধানতা প্রযুক্ত এই একটা ব্যাপারের উপর কোনরূপ কর ধার্য্য করা এখনও পর্য্যন্ত উঠে নাই বলিয়াই ঘটিয়া অনুকূলচন্দ্রের পত্নী তাঁহার দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই একটা বিষয়েই শুধু একটুখানি স্বাধীনতা লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। তা' মনের ক্ষোভ তিনি এ বিষয়ে কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, মানুষে ছাড়িলে আবার যমে ছাড়ে না যে! যমদূতেরই একটি ছোটখাট সংস্করণ স্বামীরত্নটি যদি বা একটুখানি উদারতা দেখাইলেন ত ভাগ্যনিয়ন্তা বাম হইয়া সেই জোড়াগাঁথা নামগুলির কয়েকটি খসাইয়া লইয়া চিরসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীলা, শান্তপ্রকৃতি মায়ের বুকটাকে ভাঙ্গিয়া দিলেন। একটির পর একটি করিয়া স্বর্ণলতা তাঁহার পূর্ণিমা, সুরমা ও সুষমাকে হারাইলেন, বাকি রহিল কেবল তাহাদের সহিত মিল রাখিয়া রাখা নাম সকলের ছোট মেয়েটি নীলিমা। আবার এ দিকে অরুণেন্দু, নির্ম্মলেন্দু দুইজন চলিয়া গেল, শুভেন্দু এদের সবার ছোট, সেইটিই শুধু মায়ের কোল জুড়িয়া রহিল। এমনই করিয়াই কৃপণ স্বামীর স্ত্রী স্বর্ণলতা নিজের অশন-বসন-ভোগ-বিলাসের একান্ত অভাব সত্ত্বেও সকল দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবকে তুচ্ছ করিয়া যে মহাধনে নিজেকে ইন্দ্রাণীসমা বোধ করিয়া গৌরবানন্দে পরিপ্লুতা হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিল, তাহার প্রায় সবটুকুকেই বিসর্জ্জন দিয়া জীবন্মৃতা হইয়া রহিলেন। সাতটি সন্তানের মধ্যে বাকি দুইটির উপরই বা কিসের আশা? সদা:ভয়ে

হায়াই, হায়াই—এই ভাবে যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা, ইহার চেয়ে মানুষের পক্ষে আর অভিশাপ বুঝি কিছুতেই নাই! তা তেমন করিয়াও মানুষকে প্রায়ই ত বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং স্বর্ণলতাও রহিলেন।

শুভেন্দু ছেলেটি খুবই মেধাবী বা তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন নয়; তাই বলিয়া ছোটবেলা হইতে যত্নপূর্ব্বক পড়াশুনা করাইলে যে সে 'মানুষ' হইতে পারিতই না, তেমন কোন মন্দ লক্ষণও তাহার শৈশব-জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে, এমনও বোধ হয় না। কিন্তু শুভেন্দুর পিতার নাকি ভবিষ্যদ্দর্শনজ্ঞানটা অত্যন্তই প্রবল, তাই তিনি তাঁহার এই একমাত্র পুত্রকে বিদ্যালাভের পক্ষে একান্ত অসমর্থ জানিতে পারিয়া প্রথমাবধিই তাহার জন্য কোন প্রকার যত্ন লয়েন নাই, বিশেষতঃ ছেলেরা আজকাল বিদ্যালয়ে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একান্ত ধৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে ও পিতা-মাতা—বিশেষতঃ পিতার প্রতি আর যথোচিত বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে পারগ হইতেছে না, এই প্রকার হেতুপ্রযুক্ত ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রতি শুভেন্দুর পিতার বিশেষরূপেই একটা প্রচণ্ড বিরাগ ছিল। তবে ইংরাজী বিদ্যা বয়কট করিয়া রাখিয়াও যে ছেলেদের পক্ষে অপর বিদ্যালাভ করিতে পারা সম্ভব, এমন কুতর্ক তুলিবার মত লোক সৌভাগ্যক্রমে এ পরিবারে বা ইহার বাহিরে তেমন কেহই ছিল না, যে একজনমাত্র ছিলেন, তিনি অনুকূলচন্দ্রের এক জন বাল্যবন্ধু, নাম তাঁহার ভুবনচন্দ্র মিত্র, এক্ষণে বহুবর্ষ যাবৎ দুইজনে সাক্ষাৎ নাই। কাযেই নির্ব্বিরোধে শুভেন্দুর বাধ্যতা-মূলক সু-শিক্ষা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ কোনরূপ শিক্ষালাভেরই সুব্যবস্থা হইল না। বিদ্যা তাহার পাঠশালা, বাঙ্গালা স্কুল প্রভৃতি হইতে আর উর্দ্ধসীমায় উঠিতে পাইল না, তবে এত দিনের পর হঠাৎ একদা একটা সুযোগ যদিও বা নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল।

অনুকূলের বাল্যবন্ধু ভুবনচন্দ্র একটা মোকদ্দমায় আসিয়া এক বেলার জন্য বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে ডাল-ভাত, সজিনাখাড়া চচ্চড়ি, মৌরলা মাছের অম্বল ও খয়রা মাছ ভাজার পরিবর্ত্তে তিনি বন্ধু-কন্যা নীলিমার হাতে এক জোড়া সোনার ইয়ারিং গুঁজিয়া দিলেন এবং বন্ধুর সঙ্গে বিস্তর তর্কাতর্কির পর বন্ধুপুত্র শুভেন্দুকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বন্ধুর হাতে ছেলে দিলে খরচের ভাবনা নাই, সে কথা অনুকূলও জানিতেন এবং বন্ধুও প্রথমাবধি সে ভরসা দিয়াছিলেন। ইহাতে অসম্মতির কিছুই ছিল না, বরং শুভেন্দুর উপর যেটুকু খরচ পড়ে, সেটুকু শুদ্ধ বাঁচাইতে পারা যাইবে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুকূল সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার এই ইংরাজীশিক্ষিত উত্তরাধিকারীর কথা মনে করিতেই সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিলেন। ইংরাজী শিখিলে সে কি তখনই আর এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিবে, বাপের মত আটহাতি ধুতী বেনিয়ান পরিবে, না চানা-ভিজা ও গুড় দিয়া জলখাবার খাইতে রাজী হইবে? উঃ, তখন হয় ত ডসনের জুতায়, আদ্দির পাঞ্জাবীতে ও মাংসের কাটলেটে তাঁহার বুকের রক্তস্বরূপ টাকা কয়টা দুইদিনের মধ্যেই উড়াইয়া দিয়া শুভেন্দু পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। এই দুশ্চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি উঠিয়া তীব্র ও অকাট্য প্রতিবাদ তুলিলেন; বলিলেন, "মরাহাজা একটামাত্র ছেলে; ওর মা ওকে ছেড়ে থাকতে কিছুতেই রাজী হবে না।"

ভুবনচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নীলিমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার মা'কে এই দোরের পাশে এসে দাঁড়াতে বল তো, খুকি! আর তাঁকে জিজ্ঞেস করো, শুভেন্দুকে আমার সঙ্গে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠিয়ে দিতে তাঁর কোন অমত আছে কি না?"

অনুকূল নেপথ্যে অবস্থিতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ, গিন্নি; হঠাৎ একটা খামখেয়ালী ভাবে যেন কিছু ক'রে বসো না। ছেলে ছেড়ে দিয়ে যে শেষকালে প্যান প্যান ক'রে কাঁদতে বসবে, সেটি যেন হয় না দেখ; তাতে তোমার আবার বুকের ব্যামো আছে।"

নীলিমার মুখ দিয়া স্বর্ণলতা জানাইলেন, ছেলে ছাড়িয়া তিনি একদিনও টিঁকিতে পারিবেন না।

হিতকামী সুহৃদ সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি আর একবার গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে তাঁহার বালিকা কন্যাদ্বারা পুত্রস্নেহে তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্বন্ধে বিচারশক্তিবিহীনা জননীর নিকট এ সম্বন্ধে বিস্তৃত দরখাস্ত পাঠাইয়া এই একই উত্তর পাইয়াছিলেন।

স্বর্ণলতার যদিও নিজ সন্তানের সম্বন্ধে এতবড় অবিচার করিতে বুক ফাটিয়া গেল, কণ্ঠ চাপিয়া আসিল, শেষে চোখের জলে বুক ভাসিল, তথাপি স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইয়া আসিল না। নতুবা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে স্বর্ণলতা সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে যে জ্ঞানগম্যহারা হইয়া নিজের খেয়ালে তাহাকে কাছে টানিয়া রাখিলেন, তা নয়। আসল কথা, অনুকূলচন্দ্রের স্ত্রী স্বর্ণলতা যদিও বয়স ও পদমর্য্যাদায় গৃহিণী, জননী এবং এমন কি, তাঁহার প্রথম সন্তানগুলি বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে শ্বশ্রূমাতার পদবীতেও উন্নীত হইতে পারিতেন, তথাপি স্বভাবে আজও তিনি সেই নবোঢ়া বালিকারই ন্যায় তাঁহার স্বামীর কাছে সঙ্কুচিতা হইয়া আছেন। সংসারে এক এক জন মানুষ দেখা যায়, যাঁহাদের দেখিলেই মনে হয়, তাহারা যেন জগতে কেবলমাত্র অত্যাচারিত হইবার জন্যই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্বামী পুত্র ত বটেই, পাড়া-প্রতিবেশীও সুযোগ পাইলে তাহাদের সম্বন্ধে একটুখানি না একটুখানি অবিচার করিয়া লয় এবং তাহারাও নির্ব্বিরোধে উহা সহ্য করে। আবার শুধুই যে সহ্য করে, তাও নয়; তাহাদের প্রতি যে কোন অন্যায় হইতেছে, এমন কথা মুখে ত নহেই—এমন কি, তাহাদের মনেও হয় ত পড়ে না। চিরদিনটা অত্যাচার সহিয়া সহিয়া ঐ জিনিষটাই যেন উহাদের জগতের কাছেই একমাত্র পাওনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রকমই একটা বিশ্বাস নিজের মনেও জন্মিয়া যায়। স্বর্ণলতা লোকটিও ঠিক এই প্রকৃতির। দশ বছরে বিবাহ হইয়া "বউ-কাঁট্‌কী" শাশুড়ীর হাতে অশেষবিধ লাঞ্ছনা সহিয়াছেন, বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব-তাবাসের ত্রুটি ঘটিলে, তাঁহার গালির অন্ত থাকিত না। একবার কি একটু প্রতিবাদ করিতে যাওয়ায় ইঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর মুখে জ্বলন্ত দিয়াশালাইএর কাঠী চাপিয়া ধরিয়া "বউ মানুষের চোপা" করার এমন এক শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন যে, বধূর মুখ সেই দিন হইতে ছুঁচসূতা দিয়া শিলাই করিয়া দিলেও এর চেয়ে বেশী বন্ধ করিতে পারা সম্ভব হইত না। সেই যে বালিকা স্বর্ণলতা তাঁহার প্রতি শাশুড়ীর সকল অত্যাচারকে নীরবে সহিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন, আজও এই প্রৌঢ়া গৃহিণী ঠিক তেমন ভাবেই দৈবমানবের সকল অত্যাচারকেই অপ্রতীকারপূর্ব্বক নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। দৈববিপাকের বিরুদ্ধে দেবতাকেও তিনি কোন দিন দোষী করেন নাই এবং মানুষকেও না। এমন কি, নিজের ভাগ্যকে পর্য্যন্ত কোন দিন নিন্দা করিতে কেহ তাঁহাকে শুনিতে পায় নাই।

স্বর্ণলতার বিবাহ হয় বৈশাখমাসে। বিবাহের শয্যাদানের সঙ্গে বাপ গায়ে দিবার লেপ দেন নাই; আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঘর-বসত হইল আশ্বিনে, তখনও লেপখানি বাদ পড়িল। পৌষমাসের শীতে শাশুড়ী তাহাকে গায়ে দিতে একখানি পুরাতন কাঁথা দিয়া বলিলেন, "বাপ মিন্‌ষে লেপ দিলে না, আমি কোথা থেকে কি দেবো? লেপ কি আবার তৈরী করতে যাব নাকি?" তা এখনও প্রায় সেই এক ব্যবস্থাই তাঁহার জন্য চলিতেছে।

অনুকূল স্ত্রীকে সংসারখরচ করিতে মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা দিতেন, ইহার ভিতর অশনবসন সমস্তই চালাইতে হইত। ইদানীং স্ত্রীর হাতে বাজে খরচ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নিজের হাতেই সমস্ত খরচ-পত্র রাখিতে হইয়াছে। তবে স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি নাকি নিতান্তই অবিচার করিতে পারেন না; তাই ছয় মাস অন্তর যখন কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করা হয়, তখন দুই তিন টাকা করিয়া তিনি স্ত্রীর হাতে দিয়া থাকেন। কারণ, ঐ টাকার মধ্যে হাজার পনের টাকা স্বর্ণলতার বাপের বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুতে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান স্বর্ণ, শুধু ওই টাকা কেন, আরও অনেক কিছুই লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়াও কোন সময় সে সকল সম্বন্ধে কোন কথাটি পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিতেন না। স্বামী হাতে তুলিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যেটুকু দিতেন, সেইটুকুই কি তিনি ভরসা করিয়া খরচ করিতে পারিতেন? যদি কোন দিন খরচের হিসাব চাহেন? অব্যবহারে সকল জিনিষেই যেমন মরিচা ধরে, এ মেয়েটির সমস্ত মনোবৃত্তিরই বোধ করি সেই রকম দুরবস্থা ঘটিয়া থাকিবে। তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তির একটা অংশ খুব সজাগ ছিল—সেটা ভয়।

বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও ইহারই ভিতরে স্বর্ণলতাকে

পল্লী-প্রাণ

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী— শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

অনুকূলচন্দ্রের দিদির বয়সী মনে করিতে পারা যাইত। তাঁহার গায়ের রং এক সময় বেশ উজ্জ্বল ছিল, আজও তাহার আভাস তাঁহার শীর্ণ ও লোল চর্ম্মের উপর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ দেহ ইহার মধ্যেই মধ্যভাগে যেন নত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছিল। ললাটের শুষ্ক চর্ম্ম রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মাথার চুলের অর্দ্ধেকগুলি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। গালের মাংস লোল হইয়া, গায়ের মাংস শীর্ণ হইয়া তাঁহাকে যেন একটি রসহীন আতপশুষ্ক ফলের মতই দেখাইত। কিন্তু তাঁহার সচকিত ভীত দৃষ্টির মধ্য দিয়া শুষ্ক মৌন শান্ত অধরের অভ্যন্তর হইতে এখনও যেন একটি অতৃপ্ত বালিকাজীবনের সাড়া পাওয়া যায়। শুষ্ক বালুরাশির তলদেশে এখনও যেন অনেকখানি স্বচ্ছ শীতল সলিল লুকান আছে বলিয়াও সন্দেহ জাগে। কিন্তু সন্দেহভঞ্জন করিবার পথ ছিল না।

যাহা হউক, এইরূপে "মাতা শত্রু" এবং "পিতা বৈরী" হইয়া তাঁহাদের বালকটির পড়া-শুনার পথে যখন কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া বসিলেন, তখন কোথা হইতে আর এক অদৃশ্যশক্তি আসিয়া আর একটা অভাগা জীবের সহায়তা করিল। পাড়ার নবহরি ভট্টাচার্য্যের এক বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত বলিয়া অনেকেই—বিশেষ করিয়া আবার অনুকূলচন্দ্রই সে বেচারাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িয়াছিল। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, এক মোটা মাহিনার অল্পবয়সী রাজকর্ম্মচারী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের জন্য সেই বয়স্থা ও লেখাপড়াজানা মেয়েকে, তাহার সৌন্দর্য্যহীনতাকে তুচ্ছ করিয়াও, বিনা পণে বা সামান্য পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবাহসভায় বরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে বরটি গম্ভীরমুখে উত্তর দেন যে,"গায়ের চামড়া একটু কটা পাওয়া যাইতে পারে, পয়সাও অকিঞ্চিৎকর নয়, কিন্তু স্ত্রীকে 'ক খ' শেখাইতে বসার পরিশ্রম উহার দ্বারা পোষাইয়া উঠে না।"

এই ঘটনায় অনুকূলচন্দ্রের চোখ ফুটিয়া গেল। তিনি বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,"বলি গিন্নি! ওগো! বলি শুনচো? কাল থেকে আমি নীলিকে মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবার সব ঠিকঠাক ক'রে এসেছি, এবার কিন্তু আর তোমার কাঁদুনী শুনচিনে যে, মেয়ে ছেড়ে সারাদিন কেমন ক'রে থাক্‌বো! সেটি আর তোমার হচ্ছে না, বাবু।"

স্বর্ণলতা অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি যে কি শুনিতে কি শুনিলেন, তাহাই যেন ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে বাড়ীতে ছেলের বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ, সেই বাড়ীর মেয়ে চলিল কি না স্কুলে ভর্ত্তি হইতে!

কিন্তু বিশ্বাস তাঁহাকে করিতেই হইল। ইহার পরদিন সকালে যখন ঘড় ঘড় হড় হড় শব্দে মেয়ে স্কুলের গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের দরজায় দাঁড়াইল এবং অনুকূল আস্তে-ব্যস্তে আসিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তখনই সেই গাড়ীর সঙ্গে অগত্যা স্কুলের দাইয়ের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন।

শুভেন্দু আসিয়া অভিমানে জলভরা চোখে মা'র গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "নীলিকে যে ইস্কুলে পাঠান হলো বড়?"

স্বর্ণলতা এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "ওঁর ইচ্ছা হলো, বাবা।"

শুভেন্দু বলিল, "তা'হলে আমার বেলাই বা হলো না কেন?"

স্বর্ণলতা চকিতে ছেলের দিকে চাহিয়া সভয়ে কহিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, শুভেন্দু।"

শুভেন্দু একবার নিজের পিছনটায় চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া লইল, তাহার পর সে দিক দিয়া উপস্থিত আশঙ্কার কারণ না দেখিয়া সে দৃঢ় এবং রূঢ়কণ্ঠে পুনশ্চ নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কহিল--

"কেন ইস্কুলে পড়লে যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হ'লে নীলিই বা হবে না কেন? ও কি চাকরী ক'রে পয়সা এনে তোমাদের খাওয়াবে না কি? ও যদি পড়তে যেতে পারে তো আমিই বা তা পাবো না কেন, শুনি? আমাকেও দিতে হবে ভর্ত্তি ক'রে ইস্কুলে।"

স্বর্ণলতা তখন একখানা ছেঁড়া কাঁথার উপর আর একখানা পুরাতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিতেছিলেন, সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং সস্নেহে ও সভয়ে ছেলের একটা হাত হাতে

ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃদু ও ভীতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "ইংরেজী পড়া উনি পছন্দ করেন না, তাই জন্যেই ত তোমায় ইস্কুলে দেন নি, নইলে আর দিতে কি ? নীলি ত আর ইংরেজী পড়চে না, ও এখন দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় পড়চে বৈ ত না, তুমি এ নিয়ে আর গোলমাল করো না, লক্ষ্মী গোপাল আমার !"

শুভেন্দু গা-ঝাড়া দিয়া মায়ের হাত গায়ের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। উদ্ধত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে ঝাঁজের সঙ্গে কহিল, "হুঁ,—গোল করবে না বই কি ! 'লক্ষ্মী গোপাল' বৈ কি ! আমি কিসের লক্ষ্মী গোপাল ! সে ত তোমাদের ঐ নীলি। বা রে মজা ! মুখপুড়ী মেয়ে, সকালবেলা খেয়ে দেয়ে গাড়ী চড়েই স্কুল যাবেন, পড়তে শিখবেন, আর আমি বাড়ীতে সব্বার পাত কুড়িয়ে খাব, গোরুর খড় কাটবো—নেদি কুড়ুবো—বা রে মজা !"

ক্ষীণ ও শুষ্ককণ্ঠে মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ছেলেদের ইস্কুলে অনেক খারাপ ছেলে আছে কি না,—সেই জন্যই ত দিতে পারেন না, না হ'লে তুমিও ত পড়তে। সে বার বিপিনের সঙ্গে কি রকম মারামারি করেছিলে মনে নেই ?—তাইতেই ত ছাড়িয়ে নিতে হ'লো—"

শুভেন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা ; তোমাদের ও-সব চালাকি ! দেশশুদ্ধ সব ছেলেই ইস্কুলে যাচ্চে, আর আমি গেলেই নাকি বয়ে যাব ? আচ্ছা, দেখ তা হ'লে, আমি বাড়ীতে থেকে বয়ে যেতে পারি কি না ! এবার থেকে যত সব মন্দ ছেলে বেছে বেছে তাদের সঙ্গেই বেড়াবো। দেখছো ত ইস্কুল ছেড়ে অবধি সারাদিনই ঘুড়ি ওড়াই আর লাট্টু খেলি। এখন থেকে কেবলই ঘুড়ি ওড়াবো, লাট্টু খেলাবো, কপাটী খেলাবো, সাঁতার দোব, এই সব দিনরাত করবো, তোমাদের গরুর খড় কুচুতে বয়ে গুনছি তাই কলা—"

জীর্ণ বহির্দ্বারে মনুষ্যপ্রবেশজনিত যে শব্দটা শুনা গেল, তাহাতেই এই বালক-বীরের বীররসে কিছু বাধা পড়িয়াছিল। পরক্ষণেই শুক্নো ও ছেঁড়া চটির যে চিরশ্রুত অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতেই একেবারে সকল বীরত্বে জলাঞ্জলি দিয়া সে শুষ্ক ও বিপন্নমুখে তাহার বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলাইল।

স্বর্ণলতার গভীর ভারাক্রান্ত অন্তর ভেদ করিয়া একটা কষ্টবহুল সুদীর্ঘ নিশ্বাস এতক্ষণের পর উত্থিত হইয়া আসিল। ছেলের সাক্ষাতে এতটুকু স্বাধীনতাও তিনি গ্রহণ করিতে ভরসা করেন নাই।

বলা বাহুল্য, ঐ ছেঁড়া চটির অধিকারী তাঁহারই স্বামী।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

উদ্ভট-সাগর

কবিতার ভাব চাপা থাকা উচিত অথবা খোলা থাকা উচিত, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

অর্থো গিরামপিহিতঃ পিহিতশ্চ কশ্চিৎ
সৌভাগ্যমেতি মরহট্টবধূকুচাভঃ।
নান্ধ্রীপয়োধর ইবাতিতরাং প্রকাশো
নো গুর্জ্জরীস্তন ইবাতিতরাং নিগূঢ়ঃ॥

যে সব শ্লোকের অর্থ কোথাও আবৃত,
কোথাও বা অনাবৃত থাকে অবিরত,
কেবল সে সব শ্লোক মানস-মোহন,
মহারাষ্ট্র-রমণীর স্তনের মতন।
অন্ধ্র-দেশ-রমণীর পয়োধর-প্রায়
অতি-প্রকাশিত অর্থ শোভা নাহি পায়।
গুর্জ্জর-দেশীয়-নারী-স্তনের মতন
অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ না শোভে কখন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর

কৈলাসযাত্রা

দ্বাদশ অধ্যায়।

আমি যে সময় তাকলাকোটে উপস্থিত হই, তাহার দুই দিন পরে দুর্গমধ্যে লামাদের এক প্রধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দলে দলে তিব্বতী ও ভুটিয়া নর-নারী সেই উৎসব দেখিবার জন্য উপরে গমন করিতেছেন। তাহা দেখিবার জন্য পরিচিত ভুটিয়ারা প্রস্তুত হইলেন আর আমাকেও তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। আমি কখনও অপ্রস্তুত নহি, সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মনে করিলাম, এক যাত্রায় দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইবে,—লামাদের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আর কেল্লা দেখা হইবে। অনেক চড়াই উঠিয়া কেল্লায় উপস্থিত হইলাম। ইহার প্রকাণ্ড দরজা আমাদের ভারতের কাষ্ঠে প্রস্তুত। তিব্বতের এ অঞ্চলে গাছই নাই, তক্তা আসিবে কোথা হইতে? তিব্বতীরা যে সকল দ্রব্য ভুটিয়াদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে কাষ্ঠ অন্যতম। মনুষ্যের স্কন্ধ ব্যতীত হিমালয়ের দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহা আনিতে যে কত ক্লেশ ও পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দ্বার অতিক্রমণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরটা একটু অন্ধকার। সিঁড়ি অতিক্রমণ করিয়া উপরে উঠিলাম। নিম্নে লামাদের ভোজনের বন্দোবস্ত হইতেছে। সম্মুখে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বিরাট পটমূর্ত্তি, যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা—চীন-চিত্রকরের অঙ্কিত বলিয়া বোধ হইল। এই চিত্রপটের পশ্চাদ্ভাগে ভগবানের ধাতুময়ী মূর্ত্তি। উপাসকরা ছোহারা প্রভৃতি শুষ্ক ফল, কেহ বা এলাচদানা প্রভৃতি উপকরণ প্রদান করিয়া পূজা করিতেছেন। লামা মহাশয়রা আগ্রহের সহিত তাহা সংগ্রহ করিতেছেন। কেহ বা টাকা-পয়সা দিয়া ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ধূপ জ্বালাইয়া চতুর্দ্দিক সুগন্ধিত করিতেছিলেন। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া প্রধান লামা মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। তিনি একটি নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন। ক্ষুদ্র ঘরখানি ভগবান্ বুদ্ধদেবের নানা প্রকার চিত্রে ভূষিত ছিল। তাহার মধ্যে জর্ম্মণীতে প্রস্তুত দ্রব্যেরও অভাব ছিল না। অবশ্য তাহা ভক্তের উপহার। আমার ভুটিয়া সহচরকে লামা মহাশয় "মিত্রা" "মিত্রা" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া বসিতে কহিলেন। আমি ব্রাহ্মণ—কৈলাসযাত্রী কাশী-লামা—তাঁহার আদর-আপ্যায়ন হইতেও বঞ্চিত হইলাম না। সাধু ব্রাহ্মণ এ দেশে কাশীলামা নামে সম্মানিত হইয়া থাকেন। চা-পানের জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় তিনি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এ মঠে পুস্তক-সংগ্রহ কিরূপ, তারানাথের গ্রন্থ তাঁহার গ্রন্থাগারে আছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহাকে করিলাম। তিনি আমার প্রশ্নে প্রসন্ন হইয়া তারানাথের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি সমরের কথা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রায় দেড় মাস আমি আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়াছি, য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, দেড় মাসের পুরাতন খবর ইঁহারা খুব টাটকা বলিয়া আগ্রহের সহিত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের কথা আমি এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আবার মনে করিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলাম। লামাদের আচারব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল যেন, আমি আমাদের এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছি, তাঁহাদের অপেক্ষা মহাযানপন্থাবলম্বীদের সহিত আমাদের অনেক সাদৃশ্য দেখিলাম।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে আমাদের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কহিলেন, দেখাইবার জন্য একজন লামাও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। লামা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের প্রথম ভাগেই আমি কিছু রজতখণ্ড দিয়া আমার ভক্তি দেখাইয়াছিলাম, বিদায়ের সময় আমাকে কিছু মিছরী দিয়া তিনি তাঁহার প্রসন্নতা দেখাইয়াছিলেন। নানা স্থান দেখিয়া পুনরায় চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন রাজা ভুটিয়া আর তিব্বতী

নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিয়ে লামা মহাশয়-দের ভোজন আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক। ইঁহাদের শিরস্ত্রাণ কিন্তু সামরিক ভাব প্রকাশ করিতেছিল। চা, গোলা ছাতু আর মাংসের স্যুপই প্রধান খাদ্য, যুবক লামারা এই সকল দ্রব্য পরিবেশন করিতেছিল। পরিবেশনের পর প্রত্যেক বারই গমনের সময় পরিবেশক ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়া গমন করিতেছিল। এই শিষ্টাচার আমার কাছে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। ভোক্তা লামারা নিস্তব্ধ হইয়া, কোনরূপ চঞ্চলতা না দেখাইয়া ভোজন করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া, যে সকল ছোট ছোট ঘরে লামারা থাকেন, তাহাও দেখিলাম। সে সকল ঘরে শয্যা ছাড়া অপর কোন আসবাব দেখিলাম না। এই সকল দেখিয়া এক প্রকাণ্ড চক্রের কাছে উপস্থিত হইলাম। ভক্ত নর-নারী এই ধর্ম্মচক্র ভক্তিভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া "ধর্ম্ম" উপার্জ্জন করিতেছিলেন। এই চক্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। মধ্যযুগে আমাদের ভারতীয় যে অক্ষর তিব্বতে নীত হইয়াছিল, এখনও তিব্বতে এ অক্ষর ঠিক তাহারই অনুরূপ। বর্ত্তমান তিব্বতীও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই; অন্ধভাবে তাহাই অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই।

দুর্গের অপর অংশে শাসনকর্ত্তা মহাশয় অবস্থান করেন। তিনি কিছুদিন হইল লাসায় গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার স্ত্রী শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্তা থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। শাসনকর্ত্তা মহাশয় গৃহস্থ। তিনি ও প্রধান লামা মহাশয় মিলিত হইয়া দেশের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান লামা মহাশয় সাধন-ভজন ও ধর্ম্মকার্য্য লইয়াই থাকেন, বিশেষ ঘটনা না হইলে তিনি প্রায়ই শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

কৈলাস হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রী।

নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া অপরাহ্ণকালে ভুটিয়া বাজারে আমার ডেরায় উপস্থিত হওয়া গেল। কিছু বিশ্রামের পর যাঁহারা কৈলাস যাইবেন, তাঁহাদের খোঁজ খবর লইবার জন্য বাজারে এ দোকান ও-দোকানে একটু ঘুরিলাম। ঘোরার ফলে বুঝিলাম, অন্ততঃ একদল যাত্রী মিলিত না হইলে, সঙ্গে ২।৪টা বন্দুক না থাকিলে যাওয়া উচিত নহে। কুম্ভের বৎসর বলিয়া বহুদূর হইতে ডাকাইতের দল তীর্থ ও লুণ্ঠন উভয় কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছে। সঙ্গে অন্তত ২টা বন্দুক থাকা প্রয়োজন। এরূপ সঙ্গী যে পর্য্যন্ত না একত্র হইতেছে, সে পর্য্যন্ত যাওয়া হইবে না এইরূপ স্থির হইয়াছে। তিব্বতী বন্দুক অপেক্ষা বিলাতী বন্দুক অনেক বেশী শক্তিশালী। তিব্বতী বন্দুকে বারুদ ভরিতে—বন্দুকটিকে ছুড়িবার উপযুক্ত করিয়া রাখিতে অন্ততঃ দেড় মিনিট দুই মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে পুরাতন বিলাতী বন্দুক অনেকগুলি

আওয়াজ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এজন্য তিব্বতীয়া বিলাতী বন্দুককে বড়ই ভয় করে। ডাকাইতরা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, তাহাদের যজমানদের শিবিরে কিরূপ অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাহার সংবাদ লইয়া থাকে। সংবাদ লইবার জন্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বা ছোট ছোট বালক বালিকা নিযুক্ত হয়। তাহারা ভিক্ষার ছলনা করিয়া আসিয়া প্রত্যেক শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। ডাকাইতদের ধারণা, তীর্থযাত্রীরা তাহাদের যজমান—শস্যক্ষেত্র স্বরূপ কৃষকরা যেরূপ ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের যেরূপ পাপ স্পর্শ করে না, সেইরূপ ইহাদেরও লুণ্ঠন-কার্য্যে কোন পাপ নাই।

এরূপ অবস্থায় আমি বুঝিলাম, আত্মরক্ষার জন্য শস্ত্রশূন্য হইয়া যাওয়া পাপ, আর শস্ত্রপাণি যাওয়াই পুণ্যজনক। এখন বুঝিলাম, দুরাচারীকে বধ করাই পুণ্য—আর না করাই পাপ। যাত্রিদল মিলিত হইতে ৫।৭ দিন লাগিবে, এই দীর্ঘ সময় কি করিয়া কাটান যায়? এই স্থান হইতে ১০।১২ মাইল দূরে খোজরনাথের বিখ্যাত মন্দির ও মঠ; তাহা দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৩ই জুলাই সকাল সকাল কিছু ভোজন করিয়া খোজর নাথ যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। খোজরনাথ সংস্কৃত খেচরনাথ শব্দের অপভ্রংশ। মানসখণ্ডে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা পাঠ করিয়াছিলাম। যে সকল যাত্রী কৈলাস দর্শন করিতে আগমন করেন, তাঁহাদের ইহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। কৈলাস, মানস, আর খোজরনাথ দর্শন না করিলে কৈলাসদর্শন পূর্ণ হয় না। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, কৈলাস দর্শন করিয়া পশ্চাৎ ইহা দর্শন করিব। সে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিলাম। রাস্তা দেখাইবার জন্য এক জন জুটিয়া আর আমরা তিন জন যাত্রী মিলিত হইলাম। ৯টার সময় তাকলাকোট পরিত্যাগ করিয়া কিছু নামিয়া কর্ণালীর তটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আর একটি নদী আসিয়া মিলিতা হইয়াছে। মানসখণ্ডে ইহা সাবিত্রী নামে অভিহিতা হইয়াছে। কাঠের তিব্বতী পুল দিয়া নদী পার হইলাম। এই সেতুর লৌহকীলকের স্থান চর্ম্মরজ্জু অধিকার করিয়াছে। নদীর নিকট বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী মেষের লোম ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। উন্নতভূমির শিখরদেশে কয়টি গুহা দেখিলাম; সংসারবিরাগী লামা সজ্জন হইয়াও এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিয়া থাকেন। তাকলাকোট দুর্গের পাহাড়েও এইরূপ গুহা দেখিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে লোকালয় অতিক্রম করিয়া গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম; ধর্ম্মভীরু তিব্বতী রাস্তা চলিবার সময় ও পুণ্যসঞ্চয় মানসে পথের মধ্যস্থলে প্রস্তরখণ্ড সকল রাখিয়া গিয়াছে। এই সকল প্রস্তরের উপর "ওঁ মণি পদ্মে হুং" প্রভৃতি মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দাতার নামাদিও তাহাতে খোদিয়া দিয়াছে। রাস্তায় বহুদূর পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। তিব্বতে সযত্নে রচিত এরূপ রাস্তা আর দেখি নাই। পথিকরা এক পার্শ্ব দিয়া গমন ও অপর পার্শ্ব দিয়া আগমন করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রীরা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকেন। এ স্থানে পথিকগণের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রহরীর প্রয়োজন হয় না। এই সকল প্রস্তরখণ্ড আর পথিকদিগের ধর্ম্মভাবই সে স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে।

রাস্তার দুই ধার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে শোভিত। এই সকল ক্ষেত্র জলসিক্ত করিবার জন্য বহুদূর হইতে জলধারা আনয়ন করা হইয়াছে। বৃষ্টিবর্জ্জিত দেশে এই উপায়ে প্রচুর পরিমাণে এক প্রকার যব জন্মাইয়া থাকে। এই সকল হরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ষপের পীত পুষ্প বেশ নয়নরঞ্জন হইয়াছিল। স্থানে স্থানে মেষপালক বালকরা পশু সকল চরাইতেছে। এই সকল বালক দরিদ্র হইলেও বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন, কেহ নিরন্ন নহে, সকলেরই কটিদেশে অস্ত্র সকল শোভিত হইতেছে দেখিলাম। এমন কি, ভিক্ষুকও সশস্ত্র হইয়া ভিক্ষা করিতে আইসে।

রাস্তা চলিবার সময় পথিক খুব কমই দেখিয়াছিলাম। লোকালয় নাই বলিলেই চলে। তাকলার আর খোজরনাথের মধ্যে সুঙ্গী নামে একখানি গ্রাম দেখিয়াছিলাম। এই স্থানের কর্ণালীর অপর পারে খুদিখর নামে সুন্দর একটি স্থান আছে। তাহা আমাদের গমনপথ হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তুষারমণ্ডিত হিমালয়

আর কর্ণালীকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে হিমালয়কে দেখিলাম, যেন তুষারমুকুট ধারণ করিয়া নগাধিরাজ—পৃথিবীর মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গর্ব্বোন্নত অভিষিক্ত মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। এই মুকুটের পশ্চাদ্ভাগ তিব্বতের দিকে আর সম্মুখভাগ আমাদের ভারতের দিকে। গমন কালে আমার ভুটিয়া পথিপ্রদর্শক সহরের একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "অদূরে ঐ যে উন্নত স্থান দেখিতে পাইতেছেন, উহার নিকট ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—ঐ স্থানে তিনি ঘোর তপস্যা করিয়া অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" ঐ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আমার সঙ্গীকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, ৩।৪ মাইল ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ স্থানে রাস্তা গিয়াছে, আর উহা বড় দুর্গম। এ সময় উক্ত স্থানে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। প্রত্যাগমনের সময় দেখিয়া যাইব মনে করিলাম। সূর্য্যদেব যত মস্তকের উপর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উগ্রতা অনুভূত হইতে লাগিল। শরীরের নিম্নভাগ যেন জমিয়া যাইতেছে, আর মস্তক যেন দগ্ধ হইতেছে। এইরূপ শীত ও গ্রীষ্ম যুগপৎ উভয়ই ভোগ করা গেল। দিবাবৃদ্ধির সহিত বায়ুও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরকণিকা পথিকের মুখমণ্ডলে বিদ্ধ হইয়া থাকে। খোজরনাথের পথে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইয়াছিল।

রাস্তা খুব নির্জ্জন, সময় সময় দুই এক জন স্থানীয় গ্রামবাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। দুই এক জন মেষপালক দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এক জন পুরুষ ও এক রমণী ৪।৫ বৎসরের বালক লইয়া গমন করিতেছিল দেখিয়াছিলাম। তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়া নিতান্ত নিঃস্ব বলিয়া বোধ হয় নাই। পুরুষ বোঝা লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, বালকসহ রমণী গবাদির গোময় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন করিতেছিল। এ দেশে জ্বালানী কাঠের অভাব পূরণ করিবার জন্য মেষাদির শুষ্ক পুরীষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভূমির সহিত মিলিত এক প্রকার ছোট ছোট গাছ আছে; তাহা কাঁচাই প্রজ্বলিত হয়, তাহাও ইন্ধনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

খোজরনাথের মন্দির।

এই সকল দেখিতে দেখিতে খোজরনাথের নিকটবর্ত্তী হইলাম। কর্ণালীর বাঁকের উপর ইহা স্থাপিত হওয়াতে দৃশ্যটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। মানসখণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, এই পুরী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। কাল-প্রভাবে সে পুরী নষ্ট হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে স্থানে কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। নদীও পূর্ব্বকালের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, নিকটবর্ত্তী গৈরিক প্রভৃতি বর্ণের পর্ব্বতও পূর্ব্বের মত উন্নতশিরে অবস্থান করিতেছে। এজন্য ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। অনেক য়ুরোপীয় বলেন, হিন্দুর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান নাই। এ কথা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে। যিনি ওঙ্কার মান্ধাতার নর্ম্মদার দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনি কখনই এ কথার উপর আস্থাস্থাপন করিবেন না। অথবা যিনি কন্যা কুমারিকা, কিংবা সোমনাথের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তিনিও এ কথা অনভিজ্ঞের প্রলাপোক্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবেন।

নদীর তটের নিকট দ্বার দিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকার কক্ষের ভিতর দিয়া মন্দিরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হওয়া গেল। প্রথমে রাম-সীতার মন্দির — অপর মন্দিরে মহাকাল মহাকালী —মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি —এ সকল মূর্ত্তি আমাদের কালী তারা মূর্ত্তির অনুরূপ। এক জন লামা অন্ধকারপ্রায় গৃহে এই সকল মূর্ত্তি দেখাইয়া দীপের ঘৃতের জন্য কিছু আদায় করিলেন। যে সময় মন্দিরমধ্যে উপস্থিত হই, সে সময় লামারা মহাকালের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভোজনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের ধাতুময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। বিগ্রহগুলি বেশ সুগঠিত, ইহাতে কারুকরের কর্ম্মকুশলতা বেশ প্রকটিত হইয়াছে। নিপুণ শিল্পী প্রতিমাত্রয়ের মুখশ্রীতে উৎসাহ, দৃঢ়তা ও বিক্রমব্যঞ্জক ভাব বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়াছেন। অলসভাবে আসীন অবস্থায় অবস্থান না করিয়া দেবতারা যেন কর্ম্মের জন্য সদাই উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রতিমার সম্মুখে ও পার্শ্বদ্বয়ে দীপাধারশ্রেণী রচিত হইয়াছে। এই দীপপুঞ্জ প্রজ্বলিত হইলে এ স্থানের শোভা বহুগুণে বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলফুলের দেশের দেবতা, এই বরফের দেশে ধূপ আর দীপ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। এই স্থানে আরও কয়টি মূর্ত্তি দেখিলাম; সঙ্গের লোকটি কহিলেন, ইহা ঋষিসপ্তকের প্রতিমা। এক দল ভুটিয়া যাত্রী "দর্শন" করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়া যাইবেন.

শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ভুটিয়ারা বহু অর্থ ও অলঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া থাকেন। কয় বৎসর অতীত হইল, এই মন্দিরে আগুন লাগিয়া সব পুড়িয়া গিয়াছিল। লামারা বহু কষ্টে প্রতিমাত্রয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই অগ্নিতে মন্দিরের বহু দিনের সঞ্চিত বহু দ্রব্য ভস্মীভূত হয়।

রাত্রিযাপন কোথায় করা যাইবে, এখন তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। মন্দিরের আঙ্গিনার উপর একখানি দোতলা ঘর দেখা গেল। যদি ইহা অপেক্ষা ভাল ঘর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থানেই থাকা যাইবে, স্থির করা গেল। খোজরনাথের মঠ এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। এই মঠ দেখিবার জন্য মন্দিরের ফটক অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখভাগে খানিকটা খালি জমি তাহার একটু উপরে শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থলে খোজরনাথের সুপ্রসিদ্ধ মঠ.

মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আমার আগমনবার্ত্তা মঠাধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে প্রেরণ করিলাম। মঠ দ্বিতল; নিম্নে গবাদি পশু আর ভৃত্যবর্গ অবস্থান করে। উপরে লামা মহাশয়রা অবস্থান করিয়া থাকেন। অনতিবিলম্বে উপরে যাইবার জন্য আহূত হইলাম। আমার ভুটিয়া সঙ্গীটি আমার পরিচয়ে বলিলেন, আমি এক জন বড়দরের কাশীবাসী লামা, দেশে নামডাকও বেশ আছে, আর এই সকল লোক আমার সঙ্গী। এইরূপ বাড়াইয়া বলিয়া তিনি আমার পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, তাহার সম্মুখভাগে ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি, বামদিকে স্বতন্ত্র আসনে মঠাধীশ লামা মহাশয়। দক্ষিণভাগে ২।৩ বৎসরের একটি বালক শিক্ষানবীশ, আর দুই জন প্রৌঢ় লামা উপবেশন করিয়াছিলেন। বসিবার স্থানটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিস্তৃত আসন পাতা দেখিয়া বুঝিলাম, ভক্ত যাত্রীর দল সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকেন। অভ্যর্থনা ও প্রথম আলাপের পর চা পানের জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম। আমার সঙ্গীরা চা-পাত্র গ্রহণ করিলেন। আমি বিনয়ের সহিত চা-পানে অভ্যস্ত নহি, নিবেদন করিলাম। আমার পানের জন্য স্বতন্ত্র পেয় ব্যবস্থা হইল। এ পেয় আর কিছু নহে, তক্র। দীর্ঘপথ অতিক্রমণ করায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম; এ সময় এ তক্র শক্রদুর্লভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বহুদিন এরূপ অম্লরসযুক্ত পেয় পান করি নাই। তক্র একটু বেশী অম্ল হইলেও বেশ শ্রান্তি দূর করিয়াছিল। তিব্বতে আরও দুই এক স্থানে এইরূপ তক্রে সৎকৃত হইয়াছিলাম; অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ভুটিয়া ও তিব্বতীরা যথেষ্ট তক্র পান করিয়া থাকেন। জানি না, তাঁহাদের স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হইবার পক্ষে ঘোল একটা কারণ কি না। ঘোল-ভক্ত ম্যাচিনিকফ ইহার মহিমা কীর্ত্তন করাতে এখন আমাদের দেশের "বাবু"মহলে ইহার নষ্ট-মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মুক্তকণ্ঠে ঘোলের সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন :—

ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচি-
ন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ।

'ঘোলসেবী কখন ব্যথিত হয়েন না, তক্রদগ্ধ রোগ সকল পুনরুৎপন্ন হয় না। দেবতাদিগের পক্ষে অমৃত যেরূপ সুখদ, পৃথিবীতে নরগণের পক্ষে তক্রও সেইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

অ-লবণ তক্র পান করিয়া শ্রম ও তৃষ্ণা দূর করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

আমরা যখন ঘোল পান করিতেছিলাম, সেই সময় এক পরিচারক আসিয়া লামা মহাশয়দিগকে চা পরিবেশন করিয়া গেল। চা'র সহিত কিছু কিছু ছাতুও দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ চা ও ছাতু ১০।১৫ মিনিট অন্তর তাঁহারা সেবন করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমি তাঁহাদের কাছে বসিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমি তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ প্রধান লামা মহাশয়কে কোনরূপ অঙ্গচালনা করিতে দেখি নাই; মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় যে ভাবে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ছিলেন। চা-পানের সময় সপাত্র হস্ত ধীরে ধীরে মুখের কাছে উঠিতেছিল, আর ধীরে ধীরে নামিতেছিল। এ অবস্থাতেও অপর কোন মাংসপেশীর সঞ্চালন পরিলক্ষিত হইল না। ইঁহাদের অপেক্ষাও সেই ছোট বালকের তিতিক্ষা, সংযম ও আসন-সিদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বালক এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কত দৌড়াদৌড়ি, কত হাসি-কান্না, কত চঞ্চলতা দেখাইত। এই ২।৩ বৎসরে বালকের কোনরূপ চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া গেল না। ভবিষ্যৎকালে এই ক্ষুদ্র বালক প্রধান লামার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া এখন হইতে তাহাকে সেই পদের উপযুক্ত হইবার জন্য শিক্ষিত করা হইতেছে। বাল্যকালই শিক্ষার উৎকৃষ্ট সময়, এই সময় হইতে বালককে ভাবনা দ্বারা ভাবিত না করিলে, সে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। আমাদের দেশে যেরূপ গোলাম হয়, পৃথিবী-মধ্যে সেরূপ উৎকৃষ্ট গোলাম বোধ হয় আর কোথাও হয় না। লোকনায়ক হওয়াও শিক্ষাসাপেক্ষ। অনুচিকীর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া গোলাম, নায়ক সাজিতে পারে, কিন্তু কার্য্যের সময় পরীক্ষার সময়, স্খলিত-পদ ও বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া থাকে। সে কালে ভারতীয় মাতারা পুত্রকে শিক্ষা দিতেন, "হে পুত্র! তুমি জনগণের নিয়ন্তা, দুষ্টের দমন-কর্ত্তা, তুমি সহায়সম্পন্ন অথবা সহায়হীন হও না কেন, তথাপি তোমাকে যাবজ্জীবন এইরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইতে হইবে।"

নিযচ্ছন্নিতরান্ বর্ণান্ বিনিয়ন্ সর্ব্ব দুষ্কৃতঃ।
সসহায়োঽসহায়ো বা যাবজ্জীবং তথা ভবেৎ॥

এরূপ ভাবনায় ভাবিত পুত্র লোক-নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

যে সময় লামা মহাশয়ের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়, সে সময় কতিপয় নেপালী ভক্ত উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আমাদের মধ্যে দোভাষীর কার্য্য করিয়া আলাপের পক্ষে সুবিধা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একখানি হিন্দী গীতা মঠের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য আমি উপহার প্রদান করি। লামা মহাশয় গীতার কিছু শুনাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আর শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এ উপলক্ষে

তাকলাকোট।

সাধন-ভজন সম্বন্ধেও কিছু আলাপ হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে কথা শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহান্বিত ছিলেন,সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য লামা মহাশয়ও যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। লামা মহাশয়ের কেন, তিব্বতীয় জন-সাধারণেরও জার্ম্মাণ-অনুরাগ, জার্ম্মাণ-পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণদের রণ-কৌশল, অভিনব অস্ত্র শস্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি কথা শুনিয়া সকলে আনন্দ অনুভব করিত। ইহার সঙ্গে নিজের নিজের উদ্ভাবিত কথা মিলাইয়া তাহারা জার্ম্মাণ বল বিক্রম প্রভৃতিকে শত শত গুণে বিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। সময় সময় প্রকৃত অবস্থা কহাতে, সে কথা তাঁহাদের মনোরঞ্জক না হওয়াতে তাঁহারা আমার প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিপাতও করিয়াছিলেন!

তিন ঘণ্টা এক আসনে অবস্থান করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সুজনতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইঁহার ভিতর কৃত্রিমতা বোধ হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে মুহুর্মুহু চা-পানের ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চা-পানজনিত কোন প্রকার অসুখ তাঁহাদের মধ্যে দেখি নাই। সম্ভবতঃ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। চা'য়ে তিব্বতীরা নবনীত প্রভৃতি মিলিত করিয়া পান করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয়, চা'র অপকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার ভারতের গৌরব মহামতি হেমচন্দ্র বিলাসী শ্রমণদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল ;—

মৃদ্বী শয্যা, প্রাতরুত্থায় পেয়া,
মধ্যে ভক্তং পানকাং চাপরাহ্ণে।
দ্রাক্ষাখণ্ডং শর্করা চার্দ্ধরাত্রে,
মোক্ষশ্চান্তে শাক্যসিংহেন দৃষ্টঃ॥

কোমল শয্যা, প্রাতঃকালে উঠিয়া দুগ্ধপান (সম্ভবতঃ সে সময় ভারতে চা'র প্রচলন হয় নাই।) মধ্যাহ্নে অন্ন, অপরাহ্নে পানা, মধ্যরাত্রিতে দ্রাক্ষাখণ্ড ও শর্করা আর অন্তকালে, শাক্যসিংহ মোক্ষের বিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ শ্লেষবাক্য সকল শ্রমণের প্রতি প্রযুক্ত না হইতে পারে, ইঁহাদের ভিতর সাধন-ভজনসম্পন্নও অনেকে আছেন; কদাচারীর সংখ্যাও কম আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মঠাধীশ মহাশয় আমাদের ভোজনের জন্য তণ্ডুল ও নবনীত ব্যবস্থা করিয়া আতিথিসৎকার করেন। ক্ষেত্রে "খেতো" শাক ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা বেশ ভালই হইয়াছিল।

লামা মহাশয় আমার শয়নব্যবস্থা উপরেই করিয়াছিলেন- আমি কাশী-লামা কি না, সেই জন্যই আমার প্রতি তাঁহার এই সম্মান। আমার সঙ্গের লোক, অসংযত হইয়া শয়ন করিয়া এ স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, সেই জন্য তাহাদের শয়ন-ব্যবস্থা নিম্নে করা হইয়াছিল। আমার প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, প্রবাসকালে সঙ্গের লোকের সহিত একত্র সুখ-দুঃখ ভোগ করা উচিত। ইহা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন আর আমার কথার অনুমোদন করেন।

রাত্রিকালে আর একবার মন্দিরে গমন করি। সে সময় দীপমালার আলোকে উদ্ভাসিত মন্দিরে তিব্বতী ও ভুটিয়া নরনারী আগমন করিয়া দীপদান, প্রণতিপাত প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন; এই দৃশ্য দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। আমাদের ঘরের পার্শ্বেই প্রণালী (নালী) দিয়া পরিষ্কার জল প্রবাহিত হওয়াতে কোনরূপ জলকষ্ট হয় নাই। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া ক্ষুদ্র ঘরে শয়নব্যবস্থা করা গেল। দরজার কাছে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকায় শীতের প্রকোপও অধিক অনুভূত হয় নাই। এইরূপে শয়ন করিয়া সুনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

পুরী-দর্শন

(জগন্নাথের নিত্যসেবা)

৪

জগন্নাথ দেবের দৈনিক সেবাকার্য্য যে ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সময় ও সুবিধার অভাবহেতু তাহার ধারাবাহিক বিবরণ অনেকেরই প্রত্যক্ষভাবে জানিবার অবসর ঘটে না। ভক্তমাত্রেই ঠাকুরের সেবার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত নিম্নে দৈনিক সেবার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

দৈনিক সেবা :
(১) মঙ্গলারতি

প্রত্যূষের সময় ১০।১২ জন লোক খোলকরতালের সাহায্যে প্রভাতী গান গাহিয়া ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ করে। ইহারা "দেবদূত" নামে পরিচিত। নিদ্রাভঙ্গ হইবার পর প্রধান পাণ্ডা 'জয়বিজয়' দ্বার উন্মোচন করেন এবং "মঙ্গলারতি" আরম্ভ হয়। তখন ঠাকুর রাত্রিকালের "রাজ-বেশেই" সজ্জিত থাকেন। বাদ্যোদ্যমের সহিত পুষ্পমাল্য শোভিত দীপাবলীসাহায্যে দেবারতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(২) অবকাশ।

মঙ্গলারতির পরেই "অবকাশ"। এই সময়ে ঠাকুরের দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক একটি দাতন, জিভ্ছোলা, দাত-খুঁটা প্রভৃতি দন্তধাবনের বিবিধ সামগ্রী এক এক জন পাণ্ডা প্রত্যেক ঠাকুরের সম্মুখে কিছুক্ষণ ঘুরাইয়া দন্তধাবনক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহার জন্য তিন জন পাণ্ডা তিন ঠাকুরের সম্মুখে আসন পাতিয়া উপবেশন করে এবং নিকটে রক্ষিত তিনটি রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে (গামলা) দন্তধাবনের পর ঐ সকল সরঞ্জাম নিক্ষেপ করে। অতঃপর এক একখানি দর্পণ প্রত্যেক বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দর্পণস্থ প্রতিফলিত মূর্ত্তির উপর দধি ও শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে তিন ঠাকুরের স্নান সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্নানের পর সূর্য্য বা "দ্বারপাল" পূজা সম্পন্ন হয়।

(৩) বাল্যভোগ।

প্রাতঃকালে ঠাকুরকে যে ভোগ দেওয়া হয়, তাহার নাম "বাল্যভোগ"। এই ভোগের সামগ্রী মুড়্কি, মাখন, মিছ্রি, দধি ও মিষ্টান্ন। যে কোন ভোগের সময় দ্বার বন্ধ করা হয়; ভোগ শেষ হইলে দরজা খোলা হয় এবং দর্শকগণ পুনরায় ঠাকুর দর্শনের আনন্দ উপভোগ করে।

(৪) সকাল ধূপ।

বাল্যভোগের পর "সকাল ধূপ"। "ধূপ" শব্দ শ্রীক্ষেত্রে ভোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরীর রাজা "সকাল ধূপের" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার অপর নাম "রাজভোগ"। এই ভোগের যাবতীয় সামগ্রী ভোগান্তে রাজবাটীতে প্রেরিত হয়। এই ভোগের প্রধান উপকরণ খেচরান্ন। অন্যত্র হিং অশুদ্ধ সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেও জগন্নাথের ভোগের খিচুড়ী হিং দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৫) ছত্রভোগ।

"ছত্রভোগ"ই ঠাকুরের প্রধান ভোগ। যাত্রিগণের এবং পুরীর অধিকাংশ লোকের মধ্যাহ্নভোজন এই ভোগের সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং ইহার উপকরণের সংখ্যাও অল্প নহে। ভাত, দাল, ভাজা, মোহর, বেশর, রাইতা প্রভৃতি বিবিধ ব্যঞ্জন, খট্টা বা আম্বিড়, দধি, ক্ষীর, পিষ্টক, পায়সান্ন ও নানা-বিধ মিষ্টান্ন ছত্রভোগের উপকরণ। "মোহর" ও "বেশর" নামক দুইটি ব্যঞ্জন যথাক্রমে গোলমরিচের গুঁড়া এবং সরিষাবাটা মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। "মোহর" অপেক্ষা "বেশর" অধিক মুখরোচক। এখানে গোলআলু, লাউ, পুঁইশাক, সজিনাশাক প্রভৃতি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না। দেশী ও বিলাতী কুমড়া, বেগুণ, শকরকন্দ আলু, খাম আলু, কামরাঙ্গা, কচু প্রভৃতি ভোগের ব্যঞ্জনের উপ-করণ। লাউয়ের পরিবর্ত্তে বিলাতী বা দেশী কুমড়ায় "রাইতা" প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছত্রভোগের জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণের প্রয়োজনভেদে বিবিধ শ্রেণীর চাউলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। "কণিকা" প্রসাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নভোগ। ইহার মূল্য অধিক বলিয়া সর্ব্বসাধারণ ইহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না; অবস্থাপন্ন লোকই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে আমাদের দেশের "ঘিভাত" বলা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট আতপ তণ্ডুল, ঘৃত ও কন্দ (এক প্রকার পাটালি গুড়) মেওয়া ও মসলার সহিত মিশ্রিত করিয়া এই অন্নভোগ প্রস্তুত করা হয়। ইহা শুভ্রবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু ও

রথযাত্রা।

ঝর্ঝরে, অর্থাৎ একটি ভাত অপরটির সহিত জড়াইয়া থাকে না। আমাদের দেশের পোলাও বা ঘিভাতের ন্যায় ইহাতে অধিক পরিমাণ ঘি দেওয়া হয় না।

জগন্নাথের ভোগের দাল অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রান্না দালের মধ্যে একটি বীজও পৃথক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং উহাকে চাপক্ষীরের ন্যায় ঘন করা হয়। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু। অরহর, মুগ, ব্রীহি, (বীরি বা কলাই) এবং বুট (ছোলা) এই চারি প্রকার দাল ভিন্ন অন্য কোন দাল জগন্নাথের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কলাইদালে নানাবিধ পিষ্টক ও মিষ্টান্ন দ্রব্য ভোগার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল প্রধান প্রধান পিষ্টক, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধঘটিত সামগ্রী ছত্রভোগের জন্য নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের নাম ও উপাদান সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল। জগন্নাথের ভোগের যাবতীয় সামগ্রী ঘৃতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কোনরূপ তৈল ব্যবহৃত হয় না।

পিষ্টকশ্রেণী—

১। বীরিভাড়িয়া—ইহা বীরি বা কলাইদালে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বৃত্তাকার, চেপ্‌টা ও পুরু, আমাদের কলাইদালের বড়ার মত, কিন্তু সেরূপ মুখরোচক নহে।

২। ছানাভাড়িয়া—ইহা আমাদের দেশের ছানার "মাল্‌পো"র ন্যায়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।

৩। তমালু—চালের গুঁড়ির তৈয়ারি এক প্রকার মাল্‌পো।

৪। বীরিবড়া—ইহাও কলাইদালের এক প্রকার বড়া। ইহাতে লবণ বা কোন প্রকার মসলা দেওয়া হয় না।

৫। হংসকেলি—কলাইদালের ঘৃতপক্ব ফুলুরি।

৬। চন্দ্রকান্তি—কলাইদালের মাল্‌পোবিশেষ।

৭। মাঠপুলি—কলাইদালের পুলিপিঠা।

৮। কাক্‌রা (শাদা ও মিঠা)—ময়দা ও চাউলের গুঁড়ি একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই পিষ্টক প্রস্তত হইয়া থাকে। মিঠা কাক্‌রায় গুড় দেওয়া হয়।

৯। চড়ুইনেদা—সকল প্রকার পিষ্টকের কাঁচা উপাদানের অবশিষ্টাংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

১০। শোয়ার (সুপকার) পিঠা—চাউলের গুঁড়ি ও কলাইদালের বেসন এই পিষ্টকের উপাদান।

মিষ্টান্নশ্রেণী—

১। খাজা ২। মগধলাড়ু ৩। জগন্নাথবল্লভ	তিনটিই উত্তম মিষ্টান্ন; সুজী, চিনি ও ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪। লক্ষ্মীবিলাস—ইহা এক প্রকার মিঠা লুচি। ময়দার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া লুচির আকারে ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া হয়।

৫। খয়েরচুর—চাউলের গুড়ি ও গুড় একত্র মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন, চর্ব্বণ করিতে দাঁতকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। এক বৎসর থাকিলেও ইহা বিকৃত হয় না। জগন্নাথের প্রসাদরূপে ইহা দেশ-বিদেশে বিতরিত হইয়া থাকে।

৬। মনোহর বা কটকটি—খয়েরচুরের ন্যায় চাউলের গুঁড়ি ও গুড় ইহার উপাদান এবং প্রকৃতিতেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৭। কোরা—ইহা আমাদের দেশের রসকরার ন্যায়। নারিকেল ও চিনি ইহার উপাদান।

৮। খোমা—মিষ্টরহিত এক প্রকার গজা।

৯। সুনখোর্মা—ইহা আমাদের দেশের নিমকির ন্যায়। খোমা ও সুনখোর্মা উভয়েরই উপাদান ময়দা ও ঘি।

১০। গজা—ময়দা, চিনি ও ঘৃতে প্রস্তুত। আমাদের দেশের গজা অপেক্ষা অধিক কঠিন।

১১। ঝিলি—আমাদের দেশের জিলাপির ন্যায় (রসে ফেলা)।

১২। আরিসা—ইহা আমাদের দেশের গুড়পিঠার ন্যায়। চাউলের গুঁড়ি ও গুড় একত্র মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া হয়।

জগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্নভোগ পাণ্ডা ও যাত্রিগণ কর্ত্তৃক বহু দূরদেশে নীত ও বিতরিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ মিষ্টান্ন বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃতাবস্থায় থাকে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য—

১। অমৃতরসাবলী—ময়দার ছোট ছোট লুচি, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া জাল দিয়া ঘন করিয়া লইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

২। চকোটা—দুধ, ছানা, কলা ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া রাব্‌ড়ির ন্যায় ঘন করিয়া লওয়া হয়।

৩। ক্ষীরি—ইহা চাউলের পরমান্নবিশেষ।

৪। গুরুন্দা (১নং)—দুধের সর চিনির সহিত পাক করা।

৫। গুরুন্দা (২নং)—ইহা আমাদের দেশের রাবড়ির ন্যায়।

৬। ক্ষীরা—ঘন দুধের ক্ষীর।

ছত্রভোগের পর "মধ্যাহ্নধূপে"র ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই ভোগের ব্যবস্থার ভার পুরীর রাজার উপর ন্যস্ত। পূর্ব্বে রাজা প্রতিদিন ১২৫৲ টাকা ইহার খরচস্বরূপ প্রদান করিতেন। **(৬) মধ্যাহ্ন-ধূপ।** আমি যখন পুরী গমন করিয়াছিলাম, তখন এই ভোগের জন্য প্রত্যহ ২০০৲ টাকা খরচের ব্যবস্থা ছিল। ইহা নানা-উপকরণ-সমন্বিত অন্নভোগ। এই ভোগের সামগ্রীর অধিকাংশই রাজার বাটীতে প্রেরিত হয়, কিয়দংশমাত্র পাণ্ডাদিগের প্রাপ্য। পাণ্ডারা অনেকেই তাহাদের অংশ "আনন্দবাজারে" বিক্রয় করে এবং জনসাধারণে উহা তথা হইতে ক্রয় করিয়া ভোজন সম্পন্ন করে।

"মধ্যাহ্নধূপ" শেষ হইলে ঠাকুরের দিবাভাগে বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বেলা ৩টার সময় ঠাকুর শয়ন করেন। সেই সময় দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। **(৭) শয়ন।** এই জন্য অপরাহ্ণে যাত্রিগণ ঠাকুরের দর্শনলাভ করিতে পারে না। সন্ধ্যার সময় দ্বার পুনরায় উন্মোচিত হইলে লোক ঠাকুর দর্শন করিতে পায়।

"সন্ধ্যারতি" ঠিক মঙ্গলারতির মত। ইহা দেখিবার জন্য মন্দিরে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। বাদ্যোদ্যমের

(৮) সন্ধ্যারতি।

সহিত পুষ্পমাল্যপরিশোভিত দীপাবলী-সাহায্যে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া এই আরতিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৯) সন্ধ্যাধূপ।

আরতির পরেই ঠাকুরের বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহার নাম "সন্ধ্যাধূপ"। এই ভোগের উপকরণ অন্ন, মিষ্টান্ন, ফলাদি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর ইত্যাদি।

(১০) চন্দনলাগি।

ইহার পরে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লাগাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করা হয়। পুষ্পমাল্য এবং পুষ্পালঙ্কারে তাঁহাদের দেহ সজ্জিত করিয়া বিচিত্র বসন-ভূষণ তাঁহাদিগকে পরাইয়া দেওয়া হয়। এক্ষণকার এই বেশকে "শৃঙ্গারবেশ" কহে।

(১১) বড়শৃঙ্গার বেশ।

অধিক রাত্রিতে ঠাকুরের পুনরায় বেশ পরিবর্ত্তন করা হয়। এই সময়ে ঠাকুর বহুমূল্য বসনভূষণ এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া অতি অপূর্ব্ববেশে মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তজনগণের হৃদয়ে অপার আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকেন। এই বেশের আর একটি নাম "রাজবেশ"। এই বেশে ঠাকুরকে দর্শন করা ভক্তগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, এই জন্য অধিক রাত্রি হইলেও অনেকানেক ভক্ত যাত্রী রাজবেশে সজ্জিত দেবদর্শনাভিলাষে মন্দিরমধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই সময়ে মন্দিরের মধ্যে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু যাত্রিগণ গান শ্রবণ করে মাত্র,নৃত্য দেখিতে পায় না; নর্ত্তন গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নৃত্য করিবার জন্য অনেক "দেবদাসী" নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা শৈশবাবস্থায় এই কার্য্যে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত মন্দিরমধ্যে আনীত হয় এবং যাবজ্জীবন এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করে। ইহাদিগের ভরণ-পোষণ মন্দিরের তহবিল হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা "কুমারী" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। দুঃখের বিষয়, ইহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ নহে। উত্তর-ভারতের দেবমন্দিরসমূহে দেবদাসী কর্ত্তৃক নৃত্যগীতপ্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত নাই, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ দেবস্থানেই এই প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রথা যে অনেক দোষের আকর এবং ইহা যে আমাদের দেবালয়সমূহের একটি বিষম কলঙ্কস্বরূপ, তাহা বোধ হয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদিগের দেবালয় হইতে যাহাতে এই পাপসঙ্কুল প্রথা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দুরই সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।
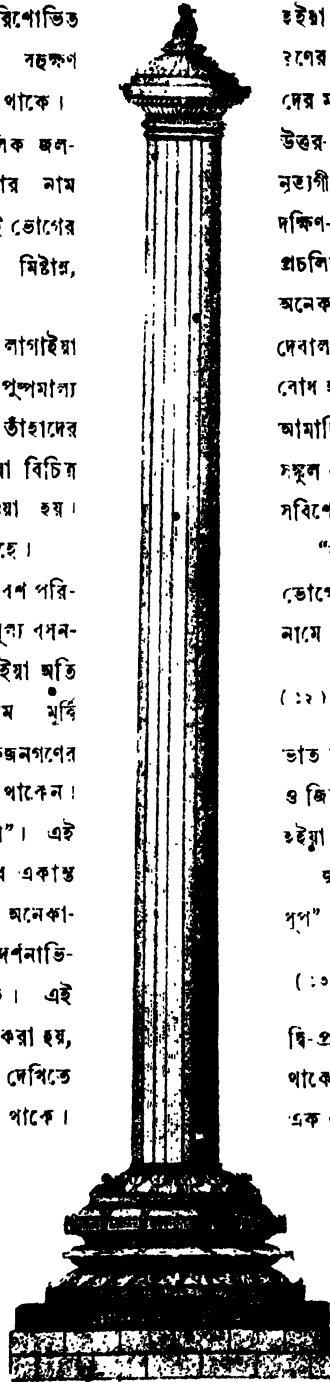
(১২) বড় শৃঙ্গারধূপ।

"রাজবেশ" ধারণের পর পুনরায় ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা "বড় শৃঙ্গারধূপ" নামে পরিচিত। "দই-পকাল", দুগ্ধ ও বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া এই ভোগ নিবেদন করা হয়। টাট্‌কা ভাত জলে ধৌত করিয়া তাহার সহিত দধি, আদা ও জিরাভাজা মিশ্রিত করিয়া "দই-পকাল" প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(১৩) পহুড় ধূপ।

জগন্নাথ দেবের দৈনিক শেষ সেবা "পহুড় ধূপ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইবার ঠাকুররা রাত্রির মত বিশ্রাম লাভ করেন। রাত্রি প্রায় দ্বি-প্রহরের পর এই সেবার আয়োজন হইয়া থাকে। তিনটি বিগ্রহের সম্মুখে শয্যাসমেত এক একখানি ছোট রৌপ্যনির্ম্মিত খাট স্থাপন করা হয় এবং এক জন পাণ্ডা অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়া খাটগুলির উপর এবং চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে। প্রধান পাণ্ডা 'জয়বিজয়' দ্বারের সম্মুখে একটি পিত্তলের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া "পহুড় ধূপ" মূর্ত্তির সম্মুখে রক্ষা করেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া

অরুণস্তম্ভ।

তাহাতে মন্দিরের শীলমোহর লাগাইয়া দেন। রুদ্ধ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই জন লোক সমস্ত রাত্রি প্রতিহারিরূপে অবস্থিতি করে। ইতঃপূর্ব্বে মন্দিরপ্রবেশের সমস্ত দরজাই রুদ্ধ করা হয়। রাত্রিকালে কোন ব্যক্তির মন্দিরমধ্যে অবস্থান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যুষে প্রধান পাণ্ডা স্বয়ং শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া 'জয়বিজয়' দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে ঠাকুরের মঙ্গলারতি আরম্ভ হয়। লোকের বিশ্বাস যে, 'জয়বিজয়' দ্বার গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ হইলে দেবতারা জগন্নাথ-সম্ভাষণের জন্য মন্দিরমধ্যে আগমন করেন এবং কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের সহিত পাশাখেলা করিয়া প্রস্থান করেন।

এইরূপে প্রত্যহ জগন্নাথদেবের দৈনন্দিন সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। [ক্রমশঃ।

শ্রীচুণিলাল বসু।

আঁকে মুখে সমান
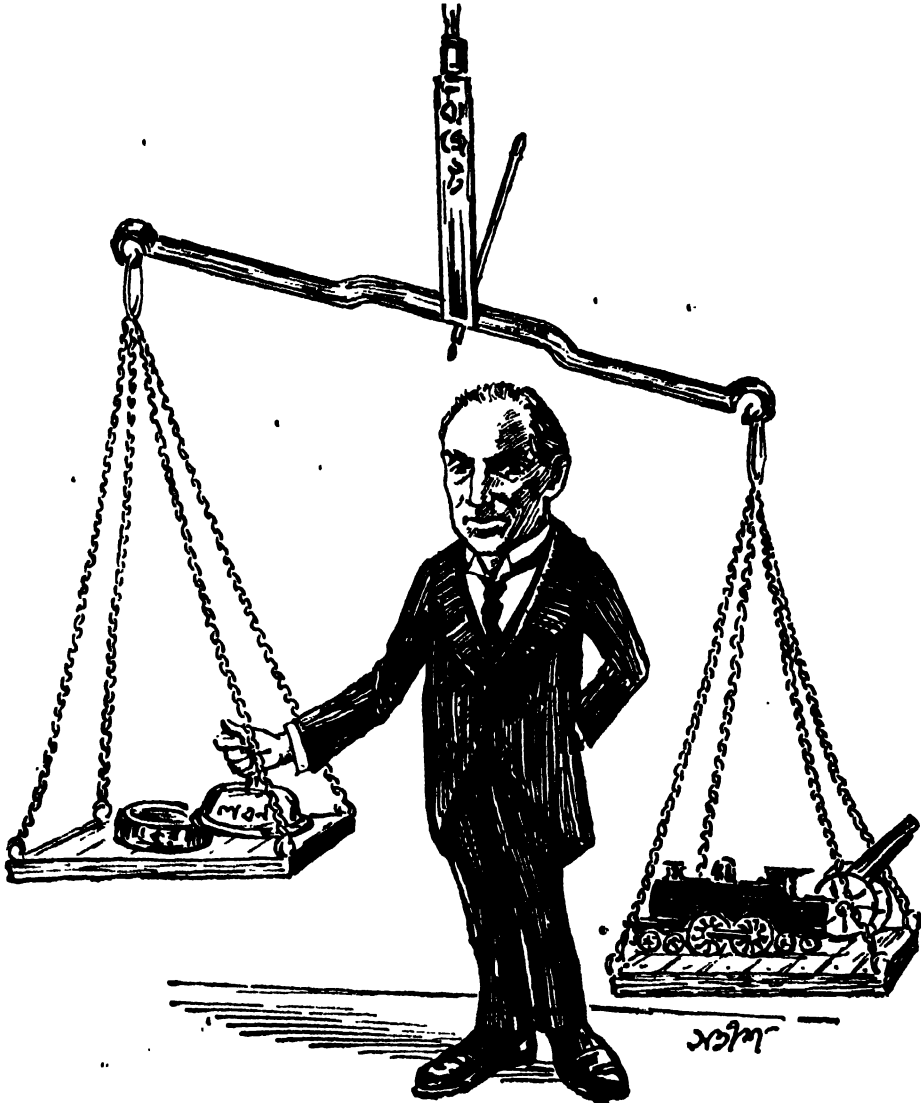
ইরাক

ইরাক অতি প্রাচীন দেশ এবং ইরাকের বক্ষে বহু রাজ্যের ও বহু সভ্যতার উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে। ইহাতে দুইটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ নদী—টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটেস—প্রবাহিত বলিয়া গ্রীকরা ইহাকে "মেসোপোটেমিয়া" নামে অভিহিত করিয়াছিল। "মেসোপোটেমিয়া" অর্থে "নদীমধ্যস্থ"। এই দেশকে মোটামুটী দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—বাগদাদের উত্তরে আপার ও নিম্নে লোয়ার ইরাক। নিম্ন-ভাগে এককালে সেচের খালে চাষ হইত এবং ভূমি স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সব খালের ব্যবস্থা অদ্যাপি লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে এবং বাইবেলে বর্ণিত "নন্দনকানন" এই দেশেই অবস্থিত। আরব্য উপন্যাসের বসোরা বন্দর এবং খলিফাদিগের রাজধানী বাগদাদ এই দেশে। বসোরা এখন আর জলকূলে অবস্থিত নহে—টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটেস নদীদ্বয়ের মিলনসম্ভাত সেতল-আরব নদীর কূলে অবস্থিত আসার হইতে কিছু দূরে—খালের ধারে অবস্থিত। এখন আসারই প্রধান বন্দর এবং আসার হইতে প্রভূত পরিমাণ খর্জ্জুর বিদেশে রপ্তানী হয়।

আসার

অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, এই ইরাকের মালভূমিই মানবের "আদি জন্মভূমি"। এই ইরাকে বহু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়—আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পারস্যও প্রাচীন রাজ্য। আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা টেসিফনের পরপারে সেলুকিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার পর পার্থিয়ানরা সে রাজ্য জয় করিয়া টেসিফনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

বসোরার খাল

এই দেশের রক্তসিক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আসিরিয়ানদিগের রণরথ ও পারস্যের দলবদ্ধ সৈনিক অবতীর্ণ হইয়াছিল। অনেক নগরের আর চিহ্নও নাই; কেবল মরুভূমির বালুবিস্তারে কতকগুলি প্রস্তর ছড়াইয়া আছে—মানবের কৃত কর্ম্মের অসারতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—

যদুপতি, মথুরার কি আছে সম্বল?
রঘুপতি, কোথা আজি উত্তর-কোশল?

ইরাকের তৃষ্ণার্ত মরুভূমি বহু নগর শোষণ করিয়াছে। কেবল টেসিফনের

টেসিফনের প্রাসাদাবশেষ।

টেসিফনের প্রতিষ্ঠা করেন, শত বর্ষে সে বংশের অবসান। মুসলমানের বিজয়বাত্যা এই নগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। বিজেতারা এই প্রাসাদের বিরাটত্বে এমনই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা গৃহ-প্রাচীরের চিত্রগুলিও নষ্ট করেন নাই। ২ শত বৎসর পরে খলিফ মনসুর বাগদাদ নির্ম্মাণ কালে ইহার উপকরণ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া উপকরণ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। বাগদাদের সমৃদ্ধিকালে এই স্থান "নগরমালা" নামে অভিহিত হইত---তাহার মধ্যে টেসিফন "পুরাতন নগর" নামে পরিচিত ছিল।

টেসিফনের প্রাসাদসান্নিধ্যে মহম্মদের সঙ্গী সালমানের কবর। নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে নলের কুটীরে দরিদ্র আরবরা বাস করে। বাগদাদ ইরাকে প্রসিদ্ধ নগর—উপন্যাসের মণিমঞ্জুষা—কল্পনার স্বপ্নলোক।

প্রাসাদের এক বিশাল খিলান আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইহা পারস্যের সাসানীয় নৃপতিদিগের অন্যতম চসরস কর্তৃক ৫৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। এখন প্রাসাদের প্রধান কক্ষের প্রাচীর ও খিলানকরা ছাত বর্ত্তমান। আর আছে দক্ষিণাংশের একটা প্রাচীর। সমগ্র পৃথিবীতে এই জাতীয় গৃহ আর নাই। পশ্চিমদিকের প্রাচীর এত বিস্তৃত যে, শত ফিট অপেক্ষা উচ্চ হইলেও পড়িয়া যায় নাই। মধ্যে একটি খিলান করা দ্বারপথ। বৃহৎ কক্ষের খিলান করা ছাত ৮৬ ফিট বিস্তৃত কক্ষ আবৃত করিয়া আছে। ইহা ৯৫ ফিট উচ্চ। কক্ষের সম্মুখভাগ অনাবৃত। আরব ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, ইহা একটি পর্দ্দায় আবৃত থাকিত। পর্দ্দায় একটি বাগানের নক্সা ছিল—তাহার জমী স্বর্ণের, পথ রৌপ্যের, প্রান্তর মরকতের, নদী মুক্তার, বৃক্ষ-লতা-ফুলফল হীরকাদি বহুমূল্য মণির। যখন টাইগ্রীসের কূলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নদীর পরপারে সেলুকিয়া টাইগ্রীসের উপত্যকার সর্ব্বপ্রধান নগর। যে রাজবংশ

আরব কুটীর।

নদীপথে বাগদাদ বসোরা হইতে প্রায় ৫ শত মাইল—নদী বক্রগতি বলিয়াই নদীপথে দূরত্ব অধিক। টাইগ্রীসের উভয় কূলে সহর—নদীর কূলে পোস্ত বাঁধান—পোস্তের পরে উদ্যান—উদ্যানে করবীতরু ফুলভারে যেন নত হইয়া পড়িয়াছে। বাগদাদে বৃক্ষলতার অভাব নাই, ফলও সুলভ। বসোরায় কেবল খেজুর গাছ; তাহার পর মরুভূমিতে নদীর কূলে যষ্টিমধুর ঝোপ। বাগদাদে তুঁতগাছ—দ্রাক্ষালতা—শাকসব্জী আছে। দুই কূলেই বড় বড় বাজার—খিলানকরা ছাত। এক কূলে নগরের উপকণ্ঠে মুয়াজ্জমে সুন্নীদিগের মসজেদ। অপর কূলে উপকণ্ঠে কাজমেনে—সিয়া সম্প্রদায়ের বিশাল মসজেদ। বাগদাদ হইতে কাজমেনে যাইবার অশ্ববাহিত ট্রামগাড়ী আছে। অনেকগুলি চিক্কণ চিত্রিত টালি দিয়া আবৃত; দূর হইতে মনে হয়, যেন গম্বুজে বা স্তম্ভে কে পারস্যদেশীয় গালিচার আস্তরণ দিয়াছে।

পূর্ব্বকালে ইরাকে সেচের জন্য খালের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা বিস্ময়কর। দীর্ঘকাল অরাজকতায়, কুশাসনে, অযত্নে সে সব খাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটি অতি পুরাতন খাল (Nahrwan Canal) প্রায় ৩ শত মাইল দীর্ঘ ছিল; তাহার বিস্তার ১ শত হইতে ১ শত ৫০ গজ ও গভীরতা ৪০ হইতে ৫০ ফিট ছিল। জার্ম্মাণ যুদ্ধের কয় বৎসর পূর্ব্বে তুর্ক সরকার ইরাকে সেচের খাল খননের নক্সা ও আনুমানিক ব্যয় স্থির করিবার জন্য সার উইলিয়ম উইলককসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করেন,

বাগদাদ-কাজমেন ট্রামগাড়ী।

বাগদাদ সহরে পূর্ব্বে অনেক বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। বর্ত্তমান শুল্কগৃহকে (Customs House) পূর্ব্বে একটি বৃহৎ বিদ্যালয় ছিল—এখনও গৃহ-প্রাচীরে তাহার ইতিহাস লিখিত আছে। নদীতে পার হইবার জন্য ভাসমান সেতু আছে—আর সচরাচর ব্যবহারের জন্য গুফা নামক জলযান ব্যবহৃত হয়। গোলাকার নৌকা—নল দিয়া গঠিত। বাগদাদ সহরে অনেক মসজেদ ও মিনার আছে—সে কায সুসম্পন্ন করিতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তুর্ক সরকার সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। প্রায় ৩ শতাব্দী কাল ইরাক তুর্কীর অধীন ছিল এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে তথায় উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই।

ব্যবসার জন্য বহু য়ুরোপীয় জাতি ইরাকে গমন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন এই পথে প্রাচী জয়ের আশা

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আশা নষ্ট করিবার চেষ্টায় ইংরাজ বাগদাদে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাহার পরিচয় বাগদাদে ইংরাজ দূতের আবাসগৃহের প্রাচীরে প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে।

বর্ত্তমানে ইরাকে ইংরাজের তৈলের ব্যবসাই প্রধান ব্যবসা। পারস্য উপসাগর হইতে নদীপথে বসোরায় যাইতে পথে আবাদান সহর। নদীর কূলেই শ্রেণীবদ্ধ তৈলের চৌবাচ্ছা এবং কারখানার কলঘর, কর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহ ইত্যাদি। সহরে লাইট রেল আছে। এই আবাদানে অ্যাংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর তৈল পরিষ্কৃত হইয়া

করিবার পর আমরা তথায় জার্ম্মাণীর সমরবিভাগ হইতে প্রকাশিত যে মানচিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভারতবর্ষ আক্রমণের ঐ পথ নির্দ্দেশ করা ছিল।

প্রধানতঃ ভারতীয় সেনার সাহায্যে ইংরাজ ইরাক জয় করিয়াছিলেন। ইরাক জয় করা ইংরাজের পক্ষে বড় সহজ কাযও হয় নাই। কারণ, ইরাকে তুর্কদিগের হস্তে ইংরাজবাহিনী কুট-এল-আমারায় অবরুদ্ধ হয় এবং শেষে খাদ্যদ্রব্যের অভাবে জেনারল টাউনসেণ্ডকে তুর্ককরে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়।

জার্ম্মাণযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তিরা যখন বিজিত জার্ম্মাণীর

বাগদাদে গুফা।
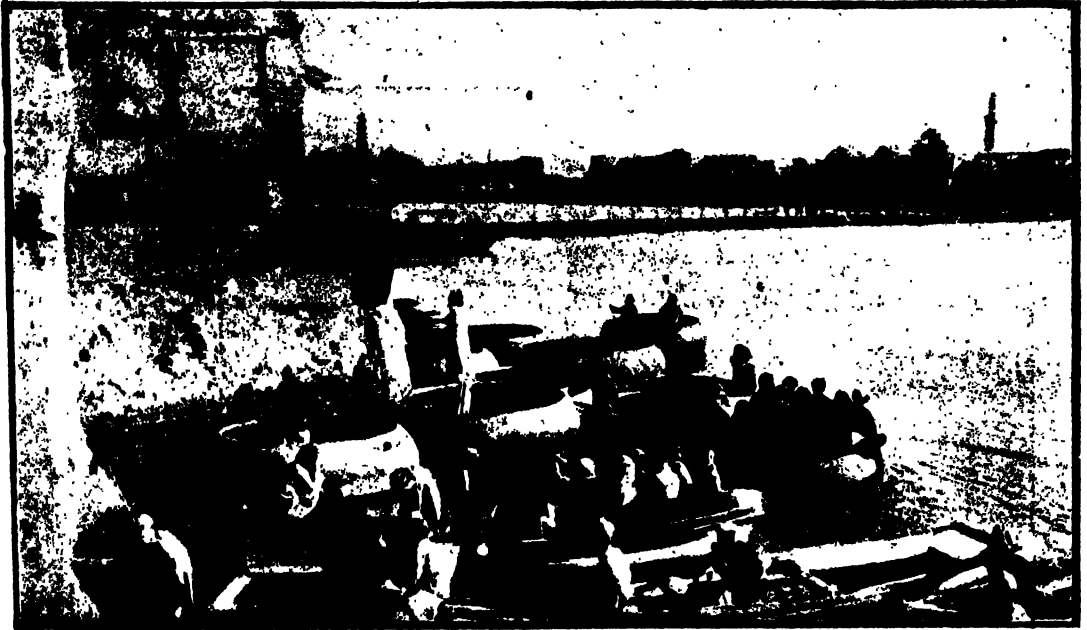
রপ্তানী হয়। আবাদান হইতে প্রায় ১ শত ৫০ মাইল দূরে কারুন নদীর কূলে আওয়াজ নামক স্থানে তৈল পাওয়া যায়; তথা হইতে তৈল নলে এই আবাদানে আনিয়া পরিষ্কৃত করা হয়। বৃটিশ সরকার এই কোম্পানীতে ৩ কোটি টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

এই তৈলক্ষেত্র রক্ষা করাও ইংরাজের ইরাকে তুর্কীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার অন্যতর কারণ। আর এক কারণ—ইরাকের বন্দর হইতে জার্ম্মাণীর জলপথে করাচীতে ভারতবর্ষ আক্রমণের সম্ভাবনা। ইংরাজ বাগদাদ অধিকার

ও তুর্কীর সঙ্গে শেষ বন্দোবস্ত করেন, তখন ইরাকে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা হইবে বলিয়া ফৈজুলকে ইরাকের রাজা করা হয়। কিন্তু ফৈজুলকে সর্ব্বতো-ভাবে ইংরাজের অভিপ্রায় অনুসারে কায করিতে হইবে।

গত ১০ই অক্টোবর (১৯২২) ইংরাজ সরকারের সহিত ইরাকের নবগঠিত সরকারের যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে ১৮ দফা সর্ত্ত আছে—

(১) ইরাকের রাজার অনুরোধে গ্রেটবৃটেনের রাজা

সন্ধির নির্দ্দিষ্টকালে ইরাক সরকারকে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন।

(২) সন্ধির নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে ইরাকের রাজা বৃটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত ইরাকী ব্যতীত অন্য কোন লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। ইরাক সরকারের বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র সন্ধিসর্ত্ত হইবে।

(৩) ইরাকের রাজা তাঁহার সরকারের নিয়মাবলী গঠন করিয়া তদনুসারে কায করিবেন। তাহাতে সন্ধি-সর্ত্তের বিরোধী কোন ব্যবস্থা থাকিবে না এবং ইরাকে সকল জাতীয় লোকের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষিত হইবে। ইরাকে যে যাহার ধর্ম্মানুসারে কায করিতে পারিবে এবং সে কোন সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে তাহাদের মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন হইবে।

(৪) ইরাকের রাজা ইরাকে ইংরাজ হাই কমিশনারের পরামর্শ লইয়া আন্তর্জ্জাতিক ও ঋণসম্বন্ধীয় কায করিবেন। যত দিন ইংরাজের সহিত ইরাকের বর্ত্তমান আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন এই ব্যবস্থা বহাল থাকিবে।

(৫) ইরাকের রাজা লণ্ডনে ও অন্যান্য রাজধানীতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। যে স্থানে ইরাকের প্রতিনিধি না থাকিবেন, সে স্থানে ইংরাজ ইরাকের স্বার্থরক্ষা করিবেন।

(৬) ইংরাজ জাতি-সঙ্ঘে ইরাককে স্থান পাইতে সাহায্য করিবেন।

(৭) ইংরাজ নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে ইরাক সরকারকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিবেন।

(৮) যাহাতে কোন বিদেশী জাতি তথায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, ইরাকের কোন অংশ সেরূপে দান বা ইজারা দেওয়া চলিবে না।

(৯) ইতঃপূর্ব্বে বিদেশীরা যে সব অধিকার সম্ভোগ করিতেছিলেন, সে সকল রক্ষার জন্য ইংরাজ বিচারাদি বিভাগে যেরূপ সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে বলিবেন, ইরাক সরকার তাহাতে সম্মত হইবেন।

(১০) ইংরাজ সন্ধিসর্ত্তাদি বিষয় পালন জন্য কোন স্বতন্ত্র সর্ত্ত করিতে বলিলে, ইরাক সরকার তাহা করিবেন।

(১১) ইরাকের অধিবাসী ও অন্যান্য দেশের লোকের মধ্যে ব্যবহারে তারতম্য হইবে না।

(১২) ইরাক সরকার স্বরাজ্যে ধর্ম্মযাজকদিগের কাযে বাধা দিতে পারিবেন না।

(১৩) ব্যাধিসম্বন্ধে ইরাক সরকার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচারে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যসাধন করিয়া বিধিপ্রবর্ত্তন করিবেন।

(১৪) প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ইরাকে সর্ব্বজাতীয় অনুসন্ধানকারীকে সমান অধিকার প্রদান করা হইবে।

(১৫) স্বতন্ত্র সন্ধিতে ইরাকের সহিত বিলাতের আর্থিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইবে। বৃটিশ সরকার প্রয়োজনানুসারে ইরাকের সরকারকে অর্থসাহায্য দিবেন।

(১৬) বৃটিশ সরকার কাষ্টামস সম্বন্ধে ইরাক সরকারের ব্যবস্থায় বাধা দিবেন না।

(১৭) সন্ধিসর্ত্তের অর্থ করিবার প্রয়োজন হইলে, সে কায লীগ অব নেশনসের বিচারবিভাগ করিবেন।

অষ্টাদশ দফা সন্ধিসর্ত্তের আমলে আসিবার সময় সম্বন্ধীয়।

ইংরাজের পক্ষে হাই কমিশনার সার পার্শি কক্স এই সন্ধিপত্রে সহি করিয়াছিলেন।

এই সন্ধিপত্র পাঠ করিলেই বুঝা যায়, সন্ধির ব্যবস্থায় ইরাকে ইংরাজের প্রভুত্ব থাকিবে। এইরূপ প্রভুত্ব থাকিলে অবশ্যই বলা যায় না যে, আরবদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হইল।

মুস্তাফা কামাল পাশা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইরাকের মুসলমানরাই স্থির করুন—তাঁহারা তুর্কীর অধীন থাকিতে চাহেন কি না। আবার এবার শুনিতেছি, ভারতবর্ষ হইতে হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ মুসলমান নেতারা মক্কায় যাইয়া পরামর্শ করিবেন—হেজাজে ও ইরাকে বিদেশীয় ও অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীর প্রভুত্ব থাকা মুসলমানের অভিপ্রেত কি না।

আরবরা যে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট, এমনও মনে হয় না। এমন অভিযোগও শুনা গিয়াছে যে, ইরাকে স্থানে স্থানে লোক রাজস্ব প্রদান না করায়, বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে "শিক্ষা" দেওয়া হইয়াছে এবং সে ব্যাপারে ইংরাজেরও দায়িত্ব আছে।

এমন কি, অল্পদিন পূর্ব্বে সার পার্শি কক্স যখন ইংরাজের কৃত রাজা ফৈজুলের জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে

সার পার্সি কক্স।

যাইতেছিলেন, তখন পথে আরবরা তাঁহাকে অপমান করিয়াছিল।

এ দিকে বিলাতের করদাতারাও ইরাকের মরুভূমিতে অর্থ-ব্যয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পার্লামেণ্টে এ কথার আলোচনা হইয়াছিল। মিষ্টার জর্জ ল্যাম্বার্ট বলেন, ইরাকে ইংরাজের দায়িত্বপরিমাণ হ্রাস করা হউক; এ পর্য্যন্ত তথায় অনেক টাকা খরচ হইয়াছে—প্রস্তাবিত সন্ধি করিয়া কায নাই। মিষ্টার মিচেল ব্যাঙ্কস বলেন, ইংরাজ যে নিঃস্বার্থভাবে ইরাকে গিয়াছেন, এ কথা আরবরা বিশ্বাস করে না। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানদিগের সহানুভূতি আরবদিগেরই দিকে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মিষ্টার আসকুইথ বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইংরাজ বসোরা প্রদেশ লইয়াই থাকুন; কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন—ইরাকে ইংরাজ যেন আর কোনরূপ দায়িত্ব না রাখেন। তখন মিষ্টার বোনার ল বলেন—যখন তুর্কীর সঙ্গে সন্ধির আলোচনা হইতেছে, তখন এ বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই পার্লামেণ্টের পক্ষে সঙ্গত।

সেই সময় বিলাতী সরকার বলেন, ইংরাজ ক্রমে ইরাক হইতে সরিয়া আসিবেন।

কিন্তু তাহার পর ২০শে মার্চ্চ পার্লামেণ্টে সরকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শীঘ্র শীঘ্র ইরাকত্যাগের কল্পনা ইংরাজের নাই। কারণ, মিষ্টার অর্মস্বী-গোর বলেন, মধ্যপ্রাচীতে ইংরাজের স্বার্থ সামান্য নহে—সেই পথে ইংরাজকে ভারতবর্ষে ও অষ্ট্রেলিয়ায় গতায়াত করিতে হয়। পোর্ট সইদ হইতে এডেন পর্য্যন্ত ভূভাগকে ইংরাজ সাম্রাজ্যের গ্রীবাদেশ বলা যাইতে পারে। মধ্যপ্রাচীর ব্যাপারের সহিত ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং এখনই প্যালেষ্টাইন, কনষ্টাণ্টিনোপল বা ইরাক হইতে সৈনিক সরাইয়া আনা অসম্ভব। অর্থাৎ এখন প্যালেষ্টাইনে, কনষ্টাণ্টিনোপলে ও ইরাকে ইংরাজের সেনাদল থাকিবে।

এই সঙ্কল্পের সমর্থনে বলা হইতেছে, জার্ম্মাণযুদ্ধের সময় ইংরাজ ইরাকের মুসলমানদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন:—

(১) বসোরা আর কখনও তুর্কীর অধীন হইতে দেওয়া হইবে না;

(২) যে সব স্থান বর্ত্তমানে ইংরাজের কর্তৃত্বাধীন, সে সব স্থানের অধিবাসীরা ভবিষ্যতে ইংরাজের আশ্রয়ে রক্ষিত হইবে;

(৩) ইরাকের অধিবাসীদিগকে তুর্কীর শাসনমুক্ত করা হইবে।

শেষ প্রতিশ্রুতিতে ফরাসীও ইংরাজের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু আরবরা অর্থাৎ ইরাকের সাধারণ অধিবাসীরা এই প্রতিশ্রুতিপালন চাহে কি না কে বলিবে?

ইংরাজ সরকার ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১২০ কোটি টাকা, ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ও ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ইরাকের মরুভূমিতে ব্যয় করিয়াছেন। এই টাকা কিসে ওয়াশীল হইবে? ইরাকের শিশু সরকার কি

রাজা ফৈজুল।

এই টাকা ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? গ্রহণ করিলেই বা তাঁহারা ঋণ পরিশোধের উপায় কি করিবেন? না—এই ঋণ আদায়ের অছিলায় ইংরাজ ইরাকে অবস্থিতি করিবেন? মিশরে ব্যাপার এইরূপই দাঁড়াইয়াছিল।

মিষ্টার অর্মসবী-গোর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, পোর্ট সইদ হইতে এডেন পর্য্যন্ত ইংরাজ অধিকার রাখিবেন। সুতরাং এক দিকে ইরাক, অপর দিকে মিশরের রাজ্যাংশ ইংরাজ গতায়াতপথের সুবিধার জন্য রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ফলে মিশরে অশান্তির কারণ বর্ত্তমান থাকিবে, ওদিকে ইরাক লইয়া তুর্কীর মনেও অসন্তোষ রহিয়া যাইবে। এই অশান্তি ও অসন্তোষ বর্ত্তমান থাকিলে ফলে যে, ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ অবস্থায় মিশরের সহিত ও তুর্কীর সহিত স্থায়ী সন্ধির সুব্যবস্থা করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বসোরায় মাকিনা হইতে মাগিল ও আমার পর্য্যন্ত যে ভাবে ইংরাজ গুদাম ও ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বটে, সহজে ইংরাজ সে দেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু বিলাতের প্রজা বৎসর বৎসর ইরাকের মরুভূমিতে জলস্রোতের মত অর্থ ঢালিয়া দিতে অনিচ্ছুক হইয়াছে। আবাদানে তৈলের ব্যবসা রাখিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করিলে ভারতবর্ষে সে পরিমাণ তৈল অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, এমন মতও শুনা গিয়াছে। বিশেষ ইরাক লইয়া তুর্কীর সহিত ইংরাজের মনোমালিন্য বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাতে মুসলমানদিগের অসন্তোষের কারণ ঘটিতে পারে। সে দিন কাবুলের সহিত ভারতে টেলিগ্রাফের তার সংযুক্ত হইলে কাবুলের আমীরও ইংরাজকে মুসলমানদিগের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

এখন সাম্রাজ্যমদমত্ত ইংরাজরা বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করেন, তাহারই উপর প্রাচীর শান্তি নির্ভর করিবে।

যৌবন

ওগো যৌবন! ওগো যৌবন!
জাগিলে কখন মানস-সাগর
　　　　করি' মন্থন;
তোমার পূজারী এসেছে আজিকে
　　　　লহ লহ অভিনন্দন!

পুলকে নিখিল আজি মাতোয়ারা,
হৃদয়ে হৃদয়ে পেয়েছি সে সাড়া,
স্বপনের দেশে চলেছি যে ভেসে,
　　　　আঁখি আগে জাগে নন্দন;
　　　　লহ লহ অভিনন্দন!

বাহি' বাসনার সাতরঙা তরী,
নামিল কি আজি স্বর্গের পরী,
গন্ধে আলোকে তরুণ ভুবন,
　　　　পরাণে এ কি স্পন্দন;
　　　　লহ লহ অভিনন্দন!

কুসুমে কুসুমে হাসি' পড় গলি',
বকুলের ছায়ে পড়িতেছ ঢলি'
অলস আবেশে মলয়ে ভাসিয়া
　　　　বিলাও মাল্য চন্দন;
　　　　লহ লহ অভিনন্দন!

নাচিছ পুলকে জলবালা সনে,
পঞ্চমে গাহি পুষ্পিত-বনে,
জ্যোছনা-কিরণে শষ্প-শয়নে
　　　　ভুজে ভুজে বাঁধ বন্ধন;
　　　　লহ লহ অভিনন্দন!

দিঠিতে তোমার ঝরে কি মদিরা,
তরুণ তরুণী আজিকে অধীরা,
আপনা পাশরি' তব পদ ঘিরি'
　　　　বিশ্ব গাহিছে বন্দন;
　　　　লহ লহ অভিনন্দন!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ।

মুক্তি ও ভক্তি

মুক্তির কামনা যে মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সে ভক্তি-সুখের আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, মুক্তির কামনা পিশাচী, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত; ইহা গতবারে বলিয়াছি। ভারতের দার্শনিকগণের নিকট কিন্তু মোক্ষই চরম বা পরম পুরুষার্থ। উপনিষদের যুগ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত, সকল দার্শনিকই এই মুক্তির পরমপুরুষার্থতা একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত মুক্তিকামনাকেও তাঁহারা পিশাচী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কেন যে তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন, এইবারে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

নির্ব্বাণ-মুক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী সকল দার্শনিকই বলিয়া থাকেন যে, 'আমি' বা অহং ভাব যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত জীবের দুঃখসম্বন্ধ অনিবার্য্য, 'আমি' থাকিতে আমার দুঃখ মিটিবার নহে, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তি যদি চাহ, তবে অহংভাবের বা আমিত্বের ঐকান্তিক বিলোপ করিতেই হইবে। আমিও থাকিব, আমার দুঃখও মিটিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই অহংতত্ত্বের বিলয়রূপ নির্ব্বাণ, ভগবান্ বুদ্ধের সময় হইতে ভগবৎপাদ আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য রচনাকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে পরমপুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। উপনিষদের মধ্যে এই নির্ব্বাণ-মুক্তি বা আমিত্বের ঐকান্তিক বিধ্বংস পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত কি না, তদ্বিষয়ে কিন্তু বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য রামানুজ-প্রভৃতি ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিচারপূর্ব্বক ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন যে, অহংতত্ত্বের বিলয়রূপ নির্ব্বাণ-মুক্তি কিছুতেই উপনিষদসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না—প্রত্যুত অহংতত্ত্বই অবিনাশী আত্মা,—এই অবিনাশী অহংতত্ত্বের সহিত দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বস্তুর যে কল্পিত তাদাত্ম্য বা অধ্যাস, তাহারই নাম অহংকার। এই অহংকারের বিনাশই জীবের পুরুষার্থ বা মুক্তি, ইহাই হইতেছে উপনিষৎসিদ্ধান্ত। আমি চিরকালই আছি ও থাকিব, কিন্তু, আমার অহংকার বা দেহাত্মভ্রান্তি থাকিবে না; ইহাই জীবের মুক্তি, উপনিষৎসমূহের পূর্ব্বাপর তাৎপর্য্যবিচার দ্বারাও এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এই অহং ও অহংকারের পার্থক্য না বুঝিয়াই বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকগণ মুক্তির স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, আত্মবিনাশ পর্য্যন্ত জীবের স্পৃহণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা কিন্তু, আর্য্য-ঋষিগণের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নহে,—এক্ষণে দেখা যাউক, উপনিষৎসমূহে অহংপদার্থ বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, জীবন্মুক্ত বামদেব ঋষি বলিতেছেন:—

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ"—
(আমিই মনু ও সূর্য্য প্রভৃতি হইয়াছিলাম)

অথর্ব্বশিখোপনিষদে দেখা যায়:—

"অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি।"

এই দুই স্থলেই দেখা যাইতেছে যে, জীবন্মুক্ত বামদেব প্রভৃতিও অহং এই শব্দের দ্বারাই জীবন্মুক্ত আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।—অহং যদি কল্পিত বা অধ্যাস মাত্রই হইত, তাহা হইলে, এই সকল বাক্যে অহং শব্দের প্রয়োগ না হইয়া ব্রহ্ম বা আত্মা এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইত।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় পরমাত্মা বা পরমেশ অহং শব্দের দ্বারাই আত্মনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)
"বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)
"স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" (ঐতরেয় উপনিষৎ)

প্রথম শ্রুতিটিতে অহং শব্দের সাক্ষাৎ প্রয়োগ রহিয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রুতিতে 'স্যাং' 'প্রজায়েয়' ও 'সৃজৈ' এই

তিনটি ক্রিয়াপদের দ্বারা সেই অহমর্থই প্রকাশিত হইতেছে। গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীভগবান্ আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতে যাইয়া বার বার অহং শব্দেরই উল্লেখ করিতেছেন, যথা :—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।"
"অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।"
"অহমাত্মা গুড়াকেশ! ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।"
"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং।"
"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"
"তেষাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।"
"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন॥"

এইরূপ আরও অনেক বচন গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বচনেই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মস্বরূপ বুঝাইতেছেন এবং আপনাকে অহং বা আমি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমি বা অহং যদি কল্পিতবস্তু হইত, তাহা হইলে, পরমার্থভূত ভগবান্ কখনই আপনাকে 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। ইহা ত হইল শাস্ত্রীয় প্রমাণ। সর্ব্বানুভবসিদ্ধ লৌকিক প্রমাণও বলিয়া দিতেছে যে, প্রতি জীবে যে পৃথক্ পৃথক্ 'অহং' প্রকাশ পায়, তাহা অবিনাশী এবং বাস্তব। অদ্বৈতবাদিগণেরই যুক্তি ও প্রমাণের বলে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে যে, যাহা অনুবৃত্ত বা অব্যভিচারী, তাহা নিত্য ও বাস্তব সৎ, এবং যাহা ব্যাবৃত্ত বা ব্যভিচারী, তাহাই মায়িক বা কল্পিত। সকল প্রকার বুদ্ধিতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাকেই অনুবৃত্ত বলা যায় আর যাহা কোন বুদ্ধিতে প্রকাশ এবং কোন বুদ্ধিতে প্রকাশ নাও পায়, তাহাই ব্যাবৃত্ত, যেমন ঘট, পট ও মঠ প্রভৃতি। যে কোন আমাদের জ্ঞান হয়, সেই সকল জ্ঞানেই সৎ এইরূপে প্রকাশিত যে বস্তু, তাহাই অনুবৃত্ত; কারণ, ঘট আছে, পট আছে, মঠ আছে, এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই আছে—এইরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যভিচার বা অভাব দেখা যায় না বলিয়া, এই 'আছে' এই শব্দ দ্বারা প্রকাশিত যে সৎ বস্তু, তাহা অনুবৃত্ত, সুতরাং তাহা নিত্য, ও বাস্তব সৎ; কিন্তু, ঘট পট প্রভৃতি বিশেষ বস্তুগুলি সকল জ্ঞানেই প্রকাশিত হয় না বলিয়া, তাহারা প্রত্যেকেই ব্যাবৃত্ত, সুতরাং কল্পিত বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা হইল বাহ্যবস্তুর অনুবৃত্তভাব বা ব্যাবৃত্তভাবের উদাহরণ—এইরূপ আন্তর বস্তুর স্বরূপ বিচার করিলে বুঝা যায়, অহংবস্তু সকল জ্ঞানেই অনুবৃত্ত থাকে বলিয়া উহা অকল্পিত বা বাস্তব সৎ, আর দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বস্তু সকল জ্ঞানে প্রকাশ পায় না বলিয়া, তাহারা ব্যাবৃত্ত বা কল্পিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আমাদের জাগ্রদ্দশাতে যত জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রত্যেক জ্ঞানেই এই অহং বস্তু প্রকাশ পায়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি রোগী, আমি ধনবান্, আমি নির্ধন, এই প্রকার সকল জ্ঞানেই 'আমি' প্রকাশ পায় বলিয়া তাহা অনুবৃত্ত এবং সেই আমি ছাড়া আর সকল বস্তুই কোন জ্ঞানে প্রকাশ পায়, আবার কোন জ্ঞানে প্রকাশ পায় না বলিয়া তাহা সকলই ব্যাবৃত্ত বা কল্পিত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমি বা অহং ব্যাবৃত্ত বা অনুবৃত্ত। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, আমাদের জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাতে যত প্রকার জ্ঞান হয়, সেই সকল জ্ঞানেই অহং প্রকাশ পাইলেও সুষুপ্তিকালে যে বিষয় প্রকাশরহিত বা অজ্ঞানপ্রকাশরূপ জ্ঞান থাকে, তাহাতে 'অহং'-এর প্রকাশ হয় না বলিয়া, ঘট পট প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর ন্যায় এই 'অহং'ও ব্যাবৃত্তই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে এই 'অহং'এর প্রকাশ হয় না বলিয়া ইহাকে সকল জ্ঞানে অনুবৃত্ত বলা যায় না। সুতরাং ঘটপটাদির ন্যায় ইহা মায়িক বা কল্পিত ছাড়া আর কি হইতে পারে? জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুইটি অবস্থাতেই আমরা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, কিন্তু সুষুপ্তির সময় আমরা কোন প্রকার দুঃখের অনুভব করি না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দুঃখানুভূতির মূল কারণ ব্রহ্মে অহংভাবের আরোপ, এই আরোপিত 'অহং' সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে মিশিয়া যায় বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই সুষুপ্তিতে আমাদের দুঃখানুভূতি হয় না, আর জাগরণ ও স্বপ্নকালে এই কল্পিত বা আধ্যাসিক 'অহং' ব্যক্তভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া দুঃখেরও অনুভূতি হইয়া থাকে। "অহং থাকিলেই

দুঃখভোগ অনিবার্য্য, আর অহং না থাকিলে দুঃখভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সংসারের সকল প্রকার অনর্থের মূল এই 'অহং'। ইহার আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভবপর নহে। সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিরহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই এই 'অহং'এর বিনাশসাধন করিতে সমর্থ। সাক্ষাৎ এই ব্রহ্মানুভূতি করিতে হইবে, তাহার উপায় শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা নিরন্তর ধ্যান। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদিগণের অহংতত্ত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির মতে অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসহও নহে এবং ইহা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বানুভববিরুদ্ধ; সুতরাং এই নির্যুক্তিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্ব্বাণ-মুক্তি বা অহংতত্ত্বনাশ কখনই বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ, সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞানমাত্রেরই বিলয় হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন, অদ্বৈতবাদিগণ নৈয়ায়িক প্রভৃতির এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, সুষুপ্তিদশায় আমাদের 'অহং' বিলুপ্ত বা অব্যক্ত হয় না, প্রত্যুত তাহা বিস্পষ্টভাবে আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন,—

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়া হ্যববুদ্ধং তদা তমঃ। পঞ্চদশী।

ইহার তাৎপর্য্য এই, 'নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে' 'আমি এতকাল কিছুই বুঝিতেছিলাম না' এই প্রকার যে সুপ্তোত্থিত পুরুষের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান তাহার সুষুপ্তির স্মৃতি; যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মরণও হয় না, সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের এইরূপ স্মৃতির বিষয় যে অজ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল, ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে।

এই প্রকার সর্ব্ববিষয়ের আবরক অজ্ঞানের অনুভূতিকে যদি সুষুপ্তি বলা যায়, তাহা হইলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ কি করিয়া বলেন যে, সুষুপ্তিকালে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না? সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের অস্তিত্বসাধন করিতে যাইয়া অদ্বৈতবাদিগণ এই প্রকার স্মৃতির সাহায্যই অবলম্বন করিয়া থাকেন? কিন্তু এই যে স্মৃতি, ইহা কি কেবল সুষুপ্তিকালে জ্ঞানমাত্রেরই সত্তাকে সিদ্ধ করে, অথবা সেই জ্ঞানের আশ্রয় যে 'অহং', তাহারও সত্তাকে সিদ্ধ করে? তাহার বিচার করিয়া দেখা যাউক্। আচার্য্য রামানুজ বলেন, এই স্মৃতির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, সুষুপ্তিকালে 'অহং'এরও সত্তা অনুভূত হয়। তাহার কারণ, এই স্মৃতিতে কেবল অজ্ঞান ও তাহার প্রকাশের সত্তা বিষয়ীভূত হয় না, প্রত্যুত, সেই অজ্ঞানপ্রকাশের আশ্রয় যে 'অহং', তাহাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি স্মরণ করে, 'আমি কিছু বুঝি নাই।' এই প্রকার স্মৃতিতে তিনটি বিষয় যে প্রকাশ পায়, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। প্রথম আমি বা 'অহং' দ্বিতীয় কিছু নয় বা অজ্ঞান, তৃতীয় বুঝা বা অজ্ঞানের প্রকাশ; নামরূপ বিভক্ত সংসার তখন বুঝা যায় না, ইহা সত্য, কিন্তু না বুঝার বুঝা যে, এই 'অহং'কেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাহাই যদি হইল, তবে—আমার এই সর্ব্বানুভূত অহং কল্পিত, সুতরাং ইহার বিনাশ না করিলে, আমার দুঃখ মিটিবে না, এই কারণে, ইহার বিনাশের একমাত্র উপায় নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ অদ্বয় জ্ঞানের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। জীবের দুঃখনিবৃত্তির ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এই প্রকার অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত কিরূপে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়? সুতরাং এই পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিমার্গই জীবের অবলম্বনীয়। এ পথে যাইতে হইলে অহংএর বিনাশবাসনারূপ পিশাচীর বশীভূত হইতে হইবে না। এ পথে অহং থাকে, কিন্তু অহংকার থাকে না; সংসার থাকে, সকল দুঃখের কারণ কিন্তু সংসারে আসক্তি থাকে না। এই অহংতত্ত্বের অনাবিল পরিস্ফুরণরূপ নির্ম্মল আলোকের প্রভায় ভক্ত ও উপাস্যের মধ্যে যে মধুর সেব্যসেবকভাবরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহাই পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় ও তাহার ফলে সমস্ত বিষয়ই ভক্তের নিকট চিরসুন্দর, রসময় ও আনন্দময় হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

এই মধুর সম্বন্ধ বা প্রাণারামের সহিত তৃষিত জীবের আধ্যাত্মিক মিলনের অনাবিল ও শান্তিময় আনন্দের সংবাদ যাহার নাই, সে-ই সংসার-সংগ্রামে বিতথমনোরথ হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির কামনা করে। এ কামনা মানবকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করে বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহাকেও পিশাচী বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"নোর্দ্ধং বিক্রমণে শক্তিস্তেষাং সম্ভৃতপাপ্মনাম্।"

(পিশাচভাবাবিষ্ট ব্যক্তিগণের পাপরাশি সঞ্চিতই থাকে, তাহাদের ঊর্দ্ধলোকসঞ্চারণে শক্তি থাকে না।)

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(হে নলিনসুন্দরনয়ন! এই মধুর ভক্তিমার্গকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সময়ে সময়ে মানস কল্পনের বশে আপনাদিগকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় না, কারণ, তাহাদের তোমার প্রতি অনুরাগ হয় নাই। এই জন্য তাহারা নানা-প্রকার ক্লেশস্বীকার পূর্ব্বক উন্নতপদ প্রাপ্ত হইলেও আবার তাহাদিগকে এই দুঃখ-তাপময় সংসারে পতিত হইতে হয়। তাহাদের সেই সমুন্নত পদ হইতে এই প্রকার পতন অনিবার্য্য; যেহেতু, তাহারা সর্ব্বভয়নিবারণ ত্বদীয় চরণারবিন্দে আদরপরায়ণ হয় নাই।)

অদ্বৈতবাদীর মহাপ্রামাণিক গ্রন্থ শারীরক সূত্রের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের ভাগবতে এই উক্তি দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভগবদ্‌ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গে আত্মোদ্ধার হইয়া থাকে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, যাহারা মুক্তিকামনাকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করিয়া থাকে, তাহাদের অভীপ্সিত সমুন্নতপদলাভ কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও সেই পদ হইতে পতন অনিবার্য্য। পিশাচীগ্রস্ত না হইলে, কাহারও সমুন্নত পদ হইতে পতন সম্ভবপর নহে, সুতরাং অভক্তজনের মুক্তিকামনাও যে পিশাচী সদৃশ, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত নির্ভিত্তিক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন না। এই ভাগবত সত্যসিদ্ধান্তের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবকুলের পরমাচার্য্য শ্রীরূপ-গোস্বামী নির্ব্বাণ-মুক্তির কামনাকেও পিশাচী বলিতে অণুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

কৌমুদী

অঞ্চল-হিল্লোলে ফুটায়ে বনের
চপল চঞ্চল লুকান হাসি,
নবীন যৌবনে আবেশে বিভোরা
হাসিছে কৌমুদী তিমির নাশি।

কার পরশনে এত শোভাময়ী—
কার পরশনে পুলক-ভরা;
প্রিয় মিলনের সুখের বারতা—
বিলাতে নিরত আজিকে ধরা!

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরী

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী

২

বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচনা কালক্রমে এ দেশে কিরূপ প্রমাদপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠের অশুদ্ধি ও অর্থহীনতা ছাড়িয়া দিয়া ভণিতাতেও অনেক ভ্রম লক্ষিত হয়। 'পদকল্পতরু' বৈষ্ণব কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্কলন গ্রন্থ। কবি ও ভক্ত বৈষ্ণব দাস বহু পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান ও নানা পুঁথি হইতে এই সকল পদ সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কলনেও প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়। পুঁথি নকল করিতে কিংবা ছাপিতে যে সকল ভুল হইয়াছে, তাহা ধরিতেছি না, মূল গ্রন্থে ভ্রমের কথা বলিতেছি। বিদ্যাপতি-বিরচিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদ "জনম অবধি হম রূপ নিহারল নয়ন ন তিরপিত ভেল" ইত্যাদি। 'পদকল্পতরুতে' (তৃতীয় শাখা, একাদশ পল্লব) এই পদের ভণিতায় আছে, "কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে মিলয়ে কোটিমে একি।" বল্লভ দাস নামে এক জন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। পদকল্পতরু ব্যতীত যদি অন্য সঙ্কলন গ্রন্থ না থাকিত ও এই পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি না থাকিত, তাহা হইলে এই পদ বল্লভ দাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইত। এইরূপ বিদ্যাপতির রচিত আর একটি পদের ভণিতাতেও বল্লভের নাম আছে,—

ভণয়ে বল্লভ ন লহ বাক।
মদন দেয়ল জয় পতাক॥

সম্পূর্ণ পদ এই প্রবন্ধে স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতির অনুকরণ করেন নাই, এমন কবির সংখ্যা খুব অল্প। এইরূপ অনুকরণের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এই পদের ভণিতায় ভূপতি সিংহের নাম আছে। বিদ্যাপতির কতকগুলি পদের ভণিতায় তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে ভূপতি সিংহ অথবা ভূপতি আছে; কিন্তু এ কথা জানা না থাকাতে, পূর্ব্বের সঙ্কলনসমূহে এই সকল পদ সংবলিত হইত না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত, বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থে এই পদ আছে (৪৮৫ পৃষ্ঠা)। মূল পদ ও তাহার অনুকরণ 'পদকল্পতরুর' চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে আছে। বিদ্যাপতির পদ এই,—

রে রে পরম প্রেম সজনি
নয়ন গোচর কোন দিন জনি
নাহ নাগর গুণক আগর কলা সাগর রে।
যবহুঁ পিয়া মঝু ভবনে আওব
দূরে রহি মুঝে কহি পঠাওব
সকল ভূখন তেজি ভূখন সমক সাজব রে॥
লাজ নতি ভয়ে নিকট আওব
রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভাওব
কাম কৌশল কোপ কাজর তবহুঁ রাজব রে।
কবহুঁ কোকিল মধুর কুহু কুহু
কবহুঁ কপোত কণ্ঠ রব মুহু
কয়জ শাসন কলা আসন কছু ন গোজব রে॥
কবহুঁ দুহু মিলি সঙ্গীত গাওব
কবহুঁ কর গহি কণ্ঠ লাওব
কবহু কৌতুক কোপ কিয়ে রস রাখি রুখব রে।
যতন করি হরি কত ন ভাখব
আশ দই পিয়া পাশে রাখব
সময় বুঝি তহিঁ মাঞ্জি হোই পুন সাঞ্জি হোয়ব রে॥
বচন ছলে যব সাধ মানব
মীনকেতন যুঝত জানব
মদন মম মত্ত হাতী মাতব অচিরে মূরব রে।
এতহু কহিতে সখি তুরিতে আওলি
সুধাময় বাত লাওলি
কানু সুন্দর চতুর মন্দির নিকটে আওলি রে॥
হরখি হসি হসি বোলয়ে রাধা
অচিরে বিহি কিয়ে পূরব সাধা
শরদ চাঁদ চকোর মিলল সিংহ ভূপতি গাবই রে॥

[রে পরম প্রিয় সজনি, সুপুরুষ গুণাগ্রগণ্য কলাসাগর

নাথ কোন্ দিন নয়নগোচর হইবে! যখন প্রিয় আমার ভবনে আসিবে, দূর হইতে আমাকে বলিয়া পাঠাইবে। সকল দোষ ত্যাগ করিয়া ভূষণে সম্যকরূপে সাজিব। লাজ-নম্রভয়ে নিকটে আসিয়া রসিক ব্রজপতি আলিঙ্গন করিবে, তখন কামকৌশল কোপকার্য্য শোভা পাইবে। কখন (কণ্ঠে) কোকিলের মধুর কুহুরব, কখন মুহুর্মুহু কপোত-কণ্ঠরব, নখাঘাত, কলা, আসন কিছু ভুলিব না। কখন করে গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে আনিব, কখন কৃত্রিম কোপ করিয়া রস রাখিয়া রাগ করিব। যত্ন করিয়া হরি কত না বলিবে। আশা দিয়া প্রিয়কে নিকটে রাখিব। তখন সময় বুঝিয়া মহার্ঘ হইব, আবার সস্তা হইব। বচনছলে সাধিলে যখন মান ভাঙ্গিবে, (তখন) জানিব, মদন যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে, মদন (রূপ) মদমত্ত হস্তী মাতিবে, শীঘ্রই অঙ্কুশ দ্বারা নিবারিত হইবে। এত কহিতে সখী ত্বরিতে আসিল, সুধাসম কথা কহিল, সুন্দর চতুর কানাই গৃহের নিকট আসিল। রাধা হরষিত হইয়া হাসিয়া হাসিয়া কহিতেছে, বিধি কি শীঘ্র সাধ পূর্ণ করিবে? চকোর শরৎ-চন্দ্র প্রাপ্ত হইল, সিংহ ভূপতি (শিবসিংহ ভূপতির সাক্ষাতে কবি) গাহিতেছে।]

এই ভাষা ও ছন্দের অনুকরণে বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ দাস গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত পদ রচনা করিয়াছেন,—

আলিরি হোত মনহুঁ উদাস সুলছন
বাম নিজ ভুজ উরজ ঘন ঘন
ফুকরই দূর সঞে প্রাণ পিউ কিয়ে অদূর আওব রে।
যবহুঁ পহু পরদেশ তেজব
আগে লিখন সন্দেশ ভেজব
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূষণ সবহুঁ ভায়ব রে॥
ত্রিপথগামিনীতীরে পহুঁ যব
অচিরে আওব শুনত পাওব
অলস তেজি কুচ কলস জোর আগোরে সাজব রে।
তবহি হিয় মাহা হার পহিরব
বেণী ফণি মণি মাল বিরচব
চলব জল ছলে কলস লেই সব কলস ভাঙ্গব রে॥
নদীয়াপুরে জয়তুর বাওব
হৃদয় তিমির সুদূর ধাওব
ভকত নখতক মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে।
রঙন শয়নক ভঙন পৈঠব
পীঠ দেই হাসি পালটি বৈঠব
কছু সরস দেই কছু বিরস ভই দশ দোষে দোখব রে।
পীন কুচ করকমলে পরশব
ক্ষীণ তনু মনু পুলকে পূরব
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস রাখি রোখব রে।
বাহু গহি তব নাহ সাধব
সময় বুঝি হাম সব সমাধব
সুধই সুধাময় অধর পিবি পিয়া পুন পিয়াওব রে॥
মীন কেতন সমরে চেতন
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন
অবিরোধ বিনু অনুরোধ পিউ পরবোধ পায়ব রে।
মিটব কিয়ে হিয় বিষাদ ছলছল
কহুঁ যব তবহুঁ কলকল
নাদ সুখদ সম্বাদ এক ধনি ধারি লাওল রে॥
নাহ আওল এতহিঁ ভাখল
মৃত সঞ্জীবন শ্রবণে ডারল
জগত জন জনি জীবনমৃত তনু জীবন পাওল রে॥

এইরূপ আনুপূর্ব্বিক অনুকরণ অধিক নাই, কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবিই যে বিদ্যাপতির ভাষা, ছন্দ ও উপমা অনুকরণ করিতেন, তাহা তাঁহাদের রচনাতেই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। এই অনুচিকীর্ষা এখন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই।

পদাবলীর শব্দের বানান সম্বন্ধে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হয়। মিথিলায়, নেপালে যে তালপাতার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, প্রাচীন হস্তলিখিত যত পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে শব্দের বানান আর এক রকম, এখনকার সঙ্গে মিলে না। বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনকালে আমি প্রাচীন বানান কতক রক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারি নাই; কারণ, তাহা হইলে এ দেশে পূর্ব্বপ্রচলিত পদসমূহ একেবারে নূতন পদের মত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্বন্ধেও তাহাই। সেকালের বানান ভুল মনে করিয়া পুঁথি নকল করিবার ও ছাপিবার সময় মহাপণ্ডিতরা বানান সংশোধন করিয়া আধুনিক আকারে পরিণত করিয়াছেন। সে কালে লেখক, কবি ও লিপিকরদিগের

শুদ্ধ অশুদ্ধ জ্ঞান ছিল না, এই ভাবিয়া আধুনিক পণ্ডিতরা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, যাঁহারা এরূপ করিয়াছেন, তাঁহারা যে শুধু অজ্ঞতার চরম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে, বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ অপকার করিয়াছেন। বিদ্যাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষার রচিত তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পদাবলীর শব্দের বানানে তিনি যে ভুল করিতেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পদাবলীর যে সকল প্রাচীন তালপাতার বা অপর পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে সংস্কৃত টীকা আছে, সংস্কৃত শব্দের বানানে কোনরূপ বর্ণাশুদ্ধি নাই। পদাবলীর শব্দের বানান যে আর এক রকম, তাহার কারণ, মিথিলা ভাষা অথবা বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নয়, প্রাকৃত হইতে। সুতরাং মিথিলা বা বাঙ্গালা শব্দের বানান প্রাকৃতের অনুযায়ী হওয়া উচিত, সংস্কৃতের নয় এবং প্রাচীন লেখক ও লিপিকররা সেই অনুসারে বানান করিতেন। যাঁহারা সে বানান পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কৃত শব্দের অনুসারে পদাবলীর শব্দের বানান করিয়াছেন, তাঁহারাই ভুল করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, বিদ্যাপতির পদাবলীতে অক্ষরবৃত্ত নাই, মাত্রাবৃত্ত। হ্রস্ব দীর্ঘ শব্দের বানান হিসাবে নয়, মাত্রা রক্ষার হিসাবে। সেই কারণে একই শব্দের বানানে কোথাও হ্রস্ব ইকার, কোথাও দীর্ঘ ঈকার, কোথাও হ্রস্ব উকার কোথাও দীর্ঘ উকার। হ্রস্ব দীর্ঘ বানান পরিবর্তন করিলে মাত্রাত্মক ছন্দোভঙ্গ হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠের, বানানের সকল ভ্রম সংশোধন করিতে হইলে পদাবলীর আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

প্রাচীন কবিদিগের রচিত গ্রন্থসমূহে শব্দের বানান তাঁহারা যেমন লিখিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারিলে ভাষার ও শব্দের উৎপত্তি জানিবার পক্ষে আনুকূল্য হইত। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেই হইবে। পেখ শব্দের অর্থ দেখা, বিদ্যাপতি ও অপর কবিরা অনেক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। অভিধানে দেখিতে গেলে জানা যাইবে, সংস্কৃত প্রেক্ষণ শব্দ হইতে পেখন হইয়াছে। মাঝ হইতে পেখ শব্দের উৎপত্তি যে প্রাকৃত পেক্খ শব্দ হইতে, সে কথা আর লক্ষ্য হয় না। বিদ্যাপতিতে যেখানে সেখানে পেখন শব্দ পাওয়া যা। রাধার বিরহের অবস্থায় দূতী গিয়া মাধবকে বলিতেছে,—

মাধব ন যাই পেখহ বালা।

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিয়া আত্মগত বলিতেছেন,—

কিং ণু ক্খু ইমং জনং পেক্খিঅ তবোবনবিরহিণো বিআরস্স গমণীঅহ্মি সম্বুত্তা,—এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?

পেখহ এবং পেক্খিঅ এই দুই শব্দে অধিক সাদৃশ্য, না পেখহ ও প্রেক্ষণে? এই শব্দ এইরূপে সাধিত হইয়াছে—সংস্কৃত প্রেক্ষ, প্রাকৃত পেক্খ, ভাষা পেখ।

পদাবলীতে ও বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায় ফুরে, ফুরে, ফুর এই শব্দ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অভিধানে যদি এই শব্দের অর্থ ফুরাইয়া যাওয়া লেখা থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অর্থ ভুল। এই শব্দের প্রয়োগ হইতেই তাহা সিদ্ধান্ত হইবে। বিদ্যাপতির একটি পদে,—

সখি হে কি কহব কিছু নহি ফুরে।

মিথিলার গোবিন্দদাসের পদে,—

কুচ যুগ কোক শোক নহি জানত
গোবিন্দ দাস কহে ফুরে।

এই ফুর শব্দ সংস্কৃত স্ফুর অথবা স্ফুট শব্দের অনুরূপ, অর্থ স্পষ্টভাবে অথবা বাক্যস্ফূর্ত্তি, কিন্তু প্রাকৃত ফুড় শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। রত্নাবলী নাটকে আছে,—

ফুড়ং এব্ব কিং ণ ভণাসি,—স্পষ্ট করিয়া কেন বলিতেছ না?

এই রকম আরও অনেক শব্দ পাওয়া যায়। ঋণ শব্দ সংস্কৃত, কিন্তু ধার প্রাকৃত। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে কহিতেছে, রুক্খ সে অনাইং দুবে ধারসি সে—তুমি দুই কলসী জল ধার। যে ভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্ভূত, তাহার শব্দের বানান প্রাকৃতের অনুযায়ী হওয়া উচিত। সেই কারণে বিদ্যাপতির পদাবলীর, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের শব্দসমূহের বানান প্রাকৃতের অনুযায়ী, সংস্কৃতের নহে। পরবর্ত্তী সংশোধনকারীরা শুদ্ধ করিতে গিয়া অশুদ্ধ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি-বিরচিত আরও কয়েকটি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি উদ্ধৃত করিতেছি;—

(দূতীর উক্তি)

আওল শরদ নিশাকর নিরমল
পরিমল কমল বিকাস।
হেরি হেরি বরজ রমণীগণ মুরুছএ
সুমরি রাস বিলাস॥
মাধব তুয় অতি চপল চরিত।
কিয়ে অভিলাষ রহলি মথুরাপুর
বিসরএ পুরুব পিরীত॥
ই সুখ জামিনী বিরহিনী কামিনী
কৈসনে ধরব পরান।
রোই রোই ভরম সরম সব তেজল
জীবইতে ভেল নিদান॥
অমল কমলদল জে মুখমণ্ডল
অব ভেল ঝামর তুল।
চম্পতি পতি গেহে কিয়ে সমুঝাএব
পেখল বল্লবী কুল॥

[শরৎকাল আসিল, নির্ম্মল নিশাকর, বিকশিত কমল পরিমল (বিকীর্ণ করিতেছে), দেখিয়া দেখিয়া রাসবিলাস স্মরণ করিয়া ব্রজরমণীগণ মূর্চ্ছিত হইতেছে। মাধব, তোর অতি চপল চরিত্র, পূর্ব্বপ্রীতি বিস্মৃত হইয়া কি অভিলাষে মথুরাপুরে রহিলি? এই সুখযামিনীতে বিরহিণী কামিনী কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে? রোদন করিয়া করিয়া সরম ভরম সব ত্যাগ করিল, জীবন শেষ হইল। যে মুখমণ্ডল অমলকমলদল (তুল্য ছিল), এখন ঝামার তুল্য হইল। চম্পতি পতির (সাক্ষাতে কবি কহিতেছে) কি বুঝাইব, গোপীগণ দেখিয়াছে।]

(দূতীর উক্তি)

চেতন পাই তাহি।
জতেক বিলপএ রাহি॥
সে কছু কর অবধান।
কহইতে বিদর পরান॥
কহে কাঁহা সে মঝু নাথ।
অবহুঁ অছলোঁ জাহি সাথ॥
কাঁহা সোই মুরলী বদন।
কাঁহা মঝু নয়ন অঞ্জন॥
পুনু মুরুছিত পুনু ভোর।
পুনু চেতন সখী কোর॥

[সেখানে (তখন) চেতনা পাইয়া রাই যত (অত্যন্ত) বিলাপ করিতেছে। সে কথা কিছু অবধান কর, কহিতে প্রাণ বিদীর্ণ হয়। (রাধা) কহে, কোথায় সে আমার নাথ, এখনি যাহার সঙ্গে ছিলাম। কোথায় সে মুরলীবদন, কোথায় আমার নয়ন-অঞ্জন। কখন মূর্চ্ছিত, কখন বিহ্বল (হইতেছে), কখন সখীর ক্রোড়ে চৈতন্য লাভ করিতেছে।]

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব রাহিক খেদ।
কহইতে হৃদয় হোয়ত মঝু ভেদ॥
অতি দুরবল তনু ধরই ন পার।
কোকিল শবদে বহয় জলধার॥
ইহ মধু সময় পুরব রস খেল।
সুমরি সুমরি ধনি ঝামর ভেল॥
বিরহ আনলে দহি বিবরন অঙ্গ।
বিষম বসন্ত তাহে মদন তরঙ্গ॥
রোই রোই কি কহএ কছু নহি জান।
জনি পরলাপ কবিশেখর ভান॥

[মাধব, রাধার খেদ কি কহিব, কহিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল তনু ধারণ করিতে পারে না, কোকিলের শব্দে অশ্রুধারা বহে। এই মধু সময়ে (চৈত্র মাসে) পূর্ব্বের রসখেলা স্মরণ করিয়া করিয়া ধনী ঝামাবর্ণ হইল। বিরহ অনলে দহিয়া অঙ্গ বিবর্ণ হইল, বসন্ত বিষম, তাহাতে মদনের অঙ্গভঙ্গী (তর্জ্জন)। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি বলে কিছু জানে না, কবিশেখর কহিতেছে যেন প্রলাপ (কহে)।]

(মাধবের উক্তি)

সুনহ সুন্দরী কি কহব তোয়।
হেরিতে হরল মরম মোয়॥
মদন সদন বদন চান্দ।
তুক সে মুরতি সুরত ফান্দ॥
অরুণ তরুণ অধর কাঁতি।
নিন্দিত মোতিম দশন পাঁতি॥

অমল কমল লোচন জোর।
তরল করল হৃদয় মোর॥
রুচির চিবুক মধুর গীম।
বিধিক সিলিপ শকতি সীম॥
কনক দাড়িম কুচক জোর।
মুনিক মানস চতুর চোর॥
ভনে বিদ্যাপতি ন লহ বাক।
মদন দেয়ল জয়পতাক॥

[শুন সুন্দরি, তোকে কি কহিব, দেখিতেই আমার হৃদয় হরণ করিল। বদনচন্দ্র মদনের আলয়, ভুরু সুরতি ফাঁদের মূর্ত্তি। অধর তরুণ অরুণ-কান্তি, দশন-পংক্তিতে মুক্তা নিন্দিত। সুন্দর কমলতুল্য লোচন-যুগল আমার হৃদয় চঞ্চল করিল। রুচির চিবুক ও মধুর গ্রীবা বিধির শিল্প শক্তির সীমা। স্বর্ণদাড়িম্বতুল্য কুচযুগল মুনির মানসের চতুর চোর। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কথা শোভা পায় না, মদন জয়পতাকা দিল।]

'পদকল্পতরুতে' এই পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি স্থানে বল্লভ আছে।

(সখীর উক্তি)

চললি নিতম্বিনী জমুনা সিনানে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী গজপতি ভানে॥
তৈল হলদী কোই অমলকী লেল।
সুবরন ঘট লই কোই চলি গেল॥
জানি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে।
অগুসরি আওল কালিন্দীক তীরে॥
একলি কাহু খেলই জল মাহি।
সহচরী মেলি ধনী মিলল তাহি॥
আন জন কোই ন হোই তব সাথ।
নাগর হেরি ধুনায়ত মাথ॥
কাহুক জল দেই কাহুক পঙ্ক।
কাহুক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক॥
হেরি সব সহচরী চমকিত ভেল।
ঝটিতহিঁ ধাই রাহি লই গেল॥
কণ্ঠ মগন জলে দুহুঁ এক ঠাম।
পূরল দুহুঁক মনোরথ কাম॥
কহ কবিশেখর সহচরী পাশ।
হের দেখ রাধা কানুক বিলাস॥

[সঙ্গিনী রঙ্গিণীদিগের সহিত নিতম্বিনী (রাধা) গজেন্দ্র-গমনে যমুনাস্নানে চলিলেন। কেহ তৈল, হরিদ্রা, কেহ আমলকী লইল, কেহ সুবর্ণ-ঘট লইয়া চলিয়া গেল। নাগরশ্রেষ্ঠ (কানাই) জানিয়া ধীরে ধীরে চলিল, অগ্রসর হইয়া যমুনার তীরে আসিল। কানাই একা জলের মধ্যে খেলা করিতেছে, সহচরীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ধনী (রাধা) সেখানে উপনীত হইল। আর কেহ তখন সঙ্গে ছিল না দেখিয়া নাগর মস্তক স্পন্দন করিল। কাহারও (অঙ্গে) জল, কাহারও (অঙ্গে) পঙ্ক দেয়, কাহাকেও ধাবিত হইয়া নির্ভয়ে চুম্বন করে। দেখিয়া সহচরী সকলে চমকিত হইল, দৌড়িয়া শীঘ্র রাধাকে লইয়া গেল। কণ্ঠমগ্ন জলে দুই জন এক স্থানে হইল, কাম উভয়ের মনোরথ পূর্ণ করিল। কবিশেখর (বিদ্যাপতি) সহচরীর নিকট কহিতেছে, রাধা-কানাইয়ের বিলাস দেখ।]

(মাধবের উক্তি)

আরে সখি কব হম সে ব্রজ জাওব।
কব পিতা নন্দ জশোদা মাই স্থান
খীর সর মাখন খাওব॥
কব প্রিয় ধবলী সামলী সুরভি লই
সখা সঙ্গে দোহি দোহাওব।
কব প্রিয় শ্রীদাম সুবল সখা মেলি
কাননে ধেনু চরাওব॥
কব জমুনা কূলে নীপ তরু মূলে
মোহন বেণু বজাওব।
কব বৃষভানু কিশোরী গোরী সঙ্গে
কুঞ্জহি রাস বিহারব॥
কব ললিতাদি রাইক প্রিয়সখী
আবেশে কোর পর লেওব।
কহ কবিরঞ্জন ঐসন শুভদিন
রাহিক মান মনাওব॥

[সখি, কবে আমি ব্রজে যাইব, কবে পিতা নন্দ মাতা যশোদার নিকট ক্ষীর সর মাখন খাইব? কবে প্রিয় ধবলী

শ্যামলী গাভীকে লইয়া সখাদিগের সহিত দুগ্ধ দোহন করিব ও করাইব, কবে প্রিয় শ্রীদাম ও সুবল সখার সঙ্গে মিলিয়া কাননে ধেনু চরাইব! কবে যমুনাকূলে কদম্ব-তরুমূলে মোহনবেণু বাজাইব, কবে বৃষভানুনন্দিনী কিশোরী সুন্দরীর সঙ্গে কুঞ্জে রাসবিহার করিব! কবে ললিতা ও রাধার অপর প্রিয় সখীদিগকে আবেশে ক্রোড়ে লইব, কবি-রঞ্জন (বিদ্যাপতি) কহিতেছে, (কবে) এমন শুভদিন হইবে, রাধার মানভঞ্জন করিব।]

মনাওব প্রচলিত হিন্দী শব্দ, অর্থ মানভঞ্জন করিব।

মিথিলা হইতে প্রাপ্ত একখানি ছিন্ন তালপত্রের পুঁথি হইতে পূর্ব্ব-প্রবন্ধে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আর দুইটি পদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ছন্দের তরল ঝঙ্কার ও ভাষার ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য পাঠক লক্ষ্য করিবেন।

(দূতীর উক্তি)

সহজ সুন্দর চিকুর চামর
সজল জলদ সমূহ সামর
সিঁউথি সরণি সুঢ়ার•
সীঁদুর রাগ আঁকুর রে।
অতি সোহাওন বদন-মণ্ডল
নিঅর চঞ্চল কনক কুণ্ডল
নয়ন বানক মান জনি লুর
আন নহি কুর রে॥
রূপে রতি অতি অনুরূপ দেখলি
ললিত কনক লতা বিশেখলি
বিধিহু জনি বিনু পরসে সিরিজলি
মদনে অরজলি রে।
দুলভ দোরী গহল গীমা
দেখল দুহুঁ মিলি রূপ সীমা
গুরু পয়োধর ভার নিঅরচি
সে ন হোঅ কহি রে॥
বাহু বন্ধুর পুলকে হরষল
চারু চন্দন খণ্ড ঘরষল
বলয় জুগ সন আর কিছু
নহি লাগি রহি অহ রে।
চরণ চটুল মরাল সম গতি
কুন্দ নখ ততি রে॥
সকল কলাময় গুণক আগরি
লখলি বিধিবসেঁ নগর নাগরি
কহএ মৈথিল সুকবি বিদ্যাপতি
বুঝএ জদুপতি রে॥

[স্বাভাবিক সুন্দর চামরতুল্য কেশ সজল জলদসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সুন্দর সীমন্তপ্রান্তে সিন্দুররাগের অঙ্কুর। অতি শোভন বদনমণ্ডলের নিকট চঞ্চল কনক-কুণ্ডল নয়নবাণের তুল্য অনুমান হয়, আর কিছু স্পষ্ট (মনে হয়) না। রূপ দেখিতে অত্যন্ত রতির অনুরূপ, ললিত কনকলতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিধি যেন বিনা স্পর্শে সৃজন করিল, মদন অর্জ্জন করিল। দুর্ল্লভ হার গ্রীবা গ্রহণ করিল, দুই (গ্রীবা ও হার) মিলিয়া রূপের সীমা দেখাইল, নিকটেই গুরু পয়োধর ভার তাহা কহা যায় না (তাহার বর্ণনা হয় না)। হর্ষে রোমাঞ্চিত সুন্দর বাহুতে চন্দনখণ্ড ঘর্ষিত (তাহাতে) বলয়-যুগল, আর কিছু (কোন অলঙ্কার) লাগিয়া নাই। * * (ইহার পর কয়েকটি শব্দ তালপত্রের সহিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে)। চটুল চরণ, মরালতুল্য গতি, তাহাতে কুন্দ কুসুমের ন্যায় নখ। সকল কলাময় গুণের অগ্রগণ্যা নাগরীকে বিধিবশে নগরে লক্ষ্য করিলাম। মৈথিল সুকবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, যদুপতি বুঝেন।]

(সখীর উক্তি)

কি আরে আজ বিধি করু
ধরনি জনি রতিকাম অবতরু
দুঅও সকল কলা নিকেতন
অতি সুচেতন রে।
দুঅও সব তহ সহজ সুন্দর
দুহু উপগত সয়ন মন্দির
রমনি অতি নতি লাজ
ভেজল পরস সে জন রে॥
কণ্ঠে কৌতুক কএলস রভস
তাবে ভাবিনি ভেলি পরবস
সেদ সলিল সমূহ পসরল
বসন সসরল রে।

তখনে নাগর পুলকে ঝাঁপল
সুতনু তনু অতি কামে কাঁপল
দুহুক মন অনুরূপ ভএ রহ
নাহে কর গহু রে ॥
রসিকে করতল জঘন রাখল
রমনি কত কত কহু ভাখল
মধুর বচন বিলাসে লহু লহু
বিহসি নহি কহু রে।
প্রথম জৌবন নব সমাগম
সুরতি সময় সমীর লঘুতম
দুহুক হিত ভএ জুঝএ রতিপতি
হরষ দম্পতি রে ॥
সেহে জন বড় জগতঁ সব তহ
জাহি নিঞঃ পিআ সঙ্গ থির রহ
কহএ কৌতুক সুমতি বিস্তাপতি
বুঝ রমাপতি রে ॥

[আহা, বিধি আজ কি করিল, ধরণীতে যেন রতিকাম অবতীর্ণ হইল, দুজনেই সকল কলা-নিকেতন, অতি সুচতুর। দুজনেই স্বভাবতঃ সকলের অপেক্ষা সুন্দর, দুই জনে শয়নগৃহে উপনীত, রমণী অত্যন্ত নতি-লাজে সে জনের স্পর্শ ত্যাগ করিল। কান্ত কৌতুকে রহস্য করিল, ভাবিনী ভাবে পরবশ হইল, স্বেদসলিলসমূহ (অঙ্গে) প্রসারিত হইল, বসন স্রস্ত হইল। তখন নাগরের (অঙ্গ) রোমাঞ্চে পূর্ণ হইল, কোমল অঙ্গ কামে কম্পিত হইল, দুই জনের মন অনুরূপ হইল, নাথ করগ্রহণ করিল। রসিক জঘনে করতল রাখিল, রমণীকে কত কথা বলিল, (রমণী) মধুর বচনবিন্যাসে স্মিতমুখে লঘু লঘু না না কহিল। প্রথম যৌবনে নব সমাগম, সুরতিসময় লঘুতম সমীর, দুই জনের হিত হইয়া মদন যুদ্ধ করিল, দম্পতী হর্ষিত হইল। জগতে সেই জন সকলের অপেক্ষা বড়, যাহার নিজ প্রিয়ের সঙ্গ স্থির থাকে। সুমতি বিস্তাপতি কৌতুক কহিতেছে, রমাপতি বুঝেন।]

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পল্লীঘাটে

সেওলা-ভরা দীঘির ঘাটে
আসে উদাস হাওয়া।
বারিরাশি অসীম ঘিরে
কোথায় জানি কেন ফিরে,
সেইখানেতে মৌন সাঁঝে
প্রিয়ার সনে চাওয়া।
কেয়াফুলের মধুর হাসি
প্রিয়ার সনে আস্‌ছে ভাসি,
কাজলপরা চোখের মাঝে
বিজুলি হানে বিজন সাঁঝে,
ও পারেতে কাঁকন বাজে
মলয় মধু গাওয়া।

একই দীঘির ঘাটের ফাঁকে
পরাণ মাঝে বাদল ডাকে,
আবেগভরা হৃদয়নীরে
মানস-তরী বাওয়া।
ও পারের ঐ বকুলতলে
মালা গাঁথি কতই ছলে,
ভাসিয়ে দেয় ঐ দীঘির ঘাটে
পরাণ বেড়ায় মাঠে মাঠে,
কি জানি কোন্ নূতন দেশে
কি জানি এক পাওয়া।

শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিমক্‌হারাম

১

"মলেম ভূতের ব্যাগার খেটে,
আমার কিছুই সম্বল নাইকো গেঁটে।"

সম্বলের আশায় মতিরাম তাঁত বুনিতেছিল, আর মাকুর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে তাল দিতে দিতে মোটা গলায় আপন মনে গাহিতেছিল,—"মলেম ভূতের ব্যাগার খেটে।"

ভূতের ব্যাগার না হউক, পরের ব্যাগার মতিরাম অনেক দিন খাটিয়াছিল। সাত বছরের ছেলে কিরূপে মানুষ হইবে, তাহার কোন উপায় না করিয়া দিয়াই মা-বাপ দুইজনেই নিতান্ত নির্ম্মমভাবে পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল। শুধু বাপ আসন্নকালে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় ক্ষীণ সকাতর কণ্ঠে পুরোহিত মধুসূদন তলাপাত্রকে বলিয়া গিয়াছিল, "খুড়ো ঠাকুর, আমার মতিরামকে দেখবার কেউ রইলো না।"

তলাপাত্র মহাশয় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "মধুসূদন আছেন, নবীন, মধুসূদন আছেন।"

বাস্তবিক, নবীন দাসের মৃত্যুর পর লোকলোচনের অলক্ষ্যে অবস্থিত মধুসূদনের পরিবর্ত্তে পুরোহিত মধুসূদন তলাপাত্রকেই মতিরামের আশ্রয়দাতা হইতে হইল। তিনি আপনার তিনটি সবৎসা গাভীর পরিচর্য্যাভার মতিরামের হস্তে অর্পণ করিয়া, তাহাকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অনাথ বালকের প্রতি স্বীয় দয়াবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

তাঁহার এই দয়ার উপর নির্ভর করিয়া মতিরাম জীবনের পনেরোটি বৎসর কাটাইয়া দিল। এই দীর্ঘকালটা যে খুব সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। সংসারে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে; সুতরাং কখন সুখে, কখন দুঃখে দিনগুলা এক রকমে কাটিয়া গেল। তবে সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগটাই মতিরামকে কিছু বেশী ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেন না, বয়স যতই বাড়িতেছিল, কাযের চাপও ততই বেশী বেশী করিয়া তাহার উপর পড়িতেছিল, এবং সে চাপে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও বাধ্য হইয়া মতিরামকে সেই ভার বহন করিতে হইতেছিল। গো-সেবা হইতে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কায—কাঠ কাটা, মাটী কোপান, ছেলে বওয়া, চাষের কায প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ভারই মতিরামের উপর অর্পণ করিয়া তলাপাত্র মহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

মতিরামও যে অন্নদাতার কার্য্যসম্পাদনে ত্রুটি করিত, তাহা নহে; ছেলেবেলা হইতে প্রতিপালিত হওয়ায় এই ব্রাহ্মণ-গৃহই সে নিজের ঘর বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছিল এবং গৃহের সুখ-দুঃখের সহিত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ফেলিয়া ইহার উন্নতি-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকিত। কিন্তু কার্য্যে তাহার সামান্য শৈথিল্য দর্শনে তলাপাত্র মহাশয় যখন তীব্র তিরস্কারের সহিত তাহাকে জানাইয়া দিতেন যে, এরূপ ভাবে কাযের ক্ষতি করিলে, তিনি দুই বেলা রাশীকৃত অন্ন যোগাইতে পারিবেন না, তখন সে তিরস্কার নিতান্ত কঠোরভাবে মতিরামের মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইত; তাহার মনে হইত, দূর হউক, না খাইয়া মরিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি এখানে আর থাকিব না। মনে করিলেও মতিরাম কিন্তু যাইতে পারিত না।

যাইবার যায়গা ছিল না বলিয়াই যে মতিরাম যাইতে পারিত না, তাহা নহে; যাইবার যায়গা তাহার অনেক ছিল। তাহার শ্রমদক্ষতা দর্শনে গ্রামের অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছিল, এবং দুই বেলা অন্ন ব্যতীত কিছু কিছু মাহিনা দিয়া তাহাকে রাখিতেও অনেকে প্রস্তুত ছিল। তলাপাত্র মহাশয়ের জ্ঞাতি বিপিন ঠাকুর মতিরামকে অনেকবারই বলিয়াছিলেন, "ওরে বেটা তাঁতির ছেলে, পেটভাতায় এমন গাধার মত খেটে মচ্ছিস্ কেন? আমার ঘরে থাক্, ভাত, কাপড় ছাড়া কিছু কিছু মাইনেও দেব।"

মতিরামের বাপের মামাতো ভাই যাদব বসাক উপদেশ দিয়াছিল,—"বাপু, তাঁতির ছেলে হয়ে চিরকাল লাঙ্গল ধ'রে কাটাবি? আমার কাছে তাঁত শিখবি আয়, পেটে পয়তে দেবার পর শিখতে পারলে ঘরে ব'সে তিরিশ দিনে তিরিশ টাকা।"

এত প্রলোভনেও মতিরাম তিরস্কার খাইয়াও তলাপাত্র মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিতে পারিল না। শুধু যে বহুদিন অবস্থিতি জন্ম মায়াই তাহাকে যাইতে দেয় নাই, তাহা নহে; তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তলাপাত্র মহাশয়ের ছোট মেয়ে বিন্দু।

আঁতুড় হইতে বাহির হইয়াই সেই এক মাসের ফুটফুটে মেয়েটিকে কোলে লইয়া মতিরাম কি যে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ অনুভব করিয়াছিল, সেই আনন্দের লোভে মতিরাম তাহাকে কোল হইতে নামাইতে চাহিত না; মেয়েটিও তাহার কোল ছাড়া হইয়া থাকিতে চাহিত না। সেই অজ্ঞান শিশু মতিরামের কোলে আসিয়া এমন একটা স্নেহ বা ভালবাসার আস্বাদ পাইত, যাহাতে তাহার সকল ক্রন্দনের, সকল চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি এক মুহূর্ত্তে হইয়া যাইত।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত বিন্দু স্নেহের দুশ্চেদ্য বন্ধনে মতিরামকে এমন জড়াইয়া ফেলিল যে, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মতিরামের এক পা-ও নড়িবার উপায় রহিল না। তাহার আহার-নিদ্রা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি সকল কার্য্যই মতিরামের কোলে এমন সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইত যে, মায়ের কাছে তেমন হইত না। মতিরাম পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রসূতির মত সযত্নে বিন্দুকে দুধ খাওয়াইত, তাঁহার চোখে কাজল, কপালে টিপ দিত; তার পর তাহার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; সেই ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে সমষ্টীভূত স্নেহের মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িত।

মধ্যাহ্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহ লইয়া মতিরাম মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিত; কিন্তু সে সময়েও বিন্দুকে একবার কোলে না লইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম করিতে পারিত না; করিতে গেলেও সে শান্তি যেন অশান্তিতে পরিণত হইত! সুতরাং মতিরাম বিন্দুকে উপেক্ষা করিয়া কোন দিনই এমন অশান্তি ভোগ করিতে চাহিত না। আর এই জন্যই বহু অশান্তি ভোগ করিয়াও মতিরাম বিন্দুকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না।

একদিন কিন্তু বিন্দুর জন্যই বিন্দুকে ছাড়িয়া যাইতে হইল।

২

রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ বিন্দুর চীৎকার শুনিয়া মতিরাম জাগিয়া উঠিল, এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, বিন্দু তত রাত্রিতে মাছের মুড়ো খাইবার জন্য আবদার ধরিয়াছে। কিন্তু এত রাত্রিতে মাছ বা মাছের মুড়ো কোথায় পাওয়া যাইবে? মেয়েকে ভুলাইবার জন্য মা অনেক চেষ্টা করিলেন, বাতাসা দিলেন, সন্দেশ দিলেন, মুড়ী দিলেন, মেয়ে কিন্তু তাহাতে ভুলিল না; সে মাছের মুড়োর জন্য কান্না জুড়িয়া দিল। কান্না কিছুতেই থামে না দেখিয়া মা বিরক্ত হইয়া প্রথমতঃ ধমক দিলেন, তাহার পর দুই এক ঘা চড়-চাপড় বসাইয়া দিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল, কান্নার সুর খাদে না আসিয়া ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল। নিদ্রার ব্যাঘাত হয় দেখিয়া তলাপাত্র মহাশয় প্রমাদ গণিলেন।

এমন সময় মতিরাম উপস্থিত হইল, তলাপাত্র মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কোথা হ'তে মাছ একটা এনে দিতে পারিস্, মতিরাম?"

চিন্তিতভাবে মতিরাম বলিল, "তাই তো, দাদাঠাকুর! এত রাত্তিরে মাছ কোথায় পাব?"

তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "বিপিন খুড়োর খিড়কীতে দেখতে পারিস্? বিস্তর মাছ আছে।"

মাথা চুলকাইয়া মতিরাম বলিল, "বড্ড অন্ধকার।"

গম্ভীর হাস্য সহকারে তাহাকে উপদেশ দিয়া তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "হেঃ অন্ধকারেই তো পরের পুকুরে মাছ ধরার সুবিধা। ঘাটের পাশে ঝুপ ক'রে জালটি ফেলে আস্তে আস্তে তুলে নিবি! বুঝলি কি না?"

ভাল না বুঝিলেও বিন্দুর ক্রন্দনধ্বনি মতিরামের অসহ্য হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং ভাল হউক, মন্দ হউক, বিন্দুকে শান্ত করিবার জন্য মতিরাম জাল লইয়া বাহির হইল।

ঝপাৎ—ঝুপ্! হয়েছে, বড় না হইলেও মাছটা নেহাৎ ছোট হইবে না। মতিরাম সন্তর্পণে জাল টানিয়া গুটাইতে লাগিল। সে কিন্তু জানিত না, শরীর অসুস্থ হওয়ায় বিপিন ঠাকুর বাহিরে আসিয়াছেন, এবং তিনি ঘাটের পাশে আমগাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

মাছসমেত জাল গুটাইয়া লইয়া মতিরাম সবেমাত্র একটা পা ডাঙ্গায় তুলিয়াছে, এমন সময় বজ্র-গম্ভীর-কণ্ঠে হাঁকার আসিল, "কে রে?"

সর্ব্বনাশ, এ যে বিপিন ঠাকুরের গলা! মতিরাম ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু একে অন্ধকার, তাহার উপর জলের ধারে লতাপাতার বাসনা; একটা লতা পায়ে বাধিয়া যাওয়ায় মতিরাম জালসমেত হুম্ করিয়া পড়িয়া গেল, এবং পতনজনিত আঘাতের বেদনা সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই বিপিন ঠাকুর আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। মতিরাম ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"তবে রে হারামজাদা, চোর, ডাকাত, এক রাশ টাকার মাছ ফেলেছি, একটা মাছ ভোগ কত্তে দিলে না? চল্ বেটা, এবার পুলিসে গিয়ে মাছের ঝোল খাবি।"

মতিরাম অনেক অনুনয়-বিনয় করিল। কিন্তু একে পুকুরের মাছ চুরী যায় বলিয়া বিপিন ঠাকুর চোরের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, ইহার উপর মতিরাম তাঁহার ঘরে চাকরী স্বীকার না করায় তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি মতিরামের অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিলেন না; বাগী চৌকীদারকে ডাকিয়া তাহার হাতে জাল ও মাছ সমেত মতিরামকে অর্পণ করিলেন। চৌকীদার খুব সকালেই চোরকে দারোগার দরবারে হাজির করিয়া দিল। দারোগা মাছটাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়া মতিরামকে হাজতে রাখিয়া দিলেন।

মতিরাম নিজেই অপরাধ স্বীকার করায় সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হইল না। বিচারক তাহার এই প্রথম অপরাধ এবং অপরাধের লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া দশ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন, অনাদায়ে এক পক্ষ কারাবাস। তলাপাত্র মহাশয় বিচারফল জানিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি মতিরামকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মতিরাম, পনরোটা দিন, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার তরে গরীব ব্রাহ্মণ—দশ দশটা টাকা অনর্থক কোম্পানীকে দিতে যাই কেন?"

অগত্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মতিরামকে জেলে ঢুকিতে হইল। পনের দিন পরে জেলখানা হইতে বাহির হইয়া সে আর তলাপাত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গেল না, যাদব বসাকের কাছে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া বলিল, "আমার একটা উপায় ক'রে দিন।"

যাদব তাহাকে কতকগুলা তিরস্কার করিয়া তাঁতের কাষ শিখাইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই মতিরাম তাঁত শিখিয়া ফেলিল এবং বাপের ভিটায় একখানি ঘর বাঁধিয়া তাঁত বুনিতে আরম্ভ করিল। তাঁত বুনিয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে একটা পেটের খরচ চালাইয়া যে কিছু উদ্বৃত্ত হইত, খুড়া যাদব বসাকের কাছে জমা দিয়া আসিত। যাদব তাহাকে আশা দিয়াছিল, শ' চারেক টাকা জমাইতে পারিলেই তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিবে। বিবাহের আশায় মতিরাম দিনরাত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

এ দিকে তলাপাত্র মহাশয় তাহার এই অকৃতজ্ঞতায় সন্তপ্ত হইয়া লোকের কাছে বলিতে লাগিলেন, "দেখলে, মত্তে বেটা কতদূর নিমকহারাম! এতকাল খেয়ে প'রে যাই হাত-পা হ'ল, অমনি না বলা না কওয়া, নিজের পথ দেখলে। দেখুক, কিন্তু ওর ভাল হবে কি?"

৩

"মতিরাম, ওহে মতিরাম!"

মতিরাম গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কে, দাদাঠাকুর?"

"হাঁ হে, আমি। দরজাটাই খোল না।"

মতিরাম শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলে তলাপাত্র মহাশয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মতিরাম তাঁহাকে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল তো সব, দাদাঠাকুর?"

তলাপাত্র মহাশয় আসনগ্রহণ করিয়া মৃদুগম্ভীর হাস্য সহকারে বলিলেন, "ভাল মন্দর খোঁজখবর তুমি তো আর নাও না, মতিরাম; এখন তুমি স্বাধীন হয়েছ, কত লোক তোমার আপনার হয়েছে। কিন্তু নবীন খুড়ো যখন মারা যায়, তখন কেউ কোথাও ছিল না।"

মতিরাম লজ্জানত মস্তকে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। তলাপাত্র মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "হোক্, তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলের মত মানুষ করেছি, এখন তুমি যদি সুখী হও, তাতে আমাদের সুখ ভিন্ন দুঃখ একটুও নাই। শুন্‌ছি তো হাতে জমিয়েছ কিছু, বিয়েও করবে।"

মৃদু হাসিয়া মতিরাম বলিল, "আর শ'খানেক টাকার যোগাড় কত্তে পারলেই হয়, দাদাঠাকুর।"

মুখে খানিকটা অহ্লাদের ভাব আনিয়া তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "বেশ বেশ, জগদম্বার কৃপায় সংসারী হও, নবীনের বংশ বজায় থাক্, আমারও নাম থাক্। ওহে, যতই যা কয়, এই গরীব বামুনের আলো চালের ভাতই তার মূল।"

বলিয়া তিনি মতিরামের মুখের উপরে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মতিরাম বলিল, "তা বৈ কি, দাদা-ঠাকুর, আমি তো তোমাদেরি চাকর।"

প্রসন্ন হাস্য সহকারে তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "তা বলবে বৈকি ভায়া, নবীনের ছেলে তো তুমি। নবীনের মত লোক কি আর জন্মাবে? মত্তে যায়, তখনও খুড়ো ঠাকুর, আর খুড়ো ঠাকুর। আহা, খুড়ো ঠাকুর অন্ত প্রাণ ছিল।"

শোকসূচক স্মৃতির উচ্ছ্বাসে তলাপাত্র মহাশয়ের মুখ-খানা বিষাদগম্ভীর হইয়া আসিল। তাঁহার এই স্নেহপূর্ণ উক্তিতে মতিরামের হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল; সে বাষ্পসজল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এত রাত্রিতে কি মনে ক'রে, দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুর কোঁচার খুঁটে শুষ্ক চক্ষু দুইটাকে মুছিয়া ফেলিলেন, এবং বার কতক কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "বড্ড একটা দরকারী কথা মনে ক'রেই এসেছি, ভায়া। তুমি শুনলে হয় তো মনে করবে, দাদাঠাকুরের একটুও আক্কেল নাই। কিন্তু আক্কেল আমার খুব আছে। তবে কি জান, দায়ে পড়লে মানুষের আক্কেল ওকুব বড় একটা থাকে না।"

দাদাঠাকুরের বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মতি-রাম উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তলা-পাত্র মহাশয় আর একবার জোরে কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন; তাহার পর ধীরগম্ভীরভাবে মাথাটা বার কয়েক নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "তা, ভায়া, তুমি হচ্ছ, আপনার লোক, তোমাকে তো কখন পর ভাবি নাই, বরং ছেলের চাইতে আপন মনে করেছি। তোমার কাছে বলতে লজ্জাই কি, ভয়ই বা কি? আর তোমার কাছে না বললে বলবোই বা কার কাছে? তোমার দুখের দুখী, সুখের সুখী আছেই বা কে?"

ভিতরের কথাটা জানিবার জন্য মতিরাম নিতান্তই উৎ-সুক হইয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "দায়টা কি দাদা-ঠাকুর?"

তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "দায়টা নেহাৎ ছোটখাট নয়, মতিরাম, কন্যাদায় কি রকম বিষম দায় তা জান তো। এ তো তোমাদের তাঁতি তেলীর ঘর নয় যে, মেয়ে জন্মালে বুকটা দশ হাত হয়ে উঠবে, পাঁচ বছরের মেয়ে সাত শো টাকায় বেচে ত্রিশ বিঘে জমী কিনে ফেলবে। আমাদের বামুন-কায়েতের ঘরে একটা মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে চোদ্দ পুরুষ হায় হায় ক'রে ওঠে, ভয়ে ভিটের মাটী পর্য্যন্ত সাত হাত নেমে যায়।"

বলিয়া তলাপাত্র মহাশয় একটু দুঃখের হাসি হাসি-লেন। তাহার পর মতিরামের মুখের উপর উদ্বেগকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জান তো, বিন্দী ন' বছরে পড়েছে। 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।' নবম বৎসরের মধ্যেই কন্যাদান প্রশস্ত। কিন্তু আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয় তো। হাঁসপুকুরে একটি ছেলে আছে, কিন্তু কত চায় জান, নগদ সাত শো। বাপ্, আমাকে পর্য্যন্ত বেচলেও সাত শো টাকা হবে না। গৌরহাটীতে একটি ছেলে—সে-ও চায় চার শো। কাযেই দেখে শুনে ঘোড়াহাটে একটি পাত্র স্থির করে-ছিলাম; বুড়ো নয়, তবে বছর চল্লিশ বয়স, প্রথম পক্ষের একটি ছেলে দু'টি মেয়ে আছে; শ'খানেক টাকার মধ্যেই হোতো। কিন্তু জান তো, গিন্নীর আদুরে মেয়ে, বলে, বাপ হ'য়ে ঘাটের মড়ার হাতে আমার বিন্দীকে দেবে?"

গম্ভীরমুখে মতিরাম বলিয়া উঠিল, "দিদি ঠাকরুণ তো ঠিক কথা বলেছে।"

তলাপাত্র মহাশয় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঐ দেখ, তোমার মুখেও সেই কথা। তা হবে না কেন, বিন্দী তো তোমারও কম আদুরে নয়, সে যে তোমার কোলেই মানুষ, তোমার বিন্দী মাসী। তাকে চল্লিশ বছরের বুড়োর হাতে দিতে তোমার কি মত হ'তে পারে? কিন্তু কি করবো, ভায়া, আমার পুঁজি যে নাই। আমি না হয় এ দিক সে দিক ক'রে শ'খানেক টাকার যোগাড় কত্তে পারি। বাকী তিন শো?"

বলিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মতিরামের মুখের দিকে

চাহিলেন। মতিরাম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "আমি চেষ্টাও কি না দেখেছি, কিন্তু পঞ্চু পাল পাকুড়তলার আড়াই বিঘেটা রেখে দেড়শো-খানি টাকা দিতে চায়। গোপাল হাজরা তিন শোই দিতে পারে; কিন্তু সে বলে, এ মাসে পার্‌বো না, চৈত মাসের আধা-আধি দিতে পারি। এ দিকে ছেলের মায়ের প্রতিজ্ঞা, ফাল্গুন মাসের ভিতরেই ছেলের বিয়ে দেব।"

চিন্তিতভাবে মতিরাম বলিল, "তাই তো, দাদাঠাকুর, দিতে পারি তিন শো টাকা, কিন্তু যাদব খুড়ো ব'লে রেখেছে, আস্‌ছে বোশেখের ভিতর কাযটা শেষ কত্তে হবে। মেয়ে তারা আর রাখতে চায় না। তিন শো জমা আছে, এর ভিতর আর যা যোগাড় হয়, বাকী টাকাটা কর্জ্জ করা যাবে।"

গম্ভীরভাবে তলাপাত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদবের শালীরই মেয়ে না?"

মতিরাম মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "হাঁ।"

তলাপাত্র মহাশয় খানিক ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলি-লেন, "তা, ভায়া, যখন তোমার হাতে হাতে দরকার, তখন আর কি বল্‌তে পারি। কিন্তু তোমার যদি বোশেখ মাসে দরকার হয়, আমি গোপাল হাজরার কাছ থেকে চৈত মাসে টাকাটা নিয়ে তোমাকে দিতে পারি।"

মতিরাম বলিল, "তা যদি পার, দাদাঠাকু—"

দাদাঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "যদি কেন, নিশ্চয় দিতে পারি।"

মতিরাম দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তলাপাত্র মহা-শয় তাহার চিন্তামলিন মুখের উপর ব্যগ্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে টাকাটা কবে দিচ্ছ?"

মতিরাম উত্তর করিল, "আগে ঠিক কর না, দাদা-ঠাকুর।"

দাদাঠাকুর হর্ষপ্রফুল্লমুখে বলিলেন, "ঠিক এক রকম হয়েই আছে, ভায়া। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত। পরশু দিনে কিন্তু টাকাটা চাই। জান তো, টাকা হাতে না ক'রে আমি কাযে হাত দিই না। ভাল কথা, লেখাপড়া—"

ঈষৎ হাসিয়া মতিরাম বলিল, "ছি, দাদাঠাকুর, তোমার কাছে লেখাপড়া ক'রে?"

মতিরামের এই সরলতায় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তলাপাত্র মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। মতি-রাম এক ছিলিম তামাক খাইয়া পুনরায় তাঁতে গিয়া বসিল, এবং মাকুর ঠক্‌ঠক্ শব্দে তাল দিয়া গান ধরিল,—

"মলেম ভূতের ব্যাগার খেটে।
আমার কিছুই সম্বল নাইকো গেঁটে॥"

৪

সে দিন মতিরাম অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া তাঁত বুনিল। তাঁত ছাড়িয়া যখন শুইতে গেল, তখন শুক্লা একাদশীর চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এত রাত্রিতে শুইয়াও কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার প্রধান চিন্তার বিষয়, টাকাটা সে হাতছাড়া করিবে কি না। তাহার সংসারী হইবার বড় সাধ; এত দিন একা থাকিয়া থাকিয়া একক জীবনটা যেন নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহ করিয়া, পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া সংসারী হইতে পারিলে, অন্ততঃ মেয়েমানুষের হাতে গৃহস্থালীর ভার ছাড়িয়া দিয়া এক মুঠা রাঁধা ভাত পাইলেও জীবনে যেন একটা নূতনত্ব আইসে। কিন্তু বিবাহে অন্তরায় অনেক। একে ত তাহা-দের জাতির মধ্যে বিবাহে এক রাশ টাকার দরকার; তাহার উপর সে 'অগ্নি-দগ্ধা',—শুধু অগ্নি-দগ্ধা নয়, চুরীর দায়ে জেল খাটিয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্বজাতির মধ্যে তাহাকে মেয়ে দিতে কেহই স্বীকৃত নহে। ভাগ্যে যাদব খুড়োর বিধবা শালীর আট বছরের মেয়েটি ছিল, তাই যাদব খুড়োর চেষ্টায় তাহার সংসার পাতিয়া বসিবার আশা হইয়াছে, নতুবা তাহার বিবাহই হয় তো ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু বৈশাখ মাসের মধ্যে সে যদি টাকাটার যোগাড় করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার এ আশাটুকুও নির্ম্মূল হইবে। মেয়ের মা তো সে দিন যাদব খুড়োর সাক্ষাতে মতিরামের মুখের উপর স্পষ্টই বলিয়াছে, বৈশাখ মাসের মধ্যে কায শেষ করিতে না পারিলে, সে অন্যত্র মেয়ের বিবাহ দিবে; তাহার মেয়ে তো অবিক্রী নয়, শালুকপুরের গুপী যে টাকা লইয়া হাত ধুইয়া বসিয়া আছে। এ অব-স্থায় তাহার বিবাহের সম্বল টাকাগুলা হাতছাড়া করা সঙ্গত কি না।

সঙ্গত নয় সত্য, কিন্তু বিন্দীকে লইয়া সে যে মহা মুস্কিলে পড়িল! টাকার যোগাড় করিতে না পারিলে দাদাঠাকুর অগত্যা বিন্দীকে বুড়া বরের হাতেই সম্প্রদান করিবেন। আহা, এমন ফুটফুটে মেয়েটি বুড়ার হাতে পড়িবে, আর মতিরাম নিজের বিবাহের জন্য টাকাগুলা গুছাইয়া রাখিবে? ধ্যেৎ তোর বিবাহ! ধ্যেৎ তোর সংসার! একদিন সে যে বিন্দীর মুখে একটু হাসি দেখিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত, তাহার কান্না শুনিলে মনে হইত, সারা জগৎটাই যেন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! এখনও সে কাজের একটু ফুরসৎ পাইলেই যে বিন্দীকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া যায়। বিন্দীও যে পাঁচ দিন তাহাকে দেখিতে না পাইলে এখানে পর্য্যন্ত ছুটিয়া আইসে। সেই বিন্দী বুড়া বরের হাতে পড়িলে, এত সাধের সংসার পাতিয়াও কি সে সুখী হইতে পারিবে?

আর টাকাগুলা সে খয়রাৎ করিতেছে না, মাসখানেকের জন্য হস্তান্তর করিতেছে মাত্র। দাদাঠাকুর বলিতেছেন, চৈত্রমাসে টাকা মিটাইয়া দিবেন। চৈত্রের মধ্যে না পারেন, বৈশাখমাসেও তো দিতে পারিবেন। বৈশাখের শেষ নাগাদ বিবাহের দিন করিলেই চলিবে। এই সামান্য কয়দিনের জন্য টাকাগুলা দিলে ব্রাহ্মণের যদি উপকার হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? সে এতকাল ব্রাহ্মণের নিমক খাইয়া আসিল, আজ এই উপকারটুকু করিয়া সেই নিমকের শোধ দিতে পারিবে না? না পারিলে লোক বলিবে কি? দাদাঠাকুরই বা কি মনে করিবেন? ভাবিবেন, মতিরামের মত নিমকহারাম দুনিয়ায় আর নাই। বিন্দীকে বুড়া বরের হাতে সম্প্রদান করিতে তাঁহার যে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস বাহির হইবে, সেই দীর্ঘশ্বাসে তাহার সংসারে সুখশান্তি সব পুড়িয়া যাইবে যে! না না, টাকাটা দিতেই হইবে।

সকালে মতিরাম টাকার জন্য যাদব খুড়ার কাছে উপস্থিত হইল। যাইবার সময় সে ঘুরিয়া বিন্দীর সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। বিন্দী তাহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল, এবং তাহার হাতখানা ধরিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছিস, মতি কাকা?"

মতিরাম হাসিয়া উত্তর করিল, "যাচ্ছি তোর একটি টুকটুকে শাশুড়ী আন্‌বার চেষ্টায়।"

"দূর!" বলিয়া তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া বিন্দী লজ্জা-রক্তমুখে ছুটিয়া পলাইল। মতিরাম প্রাণের ভিতর একরাশ আনন্দের উচ্ছ্বাস লইয়া যাদব খুড়োর নিকট উপস্থিত হইল।

যাদব খুড়ো তাহার টাকা লইবার প্রয়োজন অবগত হইয়া তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিল, "তোর টাকা নিয়ে তুই যা ইচ্ছা কর্‌তে পারিস্, মতি; কিন্তু বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছা যদি থাকে, তা হ'লে টাকাটা বেহাত করিস্ না।"

মতিরাম বলিল, "বেহাত তো কচ্চি না খুড়ো, দিন কতকের তরে ধার দিচ্চি। বামুনের এতকাল নুণ খেয়েছি, এখন দশ দিনের তরে দু' টাকা ধার দিয়ে যদি একটু উপকার কর্‌তে না পারি, তবে আমার মত নিমক্‌হারাম আর কে আছে। না খুড়ো, দাদাঠাকুর চৈতমাসেই জমী বাঁধা রেখে টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন।"

যাদব খুড়ো বলিল, "দিলেই ভাল! রাবির মা কিন্তু বোশেখমাসে মেয়ের বিয়ে দেবেই দেবে, এটা যেন মনে থাকে।"

যাদব খুড়ো টাকা আনিয়া দিল। মতিরাম তলাপাত্র মহাশয়ের হাতে দিয়া, ব্রাহ্মণের আন্তরিক অজস্র আশীর্ব্বাদ ও হৃদয়ে অব্যক্ত আনন্দের বোঝা লইয়া ঘরে ফিরিল।

বিন্দীর বিবাহে তাহার চার পাঁচ দিন তাঁত কামাই হইল। কিন্তু সেজন্য মতিরাম একটুও দুঃখ অনুভব করিল না। অধিকন্তু বিবাহের সময় একটি উনিশ-কুড়ি বছরের নধর-কান্তি যুবাকে বরের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সে আপনার অর্থোপার্জ্জন সার্থক জ্ঞান করিল। হাঁ, যেমন মেয়ে তেমনই বর! এমন বর না হইলে কি বিন্দীকে মানাইত! আর সে কপাল ঠুকিয়া টাকাটা না দিলে, আজ বিন্দীর ঢলঢলে মুখে এমন মিষ্টি হাসি কি কেহ দেখিতে পাইত!

"দাদাঠাকুর!"

ঘরের ভিতর হইতেই তলাপাত্র মহাশয় উত্তর দিলেন, —"কে, মতিরাম নাকি? বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল?"

লজ্জানত মুখে মতিরাম বলিল, "হাঁ, একুশে দিন ঠিক হয়েছে।"

গৃহিণী রন্ধনশালার বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "তা আমাদের নেমন্তন্ন করনি তো মতি?"

ঈষৎ হাসিয়া মতিরাম বলিল, "তোমাদের আমি নেমন্তন্ন করতে যাব কেন, দিদি ঠাকরুণ, তোমরাই বরং পাঁচজনকে নেমন্তন্ন করবে। এ তো তোমাদের কায।"

তলাপাত্র মহাশয় হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কেমন, গিন্নি, মতিরাম কেমন জবাব দিয়েছে দেখ। আর সত্যিই তো, এ আমাদেরি কায, আমাদের ঘরে খেয়ে প'রে যখন মানুষ হয়েছে, তখন চেষ্টা ক'রে ওর বিয়ে দা দেওয়া আমাদেরি উচিত। তবে, মতিরাম স্বাধীন হয়ে নিজে কচ্চে, সেটা আমাদেরি স্বদার। কি বল হে মতিরাম?"

বলিয়া তিনি মতিরামের মুখের উপর প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মতিরাম লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো না। ত: আমার কাছে তাগাদায় এসেছ বুঝি?"

মতিরাম ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, তাগাদা নয়, তবে, দাদাঠাকুর—"

দাদাঠাকুর এবার মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমিও চেষ্টায় আছি হে মতিরাম, তবে হয়ে উঠ্‌চে না, কি করি বল! নৈলে আমাকে কি তাগাদা দিতে হয়?"

বিনীতভাবে মতিরাম বলিল, "তাগাদা নয়, দাদাঠাকুর, তবে দিনও সংক্ষেপ হয়ে আস্‌ছে, তাই—"

রুক্ষস্বরে তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "দিন সংক্ষেপ হয়ে আস্‌ছে, আমি তার কি কর্‌বো? তোমাদের যেমন তাড়াতাড়ি; কেন, দু'মাস পেছিয়ে দিলে কি চল্‌তো না।"

হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে মতিরাম বলিল, "চল্‌বে না কেন, তবে ওরা যে কিছুতেই রাখছে না।"

রোষগম্ভীর স্বরে তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "ওরা রাখছে না, না তুমি রাখছো না? আসল কথা আমি জানি হে জানি, দাদাঠাকুর পাছে টাকাটা না দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলেছ। তা ভয় নাই, আমি তোমার মত নিমকহারাম অধার্ম্মিক নই। মাসখানেক থাম, আমি জমী বেচি, ভিটে বেচি, তোমার টাকা ফেলে দেব।"

সর্ব্বনাশ! মাসখানেক পরে টাকা দিবে! মতিরাম নৈরাশ্যে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল; ভীতি-জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "মাসখানেক পরে দিলে চল্‌বে কেন, দাদাঠাকুর?"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া তলাপাত্র মহাশয় বলিলেন, "তবে কি আজই এক্ষুণি তোমায় দিতে হবে নাকি? আমি বুঝি বাক্সে টাকা রেখে তোমাকে দিতে চাইছি না?"

এ কথার উত্তর মতিরাম খুঁজিয়া পাইল না। সে ভীতি-বিহ্বল-নেত্রে দাদাঠাকুরের রোষস্ফীত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তলাপাত্র মহাশয় কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া যেন খুব দুঃখের সহিত বলিলেন, "ওহে, আজ তিন শো টাকা দিয়ে আমার কাছে মহাজনের মত তাগিদ দিতে এসেছ, কিন্তু এই মধুসূদন তলাপাত্রের ভাতের গন্ধ এখনো যে তোমার গায়ে রয়েছে হে। দেখ, মতিরাম, আর যাই কর, এতটা নিমকহারামী ক'রো না।"

নিমকহারামী যে কিসে হইল, বুঝিতে না পারিয়া মতিরাম নীরবে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। তলাপাত্র মহাশয় তখন ক্রোধপরুষ স্বরটাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ, মতিরাম, তোমাকে বেশী কথা বল্‌তে চাই না। ছেলের মত মানুষ করেছি তোমাকে, এখন আধা মূল্যে জমী বেচিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া তোমার ধর্ম্ম হয় না। তাতে তোমার ভালও হবে না। আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে যে রকমে পারি, তোমার টাকাটা ফেলে দেব। না দিতে পারি, সুদ দেব।"

কাঁদ-কাঁদ মুখে মতিরাম বলিল, "সুদ নিয়ে আমি কি কর্‌বো, দাদাঠাকুর?"

"তোমার সাত গুষ্টীর পিণ্ডী চট্‌কাবে!" বিকৃত মুখে কথাটা বলিয়াই তলাপাত্র মহাশয় গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া সশব্দপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। মতিরাম হতবুদ্ধির ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর শুষ্ক-মুখে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

যাদব খুড়ো সমস্ত শুনিয়া বলিল, "আমি আর কি কর্‌বো, মতি, তোর বরাতেই নিয়ে নাই।"

মতিরাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিল।

৬

মতিরাম তাঁতের কাছে বসিয়াছিল, কিন্তু তাঁত বুনিতে পারিতেছিল না। একটা ঘোলাটে মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়া অপরাহ্নের সমুজ্জ্বল প্রকৃতিকে যেন গভীর বিষাদ-ম্লান করিয়া তুলিয়াছিল। মতিরাম হাত দুইটা বুকের কাছে জড় করিয়া গবাক্ষপথে সেই বিষাদ-মলিন প্রকৃতির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল। আজ রাধির বিয়ে, থাকিয়া থাকিয়া শাঁকের শব্দ উঠিয়া পাড়ায় সেই কথাটা প্রচার করিতেছিল। সে শঙ্খধ্বনি মতিরামের কানে ঠিক বজ্রধ্বনির মতই অনুভূত হইতেছিল। সেই শাঁকের শব্দ শুনিতে শুনিতে মতিরামের বুকের পাঁজরগুলাকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল।

"মতি কাকা!"

মতিরাম চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "কে, বিন্দী?"

বিন্দী সহাস্য মুখে উত্তর করিল, "হাঁ, আমি। অমন চুপ্ ক'রে ব'সে কি ভাবছো? কাঁদ্‌চো নাকি?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মতিরাম ধরা-গলায় বলিল, "দূর্ পাগ্‌লি, কাঁদতে যাব কেন?"

বলিয়া সে দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া লইল। বিন্দু হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এক জিনিষ খাবে, মতি কাকা?"

"কি জিনিষ, বিন্দি?"

"বল দেখি কি?"

"সন্দেশ রসগোল্লা?"

ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে বিন্দী বলিল, "দূর, রসগোল্লা কোথায় পাব? শুধু সন্দেশ।"

মতিরাম জিজ্ঞাসা করিল, "সন্দেশ কোথায় পেলি, বিন্দী?"

বিন্দু দুষ্টামীর স্বরে বলিল, "তুমিই বল না, কোথায় পেয়েছি।"

মতি। তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে এয়েচে বুঝি?

বিন্দু। ঠিক! এই নাও চারটে সন্দেশ, খাবে।

বলিয়া সে সন্দেশ চারিটি মতিরামের সম্মুখে রাখিল। মতিরাম সন্দেশগুলার দিকে চাহিয়া বলিল, "চমৎকার সন্দেশ! আচ্ছা, বিন্দি!"

"কি, বল।"

"তোর শ্বশুরবাড়ীটি বেশ হয়েছে, না?

"হুঁ।"

"তোর শ্বশুর শাশুড়ী তোকে কেমন ভালবাসে?"

"খুব।"

"আর জামাই?"

"দূর" বলিয়া বিন্দু মতিরামের মুখের উপর সলজ্জ-কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। মতিরাম জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্দেশগুলাকে তুলিয়া রাখিল; তাহার পর তাঁতের সম্মুখে বসিয়া মাকু ঠেলিতে ঠেলিতে গুণ্ গুণ্ শব্দে গান ধরিল,—

"আমায় দে, মা, তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই, শঙ্করী॥"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্বরাজ-সাধনা

৪

মহাকবি ব্যাসদেব আর এক আদর্শ চরিত্রের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন মহাভারতে। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-চরিত্র শুধু রাজ-চরিত্র নহে বীরের চিত্র নহে রাজনীতিজ্ঞের কথা নহে সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থেরও অনুকরণীয় চরিত্র।

ভগবদ্ভক্তিতে চরিত্রের চারুতায় ইন্দ্রিয়-সংযমে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে কষ্টসহিষ্ণুতায় শ্রমে কর্ম্মকুশলতায় আদর্শ-মানবরূপে গঠিত করিবার জন্য কবি পঞ্চপাণ্ডবের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন মহাবন। পাণ্ডুর শরীরে নিশ্চয়ই কোন ক্ষয়কারী রোগের বীজ ছিল সেই জন্য তিনি প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বন হইতে বনান্তরে বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু সেবনে আয়ুরক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের বাল-নয়নে প্রতিভাত হইত তুষার-মণ্ডিত অত্যুন্নত গিরিমালার গরীয়ান্ দৃশ্য শ্যাম-পত্রাবলী ও বিচিত্র ফল-পুষ্পবিভূষিত তরু-গুল্ম-লতাদির সুশোভন চিত্র; তাঁহাদের কিশোর কর্ণে প্রবিষ্ট হইত—পর্ব্বতগাত্র-প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর গম্ভীর গীতি তরঙ্গিণীর কুলু-কুলু কল্লোল বিহঙ্গমগণের কলধ্বনি ও ঋষিগণের সাম-গান। শাল তাল তমাল পিয়াল্ অশ্বত্থ ভল্লাতক বট নিম্ব হরীতকী জারুল পারুল দেবদারু অগুরু প্রভৃতি তরুতে আরোহণ ও সাধারণ শিশুর আতঙ্ক উৎপাদক মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র গণ্ডার কাসর ভল্লুক বরাহ প্রভৃতির পশ্চা-দ্ধাবন পাণ্ডবদিগের বাল্যক্রীড়া ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে হস্তিনায় আনীত হইলে তাঁহাদের শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পরাক্রান্ত জ্ঞাতির বিষম বিদ্বেষ তাঁহাদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে ও আত্মরক্ষাপটু হইতে অভ্যস্ত করে। দুর্য্যোধনের কপটতায় নিধন-প্রাপ্তির আশঙ্কাতেই আবার তাঁহারা ছদ্মবেশে জনপদ হইতে অদৃশ্য হয়েন। এই প্রবাসেই পাণ্ডবরা স্ববৃত্তি দ্বারা আত্মপোষণ করিতে শিক্ষা করেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পর পুনরায় তাঁহারা রাজধানীতে আনীত হয়েন এবং যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পরে রাজসূয়যজ্ঞ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রতি-হত প্রভুত্বের অধিকারী হয়েন। যেন তাঁহাদের শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্যই কবি শকুনি দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পাশায় আহ্বান করাইলেন; যুধিষ্ঠির পরীক্ষায় সফল হইলেন না, পাশা খেলিতে যাইলেন ও পরাজিত হইলেন। তদনন্তর আবার ভিখারী আবার বনবাস—কেবল বনবাস নহে, আরও কঠিন শাস্তি—এক বৎসর অজ্ঞাতবাস; পরগৃহে পরান্নে দাসভাবে অবস্থিতি।

সৃজন-পালনকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতিভূ হইয়া প্রজাপতি-রূপে তুমি কোটি কোটি নরনারীর ধর্ম্ম, ধন, জীবন রক্ষার ভার লইলে—ফিটনের কুসনে হেলান দিয়া মোটরে গতর রাখিয়া রোষ্ট টোষ্ট পোলাও রাবড়ী খাইয়া সেই দেব-দায়িত্ব বহনের শক্তি কি দেহমনে সঞ্চিত হইতে পারে?

মানবদেহ ধারণ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানাথ হইবার পূর্ব্বে বাল্যে রাখালের সঙ্গে গো-চারণ করিয়াছিলেন গোপবেশে গাভী দোহন করিয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্রের শিক্ষানবীশির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করি-য়াছি। আবার দেখিতেছি রাজসূয়যজ্ঞকালে ভারতের সমস্ত নরপতি যাঁহার সিংহাসনতলে মুকুটধারী মস্তক অবনত করিয়াছেন, সেই যুধিষ্ঠির বিরাটের সভায় এক জন মোসাহেব; তমোগুণের পূর্ণাবতার বৃকোদর মৎস্য দেশপতির জন্য উচ্ছেচচ্চড়ি মাছের ঝোল রাঁধিতেছেন; যে ত্রিপুরারিবিজয়ী অর্জ্জুন এক দিন সুরপুরে ইন্দ্রের সিংহা-সনের পার্শ্বে আসনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অর্জ্জুন আবার পৃষ্ঠে বেণী বিলম্বিত করিয়া নপুংসক-বেশে উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণকে সারঙ্গ বাজাইয়া নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। নকুল সহদেব কি না অশ্বপাল—গো-পাল; আর দ্রৌপদী দীপ্তিমতী স্বাহাসমা তেজস্বিনী পাঞ্চালী বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার সৈরিন্ধ্রী কি না Lady's maid.

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের আদর্শ ভারতবর্ষের রামায়ণ

মহাভারতের কাণ্ডে কাণ্ডে পর্ব্বে পর্ব্বে আখ্যানে উপাখ্যানে প্রদর্শিত আছে। স্বার্থ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি আমাদের আদর্শ নহে। তাঁহাদের মন্ত্র ভোগ আমাদের মন্ত্র ত্যাগ।

স্বরাজ কি একটা জমীদারী যে, পাট্টা-কবুলতী লিখাইয়া রেজেষ্টারী করিয়া লইবে, না লাঠির আগায় বিবাদী চর দখল করিয়া তাহাতে বাঁশগাড়ি করিবে?

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বাধীন হইবে তখন দেশ ও আপনা আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে। একে ত জঠরযন্ত্রণায় প্রকৃতির তাড়নায় মানব স্বতঃই স্বাধীনতাশূন্য, তাহার উপর আবার সভ্যতার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অভাবের উপর অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহা পূরণের জন্য লালায়িত হওয়া এবং এই লালসার বশে শিক্ষার নামে শিল্পের নামে কলার নামে বিজ্ঞানের নামে বেসাতীর নামে এমন কি, ধর্ম্মের নামে-ও কেবল 'কাঞ্চন কাঞ্চন করিয়া অপরকে লাঞ্ছিত করা বা আপনি লাঞ্ছিত হওয়া।

কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন:—

"কাঠুরিয়া জাতি মোরা কাঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি॥"

সুস্থ শরীরে নিত্য আন নিত্য খাও উপবাসী উপস্থিত থাকিলে তাহাকে কিছু বাটিয়া দাও। এই একমাত্র নীতিতে দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, নচেৎ সংসারী লোকের দুঃখের হাত এড়াইবার অন্য উপায় নাই। আর পেটের তাড়া থাকিলে পীড়াও নিকটস্থ হইতে শঙ্কিত হয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে-ও এ দেশের অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বাধীন ছিলেন। পর্ণ কুটীরবাসী হবিষ্যাশী অঋণী অপ্রবাসী, আশীর্ব্বাদের হস্ত দাতা অদাতা সকলেরই জন্য প্রসারিত; রাজা হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান তাহার জন্য ভ্রূক্ষেপ-ও নাই। পাদপীঠে বিদ্যার্থী উপস্থিত হইলেই, বিনা উপায়নগ্রহণে বিদ্যাদান, আরাধিত হইলে নিমন্ত্রণরক্ষা ও বিদায় গ্রহণ আর গ্রাম্য তন্তুবায়ের নিকট কার্ষিকপণলব্ধ কার্পাসিক মাত্র পরিধানে সর্ব্বত্র সম্মান।

মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন যে, সকলে চরকা কাট আর খদ্দর পর অর্থাৎ সহজ গ্রাম্যভাবে আপনার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। অনেক ধনগর্ব্বী যেমন সোনার রুদ্রাক্ষমালা গলদেশে বিলম্বিত করেন সেইরূপ কি তিনি বলিয়াছেন যে, তোমরা কুসান চেয়ারে বসিয়া মার্ব্বেলের টিপয়ের উপর মেহগিনির চরকা ঘুরাইয়া দীর্ঘসূত্রতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কর, আর খদ্দর পরিয়া বিলিয়ার্ড খেল কি মোটরে পার্কে বেড়াইতে বাহির হও?

ইংরাজ এ দেশে আছে কি জন্য? কেবল ইংরাজ বলি কেন ফরাসী জার্ম্মাণ ইটালীয়ান আমেরিকান সুইস জাপানী চীনে এমন কি, মাড়োয়ারী ভাটীয়া সুরাটী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোক আপনার আপনার মায়ের কোল ছাড়িয়া এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়া পড়িয়া আছে কেন? নিশ্চয়ই গঙ্গাস্নান কালীদর্শন চন্দ্রনাথগমন ও তারকেশ্বরে হত্যা দিবার জন্য নহে; নিশ্চয়ই বৰ্দ্ধমানের সীতাভোগ মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া ভীমের সন্দেশ নবীনের রসগোল্লা পদ্মার ইলিস ঢাকার অমৃতি কৃষ্ণনগরের সর-ভাজা ফতেউল্লার চিঁড়ে আর মৈমনসিংহের ক্ষীর খাইবার জন্য নহে। তাহাদের সহিত বঙ্গদেশের একমাত্র কুটুম্বিতা—তাহারা বিক্রেতা, বঙ্গ ক্রেতা। ভূতাশ্রয়ের ন্যায় অলস-বিলাসের প্রেতাত্মা ঘাড়ে চাপিয়া আমাদিগকে যতই আশ্রয় করিতেছে, নগরে নগরে মিউনিসিপ্যালিটী বাস্তুর অস্তিত্ব লোপ করিয়া ততই রাস্তা বিস্তার করিতেছেন; আর বিদেশীর দোকান ততই লক্ষ লক্ষ অনন্ত নাগের ফণা দোলাইয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। এই ক্রয়ের ক্রীড়া যতই কমাইবে ততই দেখিবে বাঙ্গালার হাওয়া আর বিদেশীর দেহে বরদাস্ত হইবে না। অপরিহার্য্য ব্যবহার্য্য মাত্র আপনি প্রস্তুত কর আপনি বিক্রয় কর।

আমার ঘরে পিপীলিকার সার দিলেই যদি কেহ মারিয়া বা ঝাঁটাইয়া পিপীলিকা নিঃশেষ বা দূর করিতে চেষ্টা করে, আমি তখনই তাহাকে নিবারণ করি এবং খুঁজিয়া দেখি, কিসের জন্য এত পিপীলিকা আসিয়া জমা হইতেছে, খুঁজিতে খুঁজিতেই পাওয়া যায়—হয় ত কোথাও এক টুকরা বাতাসা ভাঙ্গা বা একখানা আরসুলার ঠ্যাং পড়িয়া আছে। আমি সেইটা উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়া স্থানটায় একটু জলহাত বুলাইয়া লইতে বলি, আর দেখিতে দেখিতে কোথায় কোন্ দিক দিয়া সহস্র সহস্র পিপীলিকা যে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা বুঝা যায় না। দশ হাতে মিষ্টির গুঁড়া ছড়াইতেছ, মরা আরসুলা ফড়িং মাছি

বোতল্‌তা ছড়াছড়ি করিতেছ আর বলিতেছ, পিঁপড়ে, তুই আমার ঘরে কেন?

আসবাববাহুল্যে ঘরখানি গুদামে পরিণত না করিয়া অবশ্য আবশ্যক নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রাখিলে কেবল যে ইঁদুর আরসুলা পিঁপড়ের উপনিবেশ উঠিয়া যাইবে তাহাই নহে; মাছি মশার উৎপাতও কম হইবে। সহরের মধ্যে একটি ঠিকে ঝি তারও 'ভগ্‌গিন্‌পোতের' অসুখের জন্য মাসে ক'দিন কামাই আর এদিকে বিছানায় ছ'টা বালিসের তোষাথায় আঠার হাত ঝালর,—এ বিছানায় ছারপোকা জন্মিবে না ত কোথায় জন্মিবে?

ইন্দ্রাদিদেবগণবাঞ্ছিত অলোকসামান্যা সুন্দরী দময়ন্তীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া নল নরপতি-কার্য্যে অনেকটা অবহেলা করিয়া পতিত্বের তৃপ্ত্যর্থে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। সেই অবসরে কলি তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পাশাক্রীড়ায় লিপ্ত করে। কাঞ্চনের লোভই লোককে বঞ্চনার খেলায় (জুয়া খেলায়) প্রবৃত্ত করে। অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় না করিলে বিলাস আয়ত্ত হয় না। বিলাসের সঙ্গে আলস্যের চিরসাহচর্য্য সুতরাং বিলাসী লোক শ্রমের সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে রাতারাতি ধনবান হইবার প্রয়াসী সহজেই হয়; এই জন্যই বিলাসী ইংরাজের দেখাদেখি আমাদের দেশের লোকও ক্রমে জুয়ার নেশায় পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছেন। আজকাল কলিকাতার বাবুদের বৈঠকে গৃহস্থের ট্রামে কেরাণীর জলখাবার ঘরে এমন কি গঙ্গায় স্নানরত বাঙ্গালীর মুখেও ঘোড়ার কথা, 'মে ক্রাউন' ও 'ডাক লিজেণ্ডের' কথা। যাঁহাদের ঘোড়ার ডিম মাত্র সম্বল, তাঁহাদেরও ঘোড়া-রোগ। তাহার পর রাজা নল পাশায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একবস্ত্রপরিধানে বনে গমন করিলেন। সেখানেও কাঞ্চন-প্রেত তাঁহার স্কন্ধ ত্যাগ করে নাই; সোনালী রং-এর পাখী দেখিয়া ভাবিলেন,—"মাংস হইবে ভক্ষ্য, পাখা হইবে ধন"।

ব্যাস্, এই ভাবনার ফলে শেষে তাঁহার পরিধের বস্ত্রখানিও গেল। হংসের ঘটকালীতে দময়ন্তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবারে নিজে মাংসলোভী পরমহংস! অবশেষে কলি তাঁহার স্বার্থকে এতদূর জাগাইয়া তুলিল যে, নিজের সুবিধার জন্য তিনি বনবাসের একমাত্র সঙ্গিনী নিরাভরণা ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লিষ্টা নিদ্রিতা সহধর্ম্মিণী দময়ন্তীকে ও পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বেঞ্চে বসিয়া বিলাতী বাঁধান বইয়ে এ, বি, সি, ডি, পড়িতে পড়িতে-ও আমাদের শরীরে বাবুয়ানা মূর্ত্তিতে কলি প্রবেশ করিয়াছে। বাবু শব্দের ধাত্বর্থ যাহাতে সার বু বা এসেন্স আছে, কিন্তু আমরা বাবুর অর্থ করিলাম—অলস অকর্ম্মণ্য স্বাস্থ্যরহিত চাকচিক্যোজ্জ্বল-বসন-ভূষণজড়িত একটি জঙ্গম!

দেহে জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে-ই স্বাতন্ত্র্যলাভে ইচ্ছা এবং শক্তি-ও সঞ্চারিত হয়। ভাবী জননী পঞ্চামৃত ভক্ষণের পরে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গর্ভস্থ ভ্রূণ কারামুক্তির প্রয়াসে তাহার নব-জাত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, নবম মাস উত্তীর্ণ হইলেই সে কারা-দ্বার মোচন করিবার চেষ্টায় গর্ভিণীকে পীড়িতা করে এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া মুক্তালোকে ও মুক্তবাতাসে তাহার মুক্তির সংবাদ কণ্ঠস্বরপ্রয়োগে ঘোষণা করে; সেও শান্তি লাভ করে আর তাহার প্রসূতি-ও শান্তিলাভ করেন। আমার অনেক সময় ইচ্ছা হয়, কোন জেলারকে জিজ্ঞাসা করি যে, কার বেশী কষ্ট—যে জেলের ভিতর কয়েদ থাকে না যে জেলের ভিতর কয়েদ রাখে তাহার? যে জাতি অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সে ত যন্ত্রণাভোগ করেই কিন্তু যে জাতি শৃঙ্খল পরাইয়া চৌকী দেয় তাহার যন্ত্রণার সীমা নাই; কয়েদী তবু ক্লান্ত হইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু সতর্ক জাগরণেই জেলার জীবন অতিবাহিত হয়। শিশু একটু হাঁটিতে শিখিলে-ই মায়ের অঙ্ক হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে,যে ছেলে চলিতে বলিতে শিখিয়া-ও মায়ের আঁচল ধরিয়া ঘোরে প্যান্ প্যান্ করে সে হয় রোগা নয় ভয়ানক হ্যাংলা। এইরূপে মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা প্রসারিত ও বলবতী হইতে থাকে। তাহার শক্তিলাভের প্রবৃত্তি জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি বিষয়-বিভবলাভের প্রবৃত্তি সকল প্রবৃত্তিমূলেই এক উদ্দেশ্য—শান্তিলাভ। তাহার পর তাহার অন্তরস্থ আত্মা-ও এই দেহের বন্ধন হইতে, অস্থি-পঞ্জরের পিঞ্জর হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায় তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার চরণতলে লুণ্ঠিত হইবার জন্য লালায়িত হয়। আমরা ইংরাজের independence বা Libertyর অনুবাদ করিয়াছি স্বাধীনতা, কিন্তু সংস্কৃত স্বাধীনতা শব্দটি স্বেচ্ছাচারিতার সপিণ্ড-জ্ঞাতি, ঠিক 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে'র সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের সমধিক সাদৃশ্য আছে।

আমাদের আর্য্য-রক্তের সহিত যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত আছে তাহার নাম—মুক্তি।

মানবের আত্মা স্বতঃই ত্যাগের দ্বারা মুক্তির পথে যাইতে ইচ্ছা করে। ইন্দ্রিয়শাসিত মন একটা আমি গড়িয়া তাহাকে ভোগের পথে লইয়া গিয়া ও অধীনে রাখিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া দেয়। এই ভোগের মায়াই মানবের আত্মাকে মুক্ত হইতে এবং জীবনকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে দেয় না।

আমি পূর্ব্বে-ও বলিয়াছি, আবার এখন-ও বলিতেছি, যে য়ুরোপীয়দিগকে আমরা স্বাধীন মনে করি তাহাদের মত পরাধীন আর জগতে নাই; ইংরাজদের তুলনায় আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই অনেকটা স্বাধীন তাই এখনও তাঁহাদের দণ্ডাধীন হইয়াও জীবিত আছি। জগদীশ্বর রক্ষা করুন, ইংরাজ যেন কখনও অপর জাতির অধীন হয় না, আমাদের দারিদ্র্য কি হীনতা তাহাদের যেন স্পর্শ না করে, তাহা হইলে শতাব্দীমাত্র গণনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজ নাম কেবল ইতিহাসে বা গল্পেই থাকিবে। ঈশ্বরকৃপার মুক্ত-হস্ত আমাদিগের দিকে প্রসারিত; অতি অল্পমূল্যে প্রাপ্ত আহারে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি, স্বচ্ছল লোক-ও দুই তিনটা উপবাস সহ্য করিতে পারে; মুক্ত আকাশতলে নিদ্রালাভ এ দেশে একটা আয়েস; প্রান্তরের পাতা কুড়াইয়া জ্বালাইয়া রাখিলে স্বল্পদিনস্থায়ী সামান্য শীতের রাত্রি কাটিয়া যায়; আট হাত পরিমাণ মোটা কাপড়ে আমাদের লজ্জানিবারণ হয়। আমাদের পল্লীগ্রামের বালক বৃদ্ধ-যুবকগণ কঙ্কালসার দেহে বৰ্দ্ধিত প্লীহার গুরুভার বহন করতঃ কাঁথা মুড়ী দিয়া ম্যালেরিয়ার পালা খাটিয়া পাথ্যর পাতর লইয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ কম্প-জ্বরে তিনটা পালা ভোগ করিলে বোধ হয় অনেক লৌহ-দেহধারী জনবুলকেও বৈতরণীকূলে নীত হইতে হয়। ত্যাগ আমাদের সহজ প্রবৃত্তি, অনুকরণে কৃত্রিম উপায়ে মাত্র ভোগের ক্ষুধা আমরা উদ্দীপ্ত করিয়াছি। কিন্তু বিধাতা ইংরাজের জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন শীতপ্রধান তুষার-কবলিত ইংলণ্ডে, অথচ তাঁহাদের দেহে বহুল পরিমাণে লোম দেন নাই, সেই জন্য ইংরাজকে পশু-পক্ষী আক্রমণ করিয়া উহাদিগের লোম ও পর লইয়া শ্বেতকায়া আচ্ছাদিত করিয়া শীতের তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে হয়। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের সংখ্যা ভারতবর্ষে এখন অতি অল্প, কিন্তু অগ্নিহোত্রী না হইলে ইংরাজ গোত্র লোপ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ মাংসাশী অথচ বাঘের মত দাঁত-ও নাই ভালুকের মত নখ-ও নাই গণ্ডারের মত খড়্গ-ও নাই সুতরাং উদরপূর্ত্তির জন্য ইস্পাতের দাঁত নখ শিং প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এইখানেই ইংরাজের রণ-সজ্জার শিক্ষারম্ভ, এই সব অসুবিধার উপর প্রকৃতির উৎপাতে নিত্য সম্ভ-ভোজ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর বলিয়া ইংরাজকে আহার্য্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সঞ্চয়বিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইয়াছে। এই ভোজ্যসংরক্ষণচেষ্টাতেই ইংরাজ বিজ্ঞানের শিশুশিক্ষা পাঠ আরম্ভ করিয়াছিল। দ্রব্য সঞ্চয় করিতে করিতে তল্লাভোপায় কাঞ্চনমূল্যের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগিয়া উঠে সুতরাং অভাব ও প্রয়োজন প্রথমেই কাঞ্চন-সংগ্রহে-ই প্রবৃত্তি দিয়া কাঞ্চনকে ইংলণ্ডের উপাস্য দেবতা-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সহজ ইংলণ্ডে যেমন ভীষণ দারিদ্র্য, কৃত্রিম ইংলণ্ড তেমন-ই কাঞ্চনজঙ্ঘা। প্রকৃতির নিয়ম অর্জ্জন ও ব্যয়; অধিক উদ্বৃত্ত সঞ্চিত রাখিতে প্রকৃতি নারাজ। তুমি আহার করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিলে, শক্তিটুকু ব্যয় করিতে হইবে পরিশ্রম করিয়া, তবে তোমার আবার ক্ষুধা হইবে, আহারে প্রবৃত্তি হইবে। পাকস্থলীগত খাদ্য জীর্ণ হইয়া তোমাকে যেটুকু রক্তরস পেশীমাংসাদি দিল, তাহার যদি শ্রম-সাধ্য সদ্ব্যয় না কর, তবে তুমি অজীর্ণ মন্দাগ্নি বাত মেদাধিক্য প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত সহ্য করিতে বাধ্য হইবে। শারীরিক বল-ও তাহাই; নিত্যকর্ম্মের প্রয়োজনের জন্য যেটুকু বল প্রয়োজন, তাহার অধিক বল যদি তোমার শরীরে সঞ্চিত হয় তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত বল ব্যয় করিবার জন্য তোমার হাত-পা নিস্-পিস্ করিবে; ভাল লোক হও, পাঁচ জনের কায করিয়া দিবে, দুর্ব্বলকে সাহায্য করিবে নহে ত গোঁয়ার হইয়া ইহাকে উহাকে ঠেঙাইবে; অন্যকে ভূমিসাৎ করাটা জাঁকালরকম হইলে তাহার নাম হইবে বীরত্ব। অর্থবল-ও তদ্রূপ, নিজের ও পোষ্যগণের ভরণ পোষণ-রক্ষণাদির জন্য যে খরচ প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষা অধিক অর্থ আসিলে তাহা খরচ করিতে অর্থাৎ তোমার হাতও তোমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এ সংসার ঈশ্বরের, এখানে যাহা কিছু আছে সব-ই ঈশ্বরের, তুমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া বা

সংসার-পালন করিয়া ঈশ্বরের-ই কার্য্য করিতেছ, তোমার কিছুই নাই, তুমি কিছুরই অধিকারী নহ এই দিব্যজ্ঞান যদি তোমার থাকে, তুমি সেই উদ্বৃত্ত অর্থ দেবসেবায় অর্থাৎ ধনহীন আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী অতিথির, যাচক প্রভৃতির তৃপ্তির জন্য ব্যয় করিবে; পথিকের জন্য পান্থশালা, তৃষ্ণাতুরের তৃপ্তির জন্য জলাশয়, পীড়িতের জন্য চিকিৎসালয়, দুর্ভিক্ষে অন্নমেরু প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবে। যদি স্বার্থসর্ব্বস্ব বিলাসী হও, তবে কি করিবে? বিধাতা যেমন দরিদ্র পরিবারে প্রত্যেককে এক একটি মাত্র উদর দিয়াছেন, তেমনই তোমাকে-ও তাহাই দিয়াছেন, তুমি কোটিপতি বলিয়া তোমাকে পাঁচটি তোমার প্রাণেশ্বরীকে দশটি এবং তোমার বালখিল্যগণকে দ্বাদশ কুটুরীযুক্ত বাইশটি উদর দেন নাই; সুতরাং অর্থব্যয়ের জন্য সেই একমাত্র অন্নই তুমি দ্বাদশ পাত্রের অন্নের মত মূল্যবান্ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমার অন্নের সঙ্গে বহুল পরিমাণে ঘৃত মিশিবে, বাদাম-পেস্তা-জাফরাণ মিশিবে, ব্যঞ্জনে বহু রস মিশ্রিত হইয়া তাহা আর আর আধ্ মাত্রা প্রভৃতি যুক্ত অক্ষরে পরিণত হইবে। পশুর নিকট হইতে দুগ্ধ, দধি, ছানা, মাখম আদায় করিয়াই তৃপ্ত হইবে না; ইতরজীবের শব রসনাপ্রিয় করিবার জন্য তাহাতে টাকা গুলিয়া মিশাইবে। পরিধেয় তখন কেবল লজ্জা ও শীত নিবারণ করিবে না, মনুষ্যের পরিচায়ক ত্বক তখন চক্চকে মলমল ঝক্ঝকে মখমলের ঘেরাটোপের ভিতর লুকাইবে; চরণদ্বয় তখন চলিতে আলস্য বোধ করিবে, পঙ্গু ভিখারীর স্বত্বাধিকারী যেমন তাহাকে একটা কাঠের গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া বেড়ায়, তেমনই তোমায় একটা চক্চকে গাড়ীতে চড়াইয়া ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইবে অথবা ছেলের আদিক্যবশতঃ একটা গাড়ীর গহ্বরে খানিকটা তেল ঢালিয়া তাহাতে চড়িয়া শিঙা বাজাইবে এবং ডায়েবিটীস গাউট লিভার উদরী প্রভৃতির মধ্যে একটা না একটা বাহনে আরোহণ করিয়া নিজে-ও স্বরায় শিঙা ফুঁকিবে। যাত্রাকালে সম্ভবতঃ প্রিয়তমার আগাগোড়া সোনার পতর বাঁধান হাত দুইখানির দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়াও মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে পারিবে না। কৃপণ হইলে তোমার আর-ও বিপদ্। তখন কাহার মুখে দুই মুঠা দিতে পারিবে না নিজে-ও এক মুঠা ভাল করিয়া মুখে তুলিতে পারিবে না, কেবল সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। অধিক সঞ্চয় হওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ; সুতরাং সবই ব্যয়িত হইবে। ব্যয় ব্যাঙ্কে ব্যয় মাটীর ভিতর ব্যয় প্রতারকের নিকট গচ্ছিতে ব্যয় সুদের লোভে ঋণদানে; আসল কথা, তোমার হাতে করিয়া একটি পয়সা খরচ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

ইংরাজ অত্যন্ত ধনবান্ হইয়াছেন, স্তূপের উপর স্তূপ সভার্ণের পাইল করিয়া তুলিতেছেন। আজকাল আমরা যেমন একটা দুর্গোৎসব, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ বা কোন একটা সাধারণ কাযে চাঁদা দিয়া বিবেকের সঙ্গে আপোসে রফা করিয়া নিজের স্বার্থসুখে ডুবিয়া যাই, মাড়োয়ারীরা যেমন পিঁজরাপোলে চাঁদা দিয়া বা ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া বিবেককে বুঝাইয়া শতকরা সাত টাকা হারে হুণ্ডীর সুদ আদায় করেন, ইংরাজও তেমনই হাঁসপাতালে অরফানেজে অন্ধ সৈনিকাশ্রমে বা শিষ্টার্স অফ চ্যারিটির মন্দিরে কিছু কিছু প্রণামী ফেলিয়া দিয়া ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য রক্ষা করতঃ ভোগের সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন। আবিষ্কারের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, তিনটি আবিষ্কার যেন জল্-জল্ করিতেছে। অর্থ উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কার অর্থব্যয়ের পথ আবিষ্কার ও যাহার অর্থ নিজের কোলে টানিয়া আনিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে এবং যাহার দ্বারা আমার অর্থ হরণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাকে নিধন করিবার যন্ত্র আবিষ্কার। এই অর্থ-বাহুল্য ইংরাজকে অত্যন্ত ভোগী করিয়া তুলিয়াছে; বিকারের পিপাসার ন্যায় ভোগের পিপাসারও শান্তি নাই। বিলাস-ভোগ যেমন অর্থপিপাসাকে বাড়াইতেছে, তেমনই নূতন ভোগের ইচ্ছা আবার অর্থপিপাসাকে অধিকতর বাড়াইয়া তুলিতেছে। সমাজরক্ষার জন্য রাজ্য ও রাজনীতি প্রয়োজন; যে সমাজ-প্রাসাদে প্রত্যেক ইষ্টকে স্বার্থ অর্থ ভোগ বিলাস শব্দচতুষ্টয় অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত, সেই সমাজ-রক্ষার জন্য যে রাজনীতি, তাহার অঙ্গব্যবচ্ছেদ করিলেও দেখা যাইবে, তদভ্যন্তরস্থ রক্ত শিরা পেশীর অস্তিত্ব ভোগে, বিলাসে, অর্থে, স্বার্থে।

এই রাজনীতি এ দেশের নয়। ইংরাজই হউন মুসলমানই হউন হিন্দুই হউন, মহাভারতের রাজত্বে যিনি এই নীতিকে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই বিফল-যত্ন হইবেন।

যেমন কোন ধনী জমীদারের প্রাসাদস্থ প্রাঙ্গণমধ্যে বিবিধ প্রয়োজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাটী নির্ম্মিত থাকে, যথা :—বাস-বাটী, স্কুল-বাটী, চিকিৎসা-বাটী, কারখানা-বাড়ী, ঠাকুর-বাড়ী প্রভৃতি, সেইরূপ আমার বোধ হয়, জগদীশ্বর-ও তাঁহার এই পৃথিবীরূপ প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনসাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে গঠন করিয়া রাখিয়াছেন। হয় ত ইংলণ্ড তাঁহার মিস্ত্রীখানা, চীন তাঁহার শিল্পাগার আর এই ভারতবর্ষ জগদীশ্বরপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় বা ঠাকুরবাটী। কেহ যখন কোন দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেবসেবা ও দেবালয়ের খরচের জন্য সাধারণতঃ একটা ভূমিসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; সেই সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন আয়ে দেবতার পূজা-পার্ব্বণ ভোগ-রাগাদির ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় এবং সেবকরা-ও পুরুষপরম্পরাগত ঐ স্থানে বাস করিয়া আপনাদের আহার্য্য ব্যবহার্য্য নিয়মিত প্রাপ্ত হয়েন। যে সেবাইত ঠাকুরসেবা ধানে-চালে বাতাসায় সারিয়া ঐ অর্থ আপনার শান্তিপুরে কাপড়ে পরিবারের চন্দ্রহারে গাড়ীজুড়ী ফেটিংয়ে হোটেলের খানায় রায় বাহাদুরীর বায়নায় বিলিয়ার্ডের কাঠে কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে উড়াইয়া দেন, তাঁহাকে হাইকোর্ট মারফত লোটা হাতে করিয়া পথে বাহির হইতে হয়-ই হয়। যে দেবালয়ে অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত নাই, সে দেবালয় দেবালয়-ই নয়। দরিদ্রের মুখ দিয়াই দেবতা ভোগ গ্রহণ করেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

প্রতীক্ষা

"দরমান্দা ঠাঢ়ো তুম দরবার
দরশন দীজে খোল কিবাড়।"
কবীর।

মন্দিরদ্বারে তব দণ্ডায়মান,
খোলো দ্বার খোলো দ্বার, ডাকি মোরা বারবার,
ভক্তেরে কর দেব দর্শনদান।

কঠোর কাঠের দ্বারে মন্দির পাষাণে
মাথা কুটে মরি মোরা অস্থির পরাণে,
আসিয়াছি বহুদূর, আঁখি বড় তৃষাতুর,
খোল দ্বার করি ঐ রূপসুধা পান।

উবে যায় মৃগমদ নিভে যায় দেউটি,
কোথা হায় পুরোহিত শুনিবে না কেউ কি ?
চন্দন হলো ধুলি, পুড়ে যায় ধূপগুলি,
পুষ্প-তুলসী-ডালি ঝলসিয়া ম্লান।

ক্রমেই বাড়িছে ভিড় বড় তাই ভাবনা
দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু ভিতরেও পাব না,
কেহ যদি নাহি আসে, দয়া তবে কর দাসে,
নিজেই দুয়ার তুমি খোল ভগবান্।

শ্রীকালিদাস রায়

গ্রন্থাগারের কাহিনী

বান্ধব-লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ আজিকার বার্ষিক অধিবেশনে, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করায়, আজি আমি আপনাদিগকে "গ্রন্থাগারের কাহিনী" শুনাইতে আসিয়াছি।

যে স্থানে গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ, তাহাকেই গ্রন্থাগার বলে। গ্রন্থসমূহ বিদ্যার মূল। এই মূলকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যা প্রচারিত ও ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এ হিসাবে, সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা গ্রন্থাগারের গৌরব অধিক; কেন না, বিদ্যালয়ে কেবল ছেলেরাই বিদ্যালাভ করে; কিন্তু গ্রন্থাগারে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিদ্যালাভ করিতে পারেন।

গ্রন্থাগারের কাহিনী অতি বিস্তৃত। বহু সহস্র বৎসর-ব্যাপী ক্রমোন্নতির ফলে, বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি তাহাদের আধুনিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে, গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত সামান্য সামান্য কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, গ্রন্থাগার পরিচালনা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দফাতেই এই ক্রমোন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগারের ইতিহাসের আলোচনায়, আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রাচীন যুগে রাজপ্রাসাদে বা দেব-মন্দিরে গ্রন্থাগার সংরক্ষিত হইত এবং তথায় রাজকীয় দলিল ও কাগজপত্রাদির সহিত, পুরোহিতদিগের প্রয়োজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ এবং জ্যোতিষ-গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে স্থান পাইত। অভিধান, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি ঐ গ্রন্থাগারসমূহে পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক মিনান্ট (Menant) বলেন, "নিনেভে (Nineveh) নামক নগরে আসিরিয়ার অধীশ্বর অসুর-বনি-পালের (Assurbanipal) যে গ্রন্থাগার ছিল, তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল।" কিন্তু সে সময়ের অন্যান্য গ্রন্থাগারেও এ প্রকার নিয়ম ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমানকালে এমন অনেক শ্রেণীর গ্রন্থাগার দেখি, যাহা প্রাচীন সময়ে আদৌ ছিল না। দুই এক শ্রেণীর গ্রন্থাগার, মাত্র দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বহু বিষয়ের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও প্রবর্ত্তনের ফলে, যে নানা সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রাচীনকালে অঙ্কুরস্বরূপ বা অতিবিরল ছিল, অথবা একেবারেই ছিল না।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থাগার কি ধরণে গঠিত হইত, তাহার বিবরণ আমরা ব্যাবিলোনীয় সহর নিপুরে (Nippur) অবস্থিত, গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ হইতে জানিতে পারি।

ব্যাবিলন।

আমেরিকাবাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক হিলপ্রেক্ট (Hilprecht), উক্ত স্থানে ভূ-প্রোথিত অনেকগুলি ঘর আবিষ্কার করেন। এই সমস্ত ঘরে তাকের উপরে সুন্দরভাবে সাজান প্রায় পঁচিশ হাজার মৃত্তিকা-ফলক পাওয়া যায়। সে সময়ে পুঁথির প্রচলন হয় নাই; তখন ব্যাবিলনে পুস্তক-নিহিত বিষয়গুলি মৃত্তিকা-ফলকের উপর ক্ষোদিত হইত। মিষ্টার লেয়ার্ড (Layard) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অসুর-বনি-পালের গ্রন্থাগারে, মৃত্তিকা-ফলকগুলি বিষয় অনুসারে বিভক্ত ছিল এবং সেগুলিতে নানা বিষয়িণী আলোচনা নিবদ্ধ ছিল।

আসিরিয়া।

এইগুলির ভিতরে সংরক্ষিত গ্রন্থসমূহের একখানি সাধারণ তালিকাও ছিল। এই গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাধ্যক্ষ (Librarian) নিযুক্ত হইত। যে সকল পুস্তক লোক অধিক ব্যবহার করিত, সে সকলের স্বতন্ত্র তালিকাও এই গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে। এই তালিকা এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি স্থানের সুপ্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি কি ধরণের হইত, তাহা উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। এখন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গ্রীসীয় গ্রন্থাগার।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব সময়ের গ্রীসীয় গ্রন্থাগারের কথা আমরা খুব কমই জানিতে পারি। সে সময়ে গ্রন্থ-সংগ্রহ-কার্য্য যে খুব একটা ভাল কাজ এবং বিশেষ দরকারী, তাহা সাধারণে মনে করিত না; তবে কোন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন। সর্ব্বপ্রথমে পিসিস্ট্রেটাস্

(Peisistratus) একটি গ্রন্থাগার করিয়া সাধারণকে তাহা ব্যবহার করিতে দেন। সুবিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো (Plato) ও এরিস্টটল (Aristotle) উভয়েরই নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার ছিল। গ্রীসে বা রোমে মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির যুগের পর, যখন টীকা-টিপ্পনীর যুগ আসিল এবং জনসাধারণ অধিকতর বিলাসী হইয়া পড়িল, তখন হইতেই পুস্তকসংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টা প্রবলভাবে আরম্ভ হয়। লুসিয়ানের (Lucian) সময়ে পুস্তক-সংরক্ষণ কার্য্য বিলাসিতার পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। কথিত আছে, গথরা (Goths) এথেন্স নগরী অবরোধ করার পর গ্রীকদের সংগৃহীত সমস্ত পুস্তকই কাড়িয়া লয়; কিন্তু তাহারা সেগুলির মর্ম্ম বা মূল্য না বুঝিয়া, সেগুলির অগ্নি-সৎকারের আয়োজন করিতেছিল। তখন তাহাদের দলস্থ এক বৃদ্ধের পরামর্শে তাহারা এ কার্য্যে নিরস্ত হয়। তিনি বলেন,—গ্রীকরা যত দিন খেলার সামগ্রীর ন্যায় এই সমস্ত পুস্তক লইয়া থাকিবে, তত দিন তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না। তাহাদের পুস্তকগুলি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেই আমাদের সুবিধা হইবে।

গ্রীকজাতির কায়িক শক্তি ও রচনা-শক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুস্তক-সংগ্রহের উন্নতি দেখা যায়। বিলাস-প্রবণ হইয়া পড়ায়, তাহাদের মধ্যে কায়িক শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিলাসের অন্যতম সামগ্রীরূপে পুস্তক-সংগ্রহ-কার্য্যে তাহাদের খুব আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। এই কার্য্যের আর একটি বিশিষ্ট কারণ পাওয়া যায়; সে সময়ে তাহাদের দ্বারা কোন নূতন পুস্তক রচিত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে কেবল সমালোচনার বহরই বাড়িয়া যাইতেছিল। এই সমালোচনার জন্য তাহাদের নানা পুস্তকের প্রয়োজন হইত এবং এই কারণেই পুস্তক-সংগ্রহ-কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে।

আলেকজান্দ্রিয়া।

গ্রীকরাজগণের পুস্তক-সংগ্রহ-চেষ্টার ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার সুবৃহৎ ও বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থাগার দুইটি গঠিত হয়। প্রথম টলেমি অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে দুইটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় টলেমি বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে নানা দেশ হইতে অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থাগার দুইটিকে বর্দ্ধিত করেন। তাহার পর তৃতীয় টলেমির দ্বারা এই গ্রন্থাগার দুইটির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারদ্বয় ঐ সহরের বিভিন্ন দুইটি স্থানে—ব্রুকিয়াম্ (Brucheum) এবং সেরাপিয়ামে (Serapeum) অবস্থিত ছিল। প্রথমটিতে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার এবং দ্বিতীয়টিতে ৭২ হাজার ৮ শত পুঁথি ছিল।

গ্রন্থাগারের জন্য কৌশলের আশ্রয় ও উৎপীড়ন।

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের উন্নতি-সাধনের জন্য টলেমি-বংশীয়রা মধ্যে মধ্যে কৌশলের আশ্রয় লইতেন এবং তাহাতে কাহারও উপর উৎপীড়নও হইত। কোন জাহাজ পুঁথি লইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে উপস্থিত হইলে, তৃতীয় টলেমি উহার অধ্যক্ষের নিকট হইতে জোর করিয়া পুঁথিগুলি লইতেন এবং সেগুলির পরিবর্ত্তে পুঁথিগুলির নকল প্রত্যর্পণ করিতেন। এথেন্সে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন তৃতীয় টলেমি মিশর দেশ হইতে তথায় শস্যাদি প্রেরণ করেন এবং পনের ট্যালেণ্ট (15 talents) অর্থাৎ প্রায় ২২ হাজার ৫ শত টাকা জমা-স্বরূপ রাখিয়া এথেন্স হইতে সফোক্লিস্ (Sophocles), ইস্কাইলাস্ (Aeschylus) ও ইউরিপিডিস্ (Euripides) লিখিত মূলগ্রন্থগুলি নকল করিয়া ফেরৎ দিবার সর্ত্তে আনয়ন করেন। কিন্তু পরে তিনি মূলগুলি ফেরৎ না দিয়া তাহাদের নকল প্রেরণ করেন এবং জমাস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ অম্লানবদনে বাজেয়াপ্ত হইতে দেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তৎকালেও মূলগ্রন্থগুলি রাখিবার জন্য ঐ রাজাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল।

টলেমি রাজাদের অনুকরণে এসিয়ামাইনারের অন্তর্গত পারগেমামের রাজারা পুস্তকসংগ্রহে বিশেষ যত্নবান্ হয়েন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে প্রায় ২ লক্ষ পুঁথি সংগৃহীত হয়। চারিটি বৃহৎ হলে এই গ্রন্থগুলি রক্ষিত হইত। এই দুইটি স্থানে সংরক্ষিত গ্রন্থাগার লইয়া রাজাদের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা চলিত। এক সময়ে পারগেমামের রাজা দ্বিতীয় ইউমিনিস্ (Eumenes II), আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাধ্যক্ষকে নিজের গ্রন্থাগারে নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন এবং এই সংবাদ পাইয়া পঞ্চম টলেমি তাহার গ্রন্থাধ্যক্ষকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইব না—এই সঙ্কল্প গ্রন্থাধ্যক্ষের মনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

পর্য্যন্ত তিনি মুক্তি পায়েন নাই। এক সময়ে টলেমি-রাজবংশীয়দের মধ্যে এক জন পারগেমামের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য মিশরে যত পেপাইরাস্ কাগজ বিক্রয় হইত, সে সমস্তই একচেটিয়া করিয়া ক্রয় করেন। সে জন্য পারগেমামের রাজাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া পার্চ্চমেণ্ট কাগজ আবিষ্কার করিতে হয়। পূর্ব্বে চামড়ার কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখা হইত; এখন এই নব আবিষ্কারের ফলে কাগজের দুই পিঠেই লিখা হইতে লাগিল। পুস্তক সংগ্রহের জন্য রাজাদের এত ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল যে, সুবিধা পাইলেই অনেক সময়ে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির গ্রন্থাগার হস্তগত করিতেন। সেই জন্য কখন কখন সাধারণ লোক মাটীর নীচে তাঁহাদের পুস্তকাদি লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন।

রাজারা কেবল গ্রন্থসংগ্রহ করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই। তাঁহারা বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতগণকে অন্যান্য রাজ্য হইতে আনয়ন করাইয়া, তাঁহাদের হস্তে গ্রন্থসংরক্ষণের ভার অর্পণ করিতেন। পণ্ডিতগণও ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিষয়ানুসারে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন, সুন্দররূপে সেগুলির নকল করাইতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা পুস্তক রচনা ও পুস্তকের টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। স্ক্রীপটোরিয়ামে (অর্থাৎ নকল-খানায়) হাজার হাজার পুঁথির নকল হইত এবং ঐ নকলগুলি নানা দেশে বিক্রয় করা হইত। এই সমস্ত চেষ্টার ফলে আলেক্জান্দ্রিয়া একটি প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বহু দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া তথায় নানা বিষয়ের মীমাংসা ও আলোচনায় সতত‌ই নিযুক্ত থাকিতেন।

জুলিয়াস্ সিজার যখন আলেক্জান্দ্রিয়ার বন্দর জ্বালাইয়া দেন, সেই সময়ে সেখানকার প্রধান গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়া উহার কতকাংশ পুড়িয়া যায়।

পরে এণ্টনি, পারগেমামের পুস্তকসমূহ ব্রুকিয়াম্-গ্রন্থাগারভুক্ত করিয়া ঐ অগ্নিদাহের ক্ষতিপূরণ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অরেলিয়ানের (Aurelian) আক্রমণ সময়ে এই সুন্দর ও সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটি ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ৬৪২ খৃষ্টাব্দে অমরু ও খালিফ ওমারের সৈন্যরা ঐ গ্রন্থাগারটি পোড়াইয়া দেয়; কিন্তু এই কথা সত্য নহে; কারণ, সে সময়ে অমরু ও খালিফ ওমার বর্ত্তমান ছিলেন না। যাহা হউক, এই অগ্নিদাহের ফলে পাঁচ ছয় লক্ষ পুস্তক একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে রোমানজাতি যুদ্ধ-বিগ্রহেই ব্যাপৃত ছিল; শিক্ষাবিষয়ে তাহারা বিশেষ মনোযোগ দিত না। কারথেজ্-ধ্বংসের সময় কৃষিবিষয়ক একখানি পুস্তক ব্যতীত সমস্ত পুস্তকই তাহারা আফ্রিকাদেশীয় সর্দ্দারদিগকে প্রদান করে। এই ঘটনার দ্বারা তাহাদের শিক্ষার প্রতি অনাসক্তি বেশ বুঝা যায়।

রোমানজাতির গ্রন্থাগার।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৬৯ অব্দে পারগেমামের গ্রন্থাধ্যক্ষ কিছুদিনের জন্য রোমে বাস করেন; সেই সময়ে তিনি রোমানদিগকে শিক্ষাবিষয়ে অনুরাগী করিবার চেষ্টা করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৯ অব্দে প্রকৃতপক্ষে রোমে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এসিনিয়াস পলিও (Asinius Pollio), ইলিরিয়ান যুদ্ধের (Battle of Illyria) পর এভেনটাইন (Aventine) পর্ব্বতের উপরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে সিজার একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত পণ্ডিত টেরেনসিয়াস্ ভ্যারোর (Trentius Verro) হস্তে পুস্তক-সংগ্রহ ও পুস্তক-বিন্যাসের ভার অর্পিত হয়। ইহার পর রোম নগরে আরও দুই তিনটি গ্রন্থাগার গঠিত হয়। ১০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত আল্পিয়াস্ ট্রাজানাসের (Ulpius Trajanus) গ্রন্থাগারটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়া উঠে। এই গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলিকে পারগেমাম-গ্রন্থাগারের শৃঙ্খলা অনুসারে সাজান হয়। দুইটি পৃথক্ ঘরে লাটিন ও গ্রীক্ গ্রন্থ রাখা হইত। গ্রন্থাগারের মধ্যস্থানে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ও তাহার চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত স্তম্ভশ্রেণী বিদ্যমান ছিল। এই গ্রন্থাগারেই রোমের রাজকীয় দলিল ও কাগজপত্র রক্ষিত হইত। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোমে ২৮টি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যে ২।১টি ভাল ছিল, নানা স্থান হইতে শিক্ষানুরাগিগণ সে কয়টি গ্রন্থাগারে আসিতেন; এবং তাঁহারা গ্রন্থাগারের স্কোলা (Schola i.e. Conversation hall) বা আলোচনা-গৃহে বসিয়া তাঁহাদের পঠিত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতেন।

গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, অনেকে এগুলিকে বাহ্যাড়ম্বর বা বিলাসের উপকরণ বলিয়া

মনে করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক সেনেকো (Seneca) বলিতেন, প্রয়োজনমত পুস্তক রাখা উচিত; বেশী বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুস্তক-সংগ্রহ করা বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। তাঁহার মতে চিত্রাদি যেমন বিলাসের উপকরণ, বেশী পুস্তকও সেই পর্য্যায়ভুক্ত।

কনষ্টান্টাইন্ দি গ্রেট্ (Contantine the Great) রোম হইতে বাইজানটিয়ামে (Byzantium) তাঁহার রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তিনিই কনষ্টান্টিনোপল নগরটি স্থাপন করেন। গ্রীক্ শিক্ষাবিদগণ তাঁহার নবনির্ম্মিত রাজধানীতে অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধানের ফলে ৭ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গও এই গ্রন্থ সংগ্রহ কার্য্য চালাইয়া যায়েন। আলেক্জান্দ্রিয়া ও এথেন্সের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবনতি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টান্টিনোপলের গ্রন্থাগারের উন্নতি হয়, এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় মঠগুলিতে রক্ষিত পুস্তকের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়। এই সমস্ত মঠে পুঁথিগুলির নকল করান এবং সেই কার্য্যের দ্বারা সাহিত্য-প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করা হইত। পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহে কনষ্টান্টিনোপলের গ্রন্থাগারগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও, উপরি-উক্ত কার্য্যের ফলে প্রাচীন পুঁথি লোপ পায় নাই। গ্রীসের যত প্রাচীন পুঁথি, প্রায় সমস্তই এই নকল লওয়ার জন্য রক্ষা পাইয়াছে। কেবল যে কনষ্টান্টিনোপলের গ্রন্থাগারে পুস্তক রক্ষিত হইত, তাহা নহে, বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত মঠ ছিল, সেগুলিতেও বহু পুঁথি রক্ষিত হইত, এবং সেই সেই স্থানের পুঁথির নকল-কার্য্য সোৎসাহেই চলিত।

মধ্যযুগে য়ুরোপের গ্রন্থাগার।

রেভারেণ্ড কার্লাইল (Rev. Carlyle) ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধানের জন্য নানা স্থানে পর্য্যটন করেন এবং এথস্ পর্ব্বতের (Mount Athos) মঠে ও অন্যান্য বহু মঠে গমন করেন। এই পর্য্যটনের ফলে তিনি জানিতে পারেন যে, এই সমস্ত মঠে প্রায় ১৩ হাজার পুঁথি ছিল;—পুঁথিগুলি ৯ হইতে ১২ শতাব্দীর; এবং সেগুলি ভেলাম (Vellum) নামক কাগজে লিখিত। পুঁথিগুলির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যশোভাও নয়নমনোহর ও ঐগুলির মধ্যে কোন কোনটি সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত এবং মণিমুক্তা-খচিত বন্ধনীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অনেকে বলেন, তুর্কীরা বহু গ্রন্থ নষ্ট করিয়াছে। ইহা কতকটা সত্য বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, তুর্কীরা প্রাচীন পুঁথির ব্যবসা হিসাবে যে একটা মূল্য আছে এবং ইহার কারবার করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে—তাহা জানিত। প্রাচীন পুঁথির জন্য তখন লোক উচ্চমূল্য প্রদানে কাতর হইত না; সেই জন্য তুর্কীরা ব্যবসার খাতিরে ঐ সমস্ত পুস্তক নষ্ট না করিয়া, নানা দেশে চালান করিত।

শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যের সহায়তার জন্য আরবীয়রাও গ্রীক্ জাতির ন্যায় পুস্তক-রক্ষা ও গ্রন্থাগারস্থাপনে যত্নশীল ছিল। তাহারা জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক, গ্রীক্ ও লাটিন পুঁথি রক্ষা করিত। সুবিখ্যাত হারুণ-অল্-রশিদ (Harun-al-Rashid) এবং তাঁহার পুত্র, শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সন্নিকটে রাখিতেন। তাঁহারা পুস্তক সংগ্রহ করিতেন, এমন কি, বিজিত জাতিসমূহের নিকট হইতে রাজকর হিসাবে অর্থের পরিবর্ত্তে পুস্তক গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বাসোরা, কর্ডোভা ও বাগদাদে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় কাইরো একটি বৃহৎ শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। তথায় ফতিমিদ (Fatimid) বংশীয়দের গ্রন্থাগারে লক্ষ পুস্তক ছিল। তুর্কগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর তাঁহারা পুনরায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, এবং সেই গ্রন্থাগারে ১ লক্ষ ২০ হাজার পুস্তক সংরক্ষিত হয়। ত্রিপলীতে এবং দ্বিতীয়বার আলেক্জান্দ্রিয়ায় পুস্তকাগার স্থাপিত হইবার কথাও শুনা যায়।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে স্পেনে অল্-হকীম (Al-Hakim) নামে এক জন বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত আরবীয় ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি কর্ডোভা নগরে একটি শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তিনি লোক দ্বারা বহু গ্রীক পুঁথি সংগ্রহ করাইতেন, এবং ৩ শত বেতনভোগী নকলনবিশ নিযুক্ত করিয়া ঐ সমস্ত সংগৃহীত গ্রীক্ পুঁথি আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করাইতেন। কর্ডোভার গ্রন্থাগারে ৬ লক্ষ পুঁথি ছিল বলিয়া শুনা যায়। আরবীয়দের অনেকগুলি গ্রন্থাগার ছিল, এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরব-অধিকৃত স্পেন, য়ুরোপের মধ্যে একটি প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রন্থাগারের অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রন্থ-সংরক্ষণ। ব্যাবিলন, এসিরিয়া, মিশর প্রভৃতি স্থানে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় তিন হাজার বৎসর হইতেই গ্রন্থাগারের বিবরণ পাই।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার

কিন্তু সেই সুপ্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করা হইত। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে লিপির প্রচলন হয়। লিপির ব্যবহার আরম্ভ হইলেও, লিপির সাহায্যে পুঁথি-লেখা অনেক পরে আরম্ভ হয়। সুতরাং যে সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ আজকাল মুদ্রিতাকারে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি পুরুষানুক্রমে পুরোহিত বা পণ্ডিতবর্গের স্মৃতি-ভাণ্ডারে রক্ষিত থাকিত। অপরাপর দেশে বংশপরম্পরায় অনেক গান, গাথা, বা ঐতিহাসিক বিবৃতি এইরূপে চলিয়া আসিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষে যে ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। ধর্ম্মাদি বন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ভারতে প্রাচীনকালে যেরূপ আগ্রহ ও শৃঙ্খলার সহিত ব্রাহ্মণাদি-সংবলিত ঋগ্বেদ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি কণ্ঠস্থ করা হইত, এবং এখন পর্য্যন্ত ভারতের বহুস্থানে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা অন্য কোথাও দেখা যায় না। তখন এক জন পুরোহিত বা পণ্ডিতের স্মৃতি-ভাণ্ডার এক একটি গ্রন্থাগারস্বরূপ ছিল। এই সংরক্ষণী শক্তির সাহায্যেই লিপিপ্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থ কালকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ লিপি-প্রচলনের যুগে, তক্ষশীলা বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। লিপির ব্যবহার আরম্ভ হইলেও, তখনকার পণ্ডিতবৃন্দ তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। লিখিবার সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পুঁথি লিখিয়া রাখা অপেক্ষা পুঁথির বিষয় স্মৃতি-ভাণ্ডারে রক্ষা করা তাঁহারা পছন্দ করিতেন, এবং শিষ্য-পরম্পরাক্রমে যাহাতে পুঁথির অন্তর্গত বিষয়গুলি সঠিক থাকে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। গ্রন্থ লিখিবার জন্য লিপির ব্যবহার অনেক পরে হইয়াছে। বৌদ্ধ জাতক পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তক্ষশীলা হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বারাণসীতে গমন করিয়া শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিতেন, এবং শিক্ষাদানকালে ও আলোচনার সময়

বৌদ্ধ যুগ

সুন্দর বাঁধাই-করা পুঁথি ব্যবহার করিতেন। গ্রন্থাগারস্থাপনে বৌদ্ধদিগের বিশেষ চেষ্টা ছিল, এবং ইহারই ফলে নালন্দা প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারগুলি অতুলনীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। খোটানের নিকটস্থ গোসিঙ্গ বিহার হইতে যে পুঁথিখানি পাওয়া যায়, তাহা অতি প্রাচীন। খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে উহা গান্ধারে লিখিত হইয়াছিল। তক্ষশীলার মত সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে গ্রন্থাগার থাকার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই না বটে, কিন্তু উপরিলিখিত পারিপার্শ্বিক প্রমাণ আলোচনা করিলে ঐ স্থানে গ্রন্থাগার থাকা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। অন্য অনেক প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথা বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের যুগে ধর্ম্মপ্রচারের সহিত শিক্ষা-প্রচার কার্য্যও চলিয়াছিল। বৌদ্ধ মঠগুলির প্রাচুর্য্যের উল্লেখ অনাবশ্যক। শিক্ষাদান এই সমস্ত মঠের একটি প্রধান কার্য্য ছিল। নালন্দার

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার এই মঠগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার অল্প সময়ের মধ্যে গঠিত হয় নাই; বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ইহার সংগঠন ও পুষ্টিসাধন-কার্য্য চলিয়াছিল,—তাহার ফলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই বিদেশীয়রা নালন্দাকে শিক্ষালাভের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া, বহুদূর ও বিপৎ-সঙ্কুল পথের বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও এই স্থানে আগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ান, সাং, ফাহিয়ান, ইৎসিং প্রভৃতি এই নালন্দায় শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কেবল শিক্ষালাভ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন নাই, পরন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে এই স্থান হইতে বহু যত্নে বহু পুঁথির নকল লইয়া যায়েন, এবং দেশে যাইয়া সেগুলি নিজ নিজ মাতৃভাষায় অনুদিত করেন। কথিত আছে, হিয়ান সাং ২০টি অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া এই স্থান হইতে ৬ শত ৭৫ খানি পুঁথি লইয়া যায়েন। এইরূপে ফাহিয়ান্ এবং ইৎসিংও কিছু কিছু পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থ ভারতীয় ও

চৈনিক পণ্ডিতের সমবায়ে বহুবার অনূদিত হইয়াছে, এবং নানা নরপতি কর্ত্তৃক সেগুলির তালিকা প্রস্তুত ও তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সুদূর চীনদেশে রক্ষিত ও অনূদিত সেই সমস্ত পুঁথির সাহায্যে ভারতের লুপ্ত ও অজ্ঞাত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে।

নালন্দায় "রত্নোদধি" নামে একটি নয়তলবিশিষ্ট প্রাসাদ ছিল; তথায় সমস্ত সংগৃহীত পুঁথি রক্ষিত হইত। এই গ্রন্থাগারে কেবল যে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুঁথিই থাকিত, তাহা নহে, সাহিত্য, ব্যাকরণ, বৈদ্যক, জ্যোতিষ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের পুঁথিও তথায় ছিল। শুনা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে কতকগুলি বৌদ্ধদ্বেষী সন্ন্যাসী এই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগারে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক উহার অমূল্য পুঁথিগুলি ভস্মীভূত করে।

নালন্দার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মগধে পালবংশীয় নরপতিগণের সাহায্যে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলায় আর দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ওদন্তপুরীতে বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় উভয় প্রকার পুঁথিই রক্ষিত হইত। তিব্বতের অনেক গ্রন্থাগার ইহার অনুকরণে গঠিত হয়। ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজির সৈন্যাধ্যক্ষ ওদন্তপুরীর গ্রন্থাগারে অগ্নি প্রদান করিয়া ইহার ধ্বংসসাধন করে। বৌদ্ধভিক্ষুগণ মুসলমানগণের হস্ত হইতে গ্রন্থাগারগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন ও অবশেষে এই চেষ্টা নিষ্ফল হইলে, নেপালরাজ্যে পলায়ন করিয়া অনেক গ্রন্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন।

*ভারতের বহু নরপতি গ্রন্থসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন, এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেন।

• ভোজরাজ প্রভৃতির গ্রন্থাগার

একাদশ শতাব্দীতে •ধাররাজ্যের ভোজরাজ পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার গ্রন্থাগারের উল্লেখ দেখিতে পাই। চালুক্যরাজ জয়সিংহ মালবপ্রদেশ জয় করিবার পর গ্রন্থাগারটি অনহিলপত্তনে লইয়া গিয়া চালুক্যবংশীয় রাজাদের গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজাপুরে দ্বাদশ শতাব্দীতে একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল প্রস্তর-নির্ম্মিত বিদ্যামন্দির চালুক্য রাজগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। চালুক্যরাজগণের "ভারতীভাণ্ডার" নামক গ্রন্থাগারটিও উল্লেখযোগ্য। রাজকীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তাঞ্জোর, নেপাল, কাশ্মীর, মহীশূর, বরদা ও রাজপুতানার কয়েকটি রাজন্যের গ্রন্থাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অম্বররাজ জয়সিংহ শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাস্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তিনি জয়পুরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার কোন বংশধর মূল্যবান্ গ্রন্থগুলির মর্ম্ম না বুঝিয়া, উহার কতকগুলি হস্তান্তরিত করেন। এখনও জয়পুরের এই গ্রন্থশালায় কতক কতক মূল্যবান্ সংস্কৃত, আরবী ও পারশী পুঁথি পাওয়া যায়।

জয়পুর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যোধপুর, বিকানীর ও আলোয়ার নরপতিগণের পুস্তকাগারে প্রায় ২ হাজার করিয়া পুঁথি ছিল, এখন এগুলির সংখ্যা বোধ হয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। কাশ্মীর রাজগণ প্রাচীন পুঁথির আদর করিতেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে পুঁথি সংগ্রহে যত্নবান্ হইতেন।

যোধপুর ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব-বিৎ ডাক্তার বুলার (Buhler) যখন কাশীতে পুঁথির

কাশ্মীর।

বিজাপুর পুস্তকাগারের ভগ্নাবশেষ।

অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি জানিতে পারেন, কাশ্মীরের রাজা পুঁথি সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে পণ্ডিত ও সংগ্রহকারী নিযুক্ত করিয়া বহু মূল্যে তাঁহাদের সংগৃহীত পুঁথি ক্রয় করেন।

নেপালের দরবার লাইব্রেরী।

ভারতের মধ্যে নেপালের "দরবার লাইব্রেরী"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গুপ্ত রাজবংশের সমসাময়িক পুঁথি তথায় রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থাগারে তালপত্রে লিখিত পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। তাঞ্জোরের গ্রন্থাগারটিই ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তথায় অনেক ভাল ভাল পুঁথি রক্ষিত আছে। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থাগারের গঠন আরম্ভ হয়।

তাঞ্জোর।

ইহাতে দেবনাগরী, তেলেগু, কন্নাদ, গ্রন্থি, মলয়ালম ইত্যাদি নানা অক্ষরে লিখিত নানা ভাষার পুঁথি আছে। বার্ণেলের (Burnell) মতে এই গ্রন্থাগারের মূল্য সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার কম নহে। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

* কলিকাতা বান্ধব-লাইব্রেরীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

চণ্ডিদাস

তুমি বুঝেছিলে—
তরঙ্গিত বক্ষবাণে করুণা ক্ষরিলে
বিশ্বের মরমতট করিয়া প্লাবন
বহাইলে অশ্রুধারে প্রেম প্রস্রবণ। •
চির যুগ-যুগান্তের আনন্দ বাহিনী
মর্ত্ত্যবাণী ক'য়ে গেল অমৃত কাহিনী।
একদা নীরব সাঁঝে দেখেছিলে তুমি,
নিখিলের সারা হিয়া কোন স্বপ্ন চুমি'
ফুটে উঠেছিল ওই আকুল আকাশে
মর্ম্মরিত বসন্তের ব্যাকুল বাতাসে;
উচ্ছ্বসি উঠিয়াছিল কোন নীরবতা।
চির জন্মজন্মান্তের সেই আকুলতা
বিহ্বল করিল তব নন্দিত পরাণ
আনন্দ উদ্বেলকণ্ঠে গেয়েছিল গান
সে চেতনা। ঋণ কিছু রাখিলে না বাকী
অনন্ত তমিস্র কালে তাই দিয়ে ফাঁকী
ফুটিয়া উঠিল ওই চিরোজ্জ্বল শিখা
আনন্দের চিরন্তনী বক্ষোমাঝে লিখা।
হে কবি প্রেমিক, আজ তোমার সঙ্গীতে
স্বপন-নন্দনে তব বহে তরঙ্গিতে
অমৃত-মদিরা মাখা যে মাধুরী ধারা
নিখিলের অশ্রুনীরে আজি পথহারা
সে প্রেম অলকনন্দা;—মিলি তার সনে
বিশ্বব্যথা-মন্দাকিনী রচিতেছে মনে
অপূর্ব্ব সঙ্গমতীর্থ। যুগ যুগ ধরি'
সমস্ত চেতনা তাহে ডুবিছে শিহরি।
হে মহান্ কবি, তুমি তারে দিলে বাণী
অন্তরের অন্ত হ'তে নিয়ে এলে টানি
বিশ্বের মরমলীনা যে গোপন কথা
হৃদয় শয়ানে ছিল অশ্রুভারনতা
একান্তে পড়িয়া; ওই মর্ম্মব্যথা নিয়া
উন্মুখ অধরে তার দিলে কি অমিয়া!
চিরগীতিভরা তব আনন্দ-নির্ঝর
চির বিরহের মাঝে বহে ঝর ঝর;
তাই আজি নিশিদিন নিখিলের বুকে
চির বাধা পায় প্রাণ অপরূপ সুখে।
সে চির সুন্দর শ্যাম মিলনের মাঝে
মরমের মর্ম্মবাণী কেঁদে কেঁদে বাজে;
তোমার সে কবি হিয়া তারি মাঝে হারা
আপনারে নিঃশেষিয়া ঢালে রসধারা।
আনন্দের যে দীপালী জ্বালাইলে তুমি
আজো তাহা জ্বলিতেছে আঁধারেরে চুমি'
উঠিতেছে উর্দ্ধশিখা অনন্তের পানে
বিরহ কল্লোলভরা জীবনের গানে।
বুকে বুকে অভিসার যুগ যুগ ধরি'
বাজিছে তোমার বীণা তারি হিয়া ভরি'।
ছন্দ বর্ণ গন্ধভরা রচিয়াছ গান
পরিপূর্ণ চেতনার সহজ নির্ব্বাণ।

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অকূলের তরী দুইখানা ঈর্ষাদ্বন্দ্বে মাতিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া কূলের দিকে চলিয়াছে। কর্ণধার দুই জন বাচ্ খেলিতেছেন। উভয়েই সমান শক্তিশালী, তাঁহাদের সুদক্ষ চালনায় উভয় তরীই সমান বেগে ধাবিত। একখানা যদি বা ক্ষণতরে অগ্রসর হইয়া যায়, অন্যখানা তৎক্ষণাৎ তীরবেগে তাহার পার্শ্বদেশ অধিকার করিয়া লয়। রহস্যময় নিয়তির এ কি খেলা! এ খেলার শেষ কোথায়,—জয়-পরাজয় কখন্ এবং কিরূপে,—দর্শক আমি উচ্চ চূড়ায় বসিয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে নির্নিমেষ কৌতুকব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহাই লক্ষ্য করিতেছি।

শরৎকুমার বন্দী হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক জানেন এবং বিজন রায়ের কর্ম্মচক্রও যে তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহারও ইঙ্গিত তিনি পাইয়াছেন। বিজন সত্যই এখন গুপ্তদলের গোয়েন্দা। তবে এই সত্য হইতে পাঠক যদি সাব্যস্ত করিয়া বসেন যে, একান্ত স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যই এই ঘটনামূলে নিহিত, তাহা হইলে শরৎকুমারের ন্যায় তিনিও ভুল করিবেন। প্রকৃতপক্ষে সে অতদূর হীনপ্রকৃতির লোক নহে! দেশব্রত যে গ্রহণ করে—তাহার মধ্যে উচ্চভাব যে কতক পরিমাণে থাকিবেই, ইহা ধরা কথা। কিন্তু অবস্থাচক্রে শেষ রক্ষা করিতে না পারিলেই এ ভাব ক্রমশঃ প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি-পঙ্কিলতায় মিশিয়া যায়। মানুষ সাধারণতঃ ভাল-মন্দের মিশ্রণ। অসাধারণ যাহারা, তাহারাই মাত্র অবস্থার নিগ্রহ বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া আপন আপন ভাগ্য রচনায়--দেব বা দানব শক্তির প্রকাশে বিশ্ব-সংসারকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিয়া তুলে।

পূর্ব্বকথিত নির্দ্ধারিত ডাকাতির দিনের কয়েক দিন পূর্ব্বে জঙ্গল মধ্যে সেবাধারীদিগের কমিটী বসিয়াছিল। দলপতি আসেন নাই; সন্তোষও নাই—অন্য সকলে মিলিয়া বিজনকুমারের হাতে একটা বন্দুক তুলিয়া দিয়া এ কার্য্যে তাহাকেই সর্দ্দাররূপে নির্ব্বাচিত করিল। সহব্রতীদিগের জয়োল্লাস-হুঙ্কারের মধ্যে অভিনন্দিত সমাদরে তাহার মনেও তখন জয়মত্ততা জাগিয়া উঠিল। পরে মন্দির ত্যাগ করিয়া সমিতির নিয়মানুসারে সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক যখন একাকী সে বিজন পথ ধরিল---তখন চিন্তা করিবার অবসর লাভে এ কার্য্যের ভীষণতা তাহার মনের স্তরে স্তরে প্রবেশলাভ করিয়া তাহাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলিল।

মনের ইচ্ছা, আমরা স্বাধীন জাতি হইব; অসভ্য জাপান, চীন দস্তুরমত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—আর সুসভ্য আর্য্যজাতি আমরা এখনও পদানত আছি? হায় রে! কিন্তু এই মনুষ্যোচিত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অর্থাৎ আমাদের মুক্তির পথে যে অগ্নিপরীক্ষা-- তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে বলসঞ্চয়ের উদ্যম ও অধ্যবসায়শক্তি, আমাদের কয় জনের মনে এবং কতটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে? উত্তরে শুনিতে পাই, জাগিয়া উঠিয়াছে বই কি; খুব বেশী পরিমাণেই জাগিয়া উঠিয়াছে; মোহনিদ্রা-অবসানে ভারতের এ যে জাগরণের কাল।

এই বাক্যসুধাপানে হৃদয় যখন আনন্দমত্ত হইয়া উঠে, তখন ঈর্ষা-কাতর দুর্ম্মুখ যুক্তিবাগীশ মহাশয় মনের দরজায় উঁকি মারিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া উঠেন,—"অত আনন্দ ভাল নয় গো, ভাল নয়! ভারতের নিদ্রা যদি বা ভাঙ্গিয়া থাকে, বলিতে পারি না,—কিন্তু তাহার মোহের অবস্থা যে সমানই আছে, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। আলস্য, মূর্খতা, বৃথা গর্ব্ব, স্বার্থদ্বন্দ্ব প্রভৃতি সাড়ে ষোল আনা মোহে ভারত এখনো ভরপুর আচ্ছন্ন, জাগরণ যদি তাহার হইয়া থাকে ত স্বপ্নের মধ্যেই হইয়াছে, প্রকৃত জাগরণ এ নয়। অতএব ইহাতে এত আনন্দ বা গর্ব্ব বোধ করিবার কারণ ত দেখিতেছি না।

মর্ম্মাহত হইয়াও দুর্ম্মুখ মহাশয়ের কথা ত অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বস্তুতঃই আমাদের অবস্থা এমনই প্রতিকূল যে, দেশের বড় বড় সেনাপতি-গুরুদিগের দৃঢ় আশা সঙ্কল্পও যখন স্বপ্নের মধ্যে রচিত হইয়া স্বপ্নেই বিলীন হইয়া পড়িতেছে, তখন স্বল্পবুদ্ধি বালক চেলাদিগের কি কথা!

এই উপন্যাস যখনকার ইতিহাস, বিদেশী পণ্যবর্জ্জনেই তখন স্বদেশী যুগের আরম্ভ। কর্জ্জন-নীতির বিরুদ্ধে লড়িবার পক্ষে দেশের মাতব্বর রাজনৈতিকগণ ইহাই মহা অস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কিন্তু দেশ-মঙ্গলকামী দুঃসাহসী বালকের দল ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। পক্ষপাতময় শাসন-নীতির মূল উৎপাটন সংকল্পে তাহারা গুপ্ত বিদ্রোহিতার আয়োজন আরম্ভ করিল। এ সময় মাথা ঠিক রাখিয়া কায করা নেতৃগণের পক্ষেও সম্ভব হইয়া উঠে নাই,—যুবকদল যে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু ইহার ফলে বিপদগ্রস্ত হইল,—রাজ্যের লোকেই, রাজ-সিংহাসন যেমন অটল ছিল, তেমনই অটল রহিল। ছেলেরা এক পক্ষে বিলাতী দ্রব্যের নির্ব্বাসন সংকল্পে ক্ষুদ্র-প্রাণী দেশের দোকানদারদের উপর জুলুম আরম্ভ করিল; অন্য পক্ষে বিদ্রোহিগণ দেশকে জাগাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে অনাচারকেও যেন অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিল না।

বিজন রায়ও প্রথমে বিলাতী জিনিষের ধ্বংসসাধন করিয়া স্বদেশী-জীবন আরম্ভ করে, তবে পিতার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে মুখোস পরিয়াই তাহাকে এ কার্য্য করিতে হইত। পরে এই সূত্রেই মাতৃ-মন্দিরের দলপতিকে সে গুরুরূপে লাভ করে, এবং অজ্ঞানে ক্রমশঃ এমনই ফাঁদে জড়াইয়া পড়ে যে, তখন আর ইচ্ছা করিলেও তাহার সরিয়া পড়িবার উপায় রহিল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার উপরই দীনেশকে গুলী করার ভার পড়িয়াছে। দীনেশ অবশ্য গুরুতর অপরাধী সন্দেহ নাই! শরৎকুমারকে মারিতে পারিবে না; এইরূপ স্পষ্ট জবাবে গুরুকে সে অপমানিত করিয়াছে। কি দুঃসাহস! ঠিকই শাস্তি তাহার হইয়াছে। কেন, ডাক্তারটাকে মারিতে ক্ষতি ছিল কি? সেটাকে মর্ত্ত্য ছাড়া করিতে পারিলেই, ভাল হইত।

বিজন শরৎকুমারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত,—কেন, তাহা পাঠক জানেন।

কিন্তু তবুও? সে তবুওটা কি? দীনেশ যে নিতান্ত বেচারা, তাহাকে গুলী করিতে বিজনের মন নিতান্ত নারাজ। যাহা হউক, সে কাযের এখনও বিলম্ব আছে,—তাহার পূর্ব্বে দীনেশের মন বা গুরুর মত বদলাইতেও পারে। কিংবা বিজনের স্থলে অন্য কেহ এ কার্য্যভার গ্রহণও করিতে পারে। কিন্তু আপাততঃ কাল্‌ই যে ডাকাতির দিন! আর সেই ত সর্দ্দাররূপে নির্ব্বাচিত? অথচ এ কার্য্যের পক্ষে সে একেবারেই অযোগ্য,একেবারেই কাঁচা—ডাকাতি লোকে কি করিয়া করে, সে তাহার কিছুই জানে না। দ্বিতীয়তঃ ধনপতি সিং তাহার পরম বন্ধু—তাহার ধন স্বহস্তে লুটপাট করিবে সে কি করিয়া?

আচ্ছা বেশ, দেশসেবার জন্য তাহাও যেন সে করিল, কিন্তু ইহার পরিণাম? বিজনের মন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল,—ইহার পরিণাম ভাল হইবে না; দেশের পক্ষেও নহে—তাহার নিজের পক্ষেও নহে। কার্য্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেও—এ ঘটনা—এ চক্রান্ত কোন না কোন দিন প্রকাশ হইবেই—আর তখন একাকী ত এ কার্য্যের শাস্তি সে ভোগ করিবে না। তাহার পাপে পিতা-মাতাও বজ্রদণ্ডে আহত হইবেন।

এইরূপ দুশ্চিন্তাজর্জ্জরিত-চিত্তে সে যখন জঙ্গল পার হইয়া মাঠের পথ ধরিল—তখন বেলা যেন সহসা নিভিয়া গেল, দিবসের শেষ রশ্মিটুক গাছের মাথায় খেলিতে খেলিতে শান্ত ছেলের ন্যায় নদীর পারে সহসা ঢলিয়া পড়িল। বিজন রায় হাতের বন্দুকটার উপর ভর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল,—সহসা পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"Good Evening Sir" বিজন চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল,—পুলিসসাহেব। হঠাৎ তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু পুলিস তাহার চেনা লোক, ভয় পাইবার ত কোন কারণ নাই। অবিলম্বে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাস্যমুখেই সে বলিল, "Good evening, Sir." পুলিস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"মাপ করবেন, আপনার প্রতি আমার একটু unplesant duty আছে।" হাতের বন্দুকটা যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে দেন।"

বিজন সবিস্ময়ে কহিল, "আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? জানেন না কি, আমরা লাইসেন্স ধারী?"

উত্তর হইল,—"জানি। কিন্তু আপনি অভিযুক্ত।"

"আমি অভিযুক্ত? আপনি ভুল করেছেন,—আমার পিতা বিষাদপুরের—"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনার পিতা স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁর নির্দ্দেশমতই আপনাকে ধরতে এসেছি; তাঁর কাছেই নিয়ে যাব।"

দারুণ অভিমানে ক্রোধে বিজন রায়ের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—পিতা জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিলেন! বিনা বাক্যব্যয়ে সে তখন পুলিসসাহেবের সহবর্ত্তী হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। বিদ্রোহী দলের অনুসন্ধান অভিপ্রায়েই পুলিসসাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুজন রায় তখন এ দিকে আসিয়াছিলেন। কপালজোরে জঙ্গল সীমানার কাছাকাছি রাস্তার উপর খোলা ফেটীন গাড়ী পৌঁছিবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, কে এক জন বন্দুক হাতে লইয়া জঙ্গল হইতে মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। বমাল আসামী গ্রেপ্তারের আশায় তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রায় বাহাদুর বিষাদপুরের এক জন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট; পুলিসকে হুকুম দিবার তাঁহার অধিকার আছে; তাঁহার আজ্ঞায় পুলিসসাহেব বিজন রায়কে নিকটে আনিয়া হাজির করিল। বিজনকে দেখিয়াত তাঁহার চক্ষু স্থির! এ কি সর্ব্বনাশ! কাহাকে ধরাইতে গিয়া এ কাহাকে ধরাইয়া দিলেন! তিনি একটুখানি দম লইয়া কম্পিত শুষ্ক-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তুই যে এখানে?"

মনে করিয়াছিলেন, উত্তরে সে কৈফিয়েৎস্বরূপ বলিবে, বেড়াতে এসেছিলুম—বা পাখী শীকারে এসেছিলুম—এই রকম একটা কিছু সাফাই বাক্য। কিন্তু যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লোক অসঙ্কোচে খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি মহাকাণ্ড করিয়া বসে, সেই ভাবের আবেগে, বিজনের মন তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বিকারগ্রস্ত। আর সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে চাপা দিয়া কেবল প্রতিশোধস্পৃহা—পিতাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা তাহার মনকে তখন অধিকার করিয়া বসিয়াছে; সুজন রায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে নিশ্পরোয়া ভাবে সাফ্ জবাব দিল—

"এসেছিলুম—পরামর্শসভায়।"

সুজন রায়ের মাথা ঘুরিয়া উঠিল—তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি বলছিস তুই?"

উত্তর হইল—"ঠিক কথাই বলছি।"

সুজনের আর কোন কথা যোগাইল না—পুলিস-সাহেব একটু হাসিয়া বলিল—"কিসের পরামর্শসভা? ডাকাতির পরামর্শ নাকি? বনজঙ্গল ত ডাকাতদেরই আড্ডা।"

বিজন বলিল—"আপনি কি মনে করেন, সে কাজ আমাদের পক্ষে এমনি অসম্ভব?"

"মোটেই তা মনে করিনে, আজকাল ভদ্রলোক ডাকাতদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা। আপনি তা হ'লে একজন বিদ্রোহী?"

বিজন গম্ভীরভাবে বলিল—"নিশ্চয়ই। চিরদিন কি আমরা আপনাদের পদানত হয়ে থাকব নাকি? মনেও করবেন না তা।"

বিজনের মুখে এইরূপ স্বীকারোক্তি পুলিসসাহেবের স্বপ্নেরও অগোচর, তাহার বিস্ময়নির্ব্বাক কণ্ঠ হইতে শুধু ধ্বনিত হইল "হুম্!"

সুজন রায় ব্যাকুলভাবে এতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা সাহেব,—মিথ্যা বলছে ও! আমাকে জব্দ করার জন্য ও কথা বলছে।"

পুলিসসাহেব প্রকৃতিস্থভাবেই অতঃপর বলিলেন, "আপনাদের ঝগড়া ত আমরা মেটাতে পারব না, এই স্বীকারোক্তির পর এঁকে থানায় নিয়ে যেতে আমরা বাধ্য, সেখান থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এঁকে নিয়ে যেতে হবে।"

গাড়ীর উপর কোচমানের পার্শ্বে এক জন কনষ্টেবল বসিয়া ছিল, প্রভুর আজ্ঞায় সে নামিয়া দাঁড়াইবামাত্র বিজন বলিলেন, "জোরজবরদস্তি কিছুই করতে হবে না, চল, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।"

* * * *

সুজন রায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া দুঃখ নিবেদন

করিলেন। বিদ্রোহী দলের নেতা অতুল রায়ই যে সুজনের সর্ব্বনাশসঙ্কল্পে তাহার ইংরাজভক্ত সাধু সজ্জন ছেলেটিকে গুপ্ত উত্তেজনা প্ররোচনার দ্বারাই দলে টানিয়া লইয়াছেন,—নানারূপ বাগবিন্যাসে এই কথা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। ভক্তের স্তুতি-মিনতি এবং অশ্রুধারায় ম্যাজিষ্ট্রেটের মন গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মা ভৈঃ বৎস মা ভৈঃ! তোমার ছেলে রাজসাক্ষী হ'ক—আর কোন ভয় নাই।"

পিতা বলিলেন, "তাই বল সাহেব, তুমি তাকে বুঝিয়ে বল। তার মেজাজটা কিছু দিন থেকে আমার প্রতি চটে রয়েছে, আমি কিছু বলব না, তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে।"

যথাসময়ে পুলিস বিজনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আনিয়া হাজির করিল। তখন তাহার রাগ অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে—চিন্তা করিবার শক্তিও ফিরিয়াছে। সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মুক্তকণ্ঠ হইয়া সে ভাল করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাজসাক্ষী হবে?

উত্তর হইল—"না।"

"তুমি বিদ্রোহী?"

"না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝাইয়া বলিলেন—"আগেই তুমি স্বীকার করেছ, এখন এরূপ অস্বীকারে ত কোন ফল নেই। যদি মুক্তকণ্ঠে সব কথা এখন প্রকাশ কর—তবেই আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারি।"

বিজনের মন কিন্তু এ কথা মানিল না, সমস্ত সহকর্ম্মীদিগকে বলিদান দিয়া আত্মরক্ষা করিতে তাহার সর্ব্বান্তঃকরণ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, সে মৌন হইয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও কিছুক্ষণ বুঝাইয়া অবশেষে তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, দুই দিন তোমাকে সময় দিলাম, এ বিষয়ে চিন্তা কর। দুদিনে নিশ্চয়ই তোমার বুদ্ধি সাফ্ হয়ে যাবে।"

তাহার পর গোপনে পুলিসসাহেবকে কি বলিলেন, বিজনকে তিনি হাজতে লইয়া গেলেন।

বেশী কিছু বলা বাহুল্য—দুই দিনে তাহার মনের বল একেবারে তাহাকে ত্যাগ করিল, শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৃতীয় দিনে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার করিল। তবুও যথাসাধ্য দলের লোককে বাঁচাইয়া কবুল করিল। ডাকাতির কথা আগেই বলিয়া ফেলিয়াছিল, তবুও স্বদলকে পলায়নে অবসর দিবার সংকল্পে পুলিসদলকে দিব্য ঘুরপাক দিয়া জঙ্গলের রাস্তায় যখন আনিয়া ফেলিল, তাহার পূর্ব্বেই ধনপতির গাড়ী দুইখানা চলিয়া গিয়াছে। পুলিসসাহেব কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়াই রাস্তায় গাড়ী চলিবার শব্দ শুনিয়া সন্দিহান হইয়া ভাবিলেন—হয় ত বা ডাকাতরাই লুঠপাট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি তাহাদের অনুগমন করিবার ইচ্ছায় বিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শব্দ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে?" বিজন অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দিক্ জানাইয়া দিল। তিনি দারোগাকে দলবলসহ সেইখানে রাখিয়া বিজনের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া সেই শব্দলক্ষ্যে গাড়ী চালাইয়া দিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় বিজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ পথ ধরিলে শীঘ্র গাড়ী ধরিতে পারিবেন? বিজন গাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল—শরৎকুমার তাহাই দেখিয়াছিলেন। বিজন কিন্তু সোজা পথ দেখাইয়া দেয় নাই—তাই রাস্তার মধ্যে পুলিসসাহেব ধনপতির গাড়ী ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া আদালতের কাছে খাজনা জমা দিবার স্থানে আসিয়া ধনপতির গাড়ী দুইখানা এবং সঙ্গের লোকজনকে দেখিতে পাইলেন—। অনাদি ও বসন্তের প্রসাদে তাহারা নিরাপদেই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহাদের প্রশ্ন করিয়া শুনিলেন—পুলিসকৃপাতেই ডাকাতের হাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছে।

পুলিসই তাহাদের রক্ষা করিয়াছে—শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথাকার পুলিস? কোতোয়ালির—না থানার?"

এই দুই পুলিসের পার্থক্য ধনপতির লোকজনের মাথায় প্রবেশ করিল না,—দরোয়ান বলিল, "হাঁ হাঁ হুজুর—কোতোয়ালিই থানা-ঠিক—বড়া হুঁসিয়ার দারোগা—ও লোক!"

সরকার বলিল, "হুজুর ত পুলিসেরই সাহেব! তারাও নিশ্চয়ই আপনারই তাঁবেদার—বড় বাঁচান বাঁচিয়েছে—হুজুর!"

পুলিসসাহেব আর কিছু না বলিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া বিজনের সহিত পুনরায় জঙ্গলে বিদ্রোহীর আড্ডা দেখিতে চলিলেন।

পরদিন পুলিসসাহেবের সন্দেহভঞ্জন হইল। ধনপতির ধন্যবাদপত্রে নিশ্চয়রূপে তিনি জানিলেন যে, সশরীরে উপস্থিত না থাকিয়াও তিনিই তাহাকে ধনে প্রাণে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, দুই এক দিনের মধ্যে নানা খবরের কাগজে প্রসাদপুর-পুলিসের গৌরবকাহিনী বহু বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইল। ইহার ফলেই যে অচিরাৎ সাহেবের পদোন্নতি হইয়াছিল—সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

পিতৃ-তর্পণ

হে মোর জাগ্রত দেব! হে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা!
স্বর্গ মম, ধর্ম্ম মম, পরম তপস্যা মোর-পিতা!
পিতা মোর, গুরু মোর, শিক্ষক, জনক স্নেহাধার।
তোমাহীন এ জগত আজ কি যে শূন্য কি ঘোর আঁধার।
সমস্ত জীবন মন ঢাকি অন্ধকার ঘন তমসায়
হে চির আলোক-জ্যোতিঃ! দেবতা আমার!
লুকালে কোথায়?
শোক-বিয়োগের ব্যথা করেছে আঘাত ভাঙ্গেনি ত প্রাণ,
বিপুল স্নেহের বর্ম্মে ঢেকে রেখেছিলে মোর ভগবান্।
আদরে শাসনে তব ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরের শত পরিচয়,
আজীবনই পাইয়াছি, শিখায়েছ মিথ্যা হতে মৃত্যু ছোট নয়।
স্বদেশে বেসেছ ভাল সঁপিয়া সকল দেহ-প্রাণ।
অন্যায়ের প্রতিবাদে সংসারে মিলেনি যোগ্যস্থান,
ধনীর দুলালরূপে এসেছিলে অবনীতে প'রে গেছ
দরিদ্রের সাজ।
স্বদেশের মোটানর কত পূর্ব্বে ধরেছিলে, গান্ধিমন্ত্রে মুগ্ধ
যারা আজ।
হাসিয়া করেছে হেলা; আত্মীয়ে করেছে অভিমান,
হে কঠিন সত্যগ্রাহী দূর অতীতের! টলাতে পারেনি
কেহ প্রাণ।
ভূদেবনন্দন তুমি, ভূদেব পিতারেও করিয়াছ জয়,
স্বধর্ম্ম সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষণে পালনে মান নাই স্নেহ-প্রেম ভয়।
ধার্ম্মিকে করেছ রক্ষা বিপন্নজনে করেছ পালন,
পাণ্ডিত্যের সমাদরে পরিপূর্ণ ছিল প্রাণ-মন।
বিদ্যার্থী ফেরেনি কভু, "অন্নার্থী ফেরেনি যেন দ্বারে
অন্নপূর্ণা সেবকের।" এ কথা বলেছ বারে বারে
—পরিজনে, প্রতিদিন। পূজেছ দরিদ্র-নারায়ণ।
হে নিষ্কাম গৃহি-যোগী! ধর্ম্ম ছিল মাথার ভূষণ।
ক্রীড়ানন্দ কর নাই। ঈশ্বরে করেছ ক্রীতদাস,
চিরদিন ধরি; তাই মৃত্যুরে করিয়া উপহাস
চ'লে গেছ দিব্যধামে; হয়ে অমৃতের অধিকারী,
ইচ্ছা-মৃত্যু দেবব্রত সম, ন্যায়-দান-সত্যব্রতধারী।
নিষ্পাপ পুরুষসিংহ! ধর্ম্মবীর ধর্ম্মেতে অটল,
জনমি তোমার অঙ্কে আমাদেরও জনম সফল।
বাৎসল্যের পূর্ণমূর্ত্তি, পিতৃ-বাৎসল্যের অবতার,
পিতৃ-প্রতিবিম্ব তুমি, পিতা চির-আদর্শ তোমার।
তোমারে কি হারায়েছি? না না এ ত' হারাবার নয়,
হে মঙ্গল! স্থিরজ্যোতি! সনাতন! আনন্দ-নিলয়!
তুমি যে অমর, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, পুরুষ-প্রধান!
মৃত্যুর অধীন নহ আর, বিশ্বাত্মার লিপ্ত ভগবান্!
আছ তুমি মনে প্রাণে অন্তরে বাহিরে, রাখিয়াছে মম,
সমস্ত জীবন ভরি, তব পুণ্য-স্মৃতি, শোক দুঃখ তম
অপসৃত করি; স্থিরজ্যোতি জ্যোতিষ্কের মত।
ভীষণ সংসারাবর্ত্তে চিরদিন ধরি দেখাইবে পথ,
এই আজ একান্ত সান্ত্বনা। পূর্ণাত্মার নাহি প্রয়োজন
কোন কিছু; জানি তবু সন্তানের শ্রদ্ধার তর্পণ
ভক্তির এ জলাঞ্জলি, হে পিতা! হে দেবতা আমার!
তোমার চরণোদ্দেশে দানি প্রাণে মোর সান্ত্বনা অপার।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ঘরে-বাহিরে

বিবাহ কি বর্জ্জিত হইবে ?—

প্রতীচ্যে sex-problem বিবাহ-সমস্যা কিরূপ জটিল হইয়া উঠিয়েছে, তাহা তদ্দেশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের মামলার বিবরণ অথবা সামাজিক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি পাঠ করিলে জানা যায়। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ বর্ত্তমানে প্রতীচ্য সভ্যতার মন্দির চূড়া, সুতরাং সেখানকার বিবাহ-ব্যাপারের একটু বিবরণ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মার্কিণের ডেনভার ও চিকাগো নামক স্থানে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিশেষ আদালত আছে। জজ বেন লিণ্ডসে ঐ দুই আদালতের সম্পর্কে বিবাহের ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যার তুলনায় সমালোচনা করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন; বলিয়াছেন,—Marriage has proved to be a failure, বিবাহ অনুষ্ঠানটা এ দেশে ব্যর্থ হইয়াছে। পরন্তু তিনি বলেন, আর কিছুদিনের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান একবারে পরিত্যক্ত হইবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের শত সহস্র মামলার বিচার করিয়া জজ লিণ্ডসে শত সহস্র ঘরের স্বামি-স্ত্রীর কলহ ও মনোমালিন্যের এবং পরস্পর বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাইয়াছেন। গির্জ্জার বেদীর সম্মুখে খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত কত পবিত্র মন্ত্রই না স্বামি-স্ত্রী উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অথচ বিবাহের পর 'বিশ্বাস ও প্রেমের' সেই সব প্রতিশ্রুতি কোথায় অন্তর্ধান করে !

জজ লিণ্ডসে বলেন, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডেনভার সহরে যতগুলি বিবাহ হইয়াছে, ততগুলি ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। আদালত হইতে যে স্থানে ২টি বিবাহের লাইসেন্স লওয়া হইয়াছে, সে স্থানে ১টি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু হইয়াছে। গত ৪ বৎসরে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ যেন সমতুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে স্থানে ৪টি বিবাহ হইলে ১টি বিচ্ছেদ হইত, সে স্থানে এখন ২টি বিবাহে ১টি বিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর চিকাগো সহরে ৩৯ হাজার বিবাহের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ১৩ হাজার বিচ্ছেদ-মামলায় ডিক্রী দিতে হইয়াছিল; ডিক্রী ছাড়া দায়ের করা মামলার সংখ্যাও অনেক ছিল। পরন্তু বিচ্ছেদের (divorce) মামলা হইতে ছাড়াছাড়ির (separation) মামলা পৃথক। আর একটা কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার এই যে, কয় বৎসর বিবাহের লাইসেন্সের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়েছে। ডেনভারে ১৯২০ খৃঃ মোট ৪ হাজার ১ খানা বিবাহ-লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, আর আজ ১৯২৩ খৃঃ অর্থাৎ মাত্র ৩ বৎসরের মধ্যে উহার সংখ্যা ৩ হাজার ৮ খানায় নামিয়াছে।

জজ লিণ্ডসে এই সংখ্যাহ্রাসের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা economic independence প্রধান ও প্রথম। অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে প্রতীচ্যের নারীরা পুরুষের সমকক্ষরূপে আপন উদরান্নের সংস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন না। স্ত্রীরূপে স্বামীর গলগ্রহ হইয়া থাকা তাঁহারা আত্ম-সম্মানের পক্ষে অপমানকর বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাই বিচ্ছেদ ও ছাড়াছাড়ির প্রধান কারণ।

জজ লিণ্ডসে বলেন,—নারীর আর্থিক স্বাধীনতা জিনিষটা মন্দ নহে। পুরুষ ও স্ত্রী যদি নিজ নিজ ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ উপার্জ্জনক্ষম হয়, তাহা হইলে জগতের অনেক দুঃখ ঘুচে। কিন্তু ইহার ফলে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহিত জীবনে এমন একটা বিসদৃশ অবস্থা আনিয়া দিতেছে, যাহাতে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছে। সমাজে গ্রাহ্য ব্যবহারিক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে বহু নর-নারী অভিলাষী নহেন; এই হেতু তাঁহারা ঐ ব্যবহারিক বন্ধনের মধ্যে না গিয়া স্ত্রী-পুরুষ একত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছেন। যদি কখনও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একত্র বসবাসের বিষয়ে মতানৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, বিবাহ-বন্ধন না থাকায় আইন-আদালতের সাহায্য না লইয়াই বেশ সহজে, সুবিধা ও সুযোগমত পরস্পর ছাড়াছাড়ি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মার্কিণের হাজার হাজার নরনারী এই ভাবে বাহিরে ঢাকানিনাদ না করিয়া নীরবে পরস্পর ছাড়াছাড়ি করিয়া লইতেছে। তাহাদের

নিজের সমাজে অর্থাৎ যে সমাজে নরনারী বিবাহ-বন্ধন দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, সেই সমাজে তাহাদের ছাড়াছাড়ির কার্য্য নিন্দনীয় হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু আজ তাহাদের এ সমাজটা ক্ষুদ্র—কাল যখন বড় হইবে, অর্থাৎ বেশী লোক যখন এই স্বাবলম্বনের হিড়িকে বিবাহের ফাঁদে গলা না দিয়া অবিবাহিত অথচ স্ত্রী-পুরুষের মিলন-প্রয়াসী সমাজের দল পুষ্ট করিবে, তখন জগতের অবস্থা কি হইবে?

কি হইবে, তাহা কি জজ লিণ্ডসে জানেন না? সংযম ও বন্ধন শিথিল হইলেই কর্ত্তব্য-নীতি শিথিল হইয়া পড়িবে। জজ লিণ্ডসে বিবাহ-সংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি গৃহ ও সংসারের এবং বিবাহের অনুরূপ সুন্দর অবস্থা খুঁজিয়া পায়েন নাই। কিন্তু তিনি যাহাই ভাবুন, মার্কিণের বড় বড় শক্তিশালী পত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে,—বিবাহ অনুষ্ঠান বিফল হইয়াছে। ক্যানসাসের 'ডেলি ক্যাপিটাল' বলিয়াছেন,—"বিবাহ ও সংসার,—এই ২টি কথাতেই এমন একটা স্থানের নাম মনে পড়ে, যে স্থানে সন্তানসন্ততির জন্ম ও পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুষ্ঠানটি is still in advance of human nature মানুষের প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ অবস্থার বহু পূর্ব্বে দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ মানুষ এখনও বিবাহিত আদর্শ জীবনের সন্ধান পায় নাই, অতএব বিবাহ-অনুষ্ঠান মানব-সমাজের কাম্য হইতে পারে না। যেমন মানুষের প্রকৃতি এখনও শান্তির জন্য প্রস্তুত হয় নাই—এখনও মানুষ হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, যুদ্ধ ভালবাসে, তেমনই মানুষ এখনও ঘর-সংসার ও পুত্র-পরিবারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই—সে সংসার ও পরিবারের বন্ধনের মধ্যে না যাইয়া মানসিক ও দৈহিক আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য আপনার Mate অর্থাৎ 'মনের মানুষ' খুঁজিয়া লয়।"

বিবাহ অনুষ্ঠানের সংস্কার-সাধন করিবার কোনও প্রস্তাবই সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে না। যাহা আছে, তাহাও বিফল হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং যে সকল নরনারী বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রী-পুরুষরূপে একত্র বাস করে, তাহাদের সংস্কার করা এখন কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা প্রথমে যখন স্ত্রী-পুরুষরূপে একত্র বাস করিতে যায়, তখন ভবিষ্যতের কথা ভাবে না —একত্র বাস করাটা একটা পরীক্ষা বলিয়াই মনে করে, সুতরাং মনের মত না হইলেই উহা দূরে বর্জ্জন করে উহাতে তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান থাকে না—একত্রবাসে যে পরস্পর প্রীতি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, শ্রম, বিবেচনা, ধৈর্য্য, সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়, তাহা বুঝিবার বা শিখিবার অবসর হয় না। বিবাহিত জীবনের এ সকল বড় কঠিন পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় সফল না হইলে বিবাহিত জীবন সুখের ও স্থায়ী হয় না। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, বন্ধনহীন কেবল পরীক্ষার বসবাসের জীবন কিরূপ ক্ষণস্থায়ী হয়? যাহাতে বাধ্যবাধকতা নাই—সমাজের নিকট দায়িত্ব নাই, এমন জীবন সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে সুখের না হইয়া দুঃখেরই হয়।

জজ লিণ্ডসে এই সকল কথা ভাবিয়া যদি মানুষ-সংস্কারে মন না দিয়া মানুষকে বিবাহ-সংস্কারে মনোযোগী হইতে উপদেশ দান করেন, তাহা হইলে 'ডেলি ক্যাপিটাল' পত্রের মতে পৃথিবীর উপকারসাধন করা হয়, কেন না 'ডেলি ক্যাপিটালের' ধারণা,—যে জাতির শিশুসন্ততির বসবাসের যোগ্য গৃহ নাই, সে জাতির গৃহ শ্মশান; বিবাহানুষ্ঠান বিফল হওয়াতেই এই শিশু-সন্তানের গৃহের বিলোপসাধন হইতেছে।

লবণের শুল্ক-বৃদ্ধি—

এ দেশে লবণ-শুল্ক দ্বিগুণ হইল, ফলে লবণের মূল্য চড়িয়া যাইবে। ইতোমধ্যে বাজারে নুণের দর চড়িয়াছে। অতি দরিদ্র আর কিছু না পাইলেও কেবল এক নুণ ভাত খাইয়াই জীবন ধারণ করে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কষ্টবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারা লবণের পরিমাণ আহারকালে কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

লবণ যে মানুষের জীবনীশক্তিবৃদ্ধির একটা প্রধান উপকরণ, তাহা বহু চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদই স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ গামপেল 'ভারতে প্লেগ' নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, "লবণের উপর শুল্ক বসাইয়া সরকার দরিদ্র প্রজার দুঃখের ও কষ্টের কারণ হইয়াছেন। এই শুল্কের ফলে দেশে লবণ ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে এবং সেই হেতু দেশে

মহামারীর প্রকোপবৃদ্ধি হইয়াছে।" মিঃ গামপেল লবণ-শুল্ককে পিস্তলের গুলীর সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—সরকার যেন লবণ-শুল্কের পিস্তল প্রজার মাথার উপর ধরিয়া ভয় দেখাইতেছেন, "হয় টাকা, না হয় প্রাণ।" রবিণ হুড ডাকাতের গল্পে এই ভাবে "হয় টাকা, না হয় প্রাণ" কথা পড়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মিঃ গামপেল লবণ-শুল্কের উপর এত বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, সুসভ্য ইংরাজ সরকারকে ইহার জন্য রবিণ হুড ডাকাতের সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

লবণ নিত্যব্যবহার্য্য আহার্য্য –ইহা জলের মত মানুষের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজীতে লবণের এত কদর যে, কোনও উৎকৃষ্ট দ্রব্যের কথা উল্লেখ করিবার সময়ে উহাকে salt of life বলিয়া অভিহিত করা হয়। দরিদ্র দেশে সেই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করা নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক।

লর্ড কার্জ্জনকে অধুনা অনেকে ইংরাজের দুষ্টগ্রহ বলিয়া মনে করেন। বঙ্গভঙ্গকালে লর্ড কার্জ্জন ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্যের রাজনীতিক আকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হইয়াছিলেন—ইংরাজকে এখনও তাঁহার কৃত কার্য্যের ফলভোগ করিতে হইতেছে। সম্প্রতি ইংরাজের বৈদেশিক ব্যাপারে বলশেভিক রুসিয়া বা নবীন তুর্কীর সহিত ব্যবহারে লর্ড কার্জ্জন যে ব্যর্থ রাজনীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কেহ কেহ সাম্রাজ্যের শনি আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন যতই হাম-বড়া জবরদস্ত লাট হউন না কেন, তিনি ভারতে কয়টি ভাল কাযও করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা ও লবণশুল্ক হ্রাস অন্যতম। লর্ড কার্জ্জন লবণশুল্ক ২৷৹ টাকা হইতে ১৲ টাকায় নামাইয়াছিলেন। ইহার ফল হাতে হাতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দেশে প্লেগের প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন লবণশুল্ক হ্রাস করিবার পর হইতে প্লেগের প্রকোপ কমিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতেই লবণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপেই উপলব্ধি করা যায়। শুল্ক হ্রাসের পর হইতেই লবণের ব্যবহার বাড়িতে থাকে। ফলে লোকের জীবনীশক্তিবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ হ্রাস।

জগতের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, ইংলণ্ডে লবণশুল্ক নাই। ইংলণ্ডের মত ধনশালী দেশে এই ব্যবস্থা, অথচ দরিদ্র ভারতে বিপরীত ব্যবস্থা! ভারতবাসীর স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিলে এমন ব্যবস্থা যে কখনই হইত না, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন, সুতরাং তাহারা লবণকে জীবনীশক্তিবৃদ্ধির উপাদান জানিয়া উহার উপর শুল্ক বসাইতে দেয় নাই। ফলে ইংলণ্ডের লোক গড়পড়তায় প্রত্যেকে বৎসরে ৩৬ সের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সেই হেতু সুস্থ ও সবল হয়। পৃথিবীর কোনও কোনও দেশের লবণব্যবহারের একটা ফর্দ্দ দিতেছি:—

দেশ	লবণের পরিমাণ	আয়ু
ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ড	৩৬ সের	৪৫ বৎসর
মার্কিণযুক্তপ্রদেশ	২৭ "	৪৫ "
কানাডা	২২৷৷৹ "	৪৫ "
নরওয়ে ও সুইডেন	২২ "	৭৫ "
ফ্রান্স	১৭৷৷৹ "	৪০ "
জার্ম্মাণী	১৭৷৷৹ "	৪০ "
রাসিয়া	১৬৷৷৹ "	২৪ "
ভারতবর্ষ	৬ "	২৩ "

পাঠক, ইহা হইতেই বুঝিতেছেন, লবণের শুল্কবৃদ্ধি জাতির জীবনীশক্তিবৃদ্ধির পক্ষে কিরূপ প্রবল অন্তরায়। জাতি জীবন্ত হইলে এই মহান্ অনিষ্টকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে দিত না। মজা এই, যে সকল বিজাতীয় সংবাদপত্র এ দেশে 'ভারতবন্ধুর' মুখোস পরিয়া ভারতের মূক জনসাধারণের প্রতি অহরহঃ কৃপাপরবশ হইয়া শিক্ষিত সমাজকে তাহাদের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই লবণশুল্ক বৃদ্ধি করা ভিন্ন সরকারের গত্যন্তর নাই বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন, অথচ স্বজাতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর মোটর ট্যাক্স চাপান হইয়াছে বলিয়া সরকারকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন! বিলাসের উপর কর ধার্য্য করা এবং প্রাণধারণোপযোগী আহার্য্য-দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করা এক নহে, এ কথাও বুঝাইতে হয়, এ দেশের এমনই দুর্ভাগ্য!

—

ভ্রান্ত ধারণা—

মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব এ দেশে কিরূপ অনুভূত হইয়াছে, তাহা বিগত গন্ধী-সপ্তাহের হরতালের দিনে বিশেষরূপে জানা গিয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর উহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন, The political agitator has been working in barren soil অর্থাৎ মহাত্মার আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, এখন আর আন্দোলনকারীর কথা দেশের লোক কানে তুলে না। নবভারতের যুগাবতার—ভারতের মুক্তিকামনার মূর্ত্ত বিকাশ—মুক্তভারতের অগ্রদূত মহাত্মা গন্ধী যে মুক্তির আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই,—শত ব্যুরোক্রাট ও সহস্র লিগ সে কথা ঘোষণা করিলেও হইতে পারে না। মহাত্মার সাধনা নিষ্ফল হইবার নহে—জাতি সে সাধনার মধ্যে দিয়া মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে—বুঝিয়াছে, যে যুগসহস্রসঞ্চিত দাসবৃত্তির ভারে ভারতের মন অবসন্ন, উহার মোহ—উহার বন্ধন ঘুচাইতে না পারিলে ভারতের মুক্তির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইবে না। মহাত্মা গন্ধী কি ব্রত সফল করিতে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহার সন্ধান পাইয়াছে বলিয়াই দেশ আজ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহারই দণ্ডের সাম্বাৎসরিক দিনে বিরাট হরতাল অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যাহারা সে সন্ধান পায় নাই, তাহারা মহাত্মার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতেও সমর্থ হয় নাই। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেনের' এক প্রতিনিধি এ দেশে কিছু দিন থাকিয়া এ দেশের নানাশ্রেণীর লোকের সহিত মিলামিশা করিয়াও ভ্রান্ত ধারণা লইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছেন যে, মহাত্মার আন্দোলনের মূলে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা আছে। তাঁহার কথা এই :—"ধরিয়া লওয়া যাউক, বাহির হইতে কোন শত্রু ভারত আক্রমণ করিবে না, ধরিয়া লওয়া যাউক, তুর্কীর পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হইবে। তাহা হইলেই আমার বিশ্বাস, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে অথবা হয় ত ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতের লোক আমাদের বিপক্ষে একটা বড় রকমের সশস্ত্র বিদ্রোহের আন্দোলন সফল করিতে পারিবে না। আমার মনে হয়, সারা ভারত ব্যাপিয়া সমস্ত রায়তকে খাজনা না দিতে প্রণোদিত করিবার অনুকূলে যে অবস্থা আনয়ন করা প্রয়োজন, তাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আর এক উপায়ে ইংরাজ শাসনকে জখম করা যায়। যদি ভারতীয় সেনামণ্ডলীকে বিদ্রোহী করা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমানে সেনা বিদ্রোহের কোনও সম্ভাবনা নাই। এই দুইটি অস্ত্র ব্যতীত বিপ্লববাদীদিগের অন্য অস্ত্র নাই। সুতরাং আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে যখন ঐ ২টি অবস্থা ঘটিবার কারণ নাই, তখন ইংরাজ শাসনের বিপক্ষে গন্ধী আন্দোলন হইতে কোনও আশঙ্কা নাই।

মহাত্মাকে না বুঝিলে তাঁহার আন্দোলনকে বুঝা যায় না, মানুষটাকে না বুঝিলে তাঁহার জীবনের ব্রত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবারই সম্ভাবনা। "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেনের" প্রতিনিধি মহাত্মাকে বুঝেন নাই, অথবা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, কাযেই মহাত্মার আন্দোলনের মর্ম্মও বুঝিতে পারেন নাই। মহাত্মা গন্ধী যে আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা সেনা-বিদ্রোহের সম্পর্ক নাই, এমন কি, সশস্ত্র বিদ্রোহের আভাস পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার মূলমন্ত্র অহিংসা—চিন্তা কথা কার্য্য—সকল বিষয়েই অহিংসা অবলম্বনীয়। পশুবল প্রতীচ্য জগৎকে কিরূপ ভূতাবিষ্ট, আচ্ছন্ন ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ঐহিক স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্যকে কিরূপ কঠিন নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, চক্ষুর সমক্ষে সে শিক্ষা লাভ করিয়া মহাত্মা গন্ধী উহার ক্ষণভঙ্গুরতা ও অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই অহিংসার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধি ও দাসত্বের মোহবর্জ্জনের দ্বারা জগতে নূতন অবস্থা আনয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহার সহিত সশস্ত্র বিদ্রোহের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না। যাহারা 'গার্জ্জেনের' লেখকের মত রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়াছে, তাহারাই বলিয়া থাকে, মহাত্মার আন্দোলন নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

কাণে সোণা কোমরে কানি—

ভারতের দরিদ্র দুই বেলা দুই মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, একথা যেমন সত্য, ভারতরক্ষী সেনাকে

সোণা-দানায় মুড়িয়া সাজাইবার কথা তেমনই সত্য। এই অজগরের পেট ভরাইতে সরকারের তহবিলের মুখ বে-পরোয়া খুলিয়া দেওয়া হয়। বিশ্বাসের অভাব যে ইহার মূলে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। দেশের লোককে নিরস্ত্র রাখিয়া ভাড়া করা সেনা ভারত-রক্ষায় নিয়োজিত করিলে এই ফলই হইবে। এই যে সরকারের সীমান্ত-নীতি, ইহার মাথামুণ্ড কিছু আছে কি? যখন সীমান্তের ওপারে রুসিয়ান ঋক্ষের ভয় ছিল, তখনও যে কথা শুনা গিয়াছে, এখনও তাহাই শুনা যাইতেছে,—সীমান্তের আটঘাট না বাঁধিলে ভারতের জুজুর ভয় ঘুচিবে না। কেন, এখন ত রুসিয়ান ঋক্ষের নখ দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পরন্তু স্বাধীন আফগানের বন্ধুত্বও লাভ করা হইয়াছে, তবে ভয় কিসের? এবারও বড় লাটের লেজিস্‌লেটিভ এসেমব্লিতে বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ ডেনিস ব্রে সীমান্ত-নীতির খুবই ওকালতী করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক হিসাবেই কি, আর আন্তর্জাতিক হিসাবেই বা কি, সীমান্ত-প্রদেশটা ভারতের নিজস্ব, ঐ প্রদেশটা ভারতের এক্তারিতে রাখিতেই হইবে। তাঁহার কথা শুনিলে হাসি পায়,—What India's is, let India hold, যাহা ভারতের নিজস্ব, তাহা ভারতকে দখলে রাখিতেই হইবে। দুঃখ কেবল তহবিলের অনাটন! কেন ওয়াজিরি মামুদরা ভারতের বন্দুক বেয়নেটের অধীন না হইলে কি ভারতের দিন চলে না? মিষ্টার ব্রে মামুদদিগকে progressively civilise অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সভ্য করিয়া তুলিবার কথা পাড়িয়াছেন। এই যে জগতের সকল অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, ইহার অন্তরালে কত গুপ্ত রহস্যই না লুক্কায়িত আছে! সকল সাম্রাজ্যবাদের মূলে এই রহস্য আছে, সে কথা এখন সকলেই বুঝিতে শিখিয়াছে। প্রথমে পাদরী, তাহার পর ব্যবসায়ী ও সর্ব্বশেষে সৈনিক আইসে, ইহাই কি প্রতীচ্যের অসভ্যকে সভ্য করিবার মূলনীতি? ইহার পরে নূতন কথা কিছুই নাই।

মিষ্টার ব্রেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যাউক্। এদেশের আমলাতন্ত্র সরকার মামুদদিগকে সভ্য করিতে চাহেন; তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "ওয়াজিরি দেশে সভ্যতার বিস্তার করিতেই হইবে, অন্যথা ওয়াজিরি স্থানের সমস্যার কখনও মীমাংসা হইবে না।" কিন্তু আমলাতন্ত্র সরকার কি ভারতকে উপযুক্ত পরিমাণে 'সভ্য' করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, ভারত ছাড়িয়া ওয়াজিরিস্থান ধরিতে যাইতেছেন? অসভ্য ভারত আমলাতন্ত্র সরকারের সংস্পর্শে এমনই সভ্য হইয়াছে যে, ঘরে-বাহিরে নিজে আত্মরক্ষা করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। রোমান শাসকরা যখন বৃটনদিগকে ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন বৃটনরা স্কট ও পিক্ট দস্যুদের ভয়ে দিশাহারা হইয়া জানু পাতিয়া করযোড়ে বিদেশী রোমান শাসকদিগকে বৃটেন ছাড়িয়া চলিয়া না যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। আজ ভারত এমনই 'সভ্য' হইয়াছে যে, যদি হঠাৎ বিদেশী শাসকরা এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ ভারতবাসী করযোড়ে তাহাদিগকে চীন, আফগান, রুসিয়ান হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিবে।

মামুদদের সভ্যতা নাই বটে, কিন্তু তাহাদের এমন অবস্থা হয় নাই। তাহারা এখনও আত্মরক্ষায় সমর্থ। এই ক্ষমতার বিনিময়ে তাহারা যে সভ্যতা চাহে না, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবে বেয়নেটের মুখে তাহাদিগের মধ্যে সভ্যতা-বিস্তারের এত আগ্রহ কেন? যে দয়ার দান মামুদরা চাহে না, তাহা যোগাইবার জন্য দরিদ্র ভারতীয়ের তহবিলের মুখ খুলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি?

ভারতে বৎসরে হাজার করা ৬৬২টি শিশু মৃত্যু হয়। ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় সরকারী হিসাবে এক বৎসরে ৬০ লক্ষ লোক (এখন হিসাব পাওয়া গিয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক) মরে। প্লেগ, ম্যালেরিয়া ও কলেরার হিসাব দিব না, উহা বলিয়া বলিয়া পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আর ভারতের কোটি কোটি লোক জীর্ণ কুটীরে শীতবাতে বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পায়, রোগে ভুগিয়া জীবনীশক্তিহীন হয়, অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ ও কঙ্কালসার হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদের ব্যথা, তাহাদের বেদনা বুঝে কে? কিন্তু প্রতিবেশী মামুদের কষ্টে কর্তৃপক্ষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে,—আহা! ইহারা কি অসভ্যই থাকিয়া যাইবে? সামরিক কর্ত্তারা যখন চাহিয়াছেন, তখন ওয়াজিরিস্থানে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাড়ে ৪ হাজার খাসাদার ও

৫ হাজার খাইবার রাইফল সেনা রাখিতেই হইবে—না হইলে অসভ্য মানুষ সভ্য হইবে না। কেবল কি সেনা? উহাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের উপযোগী সামরিক পথঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য কুলী মজুরও ঝাঁকে ঝাঁকে নিযুক্ত করিতে হইবে। খরচ যাহাই পড়ুক না, ভারতের তহবিল তাহা পূর্ণ করিবে।

তাহার পর মোট সামরিক ব্যয়ের কথা। জঙ্গী লাট লর্ড রলিনসন মহা পীড়াপীড়ির পর বাৎসরিক ৫৭ কোটি টাকা সামরিক খাতে ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছেন; ইহার কমে তিনি কিছুতেই চালাইতে পারেন না। ইঞ্চকেপ কমিটী ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০ কোটি পর্য্যন্ত সামরিক ব্যয় বরাদ্দ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু লর্ড রলিনসন উহার উপরেও ৭ কোটি চাহেন। ইহা ত হইবেই। ভারত-রক্ষার সাজ-সরঞ্জাম যদি কেবল ভারতরক্ষার জন্য যোগান হইত, তাহা হইলে এই কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া ভারত-রক্ষার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখনকার শাসন-নীতিতে ভারতরক্ষার নামে সাম্রাজ্যরক্ষা ও প্রসার করা হয়, কাজেই ব্যয় কমান যায় না। ৫০ বৎসরেরও পূর্ব্বে ইডেন কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভারতের সেনা কেবল ভারতরক্ষার প্রয়োজনানুসারে পোষিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার পর যতই দিন যাইতেছে, ইংরাজের ততই সাম্রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই বর্দ্ধিতায়তন সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য ভারতের সেনা ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বড়লাটরূপে লর্ড কার্জ্জন একবার স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এসিয়ায় শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই ভারতে ইংরাজের সেনা পোষণ করা প্রয়োজন। এসার কমিটী তাহার পর আরও খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, মিশর ও ও মধ্য প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের সেনা পোষণের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা কি সাম্রাজ্যবাদীর কথা নহে? তাহার পর বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভারতের সেনাকে কেবল এসিয়ার শক্তি-সামঞ্জস্য বিধানে নিয়োজিত করা হয় নাই, য়ুরোপেও শক্তি-সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এ সবই সাম্রাজ্যবাদ-নীতির ফল।

এসার কমিটী আর একটা কথা বলিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনার মধ্যে বৃটিশ সেনার ভাগটা ভারতের নহে, ইংলণ্ডের; উহা ভারতকে ধার দেওয়া হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ভারতের আপনার বলিতে সেনা নাই, যাহা কিছু আছে, ভাড়াকরা (mercenary), তাহাও সুবিধামত পাওয়া যায় না; ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলেই যখন যথা ইচ্ছা সেই সেনা পাঠাইতে পারে; সুতরাং সেই সেনা নিয়োগ ভারত ইংলণ্ডের মরজি মত করিতে পারে, অন্যথা নহে।

অথচ এই সেনারক্ষার জন্য আমাদিগকে বৎসরে ৫৭ কোটি টাকা যোগাইতে হইবে। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পূর্ব্বে সামরিক ব্যয় ইহার অর্দ্ধেক ছিল।

লর্ড মেও একদিন ভারত-সচিবকে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সামরিক খাতে ১৬ কোটি টাকারও উপর ব্যয় করি। দেশের অবস্থা অনুসারে এত ব্যয় করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার মনে হয়, ভারত-রক্ষা ব্যপদেশে প্রকৃত যাহা ন্যায্য খরচ হওয়া উচিত, আমাদের তাহার অধিক এক কপর্দ্দকও ব্যয় করা উচিত নহে।" লর্ড মেও ১৬ কোটিতে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে এখন ৫৭ কোটিতে কি বলিতেন?

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

শিক্ষা ও অন্ন-সমস্যা

বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা দিন দিন যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকে চিন্তিত হইতেছেন। এই অন্ন-সমস্যার সমাধান না হইলে বাঙ্গালীর মানসিক শক্তিস্ফুরণ ত পরের কথা, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহের কারণ ঘটিবে। বাঙ্গালায় লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হইতেছে না—বাঙ্গালায় যে বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান হইতে পারে না, এমনও নহে। কারণ, দেখা যাইতেছে, অন্যান্য প্রদেশ হইতে উদ্যমশীল লোক বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার ধন শোষণ করিয়া ধনী হইতেছে। কেবল ইংরাজ বণিক নহে, পরন্তু মাড়োয়ারী, গুজরাটী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, পেশয়ারী সকলেই বাঙ্গালায় আসিয়া ধন-সঞ্চয় করিতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোক-গণনার কর্ত্তা মিষ্টার গেট ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

দেশীয় শাসকের অবস্থিতিতে যে সকল পুরাতন সহর সমৃদ্ধ ছিল, সে সকল সহরে শিল্প বড় নাই—যাহা আছে, তাহাও বিলোপোন্মুখ; নূতন সহরে বিদেশীর মূলধনে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—শ্রমিকরা প্রায়ই অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে। হাওড়ার কলের ও আসানসোলের কয়লার খনির মালিক প্রায়ই ইংরাজ—কুলীমজুররা বিহারী ও যুক্তপ্রদেশের। দোকানীরাও পরদেশী। নূতন শিল্পে স্থানীয় লোকের বড় লাভ হয় নাই।—"The district-born, as a class, have so far benefited but little by the growth of new industries."

মতিলাল শীল।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবনতি—শারীরিক দৌর্ব্বল্য—বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রভাব যে এই অবস্থার একমাত্র কারণ, এমন মনে হয় না। বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের—"ভদ্রলোকদিগের" সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ২০ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার গেটের উদ্ধৃত উক্তি অবলম্বন করিয়া সার হার্বার্ট হোপ রিসলী বলিয়াছিলেন :—

গত কয় বৎসরে দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে সহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই অধিক কষ্ট হইয়াছে। কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহাদের কোন লাভ হয় না; তাঁহারা ব্যবসা করেন না; নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হিসাবে তাঁহাদিগকে অধিক দিতে হয়; বেতন দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে বর্দ্ধিত হওয়া ত পরের কথা—অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিয়া গিয়াছে; সামাজিক ব্যয় বাড়িয়াছে। কাযেই যে সকল ভদ্র পরিবার বেতন বা পেন্সনে নির্ভর করিয়া সমৃদ্ধির সময় নির্ম্মিত গৃহে ঠাট বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাদের নানারূপ কষ্ট অনিবার্য্য।

এই যে ব্যবসাবিমুখতা (From trade they hold aloof) ইহা বাঙ্গালীর অনন্ত দুঃখের কারণ। ইহা এ দেশে নূতন। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল—

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ।"

এখন বাণিজ্য ও চাষ উভয়েই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের অরুচি দেখা যায়। বাণিজ্য বিদেশীর বা অন্য প্রদেশবাসীর হস্তগত, চাষ নিরক্ষর কৃষকের কায। তবেই

বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অর্থোপার্জ্জনের পথ কেবল—চাকরী। বাঙ্গালীর এই যে চাকরীসর্ব্বস্বভাব, ইহার কারণ কি? আজকাল এ দেশে যে উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কিতাবতী শিক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে কি না? বহুদিন পূর্ব্বে এ দেশে ইংরাজশাসনের ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের" মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ---

বর্ত্তমানে ইংরাজ সরকার এ দেশে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম ও সন্তোষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় সাহায্য করা হইতেছে। এ দেশে যে সব বিদ্যালয় ছিল, সে সকলের শিক্ষায় শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ী ছাত্ররা যে যাহার কাযের উপযুক্ত হইত। এখন সরকারী বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া ছোট ছেলেদের বড় বিদ্যালয়ে যাইতে উৎসাহিত করা হয় এবং সে বিদ্যালয় হইতে আবার অধিক বৃত্তি দিয়া তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লওয়া হয়। ফলে কিছু কালেই যে কেরাণীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে, তাহাদের সকলকে চাকরী দেওয়া সম্ভব হইবে না; আর শিক্ষার দোষে তাহারা সরকারের বৃত্তি ও শেষে সরকারী চাকরীর উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সরকারের সব চাকরীতেও তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে না। তখন এই শৃঙ্খলাহীন, সন্তোষশূন্য, ধর্ম্মভয়বর্জ্জিত বিদেশী শিক্ষার শিক্ষিত চতুরসম্প্রদায়কে লইয়া ইংরাজ কি করিবেন?—"What are you to do with this great clever class, forced up under a foreign system, without discipline, without contentment, and without a god?"

রামগোপাল ঘোষ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? বিরাট কেরাণীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে—শিক্ষার উদ্দেশ্য, সকল সম্প্রদায়কে তাহাদের অনুসৃত কাযের উপযুক্ত করিয়া তুলা।

আজকাল যে সাহিত্যপ্রধান শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। এখন অবস্থা ও প্রতিভা বিচার না করিয়াই অভিভাবক বালককে বিদ্যালয়ে দিয়া ক্রমে "উচ্চ শিক্ষার" জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—আই, এ, বা আই, এস সি, পড়ুক—তাহার পর বি, এ, বা বি, এস সি—শেষে আইন। ইহার মধ্যে অভিভাবকও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখেন না; ছাত্রেরও তাহা ভাবিবার ক্ষমতা নাই। বাঙ্গালী যুবক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তাহার না থাকে উদ্যম, না থাকে স্বাস্থ্য, না থাকে স্বাবলম্বী হইবার শক্তি। তখন মোটা মোটা কেতাবপাঠে তাহার সব শক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে সে একেবারে অজ্ঞ; অথচ তখনই তাহাকে সংসারের গুরুভার বহন করিতে হয়। সে অন্নচিন্তায় ব্যাকুল—মৌলিক চিন্তার অবসর তাহার নাই। শিক্ষার উপযোগিতা—cultureএর প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না, কিন্তু যাহারা সাধারণ-বুদ্ধি—যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে, তাহারা সেই জন্য প্রস্তুত না হইলে, তাহাদের সাফল্যলাভসম্ভাবনা থাকিবে কিরূপে?

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামগোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল, দুর্গাচরণ লাহা এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই অসাধারণ ব্যবসা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। তখনও এ দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ গঠিত হইত এবং তখনও কলিকাতা বহুবাজারের দত্তপরিবারে যুরোপীয় কোম্পানীর মত জাহাজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের পর যাঁহারা ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার শেষ সোপানে না যাইয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি বিখ্যাত কর-তারক কোম্পানীর নলিনবিহারী সরকার। পূর্ব্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্পৃহা ছিল—দেশের সাধারণ ব্যবসাও দেশের লোকের হাতে ছিল।

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা।

আর এখন? অল্পদিন পূর্ব্বে মিষ্টার হর্ণেল বলিয়াছেন, বি. এ ও এম, এ পাশ করা বাঙ্গালী যুবকরা দলে দলে সরকারী দপ্তরখানায় চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া ফিরে। চাকরী নাই। বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলনের সময় এ দেশে আসিয়া সার ভ্যালেন-টাইন চিরল এ দেশে অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিয়া এ দেশে শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার-সাধন দ্বারা শিক্ষিত ভারতবাসীকে নূতন নূতন ক্ষেত্রে বুদ্ধি-প্রয়োগের সুযোগ প্রদান করা এ দেশে ইংরাজ সরকারের কর্ত্তব্য। — "To promote the industrial and commercial expansion of India so as to open up new fields for the intellectual activity of educated Indians".

কিন্তু সরকারের উপর নির্ভর করিলেই সাফল্যলাভের আশা করা যায় না। এই যে নির্ভর করিবার প্রকৃতি, ইহাই স্বাবলম্বনের শত্রু। এ বিষয়ে দেশের লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, কোন উপায় হইবে না। তবে শিক্ষা যাহাতে ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের উপযোগী হয়, সে চেষ্টাও বাঞ্ছনীয়।

এক জন বিদেশী বাঙ্গালী যুবকদিগকে শিক্ষায় স্বাবলম্বন আদর করিতে শিখাইতেছেন। তিনি কাপ্তেন পিটাভেল। তিনি মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহায্যে কলিকাতায় একটি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দিতেছেন

এবং তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল অন্যান্য ব্যবস্থাও করিতেছেন। বহু প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংপ্রতি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে উপস্থিত থাকিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যাসম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কাপ্তেন পিটাভেলকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কাপ্তেন পিটাভেল যে স্বাবলম্বী শিক্ষাদানব্যবস্থা করিয়া এ দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাজ যোগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :--

"বঙ্গদেশে 'ভদ্র' সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্ত্তমানে যে সমস্যা প্রবলতম, আপনি তাহারই সমাধানে চেষ্টিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার চেষ্টা যদি ফলবতী হয়, তবে আপনি আমাদের যে উপকার করিবেন, (বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী) ডেভিড হেয়ারও সে উপকার করিতে পারেন নাই। যদি সাফল্যলাভে দৃঢ়সঙ্কল্পে কায হয়, তবে সে বিষয়ে আপনার যে সম্বল আছে—তাহা বাঙ্গালায় আর কাহারও নাই। বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, আমি যেন নিরাশার অন্ধকারে আর আলোকবিকাশসম্ভাবনা দেখিতে পাই না। আমাদের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে; অথচ শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য শিখাইবার কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। আমরা যেন মেষপাল—পর্ব্বতের তুঙ্গস্থান হইতে ছুটিয়া নামিয়া যাইতেছি। বাঙ্গালীর ছেলেরা কিতাবতী শিক্ষার অতিভোজনে কাতর; এখন তাহাদিগকে নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব প্রয়োজন। আমি তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া আছি। আপনার চেষ্টা ফলবতী হইলে আমি যত আনন্দিত হইব, তত আর কেহ হইবেন না।"

নলিনবিহারী সরকার।

সত্য বটে, উচ্চশিক্ষার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে তাহার কাযের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারে, সে শিক্ষা ভার মাত্র। ভূপেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমানকালে বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

বর্ত্তমান "উচ্চশিক্ষা"য় যে বিশেষ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, এ মত ভূপেন্দ্র বাবু বহুদিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বোধ হয়, য়ুরোপে সামাজিক অবস্থা অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার সে মত আরও দৃঢ় হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা হইতে সরাইয়া নগরোপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাত্রাবাস-সংবলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয় এবং সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরাও সে প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তখন ভূপেন্দ্র বাবু এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ধনীর পুত্ররা এবং যে সকল প্রতিভাশালী যুবক বৃত্তি পাইবে, তাহারাই "উচ্চশিক্ষা" লাভ করিলে ভাল হয়; সাধারণ ছাত্রগণ ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষা লাভ না করিয়া

সাধারণ শিক্ষার পর শিল্পব্যবসা-বাণিজ্যের পথ গ্রহণ করিলে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

তাহার পর তিনি য়ুরোপের শিক্ষাপদ্ধতি অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি যখন বিলাতে ভারত-সচিবের মন্ত্রিসভার সদস্য, সেই সময় গণিতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন বাঙ্গালী যুবক তাঁহার নিকট গমন করে—উদ্দেশ্য, ব্যাঙ্কে কায শিখিবে। তিনি কোন ব্যাঙ্কের এক জন ডিরেক্টারকে তাহার কথা বলিয়া দেন। ডিরেক্টার মহাশয় যুবককে দেখিয়া বলেন, "মিষ্টার বসু, ইহার শিক্ষার বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—ইহাকে দিয়া আর কায হইবে না।" ২১।২২ বৎসর বয়স কি এত বেশী! তখন ডিরেক্টার মহাশয় বুঝাইয়া দেন—যে বালক ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হইবে, তাহাকে ১৪ বৎসর বয়সে কাযে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথম ২ বৎসর সে ম্যানেজারের ঘরে সার্সি সাফ করিবে ও পত্রবাহক হইয়া থাকিবে—দেখিবে, কে আসে কে যায়—কাহাকে পত্র লিখা হয় ইত্যাদি। তাহার পরের বৎসর সে ম্যানেজারের ঘরে দ্বারবানের কায করিবে। এই সময়ের মধ্যে সে অবসরকালে স্কুলে (continuation school) পাঠ করিবে। চতুর্থ বৎসরে সে আফিসে লিখাপড়ার কায আরম্ভ করিবে।

কাপ্তেন পিটাভেল।

এই প্রণালীর ত্রুটি থাকিতে পারে। কিন্তু ইহারই ফলে ইংরাজের বিরাট ব্যাঙ্কিং কায প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর ছেলে যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহাকে শিক্ষায় সেইরূপে গঠিত করাই বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে যে কোন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকরা যে বেতনে চাকরীর জন্য লালায়িত, তাহাতে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। ইহারা কায করে বটে, কিন্তু সে কাযে তাহাদের আগ্রহ থাকে না। কাযেই কাযও ভাল হয় না।

ব্যবসা-প্রধান বোম্বাইয়ে অনেক বালকই "উচ্চশিক্ষার" জন্য লালায়িত না হইয়া, কেহ বা প্রাথমিক, কেহ বা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবসায় শিক্ষা করিতে যায়। ইহাতে লাভ হয়—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের অপেক্ষা ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বেই তাহারা ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে পারে এবং কোন কাযে ৬।৭ বৎসর কম সময় নহে।

(২) এই ৬।৭ বৎসর তাহাদের অর্থ ও উদ্যম অকারণে নষ্ট হয় না।

আমরা বলিয়াছি, বাঙ্গালায় যে বাঙ্গালীর অন্নাভাব দূর হয় না, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যে এখন অনেক কালোপযোগী উন্নতি করা যায়। বাঙ্গালায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার বাণিজ্যে বিদেশীর সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইতেছে—বাঙ্গালী তাহা হস্তগত করিতে পারে। এখন বাঙ্গালীকে এই সকল দিকে মন দিতে হইবে। পাট বাঙ্গালা ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও উৎপন্ন হয় না; কিন্তু পাটে যে লাভ, তাহা বিদেশী মহাজন হইতে কলওয়ালা পর্য্যন্ত বিদেশীরাই লইয়া যায়। বাঙ্গালী কি চিরদিন পচা জলে পাট কাচিয়া ও পাটকলে কুলী হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে?

ভূপেন্দ্র বাবুর মত অনেকেই এখন আশাপথ চাহিয়া আছে—কবে উপযুক্ত লোক আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভূপেন্দ্র বাবু বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। তিনি যদি বাঙ্গালীকে স্বাবলম্বী হইবার মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি

বাঙ্গালীর অসীম উপকারসাধন করিবেন। কিন্তু এ জন্য আমরা কি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব?

আজকাল সমবায়ের কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। যে কায একের দ্বারা সম্ভব নহে, দশ জন মিলিলে তাহা সহজ-সাধ্য হয়। কিন্তু সে জন্য সরকারের হাজার হাজার টাকা বেতনের কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয় কেন? যে সমবায় অনুষ্ঠান (Irish Agricultural Organisation Society) আয়ার্লণ্ডে অঘটন ঘটাইয়াছে, তাহা সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে নাই। আইরিশরা তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিকদ্বয় বলিয়াছেন, কোন জাতি পণ্যাদির যে উপকরণ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাকেই তাহার সম্পদ বলা যায় না—জাতির সম্পদ, দেশের লোকের উদ্যম, কার্য্যক্ষমতা ও চরিত্র। এ কথার যাথার্থ্য আমরা অনেক সময়ই অনুভব করিয়া থাকি এবং যত দিন যাইতেছে, দেশের অন্ন-সমস্যা যত প্রবল হইতেছে, ততই সে অনুভূতিও প্রবল হইতেছে। বাঙ্গালীকে আবার মানুষ হইতে হইবে। দেশে পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্নসমস্যা তত তীব্র ছিল না বলিয়াই সে সম্প্রদায় দেশে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় করিতে পারিয়াছিল। আজ যদি সে সম্প্রদায় নষ্ট হইয়া যায়, তবে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেই জন্য সময় থাকিতে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

পরবশ্যতাই দুঃখের কারণ। সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে স্বরাজ আন্দোলনের নেতা ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। চরকা সেই স্বাবলম্বনের প্রতীক মাত্র। তাহাকেই মুক্তির উপায় বলিয়া পূজা করিলে কোন ফল হইবে না—তাহাতে যে ভাব মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে, সেই ভাবে ওতঃপ্রোতঃ হইয়া কায করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গোটাকতক ব্যবসা শিক্ষার কলেজের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপাধি প্রদান করিলে বা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড় করিয়া কারীগরী বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেই ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না। জাতিকে জাড্য পরিহার করিয়া আপনার মুক্তির জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে—কিতাবতী সাহিত্যিক শিক্ষার মোহজাল ছিন্ন করিয়া—অন্নেভুষ্টিপ্রবণতা পরিহার করিয়া—উদ্যোগী ও উদ্যমশীল হইয়া উৎসাহ সহকারে কর্ম্ম-পথের পথিক হইতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বাঙ্গালাতেই বাঙ্গালীর অন্নের অভাব দূর হইতে পারে। বাঙ্গালার নদী আর বর্ষার জলে কূল প্লাবিত করিয়া জমীর উপর পলীরূপে উর্ব্বরতা ঢালিয়া যায় না বটে, কিন্তু বিজ্ঞান জমীর নষ্ট উর্ব্বরতার পুনর্জ্জীবনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞান ক্ষারক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়াছে—বাঙ্গালায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কোনই কারণ নাই। বাঙ্গালার লোকের অভাব যাহারা পূর্ণ করিত, সেই তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতির বংশধররা
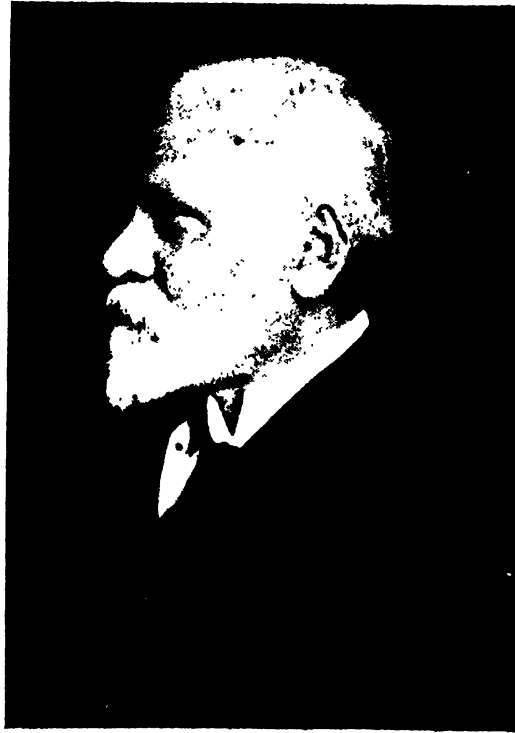
বিদ্যমান; তাহারা যদি স্ব স্ব জাতিগত ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনে তৎপর হয়, তবে উন্নতি হইতে বিলম্ব ঘটে না। বাঙ্গালায় ছোট বড় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যে সব পণ্যের উপকরণ এই বাঙ্গালাদেশেই উৎপন্ন হয়, সে সব পণ্য বাঙ্গালাতেই প্রস্তুত করিলে বিদেশ হইতে অনেক পণ্যের আমদানী কমিয়া যায়—বাঙ্গালা হইতে আমরা নানা পণ্য রপ্তানী করিতে পারি। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক বার্ণিয়ার মোগলসম্রাটদিগের আমলে এ দেশে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা হইতে পারস্যোপসাগর প্রভৃতির কূলেও শর্করা রপ্তানী হইত। ইতিহাসে দেখা যায়, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দেও মালদহের বণিক শেখ ভীক পারস্যোপসাগরের পথে রুসিয়ায় ৩ জাহাজ মালদহী (রেশমী) কাপড় পাঠাইয়াছিলেন। আর আজ যে বিলাতী কাপড়ে বাঙ্গালী লজ্জানিবারণ করে, তাহাও ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে লইয়া বেপারীদের কাছে বিক্রয় করে—মাড়োয়ারী মহাজন! বাঙ্গালায় পুরাতন শিল্প মৃত বা মরণোন্মুখ, বাঙ্গালায় নূতন শিল্প বিদেশী প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, বাঙ্গালার ব্যবসা বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত। এই শোচনীয় দুরবস্থার প্রতীকার না হইলে, বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায় হইবে না। যে শিক্ষা বাঙ্গালীকে পরমুখাপেক্ষী হইবার প্রবৃত্তিপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বাবলম্বী হইতে শিখাইবে এবং বাঙ্গালীকে তাহার অন্ন-সমস্যার সমাধানে সমর্থ করিবে—এখন বাঙ্গালায় সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

নিঃসংশয়

"আঁক্ষ বসো মম মন্দির চোখে।
কঁহৈ কবীর পড়ো নহিঁ ধোখে॥"

কবীর।

মন্দিরে মোর বন্ধু যখন
সন্দেহ দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই,
লুপ্ত হয়েছে সব সংশয়
জ্ঞান উপদেশ আর না চাই।

মম দোলাচল—চিত্তনলিন'
আজি হলো স্থির স্পন্দহীন,
বিরাজে তথায় প্রভু নিশিদিন
তার বন্দনা নান্দী গাই।

ঘাঁটি নাক আর শাস্ত্রের পুঁথি
গুরুমহাজন আর না খুঁজি
সাধু সজ্জনে শুধাতে চাই
নিজে কোন' কথা বুঝি না বুঝি

এমন বন্ধু ঘরে যার রয়
সে কি আর চায় পর-প্রত্যয়?
সকল চিন্তা বাক্যে কর্ম্মে
বন্ধুর মম নিদেশ পাই॥

শ্রীকালিদাস রায়।

অশোক অনুশাসন

অশোক অনুশাসনে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সত্য, উদারতা প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বের সূত্রগুলি প্রধানতঃ বিবৃত হইলেও, উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ পাঠে মৌর্য্য-যুগের রাজনীতিক ও সামাজিক অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা প্রথমোক্ত কয়েকটি বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মাতাপিতার প্রতি তৎকালে যে বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করা হইত, অনুশাসনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ সম্মানপ্রদর্শনশিক্ষা অনুশাসনাবলীর অন্যতম মূল তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তৃতীয় গিরিলিপিতে

পিতার শুশ্রূষা অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত
আমরা
এইরূপে চতুর্থ, একাদশ ও ত্রয়োদশ গিরি-
অনুভব
ই বিষয়ের প্রতি প্রজাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা
এবং যত
পুনঃ পুনঃ এই সম্বন্ধে উল্লেখ হইতে আমরা
দেশের
এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

এইরূপে শিক্ষকগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বয়োবৃদ্ধসেবার কথাও বহুস্থলে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অবশ্য অশোক অনুশাসনে অহিংসা সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। অনুশাসনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে অহিংসার প্রতি রাজচক্রবর্ত্তীর যে উত্তরোত্তর ভক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার নিদর্শন উত্তমরূপে পাওয়া যায়। এ কথা সকলেই বিদিত আছেন যে, কলিঙ্গবিজয়ে যে রক্তপাত হয়, তাহা হইতেই অশোকের রাজ্যবিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং এই স্থানেই অহিংসার প্রতি তাঁহার আসক্তির প্রারম্ভ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, রাজভোজনাগারে জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য যে জীবহত্যা হইত, তাহারই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে ২৬ বৎসর পরে তাঁহার পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে অশোক বহু জন্তুকে অবধ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহাতে কোন প্রকারে সামান্য জীবও ধ্বংস না হয়, তজ্জন্য তুষ দগ্ধ করা, এমন কি, বৎসরের প্রায় ৬ মাস মৎস্য বিক্রয় পর্য্যন্তের জন্যও নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

অহিংসার জন্যই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী নিজ বিরাট রাজ্য ব্যতীত, চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র, এমন কি, সুদূর সিংহলে এবং মিত্ররাজ আন্তিয়োকসের রাজ্যে—অধিক কি, মিত্ররাজের নিকটবর্ত্তী রাজ্যেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনুষ্য ও পশু উভয়েরই জন্য ঔষধ সংগ্রহ, পথিপার্শ্বে কূপ খনন ও বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল। ভিন্ন স্থান হইতে ভেষজ ও ফলবৃক্ষ সংগৃহীত হইয়াছিল। কেবল মনুষ্যের জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই; পরন্তু সামান্য কীটের কথাও রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট বিস্মৃত হয়েন নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, খুব সম্ভব অশোক এই কারণে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। "চিকীছা কতা মনুশ চিকীছা চ পশুচিকীছাচ" দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই

বুদ্ধ

[অজন্তা চিত্র হইতে

স্থলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথাই বলা হইয়াছে। কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, দুর্গাভ্যন্তরে চিকিৎসালয় স্থাপন তৎকালে প্রচলিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলিপুত্রবর্ণনাকালে সুন্দর দাতব্য চিকিৎসালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ানের সময়ে পাটলিপুত্র অনেকাংশে গৌরবহীন হইয়াছিল। সুতরাং অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রে যে দাতব্য চিকিৎসালয় থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কোনই নাই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বহু শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের চিকিৎসালয় দেখিয়া সত্যই বলিয়াছেন যে, এগুলি যে মৌর্য্যসম্রাটের চিকিৎসালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তুতঃ, তৎকালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে যে এরূপ কিছু ছিল, তাহা আদৌ অনুমান করাও যায় না এবং এ জন্য অশোকের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্রীতদাসকে সাধারণতঃ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইত; কিন্তু অশোক অনুশাসনাবলী পাঠে ভারতবর্ষে যে ইহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে দেখা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম গিরিলিপিতে ইহা বেশ বুঝা যায়। তথায় ক্রীতদাসের প্রতি সদয়তাপ্রদর্শনের অনুজ্ঞা লিখিত হইয়াছে। কেবল অনুশাসনে নহে, মৌর্য্যযুগসম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীকদূত মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, কোন ভারতীয়ই ক্রীতদাস হইতে পারিত না। অর্থশাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, কেবল ৪টি কারণে কোন আর্য্য ক্রীতদাসরূপে পরিগণিত হইত। ক্রীতদাসকে সুদৃষ্টিতে দেখা হইত। তাহাকে শব বহন বা উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিতে হইত না। ক্রীতদাসপীড়ন নিষিদ্ধ ছিল। ক্রীতদাস সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত এবং প্রভুর ক্ষতি না করিয়া সে যাহা অর্জ্জন করিতে পারিত, সে-ই তাহার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহার মৃত্যু হইলে তাহারই আত্মীয়গণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। বালক ভৃত্যগণের বিশেষ অধিকার ছিল। তাহাদিগকে বিদেশে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাহাদিগকে ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইত না। অধিকন্তু, ক্রীতদাস স্বাধীনতাও পাইত।

সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শন এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অশোকের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। নবম ও দ্বাদশ গিরিলিপিতে আমরা দেখিতে পাই যে, অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে তৎকালীন সভ্যজগতের প্রধান ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও, তিনি অন্য ধর্ম্মকে হেয়জ্ঞান করিতেন না। অনুশাসনে ইহা নানা স্থানে পরিস্ফুট রহিয়াছে। নবম ও দ্বাদশ গিরিলিপিদৃষ্টে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। "সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা, যেন সামান্য বিষয়েও না হয়।" এমন কি, কোনও কোনও কারণে তিনি পরধর্ম্মীদিগের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দ্বাদশ গিরিলিপিতে নিম্নোক্ত উপদেশ রহিয়াছে—"পরধর্ম্মীদিগকে পূজা করিলে, সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় এবং পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়। এরূপ না করিলে সধর্ম্মীদিগের ক্ষতি ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের ক্ষতি করে। সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক।

এই জন্যই দেখিতে পাই যে, তিনি মুক্তহস্তে বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধসঙ্ঘে অর্থ বিতরণ করিলেও, হিন্দু সন্ন্যাসীদের বাসস্থান নির্ম্মাণে অর্থদানে কার্পণ্য করেন নাই। এখনও কাশ্মীর প্রদেশে কথিত হয় যে, দেবমন্দির-নির্ম্মাণে অশোক তদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। যদিও অর্থশাস্ত্রে (১৩।৫) আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা পরাজিত জাতির ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, তথাপি কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, বিধর্ম্মিগণকে দুর্গাভ্যন্তরে যেন স্থান দেওয়া না হয়; তাহাদিগকে শ্মশানভূমির বহির্দ্দেশে বাসভূমি দিতে হইবে। কিন্তু অশোক-অনুশাসনে আমরা দেখিতে পাই যে, বিধর্ম্মীগণও যথেচ্ছা বাস করিতে পারিত। এই সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে আমরা অশোকের ধর্ম্মমতের মূলতত্ত্ব ধারণা করিতে পারি।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ অশোকের শাসনপদ্ধতির নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মৌর্য্যযুগে অপরাধীদিগকে ক্লেশ দেওয়া হইত। অনুশাসনে "পরিক্লেশ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কিন্তু, এরূপ অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। উক্ত ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের অষ্টম, নবম ও একাদশ অধ্যায়গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অর্থশাস্ত্রের এই অধ্যায় সকলে আমরা এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই, যাহা হইতে আমরা ভিন্সেণ্ট স্মিথের মত গ্রহণীয় বলিয়া লইতে পারি। অপিচ, তৎকালে যে এরূপ নির্য্যাতন করাই হইত না, আমরা তাহারই প্রমাণ পাই। মৌর্য্যযুগে, কোন বিচারক অন্যায়রূপে পীড়ন করিলে দণ্ডনীয় হইতেন। কারাগারাধ্যক্ষও নির্য্যাতন করিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অনুশাসনেও আমরা দেখিতে পাই যে, বন্ধন বা দৈহিক দণ্ডে লোক যেন ক্লেশ না পায় এবং তজ্জন্যই রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা দণ্ডদানবিষয়ে অতিরিক্ত কঠোরতা প্রকাশ না করেন। অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, অপরাধী জরিমানা না দিতে পারিলে তাহার অঙ্গহানি করা হইত—এবং তিনি যে অষ্টাদশ প্রকার শাস্তির কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে বেত্রদ্বারাই আঘাত করা হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধির পর্য্যালোচনা করিলে অশোকযুগের দণ্ডবিধি অত্যন্ত সমুন্নত ও দয়ার পরিচায়ক বলিয়া সহজেই মনে করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ যিনি সামান্য কীট-পতঙ্গাদির ক্লেশ অপনয়নেও যত্নবান ছিলেন, তিনি যে মনুষ্যকে যন্ত্রণা দিবেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না।

প্রথম গিরিলিপিতে "সমাজ" বলিয়া একটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কথাটির আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতের একটি সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অশোক-অনুশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, "এই স্থানে কোনও পশুকে বলি দিয়া তাহার দেহ লইয়া হোম করিবে না; অথবা কোনরূপ সমাজ করিবে না। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সমাজে অনেক দোষ দেখিয়া থাকেন। কিন্তু, এরূপ একটি সমাজ আছে, যাহাকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী উপকারক মনে করেন।"

এই সমাজ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? দুই প্রকার সমাজের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এক প্রকার, যাহা—নিন্দনীয়; অন্য প্রকার, যাহা—অনুমোদনীয়।

হরিবংশে আমরা একরূপ সমাজ দেখিতে পাই মহাভারতেও সমাজের উল্লেখ আছে। কুরুপাণ্ডবগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সমাজের ব্যবস্থা হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ক্ষেত্রেও সমাজের উল্লেখ আছে। এই তিন ক্ষেত্রেই নরপতিগণ সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রেও সমাজের উল্লেখ আছে। দুইটির দৃষ্টান্ত পাই। বিনয় ২।৫, ২,৬এ কয়েকজন প্রমত্ত ভিক্ষুর সমাজ এবং ৪।৩৭, ১৫ ভিক্ষুগণের স্নানাহারের সমাজের চিত্র পাই। এই শেষোক্ত সমাজের কথাই অশোক অনুমোদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত সমাজে মঞ্চ ও পর্য্যঙ্ক স্থাপনা করিয়া মদ্য, মাংসের এবং অভিনেতার এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইত; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বার সার্থকতা করা হইত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মোৎসব হইত। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে প্রথমোক্তের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে অভিনেতৃবর্গ সমবেত হইয়া অভিনয় করিতেন। জাতকেও এইরূপ সমাজপ্রসঙ্গে দৃষ্ট হয় যে, অভিনেতৃবর্গ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া যে অভিনয় করিতেন, তাহাকে সমাজ বলা হইত। যে 'সমাজে' মদ্য, মাংস ব্যবহৃত হইত, অবশ্য অশোক সে সমাজের প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না। অশোকের সমাজে ধর্ম্মালোচনা হইত এবং এইরূপ সমাজই তিনি উপকারী মনে করিতেন।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের যে সকল পথ গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনুশাসন উৎকীর্ণ-লিপিই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাচীন ভারতে, বিশেষতঃ মৌর্য্যযুগের, অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে এই অমূল্য অশোক অনুশাসনাবলীর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে অশোক-অনুশাসনের অনেক দুরূহ স্থল বোধগম্য হইয়াছে। তথাপি যে ভাবে এই অনুশাসন পাঠ প্রয়োজন, তাহা নানা কারণে হইয়া উঠিতেছে না। অনুশাসনের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুপাঠ্য সংস্করণেরও প্রয়োজন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বিচ্ছেদ-মিলন

(অলৌকিক চিত্র)

১

নিরঞ্জন ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, আলো ও অন্ধকার ছাড়া পূর্ণিমা অমাবস্যার যে কিছু প্রভেদ আছে, তা ত বুঝতে পারি না।

আশুতোষ, ইহার ভগ্নীপতি। সবিস্ময়ে শ্যালকের মুখ চাহিয়া বলিলেন, বল কি! বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট-গুলো সব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ, বল!

কেন? হয়েছে কি?

আরে রাম রাম! যে সাদা কাল ছাড়া অমাবস্যা পূর্ণিমার আর কোন তফাৎ বোঝে না, সে হ'ল প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার! যে একটা চাঁদের মূল্য বোঝে না, তার খেতাবে দু' দুটো চাঁদ! কি অবিচার! আচ্ছা, ভায়া, এই যে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে, ফূর্ত্তিতে ফুলগুলো গন্ধের সদাব্রত খুলে দিয়েছে, তার ওপর ফুরফুরে বাতাস; আর কোকিলটার ঐ যে ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে যাচ্ছে, এতে কি তোমার প্রাণ কোন সাড়াই দিচ্ছে না?

মোটেই না। দেখুন, দাদা, আমি প্রাকৃটিক্যাল্ লোক—বাস্তব-রাজ্যের মানুষ—ভাবুকতার ধার ধারি না।

আরে, আমিই কোন্ অবাস্তব-রাজ্যের কথা কইছি! চাঁদের আলো দেখতে পাও না, না, ফুলের গন্ধ তোমার নাকে যায় না? হাওয়া ত আর পলিটিক্যাল্ নেতা নয় যে, কোন্ দিকে বইছে ঠিক পাওয়া যায় না, আর কোকিলগুলোও প্রাইভেট কন্ফারেন্স করে না। তারা যা অনিষ্ট করে, ডেকে হেঁকেই করে। এ সব যে প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু প্রাণ খামকা সাড়া দেবে কেন? অবশ্য, এ সবের যদি কোন অর্থ থাকৃত—

আশুতোষ একটু অধীর হইয়াই বলিলেন, অর্থ নেই? ভগবান্ কি তবে এই সব নিরর্থক সৃষ্টি করেছেন?

ভগবান্ আবার কি? সৃষ্টি আপনা হ'তে হয়েছে। এ তর্ক ত হ'য়ে গিয়েছে, দাদা! আমার সাংখ্যের মত—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

থাম, থাম, ভায়া! প্রমাণ নাই বলেই যে, তিনি নাই, এ কথা কেমন করে বলছ?

থাকুন না থাকুন, যাঁকে ধরতে-ছুঁতে পারা যায় না, থাকার কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারে না, তাঁর কথায় কি দরকার?

আশুতোষ একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, তা বটে! কিন্তু তাঁকেই যখন মান না, তখন তাঁর সৃষ্টির মানে বুঝবে কি ক'রে!

নিরঞ্জনও একটু অধীর হইয়া বলিল, বেশ ত! বুঝিয়ে দিন না। আপনি বললেন, কোকিলগুলো যে অনিষ্ট করে তা ডেকে হেঁকেই করে। ওরা ডাকছে ওদের জোড়াকে।

কও কথা! আমিই কি বলছি পানিপাঁড়েকে ডাকছে? কিন্তু ঐ যে কাতর আহ্বান, ওতে সকল বিরহীর হৃদয়ে ঘা লাগে।

কিন্তু কাক, চিল, কালপেঁচা, হাঁড়িচাঁচা, কাঠঠোক্‌রা, কাদাখোঁচাও জোড়ার সঙ্গে মেলবার জন্যে চীৎকার করে, কৈ তাদের স্বরে ত কোন বিরহীর হৃদয় সাড়া দেয় না?

কি আপদ! সমবেদনা সহানুভূতি ব'লে কিছু নেই? কোকিলের স্বরে সেই সমবেদনার উদ্রেক করে। যে দূরে আছে, তাকে কাছে পেতে ইচ্ছা হয়; যম যার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, তার জন্যে—

আশুতোষের স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। নিরঞ্জনের ভগ্নী নীলিমা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী। আজ অকস্মাৎ তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্মৃতি তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। তবে সে ক্ষণিকের জন্য। নীলিমার মুখখানি মনে উঠিতেই সে ভাব মিলাইয়া গেল। কিন্তু নিরঞ্জন যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা তিনি জানিতেই পারেন নাই। তাঁহার মোহজাল ছিন্ন করিয়া দিয়া হঠাৎ সে বলিল, ছি ছি, দাদা, আপনার প্রবীণ বয়স—

আশুতোষ তাঁহার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা পরিহাসে পরিণত করিয়া বলিলেন, সাবধান ভায়া, ও কথা আমার কাছে যা বললে, তোমার ভগ্নীর কাছে বোল না।

নিরঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা না-ই বল্লুম। কিন্তু যম যার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, দীর্ঘকাল পরে তার জন্যে আপনার বিচলিত হওয়া—

আ সর্ব্বনাশ! তুমি কি লিলীকে এই সব ব'লে একটা কাণ্ড বাধিয়ে মজা দেখ্‌তে চাও?

তা চাইনে, কিন্তু জান্‌তে চাই, এ কি ক'রে সম্ভব হয়? আপনারা যে বলেন, ভালবাসা অব্যভিচারী—তার এক বৈ দুই পাত্র থাকে না।

আশু বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলেন, সে কি ভায়া, যে পদ্মফুল ভালবাসে, সে কি গোলাপফুল পছন্দ করে না, না, সন্দেশ খেলে রসগোল্লা মিষ্টি লাগে না? প্রথম স্ত্রী গেলে দ্বিতীয়ের উপর ত ভালবাসা হয়ই, আমার বিশ্বাস, এক সঙ্গেই দু'জনকে ভালবাসা যায়। পুরাণে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মান কি না?'

নিরঞ্জন গম্ভীর হইয়া বলিল, থাকতে পারে, আমি ওসব বুঝি না। দেখুন, দাদা! ভালবাসা, দয়া, মায়া, চাঁদের আলো, ফুল, কোকিল, মলয়-মারুত, ওসব ভাবুকতা—নিছক কল্পনা। চাঁদ উঠ্‌লো, অমনি কেউ তা'তে প্রণয়িনীর মুখ দেখলেন। ফুল ফুট্‌ল, কেউ তা'তে দেখলেন, প্রিয়ার হাসি, না হয়, তার চোখ! কিন্তু দাদা, সাতাস-আটাস বচ্ছর বয়স হ'ল, ফুল কখন আমার পানে হেসেও চাইলে না, বাতাসও কানে সারে-গামা সাধলে না। চাঁদে কলঙ্ক ছাড়া কারুর মুখ কখন ত দেখ্‌লুমই না; আর পাপিয়ার ডাক শুনে, পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা বল্‌তে বল্‌তে আপনার শালাজের সন্ধানেও কখন ছুটলুম না।

ধন্য তুমি!

তা না-ই বলুন। কবি, ধর্ম্মপ্রচারক, এরাই সব কতকগুলো অস্বাভাবিক ভাবুকতা সৃষ্টি ক'রে মানুষের হাড়-গোড় সব মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। ক্রমে এই অস্বাভাবিক ভাবুকতায় অস্বাভাবিক মানুষ জন্মাবে। তারা কেবল ফুলের মত ফুট্‌বে আর ঝরে পড়বে।

আশু একটা কি বলিতে যাইতেছিলেন, নিরঞ্জন তাঁহাকে হাত তুলিয়া বাধা দিয়া কহিল, জার্ম্মাণ পণ্ডিতরা কি বলে জানেন? দয়া, ধর্ম্ম, এমন কি শত্রুকেও ভালবাসা, এই সব প্রচার ক'রে ক্রাইষ্ট্ জগতের যত অনিষ্ট ক'রেছেন, আপনার সৃষ্টির কোকিল একত্র হ'য়ে তা পারেনি। মানুষকে আবার ভেঙ্গে গড়তে হবে।

কি রকম মানুষ গড়তে হবে?

অতি-মানুষ। তার দয়া, ধর্ম্ম, ভালবাসা, কাব্যের ভাবুকতা, সহানুভূতি এ সব বালাই থাক্‌বে না।

তবে থাক্‌বে কি?

থাক্‌বে এক লক্ষ্য, কর্ত্তব্যজ্ঞান, আর তা সাধন করবার মত সাহস, বীর্য্য।

আর সিং, ল্যাজ, নখ, দাঁত কিছুই থাকবে না? তুমি বেশী পড়েই মাটী করেছ? অতিভোজনে যেমন বদ্‌হজম হয়, বিদ্যার তোমারও তেমন বদহজম হয়েছে।

তাও ভাল, তবু এ সব দুর্ব্বলতার হাত থেকে ভগবান্ যেন আমাকে রক্ষা করেন!

কে রক্ষা করবে?

নিরঞ্জন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ওটা কথার কথা—মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। সংস্কারের দোষ দেখুন, দাদা! এ সব সংস্কার ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে হবে।

তা যেন ফেল্‌লে, কিন্তু সহানুভূতি না থাকলে, পরস্পরে বন্ধনই বা থাক্‌বে কি করে, আর জাতিই বা হবে কিসে?

কর্ত্তব্যের বন্ধন থাকবে। এই যে শত্রুজয় উপলক্ষে কোটি কোটি মানুষ শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে যুদ্ধস্থলে প্রাণ দেয়, আপনি কি বলতে চান, এরা সব পরস্পরে সহানুভূতি-সম্পন্ন? আমার এই তুচ্ছ জীবনের খুব বড় একটা গর্ব্ব কি জানেন? শোকে, দুঃখে চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল কখন পড়েনি।

আশুতোষ সোৎসাহে উঠিয়া বলিলেন, দাও ভায়া, পায়ের ধুলো দাও, তুমি মুক্ত পুরুষ!

কি করেন, কি করেন!

ব্যস্ত হও কেন ভায়া, কি বল্‌ব তোমার দুটো পা, চারটে থাক্‌লে তবে পায়ের ধুলো নিয়ে সুখ হ'ত! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই যে পি, আর, এস্, পাশ-করার টাকাগুলো হাঁসপাতালে দিলে, এ কি পীড়িতের সঙ্গে সহানুভূতি নয়?

একদম্ নয়। শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানে। দেশের লোক সুস্থ না থাক্‌লে দেশের কাম করবে কে?

এই সময় একটি অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী একখানি

আধময়লা কস্তা-পেড়ে শাড়ী পরে জলখাবারের পাত্র হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া আশুতোষের সম্মুখে ধরিয়া দিল। যুবতীর কেশবন্ধনে কোন পারিপাট্য নাই, লোহা ও শাঁখা ভিন্ন অঙ্গে আভরণের লেশমাত্র নাই। কিন্তু তবু আকাশের ওই জ্যোৎস্নার মত, তাহার সর্ব্বাঙ্গে রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। আহার করিতে করিতে আশুতোষ বলিলেন, আচ্ছা, বৌদি, যখনই আসি, দেখি, একখানা আধ-ময়লা কাপড় পরে আছ। এর মানে কি?

মানে অন্তর্যামীই জানেন! বৌদিদির অধরে একটু হাসির রেখা দেখা দিল মাত্র। জলযোগ সম্পন্ন হইলে সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আশুতোষ তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা ভায়া, রাগ না কর ত' একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

একটা কেন, হাজারটা করুন।

যদি ভালই বাস্‌বে না, তবে বে' করা কেন?

বাঃ! বে' না কর্‌লে সংসার চল্‌বে কি করে? পুরুষ বাইরের কায কর্‌বে, স্ত্রীলোক অন্দরের।

বাঃ! সে কি তোমার দাসী?

কে বল্‌লে? সংসারের কারবারে স্ত্রী—পুরুষের অংশীদার! সব কাযেই শ্রমবিভাগ চাই—ডিভিসান্ অব্ লেবার্।

বেশ! কিন্তু কারবারের একটা ত মূলধন থাকা চাই।

চাই বৈকি! কিন্তু তা রূপ-যৌবন-ভালবাসা নয়—কর্ত্তব্য। তা'তে মোহ নেই।

নাই বল্‌লেই যদি না থাকে, তা হ'লে ভাবনা কি? আচ্ছা ধর, আজকের এই পূর্ণিমার রাত্রি, ফুলের গন্ধ, কোকিলের স্বর, আর ফুর্‌ফুরে বাতাস, সব যদি হঠাৎ মূর্ত্তি ধ'রে, এই জ্যোৎস্নার মত একখানি ফিন্‌ফিনে সাড়ী প'রে, ফুলের গয়না গায় তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, তা হ'লে কি হয়?

নিরঞ্জন হো হো করিয়া খুব একচোট হাসিল, তার পর হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হইয়া গেল।

২

নিরঞ্জনের স্ত্রী সুরবালা দরিদ্র ঘরের মেয়ে। অর্থাভাবে একটু বেশী বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কবিরা বলেন, মিলনের প্রথম রাত্রি—জীবনের সন্ধিক্ষণ। এই পরম মুহূর্ত্তে পরিণয়ের চরম সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু প্রথম যৌবনের উদ্দাম আবেগ লইয়া স্বামীর কক্ষে প্রথম চরণক্ষেপ করিয়াই সুরবালা বুঝিয়াছিল, এ তাহার মিলনের পুণ্য-প্রয়াগ নহে, জীবনের কুরুক্ষেত্র।

ফুলশয্যার পরদিন সকাল বেলা ননদিনী নীলিমা যখন নববধূর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া মৃদুগুঞ্জনে গাহনা দিল, 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হ'ল মরি লাজে'—তখন নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ—'রাত ঢের হ'য়েছে, শুয়ে পড়, নইলে অসুখ কর্‌বে।'

কথা কয়টার ভিতর এমন কিছুই ছিল না যে, সত্য অশান্তি সৃষ্টি করিতে পারে। বরং যদি কিছু থাকে ত তাহার স্বাস্থ্যের জন্য স্বামীর অযাচিত উদ্বেগ ও অকারণ উৎকণ্ঠা। তথাপি সুরবালার মনে হইল, যেন তাহার বুকের ভিতর বৃহৎ তরঙ্গের মত কি একটা ফাঁপিয়া উঠিতেছে। দুই হাতে সবলে বুক চাপিয়া সে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল এবং অল্পক্ষণেই বুঝিল, স্বামী সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন!

বিবাহিতা বাল্য-সঙ্গিনীদের মুখে এই রহস্যময়ী রজনীর কত না কাহিনী সুরবালা শুনিয়াছে! আজই নিদাঘ মধ্যাহ্নে নিভৃত কক্ষে বসিয়া তাহার সৌভাগ্যশালিনী ননদিনী এই প্রথম মিলন-রাত্রির মাদকতা কত না বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার সহজ ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অপূর্ব্ব রং ফলাইয়াছে! হায়, কোথায় সে মত্ততা, সেই অপরূপ কথা—মুখ যাহা লজ্জায় প্রকাশ করিতে চায় না, চোখ বলিয়া দেয়! সেই মনে মনে বোঝাপড়া, ভাবে ভাবে ভাঙ্গাগড়া, প্রাণে প্রাণে পরিচয়; স্পর্শে স্পর্শে মাতামাতি, হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময়? কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা তাহার ওষ্ঠপুট হইতে তৃষ্ণার জল কাড়িয়া লইল! সুরবালা শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে অধিকার করিতে আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

হায়, কত তুচ্ছ ব্যাপারের উপর জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা নির্ভর করে! সুবাসিত কক্ষ, সুসজ্জিত শয্যা, মধুময়ী রাত্রি, সুরবালার মনে হইল, বিস্বাদ—বিস্বাদ—সব মিথ্যা! ফুলের হার ধূলায় ফেলিয়া দিয়া দুরো তাহার দুর্ব্বহ দেহভার ভূমিশয্যায় ঢালিয়া দিল। এক একটি

প্রকৃতি আছে, যাহা অল্পে আঘাত পায়; অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মত ছোটকে অত্যন্ত বড় করিয়া তুলে। সুরবালার মনে হইল, বাঞ্ছিত বন্দরের আশায় যে সাগরে সে তরী ভাসাইয়াছে, তাহার শেষ নাই। এই উপেক্ষার রাত্রি তাহার জীবনে আর ফুরাইবে না।

নীলিমার কণ্ঠস্বরে সচকিতে যখন সে অঞ্চল সংবৃত করিয়া উঠিয়া বসিল, তখনও তাহার চোখের কোলে অশ্রুর শুষ্ক রেখা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। ঠোঁটের হাসিতে তাহা ঢাকা পড়িল না। নীলিমার মুখের গান মুখে রহিয়া গেল—এ কি! কিন্তু কৌতূহল ও বিস্ময় আপাততঃ দমন করিয়া বধূর এই লজ্জার চিহ্ন লোকের চোখে গোপন করিতে সে তাড়াতাড়ি তাহাকে স্নানাগারে পাঠাইয়া দিল।

সারাদিন নীলিমার জিজ্ঞাসু চক্ষুকে সুরো এড়াইয়া চলিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ননদিনী বিদায় লইতে আসিলে সে ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'ঠাকুরঝি, আজ রাতটা থাক।'

কেন, বৌ?

থাক না।

তাহার কাতর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া নীলিমা প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে বল্ না। বর পছন্দ হয় নি?

সুরবালা নীরবে আঙুল খুঁটিতে লাগিল। নীলিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা ভাই, হাঁড়ি কলসি ত' নয় যে, বদলে নেবে! যা পেয়েছ, তাই নিয়ে ঘরকন্না করতে হবে।

হায় রে ঘরকন্না! এই কি ঘরকন্না করিবার বয়স! লিলী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বধূর মুখপানে চাহিয়া দেখিল, তাহার আয়ত চক্ষুদুইটির কোলে জল টল্ টল্ করিতেছে। কি যেন বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। সে জিজ্ঞাসিল, আমায় কিছু বল্‌বি?

তুমি আজ থাক।

কেন?

আমি তোমার কাছে থাকব।

লিলী অনুমান করিল, দাদার কোন ব্যবহারে বধূ অভিমান করিয়াছে, তাই তাঁহার সঙ্গ এড়াইতে চায়। ঐ ত কাট-খোট্টা মানুষ! কিন্তু ইহার প্রশ্রয় দেওয়াও ত উচিত নয়। পরিহাস করিয়া বলিল, তুমি ভাই ভারি আপ-গন্নে! আমি থাকলে আমার বরের দশা কি হবে?

ঠিকই ত। এ কথা ত সুরো ভাবে নাই, ইহার স্বামী ইহার সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন কিন্তু আমার আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে লিলী চকিত হইল। যাইবার সময় পরম স্নেহের স্বরে সে বলিয়া গেল, বৌ, একটা কথা মনে রাখিস্, বোন্, আমার চেয়ে হিতৈষী আর তোর কেউ নেই।

ননদিনীকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনতার আকাঙ্ক্ষায় বধূ ছাদে উঠিয়া দেখিল—স্বামী। ছি ছি! কি লজ্জা! কালিকার প্রত্যাখ্যানের পর যদি উনি মনে করেন, আমি ওঁর কাছে এসেছি। সুরো মরমে মরিয়া গেল। অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিকেই আর তাহার পা চলিল না।

নিরঞ্জন তখন ভাবিতেছিল, তাহারই কথা। সারারাতই কি ভুঁয়ে শুয়েছিল? কিন্তু কি সুন্দর! যেমন রং, তেমনই শ্রী! চোখ, মুখ, নাক, সবই নিখুঁত! আচ্ছা, রংটা কিসের মতন? মল্লিকা? নাঃ! চাঁপা? রাম! গোলাপ? কতকটা বটে। ও বাবা, আমাকেও যে দেখছি কবি করে তুললে! বোঝা গেছে, এমনি কতকগুলো আগড়ম বাগড়ম ভাবাই কবিত্ব। না-সত্যি, না-মিছে! ও সব নিয়ে কারবার আমার পোষাবে না। এরই মধ্যে মমতা হচ্ছে! কেবলই মনে হচ্ছে, সারারাত ভুঁয়ে পড়ে রইল। তা রইলই বা। শোয়া ত ঘুমের জন্য? বেশ ত ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু নিশ্বাসটা থেকে থেকে কাঁপছিল কেন! আবার ঠোঁট-দুখা'নর কোণে একটু হাসিও দেখলুম। বোধ করি, স্বপ্ন দেখছিল। কাকে? আমাকে? তা যদি হয়, বারণ করে দিতে হবে, আমাকে স্বপ্ন-টপ্ন দেখা হবে না। এই দেখ! কি ভাবছি! স্বপ্ন কি কারুর হাতধরা? না, এরই মধ্যে আমাকে কাবু করে ফেলেছে। মনকে বিশ্বাস নাই। সাবধান থাকতে হবে, বেশী ঘনিষ্ঠতা করা হবে না।

এমন সময় তাহার দৃষ্টি পড়িল—বধূর উপর। নিরঞ্জন চমকিয়া উঠিল। এই দেখ! তাড়া করে যে! ইংরাজরা ত বলে মিথ্যা নয়, শয়তানকে স্মরণ করলেই হাজির। কি চায় ও? আর যা-ই চাক, সব পাবে, ভালবাসা-টাসা হবে না। সে ভুল ওর ভেঙ্গে দিতে হবে।

ভুল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বধূর কাছে আসিল। চক্ষু আর ফিরাইতে পারিল না। প্রথম যৌবনে এ কি রমণীর মাধুরী, কমনীর তারুণ্যকে

তাহার অঙ্গে অঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে! চাঁদ তাহার মিশ কালো এলোচুলে কি বিচিত্র ছায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছে? বাতাস তাহার স্পর্শের মাদকতায় যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও গৌরবে নিরঞ্জনের বুক ফুলিয়া উঠিল—এই আমার স্ত্রী! তখনকার মত ভুল ভাঙ্গা হইল না বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষিত মন তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল, এমনই করিয়াই মানুষ মজে। না, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সাধ্যমত সাবধান থাকিতে হইবে। সে বধূকে কহিল, তোমার বুঝি একলা শোয়া অভ্যাস—আমার মত? তা বেশ ত! ছুঁয়ে পড়ে থাক্‌বার দরকার কি? আমার পাশের ঘরেই তোমার বিছানা হোক্ না কেন? কেমন? আমি এখনই বন্দোবস্ত কর্‌ছি।

বধূর সম্মতি বা উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া নিরঞ্জন নীচে নামিয়া গেল এবং এমনই করিয়া বিচ্ছেদ-মিলনে দাম্পত্য-জীবনের সূত্রপাত হইল। কিন্তু নিরঞ্জনের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। স্মৃতি একটি অনিন্দ্যসুন্দরমূর্ত্তি গঠন করিয়া আনে, হৃদয় তাহাকে কাছে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। মন বলে, সাবধান! একটা দুর্নিবার আকর্ষণে নিরঞ্জন বধূর শয়নকক্ষের দ্বার অবধি যায়, আবার ফিরিয়া আসে; শয্যাপার্শ্ব মনে হয়—বিষম শূন্য।

এমনই করিয়া দিন বহিতে লাগিল। যে গৃহে শাশুড়ী বা অপর কর্ত্রীস্থানীয়ার অভাব, সে সংসারে বধূ-জীবন শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়। সুরবালা অচিরে গৃহিণীপদ অধিকার করিল।

নিরতিশয় বিপদে পড়িল—নিরঞ্জন। সুরবালা সেই সেকালের গৃহিণীদের মত সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় নিজহস্তে ধুপ দীপ গঙ্গাজল দেয়, প্রণাম করে; রামায়ণ, মহাভারত পড়ে। নিরঞ্জন অনেক বুঝাইল, রাগ করিল। কিন্তু বুঝাইলেও কোন ফল হয় না, আর রাগ করিয়াও থাকা যায় না। যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, তাহার মুখদর্শন করিতে নাই। হায়, প্রতিজ্ঞা করা সহজ, রাখা কঠিন। যে মুখ সে দেখিতে চায় না, বার বার করিয়া তাহাই তাহাকে আকৃষ্ট করে। যতই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, নিজের উপর ততই তাহার রাগ বাড়ে। ক্রমে আপনার উপর যতই রাগ বাড়িতে লাগিল, স্ত্রীর প্রতি তাহার ব্যবহার ততই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল।

৩

'আঃ! তোমার হাতখানি কি নরম—বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা!

কয়দিন হইল নিরঞ্জনের জ্বর—ম্যালেরিয়া। তপ্তললাটে স্ত্রীর কুসুম-শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া দুই হাতে তাহার হাতখানি ধরিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অতি রূঢ়ভাবে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে হাঁসপাতালে না যাইয়ে নিশ্চিন্ত হবে না? জগুয়াকে ডেকে দাও। বলিয়া নিরঞ্জন পাশ ফিরিয়া শুইল।

জগুয়া পুরাণ চাকর। জ্বর আসিবার মুখে ছট্‌ফট্‌ করিয়া নিরঞ্জন যখন আ-উ করিতেছিল, সে তখন ঢুলিতেছে। সুরো স্বামীর কাতরোক্তি শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। জগুয়া বধূর উপর তাহার সদ্যোন্মীলিত রক্তচক্ষু স্থাপন করিয়া কহিল, আপনি কেনো আসিয়েছে, বহুমা? বাবু মাঙ্গে না, আপনি কেনো আসে। হামিলোগ কি কামে আসে?

নিরঞ্জন ধমক দিল, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই থাম! হামিলোগ কি কামে আছে! তুমি লোক আছ, ডাল-রুটীর শ্রাদ্ধ কর্‌তে আর ঘুমুতে। নে, বরফ কেটে মাথায় দে।

জগুয়া তাড়াতাড়ি বরফ কাটিয়া আনিল। নিরঞ্জন স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, সুরো!

বাবু চাহে না! এই বর্ব্বর কাহারটাও তাহার হেনস্থা বুঝিয়াছে। সুরো উত্তর দিতে পারিল না। অশ্রুর অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিয়াছে। পরক্ষণেই তাহার কানে গেল, এত বারণ করি, ম্যালেরিয়া জ্বর—ছোঁয়াচে—

সুরবালা বুঝিল, ভৃত্যের সমক্ষে স্বামী তাঁহার সাফাই গাহিতেছেন। নিরঞ্জন আবার ডাকিল, সুরো!

ধীরে ধীরে সুরবালা কাছে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইল। নিরঞ্জন বলিল, এ ঘরে আস্‌তে তোমাকে বারণ করিনি?

সুরো উত্তর দিল না। নিরঞ্জন ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তবে? হাঁসপাতালে গেলে সুখী হও?

সুরো কোন দিন স্বামীর রূঢ় ব্যবহারের বা কথার কোন প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করে নাই। তবে আজ নাকি তার বুকের ভিতর বড় চিন্ চিন্ করিতেছিল, মৃদুস্বরে বলিল, জগুয়া ত রয়েছে।

জগুয়া আর তুমি?

আমি আর কি——

কথা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে আপনার উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। নিরঞ্জন জগুয়ার হাত হইতে বরফ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, হারাম-জাদা! জ্বালা করছে কোথা, আর বরফ দিচ্ছিস কোথা? দূর হ।

সুরো শুনিল, জগুয়া দাস দাসী মহলে প্রচার করিতেছে, বহুমা ঘরে যাইতে বাবুর মেজাজ একদম বিগড় গিয়া।

অনতিপরেই নিরঞ্জন সারিয়া উঠিল। আজ তাহার জন্মতিথি পূজা। স্বামীর চিত্রপটখানি পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া সুরবালা একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। কখন যে নীলিমা আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহাকে চকিত করিয়া লিলী প্রশ্ন করিল, কি লো, আসল থাকতে নকল কেন?

আসলটা যে বিলিয়ে দিয়েছি ভাই!

কাকে?

তোমাকে।

মরণ আর কি!

আমি মরি তোমার জন্যে, কিন্তু তোমার কি আক্কেল! আমাকে না হয় দু'চোখে দেখতে পারিস্নি, ভায়ের অমন অসুখ গেল, একটিবার উঁকি মারতে নেই?

লিলী করযোড়ে কহিল, 'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি---'

'ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড' বলিয়া সুরো লিলীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। তারপর জিজ্ঞাসিল, ভাল, ঠাকুর-জামাইকেও ত একবার আসতে হয়।

নীলিমা স্বামীর কাছে একটু আধটু ইংরাজী শিখিয়াছিল। মাঝে মাঝে রাজভাষার বুকনি দিত। বলিল, ভেরি সরি! কিন্তু তিনিই কি সুস্থ আছেন?

সুরো উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, ঠাকুর-জামায়ের অসুখ! তা ত শুনিনি! কি হয়েছে?

রোগ কি একটা! ক'টার কথা বল্‌ব? একের নম্বর—আমি। দুইয়ের নম্বর—আপিসের সাহেব আছেন। তেসরা নম্বর—তাঁর দাদ-চুলকান আছে। তারপর গড়গড়ার নল—

সুরো একটু হাসিয়া বলিল, তা হলে একটি হাঁস-পাতাল ক'রে বসে আছেন বল? তা হোক্, তোমার ত আর কোন রোগ নেই -

রোগ নেই? বলিস্ কি লো? একেবারে ঘোর বিকার! ধাত ছেড়েছে। বলিয়া লিলী জিজ্ঞাসিল, তুই কি কিছু জানিস্নি নাকি?

সুরো ঘাড় নাড়িল—না।

দাদা যে আমাদের বয়কট্ করেছিলেন।

সে কি?

চিঠি গেল, আমার ম্যালেরিয়া। তোমরা এখন কেউ এ বাড়ীতে ঢুকো না। তুই ঘরে ঢুকতে পেতিস ত?

আমি ত বরাবরই বয়কট্ হ'য়ে র'য়েছি।

মহাপুরুষ গেলেন কোথা?

আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চলা-বলা হয় কি না! সে সব জগুয়া জানে।

সুরোর বুকের ভিতর একটা সুদীর্ঘ শ্বাস মুক্তি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। লিলী আলোচনাটাকে উল্টাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, আজ হঠাৎ তোর এত জোর তলব কেন?

সুরো সেই সজ্জিত চিত্রপট দেখাইয়া কহিল, আজ যে জন্মতিথি পূজো।

ও! তাই নিমন্ত্রণ? কি রাঁধলি বল?

রাঁধব আর কি? রোজ যা হয়, তার এক চুল এদিক ওদিক হবার যো আছে?

ও মা, সে কি! আজ যে পায়েস খেতে হয়! তুই রাঁধ বৌ!

ঠাকুরঝি! আমার বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। তোর পায়ে পড়ি, ভাই! আমাকে আর কিছু বলিস্নি। লেখা-পড়া তেমন জানিনি, সখ ক'রে রান্না শিখেছিলুম, সবই মিছে হ'ল! যত্ন ক'রে এটা ওটা রেঁধে পাতে দিয়েছি, হাত দিয়ে ঠেলে দিয়েছেন, জলে ফেলে দিয়েছি!

সুরোর কপোল দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়াইয়া

পড়িতে লাগিল। লিলী সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া কহিল, তা হোক্, আজ ত রাঁধ।

কার জন্যে?

আমার জন্যে।

তবু ভাল, এত কাল পরে কপালে একটা খদ্দের জুটলো?

এই সময় হরির মা, বুড়ী ঝি, আসিয়া নীলিমাকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, বলেছিলে?

সুরো তাহার অভিনয় দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, কি হরির মা?

লিলী বলিল, সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে একজন বামুন না কে এসেছে, সে নাকি ভারি গুণী—'

লজ্জায়, ঘৃণায়, রোষে সুরবালার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরিতে লাগিল। বলিল, 'লিলি! এ অপমানও আমার অদৃষ্টে ছিল? স্বামীর ভালবাসার জন্য গুণগান্ কর্‌তে হবে? সুরো কাঁদিয়া ফেলিল, ঠাকুরঝি! দাসী-চাকরের ভেতর এই ঘোঁট, এই কানাকানি—আমি স্বামীর চ'ক্ষের বিষ। এমন ক'রে চারিদিক থেকে খোঁচালে আমি বাঁচবো কেমন ক'রে?

রাগ কোর না ভাই! তুমিই ত তার পথ ক'রে দিয়েছ। তোমার এই সোমত্ত বয়েস, গয়নাগাটি পর্‌বার সময়। তা চুলোয় যাক্, তোমার অঙ্গে একখানা ভাল কাপড় ওঠে না। মুখে হাসি নেই, দিনরাত মরমে ম'রে রয়েছ। একখানা ফরসা কাপড়ও কি পর্‌তে নেই?

কার জন্যে প'র্‌ব?

কেন, নিজের জন্য। আমি হ'লে এমনভাবে চল্‌তুম যেন কিছুই হয়নি। জোর ক'রে আপনার মুখ হাসাতুম, তবু লোক হাসাতুম না। আপনার লজ্জা আপনি ঢেকে নিতে হয়।

সুরো আবার কাঁদিয়া বলিল, দিদি! স্বামীর মনের মত হ'তে পার্‌লুম না, এ লজ্জা আমি কোথায় লুক'ব?

আজকের দিনে চোখের জল ফেলিসনি। আচ্ছা, বৌ, তোর কি একটুও মনে হয় না, দাদা তোকে এতটুকু ভালবাসে?

নইলে কি নিয়ে বেঁচে আছি, দিদি? কিন্তু সে স্বামী আমার মনের গড়া। যখন ওঁর হেনস্থায় প্রাণ বড় কাতর হয়, তখন এই ছবিখানির কাছে এসে একটু জুড়ুই। মনে মনে এর সঙ্গে কথা কই। আমারই মন উনি হ'য়ে জবাব দেয়। আচ্ছা, ঠাকুরঝি, স্বপন কি সত্যি হয়।

কেন, কেন? কি স্বপন দেখেছিস্?

সুরবালার মুখের উপর লজ্জার ঈষৎ আভা দেখা দিল।

নীলিমা অধিকতর কৌতূহলে জিজ্ঞাসিল, কি স্বপন দেখেছিস্, বল্ না?

আজ ক'দিন ধ'রে দেখছি, পদ্মফুলের কুঁড়ির মত একটি ছেলে আমার বিছানার পাশে এসে মা' ব'লে ডাকে। তাকে কোলে নেবার জন্য বুকের ভিতর যে কি করে, তা কি বল্‌ব! কিন্তু ধর্‌তে গেলেই সে হেসে পালিয়ে যায়। লিলি! সে হাসি দিনরাত আমার চোখে লেগে রয়েছে।

নীলিমার শ্বশুরকুল বৈষ্ণব। তাহার মনে হইল, হয় ত শ্যামসুন্দর এই চিরদুঃখিনীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গোপাল-বেশে স্বপ্নে এসে দেখা দেন। সে জিজ্ঞাসিল, কি রকম ছেলে, লো? দিব্যি গোলগাল ননীর পুতুলটির মত?

সুরো বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তুই কেমন ক'রে জান্‌লি! তুইও কি তাকে স্বপ্নে দেখিস্?

আমার এমন কি বরাত, ভাই? তার রং কেমন বল্ দেখি? ঘাসফুলের মত—নীল?

না, না, সে ঠাকুর নয়, সে খোকা।

সায়াহ্নে লিলী অতি যত্নে বধূর কবরী রচনা করিল, কপালে টিপ দিল, মনের মত চিকণ বসন পরাইল; তাহার পর একটি আধফোটা গোলাপ কবরীতে পরাইয়া ও কণ্ঠে কুসুম হার দিয়া তাহার মুখখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার-বার দেখিতে লাগিল। সুরো অতিষ্ঠ হইয়া প্রশ্ন করিল, এ কি হচ্ছে, আমি কি পুতুল?

পুতুল ছিলি, আজ তোর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল। খবর-দার বল্‌ছি! আমার মরামুখ দেখবি, যদি খুল্‌বি।

আমি যে লজ্জায় ম'রে যাচ্ছি।

পোড়ারমুখি! ঘরের চিত্রপট পানে চাহিয়া সেজে থাকতে লজ্জা করে না? ...ার সর্ব্বস্ব দিয়েছি। ওই ছবি তিনি যে এ সব পছন্দ...

কে পছন্দ করে না লো?

না, ভাই, তিনি যদি দেখেন, আমি লজ্জায় ম'রে যাব।

যাস্ যাবি। লক্ষ্মীটি আমার, একটা দিনের জন্যে আমার সাধ মেটাতে দে।

সত্যি বল্‌ছি, ঠাকুরঝি! আমার ভারি ভয় করে।

কচি খুকী আর কি! এখানে ত আর দাদা নেই।

না ভাই, যদি এসে পড়েন?

কেন? লুকিয়ে সন্দেশ খাস্ কি না দেখতে?

সুরো হাসিল। বলিল, না, তোকে দেখতে।

লিলী মুখবিকৃতি করিয়া বলিল, ওঃ! টান ত কত!

টান না থাক, কর্ত্তব্যজ্ঞান যে টনটনে।

বৌ, তুই যে ভারি গো-বেচারা! নইলে তোর হাতে এত অস্ত্র থাক্‌তে—

অস্ত্র ত চোখের জল?

সে ত' অনেক বর্ষণ করেছ। আর কি কিছু নেই?

আমার হাতে আর কিছু নেই। তোর যদি থাকে ত পরখ ক'রে দেখ্।

লিলী বধূকে শাসন করিবার জন্য হাত তুলিতেই নিরঞ্জন ডাকিল, লিলি! ঘরে আসিতেই সুরবালার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। কিছুক্ষণ বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া মুখ বিকৃত করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, সেজেগুজে যে মন ভোলাবার চেষ্টা করে, তাকে কি বলে জানো? ছিঃ!

৪

ঠাকুরঝি! আমার খোকা?

সুরো নিষ্পলক-নেত্রে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ যেন নিদ্রাভঙ্গে চকিত হইয়া চারিদিক চাহিতে চাহিতে কহিল, দেখ্ লিলি, আমার সেই স্বপ্নের ছেলে সত্যি হ'য়ে এসে আমাকে মা ব'লে ডাক্‌ছিল।

লিলী বধূকে বাতাস দিতে দিতে জিজ্ঞাসিল, মাথায় বরফ দেব?

সুরো ঈষৎ হাসি[illegible] ধবলা গিরি এনে মাথায় [illegible] সরি! কিন্তু তিনিই কি সুস্থ হ[illegible]

সুরো উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, [illegible] আঘাত করিয়া নিরঞ্জন তা ত শুনিনি! কি হয়েছে? [illegible] ধীর, স্থিরপদে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ক্যান্‌সার। চিকিৎসকের মুখে এই সাংঘাতিক সমাচার নিরঞ্জন সহসা ধারণা করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, ক্যান্‌সার! ক্যান্‌সার কি?

চিকিৎসক চুপ করিয়া রহিলেন। নিরঞ্জন পুনঃ প্রশ্ন করিল, ক্যান্‌সার হ'ল কেন?

কেন হ'ল বলা যায় না, তবে কখন কখন মনের অসুখ থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

মনের অসুখ? আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আস্‌ছি।

নিরঞ্জন ছুটিয়া গিয়া সুরোকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মনে কোন অসুখ আছে?

এ কি পরিহাস! নিদারুণ আঘাত করিয়া প্রশ্ন করিতেছে, লেগেছে কি? সুরো মৃদুস্বরে উত্তর দিল, না।

থাকে যদি, আমাকে বল। আমাকে না বল, ডাক্তারকে বল।

সুরো এবার প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, না, আমার মনে কিছু অসুখ নেই—আমার কোন অসুখ নেই। কে বললে আমার মনে অসুখ আছে?

শান্তস্বভাবা স্ত্রীর সহসা এই উত্তেজনা দেখিয়া নিরঞ্জন থমকিয়া বলিল, ডাক্তার।

ডাক্তার ছাই জানে বলিয়া সুরো দ্রুতপদে চলিয়া গেল। নিরঞ্জন ডাক্তারের কাছে আসিয়া বলিল, কৈ, মশাই, মনের অসুখ ও ত স্বীকার করে না।

তা না করতে পারেন, আর ঐ যে নিশ্চিত কারণ, তাও বলা যায় না।

বলা যায় না! তবে বল্‌লেন কেন? চুলোয় যাক্। আরাম ক'রে দিন।

এ রোগ শিবের অসাধ্য।

নিরঞ্জনের মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসিল, আরাম হয় না! এত সায়েন্সের উন্নতি, তবে কি হচ্ছে?

ছাই উন্নতি! আরাম করবার মত ব্যায়রাম ক'টা আরাম হয়? ক্যান্‌সার, যক্ষ্মা, এ সব বিধাতার মৃত্যুদণ্ড। তবে চেষ্টা করা যায়, যন্ত্রণা যদি কিছু লাঘব থাকে। তাও সব সময়ে হয় না।

খুব যন্ত্রণা বুঝি? খুব ছট্‌ফট্ করবে? তবে কি হবে? সহ্য করব কেমন করে?

আপনি অধীর হবেন না। চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্, বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন।

নিরঞ্জন তাঁহার হাতে দর্শনী দিয়া বলিল, দেখুন, আমার সর্ব্বস্ব পণ, যদি কোন উপায় হয়।

কিন্তু শান্তস্বভাবা সুশীলা সুরবালা অসীম যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিঃশব্দে সহ্য করিতে লাগিল—পাছে স্বামী অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। এমনই করিয়া দিনে দিনে চরম দিন অতি নিকট হইয়া আসিল। ডাক্তার নিরঞ্জনকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, আজ একটু সাবধান থাক্‌বেন।

নিরঞ্জন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল, কেন? আজকে বিশেষ ক'রে সাবধান হবার কি কারণ হ'য়েছে?

আজ অবস্থা বড় খারাপ।

খারাপ! তার মানে?

শ্বাস হ'য়েছে।

নিরঞ্জন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল? কি হৃদয়হীন ইহারা! অনায়াসে বলিল শ্বাস হ'য়েছে! হতাশ-স্বরে প্রশ্ন করিল, শ্বাস ভাল হয় না? তবে আর কোন উপায় নাই?

সুরো শ্বাস টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরঝি! আমি কি সত্যই তাই?

কি দিদি?

সেই সে দিন উনি যা বল্‌লেন, সেজে গুজে যারা—

লিলী ব্যাকুল হইয়া বলিল, সে দোষ ত আমারই, বোন! আমিই তোকে জোর করে সাজিয়েছিলুম। ভুলে যা, দিদি, ভুলে যা।

ভুলতে পারছি না বোন্।

সুরো কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর চিত্রপট দেখিতে দেখিতে বলিল, সত্যি বল, তুমিই আমার মন জান। লিলি বড় আশা করে এ বাড়ীতে এসেছিলুম। আমি জন্মদুঃখিনী, জন্ম দিয়েই মা মারা গেলেন। দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হলুম। বৌ-দিদি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না—আমার বেঁচে টাকা খরচ হবে। দাদার কাছে চোরের মার খেয়েছি। তখন জান্‌তুম না, বুকের কথা—হাতের মারের চেয়ে বেশী লাগে।

লিলী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বৌ, আমার এ ঘরে টিঁক্‌তে দিবি নি? পায়ে ধরি বৌ, কাটা ঘায় আর নুনের ছিটে দিস্‌নে।

সুরো অতি ভুবনমোহন হাসি হাসিল। বলিল, ছি, দিদি! কেঁদ না। এ ত আমার সুখের দিন—আগুনে ঠাণ্ডা হব। ঠাকুরঝি, এখানে যখন আশ্রয় পেলুম, ভেবে-ছিলুম, চোখের জলের শেষ হ'ল। তখন জানিনি যে,' শেষ নয়, সুরু। তিলে তিলে গায়ের রক্ত জল হ'য়ে চোখ দিয়ে ঝরেছে। একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, আমায় এখানে আন্‌লেনই বা কেন, আর এমন করে দু পায় ঠেল্‌লে মাথায় কলঙ্কের ডালি দিয়ে বিদায়ই বা কর্‌ছেন কেন? কি আমার অপরাধ?'

লিলী রোদনবেগ সংবরণ করিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিরঞ্জন রুগ্ন-কক্ষের আসে-পাশে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছিল, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে লিলি, আমায় ডাক্‌ছে?

ডাক্‌বার কি আর মুখ রেখেছ, দাদা। আমি আর সেখানে থাক্‌তে পারছিনি।

যা, বোন্, কর্ত্তব্য বড় কঠিন।

আমি যে কর্ত্তব্য করেছি, দাদা, তা জীবনে ভুল্‌ব না। এখন তুমি করগে।

না, না, আমি কাছে গেলে হয় ত বিরক্ত হবে। সেই যে বলেছিলুম, মনে নেই—তোরই ত' সাম্‌নে রে? এতটা হবে কে জানে? তুই যা, আমার পা উঠ্‌ছে না। আমি গেলেই ওর সেই সব মনে হবে!

লিলী চোখ মুখ ধুইয়া আবার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে বসিল। শ্বাস তখন দ্রুত হইয়াছে। মুমূর্ষু বলিতে লাগিল, ঠাকুরঝি, ঠাকুর-দেব্‌তা কি আছে?

নীলিমা উত্তেজিত হইয়া বলিল, সব মিথ্যে, বোন্, সব মিথ্যে! তোর জন্যে দু-বেলা ডেকেছি; বুক চিরে রক্ত দিয়েছি। সব মিথ্যে—সব মিথ্যে! কেউ মাটীর পুতুল, কেউ ছবি।

সুরো পুনরায় স্বামীর চিত্রপট পানে চাহিয়া কহিল, তাই ত ওই ছবিকেই আমার সর্ব্বস্ব দিয়েছি। ওই ছবি নিয়েই আছি।

তবে বাজিল্ কেন, বোন?

যেতে কি আমার সাধ? আমার এই একুশ বছর বয়েস—একটা সাধও পোরেনি। বরের সঙ্গে সাধ-আহ্লাদ—ছেলে হবে, হাস্তে হাস্তে তাঁর কোলে দেব। লিলি! জীবনে একটি দিন প্রাণ খুলে হাসতে পাইনি।

নিরঞ্জন ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছিল, লিলী কিছু পূর্ব্বেই দেখিয়াছে। আজ সহোদরের জন্ম সমবেদনায় তাহার মন গলিল। বলিল, বৌ, দাদাকে একবার ডাক্‌ব?

সুরো শিহরিয়া উঠিল। না, না, ঠাকুরঝি, ছি ছি, এ কালা-মুখ আর তাঁকে দেখাব কেমন ক'রে? তুই ত জানিস্, তিনি আমায় কি ভাবেন?

একটা কথা বলে বিদায় নিবিনি?

বিদায় ত অনেক দিন দিয়েছেন। মনে করে দেখ, সেই ফুলশয্যার রাত্রে –

সুরোর শীর্ণ গণ্ড দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বলিল, আর কেন? ঐ ছবি এখন আমার সব। ঠাকুরঝি! সে কথা তোর মনে আছে? সেই যে ছবি-সাজান দেখে ঠাট্টা করেছিলি—আসল থাক্‌তে নকল? আমিও ঠাট্টা করে বলেছিলুম, আসলটা তোকে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ ঠাট্টা নয়, আজ সত্যিই তোকে দিয়ে গেলুম—ওঁকে একটু দেখিস্।

সুরো চিত্রপটের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি স্থাপন করিল এবং দেখিতে দেখিতে সে দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল।

লিলী বুকফাটা চীৎকার করিয়া শবের উপর লুটাইয়া পড়িল। নিরঞ্জন পাথরের পুতুলের মত স্থির। কিন্তু শোক যতই মর্ম্মভেদী হউক, সংসার তাহার দাবী ছাড়ে না। যাহার জন্ম প্রাণ বক্ষঃপিঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইতে চায়, তাহাকেও প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে হয়।

আশুতোষ মহাযাত্রার আয়োজন করিতে ভিতরে আসিলেন। হঠাৎ যেন গভীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া নিরঞ্জন সরকারকে প্রশ্ন করিল, সরকার, ফুল-টুল মালা-টালা সব আনা হয়েছে?

বিস্মিত সরকার ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কৈ না।

না! কেন নয়? আনা হয় নি কেন, সেইটে শুন্‌তে চাই।

আমাকে ত বলা হয়নি।

এও কি আবার বল্‌তে হবে? কেন? একদিনও কি ও তোমাদের কারুর কিছু করেনি?

বাবু, সে কথা মুখে আন্‌লে মুখ পচে যাবে। মা-লক্ষ্মী মায়ের মত যত্ন কর্‌তেন।

সরকার কাঁদিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন তীব্রস্বরে বলিল, চুপ্! তবে? ঘরের লক্ষ্মীকে ঘুঁটেকুড়ুনীর মত বিদায় করতে চাও?

লিলী ভ্রাতার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিল। নিরঞ্জন কহিল, হাঁ রে লিলি, তুইও ভুলে গেলি?

ভুল্‌ব কেন, দাদা! তুমি পছন্দ কর্‌বে কিনা, কেমন ক'রে জান্‌ব?

আমার পছন্দ মত সব হচ্ছে কিনা! তোরা সবাই সমান—সবাই সমান! তোরা মন বুঝিস্ না, কেবল রাগ্‌তে জানিস, আর অভিমান কর্‌তে পারিস্।

আশুতোষ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ভায়া, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। তুমি অধীর হ'য়ো না।

কিছু না—কিছু না, অধীর কিসের? হাঁ রে লিলি, আমার কথা কিছু ব'লেছিল রে?

হাঁ দাদা, বলেছিল, ওকে দেখো!

নিরঞ্জন মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া নীলিমা সেই স্বর্ণ-প্রতিমাকে মনের মত করিয়া সাজাইল। আশুতোষ ডাকিলেন, ভায়া, একবার দেখবে এস।

কি? ওঃ—চলুন।

কিন্তু দ্বারের কাছে আসিয়া তাহার পা উঠিল না। বলিল, আপনি ত ভারি ছেলেমানুষ! কি দেখতে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন?

আচ্ছা, এখন না যাও, কিন্তু শেষ কাজ ত তোমাকেই কর্‌তে হবে!

আমাকে? কি কর্‌তে হবে?

উনি পুত্রহীনা, তোমার আগুনের প্রত্যাশী ত?

নিরঞ্জন একটা মর্ম্মভেদী হাসি হাসিয়া বলিল, এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন, সে কোন কালে আমার কিছুরই প্রত্যাশী ছিল না।

তারপর ছুটিয়া গিয়া সে দরজায় খিল দিল।

৫

গভীর রাত্রিতে শ্মশান হইতে ফিরিয়া আশুতোষ ডাকিলেন, ভায়া!

নিরঞ্জন দ্বার খুলিল। আশু তাহাকে দেখিয়া পিছাইয়া আসিলেন। এ কে—বৃদ্ধ! এই কি নিরঞ্জন? কয় ঘণ্টার মধ্যে এ কি পরিবর্ত্তন! একটা হৃদিভেদী শ্বাস যেন বাষ্পময় হইয়া আশুর মর্ম্মস্থল হইতে বাহিরিয়া আসিল, ভায়া, সব শেষ হ'য়ে গেল।

নিরঞ্জন তাঁহার পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, কি শেষ হ'ল দাদা? ও—

তাহার বুকের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল, শেষ! সেই নিঃশব্দ-কর্ম্মপরায়ণা বিষাদ-প্রতিমা!—তাহার শেষ হইয়া গেছে? সেই অতুল রূপ, সুঠাম দেহ, আয়ত চক্ষু, পুষ্পিত অধর, সুমিষ্ট হাসি, সুকৃষ্ণ কেশ,—সেই সোনার সুরো—আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে! কে বলিল? না, না, সে আছে, ডাকিলেই আসিবে। তেমনই ধীরে ধীরে নতশিরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে। নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইল, তাহার নাম ধরিয়া একবার চীৎকার করিয়া ডাকে, কিন্তু লজ্জা বাধা দিল। জিজ্ঞাসিল, আচ্ছা, দাদা, এই যে আপনারা আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম কত কি বকেন—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—এ সব কি সত্য?

সত্য, ভায়া, সব সত্য।

খুন করলেও মানুষ মরে না?

না, ভায়া।

আবার দেখা হয়?

নিশ্চয়।

তার মানে? যা প্রমাণসিদ্ধ নয়, যুক্তিবিরুদ্ধ, তা নিশ্চয় কি ক'রে বলি?

কিন্তু বিজ্ঞানের সহস্র প্রমাণ, দর্শনের সকল যুক্তি তুচ্ছ করিয়া নিরঞ্জনের অন্তরাত্মা নিরন্তর বলিতে লাগিল, সে আছে—আমার সুরো পুড়িয়া ছাই হয় নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, এ বিশ্বাস ততই প্রবলতর হইতে লাগিল—সে আছে, জীবিতের চেয়ে মৃত আরও বেশী করিয়া আছে। জীবনে যে আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, মরণে সে যে এই বিরাট্ বিশ্ব এমন করিয়া ভরাট করিয়া থাকিতে পারে, এ কথা কোন বিজ্ঞান বলে না, কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রমাণ অস্বীকার করিবার উপায় কি? তাহার লাঞ্ছিত প্রেম, অতৃপ্ত কামনার উত্তপ্ত নিশ্বাস এখনও এই অভিশপ্ত গৃহের কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ কথা আর যে অবিশ্বাস করে করুক, নিরঞ্জন পারে না। ঘুঘুর ওই সকরুণ স্বর মনে হইতেছে, তাহারই মর্ম্মবেদনার বিলাপ-ধ্বনি। দিক-দেশ-কাল সবই তার অশরীরী সত্তার পরিপূর্ণ, কেবল তাহারই হৃদয়ে বিশাল শূন্য—বিস্তীর্ণ মরুর মত হাহাকার করিতেছে। বাহিরে আপনাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া সে যে এমন করিয়া তাহার সমস্ত বুক জুড়িয়া বসিয়াছিল, অন্তর্দৃষ্টিহীন নিরঞ্জন কেমন করিয়া জানিবে? কেমন করিয়া জানিবে যে, সে যখন গভীর অধ্যয়ন-মগ্ন, তখন দুইখানি কর্ম্মনিপুণ পরিচর্য্যা-কুশল হস্ত তাহার চারিদিকে শান্তির স্বর্গ রচনা করিতেছে। দাস-দাসী তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে তেমন হয় না কেন? তখন শয্যায় ধূলিকণা থাকিত না, এখন ছারপোকা মশায় তাহার শরীরের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে। হায়, অলক্ষিতে সে কেমন করিয়া তাহার চারিদিক এমন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল? কিন্তু যে সুধাপাত্র সে ওষ্ঠাগ্র হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে, জীবনপণেও আর তাহা ফিরিবে না। যে নিরশ্রু চক্ষু একদিন তাহার জীবনের বাঞ্ছিত গর্ব্ব ছিল, আজ তাহারা মুষলের ধারা ঢালিয়া সৃষ্টি ভাসাইয়া দিতে চায়! নিরঞ্জনের নিদ্রা গেল, রুচি গেল, আহার গেল, আবার জ্বর দেখা দিল এবং অচিরে সে তাহার মৃতা স্ত্রীর শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আশুতোষ তাহার শয্যাপাশে আসিয়া বলিলেন, ভায়া, এ বিছানায় তুমি শু'লে কেন? তিনি দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ ক'রে গেছেন।

এ শয্যা ত আমিই পেতেছি, দাদা! আমি না শু'লে কে শোবে?

তুমিও কি ফাঁকি দিতে চাও?

নিরঞ্জনের শীর্ণ অধরপ্রান্তে হাসি দেখা দিল। আশু শিহরিয়া উঠিলেন।

ক্ষীণকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, ফাঁকি আর দিতে পারছি কৈ, দাদা? আপনারা যে বলেন, আবার দেখা হয়।

আচ্ছা, দাদা, সেখানে কি এখানকার সম্বন্ধ মনে থাকে ?

কেন বল দেখি ?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

আশু নিরঞ্জনের উৎসুক চক্ষু দেখিয়া বুঝিলেন, এমনি প্রশ্ন এ নয়। বলিলেন, তা কর, ভায়া, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে পালিয়ো না।

নীলিমার মুখেও ঐ কথা - দাদা, তুমিও কি ফাঁকি দেবে ? তবে ভাল হচ্চ না কেন ?

আমি ভাল হ'লে কি করিস্ লিলি ? আবার একটা বে' দিস্ ?

না, দাদা ! তার জায়গায় আর একজন আসবে, সে আমার সহ্য হবে না।

নিরঞ্জন অতি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, তুই ত ভারি হিংসুটে রে !

তারপর দুই ভাইবোনে তাহার আলোচনা আরম্ভ হয়। ঘরে গোধূলির আলো। অদূরে জানালার বাহিরে পথিপার্শ্বস্থ কনকচাঁপার গাছ হইতে উগ্র গন্ধ আসিতেছে, এই ফুলের গন্ধ সে বড় ভালবাসিত। এমনই সময় ঐ জানালাটিতে দাঁড়াইয়া, ঐ যে গাছ লাল করিয়া কৃষ্ণ-চূড়ার ফুল ফুটিয়াছে, উহারই পানে চাহিয়া থাকিত আর মাঝে মাঝে ফিরিয়া তোমার ঐ ছবিখানি দেখিত। ঐ ছবি সে কত রকম করিয়া সাজাইত। ওর সঙ্গে কত কথা কহিত।

নিরঞ্জন বলিল, কি ছেলেমানুষ ছিল, রে !

নীলিমা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, ঝি-চাকররা কি দেখে না ? সেই কতদিনের শুক্‌নো মালা তোমার ছবিতে পরান রয়েছে !

কিন্তু নীলিমা উঠিতেই নিরঞ্জন ব্যগ্র হইয়া বলিল, না, না, লিলি, ও যেমন আছে, থাক্ ! ওইটুকু থাকতে দে, বোন ! তুই কি আজ থাক্‌বি ?

আজ কি দাদা ? তোমাকে ভাল না ক'রে আমি এখান থেকে নড়ব না।

কি দরকার ?

দরকার তোমার নয় দাদা, আমার।

তোর সংসার আছে, কর্ত্তব্য আছে।

অত কর্ত্তব্যজ্ঞান আমার নেই, দাদা !

নিরঞ্জন আর কথা কহিল না। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু লিলী প্রাণপণ চেষ্টাতেও সহোদরকে আরোগ্য করিয়া তুলিতে পারিল না। এক রোখা জন্তুর মত নিরঞ্জন গোঁ-ভরে মৃত্যুমুখে ছুটিতে লাগিল।

শেষ দিন নিরঞ্জন কুণ্ঠিত কণ্ঠে আশুতোষকে নিভৃতে বলিল, শেষ অনুরোধ একটা করব, দাদা ? ছেলেমানুষি ভাববেন না ?

কি ? তোমাকেও তেমনই ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে খুব ঘটা ক'রে নিয়ে যেতে হবে ? বল বল, তোমরা শুনে।

আমরা নয়, দাদা, আমি। কিন্তু আমার ফুলটুল দরকার নেই। ওই শুক্‌নো মালাই আমি চাই। তা নয়, তাকে যে চিতায় দাহ করেছিলেন, মনে আছে ?

ভাই রে, সে কি ভোল্‌বার ?

দাদা, যদি সেই চিতায় আমাকেও—

অনতিপরেই শূন্য ভবন তীব্র হাহাকারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

কামরূপা

দয়া কর, রূপ তব সংবর সংবর,
বিচিত্র ও রূপরাগে হে বিভ্রমময়ী
উন্মত্ত ক'র না মোরে, জানি কালজয়ী
তব রূপ-শিখারাশি—মুনি-মোহকর।

দাঁড়ায়ো না হে দর্পিতা, বিমুক্ত কুন্তলে
আমার অন্তরধনে অন্তরাল করি,
আরক্ত সুরাতে তব স্বর্ণপাত্র ভরি'
আর ভুলায়ো না মোরে ও মোহন ছলে।

বৃথা চেষ্টা ভুলিব না কাম-ইন্দ্রজালে,—
পেয়েছি আনন্দ আমি অমৃতসম্বল,
তব কামগীতা ব্যর্থ—কটাক্ষ উজ্জ্বল
পরম পদাঙ্ক-লেখা দেখ মোর ভালে !

সর্ব্ববন্ধ মুক্ত আমি—অমৃত স্মরণে
পেয়েছি পরম শান্তি জীবনে মরণে ॥

শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সার্ডিনিয়া

ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ভাগে সার্ডিনিয়াদ্বীপ অবস্থিত। উহা ইতালীর অধিকারভুক্ত। এই দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে ১ শত ৬০ মাইল এবং প্রস্থে ৭০ মাইল। বহুসংখ্যক শৈল দ্বীপ-মধ্যে বিদ্যমান, এই জন্য সার্ডিনিয়ার গ্রামগুলির মধ্যে আচারগত ও উচ্চারণগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। বহির্জ্জগতের প্রভাবসত্বেও সার্ডিনিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। এই দ্বীপে পান্থশালা নাই বলিলেই হয়। ট্রেণ আছে বটে, কিন্তু মন্থরগতি। রাজপথসমূহ বাধাবন্ধমুক্ত, মনোরম; আরণ্যকুসুমপুঞ্জশোভিত ক্যাম্পিডানো মালভূমির বৈচিত্র্য বর্ণনাতীত। সার্ডিনিয়া পরিভ্রমণ করিয়া পর্য্যটক পর্য্যাপ্ত আনন্দ পাইতে পারেন। ভোগ-বিলাসের প্রচুর আয়োজন এই দ্বীপে নাই বটে, কিন্তু এমন আতিথেয়তা অন্যত্র দুর্লভ।

জুন হইতে অক্টোবর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত এই দ্বীপে আদৌ বারিপাত হয় না। এই সময় নীল আকাশের কোথাও মেঘের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন অত্যন্ত গরম পড়ে, সেই সময় শুধু শ্বেতরেখা-সমূহ সুনীল গগন প্রান্তে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে চারিদিক ঝলসিয়া যায়— ক্যাম্পিডানো মালভূমি তখন যেন-পীতাভ বলিয়া অনুমিত হয়, গাছপালা শুষ্ক, সমগ্র প্রান্তর শ্রীহীন দেখায়। সার্ডিনিয়ার মধ্যভাগ শৈলসমাকীর্ণ। বসন্ত ঋতুতে এই প্রদেশের শ্যামশোভা, ফলপুষ্পিত শৈলমালা দর্শকের নয়ন ও মন হরণ করিয়া থাকে।

যে দ্বীপে অসংখ্য পর্ব্বত, তথায় নদীর সংখ্যাও অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সার্ডিনিয়া ঠিক তাহার বিপরীত। বৎসরের দীর্ঘকাল বারিপাত হয় না বলিয়া এখানকার স্রোতস্বিনীদিগকে নদী আখ্যা দেওয়া যায় না। শীত-ঋতুতে যখন বর্ষণ আরম্ভ হয়, প্রবাহিনীগুলি তখন স্ফীত-কলেবর ধারণ করে। সে সময় স্রোতের বেগ যেমন প্রখর তেমনই ভীতিপ্রদ। গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুকাইয়া যায়, শুধু মধ্যস্থলে ক্ষীণরেখায় কর্দ্দমাক্ত, মলিন জলধারা মৃদু-গতিতে বহিতে থাকে। তখন এই সকল জলধারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সার্ডিনিয়ায় চারিটি মাত্র উল্লেখ-যোগ্য নদী আছে। তাহাদের নাম, টিরসো, ফ্লুমেনডোসা, কাগিনাস্ এবং টেমো।

দ্বীপের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ আছে। উহার উচ্চতা ২ শত ৩৫ ফুট। টিরসো নদীর জলধারা এই বাঁধের অন্তর্গত বিলে সঞ্চিত হয়। ১২ মাইল দীর্ঘ এবং ৭০ মাইল প্রশস্ত ক্ষেত্রে সঞ্চিত জলরাশি দেখিতে

উত্তর সার্ডিনিয়ার নারীরা সোমবার সকালে কাপড় কাচিতেছে।

হ্রদের মত। সমগ্র য়ুরোপে এত বড় কৃত্রিম হ্রদ আর নাই।

সমগ্র সার্ডিনিয়ার নিসর্গ দৃশ্য বিচিত্র ও মনোরম। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামের ব্যবধান অত্যন্ত অধিক। দূরে দূরে—শৈলমূলে মেষ-পাল চরিতেছে। পাহাড়ের প্রান্তদেশে পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত 'খোয়াড়'। রাজপথগুলি সযত্ন-সংরক্ষিত, মোটর-বিহার অনায়াসে চলিতে পারে। যদিও পথগুলি পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া বিসর্পিত, তথাপি সেজন্য মোটর-পরিচালনে কোনও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

নুরাঘি—প্রাচীনযুগের স্মৃতি-সৌধ।
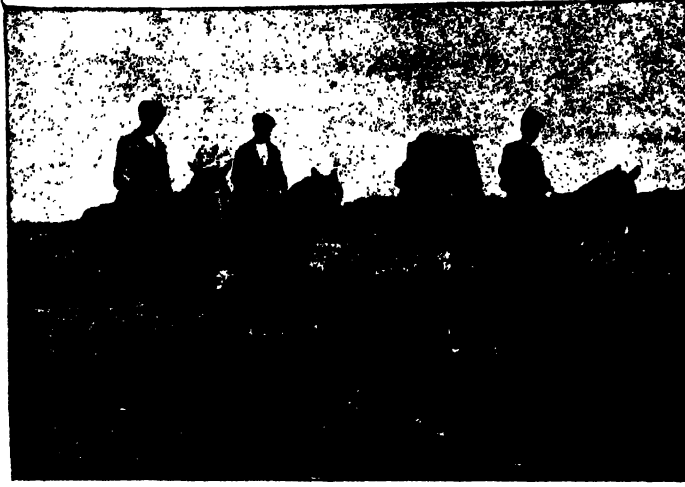
সার্ডিনিয়ার প্রধান নগরীর নাম কাগলিয়ারী। সান্টাগিলা নামক হ্রদ উহার সন্নিকটে অবস্থিত। এই নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা-শ্রেণী বিদ্যমান। মধ্যযুগের বহু স্মৃতি-সৌধ এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে পিসীয়গণ উল্লিখিত সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। 'হস্তিপ্রাসাদ' নামক একটি প্রাচীন সৌধ কাগলিয়ারীর বিশিষ্ট সম্পদ্।

সার্ডিনিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে যে ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে লা মাদালেনা ও কাপ্রেরা উল্লেখ-

রোমক যুগের ক্রীড়া-ক্ষেত্র।
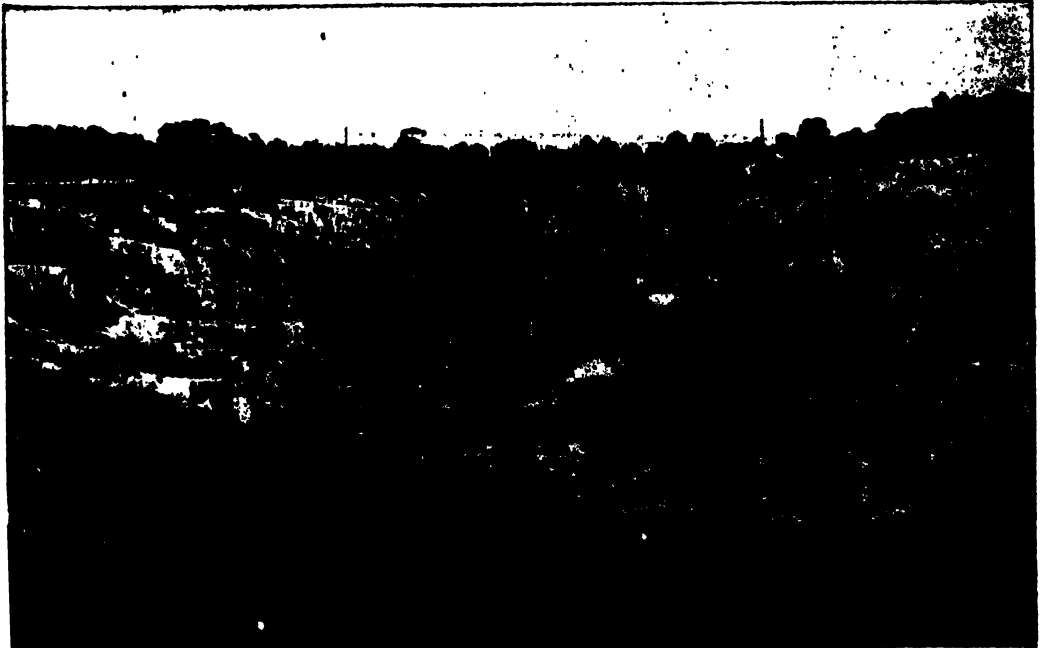
যোগ্য। শেষোক্ত দ্বীপে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, স্বদেশ-প্রেমিক, ইতালীয় বীর গ্যারিবল্ডী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তিমকালেও তিনি জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করেন নাই। এই স্থানেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জ্ঞানে ইতালীয়গণ প্রায় কাপ্রেরা-দর্শনে আসিয়া থাকেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষ সার্ডিনিয়ায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র দ্বীপে এমন কোন স্থান দেখা যায় না, যে স্থানে প্রাচীন যুগের স্মৃতি-চিহ্ন নাই। প্রকৃতির নির্য্যাতন ও প্রভাবকে জয় করিয়া অতীত কালের বিচিত্র-দর্শন স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাচীন যুগের সভ্যতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সার্ডিনিয়ার প্রাচীন অধিবাসীরা যে অসভ্য, বর্ব্বর ছিল না, এই সকল স্মৃতিস্তম্ভ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

এক প্রকার প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহাবশেষ পর্য্যটনকালে দর্শকের নেত্রপথে পতিত হয়। ইহাদের নাম 'নুরাঘি'। কোনও রূপ মশলা না দিয়া শুধু প্রস্তরের সাহায্যেই প্রাচীনকালে এই গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ

সার্ডিনিয়ার স্থপতি-শিল্পের নিদর্শন।

বোসার সন্নিহিত মালাসপিনা প্রাসাদ।

অনেক গবেষণা ও বাদানুবাদের পর স্থির করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ এই সকল গৃহ সেনা-নিবাস অথবা আবাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার ৩ হাজার প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ সমগ্র দ্বীপমধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে। কালের প্রভাব সত্ত্বেও অধিকাংশ 'নুরাগি' এখনও ব্যবহারের উপযুক্ত। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ প্রাচীন স্মৃতি চিহ্নও বিরল নহে। রোম যুগের সমকালবর্ত্তী দেবদেবীর উদ্দেশে নির্ম্মিত বহু মন্দিরও ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সার্ডিনিয়ার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সভ্যতার ইতিহাস-রচনার উপাদান পাইতে পারেন।

সার্ডিনিয়ার রাজত্বকালে রোমকগণ এখানে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে রোমান যুগের নির্ম্মিত সেতু, মন্দির ও পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কাগলিয়ারী নগরীতে রোমক যুগের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ দেখিলে চিত্ত অভিভূত হয়। পাহাড় কাটিয়া সোপানাবলী, বারাণ্ডা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সোপানশ্রেণী, বারাণ্ডা ও পশুগুহা এখনও অটুট অবস্থায় বিদ্যমান।

কাগলিয়ারীর হস্তি-প্রাসাদ, পিসীয়-যুগে নির্ম্মিত।

সার্ডিনিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। দ্বীপের অধিবাসীরা অতীত যুগের ইতিহাসসম্বন্ধে উদাসীন। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীতেও তাহাদের কাহারও বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। দেশের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। পর্য্যটকগণও সে জন্য স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে কোনও তথ্য অবগত হইবার সুবিধা পায়েন না।

ইতালীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায়, সার্ডিনিয়া যখন 'পিসার' কর্তৃত্বাধীন ছিল, তখন সার্ডিনীয়গণ বড় সুখে কালযাপন করিতে পায় নাই। অতিরিক্ত করভারে তাহারা প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইত। তবে একটা কথা,—পিসার নিকট হইতে তাহারা কলাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল। তস্কান স্থপতি-শিল্পের আদর্শে পিসীয় মঠ দ্বীপের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বড় বড় রাজপথের পার্শ্বে একটি মঠও নাই। এজন্য সাধারণ দর্শক সেগুলি বড় একটা দেখিতে পায়েন না।

মধ্যযুগে নির্ম্মিত দুইটি প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাসাদযুগলের অধিকারীদিগের নাম মহাকবি দান্তে তাঁহার

'ডিভাইন কমিডি' কাব্যে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। প্রথম প্রাসাদটির নাম 'গোসিয়ানো প্রাসাদ'। ১১২৭ খৃঃ গোনারিও উক্ত প্রসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের অবৈধ সন্তান এঞ্জিওর সুখবঞ্চিতা রাণী আদেলাসীয়া দীর্ঘকাল বসবাস করিয়া দেহত্যাগ করেন। অপর প্রাসাদটি ইগ্‌লিসিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত। উহার নাম 'একোয়া ফ্রেডা'। পিসার কোনও রাজবংশীয় কাউণ্ট উহার অধিকারী ছিলেন। উল্লিখিত প্রাসাদ ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য প্রাসাদও বিদ্যমান। দ্বীপের উত্তর ভাগে বোসা নদীর তীরে অবস্থিত ডোরিয়া প্রাসাদ তাহাদের অন্যতম। উহা এখন প্রায় পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে বটে; কিন্তু বহু ঐতিহাসিক উপাদান এই স্থানে এখনও পাওয়া যায়।

সাসারির রসেলো উৎস।

ভেণ্ডালদিগের আক্রমণে সার্ডিনিয়ার বহু মঠ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির প্রতি দেশের কাহারও তেমন শ্রদ্ধাভক্তিও ছিল না; সমগ্র দ্বীপে প্রাচীন গ্রন্থ অথবা দলিলপত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ছিল, পুনঃ পুনঃ অগ্নিকাণ্ডে তাহাও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল—স্থপতিশিল্পের অনেক নিদর্শনও অগ্নির লেলিহান জিহ্বা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল কারণে সার্ডিনিয়ার পূর্ব্ব-ইতিহাস সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত সার্ডিনীয় কৃষককুল গুপ্তধনপ্রাপ্তির আশায় প্রায়ই প্রাচীন স্মৃতিসৌধ, মন্দির প্রভৃতি খনন করিয়া ফেলিয়া থাকে। তাহাতে বহু ঐতিহাসিক উপাদান চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

স্পানিয়ার্ডগণ যে সময় সার্ডিনিয়ায় আধিপত্য করিয়াছিল, সেই সময় দ্বীপবাসিগণ বাস্তবিকই অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, আচার, ব্যবহার সার্ডিনীয়গণ বহুলাংশে অনুকরণ করিয়াছিল। তাই এখনও তাহাদের চরিত্রে স্পানিয়ার্ডদিগের চরিত্রগত ভণ্ডামী, কুসংস্কার প্রভৃতি দোষগুলি প্রতিফলিত দেখা যায়। দ্বীপের যাবতীয় মূল্যবান ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্পানিয়ার্ডগণ তাহাদের চরিত্রের ঘৃণিত দোষগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করিবার জন্য সার্ডিনীয়গণকে দান করিয়া গিয়াছে।

ইতালীর প্রতি সার্ডিনীয়গণের বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সার্ডিনীয় বীরগণ মাতৃভূমির গৌরব-রক্ষাকল্পে আত্ম-শোণিত দান করিয়াছিল।

সার্ডিনিয়ার সহরগুলি স্পেনের সহরের আদর্শে গঠিত। রাজপথে, পথিপার্শ্বস্থ চারিতল অট্টালিকা প্রভৃতি দেখিলেই মনে হইবে, যেন অকস্মাৎ স্পেনের কোনও নগর মায়াবলে এই দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছে।

উত্তরাংশের প্রধান নগরের নাম সাসারি। উহা বিচিত্র-দর্শন না হইলেও নগরের অধিবাসিগণের চরিত্রে

গৃহিণী স্বয়ং রুটী প্রস্তুত করিতেছেন।

বৈশিষ্ট্য আছে। উহারা বড়ই বচনবাগীশ; কিন্তু সদানন্দ, সামাজিক এবং অতিথিবৎসল। উহাদের সহিত আলাপ করিয়া সুখ জন্মে, প্রতি কথার অন্তরালে পরিহাসের স্বচ্ছ ফল্গুধারা যেন প্রবাহিত। সাসারির 'রসেলো' উৎসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন সুন্দর উৎস অন্যত্র দুর্লভ। প্রত্যেক পরিব্রাজকই রসেলো উৎসের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সাসারির বর্ণনা করিতে গেলে উৎসটির উল্লেখ অনিবার্য্য। বহুদূর হইতে লোক এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উৎস হইতে পানীয় জল

ছেলেমেয়েরা পিলোঁকা রুটী খাইতেছে।

সংগ্রহ করিয়া থাকে। ১৬০৫ খৃঃ এই উৎসটিকে বাঁধাইয়া দেওয়া হয়।

কাম্পিডানো মালভূমির অন্তর্গত গ্রামগুলিতে যাইতে হইলে আরণ্যবৃক্ষ ও গুল্ম-সমাচ্ছন্ন ধূলিধূসর পথ অতিবাহন করিতে হইবে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পথিপার্শ্বস্থ আরণ্য কুঞ্জপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রমণীরা সুপক্ব ফল সংগ্রহ করিয়া থাকে। গ্রামের পথগুলি প্রশস্ত ও সূর্য্যালোক-প্রদীপ্ত। গ্রামের গৃহগুলি পথের ধারেই অবস্থিত হইলেও, বাহিরের দিকে একটিও বাতায়ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

পল্লীগৃহ, রাজ-পথ ও গৃহসংলগ্ন উদ্যানগুলি যেন প্রাচ্য আদর্শে গঠিত। প্রত্যেক বাড়ী উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রতি গৃহস্থেরই অন্তঃপুরের দিকে উদ্যান আছে। সদর দরজা দিয়া কোন গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশ করিলেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নয়নপথে পতিত হইবে। প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চিমাংশ বাধাবন্ধনহীন—সারা দিন সূর্য্যের কিরণ সেদিকে পাওয়া যায়। সম্মুখে বিস্তৃত বারাণ্ডা। নানাবিধ ফুলের টব সেই বারাণ্ডায় রক্ষিত থাকে। বারাণ্ডার পরেই বিবিধ প্রকার ফল ও পুষ্প-খচিত বৃক্ষরাজি অপূর্ব্ব উদ্যান। কাম্পিডানো অঞ্চলের প্রত্যেক গৃহেই 'ললা' বা উদ্যান আছে। উহা প্রত্যেক গৃহিণীর অতি আদরের স্থান।

অলিয়েনার এই বালিকাদের আলোক চিত্র পূর্ব্বে কখনও গৃহীত হয় নাই। বৃদ্ধাদিগের ন্যায়ই ইহাদের বেশ-ভূষা।

সৌন্দর্য্য প্রিয়তা ও পরিচ্ছন্নতা এ দেশের নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। কাম্পিডানো পল্লীর কোনও গৃহেই পথের ধারে বাতায়ন নাই। প্রাচীনকালের পুরুষগণ নারী-জাতিসম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের উদারতা দেখাইতে পারিত না। স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীকে পুরুষের দৃষ্টি-পথ হইতে দূরে রাখাই তাহারা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। সার্ডিনীয়গণের ধারণা ছিল, নারীকে অপরিচিতের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করা সঙ্গত নহে। অন্তঃপুরে কি হইতেছে, তাহা বাহিরের লোকের জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই জন্যই তাহারা বাহিরের দিকে

সুনেটা প্রেকা উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত কৃষক পরিবার।

বাতায়ন রাখার পক্ষপাতি ছিল না। সার্ডিনীয়গণ এখনও তাহাদের সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। শুদ্ধান্তঃপুরের শুচিতা সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ অবহিত। সার্ডিনিয়ার নরনারীর চরিত্র লইয়া যে সকল ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। মিসেস্ ডেলেডা 'কাম্পিডানো' পল্লীর নারী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই স্থানের সুন্দরীরা পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই অবহিত। প্রবৃত্তির তীব্র জ্বালা তাহাদের কাহারও প্রসন্ন, নিষ্কলঙ্ক আননে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই। সুন্দরীরা তাহাদের 'বন' বা উদ্যানের সৌন্দর্য্যবিধানের জন্য অবসর সময় যাপন করে। পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সুখময় দাম্পত্য-জীবনের আরম্ভ হয়। এমনই ভাবে পুরুষ ও নারী দিনযাপন করিয়া থাকে। দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের সহিত উত্তরাঞ্চলের জীবন-যাত্রার প্রণালীর সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

সমতলক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে উঠিলেই নয়ন ও মন বৈচিত্র্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পাহাড়ীদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সহিত এতদঞ্চলের অধিবাসীদিগের পরিচ্ছদেরও বৈচিত্র্য-বিস্ময়োদ্দীপক। প্রাচীনযুগের সার্ডিনীয়দিগের বেশ-ভূষার নিদর্শন এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অলিয়েনা, ফোনি, অর্গোসোলো ও ডেসিলো প্রভৃতি স্থানের নারীরা সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাহাদের পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ। যখন দলে দলে এই সকল স্থানের সুন্দরীরা হরিৎ ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিতে থাকে, শ্যামল বাদাম-বীথির ভিতর দিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। অথবা নতজানু হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপাসনায় যোগদান করে, তখন মনে হয়, যেন অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে।

সার্ডিনিয়ার প্রতি পল্লীতেই রুটী তৈয়ার হয়। রুটী তাহাদের প্রধান খাদ্য। দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে কায করিতে যাইবার সময় চাষী এক সপ্তাহের উপযোগী রুটী সঙ্গে লইয়া যায়। সপ্তাহের একদিন প্রতি গৃহস্থ রমণী রুটী তৈয়ার করিয়া থাকে। কোন কোন গৃহে সারারাত্রি পর্য্যন্ত কায চলিতে থাকে। যাহারা সম্পন্ন গৃহস্থ, সে বাটীর গৃহিণীও স্বয়ং রুটী তৈয়ার করেন অথবা রুটী তৈয়ার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই ব্যাপারে পরিবারস্থ প্রত্যেকেই অল্পাধিক সাহায্য করিয়া থাকে। যে আহার্য্য এক সপ্তাহ কাল চলিবে, তাহা যাহাতে উপযুক্তরূপে তৈয়ার হয়, কোনও মতে নষ্ট না হইয়া যাইতে পারে এ সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। রুটীগুলির আকার বেশ বড়।

রুটী ভাজা হইবার পর যখন জুড়াইয়া যায়, তখন উহা বিস্কুটের মত মচ্‌মচে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এই রুটীর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ডেসিলো, বার্ব্বাজিয়া প্রভৃতি স্থানে এই রুটীকে 'পিলোঁকা' বলে।

গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ অত্যন্ত কৌতূহল-পরায়ণ। কোনও আগন্তুক গ্রামে উপনীত হইলেই তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলে। কে তিনি, কোথা হইতে আসিতেছেন, কি প্রয়োজন, কতদিন থাকিবেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আগন্তুককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। বিশেষতঃ ডেসিলো অঞ্চলের নারীরা বড়ই অনুসন্ধিৎসু। "আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন?" "চির-কুমার না বিবাহিত?" "কোথায় এখন যাইবেন?" এইরূপ প্রশ্ন তাহারা করিবেই। যদি আগন্তুক শান্তি চাহেন, তবে ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিতেই হইবে।

সঙ্গে ক্যামেরা থাকিলে ত আর রক্ষা নাই। চারিদিক্ হইতে বালখিল্যদল তাঁহাকে সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যুর দশাগ্রস্ত করিবে। বয়স্করা প্রশ্ন করিবে, "মহাশয় ছবি তুলিতে কত খরচ বলুন ত?" তাহাদিগকে এ কথা বুঝানই কঠিন যে, মানুষ কেন ফটো তুলিতেছে। সুন্দরী যুবতীরা ছবি তুলাইতে বড় একটা রাজি হয়েন না। তাঁহাদের আশঙ্কা, পাছে তাঁহাদের প্রতিকৃতি পোষ্টকার্ডে ছাপা হয়। এ ব্যাপারটাকে তাঁহারা আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকেন।

অনেকে ছবির তুলিবার পূর্ব্বে লজ্জার অভিনয় করে; কিন্তু ঠিক সময়ে তাহারা জড়সড় হয় না। বেশ সহজ, সরল ভাবে ছবি তুলাইয়া থাকে। একটুও নড়ে চড়ে না। বালিকা-সুলভ চপলতা সে সময় তাহাদের দেখা যায় না।

সার্ডিনীয় রমণীগণ বিবিধ বর্ণের পশম লইয়া অতি চমৎকার কার্পেট ও ঘোড়ার জিন তৈয়ার করিয়া থাকে। নানা নমুনার এমন বিচিত্রদর্শন কার্পেট অন্যত্র দেখা যায় না। এই অশিক্ষিত নারীরা বর্ণ-সংমিশ্রণরূপ কলাবিদ্যায় এরূপ নিপুণতা প্রকাশ করিতে পারে দেখিয়া, কলাবিংগণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্যাটার্ণ বা নক্সার বৈচিত্র্যও অত্যন্ত বিস্ময়োদ্দীপক। কলাশিল্পের কেন্দ্র হইতে সার্ডিনিয়া বহু দূরে অবস্থিত। তথাপি স্বাভাবিক কলানিপুণতায় এতদ্দেশীয় নারীরা শ্রেষ্ঠ। বংশ-পরম্পরানুক্রমে চর্চ্চার দ্বারা বর্ণ-বিন্যাস-সম্বন্ধে ইহাদের রসশক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকিবে।

জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সার্ডিনিয়ায় নানা প্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সকল উৎসব উপলক্ষে কৃষক পরিবারবর্গ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। উৎসবারম্ভের দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই তাহারা ভোজের আয়োজন করিতে থাকে; তখন তাহারা অনাবশ্যক ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে। এমন কি, কপর্দ্দকমাত্রও অযথা ব্যয় করে না। অশন, বসন সকল বিষয়েই তাহারা সংযত হইয়া ব্যয় করে। একদিন উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য তাহারা যেরূপ কষ্ট সহ্য করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বহু দূর হইতে গরুর গাড়ী চড়িয়া তাহারা উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হয়।

সার্ডিনিয়ার সুন্দরী রমণী।

উৎসবের সময় আনন্দাতিশয্যে ধর্ম্মকার্য্যগুলি উপেক্ষিত হয় না। প্রতি গৃহের কর্ত্রী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকাসহ গির্জ্জায় গমন করেন। দেবতার চিত্রের সম্মুখে বর্ত্তিকা স্থাপন করিয়া তিনি নতজানু হইয়া সকাল বেলা উপাসনা করিতে থাকেন। পরিবারের অন্যান্য নরনারী তখন ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে।

মুক্ত আকাশতলে রন্ধনের ব্যবস্থা হয়। অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আস্ত ছাগশিশুর রোষ্ট প্রস্তুত হয়। মদের পিপাগুলির পার্শ্বে ব্যাগ খুলিয়া পনীর, রুটী ও তরিতরকারী থরে থরে সাজাইয়া রাখা হয়। তাহার পর উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভোজ আরম্ভ হয়।

আহার-শেষে গীতবাদ্যের আয়োজন চলিতে থাকে। বাঁশী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রসহ সঙ্গীত আরব্ধ হয়। সমগ্র উন্মুক্ত প্রান্তরটি তখন বিবিধ রাগরাগিণীপূর্ণ সঙ্গীতে পূর্ণ

হইয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এক একটি পরিবার সমবেত। প্রত্যেক দলের নরনারী স্বেচ্ছামত সঙ্গী আলাপে মগ্ন হয়। অপরাহ্ন ঘনাইয়া আসিলে নৃত্য আরম্ভ হইয়া থাকে।

প্রতি গ্রামের সংলগ্ন গির্জ্জার সমীপবর্ত্তী প্রান্তরে এইরূপ উৎসব হইয়া থাকে। সে দৃশ্য মধুর। বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য এইরূপ উৎসবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটকগণ যে সময় সার্ডিনিয়া পরিভ্রমণ করিতে গমন করেন, সে সময় প্রায়ই উৎসবের যোগ থাকে না।

আগুনে মাংস পোড়ান হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গীত বাদ্য চলিতেছে।

সার্ডিনিয়ার নৃত্যে বৈশিষ্ট্য আছে। সার্ডিনীয় নর নারীরা সাধারণতঃ মণ্ডলাকারে নৃত্য করিয়া থাকে। অনেকটা আমাদের দেশের রাস-নৃত্যের মত। যিনি কখনও এই নৃত্য দেখেন নাই, তাঁহাকে উহা বর্ণনা করিয়া বুঝান কঠিন। বাস্তবিক শিক্ষা-নবিশের পক্ষে এই নৃত্যও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। নৃত্য-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী না হইলে সার্ডিনীয় নৃত্যোৎসবে যোগ দেওয়া দুঃসাধ্য হইবে। নৃত্যের সময় নর্ত্তক ও নর্ত্তকীদিগের

রন্ধনাগারে সার্ডিনীয় কৃষকগণ নাচগান করিতেছে।

সার্ডিনীয় নারীরা মুড়ি প্রস্তুত করিতেছে।

দেহ দণ্ডভাবে থাকে; মুখের ভাব দৃঢ়, তাহাতে কোন প্রকার ভাব-তরঙ্গের লীলা প্রকাশ পায় না। শুধু চরণ দ্রুত সঞ্চালিত হইতে থাকে; কখনও সম্মুখে, কখনও বা পশ্চাতে চরণ ক্ষিপ্রগতিতে তাল-লয়যোগে আন্দোলিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে লম্ফ দিয়া আবর্ত্তন করিতে হয়। চরণাঙ্গুলীর উপর ভর দিয়া সমগ্র নৃত্যটি সম্পন্ন হয়।

নাচ যখন জমিয়া আসে, সেই সময় সহসা শুধু নর্ত্তকগুলি চীৎকার করিয়া উঠে, আবার তখনই চারিদিক নিস্তব্ধ হয়। মহিলারা নৃত্যকালে বিন্দুমাত্র চপলতা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা লজ্জানতনেত্রে, গম্ভীরভাবে নৃত্যক্রীড়া সম্পাদন করেন। সার্ডিনীয় মণ্ডলীনৃত্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে—যেন তিনি পুরুষ নর্ত্তকের দক্ষিণ দিয়া না যায়েন। যদি কেহ পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মণ্ডলী-নৃত্যে যোগ দেন, তবে তাহা অতি গুরু অপরাধ বলিয়া গণ্য

সার্ডিনীয়গণ কলের সাহায্যে টুপি প্রস্তুত করিতেছে।

হইয়া থাকে। পুরুষরা নারীকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নৃত্যের সহকারিণীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং পুরুষের দক্ষিণ দিক দিয়া মণ্ডলীনৃত্যে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ। উহাতে সেই যুগল নর্ত্তক-নর্ত্তকীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সার্ডিনীয়গণ এই অপরাধটিকে বিরক্তিকর বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

সমগ্র দ্বীপমধ্যে হোটেল বা পান্থ-নিবাস নাই বলিলেই হয়। সুতরাং অতিথি আসিলেই গৃহস্থগণ তাঁহাকে স্বভবনে লইয়া গিয়া থাকে। অতিথি সৎকার সার্ডিনীয়গণের সামাজিক রীতির মধ্যে পরিগণিত। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি দ্বীপে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। পরিবারস্থ সকলেই তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য প্রাণপণ যত্ন লইয়া থাকে। এমন আতিথেয়তা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। রোমক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল বিদেশীয় পর্যাটক সার্ডিনিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সকলেই মুক্তকণ্ঠে সার্ডিনীয়গণের আতিথেয়তার প্রশংসা করিয়াছেন। উৎসবের সময় অকস্মাৎ যদি কেহ দ্বীপে উপস্থিত হয়েন, তবে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি নিরানন্দ অনুভব করিবেন না। কেহ না কেহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিবে। প্রত্যেক গৃহের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। আহার্য্য বা পানীয়—যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন, দ্বীপবাসীরা হাস্যমুখে সবই তাঁহাকে যোগাইয়া দিবে। বিনিময়ে অর্থ কখনই কেহ লইবে না, উহা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যদি স্থানীয় কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে পরিচয় পত্র থাকে, তবে ত আর কথাই নাই। তিনি সেখানে রাজসমাদর লাভ করিয়া থাকেন। অতিথি সে দেশে মহা পূজ্য ব্যক্তি। ভারতবর্ষের সহিত এ বিষয়ে সার্ডিনিয়ার সাদৃশ্য আছে। হিন্দুর নিকট অতিথি অতি পূজ্য। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" এই নীতিবাক্যটি সার্ডিনিয়াতেও যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। ইদানীং দ্বীপের মধ্যে দুই একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিচালকরা ভিন্নদেশীয়। কোনও সার্ডিনীয় হোটেল বা পান্থনিবাসের অনুরাগী নহে। কাযেই সে সকল হোটেল বা পান্থনিবাসের অবস্থা আশাপ্রদ নহে।

সার্ডিনীয় নারীরা পুরাতনের পক্ষপাতিনী। তাহারা সাধারণতঃ দেশীয় প্রথায় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে ভালবাসে। তবে ইদানীং প্যারীর অনুকরণে নবীনারা বেশ-বিন্যাসের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

দ্বীপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। কুটীর শিল্পের অবস্থা খুবই ভাল। বোসার নারীরা চমৎকার লেস তৈয়ার করিয়া থাকে। ইতালীতে উহার আদর খুবই বেশী। ঝুড়ি-নির্ম্মাণে সার্ডিনীয়গণ বিশেষ দক্ষ। কাষ্টেল সার্ডো নামক স্থানে যে সকল ঝুড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সুদূর ফিলাডেলফিয়ায় পর্য্যন্ত উহার বিক্রয়াধিক্য আছে। একপ্রকার তালজাতীয় বৃক্ষের পত্র হইতে এই ঝুড়ি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

সমগ্র দ্বীপের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র স্থান কর্ষিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির অল্পতাই ইহার কারণ। বারিপাত ভালরূপ হয় না, এজন্য ফসলও অনেক সময় ভাল জন্মে না। কিন্তু যতটুকু জমী কর্ষিত হয়, তাহাতে ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকরা বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। টিরসো নদীর জল বাঁধ দিয়া সঞ্চিত হওয়ায় অধুনা কৃষির ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। ছাগ ও মেষ সার্ডিনিয়ায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

দ্বীপবাসীরা স্বদেশের উন্নতিবিধানের জন্য এখন উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতেছে। মহাযুদ্ধের পর হইতেই তাহাদের জীবনে যেন একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। দেশাত্মবোধ তাহাদিগকে নূতন উদ্যম দান করিয়াছে।

ওক গাছ হইতে সার্ডিনীয়গণ কর্ক বা বোতলের ছিপি প্রস্তুত করিয়া থাকে। যুদ্ধের পর হইতেই এই ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটিয়াছে। অগ্রে ছুরীর সাহায্যে তাহারা ছিপি প্রস্তুত করিত। অধুনা কলের সাহায্যে উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মৎস্য-রাক্ষস

সকলেই জানেন যে, হাঙ্গর, কুম্ভীর ও অষ্টভুজ (Octopus) জলজ প্রাণিগণের মধ্যে হিংস্রক এবং মানুষ একবার তাহাদের গ্রাসে পড়িলে তাহার আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, অষ্টভুজ ভীষণ-প্রকৃতির হইলেও

ইহার দ্বারা মানবের অনিষ্ট অধিক মাত্রায় হয় না। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই —সমুদ্র-সলিলে অষ্টভুজ বিদ্যমান; কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গড়ে, বৎসরে ৬ জনের অধিক লোক ইহার গ্রাসে পড়িয়া বিনষ্ট হয় না। হাঙ্গরের দংষ্ট্রাঘাতে প্রতি মাসেই বহু ব্যক্তির প্রাণনাশের সংবাদ পাওয়া যায়! সমুদ্রের কোন কোন অংশে হাঙ্গরের এমনই উৎপাত যে, কোন ব্যক্তি জলে পতিত হইবামাত্রই এই জল-রাক্ষসের গর্ভে তাহাকে সমাহিত হইতেই হয়। কিন্তু সর্ব্ববিধ হিংস্র জলজ প্রাণীর মধ্যে 'ডল্‌ফিন্' বা শুশুকজাতীয় এক প্রকার প্রাণী আছে, তাহার মত ভীষণ জীব আর নাই। ইহার শরীরের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২০ ফুট হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের ন্যায়ই ইহারা হিংস্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত উগ্র এবং ইহারা কাহাকেও ভয় করে না। এই ব্যাঘ্রপ্রকৃতির মৎস্যের হাঁ প্রকাণ্ড, চোয়ালের দংষ্ট্রাপংক্তি ভীষণ ও তীক্ষ্ণ। ইহারা এক মাইল পথ দুই মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়া থাকে। সুতরাং এই জল-রাক্ষস যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটা বৃহৎ 'সীল' মৎস্যকে ইহারা এক গ্রাসে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড তিমি মৎস্য ইহাদের প্রিয় শিকার। নেকড়ে বাঘ যেমন দলবদ্ধ হইয়া শিকার অন্বেষণে ধাবিত হয়, ইহারাও তেমনই দলবদ্ধ হইয়া ৭০।৮০ ফুট দীর্ঘ, বিরাট দেহ তিমিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণ-প্রণালীও চমৎকার। সমুদ্র-গর্ভে ইহারা কোন অতিকায় তিমি দেখিতে পাইলে তাহাকে গভীর জল হইতে তাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত অগভীর উপসাগরে লইয়া যায়। সেখান হইতে 'ডুব দিয়া' তিমির আর পলায়নের উপায় থাকে না। তখন তাহারা হতভাগা তিমির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং দেহের অপেক্ষাকৃত কোমল অংশ দংষ্ট্রান্তরালে চাপিয়া ধরে। সাধারণতঃ তিমির ওষ্ঠদেশ আক্রমণে ইহাদের অনুরাগ অধিক। 'বুলডগ্' কুকুর যেমন তাহার শিকারকে দংশন করিয়া ঝুলিতে থাকে, ইহারাও তেমনই ভাবে তিমির অঙ্গে ঝুলিয়া থাকে। একবার এইরূপে আক্রান্ত কোনও তিমি মৎস্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সমুদ্রবক্ষে প্রায় ২০ ফুট ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। সে সময় দেখা গিয়াছিল, একটা "ব্যাঘ্র"-মৎস্য তাহার জিহ্বা দংশন করিয়া ঝুলিতেছে, আর কয়েকটা তাহার ওষ্ঠ এবং শরীরের অন্যান্য অংশ দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্রে প্রায়ই এই ভীষণ জীব দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুইটি এই জাতীয় রাক্ষস মৎস্য টেম্‌স্ নদীতে ভাসিয়া গ্রীন্‌উইচের কাছে আসিয়াছিল। সংপ্রতি ব্রিষ্টল প্রণালীতে দুইটি বৃহদাকার রাক্ষস মৎস্য ধরা পড়িয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্রে হাঙ্গরের প্রকৃতির পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের যে অংশে ফ্লোরিডা অবস্থিত, তথায় সমুদ্রজলে নিরাপদে অবগাহন করা যায়। কিন্তু মেক্সিকোর সন্নিহিত সমুদ্রে অতি হিংস্র-প্রকৃতির হাঙ্গর বিদ্যমান। একবার ট্যাম্‌পিকোর (মেক্সিকোর অন্তর্গত একটি স্থান) অনতিদূরে, সমুদ্রসলিলে একটা হাঙ্গর একখানি সমুদ্রগামী তরণী আক্রমণ করিয়াছিল। সে এমনভাবে পোতের স্থানবিশেষ দংষ্ট্রার সাহায্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, নৌকাখানি প্রায় উল্টাইয়া গিয়াছিল।

প্রকাণ্ড 'বড়্‌শি'তে টোপ গাথিয়া কখন কখন হাঙ্গর ধরা হইয়া থাকে। শক্ত পিপার সহিত বড়শি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। হাঙ্গর টোপ গিলিয়া জলের মধ্যে পিপাসহ অন্তর্হিত হয়; কিন্তু বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকিতে পারে না। পিপা সর্ব্বক্ষণই জলের উপরে ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। অবশেষে শ্রান্ত হাঙ্গর হাল ছাড়িয়া দেয়। বড়শিবিদ্ধ হাঙ্গর পিপার সঙ্গে ভাসিয়া উঠিলে, দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর তাহাকে সংহার করা হয়।

একবার অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রগর্ভে জনৈক 'ডুবুরি' সমুদ্র-গর্ভে কায করিবার সময় একটি হাঙ্গর দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। হাঙ্গরটি ১২ ফুট দীর্ঘ হইবে। ডুবুরি তাঁহার হস্তস্থিত তীক্ষ্ণমুখ ইস্পাতের দণ্ড দ্বারা তাহাকে বাধা দিতে থাকেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হাঙ্গরটি তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছিল। অবশেষে ক্ষত-বিক্ষত দেহে সে পলায়ন করে।

ইংলণ্ডের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে আর এক প্রকার ভীষণ জাতীয় মৎস্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম "সোর্ড্-ফিশ্" অথবা খড়্গা মৎস্য। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ফুট, শরীরের ওজন ১৮ মণ। ইহাদের উপরের 'চোয়াল' এমন চাপা যে, দেখিতে ঠিক তরবারীর মত। এই খড়্গা দৈর্ঘ্যে ২ হাত। জলের মধ্যে ইহারা এমন দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় যে, দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

অনেক সময় ইহারা নৌকা অথবা জাহাজও আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদের প্রচণ্ড তরবারীর সাহায্যে তাম্রাচ্ছাদন বা কাষ্ঠ ভেদ করিতে ইহাদের কোনই আয়াস পাইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা আকারে আরও বড় হয়, তাহাদিগকে "সেল্ ফিশ্" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহাদের পৃষ্ঠদেশে যে ডানা থাকে, তাহার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট হইবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্যকুলকে আক্রমণ করিয়া ইহারা এককালে শত শত জীবকে মারিয়া ফেলে। অনেক সময় সমুদ্রের জল তাহাদের শোণিতস্রোতে লোহিতবর্ণ ধারণ করে।

আর এক জাতীয় মৎস্য আছে। তাহাদের চোয়াল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং দংষ্ট্রাপংক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও ভীষণ। সমুদ্রের যাবতীয় হিংস্র প্রাণীর মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। ধীবরকুল এই সমুদ্র-ব্যাঘ্রকে হাঙ্গরের অপেক্ষাও অধিক ভয় করিয়া থাকে।

সমুদ্র-তরঙ্গের পরিমাপ

আয়র্লণ্ডের পশ্চিম উপকূলে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের তরঙ্গমালা প্রহত হয়। সংপ্রতি বার্মিংহামে উক্ত তরঙ্গমালার পরিমাপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক ইভান্স পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক তরঙ্গ আইরিস সমুদ্রের মধ্য দিয়া প্রতি মিনিটে ১ শত ৮০ মাইল গতিবেগে আসিয়া থাকে। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের ১ শত ৩০ ফুট উচ্চ তরঙ্গের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থল অতিক্রম করিতে পাঁচ সেকেণ্ড মাত্র লাগে। আবার ৩ শত ৩৫ ফুট উচ্চ তরঙ্গ আট সেকেণ্ডে সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে।

ভূমিকম্প নির্ণয় করিবার জন্য যে "সিসমোগ্রাফ" যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহারই সাহায্যে তরঙ্গের এই গতিবেগ নির্ণীত হইয়াছে।

ইথর তরঙ্গের গতিবেগ

ডাক্তারখানার 'ইথর' তরঙ্গ আর যে ইথর-তরঙ্গ সংবাদ বহন করিয়া থাকে, এতদুভয়ের পার্থক্য অনেক অধিক। ডাক্তারখানার 'ইথর' তরল পদার্থ; উহা দৃশ্য এবং স্পৃশ্য, এই তরল ইথরের গন্ধও আছে। কিন্তু অপর 'ইথর' যে কি পদার্থ, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সত্য বটে, এই ইথরের নানাবিধ বিস্ময়কর গুণের কথা বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্বরূপ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

এই আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে মানুষ ভাবিত যে, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই যে বিরাট শূন্য, ইহাতে কোনও পদার্থ নাই। কিন্তু উত্তাপ ও আলোকের উৎপত্তির মূলে তরঙ্গের প্রভাব বিদ্যমান; এই আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শুধু শূন্যস্থানে তরঙ্গের উৎপত্তি অসম্ভব। দুইটি দৃশ্য-পদার্থের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নিশ্চয়ই এমন কোন কিছু আছে, যাহাকে স্পন্দিত, আলোড়িত বা উত্তেজিত করা যায়। যাহাকে শূন্য বলি, তাহা কখনই পদার্থবর্জ্জিত নহে। নিশ্চয়ই সেই শূন্যস্থানে কোনও বিচিত্র বিস্ময়জনক পদার্থ আছে। এই পদার্থ পৃথিবীর অপেক্ষা দৃঢ়, অথচ ইহার কোনও ওজন নাই। সূক্ষ্মতম ইস্পাতের অপেক্ষাও ইহা স্থিতিস্থাপক, অথচ কোনও স্থূল পদার্থের গতিরোধে সমর্থ নহে। পৃথিবী যদি বায়ুর শতাংশের এক ভাগ বাধা ইথরের দ্বারা পাইত, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ভূমণ্ডল পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইত। কারণ, সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় এই বাধার ফলে ইথরের সহিত এমনই সংঘর্ষ হইত যে, তাহাতে পৃথিবী পুড়িয়া যাইত।

তৎপরে বহু গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিলেন যে, ইথর শুধু বিরাট শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াই বিদ্যমান নাই, ইহা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; সর্ব্ব দ্রব্য, সকল প্রকার স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। যে সুদৃঢ় অখণ্ড লৌহকে আমরা কঠিন 'নীরেট' বলিয়া জানি, তাহা ঠিক 'নীরেট' নহে। উহা স্পঞ্জেরই মত অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল। স্থূল চক্ষুতে ইহাকে অখণ্ড দেখিতে হইলেও বাস্তবিক ইহা সংখ্যাতীত অণু, পরমাণু লইয়া গঠিত এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথ বিদ্যমান। এই সকল ছিদ্রের মধ্যে ইথর বিদ্যমান। জলের মধ্যে একখানি স্পঞ্জকে ডুবাইলে তাহা যেমন জলে

পরিপূর্ণ হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, একখানি লৌহও সেইরূপ ইথরে পরিপূর্ণ।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তরঙ্গসমূহ কি বিচিত্র, বিস্ময়জনক বেগেই ইথরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়! সূর্য্য, পৃথিবীর ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ইহা হইতে উদ্গত আলোক-রশ্মি আমাদের কাছে আসিতে মাত্র সাড়ে আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য্যরশ্মির তরঙ্গ প্রতি মিনিটে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। তারহীন বার্ত্তার তরঙ্গ ইহার অপেক্ষাও প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হয়। ইহার গতিবেগ আলোক-তরঙ্গের অপেক্ষাও সাড়ে সাত গুণ অধিক।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ইথর অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং যে কোনও ধাতু অপেক্ষা দৃঢ়। যাহা যত দৃঢ়, তাহার মধ্য দিয়া কম্পন বা তরঙ্গ তত তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়। বায়ুর মধ্য দিয়া তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ শত ফুট মাত্র পথ অতিবাহন করে; কিন্তু জলের মধ্য দিয়া তাহার চারি গুণ অধিক বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও তরঙ্গ লৌহ বা ইস্পাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে তাহার গতিবেগ উহার পনের গুণ অধিক হইবে। সীসা ও দস্তা-চূর্ণের মত কোমল পদার্থের মধ্য দিয়া কোনও তরঙ্গ ধাবিত হয় না। কারণ উহা দৃঢ় নহে।

শব্দ-তরঙ্গ, অথবা জলের উপর দিয়া কোনও তরঙ্গ প্রবাহিত হইলে, যতই দূরে তাহা চলিয়া যায়, ততই তাহার গতিবেগের হ্রাস হয়। অবশেষে তাহা একেবারেই থামিয়া যায়; কিন্তু ইথর-তরঙ্গ কখনও সম্পূর্ণ বিলয়প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ তাহাদের আকারও হ্রাস পায় না। বৃটেন হইতে যদি কোনও তারহীন বার্ত্তাবহের তরঙ্গ প্রেরিত হয়, তবে যত উচ্চ স্থান হইতে উক্ত তরঙ্গ স্রোত বহিয়াছে, আমেরিকার সম-উচ্চস্থানে সন্নিবিষ্ট অনুরূপ বার্ত্তাবহে ঠিক একই আকারের তরঙ্গ প্রকৃত হইবে—কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। এই তরঙ্গ ইট, পাথর, সুরকী অথবা বিরাট পর্ব্বতমালার পাষাণ-দেহ ভেদ করিয়া সহজগতিতেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। সেজন্য কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

কথা একই

আমার ডায়েরী

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"

এই শরৎ আকাশটা দেখছি আমায় পাগল করে তুলবে। এই নিস্তব্ধ দু'প্রহরে পশ্চিমের জানালা খুলে—অলসতার মধ্যে গা গড়াব বলে তার সাম্‌নে একটু এলাম, অমনি কতদিন আগের শোনা একটা গান আর তার সুরের প্রত্যেক মীড়, প্রত্যেক মূর্চ্ছনা ও স্পন্দন আমার প্রাণের কানের মধ্যে সে বাজিয়ে তুলে গেয়ে উঠলো, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" এই একটি লাইনকে কত বার কত রকমেই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগ্‌ল সে! আর আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

আজ সকালে এই 'গিরি পর্ব্বতের' দেশে যখন শারদ লক্ষ্মীর শুভ্র মেঘের রথ ঐ আলো ঝলমল নির্ম্মল নীল পথ বেয়ে চলেছে দেখা গেল, তখন আকাশের মাঝে পাত্‌লা পাত্‌লা মেঘের একটা বিস্তৃত রেখা ঠিক্ যেন নদীর আকারেই তার প্রত্যেক মেঘ তরঙ্গভঙ্গটিকে সচল ক'রে নিজের বুকের ওপরে কবিকল্পনার অমল ধবল পাল্-তোলা যে নৌকাখানা ব'য়ে নিয়ে চলেছিল সে নৌকাখানার নামও বুঝি তার গায়েই লেখা ছিল! তার নাম ছিল আনন্দ! আমি অবাক্-চোখে তার সেই সাগরপার হতে বয়ে আনা সুদূরের ধন-ভরা তরণীখানি যাওয়া সারা সকাল ধরে দেখেছিলাম! নৌকাখানির কাণ্ডারীর মুখে সেই 'ছিন্ন মেঘের ফাঁকে' তেমনি অরুণ কিরণও এসে পড়েছিল! সে কাণ্ডারীর নামটি হচ্ছে সুখ, আর তৃপ্তি! কিন্তু এই দুপুরে একি সুর—একি গান হঠাৎ আমার অন্তরে বেজে উঠলো? গানটির অন্ত কোন কথা বা আর কোন কিছুতো মনে পড়ছে না। মাত্র ঐটুকু "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" কিন্তু ঐ কথাকটিতেই একটি বিপুল অতৃপ্তি একটি গভীর উদাস সুরে অন্তর যে ভরে উঠ্‌ল! এ অলস ভৈরবী সুর—এই উদাস হাওয়া কোথা হ'তে এল আজ? আমি তো একে কখনো জানি না! আমি তো উদাসীও নই, সুদূরের পিয়াসীও নই। আমার হাতের কাছে বুকের নীচে চোখের সুমুখের এই যে পৃথিবী এর সবই যে আমি বড্ড ভালবাসি। এ তো চঞ্চলা নয়, নিত্য নূতন গন্ধে বরণে গানে আমার প্রাণে প্রবেশ করতে যে তার অচল আগ্রহ। একেই ভালবেসে যে আমি এখনো তৃপ্ত হইনি।

আর ভালবাসি আমি এই সুখতপ্ত ধরার বুকের মাঝে স্পন্দিত নিত্য-নন্দিত আমার এই জীবনটিকে! যে এই পৃথিবীকে ভোগ কর্‌ছে, দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে,—এর সর্ব্বরস অনুভব কর্‌ছে। কিন্তু কে আমায় এমন করে এই চরাচরকে আর সেই চরাচরকে যার দ্বারা অনুভব করছি—নিজের সেই ক্ষুদ্র জীবনটিকে এমন সুখময় অনুভূতির সঙ্গে ভালবাসতে শিখিয়েছে? কোন্ গুণী আমার সুমুখের এই ভুবনকে অপরূপের আলোয় ছেয়ে তার পাষাণ বুকে 'সুরের সুরধুনী' বইয়ে দেয়? কবি তিনি কবি! তাঁরই কাব্য আর গান। আমার মনে হয়, মানুষ মানুষই হ'ত না যদি না জগতে কবি জন্মাতেন! এমন ক'রে মানুষের অনুর্য্যম্পশ্য অন্তরের দল স্তরে স্তরে কে খুলে দিত, যদি না কবির অনুভব কবিতা হ'য়ে গান হ'য়ে তাকে স্পর্শ করত? অন্ততঃ আমার জীবনে এ কথাটা তো সম্পূর্ণ খাটে। আমার যা কিছু বল্‌বার, জানবার, অনুভব কর্‌বার সবই আমি কবির হাত হ'তেই পেয়েছি এবং এখনো সে পাওয়া ফুরোয় নি। পেতে পেতেই চলেছি, আর শেষ পর্য্যন্তও বোধ হচ্ছে তাই-ই পাব। কবির যে অনুভব ভাষা হ'য়ে সুর হ'য়ে বেরিয়েছে, তাদের নিজের তুচ্ছ জীবনে যেটুকু অনুভব করি, তারই নাম আমার এই ডায়েরী লেখা। এ কেবল এই নগণ্য প্রাণের অনুভূতিকে কবিরই ভাষায় কবির গানের সঙ্গে মিলিতে দেখা। মানুষের এই মূক প্রাণকে ভাষায়, সুরে যে অহরহ প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলছে তার এই শরতের, বসন্তের, হেমন্তের, সর্ব্ব ঋতুর গানে আমারও এই দিন মাস বৎসর তারিখের হিসাব-হারা প্রাণ কেবল মাত্র অনুভবের ধারা ধরে কবির গানের সুরের পদে পদে তাল দিতে দিতে... এই দুদিন আগে ভরা

ভাদরের ঝর ঝর বারি ঝরার মধ্যে মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে তাকেই নিজের চোখের সাম্‌নে যে নাচতে দেখেছিল! শ্রাবণের ঘন মোহে সে তারই কাজল কালো চুলের রাশ পানে চেয়ে সে দিন অভিভূত হ'য়ে থেকেছে। সে দিনের নীপের বন যে পুলকভরা ফুলে ব্যথিয়ে উঠেছিল আর নদী যে পূর্ণতার উচ্ছ্বাসে কূলে কূলে কলরোদন তুলে চলেছিল—সেও যে আমার এই পূর্ণ সুখানুভূতির অসহ্য উচ্ছ্বাস মাত্র! কিন্তু আজ আবার সেই একি গান গাইলে! আজ আমি শুনছি আমার প্রাণের একেবারে কাণের কাছে মুখ রেখে সেই ধরণীই গেয়ে উঠেছে "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!" আমার অচলা আজ বলছে, সে আজ চঞ্চল! সে আজ পিপাসী!

স্থলে আকাশে এই রৌদ্রতপ্ত ধরার বুকে আজ একটা গভীর তৃষ্ণারই ইঙ্গিত যে স্পষ্ট হতে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিসের এ তৃষ্ণা? কিসের অভাব তার? ঐ যে শুভ্র নবনীর মত মেঘের চাপ্ তীব্রোজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, তারাও যেন ইঙ্গিতে আভাস দিচ্ছে তারা 'জলহারা!' তাঁদেরও অন্তরে আজ এই তৃষ্ণার আকুলতা। দিকে দিকে তা'রাও সেই সুদূরের সন্ধানেই যেন চলেছে। আর তাদের নীচে এই শ্যামলা, উজ্জ্বলা আমার চিরনন্দিতা ধরণী সহসা যেন উদাসিনী হ'য়ে তাদের পানে চেয়ে আছে। তা'র অন্তর হতে সেই একই সুর বাজছে সে পিয়াসী—পিয়াসী! সঙ্গে সঙ্গে আমারও অন্তরে আজ সেই বেদনা! এ তো শুধু আর আভাস নয়, ইঙ্গিত মাত্র নয়। এ যে একেবারে স্পষ্ট! এ যে একেবারে এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের সঙ্গেই জল্ জল্ ঝল্ ঝল্ করে উঠলো! এই উদাসী বায়ুর মতই যে তার 'হু হু' করা নিঃশ্বাস আমি শুন্‌তে পাচ্চি।

কিন্তু কেন? কেন তা তো কেউ-ই বল্‌তে পার্‌ছে না—তবু চাই—চাই! কারণ না থাক্‌লেও এই তৃষ্ণা তাদের মিথ্যা নয়! কি চায় তারা? সেই সুদূরকে! যাকে কখনো তারা পায়নি এবং হয়ত চির-জীবনে পাবেও না। যে তাদের কখনো ধরা দেয়নি—কখনো বুঝি দেবেও না—সেই চির অপ্রাপ্তির ধন সুদূর কে!

এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে একি মায়ামরীচিকা আমার চির আনন্দ চির সুখের নিকেতন ধরণীর বুকে বাসা বাঁধ্‌লো! সে যে তার জলস্থল অন্তরীক্ষকে এই অকারণ ব্যথার তীব্রতায় ভরিয়ে দিয়ে আমায় সুদ্ধ পাগল ক'রে তুল্‌লো। সুদূর কে? সুদূর কি? তা কেউ জানে না, তবু তাকে পেতে হবে, তবু তাকে চাই!

—

পরদিন

জগতে যত কিছু চাইবার তার তো আমার একটুরও অভাব নেই। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সম্পদ, আমার যথেষ্ট; বিদ্যা, বিনয়, চরিত্র সম্বন্ধেও কখনো একটা বিরুদ্ধ মন্তব্য কানে আসেনি। মোট কথা এগুলা যতটা থাকুক বা না-ই থাকুক অন্য কারো এই সব সম্পদের উপর একটুও ঈর্ষা কখনো ত আমার আসেনি। তা হ'লেই বলতে হবে যা আমার আছে অন্যের কাছে তা যতই ছোট হোক্ আমার নিজের কাছে তা পর্য্যাপ্ত। এই হ'লেই যথেষ্ট হ'ল না কি? স্নেহময় আত্মীয় স্বজনও ভগবান আমায় দিতে কার্পণ্য করেন নি। তাঁরা আবার আমার ওপরে এতটাই নির্ভরশীল যে, কখনো অধীনতার কষ্টও জীবনে আমি জানি না। সেই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কতকগুলো ছাপ্ নিয়ে বেরিয়ে এসেও আমি এখনো প্রকৃতির কাছে 'তরুণ'। বয়স খানিকটা হ'য়ে গেলেও আমি এখনো সকলেরই কাছে স্বাধীন-বালক! বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাড়ে থেকে নামিয়ে স্বদেশ-বিদেশের কাব্যকুঞ্জে সেই যে ঢুকে পড়েছি, তার থেকে আমায় টেনে বার কর্‌তে কারো এ পর্য্যন্ত সাহসে কুলোয়নি। আমায় এতটা স্বাধীনতা দিয়ে জানি না তাঁরা ভাল করেছিলেন কি আমার মন্দই করেছিলেন।

কাল হঠাৎ ডায়েরী লেখার সখ হ'য়েছে! এতদিন তো এ বালাই ছিল্ না! কালকের দুপুরের ঐ সুরটাই এই কাণ্ডটা ঘটালে, তারপর থেকে তার জের বাড়্‌তেই চল্‌লো দেখছি। কত ছাই বালাই-ই যে এতে লিখে যাচ্ছি, এখনো আরও কত যে লিখব তারই ঠিক্ কি! এ এক আচ্ছা নতুন নেশায় ধর্‌লো দেখছি। দিনকতক মাত্র বাংলা দেশ ছেড়ে এই "গিরি পর্ব্বতে"র দেশে এসেছি, এখানে প্রকৃতির এ কি উপদ্রব? স্বাস্থ্যসঞ্চয় ও নূতনত্বের আনন্দ উপভোগ কর্‌তে এসে আমার চিরদিনের আশ্রয়

আমার আশৈশব যৌবনের সাথীর এমন বেসুর গান কেন কানে আসছে। সেও যে কি এক নতুন কথা আমায় বলতে চায়---বলতে চায় দেখছি! কি চায় সে? কিসের তার অভাব? আবার সে অভাব-বোধকেও এ কি রঙ্গিন আলোয় সাজিয়ে নতুন এক নেশার মত আমার মনের কাছে ধরছে অন্তরের পূর্ণতার দিনেও যেমন, আজ এই রিক্ততার মধ্যে তেমনি তাকে অনুভব করবার মত্ততাও যে ক্রমে আমায় পেয়ে বসছে! এই 'সুখের ব্যাথা'কে নিয়ে ব'সে নড়তে চড়তে উল্টে পাল্টে দেখতেও যে বেশ লাগছে! এ আবার কি মজা!

কিন্তু তারও সময় বড় কম। এই দূর দূরান্তের দেশে ঐ যে আমার আত্মীয়ের মত পিতৃবন্ধু আছেন একজন এঁকে জান ত! যেখানে যাই সেইখানেই আমার স্বজন! আঃ, পৃথিবীর এ জঞ্জাল হ'তে যেন আর থাকতে ভাল লাগে না। একা একা---মাত্র একা আমি, আর কেউ কোথাও নেই, এমনি হ'য়ে কোথাও প'ড়ে থেকে নিজেকেই বেশ ক'রে আরাম ক'রে ভোগ করি, এই যেন এখন আবার মন চায়।

কিন্তু তারও উপায় নেই। ওঁর সাদর নিমন্ত্রণ তো এসে পর্য্যন্তই অপর্য্যাপ্ত রকম চলেছে, আবার শুনলাম তাঁর কন্যা বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছে, সেই জন্য কাল দুপুরেও একটা নিমন্ত্রণ! এইখানে একটু কাহিনীও আছে। পিতা ও তাঁর এই বন্ধু দু'জনে মিলে নাকি বহুদিন পূর্ব্বে এই কন্যাটি-কেই আমার জন্য স্থির করেছিলেন। তার পরে আমার পিতাও গত হন এবং আমার মাথানাড়ার দায়ে আমার আত্মীয়রা এ বিষয়ে এঁকে অনেকদিনই নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছিলেন। লোকটি কিন্তু এমনি নিস্মল, সে সব কথা কিছুমাত্র মনে রাখেননি। আমায় পেয়েই বন্ধুপুত্রের সকল আদর প্রচুরভাবে আমায় অযাচিত দান ক'রে চলেছেন; আমারও এতদিন কিছু বাধেনি, কিন্তু আজ একটু বাধ্-ছিলো। তার পরে যেই শুনলাম যে এ নিমন্ত্রণে তাঁর ভাবী জামাতাও উপস্থিত থাকবেন, তখন সব বেশ হাল্কা হ'য়ে উঠেছে। যেতে তো হবেই। ইনি আমাদের হিন্দু অথচ বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরে এই মধ্যপ্রদেশেরও সীমা ছাড়িয়ে মহারাষ্ট্রীয়দের আব-হাওয়ায় তাদের দৃষ্টান্তে মেয়েকে এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখে এই অঞ্চলেরই মহারাষ্ট্রীয় মহিলা কলেজে এক বন্ধু-পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। মেয়েটি কয়েক বৎসরের বেশীর ভাগ সময় সেই মহারাষ্ট্রীয় পিতৃবন্ধু পরিবারের মধ্যেই পুনায় বাস ক'রে এসেছেন। হিন্দু-সমাজ এতদূরে ধাওয়া ক'রে এসে এঁর টিকি ধরতে পারেনি দেখ্‌ছি। এইবার বুঝি মেয়ের শিক্ষা শেষ করিয়ে ঘরে এনে বিয়ে দেবেন। জামাইও ঠিক করা হয়েছে, শুনছি। মেয়েটির নাম শুনলাম সগুণা! বাঃ এরা একেবারেই মারহাট্টি বনে গেছে বটে। কাল আর তা হ'লে মাত্র একা পিতৃবন্ধুর স্নেহের আড়ালে ব'সে হাজারো ত্রুটির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া নয়। কাল আর মাত্র সেখানে একা তিনি নন, একটা রীতিমত পার্টিই তা হ'লে। তাঁর গৃহ শূন্য, সে জন্য রীতিমত আতিথেয়তা করতে পারেন না ব'লে তিনি একটু কুণ্ঠিতই থাকতেন, আজ তাই তাঁর আনন্দ মুখে চোখে ফুটে উঠছিলো। যাক আমারও আর একটা দিন না হয় তাঁকে খুসী করবার জন্য গোলমালেই কেটে যাবে! কিন্তু দুপুরে নিমন্ত্রণ, আঃ! আমার এই জানালার নীচে দিগন্তের পানে তখন যে ঐ গানটি ব'য়ে চল্‌বে, "আমি সুদূরের পিয়াসী!" কতক্ষণে এসে আমি শুনতে বসতে পাব, কে জানে! এই দুপুরটির নেশা যে এখন আমার চিরদিনের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনাকে ছাড়িয়ে উঠলো! উপাসনাই বটে! আমি যে ভাবেরই উপাসক, আর তার উপাস্য আমার এই ধরণীর নিত্য-নবরূপরাশি! রাত্রি হ'লো ঘুমুই এইবার।

- —

প্রভাত

আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো
আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা
যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবি ভালো।
* * * তোমার আলো ভালবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো।

এই প্রকাণ্ড আকাশের তলে খোলা মাঠের বুকে এই মেঘমুক্ত শরতের নবরৌদ্রে উজ্জল ধরণীর এ রূপ বুঝি এমনটি নৈলে অন্য কোথাও এমন ক'রে দেখা যেত না। এমন উদার শোভার জন্য এমনি বাধাবন্ধহীন অবকাশের দরকার!

দৃষ্টি বাধ্‌ছে কেবল বহুদূরের ঐ নীল প্রাচীরশ্রেণীর গায়ে—ঐ সাতপুরা পর্ব্বতমালার অঙ্গে। আশে-পাশের কাছা-কাছির এ সবুজে ঢাকা ছোঠ-খাটো পাহাড়গুলি এ বাধা-বন্ধহীন অবকাশের কোনই বাধা দিতে পার্‌ছে না।

জানি না কবি এমনি একটা দৃশ্যের মধ্যেই এ গানটিকে রচনা করেছিলেন কি না! তাঁর 'আলোর আলো' কি তা জানি না, কিন্তু আমার আলো আমার এই জীবন!—যার প্রভায় আমি এই জগৎ চরাচরকে নিত্য ভোগ করি। আর আমার সেই "আলোর আলো" এই ধরণীর আলো, আর আকাশ বাতাস! আমার হারানো ধনকে আবার আমি এই প্রভাতে ফিরে পাব, এ আর কাল দুপুরে মনেও করিনি। কোথায় সে তৃষ্ণার জ্বলন্ত আলো? কোথাও না! কবির কত বাণীই যে আজ আমার মধ্যে জীবন্ত আর সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ছে!

নীল আকাশের গায়ে এক একখানা সাদা চাদর এখানে ওখানে যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে প'ড়ে রয়েছে। দূর আকাশচারী বড় বড় পাখী দু' চারটে মাত্র আমারই মত এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে এই আলোকধারায় স্নান করছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমারই মত ঠিক যার আলোর এই বিকাশ, সেই উদ্দীপ্ত সূর্য্যের দিকে পেছন দিয়ে আশে-পাশের দিকে পশ্চিমের দিকে মুখ রেখেছে চোখ খুয়েছে। কত গানই মনে আস্‌ছে—

* * * এই মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ!
* * * তোমারি মুখ এই নুয়েছে মুখে আমার চোখ থুয়েছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

হঠাৎ মনের ভেতরটা আবার দুলে উঠ্‌লো কেন! "এই তো তোমার প্রেম হৃদয়-হরণ!"

এ কিসের প্রাপ্তির গান? কোন্ তৃষ্ণা নিবৃত্তির সুর? কি পেলে এমন ক'রে প্রাণ ভরে?

"* * * ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ দু' হাত দিয়ে ফ্যাল ঠেলে।"

পেয়েছি বটে, তবু একটু আবরণ ঐ যে রয়েছে। এ অতৃপ্তিটুকু মিটিয়ে যাক্, ওটুকু স'রে যাক্! আবার সেই দুপুরের সুরের আভাস—আবার সেই কথা। এই অতৃপ্তি থেকেই সেই তৃষ্ণাকে ক্রমে টেনে আন্‌বে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। শুধু এ নয়, আরও কিছু চাই, চাই।

কিন্তু সে কি? আবারও সেই প্রশ্ন!

নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে যে। আর খাতা লেখে না। উঠি!

* * * * *

এর নাম কি? একে কি বলে? ওগো এ আবার কি? কেউ ব'লে দাও আমায়!

দুপুর? কখন্ চ'লে গেছে! নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এসেছি যথাকালে। সায়াহ্ন—না সন্ধ্যাও যে চ'লে যায়।

সুখ? না! দুঃখ? তাও না! তবে কি এ? না—কিছু লিখ্‌তে পার্‌ব না—পার্‌ব না!

ক'দিন কেটে গেল? দেখি হিসাব ক'রে! পাঁচ দিন? উঃ!

কিছু মনে পড়্‌ছে না এই ক দিন কি করেছি! কেবল মনে পড়্‌ছে পিতৃবন্ধু এসেছিলেন! আমার পাশে ব'সে আমার হাতে একটুক্‌রো চিঠি ফেরত দিয়ে অত্যন্ত শান্ত স্নেহপূর্ণ চোখে যেন আমার মনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, "এখন যে আর এ বদ্‌লানো চলে না, বাবা, সগুণাকে হরেন্দ্রের বাগদত্তা ব'লেই জেনো।"

মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি কি হয়েছিল! কেন? আর এখনই বা কি হয়েছে আমার? নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম! তার পর? ক'জনে খেতে বসেছিলাম তাও ভাল মনে পড়্‌ছে না। হরেন্দ্র বাবু ছিলেন তো নিশ্চয়ই—আরও কে কে। গৃহকর্ত্তা সঙ্গে বসেননি। সে তো পার্টি নয় তিনি দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিলেন, আর মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় পরিবেশন কর্‌ছিল তাঁর মেয়ে! মাটীর উপর চালগুঁড়ি দিয়ে সুন্দর সুন্দর আসন চিত্রিত করিয়ে প্রত্যেক আসনের দুই ধারে দুইটি ক'রে "অম্বর বাত্তি' (সুগন্ধ ধূপ কাঠী) জেলে নিমন্ত্রিতদের সেই কল্পনার আসনের উপর ছোট ছোট কাপড় পেতে বসানো হয়েছিল আর প্রথমে সমস্ত খাদ্য অতি অল্প এমন কি নমুনার ভাবে পাতে রেখে—পরে একে একে বারে বারে অল্প মাত্রায় গরম গরম আমাদের এনে এনে দিচ্ছিলেন। সকলেই যার যা দরকার চেয়ে চেয়ে নিচ্ছিলেন। এই নাকি এ দেশের প্রথা! (নিমন্ত্রণটা একেবারে মহারাষ্ট্রীয়

অনুকরণে!) আর তাতে সব চেয়ে বিপদে পড়েছিলাম আমি! এ তো বাঙ্গালীদের কখনো অভ্যাসে নাই যে অল্প মাত্রায় পরিচিত বা একেবারে অপরিচিত স্থানে এমন ক'রে চেয়ে নিয়ে খেতে হবে! নিজের ঘরেই যে আমাদের পাছে পাতে পড়ে নষ্ট হয় বলে অতবেশ চেয়ে নেওয়া অভ্যাস থাকে না। বে-হিসাবী বে-আন্দাজী অপচয় করার জন্য বাঙ্গালী ভোজ যে বিখ্যাত।

যাক্—তার পরে? সকলের দেখাদেখি প্রায় ভদ্রতার খাতিরেই এটা ওটা একটু একটু চেয়ে নিয়েছি বৈকি! আর উনি তো সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেবলই শাসাচ্ছিলেন—"পেট ভ'রে যদি না খাও, তো টের পাবে। সগুণা তুই নিয়ে আয়,—ওর কথা শুনিস্‌না—" ইত্যাদি।

তার পরে? এ সব তো সোজা কথা—এতে এমন কি হল? এতদিন এতকাল পরে—আর এই যে কাণ্ডটি করলাম সগুণার বাবাকে চিঠি লিখে,—এ কেন?

কি এমন দেখেছিলাম? রূপ? কৈ তাওতো এমন বুঝতে পারছি না! মনে মনে ভেবে দেখছি, অতি প্রোজ্জ্বল-সৌন্দর্য্যও কি দেখিনি কখনো? দেখেছি বৈকি! অবাক হয়ে বিধাতার শিল্পচাতুরী চেয়ে চেয়ে দেখেছি এমন কত 'হিমকুন্দ-তুষারাভাঃ' সুন্দরী, কত 'বসরাই গুলে'র তুলনীয়া, কত চম্পকোপমা,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রূপের আলোয় চোখে ঠিক ধাঁধা ধ'রে যায় এমন কত। আমারই জন্ম শুনেছি দেখেছি এমন কত, যারা সগুনার চেয়ে—লিখতে পারলাম না আর। কি লিখছি নির্ব্বোধের মত,—'কার' নাম নিয়ে বার বার কিসের তুলনা ক'রছি? রূপ? মানুষের এই কদর্য্য অসার বহিরাবরণ যা দিয়ে আসল মানুষটাই চিরদিন ঢাকা পড়ে আছে, তাই দিয়েই তার তুলনা। ছি ছি এর চেয়ে মূর্খত্বের পরিচয় আর নেই!

তবে কি গুণ? তাই বা কি ক'রে বলি? কি জানি তার আমি, কতটুকু পরিচয় জানি তার? না না এও না!

বিদ্যা? তুলনা আর করব না—তবু বুঝ্‌ছি তাও নয়।

এই তুলনা জিনিষটাই কি বিশ্রী! এই ক'টা কথা লিখতেই মনটা কি বিকৃত—কি পঙ্গু, কি সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ছে! পৃথিবীতে আছে কি কেবল রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধির বিচার মাত্র? এরই ভুল দাঁড়িতে তুলে সব জিনিষকে বুঝে নিতে হবে? এতেই জিনিষের মূল্য ঠিক হবে? হায় রে—তাই যদি হ'ত তাহ'লে আর তার মধ্যে 'অতুল্য' 'অমূল্য' এ কথাগুলো থাকতো না! আর পৃথিবী তাহ'লে কি দরিদ্র, কি হীনই না হ'য়ে দাঁড়াত' জগতের কাছে। আভাস পর্য্যন্ত যার পায়ের কাছেও পৌঁছুতে পারে না—এমন কিছুও আছে গো এই পৃথিবীর মধ্যে।

তাহ'লে কি একেবারেই অকারণ? সম্পূর্ণ অকারণেই মনের এই কাণ্ড! মন যে একেবারে লাফিয়ে উঠে অন্তরের মুখ থেকে এই কথাটি ছিনিয়ে নিচ্ছে! অকারণ! হাঁ এ অকারণই! যেমন অকারণে সেদিন আমার চির স্থিরা চির সুখময়ী পৃথিবী সহসা জেগে গেয়ে কেঁদে উঠেছিল "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!" তেমনি, ঠিক তেমনি করেই!

লজ্জার ধাক্কাটাও কেমন করে সাম্‌লাতাম জানিনা যদি না পিতৃবন্ধু আমার ঐ কথাগুলার পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ ক'রে আমায় একটু প্রকৃতিস্থ ক'রে রেখে না যেতেন! তারপরেও প্রত্যহই আসেন এবং ও কথাটা যে আমি কখনো তাঁকে বলেছি এমন একটু আভাসও আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন না। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে প্রত্যহ আমায় তাঁর বাড়ী গিয়ে হরেন্দ্র আর সগুণার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করতেও বলছেন, কিন্তু আমি—কি জানি পারব কি? অন্ততঃ এখনি? না পারব না। আগে নিজের কাছেই নিজের লজ্জাটা ভুলে নিই।

মাত্র কদিনের একটা প্রবল ইচ্ছা, নিশ্চিত প্রাপ্তি সম্ভাবনার একটা উত্তাল আশা, তারই নিরাশার আঘাতে এতখানি বেদনা? পাবে না, আর পাবে না; মিথ্যা, মিথ্যা সব। যে দিন হেলায় হারিয়েছ আর তা প্রাণপণ করলেও তোমার হাতে আসবে না। যা অনায়াসে পেতে আজ তা তোমার পক্ষে সুদূরের চেয়েও সুদূরের ধন—দুর্লভ হ'তেও দুর্লভতম বস্তু! যা তুমি হারালে এর কাছে তুচ্ছ তোমার জীবন—তুচ্ছ তোমার সব—তুচ্ছ তুমি! অন্তরের ভেতর অন্তর লুকিয়ে পড়ে কেবল এই কথাই বলছে যে! এর এ ব্যথা নিবারণ করবার মত আজ আর হাতে কোন সম্বলই যে পাচ্ছি না। তবু চিরদিনের জায়গাটিতে আসন

পেতে পৃথিবীর মুখের দিকে চাইছি, কই গো আমার অম্লান প্রভাতের আলোর আলো—কোথায় তুমি আজ? কেন আমার এই সহসা অন্ধকারময় চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে পারছ না? আজ সে আলোর দলগুলি কেন খুলছে না, সেই সোনার কোষের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে কে ও আজ! আনন্দের সিংহাসনে আজ কে এ, এতো আমার সেই সুখের মত ব্যথা নয়! এ যে একেবারে জীবন্ত, জ্বলন্ত! কি তীব্র—কি উদ্দাম এ বেদনা! এর নাম কি, কে বলে দেবে আমায়?

আমি না সাড়ম্বরে লজ্জা ভুলতে বসেছিলাম! কিসের লজ্জা? কে পেয়েছে? কিছু না! কি তুচ্ছ এ লজ্জার কথা, নিজের এতদিনের জীবনটাই যেন একেবারে ধোঁয়ায় মিশে গেছে! সমস্ত আকাশ বাতাস চরাচর জুড়ে যা আজ একান্ত সত্য হ'য়ে উঠে আর সবকে একেবারে মিথ্যায় একবারে তুচ্ছত্বে পরিণত ক'রে দিচ্ছে তার একটি মাত্র নাম—বেদনা—বেদনা! লজ্জা বা ঐ রকম একটু কিছুর স্থান থাক্‌লেও তো বাঁচ্‌তাম!

সন্ধ্যার দুয়ারেও ভিখারীর মত বসেছি। আকাশেও দেখি সেই নিরুদ্দেশ যাত্রা! সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা ক্রমে নিভে এলো দেখ্‌ছি—

সেই —ঘননীল নীর
কোন দিকে চেয়ে নাহি দেখি তীর
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।

"এখন বারেক শুধাই তোমায় স্নিগ্ধ-মরণ আছে কি হোথায়?"

কাকে এ প্রশ্ন কর্‌ছি? আমার যে এমনি হয়েছে এ জগতের কে জানে? কেউ না—কেউ না! জগৎ না জানুক কোন দুঃখ নেই, বরং না জান্‌লে বাঁচি। কিন্তু ওগো তুমিও একবার জান্‌বে না! এ কথা তুমিও যে জান্‌তে পার্‌লে না এ দুঃখ কেমন ক'রে সইব? কিন্তু জানাতেও তো কখনো পার্‌বো না—এওতো নিশ্চয়।

রাত অনেক, সদ্যোগত বর্ষার এই ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ছাতের উপরই কি পড়ে ছিলাম? এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখছি নক্ষত্রদের চোখ তো জ্বল্‌ছে! তারা আমার এই কাণ্ড দেখেছে মনে ক'রে একটু লজ্জার সঙ্গেই একটা উদ্দাম নিশ্বাসকে যে রোধ কর্‌তে পার্‌ছি না! নক্ষত্রদেরও তো আমি জানাতে যাই নি, কিন্তু তারা যেমন ক'রে সব টের পায় এমনি ক'রে কি সে চোখের আলোও আমার এই দুর্ভাগ্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে—

কি কর্‌ছি, কি লিখ্‌ছি পাগলের মত! এই এক জ্বালা—একি লেখার নেশায়ও ধরেছে। সেদিন দুপুর থেকে এই এক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে দিন কি স্বপ্নেও জেনেছিলাম যে আমার এই ভাবচর্চ্চা শেষে নিজের জীবনের কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে!

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

সঙ্গীর প্রতি বারিধারা

চল্ রে, বঁধু, চল্,
দোদুল মেঘে ঘুমিয়ে কত
করবি' টলটল্?
চল্ রে, বঁধু, চল্।

দুখান আর মরার মাঝে,
কি বা এমন তফাৎ আছে?
কিসের ভয়ে রইবি' পাছে
ওরে হীনের দল্?
চল্ রে, বঁধু, চল্!

মরণ যদি হবেই হবে,
হো'ক্ না মরণ মধুর তবে,—
ফুলের বুকে ঝাঁপিয়ে সবে
করবো ঝলমল্।
চল্ রে, বঁধু, চল্!

মুক্তা হব শুক্তি-বুকে,
উল্লাসে ঢেউ ধর্‌বে মুখে,
আঁচল পেতে ভুবন দুখে
চাইছে ছলছল্।
চল্ রে, বঁধু, চল্।

উষর মরু উঠ্‌বে হাসি'
বক্ষে লয়ে ফুলের রাশি,
নদীর সনে চল্‌বো ভাসি,'—
গাইব কল্‌কল্।
চল্ রে, বঁধু, চল্।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
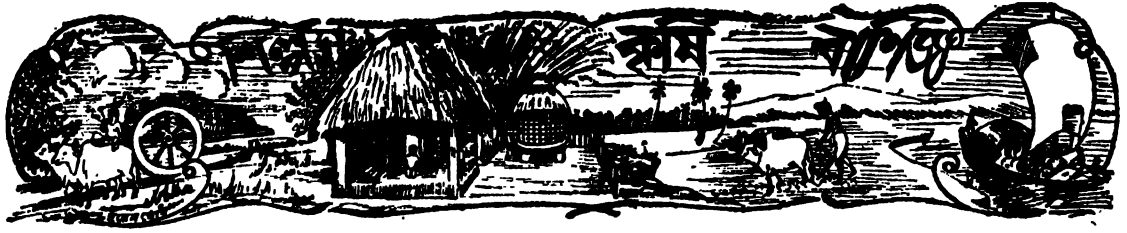
ঔষধের গাছগাছড়া

উদ্ভিদ ব্যতিরেকে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ। আহার্য্য, পরিধেয়, গৃহনির্ম্মাণ ও সজ্জার দ্রব্যাদির জন্য মানব উদ্ভিদ্-জগতের নিকট ঋণী। সেইরূপ আমাদের ব্যবহৃত অধিকাংশ ঔষধের উপাদানও উদ্ভিদ। প্রাণীজ ঔষধের মাত্রা কম, খনিজ ঔষধ তদপেক্ষা বেশী; কিন্তু উভয় প্রকার ঔষধ একত্র করিলেও উদ্ভিজ্জ ঔষধ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইবে না। ইহার এক কারণ হইতে পারে যে, উদ্ভিদ্ সহজপ্রাপ্য বলিয়া মানব বহু পুরাকাল হইতে তৎসমুদায় বহুবিধ রোগের চিকিৎসায় পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। এরূপ ভাবে প্রযুক্ত ঔষধের সংখ্যা কালক্রমে সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রোগ উপশম করিবার ক্ষমতায় উদ্ভিজ্জ পদার্থ কোন অংশেই প্রাণীজ অথবা খনিজ পদার্থ অপেক্ষা হীন নহে। সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ ঔষধের ক্রিয়া মৃদু, কিন্তু উগ্র উদ্ভিজ্জ ঔষধেরও অভাব নাই, কুঁচিলা, ধুতুরা, কুঁচ, জয়পাল প্রভৃতি তাহার উদাহরণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ণনা না থাকায় উক্ত শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উদ্ভিদের স্বরূপ নির্ণয় ও নামকরণ বড় দুরূহ ব্যাপার। তথাপি যেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই, সেরূপ বৃক্ষলতাদির সংখ্যা তিন শতের কম হইবে না। এতদ্ভিন্ন ঠিক শাস্ত্রীয় নয় অথচ সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ে ব্যবহৃত হয়, এরূপ গাছ-গাছড়ার সংখ্যাও অন্যূন দুই শত হইবে। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে যে অন্ততঃ পাঁচশত উদ্ভিদ্ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইবে, তাহা আদৌ আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু অনেকগুলি দেশীয় ঔষধেরই ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এক প্রদেশে যাহা ব্যবহৃত হয়, অন্য প্রদেশে হয় ত তাহা হয় না। যেগুলির প্রচলন সর্ব্বপ্রদেশে সাধারণ, তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আবার বৃটিশ-শাসনের আমলে অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের ব্যবহার্য্য ঔষধেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী ঔষধ ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বিলাতী ঔষধ বলিতে গেলে প্রধানতঃ এলোপ্যাথিক ঔষধ বুঝায়। এলোপ্যাথিক ঔষধ official ও unofficial দুই রকম আছে। যেগুলি British Pharmacopœiaয় গৃহীত হইয়াছে, সেইগুলিই official; এবং তদ্ব্যতীত সমস্তই unofficial। পূর্ব্বে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় সামান্য পরিমাণেই ভারতজাত ঔষধ ছিল; ইদানীন্তন এই শ্রেণীর কতিপয় ঔষধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভারতে প্রায় পঁচিশ হাজার জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে। এই বিরাট উদ্ভিদ্ ভাণ্ডারে যে দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী দ্রব্যাদি নাই, তাহা কেহই সহজে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। এতদ্দেশে সেই হিসাবে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার চলন বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ওসানসি ও ওয়ারিং প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ দেশীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহ নির্ব্বাচিত করিয়া Bengal Dispensatory ও Pharmacopœia of India সঙ্কলন করেন। কয়েক বৎসর উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রচলন হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের জন্য বিশেষভাবে যে একখানি ফার্ম্মাকোপিয়া হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এরূপ ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলনের প্রধান প্রতিবন্ধক—অধিকাংশ ভারতীয় উদ্ভিজ্জ-ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণার অভাব। অনেক ঔষধের উপকারিতা শুধু অভিজ্ঞতায়, এমন কি, জনশ্রুতির উপর স্থাপিত। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা হইলে চলে না। কোন বিশেষ ঔষধের কোন্ বিশেষ উপাদান কিরূপ ভাবে দেহস্থিত কোন্ যন্ত্রের উপর ক্রিয়া দ্বারা রোগ উপশম করে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার এবং মানবেতর প্রাণীর উপর পরীক্ষার দ্বারা তাহা প্রমাণিত হওয়া চাহি। তবেই সেই ঔষধের গুণাবলী গ্রাহ্য হইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় ও হাকিমি শাস্ত্রে যে বহুসংখ্যক ঔষধ আছে, তাহার মধ্যে প্রকৃত ফলদায়ক ঔষধ নাই—

এ কথা এমন কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর ঘোর পক্ষপাতীও বলিতে পারিবেন না। এই শ্রেণীর ঔষধাবলির প্রধান দুরদৃষ্ট এই যে, উহাদের মধ্যে ভাল মন্দ এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, সাধারণতঃ সমস্তগুলিই দুর্নামের ভাগী হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় প্রায় ১ শত ৫৭টি উদ্ভিজ্জ ঔষধের মধ্যে ৩৯টি ভারতে বন্য অথবা অর্দ্ধ-বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অপর ১৬টির মধ্যে অনেকগুলি ক্ষেত্র ও উদ্যানে বহুকাল হইতে উৎপাদিত হইতেছে ও কয়েকটি সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত হওয়ায় বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতে ইহাদের ব্যবহার সুপরিচিত ছিল। প্রতীচ্যের চিকিৎসকগণ বহুসংখ্যক পরীক্ষার ফলে ইহাদের গুণাবলী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন মাত্র। দেশীয় ঔষধ ব্যতীত সুলভে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নাই উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় ঔষধাবলীর উপর শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে; রাষ্ট্রসভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, ও এ ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণারও সূত্রপাত হইয়াছে।

ভারতীয় উদ্ভিজ্জ ঔষধ সমূহের ব্যবহার দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগের সাধারণ চলন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ঔষধের গাছ গাছড়া লইয়া আপাততঃ অল্পবিস্তর কারবার চলে। ইহাদিগকে আমরা বিশেষভাবে ব্যবসায়ের গাছগাছড়া বলিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুঁচিলার উল্লেখ করিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয়, হাকিমি, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাপ্রণালীতে ইহার ব্যবহার আছে। দেশে ব্যবহার বাদে ইহার রপ্তানীর মূল্য প্রায় দশলক্ষ টাকা। এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌গুলি এতদ্দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় ও তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া গাছড়ার মূল্যের শতগুণ অধিক দামে এ দেশে আসিয়াই আবার বিক্রয় হয়। রাসায়নিক দ্রব্যাদি বাদ দিয়া প্রতি বৎসর প্রায় দেড়কোটি টাকার ঔষধ এতদ্দেশে আমদানী হয়। এই সমুদয়ের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধের উপাদান যে ভারত হইতে সংগৃহীত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের কর্ত্তব্য কাঁচামাল হইতে দেশমধ্যে এই সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করা। কিন্তু তাহার অন্তরায় অনেক। বিশেষজ্ঞ, মূলধন, ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা, বহুল উৎপাদন (mass production) প্রভৃতির অভাব তাহার কতকগুলি। দেশমধ্যে সকল সূক্ষ্মদ্রব্য (Fine pr. duct) উৎপাদন এখনই সম্ভবপর না হইলেও কতকগুলি মূলদ্রব্য (Heavy or crude product) যে সহজে উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা বিগত মহা-সমরের সময়ই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

ঔষধ শিল্পের মূলভিত্তি ঔষধের গাছ-গাছড়া। গাছগাছড়া যত সহজে ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় পাওয়া যাইবে, প্রস্তুতীকৃত ঔষধ তত সুলভ ও ফলদায়ক হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাজারে কতিপয় ঔষধের গাছ-গাছড়ার বেশ চলন আছে। অবশ্য যেগুলি রপ্তানী হয়, সে গুলিরই চলন অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যে দোষে ভারতের অধিকাংশ মাল বিদেশের বাজারে অনাদৃত অথবা স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হয়, সেই দোষ, অর্থাৎ ভেজাল, ঔষধের গাছ-গাছড়ায়ও প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান। কতকটা কুলগত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবং কতকটা আপাততঃ সামান্য লাভের লোভে মুগ্ধ হইয়া বণিকরা এই কার্য্য করিতে ছাড়ে না। কিন্তু ইহাতে গাছ-গাছড়ার ব্যবসায়ের যে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশে ও বিদেশে, উভয় স্থানেই, ভারতীয় ঔষধের গাছ গাছড়ার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি জিনিস পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ সংগ্রহের কার্য্য আপাততঃ নিরক্ষর অর্দ্ধসভ্য বন্য লোকের অথবা সহরাঞ্চলে 'বেদেগণে'র হাতে ন্যস্ত আছে। যতদিন না শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, ততদিন ঔষধের গাছগাছড়ার বর্ত্তমান দুরবস্থা ও দেশীয় ঔষধের দুর্নাম চলিতে থাকিবে।

মধ্য য়ুরোপের অনেক স্থলে ঔষধ-উদ্ভিদ্ সংগ্রহ ও চাষ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি আছে। ইহারা সরকারী সাহায্যও পাইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায়ও আজকাল কতকগুলি ঔষধক্ষেত্র (Drug Farm) হইয়াছে। Burroughs Wellcome, Potter Clarke প্রভৃতি বড় বড় ঔষধ প্রস্তুতকারকগণের নিজ নিজ

ঔষধক্ষেত্র আছে। আমাদের দেশে এই ব্যাপার নূতন। তবুও গত যুদ্ধের সময় হইতে সাহারাণপুরের নিকট কৈলাসপুর; নৈনিতালের নিকট চৌবাতিয়া ও রামপুর; ভাগলপুর, দার্জ্জিলিং, নীলগিরি, উতকামন্দ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ বিশেষ ঔষধের চাষ হইতেছে। কুইনাইনের জন্য সিঙ্কোণা চাষ মংপু ও নীলগিরিতে আবদ্ধ ছিল। এমন ব্রহ্মদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহার প্রসারের চেষ্টা হইতেছে। ভারতে এত বিভিন্ন প্রকারের জল, হাওয়া ও মৃত্তিকা আছে যে, বিদেশীয় যে কোন ঔষধ-উদ্ভিদ্ এখানে বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত স্থানে চাষ করিয়া সফল হইবার আশা করিতে পারা যায়। কিন্তু বেলেডোনা, ইপিকাকুয়ানা, ডিজিট্যালিস্ প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ-উদ্ভিদ্ চাষে বিলক্ষণ লাভ আছে, সেই সমুদায় সাধারণতঃ পার্ব্বত্য অথবা উচ্চপ্রদেশে ভাল জন্মাইয়া থাকে। ঔষধক্ষেত্র স্থাপন ও পরিচালনও বিশেষ ব্যয়সাধ্য। কিন্তু ঔষধ-উদ্ভিদ্ সংগ্রহের কার্য্য যে কেহ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন। বঙ্গদেশের তিন চারিটি পার্ব্বত্য জিলা ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট জিলায় নিম্নলিখিত ঔষধের গাছ গাছড়া সহজে পাওয়া যাইতে পারে :—

১।	ওলটকম্বল, মূল	১৫।	থুলকুড়ি, গাছ
২।	মুক্তাবর্ষা, গাছ	১৬।	নিম, ছাল ও বীজ
৩।	বাকস, পাতা	১৭।	আমলকী, ফল
৪।	বেল, শুঁট	১৮।	হরীতকী, ফল
৫।	ছাতিম, ছাল	১৯।	পিপুল, মূল
৬।	কালমেঘ, গাছ	২০।	বুচকী, বীজ
৭।	পুনর্ণবা, গাছ	২১।	অশোক, ছাল
৮।	সোঁদাল, ফলের শাঁস	২২।	কণ্টিকারী, গাছ
৯।	জামির, ফলত্বক	২৩।	কুঁচিলা, বীজ
১০।	কুঁচ, বীজ	২৪।	তেঁতুল, শাঁস
১১।	কালজাম, বীজ	২৫।	চালমুগরা, বীজ
১২।	ক্ষিরুই, গাছ	২৬।	অশ্বগন্ধা, গাছ
১৩।	অনন্তমূল মূল	২৭।	বাবলা, আঠা
১৪।	কুরচি, ছাল	৩৮।	জয়পাল, বীজ

এস্থলে প্রথমে বলা প্রয়োজন যে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দের সমস্ত গাছ এক জিলাতেই না পাওয়া গেলেও প্রত্যেকটি একাধিক জিলায় পাওয়া যায় এবং এগুলি বন্য অথবা অর্দ্ধবন্য উদ্ভিদ্। কলিকাতার বাজারে সকল সময়েই ইহাদের অল্পবিস্তর কাটতি আছে। ক্ষেত্র অথবা উদ্যানজাত ঔষধ উদ্ভিদের, যথা লঙ্কা, জোয়ান, গন্ধবেণা প্রভৃতি, এস্থলে উল্লেখ করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ফর্দ্দটিও কিছু সম্পূর্ণ নহে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ঔষধের নাম করা হইয়াছে মাত্র। মফঃস্বলের অনেক ব্যক্তিই অবসরমত এগুলি সংগ্রহ করিয়া লাভ করিতে পারেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কিংবা বিশেষ স্থল ব্যতীত সাধারণতঃ ঔষধ-উদ্ভিদ্ সংগ্রহের কায সকল দেশেই চাষীরা অন্য কাযের সঙ্গে করিয়া থাকে অথবা তাহাদের স্ত্রীলোক এবং বালকরা করে। যদি নগদ মজুর দ্বারা সমস্ত গাছগাছড়া সংগ্রহ হইত, তাহা হইলে উহারা মহার্ঘ হইয়া পড়িত এবং কাটতি কমই হইত। কাশ্মীর রাজ্যে এইরূপ ভ্রমবশতঃ অনেক অর্থব্যয় বিফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় আশাতীত লাভ করিয়া তাঁহারা অধিক মজুরী দিয়া গাছ সংগ্রহ করাইতেছিলেন। এখন দেখিতেছেন যে,'বেলেডোনা', পোডোফাইলাম প্রভৃতির আর সে দর নাই। পড়তার দরে বিক্রয় হওয়াও ভার হইয়া পড়িয়াছে।

ঔষধের গাছগাছড়া ব্যবসায়ে স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম—(১) ব্যবহার্য্য অংশ প্রকৃত উদ্ভিদ্ হইতে সংগ্রহ; (২) উদ্ভিদের পূর্ণ পরিণতির অবস্থায় ও বৎসরের উপযুক্ত সময়ে সংগ্রহ; (৩) সংগ্রহের পর যত শীঘ্র সম্ভব শুষ্ক করা; (৪) শুষ্কীকৃত গাছড়াকে এরূপ অবস্থায় রাখা যেন তাহা বায়ু অথবা মৃত্তিকার আর্দ্রতায় নষ্ট হইয়া না যায়; (৫) চালান দেওয়ার সময় এরূপ ভাবে বস্তা কিংবা বাক্স-বন্দী করা যে গাছড়া অযথাভাবে ভাঙ্গিয়া অথবা গুঁড়াইয়া না যায়। সংগ্রহকারিগণের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বড় ব্যবসায়ে কোন ঔষধের গাছড়া কাঁচা বিক্রয় হয় না। চালানের পূর্ব্বে গাছড়া সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। ইহাও জানা দরকার যে, টাটকা মাল শুকাইলে সাধারণতঃ ওজনের এক-চতুর্থাংশে দাঁড়ায়। থুলকুড়ি, ক্ষিরুই প্রভৃতি শুকাইয়া এক-অষ্টমাংশ অর্থাৎ ১ মণে ৫ সের হইতেও দেখা গিয়াছে। আমরা এস্থলে গাছড়ার দামের কোন উল্লেখ করি নাই। কারণ, বাজারদর সব সময় ঠিক থাকে না। সাধারণ ভাবে এই

...র বলিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দের কোন গাছ-...ই মণ আজকাল ৭৲ টাকার কম নহে। এতদ্ভিন্ন খাঁটি উপযুক্তরূপে প্রস্তুতীকৃত গাছড়ার জন্ম বিলাতী ব্যবসায়ি-... যথেষ্ট দর দিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের দরকার দুই ...র মণ নহে; দুই চারি শত মণ হইতে পারে।

প্রত্যেক ঔষধ-উদ্ভিদ্‌ শুকাইবার বিশেষ প্রকরণ আছে। ঠিক সেই ভাবে প্রস্তুত না হইলে উহার ঔষধ-ক্রিয়ার ইতর-বিশেষ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থান নাই। তবে যাঁহারা ঔষধের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাঁহারা মোটামুটি কয়েকটি জিনিষের উপর নজর রাখিবেন। যখন জলবৃষ্টির সম্ভাবনা নাই, সেই সময়েই গাছ তোলা ভাল। রৌদ্রেই অধিকাংশ গাছ শুকাইতে পারা যায়; কিন্তু মাটী হইতে কিছু উপরে জাল খাটাইয়া তাহার উপর শুকাইতে দিলে শীঘ্র শুষ্ক হয়। পূর্ণ শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বে রৌদ্র হইতে তুলিয়া আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে শুকাইলে গাছের রং ঠিক থাকে ও পাতা প্রভৃতি সহজে ঝরিয়া যায় না। সামান্ত সামান্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট ওজনের বাণ্ডিল বাঁধা দরকার। গাছড়া নাড়া-চাড়ার সময় যথাসম্ভব সতর্ক হওয়া উচিত, যেন কোন অংশ চূর্ণ হইয়া না যায়। অপরিষ্কৃত স্থান হইতে সংগৃহীত গাছ-গাছড়া শুকাইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ফুল, পাতা, বীজ প্রভৃতি কাগজমণ্ডিত বাক্সে অথবা টিনে রাখাই ভাল। বলা বাহুল্য যে, গাছ-গাছড়া দেখিতে যত টাটকার মত হইবে, ততই তাহার মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। *

কাঁচা মালের প্রাচুর্য্যের দিক হইতে দেখিলে ভারতীয় ঔষধ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হয়। গত যুদ্ধের সময় হইতে সাধারণের অনেকটা চোক ফুটিয়াছে। ভারতে বহুকাল হইতে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার ড্যাণ্ডেলিয়ান, পোডোফাইলাম, হায়োসায়েমাস্ প্রভৃতি জন্মিয়া আসিতেছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ই বিলাতী ঔষধ আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই সমস্ত দ্রব্য প্রথমে বহুলভাবে কাজে লাগান হয়। পূর্ব্বতন Indigenous Drugs Commiteer স্থানে এখনও একটি সরকারী Drugs Manufacture Commitee আছে বটে; কিন্তু ভারতে ভারতজাত ঔষধ-উদ্ভিদের সদ্ব্যবহারের আর সে উদ্যম নাই। Tannic, Tartaric ও Citric Acid, Caffeine, Strychnine, পেপেন, অহিফেণ বীর্য্যসমূহ ও অন্যান্য অনেক ঔষধ প্রস্তুতের কাঁচা মাল এই দেশ হইতেই যায়। এই সমুদায় ঔষধ দেশে প্রস্তুত হইলে শুধুই যে প্রভূত অর্থ দেশে থাকিয়া যাইবে, তাহা নহে; ঔষধ শিল্পের উন্নতির সহিত বড় বড় কলকারখানায় খাটিয়া ও পল্লীগ্রামেও বনে জঙ্গলে অনেক লোক ঔষধের গাছগাছড়া সংগ্রহ ও চাষ গৌণ পেশা করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিতে পারিবে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। আশার বিষয় কেবল এই মাত্র যে, দুই চারিটি বড় বড় কোম্পানী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সফলতায় অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যেও এই ক্ষেত্রে নামিতে পারেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

---

* ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকেরা ঔষধের গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে অধিক জানিতে চাহিলে নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারেন:—

Commercial Medicinal Plants of India—Proceedings, Indian Association for the Cultivation of Science, 1 14.

Future of Drug Industry of India—Indian Medical Record, October, 1919

Drug Resources of India—Report, Indian Industrial Conference—1919.

কাশী

"পুণ্যভূমি বারাণসী　　　বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত ;
আনন্দ কানন নাম　　　কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত।"

কাশী হিন্দুভারতের কেন্দ্রস্থান—হিন্দুধর্ম্মের হৃৎপিণ্ড—হিন্দুধর্ম্মেরই মত অজর অমর। কাশীর মত প্রাচীন নগর পৃথিবীতে আর বিদ্যমান নাই। যখন বাবিলন নিনেভের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল, যখন এথেন্স সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, যখন রোমের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উঠে নাই, যখন গ্রীসের সহিত পারস্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, তখনই কাশী প্রাচীন নগর—জ্ঞানের লীলাভূমি, বিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র, মুক্তিকামীর কাম্যকানন। কাশীর উৎপত্তির পর কত নগরের উত্থানপতন হইয়া গিয়াছে, কত সভ্যতার উদ্ভববিলয় হইয়াছে—কত দেশের উপর দিয়া কত বিজয়বাত্যা বহিয়া গিয়াছে; কাশী আজও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার কূলে হিন্দুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। এখনও ভারতের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে ভক্তদল মুক্তিধাম বারাণসীতে সমাগত হইয়া জীবন সার্থক বিবেচনা করেন—কাশীর আকাশ-বাতাস "কাশীজী কি জয়" রবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।

কাশীর প্রাচীন ইতিহাস অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সে কুহেলিকা ভেদ করিয়া মানুষের দৃষ্টি যাইতে পারে না। হয় ত উত্তর-ভারতে আর্য্যদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কাশীর প্রতিষ্ঠা। কোন্ রাজা, কোন্ পুরোহিত, কোন্ ভক্ত ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। জানিবার চেষ্টাও বুঝি প্রাচীন হিন্দুরা করেন নাই। তবে বৈদিকযুগেও যে কাশীর প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। বোধ হয়, আর্য্যদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই কাশীর প্রতিষ্ঠা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কাশীর যত উল্লেখ আছে, তত আর কোন নগরের নাই। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কাশীতে বিশ্বনাথদর্শনই হিন্দু পরম পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে। কাশীর পুণ্যক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে চিতায় ভস্মীভূত হওয়া হিন্দু নরনারী পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কাশীর ভূমি পবিত্র—কাশীর নিম্নে উত্তরবাহিনী জাহ্নবীর সলিল পবিত্র—কাশীর বাতাস পবিত্র। মহাভারতের বিরাট বক্ষে কাশীর স্থান আছে। যখন রেলপথের বা ষ্টীমারের কল্পনাও হয় নাই, তখনও আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে পুণ্যকামী হিন্দু নরনারী বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া শঙ্কাসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া কাশীতে আসিতেন এবং কাশীদর্শনের স্মৃতি তাঁহার পরিবারে সযত্নে রক্ষিত হইত।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যসিংহ জরাব্যাধিমৃত্যু দেখিয়া নির্ব্বাণলাভের আশায় রাজপ্রাসাদের বিলাস ও পত্নীর প্রেম পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি যখন জগতে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন সত্য প্রচারে—ধর্ম্মচক্র আবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তখন প্রথমেই তাঁহাকে কাশীতে যাইতে হইয়াছিল। কাশীতে যিনি স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতেন, তাঁহার মত গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাই মৃগদাবে তিনি প্রথমে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই মৃগদাবই বর্ত্তমান সারনাথ। তথায় সেই বৌদ্ধযুগের নিদর্শন আজ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া বিশ্বে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় গৌতম বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন কাশী প্রসিদ্ধ নগর এবং ধর্ম্মকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং এমন কথা মনে করিতেই হইবে যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে কাশী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছিল। পঞ্চবিংশ শতাব্দীরও পূর্ব্বে বারাণসীর গৌরবরবি সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার সমুজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিয়া মানবের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিল।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম হিমগিরি পার হইয়া স্থলপথে এবং বঙ্গোপসাগর দিয়া জলপথে সমগ্র প্রাচীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সকল দেশ হইতে পরিব্রাজকরা বুদ্ধের

জন্মভূমি ভারতবর্ষে আসিতেন। চীনদেশ হইতে যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কয় জন ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিউয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন, বারাণসীরাজ্যের পরিধি ৬ শত ৬৭ মাইল—পশ্চিমে গঙ্গাতীরে তাহার রাজধানী প্রায় ৩ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ১ মাইল প্রস্থ। বহু গ্রাম এক স্থানে অবস্থিত—জনপূর্ণ। বারাণসীতে বহুমূল্য দ্রব্যপূর্ণ বহু ধনিগৃহ বিদ্যমান। অধিবাসীরা শিষ্ট ও নম্রস্বভাব; তাহারা বিদ্বান্ লোককে বিশেষ ভক্তি করে। অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু। কাশীর জল-বায়ু অতিশয়ব্যবর্দ্ধিত—শস্য প্রচুর, ভূমি স্নিগ্ধশ্যাম—বৃক্ষে ফলভার। তথায় ৩০টি বৌদ্ধ বিহার ও ১ শত হিন্দু-মন্দির বিদ্যমান। সেই সব মন্দিরে ১০ হাজার হিন্দু মহেশ্বরের পূজা করে। তাহারা কেহ বা মস্তকের কেশ কর্ত্তন করে, কেহ বা শিখা ধারণ করে; কেহ বা উলঙ্গ, কেহ বা অঙ্গে বিভূতি লেপন করে। জন্মান্তর হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় তাহারা নানারূপ কৃচ্ছ্র-সাধন করে।

কিন্তু বারাণসীর পূর্ব্বসমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বারাণসীতে কত মন্দির নষ্ট করিয়া সেই সব উপকরণে মস্‌জেদ ও মিনার রচিত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার আর উপায় নাই। তবে সমগ্র বারাণসীতে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ২০টি মন্দিরও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। দক্ষিণ-ভারতের রামেশ্বর হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত বহু মন্দিরের মত বিরাট মন্দির বা বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর ভগ্ন মন্দিরের মত মন্দির বারাণসীতে নাই। আলাউদ্দীন গর্ব্বভরে বলিতেন, তিনি কাশীতে সহস্র মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই সব অনাচারের ক্ষত আজও বারাণসীর বক্ষে বিদ্যমান। ধ্বংসের পর ভক্তগণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন মন্দির রচিত করিয়া তাহাতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তবুও বারাণসীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

পথে সাধু-সন্ন্যাসীর ও গোঁসাইদিগের বাহুল্যে পথ চলা দুষ্কর। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক ঘাটের সোপান বাহিয়া নামিয়া পূজা করিতে যায়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বিদ্যার্থী ও দেবদর্শনার্থীরা বারাণসীতে সমাগত হইয়া থাকেন। সহস্র সহস্র লোক মরিবার জন্য কাশীতে আসিয়া থাকেন বারাণসীর ব্যবসাও বড় অল্প নহে। নদীতে পণ্যপূর্ণ বড় বড় নৌকা। বারাণসীর তন্তুবায়দিগের কীর্ত্তি জরীর কায করা রেশমী কাপড় য়ুরোপে সমাদৃত ছিল।

ভারতবর্ষে প্রায় ৭ শত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম সমাদৃত ছিল। তখনও বৌদ্ধরা বারাণসীতে প্রচারকেন্দ্র রাখিয়াছিলেন। সারণাথে যে সব গৃহের, স্তম্ভের, স্তূপের অবশেষ দেখা যায়, সে সব একদিনে বা এক শতাব্দীতেও নির্ম্মিত হয় নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে বারাণসীর বিশেষ উল্লেখ আছে। এই সারণাথে বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত প্রচারকরা বারাণসী হইতেই দেশে দেশ যাইয়া স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন—বৌদ্ধধর্ম্ম অর্দ্ধ জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

আবার এই কাশীতেই হিন্দুধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মত ভারতে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

বারাণসীতে ঘাটের বাহুল্য বিস্ময়কর। বলিতে গেলে বারাণসীর নিম্নে গঙ্গার সমগ্র কূলই ঘাট। বাগদাদেও টাইগ্রীসের কূলে পোস্তাবাধান। কিন্তু পৃথিবীর আর কোন স্থানে এমন ঘাট নাই—শ্মশান বাদ দিলে সর্ব্বত্রই সোপানশ্রেণী তীর হইতে জাহ্নবীর পূত সলিলে নামিয়া গিয়াছে। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান সমাপন করিয়া তীর্থদর্শক দেবদর্শন আরম্ভ করেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটকে ঘাটবহুল বারাণসীর মধ্যবর্ত্তী ঘাট বলা যাইতে পারে। দক্ষিণে অসিসঙ্গম হইতে উত্তরে বরুণা পর্য্যন্ত বারাণসীতে প্রায় ৫০টি ঘাট আছে। পরপার হইতে বা সেতুর উপর হইতে এই ঘাটগুলির দৃশ্য মনোরম। স্নানের পক্ষে দশাশ্বমেধ ঘাটই প্রশস্ত।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পরেই উত্তরে মানমন্দির ঘাট। এই মানমন্দির জয়পুরপ্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহের অপূর্ব কীর্ত্তি। মহারাজা জয়সিংহ জ্যোতিষ গণনার জন্য জয়পুরে, দিল্লীতে, উজ্জয়িনীতে, মথুরায় ও বারাণসীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীতে বর্ত্তমানে মানমন্দিরের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে; আর কয় স্থানে মন্দিরগুলি এখনও

বর্ত্তমান থাকিয়া জয়সিংহের বিজ্ঞানপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ইহার পর মণিকর্ণিকাই প্রধান ঘাট। মধ্যে নেপালী মন্দিরও ক্ষুদ্র ঘাট।

মণিকর্ণিকার পর সিন্ধিয়া ঘাট—বিশাল ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে ইন্দোর দরবার এক বিরাট ঘাট ও তদুপরি এক প্রাসাদ রচনা করাইতেছিলেন। ভিত্তি গুরুভার প্রস্তরের ভার সংনোপযোগী না হওয়ায় ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর গোয়ালিয়র ঘাট উল্লেখযোগ্য। ইহার কিছু পরে ভোঁসলা ঘাট ও পেশওয়ার নিদর্শন বাজীরাও ঘাট। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কীর্ত্তি এই সকল ঘাট পরস্পরের নিকটে অবস্থিত। কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। ইহার পর দ্রষ্টব্য—পঞ্চগঙ্গা ঘাট। তাহার উপর হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী আওরঙ্গজেবের মসজেদ।

দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে প্রধান ঘাট— শিবালয় ঘাট ও কেদার ঘাট। কেদারঘাট বাঙ্গালীটোলায় অবস্থিত এবং প্রধানতঃ বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত।

শিবালয় ঘাটের সহিত বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। ঘাটের উপর চেতসিংহের দুর্গপ্রাসাদ আজও বর্ত্তমান। এই স্থানে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চেতসিংহকে ধরিতে যাইয়া ইংরাজ সেনাদল নিহত হয়।

বারাণসীর সর্ব্বস্ব দেবালয়। বারাণসীতে দেবালয়ের সংখ্যা এত অধিক যে, যাঁহারা সমস্ত জীবন তথায় বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও সকল দেবালয়ের কথা বলিতে পারেন না। বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার মন্দির সর্ব্বপ্রধান। উভয় মন্দিরই সঙ্কীর্ণ গলিরাস্তায় অবস্থিত। বিশ্বেশ্বরের মন্দির বৃহৎ নহে—গলিরাস্তায় অবস্থিত বলিয়া রণজিৎ-সিংহের ব্যয়ে নির্ম্মিত স্বর্ণচূড়া নিকট হইতে দেখা যায় না। মন্দিরের বৈশিষ্ট্য—ইহা অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের মত এক-দ্বার নহে—তিন দিক হইতে মন্দিরগর্ভে প্রবেশ করা যায়। বর্ত্তমান মন্দিরও বহুদিনের নহে। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর—হিন্দুতীর্থের মধ্যস্থলে—আওরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ মসজেদ। মসজেদ মন্দিরের উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল—মসজেদের প্রাচীরে ক্ষোদিত প্রস্তরে এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মসজেদের—পার্শ্বেই জ্ঞানবাপী। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসকালে মন্দিরের পুরোহিতরা বিশ্বেশ্বরকে এই কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

"অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী" রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তিতে কাশীধামে বাঙ্গালীর নাম পরিচিত রহিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম—কাশীর সীমানির্দ্ধারণ ও কাশীপ্রদক্ষিণের পঞ্চক্রোশব্যাপী পথের সংস্কার; দ্বিতীয়—দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠা। পঞ্চ ক্রোশ কাশীর প্রাচীন সীমা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় মুসলমানদিগের সময়ে মন্দিরাদি ধ্বংস করাও তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই পুণ্যবতী বঙ্গনারী বহু অর্থব্যয়ে সেই পুরাতন সীমা পুনরায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কাশীবাসী ও কাশীতে তীর্থযাত্রী সকলেই তাঁহার সেই কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিয়া থাকেন। যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, ততদিন তাঁহার এই কীর্ত্তিও লোক ভুলিতে পারিবে না।

সার রিচার্ড টেম্পল যথার্থই বলিয়াছেন—কাশীর সৌন্দর্য্য গঙ্গাতীরে; জগতে আর কোন সহরের এরূপ নদীকূলসৌন্দর্য্য নাই।

বারাণসীর ঘাটের দৃশ্য আমরা 'মাসিক বসুমতীর' পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীভবতারিণীর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। অভিনব আশায় বুক বাঁধিয়া, নবীন উৎসাহ ও উদ্যমে বসুমতী আবার নিয়মিত পন্থায় পদার্পণ করিলেন। সংসারতরঙ্গভঙ্গে মানব নিয়ত দোদুল্যমান, কিন্তু এই দেবোদ্যান চিরশান্তির আবাসস্থান। হেথায় লোভের উল্লাস নাই, ক্ষোভের নিশ্বাস নাই; বিকারের প্রলাপ নাই, বেদনার বিলাপ নাই; হেথায় মিথ্যার বঞ্চনা নাই, দুরাশার লাঞ্ছনা নাই; আছে কেবল ভাগীরথীর পবিত্র কলতান, তরুপত্রের মধুর মর্ম্মরগান, বাতাসের স্নিগ্ধ হিল্লোল, আর শঙ্খ-ঘণ্টা সঙ্কীর্ত্তনের সুমঙ্গল রোল। কাম হেথায় দেবারাধনায় নিরত, কাঞ্চন দান-সেবায় মুক্তহস্ত। কিন্তু পরিবর্ত্তন কোথায় নাই? এই এক বৎসরে রামকুমার বয়সের অধিক বৃদ্ধ হইয়াছেন। মধ্যম সহোদর রামেশ্বর সংসারের উন্নতি সাধনে উদাসীন, গদাধরের উপেক্ষা। 'যা করেন রঘুবীর' বলিয়া রামেশ্বর নিশ্চিন্ত, গদাধর একান্ত অনাসক্ত। অসহায় রামকুমার একাই সংসার ভার বহন করেন। মাথার উপর চাল-চাল বজায় রাখা কঠিন সমস্যা। প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া দিনপাতমাত্র হয়। ব্রাহ্মণের অশক্ত দেহ, নিঃশব্দ শোকপরায়ণ মন অনুক্ষণ বিরাম চাহিতেছে। কিন্তু নিঃস্বজনের পক্ষে বিশ্রাম—উপবাস। এ দিকে ঘরে শিশুপুত্র ও বৃদ্ধা মাতা। রামকুমার যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবসরপ্রার্থী দেহ মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যে দিন একান্ত শয্যা-গ্রহণ করেন, সে দিন গদাধর কালীঘরে তাঁহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করে। এইরূপ প্রায়ই হইতে লাগিল। মথুর বুঝিলেন, শক্তিপূজার গুরুশ্রম হইতে বড় ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে অব্যাহতি দেওয়া অতীব প্রয়োজন। গদাধরকে স্থায়িভাবে জ্যেষ্ঠের স্থলাভিষিক্ত করিয়া বিষ্ণুপূজার ভার রামকুমারকে অর্পণ করা হইল। সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন না যাইতে যাইতে রামকুমারের মনে জন্মভূমি দর্শনের দুর্নিবার তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ছুটির আবেদন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা গ্রাহ্যও হইল। ভাগিনেয় হৃদয়কে বিষ্ণুপূজার ভার অর্পণ করিয়া রামকুমার কল্পনা করিলেন, কিছুদিন কামারপুকুরে বাস করিবেন। হায় রে মানব-কল্পনা! কাল তাঁহাকে মৃত্যুক্রোড়ে আহ্বান করিল। আবশ্যক কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া রামকুমার এই স্থানেই তাঁহার অবসন্ন শরীরকে বাঞ্ছিত বিশ্রাম দান করিলেন। কামারপুকুর চিরপ্রতীক্ষায় রহিল। জননীর আনন্দ, শিশুর উল্লাস, জন্মভূমির হর্ষ হাহাকারে পরিণত হইল।

পিতৃ-প্রতিম অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যু গদাধরকে নিরতিশয় ব্যথিত করিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর নিরন্তর বলিতে লাগিল, এই ত জীবন! নিবিড় অন্ধকারে জোনাকীর জীবন ক্ষণিকের বাতি, মৃত্যুছায়ার আলো – এই জ্বলে, এই নিবে! এই মত তার চিরসাথী। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের উপর জীব আশার বাসা বাঁধিয়াছে। কিন্তু একটি ফুৎকারে সব ধূলিসাৎ! পুত্রমুখ দেখিবার আশায় মাতা একাগ্র দৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া আছেন; পিতৃকোললালসায় পুত্র উদ্যতকরে দাঁড়াইয়া আছে; প্রিয়মিলনের প্রত্যাশায় প্রতিবাসী সব প্রতীক্ষায় রহিয়াছে; কিন্তু মৃত্যু কাহারও মুখ চাহিল না, একবার শেষ দেখাও দেখিতে দিল না! মমতার বন্ধন নির্ম্মম হইয়া কাটিয়া দিল। তবে সাধে কেন মমতার ফাঁস গলায় বাঁধিয়া মানুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে? এ কি প্রাণান্তক ভ্রান্তি? অশান্তির হেতু এ কি শ্রান্তিহীন উন্মত্ত প্রয়াস? ভাবে না এ প্রবাসে। হেথায় আসিয়া আপনার ঘর-বাড়ী সব ভুলিয়া গিয়াছে। রাজার বেটা জল্লাদের মোট বহিতেছে, আর ভাবিতেছে, কিসে সুখী হইবে। আশার আশ্বাসে শ্মশানবাসে সুখের বাসর পাতিয়াছে—একদিকে উলুধ্বনি, একদিকে হরিবোল! রাজপথে বরের সঙ্গে শব পাশাপাশি চলিয়াছে—তবু মন বুঝে না, সুখের কল্পনাজাল বোনা আর ফুরায় না। শেষে গুটিপোকার মত আপনার লালে আপনি বদ্ধ হয়। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। একবার যদি ভাবে, আমি রাজাধিরাজের ছেলে, তাহা হইলে বন্ধন ঘুচিয়া যায়। কিন্তু

চৈতন্ত আর হয় না। উট কাঁটাঘাস খাইতে ভালবাসে। যত খায়, দুইকস বহিয়া রক্ত ঝরে, তবু তাহাই চাহে। এ মহামায়ার খেলা। তিনিই মানুষের মনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

'প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মনেরে আঁখঠারি,
তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি!'

তিনি প্রসন্ন না হইলে জীবের অবিদ্যা-ঘোর ঘুচে না, বিবেকবাণী ফুটে না। তাঁহার কৃপা আগে লাভ করা চাই। কিন্তু তাহার উপায় কি? কঃ পন্থা?

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভের জন্য মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গদাধর ঐকান্তিক চেষ্টায় নিমগ্ন হইল। রামকুমার সহোদরকে জগন্মাতার বৈদীপূজা প্রণালীতে বিশেষভাবে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহা এখন অপূর্ব্ব আকার ধারন করিল। পূজা শেষ হইবার পর যতক্ষণ মন্দির দ্বার খোলা থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকদিগের গীত গাইয়া গদাধর মায়ের কাছে একাগ্র মনে আত্মনিবেদন করে। মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হইলে সে যে কোথায় আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সে সন্ধান হৃদয়ও কেহ পায় না।

বিষম বিপদে পড়িল, হৃদয়। ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে, ভাত শুকাইতেছে, এ আবার কি কর্ম্মভোগ? মামা যায় কোথা? সূর্য্যদেব মাথার উপর বসিয়া নিঃশব্দে আগুন ছড়াইতেছেন। উদরে ক্ষুধার আগুন। প্রতীক্ষায় হৃদয়ের মেজাজও আগুন হইয়া উঠিয়াছে। দারুণ অগ্নিপরীক্ষায় হৃদয় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কিন্তু নিরুপায়। গদাধর বাল্যকাল হইতেই একরোখা; যা ধরে, তাই করে। বলিলে শুনিবার পাত্র নয়। মাত্র একটু হাসে। অন্য সময়ে যে হাসি হৃদয়ের চোখে যতই সুধাবৃষ্টি করুক, তখনকার মত বুকে আগুন ধরাইয়া দেয়।

অচিরেই হৃদয় জানিতে পারিল, কেবল মধ্যাহ্নে নয়, গভীর রাত্রিতেও তাহার মাতুল, শয্যা হইতে, অদৃশ্য হইয়া যায়। ভাগিনেয় ইহাতে সত্যই শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল। একে ত উষার উদয় হইতে না হইতে শয্যা ত্যাগ করিতে হয়, মঙ্গলারতি আছে। তারপর প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহের পূজাপদ্ধতি, সে সব খুঁটিনাটির একট ত্রুটি হইবার যো নাই; তাহা যদি চুকিল ত গান! আর সেও ত গান নয়, আকুল ক্রন্দন! তার উপর আহার ত নাই বলিলেই হয়। আবার ঘুমও যদি যায়, বাঁচিবে কেমন করিয়া? আহা, দুঃখিনী দিদিমা'র অঞ্চলের নিধি! এই ত সে দিন বৃদ্ধার ভাঙ্গা বুকে শেলাঘাত করিয়া বড় মামা চলিয়া গিয়াছেন। সে চোখের জল এখনও শেষ হয় নাই, আর কখনও যে ফুরাইবে, তাহাও মনে হয় না। ইনিও ত দেখিতেছি খুব ঘটা করিয়া মহা যাত্রার আয়োজন করিতেছেন! না, ছোট মামাকে কিছুতেই সে পথে যাইতে দেওয়া হইবে না। হৃদয় এক রাত্রিতে গুটিগুটি মাতুলের অনুসরণ করিল। গদাধর বরাবর পঞ্চবটী অভিমুখে চলিয়াছে।

পঞ্চবটীর তখনকার অবস্থা, আজিকালি যাহা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও ভীষণতর ছিল। একে কবরভূমি, তাহাতে জঙ্গলাকীর্ণ। কোথাও আমলকী, কোথাও বেল, এমনই যে সকল গাছে ভূত ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি উপদেবতাগণ বৈঠক করিয়া থাকেন, তেমন সব বৃক্ষেরও অভাব ছিল না। ভূতের ভয়ে সে দিকে কেহ বড় একটা ঘেঁসে না। কিন্তু তাহার প্রিয় হইতে প্রিয়তর মাতুলকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে নির্ভীক হৃদয় কোন উপ বা অপদেবতার সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু গদাধর দেখিতে দেখিতে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। হৃদয় প্রেতকে ভয় করে না, কিন্তু মাতুলের বিরক্তিকে সে ডরায়। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিয়া আসিল। গদাধর যখন নিঃশব্দে শয্যায় ফিরিল, সে তখন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন। কিন্তু পরদিন প্রথম সুযোগ পাইতেই সে মাতুলকে প্রশ্ন করিল, 'রাত্তিরে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে কি কর, মামা?' কিন্তু যে উত্তর পাইল, তাহাতে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। 'ঐখানে একটা আমলকী গাছ আছে, তার তলায় ধ্যান করলে যে যা কামনা করে, সিদ্ধ হয়। তাই করি।'

হৃদয় স্থূলজগতে বাস করে। সংসারকে সে চিনে। তাহার উন্নতিকল্পে কি করিতে হয়, তাহা সে জানে। অতীন্দ্রিয়-লোকের সূক্ষ্ম ব্যাপার তাহার কাছে দুরূহ সমস্যার ন্যায় দুর্ব্বোধ। তাহার ধারণা, আগে শরীর, তার পর ধর্ম্ম। শরীররক্ষায় একান্ত অমনোযোগী মাতুলকে সে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিবার সঙ্কল্প করিল। মামা ধ্যানে বসেন, আর চারিদিক হইতে ঝুপঝাপ করিয়া ঢিল পড়ে। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফল হইল না।° মামাকে সে নিরস্ত করিতে পারিল না। কিন্তু সেও জিদী লোক, নিজেও নিরস্ত হইল

মা। এক রাত্রিতে গদাধর ধ্যানে বসিবার পর নিঃশব্দে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথমে সে সত্য সত্যই ভৌতিক আবেশ ভাবিয়া ভীত হইল। গদাধর উলঙ্গ, পৈতা ফেলিয়া দিয়া আবিষ্টের মত বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বসিয়া আছে। 'মামা, মামা গো' বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার গম্ভীর জোর আওয়াজ জঙ্গল কাঁপাইয়া পাখীকুলকে চকিত করিয়া তুলিল, কিন্তু মামার সাড়া নাই। কয়েকবার ডাকাডাকির পর গদাধর যখন গভীর সুপ্তোত্থিতের মত চক্ষু মেলিয়া চাহিল, হৃদয় অনুযোগ করিল, 'পৈতা-কাপড় ফেলে এ কি হচ্ছে?' গদাধর উত্তর দিল, 'তুই জানিস্ নি! পাশ মুক্ত হয়ে মায়ের ধ্যান কর্‌তে হয়। পৈতা একটা পাশ, জাতি অভিমানের চিহ্ন। লজ্জাও একটা পাশ, এমনি অষ্ট পাশ আছে, সব ত্যাগ করে মাকে ডাক্‌তে হয়। তাই কাপড় পৈতা ফেলে রেখেছি। ধ্যান করা শেষ হলে, পরব।'

হৃদয় বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন কথাও ত কখন শুনিনি! তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিল।

ক্রমে গদাধরের আচরণ অদ্ভুত হইতে আরও অদ্ভুত হইয়া উঠিল। পূজার আসনে বসিলাই গদাধর অসাড় আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। দুই তিন ঘণ্টা আর নড়ে চড়ে না। আরতি আরম্ভ করিল ত অবিরাম হাত চলিতেছে, বালকদিগের হাত ভারিয়া উঠিয়াছে, কালঘাম ছুটিতেছে, কিন্তু গদাধরের ক্লান্তি নাই। ভোগ নিবেদন করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, মা প্রতি উপচারের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন; ওদিকে প্রসাদ-লুব্ধ কর্ম্মচারিগণের রসনায় ও চক্ষুতে অবিশ্রান্ত জলস্রোত বহিতেছে। হায়, হায়, এই গণ্ড মুর্খটার জন্য ক্রিয়া কাণ্ড সব পণ্ড হইল!

হৃদয় দেখিল, মাতুল আহার-নিদ্রা-শরীর রক্ষার চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন, কি এক ভাবের ঘোরে সর্ব্বদাই যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন কি এক অলৌকিক ব্যাকুলতায় তাহার অন্তর নিরন্তর বিচঞ্চল। বক্ষঃস্থল আরক্ত, মুখমণ্ডল অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময়; কখন হাসে, কখন অশ্রুজলে বুক ভাসে! কখন স্থির; কখন অধীর; কখন ব্যগ্র, কখন উগ্র; সারা রাত্রি পঞ্চবটীর জঙ্গলে কাটে! কর্ম্মচারিগণের কেহ বলিল, ওটা ত ভূতের আড্ডা! এ নিশ্চয়ই প্রেতাবেশ। কেহ বলিল, না, এ পাগলের পূর্ব্ব লক্ষণ! পাছে এ সকল আন্দোলন মথুরমোহন এবং রাণীর কর্ণগোচর হইয়া মাতুলকে দক্ষিণেশ্বর হইতে বিতাড়িত হইতে হয়, হৃদয় সেই ভয়ে, সর্ব্বক্ষণ কণ্টকিত হইয়া থাকে। কামারপুকুরের সংসারটি ত ছোট নয়, অনেকগুলি পোষ্য, তার উপর দেব-সেবা, অতিথি সৎকার আছে। দিদিমা ত পথের উপর চোখ পাতিয়া বসিয়া থাকেন! শ্রান্ত, ক্লান্ত, শুষ্ক-মুখ পথিক দেখিলে তাহাকে সাধিয়া-পাড়িয়া গৃহে আনিয়া দুটি পরিষ্কার ভাত আর শুশুনি শাকের ঝোল না খাওয়াইয়া ছাড়েন না! অন্ন বিলাইতে বুড়ী যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! পাড়ার কেহ অভুক্ত থাকিলে তাহার মুখে অন্নের গ্রাস উঠে না! আহা, কি অদৃষ্ট! চির দিনই কি দুঃখের ধান্দায় কাটিয়া গেল! রাজার মত ঐশ্বর্য্য, জমীদার সর্ব্বস্বান্ত করিল, শেষে, ভিটে ছাড়া। তার পর আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে রণ। বড়মামার প্রাণপণ চেষ্টায় একটু যদি সময় ফিরিল ত বিধাতা বৃদ্ধ বয়সে সীঁথির সিঁদুর ঘুচাইয়া দিলেন! দিনরাত খাটিয়া খাটিয়া প্রাণপাত। বড় বৌটা মানুষ হইয়া শাশুড়ীকে যখন দুদণ্ড হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিল, যম অমনি তাকে দয়া করিলেন। বুড়ীর ঘাড়ে একটি বোঝা চাপাইয়া তিনি সরিলেন। আবার সংসারের সঙ্গে কচি ছেলে গলায়! কিন্তু চরম করিয়া গেলেন, বড় মামা। উঃ, সাতষট্টি বৎসর বয়সে পুত্রশোক! আবার যেমন তেমন ছেলে নয়, বার্দ্ধক্যের ভরসা! মেজমামা ত না সংসারী, না উদাসী। ভরসা এখন ছোটমামা, তাও ত বেশ ফর্সা হইয়া আসিতেছে! এঁর পূজারীর পদ যদি যায়, দিন চলিবে কেমন করিয়া? কর্ম্মচারিবর্গের চোখের আড়াল করিয়া হৃদয় যে মাতুলকে কোথায় লুকাইবে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া কেমন করিয়া প্রকৃতিস্থ করিবে, ঠিক পায় না। কখন কখন তাহার মনে হয়, আর পারি না! মন্দিরে এক বিগ্রহ সেবা, ঘরে আর এক বিগ্রহ। বিগ্রহ নয়, জীবন্ত নিগ্রহ। কিন্তু বিগ্রহ অপেক্ষা এই নিগ্রহ-সেবায় হৃদয়ের অধিকতর আকর্ষণ। বরং কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, তবু স্নেহের অণুমাত্র ত্রুটি সহে না। হৃদয় বহু যত্নে ভুলাইয়া মাতুলকে তেল মাখায়, নাওয়ায়, খাওয়ায়। কিন্তু তাহার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও গদাধরের ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
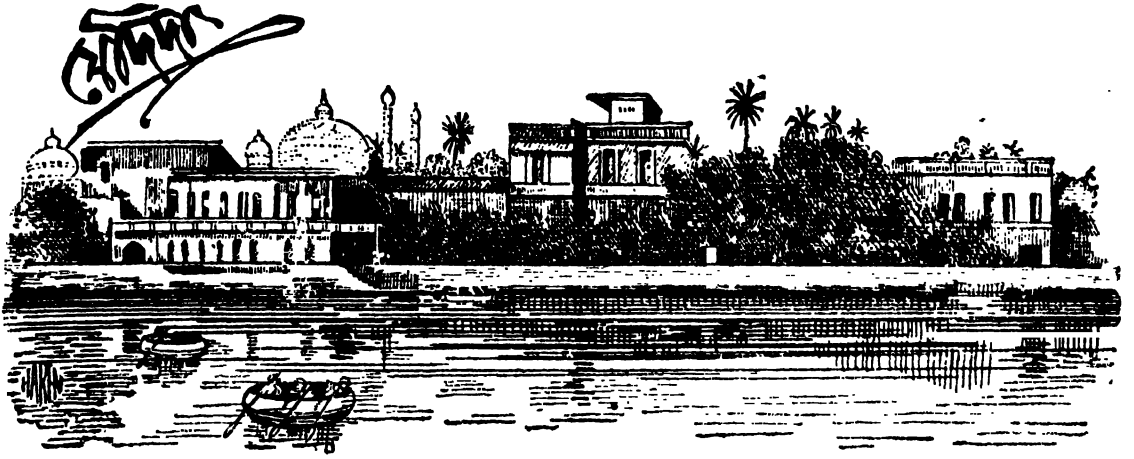
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আমীরের রাজধানীতে সাহিদ তাঁহার গৃহে একটি কক্ষে বসিয়াছিলেন। সাহিদের গৃহে তিনি একা বাস করেন। যে গৃহে নারীর স্পর্শ অনুভূত হয় না, সে গৃহ বাতায়নহীন নিরানন্দ গৃহেরই সহিত উপমেয়। তবে গৃহসজ্জা বহুমূল্য; আমীর সাহিদকে প্রাসাদের মধ্যেই একটি গৃহে বাস করিতে বলিয়াছিলেন; সাহিদ তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। রমণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বই যে তাহার কারণ, তাহা আমীর বুঝিতে পারিয়াছিলেন রতনে রতন চিনে। তাই তিনি প্রাসাদের প্রাকারবাহিরে একখানি উদ্যানবেষ্টিত গৃহ সাহিদকে বাসের জন্য দিয়াছিলেন—গৃহখানি সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। বহুমূল্য গালিচায় ঘরের মেঝে ও কক্ষপ্রাচীর আবৃত—গৃহে ভৃত্যের অভাব নাই। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি সাহিদের ধাতুতে ছিল না; কাযেই সে গৃহে বিশৃঙ্খলা রাজত্ব করিত।

দক্ষিণের বারান্দার দিকে একটা বড় ঘরে মেঝের উপর পুরু গালিচা দেওয়া গদিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সাহিদ কি ভাবিতেছিলেন। ভৃত্যরা প্রতিদিন যেমন সহরে তাঁহার জন্য রাত্রির সঙ্গিনী সন্ধান করিতে যায়, তেমনই গিয়াছে—তিনি হয় ত লুব্ধচিত্তে তাহাদেরই প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভৃত্যরা যে সকল দিন সত্যসত্যই সহর অবধি যাইত, তাহাও নহে—খানিকটা সময় কাটাইয়া আসিয়া বলিত—তাহারা ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়াছে।

ঘরে বাতিদানে দুইটি বাতি জলিতেছে—ছাত হইতে বিলম্বিত ঝাড়ে আলো জালা হয় নাই। এখনও মরুপ্রদেশের রাত্রির বাতাস বহিতে আরম্ভ করে নাই—দীপশিখা স্থির ও অচঞ্চল। কক্ষমধ্যে গুমট গরম—প্রভাতে ভৃত্যরা ঘরের ফুলদানীতে যে সব ফুল রাখিয়া গিয়াছিল, সেগুলির গন্ধ যেন কেমন উগ্র হইয়া ঘরে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

বোরকাপরা ফরিদা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সাহিদ সোজা হইয়া বসিলেন—তাঁহার মুখে তিনি যে হাসির সরসভাব আনিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে মুখখানা যেন আরও বিকৃত দেখাইল—যেন শ্মশানে আলেয়ার আলো ফুটিয়া উঠিল।

সাহিদ বলিলেন, "এই যে—এতক্ষণে আসিলে?—তবু ভাল।"

মুখের উপর হইতে বোরকা ফেলিয়া দিয়া কুটিল কটাক্ষে সাহিদের দিকে চাহিয়া ফরিদা বলিল, "আমাকে চিনিতে পারিতেছেন, না? আমি ফরিদা।"

সাহিদের মুখ বিরক্তিপূর্ণ হইয়া আরও বিকট দেখাইল। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এ সময় আমীরের কোন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, তাই তিনি তাঁহাকে ডাকিতে ফরিদাকে পাঠাইয়াছেন। কি এত জরুরী ও গোপনীয় কায, যে, এ সময় তাঁহার তলব পড়িল! চাকরী কি ঝকমারি! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমীর কোথায়?"

ফরিদা বলিল, "কেন, হারেমের হাওয়াখানায়!"

"তবে আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ কেন?"

"ডাকিতে ত আসি নাই!"

"তবে?"

"না ডাকিতে আসিয়াছি।"

"কেন?"

"ফরিদার যিনি আমীর, তাঁহারই আদেশে।"

সাহিদ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন না। যুবতী কি বলিতেছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?"

"আমার মন—যাহার উপর কোন আমীরের প্রভুত্ব নাই।"

"না ডাকিতে রাজকন্যা এ গরীবের কুটীরে!"

"আমি যদি রাজকন্যা, তবে আপনি কি এ প্রদেশের রাজারও রাজা নহেন?"

"তুমি কি বলিতেছ?"

ফরিদা বুঝিল, সে যে অবসর খুঁজিতেছিল, তাহা পাইবে। তাহার রূপযৌবনের যে ক্ষমতা, তাহাতে তাহার প্রত্যয় ছিল। সে বলিল, "সব বলিব; বলিতেই আসিয়াছি! কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটা কথা। ঘরটা বড় অন্ধকার—আমি আলো না হইলে থাকিতে পারি না। আর গোটাকতক বাতি জ্বালিয়া দিতে হইবে।"

সাহিদ এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া ঝাড়ের বাতিগুলা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য স্ফটিকের ঝাড়ে সব বাতিগুলা জ্বালিয়া দিল—কক্ষ আলোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই আলোকে ফরিদার উজ্জ্বলগৌর আনন ও সুরমা-আঁকা নয়নে বিলোল কটাক্ষ দেখিয়া সাহিদ ভাবিলেন—ফরিদা এত সুন্দরী!

ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দ্বারের পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ফরিদা পূর্ব্বেই মুখের উপর হইতে বোরকার আবরণ ফেলিয়া দিয়াছিল—এবার বোরকাটা ফেলিয়া দিল। বোরকার মধ্য হইতে যখন তাহার সুগঠিত অনাবৃত বাহু দেখা গেল, তখন সাহিদের মনে হইল, যেন কৃষ্ণবর্ণ মখমলে মোড়া খাপের ভিতর হইতে দামাস্কাসের তরবারি বাহির হইল।

ফরিদা আসিয়া গদীর উপর সাহিদের পার্শ্বে উপবেশন করিল। তাহার পর সে বলিল, "আমি আমীরের দুহিতা, এ কথাও যেমন সত্য, আপনি যে এ দেশের রাজার রাজা, সে কথাও তেমনই সত্য নহে কি?"

"সে কি কথা, সুন্দরি?"

"আপনি আমাকে ছলনা করিতে পারেন; আপনার মনকেও ছলিতে পারিবেন কি?"

"কেন?"

"আপনি সাহায্য না করিলে, আমীর কতক্ষণ সিংহাসনে থাকিতে পারেন? আপনি ষড়্‌যন্ত্র করিলে আমীরের প্রাধান্য কি মরুবাত্যায় আঙ্গুরলতার শুষ্ক পত্রের মত উড়িয়া যায় না?"

সাহিদ শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন—পাছে কেহ শুনিতে পায়! তিনি বলিলেন, "ফরিদা, তুমি কি বলিতেছ? সাবধান—এ কথা বলার বিপদ কি তুমি অনুমান করিতে পার না?"

ফরিদার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল—হীরকের উপর যেন আলোকপাত হইল। সে বলিল, "পারি। অনুমান করা কেন, অনুভবও করিয়াছি। কিন্তু তবুও এই কথা বলিব। এ দাসত্ব আর সহ্য হয় না। আপনার অবস্থাই বা কি?"

"কেন?"

"আপনিও ভৃত্য; আজ যদি আমীর ইচ্ছা করেন, আপনাকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইতে পারেন—আপনি কি তাহা জানেন না?"

সাহিদ এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "জানি।—কিন্তু—"

ফরিদা একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "কিন্তু কি?"

সাহিদ বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি?"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "যিনি আমীরকে সিংহাসনে রাখিতে পারেন, সিংহাসন হইতে নামাইতে পারেন, তাঁহাকে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিব, আমি—নিরক্ষর নারী?"

সাহিদ নিরুত্তর হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে একবার সতৃষ্ণ-নেত্রে ফরিদার যৌবন-পুষ্পিত লাবণ্যলীলায়িত মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন। এ কি বলে?

ফরিদা সাহিদের আরও কাছে সরিয়া আসিল—একেবারে কাছে; তাহার পর তাঁহার হাত আপনার কোমল হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "উপায় আপনার হাতে।"

সাহিদ কেমন বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হাতে?"

সাহিদের হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিয়া ফরিদা বলিল, "এই হাতে—এই হাতে।"

সাহিদ ভাবিতে লাগিলেন।

ফরিদা বলিল, "এই ত সুযোগ—এই যে যুদ্ধ বাধিতেছে।"

সাহিদ যেন চমকিয়া উঠিলেন, ফরিদা এ কথা জানিল কেমন করিয়া? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধ! কে বলিল?"

ফরিদা হাসিয়া যেন ঢলিয়া পড়িবার মত করিয়া সাহিদের অঙ্গে দেহভার একবারমাত্র দিয়া আবার স্থির হইয়া বসিল; বলিল, "আমি জানি।"

সাহিদ ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি আমীর এ কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ, যুদ্ধ হইবে; কিন্তু তাহাতে কি লাভ?"

"লাভের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যুদ্ধ কাহাতে কাহাতে?"

ততক্ষণে সাহিদের সতর্কতা পরাভূত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "প্রথমে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের।"

"তাহার পর?"

"তাহার পর তুর্কী ইংরাজের বিপক্ষে যাইবে। তখনই আমরা তাহাতে আসিয়া পড়িব।"

"কে জিতিবে?"

সাহিদ বিকট মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, "সে কথা কে বলিতে পারে?"

"বলিতে পারেন, আমীরের যিনি মন্ত্রী।"

"আমি তুর্কীর অবস্থা যাহা জানি, তাহাতে মনে হয়, জার্ম্মাণী সাহায্য করিতে না পারিলে তুর্কী জয়ী হইবে না। কিন্তু জার্ম্মাণীর যেরূপ আয়োজন, তাহাতে তুর্কী জয়ী হইবার সম্ভাবনা।"

"যে পক্ষই কেন জয়ী হউক না, আপনি ইচ্ছা করিলে এমন ভাবে খেলিতে পারেন যে, জয়ের সুফল আপনার হাতে আসিয়া পড়িবে।"

সাহিদ আবার ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ফরিদা জানিল কেমন করিয়া? আমীরের রাজ্যের অবস্থান-বৈশিষ্ট্যে ফরিদা যাহা বলিল, তাহা করা অসম্ভব নহে। এখন আমীর তুর্কীর পক্ষে সাহায্যদানে সম্মত হইয়াছেন। সেই ভাবই রাখা যায়। পারস্য উপসাগর হইতে ইংরাজের রণতরী যদি অগ্রসর হইতে না পারে, তবে স্থলপথে মরু-মধ্য দিয়া তাহাদের সেনাদল এতদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। যদি তাহাই হয়, তুর্কীকে সুলতান চলিবে, আমীর তুর্কীকেই সাহায্য করিয়াছেন। আর যদি ইংরাজের বাহিনী টেসিফন পর্যান্ত অগ্রসর হয়, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যায়। সে খেলা তিনি খেলিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি লাভ? তিনি ফরিদাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ফরিদা বলিল, "জয়ের ফল আপনি লাভ করিলে, বিজয়ীকে বুকাইয়া দিতে কতক্ষণ—আমীর বিরোধী ছিলেন।"

সাহিদের এক চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল—"এত বড় অন্যায়—"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "আমীরকে নিঃশঙ্ক করিবার জন্য কত লোককে বিষ দিলেন, কত জনকে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা নিহত করিবার ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন! সাধারণ লোকের উপর অন্যায় বুঝি ন্যায়; যত অন্যায় আমীরের বিষয়ে?"

সাহিদ কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলেন না; তাহাই বটে।

ফরিদা বুঝিল, এই তাহার অবসর। সে বলিল, "তাহা হইলে এই রাজ্য সাহিদের হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। ভাবিয়া দেখুন! আপনার বুদ্ধি কি দাসত্বেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে? যে ইংলণ্ডে দাসব্যবসায়ের অবসান হয়, তাহাতে কি আপনি আমীরের রাজ্যটেনের রাজমিস্ত্রীর কাণিক প্রস্তুত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন? ধিক্, আপনাকে!"

সাহিদ আবেগভরে ফরিদার একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি সয়তানী।"

ফরিদা আবার হাসিয়া সাহিদের গাত্রে ঢলিয়া পড়িল; বলিল, "সয়তানী নহিলে সয়তানের উপযুক্ত সঙ্গিনী হয় না। আপনার বুদ্ধি ও আমার রূপযৌবন—এতদুভয় অপেক্ষা অনেক অল্প সম্বল লইয়া লোক রাজ্যস্থাপন করিয়া গিয়াছে—রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে।"

সে কথা সত্য বলিয়াই সাহিদের মনে হইল। রাজ্য—আর এই সুন্দরী! ফরিদা তখন তাঁহার অঙ্গে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিলোল কটাক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে চাহনী কি মধুর!

সাহিদ বলিল, "যদি তাহাই হয়, তখন তোমাকে পাইব ত, ফরিদা?"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "তাহার আগেই কি পারেন নাই? আপনি রাজনীতি বুঝেন—কিন্তু নারীহৃদয় আপনার কাছে আজও অজ্ঞাত। নহিলে বুঝিতেন, কেন আজ পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আপনাকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি; আপনি অসম্মত হইলে আমার কি শাস্তি, তাহা জানিয়াও আসিয়াছি।"

সাহিদের নিকট নারীহৃদয় সত্য সত্যই অজ্ঞাত ছিল, আর সেই জন্যই তিনি ফরিদার এ সব কথা সত্য বলিয়া মনে করিলেন।

ফরিদা উঠিল; দাঁড়াইয়া বোরকাটা পরিবার পূর্ব্বে বলিল, "তবে আজ আসি।"

সাহিদ বলিলেন, "আর একটু থাকিবে না?"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "যখন আর কোথাও যাইতে হইবে না—তখন যেন দিবারাত্রি কাছে থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত না হই।"

ফরিদা চলিয়া গেল।

সাহিদ ভাবিতে লাগিলেন—কি আশা! তাঁহার হৃদয় তখন সয়তান জয় করিয়া বসিয়াছে। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, আজ সে নগরে কাহাকেও পায় নাই। সাহিদ ভাবিলেন, ভালই হইয়াছে। তিনি কেবল চিন্তার অবসরই সন্ধান করিতেছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শাসন-সংস্কার

পতাকা-বিভ্রাট

গত আগষ্ট মাসে আইন অমান্য তদন্ত সমিতির সদস্যরা যখন জব্বলপুরে গমন করেন, তখন জব্বলপুরবাসীরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন ও সেই উপলক্ষে মিউনিসিপ্যাল টাউন-হলে "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করেন। বিলাতে পার্লামেণ্টে যখন সে কথা আলোচিত হয়, তখন সহকারী ভারত-সচিব আর্ল উইণ্টারটন ভবিষ্যতে সেরূপ ব্যাপার ঘটিলে সরকার যে আর অবিচলিত থাকিবেন না, এমন আভাস দিয়াছিলেন। জব্বলপুরের সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহার সেই ইঙ্গিতানুসারে কায করিতে বিলম্ব করেন নাই।

গত ৮ই মার্চ্চ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটী স্থির করেন, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, মৌলানা মোয়াজ্জম আলী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত দেবীদাস গন্ধী ১১ই মার্চ্চ তথায় পৌছিলে তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইবে এবং সেই উপলক্ষে মিউনিসিপ্যাল টাউনহলে "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করা হইবে। তাঁহারা সেই দিন আরও স্থির করেন, মহাত্মা গন্ধীর কারাদণ্ডাদেশ দিনে তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল আফিস ও স্কুল বন্ধ রাখিবেন।

এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার কে, হামিল্টন পরদিন কমিটীর এক অতর্কিত অধিবেশন ব্যবস্থা করেন এবং স্বয়ং সভায় আসিয়া কমিশনারদিগকে তাঁহাদিগের নির্দ্ধারণের পুনর্বিবেচনা করিতে বলেন। তিনি বলেন, কমিশনাররা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে স্বীয় ক্ষমতায় তিনি সে নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত হইতে দিবেন না। তাঁহার অশিষ্ট বাক্যে ও আচরণেও কমিশনাররা নির্দ্ধারণের পুনর্বিবেচনা করিতে অস্বীকার করিলে তিনি মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৪৬ (১) ধারা অনুসারে সে নির্দ্ধারণের বিপরীত আদেশ প্রচার করেন। আদেশপত্র তিনি লিখিয়াই আনিয়াছিলেন।

ডেপুটী কমিশনারের এই ব্যবহারে মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা ও করদাতারা বিরক্ত হইয়া স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া জাতির সম্মান রক্ষার্থ স্থির করেন, তাঁহারা অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং সেই জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটীর নিকট হইতে টাউনহল ব্যবহার করিবার অনুমতি গ্রহণ করেন।

১১ই তারিখে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি যখন জব্বলপুরে উপস্থিত হয়েন, তখন মিউনিসিপ্যাল কমিটীর বিনানুমতিতেই পুলিস টাউনহল পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে টাউনহলে সভা হইবার কথা। সেই দিন পুলিস-আইনের ৩০ ধারা অনুসারে এক নোটীশ জারী করা হয় — টাউনহলের সম্মুখে রাস্তায় শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ; আর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে নোটীশ জারী হয় — টাউনহলে সভা হইতে পারিবে না, হলের উপর "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করাও চলিবে না। ডেপুটী কমিশনার জানান, তাঁহার সম্মতি ব্যতীত মিউনিসিপ্যাল কমিটীর সভাপতি কাহাকেও হল ব্যবহার করিতে দিতে পারিবেন না।

মিউনিসিপ্যাল কমিটীর ক্ষমতায় এইরূপ অযথা হস্তক্ষেপে লোক চঞ্চল হইয়া উঠে এবং অনেকে স্ব স্ব গৃহের উপর "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করেন। আইন অমান্য করিবার আয়োজনও হইতে থাকে। কমিশনাররা সঙ্কল্প করেন, পদত্যাগ করিবেন।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ লোককে সত্যাগ্রহে উৎসাহিত করেন। গন্ধী সপ্তাহের জন্য আয়োজন চলিতে থাকে এবং সত্যাগ্রহীদিগের নামের তালিকা

প্রস্তুত করা হয়। ১৮ই তারিখে যেরূপ হরতাল হয়, সেরূপ হরতাল জব্বলপুরে পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

১৮ই তারিখেই "জাতীয় পতাকা" লইয়া এক শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়। পুলিস পুলিস-আইনের ৩০ ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের ও শ্রীযুক্ত নাথুরাম মোদীর উপর নোটিশ জারী করে, পুলিসের [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ছাড় ব্যতীত মিছিল [illegible] শোভাযাত্রা লওয়া চলিবে না। [illegible] করিলে সে ব্যবস্থা [illegible] হইবে। "জাতীয় পতাকা" লইয়া যাইতে [illegible] না। লোক এ আদেশ অমান্য করিতে [illegible] হইল। আদেশ অমান্য করিবার [illegible] জন হইল। শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল, শ্রীযুক্ত নাথুরাম মোদী, [illegible] শিবপ্রসাদ [illegible], শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী [illegible] "জাতীয় পতাকা" লইয়া শোভাযাত্রা করিতে অগ্রসর হইলে [illegible] আদেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] করিয়া লইয়া যাইলে তাঁহাদিগকে ১২ ঘণ্টা পুলিসের হাজতে রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদিগের প্রতি এই ব্যবহারের [illegible] আইন অমান্য করিয়া দণ্ড [illegible] হইতে চাহেন।

শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল।

২০শে মার্চ মিউনিসিপ্যাল কমিটির এক অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়—

(১) ডেপুটী কমিশনারের বে-আইনী ও অবৈধ আদেশের প্রতিবাদ করা হইতেছে;

(২) সাধারণের পক্ষে যথেচ্ছা টাউনহল ব্যবহারে বাধা দিয়া ডেপুটী কমিশনার লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করায় তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে।

(৩) এই ব্যবহারে মিউনিসিপ্যাল কমিটীর সম্ভ্রমহানি করা হইয়াছে।

(৭) এ অবস্থায় আত্মসম্মানজ্ঞানশীল সদস্যদিগের পক্ষে অবিলম্বে পদত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

২১ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ১৬ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ১৪ জন তখনই পদত্যাগ করেন পরে আরও কয় জন কমিশনার পদত্যাগ করিয়াছেন।

৯ই তারিখের সভায় ডেপুটী কমিশনার যে অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রতিবাদ কমিটী করিয়াছেন।

এই স্থানেই এ ব্যাপারে যবনিকাপাত হইল না। শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল কয়টি বক্তৃতার জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারামতে অভিযুক্ত হইলেন। আদালতে প্রমাণ হইল, তিনি যে বর্ত্তমান সরকারের উচ্ছেদ সাধনের কথা বলিয়াছিলেন, সে কেবল ত্যাগের দ্বারা। সরকার পক্ষের উকীল বলেন, ইহাতেও তিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিস্তার করিয়াছেন। সুন্দরলাল অসহযোগী বলিয়া মোকদ্দমায় আত্মপক্ষসমর্থন করেন নাই; কেবল একটি বর্ণনা দাখিল করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, কোনও দেশপ্রেমিক—দেশের সম্মানের ও স্বাধীনতার কোন ভক্ত বর্ত্তমান সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কোন ভাব পোষণ করিতে পারেন না—কাযেই সে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিস্তার করাই কর্ত্তব্য। যে আইন

[ন্যা]য় করিয়া এ সরকারের প্রতি প্রীতি উৎপাদন করিতে [চে]ষ্টা করে, যাহা ন্যায়সঙ্গত মতের, চিন্তার ও বাক্যের [ব]িরোধী, সে আইন নীতিসঙ্গত নহে। তিনি লাঞ্ছিত [হ]ওয়া সম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। দেশের ও [দ]েশবাসীর ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই।

বিচারক সুন্দরলালকে ৬ মাসের জন্য শান্তিরক্ষার জামিন দিতে আদেশ করিলে সুন্দরলাল তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন। তখন বিচারক তাঁহাকে ৬ মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দেন। সুন্দরলাল দেশবাসীকে ত্যাগে উৎসাহিত করিয়া সচ্ছন্দে কারাগারে গমন করেন।

এই যে "জাতীয় পতাকা", ইহা সত্য সত্যই এখনও জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা বলিয়া গৃহীত হয় নাই। যে হিসাবে "ইউনিয়ন জ্যাক" ইংরাজের বা "ষ্টারস এণ্ড ষ্ট্রাইপস" মার্কিণের জাতীয় পতাকা সে হিসাবে [ক]োন জাতীয় পতাকা ভারতবর্ষের নাই। কেন না, ভারতবর্ষ পরাধীন। কিন্তু জাতীয় পতাকায় ইংরাজের এই বিদ্বেষ কেন? স্বদেশীর যুগে কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত "ফেডারেশন হলের" মাঠে সুরেন্দ্রনাথ যখন "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহার সহকারী ছিলেন, তখন এ বিদ্বেষ দেখা দেয় নাই। কেন না, তখন ইংরাজের বিশ্বাস ছিল, জাতির একতা সাধিত হয় নাই। মিসেস বেসাণ্ট যখন তাঁহার "হোমরুল পতাকা" উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখনও ইংরাজকে বিশেষ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু আজ? আজ সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া, দেশবাসী মুক্তি লাভে বদ্ধপরিকর হইয়াছে বলিয়া, আজ "জাতীয় পতাকায়" ইংরাজের এত বিদ্বেষ। জব্বলপুরের মত অন্যান্য স্থানেও "জাতীয় পতাকা" লইয়া ব্যুরোক্রেশীর সঙ্গে জনগণের বিরোধ বাধিয়া উঠিতেছে।

হয় ত এই বিরোধের ফলেই ভারতবাসী এই পতাকা "জাতীয় পতাকা" বলিয়া গ্রহণ করিবে—ব্যুরোক্রেশীর হাতে নেতৃগণের লাঞ্ছনায় সে পতাকার অভিষেক সম্পন্ন হইবে এবং ভারতবাসী মুক্তির পথে জয়যাত্রার সেই পতাকা লইয়া অগ্রসর হইবে।

—

নুনে খুন

লবণের শুল্ক ও দ্বিগুণ হইবার পরই যেন লবণ যাহাতে আর কেহ প্রস্তুত না করে, সে জন্য কর্ম্মচারীদের ঔৎসুক্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। সংপ্রতি বাখরগঞ্জ ভোলা মহকুমার মৃজাকালু বন্দরে এই উপলক্ষ্যে গুলী চলিয়াছিল এবং তাহাতে লোক নিহতও হইয়াছে।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি তথায় যাইয়া তদন্ত করিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রথমেই জনকতক সশস্ত্র পুলিস লইয়া মৃজাকালুতে গিয়াছিল। তাহারা কতকগুলি গামে যাইয়া কতিপয় গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহাদের কাছে লবণ প্রস্তুত করিবার সরঞ্জামও পাওয়া যায়। তাহাদিগকে জামিনে খালাস দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে কর্ম্মচারীরা মৃজাকালু বাজারে গমন করে। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল---

হাটের লোকজন ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া আবগারীর লোকের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু কোনও রূপে তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। জিনিসপত্র গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোকজনকে সরিয়া যাইতে বলা হয়। আবগারী পেয়াদারা লোক সরাইবার জন্য যথেচ্ছভাবে ছড়ি চালায়। সশস্ত্র পুলিসের লোকরা বন্দুকের কুঁদা দিয়া লোকজনকে ভীষণভাবে ঠেলিতে থাকে। এই সময় একটি বালক ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া যায়। বালকটি পাছে চাপা পড়ে, এই আশঙ্কায় তাহার পিতা তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। সে তাহাকে উঠাইবার জন্য হেঁট হয়। কোন পুলিস বা আবগারী পেয়াদা তাহার পিঠে প্রহার করে। তখন হাটের লোকজন দৌড়াইয়া যায়। ওদিকে পেয়াদারা ও পুলিস লোকজনকে প্রহার করিতে থাকে। এই সময় জনতার এক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী কাঠের গাদা হইতে একখানা চেলাকাঠ তুলিয়া লয় এবং এক জন পুলিসের মাথায় প্রহার করে। এই সময় আরও জনকতক লোক পুলিস ও আবগারীর লোককে চেলাকাঠ দিয়া প্রহার করে। তাহারা অপর পক্ষের প্রহার আটকাইবার জন্যই নাকি ঐরূপ করিয়াছিল। পুলিস তখন আহত লোকটিকে নিকটবর্ত্তী গাঁজার

দোকানে লইয়া যায় ও ঘরে খিল দেয়। হাটের লোকরা দোকানঘর খুলিবার চেষ্টা না করিলেও জানালা দিয়া গুলী চালান হয়। এক জন লোক গুলী খাইয়া পড়িয়া যাইলে হাটের লোক পলাইতে থাকে। তখন দুই জন পুলিস গাঁজার দোকান হইতে বাহির হইয়া লোকজনের উপর গুলী চালাইতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় দিকেই যথেচ্ছ গুলী করা হয়। দুই জন নিহত হইয়া পড়িয়া যায়। অন্যান্যরা আহত হইয়া পলায়ন করে।

এমন কি, লোক ঘরে প্রবেশ করিলেও পুলিস ঘরের মধ্যে গুলী চালাইয়াছিল। নিহতদিগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) মন্তাজ উদ্দীন—বয়স ৫০ বৎসর। ৯টা ছররা মস্তিষ্কের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দুইখানা হাড় (ব্রহ্মরন্ধ্রের ও কর্ণপ্রান্তের) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

করোটীর নিম্নে খানিকটা রক্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ চক্ষুটি একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। যে কয় টুকরা গুলী বাহির হইয়াছে, তাহা পুলিসকে দেওয়া হইয়াছে।

(২) জুবন আলি—বয়স ৪৫। বক্ষমধ্যে ৬টা ছররা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১টি দক্ষিণ ফুসফুসে ছিল। অপর ৫টি ফুসফুসের আবরণ-ত্বকে। এই দক্ষিণ ফুসফুসের উপর দিকে ৯টা এবং বাম ফুসফুসের ঐ রকম স্থানে ৪টা ছিদ্র। হৃদযন্ত্রেও ৩টা ছিদ্র হইয়াছে। সবগুলি গুলীর আঘাতে। একখানা পাঁজরা ও বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বক্ষঃস্থল ঘন কাল রক্তে পূর্ণ।

(৩) কোরবান আলি—বয়স ৬০ বৎসর। ২টা ছররা পঞ্জরমধ্যে, ১টা দক্ষিণ ফুসফুসে ও অপরটি বাম মূত্রাশয়ে; মোট ৪টি পাওয়া গিয়াছে। ডানদিকের সপ্তম পঞ্জরখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাম হৃদযন্ত্র ২ বায়গায়, যকৃৎ ২ যায়গায় ও পাকস্থলী ৩ যায়গায় ছিদ্র হইয়াছিল। বক্ষঃস্থল ও তলপেট গাঢ় রক্তে পূর্ণ।

এইরূপ ভাবে গুলী চালাইবার কারণ কি? দেখা গিয়াছে, বহুকাল হইতেই সে অঞ্চলে লোক আপনাদের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে এবং বুড়ী বুড়ী লবণ বাজারে বিক্রয়ও করিয়া থাকে। এ সব ব্যাপার পুলিসের ও আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারীদের অজ্ঞাত ছিল না। এবারও লোক লবণ ধরায় আপত্তি করে নাই—বাধা দেয় নাই। আপনাদের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিবার যে অধিকার আইনতঃ লোককে দেওয়া হইয়াছিল, সরকার কি তাহার প্রত্যাহার করিয়াছেন?—করিয়া থাকিলে তাহা কি ভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে, অর্থাৎ যেভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে, তাহাতে দেশের জনসাধারণের তাহা জানিবার সম্ভাবনা আছে কি না?

বেভারিজ তাঁহার বাখরগঞ্জের বিবরণে লিখিয়াছিলেন, বাখরগঞ্জে যথেষ্ট লবণ উৎপন্ন হইতে পারে; কেবল সরকারী আইনের কড়াকড়িতে ও জ্বালানী উপকরণের অভাবে লবণ প্রস্তুত হয় না। এই জিলায় লবণ জল হইতেও উৎপন্ন করা যায়, আবার ভূমি হইতেও পাওয়া যায়। দক্ষিণ সাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে নূতন চরে জমীতে লবণ এত অধিক যে, জমীর উপরিভাগ সাদা দেখায়। এ সব স্থানে না কি অবৈধভাবে লবণ প্রস্তুত হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন, যাহারা এককালে এক দিকে পর্ত্তুগীজ ও আরাকানী মগদিগের আক্রমণ এবং অন্যদিকে বনের ব্যাঘ্র ও নদীর কুম্ভীরের আক্রমণে ভয় না পাইয়া বাখরগঞ্জে বাস করিয়াছিল, সেই সকল সাহসী বাঙ্গালী প্রকৃতিপ্রদত্ত এই সম্পদ অবহেলায় ত্যাগ করে নাই। মুসলমান শাসনকালে এই স্থানে লবণের ব্যবসা চলিত এবং সুদূর কাশ্মীর হইতেও ব্যবসায়ীরা ঝালকাটী ও দক্ষিণ সাবাজপুরে আসিয়া লবণের সওদা করিত। সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাঙ্গালার মসনদে মীর জাফরের অধিষ্ঠানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশ্মীরের সহিত বাখরগঞ্জের বাণিজ্য চলিয়াছিল। তখন বৃটিশ বণিকরা লোলুপদৃষ্টিতে দেশের সর্ব্বত্র অর্থাগমের পথ লক্ষ্য করিয়া সেগুলি হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন এবং মীর কাশিমের সর্ব্বনাশের পর বাখরগঞ্জের লবণের ব্যবসায় ইংরাজ বণিকদিগের হস্তগত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বন্ধু বারওয়েল ৩৮ বৎসর বয়সে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়া এ দেশ হইতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে প্রভূত সম্পত্তি ও পার্লামেণ্টে সদস্যপদ ক্রয় করিয়াছিলেন। ভোলার লবণে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকার প্রধান কর্ম্মচারী বারওয়েল লবণগোলা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল।

বারওয়েল সেলিমাবাদের (ঢাকার) ও ভোলার লবণ-গোলা ইজারা লইয়া মাইকেল ও কোয়ারকি নামক ২ জন আর্ম্মাণীকে তাহা দর-ইজারা দিয়াছিলেন। সর্ত্ত ছিল—আর্ম্মাণীরা তাঁহাকে খাঁটি মুনাফা হিসাবে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিবে। তিনি বসন্ত রায় ও কৃষ্ণদেব সিংহের বেনামীতে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খাজা কোয়ারকি অভিযোগ উপস্থাপিত করেন যে, পরম সাধু বারওয়েল টাকাটা লইয়া তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া আর এক জনের নিকট লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহাকে দর-ইজারা দেন! অবশ্য তৎকালে অনেক ইংরাজ বণিক ও কর্ম্মচারী এমন কুকার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের ব্যবহারের বিষময় ফলের কথা ওয়ারেন হেষ্টিংস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিলাতে বোর্ডে যখন এই কথা উঠে, তখন বারওয়েল জবাব দেন—যদি অর্থার্জ্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আমি কোন অন্যায় করিয়া থাকি, তবে এইমাত্র বলিব—সে কায হইয়া গিয়াছে, আর ফিরান যায় না! (I cannot recall it) বোর্ড তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করিবার আদেশ দেন; কিন্তু সে আদেশ পালিত হয় নাই।

কোম্পানীর লোকরা লবণ প্রস্তুতকারকদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেও বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছিলেন, লবণ বিভাগের কর্ম্মচারীরা লোকের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে।

বেভারিজ বলেন, এই স্থানে চরের এক মুঠা মাটীতে যে লবণ পাওয়া যায়, তাহাতে একবার ভাতের লবণ হয়। এই স্থানের নারিকেলের শাখা, কলাগাছের বাসনা ও বাঁশ হইতেও লবণ পাওয়া যায়। যে স্থানে লবণ এত সুলভ, সে স্থানের লোককেও লবণের মত অবশ্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য বিদেশের আমদানী মাল পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বেভারিজ ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হতভাগ্য পরপদানত দেশে এমন ব্যাপার ঘটায় বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই।

যে দেশে লবণ এত সুলভ, সে দেশে লোক, আহারের জন্য—আপনাদের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিলে তাহা আইনে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, সে দেশে বিদেশী সরকার লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করেন না, আর সে দেশে লোক লবণ প্রস্তুত করিবার পুরাতন অধিকার (ancient right) পরিচালনা করিলে বিদেশী সরকারের সশস্ত্র পুলিসের গুলীতে প্রাণ হারায়!

—

মন্ত্রীর পদত্যাগ

বিহারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয়ের পদত্যাগের পর যুক্তপ্রদেশের ২ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মাদ্রাজ হইতে সংবাদপত্রসেবাব্যপদেশে এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন এবং তথায় 'লীডারের' সম্পাদক ছিলেন। পণ্ডিত জগৎনারায়ণ হাণ্টার কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। শাসনসংস্কারের সারম্ভে প্রত্যয় প্রযুক্ত উভয়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া সহযোগীর চরম অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন হইতেই তাঁহারা বুঝিতেছিলেন, তাঁহারা পদোচিত সম্মান পাইতেছেন না। গত ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন—যুক্তপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় একবার শাসন পরিষদের অনৈক সদস্য এক জন মন্ত্রীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; আর একবার মন্ত্রীর সেক্রেটারী তাঁহার অনুমতি না লইয়াই ব্যবস্থাপক সভায় একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; আবার জিলা বোর্ড বিষয়ক আইন সম্বন্ধে শাসন পরিষদের এক জন সদস্য ও এক জন সেক্রেটারী মন্ত্রীর প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহের চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

সংপ্রতি যে ব্যাপার ঘটে, তাহা এই—সার রুড ডিলাফস সরকারী চাকরীয়া, এখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন এবং জনরব শুনা যায়, তিনি বিক্রেতার নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়াছেন। সেইজন্য তিনি পণ্ডিত ইকবল নারায়ণ গার্টু ও নানকচাঁদ শর্ম্মার বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ রুজু করিতে গভর্ণরের অনুমতি চাহেন; গভর্ণরও সে অনুমতি দেন।

তখন শিক্ষা-সচিব চিন্তামণি, গভর্ণরকে বলেন, নিয়ম অনুসারে সার রুড মন্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত নালিশ করিতে পারেন না। গভর্ণর সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ

করেন এবং বলেন, যদি এ ব্যাপারে সার রুড নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ত্রুটি অতি সামান্য। যাহা হউক, তিনি সার রুডকে সে কথা জানান। কিন্তু সরকারের চীফ সেক্রেটারী সার রুডকে অভয় দেন,—মন্ত্রীর অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই।

চিন্তামণি বলেন, অন্ততঃ মামলা মুলতবী রাখিয়া মিটমাটের চেষ্টা করা হউক। পণ্ডিত জগৎনারায়ণও বলেন, সরকারের অনুমতি না লইয়া সরকারী কর্ম্মচারী এমন ভাবে নালিশ করিতে পারেন না এবং সরকার বলিতে বুঝায়—গভর্ণর, শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীরা।

এই ব্যাপারে গভর্ণর শেষে বলেন -(১) এ ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম ঠিক খাটে না, (২) এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের কোন সম্বন্ধ নাই, (৩) মানরক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মচারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য, (৪) ভাইস-চান্সেলারের কয় জন সাক্ষী বিলাতে যাইতেছিলেন; কাজেই মামলা রুজু করিতে অল্প বিলম্ব করা সম্ভব হয় নাই।

অর্থাৎ গভর্ণর সার রুডকেই সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি যে মন্ত্রীর মতের অপেক্ষা না রাখিয়াই সার রুডকে নালিশ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, চিন্তামণির শেষ পত্রে দেখা যায়—গভর্ণরের পত্রে এমন ভাবও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, চিন্তামণি মন্ত্রী হইলেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে গভর্ণরের সন্দেহ ছিল।

অবশ্য যে স্থলে মন্ত্রীর সাধুতায় এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, সে স্থলে মন্ত্রীর পক্ষে আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পদত্যাগ ব্যতীত গত্যন্তর থাকিতে পারে না। তাই চিন্তামণি পদত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জগৎনারায়ণও এই কথা বলিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন যে, তিনি যখন চাকরী লইয়াছিলেন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন—মন্ত্রীরা গভর্ণর ও শাসনপরিষদের সদস্যদিগের সহিত সমভাবে শাসনের দায়িত্ব বহন করেন। এখন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে।

মন্ত্রীরা আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহাদিগের যে মান থাকিতে পারে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার বোধ হয় সে ধারণাই নাই; তাই 'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন, চিন্তামণি কি অপমানটা হজম করিতে পারিতেন না?—He should have put the slight in his pocket.

যাঁহারা এ দেশের লোকের সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, তাঁহাদের সহিত সহযোগ কিরূপ সম্ভব হয়, মডারেটরা বুঝাইয়া দিবেন কি?

অর্থ-সচিবের সফর

লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিবার ব্যবস্থা শেষ করিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব সার বেসিল ব্লাকেট সফরে বাহির হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি রাজা হৃষিকেশ লাহা বলিয়াছিলেন,—

(১) এখনও লবণ-শুল্ক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই শুল্ক এখন অর্থনীতির ক্ষেত্র হইতে রাজনীতির বাত্যাসঙ্কুল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে, আর অসন্তোষের ও চাঞ্চল্যের আবহাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় না।

(২) গত ৫ বৎসরে সরকার যে ১ শত কোটি টাকা ঋণ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের কোন লাভ নাই। আর টাকার অভাবে প্রদেশসমূহে জনহিতকর কার্য্য করা সম্ভব হইতেছে না। কাজেই প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে ভারত সরকারের বার্ষিক আদায় করা বন্ধ করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার অবস্থা অতীব শোচনীয়। বাঙ্গালায় নূতন কর সংস্থাপিত করিয়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন সম্ভব হইতেছে না। পর পর ৮ বৎসর দেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হইয়াছে, অথচ থানায় থানায় ডিসপেন্সারী স্থাপন করাও গেল না! বাঙ্গালায় বার্ষিক বাতিল করা আশু প্রয়োজন।

(৩) সামরিক ব্যয় হ্রাস না করিলে আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব হইবে না।

(৪) এখনও শিল্প-কমিশনের নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ভারতে সরকারী সাহায্য দিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা না করিলে দেশ স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না।
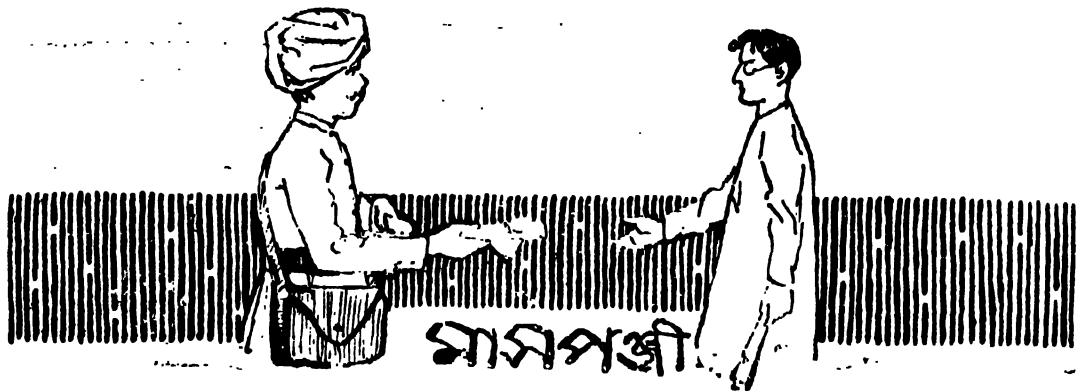
১৬ই চৈত্র—

পাটনার সার্চ লাইটের বিরুদ্ধে সারণের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুইস ও পুলিস সুপাঃ মিঃ পারকিন যে মামলা আনিয়াছিলেন, ক্ষমা-প্রার্থনা করায় তাহার প্রত্যাহার। যশোহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি-ক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক খদ্দর প্রদর্শনীর উদ্বোধন। বোম্বায়ের ব্যয়-হ্রাস কমিটির রিপোর্ট, কমিটী শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্য ও মন্ত্রীদের মাহিনা কমাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। লসেনের সন্ধি-সভায় তুরস্কের পুনরায় নিমন্ত্রণ।

১৭ই চৈত্র—

যশোহরে পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। অম্বালার উকীল শ্রীযুত লালা দুনীচাঁদ, লাহোরের শ্রীযুত লালা বিষেণনাথ প্রভৃতির অব্যাহতি; ইঁহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় ব্যবহারাজীবের অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন না, তাহারই মামলা চলিতেছিল। লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুত ভুরগ্রীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মোসলেম লীগের অধিবেশন। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত। ঢাকায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সভার অধিবেশন।

১৮ই চৈত্র—

মোসলেম লীগে সদস্যদের মতভেদ; বহু সদস্যের সভাস্থল ত্যাগে অধিবেশন স্থগিত। ব্রহ্মে ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে প্রায় চারি লক্ষ টাকা ক্ষতি।

১৯শে চৈত্র—

কলিকাতায় কাশিমবাজারের মহারাজের বাটীতে বাঙ্গালার জমীদার-দের সভায় প্রজা-স্বত্ব আইনের নূতন সংস্কারের প্রতিবাদ। নোয়াখালীতে বালিকা বধূ নিগ্রহের অভিযোগ, বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত, বালিকার স্বামীর জামীন প্রার্থনা অগ্রাহ্য। দিল্লীতে লোক কিছু নূতন কর স্থাপনের সম্ভাবনায় ভারতীয়দের আশঙ্কা। বিলাতে যোওার কয়লার খনির ৮০ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।

২০শে চৈত্র—

ব্রহ্ম, জায়নগিয়ানে বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা সভার প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বয়কট আইন অনুসারে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কলিকাতার ১০৭ ধারার মামলার সহযোগী আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করায় অব্যাহতি পাইলেন, অসহযোগীরা তাহা না করায় দণ্ডিত রহিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গোপন কথা প্রকাশ, গবর্ণর লর্ড লিটন তাঁহাকে সর্ত্ত-বিশেষে ভাইস-চ্যান্সেলার রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্লেগ আবির্ভাবের সংবাদ। নূতন মিউনিসিপাল আইনে কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে লক্ষ টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে মোটরের উপর কর গ্রহণের আইন পাশ। জার্ম্মাণ খনিওয়ালারা কয়লার টেক্স না দেওয়ায় তাহাদের খনি বাজেয়াপ্তের ব্যবস্থায় ৫ দিন সময় বৃদ্ধি। রুসিয়ায় বৃটিশ মৎস্য-তরী আটকের সংবাদ।

২১শে চৈত্র—

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীতে ও কানপুরে অসহযোগী ডাঃ মুরলিলাল চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত। গুজরাটের বোরসাদ মিউনিসিপালিটী সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ তালুকচ্যুত তালুকদার শ্রীযুত গোপালদাস দেশাই ও শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করায় আদালতে অভিযুক্ত। পূর্ণিয়া ঠাকুরগঞ্জে সশস্ত্র পুলিসের গুলীতে তিন জন নিহত ও এক জন আহত হওয়ার সংবাদ। হোরা-বিজ্ঞানরহস্য প্রণেতা পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের লোকান্তর। মিশরের ফিরো নৃপতি টুটানকামেনের আমলের নিদর্শন আবিষ্কার করিতে যাইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক লর্ড কার্ণারভন বিষবাষ্পে রক্ত দূষিত হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত। ফ্রান্স কর্ত্তৃক এসেনে ক্রুপের মোটরের কারখানা অধিকৃত হওয়ায় তথাকার শ্রমিকদের সহিত হাঙ্গামা, ফরাসীর গুলীতে কয়জন শ্রমিক নিহত, ক্রুপের চারজন ম্যানেজার গ্রেপ্তার। রুস সোভি-য়েটের ধর্ম্মমন্দিরের সম্পত্তি ব্যবস্থায় বাধা দেওয়ায় এক জন বিশপের প্রাণদণ্ড। ভূমধ্য সাগর হইতে অতিরিক্ত বৃটিশ রণতরী বহরের প্রত্যাবর্ত্তন।

২২শে চৈত্র—

ভোলার স্বেচ্ছাসেবক অধিনায়ক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সেনের কারাদণ্ড। তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের আহ্বানে গয়ায় বাঙ্গালা, বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের মোহন্তগণের সম্মিলন।

২৩শে চৈত্র—

কলিকাতার জোড়াবাগানে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এ, জেড খানের এজলাসে সাতটি মানহানি মামলার পুনর্বিচার আরম্ভ। গুজরাটী মাসিক পত্র যুগধর্ম্ম সম্পাদক প্রসিদ্ধ অসহযোগী শ্রীযুত ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনটা কালা আদমী কোন য়ুরোপীয় যুবতীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার করায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ। ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible] সভার সভাপতি বলিতেছেন, লাঙ্কাশায়ারের সুতাকাটা কলের কাজ আরও কিছুদিন অল্প পরিমাণে চালাইতে হইবে।

২৪শে চৈত্র—

লাহোরে লালা দুনীচাঁদ, ডাঃ গোপীচাঁদ প্রভৃতি নেতাদের মামলায় আসামী পক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়াও তাঁহাদের পক্ষে ব্যারিষ্টার ডাঃ নারঙ্গের উপস্থিতি; উল্লিখিত নেতা দুই জন আদালতে দেশবন্ধু দাশ ও শ্রীযুক্তা নাইডুর সহিত আলাপ করিতে নিষিদ্ধ। [illegible]

মামলায় সম্পাদক ও মুদ্রাকরের প্রতি আবার পূর্ব্বের মত দণ্ড ; অর্থাৎ ৫০০ ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড বিকল্পে ৬ মাস ও ১ মাস কারাদণ্ড। সিন্ধুর হিন্দুপত্রের অষ্টম সম্পাদকের কারাদণ্ড। সেন্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর সিদ্ধান্ত—তাঁহারা মালিকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিবেন। আলিগড় জাতীয় মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাঞ্জা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার-রুড-ডি-লা-ফসে কর্ত্তৃক পণ্ডিত ইকবল নারায়ণ গুর্ত্তু ও পণ্ডিত নানকচাঁদ শর্ম্মার বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ ; আসামীরা নাকি উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত হাবড়া ষ্টেশনে বোম্বাই মেলের তৃতীয় শ্রেণীর য়ুরোপীয় কামরা হইতে নামিতে অসম্মত হওয়ায় গ্রেপ্তার হয়েন, বিচারে তাঁহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। লাহোর মিউনিসিপাল সেক্রেটারীর পদে সিভিলিয়ান। হ্যাদের চক্রান্তে এসেন সহর সংবাদ-পত্র শূন্য। কাবুলের জন্য প্রথম ফরাসী মন্ত্রী নিযুক্ত।

২৫শে চৈত্র –

শ্রীযুত বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতাদের ব্রহ্ম পরিদর্শনের ফলে কংগ্রেস ভাণ্ডারে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত। নূতন ব্রহ্মদেশীয় আইনে পাইনামার সভা, কেবল জাগিরদারদিগকে প্রজার অধিকার দেওয়ায় আপত্তি। মুলসীর স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতি রবিবারে সত্যাগ্রহ করিতেছেন। সার্টিফিকেটাল হইতে চার মাইল দূরে সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার দলের মেজর থর ও এণ্ডারসন অজ্ঞাতনামার গুলীতে নিহত। মাদ্রাজের সালেম সহর ও দিল্লীতে প্লেগের বাড়াবাড়ির সংবাদ। রুঢ়ে ফরাসী সেনা আরও অগ্রসর। ফরাসীরা জার্ম্মাণীর সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে এ পর্য্যন্ত ৮১০০ কোটী মার্ক কাড়িয়া লইয়াছেন। এসেনের বণিক সভার সভাপতি ফরাসী ও বেলজিয়ানদিগকে সঙ্কটে ফেলার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট করায় ছয় মাসের কারাদণ্ডে ও ৮ লক্ষ মার্ক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। লিথুয়ানিয়া জার্ম্মাণীর মেমেল বন্দরটি অধিকার করায় বাসিন্দাদের ধর্ম্মঘটে সহর অবরুদ্ধ।

২৬শে চৈত্র –

জব্বলপুরে শ্রীযুত সুন্দরলালজীর প্রতি রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ১০৮ ধারার সমন জারী। পণ্ডিত শ্রীযুত জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভাগলপুরে রাজনৈতিক জেলা কনফারেন্স। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কলিকাতার ছোট আদালতে এক জন এম এ বি এল ৪০ টাকা ও এক জন আই এস সি পাশ ১৫ টাকা মাহিয়ানায় কাজ করিতেছেন। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মহিলার ভোটাধিকার প্রস্তাব ভোটে টিকিল না। টাঙ্গানিকায় সকল ব্যবসায়ীর ইংরাজীতে হিসাব রাখা বাধ্যতামূলক করায় ভারতীয়দের বিশেষ অসুবিধা, আইন অনুসারে চলিতে না পারায় দোকান-পাট বন্ধ। ভারতের লবণ-শুল্ক সম্বন্ধে পার্লামেন্টে প্রশ্ন, আইন হইয়া যাওয়ায় আলোচনায় বাধা। তুরস্কে বিদেশীয়দের বিদ্যালয়েও তুরস্কের ইতিহাস ভূগোল ও তুর্ক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা।

২৭শে চৈত্র—

অমৃতসরের আকাল প্রেসের স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে ১২৪ ধারার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, এই প্রেস হইতে গুরুবাগ সম্পর্কীয় যে পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; পুস্তকের লেখকের নামেও ঐরূপ পরোয়ানা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনের জন্য কমিটী-গঠন। মুলতানের গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ একটি মুসলমান মহিলাকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ; খাস বোম্বায়ের জন্য ব্যবস্থা পূর্ব্বেই হইয়াছে। মাদারীপুরে বিষম ঝড়ে অনেক নৌকা জলমগ্ন। টিপারারি, নিউক্যাসেলে আইরিশ বিদ্রোহী নেতাদের গুপ্ত বৈঠকে সরকারী সৈন্যদের অপ্রতর্কিত আক্রমণ ; সেনাপতি লিয়াম লিঞ্চ কৌশলে সৈন্যদিগকে নিজের দিকে লইয়া গিয়া ডি ভ্যালেরাকে পলাইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন ; যুদ্ধে লিঞ্চ আহত ও মৃত্যুমুখে পতিত। পারস্যের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতিপয় পরামর্শদাতা আমদানী করা হইয়াছে।

২৮শে চৈত্র—

অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, বহু লোক অল্পবিস্তর আহত। হাজার টাকার জরিমানার জন্য প্রসিদ্ধ ধনী, মহাত্মা গন্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের প্রায় তিন হাজার টাকা মূল্যের মোটর নীলাম। শ্রীযুত এ সি চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকারের শাসন পরিষদে পাকা হইলেন। বেগুড় মঠের কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলাউড বাঙ্গালার প্রথম মহিলা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মনোনীত। কোরিয়ায় অসহযোগ আন্দোলন চলার সংবাদ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এক জন জাপানীকেও নাগরিকের অধিকার দেন নাই। তুরস্কে ফরাসীর পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার প্রদান ; আর্জেরুম, ত্রেবিজন্দ, আঙ্গোরা ও মোসলের যোগাযোগ সাধনের সঙ্কল্প। বিলাতে পার্লামেন্টে মতভেদে সদস্যদের মারামারি।

২৯শে চৈত্র—

গড়বেতায় রাজনৈতিক জেলা সম্মিলনে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিবার অভিযোগে স্থানীয় অসহযোগী শ্রীযুত শ্যামসুন্দর সিংহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মুলতানে নেতাদের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ। গত কয় মাসের চেষ্টায় প্রায় দশ হাজার মালিকানা রাজপুতকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলায় পণ্ডিত শ্রীযুত ঈশ্বরী-প্রসাদ ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁহার অব্যাহতি। আফরিকা, টাঙ্গানিকায় ভারতীয়দের ধর্ম্মঘটে বিলাতের ঔপনিবেশিক অফিসের দোষ-প্রদর্শনে ডারেসালেমের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ, ধর্ম্মঘটই স্বাভাবিক ; ওদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয়গণকে দুধ ও শাকসব্জী বিক্রয় নিষেধের সংবাদ। কাশ্মীর পরিদর্শনে নিরত কৈশর-পত্নীর প্রতি বহিষ্কারের আদেশ।

৩০শে চৈত্র—

মাদ্রাজে সালেম জেলায় গন্ধী পুণ্যাহের সভায় সভাপতিত্ব করায় উকীল সরকার শ্রীযুত কে এম বাল সুব্রহ্মণ্য আয়ারের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের ধমকী, উত্তরে আয়ার মহাশয়ের কার্য্য-ত্যাগ। বোম্বাই হইতে বিলাত-যাত্রী কেনিয়া প্রতিনিধিগণকে জেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অমৃতসরের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শান্ত, উভয় পক্ষে প্রায় এক শত লোক আহত ; পুলিস ও সৈন্য লইয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং আকালীগণ ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই হাঙ্গামা নিবারণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; দোকানপাট আবার খুলিতেছে ; দুই জন গ্রেপ্তার। কোহাট জেলার সেনানীদের কর্ত্তা মেজর এলিসের কোহাটস্থিত বাসায় দস্যুর আক্রমণ ; মেজরের স্ত্রী দস্যুহস্তে নিহত, কন্যা অপহৃত। পাবনায় ভীষণ ঝড়ে অনেকের ঘর-বাড়ী জখম, কয়েকজন লোকও হতাহত। ঝেলাম জেলার কার্ণালী নামক স্থানে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে হাঙ্গামা ; হিন্দুদের মন্দিরেরও কোন কোন অংশের ক্ষতি।

৩১শে চৈত্র—

মিশরের মুক্তি-যজ্ঞের হোতা জগলুল পাশাকে সিসেলিস হইতে মুক্তি-প্রদানের সংবাদ ; জগলুলকে কেবল ফ্রান্সে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

১লা বৈশাখ—

আমেদাবাদে ভারত সচিব বনাম ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যালিটির অসহযোগী সদস্যদের মামলায় শেষোক্ত পক্ষের জয়-লাভ। নাগপুরেও পতাকা-শোভা-যাত্রায় পাঁচ জনের কারাদণ্ড। পুনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। কেনিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সহিত মিঃ এণ্ডরুজের বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা। লাহোরে হিন্দু বালিকা শিল্প বিদ্যালয়ে স্যর গঙ্গারামের লক্ষ টাকা দান। গৌহাটীতে [?] কনফারেন্স। [?] মুসলমান শিক্ষা সম্মিলন। হায়দ্রাবাদে কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় আইন পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলেন। দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী [?] গ্রামে কোন জমীদারের বাটীতে ডাকাতিতে ৬০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত; ডাকাতদের গুলীতে কয়েকজন হতাহত। ভোলা মহকুমার মুক্তা-কান্দি বন্দরে আবগারী বিভাগের লোকজনের সহিত হাটের লোকের সংঘর্ষ; পুলিশের গুলীতে তিন জন নিহত ও অনেকে আহত; আবগারী বিভাগের লোকরা বে-আইনী লবণ তৈয়ারীর সাজ-সরঞ্জাম কাড়িয়া লইয়া যাইতেছিলেন, হাটে সে সব জিনিষ দেখিবার জন্য লোক জমা হওয়ায় এ ব্যাপারের সূত্রপাত।

২রা বৈশাখ—

সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর হিসাবে গোলমালের অভিযোগে কমিটীর অন্যতম সম্পাদক ডাঃ মামুদ কর্ত্তৃক কলিকাতায় এক সভায় সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণের নিকট হিসাবের খাতাপত্র প্রদর্শন; হিসাব ঠিক বলিয়া তাঁহাদের সমর্থন। বগুড়ায় জেলা খেলাফতের অধিবেশনে লবণ আইন অমান্যের ও অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত। রাজসাহীর বন্যা-বিপন্ন অঞ্চলে কলেরার প্রাবল্যের সংবাদ। মাদ্রাজে নব বর্ষোৎসবে গায়ে জল দেওয়ার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় ৩৩ জন আহত, জনতার হস্তে পুলিশও প্রহৃত।

৩রা বৈশাখ—

জব্বলপুরে জাতীয় পতাকার মামলায় লালা [?]লালজীর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। যারবেদা জেলে মহাত্মা গন্ধীর সহিত তাঁহার পুত্র শ্রীযুত দেবীদাসের সাক্ষাৎ; অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা সাক্ষাতের অনুমতি পান নাই। আমেদাবাদের স্বরাজ-সম্পাদক শ্রীযুত মগনলাল গন্ধী জামীন-মুচলেকা না দেওয়ায় এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মেদিনীপুরের [?] [?] জঙ্গল লইয়া জমীদারী কোম্পানীর সহিত প্রজাদের মামলায় শ্রীযুত [?]জানন্দ সেন প্রভৃতি ১৭ জনের অব্যাহতি। মাণিকগঞ্জের কলেরার বাড়াবাড়ির সংবাদ। নাগপুরে ইটালীয়ান সার্কাসের তাঁবুতে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতি। কলিকাতায় হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থানার এক কনষ্টেবল রামশরণ নামে এক ট্যাক্সি-চালকের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ আনিয়াছিল, মামলা টিকে নাই। পূর্ব্ব কোরিয়ায় ঝড় তুফানে প্রায় চারি শত ধীবর ও অন্যান্য লোকজন নিরুদ্দেশ। বৃটিশ গবর্মেণ্ট ফিজীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ না করিয়া শেষোক্ত স্থানের চিনির কারবারীদের রপ্তানী শুল্ক ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যদের সভা গমন বন্ধ করিয়াছিলেন; কারবারীরা টাকা ফেরৎ লইতে অসম্মত হইয়াছেন। বিলাতে পার্লামেণ্টের প্রশ্নে প্রকাশ, জগলুল পাশার সহকর্ম্মীরা এখনও সেসিলিস দ্বীপে আটক রহিয়াছেন। এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা—যে সকল দেশে তুরস্কের পণ্য বিনা শুল্কে বা অল্প শুল্কে প্রবেশ করিতে পারিবে না, সে সব দেশের পণ্যের উপর তাঁহারা ২০ গুণ শুল্ক বসাইবেন।

৪ঠা বৈশাখ—

মহাত্মা গন্ধীর সহিত একই মামলায় দণ্ডিত প্রসিদ্ধ ধনী, অসহযোগী নেতা শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার যারবেদা জেল হইতে কারামুক্ত। বহরমপুর জেলে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস ও যতীন সেনের শারীরিক অবস্থা বলের খারাব হওয়ার সংবাদ। বিহারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত গণেশ দত্ত সিং পাটনায় একটি স্বাস্থ্য-ভাণ্ডার খুলিয়াছেন এবং নিজ মাহিনার বারো আনা অংশ তাহাতে প্রদান করিতেছেন। বেঙ্গলী-সম্পাদক শ্রীযুত পৃথ্বীশ-চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক নায়কের সম্পাদক শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুদ্রাকর শ্রীযুত শশধর ঘোষ ও ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুত প্রিয়নাথ গুহের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের অভিযোগে পণ্ডিত ইকবাল নারায়ণ গুর্ট্টুর ক্ষমা প্রার্থনা ও অব্যাহতি লাভ; পণ্ডিতজী বাদীর খরচা স্বরূপ হাজার টাকা তাঁহাদিগের মারফতে দেশহিতকর অনুষ্ঠানে প্রদান করিয়াছেন। লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টে অগ্নিকাণ্ডে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি। খলিফা সমস্যা সম্বন্ধে আঙ্গোরার সিদ্ধান্ত না মানিয়া নূতন সমাধানের জন্য ভূতপূর্ব্ব সুলতানের ঘোষণা। মিশরের রাজারও খলিফা পদ দাবী। ইরাকে সুলেমানিয়া অঞ্চলে পল্লীগ্রামে বোমা নিক্ষেপ। ইটালীর মন্ত্রিগণের পদত্যাগ; প্রধান মন্ত্রীর সহিত মতভেদ। তুরস্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার-লাভে ও ফ্রান্সের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার সংবাদে ফ্রান্সে ও মার্কিণে বাদ-প্রতিবাদ।

৫ই বৈশাখ—

ভাগলপুরে তিন জন রাজনৈতিক কয়েদীর ৪৫ দিন হিসাবে কারাদণ্ড। পাটনা মিউনিসিপ্যালিটির অধিকাংশ সদস্যের ভোটে সহরে গো-বধ বন্ধ। জি পি কওয়ার নামে এক ফিরিঙ্গী ছাত্রের বিরুদ্ধে তাহার বন্ধু-জননীর গর্ভে ও তাহার ঔরসে জাত পুত্রকে কলিকাতায় লালদীঘিতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টার অভিযোগ। ভবানীপুরের অল-ইণ্ডিয়া একজিবিশনের সেক্রেটারীর নামে এম্পায়ার আর্ট ষ্টুডিয়োর পক্ষ হইতে আর একটি নালিশ। আফগান আমীরের আজোয়া পরিদর্শনের সঙ্কল্প। তুর্ক প্রতিনিধিদের কনষ্টা-ন্টিনোপল হইতে লসেন যাত্রা। দক্ষিণ আফ্রিকার কতিপয় য়ুরোপীয় কর্ত্তৃক ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনের সঙ্কল্প সফল সিদ্ধ হইলে প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে সহজে জব্দ করিতে পারিবেন।

৬ই বৈশাখ—

সালেমের নির্ভীক ডাঃ বরদারাজলু নাইডু আবার পাঁচ বিঘা জমী ক্রোক। কারামুক্ত শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার বলিয়াছেন, জেলে মহাত্মাকে সাধারণ কয়েদীদের সহিত মিশিতে দেওয়া হয় না, সকল রাজনৈতিক কয়েদীই রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদপত্রাদি পড়িতে পায় না। অমৃতসরের দাঙ্গা হাঙ্গামায় পুলিসের তদন্ত আরম্ভ। এ বি রেলে ব্যয়-হ্রাসে শতকরা কুড়ি জন কেরাণী কমাইয়া দিবার সঙ্কল্প। ময়মনসিংহে আরও প্রায় দেড় শত হাড়ি হাড়ী ক্ষত্রিয়ের (হাড়ীর) উপবীত গ্রহণ। [?] কিয়াউক্তাব সহরে মহিলা সভার চেষ্টায় গো-বধ বন্ধ। এ বি রেলে যাত্রীদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটি পরামর্শ-সমিতি গঠিত। কুমার অধিক্রম মজুমদার টেরিটোরিয়াল সৈন্যরূপে ১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টে অফিসার নিযুক্ত। পুণা সহরে জেলে যাবার আতঙ্কে নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা হতাহত। দিল্লীতে আজমীর গেটে হিন্দু দেবমূর্ত্তি ধ্বংস। গঙ্গাতীরের চটকল সমূহের ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট। টাঙ্গানিকায় ৪৫ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী ৪৫ শিলিং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। শ্রীযুত গোলাম রসুল ট্রান্সভাল হইতে তাঁহার ৩ বৎসরের একটি পুত্রকে নাটালে লইয়া যাওয়ায় এশিয়াবাসী সংক্রান্ত আইন অনুসারে দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ।

৭ই বৈশাখ—

আবার ১৪ জন মুলসীপেটা সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড। ব্রহ্ম সরকারের সহিত স্থানীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আপোষ, পরিষদ সরকারী অর্থসাহায্য লইবেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে দিবেন। কলিকাতায় জার্ম্মাণীর পরিখা ছুরী৩- অস্ত্র আইনে পড়িল। ব্রহ্মে দক্ষিণ শাণ রাজ্যের কিং-টাং অঞ্চলে স্থানীয় সর্দ্দারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র; ষড়যন্ত্রকারীরা নাকি সরাসরি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতে চায়। মিশরে যুক্ত

শাসন-ব্যবস্থা। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে অন্যূন চব্বিশটি বৃটিশ বীমা কোম্পানী কারবার গুটাইয়া লইতেছেন।

৮ই বৈশাখ—

ভোলার মুন্সীকান্দ বন্দরের গুলী সম্পর্কে বে-সরকারী তদন্ত। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল চেয়ারম্যান ও শ্রীযুত এম সারওয়ার্দী ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত। গোদাবরী জেলায় অসহযোগ কনফারেন্সে যোগ দিলে বন্দুকের পাশ কাড়িয়া লইবার ভয় প্রদর্শন। শুদ্ধি আন্দোলন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উক্তি, উলেমা সভা ও খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাঁশবাড়িয়ার নসিরনগর থানার আয়ুবউল্লা সেকে টাকা রাখায় ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ। মুলতান হাঙ্গামার মামলায় পাঁচ জন হিন্দুর অব্যাহতি। কলিকাতার ফেরী ষ্টীমার নলিনীর লস্কর ছুলা মিঞা কাশীপুর ঘাটে কোন স্ত্রীলোককে গঙ্গাবক্ষ হইতে উদ্ধার করায় বিলাতের রয়্যাল হিউমেন সোসাইটীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। অমৃতসর হাঙ্গামায় তিন জন হিন্দু গ্রেপ্তার। শেওড়াফুলীতে জাল সেটেলমেণ্ট অফিসার সদলবলে গ্রেপ্তার।

৯ই বৈশাখ—

চট্টগ্রাম, পটিয়াকেড়ার ডাকাতি সম্পর্কে স্থানীয় সারদা আশ্রমে খানাতল্লাস। মাদ্রাজ সরকারের কমিটী কর্তৃক ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া মত প্রকাশ। কলিকাতায় মির্জাপুর ষ্ট্রীটে কৃষক রায়ত সভা; সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১০ই বৈশাখ—

বোম্বাই করপোরেশনের সভায় ইংরেজী অনভিজ্ঞদের ভারতীয় ভাষায় আলোচনা করিবার ব্যবস্থা। শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন ও মৌলানা আজাদ সোভানি শুদ্ধি কার্য্যের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য পল্লী অঞ্চলে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতেছেন। ফরিদপুর ও জলন্ধর জেলায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গত কয় বৎসরে ছয় জন শিখ হত্যা। বোম্বায়ের কর্তৃপক্ষ ৫ বৎসর তথায় সওয়া লাখ টাকা ব্যয়ে ২১ লক্ষ ইঁদুর মারিয়াছেন; তথাপি প্লেগ কমে নাই, বরং বাড়িয়াই গিয়াছে।

১১ই বৈশাখ—

বাঙ্গালোরে কংগ্রেস-নেতাদের গমন আশঙ্কায় মহীশূর রাজ্য কর্তৃক কংগ্রেস কমিটীর প্রতি অভিনন্দনের আয়োজন করিতে ও সভা বসাইতে নিষেধ। হুগলী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ প্রতিবাদে মৌলবী সেরাজুদ্দীনের প্রায়োপবেশনের সংবাদ। ব্রহ্মে আট জন ব্যবহারাজীব লইয়া আর্থিক কমিটী গঠিত। পাবনাতেও কলেরার বাড়াবাড়ি। বোম্বায়ে ভজনাট ব্রাদার্সের তেল ও ময়দার কলে অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি। আর্য্য সমাজীদের শুদ্ধি কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য মালিকান রাজপুতদের সুলতানপুরে সমিতি-গঠন। যুক্তপ্রদেশে চন্দাউসী নামক স্থানে হিন্দুদের উপর কসাইদের আক্রমণ; অনেকে গুরুতর যখম। লসেন বৈঠকে থ্রেসের সীমানা লইয়া আবার গ্রীস্-তুরস্কে মতভেদ; কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সম্মিলিত সেনা প্রত্যাহারের দাবী, ইরাকের সীমা নির্দ্ধারণের জন্য এক বৎসর সময়ের ব্যবস্থা।

১২ই বৈশাখ—

বাঙ্গালায় কচুরী পানা ধ্বংসে কমিটীর বিবরণ, আইন প্রণয়নে সম্মতি। দস্যুহস্ত হইতে মিস এলিসের উদ্ধার। এলাহাবাদ জেলায় কয়ারি নামক স্থানে সিয়া সুন্নীর দাঙ্গা,হাঙ্গামায় অনেকে হতাহত।

১৩ই বৈশাখ—

পঞ্জাবের নানা স্থানে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ; কড়া পাহারার জন্য সৈন্য প্রেরণ। ভোলা মহকুমার মুন্সীকান্দ বন্দরের গুলী বর্ষণে বে-সরকারী তদন্তের বিবরণ, তিন জন নিহত হওয়া ছাড়া আরও অনেকে অত্যধিক পরিমাণে আহত; গুলী বর্ষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। মুন্সীকান্দ অঞ্চলে পরবর্ত্তী ধরপাকড় সংক্রান্ত সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম আটক হওয়ার কথা। হুগলী জেলে কাজী নজরুল ইসলাম ও কলিকাতা খান-সামা সমিতির সম্পাদক মৌলবী সেরাজুদ্দীনের প্রায়োপবেশন; শেষোক্ত ব্যক্তি ও ভোলার স্বেচ্ছাসেবক নায়ক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সেনের ঠাণ্ডা গারদ। সুরাটের এক ভদ্রলোক তাঁহার কন্যাকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়িতে না দেওয়ায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে তাঁহার এক টাকা জরিমানা; ভদ্রলোক মেয়েটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন, তিনি হাইকোর্টে আপীল করায় রুল জারী হইয়াছে। পঞ্জাব হইতে দেশবন্ধু দাশের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন। বাঙ্গালায় শিক্ষাবোর্ড গঠন উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিকট নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণের সংবাদ।

১৪ই বৈশাখ—

কলিকাতায় গোপাল সিং প্রমুখ তিন জন শিখের কৃপাণ বড় বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা। হুগলী জেলে তিন জন নেতার পূর্ণ ভাবে ও অন্যান্য অনেকের আংশিক প্রায়োপবেশন; দুই জনের অবস্থা খারাপ। কাজী সাহেবের সহিত বন্ধুর সাক্ষাতে আপত্তি। বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় কোন উকীলের পুত্র বাড়ীতে টেক্স বন্ধের বক্তৃতা করিতে দেওয়ায় রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত। অমৃতসর হাঙ্গামায় আকালীরা সরকার পক্ষের সহায়তা করায় পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গুরু-বাগের সকল আকালী আসামীকে মুক্তি প্রদানের সঙ্কল্প। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলারকে গবর্ণর মানহানির মামলা আনিবার অনুমতি দিবার সময় শিক্ষা-সচিব শ্রীযুত চিন্তামণির সহিত পরামর্শ না করায় দুই জন মন্ত্রীরই পদ ত্যাগ। চিন্তামণির পদত্যাগপত্র গৃহীত। সিমলার প্রসিদ্ধ য়্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক দেউলিয়া। ভারতের নূতন লবণ-শুল্ক সম্বন্ধে বিলাতে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করিবার নোটীশ; শ্রমিক সদস্যগণের রাজার নিকটও আবেদন করিবার সঙ্কল্প। আইরিশ-সাধারণতন্ত্রীদল কর্তৃক বিরোধ স্থগিতের আদেশ প্রচার।

১৫ই বৈশাখ—

মান্দালয়ে বোমার মামলায় নারায়ণদাস নামক এক ব্যক্তির ৭ বৎসর দ্বীপান্তর। হাজারিবাগ জেলে মৌলানা হজরৎ মোহানী লোকজনের সহিত দেখা করিতে ও পত্র লিখিতে পান না; সরকারের কৈফিয়ৎ। উহা জেল নিয়মভঙ্গের শাস্তি। জলন্ধর জেলায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে আদমপুর থানার মানকো গাড়িয়াল গ্রামের সমস্ত পুরুষ নজরবন্দী থাকার সংবাদ। কলিকাতায় ছয় জন গুণ্ডার প্রতি বাঙ্গালা দেশ হইতে বহিষ্কারের আদেশ, তিন জনের দশ ও আর তিন জনের পনেরো বৎসরের জন্য। কানপুরের ডেপুটী কালেক্টর খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আসাক হাসান জয়পুর মন্ত্রি-সভার সদস্য নিযুক্ত। মুলতানে আবার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা; এক জন নিহত, নয় জন আহত। মরক্কোয় আবার ফরাসী অভিযান।

১৬ই বৈশাখ—

লবণ শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য করাচী অঞ্চলের শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক সাহানির পদত্যাগ। নাটালে নূতন ব্যবসা লাইসেন আইনে ভারতীয়গণের অসুবিধার সংবাদ। ডার্বিন রেল ষ্টেশনে ভীষণ মাইন বিস্ফোরণে, কয়েকজন আহত। সিরিয়ার জন্য তুরস্ক ও ফ্রান্সের সৈন্য সজ্জা।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক-রোটারি মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পল্লী-প্রণয়

বসুমতী প্রেস]　　　　[শিল্পী—শ্রীঅমাকুমার চৌধুরী।
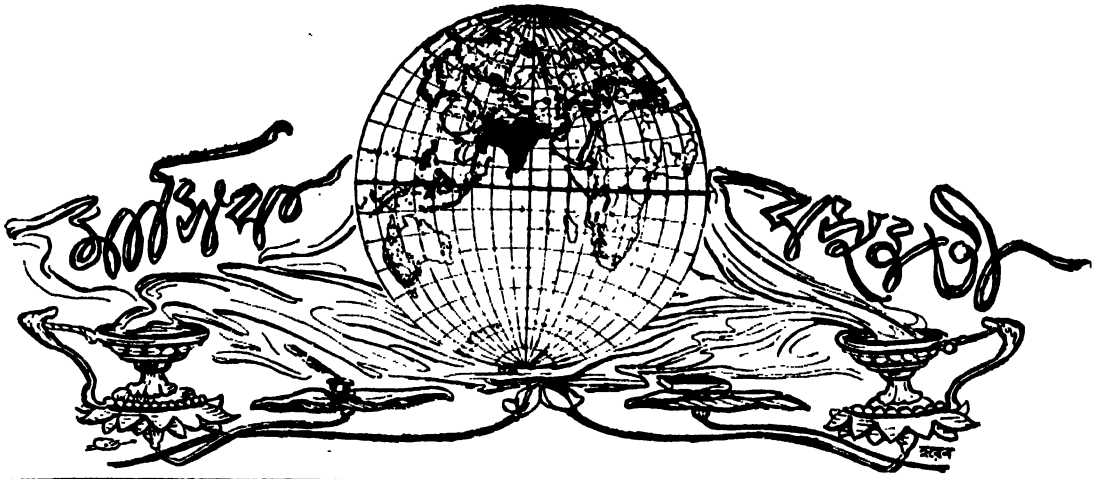
২য় বর্ষ } ১ম ✱ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ✱ খণ্ড { ২য় সংখ্যা

বাঙ্গালা গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

বাঙ্গালাভাষায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে, বৈষ্ণব-পদাবলী প্রথম ও প্রধান গীতিকাব্য। বৈষ্ণব-পদাবলী—এই দুইটি কথার প্রয়োগ বড় শিথিল রকম। এইরূপ সঙ্কলন গ্রন্থে যে সকল কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা সকলে বৈষ্ণব ছিলেন না এবং সকল পদও রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় নহে। কয়েকজন পদকর্ত্তা সমসাময়িক, কয়েকজন তাঁহাদের পূর্ব্বের, অবশিষ্ট কবিগণ তাঁহাদের পরের। শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া যে সকল গ্রন্থ রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলিও বৈষ্ণবকাব্যের অন্তর্ভুত। বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ, কেবল কাব্যগ্রন্থ নহে; পদকর্ত্তারা সকলেই মহাজন, পদসমষ্টি মহাবাক্যতুল্য। কাব্যরসগ্রাহী বৈষ্ণব হইতে পারেন, নাও হইতে পারেন; তিনি এই গীতিকাব্যের ছন্দলালিত্য ও ভাবমাধুর্য্য অনুভব করিবেন। এই হিসাবেই বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব।

পদকল্পতরুতে সংগৃহীত সমস্ত পদ প্রায় দুই শত বৎসরের রচনা। সকলগুলিই গীত, শুধু গীতিকবিতা নহে, অর্থাৎ সুরতালের সাহায্যে গান করিবার জন্য রচিত, কেবল আবৃত্তি করিবার জন্য নহে। এই বিস্তৃত সঙ্কলন গ্রন্থ এই আকারে রক্ষিত ও প্রকাশিত হইবার কারণ কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার স্বীকার করিয়া ভক্তবৈষ্ণবগণ সমস্ত বৈষ্ণবকাব্য তাঁহাকেই নৈবেদ্যের ন্যায় অর্পণ করিতেন। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই শ্রীচৈতন্য, যে লীলা কৃষ্ণের, সেই লীলা চৈতন্যের। চন্দ্র যেমন তারকাবেষ্টিত, চৈতন্য তেমনই বৈষ্ণব কবিগণবেষ্টিত। সেই কারণে বৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে প্রত্যেক শাখা ও প্রত্যেক পল্লবের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা, প্রথমে গৌরসম্বন্ধীয় পদ, তৎপরে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ। যে সকল গীতকর্ত্তা চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহাদিগের পদাবলীও এই সংগ্রহভুক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ ত্রিকালে বিভক্ত। কয়েকজন চৈতন্যের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের রচনাও চৈতন্যের পূর্ব্বে। অপর কয়েকজন চৈতন্যের সমসাময়িক। অবশিষ্ট কবিগণ চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী। এই ত্রিবিধ রচনাই পদকল্পতরুর সঙ্কলনকার তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। সকল বৈষ্ণব কবিতাই এক সূত্রে গাঁথা ও শ্রীগৌরাঙ্গ সেই রত্নমালার মধ্যমণি। ইহাতে লাভ এই যে, সকল বৈষ্ণব-কবিতাই একত্র রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষতি এই যে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা স্বতন্ত্র করা অত্যন্ত আয়াস সাধ্য এবং বহু পরিশ্রম করিলেও সকল পদের রচয়িতাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; কারণ, বহুসংখ্যক পদের ভণিতা নাই এবং ভণিতার অভাবে ঐ পদগুলি কাহার রচিত, তাহা নিরূপণ করিতে পারা অসম্ভব। ভণিতা থাকিলেও যে পদরচয়িতার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, এমন নহে; কেন না, কোন কোন পদে ভণিতারও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বৈষ্ণবকাব্য বাঙ্গালা-সাহিত্যে গৌরবের

সামগ্রী হইলেও বিশ্লেষণের কখন কোন চেষ্টা হয় নাই। পদকল্পতরু অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থভুক্ত সকল কবির রচনা স্বতন্ত্র করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা একবারমাত্র হইয়াছে। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একচল্লিশ জন পদকর্ত্তার পদসমূহ স্বতন্ত্র সঙ্কলন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির রচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে কবির সম্মান হয় ও বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি হয়। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি। বৈষ্ণবশিরোমণি রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি কবিগণ ধর্ম্মের উর্ব্বরা ভূমিতে ভক্তি-প্রেমরসে সিঞ্চিত করিয়া পদকল্পতরু রোপণ করিয়া তাহাকে শাখা পল্লবে পূর্ণ না করিলে এই সুরভিপূর্ণ গীতিগুচ্ছ সাহিত্য ভাণ্ডারে কোথা হইতে আসিত? সকল সঙ্কলনের মধ্যে পদকল্পতরু প্রধান; কারণ, এ পর্য্যন্ত আর যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, কোনটিতে এত পদ নাই।

এই সঙ্কলন গ্রন্থ কেবল রক্ষা করিলে অথবা সময় সময়ে পুনর্ম্মুদ্রণ করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পালন করা হয় না। ইহার উৎকর্ষতার জন্য আমাদের কোন চিন্তাই নাই। যদি ভিন্ন ভিন্ন কবির গীতিকবিতা এই সমষ্টি হইতে বাহির করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তক করা যায়, তাহা হইলে শুধু পড়িবার নয়, বুঝিবারও সুবিধা হয় এবং প্রত্যেক কবির সম্বন্ধে পাঠক একটা অভিমত স্থির করিতে পারেন। পদকল্পতরু আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে প্রায় এক শত কুড়ি জন পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের বহুসংখ্যক পদ, আবার অল্পসংখ্যক পদরচয়িতাও অনেক জন আছেন। যাঁহাদের পদসংখ্যা অল্প, তাঁহাদের পদাবলী পৃথক্ না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহারা বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ না করিলে তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। সঙ্কলন কাব্য অন্য ভাষাতেও আছে, কিন্তু সেরূপ গ্রন্থে প্রত্যেক কবির গুটিকতক কবিতা বাছিয়া দেওয়া হয় এবং এক এক কবির রচনা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সন্নিবেশ করা হয়। ইংরাজী কাব্যের সঙ্কলন গ্রন্থে এইভাবেই কবিতা নির্ব্বাচন করা হয়। হয় একটা কাব্যযুগের বিভাগ, নহে ত সমসাময়িক কবিদিগের বিভাগ। বিষয় হিসাবেও শ্রেণী বা বিভাগ করা যায়, কিন্তু তাহাতেও তেমন ক্ষতি হয় না, কারণ সকল কবির গ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর বিভাগ গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণের লীলা প্রকরণে। এক পল্লবেই নানা কবির রচনা রহিয়াছে। হয় ত একটি পদ জয়দেবের, দুইটি চণ্ডিদাসের, কয়েকটি বিদ্যাপতির, দুই চারিটি গোবিন্দদাসের, জ্ঞানদাসের কয়েকটি, এইরূপ। এই ভাবে পদাবলী সাজাইলে গীতের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য পাঠের হিসাবে রসভঙ্গ হয়। আরও কয়েকটি অসুবিধার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোবিন্দদাস নামধারী কয়েকজন পদকর্ত্তা আছেন। এইরূপ কবিশেখর, শেখর, শেখর রায়, নৃপ ভূপতি, ভূপতি সিংহ, চম্পতি, চম্পতিপতি প্রভৃতি আছেন। ইঁহাদের পার্থক্য কি কোনরূপে নিরূপণ করিতে পারা যায় না? ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভণিতাশূন্য পদ বিস্তর আছে। কোন্ পদ কাহার রচিত, নির্ণয় করিবার কি কোন উপায় নাই? সকলের অপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, পদকল্পতরুর যে কোন সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই এমন অনেক পদ আছে—যাহার কোন অর্থ হয় না। ইহার কারণ কি? সঙ্কলনকার বৈষ্ণবদাস যে কোন পদের অর্থ না বুঝিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যদি পাঠবিকৃতির কারণে অথবা লিপিকরের প্রমাদবশতঃ এতগুলি পদ অর্থশূন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি? বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান গীতিকাব্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা কি করিয়াছি?

পদকল্পতরুর মধ্যে সঙ্কলিত সকল কবিতা বাঙ্গালাভাষায় রচিত নয়। সকল পদকর্ত্তাও বাঙ্গালী ছিলেন না। অধিকসংখ্যক পদাবলী তিনটি ভাষায় বিরচিত;—সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও আর এক ভাষা যাহা সংস্কৃতও নয়, বাঙ্গালাও নয়। এই ভাষাকে ভ্রমক্রমে ও অজ্ঞতাবশতঃ ব্রজভাষা অথবা ব্রজবুলি নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহা বিস্তারিতরূপে পরে আলোচিত হইবে।

বৈষ্ণবকাব্যের কবিত্রয়

এই তিন ভাষায় বীণাপাণির যে ত্রিতন্ত্রী বীণার আবির্ভাব

·য়াছে, তাহার তিনটি তার তিন জন কবি সৃষ্টি করিয়া-
.ন —জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস। ইঁহাদের গীতা-
·ীও পদকল্পতরুতে সংবলিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র আকারেও
·কাশিত হইয়াছে। কালপর্য্যায়ক্রমে ইঁহাদের নাম উল্লি·
·খত হইল। প্রথমে জয়দেব, তাহার পর বিদ্যাপতি, তাহার
·র চণ্ডিদাস। তিন জনই চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, চৈতন্যের-
·ালে ইঁহাদের কেহই জীবিত ছিলেন না। কিন্তু সেই-
কালেই ইঁহাদের গীতাবলীর প্রচুর সমাদর হইয়াছিল,
সঙ্কীর্ত্তনে ইঁহাদের পদসমূহ উদ্গীত হইত। সংস্কৃতভাষায়
বিরচিত কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গীভূত কি না, এ কথা
বিচারযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় রচিত নয়
·লিয়া যদি গীতগোবিন্দকে বৈষ্ণবকাব্যের আলোচনা হইতে
বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাপতির পদাবলীরও আলো-
চনা হইতে পারে না, কারণ, বিদ্যাপতির ভাষা আদৌ
বাঙ্গালাভাষা নয়। কিন্তু বিদ্যাপতিকে এবং তাঁহার ভাষায়
·াহারা পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে
·বৈষ্ণবকাব্যের বিশেষত্বই লুপ্ত হয়। পদকল্পতরুতে সংগ্রহ-
কার বৈষ্ণবদাস যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই তিন সহস্র
·দাবলীর ভাষা ত্রিবিধ হইলেও এই গ্রন্থই মুখ্য বৈষ্ণবকাব্য
·বং ত্রিভাষার এই ত্রিবেণীসঙ্গম বাঙ্গালা সাহিত্যের ম·
·ীর্থপীঠ। যে তিন মহাজন এই অমৃতানন্দম·
উৎস সৃজন করেন, বৈষ্ণব গীতিকাব·
·বি। তাঁহাদের কাব্যের আলোচন·
আলোচনা।

গিয়াছেন, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।
বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস (মিথিলা), সনাতন, রামানন্দ রায়,
দেব সনাতন, রাধামোহন, ইঁহার অনুকরণে সংস্কৃতভাষায়
পদ রচনা করিয়াছেন। আর সকলের পদ পদকল্পতরুতেই
আছে, কেবল বিদ্যাপতির সংস্কৃত গীত এই গ্রন্থে নাই।
সংস্কৃতে বিদ্যাপতি-বিরচিত দুর্গা ও গঙ্গাস্তোত্র মনোহর।
ভাষা জয়দেবের অনুকরণ। যাঁহারা গীতগোবিন্দের ছন্দ ও
গীতগোবিন্দের শব্দযোজনা অনুকরণের প্রয়াস করিয়াছেন,
তাঁহারা কেহই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।
শুধু কি অনুপ্রাসের ছটায় আর শব্দের শ্রুতিমধুরতায় জয়
দেবের যশ দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে? অতি
সংক্ষেপে কয়েকটি শব্দে জয়দেবের বর্ণনা করিবার অসাধা-
রণ ক্ষমতা। "চন্দন-চর্চ্চিত নীল-কলেবর পীত-বসন বন-
মালী" এই শ্লোকার্দ্ধে শ্যামসুন্দরের লোক-মনোমোহন রূপ
মানস-চক্ষুর সম্মুখে দিব্যমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিভাত হয়। দশাব-
তারের অতুলনীয় স্তোত্র কাব্য-সাহিত্যে অমূল্য রত্ন। এক
একটি শ্লোকে প্রত্যেক অবতারের ম·
হইয়াছে।—

কোমলকান্ত পদাবলী নানা জাতীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে মধুর তাললয়ের যোগে গীত হইতেছে।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি ঠাকুরকে লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন না, এ কথা আমরা এখন নিঃসংশয়রূপে অবগত হইয়াছি। তাঁহার জন্মস্থান এবং কোন্ সময় তিনি জীবিত ছিলেন, অবধারিত হইয়াছে। তালপত্রের পুঁথিতে তাঁহার স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান এবং ঐ পুঁথিতে লিখনসমাপ্তির স্থান ও তারিখ লিখিত আছে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই এখন জানিতে পারা গিয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানে ভারতবাসী চিরকালই উদাসীন; কিন্তু যে সকল দেশে ইতিহাস ও ইতিহাসের গবেষণার অভাব নাই, সে সকল দেশেও যশস্বী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। সেক্সপীয়র ... কত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এই পর্য্যন্ত অভ্রান্ত- ... হইলেও বিশেষ আইসে যায় না; কেন না, প্রথিত-যশ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এরূপ অমূলক জনশ্রুতি প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষ গোল বিদ্যাপতির ভাষা লইয়া এবং ইহার ফলে বাঙ্গালা গীতিকাব্যের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রজবুলি ও ব্রজভাষা

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ছিলেন, কিন্তু যে ভাষায় তিনি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামকরণ হইয়াছে, ব্রজবুলি বা ব্রজভাষা। এই দুইটি শব্দের মোটামুটি অর্থ সহজ বুদ্ধিতে বিবেচনা হয় যে, ব্রজবাসীরা যে বুলি বলেন, তাহাই ব্রজবুলি এবং ব্রজভূমিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাই ব্রজভাষা। কিন্তু ব্রজবুলি ও ব্রজভাষাকে এক করিতে গেলে মুস্কিল হয়। কেন না, ব্রজভাষা বলিয়া একটা ভাষা আছে, অথচ বিদ্যাপতি ও তাঁহার অনুকরণে অপর কবিগণ যে ভাষায় পদাবলী রচনা করেন, তাহার সঙ্গে ব্রজভাষার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। অতএব পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল এবং যথানিয়মে ইহার ঠিকুজি-কোষ্ঠী প্রস্তুত হইল। সে ঠিকুজি হাৎড়াইলে এই ভাষার সঙ্গে ব্রজের কোন রকম সম্পর্ক আবিষ্কার ...পাওয়া যায় না। এক মত এই যে, মিথিলার ভাষা ... ও তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা মিশাইয়া ব্রজবুলি ... মতে বিদ্যাপতি মিথিলার হিন্দী- ... রচনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর ...জা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত ...ন আকারে পরিবর্ত্তিত ...লি কি আকারে ছিল ...? কেনই বা বসন্ত ...রিতে গেলেন? * ... উৎপত্তি আলোচনা ...প হিন্দীসে বহুত্ ... উসকী শাখা নহী। ...হ ... মৈথিলী ... ইস ...ন কবি পুত্র।" †

---

* ... দুইটিই ভ্রান্ত।

† ...দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

তিনি বলেন, "বিহারীভাষাকে অন্তর্গত পাঁচ বোলিয়াঁ হৈঁ।" এই পাঁচ বুলিরই কি বাঙ্গালাভাষার সহিত অধিক সম্বন্ধ, না কম বেশী? মৈথিলী যদি বিহারীভাষার এক বুলি হইল, তবে আর চারটি বুলি কি রকম? ইহার মধ্যে ভোজপুরী বুলি একটি। ছাপরা ও আরা জিলায় এই বুলি প্রচলিত। বুলির নমুনা এই রকম:—

অংরেজ বহাদুর জুলুম কইলে বা,
ধুঁয়াকে গাড়ী চলওলে বা।

এই গানে জুলুম অর্থে খুনখারাপী নয়, যাহাকে কেরামত বলে, তাহাই। রেলগাড়ী যখন প্রথম চলে, তখনকার এই গান। কথার নমুনা, "রউরা কাঁহা যা তাড়ি," অর্থ—আপনি কোথায় যাইতেছেন? এই বুলির সহিত বাঙ্গালা ভাষার নিকট কিংবা দূর কোন সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আসল কথা, বিদ্যাপতি ও তাঁহার অনুকরণকারী অপর কবিদিগের পদাবলী ব্রজবুলি বলিয়া নির্দ্দেশ করা আমাদের নিজেদের মনগড়া মত, এ বিষয়ে আমরা সকলেই তুল্য অপরাধী। বৈষ্ণব কবিতাবলীর কতক অংশ যে ব্রজবুলিতে বিরচিত, এ কথাটাই আধুনিক। বিদ্যাপতির কালে ও তাহার কিছুকাল পরেও বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পাঠ করিতে যাইতেন। সেখানে তাঁহারা অবলীলাক্রমে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা শিখিতেন এবং পদাবলী পাঠে মুগ্ধ হইয়া, পদসমূহ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, এই কারণে বিদ্যাপতি বিরচিত রাধাকৃষ্ণ পদাবলী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃত শিবগীতসমূহ পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী লইয়া আসেন, তাঁহারা রসিক, রসগ্রাহী, কেহ ভক্তিরসে রসিক, কেহ সাহিত্যরসে, কাব্যরসে রসিক। তাঁহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক কেহ ছিলেন না। কেহই বিদ্যাপতির অথবা তাঁহার প্রণীত পদাবলীর ইতিহাস লিখিয়া যায়েন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন যে, তাঁহারা যেমন জানেন, বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ও পদাবলীর ভাষা বুঝেন, বাঙ্গালাদেশের লোকেরা চিরকাল সেই রকম জানিবে ও বুঝিবে। কিন্তু যখন মিথিলায় পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী শিষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং মিথিলায় ও বঙ্গদেশে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ উঠিয়া গেল, তখন লোক অল্প দিনে সকল কথা ভুলিয়া গেল। কিছুদিনে বিদ্যাপতি কোন্ দেশের লোক, তাহা তাহারা ভুলিল। তাঁহার পদাবলী কোন্ ভাষায় রচিত, তাহাও ভুলিয়া গেল। অবশেষে এমন এক সময় আসিল যে, পদাবলীর ভাষার একটা নাম না দিলে আর চলে না। এ ভাষা হিন্দী নয়, মথুরা বৃন্দাবন গোবর্দ্ধনে যে ভাষা কথিত ও লিখিত হয়, সে ভাষাও নয়। তবে এই ভাষাকে কি নামে অভিহিত করা যাইবে? সকল পদই ব্রজনায়ক ও ব্রজনায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত, সুতরাং ইহাকে ব্রজবুলি নাম দিলেই ইহার যথাযথ নামকরণ হয়। এই নাম কল্পিত নামমাত্র, বিদ্যাপতির ভাষা ও বিদ্যাপতির দেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলে ব্রজবুলি কথাটা লোকের মনে পড়ে।

বৈষ্ণব কবিগণ ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথাই বলিয়া যায়েন নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর পণ্ডিত এবং স্বয়ং সুকবি ছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গীত ব্যতীত বিদ্যাপতির ভাষায় তিনি বহুপদ রচনা করিয়াছিলেন এবং পদকল্পতরুতে সে সকল গীত সংবলিত আছে। রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'পদামৃতসমুদ্র' পদকল্পতরুর ন্যায় বৃহদাকার গ্রন্থ নয়, কিন্তু উহাতেও মহাজনদিগের বিস্তর উৎকৃষ্ট পদ আছে এবং অনেক স্থলে সংস্কৃতভাষায় টীকা আছে। রাধামোহন ঠাকুর শ্রীআচার্য্য প্রভুর বংশ এবং তাঁহার 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থ দেখিয়াই কবি বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু' সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ও নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিন হাজার এক শত এক পদ সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে এক স্থানে আছে—

নলিনি চকোর সফরি সব মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আঁখী।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণে বিশেখী॥

আর এক পদে—

গমন অবধি তুঅ ন ভেল বিশেখ।
ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ॥

"ষ" কে "খ" লিখা অথবা "খ"য়ের মত উচ্চারণ করা বাঙ্গালাভাষায় চলিত নাই। রাধামোহন ঠাকুর এখানে এইরূপ টীকা করিয়াছেন, "পাশ্চাত্যা মূর্দ্ধণ্যষকারোচ্চারণং কুর্ব্বন্তি অতো বর্ণো সাম্যং।" ব্রজবুলির নাম গন্ধ নাই। টীকাকার কেবল এই ইঙ্গিত দিতেছেন যে, পদকর্ত্তা কবি পশ্চিমদেশবাসী এবং সে দেশে "ষ" ও "খ"য়ের উচ্চারণ একরূপ।

ব্রজবুলি, ব্রজভাষা অথবা হিন্দী পদ

সমগ্র পদকল্পতরুতে হিন্দীভাষায় রচিত দুই চারিটি পদ আছে। এই ভাষা শুনিতে ব্রজভাষার মত। যে ভাষায় বিদ্যাপতি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন এবং যে ভাষা অন্যান্য কবি কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে, সে ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।-

(১) ভজ গোবিন্দ গোপালা।
অধম উদ্ধারণ নন্দলালা॥
মথুরামে হরি জনম লিয়ো হৈ
সঙ্গ লিয়ে ব্রজবালা।
বৃন্দাবনমে গৌ চরাওত,
গোকুল খেলত নন্দলালা॥
পুন মথুরা আওয়ে এক্ষক নসাওয়ে
পাঁওরায়ে সব গোপালা।
উগ্রসেনকো রাজতিলক দিয়ে
কিয়ে মথুরাকে ভূপালা॥

(২) জয় গোবিন্দ মাধব গিরিধারী।
গিরিবরধারী গোবর্দ্ধনধারী॥
কেলি কলারস মনোহারী॥
শ্রীবৃন্দাবনমে চন্দ্র চিকনিয়া
ললিত বিশাখা চিত হিতকারী।
নন্দনন্দন ত্রিজগত বন্দন
গোবিন্দ গোকুল বনচারী॥

(৩) হরত সকল সন্তাপ জনমকোঁ।
মিটত তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে মদনগোপাল কি॥
গোঘৃত রচিত কপূরক বাতি
ঝলকত কঞ্চনথাল কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী বাজত
বেণু বিষাণ কি॥
চন্দ্র কোটি জ্যোতি ভানু কোটি ছবি
মুখশোভা নন্দলাল কি।
ময়ুর মুকুট পীতাম্বর শোহে
উরে বৈজয়ন্তি মাল কি॥
সুন্দর লোল কপোলক ছবি সোঁ
নিরখত মদনগোপাল কি।
সুরনর মুনিগণ করতহিঁ আরতি
ভকতবৎসল প্রতিপাল কি॥

এই ভাষা হিন্দী, কিন্তু বিদ্যাপতি অথবা মিথিলার কবি গোবিন্দদাস এ ভাষায় গীত রচনা করিবেন না। ব্রজবুলি নামে কোনকালে কোন বুলি ছিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মুকুলিকা

বসন্তে বকুল বনে দেখিনু তোমারে,
পুষ্পপাণি রূপরাণী মোর মুকুলিকা,
ফোট ফোট ছোট ফুল কানন-যূথিকা;
কুটিল কবরী গাঁথা মুকুতার হারে।

কুমুদ-কোমলকান্তি--মধুর অধরে,
লঘু হাসি মুকুতার রূপরশ্মি-রেখা,
নত আঁখি মুখচ্ছবি আধ যায় দেখা
কটাক্ষ-বিদ্যুৎ-বিভা অপাঙ্গে সঞ্চরে।

সন্ধ্যার মায়ার মাঝে প্রেমস্বপ্ন মম,
দেখা দিল আধ আধ আলোক-আঁধারে;
আধ-গাঁথা ফুলমালা, চারু চিত্রাকারে
চিত্রা নক্ষত্রের ছবি—ঋষি স্বপ্নসম।

চিনিনু হৃদয়-রত্ন তুমি মোর প্রিয়া,
সাঙ্গ-সঙ্গীতের সুর—চির মোহনিয়া।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
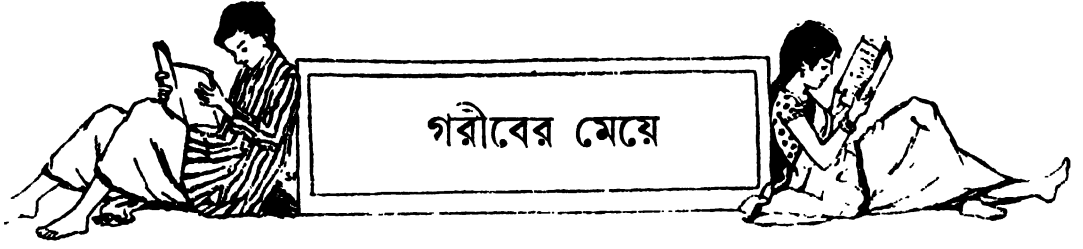
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কুলের ছুটীর পর সকল মেয়ে যখন হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীর চারিপাশে জড় হইয়াছে, একে একে বা এক সঙ্গেই দুই-জনে লাফালাফি করিয়া আগে উঠিবার চেষ্টায় সোরগোল লাগাইয়া দিয়াছে; বারান্দার উপর হইতে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী তখন ডাকিয়া বলিলেন, "নীলিমা! শুনে যাও।"

নীলিমার মুখ একটুখানি ম্লান হইয়া আসিল। সুলোচনাদি' কি জন্য যে তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কথা তার ত অজ্ঞাত নয় এবং এরূপভাবে আহ্বান পাওয়াও তার পক্ষে এই প্রথমবার নহে। ফিরিয়া আসিয়া সে নতমুখে দাঁড়াইল।

সুলোচনা বসু বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী হইলেও একণে প্রতিনিধিত্বে প্রধানার পদ অধিকার করিয়া আছেন. নীলিমা কাছে আসিতেই নিজের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বাবাকে চিঠি দিয়েছিলে?"

নীলিমা নতনেত্রে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, দিয়াছে।

"কি বল্লেন?"

নীলিমার কপালে একটু একটু ঘাম দেখা দিল। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা বলিবার শক্তি বা সাহস তাহার প্রাণে থাকিলে তবে ত সে বলিবে! আবার মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিবার অভ্যাস বা শিক্ষা, তাহাও সে কোন দিন পায় নাই। কাযে কাযেই অত্যন্ত বিপন্ন ও বিমর্ষভাবে সে পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁটিতে লাগিল, মুখ দিয়া তাহার একটি শব্দও বাহির হইল না।

তিনি যে কি বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর এর চেয়ে আর বেশী সরলভাষায় পাওয়া সম্ভব ছিল না, সুলোচনাও তাহা বুঝিলেন। তাই মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও বাহিরে তিনি আর এই বিপন্ন জীবটিকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; শুধু স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, "প্রায় তিন বৎসর তুমি এখানে ভর্ত্তি হয়েছ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তোমার মাহিনার দরুণ একটি পয়সাও কখন পাইনি। বেশী পীড়াপীড়ি হ'লে পাছে তোমায় ছাড়িয়ে নেন, সেই জন্য মায়া ক'রে আমরাও তাঁকে তার জন্য বড় একটা ব্যস্ত করিনি, সে ত তুমি সব জানো? কিন্তু এখন আর কারুকে ফ্রি রাখা সম্ভব হচ্ছে না, স্কুলের গবর্ণমেণ্ট 'এড্' প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে। নানা রকমে খরচ বেড়েছে, সেইজন্য সকল ক্লাসের মেয়েদেরই কিছু কিছু মাইনে বাড়াতে হলো। যে সব টাকা অনাদায়ী হ'য়ে পড়ে আছে, সে সব আদায়ের জন্য উপর থেকে হুকুম এসেছে। এ সব না হ'লে আমাদের চাকরীতে টান পড়বে, এমন সম্ভাবনারও আভাস এবার ইন্‌স্পেকট্রেস মিস্ বিল দিয়ে গেছেন। তোমার বাবাকে সব কথাই লেখা হয়েছিল, তাতেও ত তিনি দিব্যি নীরব হয়ে রইলেন। তা হ'লে আর কি করা যাবে বলো? এই চিঠিটা আবার আজ দাওগে, পনের দিনের মধ্যে হয় অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা পাওনা দিয়ে দিন, না হয় ত তোমাকে আর কেমন ক'রে চিরদিন ধ'রে এমনিতে পড়ান যায়? এটা অন্যের পক্ষে বড্ডই ব্যাড এক্‌জাম্‌পল হচ্ছে, অর্থাৎ কি না দৃষ্টান্তটা ভাল হচ্ছে না। বুঝ্‌তে পার্‌লে?"

নীলিমার দুইটি চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছিল, পাছে সে জল প্রভাতকালের শিশিরের মত মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজেকে সংবরণ করিতে করিতে কোনমতে একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে বুঝিয়াছে। তার পর অন্যদিকে মুখ করিয়া সে হাত পাতিয়া সুলোচনা-প্রদত্ত খামে আঁটা চিঠিটা লইল।

নীলিমার সঙ্গিনীগণ তাহার হাতের খামখানায় কি লেখা আছে, দেখিবার জন্য তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। "দেখি, দেখি, আজ আবার কার নামের চিঠি এলো? 'অনুকূলচন্দ্র

চক্রবর্ত্তী এস্কোয়ার'। অ ভাই! রোজ রোজ সুলোচনাদি' তোর বাবাকে কি লেখেন, ভাই? কই আমাদের বাবাদের ত কই কিচ্ছু লেখেন না!"

মনোরমার সেই ডুইকাঠির বোনাটা এখন অনেকখানি লম্বা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য এখন সেটাতে ন্যাকড়া জড়াইয়া পিন আঁটিয়া প্যাচাইয়া রাখা হইয়াছিল। গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বোনাটা হাতে লইয়া প্রথম প্রশ্ন কারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িল, "মালতী যেন কি! তোর বাবা গবর্ণমেণ্টের উকীল, মাসে ছ' হাজার টাকা রোজগার করেন, তোর স্কুলের মাইনে কি কখন দিতে বাদ পড়ে যে চিঠি যাবে?"

প্রতিমা অমনি টানা সুরে ঘাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা, ভাই! সেইজন্যেই সুলোচনাদি' বারান্দা থেকে যখন নীলিমা ব'লে ডাকলেন, তখনই নীলির মুখটি শুকিয়ে যেন এতটুকুখানি হয়ে গিছলো। তুমি নিশ্চয় তখনই বুঝ্‌তে পেরেছিলে, না নীলিমা?"

নীলিমা নীরবে একটা ঢোক গিলিল, কথা কহিল না।

মনোরমা তাহার ছোটবোন প্রতিমার দিকে তীব্রদৃষ্টি করিয়া ক্ষুরবাণের মত তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "পিমী, কি যে বলে! ও আর তা বুঝতে পারেনি! এই ত আর প্রথম-বার ওর হাত দিয়ে ওর বাবার কাছে তাগিদের চিঠি পাঠান হয়নি যে, ওর বুঝ্‌তে বাধ্‌বে! ও ত, ও, আমিও ত যেই সুলোচনাদি' ওকে ডেকে বলেচেন, 'নীলিমা শুনে যাও'—তক্ষুণি বুঝ্‌তে পেরেচি যে, কি জন্যে তিনি ডাকচেন।"

অম্বুকা বলিল, "আমিও ভাই।"

সাবিত্রী সকলের পিছনে ছিল, সে সেখান হইতে মুখ বাড়াইয়া দিয়া বজ্রপাত তুল্য কঠিন স্বরে নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল, "তা নীলিমা! তোমার বাবাকে তুমি স্কুলের মাইনেটা দিয়ে দিতে বল্‌তে পার না? সত্যিই ত বার মাস তিরিশ দিন ওঁরা কি তোমায় ফ্রি'তে পড়াবেন না কি? কি অন্যায় তোমাদের!"

শুনিয়া দুই একজন মেয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিয়া ঈষৎ হাসিল, কিন্তু মনোরমা মেয়েটি নাকি কাহারও কোন অসৈরণ সহিতে অভ্যস্তা নহে, কাযেই সে খপ্‌ করিয়া অমনি বলিয়া বসিল, "সত্যি নাকি, সাবি! অন্যায় কি? তা হ'লে তোমার দাদামশাই সেই অন্যায় কি ক'রে করে থাকেন, ভাই? আমি এই সে দিন সুলোচনাদি'র সঙ্গে রামদীন চাপরাসীর কথা হচ্ছিল শুনেছি, সে তোমার সাত আট মাসের মাইনে আদায় করতে বেচারী যোগখেটে যাচ্ছে।"

তখন দলপতিকে (পত্নী?) ফিরিতে দেখিয়া ছাত্রী সমিতির হাওয়া বদলাইয়া গেল। সুষমা বলিয়া উঠিল "আর ও বেচারী তার বাপকে কেমন করেই বা টাকার জন্য তাগিদ দেবে, ভাই? সে বরঞ্চ সুলোচনাদি'রাই পারেন।"

সাবিত্রী মেয়েটি মেয়েদের স্কুলের মধ্যে নাকি কলহ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী।—তবে এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ অবশ্য এ পর্য্যন্ত সে করিতে পারে নাই। তাহার কারণ, ওই বিষয়ে স্কুলে কোন প্রাইজ এখন পর্য্যন্ত দিবার ব্যবস্থা ছিল না, থাকিলে মনোরমার পরিবর্ত্তে বোধ করি সে-ই পাইত। তবে 'ব্র্যাকেটে' পাশ করাও অসম্ভব ছিল না। কারণ, হাঁক-ডাক কম থাকিলেই যে নৈপুণ্যের অভাব বুঝায়, তাহা নহে। বরং টিপিয়া টিপিয়া চোখা চোখা শরক্ষেপ করিতে জানাতেই পটুত্ব সমধিক বুঝায়। এখন মনোরমার মন্তব্য শুনিয়া বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে চোখ গোল করিয়া পাকাইয়া সাবিত্রী যেন বাঘের মত তাহার শত্রুপক্ষের উপর হুমকি দিয়া উঠিল, "বলি মোনা! তোর যে বড্ডই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে দেখ্‌তে পাই? আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের মাইনের টাকা ইস্কুলকে দেয় বা না দেয়, তাতে তোর কি আসে যায় শুনি? তুই যা খুসী তাই ট্যাক্‌ ট্যাক্‌ ক'রে বলবি ক্যান্‌লা? ফের যদি কখন আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আসবি তা হ'লে—"

"কি, মারবি না কি? সুষমা, লীলা, অম্বুকা সব্বাই সাক্ষী থাকলি, এর যদি না আমি প্রতীকার করি তা হ'লে—"

এইরূপ সলজ্জ আস্ফালনে পথের দুই সারি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে করিতে নেপথ্যচারিণীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখী হইলেন।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যদিও সে সময়টা অনুকূলচন্দ্রের বাড়ী থাকিবার সময় নয়, তথাপি কি ঘটিতে কি ঘটে, দৈবের কথা বলাও ত যায় না, তাই বাড়ী ঢুকিয়া নীলিমা সতর্ক চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল ও তাহার পর কতকটা আশ্বস্তচিত্তে ঈষৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে ডাকিল, "মা !"

"এস, মা, এস।"—বলিতে বলিতে ক্ষীণাঙ্গী ক্লান্তমূর্ত্তি জননী তাড়াতাড়ি হাতের কায ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে বসান যাঁতায় চারিটি গম লইয়া স্বামীর রাত্রিতে রুটী খাওয়ার জন্য আটা পিষিতেছিলেন।

"এস, মা, এস,—আহা, মুখটি শুকিয়ে গেছে রে! সারাদিনটাই উপোসে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে রান্নাঘরে আয়, চারিটি ভাত শেষ ক'রে ফুটিয়ে রেখেছি, একটু দুধ-চিনি দিয়ে খাবি, চল্।"

নীলিমার পেটের মধ্যে যে রকমের জ্বালা ছিল, তাহাতে তাহার অপমানাহত ক্রুদ্ধমন এই শুভসংবাদেই জুড়াইয়া জল হইয়া যাইতে পারিত ; কিন্তু উপর্য্যুপরি ক্রমাগত তিরস্কার ও বিদ্রূপ সহিয়া সহিয়া আজ তাহার পূর্ণ উপবাসী শরীর-মন বড় বেশী রকম তাতিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে মায়ের দেওয়া সুসংবাদকে আমলে না আনিয়াই উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "যাও, আমি তোমার দুধ-ভাত খেতে চাইনে ; আমার ইস্কুলের মাইনে তোমরা দেবে কি না, এখন তাই স্পষ্ট ক'রে বলো ?"

স্বর্ণলতার ভয়াচিত্ত গুটাইয়া যেন এতটুকু ছোট হইয়া আসিল। মেয়ের মনের মধ্যে কিসের যে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া তিনি অপরাধিভাবে মাথা নত করিলেন। এই যে প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইল, তাহার স্পষ্ট ছাড়িয়া অস্পষ্ট একটা জবাবও তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইল না।

নীলিমা তাহার হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া অভিমান-বেদনা-ছলছল চোখে মা'র পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "সুলোচনাদি' আমায় রোজ রোজ বকছেন, রাগ করছেন, আজ বলেছেন, এবার যদি না মাইনে পান, তা হ'লে আমায় ইস্কুল থেকে নাম কেটে দেবেন। কেন তোমরা আমার মাইনেটা দিয়ে দিচ্ছো না বল তো? শুধু শুধু আমায় সব্বাইকার কাছেই খোঁটা খেতে হয়। তুমি বাবাকে কেন এ কথা ভাল ক'রে বলো না ?"

স্বর্ণলতা এইবার তাঁহার বিষণ্ণ মুখ তুলিলেন,—"বলেছিলুম রে! উনি বল্লেন, অনেক টাকা হয়ে গেছে—অত টাকা তাঁর নেই, কেমন ক'রে দেবেন ? এত দিন যেমন ওঁরা দয়া ক'রে পড়িয়ে এসেছেন, এখনও যদি সেই রকমই তোর মুখ চেয়ে আরও একটু—"

নীলিমা মায়ের এই মৃদু সঙ্কুচিত করুণ কথা কয়টিতে জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে বাধা দিল—"চাইনে আমি অমন দয়া ভিক্ষা করতে! যদি স্কুলের মাইনেই দিতে পারবে না, তবে কেন তোমরা আমায় সব্বাইকার কাছে ছোট করবার জন্যে স্কুলে দিয়েছিলে ?"—বলিতে বলিতে অঝরঝরে কাঁদিয়া ফেলিয়া নীলিমা তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল।

স্বর্ণলতা বিষণ্ণমুখে রান্নার পিঁড়িতে বসিয়া একখানি মেটে পাতরে করিয়া চারটি ময়লা রঙ্গের মোটা ভাত বাড়িতেছিলেন, শুভেন্দু 'মা' বলিয়া ডাক দিয়া ঘরে ঢুকিল।

"হুঁ ; তাই তো বলি যে, মুখপুড়ী মেয়েটা কি খেয়ে খেয়ে অত মোটাচ্ছে! আর আমিই বা তাই খেয়ে দিনকের দিন শুকুচ্ছি কেন ? এর ভেতরে মস্ত বড় একটা ঐতিহাসিক রহস্য আছে! তাই না ? দাও দিকিন্, ও ভাতকটা দুধ দিয়ে আজ না হয় আমিই খেয়ে যাই! বাঃ বাঃ, আবার যে একটা কাঁচকলা পাকাও জমিয়ে রাখা হয়েছে, দেখচি। ওঃ দিব্যি হবে এখন। দিয়ে ফেল আজকের মত এ সব এই অপাত্রকে, পেট আমার খিদেয় জলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আবার এখুনি যাব জগা মণ্ডেদের সঙ্গে ফুটবল-ম্যাচ খেলতে।"

শুভেন্দু ধপ্ করিয়া নীলিমার জন্য পাতা কাঠের পিঁড়িখানায় বসিয়া পড়িয়া আগ্রহব্যগ্রহস্তে ভাতশুদ্ধ পাতরটা নিজের কোলের কাছে চট করিয়া টানিয়া আনিল। এইরূপে উহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়া দুগ্ধ নামে আখ্যাত নীলবর্ণের জলবিশেষকে কোন মতে ভাতের উপর ঢালিয়া আয়োগন্ধ কদলীযোগে তাহা পরম পরিতোষে মাখিতে লাগিয়া গেল।

"কই, চিনি কোথায় ? ওইটুকু নুণের মতন চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায় ? নিজেদের আদুরে

মেয়ের জন্যে চুরি ক'রে রাখা হলো বুঝি? দাও দাও বার ক'রে দাও। ভাল হবে না বল্‌ছি, হঁ্যা!"

স্বর্ণলতা চিনির কৌটাটা পাতের উপর উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া দিয়া দুঃখিত স্বরে, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আর ত নেই, বাবা, ওই দিয়েই খেয়ে নাও, লক্ষ্মীট।"

"ও সব খোসামোদের কথার ধার ধারিনে;—নেই কি! আলবৎ আছে। তোমার স্কুলে-পড়া গাড়ীচড়া মেয়ে কি না ওইটুকু চিনির টাকনা দিয়ে খেতে পার্‌তো? দাও বল্‌ছি শীগ্‌গির, না হ'লে এই রইলো তোমার ছাইপিণ্ডি ভাত পড়ে! মেয়ে খেতে পেলে না ব'লে রেগে গেছ ত? সেই সোজা কথা, তা থাক, তোমার সেই বিদুষী মেয়েরই থাক্; পচা নর্দমায় ফেলে লোকসান কর্‌বার দরকারটা কি!"

তড়বড় করিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে শুভেন্দু সত্য সত্যই মাখাভাত পাতর শুদ্ধ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেল, এবং মায়ের বুকফাটা কাতর করুণ আহ্বান কানে না তুলিয়াই সে গুম গুম শব্দে পা ফেলিয়া দালান পার হইয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

নীলিমা নিজের দুঃখ অভিমানে অভিভূত হইয়া গিয়া মায়ের সঙ্গে যেটুকু কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, মা'র কাছ হইতে সরিয়া আসিয়াই সে তাহার জন্য ভীষণভাবে অনুতপ্তও হইয়া পড়িয়াছে। মা যে তাহার কত বড় অসহায়, সে কথা বালিকা সম্পূর্ণভাবে না বুঝিলেও স্বামীকে তিনি যে কতদূর ভয় করিয়া চলেন, সে কথাটা যে তাহাদেরও অজ্ঞাত ছিল না। পিতা না দিলে মা আর কেমন করিয়া তাঁহাকে দিয়া দেওয়াইবেন। এই কথা মনে হইতেই তাহার মনে হইল, মা'র মনে সে আজ শুধু শুধু কষ্ট দিয়াছে। মা তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিতে চাহিলেন, আর সে কি না 'খাইতে চাহে না' বলিয়া তাঁহার সে যত্নের অবমাননা করিয়া চলিয়া আসিল! অপরাধীর মত সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া সে নিঃশব্দপদে নীচে নামিয়া আসিল। লজ্জা মনে বড়ই জ্বালা দিতে লাগিল, সে খাইতে চাহে না বলিয়া আবার তখনই কিনা খাইতে চলিয়াছে! মনকে জোর করিল, বলিল, "হোক গে, মা খুসী হইবেন" কিন্তু রান্নাঘরের কাছাকাছি যাইতেই তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শুভেন্দু সোৎসাহে ভাত মাখিতে মাখিতে উৎফুল্লকণ্ঠে বলিতেছে—"কই চিনি কোথায়? অতটুকু নুণের মত চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায়?"

আবার তেমনই করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নীলিমা উপরে উঠিয়া আসিল; মনে মনে ভাবিল, "যদি আমি এখন খেতে গেলে দাদার কম প'ড়ে যায়! থাক, আগে ওর খাওয়া হয়ে যাক্, তখন ওর পাতেই খাবো।"

সে জানিত, তাহার মা নিজের ভাগের চাল দু'টি দু'টি করিয়া প্রতিদিন একটা ভাঁড়ের মধ্যে জমা করেন এবং মুটাখানেক জমিলেই এক দিন তাহাদিগকে বিকালের পাঁপর পোড়া বা ভুট্টাভাজার বদলে ভাত রাঁধিয়া দেন। সে ক'টি ভাত দুইজনে খাইতে গেলে কাহারও আধপেটাও হয় না।

উপরে আসিয়া এবার সে তাহার নিত্যকার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে মনোনিবেশ করিল; কিন্তু মা'র তখনকার সেই বিষন্ন নিরুপায় মুখচ্ছবি মনে করিয়া তাহার মনটা বেশ সহজ হইতে পারিল না। তাহার উপর সারাদিনের উপবাসে শরীরেও যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টির জন্য কাপড়-চোপড় ঘরে-বারান্দায় করিয়া টাঙ্গান ছিল, সে সব খুলিয়া যেগুলি শুষ্ক, সেগুলি আল্‌নায় রাখিয়া ভিজা সেঁৎসেঁতে কয়েকটা লইয়া ছাদে উঠিল, কিন্তু সেই সাবিত্রী পাহাড়ের সিঁড়ির মত উঁচু উঁচু সিঁড়ি উঠিতে সে দিন তাহার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকদিনের পরে আজ মধ্যাহ্ন হইতেই বৃষ্টি থামিয়াছে। বেলাও অনেকখানি কাটিয়া আসিয়াছিল। বিশাল আকাশের সর্ব্বত্রই যদিও নির্ম্মেঘ হইতে পারে নাই, তথাপি আশে-পাশে যে সকল খণ্ডমেঘ লঘু ত্রস্তগতি লইয়া ইচ্ছা-সুখে ভাসিতেছিল, তাহারা কোন জাগতিক জীবের ভয়-প্রদ নহে; তাহা উহাদের শান্তমূর্ত্তিই সপ্রমাণ করে। মেঘের বিরাট প্রাচীর টুটিয়া যাওয়াতে বারিধৌত প্রসন্ন জগতের বক্ষে অম্লান রজত কৌমুদীরই সমতুল্য শীতের প্রফুল্ল সূর্য্যকর যেন স্মিতহাস্যে সকলকে অভিনন্দন জানাইতেছিল। দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর অট্টালিকায় সর্ব্বত্রই এই চির অতিথির আগমনী উৎসব চলিতেছে।

নীলিমা কাপড় কয়টা ছাতের প্রাচীরের উপর মেলিয়া দিয়া খানিকটা দূরের একটা বাড়ীর ছাতের দিকে

ড়িয়া ছিল। সে বাড়ীটা অমুকাদের। সে দেখিতে পাইল, ...তের উপর অমুকারা তিন ভাই-বোনে কমলালেবু হাতে খাইতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার মা একটা ছোট ডালায় ভরিয়া আঙ্গুর, আপেল ও কমলালেবু তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেছেন। বুকের কাছে একটা নিশ্বাস আচম্‌কা জমিয়া উঠিতেই সে চমকিত হইয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। তাহার ক্ষুৎপিপাসাতুর বুভুক্ষু দেহ-মন কি অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষ্যা করিতেও আরম্ভ করিল নাকি? পরের সুখ দেখিয়া লোভ করিবে না, এ কথা প্রাণপণে মনে করিতে করিতেও কিন্তু তাহার বিবেকের সহস্র নিষেধ না মানিয়াই তাহার অতৃপ্ত নিরানন্দ মন অকস্মাৎ মনে করিয়া বসিল, —সেও যদি অমুকারই আর একটি বোন হইয়া জন্মিত!

সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখখানি মনশ্চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিল। কি শান্ত, কি কোমল, আর কি করুণ সে মুখ! উঃ, নীলিমা কি নিষ্ঠুর!—ও-ই মাকে কিনা সে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়া মনে করিতেছে যে, সে যদি অন্য মায়ের মেয়ে হইত ত বেশ হইত! কেমন করিয়া এমন কথা সে মনেও করিতে পারিল? সে যদি না তাহার মায়ের মেয়ে হইয়া জন্মিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি হইত, কে বলিতে পারে? হয় ত অন্য মায়ের কাছে তাহার সুখ কিছু বেশী হওয়াও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু তাহার মায়ের কি হইত? মা'র মুখ চাহিতে ত কেহই থাকিত না! এ কথা ভাবিতে গিয়া তখন আবার মনে পড়িয়া গেল যে, সেই বা তাহার মায়ের মুখ এমনই কি চাহে? এই ত সে মায়ের আদর করিয়া ভাত খাইতে ডাকার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে দশটা কথা শুনাইয়া দিয়া অনায়াসে চলিয়া আসিয়াছে। মা'র প্রাণে তাহার এই ব্যবহারে কতখানি ব্যথা বাজিতে পারে, সে কি তাহা একবারও ভাবিতে পারিয়াছিল? কিন্তু যদি তাহার ওই মা-ই আবার ওবাড়ীর ঐ অমুকার মায়ের মত তাহার মুখের সামনে আঙ্গুর-আপেলের ডালা ধরিতে পারিতেন? সে কি প্রত্যাখ্যান করিয়া মা'র প্রাণে আঘাত দিতে পারিত? লোভ!—হায় রে লোভ! মায়ের স্নেহটা তাহা হইলে আসল জিনিষ নয়? সন্তান তাঁহার নিকট হইতে প্রগাঢ় ভালবাসার অপেক্ষা উত্তম অশন-বসনেরই আকাঙ্ক্ষা অধিকতর করে? নিজের প্রতি ঘৃণা বোধ হইল। অমনই সে মা'র কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

"কি গো বিবি সাহেব! হাওয়া খাওয়া আর শেষ হলো না?"

দাদার এই স্নেহসম্ভাষণে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া নীলিমা মুখ ফিরাইল—"তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল দাদা?"

শুভেন্দু পূর্ব্ববৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, "ওগো না গো না, ভয় নেই, তোমার অন্নের আমি হস্তারক হইনি। যাও, সব ঠিক করাই আছে, কৃপা ক'রে মুখে তুলে দিয়ে এস গে যাও।"

নীলিমা কথার ভাবে দাদার মনের খবর জানিতে পারিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি খেলে না কেন, দাদা? যাও, তুমি খেয়ে এস, আমার একটুও আজ ক্ষিধে নেই, বড্ড মাথা ধরেছে।"

শুভেন্দু বলিল, "আহা, মাথা ধরেছে! ম'রে যাই, প'ড়ে প'ড়ে বোধ হয়? এসো, বিছানা পেতে দিই গে শোবে এসো! মাথায় গোলাপ জলের পটী বেঁধে দেবো? হাওয়া কর্‌বো নাকি?"

এই বিদ্রূপের খোঁচা খাইয়া অভিমানে চোখের কোল ভর্ত্তি হইয়া উঠিলেও নতমুখে তাহা সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিয়া নীলিমা মিনতি করিয়া কহিল, "কিছু কর্‌তে হবে না। লক্ষ্মীটি! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে এস।"

"হুঁ! আমি খেলে কি হবে? বরং তুমি খাও গে যে, মাথার মগজে একটু ঘি হবে। আ মলো! মুখপুড়ী মেয়ে আবার ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন, কাঁদ্‌লি ত বড় আমার বয়েই গেল! তোর সখ হয়েছে, তুই কেঁদে মরগে যা; তাতে আমার কি? হুঁ, বুঝেছি! ও কি আমায় খাওয়াবার জন্যে কাঁদ্‌ছিস্! মনে করেছিস্, ওই রকম প্যান প্যান কর্‌লে আমি রেগে মেগে চলে যাব, আর তখন মজাসে খুব খানিক গুড়-চিনি মেখে নিয়ে গব্‌গবিয়ে ভাতগুলো সব খাবি।—ঐ রে! কেপ্পন বুড়ো ঐ গলির মোড় ফির্‌লো! বাড়ীর দিকেই ত আস্‌চে না? পালাই।"

শুভেন্দু তিন লাফে সিঁড়ি নামিয়া খিড়কীর দ্বারের দিকে ছুট দিল। আর পথের উপর বাপকে দেখিতে

পাইয়া একসঙ্গে ছুইটা বিপদের সম্ভাবনা একত্র মনে উদিত হইয়া নীলিমাকেও ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথমতঃ বাড়ী ঢুকিয়াই তাহার পিতা একবার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সারাদিনের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ রান্নাঘরে না গেলে তাঁহার মন স্থিরই হয় না। যদি ইহারা মায়ে মেয়েয় ও ছেলেয় মিলিয়া সেখানে তাঁহার সকল সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বিশেষ ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া থাকে, তাহারই 'ডিটেকটিভি' তাঁহাকে প্রতিদিনই করিতে হইত এবং এই উদ্দেশ্যেই এক এক দিন অকস্মাৎ অসময়ে কর্ম্মস্থান হইতে চলিয়া আসিতেও হয়। আর যখন তিনি ঐ ছুধমাখা ভাত ও রন্ধনকারিণীকে একত্র ঐ স্থানে দেখিতে পাইবেন, তখনকার সেই দৃশ্য মনে করিতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। ছুটার দিনে বাড়ী থাকিলে সে দেখিয়াছে যে, তাহার মায়ের ভাত আজকাল খুবই কম থাকে। যদিও সে অনুযোগ করিলেই তিনি অক্ষুধার দোহাই পাড়িয়া থাকেন, তবুও নীলিমার মনে সন্দেহ হয় যে, ওই যে মধ্যে মধ্যে তাহাদের ছুই ভাই-বোনকে তিনি ভাত রাঁধিয়া খাওয়ান, তাহারই জন্য তাঁহার ঐ অক্ষুধাটুকু দেখা দিয়াছে এবং ফলে জীর্ণদেহ অধিকতরই শুষ্ক হইতেছে। এবার হয় ত অপব্যয়ের চাউল বাঁচাইতে গিয়া পিতা তাহার জন্য অর্দ্ধাশনেরই ব্যবস্থা করিয়া বসিবেন! তখন তাহার এই প্রথম চিন্তাটাকেই প্রবল করিয়া তুলিয়া স্কুলের মাহিনার বিষম চিন্তাটাকে কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সে নিজের মনকে যেন কশাঘাত করিয়া ভাবিল—এই আমি! মা'র মনে কষ্ট দিলেম, মা'কে আবার বকুনি খাওয়াব, তাহার উপর মা'র ভাতেও টান পড়িবে! না না, আমি আর কারুকে চাইনে, আমার মায়ের মেয়েই যেন আমি থাকিতে পাই।

উদ্বেগে শঙ্কায় অধীর হইয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

"মা, মা, বাবা আসছেন। কি হবে, মা?"

স্বর্ণলতার নিজের মুখ এ সংবাদে শুকাইয়া গেলেও তাঁহার এতক্ষণকার মনঃকষ্টের কাছে তাহাও যেন তাঁহার কাছে ছোট হইয়া গেল। তাঁহার চিরাভ্যস্ত অটুট ধৈর্য্যের সহিত তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে মেয়েকে কহিলেন, "তুমি খেয়ে নাও, নীলা! আমি ওদিকে যাচ্ছি কি আর হবে, তোমায় কিছু বল্‌বেন না।"

স্বর্ণলতার আজ কাহার মুখ দেখিয়া যে রাত্রি পোহাইয়াছিল, বলা যায় না; নহিলে আজ এমন অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় কাণ্ড কখন ঘটে!

"গিন্নি! ওগো ও, বলি কোথায় গো!" এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্লান্ত শীর্ণ চরণকে যতখানি সম্ভব দ্রুত করিতে চাহিয়া গৃহিণী স্বর্ণলতা বলিদানোদ্দেশে আনীত জীববিশেষের মতই কম্পিতকলেবরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নিজের জন্য ভয় যত না হইতেছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবনা হইতেছিল—নীলিমা হয় ত এই সব গোলমালে মাখা ভাত কয়টা খাইয়া উঠিতেই পারিবে না। শুভেন্দুর কথা মনে হইয়াও একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল ও পড়িল। না খাইয়া, কোলের ভাত ফেলিয়া ছেলেটা চলিয়া গেল, সহসা অতিমাত্রায় বিস্মিত ও চকিত হইয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার রুক্ষমেজাজী স্বামী তাঁহার সহিত একি আবার রসিকতা করিতেছেন নাকি?

"ও গিন্নি! নেমন্তন্ন খেতে যাবার জন্যে যে বড্ড জোর তাগিদ এসেছে, বলি, খেতে যাবে, নাকি? তা হ'লে তল্পিতল্পা সব বেঁধে ছেঁদে নাও গে।"

নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ অবাক হইয়া স্বামীর দন্ত-বিকসিত আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনুকূলচন্দ্র হাতের নোটের তাড়া দেখাইয়া তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না! একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি আর কি! সত্যি গো, মাইরি বল্‌ছি, তোমার সঙ্গে আমি রঙ্গ কর্‌ছিনি। তোমার সেই ভুবন রায়কে মনে আছে, সেই যে একবার ক'বছর আগে এসে গোড়াকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল না? সে-ই তোমাদের যাবার জন্যে অনেক ক'রে চিঠি লিখেছে, আর এই টাকাগুলো পাঠিয়েছে গাড়ীর ভাড়া ব'লে। সব্বাইকার সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া! উঃ, কত টাকাই ওরা বাজে খরচ করে যে! আহা, মনে একটু দরদও করে না?"

'উড়নচড়ে' লোকগুলার আশ্চর্য্য অপব্যয়শক্তির কথা স্মরণে আসিতেই 'মিতব্যয়ী' অনুকূলের ললাট অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেইক্ষণেই আবার যেমনই মনে

...গেল যে, সেই অপব্যয়িত টাকাগুলা উড়িয়া তাঁহা... লোহার সিন্দুকের 'দোরগোড়ায়' আসিয়া পড়িয়াছে, ...এবং এ ক্ষেত্রে সেই অমিতব্যয়ী লোকরা তাঁহার আশী-...-ভাজনই হইতে পারে, অমনই তাঁহার গলার স্বর ...রিয়া গেল :—

"তা ভালই করেছে ; অনেক হয়েছে, একটু আর খরচ-পত্র করবে না! আমাদের মত ত আর পাতরচাপা কপাল ক'রে আসেনি, দিচ্ছেন অঢেল, ছড়িয়েও ফেলবে তেমনি দুহাতে। তা দেখ, গিন্নি! তোমরা আর এই দুরন্ত শীতে কোথায় যাবে? আমিও ত আর কায-কর্ম্ম ফেলে যেতে পারবো না, ক্ষেত-খামারটুকু করেছি, রবিগুলো নষ্ট হবে। পাঁজার ইটে আগুন দেওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে ত চলবেই না। তার পরে মধু মিস্ত্রীর সুদটা উশুল করা নেহাৎ দরকার হয়ে পড়েছে। আয় নেই যেন একটি পয়সা, কিন্তু 'ঠাঁটা'টুকু ত ষোল আনার উপর আঠারো আনাই পোহাতে হচ্ছে। তা দেখ, আমি বলি কি, ওর জন্যেই পাগল ত, গোঁড়াকেই না হয় পাঠিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমরা থেকে যাও। গাড়ী ভাড়ার টাকাটাও তা হ'লে কিছু বেঁচে যাবে। আর গোঁড়ার এই বয়সে অত বিলাসিতা ত আর ভাল নয়, তাকে একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়ে দিলেই চলবে। কি বল?"

স্বর্ণলতা ঈষৎ ব্যগ্র হইয়া ঘাড় নাড়িলেন, "হুঁ" পর-ক্ষণেই কি ভাবিয়া লইয়া এই অবসরে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াই কোনমতে বলিয়া ফেলিলেন—"ওই টাকা থেকে তা হ'লে নীলার ইস্কুলের মাইনেটা চুকিয়ে দিলে হয় না? ওরা রোজ রোজ বড্ডই তাগিদ দিচ্ছে, বলছে—"

অনুকূলের 'দন্তরুচি' আবার 'কৌমুদী' ছড়াইয়া বিক-শিত হইল, কিন্তু এবার আর তাহা আনন্দে নহে। ইস্পাত শাণে ঘষিলে যে রকম শব্দ জন্মায়, সেই ধ্বনির অনু-করণে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "কি বলছে, শুনি?"

স্বর্ণলতার দুর্ব্বল হৃদ্পিণ্ড 'ধ্বকাধ্বক' করিয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল, তিনি কোন মতে গলা সাফ করিয়া লইয়া উত্তর দিলেন, "কালকের মধ্যে মাহিনে না পেলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে।"

অনুকূল এবার দাঁতে দাঁতে একটা বিকট ঘর্ষণশব্দ করিয়া বলিলেন, "ছাড়িয়ে দেবে, বটে! দেবে কেন, আমি নিজেই আমার মেয়েকে ওদের ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবো। আর শুধু তাই নয় ; সকল মেয়েই যাতে ওদের স্কুল ছেড়ে ও বেটীদের দেশছাড়া করে, তারির জন্যেই আজ থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করবো! ইস্কুলে মেয়ে দিইছি, তাই কত না, এতেই ভাগ্যি ব'লে মেনে নে; আবার তার জন্যে দু'টাকা ক'রে মাইনে দেবে না কচু করবে! আহ্লাদ দেখে আর বাঁচিনি যে!"

পাছে তাহাদের নজর লাগে—এই ভয়ে কর্ত্তা টাকা-গুলিকে সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। সেগুলিকে লইয়া চলিয়া যাইবার অভিলাষে ফিরিতে গিয়া কি মনে হইল, ফিরিয়া মুখ খিঁচাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আর তুমি মাগীও ত বড় কম সয়তানী নও! যেই এই ক'টা টাকা দেখতে পেয়েছ, অমনি ঐ বিবি নাইটিঙ্গেল মেয়ের জন্যে ওর উপর চোখ প'ড়ে গ্যাছে! আরে বাপু! এই টাকা-গুলি অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে যদি রাখতে পারি, মধু মিস্ত্রীকে যদি সাড়ে তের টাকা সুদেও কর্জ্জ দিয়ে রাখতে পারি, তবে না তোমাদের বার মাসের কুঁড়ো চারটি যোগান দেবো। বলে কি না, মেয়ের ইস্কুলের মাইনে দাও! মেয়ের উপর যদি টাকা খরচই করবো, তা হ'লে মেয়েকে ইস্কুলে দিলুম কি কর্ত্তে?"

টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়া কর্ত্তা তখনও স্বর্ণলতাকে সেই স্থানে ও সেইভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু প্রসন্নস্বরে (বোধ করি সদ্য টাকা গোণার শব্দটা কানে ও প্রাণে বাজিয়া রহিয়াছিল) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, গিন্নি! ও আমি সব ঠিক ক'রে নেবো। নীলির পড়া আমি ছাড়াবো না; পড়াতে ওকে হবে, তবে ও ছায়ের ইস্কুলে কিছু ভাল জিনিস শেখায় না! প্রাইজ ত নেই বল্লেই হয়; আমি ওকে মিস রেজের মিসন ইস্কুলে কাল থেকেই ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসবো। তারা মাইনে ত নেয়ই না, উল্টে শাড়ী, জামা, বই, শ্লেট সমস্ত প্রাইজ দেয়। বড় বড় 'ডল' দেয়, সেগুলো আমেদের দোকানে আধা কড়িতে বেচে এলেও দাম আছে। কালই আমি ওকে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করিয়ে আসছি। আর গোঁড়াও তা হ'লে কালই রওনা হয়ে যাক্।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

শিবাজীর সেনাদল

শিবাজী ছিলেন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র। তাঁহার রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত হয়, পিতার মনিবকে বেদখল করিয়া। সে রাজ্যের প্রসার হইয়াছিল—বিজাপুরের দুর্ব্বল সুলতানের ও দিল্লীর প্রবল সম্রাটের সহিত লড়াই করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের পরগণাগুলি কাড়িয়া লইয়া। যিনি বংশানুক্রমিক রাজা, তাঁহাকে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলে, প্রবল শত্রুকে বাধা দিবার মত সৈন্য-সমাবেশ করিতে পারিলেই তাঁহার হইল। কিন্তু যিনি সামান্য জায়গীরকে বিপুল সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার মহৎ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাকে কেবল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। তিনি একদিকে আক্রমণের পর আক্রমণ করিয়া, আঘাতের পর আঘাত করিয়া প্রতিবেশীর জনপদ অধিকার করিয়া লইবেন, আবার সদ্যোবিজিত দেশ ও তৎসঙ্গে পৈতৃক গ্রাম কয়েকটি হাতছাড়া না হইয়া যায়—তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। শিবাজীকে এই উভয় ব্যবস্থাই করিতে হইয়াছিল। বিজাপুরের তখন শেষ অবস্থা; গৃহকলহে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে, প্রজা-বিদ্রোহে বিজাপুরের ক্ষুদ্র রাজ্য তখন যায় যায়। বিজাপুর যদি তাঁহার একমাত্র শত্রু হইত, শিবাজীর বেশী ভাবিবার কারণ ছিল না। কিন্তু মুঘল রাজশক্তি তখন একটি একটি করিয়া দক্ষিণের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে। শিবাজী যখন রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উপক্রম করিতেছেন, তখন দক্ষিণের মুঘল সুবেদার ঔরংজীব। আহম্মদনগর পূর্ব্বেই মুঘলের করতলগত হইয়াছিল। ঔরংজীব বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করিতে, সমস্ত দাক্ষিণাত্যে মুঘল-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছিলেন। শিবাজীর আপন ভয়ের কারণ এই স্থানে তিনি সহস্র চেষ্টা করিলেও সৈন্যসংখ্যায় মুঘলের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন না, তাঁহার পৈতৃক জায়গীরের প্রস্তরময় ভূমিতে গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহিত প্রদেশের মত প্রচুর শস্য জন্মে না। যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজন; সুতরাং ধনবলে ও সেনাবলে

শিবাজী।

মু...এর সমকক্ষ হওয়া শিবাজীর একান্তই প্রয়োজন হইয়াছি। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, এমন এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য তিনি সংগ্রহ করিবেন, যাহারা সংখ্যায় ...গের মুঘল সৈন্যের সহিত তুলনার যোগ্য না হইলেও, রণনৈপুণ্যে, ক্ষিপ্রগতিতে ও সামরিক শৃঙ্খলায়, তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইবে; এবং স্বরাজ্যের দারিদ্র্যের অসুবিধা তিনি এই ক্ষিপ্রগামী সেনার সাহায্যে পররাজ্য লুণ্ঠন করিয়া দূর করিবেন। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন—যুদ্ধলব্ধ আয়ের দ্বারা।

অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী।

স্বরাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে শিবাজীকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। মহারাষ্ট্র দেশ পর্ব্বতবহুল। তখনকার দিনে দুরারোহ পার্ব্বত্য দুর্গ একরূপ অজেয় ছিল। সেকালে এরোপ্লেনের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং আকাশ-পথে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। কামানের পাল্লাও এখনকার মত বেশী ছিল না। সুতরাং শিবাজী একটি একটি করিয়া গিরিদুর্গ দখল করিতে লাগিলেন এবং উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। মল্লার রামরাও চিটনীস লিখিয়াছেন,—"শিবাজী মনে করিতেন, কিল্লা কোট রাজ্যের প্রাণস্বরূপ।" 'লোকহিতবাদী' ছদ্মনামধারী মারাঠা লেখক বলিয়াছেন, শিবাজী দুর্গনির্ম্মাণের জন্যই প্রসিদ্ধ। সভাসদের মতে শিবাজী অন্যূন আড়াই শত দুর্গ জয় ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ছত্রপতি শাহুর জাবিতা স্বরাজ্যে তালুক ও কেল্লার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, শিবাজীর রাজ্যে এমন একটি তালুকও ছিল না, যে স্থানে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য দুই একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করা হয় নাই। ইংরাজ লেখক স্কট ওয়ারিং বলেন,—

Before his death he had established his authority over an extent of country four hundred miles in length, and one hundred and twenty in breadth, His forts extended over the vast range of Mountains which skirt the western shore of India Regular fortification barred the open approaches, every pass was commanded by forts every steep and overhanging rock was occupied as a station to roll down great masses of stone which made their way to the bottom, and impeded the labouring march of cavalry elephants and carriages.

দুরারোহ গিরিদুর্গ রক্ষার জন্য বহু সৈন্যের প্রয়োজন ছিল না। সাধারণতঃ এক একটি দুর্গে পাঁচ শতের বেশী সৈন্য থাকিত না। কিন্তু কোন দুর্গই মাত্র এক জন সৈন্যনায়কের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন রাখা হইত না। সভাসদ বলেন—"প্রত্যেক দুর্গেই এক জন হবালদার, এক জন সবনীস এবং এবং এক জন সরণোবত থাকিবে। এই তিন জন কর্ম্মচারীরই পদমর্য্যাদা সমান। তাঁহারা তিন জন পরস্পরের মত লইয়া দুর্গের কার্য্য করিতেন।" দুর্গের অস্ত্র শস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কায করিতেন

কারখানীস,দুর্গের আয়-ব্যয়ের হিসাবও রাখিতেন তিনি। খুব বড় বড় দুর্গে প্রাকার রক্ষার জন্য পাঁচ ছয় জন তট সরণোবত থাকিতেন। দুর্গরক্ষার জন্য সতর্ক প্রহরীর ব্যবস্থা ইঁহারাই করিতেন। দুর্গরক্ষী সেনাদলের মধ্যে প্রত্যেক দশ জন লইয়া এক একটি দল গঠিত হইত। প্রত্যেক দলে থাকিত নয় জন সাধারণ সৈনিক ও এক জন নায়েক। রাজা নিজে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া, নিজের জানা লোকের নিকট জামিন লইয়া তবে কেল্লার সৈন্য নিযুক্ত করিতেন। সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত মারাঠা বংশের লোক হবালদার ও সরণোবতের পদে নিযুক্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ সবনীস ও প্রভু কারখানীস নির্ব্বাচিত হইতেন। তিন বিভিন্ন জাতি হইতে তিন জন প্রধান কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইতেন। কোন এক জন কর্ম্মচারীই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুর নিকট দুর্গ সমর্পণ করিতে পারিত না।

এক একটি কেল্লায় সমান ক্ষমতাশালী ও সমান পদের তিন জন কর্ম্মচারী নিয়োগের নিয়ম শিবাজী উদ্ভাবন করেন নাই। এই প্রথাটি বিজাপুররাজ্যে শিবাজীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। দলাদলি, বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার দিনে এক জন কর্ম্মচারীর হাতে দুর্গের আধিপত্য ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হইত, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রভুদিগের ঐক্য ছিল না। কয়েকটি সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার লইয়া প্রায়ই প্রভু ও ব্রাহ্মণে কলহ হইত। সুতরাং রাজকর্ম্মচারী-নিয়োগ ব্যাপারে তাহাদের এই অনৈক্য উপেক্ষার বিষয় ছিল না। শিবাজী যখন উপবীত ধারণ করেন, তখন ব্রাহ্মণরা তাঁহার সেই কার্য্যের বিরোধী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও আবার ঐক্যের একান্তই অভাব ছিল। সুতরাং সবনীস নিয়োগের সময় কোকনস্থ, দেশস্থ, করহাডা ও মধ্যন্দিন সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দাবী যথাযথভাবে বিচার করিতে হইত। ব্রাহ্মণ প্রভু ও মারাঠা জাতীয় লোকদিগের মধ্যে সরকারী চাকরীগুলি যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টন করিয়া দিলে অবশ্য কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিত না। সুতরাং এই নিয়মের সুবিধা এই যে, দুর্গরক্ষা বিষয়ে তিন জন কর্ম্মচারীই পরস্পরের ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত এবং পরস্পরবিরোধী জাতির লোক কখনই রাজার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে মিলিত হইতে পারিত না।

এই তিন জন কর্ম্মচারীর মধ্যে দায়িত্বের হিসাবে হবালদারই প্রধান। তাঁহার কাছে দুর্গের চাবি থাকিত রাত্রিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকেই স্বহস্তে দুর্গের দরজা বন্ধ করিতে হইত। রাত্রিতে শত্রু মিত্র কাহাকেও দুর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়ার নিয়ম ছিল না। প্রাতঃকালে তিনি আবার নিজে আসিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতেন। চিটনীস বলেন যে, হবালদাররা এই কর্ত্তব্যগুলি যথাযথ প্রতিপালন করে কি না দেখিবার জন্য শিবাজী এক দিন গভীর রাত্রিতে পাহ্নালা দুর্গের নিকট যাইয়া হবালদারকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচররা হবালদারকে ডাকিয়া বলিল,—"রাজা স্বয়ং দুর্গে আশ্রয়প্রার্থী, নিকটেই মুঘল শত্রু। দরজা খুলিয়া না দিলে রাজা মুঘলের হাতে বন্দী হইবেন।" হবালদার করযোড়ে উত্তর করিলেন যে, রাজার নিয়ম অনুসারে রজনীতে দরজা খুলা নিষিদ্ধ; তিনি প্রহরী-সৈন্য পাঠাইয়া মুঘল সৈন্যের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু প্রভাতের পূর্ব্বে কাহাকেও দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবেন না; স্বয়ং রাজাকেও না। রাজা তখন নিজে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, —"দুর্গ আমার, নিয়ম আমার, নিয়মভঙ্গের হুকুমও আমার, তুমি দরজা খুলিয়া ফেল।" কিন্তু হবালদার যখন শিবাজীর আদেশেও দুর্গের দরজা খুলিলেন না, তখন রাজা তাঁহাকে নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, চাকর মনিবের হুকুম রাখে না। এ কি অন্যায়! এই অপরাধের দণ্ড শিরশ্ছেদ। তথাপি কিন্তু পাহ্নালার হবালদার শিবাজীকে দুর্গপ্রবেশ করিতে দিলেন না। প্রভাত হইলে তিনি দরজা খুলিয়া করযোড়ে শিবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,"আমি অপরাধ করিয়াছি, যথাযোগ্য দণ্ডবিধানের আদেশ হউক।" শিবাজী এই কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। শিবদিগ্বিজয়ের অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলেন যে, যাহারা শিবাজীর এই প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহারা সকলেই পদচ্যুত অথবা অবমানিত হইয়াছিল।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু শিবাজী তাঁহার সেনাদলে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ একেবারে নিবারণ করিতে

পারেন নাই। শিবাজী যখন জয়সিংহের সৈন্যনিবাসে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন রাজগড় দুর্গের সমস্ত ভার কিছুকালের জন্য কেসোনারায়ণ সবনীসের হাতে পড়িয়াছিল। দুর্গে তখন হবালদার ছিল না। সেই সুযোগে কেসোনারায়ণ রাজকোষের বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সিংহগড় দুর্গে বিদ্রোহ হয় এবং এই জন্য শিবাজীকে কিছুকালের জন্য কোঁকণ অভিযান স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।

সেকালে দুর্গরক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত রসদই বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। কেহ বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে দুর্গে খাদ্য থাকিতে, সহজে কেহ রক্ষিসৈন্যদিগকে বেদখল করিতে পারিত না। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে শিবাজী স্থির করেন যে, রসদ ক্রয়ের নিমিত্ত একটি স্থায়ী ভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে হইবে। মুগল আক্রমণের সময়েই কেবল এই ভাণ্ডারের অর্থে রসদ ক্রয় করা হইবে, অন্যথা ইহাতে হাত দেওয়া হইবে না। এই জন্য তিনি নিম্নলিখিত মহল ও ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার হোন সংগ্রহ করিয়াছিলেন--

কুদাল	২০,০০০
রাজাপুর	২০,০০০
কোর্ণে	২০,০০০
দাভোল	১৫০০০
পুণা	১৬০০০
নাগোজীগোবিন্দ	১০০০০
কাওলী	৫০০০
কল্যাণ	৫০০০
ভিবণ্ডী	৫০০০
ইন্দাপুর	৫০০০
সুপা	২০০০
কৃষ্ণাজী ভাস্কর	৫০০০
	১,২৫০০০

এই বৎসরই শিবাজী তাঁহার প্রধান প্রধান দুর্গগুলি মেরামতের জন্য ১ লক্ষ ৭৫ হাজার হোন মঞ্জুর করেন। তিনি এই মঞ্জুরীপত্রে লিখিয়াছেন যে, মজুররা যথাসময়ে মজুরী না পাইলে অসন্তুষ্ট হয়। অতএব এই ১ লক্ষ ৭৫ হাজার হোন কেবল ইমারতের কাযেই ব্যয় করা হইবে। কোন্ কোন্ দুর্গ মেরামতের জন্য কত টাকা খরচ হইবে, তাহাও তিনি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সেই তালিকাটি দিতেছি--

সিংহগড়	১০,০০০
সিন্ধু দুর্গ	১০০০০
বিজয় দুর্গ	১০০০০
সুবর্ণ দুর্গ	১০০০০
প্রতাপগড়	১০০০০
পুরন্দর	১০০০০
রাজগড়	১০০০০
প্রচণ্ডগড়	৫০০০
প্রসিদ্ধগড়	৫০০
বিশালগড়	৫০০০
সুধাগড়	৫০০১
লোহগড়	৫০০০
সবলগড়	৫০০০
শ্রীবর্দ্ধন ও মনোরঞ্জন	৫০০০
কোরিগড়	৩০০০
সারসগড়	২০০০
মহিধরগড়	২০০০
মনোহরগড়	১০০০
বিবিধ	৭০০০
	১,৭৫০০০

দুর্গরক্ষার জন্য যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার কোন কোনটি হয় ত আধুনিক পাঠকের হাস্যোদ্রেক করিবে। শিবাজীর কতকগুলি কামান ছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিক অর্ম্ম লিখিয়াছেন--He had previously purchased eighty pieces of cannons, and lead, sufficient for all his match-locks from the French Director at Surat. কিন্তু এই কামানগুলি তেমন ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শিবাজীর সৈনিকগণ, বোধ হয়, কামানব্যবহারে তেমন নৈপুণ্য লাভও করিতে পারেন নাই। স্কট ওয়ারিং বলেন—Shivaji's artillery was very contemptible and he seems seldom to

have used it but against the island of Gingerah. সভাসদ গোলন্দাজ ও তীরন্দাজ সেনার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অবরোধকারী শত্রুদলকে হাউই দ্বারাও আক্রমণ করা হইত। যুদ্ধের হাউইর বিবরণ ফোর্ব্বস ও ফিটজক্লারেন্স প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ বিশদভাবে প্রদান করিয়াছেন। এ স্থানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কখন কখন অবরুদ্ধ মারাঠা সৈন্য অসতর্ক শত্রুর উপর তরবারি ও বর্শা হস্তে আপতিত হইত। মুরার বাজী প্রভু কর্ত্তৃক (দিলীর খাঁর সৈন্যগণকে) এইরূপ একটি অতর্কিত আক্রমণের বিবরণ সভাসদ ও চিটনীস বখরে আছে। ইংরাজ পর্য্যটক ফ্রায়ার মারাঠাগণের আত্মরক্ষার আর একটি অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—On the top of mountains, several fortresses of Sevagi's, only defensible by nature, needing no other artillery but stones, which they tumble down upon their foes, carrying as certain destruction as bullets where they alight. প্রত্যেক দুর্গের কাছেই বড় বড় পাতর জমা করিয়া রাখা হইত। আর খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে শত্রু-সৈন্যরা যখন বিব্রত, তখন এই পাতরগুলি গড়াইয়া ফেলিয়া তাহাদের হস্ত, পদ ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দুরবস্থার একশেষ করা হইত। পাতর মারিয়া যুদ্ধ করা আজকাল না চলিলেও চুনার দুর্গ দখল করিতে গিয়া বক্সারবিজয়ী হেকটর মনরো পাতরের ঘায়ে কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ক্যারাক চিয়োলি-লিখিত ক্লাইব-চরিতে পাওয়া যাইবে।

অশ্বপৃষ্ঠে মারহাট্টা।

সেকালের মারাঠা সামরিক কর্ম্মচারীরা বেতন বেশী পাইতেন না। হবালদাররা সাধারণতঃ বার্ষিক ১ শত ২৫ হোন বেতন পাইতেন। এক হোনের মূল্য ৩৸০। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে নাগোজী ভোঁসলে বার্ষিক ২ শত ৫০ হোন বেতনে উৎলুর দুর্গের মুদ্রাধারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই কৃষ্ণাজী সুরেবংশী বার্ষিক ১ শত হোন বেতনে ঐ দুর্গের সরণোবত নিযুক্ত হয়েন। শিবাজী উতলুর দুর্গের প্রাকাররক্ষার জন্য ৪ জন ভট সরণোবত পাঠান। ইঁহারা প্রত্যেকে পাইতেন বৎসরে ৪ হোন ও ৮ কাবেরী পাক হোন। ইঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল ৭ জন বারগীর বা বর্গী। তাহাদের বেতন ছিল বৎসরে ৯ হোন হিসাবে। বেতন ব্যতীত প্রত্যেক কর্ম্মচারীই পদমর্য্যাদা অনুসারে পালকী, মশালচী, আফতাগীর এবং চাকরের জন্য একটা ভাতা পাইতেন। দুর্গের চারিধারে রাত্রিকালে পাহারা দিত রামোশী ও পরোয়ারীরা। ইহারা অস্পৃশ্য, গ্রামের ভিতরে ইহারা বাস করিতে পাইত না। সুতরাং অনুমানকরা অসঙ্গত হইবে না যে, দুর্গের অভ্যন্তরে ইহাদের বাসগৃহ ছিল না। ইহাদের বেতনও বোধ হয় খুবই কম ছিল।

দুর্গরক্ষার সকল ব্যবস্থার কথা বলা হইল, এখন যে সেনাদল লইয়া ছত্রপতি শিবাজী দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। পেশবাযুগে পদাতিকের তেমন আদর ছিল না। পদাতিক সেনা সংগৃহীত হইত উত্তর ভারতবর্ষ হইতে। বিদেশ হইতে সমাগত এই অর্থগৃধ্নু সেনাদলের নৃশংসতার বিবরণ আইরিশ লেখক উইলিয়ম হেনরী টোন অষ্টাদশ শতাব্দীর

পবভাগে লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে এখনও শহরিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু শিবাজী নিজের দেশ হইতেই রণনিপুণ পদাতি সেনাবল গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের মাওলী ও হেতকরী পদাতিকগণ যে সামরিক যশের অধিকারী হইয়াছিল, তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। শিবাজী নিজে দেখিয়া তবে তাঁহার সেনাদলের জন্য লোক বাছিয়া লইতেন। এইরূপ সযত্ন-নির্ব্বাচিত সেনাদল আবার অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে রণকৌশল শিক্ষা করিত। ভিনিসীয় পর্য্যটক মামুসী লিখিয়াছেন—Shivaji had no idea of allowing his soldiers swords to rust. অবিরত ব্যবহারের ফলে শিবাজীর সেনাদলে ব্যবহৃত তরবারিগুলি যেমন সুতীক্ষ্ণ থাকিত, সেইরূপ যাহারা সেই তরবারি পরিচালনা করিত, তাহাদের রণনৈপুণ্যও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইত।

প্রত্যেক ৯ জন পদাতিকের উপর ১ জন নায়েক থাকিত। ৫ জন নায়েকের উপর ১ জন হবালদার। ২ অথবা ৩ জন হবালদারের উপর ১ জন জুমলাদার। ১০টি জুমলা যাহার অধীনে, তাহাকে হাজারী বলা হইত; এবং পদাতিকদিগের সরণোবতের অধীনে ৭ জন করিয়া হাজারী থাকিত। পদাতিক জুমলাদারের বার্ষিক বেতন ছিল ১ শত হোন। তাহার সবনীস পাইত বৎসরে ৪০ হোন। হাজারীদিগের বার্ষিক বেতন ৫ শত হোন।

অশ্বারোহী সেনাদল দুই ভাগে বিভক্ত। (১) শিলেদার—যাহারা নিজের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া লয়, (২) বারগীর - যাহাদের অস্ত্র ও বাহন সরকার হইতে সরবরাহ করা হয়। এই বারগীররাই বাঙ্গালাদেশের 'ঘুমপাড়ানো' গানের বর্গী। কেবল বাঙ্গালা নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের লোক একদিন বর্গীর নামে ভীত সন্ত্রস্ত হইত। শিলেদাররা কতকটা নিজের নিজের মালিক। যে টাকা দিবে, তাহারই নিকট আত্মবিক্রয় করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করিত না। শিলেদারের এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা দক্ষিণী সৈন্যের দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। শিবাজীর মত বিচক্ষণ রাজা এই দৌর্ব্বল্যের কারণ দূর না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। তাই তিনি শিলেদারদিগকে যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার দেন নাই। তাহাদিগকেও বারগীর সেনার সেনানায়কদিগের পরিচালনাধীন রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগকেও তিনি নিজের সামরিক কায়দা-কানুন অবনতশিরে মানিয়া চলিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

অশ্বারোহী সেনাদলে এক এক জন জুমলাদারের অধীনে ৫ জন হবালদার থাকিত। জুমলাদারের বেতন ছিল ৫ শত হোন। প্রত্যেক ২৫জন অশ্বারোহীর জন্য এক এক জন পাখালচী বা জলবাহক এবং নালবন্দ থাকিত। তাহারা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইয়া দিত। ১০ জন জুমলাদারের উপর ১ জন হাজারী। হাজারীর বেতন ছিল বার্ষিক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা (হোন)। ৫ জন হাজারীর উপরে ১ জন পাঁচহাজারী এবং সমস্ত পাঁচহাজারীর উপরে সরণোবত।

শিবাজী যে কেবল হিন্দুদিগকেই সেনাবিভাগে গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে; তাঁহার সেনাদলে মুসলমান কর্ম্মচারীরাও উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। একবার তিনি সোমাজী নায়ক পানসম্বলের উপদেশ অনুসারে ৭ শত পাঠান যোদ্ধাকে স্বীয় সেনাদলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাসদ শিবাজীর সেনানায়কগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে শামা খাঁ নামক এক জন মুসলমান যোদ্ধার নাম আছে। শিবাজীর নৌবাহিনীতে দৌলত খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ, দরিয়া সারঙ্গ প্রভৃতি মুসলমান নৌযোদ্ধা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন।

শিবাজী জানিতেন যে, শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্ণে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিলে যুদ্ধজয় সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ তিনি জনবলে তাঁহার মুসলমান শত্রুদের সমকক্ষ ছিলেন না। এই জন্য তাহাদিগকে অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত করাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ছিল। শত্রুদিগের অরক্ষিত স্থানগুলি লুণ্ঠন করিয়া তিনি নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। আবার যখন সম্মুখযুদ্ধে জয়াশা সুদূরপরাহত হইত, তখন তিনি শত্রুর অজ্ঞাত পথে নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই জন্য দেশের পথঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এক দল সুচতুর গুপ্তচর সর্ব্বদা তাঁহার জন্য দেশে বিদেশে সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিত. এই গুপ্তচর দলের নেতা ছিলেন—বহিরজী যাধব। বহিরজীর বুদ্ধিকৌশলে শিবাজী একাধিকবার নির্ব্বিঘ্নে শত্রুর অজানিত পথে সসৈন্যে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিবাজীর সেনাদলের পরিচয়জ্ঞাপক বিশেষ কোন পরিচ্ছদ ছিল না। যানবাহনের, অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য ছিল না। তরবারি ও বর্শা, তীর-ধনুক ও নলগাদা বন্দুক, হাতিয়ারের মধ্যে ইহাই ছিল তাহাদের সম্বল। কিন্তু তাহারা এত ক্ষিপ্রতার সহিত একত্র হইত যে, শিবাজীর শত্রুগণ তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সৈন্যগণ রণজয় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিত।

প্রত্যেক বৎসর শিবাজীর সৈন্য ও সেনানায়কগণ বিজয়া দশমীর দিন পর-রাজ্যে চলিয়া যাইত। ৮ মাসকাল তাহারা পর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বর্ষাসমাগমে দেশে চলিয়া আসিত। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। গো-ব্রাহ্মণের প্রতি উপদ্রব করা শিবাজীর সেনাদলে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কোন কারণেই ক্ষমা করা হইত না। এই জন্যই দুই এক জন বুদ্ধিমান্ মুঘল শাসনকর্ত্তা শিবাজী কর্ত্তৃক তাঁহাদের নগর আক্রান্ত হইলে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া শিবাজীর সৈনিকগণ যে একেবারে কাহারও উপর কখনও কোন অত্যাচার করে নাই, তাহা নহে। বিদেশে তাহারা পুরুষদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার ত করিতই, স্বদেশেও তাহাদের আচরণ সর্ব্বদা নিন্দা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, চাফলের নিকট শিবাজীর সৈন্যগণ নানাপ্রকার উৎপাত করিয়াছে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে টিপলুনের নিকটে যে সৈন্যদল ছাউনী করিয়াছিল, তাহা-দিগকেও শিবাজী অসদাচরণের জন্য তিরস্কার করিয়াছেন। তখনকার দিনে মুঘল ও বিজাপুরী সেনাদলের অসদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে শিবাজীর সেনারাও ইতস্ততঃ করে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধবিগ্রহের কালে আধুনিক সময়েও সুসভ্য দেশসমূহের সৈন্যগণ কিরূপ পশু-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

শম্ভূজী।

তথাপি বিজাপুরী সেনার তুলনায় তাহারা যে আরাম-বিমুখ ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিজা-পুরের ও শিবাজীর সেনা-দলের তুলনা করিতে যাইয়া প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ পর্য্যটক ফ্রায়ার লিখিয়াছেন,—

Sevagi's men thereby being fitter for any martial exploit having been accustomed to fare hard, journey fast, and take little pleasure. But the other will miss a booty rather than a dinner, must mount in state and have their arms carried before them, and their women not far behind them with the masters of mirth and jollity; will rather expect than pursue a foe; but then they stand it out better; for Sevagi's men care not much for a pitched field, though they are good at surprizing and ransacking; yet agree in this, that they are both of stirring spirits.

পেশবাযুগের সৈনিকগণের ন্যায় শিবাজীর সেনাদলের নৈতিক চরিত্র যে উন্নত ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। শিবাজী ব্যভিচারী সৈন্যের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—ফ্রায়ার বলেন—He does not permit whores and dancing wenches in his army. আর এ বিষয়ে পরবর্ত্তী কালের মারাঠা সেনানিবাসের অবস্থা কি ছিল, তাহা এল্‌ফিনষ্টোনের পত্র ও ব্রৌটনের লিখিত সিন্ধিয়া শিবিরের বিবরণ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিতে হইবে না।

আরও একটি বিষয়ে শিবাজী অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি আহত সৈনিকগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। হত সৈনিকদিগের বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইলে তিনি তাঁহার অনুচরগণের পদবৃদ্ধি, বেতনবৃদ্ধি করিতেন। তাহাদিগকে উপাধি ও নানাবিধ উপহার দিতেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে জায়গীর দিতেন না। জায়গীর-প্রথার কুফল নিবারণে তিনি যেরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী কালের মারাঠা নৃপতিগণ সেইরূপ যত্নবান্ হইলে হয় ত মারাঠা সাম্রাজ্য দুই শত বৎসরের মধ্যে ধ্বংস নাও হইতে পারিত। পেশবাদিগের মত তিনি সৈন্যগণের বেতন বাকী রাখিতেন না। কিন্তু বেতন পরিশোধের নিমিত্ত তিনি তাহাদের হাতে খাজনা আদায়ের ভারও দিতেন না। সমকালীন ও পরবর্ত্তী কালের শাসনকর্ত্তৃগণের সঙ্গে এই স্থানেই তাঁহার পার্থক্য।

মারাঠারা চিরকালই সাহস ও রণকৌশলের জন্য বিখ্যাত। পুলকেশীর নেতৃত্বে তাহারা হর্ষবর্দ্ধনের বিজয়ী বাহিনীর গতিরোধ করিয়াছিল। হুয়েন সঙ্গ তাহাদের সাহস ও বীরত্বের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মারাঠা অশ্বারোহীর সাহায্যেই হাবশী বীর মালিক অম্বর আকবর শাহের সুশিক্ষিত সেনাদলের আক্রমণ হইতেও আহম্মদনগর রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজীর বহু পূর্ব্বে মহাডীক নিম্বালকর, ঘোরপড়ে ও যাদব প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দাররা মুসলমান নৃপতিদিগের অধীনে রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতরাং মারাঠা সেনাদল গঠনে শিবাজীর বিশেষ কৃতিত্ব নাই। তাঁহার কৃতিত্ব নিজের চরিত্রের আদর্শ দেখাইয়া সেই উচ্ছৃঙ্খল সেনাদলের চরিত্রের উৎকর্ষসাধনে, তাঁহার কৃতিত্ব বিবাদনিরত মাওলী সর্দ্দারগণের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে; তাঁহার কৃতিত্ব নিরক্ষর মাওলী সেনার হৃদয়ে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপনে। চিপলুনের কাছে যাহার সেনাদল যখন নানারূপ উৎপাত করিতেছিল, তখন তিনি তাঁহার সেনানায়কগণকে লিখিয়াছিলেন—এরূপ করিলে দেশের লোক মনে করিবে, তোমরা মোগলেরও অধম। এই তিরস্কারেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহার সৈনিকদের সম্মুখে কোন্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যদি তাঁহার পুত্র সম্ভাজী পিতার সদ্‌গুণের অধিকারী হইতেন, তবে অত সহজে ঔরংজীব মহারাষ্ট্র জয় করিতে পারিতেন না। শিবাজীর সৈন্যগণ বীরত্বের উপাসনা করিতে জানিত, তাই তাহারা বালক রাজারামকে পরিত্যাগ করিয়া বীরখ্যাতিভূষিত সম্ভাজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। আর তাহারা শিবাজীর শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই বলিয়াই ঔরংজীব সমগ্র মহারাষ্ট্র জয় করিয়াও তাহা রাখিতে পারেন নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

উদ্ভট-সাগর

'নির্ধন' হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা 'নিধন' লাভ করাও শ্রেয়ঃ। কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহাই কৌশলসহকারে কহিতেছেন :—

নির্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্বয়ো-
স্তারতম্যাবিবিমুক্তচেতসাম্।
বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা
রেফ এব জয়বৈজয়ন্তিকা ॥

'নির্ধন' 'নিধন' এই দুয়ের অন্তর
সহজে বুঝিতে নাহি পারে মূঢ় নর।
'নির্ধন' 'নিধন' দুয়ে যদি হয় রণ,
'নির্ধনের' কাছে হা'র মানিবে 'নিধন'।
তাই রেফ-রূপ জয়-পতাকা লইয়া
'নির্ধনের' শিরে বিধি দিলা পরাইয়া!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর।

গ্রন্থাগারের কাহিনী

২

মুসলমান শাসন।

মুসলমানগণ যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা নির্ম্মমভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ধ্বংসসাধন করেন। কিন্তু তাঁহারা মুসলমান-লেখক-রচিত গ্রন্থাদির উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। গজনীর মামুদ, যিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন, এবং যাঁহাকে আমরা যুদ্ধাদি ভিন্ন

নিজামুদ্দীনের সমাধি।

কোন লোকহিতকর কার্য্যে, বিশেষতঃ বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া আদৌ মনে করি না, তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গজনীর নৃপতিগণ বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কতদূর মনোযোগী ছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বজাতি-সম্পর্কিত কার্য্যে তখনকার মুসলমান নরপতিগণের অনুরাগ কত প্রবল ছিল, বিদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া তাহার পরিমাপ করা কঠিন। দিল্লীর সিংহাসনে মুসলমান নরপতিগণের প্রতিষ্ঠার পর, আমরা তাঁহাদের স্থাপিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বা রাজকীয় গ্রন্থাগারের) কথা শুনিতে পাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুলতান জলালুদ্দীন খিলজীর রাজত্ব-কালে গ্রন্থাগার-সম্পর্কিত একটি বিশিষ্ট ঘটনা লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত। তিনি বিখ্যাত লেখক আমীর খসরুকে ঐ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে বিখ্যাত ফকির ও সুপণ্ডিত নিজামুদ্দীন আয়ুলিয়ার একটি

গার ছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার শিষ্য ওস্মান্, লক্ষৌতি গমনকালে গুরুর গ্রন্থাগার অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তক লইয়া যায়েন। তীমুর কন্দে (Samarkand) অনেকগুলি বৃহৎ পাঠাগার মস্জেদ স্থাপন করেন। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে মহমুদ গাওয়ান, মণীরাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগের যথেষ্ট রিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই বদান্যতায়, বিদরে (Bidar) একটি সুবৃহৎ কলেজ এবং শিক্ষার্থিগণের ব্যবহারের জন্য কটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থাগারে তিন হাজার

বিদারে মহমুদ গাওয়ানের গ্রন্থাগার।

পুঁথি ছিল। আহ্মদ্ নগরে বহ্মনীরাজগণেরও একটি গ্রন্থাগার ছিল। বিখ্যাত লেখক ফেরিশ্‌তা এই গ্রন্থাগার স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিজাপুরে আদিলসাহী-বংশীয় রাজগণের যে গ্রন্থাগার ছিল, তাহার কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

পঞ্জাবের জনৈক আফগান ওমরাও গাজীখাঁ'র বহুমূল্যবান গ্রন্থ-সংবলিত একটি সুন্দর পুস্তকালয় ছিল। সম্রাট বাবর যখন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তিনি ঐ গ্রন্থাগার হইতে

বাবর।

কয়েকখানি পুস্তক হুমায়ুন ও কামরাণের ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেন। বাবরের রাজত্বকালে পুস্তককে চিত্রিত করিয়া উহাকে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা হইত। বাবরের জীবন-স্মৃতি (Memoirs) এইরূপে রঙ্গীন চিত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছিল।

হুমায়ুন জ্যোতিষ ও ভূগোল পড়িতে অতিশয় ভালবাসিতেন। গ্রন্থপাঠে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; যুদ্ধযাত্রার সময়েও তিনি সঙ্গে বাছা বাছা পুস্তক রাখিতেন, এবং যখন তিনি

হুমায়ুন।

পলায়ন করেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গ্রন্থাধ্যক্ষ ও কতিপয় গ্রন্থ ছিল। শের্‌শাহ্ 'পুরাণ কিলা'তে "শেরমণ্ডল" নামক যে প্রমোদ-গৃহ তৈয়ার করেন, দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের পর হুমায়ুন্ ঐটিকে গ্রন্থাগারে পরিণত করেন। এই গ্রন্থাগার হইতে অবতরণ করিবার সময় সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সাহিত্যের উন্নতি ও সংরক্ষণকল্পে সম্রাট আকবর যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। পুস্তকসংগ্রহকার্য্যে আকবরের বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইত।

রাজকীয় গ্রন্থাগারের কতক গ্রন্থ অন্তঃপুরে থাকিত; অবশিষ্টাংশ বহিঃপ্রাসাদেই রক্ষিত হইত।

আকবর।

এই রাজকীয় গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিচালনের জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল। গুজরাট জয়ের সময় আকবর ইতিমাদ্ খাঁ গুজরাটের গ্রন্থাগারটি হস্তগত করেন। এই গ্রন্থাগারে অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ ছিল এবং আকবর সেগুলি নিজ রাজকীয় গ্রন্থাগারভুক্ত করেন। কিন্তু পরে শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে কাব্য, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ফলিত-জ্যোতিষ ও সঙ্গীত-শাস্ত্র; দ্বিতীয় শ্রেণীতে শব্দশাস্ত্র দর্শন, সুফিধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ, গণিত, জ্যোতিষ ও জ্যামিতি এবং তৃতীয় শ্রেণীতে টীকা, কিংবদন্তী, ধর্ম্মতত্ত্ব ও আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থ সকল রক্ষিত হইয়াছিল। ফৈজীর গ্রন্থাগারে 'নলদমনে'র (নল-দময়ন্তীর) এক শত একখানি নকল ছিল। আগ্রা দুর্গের মধ্যে একটি লম্বা ঘরে একটি গ্রন্থাগার ছিল। সুপণ্ডিত হাভেল তাঁহার গ্রন্থে (Hand book of Agra and the Taj, Sikandra
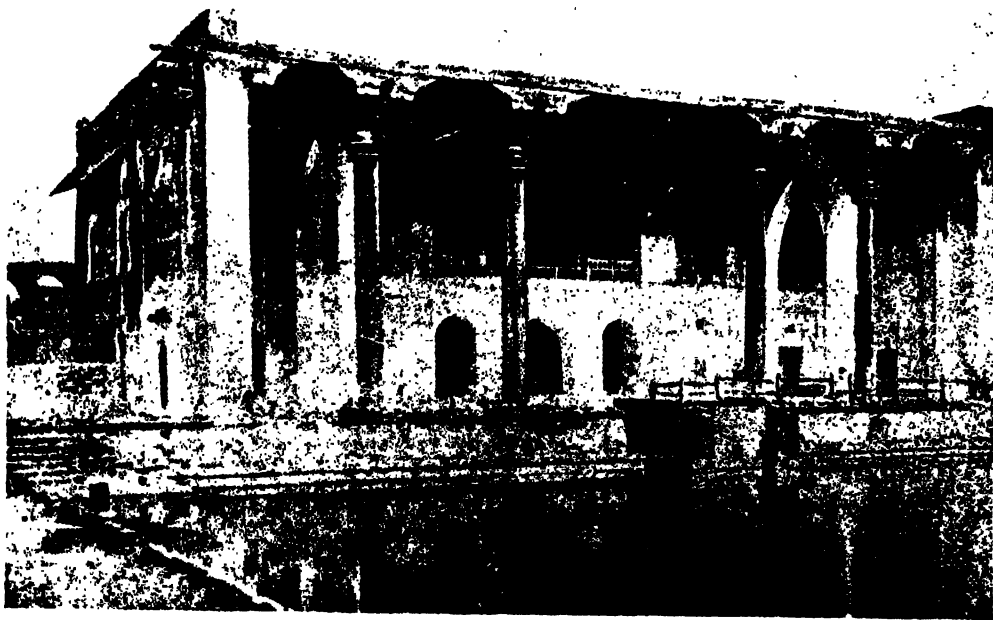
বিজাপুরে আদীলসা'হী গ্রন্থাগার।

তিনি এই পুস্তকগুলি পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করেন। আবুল ফজলের মতে ফৈজীর গ্রন্থাগারে ৪ হাজার ৩ শত গ্রন্থ ছিল। অপরিমিত শ্রম ও ব্যয়ে এই গ্রন্থাগারের কতকগুলি গ্রন্থ নকল করান হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ লেখকগণের নিজের হাতে কিংবা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। সমুদায় গ্রন্থই রাজকীয় গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হয়, এবং সেগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেগুলিকে তিন Fathapur Sikri and the Neighbourhood.) এই গ্রন্থাগারের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থ, আক্‌বর পারস্য ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র, নলদময়ন্তী, অথর্ব্ববেদ, লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদের নাম "রজ্‌ম্‌-নামা" (Razm-Namah) দেওয়া হয়। এই 'রজ্‌ম্‌-নামা' বহু চিত্রে ভূষিত করা হইয়াছিল।

Miniature Painting and Painters of India. Persia, and Turkey নামক গ্রন্থের রচয়িতা মার্টিন ...ন, (Vol. I. P. 127) এই 'রজমনামা' প্রস্তুত করাইতে আক্‌বরের ৪০ হাজার পাউণ্ড বা ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে জয়পুরের রাজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। তৎকালে গ্রন্থ সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে কখন কখন কি পরিমাণ চিত্র দেওয়া হইত, তাহা 'কিস্‌সা হাম্‌জা' (Qissah Hamzah) নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থ ১২ খণ্ডে সমাপ্ত, এবং ইহাতে ১ হাজার ৪ শত ছবি

হুমায়ুনের গ্রন্থাগার।

দেওয়া হইয়াছিল। আক্‌বরের তত্ত্বাবধায়ক বয়রাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিমের পারস্য দেশের অন্তর্গত হুলওয়ান্‌ নামক স্থানে একটি গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারে অনেক পণ্ডিত পড়িতে যাইতেন। ইহার চিত্র হইতে আমরা সেই সময়ের পুস্তকবিন্যাসের ও পড়িবার রীতি বুঝিতে পারি।

আবদুল রহিমের গ্রন্থাগার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। পারস্যদেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক সঙ্গে করিয়া পারস্যদেশে লইয়া যায়েন। শুনা যায়, এই গ্রন্থাগারের কতকগুলি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ পরে পারস্য-দেশে অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু নাদিরশাহ্‌ কর্ত্তৃক রাজকীয় গ্রন্থাগার লুণ্ঠনের পরেও পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটরা গ্রন্থাগারনির্ম্মাণে মনোযোগ দেন, এবং তাঁহাদের বিশেষ যত্ন ও অর্থব্যয়ে একটি গ্রন্থাগার গঠিত হইয়াছিল।

নাদিরশাহ।

১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান প্রচলিত হরফের আবিষ্কারের পর হইতে কত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। অল্পদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। সংখ্যাগণনায় দেখা যায় যে, ইহা উর্দ্ধপক্ষে ২ কোটি এবং নিম্নপক্ষে ১ কোটি হইবে। এক জন বলেন,—

বর্ত্তমান যুগ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে	আনুমানিক	৪০ হাজার
ষোড়শ "	"	৫ লক্ষ ৭০ হাজার
সপ্তদশ "	"	১২ লক্ষ ৫০ হাজার
অষ্টাদশ "	"	২০ লক্ষ
এবং ঊনবিংশ "	"	৪২ লক্ষ ৫০ হাজার

বিভিন্ন পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই পাঁচ শত বৎসরে প্রকাশিত সমগ্র পুস্তকসংখ্যা হইতেছে ১ কোটি, ২১ লক্ষ, ১০ হাজার।

ইহাতে প্রায় দেড় কোটি সাময়িক পত্র যোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ওগুলি পুস্তক নহে বলিয়া গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইল। প্রতি বৎসর পৃথিবীতে কত পুস্তক প্রকাশিত হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা একমত নহেন। তবে জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে কম পক্ষে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পুস্তক বাহির হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ১২ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর [illegible] হিসাবে পুস্তক বাহির হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে [illegible] খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুঁথি, বাজে [illegible], স্থানীয় (Local) ও অপ্রয়োজনীয় পুস্তকাদি বাদ দিলে সর্বসমেত আনুমানিক ১ কোটি ৬৪ লক্ষ পুস্তক বাহির হইয়াছে।

[illegible] গ্রন্থাগার

আধুনিক সময়ে য়ুরোপে ও আমেরিকায় অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার বিদ্যমান আছে। সেগুলির মধ্যে আবার কোন গ্রন্থাগার বিষয়বিশেষের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাগার আমেরিকা ও য়ুরোপে আছে।

আমি এখন বিদেশের মাত্র তিন চারিটি গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করিব। ইংলণ্ডের বৃটিশ মিউজিয়াম বর্ত্তমান সময়ের একটি প্রধান গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের বন্দোবস্ত ও সুশৃঙ্খলা অতিশয় সুন্দর। ইহাতে পাঠকের জন্য ৫টি ঘর আছে। যথা— (১) সাধারণ পাঠাগার (Reading room), (২) সংবাদপত্র পাঠাগার (Newspaper room), [এই পাঠাগারে সংবাদপত্র ব্যতীত লণ্ডন গেজেট, হাউস অব্ কমন্সএর পত্র এবং পার্লামেণ্ট সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রাদিও থাকে]; (৩) পুঁথি পাঠাগার (Mss. students' room), (৪) প্রাচ্যদেশ সংক্রান্ত শিক্ষার্থিগণের পাঠাগার (Oriental students' room) এবং (৫) Print room (অর্থাৎ engravings রাখিবার ঘর); এই গ্রন্থাগারে যে কত পুস্তক আছে, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ইহাতে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক ও প্রায় ৫৬ হাজার পুঁথি আছে।

অক্সফোর্ডের বড্লিয়ান লাইব্রেরী ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে নানা ভাষার পুঁথি প্রায় ৪০ হাজার।

বড্লিয়ান।

এই গ্রন্থাগারে ১০ হাজার ভারতীয় পুঁথি রক্ষিত আছে।

আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভারসিটীর লাইব্রেরীটি [illegible]তন। ইহা ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়; এবং স্থাপনের ২৬ বৎসর পরে পুড়িয়া যায়। কিন্তু ইহার পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকার [illegible]নী সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থদান করেন। তাঁহাদের সাহায্যে [illegible] চেষ্টায় পুনরায় ইহা বৃহদাকার গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। [illegible]হাতে প্রায় ৮ লক্ষ গ্রন্থ আছে।

হার্ভার্ড।

বার্লিনের রয়াল লাইব্রেরী ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। [illegible]হাতে ১২ লক্ষ ৩০ হাজার পুস্তক ও ৩০ হাজার পুঁথি আছে। প্রতি বৎসর পুস্তক ক্রয়ে ও পুস্তকাগার মেরামতে ১১ হাজার [illegible] শত ২৬ পাউণ্ড খরচ হইত।

বার্লিন।

ইহা ব্যতীত বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে, ভিয়েনাতে, এবং য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে বহু ভারতীয় পুঁথি আছে, ও নূতন নূতন পুঁথিও আমদানী করা হইতেছে।

ইণ্ডিয়া আফিস ইত্যাদি।

বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে অনেক-[illegible] গ্রন্থাগার আছে। বোধ হয় ভারতের অন্য কোন সহরে এত পুস্তকাগার নাই। এখানে ২টি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার,—এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবং বহু বে-সরকারী লাইব্রেরী আছে। এগুলি ব্যতীত বহু কলেজের সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীও আছে।

কলিকাতার গ্রন্থাগার।

এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে প্রায় ২২ হাজার, [illegible] শত গ্রন্থ ও পুস্তিকা এবং ১ হাজার ২ শত বিভিন্ন সাময়িক পত্র আছে; এবং ইহাতে নানা ভাষায় লিখিত প্রায় ১৮ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে—

সংস্কৃত	১[illegible],০০০
পার্শী .	[illegible],৫০০
আরবী	১,৭০০
তিব্বতীয় .. .	[illegible],০০০
উর্দ্দু	[illegible]০০
বার্ম্মিজ	১৫০
উড়িয়া	১০০
বাঙ্গালা	১০০

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে প্রায় ১ লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক ও ১ হাজার ৩ শত ৫০ খানি পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিভক্ত;—

পার্শী পুঁথি	[illegible]
আরবী " .	[illegible]
তুর্কী "	[illegible]
উর্দ্দু "	১
সংস্কৃত ও অন্যান্য	[illegible]

কলিকাতার সাধারণ বে-সরকারী লাইব্রেরীগুলির মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও পুঁথির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহাতে নিম্নলিখিত ভাষায় ১৪ হাজার ৮ শত ২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক আছে। তন্মধ্যে

বাঙ্গালা ..	[illegible],৫০০
সংস্কৃত	৮৬১
বিবিধ ভাষার .	৮৮
ইংরাজী	৪,৮০০
	১৪,৮২৫

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত [illegible] হাজার [illegible] শত [illegible] খানি পুঁথিও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

বাঙ্গালা পুঁথি	[illegible]
সংস্কৃত "	১,[illegible]
অসমীয়া "	[illegible]
উড়িয়া " .	৩
হিন্দী " .. .	১
পার্শী " ..	১২
তিব্বতীয় "	[illegible]

বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এই সাহিত্য মন্দির অল্পদিনের মধ্যেই যে এত মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে, ইহা খুব আশার ও গৌরবের কথা। সাহিত্য-পরিষদের আয় সামান্য; তাহার তুলনায় এ সংগ্রহ অতিশয় প্রশংসনীয়। বাঙ্গালীর এই সারস্বত নিকেতনের সহিত প্রত্যেক বাঙ্গালীর সহানুভূতি থাকা উচিত।

যতদূর জানি, বাঙ্গালা দেশে এতদিন একটিও বিশেষ বিষয়ের পুস্তকাগার ছিল না। সুখের বিষয়, সম্প্রতি এইরূপ

একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম "অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগার"। বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। নাটক ও নাট্যশালা সংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া এই পাঠাগার গঠিত। এ পর্য্যন্ত এই পাঠাগারে ২ হাজারের উপর পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার সুবৃহৎ ও বহু জ্ঞাতব্যবিষয়যুক্ত পুস্তক ইহাতে আছে। প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পিশেলের (Pischl) মূল্যবান গ্রন্থাগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারে প্রাচ্যতত্ত্বসম্বন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় পুস্তক পাওয়া যায়। গবেষণার পক্ষে সেগুলি খুবই সহায়তা করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াতে ইহার বাঙ্গালা পুঁথির সংগ্রহ বৃহৎ ও মূল্যবান্ হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় কলেজ লাইব্রেরীগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ-সংলগ্ন লাইব্রেরীটির সংগ্রহ খুব বেশী। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে অনেক সংস্কৃত মুদ্রিত পুস্তক ও পুঁথি আছে, কিন্তু সেগুলি ব্যবহার করিবার তত সুযোগ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, যুরোপে যে সমস্ত বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি সংস্কৃত কলেজ বা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা হয় না। সে জন্য এই দুই গ্রন্থাগার এই বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়াছে।

গবেষণার পক্ষে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী এই তিনটিরই সাহায্য না লইলে চলে না। এই ৩টি লাইব্রেরীর সমবায়ে এখন কলিকাতায় অনেক বিষয়ে গবেষণা করা সুগম হইয়াছে। তবে এ স্থানে এই সম্পর্কে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। যে সমস্ত গবেষণাকারী লাইব্রেরীতে বসিয়া পুস্তকাদি দেখিবার সুবিধা পায়েন না এবং এককালে যাঁহাদের অনেকগুলি পুস্তকের প্রয়োজন, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী হইতে তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য পায়েন। একমাত্র এসিয়াটিক সোসাইটী সভ্যগণকে এককালে ১০ গ্রন্থ পুস্তক পাঠের জন্য প্রদান করে।

বাঁকিপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরীর নাম এই স্থানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থাগারে অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত ৫ হাজার মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে। ইহা ব্যতীত এখানে চিত্রবিদ্যার যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাও অতুলনীয়।

খোদাবক্স ও অন্যান্য গ্রন্থাগার।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসলিখন বিষয়ে বাঙ্গালা পুঁথি যে কত মূল্যবান্, তাহা সকলেই জানেন। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি ও রংপুরের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ্ বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল, সুতরাং ভারতবর্ষ ব্যতীত এসিয়ার অন্তর্গত তিব্বত, চীন প্রভৃতি অন্য কোন দেশের গ্রন্থাগারের কথা বলা হইল না।

রেলওয়ে ও পোষ্ট আফিসের প্রচলনে দূরদেশে পুস্তক পাঠাইবার আজকাল যে সুবিধা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভ্রাম্যৎ লাইব্রেরীর (Travelling Library) সৃষ্টি সম্ভব পর হইয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার সময় নাই। তবে মোটামুটি একটি কথা বলিতেছি, বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এই গ্রন্থাগার হইতে এক এক প্রস্থ বহি পর্য্যায়ক্রমে পাঠান হয়; এবং সেইগুলির সাহায্যে শিক্ষকরা ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষিত করিবার সুবিধা পায়েন। এই প্রকারে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞানালোচনার পথ প্রস্তুত হয়। এই হিসাবে এই ভ্রাম্যৎ লাইব্রেরীর শিক্ষাদানবিষয়ে গুরুত্ব খুব বেশী।

সাধারণ পাঠাগার পরিচালনের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগার পরিচালন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে লাইব্রেরীর কার্য্য-পরিচালন-সংক্রান্ত বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এরূপ বিধান নাই। গ্রন্থাধ্যক্ষ হইতে হইলে কি কি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহাও আমরা জানি না। আশা করি, ক্রমশঃ অদূরভবিষ্যতে আমরা এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিব।

বর্ত্তমান সময়ে পাঠকরা সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে পাঠের জন্য যে শ্রেণীর পুস্তক চাহেন, তাঁহাদের মতে মাত্র সেই শ্রেণীর পুস্তক দিতে থাকিলে, তাঁহাদের একই শ্রেণীর

ক পাঠের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এ স্থলে তাঁহাদের প্রার্থনা বা ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া অবশ্যপাঠ্য পুস্তক পাঠের জন্ত তাঁহাদের মনোযোগ যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। যে পুস্তকগুলি তাঁহাদের পড়ান একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হইবে, সেগুলিকে এমন ভাবে গ্রন্থাগারের প্রকাশ্য স্থানে সাজাইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে সহজেই পাঠকবর্গের দৃষ্টি সেগুলির উপর নিপতিত হয় এবং সেগুলি পাঠ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। কেবল উপন্যাস বা কথা-সাহিত্য পাঠ না করিয়া বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবন-চরিত, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবার ইচ্ছা যাহাতে পাঠকগণের মনে জাগরূক হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।

গভর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী বা দেশের জনসাধারণের সাহায্য না পাইলে গ্রন্থাগার উন্নত ও পুষ্ট হইতে পারে না। য়ুরোপ বা আমেরিকা এ বিষয়ে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। নানা কারণে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা ভাল নহে। অবশ্য, আমাদের নিজেদের হাতে যে ক্ষমতা বা সুবিধা আছে, তাহার প্রয়োগে অধিকতর মনোযোগী হইলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির এ অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে আজ সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। গ্রন্থাগার সেই আলোকের প্রধান সহায়। গ্রন্থাগারের উন্নতি, পুষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধির উপর জাতির মানসিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। যাহাতে আমরা আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধনে সকলে সমবেতভাবে অধিকতর যত্নবান্ হই, আমাদের সেই চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। *

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

* এই প্রবন্ধ রচনায় প্রধানতঃ যে সমস্ত পুস্তক বা প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদান করিলাম,—

(১) The Story of Libraries and Book-collecting by E. A. Savage.

(২) Articles in the Down Magazine (1908) by R. Ghosh.

(৩) Papers relating to the Collection and Preservation of Ancient Sanskrit Literature in India, by A. E. Gough.

(৪) Mediaeval Logic by S. C. Vidyabhushan.

(৫) Cyclopaedia of Education by P. Monroe.

(৬) Encyclopaedia Brittanica

(৭) Promotion of Learning in India by Muhammadans (during Muhammadan rule) by N. Law.

ক্রীতদাস

(পারস্য উপাখ্যান অবলম্বনে)

বাগদাদ পথে করেন ভ্রমণ লোক্‌মান পণ্ডিত,
জীর্ণ-বসন শীর্ণ-শরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাস ভ্রমে এক জন নাগরিক,
গৃহে লয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক।

সপ্তাহ ধরি বন্দী রাখিল অন্ধকূপের মাঝে,
অবশেষে তাঁরে নিয়োজিল নিজ গৃহনির্ম্মাণ কাযে।
রোদে পুড়ে, শীতে জমে', জলে ভিজে' অবিরত দিনরাত,
খাটিতে লাগিলা সুধী লোক্‌মান করিয়া পরাণপাত।

আসল ভৃত্য আসিল ফিরিয়া, আসিল বছর ঘুরে,
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হ'য়ে জোড়হাত কয় নাগরিক সদাগর,
"ক্ষমা কর' মোরে, কে তুমি অতিথি
কোথায় তোমার ঘর?"

লোক্‌মান কয়, "ওগো নির্দ্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
গোটা বছরের সব লাঞ্ছনা পিঠে র'য়ে আছে জমা।
একটি বছর ব্যর্থ হয়নি,—বছরে৷ ত গেল কেটে,
বহু জ্ঞান আমি করিয়াছি লাভ তোমার দুয়ারে খেটে।

বুঝেছি আজিকে ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়।
আমারো রয়েছে বহু দাসদাসী, এমনি ত তাহাদের
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা শত, এখন পেয়েছি টের।

এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হে বণিক নির্ম্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম'।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বোগদাদে এসে যে জ্ঞান লভিনু সব হ'তে তাহা দামী।

শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রামের লক্ষ্মী

১

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর, নদী এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান,
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, আর কন্যে—"

"গুণ্ গুণ্ ক'রে কি হচ্ছে, দিদিমণি? এ দিকে যে বেরালে দুধটা খেয়ে ফেল্লে—"

আট বছরের মেয়ে হরিমতি ফিরিয়া চাহিয়া বিড়ালটাকে তাড়া করিল। সদোপদের মাধুর মা হাসিয়া বলিল, "খুব ত দুধ পাহারা দিচ্ছিলে! ঠাকুরমা কোথায়?"

"নাইতে গেছে।"

"কতক্ষণ? শুন্ছি, নদীতে বান আস্ছে।"

আশ্বিন মাস। গতরাত্রি হইতে অবিশ্রাম বর্ষণে মাঠ জলে তক্-তক্ করিতেছিল। তখন দামোদরের বাঁধ হয় নাই। সুতরাং বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার সন্ধিস্থলে প্রায় প্রতি বৎসরই কম-বেশী বান হইত।

মা-মরা হরিমতি বান আসিবার কথা শুনিয়া ঠাকুরমা'র জন্য চিন্তিত হইল। কিন্তু তখনই ঠাকুরমা'কে কলসীকক্ষে ফিরিতে দেখিয়া তাহার ঠোঁটে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মেঘাবৃত আকাশের মধ্য দিয়া হঠাৎ সেই সময়ে একটা ক্ষীণ রৌদ্ররেখা একবারমাত্র উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

২

তিন দিন ধরিয়া বন্যা জোরে বহিতেছিল। আজ সন্ধ্যা হইতে জল 'থম্থমে' হইয়াছে। ঠাকুরমা আর নাতিনী বড় ঘরখানির উঁচু দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছে। ঘরের ভিতরে একটি প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। হঠাৎ ঠাকুরমা'র দৃষ্টি পড়িল দ্বারে 'ধারির' দিকে। সেখানে কি একটা সাপ জল হইতে 'ধারি' বহিয়া উঠিয়া দ্বারে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছিল। ঠাকুরমা হাতের কাছের ঝাঁটাটার গোড়া দিয়া সেটাকে ঠেলিয়া দিতেই সেটা আবার জলে পড়িয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সাপটাকে দেখিয়া বোধ হয়, হরিমতির ভয় হইয়াছিল, তাই তাহার ঠাকুরমা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভয় নেই, দিদি! ওরা এ সময়ে অনিষ্ট করে না আশ্রয় চায়।"

হরিমতি বলিল, 'কাল ত কতগুলো ভেসে গেল একটাও ত দোরের দিকে আসেনি। এটা কেন এ দিকে—"

"কাল যে সোত ছিল, ভেসে যাচ্ছিল। আজ ত সোত নেই, আস্তে পার্ছে।"

"বান আর ক'দিন থাক্বে, ঠাকুরমা?" হরিমতি তিন দিন উঠানে নামিতে পারে নাই। সেখানে একগলা জল।

"জল 'থম্থমে' হয়েছে। আজ রাত্তির থেকেই মরতে সুরু হ'বে। কাল নিকেশ হ'য়ে যাবে।"

"এবারকার কি বান, ঠাকুরমা! এত গরু ছাগল ভেসে যেতে আর কখ্খনও দেখিনি!

"হাঁ! এবারকার বানটা জোরের বটে, কিন্তু তিরিশ সালের"—হঠাৎ একটা শব্দে দুই জনে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের 'ছিটে বেড়ার' রসুই-ঘরটি পড়িয়া গেল। হরিমতি বলিয়া উঠিল, "ঐ যা ঠাকুরমা! রান্নাঘর প'ড়ে গেল. কি হবে!"

ঠাকুরমা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি আর হবে, দিদি! হরি-মটর!"

"দূর! তা কেন? তুমি যে সে দিন কৈলেসদাদাকে বল্ছিলে, এবার বড় টানাটানি, বড় ঘর ছাওয়াতে পারব না, কেবল 'মট্‌কাটা' ভাজিয়ে রেখে দেব।"

ঠাকুরমা হরিমতির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এত কথাও তোর মনে থাকে, দিদি!" তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "চল, দিদি। হাঁড়ির ভাত দু'টি বেড়ে দিই। খেয়ে নিয়ে সকাল ক'রে শুয়ে পড়বে।"

"না, ঠাকুরমা, আমার এই জলের ভেতর চাঁদ দেখ্তে

...লাগ্‌ছে। ব'সে ব'সে একটু দেখি। তুমি না ...ক্ষণ জল খেয়ে—দূর ছাই, মনে থাকে না। তোমার ...আবার কাল থেকে মুড়ি বাড়ন্ত।—"

তখন প্রথম শরতের সদ্য-ধৌত আকাশে চন্দ্র ...তেছিল।

৩

...দের গ্রামে একটা চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে একটা ...আমগাছের তলায় একজন কৃষ্ণবর্ণ, বিশালবপু, একচক্ষু ...মহাশয় শিক্ষাকার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। ...কার প্রাতঃকালীন শিক্ষাদান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়া... । শিরপড়ুয়া নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের অধ্যাপনা শেষ করিয়া তাহাদের নিজেদের চাণক্যশ্লোক আবৃত্তি করিয়া গুরুমহাশয়কে শুনাইতেছিল। তিনি তামাকু সেবন করিতে করিতে শুনিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ একবার ... তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হরে পরামাণিক, রোদের ... কোথায় রে?"

এমন সময়ে সদ্যস্নাত প্রৌঢ়বয়স্ক একটি ভদ্রলোককে ...সিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিবাস?"

"যদুপুর। নাম রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

গুরুমহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কোথায় গমন হয়েছিল? বসতে আজ্ঞা হ'ক, তামাক ...করুন।" একটি ছাত্র আদিষ্ট হইয়া কলাপাতা আনিয়া দিল; গুরুমহাশয় স্বহস্তে নল পাকাইয়া দিলেন। রামেশ্বরবাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে বলিলেন, ...নাদ, বেলা হচ্ছে, এখনও দু' ক্রোশ—"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "বেলাটা অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। আজ এখানে অবস্থান ক'রে আহারাদি—"

"না। তবে আপনাদের গাঁয়ে নদীর যে তক্‌তকে জল দেখে এলুম, তা'তে একবার স্নান কর্‌বার লোভ হচ্ছে।"

"স্নানাহার দুই-ই কর্‌তে হ'বে আপনাকে। আপনার মত মহৎ লোকের যদি গ্রামে পদার্পণ হয়েছে।—ওরে হরিধন, তোর ছুটী। দৌড়ে গিয়ে তোর মা'কে বল্‌গে, আর দু'জনের চাল নিতে।"

"যে আজ্ঞা"—বলিয়া চাটুর্য্যেদের হরিধন তাহার দপ্তর বাঁধিতে লাগিয়া গেল। গুরুমহাশয় বলিলেন, "আমি ঐ ব্রাহ্মণবাড়ীতে প্রসাদ পাই। নিজে আর এ বয়সে ভাত পুড়িয়ে খেতে পারি না, আর ওর বাপও ছাড়ে না। ওরা তিন পুরুষে আমার ছাত্র কি না।"

"আপনি জাতিতে?"

"বাগ্‌দী—"

"আপনার কথা আমি শুনেছি"—বলিয়া রামেশ্বরবাবু অন্যমনস্ক হইলেন।

"কিরূপে? মহাশয় ত এ অঞ্চলে নূতন বসবাস করেছেন।"

রামেশ্বরবাবু কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "হুঁ।"

এই অশীতিপর বাগ্‌দী গুরুমহাশয় এ অঞ্চলে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন; এবং এ প্রদেশে এমন কায়স্থ ব্রাহ্মণ সন্তান নাই—যিনি ইঁহাকে না জানেন এবং সম্মান না করেন। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে গুরুমহাশয়ের বৃত্তি নির্দ্ধারিত।

৪

হরিধনদের বড় ঘরখানির ভিতর রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আহারে বসিয়াছিলেন। দ্বারে গুরুমহাশয় খাইতেছিলেন। হরিধন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাওয়াইতেছিল। হরিমতি একখানি থালার উপর গোটাকয়েক ছোট বাটি আনিয়া দুয়ারে উঠিয়া পাশাপাশি রাখিল। তাহার পর তাহা হইতে একটি অম্বলের ও আর একটি কিসের বাটি রামেশ্বর বাবুর পাতের কাছে আগাইয়া দিয়া আসিয়া আর দুইটি বাটি গুরুমহাশয়ের পাতের কাছে দিতেই তিনি বলিলেন, "এ বুঝি হরিমতির ঠাকুরমা'র রসুই?"

রামেশ্বরবাবু একটু অম্বল চাখিতে চাখিতে হরিমতির দিকে চাহিয়া হরিধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগিনী?"

"হ্যাঁ।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "ওর আপন ভগিনী নয়। গ্রাম-সম্পর্কে।"

রামেশ্বরবাবু বলিলেন, "বড় সুশ্রী মেয়েটি।"

"কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীন।"

"কে আছে? কার কাছে থাকে?"

"ঈশ্বরই আশ্রয়দাতা। ওর বাপের এক পিসী আছেন। তিনিই মানুষ কর্‌ছেন।"

আহারাদির পর যখন চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্রাম করিবার জন্ম রামেশ্বরবাবু ও গুরুমহাশয় বাহিরে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে হরিমতির ঠাকুরমা সেই বাড়ীতে ঢুকিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন। রামেশ্বরবাবুর দৃষ্টি হঠাৎ তাঁহার মুখের উপর পড়াতে তিনি একটু মুখ সরাইয়া লইলেন।

বিশ্রাম করিতে করিতে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গ্রামে যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীটা কোনখানে?"

"যজ্ঞেশ্বর মুখুর্য্যের এই চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। এটা এখন চাটুর্য্যেদের হয়েছে। সে অনেক কথা। চল্লিশ বৎসরের বেশী হয়ে গেল বোধ হয়। যজ্ঞেশ্বর বহু ব্যয় করিয়া তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়স্কা কন্তার বড়কুলীনের ঘরে বিবাহ দেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তিন পুরুষে সে ঋণ শোধ হয় নাই। তা'র ফলে যজ্ঞেশ্বরের পৌত্র হরিমতির পিতার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি চাটুর্য্যেদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কেবল ঐ পাশের ঘর দুইখানি এবং সংলগ্ন জমী ইঁহারা উঁহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

"যজ্ঞেশ্বরবাবুর কন্তা কি জীবিত আছেন?"

"ঐ যিনি গেলেন। উনিই হরিমতিকে পালন করছেন।"

"শ্বশুরালয়ে থাকেন না? সেখানে কেউ নাই বুঝি?"

"বরাবরই উনি এই গ্রামে আছেন। শুনেছি, ওঁর স্বামী ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়ে খৃষ্টান হয়ে যাওয়াতে ব্রাহ্মণ-কন্তা তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

"তাহারা কোন খোঁজ করে নাই?"

"ঠিক জানি না। তাহারা গ্রামে একঘরে হয়েছিল; পরে জমীদারের পীড়নে বাস ত্যাগ ক'রে কলিকাতায় চ'লে যায়।"

৮

সন্ধ্যার পর হরিমতির ঠাকুরমা চরকা কাটিতেছিলেন। পাশে বসিয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া হরিমতি আপন মনে গাহিতেছিল,—

"চরকা আমার সোয়ামী পুত্, চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।"—

হরিধন ও তাহার মা'কে আসিতে দেখিয়া হরিমতির ঠাকুরমা বলিলেন, "এস মা। এমন অসময়ে যে? অতিথটি কখন্ গেলেন?"

"আজ তাঁর যাওয়া হয়নি। বৈকালে পাঁজরে কি একটা ব্যথা আটুকে ছিল। বাড়ীতে খবর দিয়েছেন, পাক্কী আনতে।"

"ওঁদের বাড়ী কোথা?"

"মস্ত লোক। যদুপুরের রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে।"

"এ রকমে লোক-জন সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়েছিলেন যে?"

"খেয়াল। সঙ্গের পাকটা বলছিল, বাবুর খেয়াল হ'ল হেঁটে যাবেন, বানে লোকের কি দশা হয়েছে দেখতে। আর ধনেখালিতে ফৌজের যে ছাউনী পড়েছে, তার 'সাহেবের' সঙ্গে দেখা করতে। সেই 'সাহেবের' কাছে নাকি পশ্চিমে কায করতেন।"

"ঐ দিবাড়ী যদুপুরে?"

"না। কলকেতার লোক। যদুপুর তালুক কিনে ঘরবাড়ী করেছেন। জল-হাওয়া ভাল ব'লে।"

"আজ রইলেন। তা হ'লে তোমার ত একটু ঝঞ্ঝাট রয়েছে।"

"হাঁ, মা। সেই জন্তেই এসেছি। তোমাকে একটু কষ্ট দেব। আমার ত জান, ছেলেপুলে নিয়ে—সকালে তোমার তরকারি দু'টোর ভারি সুখ্যাতি করেছিলেন।"

"কষ্ট কি, মা?"

"হরিমতিকেও নিয়ে চল। সেইখানেই—"

"না। ওর ভাত ঐ ঢাকা আছে। তোমরা চল, আমি এখনি ওকে খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

হরিধন তাহার মাতাকে আলোটা দেখাইয়া আসিয়া বসিয়া রহিল। হরিমতির খাওয়া হইলে তাহারা তিন জনে বাহির হইল। বানে রান্নাঘরটা এবং মাটীর প্রাচীরের খানিকটা পড়িয়া যাওয়াতে বাহিরের দরজায় চাবি দেওয়ার সার্থকতা ছিল না। বড় ঘরের দ্বারের শিকলটা তুলিয়া দেওয়াই ছিল এবং সে গ্রামে এমন কোন দুরাত্মা বোধ হয় ছিল না যে, সেই অজাতশত্রু

প্রাণশীলা ব্রাহ্মণ-কন্যার গৃহে চুরী করিবার কল্পনাও না হতে পারিত।

হরিধনদের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের পক্ষ হইতে কয়জন ভদ্রলোক রামেশ্বর বাবুকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় রামেশ্বর বাবুর সংসারের কথা উঠাতে ব্যক্ত হইল যে, তাঁহার সংসারে একটিমাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পৌত্র ব্যতীত আর আপনার বলিতে কেহ নাই।

উদ্ধব ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পৌত্রটির বিবাহ দিয়াছেন?"

"আজ্ঞা না। শীঘ্রই দিবার বাসনা আছে। এ গ্রামটিতে ত অনেক কুলীনের বাস দেখছি। সৎপাত্রী আছে?

"হুঁ। পাত্রী অনেক আছে। কিন্তু আপনার ঘরে বিবাহের মত—"

বাগদী গুরু মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বাবু বলিলেন, "সকালে সেই যে ফুটফুটে মেয়েটি এসেছিল—তার নাম কি বল্লেন—তারা আমাদের স্বঘর—"

"হরিমতি। আপনার পছন্দ হয়েছে না কি?"

"অমন শান্ত সুলক্ষণা মেয়ে আমি কখন দেখি নি।"

গুরু মহাশয় বলিলেন, "হ'লে বেশ হয়। কিন্তু বামুন-মা'র মত হবে কি? অত বড় ঘরে—"

মধু ঘোষ বলিলেন, "যা বলেছেন। বলা যায় না। আপত্তি হতেও পারে।"

প্রবীণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এত বড় শ্রীমান্ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া গ্রামেরও গৌরব। মধু, তুমি আমার নাম ক'রে কামিনীকে একবার বল্তে পার?"

হরিধন বলিল, "ঠাকুরমা এইখানেই আছেন। মা তাঁকে রান্না কর্বার জন্যে বলেছেন।"

উদ্ধব ভট্টাচার্য্য রামেশ্বর বাবুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওঁর রন্ধনের খ্যাতি দেশপ্রসিদ্ধ। লোককে খাইয়ে আতুর অনাথের শুশ্রূষা ক'রে এত আনন্দ—"

মধু ঘোষ বলিলেন, "বামুন-মা'র আমাদের জাত-বিচার নেই। হাড়ি, মুচি, দুলে, সবাই ওঁর ছেলে। উনি বলেন, পরমেশ্বর ত আর জাত সৃষ্টি করেন নি, মানুষই করেছে।"

রামেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিন্দা হয় না?"

"প্রথম প্রথম হয়েছিল। খৃষ্টানী ঝিউড়ী ব'লে গাঁয়ের মেয়েরা বিদ্রূপ কর্তেন। কিন্তু এখন এ গ্রামে এমন পাষণ্ড কেউ নেই যে, বামুনমা'কে দেবতার মত ভক্তি না করে।"

রামেশ্বর বাবু কি ভাবিতেছিলেন। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এমন বাড়ী থেকে মেয়ে নিয়ে যাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।"

বাগদী গুরু মহাশয় পরামর্শ দিলেন, "খাবার সময় আপনি কথাটা পাড়তে পারেন। বোধ হয়, বামুন-মাই পরিবেশন কর্বেন। উনি সকলের সুমুখেই বেরোন। ব্রহ্মচারিণীর মত—"

সকলে বলিয়া উঠিলেন, "সেই ভাল।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তবে এখন একবার হরিমতিকে দেখে রাখলে ভাল হয়। কথাটা উত্থাপন কর্বার আগে আপনার মন স্থির করা প্রয়োজন।"

"আমার মন স্থির হয়েছে। তবে এখন ভাগ্য।"

"তবু মেয়েটিকে আর একবার দেখা দরকার।"

"আচ্ছা। নিয়ে আসুন।"

গুরু মহাশয় হরিধনকে বলিলেন, "ডেকে নিয়ে আয়। কিছু বলিস নে। শুধু বল্বি, মশাই ডাক্ছেন, বুঝলি?"

যে আজ্ঞা বলিয়া হরিধন ছুটিল। এমন একটা কথা সকলকে শুনাইয়া দিবার জন্য তাহার মনটা আকুলিবিকুলি করিতেছিল। কিন্তু বাগদী গুরু মহাশয়ের হুকুমের খুণাক্ষরে এদিক ওদিক করিবার সাহস সে গ্রামে হরিধনের কেন, তাহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকেরও ছিল না।

হরিধনের সঙ্গে হরিমতি আসিয়া গুরু মহাশয়ের নিকটে দাঁড়াইল। তিনি রামেশ্বর বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "বাবুকে প্রণাম কর।" সে প্রণাম করিলে রামেশ্বর বাবু তাহার পিরহানের জেব হইতে দুইটি মোহর বাহির করিয়া দুই জনের হাতে দিলেন। হরিধন একটি লইল, কিন্তু হরিমতি রামেশ্বর বাবুর পায়ের কাছে মোহরটি রাখিয়া দিল।

হরিমতির ঠাকুরমাই রাত্রিতে পরিবেশন করিতেছিলেন। ভোক্তা তাঁহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া ব্রাহ্মণ কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিক্ষা? আমার কাছে?"

"হাঁ। আমার বাড়ীতে মেয়ে নেই। হরিমতিকে দান কর্‌তে হবে।"

গুরু মহাশয় বাহিরে আহারে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ওঁর পৌত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, মা।"

উদ্ধব ভট্টাচার্য্য, মধু ঘোষ প্রভৃতি দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলে বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ঘরও মেনে।"

হরিমতির ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, "আমাকে একটু বিবেচনা করার সময় দিতে হবে। ছেলেটি—

রামেশ্বর বাবু বলিলেন, "ছেলেটি যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে অবশ্য —"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "পছন্দ না হবে কেন?"

রামেশ্বর বাবু হরিমতির ঠাকুরমা'র মুখের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "সুরেশ্বরকে আমি এখানে পাঠিয়ে দেব। দেখে — ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার বলিলেন, "নিশ্চয়ই কামিনীর মত হবে। এ বিধাতার ভবিতব্য। নচেৎ আপনিই বা এখানে এরূপ ভাবে এসে পড়বেন কেন? আর হরিমতিকেই বা আপনার এত পছন্দ হবে কেন? ওর সৌভাগ্যবশতঃই —"

"না। অমন সুলক্ষণা মেয়ে। যদি হয়, সৌভাগ্য আমারই।"

৬

নিশীথ। হরিমতি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আজ তাহার ঠাকুরমা'র নিদ্রা হয় নাই। হরিমতির বিবাহের প্রস্তাবের আকস্মিক উত্থাপনে তাঁহার মনের উপর দিয়া ভূত-ভবিষ্যতের অনেক চিন্তা ভাসিয়া যাইতেছিল। নিজের বিবাহের কথা তাঁহার মনে ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু তৎসম্বন্ধে যে সকল কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার মনের গোপন স্থানে বেশ স্পষ্টভাবেই বিরাজ করিত। তাহাদের মধ্যে যেটির বেদনা এতকালেও লুপ্ত হয় নাই, সেটি এই যে, তাঁহার স্বামী একবার তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার পিত্রালয়ে আসিয়া বিধর্ম্মী বলিয়া দূরীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতও হয় নাই এবং স্বামীর আকার সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই নাই। কেবল মনে আছে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার কথা—"অমন সুন্দর মুখ, মুসলমানদের ম[illegible] লম্বা দাড়ি রাখ'তে কি বিশ্রীই দেখাচ্ছে।"

নিজের বিবাহিত জীবনের অসার্থকতার কথা ম[illegible] হইতেই বামুন-মা সস্নেহে নিদ্রিতা বালিকার মাথায় হা[illegible] দিয়া কি আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন, এমন সময় বাটী[illegible] কাহার পদশব্দ হওয়াতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন। আগন্তুক দরজায় করাঘাত করিল। গ্রামের লোকের বিপদ-আপ[illegible] হইলে রাত্রিতে তাঁহাকে ডাকিতে আসা নূতন নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উঠান হইতে তাঁহাকে না ডাকিয়া দুয়ারে উঠিয়া দরজায় করাঘাতই নূতন। যাহা হউক, কোন স্ত্রীলোক ছেলের হঠাৎ অসুখের 'টোট্‌কা' লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "কে গা?"

কে এক জন পুরুষের গলায় উত্তর দিল, "দরজাটা একবার খুল্‌তে হবে।"

আজন্ম এই গৃহে বাস করিয়া ভয় বা পাপের দেখা কখনও তিনি পায়েন নাই; সুতরাং দরজা খুলিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। কিন্তু তাহার পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি চমকিয়া না উঠিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেখানে নগ্নপদে, উপবীতশোভিত নগ্নগাত্রে রামেশ্বর বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মুখের ভাব, চক্ষুর আগ্রহ বর্ণনা করিবার নহে। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারিণীর, নারী সম্বন্ধে পুরুষের প্রবলতম মনোবৃত্তির বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা নিজের আজীবন সাধনা এবং স্বাতন্ত্র্যলব্ধ ও গ্রামবাসিগণের সশ্রদ্ধ ব্যবহার হইতে অজ্ঞাত নির্ভীকতার বলেই হউক, মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া তিনি গম্ভীর তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি? এমন সময়ে এখানে?"

"ভয় হচ্ছে, কামিনি! কোন দোষের কি লজ্জার কথা—"

বক্তার আপাদমস্তক উজ্জ্বলিত দীপশিখায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বামুন-মা বলিলেন, "কথা দোষের এবং লজ্জার নিশ্চয়ই। কিন্তু কেবলমাত্র আপনার পক্ষে। কেন না, চোখে দেখলেও এই চল্লিশ বছর পরে এ গাঁয়ের কোন লোকই আমার পক্ষে কোন রকম কু-ভাব মনে কর্‌তে পার্‌বে ব'লে—"

"হয় ত আমার দোষের এবং লজ্জার কথাই বটে। কিন্তু এখানে এই রকম অবস্থায় এসে পড়বার ইচ্ছাটাকে আজ

. . আমার মনের সমস্ত জোর দিয়েও টেনে রাখতে পারলুম . . তখন একান্ত নিরুপায় হয়েই—"

ঘরের ভিতর হইতে হরিমতি বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর-মা, একবার ওঠ, আমি বাইরে—"

রামেশ্বর বাবু হঠাৎ একটা ফুঁ দিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া . . চকিতে দুয়ার হইতে নামিয়া পইঠার পাশে অন্ধকারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ফুৎকারের বায়ু কামিনী ব্রাহ্মণীর . . দেশ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় হঠাৎ তাঁহার হাত কাঁপিয়া প্রদীপটা পড়িয়া গেল।

*　*　*　*　*

তখনও ভোর হয় নাই। হরিমতি ঘরের ভিতর ঘুমাইতেছিল। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কামিনী ব্রাহ্মণী বাহিরে দাওয়ার বসিয়া তাঁহাদের গত জীবনের কাহিনী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বলিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। এখনও কত কথা বাকি! কিন্তু এতদিন পরে সেই প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণীর মনে কেমন যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব লজ্জার ভাব আসিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। কাক-কোকিলের ডাক শুনিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "রাত্রি যে শেষ হয়ে এল।"

"হাঁ, যাচ্ছি। কিন্তু আবার ক'দিন পরে—"

"কি বলে আস্‌বে?"

"কেন, নাৎবৌএর ঠাকুর-মা ব'লে। তবে আস্‌ব' না, নিয়ে যাব।"

একটু মৃদু হাসি হাসিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন—"না, এ বুনো পাখীকে আর ঘরে পূরে কায নেই।"

"কেন, পোষ মান্‌বে না? সে দেখা যাবে। যে ভুল একবার হ'য়েছে, তা' আর হবে না। যদি এতকাল পরে নাতীর ঠাকুরমা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়—নাৎবৌএর ঠাকুরমা বল্‌তে ত লজ্জা হবে না।"

ভোরের আলো উঁকি মারিতেছে—দেখিয়া ব্রাহ্মণী ভারি গলায় বলিলেন, "সকাল হচ্ছে।"

রামেশ্বর বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার পদধূলি লইতেই তিনি দুই হাতে তাঁহার হাত দুইটা ধরিয়া আজীবনের আগ্রহভরা মিনতির স্বরে বলিলেন, "আমার ঘরে যাবে বল, কামিনী। কথা দাও, আমার সারাজীবনের সব ত্রুটি—

"বল্‌তে নেই। তোমার কোন ত্রুটি হয় নি।"

"যাবে? সত্য কর।"

ঘরের ভিতর শব্দ হইল। হরিমতি উঠিতেছিল। তাহার ঠাকুর-মা ত্রস্তে বলিলেন, "হাঁ।"

৭

হরিমতির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের সমস্ত লোক সে বিবাহে পরমানন্দে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু বিবাহের কয়েক দিন পরেই যখন তাহার দাদাশ্বশুরের একান্ত আগ্রহে এবং তাঁহার গৃহিণীহীন গৃহে কর্তৃত্ব করিবার লোকাভাবের ওজরে হরিমতির ঠাকুরমা'কে তাঁহার পিতৃবাস্তু ত্যাগ করিয়া তাহার শ্বশুরবাড়ীর গৃহিণী হইতে হইল, তখন বৃদ্ধ বাগদী গুরুচরণের হইতে বালক হারাধন পর্য্যন্ত, সে গ্রামের সকলেই রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, "রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে আমাদের গ্রামের লক্ষ্মী হরণ ক'রে নিয়ে গেল।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার।

নিন্দা নয়

নিন্দা আমারে যত পার করো
　　মন্দ বলো না কবিতা মোর;
তৈরি সে মোর সুখ-দুখ দিয়া
　　সে মোর গলান নয়ন লোর।
চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা
　　প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে তা'তে,—
সঙ্করে যেথা করুণ-রাগিনী
　　মধু-মাধবের মধুর রাতে।

শরৎ-গগনে হাসির লহরী
　　উমা-আগমনে ফুটেছে আসি;
সেখানেও পাবে মোর কবিতার
　　অশ্রু-মাখান' সরস হাসি।
বরষার রাতে শীতের প্রভাতে
　　সে মোর বুকের কাহিনী বহে;
প্রাণ আছে যা'তে ওতঃপ্রোতভাবে;
　　মন্দ হ'লেও নিন্দ্য নহে।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

"হাড়গিলা" বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরীতেও ইহাকে স্বাধীন অবস্থায় সৌধশিরে অবস্থান করিতে দেখা যাইত। ইদানীং নানা কারণে ইহাকে আর সহরের ভিতরে দেখা যায় না। ইহার বৃহৎ বপু, লম্বা লম্বা পা, দীর্ঘ কণ্ঠ ও তৎসংলগ্ন পেটিকা, নাতিহ্রস্ব চঞ্চু, নির্লোম তুণ্ড, বিশাল পক্ষ দেখিয়া কোনও কোনও বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিৎ হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই; যেন কৌতুকময়ী প্রকৃতিদেবী হাস্যরসের অবতারণা করিবার জন্যই ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মিঃ ডেওয়ারের ভাষায় বলিতে গেলে—The adjutant bird is one of Nature's little jokes. যখন কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসের সন্নিকটে দলে দলে হাড়গিলা বিচরণ করিত, তখন গোরা সৈনিকগণ মাংসখণ্ডের প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদের সহিত রঙ্গতামাসা করিত, এমন বর্ণনাও পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে লইয়া কৌতুক করিতে কাহারও কি প্রবৃত্তি হইতে পারে? বাইবেলে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ঘৃণামিশ্রিত;—যেন (বাইবেলের ভাষায় বলিতে গেলে) একটা abomination। সেখানে কৌতুকের কোনও লক্ষণই নাই। সে শকুনির মত গলিত শবভুক্, আবর্জ্জনার মধ্যে আহার অন্বেষণ করে; তাহার চলা-ফিরা, ভাবভঙ্গী অনেকটা শকুনির মত; তাহার লোমহীন তুণ্ড, লোমহীন গল-সংলগ্ন প্রলম্বিত চর্ম্মপেটিকা, ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ চক্ষু, এক প্রকার অব্যক্ত কর্কশ কণ্ঠস্বর, দেহের অবসাদ-সূচক জাড্য,—ইহাদের সমবায়ে "হাড়গিলা" মানুষের চোখে চিরদিন অসুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া আসিতেছে। অতি দীর্ঘ সরু পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া যখন সে দ্রুত চলিতে চেষ্টা করে, অথবা বকের মত এক পায়ের উপর ভর দিয়া যখন সে চুপ করিয়া কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহাকে দেখিয়া কাহারও চক্ষুবিনোদন হয় না বটে, কিন্তু যিনি তাহাকে বিচিত্র লীলাভঙ্গীসহকারে হ্রদতড়াগের উপর দিয়া আকাশমার্গে উড়িতে দেখিয়াছেন, তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আতুণ্ডচরণ সমস্ত দেহখানা ঋজুভাবে প্রলম্বিত হইয়া চক্রাকারে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইবার সময় সে আর কৌতুকের কিংবা ঘৃণার পাত্র থাকে না,—সে যেন কতকটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গিরি-গাত্রে অথবা সৌধশিরে যখন সে একাকী অবস্থান করে, তখন তাহার সহজ গাম্ভীর্য্য আমাদের কৌতুকপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলে না। বরঞ্চ মনে হয়, যেন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভূমিতলে যাহার আলস্যমন্থর গতি প্রায় স্থাণুত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, সহসা কোন্ মায়ামন্ত্রবলে তাহা রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে প্রবল পক্ষনির্ভরশীল পতত্রীতে পরিণত করিয়া ধূলিম্লান ভূমিতল হইতে বহু উর্দ্ধে লইয়া গেল? পাষাণাসনে উপবেশন করিয়া সে যেন ভাবিতেছে—'আমি হীন নহি, আমাকে হেয় মনে করিও না।'

বাস্তবিক ভদ্র বিহঙ্গ-সমাজে সে অপাংক্তেয় কি না, সে আলোচনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু মনুষ্য-সমাজে অনেকেই তাহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে প্রস্তুত নহেন। পশ্চিম এসিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসিগণ তাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। তুর্কীরা তাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন। মরক্কো ও মিশরের জনসাধারণ হাড়গিলাকে অশ্রদ্ধা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করেন। ভারতবর্ষে ইহাকে হনন করা নিষিদ্ধ।

মানব-সমাজের দিক্ হইতে দেখিতে হইলে ইহাকে আমাদের উপকারী বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। গ্রামে ও নগরে municipalityর কোনও সুব্যবস্থা হউক বা না হউক, আবহমানকাল হাড়গিলা গ্রামস্থ বা নগরোপকণ্ঠস্থ আবর্জ্জনারাশি দূরীভূত করিয়া

অযাচিতভাবে মানব-সমাজের স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছে। আমাদের এই কলিকাতা সহরে কিছুকাল পূর্ব্বে যখন municipality সহরের পরিচ্ছন্নতা সম্যক্ রক্ষা করিতে পারিত না, স্থানে স্থানে ভূরি পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা অথবা গবাদি পশুর শব নগরের স্বাস্থ্য দূষিত করিত, তখন এই হাড়গিলা ঐ সমস্ত ময়লা অপসারিত করিয়া আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিত। ক্রমে স্বাস্থ্য বিধায়ক সুব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হাড়গিলার প্রয়োজন হ্রাস পাইলে উহার সম্পূর্ণ তিরোভাব হইল।

শবের অস্থিগুলা পর্য্যন্ত উদরসাৎ করে বলিয়া বোধ করি ইহার "হাড়গিলা" নামকরণ হইয়াছে। বাস্তবিক সে যে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর কোন বিহঙ্গ এরূপভাবে মানব-সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করে না। সেই জন্যই বোধ করি আচারে-অনুষ্ঠানে, আহারে-বিহারে "হাড়গিলা" তাহার জ্ঞাতিবর্গ হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগত পূতিময় আবর্জ্জনার মধ্যে যে সকল বিহঙ্গকে খাদ্যান্বেষণ করিতে হয়, নৈসর্গিক বিধিব্যবস্থায় তাহাদের দেহের বা দেহাংশের ভিন্ন রকম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। গৃধ্রের কণ্ঠের ও শিরোদেশের লোমহীনতা এই জন্যই সম্ভাবিত হইয়াছে। হাড়গিলার স্বভাব অনেকটা গৃধ্রের মত বলিয়া তাহার কণ্ঠ ও শিরোদেশ লোমহীন,—এরূপ অনুমান অমূলক নহে। উভয়ের চলাফিরা, দাঁড়ান-বসা — সমস্তই কতকটা অসুন্দর।

কিন্তু Stork বা হাড়গিলা-পরিবারের অন্য পাখীগুলা বাস্তবিকই অসুন্দর নহে। তাহাদের বিশাল দেহ উজ্জ্বল বর্ণানুরঞ্জিত বলিয়া সহজেই আমাদের চিত্তাকর্ষক। শ্বেত ও কৃষ্ণকায় "হাড়গিলা" (Stork) এ দেশে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ, তাহারা প্রব্রজনশীল, তাহাদের সন্তানজননসময় উপস্থিত হইলে য়ুরোপের এবং এসিয়ার অনুকূল প্রদেশে উড়িয়া গিয়া তাহারা নীড়-নির্ম্মাণ করে। এই বিহঙ্গগণ তথায় কিরূপ ভাবে আদৃত হয়, তাহা তথাকার অধিবাসিগণের আচরণ দেখিলে জানা যায়। যাহাতে ঐ পাখীরা তাহাদের গৃহের ছাতে বাসা প্রস্তুত করে, তজ্জন্য

তাহাদের চেষ্টা ও সাধ্যসাধনার ত্রুটি হয় না। এক প্রকার গাড়ীর চাকায় Stork পাখী নীড়-নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসে এবং একবার কোথাও ঐ চাকায় বাসা প্রস্তুত করিলে প্রতি বৎসর সেই স্থানে বাসা তৈয়ার করিবেই,—ইহা জানিয়া লোকরা নিজ নিজ গৃহের অংশবিশেষে ঐ চাকা রাখিয়া দেয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেও সাদা Storkকে বাসা প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। কৃষ্ণকায় Stork কিন্তু ভারতে অতি বিরল; শীতকালে কোথাও মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে দুইটা তিনটা পাখী দৃষ্ট হয়। গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে চিল্কা হ্রদের একটা অত্যুচ্চ শৈলশিখরে একটা কালো Storkকে লক্ষ্য করিয়া তাহার উড্ডীনভঙ্গী দেখিবার মানসে বন্দুকের শব্দ করিলাম। বিপুল লবণাম্বুরাশিবেষ্টিত সর্ব্বোচ্চ শৈলশিখরে আসীন রহিয়া সে আততায়ীর হাত হইতে আপনাকে স্বচ্ছন্দে নিরাপদ মনে করিতে পারিত। আমরা আগে হইতেই নৌকায় অগ্রসর হইবার সময় তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। পাহাড়ের যে ধারেই আমাদের ডিঙ্গী অগ্রসর হইতেছিল, সেই দিকেই ঐ সুদেহ কৃষ্ণকায় পাখীটি তাহার নজর ফিরাইয়া ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সচকিত স্বভাব ও মানবভয়ভীরুতার পরিচয় দিতেছিল। যখন বন্দুকের শব্দ করিলাম তাহাকে আসনচ্যুত করিয়া আমি আমার সহযাত্রীর বিরক্তিভাজন হইলাম বটে, কিন্তু পাখীটার উৎপতনভঙ্গী দেখিয়া আমরা উভয়েই মুগ্ধ হইলাম। স্থানভ্রষ্ট Stork পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে নামিয়া আসিল, অপর কয়েকটি Storkএর সহিত মিলিত হইয়া জলরাশির সহিত প্রায় সমরেখ হইয়া জল হইতে কিছু উর্দ্ধে উড়িতে লাগিল —আমরা দূরবীক্ষণ সাহায্যে অবাক্ হইয়া নিরীক্ষণ করিলাম।

সাদা হাড়গিলার (Stork) অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন প্রীতিপ্রদ, কালো Storkএর পত্ররশোভা তেমনই নয়নমুগ্ধকর। উভয়ের চঞ্চুচরণ লোহিতবর্ণ, কিন্তু সাদা Storkএর সমস্ত দেহ তুষারশুভ্র, কেবল ডানার পালক কয়েকটা কাল; কৃষ্ণকায় বিহঙ্গটির সুচিক্কণ অসিতবর্ণের মধ্যে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দীপ্যমান, কেবল পেটের দিক্‌টা শুভ্র। উজ্জ্বল, সুচিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণের সংযোগে সাদা রঙ্গের পারিপাট্য বড়ই মনোরম হয়, তজ্জন্য Stork পরিবারস্থ অধিকাংশ পাখীকেই এত সুশ্রী দেখায়। Jabiru নামে পরিচিত কৃষ্ণকণ্ঠ হাড়গিলার এই উভয় বর্ণের বিন্যাস প্রকৃতির নিপুণ তুলিকায়

মদনটাক্ এবং সাদা ও কাল হাড়গিলা।

এত চমকপ্রদ হইয়াছে যে, পাখীটার রূপের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে না করিয়া থাকা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার অত্যন্ত নিকট-জ্ঞাতিবর্গ Jabiru নামেই পরিজ্ঞাত। ভারতীয় পাখীটার পা লাল, কিন্তু ঠোঁট কালরঙের। সে স্বভাবতঃ লাজুক, সেই নিমিত্ত দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে না, কচিৎ দুইটাকে একত্র দেখা যায়। ইহারা প্রব্রজনশীল নহে। হিন্দুস্থানে "মাণিকজোড়" নামে পরিচিত সিতিকণ্ঠ হাড়গিলাকে সাদা ও কাল হাড়গিলার ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলেও চলে। Stork পরিবারস্থ সকল পাখীর মধ্যেই দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহ এত বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, মাণিকজোড় শব্দটির প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিহঙ্গবিশেষের প্রকৃতি যখন এত পরিস্ফুটভাবে বাহির হইয়া পড়ে, তখন জনসাধারণেরও যে তাহা গোচরীভূত হইবে, আশ্চর্য্য কি? Stork দম্পতি পরস্পর এত আসক্ত যে, উভয়ে একত্র বিচরণ করে, পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এমন কি, হাড়গিলা-পরিবারস্থ যে সকল পাখী দলবদ্ধ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকে, তাহারাও সন্তানজননকালে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী সুরু করিয়া দেয়। এই সময়ে তাহাদের আচরণ লক্ষ্য করিলে "মাণিকজোড়" আখ্যার যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

Stork পাখী স্বভাবতঃ মূক; কিন্তু সে যৌনসম্পর্কে মৌনব্রত অবলম্বন করে না। সহসা যেন তাহার প্রকৃতিগত জড়তা পরিহার করিয়া, সে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচিত্রভঙ্গীতে লীলায়িত করে; নৃত্য এবং পক্ষসঞ্চালনে সে তাহার প্রেম ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় চঞ্চুদ্বয়-সংঘর্ষে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করে। নীড়মধ্যে ডিম্বোপরি উপবিষ্টা স্ত্রীপক্ষী যখন তাহার কণ্ঠ প্রসৃত করিয়া সূর্য্যকরোত্তপ্ত দীর্ঘ দিবস যাপন করে, পুংপক্ষী তখন এক পায়ে ভর দিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রীতিপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে; কখনও বা স্ত্রীপক্ষীটির কণ্ঠদেশে নিজ কণ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অধর কণ্ডুয়ন করিতে থাকে, অথবা উহার পৃষ্ঠদেশে নিজ চঞ্চু বিন্যস্ত করিয়া রাখে।

ভারতবর্ষে যে সকল হাড়গিলা (Stork) নীড় রচনা করে, তাঁহাদিগকে উচ্চ-বৃক্ষশাখায় সুবৃহৎ বাসা প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। অধিকাংশ পাখীই দল বাঁধিয়া নিকটবর্ত্তী গাছপালার শাখাপ্রশাখায় গৃহস্থালী আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময় অতি দীর্ঘকায় পাখীগুলা তাহাদের লম্বা গলা প্রসৃত করিয়া চঞ্চুপুটে কাঠিকুঠি লইয়া বিস্তৃত-পক্ষভরে যখন ক্রমাগত নীড়সমীপে আনাগোনা করিতে থাকে, অথবা দলবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তখন তাহারা মানুষের নজর এড়াইতে পারে না। এত বড় পাখীর সমকক্ষ বিহঙ্গ ভারতবর্ষে বিরল।

যতগুলা Storkএর উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে Jabiru আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইলেও "হাড়গিলার" চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত মাপিয়া দেখিলে তাহার পরিমাপ Jabiru অপেক্ষা এক ফুট বেশী দাঁড়ায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "হাড়গিলার" চেহারায় মোটেই পারিপাট্য নাই। তাহার গলদেশ হইতে প্রলম্বিত চর্ম্মপেটিকা, যাহা সে স্বেচ্ছায় স্ফীত করিতে পারে — সহজেই যেন তাহাকে অপর সমস্ত Stork হইতে পৃথক করিয়া দেয়। বাস্তবিক এই পেটিকার প্রয়োজন কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। হাড়গিলার আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সে একেবারে নির্ব্বাক্ নহে। কেবলমাত্র চঞ্চুদ্বয়ের সংঘর্ষে শব্দ উৎপন্ন করিয়া সে সন্তুষ্ট হয় না, কারণ, তাহার কণ্ঠস্বর আছে।

বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে আর এক শ্রেণীর হাড়গিলা দেখা যায়, যাহার স্বভাব অনেকটা পূর্ব্বোক্ত পাখীর ন্যায়; তবে তাহার গলদেশে ঐ চর্ম্মপেটিকা নাই, আয়তনেও সে অনেক ছোট। "মদনচূড়" বা "মদনটাক্" আখ্যায় সে পরিচিত। হাড়গিলার ন্যায় তাহার শিরোদেশ কতকটা লোমহীন বটে; কিন্তু তাহার ঘাড়ের উপর কয়েকটা পালক আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ঐ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। হাড়গিলার ন্যায় খাদ্যসংগ্রহের জন্য সে-ও নগরোপকণ্ঠস্থ আবর্জ্জনারাশির মধ্যে দিনযাপন করে। এই পাখীর পুচ্ছদেশস্থ নিম্নস্তরের পালকগুলা য়ুরোপীয়দিগের বেশভূষায় ব্যবহৃত হয়। আরও দুইটা Stork ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়,—তাহাদের আয়তন, চঞ্চুর আকৃতি এবং বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন পর্য্যায় (Species) ভুক্ত করা হইয়া থাকে। ইংরাজের নিকট একটি Painted Stork, অপরটি Open-billed Stork

বলিয়া পরিচিত। শেষোক্ত পাখীটি সব চেয়ে ছোট, প্রধানতঃ মৎস্যাশী এবং ইহার ঠোঁট এমন বক্রাকারে গঠিত যে, উভয় চঞ্চু একত্র করিলে অগ্রভাগ মিলিত হয় বটে, কিন্তু মাঝখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক রহিয়া যায়।

ঠিক জলচর না হইলেও Stork পরিবারস্থ অনেক পাখী জলাভূমিসান্নিধ্যে আহার অন্বেষণ করে। ভেক, মূষিক, সর্প, কর্কট, মৎস্যই ইহাদের প্রধান আহার; "হাড়গিলা" ও তাহার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় পাখীগুলা কিন্তু শবভুক্। সন্তরণে যে ইহারা অপটু নহে, তাহা তাহাদের অঙ্গুলির গঠন দেখিলেই বুঝা যায়। ইহারা স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। ভারতীয় অনেক Storkই গাছপালায় নীড় বাঁধিতে অভ্যস্ত। ভূমিতে ইহাদের বসিবার ভঙ্গী বড়ই বিচিত্র,—যেন জানু মুড়িয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। আহারান্বেষণকালে ইহাদের পক্ষে ধৈর্য্য ও সংযম একান্ত প্রয়োজন বলিয়া ইহাদের স্বভাবে কতকটা আলস্য ও জাড্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত স্বাভাবিক বাক্‌শক্তিহীনতা ইহাদের জীবনের নিস্পৃহতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাখীগুলার দীর্ঘ চঞ্চু এবং বিশাল বপু সহসা উড়িবার চেষ্টায় কতকটা বাধা প্রদান করে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন তাহারা একেবারে ব্যোমমার্গে অধিরোহণ করে, তখন বিস্তৃত পক্ষভরে তাহারা কত উর্দ্ধে এবং কত শীঘ্র দেশদেশান্তর, নদ-নদী, সাগর-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে থাকে, তাহার হিসাব রাখা দুষ্কর। পাখীর গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবনকল্পে জর্ম্মণীতে যে পক্ষিপর্য্যবেক্ষণ-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া জানা গিয়াছে যে, Stork শিশু তাহার জন্মস্থান হইতে পাঁচ ছয় হাজার মাইল দূরে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া যাইতে সমর্থ। জন্মস্থান মধ্য-য়ুরোপ পরিত্যাগ করিয়া একদল Stork ভূমধ্যসাগর পার হইয়া প্রায় যখন আফ্রিকা মহাদেশ অতিক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে উক্ত পর্য্যবেক্ষণ-মন্দির-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাহারা বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই এই পাখীগুলার পায়ে রিং (band) পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই রিং দেখিয়া জন্মস্থান হইতে এত দূরে পাখীগুলাকে সনাক্ত করিতে পারা গিয়াছিল।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

আসিব

১

দীপ জ্বেলে রেখো দীপ জ্বেলে রেখো
দীপগুলি রেখ জ্বেলে,
নয়নের জল ফেল নাক কেহ
এ তরী সুদূরে গেলে।
রেখো গৃহ সাজাইয়া
অঙ্গন ঝাঁট দিয়া,
মোর গাঁথা মালা হেলায় যেন গো
ধূলায় দিও না ফেলে।

২

যাহা ছিল সব রেখে দিয়ে গেনু
ফিরাইয়া দিনু চাবি,
কি দিতে আমার ভুল হয়ে গেছে
বারবার তাই ভাবি।
কয়েছি যে রূঢ় কথা,
দিয়েছি যে সব ব্যথা
আজ ক্ষম তাই ধুয়ে দিয়ে যাই
নয়নের জল ঢেলে।

৩

যে বীজ রোপেছি অঙ্কুর যার
এখনো হইতে বাকি,
দিও জলধারা তারি কাছে মোর
এ হৃদয় গেনু রাখি।
যাহা এতদিন ধরি
গেনু আধগড়া করি
হয় ত তাহাও সাঙ্গ হইবে
সবার সোহাগ পেলে।

৪

শুভ্র পালেতে লাগিয়াছে হাওয়া
তরী মোর ছাড়ে ছাড়ে,
সুনীল আকাশ আলোভরা আজ
জোছনা খেলিছে দাঁড়ে।
নিভায়ও না দীপ শোনো
এক সুনিশায় পুনঃ
আসিবে এ তরী নব গৌরবে
কনক পক্ষ মেলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কৈলাস-যাত্রা

ত্রয়োদশ অধ্যায় (শেষাংশ)

প্রাতঃকাল হইল। তাকলাকোট গমনের উদ্যোগ করা গেল। কেহ কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এই স্থানে কিছু ভোজন করিয়া গমন করিলেই ভাল হয়। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না; সুতরাং গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। অসময়ে লামা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তাঁহার লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া বিদায় লইলাম; আমার শ্রদ্ধার সহিত সম্মান-প্রদর্শনের কথাও নিবেদন করিয়া পাঠাইলাম। লামা মহাশয় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রায় ৬টার সময় শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া খোজরনাথ পরিত্যাগ করিলাম। কর্ণালীর তট দিয়া গমন করিয়া একটু উচ্চ স্থানে উঠিয়া মন্দিরের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া লইলাম। সূর্য্যদেবের উদয়ের সহিত মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের পাহাড়ের আর তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম—সুহাসিনী প্রকৃতি দেবী যেন স্মিতহাস্যে আমাকে বিদায় প্রদান করিলেন। একটু গমনের পর খোজরনাথের মন্দির চিরকালের জন্য আমার চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। আত্মীয়-বন্ধু প্রভৃতির জন্য মনটা যেন ব্যাকুল হইল। প্রিয়জনসহ মিলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য ভোগ করিলে না জানি কতই মধুর বোধ হইত।

কিয়ৎকাল গমন করিবার পর এক দল তীর্থযাত্রী অশ্বারোহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচয়ে অবগত হইলাম, তাঁহারা চুম্বী উপত্যকা হইতে আগমন করিয়াছেন। প্রায় ৬ মাস হইল তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি—তাঁহাদের আনন্দ, ফুর্ত্তি ও মুখশ্রীতে তেজস্বিতা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম। দলপতি মহাশয়, আমি বাঙ্গালী অবগত হইয়া, ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতায় গমনবিষয়ক অভিজ্ঞতার কথা কহিলেন। এই দলের মধ্যে এক জন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। দলপতি মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার মুখশ্রীতে একটু অপূর্ব্বত্ব ছিল—একটু দেবভাব ছিল। প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিলাম। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গী করিতে পারেন কি না, সে বিষয় অনুসন্ধানও করিলাম। দলপতি মহাশয় পথের কঠোরতা, আর ভোজনাদির ক্লেশের কথা কহিলেন, আমি তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইব না বলিয়া তিনি স্মিতহাস্যে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। খোজরনাথ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাকলাকোটে আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া গমন করিলেন।

এই অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহাদের সহিত যেন আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইয়াছিল—আমরা পরস্পর হৃদয়ের কথার আদান-প্রদান করিয়াছিলাম। সেই জন্যই উভয় হৃদয়ের সম্মিলন হইয়াছিল। যে ভাষায় আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম—যে ভাষার প্রভাবে সে সময়ের জন্য আমরা এক-হৃদয় হইয়াছিলাম—তিব্বতের এই নির্জ্জন প্রদেশে যে ভাষার জন্য আমার স্মরণীয় হইয়া আছে, সেই হিন্দীভাষা এক দিন ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ কথা চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রাস্তা অত্যন্ত নির্জ্জন—বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণে মস্তক যেন পুড়িয়া যাইতেছে, শীতে পা যেন খসিয়া যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় আমি যখন একাকী গমন করিতেছিলাম, সেই সময় ৬ জন অশ্বারোহী, পৃষ্ঠে বন্দুক, কটিতে তরবারি বাঁধিয়া আমার নিকট দিয়া গমন করিল। তাহারা আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে একটি স্ত্রীলোক অশ্বারোহণ করিয়া পুরুষদের ন্যায় অস্ত্র-শস্ত্র-সুসজ্জিতা হইয়া গমন করিতেছিল। আমার নিকট আসিলে আমি তাহার লক্ষ্যের বিষয় হইলাম। সে তাহার মস্তকের আবরণ উত্তোলন করিয়া ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহার দেখিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমার

চক্ষুতে চক্‌চকে নিকেলের চশমার উপর বোধ হইল যেন তাহার লোলুপদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। যখন সে আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া দ্রুতবেগে অশ্বপরিচালনা করিল, তখন আমার সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া আসিল। যখন সেই দানবী যমরাজসহোদরসম পুরুষের সহিত কিছু কথা কহিয়া আমার দিকে আগমন করিতে লাগিল, তখন আমি আত্মরক্ষাবিষয়ক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। ইষ্টদেবতা, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, প্রিয়জন প্রভৃতির কথা বিদ্যুল্লেখার মতন আসিল ও চলিয়া গেল। মৃত্যুর জন্ম আমি কাতর নহি, কিন্তু কাপুরুষের মত মরিব না; অতএব এখন কি করিব, কেমন করিয়া বিপুলবলশালী সশস্ত্র দস্যুকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করিব, কেমন করিয়া বিদেশে বিভূমে শরীরটা রক্ষা করিব, এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া আমাকে আকুল করিয়া ফেলিল। একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম—ইহাদিগকে এরূপ ভাব দেখাইব যে, ইহারা স্তম্ভিত হয়; ইহারা মনে করে, আমি ইহাদের সমবেতশক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী—আমার নিকট ইহারা তুচ্ছ হীনাদপি হীন। যখন দস্যুরা আমার ২০ হাত দূরবর্ত্তী হইল, তখন আমার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাদের দিকে ২।৪ পা অগ্রসর হইলাম। অট্ট অট্ট হাস্ত করিয়া—অবশ্য দাঁতের হাসি হাসিয়া—তাহাদিগকে দেখাইয়া পকেট হইতে চশমার খাপখানি রিভলবারের ন্যায় ধরিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলাম—আমার এ ভাষায় বাঙ্গালা, হিন্দী, দুই চারিটা যাহা তিব্বতী শিখিয়াছিলাম, সেই সকলের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ভাষা রচনা করিয়া কহিলাম—"সাবধান যদি আর এক পা অগ্রসর হও, তাহা হইলে যমলোকের অতিথি হইতে হইবে।" এই বলিয়া আমি আমার চশমার কোষ তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলাম। তাহারা সম্মোহিত হইল—আর অগ্রসর হইল না; যেন স্পন্দনহীন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিল। যখন বুঝিলাম, আমার উপায়ে ফল ফলিয়াছে, তখন তাহাদিগকে আবার ভরসা দিলাম, "চলিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে হত্যা করিব না। আমি তীর্থযাত্রী"। হস্ত দিয়া বার বার তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলাম। মন্ত্র-মহৌষধি-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় যখন তাহারা বিনত হইয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইল, তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। এই অদ্ভুতপূর্ব্ব বিজয়লাভে মনে মনে অর্জ্জুন-সখা শ্রীভগবচ্চরণে অসংখ্য প্রণাম করিলাম।

আমি সিংহের ন্যায় গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়া আমার গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কেবল একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাহাদের গতি দেখিয়া লইলাম। পাছে তাহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে পশ্চাতে চাহিতে শঙ্কা হইতেছিল। এইরূপে যমের মুখ হইতে—সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইতে রক্ষা পাইলাম। যে সময় আমি দস্যুদিগকে এইরূপে অভিভূত করি, সে সময় আমার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল, আমার সমস্ত শরীর স্বর, এমন কি আমার

চশমার খাপ হস্তে শাস্ত্রী।

খতবর্গের সুদৃঢ় দন্তপংক্তিও আমার এই সম্মোহন ব্যাপারে কম সাহায্য করে নাই।

১৪।১৫ হাজার ফুট উচ্চ ভূমির উপর দিয়া আমাকে এ সময় চলিতে হইয়াছিল। এ স্থানে শুষ্ক বায়ু শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা আনয়ন করিয়া আমাকে একটু অবসন্ন করিয়াছিল। পুরাতন তেঁতুল আর মিছরী পকেটে রাখিতাম। তাহা মুখে রাখিয়া শুষ্ক গলাকে সরস করিয়াছিলাম। ক্ষুধার্ত্ত হইলেও রাস্তায় কোন প্রকার খাবার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। দিবা প্রায় ১টার সময় ৯।১০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাকলাকোটে ভুটিয়া-বাজারে উপস্থিত হইলাম।

আমার সঙ্গীরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমার রাস্তার বিপদের কথা আমি সকলের কাছে বিবৃত করিলাম। এক জন সঙ্গী কহিল, "আমি সঙ্গে থাকিলে প্রস্তর ছুড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতাম।" এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, "ভগবান্ এইজন্যই বোধ হয়, তোমাকে আমার সঙ্গে রাখেন নাই। তুমি সঙ্গে থাকিলে বিপদ্ ঘনীভূত হইত, আর দস্যুদের হস্ত হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না।" তিব্বতী নর-নারী প্রস্তরচালনায় অভ্যস্ত। এ কায তাহারা শিক্ষা করিয়া থাকে। শারীরিক বলে সেই স্ত্রীলোকটি অবলীলাক্রমে আমার মত ১০ জনের নিগ্রহ করিতে সমর্থা ছিল।

এই ঘটনা শুনিয়া ভুটিয়ারা আমাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। এক জন তাঁহার কর্ম্মচারীর নির্ব্বুদ্ধিতা ও অর্থহানির কথা দুঃখের সহিত কহিলেন। কিছু দিন হইল, তিনি তাঁহার এক কর্ম্মচারীর হাতে ৪ শত টাকা দিয়া কিছু ভেড়ার লোম ক্রয় করিতে পাঠান। যে রাস্তা দিয়া ভুটিয়া যাইতেছিল, সেই রাস্তায় এক জন লামা ধর্ম্ম-চক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপস্থিত হয়। ভুটিয়া তাহাকে ডাকাইতদের অগ্রদূত বিবেচনা করিয়া অতি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া একটা পাথরের নীচে সমস্ত টাকা লুকাইয়া রাখে। ভিক্ষুক লামা, ভুটিয়ার কার্য্য দূর হইতে দেখিতে-ছিল। ভুটিয়া চলিয়া না গিয়া সেই স্থানের আশপাশে গমনাগমন করিতে থাকে। লামা যে সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তখন ভুটিয়া একটু দূরে চলিয়া গেল। যে স্থানে ভুটিয়া টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানের পাথর সরাইয়া লামা সমস্ত টাকা হস্তগত করিল। ভুটিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে আসিয়া নিম্ন হইতে লামাকে আক্রমণ করিল। লামা উপর হইতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ভুটিয়াকে বিবশ করিয়া ফেলিল। ভুটিয়াকে পরাভূত দেখিয়া লামা মহাশয় উপরে উঠিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন।

অনেক সময় অবকাশ পাইলে সাধুও অসাধু হইয়া থাকেন। ভুটিয়া যদি বিভীষিকাগ্রস্ত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার অর্থনাশ হইত না।

ভুটিয়া বন্ধুরা আমার আত্মরক্ষা, দস্যুগণকে সম্মোহিত করা প্রভৃতি বিষয় লইয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিয়া-ছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তাকলাকোট হইতে কৈলাস প্রায় ৪ দিনের রাস্তা। কৈলাসের এত নিকটে আসিয়া অভীষ্ট স্থানে না পৌঁছিয়া তাকলাকোটে অবস্থানটা যেন বিষের মতন বোধ হইতে লাগিল। তাকলাকোটে যে কয়দিন ছিলাম, আমার দুইটি কার্য্য ছিল—প্রথম, শীঘ্র শীঘ্র কৈলাস যাইবার জন্য ভুটিয়া যাত্রিগণকে উৎসাহিত করা—আর তাকলাকোটের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল পরিদর্শন করা।

ইতঃপূর্ব্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, এ বৎসর কৈলাসের কুম্ভের বৎসর—তিব্বতীদের "ঘোটক-বৎসর"। এই ঘোটকের আবার বিভিন্ন বিভিন্ন নাম আছে। যথা,—অগ্নি-ঘোটক, জল-ঘোটক, লৌহ-ঘোটক, কাষ্ঠ-ঘোটক প্রভৃতি। এই ঘোটক-বৎসরে যেমন বহু দূরদেশ হইতে যাত্রিদল পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ দূরদেশ হইতে প্রসিদ্ধ দস্যুদলও অর্থ ও পুণ্য উভয় সংগ্রহের জন্য আগমন করিয়া থাকে। যাত্রী ও দস্যুর কিছু কিছু নমুনা ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছি।

এখনও সব যাত্রী আসিয়া মিলিত হয় নাই। মিলিত না হইয়াও কেহ যাইতে সাহসী হইতেছে না। লাল সিং-এর মাতা কৈলাসে যাইবেন—এই দলের সঙ্গে ৩।৪টা বন্দুক আর ২।৩টি তাঁবু থাকিবে। লাল সিং এই দলের সহিত যাইবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। আমিও

ইহা সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া গমনের জন্ম প্রস্তত হইতে লাগিলাম।

এখন আমার বিশেষ কোন কায নাই; কেবল তাকলা-কোটের আশ-পাশ দেখা আর যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রার দিন স্থির করা। যাহাতে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় কৈলাস পৌছান যায়, এই কথা যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, আর সে জন্ম প্রস্তত হইতে বলিলাম।

সাধু-সন্ন্যাসী খোঁজা আমার একটা 'বাই' ছিল। এই 'বাই'এর বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থানে আমি গমন করিয়াছি। ভুটিয়াদের কাছে শুনিলাম, অনেক ভারতীয় সন্ন্যাসী এ দেশে আসিয়া লামাদের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্ম কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন। আমার ভারতীয় সাধু দেখিবার জন্ম আগ্রহটা বেশী হইয়াছিল।

ভুটিয়াদের কাছে এক জন ভারতীয় সাধুর কথা শুনিয়াছিলাম, তিনি "ময়ূর-পঙ্খী বাবা" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তিব্বতীদের কাছেও ভক্তিভাবে পূজিত হইতেন। তাঁহার মস্তকে পাগড়ীর উপর ময়ূরপুচ্ছ থাকিত বলিয়া তিনি ময়ূরপঙ্খী বাবা নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, শীতের কয়মাস তিনি বৃন্দাবন-মথুরায় অবস্থান করিতেন; নিদাঘে প্রতি বৎসর কৈলাস-যাত্রা করিতেন। এইরূপ বহু বৎসর তিনি নিয়মিতরূপে কৈলাস গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার গমন-শক্তি অদ্ভুত ছিল। আমরা যে পথ দুই দিনে অতিক্রম করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তিনি অবলীলাক্রমে এক দিনে তাহা অতিক্রম করিতেন। আনন্দের তিনি যেন উৎসস্বরূপ ছিলেন। তিনি আনন্দ-মূর্ত্তি হইলেও তিব্বতে যে সকল ইংরাজ আগমন করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। এক সময় এক জন ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভুটিয়ারা বলেন, তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎ'সনা করিয়া কহেন, "তিব্বত কেন অপবিত্র করিতে আগমন করিয়াছ? এ ভূমি তোমাদের জন্ম নহে; এ স্থান হইতে দূর হও!" তাঁহার মৃত্যুও অদ্ভুত, তিনি রোগহীন শরীরে কৈলাসে আগমন করিয়া সঙ্গীয় লোককে কহেন, "এ শরীর আর বহন করিব না।" এই কথা কহিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া কৈলাস পরিক্রমার প্রারম্ভ স্থান দারচীনে দেহরক্ষা করেন। দারচীনে একটি ধর্ম্মশালা প্রস্তত করিবার তাঁহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যাত্রীদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি তাহা পূর্ণ করেন নাই। তিব্বতীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত; এমন কি, ডাকাইতরাও তাঁহার নামে ভয়বিহ্বল হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করিত। বাঙ্গালীদিগকে তিনি সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেন। শিষ্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার অধিক না থাকিলেও ঢাকা অঞ্চলে তাঁহার কয় জন শিষ্য আছেন। ভুটিয়াদের কাছে এ সব আমি অবগত হই।

তিব্বত সন্ন্যাসীর রাজ্য। এ রাজ্যে সাধারণ সন্ন্যাসীও সর্ব্বত্র ভক্তিভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভিক্ষার্থী লামা কাহারও দ্বারে উপস্থিত হইলে রিক্তহস্তে কোথাও তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েন না। আমাদের দেশে কণ্টকশায়ী, উর্দ্ধবাহু মৌনাবলম্বী প্রভৃতি কঠোর সাধনশীল সাধু দেখিতে পাওয়া যায়; তিব্বতে এই কঠোরতা চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক অদ্ভুত সাধুর কথা শুনিলাম, তাঁহার নির্জ্জনবাস কথা শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র কুটীর এরূপ ভাবে প্রস্তত করা হয় যে, কোনরূপে এক জন লোক তাহার ভিতর শয়ন করিতে পারে। এই গৃহে দুইটি ছিদ্র থাকে, উপরের ছিদ্র দিয়া ধূমনির্গমন হয়। নিম্নের ছিদ্র দিয়া ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করা হয়।

প্রতিদিন ভোজ্য আর সপ্তাহের পর কিছু কাষ্ঠ ও চা প্রদান করা হয়। লামা মহাশয় চা প্রস্তত করিয়া পান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়। যে সময় ভিতরের লামা খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকেন, তখন বাহিরের লামারা অনুমান করেন যে, লামা রুগ্ন হইয়াছেন বা তনুত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের যখন কোনরূপ সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, তখন বাহির হইতে ভিত্তি ভাঙ্গিয়া সাধুর মৃতদেহ বাহির করা হইয়া থাকে।

লামাদের মৃত্যুর পর সাধারণতঃ তাঁহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া পক্ষীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করা হইয়া থাকে। যাঁহারা নির্জ্জনবাস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তাঁহাদিগের শরীর অগ্নিযোগে ভস্ম করা হইয়া থাকে। ভক্তরা এই ভস্মের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এরূপ কঠোর ব্রতাবলম্বী

মার কথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ অনেক তিব্বতীও দেখিয়াছি।

মধ্যাহ্নকালে সময় সময় লামারা দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া ভুটিয়া বাজারে বেড়াইতে আসিতেন। যে ভুটিয়ার গৃহে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, তিনি এক জন প্রধান ব্যবসায়ী। তাঁহার দোকান-ঘরে লামারা আসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিতেন। ব্যবসায়ী মহাশয় কিস্‌মিস্, ছোহারা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। এই সকল লামার মধ্যে এক জন শিক্ষিত পণ্ডিত লামার সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক অনেক গল্প করিয়াছিলেন। যখন তিনি অবগত হয়েন, আমি এক জন বঙ্গদেশীয় কাশী-লামা, তখন তিনি ভক্তিমিশ্রিত ভাষায় প্রাচীনকালে আমাদের বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দেবচরিত্র বাঙ্গালী তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সংক্রান্ত নানাপ্রকার জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সদাচার, সামাজিক শিষ্টাচার প্রভৃতি প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কহিয়া আমাকে অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনের পূর্ব্বে তিব্বতীরা রাক্ষস-প্রকৃতিপ্রায় ছিলেন। হিংস্রপ্রকৃতির বন্য পশু বশীভূত করা অনেক সময় সহজ; কিন্তু হিংস্র-প্রকৃতির মনুষ্যকে সুসভ্য করা, সদাচার-সম্পন্ন করা, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরপরায়ণ করা, সামান্য কথা নহে। তিব্বতে বাঙ্গালী যেরূপ ভাবের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন—যেরূপ একনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, কর্ম্ম-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহার উদাহরণ নিতান্ত সুলভ নহে। কালের কি বিচিত্র গতি! যে দেশের লোক অন্য দেশবাসীকে ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়াছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের দেশবাসীকে যিশুর অনুচররা ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রদান করিয়া "আদমী" করিতেছেন। যাউক্ সে সকল কথা। হই না কেন আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান বা ঈসাই, যে কোন সম্প্রদায়গত হই না কেন, আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না—আমাদের সকলকে মিলিত হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্য আমাদিগকে উদার হইতে হইবে। লামা মহাশয়ের নিকট এই সকল প্রাচীন কথা শুনিয়া আর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া আমি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইতাম।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার আর অধিক বিলম্ব নাই। তাকলাকোট হইতে কৈলাস প্রায় ৪ দিনের রাস্তা। অন্ততঃ পূর্ণিমার দিন যাহাতে দারচীন—যে স্থান হইতে কৈলাসের পরিক্রমা আরম্ভ হয়—যে স্থানে তিব্বতীয় রাজকর্ম্মচারী অবস্থান করেন—সে স্থানে পৌছান যায়, তাহার জন্য যাত্রীদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলাম। আমার উত্তেজনায় ফল ফলিল। ঝব্বু ভাড়ার জন্য লোক প্রেরণ করা হইল—যাত্রিমহলে সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকল দ্রব্য আমার নিকট ছিল; কিছু জলখাবার প্রস্তুত করাইয়া লইলাম। দুগ্ধ চারি আনা সের—ইহাতে চামরী-গাই, ছাগী আর ভেড়ীর দুধও মিশ্রিত আছে। এই দুগ্ধের ক্ষীর করিয়া আর তাহাতে শর্করা সংযুক্ত করিয়া বেশ খাবার তৈয়ার করিয়া লইলাম। ইহা প্রস্তুত করিতে ছংগরুর প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ৪।৫ সের দুধের ক্ষীর করিতে কাষ্ঠের বড় কম প্রয়োজন হয় না। প্রধান মহাশয় তাহা যোগাইয়াছিলেন। আর খানিকটা মাখন সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এ দেশে টাট্‌কা মাখন সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। বহুবর্ষের মাখন সাধারণতঃ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবল শীতের জন্য ইহা বিকৃত হয় না। আমার এক ভুটিয়া বন্ধু টাট্‌কা মাখন সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ইংরাজ শাসনপ্রভাবে আকুমারিকা-হিমাচল পোষ্টকার্ডের মূল্য যেরূপ সর্ব্বত্র সমান, সেইরূপ কলিকাতাতে মাখনের যে দর, এ স্থানে তাহা অপেক্ষা কম নহে। বাণিজ্যের প্রভাবে সর্ব্বত্র সমান মূল্য! অবশ্য গুণে এ স্থানের মাখন যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য।

দেখিতে দেখিতে ৬ঠা শ্রাবণ ২০শে জুলাই দ্বাদশী শনিবার উপস্থিত হইল। এই দিন আমরা তাকলাকোট পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস দর্শন জন্য প্রস্তুত হই। ঘোটকবৎসর বলিয়া ঝব্বুর ভাড়া বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। পয়সার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঝব্বু সংগ্রহের জন্য আমাদের ব্যগ্রতাই এই ভাড়াবৃদ্ধির কারণ। প্রাতঃকালে ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। আমার

বাহনের জন্য ঘোটক পাওয়া গেল না; সুতরাং ঝব্বুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতে হইবে। ষাঁড়ের উপর চড়িয়া গমন করিতে প্রথম প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করি, অন্য কোন গতি নাই—অগত্যা ইহাতেই রাজী হইয়াছিলাম। এ যে মহা বৃষভবাহনের দেশ। দেবতা যেরূপ, ভক্তও সেইরূপ আচরণ করিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কোথায়? আবার উষ্ট্র যেরূপ মরুভূমির জাহাজ, ঝব্বুও সেইরূপ তিব্বতের এই ভীষণ কান্তারের একমাত্র শরণ্য।

এ স্থানে একটা কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। আমার একটা সঙ্কল্প ছিল, প্রত্যাগমনকালে নীতিপথ দিয়া বদরীনারায়ণের রাস্তা যোশীমঠে অথবা তিমরসিয়ন—গামসালী হইয়া দুর্গম রাস্তা দিয়া হরচটিতে উপস্থিত হইব। আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার ভুটিয়া অভিজ্ঞ বন্ধুরা তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। কৈলাস হইতে নীতির রাস্তা বড়ই বিপদপূর্ণ; হিংস্রপ্রকৃতির ডাকাইতদের ইহা প্রিয় ভূমি। বিশেষতঃ এ বৎসর ঘোটক-বৎসর হওয়াতে ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকূলে যাহা কিছু কহিলাম, তাঁহাদের প্রণয়গর্ভ বাক্যের কাছে সে সমস্তই বিফল হইয়া গেল। নীতিপথের জন্য এ স্থানে বাহন সংগ্রহের আর ব্যবস্থা করিলাম না। সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।

প্রায় ১০টার সময় তাকলাকোট পরিত্যাগ করি। আমার ঝব্বুর ইচ্ছা নহে যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। এই জন্য তিনি তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা দেখাইতে লাগিলেন। মধুর বাক্যেও যখন তিনি সম্মত হইলেন না, তখন প্রহারের ভয় ও প্রহার হইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইলেন; বেগতিক দেখিয়া আমি পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম। তিব্বতী সঙ্গী যখন নাকের দড়ি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন বেচারী ঝব্বু গৃহের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর গমন করিয়া আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। ঝব্বুর সহিত প্রথম পরিচয়ে তাহার ঔদ্ধত্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সুজনতা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। 'উঁচু-নীচু'তে উঠা-নামার জন্য আমার আসন শিথিল হইয়া যায়; ইহার ফলে আমি নীচে পড়িয়া যাই। খালি পড়িয়া গেলে বিশেষ কিছু হইত না—পায়ে কাবটিতে আটকান থাকায় আমার অবস্থা যথেষ্ট হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। রাস্তায় দেখিবার লোক বেশী না থাকায় আমার এ অভিনয় বৃথা হইয়াছিল। ঝব্বু আমাকে টানিয়া লইয়া যাইবার পরিবর্তে বেশ শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গের লোক আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নিষ্কৃতি প্রদান করে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরে পীরপঞ্জাল পর্ব্বত অবতরণকালে ঘোড়া হইতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, সুশিক্ষিত অশ্ব আমার জামা কামড়াইয়া ধরিয়া নিম্নে পতন হইতে আমাকে রক্ষা করে। জীবের প্রতি দয়া আমাদের দেশের পশু-হৃদয় হইতেও বিলুপ্ত হয় নাই। ঝব্বু বা ঘোড়া যদি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন না করিত, তাহা হইলে আমাকে যে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত, তাহা বলাই বাহুল্য।

জোরাবর সিংহের সমাধি।

ঝব্বু দল বাঁধিয়া যাইতে বড় ভালবাসে। আমাদের দলে আমরা ৪১৫ জন ঝব্বু আরোহী ছিলাম। ঝব্বু যখন দলবদ্ধ হইয়া গমন করিত, তখন সময় সময় তাহারা সংহত হইয়া গমন করিত। সে সময় আমাদের পায়ে পায়ে লাগিয়া যাইত—বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে দূরে দূরে পৃথক্‌ভাবে লইয়া যাওয়া হইত। এক জন মহিলা আরোহী ঝব্বুর এরূপভাবে গমনকে "কাওয়াই করিয়া যাওয়া" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাকলাকোট পরিত্যাগের কিয়ৎক্ষণ পরে তোয় নামক গ্রামে বীরবর জোরাবর সিংহের সমাধি দর্শন করিলাম। ঝব্বু হইতে অবতরণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুলতিলক জোরাবরের প্রতি একটু বাহ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আর অন্তরে সেই বিরাট পুরুষকে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া কহিয়াছিলাম, "ভগবন্, যে দেশের সকল শ্রেণী. সকল জাতির ভিতর মহাসত্ত্বসম্পন্ন অসংখ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে এখন মহাপ্রাণসম্পন্ন পুরুষের দুর্ভিক্ষ কেন? প্রভু! একবিন্দু করুণা বিতরণ কর, তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইবে, সুভিক্ষ আসিবে, আর কোটি কোটি প্রপীড়িত নর-নারীর আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে।"

অপরাহ্ণকালে আমাদের নেতা একটি ক্ষুদ্র জলধারার তটে সিকটার বিস্তৃত প্রান্তরে ডেরা ফেলিবার আদেশ প্রদান করেন। কয় জন লোক তাঁবু তুলিতে লাগিল; আর কয়েক জন লোক শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। অনতিকাল পরে তাহারা ছোট ছোট কাঁচা গাছ ও শুক্‌না গোবর লইয়া উপস্থিত হইল। আমাদের শিবিরের অনতিদূরে পর্ব্বতের পাদদেশে ছংগকুর প্রধান দলবলের সহিত অবস্থানস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। আরও কতকগুলি যাত্রী আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে কৈলাস-যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই যাত্রিদলের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আমরা ৩ জন মাত্র মিলিত হইয়াছিলাম, অবশিষ্ট ভুটিয়া ও তিব্বতী যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

পাল্টা জবাব

মধ্যযুগে বাঙ্গালার শিল্প-কলা

পুরাকালে সোনার ভারত শিল্প-বাণিজ্যে সভ্যসমাজে কতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত নাই। প্রাচীন মিসর ও বাবিলন, পরে গ্রীস্ ও রোম ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য আদরে গ্রহণ করিত। এই শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠার অংশ প্রাচীন বাঙ্গালাও উপভোগ করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্লিনী উল্লেখ করিয়াছেন, "রোমক ললনা প্রাচ্য সুচিক্কণ বস্ত্রের অন্তরাল হইতে স্বীয় অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতে ভালবাসেন;" এখানে বাঙ্গালী তাঁতির হাত সুস্পষ্ট। সুচিক্কণ রেসমী ও সূতী কাপড় প্রস্তুত করার কৌশলে বাঙ্গালী অন্য প্রদেশের অগ্রণী। প্রাকৃতিক কারণে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর অধিকাংশই কৃষিজীবী; এই কৃষীবলের আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্যই প্রাচীন যুগের শিল্পীর আবির্ভাব। অভাববোধের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিল্পের বিস্তৃতি; বিলাসে উহার পারিপাট্য, এ কথা সকলেই বুঝেন। প্রকৃতি দেবীর কল্যাণে বাঙ্গালার পল্লীর গৃহস্থের অভাব অতি অল্পই ছিল। অপেক্ষাকৃত সভ্যযুগে রাজা-রাজড়ার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নগরে শিল্পকুশল লোকের আবির্ভাব বাঙ্গালা দেশেও হইয়াছিল। তাই পাল ও সেন রাজগণের অধিকারে ভাস্কর মণিকারের কৃতিত্বের পরিচয় পাই; বিলাসী মোগলরাজের সময়ে সাত পুরু কাপড়েও কিরূপে উলঙ্গ থাকা যাইতে পারে, বাঙ্গালী তন্তুবায় তাহার নমুনা দেখাইয়াছে। জাহাঙ্গীরের সভায় দূত রোর সহযাত্রী পাদরী টেরী যে উৎকৃষ্ট রেসমী কাপড়, জরি ও বুটাদার রুমাল, রঙ্গীন ফুলদার শাটিন দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরও তাহাতে কিছু ভাগ আছে। দিল্লীওয়ালা মিস্ত্রী তাঁহার সময়ে যে সব সুন্দর খাট, সিন্দুক, বিচিত্র বারকোষ প্রস্তুত করিত, ঢাকায় তাহার অনুকরণ হয় নাই, কে বলিবে? যে হিন্দুজাতির শিল্পীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দরিদ্র ভৃত্যের সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম-যাজক মোহিত হইয়াছেন, তাহারা পরে সে সব এক দিনে হারাইয়া বসে নাই।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস-লেখক প্রবীণ বার্ডউড ৩২ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-ভারতের গ্রাম্য জীবন লক্ষ্য করিয়া এক আদর্শ গ্রামের চিত্র নিপুণ লেখনী সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া সানন্দে লিখিয়া গিয়াছেন;—ভারতে প্রতি গৃহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রামেও গৃহকর্ত্রী দৈনিক কার্য্যের অবসরে সূত্র ও বস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যাপৃতা, ছায়াবহুল গ্রাম্য পথের পার্শ্বে তন্তুবায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত। পথিপার্শ্বে কোথাও কর্ম্মকার ও কাঁসারীর কারখানা; কোথাও স্বর্ণকার স্বভাবের অনুকরণে চাঁদের মত হাঁসুলী, বালা, বা ফুল ফলের মত আভরণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত। বৈকালে সমস্ত পথ আলোকিত করিয়া রমণীদলের জল আনিতে যাওয়ার বেশ এই কবি-লেখকের হস্তে জীবন্ত প্রতিফলিত হইয়াছে (১)। এ সব সুষমা সেকালের বঙ্গেও ছিল।

সে বড় বেশী দিনের কথা নহে, পঞ্চাশ বৎসরেরও কম হইবে। যখন লেখক বাল্যবন্ধুদিগের দল লইয়া মাঠে গিয়া কার্পাস তুলায় সহায়তা করিয়াছে। সেই কার্পাস বাটীতে আসিয়া মাতৃস্থানীয়া মহিলাদিগের নিপুণ হস্তে "চড়কি" সাহায্যে সুন্দর তুলায় পরিবর্ত্তিত, আছড়া দ্বারা ফুড়িয়া শর কাঠীর সহায়তায় পাঁজে পরিণত, শেষে একালের যুবকদিগের পক্ষে অদ্ভুত আবিষ্কার সেই চরকায় ঘুরিয়া সরু মোটা সূতা প্রস্তুত হইয়াছে। তন্তুবায়ের বাটী গিয়া এই গৃহজাত সূতার লাল পেড়ে ধড়া লইয়া সানন্দে বাটীতে আসার আহ্লাদ এখনও বেশ মনে আছে। আজ বিদেশী কলের কৌশলে দেশীয় শিল্প নির্জ্জীব হইয়াছে। কলের প্রচলনে সামাজিক ও নৈতিক দুর্গতির কথা আজ নূতন আলোচনা হয় নাই; বার্ডউড্ বিশেষ ভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

কাঁসা পিত্তলের দ্রব্য আবহমানকাল প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গালী কাঁসারি যে পূর্ব্বে এ কার্য্যে সুদক্ষ ছিল, তাহা বলা যায় না। আচার-আচরণ ঘসা-মাজার নিমিত্ত

---

(১) Going and returning in a single file, the scene glows like Titan's canvas and moves like the stately procession of the Panatheniac frieze—Sir, G. Birdwood —Industrial Arts of India.

...রণের পিতল-কাঁসার দ্রব্যই হিন্দু গৃহস্থের পসন্দ ছিল; ...'এঁটো' হইবে না বা ঠাকুর-ঘরে লাগিবে, তাহা-...ই কারিগরী দেখান হইত। এই কারণেই কাশী প্রভৃতি ...স্থানের পাত্র, লতা, ফুল, দেব-মূর্ত্তি প্রভৃতি সাজ পাই-...ছে। মুসলমান অধিকারে মালদহে ও ঢাকায়, পরে মুর্শিদাবাদে ও বর্দ্ধমানের দাঁইহাটে কাঁসা-পিত্তলের বাসন-নির্ম্মাণের উন্নতি হইয়াছিল। খাগড়ার উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন সেকালে জন্মগ্রহণ করে নাই। আমরা যে প্রাচীন ...তোলা কাঁসার ফেরুয়া (ঘটী) দেখিয়াছি, তাহার ...ভাল হইতে পারে, কিন্তু গঠন-সৌষ্ঠব দেখিলে এখন লোক হাসিবে। সেই জাতীয় আ-গড়া কাঁসার তেলের ভাঁড় এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে। কলাই-করা তামার ডেকচি মুসল-মান অধিকারেই পলান্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশলাভ করি-য়াছে। কোষা, কুশী, তাম্রকুণ্ডেই বাঙ্গালী শিল্পীর তামার বাসনে বিদ্যাপ্রকাশ সীমাবদ্ধ ছিল; তাহাও পশ্চিমে ভাল হইত, এখনও হয়। খাগড়াই বা অন্য স্থানের কাঁসার বর্ত্তমান সুন্দর গঠন, একালের বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণে ...য়াছে। কাঁসা-পিতলের পাত্রে কারুকার্য্য ভারতের অন্য প্রদেশে যথেষ্ট দেখান হইতেছে। মোগল অধিকারে উৎসাহ-প্রাপ্ত দিল্লী ও মুরাদাবাদ অঞ্চলের বিদরীর কার্য্য মুর্শিদাবাদে নকল হইয়া এককালে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-ছিল, কিন্তু দস্তার দ্রব্য নির্ম্মাণ বাঙ্গালায় তত ভাল হয় নাই।

বয়ন শিল্পে বঙ্গদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারত-জাত কার্পাস-বস্ত্র গ্রীসে, রোমে সমাদর লাভ করিয়াছিল, এ কথা অনে-কেই জানেন। রোমক-সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যের সময়ে বাঙ্গালায় বস্ত্র-শিল্প কি প্রকারে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মসলিন্ নামের ব্যাখায় কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, ইংরাজ বণিকরা প্রথমে মসলীপত্তন হইতে এই জাতীয় কার্পাস-বস্ত্র লইয়া যায়েন বলিয়া ইহার মসলীন নাম হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মতে তুরস্কের সেকালের রাজধানী মোসল নগরে এই জাতীয় বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইয়া ইহার বহুল প্রচার হইয়া-ছিল; পরে সেখানেও সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র বয়নের উদ্যম হয়। প্রাচীনকালের অবস্থা যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র যে দেশ-বিদেশে খ্যাত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস-রচয়িতা ঐ অঞ্চলের নানা প্রকারের মলমল কাপড়ের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল। (*)

(১) ঝুনা (হিন্দী ঝিনা—সূক্ষ্ম); ইহা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম। কোন য়ুরোপীয় লেখক ইহা দেব-লোকের পরীর কোমল করের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করি-য়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন সাড়ে ৮ আউন্স মাত্র। ধনবান্ বিলাসী ব্যক্তির অন্তঃপুরে এবং নর্ত্তকী-গায়িকা-গৃহেই ইহার আশ্রয়। পূর্ব্বকালে এই জাতীয় এত সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত কি না নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে ঢাকাই সূক্ষ্ম মলমলের শ্রেণীর বস্ত্র পরিধান বৌদ্ধ ধর্ম্ম-যাজিকাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ উল্লেখ আছে।

(২) রং—ইহা প্রায় ঝুনা মসলিনের মত; ইহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুনা বলা যাইতে পারে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজন উহারই ন্যায়। প্রতান সূত্রসংখ্যা ১২০০ (প্রতান—টানা; পানার সংখ্যা গণনাই নিয়ম)

(৩) সরকার আলি—নবাবী আমলে সরকার আলি নামে যে জায়গীর নবাবের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার আয়ের টাকা হইতে বাদশা ও নবাবের পরিবারে ব্যবহা-রের জন্য ইহা ক্রীত হইত বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়া-ছিল। প্রতি বর্ষে বহু পরিমাণ মলমল সরকারে প্রয়োজন হইত এবং ইহাতে বহু লোকের অন্নসংস্থান ছিল।

(৪) খাসা—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মলমল। পারসী কথাকে বিকৃত করিয়া ইংরাজীতে ইহাকে cassah লিখায় অনেকে শেষে 'কসাক' মনে করিয়া লইয়াছেন। সোণারগাঁ অঞ্চল মোগল আমলে উৎকৃষ্ট খাসা মলমলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (†)। উৎকৃষ্ট খাসাকে 'জঙ্গল খাসা' নাম দেওয়া হইয়া-ছিল। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ হইতে ১॥০ গজ; ওজন সাড়ে ১০ হইতে ২১ আউন্স। প্রতান ১৪০০ হইতে ২৮০০।

(*) History of the Cotton Manufacture of Dacca District. এই পুস্তক হইতে ঢাকার ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন রায় যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি।

(†) Ain-i-Akbari; Sunargaon—in this Sircar is fabricated cloth called cassah—Gladwin.

(৫) সবনম্—এই জাতীয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রকে ইংরাজ কবি 'a web of woven wind' (বায়ুতে বোনা জাল) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পারসী ভাষায় ইহা evening dew (সান্ধ্য শিশির) নামে কথিত। ঘাসের উপর পাতিয়া দিলে শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম হইত। কথিত আছে যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ একদিন পরীক্ষার জন্য একখানি সবনম মলমল ঘাসের উপর পাতিয়া রাখাইয়াছিলেন; একটি গরু ঘাস খাইতে খাইতে ঐ বস্ত্রখণ্ডও খাইয়া ফেলে (*)।

(৬) আব্ রোয়ান্ (আব্—জল; রোয়ান্—প্রবাহ) নির্ম্মল জলপ্রবাহের মত স্বচ্ছ। উৎকৃষ্ট আব্ রোয়ান জলে কাচিতে ফেলিলে কাপড় আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। কথিত আছে, আওরঙ্গজেবের এক কন্যা এই জাতীয় বস্ত্র পরিয়া পিতার নিকট যাওয়ায় সম্রাট তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। কন্যা উত্তর করিলেন, "তবু আমি সাত পুরু কাপড় পরিয়াছি (†)।"

(৭) আলবাল্লে—অতি উৎকৃষ্ট। ডাক্তার ভিন্সেণ্ট ইহাকে abollai নাম দিয়া গ্রীক্ লাটিন হইতে ইহার ব্যুৎপত্তির সন্ধান করিয়াছেন (‡)। দৈর্ঘ্য ২০ গজ; প্রস্থ ১ গজ; ওজন ৯৬০ হইতে ১৭ আউন্স। প্রতান-সূত্র ১১ শত হইতে ১৯ শত।

(৮) তঞ্জেব্ (পারসী তন্—শরীর; জেব্—অলঙ্কার) তাঞ্জাব মলমল কথা এখনও অনেকে ব্যবহার করে। দৈর্ঘ্য ২০ গজ; প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ হইতে ১৮ আউন্স। প্রতান সূত্র—১৯০০।

(৯) তুরন্দাম্ (তুরা—রকম; উন্দাম্—শরীর)—অঙ্গরক্ষক অর্থে ব্যবহৃত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ; প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১৫ হইতে ২৭ আউন্স। প্রতান-সূত্র ১ হাজার হইতে ২ হাজার ৭ শত।

(১০) নয়নসুখ (আইন্ আকবরী—তন্‌সুক)—ইহা সাধারণ মলমল। আবুল্ ফজল সেকালে ইহার মূল্য ৪৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দৈর্ঘ্য ২০ গজ; প্রস্থ ১।০ গজ—প্রতান সূত্র ২ হাজার ২ শত হইতে ২ হাজার ৭ শত।

(১১) বদন-খাস্—ইহার সূতাগুলি নয়ন-সুখের মত অধিক ঘন নহে। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১॥ গজ; ওজন ১২ আউন্স, প্রতান-সূত্র সংখ্যা ২ হাজার ২ শত।

(১২) সরবন্দ (শির বন্ধ)—মাথার পাগড়ীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ হইতে ২৪ গজ; প্রস্থ অর্দ্ধ গজ হইতে এক গজ; ওজন ১২ আউন্স। প্রতান-সূত্র ২ হাজার ১ শত।

(১৩) সরবতি (কুণ্ডলী করিয়া জড়ান)—ইহাও পাগড়ীর জন্য প্রস্তুত হইত। সরবন্দের মত।

(১৪) কুমিস্ (আরবী, কুমিস্=শার্ট)—এখনও কামিজ নামেই শার্ট জামা কথিত হয়। এইরূপ বস্ত্র পূর্ব্বে কোর্ত্তার জন্য প্রস্তুত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ; প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ আউন্স, প্রতান-সূত্র ১ হাজার ৪ শত।

(১৫) ডুরিয়া—দুই প্রকারের সূতা পাকাইয়া ইহার টানা করা হয়। বুনানী হইলেও ডুরিয়ার ন্যায় দেখায়। ডুরিয়া মসলিনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের (বেঙ্গা প্রভৃতি) তুলার প্রয়োজন। ডুরিয়া নানা প্রকারের। রাজকোট, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, ডাকান, কাগজাহী, কলাপাত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ হইতে ১॥০ গজ।

(১৬) চারখানা—ইহা ডুরিয়ার মত। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের সূতায় নির্ম্মিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ডুরিয়ার মত। ডুরিয়া ও চারখানার 'ডোরা'গুলির আয়তন অবশ্য এক প্রকারের নহে। চারখানা ছয় প্রকার;—নন্দনশাহী, আনারদানা, সাকুতা, কবুতরখোপা, বাছাদার, কুণ্ডিদার।

(১৭) জামদানী—ঢাকা অঞ্চলের ফুলতোলা জামদানী বস্ত্রের নাম অনেকে জানেন। তাঁতেই ফুলতোলা এবং অন্যান্য কারুকার্য্য হইয়া থাকে। কাপড় বুনিবার সময়েই তন্তুবায়রা বাঁশের সূচের সাহায্যে টানার সূতার সঙ্গে যথাস্থানে ফুলের সূতা বসাইয়া দেয়। সোজা, বাঁকা সকল দিকেই ফুলের সারি দেওয়া হইতে পারে। বাঁকা সারির নাম তেড়ছা। স্থানে স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ফুল বসান হইলে তাহাকে বুটাদার বলে। মোগল আমলে জামদানী বস্ত্রের অধিক প্রচলন হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব এক

(*) Bolt's Considerations of Indian Affairs, Page 206.

(†) Bolt's Considerations.

(‡) Sequel to Periplus of the Erythrean Sea.

একখানি জামদানী ২৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতেন শুনা যায় বা কথিত আছে। তখনকার টাকার মূল্য এ কালের টাকার অপেক্ষা অনেক অধিক। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ উৎকৃষ্ট জামদানী বস্ত্রের এক এক-খানির মূল্য ৪৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট জামদানী প্রস্তুত করিবার খরচাও অনেক বেশী পড়িত। জামদানী সাধারণতঃ ১৭ শত শানায় বোনা হইত। জামদানী নানা প্রকারের ছিল; তন্মধ্যে তোড়াদার, বুটিদার, তেরছা, জালেদা, জলবার, পান্না হাজার, ছুবলি জাল, মেল, ছাও-দাল, বালোয়ার গেদা, ডুরিয়া, সাবুরগা ইত্যাদি প্রধান।

ঢাকার বিবরণ-লেখক মিঃ টেলর উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ২৬ প্রকার মসলীন দেখিয়াছিলেন। উপরে লিখিত ঢাকাই কাপড়গুলির সূত্র নির্ম্মাণে কৌশলের সহিত কত সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় জড়িত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে একখানি ১৫ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া সূক্ষ্ম মসলীন ৯ শত গ্রেণ (অর্দ্ধ ছটাক মাত্র) ওজন হইয়াছিল। এরূপ বস্ত্র চারি শত টাকায় বিক্রীত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিঃ টেলর লিখিয়াছেন যে, তখন ঐ মাপের কাপড় আর ১৬ শত গ্রেণের কম ওজনের হয় না। মূল্য এক শত হইতে দেড় শত টাকা; শত বর্ষের মধ্যেই অর্থশালী ক্রেতার অভাবে এই অবনতি। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, টাকুতে সূক্ষ্ম সূতা কাটায় বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-কন্যা সিদ্ধহস্ত; শান্তিপুর অঞ্চলেও অনেকে 'সরু কাটনা' কাটিতে পারিতেন। এ কালে ঢাকা অঞ্চলে দুই এক জন মাত্র সরু সূতা করিতে পারে; ভাল আঁশের কার্পাসও মিলে না; লোক অল্পব্যয়ে সরু বিলাতীতে বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে; বহু যন্ত্রের নকল বিলাতী আবরোঁয়া বা আদ্ধি এখন মসলীনের স্থলাভিষিক্ত। প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালার কার্পাস-বস্ত্রের প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঢাকার মোগল নবাবদের উৎসাহেই মসলীনের চরম উন্নতি, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বড় লোকের বিলাসেই শিল্পকলার উৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে। দিল্লীর বাদশা-দরবার আবরোঁয়ার উন্নতি-সাধনে প্রধান সহায়। সেই উৎসাহের বলে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী তন্তুবায় দেশী তাঁতে যে কারিগরী দেখাইয়াছে, তাঁতের ঝাঁপে এখনও যেরূপ ফুল তুলিয়া আসিতেছে, তাহা জগতের অন্য জাতির অনুকরণযোগ্য। গড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সবনাম বা আবরোঁয়া পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ স্তরে বঙ্গীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। সেকালে দেশের সর্ব্বত্র সরু-মোটা দেশী কাপড় বুনিয়া তাঁতঘরে ভদ্রলোকের বৈঠক বসাইয়া, আস্তে-সুস্থে দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া বাঙ্গালী তন্তুবায় নিরীহ লোকের অগ্রণী হইয়াছে। ভাল মানুষ বলিয়াই ঐ জাতিতে বুদ্ধির অভাব কল্পিত হইয়াছে; শিল্পকলার এই অদ্ভুত বুদ্ধি গণনায় আইসে নাই!

সাধারণ সরু মোটা কাপড় ব্যতীত দোসূতী, শতরঞ্চি, সুসী নিমজা, চারখানা প্রভৃতিও বাঙ্গালায় উত্তম প্রস্তুত হয়। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে মধ্যযুগে রেশমী কাপড়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। য়ুরোপীয় বণিকদল রেশমের ব্যবসায়ের লোভেই কাশিমবাজার, সৈদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে কুঠী স্থাপন করে। তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া মধ্যবঙ্গের রেশম-সূত্র ও রেশমী কাপড়ের সমধিক প্রতিষ্ঠা ছিল। রঙ্গীন রেশমী ও সূতী কাপড় মুসলমান অধিকারেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে; রঙ্গরেজ নামে এক সম্প্রদায় রঙ্গব্যবসায়ী মুসলমান এখনও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। স্বাভাবিক রঙ্গের রেশমী কাপড়ের নাম কোরা; ক্ষারী করা বা ধোয়া হইলে তার নাম হয় গরদ। এইরূপ পট্টবস্ত্রই প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; বিবাহাদিকার্য্যের জন্য ও মহিলাগণের নিমিত্ত লাল, জরদা, ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠি ও অন্য রঙ্গের কাপড় তৈয়ারী করা হয়। রেশমের হাত-ঝাড়া বা যে সমস্ত কোয়া হইতে পোকা কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার সূতায় যে কাপড় হয়, তাহার নাম মটকা। সূতা 'মিশাল' দিয়া বুনিলে 'বাফ্‌তা' হয়। গর্ভসূতী, আসমানী প্রভৃতি মিশাল কাপড়ও আছে। বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি স্থানের তসর, কৌষ বা নেত বস্ত্র নামে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল। 'এড়ি' আসাম হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আইসে। এখন তসরের ছাট্‌ 'কেটে' আদর পাই-তেছে। রেশম, তসর, তূলা তিন প্রকার বস্ত্র-বয়নে বাঙ্গা-লীর কৃতিত্ব থাকিলেও জরিদার বা বুটাদার বস্ত্রে দিল্লী অথবা কাশীর শিল্পীর সহিত এদেশীয় শিল্পীর কোনকালে তুলনা হয় নাই। বেনারসী সাটী সুদীর্ঘকাল ভারত-প্রসিদ্ধ; পশ্চিমের মত জরিদার বস্ত্র কোথাও হয় না। কিন্তু সাদা-সিধে ফুলে ঢাকাই, শান্তিপুরে প্রভৃতি সূতী ও

মুর্শিদাবাদী রেশমী পরাস্ত হয় নাই। সূচের কার্য্যে বঙ্গের খ্যাতি ছিল। সূতীর মত রেশমী বস্ত্রাদিতেও বাঙ্গালী এখন পশ্চাতে পড়িতেছে। জাপানী ও য়ুরোপীয় আপাত-মোহন সাদা 'সিল্ক' এ কালে সজোরে সস্তাদরে স্বীয় সৌষ্ঠব সন্দর্শন করাইতেছে। লাহোর ও বোম্বাই প্রদেশে, মহীশূর প্রভৃতি স্থানেও রেশমী শিল্পের উন্নতি আছে; তাহাদের বিবরণ এ পুস্তকের বিষয় নহে।

প্রস্তর শিল্প। মধ্য বাঙ্গালায় প্রস্তরের অভাব। দূর দেশ হইতে পাতর আনাইয়া হর্ম্ম্য ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করা রাজা রাজড়ার কায। তাই বাঙ্গালায় প্রস্তর শিল্পের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। তথাপি পশ্চিম বঙ্গের প্রান্তে, এবং গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা প্রভৃতি সে যুগের রাজধানীতে প্রস্তর শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নির্ম্মাণ প্রণালীর কথা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য রাখিয়া আমরা ঐ নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিব; গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার মসজেদগুলির মধ্যে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্পের নমুনা দেখা যায়। মন্দির বা হর্ম্ম্যের ক্ষোদিত প্রস্তর মসজেদ নির্ম্মাণে লাগাইয়া দেওয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মুসলমানের রীতি হইয়াছিল। কুতব মিনার বা আলতমিসের মসজেদ নির্ম্মাণে হিন্দু উপকরণের যেরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, মধ্যযুগের বাঙ্গালায় তাহার অন্যথা হয় নাই। তাই আদিনা বা সোনা মসজেদে, বার দুয়ারি বা দখল দরজায় হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন মিলে। ফিরোজ শার মিনার পাঠান স্থাপত্য। মূল্যবান্ কাল কষ্টি পাতর সে যুগের বাঙ্গালার অনেক প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্যে লাগান আছে, মসজেদের খিলানে, গৃহদ্বারে, বা ভিতরে এই জাতীয় পাতর দেখা যায়। মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের প্রাচীন বাটীতে এক কাল কষ্টি পাতরের 'হাউজ' ছিল; সম্ভবতঃ ইহা গৌড় হইতেই আনীত। কিন্তু এই সকল পাতরের কাযে বাঙ্গালী

সোনা মসজেদ।

মিস্ত্রীর কতটা হাত ছিল, তাহা বলা যায় না। পাঠান পদ্ধতিতে ইষ্টকে নির্ম্মিত মসজেদ্ গৌড় ভিন্ন অন্যত্রও দেখা যায়। দুই একটির নাম করিব (১) সোনার গাঁ—গোয়ালপাড়াতে হোসেন শার সময়ের পুরাতন মসজেদ্—প্রাচীন ইটের, প্রস্তরে ক্ষোদিত মিহ্‌রাব। দ্বারদেশের বেলে পাতরের স্তম্ভ হিন্দু যুগের। (২) হুগলী পাণ্ডুয়ার মিনার ও মসজেদ্ (৩) সপ্তগ্রামে জমাল উদ্দীনের প্রাচীন মসজেদ্ (৪) খুলনা বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ—নির্ম্মাণ প্রণালী একটু পৃথক ধরণের। (৫) ঢাকায় শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত পরি বিবির মসজেদ্। ইহা ভিন্ন দিনাজপুর গঙ্গারামপুরে (১৫ শতাব্দী), গোপালগঞ্জে (বার্বেক শা—১৩৬৫) রঙ্গপুর পীরগঞ্জের হাতি-বাঁধা মসজেদ্, কস্‌বার শা জলাল মসজেদ্ প্রভৃতি প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত যে সমস্ত মসজেদ আছে, তাহার মধ্যেও সেকালের প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ কার্য্য, গাঁথনি প্রভৃতি বাঙ্গালী মিস্ত্রীর, সন্দেহ নাই। পাঠান পদ্ধতির প্রধান স্থপতিরা পশ্চিমে মুসলমান; হিন্দু ভাস্কর মসজেদের প্রস্তরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। বরেন্দ্রে যে সকল স্তম্ভ ও প্রস্তর শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হিন্দুকালের।

হিন্দু শিল্পের পরিচয়ে পশ্চিম রাঢ় হইতে আরম্ভ করিব। বর্দ্ধমান, কাঁকসা থানার গৌরাঙ্গপুর জঙ্গলে ইছাই ঘোষের সুবিখ্যাত দেউল—প্রাচীন ইষ্টকের। শ্যামা রূপার গড়ের বর্ত্তমান মন্দির প্রাচীনের সংস্কার। আসানসোল থানায় কল্যাণেশ্বরী বা দেবীস্থান মন্দির এবং গারুইএর প্রাচীন প্রস্তর মন্দির উল্লেখযোগ্য। বরাকরের ও কাতরাসের প্রাচীন প্রস্তর মন্দিরের গঠন অসাধারণ ভাবের। বীরভূমির বক্রেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির বৈদ্যনাথ মন্দিরের ধরণে নির্ম্মিত।

আদীনা মসজেদের মধ্যস্থ উপাসনা-বেদী।

লখন দরজা—দক্ষিণদিকের দৃশ্য।

বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মাণেও বাঙ্গালীর হাত ছিল, ইহা অনুমিত হয়। অনেকে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণেও বাঙ্গালীর অংশ চাহেন। বিষ্ণুপুরের পাতলা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরগুলির গঠন-প্রণালী ও কারুকার্য্য লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। জোড় বাঙ্গালা মন্দিরের (১৫৭২ খৃঃ) গঠনে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; মল্লেশ্বরের মন্দিরও ঐ প্রাচীন বাঙ্গালা ধরণের। বাঙ্গালা ঘরের অনুকরণে প্রাচীন বাঙ্গালার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইত; এই প্রণালী অন্যান্য প্রদেশের লোকও গ্রহণ করায় স্থাপত্যে বাঙ্গালা পদ্ধতির সুনাম আছে। বিষ্ণুপুরের দুর্গদ্বারও সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন। সেখানকার অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে রাসমঞ্চ মন্দির, কালাচাঁদ ও মুরলীধরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। ইহার সবগুলির বাহিরের ইটেই কারুকার্য্য আছে। তমলুকের বর্গভীমার প্রাচীন মন্দির এক বৌদ্ধ বিহারের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, অনুমিত হয়। বাঁকুড়ার একতেশ্বরের প্রস্তর মন্দিরও সুন্দর; ছাতনার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে তারিখ অঙ্কিত ইট পাওয়া গিয়াছে। ডায়মণ্ড-হারবারে 'জটের দেউল' নামে মন্দিরটির নিকটে প্রাপ্ত সংস্কৃত-লেখা দেখিয়া রাজা জয়ন্তচন্দ্রের (৮৯৭ শক—৯৭৫ খৃঃ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। খুলনা গোপালপুরের গোবিন্দমন্দির প্রতাপাদিত্য-নির্ম্মিত বলা হয়। গোয়ালন্দ রাজবাড়ীর চাঁদ রায়ের মঠ ষোড়শ শতাব্দীর নির্ম্মাণপ্রণালীর নমুনা। পরবর্ত্তী কালে যে সব নবরত্ন হইতে একুশরত্ন পর্য্যন্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ধরণ অন্যপ্রকার। অনেক প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টক লক্ষ্য করিবার মত। দিনাজপুর কান্তনগরে কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত ইষ্টক-মন্দিরের দৃশ্য চমৎকার ছিল; ভূকম্পের পর আর সে শ্রী নাই।

ভাস্করের কার্য্যে হিন্দুযুগে বাঙ্গালী শিল্পী যে সুদক্ষ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। উত্তর-বঙ্গের ধীমান্, বীতপাল প্রভৃতি ভাস্করেরা যে ভাবে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন,

ই হাই তিব্বতে ... কৃত হইয়া ... দ্ধ-প্রতিমার ... শিষ্ট্য রূপে ... জ্ঞাত হই-য়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রস্তরমূর্ত্তি বা ভগ্নাংশ পাওয়া যাই-তেছে; সিংহ-বাহিনী, চণ্ডী, দুর্গা ও বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ দেব-তাদের মূর্ত্তি আছে। হিন্দু-রাজগণের অধি-কারে নির্ম্মিত শঙ্খচক্র গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালী ভাস্করের নিপু-ণতা কেবল শিব-

দিনাজপুর—কান্তনগরের মন্দির।

কনিষ্ঠ সহোদর। পরবর্ত্তী কালে গৃহাদি নির্ম্মাণে পাতলা ইট ব্যব-হৃত হইত; ইহার কোন কোনগুলি লম্বা-চৌড়ায় বেশী ছিল। গৌড়ের মসজেদে, ইছাই ঘোষের দেউলে বা সপ্তগ্রামে ইহা দৃষ্ট হয়। কিয়ৎকাল পরে খোদকারী করা ও রং দেওয়া ইট ব্যবহৃত হইয়া-ছিল। এই পাতলা ইট বহু-দিনের হইলেও নোনা লাগিয়া তত ক্ষয় হয় নাই, যতটা পর-বর্ত্তী কালের লম্বা চৌড়া ইট হইয়াছে, প্রাচীন

লিঙ্গে ন্যস্ত থাকায় উন্নতির অবকাশ ছিল না। বর্দ্ধমান দাঁইহাটের সূত্রধর ভাস্কররা পূর্ব্বাবধি প্রস্তরশিল্পে পটুতা দেখাইয়াছে। অল্পকাল পূর্ব্বে নবীন ভাস্করের ক্ষোদিত ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যামূর্ত্তি এবং দুইটি কৃষ্ণমূর্ত্তি উৎকৃষ্ট প্রস্তরশিল্প বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উৎসাহের অভাবে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়।

ইষ্টকনির্ম্মাণে মধ্যযুগের বাঙ্গালী সমধিক নৈপুণ্য দেখা-ইয়াছে। পালবংশের কীর্ত্তি মুর্শিদাবাদ সাগর-দিঘীর দশটি ঘাটের ভগ্নাবশেষের নীচে এবং অন্যান্য স্থানে যাহা দেখি-য়াছি, সেগুলি গুপ্ত যুগের বা নালন্দার পশ্চিমে বড় ইটের মুর্শিদাবাদেও এ শ্রেণীর ইষ্টক দৃষ্ট হয়। মীনা-করা ইটও গৌড় প্রভৃতি স্থানে দেখা গিয়াছে। কাঁচা ইটের উপর নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্র করিয়া পরে পোড়াইয়া সুন্দর রং ফলান হইত। এই জাতীয় ইষ্টক গৌড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, ভূষণা, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জিলায় হইত। ইষ্টকের গৃহাদিনির্ম্মাণে সেকালে যে মসলা ব্যবহৃত হইত, তাহা একালের চুণ সুরকি অপেক্ষা দৃঢ়তর বোধ হয়। বাঙ্গালার নানাস্থানে ক্ষুদ্র নদীর উপরে যে বাদসাহী সেতুগুলি আছে, তাহারা এত কাল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও বিদ্যমান।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রীষ্মের গান

ফুটায়ে তুলেছে রুদ্ররূপের শিখা,
ছড়ায়ে দিয়েছে চাঁপার উগ্র গন্ধ,
ঝরেছে মালতী মরে গেছে মাধবিকা ;
কাননে কুঞ্জে আজি বসন্ত অন্ত।

রসালে নাহি সে হরিচন্দনরাগ,
মন্দ পবনে লতার নাহি সে লীলা,
হয়েছে সাঙ্গ মধুমন্মথ-যাগ
নিস্ব অশোক রিক্ত কানন-শিলা।

নিখিলবিশ্বে বিঁধেছে অগ্নিবাণে
গগনে গগনে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে জ্বালা,
দগ্ধ মরুভূমি অগ্নি-আসব পানে
রক্ত-নয়নে জ্বলিছে মরীচি-মালা।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশিছে অগ্নিশর,
দীর্ণা ধরণী অতি প্রচণ্ডতাপে,
বালুকঙ্করে ধূমময় চরাচর ;
পাষাণপুঞ্জে তৃষিত পরাণ কাঁপে।

বিজন পল্লী বিদ্ধ বায়স-রবে,
ঘরে ঘরে ঘরে সকল দুয়ার রুদ্ধ,
রহি রহি বায় মাতিছে অনলাহবে,
জগৎ জুড়িয়া চলিছে অগ্নিযুদ্ধ।

কাঁদিছে চাতক দীপক লেগেছে গানে,
হের দশদিশি অগ্নিশিখাতে আঁকা,
মৌনা প্রকৃতি মগ্না গভীর ধ্যানে,
গৌরীর তনু বিভূতি ভস্মমাখা।

চলেছে তপন দীপ্ত অগ্নিরথে
কিরণে কিরণে ঠিকরে অগ্নিকণা,
ছায়াতরুরাজি মূর্চ্ছিত বনপথে,
শুষ্ক হরিণী, নাগিনী বিনত-ফণা।

ছায়ায় স্তিমিত নিকুঞ্জ বনভূমি,
তরুর কোটরে পিপাসী পেচক ডাকে,
বৃদ্ধ বটের শৈবালদল চুমি'
চমকে রৌদ্র পল্লব ফাঁকে ফাঁকে।

গুহা গৃহমাঝে ভালুক ধুঁকিছে জ্বরে,
ক্ষীণ নীরধারা তৃষায় চাটিছে বাঘ,
আলস-শিথিল নিশ্চল কলেবরে
তরুমূল বেড়ি' পড়ি আছে মহানাগ

নেমেছে মহিষ প্রচ্ছায় সরোবরে,
নিদারুণ দাহে বরাহ লুটায় পঙ্কে,
মদকল করী কেলিকৌতুক ভরে,
বরষিছে বারি আদরে করিণী অঙ্গে ;

কমল তুলিয়া কভু লীলায়িত করে,
বীজন করিছে নর্ম্মসখীরে সুখে,
পঙ্কজ-রেণু পড়িছে কুম্ভ পরে,
সঘনে করিণী চাহিছে মুগ্ধমুখে।

সহসা পবন শিহরিল গিরিকূটে,
ঘনবনরাজি চিত্রিত ধূম্রবর্ণে,
পঞ্চতপার দীপ্ত অনল ফুটে—
তড়িতের ছটা কাঁপিছে কুসুমে পর্ণে।

ছুটে বনচর, আকাশে উড়িল পাখী,
হো—হো—দাবাগ্নি মেলিয়াছে মহা আস্য,
তপ্ত ভস্মে গিরি সানুদেশ ঢাকি',
লাখে লাখে শিখা দেখায় করাল লাস্য।

ধূম্রডম্বর নীলপর্ব্বত-চূড়ে
দেখ কে দাঁড়ায়ে নব-যোগিনীর বেশে,
গগনে গগনে পীত অঞ্চল উড়ে,
আঁধার আকাশ মুক্ত রুক্ষকেশে।

এস হে রুদ্র, এস এস মহাভাগ,
ঘিরি অম্বর পিঙ্গল জটাজালে,
কণ্ঠে জড়িত মণিরঞ্জিত নাগ
নাচুক তোমার ডমরুর তালে তালে।

দাঁড়াও বারেক উমা তাপসীর পাশে,
এ তপোদীপ্ত রুদ্ররঙ্গ মাঝে,
অগ্নি-বাসরে নবপ্রেম পরকাশে
ফুটুক মাধুরী উমার প্রণয় লাজে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মিলন-রাত্রি

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতদলের সহিত পুলিসের মারামারি পুলিস-"সাহেব" দেখিয়া যায়েন নাই। তিনি তৎপূর্ব্বেই গাড়ীর শব্দ লক্ষ্য করিয়া বিজনের সহিত আনুমানিক ডাকাতদলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন; আর এদিকে শিকল ছিঁড়িল—দারোগা সাহেবের ভাগ্যে। ডাকাতদল এই পথে আসিয়া পড়ায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধিল। ফলে কি হইল, পাঠক জানেন। ডাকাতরা তাঁহার দল-বলকে হারাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে পলাইয়া গেল—মাঝে হইতে ধরা পড়িলেন শরৎকুমার। দারোগা অতঃপর প্রধানতঃ আহত কনষ্টেবলদিগের শুশ্রূষার জন্যই সদলে থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কি জানি পুলিসকর্ত্তা যদি এইখানে ফিরিয়াই আসেন, তাঁহাকে সমস্ত বার্ত্তা জানাইবার জন্য দুইজন কনষ্টেবলকে মাত্র এখানে হাজির রাখিয়া হুকুম দিয়া গেলেন—৭টা বেলা পর্য্যন্ত পুলিস সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিয়া তাহার পর তাহারা যেন থানায় ফিরিয়া যায়।

থানায় ফিরিয়া প্রথমেই তিনি আহতগণকে হাসপাতালে আনিয়া ফেলিয়া শরৎকুমারের ডাক্তারী বিদ্যাটা কাযে লাগাইয়া লইলেন। এমন দক্ষতার সহিত বন্দী-ডাক্তার তাহাদিগের ক্ষতস্থানে অস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক ছিটাগুলী বাহির করিয়া লইয়া বাঁধন ছাদন ঠিক করিয়া দিলেন যে, তাঁহার অস্ত্রনৈপুণ্যে সকলেই প্রশংসামুগ্ধ হইয়া গেল। দারোগা মহাশয় সম্প্রতি প্রসাদপুরে বদলিপদে আসিয়াছেন; সুতরাং তিনি শরৎকুমারকে ইতঃপূর্ব্বে দেখেন নাই; কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার তাঁহাকে চিনিতেন। হইলে কি হয়! বিদ্রোহিতা অপরাধে তিনি এখন অভিযুক্ত—বাস্ রে! তাঁহার সহিত পরিচয়ের কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে! কিন্তু তিনি যাহা চাপা দিলেন—এক জন কম্পাউণ্ডার সে কথা প্রকাশ করিয়া বসিল।

ইহার পর কনফেসন পর্ব্ব। বন্দীর মুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দারোগা বাহাদুর রীতিমত ছলকৌশলময় সাপুড়ে মন্ত্রে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। মন্ত্র কিন্তু নিষ্ফল হইল, সাপ ভুলিল না—খেলিল না—সাপুড়ের বশ্যতা মানিল না। সর্ব্ব প্রশ্নের তাগিদে তাহার একমাত্র উত্তর—

"আমি নিরপরাধ; এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যাহা, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটকেই বলিব—"

বন্দী ডাক্তার লোক, অধিকন্তু তাহার ধরণধারণে, বাক্যে এমনতর একটা অভিজাত-শ্রেষ্ঠতা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল যে, দারোগা মহাশয় কার্য্যোদ্ধার সংকল্পেও তাহার প্রতি পীড়নপর হইতে সাহস না পাইয়া, অপরাহ্ণে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনরো তখন অ্যাসিষ্টেণ্ট মিঃ রোর সহিত বাগানে বসিয়া চা-পান করিতেছিলেন। মিসেস মনরো এখন বিলাতে। বিদ্রোহ-সংক্রান্ত ঘটনার পূর্ব্বে স্বামীও তাই বিলাত যাইবার মানসে 'প্রিভিলেজ লিবে'র জন্য দরখাস্ত করেন। সম্প্রতি তাঁহার সে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে এবং রো সাহেব তৎপদে বদলি নিযুক্ত হইয়াছেন। যখন ইচ্ছা এখন মনরো পাড়ি মারিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিদ্রোহ-সংক্রান্ত মোকদ্দমাটা শেষ করিয়া যাইবারই তাঁহার ইচ্ছা; তবে কি জানি, তাহা যদি না-ই পারেন, অন্ততঃ অ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে তাঁহার মতানুসারে গড়িয়া পিটিয়া ত রাখা চাই। এই সংকল্পে তিনি তাঁহার শাসন-নীতির অনুবর্ত্তনে চলিবার জন্য মিঃ রোকে যাহা কিছু বলিতেছিলেন, সে সকলই আত্মগর্ব্বপূর্ণ। তিনি নহিলে এ রাজ্যের 'এনার্কিষ্ট স্পিরিট' এমন সহজে এবং এত শীঘ্র অন্য কেহই দমন করিতে পারিত না; বোড়ের চালে রাজাকে তিনি এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন

যে, এখন আর তাহার নড়িবার সাধ্য কি? সম্ভবতঃ তিনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই এই বিদ্রোহের আমূল উচ্ছেদ সাধন করিয়া যাইতে পারিবেন; যদি নাও পারেন, তিনি ইহার পথ এমন নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিতেছেন যে, মিঃ রো সেই পথে চলিলেই অবাধ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে তাঁহার প্রিয়বন্ধু সুজন রায়ের রাজভক্তির ব্যাখ্যায় গদ্‌গদ্‌ চিত্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, —"ধন্যবাদ, শত শত ধন্যবাদ তাঁহাকে। বৃটিশ-রাজের এমন এক জন একনিষ্ঠ মঙ্গলকামী মিত্র আমি আর দেখি নাই, তাঁহার যত্ন পরিশ্রমেই—বিশ্বাসঘাতক রাজার চক্রান্ত প্রকাশ পাইয়াছে—আমরা মহা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। প্রসাদপুরের গদীতে তাঁহাকে এখন বসাইতে পারিলেই তৎকৃত এই মহৎ উপকারের প্রকৃত প্রতিদান দেওয়া হয়। দেশে গিয়া আমি নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করিব।"

সুজন যে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ পুত্রকেও ধরাইয়া দিয়াছে এবং সে যে এখন রাজসাক্ষী, ইহাও নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি জানাইয়া দিলেন।

অতঃপর কম্পাউণ্ডের ওপারে সদলবলে বন্দিসহ দারোগা সাহেবের সচল-মূর্ত্তি, মেঘের কোলে চাঁদবদনের মত ম্যাজিষ্ট্রেটের নয়নে প্রতিভাত হইল। বহুক্ষণ হইতে তিনি ইহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রিকালের যুদ্ধ সংবাদ মোটামুটি যদিও প্রাতঃকালেই টেলিফোনে তিনি জানিয়াছেন, তথাপি বন্দীকে নজরবন্দী করিয়া তাহার মুখ হইতে বিদ্রোহ-সংক্রান্ত সমস্ত খবর আদায় করিয়া লইবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন।

কনষ্টেবলসহ বন্দীকে দূরে রাখিয়া প্রথমে দারোগা মহাশয় নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া উভয় সরকারকে যথারীতি সেলাম ঠুকিয়া Good evening, Sirs বলিয়া দাঁড়াইলেন। ছোট সরকার তাঁহার সেলাম ফিরাইয়া দিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু বড় সরকার শুধু Good evening সম্ভাষণের পর তাঁহাকে কহিলেন, "Shame Inspector Babu, shame! সশস্ত্র শিক্ষিত পুলিস তোমরা, —তোমাদের গোলা-গুলী এড়িয়ে স্বচ্ছন্দে পালাল কি না, অস্ত্রমূর্খ বাচ্ছা কজন—বদমায়েস দল!"

ইনস্পেক্টার বাবু ফরাসী আদর্শে গঠিত তাঁহার চিবুক আলম্বিত ছাগশ্মশ্রুর অগ্রভাগ ধীরে পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন,—"না Sir, মোটেই অস্ত্রমূর্খ নয় তারা। আপনি সেখানে থাকলে তা বুঝতে পারতেন। আমাদের পক্ষে disadvantage ছিল সম্পূর্ণ। অন্ধকার রাতে, জঙ্গলের গোলোক ধাঁধার মধ্য দিয়ে ভূতের মত কোথা থেকে কেমন ক'রে যে তারা আসছে যাচ্ছে—তা মোটেই বোঝা যাচ্ছিল না। তবুও যে এ রকম অবস্থার মধ্যে তাদের একজনকেও আমরা বন্দী করতে পেরেছি, এতেও যদি আপনারা খুসী না হন ত দুর্ভাগ্য আমাদেরই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন প্রফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"Bravo! three cheers for police regiment! বন্দী স্বীকার করেছে?"

"করেনি এখনো। আপনার কাছে এসে স্বীকার করবে বললে। লোকটা একজন মাতব্বর ব্যক্তি—ডাক্তার, —দেখলে বুঝবেন,—পঞ্চাশজন চুনোপুটির চেয়ে—এ রকম বড় কাতলার দর ঢের বেশী।"

"ডাক্তার?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোট হুজুর।

দারোগা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ,—খুব বড় ডাক্তার—প্রসাদপুর রাজার ডাক্তার। একজন কনষ্টেবলের পায়ে—আর একজনের পাঁজরার পাশে গুলী লেগেছিল; কি চমৎকার কাটাকুটি ক'রে যে জোড়তাড় লাগিয়ে দিলেন,—দেখে আমরা ত অবাক! যদি এরা বেঁচে যায় ত ডাক্তারের হাতের গুণেই বাঁচবে।"

"আপনি না বল্লেন—প্রসাদপুর রাজার ডাক্তার ইনি? এঁর অস্ত্রবিদ্যার যশের কথা আমিও শুনেছি। প্রথমে এখানে যখন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসি, তখন মিষ্টার ক্লাউডেনের পার্টিতে একবার এঁকে দেখেও ছিলুম।"

মিঃ রো এ কথা বলিয়া থামিলে পর ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, —"আচ্ছা, তা হ'লে তোমাদের সে great manকে এখানে নিয়ে এস এইবার; দেখে কৃতার্থ হওয়া যাক্‌।"

ইনস্পেক্টার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"এইখানে কি আনব? স্বীকারোক্তি নিতে হবে তার?"

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু হাসিয়া বলিলেন,—"চল ঘরেই যাচ্ছি। তবে স্বীকারোক্তির সময় ইনিও থাকবেন। এঁকেই এখন থেকে তোমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট বলে জেনো। পরশু মেল ডে—সেদিন আমাকে ছাড়তেই হবে। আশা

...র—তার আগেই এ caseটা শেষ করে যেতে ...রবো।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দী আনীত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তুমি প্রসাদপুর রাজার ডাক্তার?"

উত্তর হইল,—"কিছুদিন থেকে সেখানে আছি বটে?"

প্রশ্ন। রাজা ত এখন কল্‌কাতায়—এ সময় তুমি যে প্রসাদপুরে?

উত্তর। হাসপাতালের একটা case দেখতে এসেছি।"

প্রশ্ন। শীতের রাত্রিতে, মেঘ বৃষ্টির মধ্যে, সুখের আস্তানা ছেড়ে জঙ্গলে এসেছিলে কি অভিপ্রায়ে?"

উত্তর। শুনেছিলুম—জঙ্গলে মাঝে মাঝে ভূত দেখা যায়—তাই—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রোধপূর্ণ শ্লেষবাক্যে কহিলেন,— "ও: খুব সাহসী তুমি? কে সঙ্গে ছিল তোমার?"

উত্তর। কেহই না।

প্রশ্ন। কেহই না?

উত্তর। না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে, দারোগা তখন একটা পিস্তল বন্দীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ পিস্তল তোমার পকেটে ছিল কি না?"

উত্তর। ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ রাজার নামাঙ্কিত পিস্তল—তুমি পেলে কি করে?"

উত্তর। রাজা দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন। রাজা দিয়েছিলেন। কেন?

উত্তর। আত্মরক্ষার জন্ত।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"যে ভাল মানুষ, আত্মরক্ষার জন্ত তার পিস্তলের কি দরকার? বল, বিদ্রোহের জন্ত এ পিস্তল তোমার মিলেছিল?"

ডাক্তার বলিলেন,—"আপনার ঘরে কি পিস্তল নাই? আপনি কি বিদ্রোহী?"

ম্যাজিষ্ট্রেট এই উত্তরে অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন,—চড়া সুরে কহিলেন—"আমি ম্যাজিষ্ট্রেট, আমি ইংরাজ। নিগারের সহিত—আমার তুলনা ক'রে জান তুমি দণ্ডনীয় হচ্ছ?"

এই সময় পুলিস-কর্ত্তা মিঃ বেন্‌ওয়েল তাঁহার দলবলকে দ্বারদেশে রাখিয়া এখানে আসিয়া হাজির হইলেন—এবং বিজন রায়ের সৌজন্তে জঙ্গলের মন্দির ভেদ করিয়া যে সকল হাতিয়ার লাভ করিয়াছিলেন—যথারীতি অভিবাদন এবং অস্ত্রপ্রাপ্তির বিবরণ সংবাদ সহ সেগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবলে ধরিয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একে একে অস্ত্রগুলা হাতে লইয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে দুইখানা প্রসাদপুর নামাঙ্কিত তরবারি। এই দুইখানা মাত্র আড্ডায় ফেলিয়া রাখিয়া প্রসাদপুর রাজের অন্তান্ত হাতিয়ার ডাকাতগণ ব্যবহারের জন্ত লইয়া গিয়াছিল। পুলিসের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইঙ্গিতে সেই তরবারির একখানি বন্দীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ অস্ত্র কি চেন তুমি? একি প্রসাদপুররাজের?" উত্তর হইল,—"চিনি না; অর্থাৎ পূর্ব্বে এ তরবারি আমি দেখি নাই। কিন্তু ইহা যখন রাজার নামাঙ্কিত, তখন এ অস্ত্র তাঁর।"

মিঃ বেন্‌ওয়েল বলিল,—"এ অস্ত্র বিদ্রোহীদের আড্ডায় পাওয়া গেছে; তিনি কি তা হ'লে তাদের এগুলা উপহার দিয়েছিলেন?

শরৎকুমার দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয়ই না। অনেক অস্ত্র তাঁর চুরী গিয়েছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিসের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই চুরীর সংবাদ কি থানায় লিখিয়েছিলেন তিনি?"

বেন্‌ওয়েল বলিল,—"না। তাঁর অস্ত্র চুরীর খবর আমরা কিছুই জানিনে। বিজন রায় এখানে উপস্থিত আছেন; তাঁর কাছ থেকে এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যেতে পারে।"

বিজন আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট শরৎকুমারকে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহাকে চেন তুমি?"

ডাক্তারের প্রতি বিদ্বেষভাব বিজনের মনে জন্মগত সংস্কার তুল্য এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীরে যেন দাবানল জলিয়া উঠিল, এবং তাহার হৃদয়ের বাকী মঙ্গল ভাবটুকুও সে আগুনে জলিয়া পুড়িয়া তৎক্ষণাৎ খাক্ হইয়া গেল।

বিস্ময় কটাক্ষে ডাক্তারের দিকে একবার চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কথার উত্তরে বিজন কহিল,—"চিনি। প্রসাদপুররাজার ডাক্তার।"

পুলিস তখন রাজনামাঙ্কিত তরবারি তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জান কি এ তরবারি কার ?"

"প্রসাদপুররাজের।"

"বিদ্রোহীদের আস্তানায় কি ক'রে এ তরবারি এল—তা কি বল্‌তে পার তুমি ?"

অসঙ্কোচে অম্লানবদনে বিজন রায় উত্তর করিল,—"বল্‌তে পারি। বিদ্রোহীরা এ অস্ত্র রাজার কাছে দানস্বরূপ পেয়েছিল।"

শরৎকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা। একেবারেই মিথ্যা। রাজার একজন বিদ্রোহিদলভুক্ত কর্ম্মচারী এসব অস্ত্র চুরী ক'রে নিয়েছিল।

পুলিস জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কোথায় ?"

শরৎকুমার বলিলেন,—"নরকে। সে জীবিত নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"হাঁ, এ খুব বুদ্ধিমানের মত সাফাই বটে। তুমি এ সম্বন্ধে কি জান বল।" বিজনের দিকে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এ কথা বলিলেন।

বিজন বলিল,—"আমি জানি রাজাই বিদ্রোহীদলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দান না পেলে সমিতি চল্‌তেই পারত না,—তাঁকেই সাক্ষী মান্‌তে পারেন।"

শরৎকুমার ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন,—"বস, আর কোন কথা না।—আর কিছু শুন্‌তে চাইনে আমি। বন্দীকে 'সেলে' লইয়া যাও, দারোগা বাবু—আর বেন্‌গেল, বিজনকেও এখানে আর দরকার নেই। বিজন বাড়ী যেতে পারে। কনষ্টেবলদের এই হুকুম দিয়ে তুমি একবার এখানে এস।" বিজনকে লইয়া পুলিসের কর্ত্তা চলিয়া গেল, আর শরৎবাবুকে লইয়া দারোগাবাবু চলিয়া যাইবার আগে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, "যো হুকুম! কিন্তু কনষ্টেবল দু'জনকে বন্দী ডাক্তার চিকিৎসা করবেন ত? নইলে তারা রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যদি বন্দীকে না পাওয়া যেত ?"

"খুব সম্ভবতঃ মরতো তারা।"

"তাই মরুক তবে, জাহান্নমে যাক্।"

নেটিভ নিগার লোকের প্রতি তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া দারোগা যখন শরৎকুমারের সহিত দ্বার পার হইয়া গেল, তখন ছোট হুজুরের কথায় পুনরায় তাহার ডাক পড়িল।

দারোগা ফিরিয়া আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, বন্দী-ডাক্তার কনষ্টেবলদের চিকিৎসা করুক্,—কিন্তু বন্দিবেশেই যেন ওকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কার্য্যান্তে যেন 'সেলে' পাঠান হয়।"

যো হুকুম বলিয়া দারোগা চলিয়া গেল। ইত্যবসরে পুলিসের কর্ত্তা ফিরিয়া আসিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"শোন, বেন্‌গেল, বিজন রায় রাজ-সাক্ষী হওয়াতেই এমন সহজে বিদ্রোহ দমন হোল;—এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বে-কসুর ক্ষমা—আমাদের কাছ থেকে ওর প্রাপ্য। এখন থেকে তুমি ওকে free man বলেই জেনো। আর এর পর তোমাদের দপ্তরেও যেন বিজনের বিদ্রোহী নাম না থাকে।"

এই হুকুম দিবার জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস-কর্ত্তাকে হাজির হইতে বলিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর মিঃ রো একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমারও একটি আবেদন আছে—Mr. Monrow."

ম্যাজিষ্ট্রেটও হাসিয়া বলিলেন,—"Very well, I am all attention, Sir."

ছোট হুজুর বলিলেন,—"জানেন ত আপনি, ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর পা ভেঙ্গে গেছে।"

"Yes, Yes, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত—ডাক্তার সি দেখ্‌ছেন ত ?

"হাঁ, কল্‌কাতা থেকে এসে operation করে গেছেন তিনিই। কিন্তু তিনি ত হাসপাতালের কায-কর্ম্ম ছেড়ে বেশী দিন এখানে থাকতে পারেন না, এখানকার হাসপাতালেরই একজন ডাক্তারকে এ কার্য্যের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করা হয়েছে। ডাক্তার সি কল্‌কাতা থেকে হপ্তায় দু' একবার এসে পা দেখে—যা করতে হবে, একেই সব ব'লে ক'য়ে যান।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"Good Gods! এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারের হাতে অস্ত্র চিকিৎসার রোগী?"

মিঃ রো বলিলেন,—"এখন দেখ্‌ছি সেটা অনুচিত হয়েছে। গতবারে ডাক্তার সি এসে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে বলে গেছেন যে, ওর অস্ত্র-চিকিৎসায় জ্ঞান কিছু-মাত্র নেই—ওর হাতে এ case রাখলে শীঘ্র ত তিনি আরাম হবেনই না এবং আরাম হবার পরও ভবিষ্যতে খোঁড়া হ'য়ে থাক্‌তে পারেন। অতএব তিনি চান এমন একজন সুযোগ্য অ্যাসিষ্টাণ্ট ডাক্তার,—একদিন আসতে বন্ধ হ'লেও যার উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

"তিনি কারো নাম বল্লেন?"

"ত' এক বছর আগে প্রসাদপুররাজকে চিকিৎসা করতে এসে, তিনি যাকে assistant পেয়েছিলেন, তাঁর উপরই ডাক্তারের বেশী ঝোঁক। তাঁকে আনাবার জন্য তিনি রাজাকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন; সে চিঠির উত্তরে জেনেছি, রাজা লিখেছেন যে, ডাক্তার শরৎকুমার রায় এখন প্রসাদপুর রাজবাড়ীতেই আছেন। তাঁকে বল্লেই তিনি খুসী হয়েই এ 'কেস' নেবেন, আর রাজাও এজন্য তাঁকে লিখেছেন। রাজার চিঠিখানি খুবই nice চিঠি। পড়ে আমি খুবই impressed এবং thankful হয়েছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া উঠিলেন,—"Thankful! for what? Nonsense! নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ওরা আমাদের প্রসন্ন রাখতে চায়! এতে আমরা thankful হ'তে যাব কেন? সে যা হ'ক, এই বদমায়েস অ্যানার্কিষ্টটাই বুঝি ডাক্তার সির সেই favourite?"

"ঠিক তাই। এর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাই বন্দীকে দেখে আমি দৈবানুগ্রহ অনুভব করছি। কাল ডাক্তার সি আস্‌বেন; আমি কি সে সময় এঁকেও consultation এর জন্য পেতে পারি?"

এ প্রস্তাবে ম্যাজিষ্ট্রেট "সাহেব" মনে মনে বিরক্ত বোধ করিলেন; কিন্তু তবুও ত এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন না,—অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। প্রকৃত পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট এখন হইতে মিঃ রোই—ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাঁহার অনুমতি চাহিতেছেন মাত্র। মনরো নরম ভাবেই উত্তরে কহিলেন,—"বেশ ত! এর ডাক্তারী যদি তোমার কাযে লাগে সে ত ভালই; আমিও তাতে খুব সুখীই হব। তবে সুযোগ্য ডাক্তার হ'লেও লোকটা যে 'dangerous criminal'—তার সঙ্গে ব্যবহার কালে এ কথাটা ভুলো না।"

সেই রাত্রিতেই ম্যাজিষ্ট্রেট—শরৎকুমারের জবানবন্দী হইতে রাশি রাশি প্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন এবং জজের বিচার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে 'সেল'বন্দী করিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন।

বিদ্রোহীদলের নেতা এই অভিযোগে রাজাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্যও পরোয়ানা বাহির হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

শুকতারা

চন্দ্রলোকের শুকতারা কি বাসরঘরের বাতি,
মিলন-রাতের সোহাগ জানায় বঁধুর সাথে মাতি?
নীরবতার আরক পিয়া,
নিশার সনে মিশায় হিয়া,
কর্‌ছে নতি অরুন্ধতী যোগের আসন পাতি!

পুণ্যলোকের শুকতারা কি দেবের পূজার ফুল,
নন্দনেরই পারিজাত এ দীপ্তিতে অতুল?
মা যশোদার শীতল বুকে
গোপাল কি এ হাস্‌ছে সুখে,
চারপাশে তার মিতালীদল আনন্দে আকুল!

স্বপ্নপুরীর শুকতারা কি আঁখির ফোঁটা জল,
রূপকুমারীর অভিমানের অশ্রু ঝলমল্?
এ কি গৃহলক্ষ্মী সমা
শুভ্র পেলব মনোরমা,
না এ কি মা'র স্নেহের চুমা নির্ম্মল ঢল্ ঢল্!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

অমরত্ব-স্পৃহা

জার্ম্মাণ লেখক জিন পল রিখ্‌টরের গ্রন্থে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে। দেবদূত আসিয়া এক মনুষ্য-আত্মাকে লইয়া স্বর্গের তোরণদ্বারে উপস্থিত করিল, এবং অনন্ত ব্যোমে যে অসংখ্য লোক আছে, একে একে তাহাকে সব দেখাইতে লাগিল। তাহাদের ব্যবধান লক্ষ লক্ষ যোজন। শত সহস্র পৃথিবী জুড়িয়া তাহাদের আকার। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া, গ্রহ উপগ্রহ লইয়া, আমাদের যে এই সৌর-জগৎ, এমন কত শত সহস্র জগৎ তথায় ছড়ান রহিয়াছে—একের পর আর। কি বিস্তার, কি আকার, কি চক্ষু ঝল্‌সান ঔজ্জ্বল্য। কি প্রচণ্ড বেগে প্রত্যেকটি ছুটিতেছে। প্রত্যেকের অঙ্গে কত অসংখ্য পদার্থ, কত জীব, কত উদ্ভিদ, কত গিরি-নদী, কত মরু-প্রান্তর, কত অপার সমুদ্র। মনুষ্যটি অনন্তের এই রূপ দেখিয়া বিহ্বল, ব্যাকুল হইয়া পড়িল; একবার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পরে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। কম্পিতকলেবরে পরিশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। হৃদয়ের ভার অশ্রুরূপে নির্গত হইল। তখন সে বলিল, "হে দেবদূত, আর আমি দেখিতে চাহি না, এই অসীমতায় মানুষের আত্মা ব্যথিত হয়। ভগবানের বিভূতি মানুষের অসহনীয়। কবরের সেই স্বল্প পরিসরে আবার শুইতে দাও, অনন্তের এই নির্য্যাতন হইতে আমার রক্ষা কর; কই, কোথাও ত ইহার সীমা দেখিতেছি না!"

তখন সেই দেবদূত নিজ ভাস্বর হস্ত দুইখানি স্বর্গের দিকে তুলিয়া বলিল, "সত্যই ভগবানের সৃষ্ট বিশ্বের অন্ত নাই। আর তাহার আদিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

যখনই পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মার অমরত্ব-স্পৃহার কথা চিন্তা করি, তখনই রিখ্‌টরের এই উপাখ্যানটি মনে পড়ে। ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি আহরণ করিবার জন্য হিন্দুর পক্ষে অন্য দেশের সাহিত্য অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনেরই প্রকারান্তর মাত্র। তাই সেই সঙ্গে একাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোকগুলিও মনে পড়ে।

"দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি তাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥"

তবে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের বৈশিষ্ট্য এইস্থানে যে তিনি শুধু এই বিশ্বই অবলোকন করিলেন না—বিশ্বের সঙ্গে এই সমগ্র বিশ্ব যাঁহার রূপ, সেই সনাতন পুরুষেরও সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥"

সত্যই বিশ্বের এই অসীমতাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিবেন বা করিতে প্রয়াস পাইবেন—তিনিই অর্জ্জুনের মতই বেপমান, ভাব-ভীত ও গদ্‌গদ্‌কণ্ঠ হইয়া ইহা হইতেই নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিবেন। কারণ, মানবের গ্রহণ করিবার ক্ষমতা স্বল্পমাত্র—তাহার ইন্দ্রিয়সকল সঙ্কীর্ণ। সেই জন্যই এই পৃথিবী হইতে প্রায় কোটিগুণ বৃহদাকার সূর্য্যমণ্ডল আমাদিগের চক্ষুতে থালার মত প্রতীয়মান হয়। অসংখ্য জীবাণু-পরিপূর্ণ বায়ুমণ্ডল শূন্য বলিয়া বোধ হয়। কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত নক্ষত্ররাজিসমন্বিত অনন্ত ব্যোম মাথার উপরে অনুচ্চ চন্দ্রাতপ বলিয়া ভ্রম হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রত্যেকটিই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের অনুভূতিগম্য। আবার, মাত্র ইহাদিগকেই দ্বার করিয়া আমাদিগকে সকল দ্রব্যের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। কে বলিতে পারে, ইহা ভিন্নও দ্রব্যের অন্য গুণ আছে কি না? যদি থাকে, তাহা মানবের অনুভূতির অতীত। পক্ষান্তরে, যদি এই কয় ইন্দ্রিয়ের অধিক আরও কয়েকটি ইন্দ্রিয় মানবের থাকিত, তবে কে বলিতে পারে, এই বিশ্বসংসার কি আকারে তাহার নিকট প্রতিভাত হইত? আবার যে কয়টি ইন্দ্রিয় আমাদের আছে, তাহাদিগেরও কার্য্য

করিবার ক্ষমতা নিতান্তই পরিমিত। এক সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয় প্রায় কর্ম্মব্যাপৃত হইতে পারে না। আবার অষ্টপ্রহরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় তাহারা বিশ্রামের অপেক্ষা করে। সেই বিশ্রামের নাম নিদ্রা—যাহার সঞ্জীবনস্পর্শে সকল শ্রম দূরে যায়, সকল অপচয় পূর্ণ হয়,—সকল গ্লানি নিবৃত্ত হয়, যাহার অভাবে সকল ইন্দ্রিয় বিকল হয়—মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন প্রশ্ন দৈনন্দিন নিদ্রার পরিবর্ত্তে চিরনিদ্রার অঙ্কে মানব যখন আপন অবশ দেহ এলাইয়া দিবে, তখন এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক জীবনের সকল ক্ষীণতা, অক্ষমতা ও সসীমতা নিমেষে দূর হইয়া যাইবে কি? আর তাহার পরিবর্ত্তে সহসা আত্মশক্তির অসীম অনুভূতি উহাতে উদ্ভূত হইবে কি? সুষুপ্তির রূপার কাঠির স্পর্শে যে আমি জড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ি, মরণের সোনার কাঠির স্পর্শে সেই আমি কি বিপুল ভাবে প্রাণবান্ হইব? জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে যে আমি পদে পদে পরাস্ত হইয়াছি—মরণের পরপারে সেই আমি কি সর্ব্বজয়ী সামর্থ্য লাভ করিব কি? নচিকেতার মত মরণ-দেবতার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিয়া কে বলিতে পারে, সত্যই মৃত্যু, সেই কুহকী, সেই ঐন্দ্রজালিক, যে এ জীবনের যত ব্যর্থতা, যত ক্ষুদ্রতা, যত অপূর্ণতা সকলই নিমেষে সার্থকতায় মহত্বে ও পূর্ণতায় পরিণত করিতে পারে?

বয়সের পরিণামের সঙ্গে যেমন দৈহিক শক্তিরও অপচয় হয়, মানসিক ক্ষমতাও কি অধিকাংশ স্থলে তেমনই হ্রাস পায় না? শুধু ভোগের রাজ্য কেন, জ্ঞানের রাজ্যে, ত্যাগের রাজ্যেও কয়জনকে দেখিতে পাই, যাঁহারা মরণের দিকে যত অগ্রসর হয়েন, ততই পর্ব্বতচারী সিংহের মত উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে দৃঢ়পদক্ষেপে আরোহণ করিতে থাকেন। ইহার যে ব্যতিক্রম নাই, এমন কথা বলি না—যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মানবসমাজের শিরোমণি—তাঁহাদিগকে দেখিয়াই এক একবার আশা হয়, বুঝি বা উপযুক্ত সাধনা করিলে অন্তিমসময়ে জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণবায়ুর নির্গমনের সহিত পক্ষপুট বিস্তার করিয়া বিহগ যেমন আকাশের উচ্চতর প্রদেশে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া যায়, তেমনই দ্যুলোকে ভূমার জগতে মানুষও অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিবে। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ অগণিত মনুষ্যসমাজের তুলনায় মুষ্টিমেয়মাত্র নহেন কি? ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া ইতর-সাধারণ জনের সম্বন্ধে শুধু পূর্ব্বোক্ত নিয়মই কি প্রমাণিত হয় না? প্রবীণ আক্ষেপ করিতেছেন—পূর্ব্বের মত পরিচিতের নামধাম আর মনে থাকে না; তর্কের ক্ষেত্রে ধীশক্তি আর কুশাগ্রের মত তীক্ষ্ণ নাই; প্রতিবাদীর যুক্তিকে খণ্ডন করিবার সে অনায়াস-আগ্রহ আর নাই; কল্পনা আর স্বচ্ছন্দে সাগর, ভূধর, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্যে বিচরণ করে না, মৈনাক পর্ব্বতের মত কে যেন সে স্বচ্ছন্দবিহারীর পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে; প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুধাবন করিবার সে সহজ উদ্যম যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কত শত বয়োবৃদ্ধের মুখ হইতে এই আক্ষেপোক্তি আমরা প্রতিদিন শুনিতে পাই। আবার বৈরাগ্যের জগতে দেখিতে পাই নাই কি—যে অমুক আনন্দ যাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বিরক্তির দীপ্ত মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল, তিনিই লোকসমাজে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে—শিষ্যসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত—ত্যাগের পরিবর্ত্তে ভোগকেই অপরিহার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। "কমলী কো বাস্তে" নির্জ্জন গুহাবাস তাঁহার ছুটিয়া গিয়াছে, অনাবৃত ভূমিশয্যার পরিবর্ত্তে আজ সুধাধবলিত প্রকোষ্ঠে পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা নহিলে তাঁহার সুপ্তি হয় না। দূরে গিয়াছে সেই শীতাতপ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। দূরে গিয়াছে সেই কৃচ্ছ্রসাধন—সেই আহার্য্যবিষয়ে উদাসীনতা। বৈরাগ্য আজ কৌপীন ও 'আওরাখায়' গৈরিকে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তাই স্বতঃই মনে হয়, মরণের সিংহদ্বারে মানব যখন উপনীত হয়, তখন সে কোন্ ভরসায় অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবার দাবী করিতে পারে? দেহ ত ভগ্ন হইয়াছে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল জবাব দিয়াছে, মন বিকল হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বল ও বাসনাসকল ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—এমত অবস্থায় কোন্ সাহসে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ মানব বলিবে, 'আমি অমর হইব?' অনন্তকাল ধরিয়া এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের অনন্ত রহস্য অনুধাবন করিবার শক্তি ও সামর্থ্য তাহার কোথায়?

আর এক কথা—মৃত্যুর স্পর্শে বিকৃত হইয়া চিতায় অনলে ক্ষণকালের মধ্যে অথবা কবরের ভিতর কয়েক মাসের মধ্যে এই রক্তমাংসের দেহ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমন্বিত আধার দগ্ধ হইয়া কিংবা গলিত হইয়া একেবারে নষ্ট হইবে। ইহা ত প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। প্রশ্ন উঠে—এই যন্ত্রের ধ্বংস হইলে যন্ত্রী কি উপায়ে কর্ম্ম করিবে—আধার নষ্ট হইলে আধেয় কাহাকে আশ্রয় করিয়া স্থল জগতে বিচরণ করিবে—অনন্তকাল ধরিয়া বিষয়সমূহ উপলব্ধি করিবে? ইন্দ্রিয়কে দ্বার না করিয়া, দেহ আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ আত্মা যে পদার্থনিচয় অনুভব করিতে পারে—বিষয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহার নিদর্শন স্থূলজগতে কোথায় দেখিতে পাই? কে আশ্বাস দিবে—মৃত্যুর এ পারে যে নিদর্শন দুর্লভ—পরপারে তাহা সুলভ; আমাদের উপস্থিত সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব—বৈতরণীর পরপারে তাহা নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে?

প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিলে মানুষের অমরত্বস্পৃহা যে নিজ ভিত্তি হারাইয়া ফেলে—তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু তবু আমাদের মন প্রবোধ মানে না। সকল অভাব, সকল ক্লেশ, সকল দৈন্য আমরা মানিয়া লইতে পারি—কিন্তু বিশ্বসংসার হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইব—এই ধারণাকে আয়ত্ত ও স্বীকার করিতে চাহি না। কারণ, মানবের যত বাসনা আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতম বাসনা হইতেছে জিজীবিষা—অনিয়ত কাল বাঁচিয়া থাকিবার স্পৃহা। "সা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।" ভোগের সামগ্রী সকল ত্যাগ করিতে পারি, আত্মীয়স্বজনকে দূরে পরিহার করিতে পারি, গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যকান্তার-গুহাতে নির্জ্জনবাস স্বীকার করিতে পারি—এমন কি, অমুল্লঙ্ঘ্য বিধিলিপি বলিয়া এই দেহ পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি—কিন্তু এই বিচিত্র বিশ্ব হইতে,এই সূর্য্যালোকিত, নক্ষত্রমালাখচিত, শ্যামল তরুলতায় নয়নারাম, প্রাণের স্পন্দনে অনন্ত লীলাময় জগতে কোনরূপে, এমন কি সূক্ষ্মভাবেও থাকিব না—ভোক্তা না হইলেও সাক্ষিভাবেও এই প্রপঞ্চকে উপলব্ধি করিতে পারিব না—এই কল্পনা পোষণ করিতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে—অবসন্ন হয়—বিকল হয়। বুঝি বা সেই মনোভঙ্গ—সেই অবসাদ, সেই বিকলতা দূর করিবার জন্য, পাছে নৈরাশ্যের তাড়নায় মানুষ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে, কিংবা আত্মলোপের সংকল্প করে, অথবা সকল কর্ম্মে জবাব দিয়া একেবারে জড় হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কায় জগতের সকল ধর্ম্মমত অমরত্বকেই প্রথম সূত্ররূপে নির্ণয় করিয়াছে সকল ধর্ম্মই মরণের পরপারে এক পরম আনন্দময় জীবন চিত্রিত করিয়াছে। মর্ত্ত্যে যে সকল পদার্থ অবিমিশ্র সুখের অন্তরায়, সে সকলকে বাদ দিয়া, অতিমর্ত্ত্য-জীবন অব্যাহত ও অপরিসীম সুখের আকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। যে অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে মানুষের মনে স্বতঃই আশঙ্কা ও নিরাশার সঞ্চার হয়, যে অবস্থা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন—"That undiscovered land from whose bourne no taveller returneth" সেই অবস্থাকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া, আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুরূপে অঙ্কিত করিয়া থাকে বলিয়াই সংসারের দুঃখ কষ্টের ব্যর্থতা ও অভাবের মধ্যে মানব ব্যগ্রভাবে একটি না একটি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মমতে পরলোক—বিশেষতঃ সুকৃতিগণের পক্ষে পরলোক যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

খৃষ্টানের বাইবেল শেষ দিনে পাপ-পুণ্যের বিচার হইবার পর নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন :—

And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away.

এই ভাবে যে সকল সাধু-পুরুষ এ জগতে দুঃখ-নির্য্যাতনের ক্রুশ বহন করিয়া খৃষ্টের প্রদর্শিত পুণ্যের পথে অবিচলিত ভাবে চলিতে পারিবেন—তাঁহারা নিজ সুকৃতের ফল অর্জ্জন করিবেন বলিয়া Revelation আশা দিতেছেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে গোলোকের যে বর্ণনা আছে, তাহা ইহা হইতে আরও মনোরম। ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যোঽপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥"

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কতিপয় বিরলপ্রচার সাধুজন যাহাকে গোলোক বলিয়া জানেন, আমি সে শ্বেতদ্বীপের ভজনা করি। সেখানে সকল কান্তাই লক্ষ্মীরূপা, কান্ত সেই পরমপুরুষ। বৃক্ষ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিনামক মণিগণময়। জল অমৃত। স্বাভাবিক কথাই গান, স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী। চন্দ্রাদি জ্যোতি ও রস-গন্ধাদি ভোগ্য বস্তু সকল চিদানন্দময়। কারণ, সকলই পরমেশ্বরের অংশভূত। সে স্থানে সুরভিসমূহ হইতে বিপুল ক্ষীর-সাগর নিঃসৃত হইতেছে। সে স্থানে নিমেষার্দ্ধনামক কালগতিও পরিলক্ষিত হয় না।

মরণের পরপারে যে ভবিষ্যৎ, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মে, বিভিন্ন দার্শনিক মতে এইরূপ লোভনীয়—এইরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হইলেও—কত জন আছে, যাহাদের এই সকল বর্ণনায় ঠিক প্রত্যয় হয় না। দার্শনিকের যুক্তিজাল হয় ত এইরূপ ব্যক্তিগণ ছেদন করিতে অসমর্থ। তথাপি দার্শনিকদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ দেখিয়া কোনটিকেই অভ্রান্ত সত্যরূপে মানিয়া লইতে তাহাদের চিত্ত প্রস্তুত হয় না। তাহারা বলে, ধর্ম্মের তত্ত্বের মত পারলৌকিক তত্ত্বও গুহাতে নিহিত আছে 'এবং মতং যস্য ন বেদ সঃ।' যে বলে এই তত্ত্ব সে বুঝিয়াছে—সে প্রকৃতপক্ষে জানে না। সত্যের স্বরূপ এক ও অভিন্ন। পরলোকের প্রকৃত তত্ত্ব যদি জানাই গিয়াছে, তবে তাহা লইয়া সক্রেটিস ও সিনেকার মধ্যে, জৈমিনি ও পতঞ্জলির মধ্যে, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে Theosophist ও বৈজ্ঞানিক প্রেততত্ত্বান্বেষিগণের মধ্যে এত মতভেদ কেন?

হয় ত, এ যুক্তিরও উত্তর আছে—এই মতভেদের মধ্যেও সমন্বয় সম্ভব। মনুষ্য সমাজে এমন তার্কিক উদ্ভূত হইতে পারেন—যিনি সূক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে এই অসংখ্য মতজালের মধ্যেও যে সত্যের এক ও অভিন্ন মূর্ত্তি আছে, তাহা প্রমাণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে যুক্তির আয়ত্ত নহে—তর্কের অধিকারসীমার অন্তর্গত নহে। 'নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া।' এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানব যাহা চাহে, তাহা যুক্তি নহে—তাহা অনুভূতি—তাহা অপরোক্ষজ্ঞান। আত্মার অস্তিত্ব তখনই বুঝা হইবে—যখন ইহা চক্ষুর সমক্ষে সূর্য্যালোকের মত, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পদ্মগন্ধের মত, ত্বগিন্দ্রিয়ে মলয়স্পর্শের মত নিঃসন্দিগ্ধভাবে, স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে; এবং তজ্জন্য প্রয়োজন হয় সেই গুরুর- যিনি "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং" করিতে পারেন। সেই দ্রষ্টা পুরুষের—যিনি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছেন, "শুধু দেখিনি—তোকেও মা দেখাতে পারি" তেমনই মানবসমাজকে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে যাহার নেতি-নেতিরূপে বর্ণনা হইয়া থাকে—সেই পদার্থকে সত্যই প্রত্যক্ষভাবে--সচ্চিদানন্দময়রূপে দেখাইতে পারেন।

কিন্তু তেমন গুরু "লাখ্ মে মিলে এক।" এক শত যাট কোটি মানবের মধ্যে কয়জন সৌভাগ্যবানের পক্ষে তেমন সদ্গুরুলাভ ঘটিয়া থাকে? ঘটিলে ত তাহা লুকান থাকে না। তখন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি।" যে ব্যক্তি এইরূপ গুরুপ্রসাদাৎ আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে সে কি আর পাটোয়ারি বুদ্ধিতে চলিতে পারে--সে কি আর ইতরসাধারণের মত শুধু আহার নিদ্রা লইয়া, কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে? তাহার চোখের ঠুলি যে খুলিয়া গিয়াছে। যে পর্দার পর পর্দায় সত্যের রূপ আমাদের চিত্ত হইতে আবৃত হইয়াছে—তাহার পক্ষে যে পর্দা সকল সরিয়া গিয়াছে। প্রকৃত কথা ইহাই যে, সত্যই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে দুর্লভ। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।" সাধারণ মানব ইন্দ্রিয়ের জালে জড়িত হইয়া ভোগের ভিতরেই চরিতার্থতা লাভ করে। ইহাই রক্ত-মাংস-নির্ম্মিত শরীরীর সংস্কার। ইহার নিন্দা করা সহজ—কিন্তু পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদ করা - বিশেষতঃ মানবসাধারণের পক্ষে—সাধ্যাতীত। ইহার ব্যতিক্রম শুধু মহাপুরুষদিগের সত্তায় সম্ভব। ইতরসাধারণ এই দেহগত সংস্কার পরিহার করিবার ইচ্ছামাত্র করিতে পারে—কিন্তু পরক্ষণেই সেই দুস্ত্যজ্য সংস্কার আসিয়া আবার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ফলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত গুরুর

মুখে শেখা বুলির মত শুনায়। যাহা বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা, তাহাতেও লৌকিক আচরণে পদে পদে গরমিল ঘটে। নিয়ত ভাবের ঘরে চুরি হইতে থাকে। এইরূপে সংসার যাঁহাদের ষোল আনা প্রাণ টানিতেছে এবং ধার-করা আধআনা প্রাণমাত্র যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার জন্য উৎসর্গ করিতে পারেন—তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কবি বলিয়াছেন—"There lives more f.ith in honest doubt Believe me than in all the creeds."

শুদ্ধ ত্যাগের দিক্ হইতে দেখিলে বিষয়-বাসনাত্যাগ হইতে আরও কঠিন, আরও করুণ, আরও নির্ম্মম ত্যাগ আছে। সাধারণতঃ আমরা ধারণা করিয়া থাকি যে, বৈদান্তিকের যে ত্যাগ, তাহাই নিরপেক্ষ ত্যাগ, তাহাই উদাসীনতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতেও অপেক্ষা আছে। এই যে বিচিত্র, এই যে বিমোহন বিশ্ব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আত্মস্থ ও আত্মরতি হইবার ইচ্ছা—ইহার মূলেও, স্থূলভাবে বলিতে গেলে, লাভ ক্ষতির বিচার আছে। যাহা ছাড়িতেছি এবং যাহা পাইতে ইচ্ছা করিতেছি—তাহাদের মধ্যে ওজন করিয়া মূল্য নিরূপণ আছে; বিকি-কিনির হিসাব আছে। বৈদান্তিক মুক্ত-পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন "প্রনিতমুখপূর্ণসংবিদেবাহং।" আমি সেই জ্ঞানস্বরূপ যাহা সর্ব্বতোব্যাপ্ত আনন্দানুভূতিতে পরিপূর্ণ। আরও বলিতেছেন,—

"সর্ব্বপ্রকাশ রূপোঽস্মি চিন্মাত্রজ্যোতিরস্মহং
সর্ব্বদা সমরূপোঽস্মি শান্তোঽস্মি পুরুষোত্তমঃ।"

মর্ত্যের জীব আমরা। ক্ষণিক সুখে উল্লসিত, ক্ষণিক দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ি। দৃষ্টি আমাদের সীমাবদ্ধ, জ্ঞান আমাদের সংকীর্ণ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা পরিবর্ত্তিত হইতেছি। অশান্তিই আমাদের সত্তাকে যেন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। শান্ত, শুদ্ধ, স্থির আনন্দের আভাস—মেঘের কোলে বিদ্যুতের খেলার মত—চকিতের মত কখনও হয় ত পাইয়াছি বা পাইয়া থাকি। এহেন আমরা যদি অবিচ্ছিন্ন-ভাবে শান্ত ও সমরূপ, সর্ব্বপ্রকাশময়, চিৎ ও আনন্দ-ঘন অবস্থা লাভ করিতে পারি—তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ আর কি হইতে পারে? আবার বৈষ্ণব বলিতেছে—এই যে মুক্তিস্পৃহা, ইহা তুচ্ছ—শুধু তুচ্ছ নহে, অতি অ[illegible] ভোগের সুখ ও মুক্তির আনন্দ—এই দুই হইতেও বিপুল আনন্দ আছে—তাহা ভক্তিসুখ। নিঃশেষ করিয়া যদি আ[illegible]নাকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করা যায়, নিজেকে হীন অতি অকিঞ্চন জানিয়া তাঁহার সেবা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহা[র] মহিমাকীর্ত্তনে যদি বিলাইয়া দেওয়া যায়—তদপেক্ষা সুখে[র] আর কি আছে? এই সুখের চরম ভক্তিসুখ লাভ করি[তে] হইলে, একদিকে যেমন ভোগস্পৃহা, অন্যদিকে তেমন মুক্তিস্পৃহাকে রাক্ষসী মনে করিয়া হৃদয় হইতে দূর করি[তে] হইবে।

"ভক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে,
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।"

বৈষ্ণব ও বৈদান্তিকের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও উভয়েই অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া কোন আনন্দময় লোকের দিকে তপ্ত ও ক্লিষ্ট মানবকে আহ্বান করিতেছেন। উভয়েই বলিতেছেন—যদি এই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পার, তবে অতি নিবিড়, অতি বিপুল আনন্দ তোমার করায়ত্ত। এই আহ্বান স্বীকার করিয়া লইতে স্বতঃই আমাদের প্রবৃত্তি হয়—এই আশ্বাসে আস্থা করিতে ব্যাকুল মানব-হৃদয় যেন সর্ব্বদাই প্রবল হইয়া রহিয়াছে। কেন না, তাহা হইলে যে সমস্ত, যে সংশয়, যে অজ্ঞান সর্ব্বদা আমাদিগকে মর্ম্মপীড়া দিতেছে—তাহা হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; একটা অবলম্বন, একটা আশ্রয় পাইয়া আমরা স্বস্তিবোধ করিতে পারি; যে জীবন-প্রহেলিকার সমাধানের চিন্তা শুধু আয়াস ও ক্লান্তি অনুভব করে—সেই প্রহেলিকার একটা সহজ ও সুখকর মীমাংসা হইয়া যায়।

কিন্তু যাহারা এই প্রেয় পদার্থকে সত্য বলিয়া জানিতে পারিল না—তাহারা কেমন করিয়া ইহা স্বীকার করিয়া তৃপ্ত হইবে? হৃদয়ের সকল আগ্রহ ও আবেগ লইয়া আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্ব মানিয়া লইতে আমরা সর্ব্বদা উন্মুখ। কিন্তু এই মনোরম, আনন্দময় তত্ত্বটি যখন নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিতে যাই—তখন যদি ইহাকে অবাস্তব বলিয়া মনে হয়—তাহা হইলে উহা অপেক্ষা মনোভঙ্গের কারণ আর কি হইতে পারে? অথচ এই অনুপলব্ধি, এই

মৃত্যুভয় লইয়াই শতকরা নিরানব্বই জনকে জীবনযাপন ও আচরণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞান বলিতেছে—যাহা নশ্বর, তাহাকে অবিনশ্বর করিবার এই অলীক কল্পনা—এই ব্যর্থ প্রয়াস কেন? চারিদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে—অনন্ত ব্যোমে কত বৃহৎ জ্যোতিষ্ক ধূম ও ভস্মে পরিণত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে; সাগর শুকাইতেছে—পর্ব্বত সমতল হইতেছে; কত অতিকায় জীব ধরাতল হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকলই ক্ষণিক—সকলই ভঙ্গুর। এই সর্ব্বগ্রাসক অনিত্যতার মধ্যে—ক্ষুদ্র মানব তুমি, বিশ্বের তুলনায় কীটাণু হইতে স্বল্পকায়, বালুকণা হইতে লঘু—এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন তোমার? তোমার সঙ্কীর্ণ সত্তাকে বিস্তীর্ণ করিয়া, ব্যাপক করিয়া, নিত্য করিয়া সান্ত্বনা পাইবার এই নিরর্থক আয়োজন কেন? যে স্পৃহা মিটিবার নহে—যাহা শুধু মনকে মাতাইতে পারে—যে আশা সার্থক হইবার সম্ভাবনা নাই—যাহা কেবল স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারে—সেই দুরন্ত আশা, সেই অবাস্তব স্পৃহাকে, মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ড আঁকড়িয়া ধরে—তেমনই সবলে হৃদয়ে পোষণ করিয়া লাভ কি? সত্য বটে, এই আশা, এই স্পৃহা ত্যাগ করিতে তোমার হৃৎপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবে—কিন্তু উপায় কি? যাহাকে সত্য বলিয়া মন সায় দিতেছে না—তাহাকে ভিত্তি করিয়া হাওয়ার ইমারত গড়িয়া কতদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে? যখনই তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগরূক হইবে, তখনই যে উহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। মাদকের সাময়িক উত্তেজনাকে জীবনের সুস্থ স্পন্দন বলিয়া ভ্রম পোষণ করিয়া পরিশেষে প্রবঞ্চিত হইবে কেন? প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞানের এই আহ্বানে সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবদেহে যে চৈতন্যের বিলাস—জন্মক্ষণ ও মরণক্ষণ তাহার সীমা। পশ্চাতে অন্ধকার—সম্মুখে পরিসমাপ্তি। এই দুইয়ের মধ্যে কিছু কালের জন্য আমরা জ্ঞানের ভোজ, আনন্দের ভোজ, কর্ম্মের উল্লাস উপভোগ করিয়া থাকি। তাহার পর সকলের অবসান। যে অহংজ্ঞান সকল সুখের এবং সকল দুঃখের কারণ, সেই পরিচ্ছিন্ন অহংজ্ঞান একেবারে দেহের সহিত নিঃশেষ হইয়া যায়। দীপের নির্ব্বাণ হইলে দীপশিখা যেমন আর থাকে না—ইহাও সেইরূপ। মানুষ নিশ্চিহ্ন হইয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ হইতে একেবারে মুছিয়া যায়। সন্তানপরম্পরার ভিতর, সামাজিক, রাজনীতিক কার্য্যাবলীর ভিতর, নিজ মনীষার ফলের ভিতর, নিজ দেশের লোকের অন্তরে ও স্মৃতিতে প্রভাববিস্তারের ভিতর তাহার ব্যক্তিত্ব জাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এ সকলের যে মূল, যে ব্যক্তি হইতে এ সকল প্রসূত হইয়াছে—সে একেবারে শূন্যে মিলাইয়া যায়; চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে জিন পল্ রিস্‌টরের উপাখ্যানে, অসীম বিশ্বের সমক্ষে, অসামর্থ্যের জন্য মানব-আত্মার একপ্রকার ব্যাকুলতা আমরা অনুভব করিয়াছি। প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া মনুষ্য-আত্মাকে মর বলিয়া বুঝিলে, স্নেহের বন্ধন, ভোগস্পৃহার বন্ধন, জিজীবিষা বন্ধনের ছেদনে যে ব্যাকুলতা—তাহাও এখানে উপলব্ধি করিলাম। যাঁহারা আত্মার অমরত্ববাদী, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাকুলতা যে অমূলক, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আত্মা যে শুধু অমর, তাহা নহে—ইহা অধিকন্তু অপরিমেয়শক্তি—ইহা যে শুধু অক্ষয় ও অবিনশ্বর, তাহা নহে—ইহা বিভু, ইহা অসীম, ইহা ঈশ্বর। সেই অসীমতা, সেই বিভুত্ব শুধু মায়ায় আবৃত রহিয়াছে। বুঝিলেই ইহা টুটিয়া যাইবে। অথবা সেই অসীমতা সেই বিভুত্ব তাহার নিজের না থাকিলেও অসীম, বিভু, ঈশ্বর যে এক পুরুষ, তাঁহার সহিত সাযুজ্য লাভ করিলে তাঁহাতে মিলিত হইলে ইহা তাহার আয়ত্ত হইবে। নদী সমুদ্রে মিশিলে, উল্কা সূর্য্যমণ্ডলে পতিত হইলে যেমন ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়া মহত্ত্বে পরিণত হয়, ইহাও সেইরূপ।

বৈজ্ঞানিক ও প্রত্যক্ষবাদী বলেন, দ্বিতীয় প্রকার যে ব্যাকুলতা, তাহার মূলে পরিচ্ছিন্ন জীবের দৌর্ব্বল্য—সত্যকে স্বীকার করিবার অসামর্থ্যতা। এই সত্যকে মানিয়া লইবার জন্য প্রকৃতভাবে নিষ্কাম হইয়া বীরত্বে বুক বাঁধিতে হইবে। সেনাপতির আদেশে সৈনিক যেমন শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়, ইহাও সেইরূপ সাধনা। ইহাই জীবনপরীক্ষা। ইহাতে আশা নাই—আনন্দ নাই—স্ফূর্ত্তি নাই। আজ সম্মুখে অপরিহার্য্য নিয়তির বজ্রকঠিন মর্ম্মর, শ্বেত, তুষারশীতল মূর্ত্তির অঙ্গুলিনির্দ্দেশ। এই জন্যই মনে হয়, সকল ত্যাগের মধ্যে কঠিন ত্যাগ—জিজীবিষাত্যাগ। এই

ত্যাগকে বরণ করিয়া, ইহার ভারে নমিত ও অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই—এমন পুরুষ জগতের ইতিহাসে কোথায়? ইহাকে বরণীয় মনে করি না—বেদনার দান কে কবে যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছে? তবে ইহার কল্পনায়—ইহার বজ্রকঠিন মূর্ত্তির সমক্ষে চিত্ত সম্মাননায় নত হইয়া আইসে। এই দ্বিধা হইতে—এই বিপরীতমুখী আকর্ষণ হইতে সেই দিনই নিষ্কৃতি হইবে—যে দিন যাহা অজ্ঞেয়, যাহা অনির্ব্বাচ্য বলিয়া পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে—তাহার সম্বন্ধে সকল সংশয় দূ হইয়া যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইবে ও অনপনেয়ভাবে চি ফলকে মুদ্রিত হইবে। সমগ্র মানবসমাজ সভ্যতার প্রথ ক্ষণ হইতে শত শত যুগ অতীত হইলেও, এখনও সে সমাধানের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

মুস্তাফা কামালপাশা ও তাঁহার পত্নী

বোম্বাই ও বাঙ্গালা

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ বোম্বাইবাসীর হস্তগত। বড় বড় কলকারখানা তাঁহাদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত। অনেক কলকারখানায় মোটা মাহিয়ানার ইংরাজ চাকর আছেন। এই সব কারণে বোম্বাইওয়ালারা ইংরাজের কাছে বড় নতশির হয়েন না। অল্প-দিনের মধ্যে ইহার অনেকগুলি উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিবার পর ভারত সরকারের অর্থ-সচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেট সফরে বাহির হইয়া বোম্বাইয়ে গিয়াছিলেন। তথায় ভারতীয় সওদাগর সভার সভাপতি সার ফজলভাই করিমভাই তাঁহাকে স্পষ্ট শুনাইয়া দিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ অমান্য করিয়া বড়লাট যে লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিলেন, তাহাতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ঘোষণায় অর্থাৎ ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করাই যে বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য, সেই উক্তিতে ভারতবাসীর বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে। সার ফজলভাই এই উপলক্ষে অর্থ-সচিবকে এমন কথাও বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি ভারতবাসীর প্রদত্ত অর্থে বেতন পাইয়া থাকেন, সুতরাং বিলাতের মুখ না চাহিয়া ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ভারত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতে সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য যে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যে বলিতেছেন, বলশেভিক বিপদ যাহাতে ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য সেনা বল প্রবল রাখিতে হইবে

—কিন্তু তাঁহারা এ কথাটা মনে করিতেছেন না যে, সামরিক বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য যদি কর বাড়াইতে হয়, তবে অসন্তুষ্ট দেশবাসীর মধ্যেই বলশেভিক মত আত্মপ্রকাশ করিবে।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত লালুভাই শ্যামলদাস বলিয়াছিলেন, লবণের শুল্ক যদি সরকার দ্বিগুণ করেন, তবে সদস্যদিগের পক্ষে আর ব্যবস্থাপক সভায় না আসিয়া বাহিরে যথাসাধ্য কার্য করাই সঙ্গত হইবে।
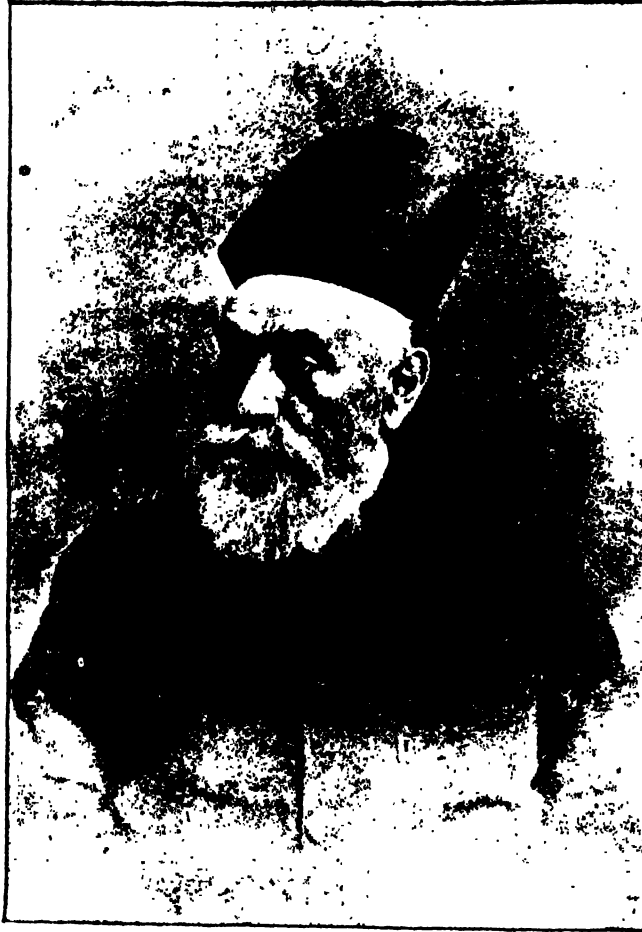
সে দিন সিন্ধিয়া

জেমসেটজী নাসরবানজী টাটা।

ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বার্ষিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নরোত্তম মোরারজী দেশীয় জাহাজওয়ালাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের ভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—দেশীয় কোম্পানী কলিকাতা হইতে ২ লক্ষ টন কয়লা রেঙ্গুনে লইয়া যাইবার ভাড়া সরকারকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। সরকার তাহাতেও সম্মতি না দিয়া ১০ বৎসরের চুক্তিতে অন্য (য়ুরোপীয়) কোম্পানীকে সে কার্যের ভার দিয়াছেন এবং সাধারণের হিতার্থ (in

সার দিনশা ওয়াচা।

মিষ্টার সাকলাতওয়ালা
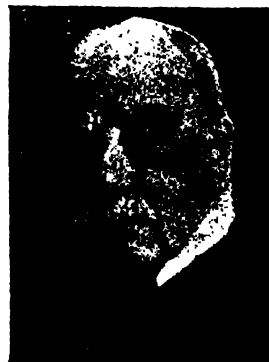
সার ফিরোজশা মেটা।

সার ফজলভাই করিমভাই।

the interest of the public) ভাড়ার হারও প্রকাশ করেন নাই। শ্রীযুক্ত কানুভাই শ্যামলদাস ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিলে সরকার বলেন, ভাড়া সমান হইলে সরকার ভারতীয় কোম্পানীকেই মাল বহনের কায দিবেন। ফলে কিন্তু কেবল একবার সরকার তাঁহাদের কাছে করাচী হইতে গোটাকতক গরু ও ছাগল লইয়া যাইবার ভাড়া জানিতে চাহিয়াছিলেন—এইমাত্র!

বোম্বাইয়ের এই ব্যাপারের পর বাঙ্গালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের 'বাবু' পদবীটা সম্মানসূচক—যথা কেশব বাবু, রবীন্দ্র বাবু ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালায় আমরা কেবল পরের কারবারে কেরাণী; তাই ব্যবসায়ীর আফিসে "বাবুর" অর্থ হইয়াছে—সামান্য বেতনের কেরাণী।

বোম্বাইবাসীকে অন্নের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না বলিয়াই নানা ক্ষেত্রে তাঁহারা অত্যন্ত সাহস দেখাইতে পারেন। পরলোকগত সার ফিরোজশা মেটা যেরূপ সিংহবিক্রমে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় কেহ সেরূপ পারেন নাই; সে তেজ যেন আমাদের ধাতু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পাল ও তদীয় কৃতী পুত্র রাধাচরণ পাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কাযে বিশেষ অভিজ্ঞ হইলেও সে প্রভুত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন নাই কেন, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মেটার বন্ধু ও শিষ্য সার দীনশা ওয়াচাও বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীতে কম প্রভুত্ব বিস্তার করেন নাই।

বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশ দেখিলে সহসা মনে হয়, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছি। সমস্ত সহরে হিন্দুদিগের জন্যই প্রায় ২ হাজার "বিশ্রান্তি-গৃহ" (ছোট ছোট ভোজনাগার), তদ্ভিন্ন পার্শী ও মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র আহারের স্থান আছে। সহরের অধিকাংশ লোকই "কারবেরে"—সমস্ত দিন বাহিরে থাকিতে হয়; কাযেই মাধ্যাহ্নিক আহার বাহিরে

সার জেমসেটজী জীজীভাই

সারিতে হয়। আর বড় হোটেলের কথা বলিতে হইলেই প্রাচীতে বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলের দৃষ্টান্ত দিতে হয়। সে হোটেলেও ভারতবাসীর—বোম্বাইওয়ালার কীর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত লালুভাই শ্যামলদাস।

ব্যবসা ব্যতীত ধনলাভ হয় না। ভারতে সব বড় ব্যবসায়ীই বোম্বাইওয়ালা। ইঁহাদিগের মধ্যে টাটার নাম আজ জগতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার বিশাল লৌহের কারখানা একটা বড় সহরে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ব্যবসায়ে কোন কোন বোম্বাইওয়ালা যেরূপ অর্থার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সার হেনরী মেন ইঁহাদিগের এক জনের—প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের, সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থ—has been accumulated with a rapidity hitherto only seen in Eastern story-telling. কিন্তু ইঁহারা যেমন অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থদানও করিয়াছেন। আজ সার রাসবিহারী ঘোষ, সার তারকনাথ পালিত প্রভৃতির দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সব দানের বহু পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ দান করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং একটি ঘড়ী-ঘরের জন্য ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাঁহার মাতৃদেবীর নামে এই ঘড়ী-ঘরের নামকরণ করেন। এই ক্লক-টাওয়ার বোম্বাইয়ের অন্যতম অলঙ্কার।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের মত বোম্বাইয়ের আর এক জন ধনী—সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বোম্বাইয়ে শিক্ষা প্রচারকল্পে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

ইঁহাদিগেরই মত আর এক জন বোম্বাইবাসী পার্শী

কৃষ্ণদাস পাল

গোকুলদাস তেজপাল

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস।

ধনকুবের ওয়াডিয়া জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহার আয় জাতিধর্ম্মদেশ-নির্ব্বিশেষে ব্যয় করা হয়। খুলনায় দুর্ভিক্ষের সময় এই ভাণ্ডার হইতে ৫ হাজার টাকা বাঙ্গালী পাইয়াছিল; এবার রাজসাহী বন্যাতেও ১০ হাজার টাকা পাইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথম পার্শী ব্যারনেট সার জেমসেটজী জীজীভাই স্বদেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই অকাতরে জনহিতকর কার্য্যে অর্থদান করিতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বন্যা-পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য তিনি ৭ হাজার ৫ শত টাকা দান করিলে সীনের প্রিফেক্ট লিখিয়াছিলেন—"Such generous proofs of sympathy call forth the entire gratitude of the French nation.

গোকুলদাস তেজপাল দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি হাঁসপাতালের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে নানা সৎকার্য্যের জন্য ৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার মৃত ভ্রাতার পুত্রদ্বয়কেও প্রভূত অর্থ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতার শ্যামাচরণ লাহা মেডিকাল কলেজে চক্ষুচিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং আরও কেহ কেহ সে কলেজে ও কারমাইকেল কলেজের হাঁসপাতালে অর্থদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদিগের মত দান বাঙ্গালায় দুর্ল্লভ।

বোম্বাইয়ের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এক এক জন এক একবার লক্ষ লক্ষ হইতে কোটি কোটি টাকা লইয়া কাজ বা deal করেন। কয় মাস পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে তারে খবর আসিয়াছিল, তথায় এক জন বিখ্যাত ব্যবসায়ী—মথুরাদাস গোকুলদাস—এইরূপ একটা কারবারে ২ কোটি বা ততোধিক টাকা লোকসান দেন, কিন্তু তাহাতেও বাজারে তাঁহার সুখ্যাতি (credit) ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ওয়াডিয়া।

শুনিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অতীত যুগের সেই কথা মনে পড়ে—বর্গীরা কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেলেও তাহাতে মুর্শিদাবাদের জৈন মহাজন জগৎ শেঠের সওকারী ক্ষুণ্ণ হয় নাই—বাজারে তাঁহার হুণ্ডী পূর্ব্ববৎ চলিয়াছিল। এই লোকসানে মথুরাদাস গোকুলদাসকে কেবল কয়টা কলের ম্যানেজিং এজেন্সী হস্তান্তরিত করিতে হইয়াছিল। প্রকাশ—তাঁহার ঘরে যে মণিমুক্তা আছে, তাহার মূল্য কোটি টাকার কম নহে এবং তাঁহার যে সব ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া (of high pedigree) আছে, সে সকলেও মূল্য ৬ লক্ষ টাকা হইবে।

সার মঞ্চারজী ভাবনগরী

পরলোকগত সার সাপুরজী বরোচা "সেয়ার" বাজারে অবিসংবাদী হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন।

ব্যবসার বাজারে কেবল যে পার্শীরাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। গুজরাটী ও ভাটিয়ারাও তাঁহাদের সমকক্ষ। কলিকাতায় মাড়োয়ারীরা দালাল বা মধ্যস্থ (midd'eman) বা বেনিয়ান মাত্র। বড় বড় যৌথ-কারবার চালাইবার যোগ্যতা তাঁহারা আজও দেখাইতে পারেন নাই। কলিকাতাতেও ভাটিয়ারা পসার-প্রতিপত্তি প্রসার করিতেছেন। বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা এমনই যে,—কলিকাতার উপকণ্ঠে যে ৭০।৭৫টি পাটের কল আছে, তাহার মালিক প্রায় সকলেই য়ুরোপীয়।

লালমোহন ঘোষ

সার বিঠলদাস ঠাকুরসী

...বল একটি কলের মালিক—দ্বারবঙ্গের মহারাজা আর ...যুত ঘনশ্যামদাস বিরলা একটি কল স্থাপন করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পেডার রোড রাস্তায় কোটিপতিদিগের বাস ...জরাটী ও ভাটিয়াদের একটু বৈশিষ্ট্যের কথা এই স্থানে ...লিব। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ; জাপান, জার্ম্মাণী, ...র্কিণ, কেনিয়া, এডেন, পোর্ট সৈয়দ, য়ুগাণ্ডা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু জাহাজে যাইবার সময় আহারের জন্য চিড়া ও ছাতু মাত্র আহার্য্য লইয়া যায়েন। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা প্রথমেই হ্যাটকোট পরিয়া টেবলে খানা-পিনা খাইতে শিখিয়া পুরামাত্রায় "সাহেব" সাজেন। তাঁহাদের বিদেশে গমন ব্যবসার জন্য নহে। কেবল ব্যারিষ্টারী বা ডাক্তারী শিখিতে বা একটা ডিগ্রী আনিয়া উমেদারী করিতে।

নানা কাযে বিলাতে যাইয়া যাঁহারা এ পর্য্যন্ত তথায় পার্লামেণ্ট সদস্য হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বোম্বাইওয়ালা। বাঙ্গালার লালমোহন ঘোষ

শ্যামাচরণ লাহা

সে চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। প্রথম সাফল্য লাভ করেন, দাদাভাই নৌরজী। তাহার পর সার মাঞ্চারজী ভবনগরী। সর্ব্বশেষে মিষ্টার সাকলাতওয়ালা।

বোম্বাইয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতবাসীদিগের হস্তগত বলিয়া তথায় দেশীয়দিগের স্থাপিত ব্যাঙ্কও বাঙ্গালার পূর্ব্বে হইয়াছে। নানা কারণে স্পেশী ব্যাঙ্ক নষ্ট হইয়া যাইলেও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে টাটা ব্যাঙ্কও সেন্ট্রালের মত নানাস্থানে শাখা স্থাপিত করিয়াছে। বাঙ্গালার যে দুইটি ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য, সেই বেঙ্গল ন্যাশনালের ও হিন্দুস্থানের কল্যাণ-কামনা বাঙ্গালীমাত্রেই করিবেন।

বোম্বাইয়ের,—তথা সমগ্র ভারতের ব্যবসায়ে এক নূতন প্রবল প্রতিদ্বন্দী দেখা দিয়াছে—সে জাপান। জাপানীরা বোম্বাই হইতে তুলা কিনিয়া লইয়া যায় অথচ শুল্ক

রাধাচরণ পাল

থাকিলেও সূতা ও কাপড় তৈয়ারী করিয়া সস্তায় বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় আসিয়া বেচিয়া যায়। তাই মৃত্যুর কয়মাস পূর্ব্বে সার বিঠলদাস ঠাকুরজী বলিয়াছিলেন—জাপানই বোম্বাইয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের যে সব ভাটিয়া ব্যবসায়ে বিপুল ধন অর্জ্জন করেন, তাঁহারা অনেকে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। বোধ হয়, তাহাই বোম্বাইবাসীর মাতৃভাষায় প্রচারিত বহু সংবাদপত্র প্রচারের কারণ। 'সাঁজ বর্ত্তমান,' 'জাম-এ-জামসেদ', 'বম্বে সমাচার' প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় পরিচালিত পত্রের কলেবর 'ষ্টেটসম্যান' প্রভৃতির সদৃশ। ইহার কারণ, তথায় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতি কারবারের বিজ্ঞাপন এই সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় ব্যবসা ইংরাজের হস্তগত বলিয়া সে সব বিজ্ঞাপন ইংরাজ-পরিচালিত পত্রেই প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালায় কেবল তৈল, ঔষধ, স্বপ্নাদ্য মাদুলী, সিদ্ধকবচ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে আয় কম হয়।

রাজাবাই ক্লক টাওয়ার

আমি আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে প্রকাশ্য সভায় ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিয়াছি—"আপলোক কলকাত্তাকা মালিক হায়—পহিলে বোম্বাইওয়ালা, পিছে আমেদাবাদওয়ালা।" এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে যখন আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম পারতপক্ষে বিদেশী কাপড় পরিব না, সেই সময় হইতে বোম্বা- ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলের পর্ব্ব পড়িয়া গেল। এই স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা প্রতিযোগিতায় ম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছিলেন না। চীনের বাজারে মোটা থান পাঠাইয়া তাঁহারা কেবল কোনরূপে অস্তিত্ব রাখিতে সমর্থ হইতেন। আমরাই তাঁহাদের কাছে কোটি কোটি টাকার কাপড় খরিদ করিয়া বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের লাভ দিতে লাগিলাম।

স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা "ওরিয়েণ্টাল", "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি বীমা কোম্পানীর কাছে জীবন-বীমা করিয়া বোম্বাইয়ে অনেক টাকা পাঠাইয়াছি। তাহার পর হিন্দুস্থান সমবায় বীমা সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা।

আবার কলিকাতায় টাটা ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক কলিকাতাতেই উপার্জ্জিত ধনে পুষ্ট হইয়া বোম্বাইবাসী অংশীদারদিগকে লাভের অংশ বণ্টন করিয়া দিতেছেন। এই সকল হইতে বুঝা যাইবে—কেন আমি বলিয়াছি, বোম্বাইবাসীরা কলিকাতার মালিক।

বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়—বাঙ্গালাই সকল

…বাঙ্গালীর কামধেনু। কেবল মা'র বৎসগণই দুগ্ধ না পাইয়া অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া পড়িতেছে—বাঁচিবার কোন উপায় করিতে পারিতেছে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।—বোম্বাই প্রদেশের মানসিক অনুশীলনের কেন্দ্র—পুনা। পুনা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু উচ্চবংশীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ—চিৎপাবনই হউন, গৌড়ীয়ই হউন আর দেশস্থই হউন—তাঁহাদের অবস্থা আর মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা প্রায় বাঙ্গালীর মত। অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা পাইয়া সামান্য বেতনে "কলম পেষা" ব্যবসা লইয়া কোনরূপে কালাতিপাত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বড় দেখা যায় না। এই কথাটাও বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বটে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রত্যাখ্যান

রাজা ফৈজুল ·ধর মালা প্রেম-উপহার।
ইরাক—মালা নয় ত জালা এ যে, শৃঙ্খলের ভার

লাটু মহারাজ

লাটু মহারাজ।

পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ শ্রীশ্রী-ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেবক ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-বিগ্রহের তিরোধানের পর হইতে নিজের তিরোভাবের দিন অবধি, অর্থাৎ ১২৯৩ সাল হইতে ১৩২৭ সাল, এই ৩৪ বৎসর কাল, লাটু মহারাজ শ্রীঠাকুরের বিরহ জাগাইয়া, দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আর একজন বিরহীকে ৺কাশীধামে দেখা গিয়াছিল। পঞ্চগঙ্গার উপর বিন্দুমাধবের মন্দিরের নিকট শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে, “মঙ্গল বাবা” নামক এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। আপনি কি উঁহার শিষ্য ছিলেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “নেই বাবু! কোই উন্‌কো শিষ্য নহি থা। হাম্ উন্‌কা সেবক্ থা। সাতাইশ্ বরষ্ সেই মূর্ত্তি সেবা কিয়া—আওর সাতাইশ্ বরষ্ এই শিলা (ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর শিলা-প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া) সেবা কর্‌তা হায়। বাবু সাব, কুচ্ নেহি মাঙ্গতা হায়। উহ পদমে লীন হোগা—আওর্ কুচ্ নেহি মাঙ্গতা হায়।” শুনিয়াই বসিয়া পড়িতে হয়। ২৭ বৎসর সেই মূর্ত্তি-সেবা আর ২৭ বৎসর এই শিলা-সেবা! ৫৪ বৎসরের ও জীবনী হইয়া গেল। সতীর পতিনিষ্ঠা ইহার কাছে পরাভব স্বীকার করে। ধন্য ভারতবর্ষ! তোমাতেই ইহা সম্ভব। ঠিক করিতে পারা যায় না, কি বুঝিয়া তিনি এই নিষ্ঠা ধরিয়া আছেন। তাঁহারও কি কিছু সুবিধা আছে? সেবার কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা গেল, বোধ হয়, বড় বড় রাজা সেবার খরচ দেন? উত্তর হইল, “নেই, উন্‌কো মানা (নিষেধ) থা। ভিক্ষা কর্‌কে সেবা চালানে কা হুকুম থা।” বলিহারি! এই সুবিধা ঘাড়ে লইয়া সেবা চালান! ইনি নিজ প্রভুর শৈলী মূর্ত্তি লইয়া বিরহ জাগাইয়া ছিলেন। আর লাটু মহারাজ ঠাকুরের মনোময়ী মূর্ত্তি লইয়া বিরহ জাগাইয়া ছিলেন।

লোকশিক্ষা, লোকহিত প্রভৃতি কোন উদ্দেশ্য ছিল না কেবল দিনপাত। দিনপাত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ... । কেবল বলিতেন, "শরীরধারণ বিড়ম্বনা।" ধ্যান ও বিচার এই দুই ছাড়া দিন কাটাইবার অন্য উপায় লাটু মহারাজ জানিতেন না।

শাস্ত্রে বলে, "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপি," "নব-নিমি-ষার্দ্ধ"ও হরিপাদপদ্ম হইতে মন বিচলিত হয় না, তাহা এই নিরক্ষর ছাপরা জিলার সাধুর জীবনে দেখা গিয়াছে। তিনি যে সিদ্ধের সিদ্ধ ছিলেন, ইহা বলা অনাবশ্যক।

"উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।" আমি যখন তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, তখন মায়াকে নিশ্চয় জয় করিয়াছি। সেই জন্য বলিয়াছি, লাটু মহারাজের ধ্যান কেবল দিনপাতের জন্য।

স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি ধ্যানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকিবার সময় এক এক দিন তিনি এমত সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, ঠাকুরকে তাঁহার বুকে হঁটু দিয়া 'ডলিয়া' জ্ঞান করাইতে হইত। যদু মল্লিকের বাগানে পাতা কাটিতে গিয়াছেন, সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ঠাকুর যাইয়া তাঁহার পায়ের উপর পা দিয়া চাপ দিলে, তবে জ্ঞান হইল। এক দিন রাত্রিতে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে যাইয়া বসিয়াছেন; ঠাকুর খোঁজ করিতে করিতে যাইয়া দেখেন, লাটু গভীর-ধ্যান-মগ্ন, দুইটা কুকুর লেজ-কান খাড়া করিয়া লাটুকে পাহারা দিতেছে।

ইদানীং রাত্রিদিন কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে ধ্যানস্থ থাকিতে দেখা গিয়াছে। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

যে সময় জাগ্রত থাকিতেন, জাগতিক ব্যবহার করিতেন; কিন্তু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতেন। তাঁহার ভিতর যেন দুইটি মানুষ বাস করিত। একটি বাহিরের কাযকর্ম্ম করিতেছে, আর একটি চৌকি দিতেছে। দ্বিতীয়টি অবহিত থাকিয়া প্রথমটিকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। একটি হেশ দর্শকের সঙ্গে কথা কহিতেছে, আর একটি অস্ফুট স্বরে বিড়্ বিড়্ করিতেছে। উপনিষদে আছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখয়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

একটি দেহবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দুইটি পাখী বাস করে, একটি গাছের ফল খায়, আর একটি চৌকি দেয়। তাঁহাকে দেখিয়া উপনিষদের এই বাণী কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইত। বাস্তবিক একটি পাখী খাইতেছে, বেড়াইতেছে, আর একটি চৌকি দিতেছে। তিনি এক হাতে একটি ছেলেকে আদর করিতেছেন, অপর হাতে বুড়া আঙ্গুল পিছনে দেখাইতেছেন—"যেটাকে আদর করিতেছি, সেটা মিথ্যা।" স্পষ্ট ভাষায় কাহাকে স্নেহ করিতেছেন, কিন্তু বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতেছেন, "এর মায়া ফেলে দে।" আশ্চর্য্য তাঁহার বিচার! প্রতি কাযে, উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, বিচার করিতেন। কেবল কথার বিচার নহে—"আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, অজ্ঞান নহি, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নহি।" প্রতি কাযে বিচার, প্রতি কাযে "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" বিচার করিতেন, "জগৎ মিথ্যা" অর্থাৎ জাগতিক ব্যবহার মিথ্যা। স্ত্রীপুত্রকে ভালবাসা, অর্থ মান যশের ভালবাসা, এ সব মিথ্যা, কারণ, দুইদিনের জন্য। ঈশ্বরকে ভালবাসা অনন্তকালের জন্য, সে জন্য সত্য।

মায়ার মূল অঙ্গ সুখ-দুঃখ। এই সুখ-দুঃখের হাত হইতে বাঁচা কম কথা নহে। সুখের উপাদান, দুঃখের হাল এই বুদ্ধিতে জীব উঠে বসে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ।
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ।

সুখ দুঃখই মায়া। ভগবানের শরণ লইলে সুখ-দুঃখের হাত হইতে বাঁচা যায়।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

তিনি বলিতেন, "কি বেঁচেই গিছি উঃ, হাসতে কাঁদতে জীবনটা যেত।" এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাই কেবল ভাব বা কৈবল্য অবস্থা।

তিনি মোটেই নিদ্রা যাইতেন না। নিদ্রা যে এত হীন জিনিষ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিদ্রায় তাঁহার ভারি ভয় ছিল। "কত ক'রে এই জিনিষ লাভ হয়েছে, অচেতন অবস্থায় যদি কেহ চুরি করে" এই ভয় সর্ব্বদা তাঁহার ছিল।

রামপ্রসাদের গানে আছে :

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাক রে মন,
তুমি ঘুম যেও না রে ভোলা মন।
ঘুমেতে হারাবে রতন।
নব-দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা ক'রে,
হইবে যখন অচেতন,
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁদ,
হরে লবে সব রতন।

শাস্ত্রে দেখি, অর্জ্জুন "গুড়াকেশ" অর্থাৎ জিতনিদ্র।

শাস্ত্র বলে, জ্ঞানী বিজন-বাস করিবে, কিন্তু হিমালয় কি কলিকাতা নিজের মনের মধ্যে। হিমালয়ে যাইয়া কলিকাতার স্বপ্ন লইয়া থাকিলে, সে হিমালয় বাস নহে; সে কলিকাতাতেই বাস। কাশীতে দেহ রহিয়াছে, কিন্তু মন পড়িয়াছে কলিকাতার ছেলে-পুলের উপর, সে কাশীবাস নহে; সে কলিকাতাবাস। লাটু মহারাজ এই জনপূর্ণ কলিকাতা মহানগরীতে থাকিয়া বিজন-বাস করিতেন। একাকী গঙ্গায় কাশী মিত্রের ঘাটের উত্তরে গো-ঘাটায়, কি বিডন গার্ডেনে বেঞ্চের উপর কি 'বসুমতী' প্রেসের "কেসের" উপর বসিয়া ধ্যানে দিন-রাত্রি কাটান, আর দুই পয়সার ছোলা কিনিয়া গঙ্গায় ভিজাইয়া মাঝে মাঝে খাওয়া, বিজন-বাস ছাড়া আর কি? এইরূপ কত বৎসর তাঁহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় থাকিবার অর্থ গুরুস্থান দক্ষিণেশ্বর হইতে পঞ্চকোশীর মধ্যে থাকা। তিনি বলিতেন, "আমি অনাথ, গুরু বই আমার কেউ নেই, তাই পঞ্চকোশীর মধ্যে পড়ে আছি।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কলিকাতার তিনি বড় তারিফ করিতেন; বলিতেন, "কি ধর্ম্মের ঢেউ উঠেছিল, এই স্যালভেশন আর্মির দল, এই ব্রাহ্মসমাজের দল, এই চৈতন্যের দল, আবার বোসপাড়ায় মোড়ে পরমহংসের দল!" আজ কেশব সেনের বক্তৃতা, কাল বিডন গার্ডেনে কালী খৃষ্টানের লেকচর, অমুকের প্রাঙ্গণে কৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজকের বক্তৃতা, ওখানে শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা, আজ বুথ্ "সাহেব" আসিয়াছেন, কাল অল্‌কট্ আসিয়াছেন, আজ এখানে হরিসভা, কাল ওখানে ছেলেদের আত্মোন্নতি সভা। ছেলে বুড়া যুবা সকলের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কথাবার্ত্তা, তর্ক-ঝগড়া, বাড়ীতে আফিসে রাস্তায় চলিতেছে। এই সব তিনি দেখিতে ও শুনিতেছেন, আর মনে মনে স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম।

মোটে হিংসা নাই, অহঙ্কার নাই। বলিতেন, "ভগবান কি কেবল তোর মনের মত হবে? না, কেবল আমার মনের মত হবে? ওরে, সে যে অনন্ত!"

জীবনের শেষ ভাগে তিনি কাশীতে থাকিতেন বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল; দুই একজন ভক্ত সেবকও থাকিতেন, রন্ধন করিয়া খাওয়া-দাওয়াও হইত। কিন্তু তাঁহার জীবনে এমন একটা অনিয়ম অশৃঙ্খলতার ধারা বহিত যে, গৃহবাস কি অরণ্য বাস ঠিক বলা যাইত না। আজ যদি রাত্রি ১০টায় খাওয়া, কাল রাত্রি ১টায় খাওয়া, পরশু রাত্রি ৩টায়। খাওয়া, দাঁড়ান, বসা, কিছুরই ঠিক নাই, সবই অনিশ্চিত। কখন তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিবে, তবে হুকুম হইবে, তবে উনুনে আগুন পড়িবে। তাহার উপর হয় ত রাত্রি ১২টার সময় ভারি বকাবকি—অকারণ বকাবকি। অপরে দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু যাহারা তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়াছে, তাহারা বুঝিত, তাঁহার মন নীচে নামিতেছে না, তাই ঐরূপ জোর করিয়া সাংসারিক জিনিষে মন নামাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ঘড়ি ধরিয়া খাওয়া, স্নান, বেড়াইতে যাওয়া, বহি পড়া, কাযকর্ম্ম করা, আমাদের পক্ষে বড় জিনিষ হইতে পারে; কিন্তু তিনি জানিতেন, এই সব নিয়ম-শৃঙ্খলাতেই অভ্যাস আনিয়া ফেলে। মানুষকে দেহ-সুখের এবং সংস্কারের দাস করিয়া ফেলে। নিয়ম-শৃঙ্খলাই বন্ধনের কারণ।

অবধূতের চব্বিশ গুরু ছাড়া নিজ দেহে এক গুরু ছিলেন। ইহা বড় বিচিত্র চরিত্র। এইটিকে ভাল করিয়া সেবা করিলে, ইনি ডুবাইয়া দেন; আর মাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী ভোগ দিলে ইনি জ্ঞান বৈরাগ্য দেন। লাটু মহারাজ এই দেহ-গুরুটিকে বিশেষ চিনিয়াছিলেন এবং সে জন্য অতি অবহিত হইয়া ইহার সহিত ব্যবহার করিতেন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

আমার ডায়েরী

পরদিন—উষা

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আত্মচৈতন্য না কি যাকে বলে—তিনি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যের সেই ধ্বক্ ধ্বক্ সুরু হ'য়ে গেছে। শুধু এই কি? বেশ মনে পড়ছে, গভীর ঘুমের পরে জেগে উঠে যেমন সেই সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়ও "আমি যে ছিলাম" এই স্মৃতিটা মনে আসে, তেমনি মনে পড়ছে, সেই "আমি আছি"র সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বক্ ধ্বক্ এই ব্যথা এসে সমান ভাবে নিজেকে গভীর ঘুমের মধ্যেও জানাচ্ছিল! "সব যাওয়ার পর" মাত্র যিনি থাকেন, তাঁরই সঙ্গে সমানভাবে নিজের অস্তিত্ব জানায়, এমন কে গো আজ আমার মধ্যে উদয় হলেন? কে ইনি? আর কি করব আমি এঁকে নিয়ে!

বেদনা বেদনা! এর নাম কি সত্যই এই? তবে ত জীবনই একটা বেদনা! এই যে আমি—এই যে আমার অস্তিত্ব এও ত বেদনা ছাড়া আর কিছু নয়! এই বেদনা ভিন্ন আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর টেরই পাচ্ছি না ত!

বুকের মধ্যে অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে অন্ধকারে যেন সমুদ্র উথলাচ্ছে! ঠিক্ তেমনি! সেই গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ—গুমরে মরা বেদনায় অব্যক্ত আর্ত্তনাদ—আর আছাড়ি পিছাড়ি! অন্তর সভয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, "কে এ? কি এ? কার এ আবির্ভাবে এখানে এমন অভাবনীয় অচিন্তনীয় সংঘর্ষ?" কে দিবে উত্তর! কিন্তু 'ভয়ে' যে সে সারা হ'ল।

ওগো যেই হও তুমি, আর যে পারি না!—অভয় দাও—অভয় হও।

কেনই বা নিজে এত প্রচণ্ড বেগে কাঁপছ—আর জল, স্থল, অন্তরীক্ষকেও কাঁপিয়ে মারছ? তোমার এই প্রচণ্ড আবির্ভাবের ধরণেই যে বুঝছি, তোমায় পরাজিত করবার মত শক্তিমান এখানে কেউ নেই। যদি এমনি তুমি হও—তা হ'লে অনুপায় গতিহীন আমাকেও তোমার পায়ের তলায় স্থির হ'তে দাও, নিজেও হও! রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও! প্রসন্ন হও গো—আর যে পারি না।

দুঃখের মধ্যেও হাসি,—কিছু দিন আগে একখানা 'পদাবলী' দেখেছিলাম পূর্ব্বরাগের গাথায় তার এই কটা ছত্র হঠাৎ মনে এল—

"রাই কহে কে বা হেন মুরলী বাজায়
যেন বিষামৃতে একত্র করিয়া
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারীতে যেন কাটে
ছেদন না করে মোর হিয়া।
জল নহে হিমে তনু কাঁপাইছে মোর তনু
শীতল না করে হিয়া মোর;
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়াইছে মোর মতি
চণ্ডিদাস ভাবি না পায় ওর।"

এমনি সব পরস্পরবিরোধী কথা! তখনও হেসেছিলাম, কিন্তু সে এক রকমে। আর আজ দুঃখের হাসি হেসে বলছি, আচ্ছা, বিষ মানছি, কিন্তু অমৃত কৈ? বিষামৃতে একত্র! শীতলতার সঙ্গে অগ্নির দাহিকা শক্তি,—কৈ, তা তো মিলছে না!—আমি যে দেখছি শুধুই বিষ—শুধুই অগ্নি! দুদিন আগেও যে জীবনের সত্তার অনুভবকে আনন্দ ভিন্ন আমার অন্য কিছু মনে হ'ত না, তাকে এমন অগ্নিময়—বিষময় কিসে ক'রে দিলে?—ওঃ—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কি কিছু জগতে আছে?

* * * * *

আছে আছে, অমৃতও আছে, শুধুই বিষ নয়।

ক'টি হাতের অক্ষরে একটুকরো চিঠি—এতেই কি আজ এই অমৃতের স্পর্শ আমায় এনে দিলে! বার বার অক্ষর ক'টি কেবল প'ড়েই যাচ্ছি—ক্রমে মাথায় যেন শব্দের আর অর্থবোধজ্ঞানও রইলো না। হাতে থেকে থেকে কাগজখানাও মলিন হয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে গেল। মাথার ভেতরে কেবল সেই সুন্দর ছাঁদের হরফ্‌গুলিই যেন সোনার অক্ষরে ছাপা হয়ে জল্ জল্ করতে লাগল! কথা ক'টি কিন্তু এই—

"বাবা আপনাকে লিখতে বল্লেন, তিনি প্রত্যহ বৈকালে আপনার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন, আপনি কেন আর আসেন না? তাঁর আজ একটু জ্বরভাব হয়েছে, যদি পারেন, আজ একবার আস্‌বেন। আমরা আপনার অপেক্ষায় রইলাম। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি সগুণা।"

বৈকাল হ'তে ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে গেল, সব ভুলে কেবল এই স্বাক্ষরটাই শেষে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে চম্‌কে উঠ্‌লাম—যেতে হবে যে!

দাঁড়াতে গিয়ে বুঝ্‌লাম, আজ মাথার পক্ষে এর বেশী আর সইবে না। যথাস্থানে ব'সে প'ড়ে এইবার চোখ বুজ্‌তেই হ'ল! যেতে পার্‌ব না।

পরদিন

কি লিখ্‌ব, আজ্‌কের কথা বুঝতে পার্‌ছি না। খানিকক্ষণ হ'ল পিতৃবন্ধু নিজেই এসেছিলেন তাঁর কন্যাকে সঙ্গে ক'রে। আমার যাবার অপেক্ষাও আর ক'রে উঠতে পারেন নি। আমার এই নিঃসঙ্গ স্বভাবকে কিছুতেই নাকি তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। সাধারণ সামাজিক মানুষ নাকি আমায় হ'তেই হবে। পিতৃবন্ধু আমায় যথেষ্ট তিরস্কার কর্‌ছিলেন আর তাঁর কন্যার সদয় সুর মাঝে মাঝে কানে গিয়ে আমায় যেন আরও অসংযত ক'রে তুল্‌ছিল! তাঁর এই দয়াটুকু, আমার ত্রুটিটা ঢাকতে তাঁর এই স্ত্রীজাতিসুলভ সৌজন্য, সেটুকুও যেন আমায় আরও বিবর্ণ ক'রে কাঁপিয়ে—চোখে জল ভরে এনে দিচ্ছিল! কি ক'রে সাম্‌লেছি—এখন মনেও কর্‌তে পার্‌ছি না। কথা ক'টি ঐ লেখা ক'টির মতই কানে লেগে আছে। "বাবা, ওঁর শরীর হয় ত ভাল নেই—দেখ্‌ছেন না! কেন অত বক্‌ছেন?"

তার পরে আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "বাবার স্বভাব এত দিনে চিনেছেন, বোধ হয়। আমার যদি চিঠির উত্তর দিতে এক দিন দেরী হয়, তা হ'লে বাবা এমন ব'কে ত চিঠি লিখতেন না; তার চেয়ে একটু বেশী দোষ হ'লে ত—আর রক্ষেই থাকত না; একেবারে পুনায় উপস্থিত হয়ে সেই একবাড়ী লোকের আর সহপাঠীদের সাম্‌নে এমন ক'রে বক্‌বেন যে, আমায় কাঁদিয়ে না দিয়ে রেহাই দেন না। আপনার ওপরও ঠিক তাই ধরেছেন দেখ্‌ছি।"

না গো, আমায় এই সাধারণ সহৃদয়তাটুকুও দিতে এসো না, এটুকুও সহ্য কর্‌বার শক্তি নেই যে দেখ্‌ছি আমার। করুণ সুরটুকু কানে গিয়েই যে চোখে জল ভ'রে এনে দিচ্ছে। যদি সেটুকু বাইরেই ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে?—না গো না—দিও না।

স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছি। যাকে মন বলে, সেই গহন গভীর অতলের একেবারে কাছে পৌঁছুতে ইচ্ছে কর্‌ছে! কি সে বস্তুটি আর তার অনুভব নামে জিনিষটাই বা কি! ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা কথা হঠাৎ মনে এল! যার নাম গান, সেই বা কি জিনিস? কবির লেখা কতকগুলা কথার সমষ্টি, তাই ছন্দে লয়ে কখনো টেনে কখনো আস্তা দিয়ে চড়িয়ে নামিয়ে কাঁপিয়ে সেই কবিতার আবৃত্তি ক'রে যাওয়া—এরই নামে কি গান? এ কথা যে কোন সঙ্গীত-শ্রোতার কাছে বল্‌লেই সে নিশ্চয়ই হেসে উঠ্‌বে। গানকে প্রকাশ কর্‌বার সাধ্য ভাষার কি থাকা সম্ভব? সে কেবল গায়কের প্রাণ জানে আর শ্রোতার কান জানে আর মন জানে। ভাষা মাত্র এইটুকু বল্‌তে পারে—

"কি যে উনি তাহা কে বা জানে।"

এই মনকে আর তার অনুভবকে বুঝ্‌বার চেষ্টা, এও কি তেমনি নয়? কেবল সেই একটা 'গান'ই চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে চলেছে যেন! ভাষা নাই, কেবল একটা সুর! বাঁশীর—বেহালা সেতারের ভাষাহীন রাগিণীর আলাপ মাত্র! তাতে কত মূর্চ্ছনা মীড় মেশানো—সুখের দুঃখের। আর কেবল কিসের একটা—"ছায়া দোলে,—ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি।" রাত্রি এসেছে। অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে একটি লাইন—

"আঁখি হ'তে ঘুম নিল হরি কে নিল হরি! মরি মরি।"

রাত্রি- দ্বিপ্রহর

আমি ক্রমশঃ আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, এই দেখে যে কবির যত গান, তা কি আমারই জন্যে তৈরী হয়েছিল! আমার এই জীবনের খাতায় যে তাঁর কোন গানটিই বাদ যাচ্ছে না। সবই যে একে একে দিনে দিনে ক্রমশঃ একেবারে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ তো গান শোনা নয়, কাব্য পড়াও নয়; এ যে একেবারে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব। জীবনটা কি? একটা অনুভবের সমষ্টি বই ত নয়। অস্পষ্ট হ'তে ক্রম-পরিস্ফুট

এই অনুভবের স্মৃতিধারাই ত মানুষের জীবন। আবার সেই একটানা জীবনস্রোত যে দিন একটা প্রবল অনুভবের বেগে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে—তারই নাম ত প্রাণের জাগরণ! আমার এই যে খাতা, এ ত তারই অভিব্যক্তি মাত্র। তাই আমার জীবনের প্রতি অভিব্যক্তির মধ্যেই কবির গানের এই আশ্চর্য্য মিল্ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। কিংবা এ বুঝি বিশ্বেরই একটা চিরপরিচিত চিরপুরাতন পরীক্ষিত সত্য,—বিশ্বকবি তাই-ই গেয়ে গেছেন। আজ আমার এই নগণ্য জীবনও সেই সুরে সুর মিলানো। বিশ্বসমুদ্রের অগণ্য প্রাণতরঙ্গের মধ্যে আজ আমিও একটা ঢেউ জাগালাম এই মাত্র। কিন্তু একটা হাসির কথা, আমার জীবন যে ক্রমশঃ কবির একটা গানের বইয়ের কপি হয়েই দাঁড়াচ্ছে! হোক্, তবু আমার এই জাগ্রত জীবন্ত সত্যকে তো আমার নিজের চোখের সামনেই একবার নিজের হাতে রেখা টেনে দাঁড় করাতেই হবে,—নৈলে স্বস্তি কোথায়!

"বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন
গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার!
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে—"

ওগো, এ কি তারে তারে ঝঙ্কার দেওয়া? এই স্তব্ধ রাত্রিতে এই বিনিদ্র নয়নে শয়ন ছেড়ে ব'সে আছি! নয়নের ঘুম কেড়ে নিল কে এমন?

"গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী—
বাজে ব্যাকুল সুরে"

তার একটি মাত্র ভাষা—"ভালবাসি—ভালবাসি।"

"কোন বেদনায় বুঝি না রে হৃদয়ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার।"

সত্যই এ কোন্ বেদনা, তাও কি বুঝ্ছি না? তাকে যে জীবনে আমার এ 'কণ্ঠহার' এই আমার সদা জাগ্রত ভালবাসার আভাসটুকুও জানাতে পাব না, এই-ই যে এ বেদনার স্বরূপ।

নতুন ক'রে—নতুন আগ্রহের সঙ্গে আবার কবির গীতিকাব্য পড়্ছি। এত দিনও ত পড়েছি, অনুভব করেছি, তন্ময় হয়েছি, এই সে দিনও ত কত লিখেছি, কত ভেবেছি। কিন্তু আজকের এ অনুভবের সঙ্গে তাদের কি তুলনা হয়? জগৎকেও আজ এ কি নতুন চোখে দেখ্ছি। বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বকাব্যও যেন তার ধারা বদ্লেছে। জীবনে এমন নতুন নতুন অনুভব মানুষের কতবারই না জানি আসে? এ অশেষ কি এমনি ভাবেই চলে? এর কি শেষ নেই? এত দিনের অনুভব—সেও তো আমার কাছে তুচ্ছ ছিল না। কিন্তু আজ—ওগো, আজ যে সে আনন্দের কোথাও আভাস নেই! কেবল বুঝ্তে পার্ছি—

"তুমি বড় বেদনার মত বেজেছ হে আমার প্রাণে
প্রাণ যে কেমন করে মনে মনে মনই জানে।"

প্রকাশ কর্বার কোন ভাষা নেই,—ভাষা নেই!
সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা প্রচণ্ড ভয়!—

"এ জনমের মত আর হয়ে গেছে যা হবার
ভেসে গেছে প্রাণ মন মরণ-টানে।"

সত্যই কি এ জন্মের মত যা হবার হয়ে গেছে? প্রাণ মন এই যে মরণস্রোতে ভেসেছে, এ থেকে কি আর সে কূলে উঠ্বে না? এই কূলে উঠারই বা অর্থ কি? যা এ জীবনে হবার নয়, পাবার নয়, তা ত হবেই না—পাবই না, তা হ'লে এর অর্থ এই নয় কি যে, তাকে ভুল্লেই—এই ব্যথাকে ভুলতে পার্লেই এ স্রোতের গতি ফির্বে?

না না না! এ কথা চিন্তার পর্য্যন্ত যখন শক্তি নেই, সাহস নেই, তখন মিছে এ কূলে ওঠার জন্য হাঁকুপাঁকু কেন?—

"এ জীবনের মত আর হয়ে গেছে যা হবার"

বড় বেদনার মতই সে আমার প্রাণে বেজে থাক্। এ ব্যথাকে আমি ভুল্তে চাইনে—চাইনে! আমার এই জীবনের অনুভবের মধ্যে সে কোন দিন থাক্বে না—এ কথা ভাব্তেও যে পারি নে! তা হ'লে আমার কি থাক্বে? "যেখানে ব্যথা সেখানে তোমারে নিবিড় করিয়া ধরিব হে।" এই-ই আমার সুখ, এই আমার দুঃখ আর "সব সুখ দুঃখ মন্থন-ধন" কবি যে বলেছেন—"বড় সুখে বড় দুঃখে আমি তোমা পানে আছি জাগি!" এ কথা এ ত সত্য। এই অপরিসীম দুঃখের মধ্যেও যে কতখানি সুখের নেশা লুকান আছে, তা এই ব্যথাকে ভুল্বার অনিচ্ছাতে আজ আল ক'রে বুঝ্তে পার্লাম।

পরদিন

* * * * *

নয়ন আপন মুছি কমলকরে
শিয়রে দাঁড়ায়ে নিশিশেষে!
স্নেহ-কনক-লেখা মুকুলিত নয়নে
চরণে অরুণ পরকাশে।
অঞ্চল বিজন চঞ্চল বাস
কোকিলকণ্ঠ পঞ্চম গায়, মৃদু হাসি কুসুমে বিকাশে।
স্নিগ্ধ সুন্দর শান্ত মনোহর নমঃ নমো প্রভাত প্রকাশে।

এ উষা-রূপিণীকে যে আজ চোখ্ খুলতেই মনের চোখের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে এ গান আজ আমায় গাওয়ালে! স্নেহ-কনক-লেখা তার নয়নে আঁকা! কাল যে স্পষ্ট তা অনুভব করলাম। মৃদু অনুযোগের সঙ্গে কথাগুলি এখনো যে কানে বেজে চরাচরকে যেন মধুরতায় ভরিয়ে দিচ্ছে।

"বাবা আপনার জন্ত ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সত্যই আপনি দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছেন! এসে যে প্রথমে আপনার চেহারা এর চেয়ে অনেক ভাল দেখেছিলাম। শুধু কোথায় একা একা ব'সে থেকে থেকে আপনি শরীরটাকে মাটী করছেন।"

কি উত্তর দিতে পারি এর? তার পরেও সগুণা বলেছিলেন—"পুনায় থাকতে বাবা আমায় কত লোভ দেখিয়ে লিখতেন, বাড়ী এলে কেমন এক জন সঙ্গী পাবি, কত নতুন নতুন গল্প শুনবি, নিজেদের দেশের কথা জানবি। কিন্তু আপনি যে আমাদের সে আশাটা এমন মিথ্যা ক'রে দেবেন, এ কিন্তু একবারও আমাদের মনে হয়নি।" কি উত্তর দিয়েছিলাম এর, মনে নেই, কিন্তু তার কথাগুলি ত মনে বেশ আছে।

"সব আপনার মিথ্যা কথা! ইচ্ছে ক'রে আপনি আমাদের বঞ্চিত করছেন! সে দিন গান গাইতে বললাম, চাতে বলেছিলেন অন্ত এক দিন গাইব। সে দিনই যে কবে আসবে তা তো বুঝছি না।" তার পর কি অনুনয়ের দৃষ্টিতেই সগুণা আমার দিকে চেয়ে অনুরোধ করলেন, আমায় সঙ্গে একটু একটু বাঙ্গালার চর্চ্চা ক'রে আমায় বাঙ্গালীর মেয়ে ক'রে দিন। "আমি যে কিছুই জানি না। যখন দেশে যাব, তখন কত লজ্জা পাব ভাবুন ত! তখন কিন্তু আমার আপনাকেই দোষী ব'লে মনে হবে। আমি বাবার কাছে শুনেছি, আপনি বেশ ভাল বাঙ্গালা রচনা করতেও পারেন।"

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলেও সগুণা বলেছিলেন, "আমি ত আপনারই রচনা এখনি শোন্‌বার জন্ত জেদ করিনি। যে যত দিনে আপনি আমায় শোনাবার ইচ্ছা করবেন, তখনই না হয় শুনব, কিন্তু এখন দেশের কবিদের সঙ্গে আমায় আগে পরিচয় ক'রে ত দিন! শুনছি বাঙ্গালায় খুব ভাল ভাল গান তৈরী হয়, কিন্তু হরেন্দ্রবাবু মাত্র বাবাকে এই খবরটুকুই দিয়েছেন, এর বেশী আর কিছু দিয়ে উঠতে পারেন নি। এখন আপনার কাছ থেকে আমরা সে সব আদায় করতে চাই। আপনার যদি প্রথমে গান গাইতে লজ্জা হয়, তা হ'লে বলুন, আমি দু' একটা মারহাট্টি 'ভজন' শুনিয়ে দিই।"

এ সুযোগও ছাড়িনি এবং তার পরে নিজেকেও গান গাইতে হয়েছে। কি যে গেয়েছি, তা মনে করতেও হাসি পাচ্ছে। কি গানই বা গাইতে পারি! যারা আজকাল আমার অন্তরে দিনরাত গুঞ্জরণ করছে, তাদেরও কি ঠোঁটের আগায় আনতে পারি তাঁরই সুমুখে? পারি না, পারব না! তাই গেয়েছি কবির শুধু বাঙ্গালারই বন্দনাগান! আমার সুরে না হোক, কবির দক্ষতায় দেখলাম, সগুণা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। হরেন্দ্রও এসে জুটেছিলেন সেদিন। সগুণার বাবা ত বরাবরই ছিলেন। সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন দেখলাম। বিদায়ের সময় সগুণার নিবেদন পেলাম, আমাকে এখন তাঁদের বাঙ্গালা গান কিছুদিন ধ'রে শোনাতে হবে, পরে সে নিজেও গাইতে শিখবে, এই তার ইচ্ছা।

তোমারই কাছে প্রত্যহ আমার গান গাইতে হবে? জান না, তাই ঐ অনুরোধ করেছ। কি গাইব—কোন্ গান গাইব আমি? যা গাইতে যাই, সবই যে আমার এখন নিজের কথায়—নিজের ব্যথায় ভরে উঠে! যদি এর একটুও বুঝতে পার—কিংবা অন্ত কেউ পারে, তখন কি হবে? কি ভাববে—কি বলবে তখন আমায়? এটুকুও যদি তাতে হারাই? না না, গান গাইতে আর পারব না। কিন্তু আজ এ প্রভাতটিকে আমার শত শত নমস্কার। আর আজকে যার ঠিক চরণমূলেই আমার আনন্দ

"তৃষিত নয়নে কা'র পথ পানে
চাহে বিয়াকুল বালা।"
— রবীন্দ্রনাথ

অরুণোদয় হচ্ছে ব'লেই অনুভব করলেম, আমার সেই উষাময়ীকেও উদ্দেশে শত শত প্রণাম। এইটুকুতেই ওগো এইটুকুতেই যে আমার প্রাণ আজ ভরে উঠেছে! আবারও তোমায় প্রণাম করি, দেবি!

এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পারছি, পিতৃ-বন্ধু আমার লজ্জাটুকু সংবরণ ক'রে নিয়েছেন। সগুণা কিছুই শোনেনি। জানি না, আমার পক্ষে এটুকু সুখের কথা কিংবা কি? এও যেন একটা দ্বন্দ্বের বিষয়! সগুণা এর যে একটুও কিছু জানে না, এ কি আমার পক্ষে এতই খুসীর বিষয়? কিন্তু জান্‌লে যে আর একদিনও আমায় এমন ক'রে এদের পাশে এখানে থাকা চল্‌তো না। সগুণা এই যে তার বাপের স্নেহে অনুপ্রাণিত হয়ে পিতৃ-বন্ধুর ছেলে ব'লে আত্মীয়ের মত ব্যবহারে চল্‌ছেন—এই অকুণ্ঠিত ভাব কি সে কথা জান্‌লে থাক্‌ত? এই স্নেহটুকু হাসিটুকুর সঙ্গে বুঝি খানিকটা সৌহৃদ্যও আমি পাচ্ছি—এ কি আর পেতাম? খুব সম্ভব পেতাম না। কিছু না কিছু কুণ্ঠা আসতই। আর পিতৃ বন্ধু? তিনিও মনের মধ্যে বোধ হয় একটু আঘাত পেয়ে স্নেহটা পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণই ক'রে ফেলেছেন। এই সরল মানুষটি বোধ হয় ভেবে নিয়েছেন, যা অসম্ভব, তার জন্য মানুষ কি আর মাথা ঘামায়? ব্যাপার বুঝ্‌বার সঙ্গেই মানুষ তার থেকে মনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য, এবং এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তাই হয়েছে।

দুনিয়ার এই এক মজা! যেখানে যত বাধা, যত বিফলতা, সেইখানেই মানুষের মনের তত ঝোঁক—তত আছাড়ি পিছাড়ি। এ রহস্যের অন্ত কে জানে! [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

আমরা কোথায়?

আমরা বাঙ্গালী চাকরী কাঙ্গালী
কেরাণীগিরীই সার;
ঘাড়ে চেপে বসে মাড়োয়ারী শেষে
[illegible]

পেটে ভাত নাই ফ্যাল ফ্যাল
পরমুখ চেয়ে থাকি;
দেহে নাহি বল হৃদয় বি[illegible]
মরিতে কেবল বাকী।

পুরী-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫

কথায় বলে, "হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ।" জগন্নাথ-ক্ষেত্রে এই চলিত কথার যেরূপ সার্থকতা উপলব্ধ হয়, হিন্দুর আর কোন তীর্থে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরীতে এই উৎসবগুলি সাধারণতঃ "যাত্রা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকল "যাত্রা"ই অল্পাধিক আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে "চন্দনযাত্রা," "স্নানযাত্রা," "রথযাত্রা" এবং "দোলযাত্রা"ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ স্থলে কেবল কয়েকটি প্রধান উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

যাত্রা।

বৈশাখ মাসের প্রধান উৎসব "চন্দনযাত্রা"। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হইয়া ২১ দিন পর্য্যন্ত এই উৎসব চলিতে থাকে। জগন্নাথের প্রতিনিধি "মদনমোহনে"র শ্রীঅঙ্গে চন্দনলেপন করিয়া এবং তাঁহাকে বিচিত্র বসন-ভূষণ ও পুষ্পাভরণে সুসজ্জিত করিয়া শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত "নরেন্দ্র-সরোবর" নামক এক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে জলবিহারের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। জগন্নাথের চলন্তী প্রতিমা মদনমোহন সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলে বাহকস্কন্ধে গমন করেন এবং রত্নাভরণে সালঙ্কৃতা সুবেশা সুবর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীপ্রতিমা গজদন্তনির্ম্মিত অপর একখানি ক্ষুদ্রতর দোলায় চড়িয়া তাঁহার অনুগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দোলায় গমন করেন। ঠাকুর লইয়া যাইবার সময়ে একটি প্রকাণ্ড শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। বহুলোক তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, দামামা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া এবং পতাকা, চামর, দণ্ড ইত্যাদি ধারণ করিয়া ঠাকুরের অগ্র-পশ্চাতে গমন করে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য; রাজপথিপার্শ্বে অবস্থিত যাবতীয় গৃহে ঠাকুর দেখিবার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কত লোক উচ্চকণ্ঠে গান ও জয়ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শোভাযাত্রায় যোগদান করে। পথের দুই ধারে বিপণিশ্রেণী বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া লোকের নয়ন, মন ও অর্থ এককালে আকর্ষণ করিতে থাকে।

চন্দনযাত্রা।

ঠাকুর নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে লক্ষ্মীর সহিত দুইখানি বিভিন্ন নৌকায় উঠাইয়া পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অবস্থিত একটি মন্দিরমধ্যে মহা সমারোহের সহিত রক্ষা করা হয় এবং তথায় তাঁহাদিগের পূজা ও ভোগাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। উড়িষ্যার পুষ্করিণীগুলি প্রায়ই সুবৃহৎ, সুন্দরভাবে নির্ম্মিত এবং সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর চারি পাড়ই পাকা করিয়া ইট বা পাতর দিয়া বাঁধান, ঠিক আমাদের দেশের "গজগিরি" পুকুরের মত। প্রায় সকল পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে হরিদ্বর্ণ বিবিধ পাদপরাজি শোভিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় স্থান জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং অনেক স্থলেই এক একটি দেবমন্দির এই সকল দ্বীপের শোভাবর্দ্ধন করে। পুষ্করিণীগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বহুবিস্তৃত এবং অনেক পুষ্করিণীরই জল বেশ পরিষ্কৃতাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। উড়িষ্যায় পান ও ক্ষেত্রে সেচনের জন্য অধিকাংশ স্থানে পুষ্করিণীর জলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূজাদি সম্পন্ন হইলে ঠাকুর ও ঠাকুরাণীকে সুসজ্জিত একখানি স্বতন্ত্র নৌকায় এবং পঞ্চপাণ্ডবকে অপর একখানি নৌকায় চড়াইয়া নৃত্যগীতের সহিত জলবিহার করিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেবমন্দির এবং পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্ব আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং বহুসংখ্যক ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠে। জলক্রীড়া শেষ হইলে ঠাকুর ও ঠাকুরাণী মন্দিরে পুনরাগমন করেন এবং মহা আড়ম্বরের সহিত তথায় তাঁহাদিগের চন্দন-স্নান, বেশ পরিবর্ত্তন, আরতি, পূজা ও

ভোগাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। লোক চন্দন মাখিয়া ঠাকুরদর্শন করে এবং মিষ্টান্নভোগ প্রসাদ পায়। অধিক রাত্রিতে পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া মদনমোহন ও লক্ষ্মীকে শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া লইয়া আনা হয়। "চন্দনযাত্রা" তিন সপ্তাহ ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ সমান উৎসব ও সমারোহের সহিত ইহা সম্পন্ন হয়। চন্দনযাত্রার নাম হইতে নরেন্দ্র-সরোবরের আর একটি নাম "চন্দন-পুকুর।" ইহার তীরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর (জটে বাবাজীর) মঠ। পুরীর অন্যান্য মঠের সহিত ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

জ্যৈষ্ঠের শেষ পূর্ণিমায় জগন্নাথের "স্নানযাত্রা" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে পুরীতে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। বিশেষতঃ ইহার ষোল দিন পরেই "রথযাত্রা" এবং উহাই পুরীর উৎসবরূপ কণ্ঠহারের মধ্যমণিস্বরূপ। রথযাত্রাদর্শনার্থী বহু যাত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে পুরীতে আগমন পূর্ব্বক উভয় উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। রথযাত্রা উপলক্ষে ট্রেণে অত্যন্ত ভিড় হয় বলিয়া আসিবার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকেই স্নানযাত্রার দুই চারি দিন পূর্ব্বে পুরীতে আগমন করিয়া রথ দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

স্নানযাত্রা।

কেবলমাত্র দুইটি উৎসব উপলক্ষে বিগ্রহদিগকে সশরীরে রত্নবেদীস্থিত সিংহাসন হইতে নামাইয়া বাহিরে লইয়া আসা হয়। ইহাদিগের একটি স্নানযাত্রা, অপরটি রথযাত্রা। রথযাত্রায় ঠাকুররা একেবারে মন্দিরের বাহিরে আগমন করেন। অপরাপর উৎসব প্রতিনিধি মদনমোহনের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উৎসবের দিন উষার উদ্বোধন হইতেই মন্দিরের মধ্যে এবং রাজপথে বহুদূর ব্যাপিয়া বিষম জনতা পরিলক্ষিত হয়। বেলা হইলে মানুষের ভিড় ঠেলিয়া এক পদ অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। বহুদূর হইতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের কণ্ঠোত্থিত গুরু-গম্ভীর আরাব ও জয়গীতি শ্রুত হইয়া থাকে। সেই বিপুল জনস্রোতের লক্ষ্য কেবল একদিকে। শ্রীমন্দিরের প্রাকারযুগলের মধ্যস্থলে অবস্থিত ঠাকুরের উচ্চ স্নানবেদীর উপর অসংখ্য ভক্তবৃন্দ করযোড়ে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া ঠাকুরের আগমন ব্যাকুলহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই দৃশ্য বাস্তবিকই দর্শনীয়। স্নানযাত্রার দিন প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশ মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ভক্তগণের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। ইহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তাহাদিগের একাগ্রতা ও তন্ময়তার বিন্দুমাত্র অবসাদ পরিলক্ষিত হয় না।

স্নানের মঞ্চ উচ্চ ও প্রশস্ত। এই বেদী দুই অংশে বিভক্ত। অভ্যন্তরস্থ বেদী বাহিরের বেদী অপেক্ষা উচ্চ এবং অল্পপরিসর এবং ইহার পশ্চাদ্ভাগ অনতি-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। বড় বেদীর চতুর্দ্দিক্ রেলিং দিয়া ঘেরা; ঠাকুরদিগের প্রবেশের জন্য সম্মুখদিকে সোপানাবলী সজ্জিত একটি খোলা পথ আছে।

সুভদ্রাদেবী বাহকস্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্নানবেদীতে আগমন করেন, কিন্তু জগন্নাথ ও বলরাম পদব্রজে স্নানবেদীতে আইসেন। সুবৃহৎ বিগ্রহগুলি অত্যন্ত ভারী; সুতরাং তাঁহাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নহে। কাছি বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং পশ্চাৎ হইতে পাণ্ডাগণ বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক পতন হইতে রক্ষা এবং সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবার সহায়তা করে। রথের সময়েও বিগ্রহগুলিকে এই উপায়ে মন্দিরের বাহিরে আনিয়া রথে উঠাইয়া দেওয়া হয়। টানাটানির জন্য ঠাকুররা ধীরে ধীরে না চলিয়া এক প্রকার লম্ফ প্রদান করিতে করিতে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই ভাবে গমন করাকে "পাণ্ডববিজয়" কহে।

এইরূপে কতক্ষণ পরে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, দামামা, কাড়া, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের গভীর আরাব, পাণ্ডাগণের ও ভক্তদিগের কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া, ঠাকুরের স্নানার্থ আগমন ঘোষণা করে। তখন সেই বিপুল জনতার মধ্যে স্নানবেদীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবার একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সে চেষ্টা তিলমাত্র স্থানের অভাবে কেবল চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হয়—সে যে স্থানে ছিল, সে সেই স্থানেই রহিয়া যায়। অথবা ভিড়ের ঠেলায় শূন্যে উঠিয়া অগ্রসর হয়।

বহু পরিশ্রমে ও বহু আয়াসে জগন্নাথ এবং বলরামের দারু-মূর্ত্তিদ্বয় সোপানশ্রেণী বাহিয়া স্নানমঞ্চের উপর

উত্তোলিত হইয়া অভ্যন্তরস্থ বেদীর পশ্চাদ্দেশস্থিত প্রাচীর-গাত্রসংলগ্ন করিয়া সংরক্ষিত হয়, এবং পূর্ব্বদিবসে মন্দিরস্থিত "সর্ব্বতীর্থ" নামক কূপ হইতে উত্তোলিত ১ শত ৮ টি তাম্র কলসে রক্ষিত, কুসুম-সুরভি-সমৃদ্ধ, স্নিগ্ধশীতল, মন্ত্র-পূত বারিধারা প্রাচীরের উপর হইতে তাঁহাদিগের মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে "রোহিণীকুণ্ড" হইতে উত্তোলিত জলও তাঁহাদিগের মস্তকে বর্ষণ করা হয়। এই সময়ে ঠাকুরদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবার এবং তাঁহাদিগের পরিহিত রঙ্গীন বস্ত্রখণ্ডের অংশ লইবার জন্য যাত্রিগণের মধ্যে একটা বিষম ব্যাকুলতা ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যাত্রিগণ কেবল স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, অপর সময়ে দেবদেহ-স্পর্শ-সুখ ভক্তগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই উপলক্ষে পাণ্ডাগণ বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যাত্রিগণের নিকট হইতে বেশ বড় রকমের দর্শনী আদায় করিয়া তাহারা ঠাকুরের অঙ্গ-স্পর্শ করিবার উপায় করিয়া দেয়। অত্যধিক জনতা হেতু এই পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য অনেককে মন্দিরে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হয়। ঠাকুরের দেহ হইতে বস্ত্রের টুকরা সংগ্রহ করা বিশেষ পুণ্যের কায, স্নানযাত্রার সময়ে যাত্রী মাত্রেই ইহা লাভ করিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

স্নানবেদী উচ্চ বলিয়া মন্দিরের বাহির হইতেই অধিকাংশ লোক স্নানকার্য্য সন্দর্শন করে। স্নানের পর জগন্নাথকে "গণেশবেশে" সজ্জিত করা হয়। সে দিন মন্দিরের বাহিরে স্নানবেদীর উপর ঠাকুররা সমস্ত দিন অবস্থান করেন। ঐ স্থানেই তাঁহাদিগের পূজা, ভোগ, আরতি প্রভৃতি নিত্যসেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্নানের পরদিন ঠাকুরের জ্বর হয় এবং ১৫ দিন এই জ্বরের বিরাম হয় না। ঠাকুরকে এই সময়ে মন্দিরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং নানাবিধ পাচন সেবন করিবার বিধিব্যবস্থা করা হয়। এই ১৫ দিন কেহ ঠাকুরের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং নিত্য ভোগ-পূজাদি পট সাহায্যে হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, কয়দিন রুদ্ধ মন্দিরে বিগ্রহগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগের দেহে নূতন করিয়া রং দেওয়া হয়। এক পক্ষকাল অতীত হইলে তাঁহাদিগকে পথ্য দেওয়া হয় এবং তিনি সুস্থ হইয়া "নবযৌবন-বেশ" ধারণ করতঃ ভক্তগণকে পুনরায় দর্শন দেন। রথযাত্রা পর্য্যন্ত ঠাকুরর আর রত্নবেদীর উপর অবস্থিত করেন না। "জগমোহনের" সম্মুখে জয় বিজয় দ্বারের পশ্চাভাগে তাঁহাদের বিগ্রহ রক্ষা করা হয়।

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় স্নানযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস তৎপ্রণীত "পুরীর চিঠি" নামক পুস্তকে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যেরূপ সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জনের জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া বিশ্বপ্রভু সে দিন সত্যই যেন বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। যাঁহার ধ্যান-কল্পিত মূর্ত্তি আমরা সতত নয়নের সমক্ষে স্থাপন করিয়া, পুষ্পপত্রে অর্চ্চনা করিয়া, মনোমত বেশে সাজাইয়া, প্রীতিকর সুপবিত্র দ্রব্যসম্ভারে আপ্যায়ন করিয়া পরম চরিতার্থতা অনুভব করি, আজ তাঁহাকে রুদ্ধ মন্দিরের বদ্ধ প্রকোষ্ঠের পরিবর্ত্তে সীমাহীন নভোমণ্ডলের চির-উদার বিস্তৃতির তলে গৌরব-মণ্ডিত প্রভুর বেশে অধিষ্ঠিত দেখিয়া সত্যই বিশ্বরাজের প্রভায় উদ্ভাসিত বলিয়া মনে হইল। তখন ভক্তিবিহ্বল পুলকিত চিত্তে সরিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল, এ কি! কাহাকে আমরা তুচ্ছ প্রস্তরমন্দিরের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া নিতান্ত আপনার জনের মত আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি! আজ সীমার বাধা হইতে অবসর লইয়া আপন বিশাল অনন্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের নিতান্তই আপনার জগন্নাথ সমগ্র বিশ্ববাসীর হইয়া আবির্ভূত হইলেন। আজ সারা বিশ্ব তাঁহার আরতির আয়োজন করিতেছে। মেঘগর্জ্জনের গম্ভীর আবাহনে তাঁহারই প্রার্থনা-গীতি ফুটিয়া উঠিতেছে। বিজলীর চকিত আলোকে তাঁহারই আরতি-প্রদীপ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। ঝরঝর ধারে বাদলের বারিরাশি আজ বিশ্বনাথের চরণতলে অর্ঘ্যবর্ষণ করিয়া জগৎ-সমীপে আপনাকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। শীকর-সিক্ত-বায়ু আজ দেবদেবের জীবন্ত সত্তার মধুময় স্পর্শ আপনার উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে শিহরিয়া সভয়ে শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছে।"

"বিশ্বের এই মহামহিমময় আকুল আরতি আয়োজনের অন্তরালে মানবের ভক্তি আহরিত পুষ্পসম্ভার কত তুচ্ছ! ডুবিয়া গিয়াছে মানবের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, নিভিয়া গিয়াছে তুচ্ছ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরশ্মি! আজ দারুমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথের মধ্যে অখিল বিশ্বপতির মহিমাই প্রতিভাত দেখিলাম। ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে মন ভরিয়া গেল, অশ্রুপুরিতনেত্রে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণিপাত করিলাম। আকারের মধ্যে নিরাকার এমনি ভাবেই আপনাকে বিকসিত করিয়া তোলেন! তাহা না হইলে কি দুঃসহ হইত মানবের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব! কোথায় থাকিত আমাদের সুখ-শান্তির প্রস্রবণ, কোথায় পাইতাম আমরা শত দুঃখ-দারিদ্র্যে অমৃতময়ের আশীর্ব্বাদ সান্ত্বনা!"

'আজ অনল অনিলে চির-নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে।
আজ বিটপি লতায় জলদের গায়
শশি তারকায় তপনে।'

সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যোগস্থাপনই বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিরাট সত্তা উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'গায়ত্রী' মন্ত্র সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে---'বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবচিত্ত---এই দুইকে এক ক'রে মিলিয়ে আছেন যিনি, তাঁকে এই দুইয়ের মধ্যে একরূপে জান্‌বার যে ধ্যানমন্ত্র - সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র ব'লে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—ধিয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ, জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ কর্‌ছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দযুক্ত কর্‌ছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান ক'রে উপলব্ধি কর্‌বার মন্ত্র হচ্চে এই গায়ত্রী।"

তিনি আরো বলিয়াছেন যে,—"তিনি যে সর্ব্বত্রই। আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরে, তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে দেখ্‌তে পাবার যে কত সুখ—যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ-রস-গীত-গন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন, তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি কর্‌বার কত আনন্দ! এই উপলব্ধি কর্‌বার মন্ত্রই হচ্চে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত ক'রে জানাই হচ্চে এই মন্ত্রের সাধনা।"

মন যখন ভক্তি-সাগরে একেবারে ডুবিয়া যায়, আত্মা যখন বিরাট বিশ্বরূপের সত্তায় লীন হইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে, তখন ভক্তের মর্ম্মি-অমর্ম্মি-বিচারবুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়, তখন সাকার নিরাকার দুই-ই তাঁর কাছে সমান হইয়া যায়। ভক্ত তখন সসীম হইতে অসীমের রাজ্যে উপনীত হয়েন, তাঁহার দেবতা তখন আর কাঠ-পাতরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। তিনি তখন বৈচিত্র্যপূর্ণ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তামাত্রই অনুভব করিতে থাকেন। কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, উভয়েই যদি অবহিত হইয়া এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু ধীর ও উদারভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মজগতের অনেক বৃথা বাদ-বিসংবাদ সহজেই মিটিয়া যায় এবং মানবসমাজ অনেক অত্যাচার-অনাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রার পূর্ব্বের একাদশী তিথিতে মন্দিরমধ্যে "রুক্মিণীহরণ" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রুক্মিণীহরণ।

ইহা আমাদের দেশের "যাত্রা" অভিনয়ের মত। লক্ষ্মীপ্রতিমাই সে দিন বাহকস্কন্ধে সুসজ্জিত শিবিকায় চড়িয়া রুক্মিণীরূপে বিমলার মন্দিরে পূজা দিতে গমন করেন। এক জন লোক সং সাজিয়া দূতরূপে এই সংবাদ জগন্নাথের প্রতিনিধি "মদনমোহনের" নিকট পৌছাইয়া দেয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে দলবলের সহিত চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়া বিমলার মন্দিরের কিয়দ্দূরে সংগোপনে অবস্থিতি করিতে থাকেন। রুক্মিণী পূজা শেষ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের দলবল তাঁহার যান আটক করে। বেগতিক দেখিয়া তাঁহার বাহকেরা ভয়ে দোলা ফেলিয়া পলায়ন করে। রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দোলে তুলিয়া লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই

এক জন লোক শিশুপাল সাজিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং দোলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহা আস্ফালন করিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বাক্য ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয় শেষ হইলে শিশুপাল পরাস্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং মহা কোলাহলের সহিত সদলবলে রুক্মিণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর নৃত্য, গীত, বাদ্য ও জয়ধ্বনির সহিত উভয়ের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে একাদশীতে এই উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহা "রুক্মিণী একাদশী" নামে পরিচিত। এই উৎসব উপলক্ষে মন্দিরমধ্যে খুব লোকের ভিড় হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচুণিলাল বসু।

ভোট-ভিক্ষা

কাদের মানের ভিক্ষার ঝুলি
ভোটের তরে আনছি দ্বারে,
দেলায় দে ভোট বঙ্গবাসি!
দেলায় দে ভোট তারে তারে।

মিশর ও সুদান
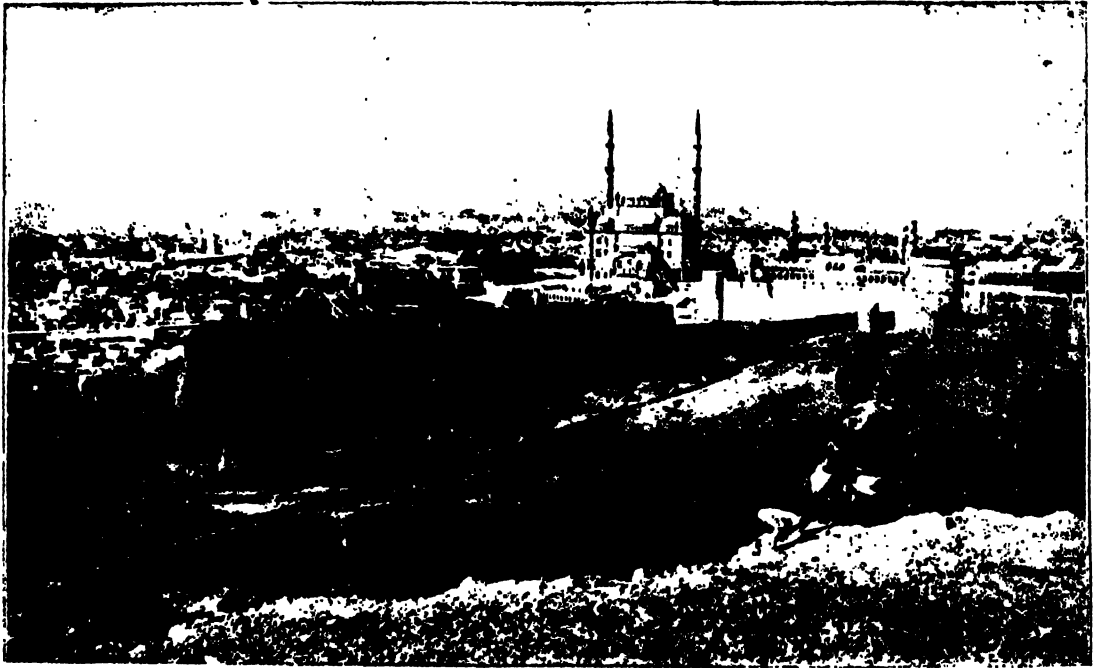
মিশরের শ্রেষ্ঠ নগর কায়রো।

মিশরের সভ্যতা, ললিতকলা, শিল্পাদর্শ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা একদিন সমগ্র পৃথিবীতে অনুকৃত হইয়াছিল। ইংলণ্ড যখন অরণ্যবহুল, দ্বীপবাসীরা যখন অর্দ্ধনগ্নদেহে গুহায় বাস করিত, লগুড়াঘাতে আরণ্য পশু হনন করিয়া জঠরানল নির্ব্বাণের জন্য অপক্ক মাংস ভোজন করিত, তখন মিশর সভ্যতার লীলাভূমি—তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভায় তখন চারিদিক্ সমুদ্ভাসিত ছিল। লর্ড মিলনার বলিয়াছেন, "এই বিচিত্র দেশের সবই অপূর্ব্ব, কিছুই সাধারণ নহে।" সেণ্টহেলেনায় নির্ব্বাসিত হইয়া নেপোলিয়ান তত্রত্য শাসনকর্ত্তার সহিত প্রথম আলোচনাপ্রসঙ্গে মিশরেরই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন দেশ আর নাই—জগতের মধ্যে মিশর শ্রেষ্ঠ।"

বাস্তবিক ৬ হাজার বৎসর ধরিয়া বহু জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা মিশরে আপতিত হইয়াছে, বসবাস করিয়াছে। তাহাদের সুশাসন ও কুশাসনের বহু স্মৃতি মিশরের বক্ষে, ললাটে যে চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়াছে, ইতিহাস চিরদিন তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা মিশরকে কতবার যে ধ্বংস করিয়াছে, কতবার যে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই ধ্বংস ও পুনর্গঠনের লীলার মধ্যে মিশর এখনও তাহার অতীত কীর্ত্তির স্মৃতিস্তম্ভ বক্ষে ধরিয়া তাহার আভিজাত্য ঘোষণা করিতেছে। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর এখন মিশরের শাসনদণ্ড যাঁহার করধৃত, তিনি মিশরের আপনার জন। মিশরের ভবিষ্য ইতিহাস যবনিকার অন্তরালে আচ্ছন্ন—তাহার ভাগ্যাকাশে যে তরুণ অরুণের আবির্ভাব হইয়াছে, মেঘোদয়ে তাহার দীপ্তি অন্তর্হিত হইবে কি না, ভবিতব্যতাই তাহার বিচার করিবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ফ্রেডরিক পিল্পিচ্ মিশর

কায়রোর দেশীয় বাজারে প্রবেশ করিবার তোরণ।

সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "মিশরের সভ্যতা যেমন প্রাচীন, তাহার পাপ-লীলাও তেমনই বহু পুরাতন। নীল নদের উপকূলবাসীরা একজাতীয় এবং একধর্ম্মাবলম্বীও নহে। এত বিভিন্ন জাতির ও ধর্ম্মের সংমিশ্রণ জগতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজনীতিক সমস্যাও এখানে অত্যন্ত জটিল। প্রত্যেকের মত বিভিন্ন, পরস্পর বিরোধী। নব-যুগের মিশরীয়দিগের জাতীয় উচ্চাদর্শও পরস্পরবিরোধী।"

বিস্ময়ের বিষয়, যে মিশর প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, আজ তত্রত্য নর-নারীর এক নবমাংশ মাত্র শিক্ষিত। শুধু তাহাই নহে, ঐতিহাসিক সিম্পিচের মতে, অসংখ্য ব্যক্তি রোগে দৃষ্টিশক্তিহীন—অন্ধ। মিশরের জনসংখ্যার অনুপাতে অর্দ্ধেক লোক দিনমজুরী করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে। মিশরের ধনভাণ্ডারের চাবি বিদেশীর করতলগত। দেশীয় চাষীদিগের অর্দ্ধাংশ ভূমিহীন, অর্থাৎ পনের লক্ষ পরিবার "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া আছে।

বিগত ৭ বৎসরের মধ্যে মিশরের জমীর মূল্য তিন গুণ বাড়িয়াছে। ধনী কৃষকরা ইহাতে পর্য্যাপ্ত ধনসঞ্চয় করিয়াও লইয়াছেন। নীল নদে পোত গমনাগমনের সংখ্যাও এই কয় বৎসরে খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ৪২ বৎসর বৃটিশ শাসনের ফলে নীলনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে জনসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের ফলে মিশরে ধনাগম হইয়াছে বলিয়া কোন কোন লেখক মত প্রকাশ করিয়াছেন। শুনা যায়, খাদ্যদ্রব্যের জন্য ইংলণ্ড মিশরকে ১ শত কোটি ডলার মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্য-প্রাচীর সেনাদলের ব্যবহারের জন্য মিশর হইতে উল্লিখিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য, উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃতি ক্রীত হইয়াছিল।

যুদ্ধের অবসানে মিশরে বহু পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে—ধর্ম্মনীতি রাজনীতিতেও অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় মিশর এখন স্বাধীনতার পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। মিশরের সীমান্ত এখন নূতন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—ভৌগোলিক সংস্থানেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে যাহার সম্বন্ধে লোক

বলিত—"স্বপ্নমগ্ন, অপরিবর্ত্তনীয় প্রাচী," এখন আর তাহার সে অবস্থা নাই। নব অভ্যুদয়ের উৎসাহে মিশর এখন অনুপ্রাণিত।

কায়রো হইতে জেরুসালেম পর্য্যন্ত এখন এক্সপ্রেস ট্রেণ গতায়াত করিতেছে—শুধু সুয়েজ খালের কাছে যাত্রীদিগকে নামিয়া ভাসমান সেতুর উপর দিয়া অপর পারে যাইতে হয়। অন্তরীপ হইতে কায়রো পর্য্যন্ত আর একটা স্বতন্ত্র রেল-লাইনও খোলা হইতেছে। অদূর-ভবিষ্যতে কায়রো হইতে গাড়ী চড়িয়া যাত্রীরা মক্কা হইয়া সোজা কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে, সে ব্যবস্থাও চলিতেছে।

তৃতীয় টলেমী নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ বিরাট তোরণ।

মিশর বলিতে, লোহিত সমুদ্রের উপকূলভাগ হইতে সাহারা মরুভূমি এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিউবিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীলনদের তীরবর্ত্তী ১২ হাজার বর্গমাইলব্যাপী ভূখণ্ড ব্যতীত বাকি সবই মরুভূমি।

মিশরে দেশীয় কৃষক (ফেলাহীন্) ব্যতীত কপ্‌ট, আরব, গ্রীক, সিরীয়, তুর্ক, পারশী ও য়ুরোপীয়গণের বাস। মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

আধুনিক মিশরের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান মিশর আক্রমণ করেন; তাহার পর আল্‌বেনিয়ার মহম্মদ আলী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশরের উপর আধিপত্য করেন। তাহার পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্, দেউলিয়া মিশরাধীপের উত্তমর্ণগণকে সাহায্য করিবার অজুহতে মধ্যবর্ত্তিতা করিতে অগ্রসর হয়েন। তাঁহাদের চেষ্টায় খদিভ ইস্মাইল রাজ্যচ্যুত হইলেন। রাজ্যশাসনে শ্বেতাঙ্গের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল—তাঁহারাই প্রকৃত রাজা হইয়া দাঁড়াইলেন। আরবী পাশা শ্বেতাঙ্গের এই শাসন-কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিলেন না; বিদ্রোহের প্রলয়বিষাণ বাজিয়া উঠিল। বলপরীক্ষায় ইংরাজ টেল-এল-কেবীরের যুদ্ধে আরবী পাশার বাহিনীকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।
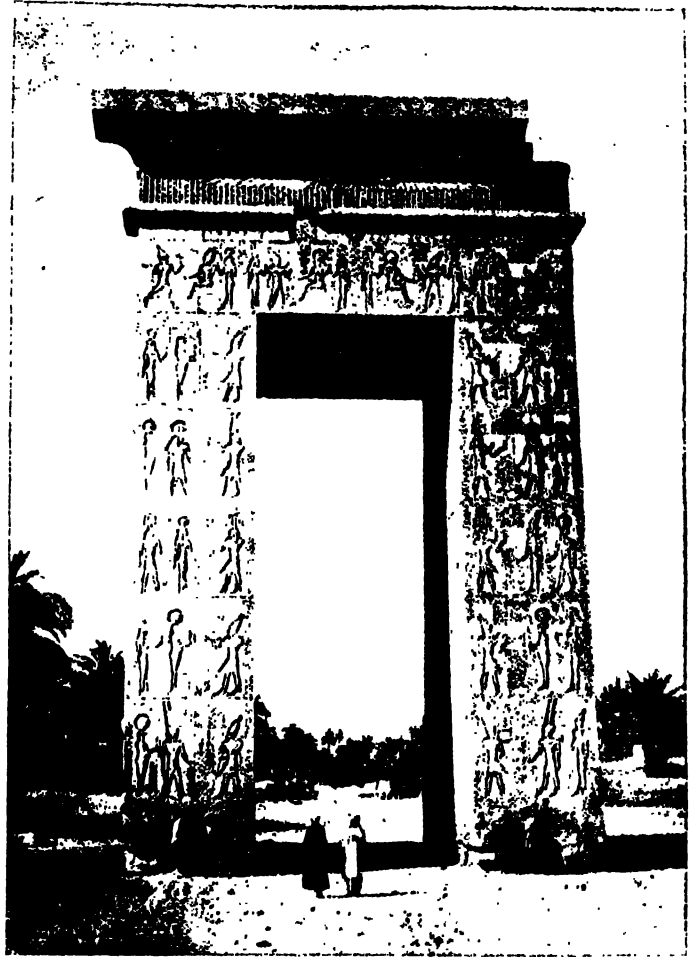
উল্লিখিত ঘটনার পর ৩৫ বৎসর ধরিয়া খদিভ মহম্মদ আলীর বংশধরগণ নামে মিশরের অধীশ্বর ছিলেন—কার্য্যতঃ কায়রোস্থিত বৃটিশ কনসল জেনারেল রাজ্যশাসন করিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড ক্রোমার কন্‌সল্ জেনারেল ছিলেন। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় মিশরের খদিভ আব্বাস হিল্‌মি তুরস্কের সহিত ভাগ্যসূত্রকে আবদ্ধ করিয়া আহবে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এক

দল তুর্ক সেনা মিশর হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্য গাজা অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু ইংলণ্ড সুয়েজ খাল পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ঐতিহাসিক সিম্পিচ বলেন, "ইংলণ্ড সুয়েজ খালকে তাঁহার সাম্রাজ্যের কণ্ঠনালী বলিয়া জানেন; নীলনদতট হইতে চলিয়া আসা তাঁহার আদৌ বাঞ্ছনীয় ছিল না; কাজেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন, মিশর ইংলণ্ডের অধীন সামন্তরাজ্য।"

ইহার পর রঙ্গমঞ্চে নূতন দৃশ্যপটের আবির্ভাব হইল। য়ুরোপের রণক্ষেত্রে কামানের ধ্বনি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশর একটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিল। স্বাধীনতার জয়ধ্বজা উড়াইয়া মিশরবাসী বলিয়া বসিল, তাহারা কাহারও অধীন নহে। তাহার দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়া য়ুরোপ কেন, সমগ্র প্রাচীও যেন চমকিয়া উঠিল। ঐতিহাসিকের কথায়—"মিশরের জাতীয় জীবন-স্পন্দন—অধীনতার শৃঙ্খল ফেলিয়া দিয়া উন্নতশীর্ষে জন্মগত দাবীর অধিকারলাভে কৃতসঙ্কল্প মিশরবাসীর আকস্মিক উত্তেজনা দর্শনে বিশ্ব বিস্ময়-বিমূঢ় হইল; ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ মিশরের দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। আহমেদ্ ফয়েদ্‌কে মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে হইল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যও প্রকাশ্যভাবে নীলনদের উপকূলবাসীদিগকে নূতন জাতিরূপে অভিনন্দনও করিলেন।"

এতকাল পর্য্যন্ত মিশর অর্থনীতিব্যাপারে অনেকটা উদাসীন ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। পশ্চিম-য়ুরোপের সহিতই তাহার যাহা কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল। গ্রীক, ইতালীয় ও অষ্ট্রীয়গণ এতদিন মিশরের শ্রম শিল্পসংক্রান্ত বাণিজ্য ব্যবসায় হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিল। কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় তাহাদের বড় বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপিত। এখন মিশরীয়দিগের আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হইতেছে। কায়রো হইতে জেরুসালেম্ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় মিশর এবং সমগ্র আফ্রিকার সহিত প্রাচীন তুরস্ক-সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে চলিয়াছে। সমগ্র য়ুরোপের সহিতও ইহাতে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে সমুদ্রপথে স্মার্ণা ও ইস্তাম্বুলে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত, অধুনা আলেকজান্দ্রিয়া ও সৈয়দ বন্দর হইয়া সেই বাণিজ্য-পণ্য আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমদানী ও রপ্তানী করা চলিবে।

কায়রোর রাজপথ।

ঐতিহাসিক সিম্পিচের মতে য়ুরোপের মহাযুদ্ধের ফলে মিশর বহু অর্থ লাভ করিয়াছে। গ্যালিপলি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ইংরাজ-বাহিনী বিশ্রামার্থ মিশরেই আশ্রয় লইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড এবং ভারতবর্ষ হইতেও দলে দলে সৈনিকগণ শিক্ষার্থ মিশরে সমবেত হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয় পলাতকগণ তথায় আশ্রয় লইয়াছিল; জেরুসালেম ও জাফার জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকগণকে মিশরে নির্ব্বাসিত করা হয়। সহস্র সহস্র যুদ্ধবন্দীকে এই স্থানেই আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। শুধু কায়রোর কারাগারস্থ হাঁসপাতালেই ১২ হাজার আহতের জন্য শয্যা নিরূপিত হইয়াছিল।

এখন আলেকজান্দ্রিয়ার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। যুদ্ধের সময় সালোনিকা, মেসোপোটেমিয়া এবং জার্ম্মাণ পূর্ব্ব-আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযানের উপযোগী যাবতীয় রসদের ভাণ্ডার এই স্থানেই খোলা হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেমে অভিযানকালে আলেনবীর অধীন ২ লক্ষ ৬০ হাজার বৃটিশ ও ভারতীয় সৈনিক ছিল। পরবৎসর সিরিয়া অভিযানকালে মিশরীয় বাহিনীতে ৫ লক্ষ সৈনিক ও ২ লক্ষ ৬০ হাজার পশু ছিল। এই বিরাট বাহিনীর খাদ্য যোগাইতে প্রত্যহ ২ লক্ষ ডলার মুদ্রা খরচ পড়িত। সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মিশর হইতেই সংগৃহীত হইত। ইহাতেই মিশরীয়গণ বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল।

লেখক মিশরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গগণ সাধারণতঃ কৌতূহলতৃপ্তির জন্য মিশরে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। পরিব্রাজক বাহিরের দৃশ্যই দেখিয়া থাকেন; ভিতরের সন্ধান বড় একটা রাখেন না। অধিকাংশ ব্যক্তি এ যাবৎ পরিব্রাজকের দৃষ্টিতেই মিশরকে দেখিয়াছেন—তাঁহাদের অভিজ্ঞতার মূল্য ঐটুকু। লেখক বলেন—"প্রকৃতপক্ষে প্রতীচ্যগণ মিশরের কতটুকু জানেন? মিশরবাসীদিগের সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু? কান্টারার এক রাত্রির কথা আমার মনে আছে। এখন যে স্থানে ভাসমান সেতু বিদ্যমান, সেই দিন সন্ধ্যায় আমি তথায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেই সময় একটি ক্ষীণাঙ্গী, ঋজুদেহা, নীলনদকূলবাসিনী রমণী আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহার নগ্নপদ, মস্তকে 'গাগরী'। সন্নিহিত কূপ হইতে পানীয় আহরণের জন্য সে
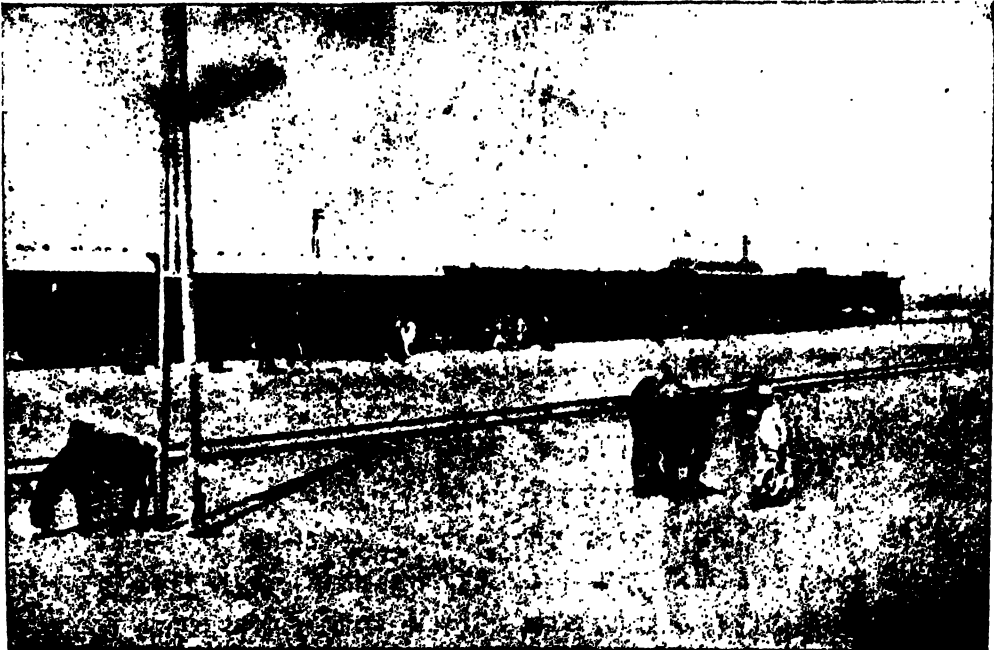
মিশর হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের একটি ষ্টেশনের দৃশ্য।

সয়দ বন্দরের আরব বালকদল।

আসিয়াছিল। তাহার গতিতে একটা স্বচ্ছন্দ গর্ব্ব ও স্বাধীনতা যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। বেশ-ভূষা দেখিবামাত্র বুঝিলাম, সে মুসলমানরমণী। নয়নযুগল ব্যতীত তাহার সমগ্র আনন অবগুণ্ঠনাবৃত ছিল। সহসা রমণী একবার আমাদের প্রতি চাহিল। কিন্তু সে চক্ষু কি সুন্দর! 'পল্লবঘন' নয়নের দীপ্তি যেমন উজ্জ্বল, তেমনই মধুর। এমন নয়ন পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের রমণীতে নাই—থাকিতে পারে না। প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভ্রূ যেরূপ, এই রমণীতেও ঠিক তাহাই দেখিলাম। আমার সহচর আমার কানে কানে বলিলেন, 'পিরামিডে রমণীদিগের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছ, এই রমণী যেন তাহারই প্রতিকৃতি। এ রমণী যুবতী ও সুন্দরী, কিন্তু ৬ হাজার বৎসরের পুরাতন মুখশ্রী ও গঠন ইহার দেহে দেখিতে পাইতেছি।' কথাটা খুবই সত্য। সে অবশ্যই সুন্দরী; কিন্তু প্রাচীন যুগের মন্দির-প্রাচীরে যেরূপ নারী-চিত্র ক্ষোদিত দেখিয়াছি, তাহার সহিত এই নারীর কি অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য।"

সিম্পিচ বলেন যে, নীলনদের তীরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া জগতের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের দৈহিক গঠন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। আধুনিক যুগের 'ফেল্লা' যখন হাতুড়ী ও বাটালী সহযোগে কার্য্য করে, অথবা নীলনদে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে, তখন তাহার দেহ ও মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, 'ফারায়ো'র যুগের চিত্রিত মিশরীয়দিগের সহিত তাহার দেহাকৃতি ও আননের কোনও পার্থক্য নাই। খৃষ্টজন্মের ৫২১ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য মিশর-বিজয় করেন। সেই সময় হইতেই মিশরীয়দিগের রাজত্বকালের অবসান হয়। ফারায়োদিগের আমলে 'ফেল্লা'দিগের মনোবৃত্তি যেরূপ ছিল, পারস্য, মাসিডোনিয়া, রোম, আরব, মামিলিউক, তুরস্ক ও বৃটেনের অধীন থাকিয়াও তাহাদের সে মনোবৃত্তির কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ফারায়োদিগের শাসনকালে যেমন দাসভাবাপন্ন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। মিশরের জনসংখ্যা আপাততঃ ৯০ লক্ষ। উহার ৫ ভাগের ৪ ভাগ লোক প্রাচীন জাতির বংশধর।
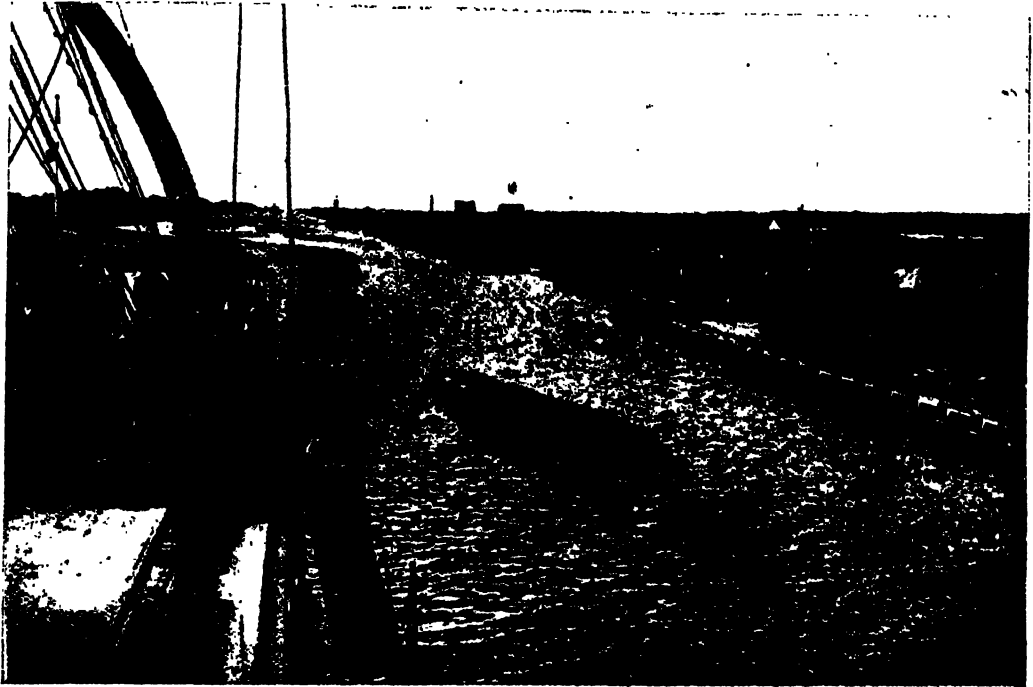
কান্টারার সুয়েজ খালের দৃশ্য।

'ফেল্লা'রা আরব-ভাবাপন্ন। উহাদের ভাষাও আরবী। উপাসনাকালে উহারা মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া উপবেশন করে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ফেল্লাগণকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। উহাই যেন তাহাদের নিয়তি। নীলনদের সন্নিহিত প্রদেশসমূহে পর্য্যটনকালে দর্শক দেখিতে পাইবেন, ৭।৮ বৎসরের বালক অথবা বালিকা মাঠের দিকে বলীবর্দ্দ লইয়া চলিয়াছে, পিতা লাঙ্গল দিয়া জমী চষিতেছে। বালক-বালিকারা ছাগমেষও চরাইয়া থাকে, তাহাদিগকে তুলাক্ষেত্র হইতে তুলা সংগ্রহও করিতে হয়।

নীলনদ যেমন মিশরের সৌভাগ্য-দ্যোতক, আবার কমলে কণ্টকের মত উহার কর্দ্দমরাশি তেমনই মিশরীয়দিগকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে। জলপ্রবাহকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই কর্দ্দম তুলিয়া ফেলিতে হয়। এজন্য লক্ষ লক্ষ মিশরীয়কে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বড় বড় তালুকে, ক্ষেত্রে জলসেচের জন্য কলের 'পাম্প' আছে বটে, কিন্তু ইদানীং 'গ্যাসোলিনে'র অভাব বশতঃ অনেকের পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বল্পবিত্ত কৃষকগণ তাহাদের ক্ষেত্রে 'শাডফের' সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া সেচের কার্য্য চালাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে এই প্রণালীতে কূপ বা জলাশয় হইতে জল উত্তোলিত হয়। বিহার প্রদেশে এই প্রণালীকে 'লাঠা বালতি' বলিয়া থাকে।

মিশরে ভাগে জমী বিলি হইয়া থাকে। জমীর মালিক দুই বা তিন বৎসরের জন্য জমী বিলি করিয়া থাকে। শস্যের বীজ ও চাষের জন্য উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ বা মহিষ সেই সরবরাহ করে। ফশল উৎপন্ন হইলে সে তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তুলা, ইক্ষু, যব ও ধান্য প্রভৃতি মিশরে পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীনকাল হইতেই রোমের জন্য মিশর তুলা উৎপাদন করিত।

কৃষিক্ষেত্রে চাষের জন্য প্রধানতঃ বলীবর্দ্দ, উষ্ট্র এবং জল-মহিষের সাহায্য গৃহীত হইয়া থাকে। অশ্ব এবং গর্দ্দভ সহরবাসীদিগের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিলেই হয়। মহিষের দুগ্ধের উপর কৃষকগণকে নির্ভর করিতে হয়। গো-দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। গরুর অপেক্ষা মহিষের পীড়াও অল্প।

মিশরীয়দিগের জীবনযাত্রার প্রণালীতে আরবদিগের প্রভাব সুস্পষ্ট। একাধিক বিবাহের আদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকিলেও সাধারণতঃ কোনও ফেল্লা একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। এক জন পত্নীর খরচ যোগাইতেই তাহার প্রাণান্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামেই কফি পানের দোকান আছে। কায়রো নগরে যেমন কফিখানায় ভাড়া-করা পত্রলেখক, গায়ক, সাপুড়ে, ফকীর এবং নর্ত্তকী দেখিতে পাওয়া যায়, পল্লীর কফিখানাতেও তাহার অভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাদের কাহিনী, নৃত্য, সঙ্গীত সবই চির-পুরাতন। সহস্র বৎসর ধরিয়া লোক একই কাহিনী একই ভাবে শুনাইয়া আসিতেছে। একই ভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত চলিয়া আসিতেছে। রামেসিসের সময় যেমন ছিল, এখনও তাহাই আছে। এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই। য়ুরোপীয়দিগের নিকট কাযেই ইহাতে কোন বৈচিত্র্য অনুভূত হয় না।

বড় বড় নগরে আমোদ-প্রমোদে বৈচিত্র্য আছে। সার্কাস, বায়স্কোপ প্রভৃতির ব্যবস্থা তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। নবযুগের মিশরীয়গণ নানাপ্রকার ক্রীড়ায় দক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

মিশরে এখন নবযুগের অভ্যুদয়। সমগ্র দেশের মধ্যে জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দিগ্গণের ধারণা যে, অদৃষ্টবাদী, নিম্নশ্রেণীর ফেল্লাদিগের মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইলেও উহার গতি অতি মৃদু। ফেল্লারা এখনও তাহাদের মাটীর কুটীর, মৃন্ময় পাত্র, টীনের কানাস্তারা এবং খড়ের মাদুরেই তৃপ্ত থাকিতে চাহে। শত শত বৎসরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার প্রণালী তাহাদের এমনই অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে যে, তাহাদের পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য নহে। পূর্ব্বপুরুষগণ ঝুড়িতে মাটী বহন করিত বলিয়া কোনও ফেল্লা ঠেলাগাড়ীতে মাটী বোঝাই করিতে সম্মত হয় না। পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা কখনও করে নাই, এখন তাহারা সে কার্য্য কিরূপে করিবে? বসন্তের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য টীকা লওয়া, অথবা স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনের তাহারা ঘোর বিরোধী। তাহাদের ধারণা,

গাগরী মাথায় লইয়া মিশরীয় নারীরা জল আনিতে যাইতেছে।

এ সকল কার্য্য পাপজনক। তাহারা অদৃষ্টবাদী—তাহাদের বিশ্বাস, আল্লা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ হইবে। কেহ যদি অপরের উষ্ট্রের প্রতি বিষদৃষ্টিতে চাহে, তবে সে উষ্ট্র ত খঞ্জ হইবেই। সুতরাং মনে দুঃখ করিয়া লাভ কি? উহাই কিস্মত্—ভাগ্য!

মিশরে শতকরা ৪জন বালক-বালিকা কাণা। বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণ অনুসন্ধানফলে অবগত হইয়াছেন যে, অদৃষ্টবাদী পিতামাতার অবহেলা বশতঃই এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। কোনও পিতামাতাই সময় থাকিতে প্রতিবিধানের চেষ্টা করে না। শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২৭।

প্রকৃত মিশরীয় কাহারা, এ সম্বন্ধে নির্ভুল মীমাংসা করা কঠিন কার্য্য। ফারাহোদিগের আমল হইতে পাশাদিগের রাজত্বকালের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। মিশরের সরকারী লোকসংখ্যার বিবরণ-বহিতে মিশরীয়দিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ দেশীয়; দ্বিতীয়তঃ সিরীয় ও আর্ম্মেনীয়; তৃতীয়তঃ

'ভাডক' বা 'লাঠা বাল্‌তির' সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসেচ।

নীলনদের তীরবর্ত্তী ইক্ষুক্ষেত্র।

নীলনদ-তীরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে শস্যসংগ্রহের দৃশ্য।

মিশরের তুলাক্ষেত্র।

মিশরে বস্তাভরা তুলা ওজনের দৃশ্য।

৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ভগ্ননাসিকা স্ফিংক্সের মূর্ত্তি।

আধা বেদুইন্। ইহারা চাষও করে, মরুভূমিতেও বিচরণ করে। চতুর্থতঃ গৃহহীন বেদুইন্। ইহারাই প্রকৃত মরুবাসী বেদুইন্।

ইহারা ব্যতীত মিশরে অপরাপর বহু বৈদেশিক আছেন। ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় যেমন বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ছিল, এখনও তাহাই আছে। টলেমীর শাসনকালে তথায় গ্রীক প্রাধান্য ছিল; এখনও গ্রীকগণ যাবতীয় ব্যবসায়বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইতালীয়গণের প্রভাবও কম নহে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নীলনদের তীরে তীরে ফরাসী সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল; সেজন্য বিদেশীয় ভাষার মধ্যে ফরাসী ভাষার প্রচলনও পর্য্যাপ্ত

তুর্কগণ ৫।৬ শতাব্দী ধরিয়া মিশরে বসবাস করিয়াছিল বলিয়া, মিশরে আভিজাতসম্প্রদায় বলিলে প্রধানতঃ তুর্কগণকেই বুঝায়। মিশরীয়গণের সহিত এতদিন কোনও তুর্ক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই। সংপ্রতি তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কুসীদজীবীর কার্য্য সিরীয়গণ চালাইতেছে। প্রত্যেক নগর ও ব্যবসায়কেন্দ্রে সিরীয়গণ দলে দলে বিদ্যমান।

আর্ম্মাণী, সিরীয় ও কপট এই তিন সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। নামে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, আধুনিক কপটগণ আচার ব্যবহার, ভাষা ও ভাবে একেবারে মুসলমান। মুসলমান-রমণীর ন্যায় কপট নারীরা শুদ্ধান্তঃপুর-চারিণী। তাহাদিগের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতিও মুসলমানদিগের অনুরূপ।

লেন তাঁহার সুবিখ্যাত 'মডারন্ ইজিপ্সিয়ান্' গ্রন্থে কপটদিগের সম্বন্ধে বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহারা অত্যন্ত নীরবপ্রকৃতি, ধর্ম্মান্ধ, অর্থগৃধ্নু এবং ভণ্ড। সার জন্ বোরিং কিন্তু অত কঠোর সমালোচক নহেন। তাঁহার মতে, যদিও তুর্কগণ কপট সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলিয়া হতশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তথাপি ইহারা বিনয়ী, শান্তিপ্রিয় এবং বুদ্ধিমান্। লিখন-পঠন কার্য্য কপটদিগের একচেটিয়া। লর্ড ক্রোমার ইহাদিগের বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে, মুসলমান-দিগের সহিত কপ্‌ট্‌দিগের পার্থক্য অতি সামান্য। মুসলমানরা মসজেদে নমাজ পড়িয়া থাকে, কপ্‌টগণ গির্জ্জায় ধর্ম্মোপাসনা করিয়া থাকে, এই মাত্র প্রভেদ। মিশরীয় মুসলমান অপেক্ষা কপ্‌ট অধিকতর বুদ্ধিজীবী। হিসাবপত্র রক্ষা, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে কপ্‌টদিগের প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়।

সিরীয়গণ অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও শান্ত প্রকৃতি। য়ুরোপের ইহুদীদিগের মত তাহারা মিশরের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সহিত মিলামিশা করিয়া থাকে। ইহাদেরই হাতে রাজস্ব। রাজনীতিতেও ইহারা নীরবে যোগ দেয়। লর্ড ক্রোমার সিরীয়দিগকে প্রশংসা করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর সিরীয় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। তাঁহার মতে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন মিশরীয়দিগের মধ্যে সিরীয়গণই প্রধান।

মিশরের প্রাথমিক বিদ্যালয়।

'বারবার' সম্প্রদায় নীলনদতীরেই বসবাস করে। মিশরের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। ইহারা সাধারণতঃ নিউবীয় বলিয়া পরিচিত। বারবারগণ অত্যন্ত অলস ও কর্ম্মে অপটু, কিন্তু মিশরীয়দিগকে ইহারা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কোনও 'ফেলাহীনের' গৃহে ইহারা বিবাহ করিবে না। বহু শ্বেতাঙ্গ বারবারদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা না কি অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি। নির্ভর করিলে ইহারা প্রাণ দিয়া সে কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া দেয়। বালুময় ক্ষেত্রে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় না, এজন্য বারবারগণ নিম্নমিশরে যাইয়া দিনমজুরী করিয়া বৎসরের অধিকাংশভাগ জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও কায়রো নগরে বারবারগণ ভৃত্য, অশ্বচালক ও অশ্বপালকের কার্য্য করিয়া থাকে। নিউবীয়গণ পুরাকালে, ফারাওর সিংহাসনপার্শ্বে নগ্নমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ময়ূরের পালকের ব্যজনী হস্তে মক্ষিকা তাড়াইত; তাই এই নিউবীয় বারবারদিগকে নগরের সকলেই ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিতে চাহে।

মিশরে এখন নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক মিশরীয় অগ্রসর হইয়াছেন। কথায় কথায় সেখানে এখন ধর্ম্মঘট চলিয়াছে। মিশরীয় নারীরাও রাজনীতিক্ষেত্রে পুরোবর্ত্তিনী হইয়াছেন। স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহারা মিশরের মানচিত্রকে নূতন করিয়া আঁকিয়া তুলিতেছেন। ইস্তাম্বুলের আধুনিক তুর্ক মহিলাদিগের ন্যায় মিশরীয় নারীরা য়ুরোপের সাহিত্য ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞা। স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদিগের সহিত একযোগে আবেদন-নিবেদনে নামস্বাক্ষরও করিয়াছিলেন।
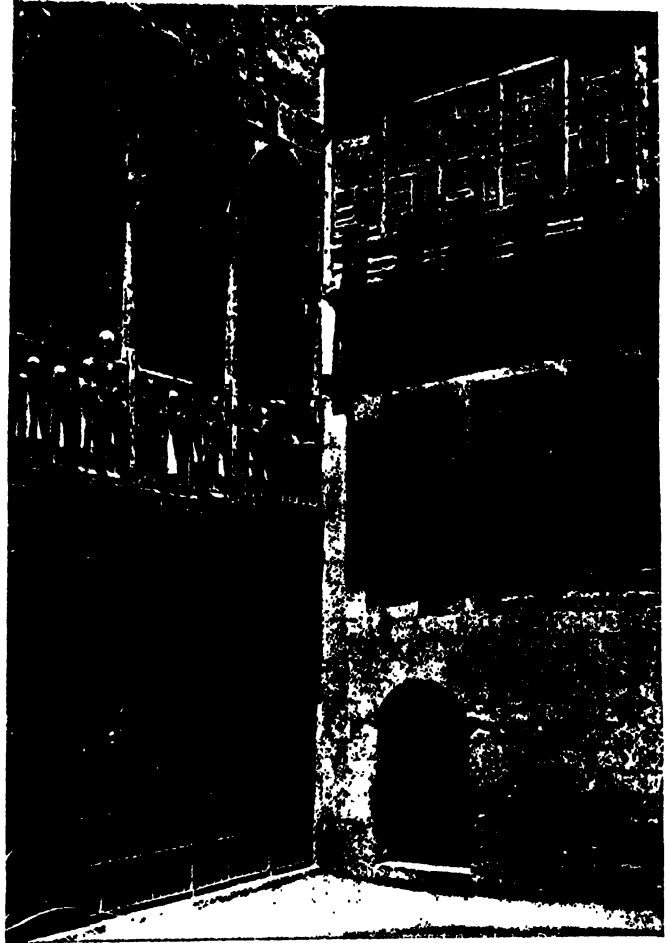
কায়রো নগরে সুপ্রসিদ্ধ 'আল-আজাহার' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। উহাই সমগ্র মুসলমানজগতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র এবং রাজনীতিক মতামতের পরিণতি ও পরিপুষ্টি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান

পরীক্ষার্থিগণ কোরাণের পরীক্ষা দিতেছে।

মিশর নিউবিয়ার দ্বিতীয় রামেসিসের খোদিত মূর্ত্তি।
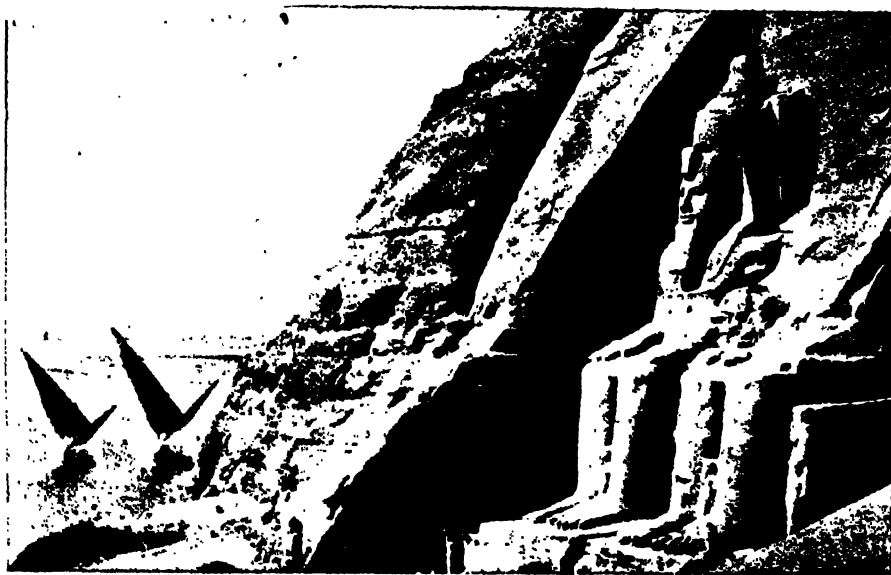
মিশরীয় কৃষক উষ্ট্র ও মহিষের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিতেছে।

কাফিখানায় মিশরীয়া গল্পগুজব করিতেছে।

মিশরী রমণী ; অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত, শুধু নয়নযুগল অনাবৃত।

থাকে। যাবতীয় নগরে মস্‌জেদ-গুলিতে রাজনীতি-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। প্রচারের কার্য্য মস্‌জেদ হইতেই ঘটিয়া থাকে। কপটগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও মস্‌জেদের মধ্যে তাহারা রাজনীতিবিষয়ে বক্তৃতা করিবার অধিকার পাইয়াছে।

সুদানের ভাবী অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ভাগ্যসূত্র মিশরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত। ফ্রেডরিক সিম্পস্ এক স্থলে লিখিয়াছেন, "১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মাহদীর উন্মত্ত জনগণ তীক্ষ্ণমুখ বর্শাফলকের সাহায্যে জেনারল গর্ডনকে হত্যা করিবার পর হইতেই সুদানের রঙ্গমঞ্চে সভ্যতা-নাটোর বহু উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যপটের আবির্ভাব হইয়াছে। বাগদাদ, আফগানিস্থান এবং নিষিদ্ধ নগরীর ন্যায় সুদানের বর্ণনীয় ক্ষেত্রে বহু অদ্ভুতসাহসিকতাপূর্ণ ঔপন্যাসিক ঘটনার উদ্ভব ঘটিয়াছে।"

সুদানের তুলাক্ষেত্র সুপ্রসিদ্ধ। বৃটিশসাম্রাজ্যের অন্য কোন স্থলে এত তুলা উৎপন্ন হয় না। প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল ক্ষেত্রে তুলার চাষ হয়। সুদানের লোকসংখ্যা কত, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে মোটের উপর এই প্রদেশের জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ হইতে পারে। প্রত্যেক ১০ হাজার বর্গ মাইলে এক জন করিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আছেন। তাঁহারা সুদান ও মিশরের লোকদিগের সাহায্যে শাসনসংরক্ষণের কার্য চালাইয়া আসিতেছেন।

সুদানের উত্তরাঞ্চলে মিশ্র আরবজাতীয় লোক বসবাস করে। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মোটের উপর এতদঞ্চলের জনসংখ্যা পরিমাণে কম। মিশর-সীমান্ত হইতে দক্ষিণভাগে ৬ শত মাইল রেলযোগে যাইবার পর প্রথম নগর খার্টুম। তথা হইতে নীলনদে ষ্টীমার চড়িয়া

ছাত্র অধ্যয়নার্থ এখানে আসে বটে, কিন্তু মিশরের ছাত্র-সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ফেলাহীনদিগের বংশধরই ছাত্রদের বেশী। এই সকল ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দেশমধ্যে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার বার্ত্তা প্রচার করিতে থাকে। তাহারই ফলে মিশর আজ দাসত্বের নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছে।

মিশরের দেশীয় সংবাদপত্রের প্রভাবও অসামান্য। কায়রো হইতে প্রকাশিত একখানি দেশীয় সংবাদপত্র ২০ হাজার সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। যাহারা লেখাপড়া জানে না, তাহারা প্রত্যহ অপরাহ্নে বাজারে সমবেত হয়, ছাত্রগণ তাহাদিগকে সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইয়া

১ হাজার মাইল অতিক্রম করিবার পর তবে সুদানের দক্ষিণ সীমায় উপনীত হওয়া যায়। এতদঞ্চলে হ্রদের বাহুল্য আছে।

সুদানের বিস্তৃত অরণ্যে বহুবিধ পশু আছে। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে একটি জীবকেও অন্যত্র লইয়া যাইবার উপায় নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ অবহিত। হস্তিদন্ত অথবা অষ্ট্রিচ পক্ষীর পালক লইবার জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। সুদান হইতেই প্রধানতঃ মিশরের মাংস সরবরাহ হইয়া থাকে। ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ বহুল পরিমাণে হইয়াছে। নিতান্ত নিভৃত ও দুর্গম প্রদেশ ব্যতীত দাসব্যবসায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খার্টুমের উত্তরাংশ প্রায় বৃক্ষলতাবর্জ্জিত বলিলেই হয়।

কৃষ্ণ রূপসী,—বিবাহের পরিচ্ছদে।

নীলনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রাচীনযুগের ভৌগোলিকগণ বলিতেন, গঙ্গা ও নীলনদ এসিয়ার উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী তুষারমগ্ন পর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূত। কল্পনাপ্রিয় লোক বলিত, চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত হইতেই নীলনদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নীলনদের দুইটি নাম ;- White Nile (শ্বেত-নীল) এবং Blue Nile (নীল-নীল)। ভিক্টোরিয়া নায়াঞ্জা (ভিক্টোরিয়া হ্রদ) এই নদের মাতৃভূমি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্পেক্ ও গ্রাণ্ট উহা আবিষ্কার করেন। সুদানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদ 'বাহার এল-গাজল্', 'সোবাট্', 'ব্লুনাইল' এবং 'আটবারা'র ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে।

নীলনদের তীরবর্ত্তী সুদানের অধিবাসীরা এমনই মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে "নিগ্রো" আখ্যা দেওয়া হয়।

নীলনদের জলকণা সংপৃক্ত উর্ব্বর ভূমির ঐশ্বর্য্যের লোভে বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু জাতি এতদঞ্চলে আপতিত হইয়াছে। ইহার ফলে বহু ভাসাভাসা লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা মুসলমানধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিয়াছে। জনৈক ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন, "সুদানের দেশীয় লোকেরা গৃহস্থজীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইয়াও পর্য্যটনের বিশেষ পক্ষপাতী। শুধু মনুষ্যমাংসের লোভে মানুষ-শিকার পৃথিবীর আর কোনও দেশে আর কোনও জাতি এত দিন পর্য্যন্ত করে নাই। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই ইহারা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অপরিচিতা নারীর প্রতি ইহাদের লোভ এত অধিক যে, সলোমনকেও ইহাদের কাছে হার মানিতে হয়।"

কায়রো'র সরবৎবিক্রেতা ;—সুন্দরী গৃহিণী স্বয়ং সরবৎ কিনিতেছেন।

প্রকৃত আরবগণকে সুদানের উত্তরাংশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের সকলেই আরবী ভাষা গ্রহণ না করিলেও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সঙ্করজাতি আপনাদিগকে আরব বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। সুদান মিশরের অন্তর্ভুক্ত বটে; কিন্তু নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অপর্য্যাপ্ত। সুদানবাসীরা মিশরীয়দিগকে আদৌ পছন্দ করে না। উভয় জাতি নীলনদতীরে বাস করিয়া থাকে; উহাই তাহাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন। সংপ্রতি সুদানে—নীলনদে বাঁধ দেওয়া হইতেছে বলিয়া মিশরবাসিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। ফেলাহীনদিগের আশঙ্কা হইয়াছে যে, এতদ্দ্বারা তাহাদের জন্মগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিশরে অত্যন্ত জলাভাবণ এই বাঁধ নির্ম্মিত হওয়াতে মিশরে জলকষ্ট ঘটিবারও সম্ভাবনা। গ্রেট বৃটেন ও মিশর যুক্তভাবে সুদানের কর্ত্তা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইংরাজই সুদানের শাসক।

ফ্রেডরিক সিম্পিচ লিখিতেছেন, "নূতন স্বাধীনতার রসাস্বাদনে উৎফুল্ল মিশরবাসীরা নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে

সুদানের নারী। পূর্ব্বে ইহারা ক্রীতদাসী হইয়া মিশরে আসিত; কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

অবতীর্ণ হইয়াছে। দিন দিন মিশরের কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি, রেলপথের প্রসার ও সেচের খালের সুবন্দোবস্ত হওয়াতে মিশর সমগ্র জগতে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। য়ুরোপীয়ভাবে অনুপ্রাণিত মিশরীয়গণ দেশের শাসনকার্য্যের কর্ণধার। দীর্ঘকাল ধরিয়া ফরাসী ও ইংরাজের শিষ্যত্ব করিয়া মিশরবাসী দেশ-শাসনে দক্ষতা দেখাইতেছে। এ বিষয়ে তাহারা পারস্য বা তুরস্কের অগ্রগামী। শিক্ষাপ্রচার, রেলপথ বিস্তার, সেচের খাল খনন, সংবাদ-পত্র পরিচালন প্রভৃতি ব্যাপারে মিশরীয়গণ তুর্কীকে অতিক্রম করিয়াছে। কায়রো ও লণ্ডনে মিশরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে লোক প্রধানতঃ তত্রত্য রাজনীতি ও কৃষিকার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন; কিন্তু অধিকাংশ মার্কিণ মিশরকে সে ভাবে দেখেন না। তাঁহাদের নিকট মিশর স্ফিংক্সের বাসভূমি—চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরের বালু-প্রান্তরে বিরাট-মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, সেই দৃশ্যই মার্কিণের মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে সে কালের পথচারী দরবেশের স্মৃতি! মিশর 'মমি'র দেশ, দলে দলে উষ্ট্রারোহী পান্থ মরুরাজ্য অতিক্রম করিতেছে। মিশর শ্বেত পরিচ্ছদভূষিত শেখের লীলানিকেতন। সুদূর অতীতে এই মিশরেই ইস্রায়েলের সন্ততিগণের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ঘটে—দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনার সূত্রপাত হয়!"

ফুক্‌সান

১

যে দিন মাঞ্চু সম্রাটবংশ হঠাৎ শিশির কর্পূরের মত উবিয়া গেল, সে দিন চীনবাসীদের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা বিদ্যুত্তরঙ্গ আঘাত করিয়াছিল। সেই প্রবল আন্দোলনের বাহ্যিক চিহ্ন বেণীমুণ্ডন। সেই যে মুণ্ডিতমস্তক চীনাম্যান আর মাথার মাঝখানে তিন চার হাত লম্বা কুণ্ডলিত বেণী, তাহা মাঞ্চু রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইল। ঘরে ঘরে, ঘরের বাহিরে স্তূপাকার সর্পাকৃতি পরিত্যক্ত বেণীরাশি। প্রয়াগে মাঘমেলায় মুণ্ডিত কেশের ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অধিকাংশ রুক্ষ, অযত্নরক্ষিত কেশ, এমন নাগিনীর মত বহুকালের বহু যত্নের বেণী নয়! সেই চকচকে কালো কালো সাদা সাদা বেণী যখন পরচুলা-ওয়ালাদের দোকানে ঢুকিল, তখন একটা মরসুম পড়িয়া গেল।

সেই গোলযোগে ফুক্‌সীনের অনেক কালের, অনেক সাধের তেল চুকচুকে বেণীও তিরোহিত হইল। কসাই-টোলার মোড়ে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে তাহার জুতার দোকান, গলির ভিতরে একটা ছোট দোতালা বাড়ীর গোটা দুই তিন ঘর ভাড়া করিয়া সে থাকিত। সে থাকিত দোতালায়, নীচে আর এক ঘর চীনাম্যানরা থাকিত। তাহারা সাঙ্ঘাই হইতে অল্প দিন আসিয়াছিল, স্বামী, স্ত্রী আর বৎসর দশেকের একটি ছেলে। দ্বিতীয় চীনাম্যানের নাম চিন্‌চিন। সে কয়েক বস্তা চীনের রেশমের থান, রুমাল, নকল পাথরের ফুলদানী, কাগজচাপা, বিকটাকার পুতুল, হাড়ের পাখা, কাগজকাটা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, ফেরি করিয়া বিক্রী করিত, কোথায় কোন্ পাড়ায় বিক্রয়ের সুবিধা, ফুক্‌সীন তাহাকে বলিয়া দিত। ফুক্‌সীনের ঘরে তাহার স্ত্রী আর বৎসর পনেরোর এক ছেলে। ছেলে বাপের সঙ্গে দোকানে বসিত, চামড়া কাটিতে, জুতা সেলাই করিতে শিখিতেছিল।

মাঞ্চু রাজা যাইবার দিন চীনামহলে বড় ঘটা। ফুক্‌সীন আর চিন্‌চিন একসঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়া বাজার করিয়া লইয়া আসিল: মুরগীর ডিম, মটন, আলু, ফরাসবীন, টমাটো কিনিল। ফুক্‌সীন সখ করিয়া এক জার চাটচাট লইল। সে দিন ত উৎসবে গেল, তাহার পরদিন হইতে ফুক্‌সীন ন্যাড়া মাথায় দোকানে বসিতে আরম্ভ করিল। যখন তখন অন্য-মনস্ক হইয়া মাথায় হাত বুলাইত আর মাথা যেন খালি খালি ঠেকিত। থাকিয়া থাকিয়া দোকানের একখানা আরসীতে মুখ দেখিত, মুখখানা কেমন বোঁচা বোঁচা মনে হইত। ফুক্‌সীনের আড়ালে বলিলে দোষ নাই যে, তাহাকে বেঁড়ে বেঁড়ে দেখাইত। চিন্‌চিন পাড়ায় পাড়ায় হাঁকিয়া বেড়াইত সিড়্‌ক, সিড়্‌ক খেড়ানা! ড় ল জ্ঞানটা ঐ রকম, ড়য়ের স্থানে ল আর লয়ের স্থানে ড় উচ্চারণ। তার বগলে বস্তা, কাঁধে ঝুলি, মাথায় হাত বুলাইবার অবকাশ হইত না; সুতরাং বেণী বিরহে তাহার চেহারা কেমন হইয়াছে, সে বড় একটা বুঝিতে পারিত না।

২

মাঞ্চুবংশ গেল, মাঞ্চু-রাজকন্যাদের ছোট ছোট পুতুলের মত আদরের কুকুরগুলি গেল, মাঞ্চুবংশের প্রায় সমবয়সী ফুক্‌সীনের বেণী গেল, কিন্তু ফুক্‌সীনের চণ্ডু খাওয়া গেল না। সে অভ্যাসটা যেমন ছিল, তেমনই রহিল। বেলা একটা দুইটার সময়, রৌদ্রে যখন চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, ঠিক সেই সময় দোকানের একটা দরজা ভেজাইয়া দিয়া, লম্বা নল আর চীনে মাটীর ছোট কলিকা লইয়া ফুক্‌সীন চণ্ডু খাইতে বসিত। তাহার ছেলে সেই সময় বাড়ীতে খাইতে যাইত, হিন্দুস্থানী মুচি মিস্ত্রীরা জলপান ও তামাকু খাইত। সে সময় কোন খরিদ্দার আসিলে বড় একটা খাতির হইত না, সহরের গ্রাহকেরা সে সময় প্রায় আসিত না, আনাড়ী বিদেশী হইলে কখন কখন দোকানে ঢুকিয়া পড়িত। এক দিন পশ্চিম অঞ্চলের এক জন ভালমানুষ হাকিম ছেলেকে সঙ্গে করিয়া জুতা কিনিতে আসিলেন। ফুক্‌সীনের তখন চণ্ডু টানা প্রায় শেষ হইয়াছে, এক জন মুচি ঘটী করিয়া জল খাইতেছে। বাবু বলিলেন, সাহেব, এক জোড়া জুতা চাই।

ফুক্‌সীন প্রথমে কথা কয় না। মুচি জলের ঘটী রাখিয়া বাবুকে বসাইয়া, পায়ের জুতা খুলিয়া দিয়া, শু-হর্ণ দিয়া

এক জোড়া জুতা পরাইয়া দিল। জুতা পায়ে ফিট হইল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব, কত দাম?

ফুক্সীন বলিল, দশ রুপী।

বাবু ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া ফুক্সীন আবার বলিল, দশ টাকা।

— দশ টাকা? সাহেব, তুমি যে অনেক দাম বল্‌চ!

অনেক দর-দস্তুরের পর, দ্বিভাষী মুচির সাহায্যে জুতা জোড়ার দাম সাড়ে সাত টাকা নির্দ্ধারিত হইল। মুচি বাক্সে জুতা বাঁধিয়া দিল, বাবুর ছেলে বগলদাবা করিয়া বাপের সঙ্গে দোকানের বাহিরে গেল।

একটু পরেই ফুক্সীনের ছেলে আর চিন্‌চিনের ছেলে আসিয়া উপস্থিত। দুই জনের গায় ধূলা-কাদা মাখা, দুই জনেই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে। বাপ জিজ্ঞাসা করাতে ফুক্সীনের ছেলে বলিল, সে আর চিনচিনের ছেলে রাস্তা দিয়া আসিতেছিল, পথে কয়েকটা ছেলে মিলিয়া তাহাদিগকে মারিয়াছে ও কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। ফুক্সীন শুনিয়াই পথে ছুটিয়া বাহির হইল, তাহার দেখাদেখি আরও কয়েক জন চীনাম্যান দৌড়িয়া আসিল। পথে পথে কয়েকটি নিরীহ বালক খেলা করিতেছিল, তাহাদের দুই চারি জনকে ধরিয়া ফুক্সীন ও তাহার সঙ্গিগণ ঘা কতক বসাইয়া দিল। গোলমাল চেঁচামেচি শুনিয়া রাস্তার লোক জড় হইয়া গেল, লাল পাগড়ীওয়ালা পাহারাওয়ালাও গজেন্দ্রগমনে আগমন করিলেন। শেষে যখন জানা গেল যে, আসল দোষী বালকেরা ফেরার, আর উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে পড়িয়াছে, তখন গোল থামে। পাহারাওয়ালা বারিশূন্য মেঘের ন্যায় খানিক তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া মোড়ের মাথায় ফিরিয়া গেল।

৩

ফেরি করিয়া, মাল বিক্রয় করিয়া, চিন্‌চিন টাকা-কড়ি যাহা পাইত,আনিয়া ফুক্সীনের হাতে দিত। ফুক্সীনের ঘরে একটা ছোট লোহার সিন্দুক, চাবি তাহার স্ত্রীর কাছে। দোকানে জুতা বিক্রীর টাকা সেই সিন্দুকে থাকিত। ফুক্সীনের স্ত্রী গোলগাল, বেঁটে বেঁটে মানুষ, চেপ্‌টা নাক, সরু কোণ-টেপা চোখ। নীলবড়ী দিয়া রং-করা পায়জামা, তাহার উপর সেই রংয়ের একটা লম্বা জামা, পিঠের উপর লম্বা বিনুনী। চিন্‌চিনের স্ত্রীর বয়স কম, কিছু জানে শোনে না, সর্ব্বদাই ফুক্সীনের স্ত্রীর কাছে থাকিত। মাঝে মাঝে ফুক্সীনের স্ত্রী তাহাকে সঙ্গে করিয়া লালদীঘিতে বেড়াইতে লইয়া যাইত, সে আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত।

এ বৎসর পূজার সময় ফুক্সীন প্রায় দু' হাজার টাকার জুতা বিক্রয় করিয়াছিল। চামড়ার দাম, মিস্ত্রীদের মাহিনা, বাড়ীভাড়া, সংসার খরচ প্রভৃতি বাদ দিয়া তাহার কাছে প্রায় এক হাজার টাকা ছিল। তাহার পর শীতকালে ঘোড়দৌড়ে বাজীতে দুই তিন শো টাকা জিতিয়াছিল। রাত্রে তোপ পড়িবার আগে দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ীতে গিয়া চণ্ডু টানিয়া সে আলনাশকরের মত খেয়াল দেখিত, আর তাহার স্ত্রী পা ছড়াইয়া বসিয়া মুগ্ধনেত্রে, অপরিমিত তৃপ্তিতে সেই সকল কাহিনী শুনিত।

ফুক্সীন বলিত, আমার কাছে প্রায় দেড় হাজার টাকা আছে। আমার দোকানের পাশে গচর দোকান ভাল চলে না, সে বেচে দেশে যেতে চায়। তার কাছ থেকে পাঁচ শো কি সাত শো টাকা দিয়ে তার দোকান কিনে নেব। দুই দোকানই আমি নিজে দেখব। আর বছর পূজার সময় দুই দোকান থেকে দুই হাজার, না, তিন হাজার, চার হাজার টাকা হবে। ঘোড়দৌড়ে আরও পাঁচ শো টাকা জিতব। তার পর দুটা দোকান চার হাজার পাঁচ হাজার টাকায় বেচে ফেলে দেশে চ'লে যাব। আমাদের ঘর প'ড়ে গিয়েছে, আবার তৈরি করব। পাশে সেই যে চায়ের ক্ষেত আছে, সেইটে কিনব। চায়ের ফসল ক'রে বাজারে চা ছাড়ব। ফুক্সীনের চা! সাংহাই পাঠাব, ক্যাণ্টন পাঠাব। ক্ষেতের পাশে বাজীর কারখানা করব। চীনা পটকা! ফুক্সীনের পটকা! এই কলকাতাতে পাঠাব, কালীপূজার সময় লাখো লাখো পটকা ছুড়বে। ফুক্সীনের পটকা! বাণ্ডিলের উপর নাম লেখা থাকবে। ফুক্সীনের চা, ফুক্সীনের পটকা! বাড়ী বড় ক'রে তৈরি করব, চাকর চার জন, চাকরাণী তিন জন। মোটর রাখব, হাঁ, আমি মোটর কিনব। ফুক্সীনের চা, ফুক্সীনের পটকা, ফুক্সীনের মোটর! রোজ বিকেলবেলা মোটর চেপে হাওয়া খেতে যাব।

ফুক্সীনের স্ত্রীর ফালিপানা চোখ কিছুতেই বড় হয় না,

যেটুকু সম্ভব ভ্যাব ভ্যাব করিয়া চাহিয়া, বিস্ময়ের আতিশয্যে বলিত, তুমি মোটর চড়্‌বে, তুমি? আর আমি?

—হাঁ, আমি মোটর চড়্‌ব, আমি নয় ত কি আর কেউ? তোমাকেও এক এক দিন নিয়ে যাব, রোজ নয়, না, রোজ তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে না। এখন ত আমার জুতার দোকান, এর পর দেখ। ফুক্‌সীনের চা, ফুক্‌সীনের পটকা, ফুক্‌সীনের মোটর!

ভোঁ-ও-ও করিয়া শব্দ করিয়া একখানা মোটর চলিয়া গেল।

—ঐ শোন, মোটরের আওয়াজ শোন!

—ও ত রাস্তার মোটর।

—আমার মোটরেরও ঐ রকম শব্দ হবে, ওর চেয়েও জোরে।

ফুক্‌সীনের স্ত্রী আবার এই সকল গল্প চিন্‌চিনের স্ত্রীর কাছে করিত, সে তাহার স্বামীকে শুনাইত। তাহারা ভাবিত, এমনতর একটা লোকের আশ্রয়ে তাহারা আছে, ইহা তাহাদের পরম সৌভাগ্য।

৪

ফুক্‌সীনের আগেকার সে মূর্ত্তি আর নাই। সে নেড়া-মাথা আর মাথার মাঝখানে ঢেম্‌না সাপের মত একটা প্রকাণ্ড লম্বা বেণী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন তাহার এক মাথা চুল, তাতে আলবার্ট ফ্যাশনে টেড়ি-কাটা, দিনে দশবার করিয়া চুলের কেয়ারী করে। পোষাকটা কিন্তু তেমনই আছে; সেই নীল রংয়ের ঢিলা পায়জামা, আর সেই রংয়ের ছোট চীনা কোট, মাথায় একটা হ্যাট। দিবাস্বপ্নগুলা দিন দিন প্রবল হইতেছিল। লোহার সিন্দুক খুলিয়া রোজ টাকা গণিয়া দেখিত, দেশে চিঠি লিখিয়া জমি-জরাতের দাম জানিত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় হ্যাংচ্যাং নামে এক জন চীনাম্যান ফুক্‌সীনের দোকানে আসিল। হ্যাংচ্যাং আর এক সহরে থাকে, সেখানে জুতার দোকান খুলিয়া বেশ উপার্জ্জন করে। দুই জনে পুরাতন বন্ধু। হ্যাংচ্যাংকে দেখিয়া ফুক্‌সীন ভারি খুসি, বলিল, চল, আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে খাবে।

হ্যাংচ্যাং বলিল, আচ্ছা, কিন্তু তার পর তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

হ্যাংচ্যাং পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দেখাইল।

ফুক্‌সীন বলিল, কত?

—গুণে দেখ।

ফুক্‌সীন গণিয়া দেখিল, দু'শো টাকা; কহিল, তোমার কত টাকা আছে?

দেয়ালে যেখানে তারে সারি সারি কাঠের গুলী সাজান ছিল, হ্যাংচ্যাং সেইখানে গিয়া গুলী চালা আরম্ভ করিল। গোটাকতক গুলী কখন ডানদিকে, আর গোটাকতক বাম-দিকে, কখন উপরের তারে, কখন নীচের তারে, খট্‌খট্ করিয়া খানিকক্ষণ গুলী নাড়াচাড়া করিয়া, হিসাব করিয়া কহিল, সাড়ে তিন হাজার টাকা।

ফুক্‌সীন বলিল, বেশ। এ দুশো টাকা কি হবে?

হ্যাংচ্যাং এক চোখ টিপিয়া বলিল, খেলা!

জুয়াখেলা! ফুক্‌সীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার অনেক দিন জুয়াখেলা হয় নাই। কহিল, আমি এবার ঘোড়দৌড়ে তিন শো টাকা জিতিয়াছি।

হ্যাংচ্যাং হাত নাড়িয়া কথাটা উড়াইয়া দিল।—ও কিছুই না, এ খেলায় অমন কত টাকা জিত্‌বে।

—কত টাকা নেব?

—আমি দুশো নিয়েছি, তুমিও দুশো নাও।

ফুক্‌সীন হ্যাংচ্যাংকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া গেল। ফুক্‌সীনের স্ত্রী হ্যাংচ্যাংয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইল। আহারাদির পর ফুক্‌সীন সিন্দুক হইতে দুশো টাকা বাহির করিয়া লইয়া হ্যাংচ্যাংয়ের সঙ্গে চলিয়া গেল।

৫

দুই জনে একটা চীনাম্যানের দোকানে ঢুকিল। যাহাকে কিউরিওর দোকান বলে, সেই রকম। চীনের, জাপানের সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ সাজান। কিম্ভূতকিমাকার পুতুল, ফুলদানী, দরজার পর্দ্দা, মুখস্, ছুরী কত কি। দোকানের ভিতর এক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, হ্যাংচ্যাং তাহাকে ইসারা করিল। সে একটা দরজা খুলিয়া

তাহাদিগকে আর একটা ঘরে লইয়া গেল, সেখানে একটা পর্দা তুলিয়া সরু গলির মত দেখাইয়া দিল। ক্ষুকসীন আর হ্যাংচ্যাং সেই গলি দিয়া গিয়া আর একটা হল কামরার মত ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে অনেকগুলা আলো, চারি ধারে ছোট ছোট টেবল। সেইখানে জুয়াখেলা হইতেছে। পনর কুড়ি জন খেলায় উন্মত্ত, দুই চারি জন নবাগতদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল, অনেকে মাথাই তুলিল না

একটা খালি টেবল দেখিয়া হ্যাংচ্যাং সেইখানে গিয়া বসিল, ক্ষুকসীন তাহার সম্মুখে বসিল। হ্যাংচ্যাং এক পকেট হইতে নোটের তাড়া, আর একটা পকেট হইতে এক-জোড়া পুরাতন ময়লা তাস, আবার একটা পকেট খুঁজিয়া পাশা বাহির করিল।

এই সময় এক জন হৃষ্টপুষ্ট চীনাম্যান তাহাদের সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। এই ব্যক্তি জুয়ার আড্ডার মালিক। হ্যাংচ্যাং জিজ্ঞাসা করিল, কত দিতে হইবে?

—দশ টাকা। —এ টাকাটা আড্ডার প্রবেশিকা ফী।

হ্যাংচ্যাং তাহার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিল, সে লইয়া চলিয়া গেল ক্ষুকসীন নিজের অংশ হিসাবে হ্যাংচ্যাংকে পাঁচ টাকা দিল।

দুই জনে তাস খেলিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম ক্ষুকসীন জিতিতে লাগিল। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, কুড়ি টাকা, পঞ্চাশ টাকা জিতিল। তাহার সম্মুখে নোটের তাড়া আরও উঁচু হইতে লাগিল। ক্ষুকসীন ভাবিল, তাহার ত জিতের পড়্‌তা, ঘোড়দৌড়ে যেমন জিতিয়াছিল, এখনও তেমনই জিতিবে। সে স্থির করিল, হ্যাংচ্যাংয়ের দুই শত টাকা জিতিয়া উঠিয়া যাইবে।

কিন্তু ক্ষুকসীনের গোফে তেল দিবার সময় তখনও হয় নাই। কাঁঠাল গাছে আর হ্যাংচ্যাংয়ের বাকি টাকা তাহার পকেটে। খেলার রং আস্তে আস্তে ফিরিতে লাগিল। হ্যাংচ্যাং যে পঞ্চাশ টাকা হারিয়াছিল, তাহা জিতিয়া লইল, তাহার পর ক্ষুকসীনের টাকার উপর টান পড়িল। তাহার নোটের তাড়া হইতে নোটগুলি একে একে সরিয়া হ্যাং-চ্যাংয়ের তাড়ায় জড় হইতে আরম্ভ হইল। ঘণ্টা তিন চার খেলার পর ক্ষুকসীনের টাকা ফুরাইয়া গেল।

হ্যাংচ্যাং বলিল, যদি আর খেলিতে চাও ত আমি ধার দিতে রাজি আছি।

ক্ষুকসীন শুষ্কমুখে খেলা ছাড়িয়া উঠিল; বলিল, আজ আর নয়, কাল্‌ দেখা যাবে।

তাহার পরদিন ক্ষুকসীন পাঁচ শত টাকা লইয়া গেল; সে টাকাও হারিল। চার দিনের মধ্যে ক্ষুকসীনের লোহার সিন্দুক খালি হইয়া গেল, চিন্‌চিনের দুই শত টাকা ছিল, তাহাও গেল। ক্ষুকসীনের কোথায় সে চুলের টেড়ি, কোথায় সে দাঁত বাহির করা হাসি! চণ্ড টানিয়া আর কিছুই হয় না, সে আরামের ঝিমকিনি আর আসেই না। টাকা ফুরাইলে ক্ষুকসীন দোকানের মুচির কাছে কুড়ি টাকা ধার করিল। জুয়াখেলার নেশা তাহাকে তখনও ছাড়ে নাই।

সে রাত্রিতে কিন্তু হ্যাংচ্যাংয়ের দেখা নাই। ক্ষুকসীন খেলার আড্ডায় গেল, হ্যাংচ্যাংয়ের কোন চিহ্ন নাই। দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, হ্যাংচ্যাং? তাকে তুমি চেন না? সে কি আর আগের মত আছে? সে বেটা মহা জুয়াচোর!

খোঁজ, খোঁজ, ক্ষুকসীন সহরশুদ্ধ হ্যাংচ্যাংকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথায় হ্যাংচ্যাং! হ্যাংচ্যাং এত-ক্ষণে ড্যাং ড্যাং করিয়া সাগর পার হইয়া গিয়াছে!

৬

এ রকম একটা বিষম ব্যাপার ত গোপন করিয়া রাখা যায় না! ক্ষুকসীনের স্ত্রী টের পাইয়া, লোহার সিন্দুক খুলিয়া নোটের তাড়াগুলা অন্তর্দ্ধান হইয়াছে দেখিয়া, মাথা চাপ ড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। চিন্‌চিনের স্ত্রী তাড়াতাড়ি তাহা-সহিত সহানুভূতি করিতে আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর টাকাগুলিও গায়েব হইয়াছে। সে কাঁদিয়া গিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল।

ক্ষুকসীন যখন দোকান হইতে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল, তখন চিন্‌চিন্‌ তাহার অপেক্ষায় দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুকসীন আসিতেই সে তাহাকে বলিল, আমার টাকা কোথায়? আমার টাকা আমাকে [illegible] ফিরে দাও।

ক্ষুকসীন বলিল, আমি ত আর তোমার টাকা নিয়ে পালাই নি, কাল্‌ দোকানে যেও, দিয়ে দেব।

—দোকানে কেন যাব? আমি তোমাকে এইখানে

দিয়েছিলুম, আবার এইখানে চাই। আমার টাকা নিয়ে জুয়াখেলা হয়েছে! জোচ্চোর, পাজী, ঠগ!

ফকরুদ্দীন রাগিয়া বলিল, যাও, আমার নামে নালিশ করগে!

এই যে, নালিশ কর্‌ছি, বলিয়া তিন্‌চিন্‌ হুস্কের মত হইয়া, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া, পাউরুটী-কাটা একটা বাঁকা ছোরা আনিয়া ফকরুদ্দীনকে তাড়া করিল। ফকরুদ্দীন প্রাণভয়ে দোতালায় ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিল। সে রাত্রিতে ভয়ে তাহার খাওয়াই হইল না।

ফকরুদ্দীনের চায়ের ক্ষেতে চারা আজাইবার আগেই পঙ্গপালে খাইয়া সাবাড় করিল, পটকা তৈরি হইবার আগেই ফাঁসিয়া গেল, আর মোটরগাড়ীর টায়ার ফাটিয়া কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ইঞ্চকেপের খোঁচা
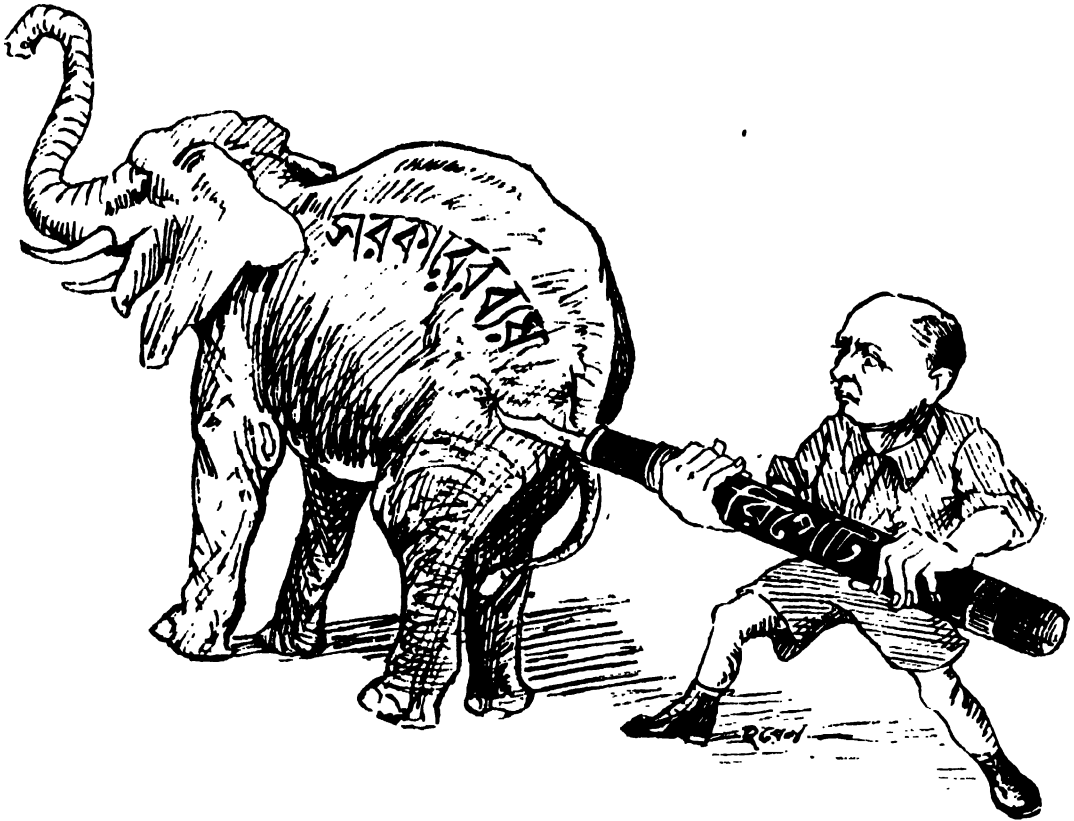
লর্ড ইঞ্চকেপ – কেমন খোঁচা!

সরকারী শ্বেতহস্তী—(হাসিয়া) – হাঃ! হাঃ! এক ফোঁটা রক্তও প’ড়ল না!

ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি

জার্ম্মাণীর মফঃস্বল

জার্ম্মাণদের শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ও সমাজের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত ভারতীয় পর্য্যটকগণ দলে দলে জার্ম্মাণীতে ও অষ্ট্রিয়ায় বেড়াইতে আসিতেছেন। এই সকল পর্য্যটকের মধ্যে ব্যবসায়ী, এঞ্জিনিয়ার চিকিৎসক, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক ও উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র প্রভৃতি নানা শ্রেণী ভারতসন্তানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বার্লিন অথবা ভিয়েনা দেখিলেই জার্ম্মাণ সভ্যতা ও সমাজ দেখা হয় না। এই সকল অতি বিশাল সহরে জার্ম্মাণ নরনারীর প্রকৃত জীবনধারা বুঝিয়া উঠা যারপরনাই কঠিন। জার্ম্মাণ জাতিকে যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার মফঃস্বলে কিছুকাল কাটান প্রয়োজন।

ব্যাভেরিয়া প্রদেশের সীমান্তে একটা ছোট সহর আছে। সেইটা পার হইয়া অষ্ট্রিয়ায় যাইতে হয়। সহরের নাম পাসাও। ইহার লোক সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক হইবে না। এই স্থানে ইন নদীর বিস্তার খুব অধিক, কিন্তু ডানিউব বা ডোনাও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে আর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আসিয়া মিশিয়াছে। এই নদীর জল কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভ, অধিকন্তু ডানিউবের সবুজ জলে ইনের ধূসর জল মিশিয়াছে। দুই পার্শ্বে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী। এই মনোরম প্রাকৃতিক আবেষ্টনে পাসাও অবস্থিত। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের মন্দির, মঠ, মোহান্ত এই স্থানে প্রতাপশালী। ভারতবর্ষে, চীনে ও জাপানে সকল সৌন্দর্য্যময় জনপদেই তীর্থক্ষেত্র ও ধর্ম্মকেন্দ্র দেখা যায়। জার্ম্মাণীর খৃষ্টানরাও সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রায় প্রত্যেক লীলাস্থলেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন।

নগর প্রাচীরের দৃশ্য।

পল্লীগ্রামের কৃষকরা পুরাতন কালের লাঙ্গল ও অস্ত্রাদি যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে। জার্ম্মাণীতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া জমীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়ান হইয়া থাকে। প্রায় সকল কৃষিক্ষেত্রেই সারের ব্যবহার প্রচলিত।

পাস্সাও

পাস্সাওয়ে "রাট্‌হাউসে" অর্থাৎ নগর-শাসকের কার্য্যালয়ে একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা আছে। বাড়ীটা বহুকালের পুরাতন। সংগ্রহালয়ে এই জনপদের নানাপ্রকার পুরাতন দ্রব্য রক্ষিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীর পল্লীবাসীরা জমীদার, নবাব বা সরদারদিগের নিকট হইতে কিরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার সাক্ষিস্বরূপ একখানি লিপি সংগ্রহশালায় বিদ্যমান। এই লিপির সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন তামিল-জনগণের সভার প্রথা তুলনা করা চলে।

আরামের সরঞ্জাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলা ৫০ বা ৭৫ বা ১ শত বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে ছিলই না। এই শত বৎসরের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি ও বিপ্লবগুলা বাদ দিলে হিন্দু-সভ্যতায় ও প্রতীচ্য সভ্যতায় বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পাস্সাওর সংগ্রহশালার মত মিউজিয়ম জার্ম্মাণীর প্রায় প্রত্যেক ছোট সহরে বা পল্লীতে আছে। এই মিউজিয়মগুলার মধ্যে অর্দ্ধঘণ্টাকাল যাপন করিলেও ভারতীয় পর্য্যটকগণ অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। জার্ম্মাণীর ঘরের কথা, জার্ম্মাণদের নারী জীবন, জার্ম্মাণ-সমাজের পারিবারিক অবস্থা, জার্ম্মাণ চাষীদিগের ধরণ-ধারণ জার্ম্মাণ-জাতির আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মজ্ঞান ও কুসংস্কার - এই সকল

জেৎসেছুস গির্জ্জা।
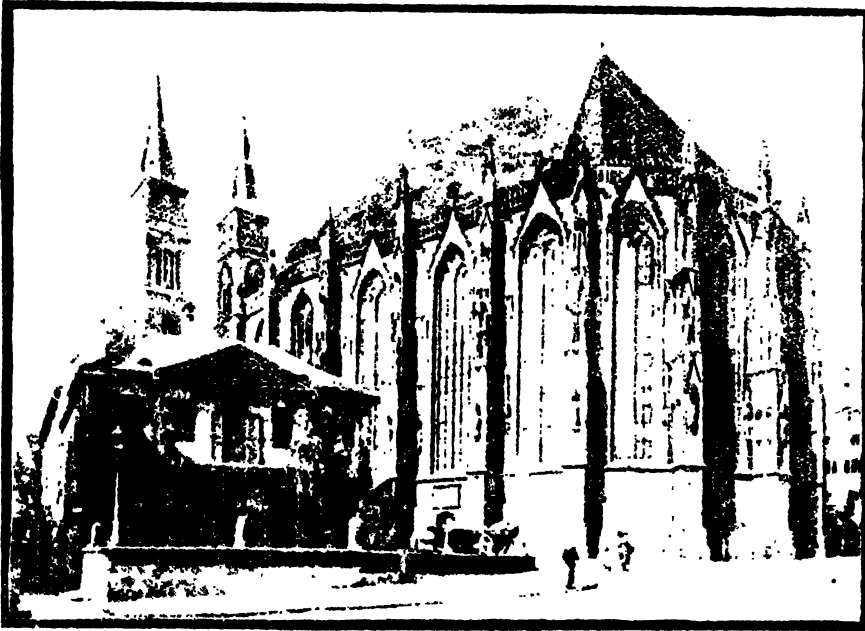
জার্ম্মাণীর পুরাতন পাল্কী, বজরা প্রভৃতি দেখিলেও মধ্য-যুগের ভারতের কথা মনে পড়ে। গৃহস্থালীর আসবাব-পত্র, রন্ধনশালার সরঞ্জাম, দোকানদারীর অনুষ্ঠান, ধান, গম প্রভৃতি মাপিবার পাত্র ও ওজন করিবার বাটখারা এ সকল দেখিলেও মধ্য-য়ুরোপের পল্লীজীবন ভারতীয় পল্লীজীবন হইতে বড় ভিন্নরূপ ছিল না। বাস্তবিক য়ুরোপের বড় বড় সহরে আজকাল যে সব নূতন যন্ত্র, নূতন কল, নূতন বিলাস, নূতন

না বুঝিলে জার্ম্মাণীকে বুঝা হয় না। এই সকল বুঝিবার একমাত্র বা প্রধান উপায়—জার্ম্মাণীর ছোট ছোট মিউজিয়মগুলি দেখা।

বার্লিন সহরে এই ধরণের একটি মিউজিয়ম আছে। সাধারণতঃ পর্য্যটকরা এই মিউজিয়মের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। ইহাকে ডয়চেস্ ফোলক্‌স মুজেউম বলে। এই সংগ্রহশালার মধ্যে জার্ম্মাণীর প্রত্যেক জিলার অশন-বসনের

সহকারিণের দণ্ড

ওজনচোরের দণ্ড
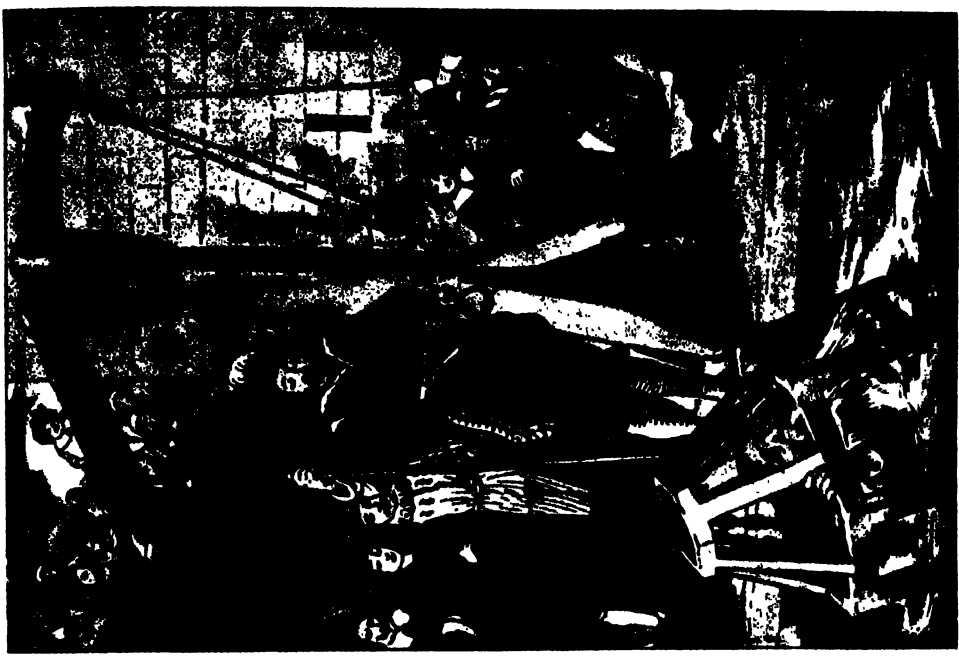
রীতি, বিবাহ-প্রথা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, চাষবাসের বৈশিষ্ট্য—এক কথায় জার্ম্মাণ-গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি সবই চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। যে সকল ভারতীয় পর্য্যটক সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সংগ্রহশালা বিশেষ মূল্যবান্।

নুর্ণবার্গ

ব্যাভেরিয়ার মধ্যস্থলে নুর্ণবার্গ প্রসিদ্ধ সহর। মিউনিকের পরেই ইহার স্থান নির্ণীত হইতে পারে। আজকাল এই সহরে প্রায় ৫ লক্ষ নর-নারীর বাস। নানা প্রকার শ্রেণীর প্রত্যেক ভারতবাসীর একবার নুর্ণবার্গ দেখিলে ভাল হয়।

জার্ম্মাণীর কারিগররা য়ুরোপের ও আমেরিকার সকল দেশের ছেলেদের খেলানা যোগাইয়া থাকে। নুর্ণবার্গ সেই খেলানা-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের ও আমেরিকার বালক-বালিকারা নুর্ণবার্গের খেলানা পাইত না বলিয়া কান্নাকাটি করিয়াছে।

মধ্যযুগের জার্ম্মাণ সভ্যতায় নুর্ণবার্গ অতি প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যূন ৩০টি গির্জ্জা সহরে বিদ্যমান এবং সেগুলির গঠন-রীতিও যার-পর-নাই চিত্তাকর্ষক। এই

নুর্ণবার্গের বাজার।
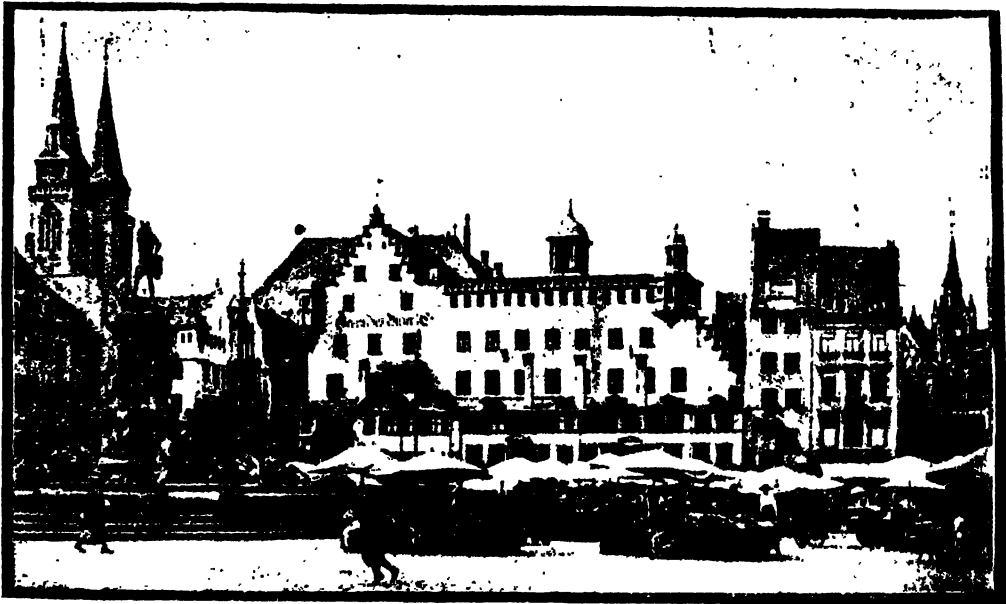
শিল্পের কারখানার চিমনীর ধূমে সহরটি সর্ব্বদাই কেমন মলিন বোধ হয়; দেখিলে বিলাতের লীডস্ কিংবা আমেরিকার পিটস্‌বার্গ বা ক্লিভল্যাণ্ড সহরের কথা মনে পড়ে। রাস্তাগুলা ঝরঝরে পরিষ্কার।

ভারতবর্ষে ফেবার কোম্পানীর পেন্সিল বিখ্যাত; সেই কোম্পানীর কারখানা এই সহরে। অবশ্য পেন্সিল প্রস্তুত করাই এ সহরের একমাত্র বা প্রধান কারখানা নহে। ব্যাপারী, ব্যবসাদার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক প্রভৃতি সহরের সাধারণ বসতবাটীগুলির গঠনেও একটা বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নুর্ণবার্গের বাস্তুরীতি জার্ম্মাণীর অন্যান্য সহরের বাস্তুরীতি হইতে পৃথক্। আর্কিটেক্ট বা বাস্তুশিল্পীরা নুর্ণবার্গ সহরে এক নূতন গৃহ-নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। বাড়ীর ছাতগুলা খাড়া ও উচ্চ কোণগুলা অতিশয় তীক্ষ্ণ।

নুর্ণবার্গের বাজারের চারিদিকের বাড়ীগুলা বহু চিত্রে সুকুমার শিল্পপ্রেমিকগণের নিকট সুপরিচিত হইয়া

রহিয়াছে। এই সহরের ফোয়ারা ও কূপগুলি মধ্যযুগের ভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে কূপগুলার কারুকার্য্য জগতে অদ্বিতীয়। সহরের চারিদিকের প্রাচীরের ও প্রাচীরের পার্শ্বস্থ খালে দিল্লীর মত ভারতীয় সহরের কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে রক্তাভ প্রস্তরের ব্যবহারবাহুল্য লক্ষিত হয়।

শিল্পগুরু ডুরেরর

প্রাচীন ভারতে এক প্রকার সুকুমার শিল্প কোন দিন প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ইংরাজীতে তাহাকে এচিং বলে। তামার পাতের উপর লোহার শলাকা খোদাই করিয়া চিত্র আঁকা হয়। পরে কালীর সাহায্যে কাগজের উপর তাহার ছাপ লওয়া হয়। কাগজের উপর যে ছাপ উঠে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন শিল্পী কলম তুলি বা কলম দিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই শিল্পের এক জন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ নিউর্ণবার্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম—আলব্রেক্ট ডুরের। সহরের কেল্লা বা রাজবাড়ীর অনতিদূরে ডুরেরের বাসভবন। তিনি যে ঘরে কায করিতেন এবং যে ঘরে খাওয়াদাওয়া করিতেন, সবই ৫ শত বৎসর ধরিয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। য়ুরোপের ও আমেরিকার শিল্পীদিগের পক্ষে ডুরেরের বাস্তভিটা তীর্থক্ষেত্র। কয়টি ঘরে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র ও এচিং সাজান রহিয়াছে।

ডুরেরের কৃত—ডার্ প্রেসে।

ডুরেরের শিল্পে চিড়িয়ার নক্সা দেখিতে পাই, ঘর বাড়ীর চিত্র অনেক, সহর, পল্লী, দুর্গ ইত্যাদিও আছে; লোকজনের মূর্ত্তি বাদ পড়ে নাই, বাইবেলসংক্রান্ত ধর্ম্মচিত্র ত আছেই। জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয় ধর্ম্মোপদেশের জন্য যে সব কেতাব প্রকাশিত আছে, সে সকলে ডুরেরের এচিংএর সাহায্যে [illegible] গল্প বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য জার্ম্মাণ-সমাজে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট ডুরের সুপরিচিত।

নিউর্ণবার্গ আর এক জন জার্ম্মাণ সুধীর জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। তাঁহার নাম—হান্স স্যাক্স। তিনি ব্যবসায়ে মুচি ছিলেন; কিন্তু কবিরূপে যশোলাভ করেন। স্যাক্স বহু গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। আজও জার্ম্মাণীর ও অষ্ট্রীয়ার বালক-বালিকারা সেই সকল গল্প জননীর নিকট বা পাঠশালায় শিখিয়া থাকে। স্যাক্স ডুরেরের সমসাময়িক। ইঁহারা একটা ভোজনশালায় আসিয়া খাওয়াদাওয়া ও খোসগল্প করিতেন। সেই ভোজনশালা বা রেষ্টরাণ্ট আজও পুরাতন কায়দায় চলিতেছে। তাহার উনান ভারতবর্ষের উনানের মত খোলা, অর্থাৎ ধূম বাহিরে লইয়া যাইবার

শারীরিক সাজার যন্ত্রপাতি।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ই ছোট ছোট সহরে, এমন কি, পল্লীগ্রামে অবস্থিত। আরলাঙ্গেন একটা নগণ্য পল্লীগ্রাম। এই গ্রামের নাম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নূৎসবুর্গ এইরূপ ছোট সহর; য়েনা এই ধরণেরই একটি নগণ্য নগর। অথচ এই সকল গ্রাম ও ক্ষুদ্র সহরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহই জার্ম্মাণীর দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনাকেন্দ্র। ৫ বা ৬ বা ৭ শত বৎসর ধরিয়া এই সকল জনপদের বিদ্যাপীঠ হইতে জার্ম্মাণীর জ্ঞানমণ্ডল জগতে সভ্যতা বিকীর্ণ করিতেছে। জার্ম্মাণ-সমাজে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানাচার্য্যগণ এই সকল কেন্দ্রেই অধ্যয়ন

জন্য চিমনি নাই। কাজেই ঘরের ভিতর ছাত ধূম-মলিন।

পল্লীগ্রামের জ্ঞানমণ্ডল

নিউর্ণবার্গের অল্প দূরে—রেলে প্রায় এক ঘণ্টার পথে আরলাঙ্গেন নামক একটা পল্লীগ্রাম বা ছোট সহর অবস্থিত। এই পল্লীগ্রামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ব্যাভেরিয়া প্রদেশে অর্থাৎ গোটা দক্ষিণ-জার্ম্মাণীতে মাত্র ২টি বিশ্ববিদ্যালয়—১টি মিউনিক সহরে আর ১টি আরলাঙ্গেন গ্রামে।

জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠিলেই একটা বিষয় সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হয়। বার্লিন, মিউনিক ও লাইপজিগ ছাড়া জার্ম্মাণীর আর
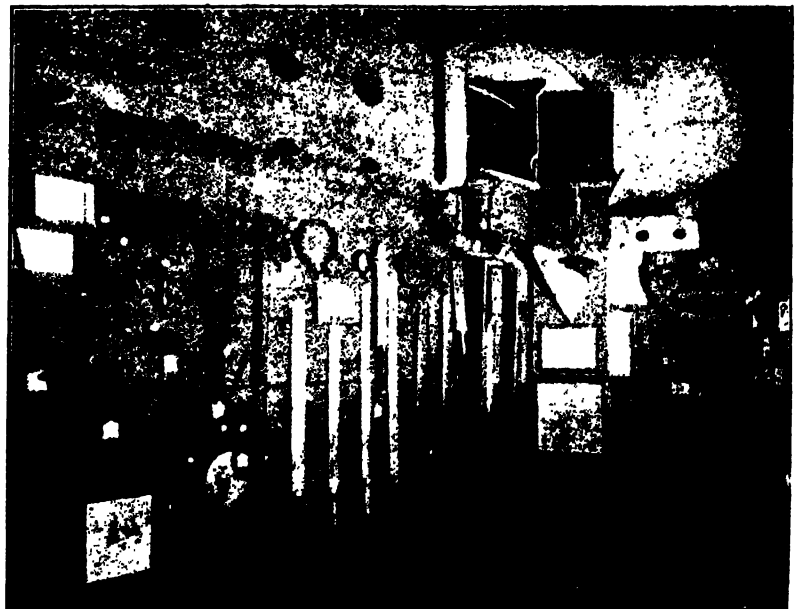
শারীরিক সাজার যন্ত্রপাতি।

ও অধ্যাপনা করিয়াছেন। এই কারণে জার্ম্মাণীর পল্লীগ্রামগুলির দিকে ভারতীয় পর্য্যটকদিগের দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

য়ুরোপের নির্য্যাতন দণ্ড

ন্যুর্ণবার্গের কেল্লায় বা ভেরিয়ার রাজা অনেক সময়ে বসবাস করিয়াছেন। রিপাবলিক বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কয় বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশের শেষ নরপতি ন্যুর্ণবার্গের "বুর্গ" বা দুর্গে অনেক রাত্রি কাটাইয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণ সম্রাট কৈশর এই দুর্গে সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। দুর্গাভ্যন্তরস্থ ঘরগুলি আড়ম্বরহীন—আরাম বা বিলাসের আসবাব একেবারেই নাই।

দুর্গের একাংশে কতকগুলি ঘরে এক অদ্ভুত সংগ্রহ দেখিলাম। ঘরগুলার নাম "ফোল্টার কাম্মার্" বা নির্য্যাতন ভবন। কয়েদী বা আসামীদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল; সে সকল এই জেলখানায় সংগৃহীত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড সচিত্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। দোকানদারেরা রুটী-মাংস বা আর কোন দ্রব্যও বিক্রয় করিবার সময় ওজনে জুয়াচুরি করিলে মধ্যযুগের য়ুরোপে তাহাদের জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগকে পাল্লার একদিকে ঝুলাইয়া জলে চুবান হইত। যে ওজনে যত চুরি করিয়াছে, ঠিক ততটা ভার তাহার ঘাড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ শাস্তির যন্ত্র এই কারাগারে দেখা যায়।

সহরে ও পল্লীগ্রামে রমণীদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়া, তাহাদের দুর্গতির সীমা ছিল না; হাতে ও গলায় বেড়ী দিয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়া হইত, এই অবস্থায় তাহারা লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিত।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।
বার্লিন।

এসো

১

এসো গোটা এ বাগান আলো-করা ফুল
আন মেঘ পথ চাওয়া,
এসো খর নিদাঘের হৃদয়-জুড়ান
সজল মলয় হাওয়া।
তুমি সাগরের শেষ সীমা হে,
তুমি ধূ ধূ মাঠে শ্যামলিমা হে,
তুমি দুখের প্রবাসে বুকের সে গান
বহুদিন ভুলে যাওয়া।

২

এসো ওগো এ বুকের রাঙা রাঙা দাগে
গোপন চরণ ফেলে,
এসো কমল দিঘীতে নব অরুণের
অনুরাগ আঁখি মেলে,
এসো নব আষাঢ়ের ঘনঘোর
এসো চির মধুময় বঁধু মোর,
এসো সকল পরেতে তরুর মমতা
ফুলে ফুলে পথ ছাওয়া।

৩

এসো তমালের ডালে বহুদিন পরে
ঝুলুক ঝুলন ডুরি
এসো শিস্ দিয়ে ডাকা কপোতের ঝাঁকে
ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে ঘুরি
এসো এসো মুখভরা মধুনাম
এসো এসো হে নয়ন-অভিরাম
এসো বুকভরা ধন সোনার স্বপন
আপন করিয়া পাওয়া।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সীমান্তের উপন্যাস

সীমান্তে ইংরাজ-কন্যা কুমারী মলি এলিসকে কেন্দ্র করিয়া যে রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী কিছুদিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া গেল, তাহার সহিত নাটকের উপন্যাসের যে কোনও আখ্যায়িকার অবাধে তুলনা করা যাইতে পারে। সীমান্তের কাণ্ড সকলই অদ্ভুত।

দক্ষিণে মিস এলিস; বামে উপরে পিতা ও নিম্নে জননী।

ইংরাজের সংখ্যাতীত থানা, সীমান্তে সর্ব্বদা সুসজ্জিত ইংরাজের ভীমরূপ, দুর্দ্দম সীমান্ত সেনা (Frontier Rifles) এবং সীমান্তরক্ষায় ইংরাজের অতুল অর্থব্যয় তাঁহাকে শত্রুর কবল হইতে সে সময়ে রক্ষা করিতে পারে নাই। আরব্য উপন্যাসের জিন দৈত্যের মত পাঠান তাঁহাকে যেন উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

সীমান্ত বলিলে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকেই লোক বুঝিয়া থাকে। ইহার কারণও যথেষ্ট আছে; কেন না, এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথা ইংরাজ-রাজত্বে সাতকাণ্ড রামায়ণের কথার মত। ইংরাজ পঞ্জাব জয় করিবার পর হইতে এই সীমান্ত রক্ষার জন্য কত রক্ত ও কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে স্বপ্নের মত অনুমিত হইবে—এক কৌটা কাঁকরের জন্য কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ ইহার উপমা হইতে পারে।

কুমারী মলি এলিস সীমান্তের কোহাট সহর হইতে দুর্দ্দান্ত পাঠান-দস্যুর হস্তে বন্দিনী হইয়া পাঠানরাজ্যে বলপূর্ব্বক নীতা হইয়াছিলেন। নিশীথে ঘোর দুর্য্যোগকালে দস্যুরা কুমারী এলিসের পিতার বাঙ্গলোয় অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাঁহার জননীকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে শয়নকালের উপযোগী পোষাকে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

সীমান্ত কি ?

সিন্ধুনদের পরপারে ও আফগানরাজ্যের মধ্যে থাল, বন্নু, কোহাট, পেশোয়ার, ডেরা ইস্মায়েল খাঁ, ডেরা গাজী খাঁ প্রভৃতি যে সমস্ত অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য তরুবিরল গ্রাম জনপদ আছে এবং যে স্থানের আফ্রিদি, ওয়াজিরি, শিনওয়ারী, ওরকজাই, বোরকজাই প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান পাঠানজাতি কোনকালেই সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই,—উহাই সীমান্ত প্রদেশ। এই প্রদেশে ইংরাজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইংরাজের অসংখ্য সমস্ত্র শিবির-নগর (military camps and cantonments) আছে, যথা—ক্যাম্বেলপুর, নওসেরা, পেশোয়ার ইত্যাদি। শত প্রহরী সত্ত্বেও এ সব স্থান সর্ব্বদাই অরক্ষিত বলিয়া মনে হয়। মাসে দুই একবার এতদঞ্চলের গ্রাম জনপদ

লুণ্ঠিত হয় না, দুই একবার সেনা-নিবাস হইতে অস্ত্র-শস্ত্র বা খচ্চর অশ্ব চুরি যায় না, এমন হয় না। এ দেশের লোক সর্ব্বদাই যেন রণসাজে সাজিয়া আছে। পেশোয়ারে এক বার অবস্থানকালে শুনিয়াছিলাম, আমাদের পেশোয়ারে অবস্থানের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে পেশোয়ারের পুরাতন বাজার লুট হইয়াছিল, পরন্তু এক ইংরাজ সেনানী পাঠানের প্রতিহিংসানলে আহুতি দিয়াছিলেন। খাইবার গিরি-সঙ্কটে যাতায়াতের ছাড়পত্র লইবার সময়ে তৎকালীন পোলিটিক্যাল অফিসার মেজর পিয়ার্স আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "জলপিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও অথবা মলমূত্রের বেগ অসহ্য হইলেও কদাচ কাফিলার (caraven) নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়িয়া একপদমাত্রও কোথাও অগ্রসর হইও না, হইলে ইংরাজ সরকার তোমাদের প্রাণের জন্য দায়ী থাকিবেন না। গিরিসঙ্কটের রক্ষক ব্লক-হাউসের খাইবার রাইফলরা পথটিমাত্র রক্ষা করে, পথের উভয় পার্শ্বস্থ আফ্রিদিদের ভূভাগে তাঁহাদের কোনও এক্তিয়ার নাই।" পেশোয়ার সহরে ও গোরাবারিকে কাবুলনদের শাখা বরা-নদী হইতে নলে করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ইহার জন্য নদীতটস্থ পাঠানসর্দ্দারগণকে ইংরাজ ১২ মাসে ১২ শত টাকা খাজনা দিয়া থাকেন,—না দিলে পাঠানরা মাঝে মাঝে নল কাটিয়া দেয়। পেশোয়ার হইতে জমরুদ ৯ মাইল, জমরুদ হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে। এই ৯ মাইল পথ রেল নির্ম্মাণ করিতে ইংরাজকে কত অর্থ ব্যয় করিয়া পাঠানদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; ইহাতেও পার নাই। পাঠানরা মাঝে মাঝে রেলের পাটি তুলিয়া ফেলিত, মাঝে মাঝে ষ্টেশন লুঠ করিত, মাঝে মাঝে গাড়ী ষ্টেশনে থামিলে সরকারী ডাক বা যাত্রীর সম্পত্তি লুঠ করিত। এমনই অশান্ত এই দেশ!

এবার গয়া কংগ্রেস হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন-কালে রেলগাড়ীতে কংগ্রেসের ২ জন সীমান্ত প্রতিনিধির সহিত সীমান্ত সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তাঁহাদের নিবাস টঙ্ক সহরে, একবারে বৃটিশ সীমানার শেষভাগে ওয়াজিরি প্রদেশের গায়ে। তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহাদের টঙ্ক সহরটিও অন্যান্য সীমান্ত সহরের ন্যায় প্রাচীর-বেষ্টিত, সন্ধ্যা ৬টার পর গেট বন্ধ হইয়া যায়, পাছে লুঠ হয়! স্ত্রী কন্যার ইজ্জত ও ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতে হয়, রাত্রিকালে পালাক্রমে পাহারা দিতে হয়।

কোহাটের রোমাঞ্চকর কাণ্ড

বলা বাহুল্য, কোহাটও সীমান্তের এমনই একটি প্রাচীর-বেষ্টিত নগর। এখানেও লোককে স্ত্রীকন্যা ও ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতে হয়, গৃহে পাহারা দিতে হয়। ইংরাজের সামরিক ঘাঁটি আছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সহর নিরাপদ নহে। তাহার প্রমাণ কুমারী এলিসের প্রতি অত্যাচারে পাওয়া গিয়াছে। কেন যে এই প্রকৃতির বিপৎসঙ্কুল স্থানে কুমারী অথবা তাঁহার জননীকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বুঝা দায়।

যাহা হউক, গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে রাওলপিণ্ডি হইতে কলিকাতায় তারে সংবাদ পাওয়া গেল, কোহাটে এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। বর্ডার রেজিমেণ্টের মেজর এলিস কোহাটে যে বাংলোয় বাস করিতেন, ১৩ই এপ্রিল তারিখের নিশীথে সেই বাঙ্গলোয় ডাকাইত পড়ে। মেজর এলিস তখন কোহাটে ছিলেন না, তাঁহার বাঙ্গলোয় তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা নিদ্রিতা ছিলেন। ডাকাতরা মিসেস্ এলিসকে গলা কাটিয়া হত্যা করিয়া পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা কুমারী এলিসকে লইয়া পলায়ন করে।

হাইল্যাণ্ডের কথা

কাপ্তেন হাইল্যাণ্ড ঐ বাঙ্গলোর অপরার্দ্ধে বাস করিতেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি গভীর রাত্রিকালে তাঁহার কুকুরের ডাক শুনিয়া জাগিয়া উঠেন এবং ডাক বন্ধ হয় না দেখিয়া ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঘরের বাহির হয়েন। তিনি বাঙ্গলোর অপরার্দ্ধে গিয়া দেখেন, মিসেস্ এলিস তাঁহার শয়নকক্ষে গলা-কাটা অবস্থায় পড়িয়া আছেন, পরন্তু কুমারী এলিস তথায় নাই। তখনই তিনি চারিদিকে কুমারী এলিসের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া দিলেন। ১৪ই তারিখের সারাদিন অনুসন্ধানেও কোন ফল হইল না।

অত্যাচারী কে?

মেজর এলিস, কর্ণেল টার্ণারের পদে অস্থায়িরূপে কোহাট জিলার জেনারল ষ্টাফ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি

ঘটনার সময় বন্নুতে ছিলেন। কোহাট স্বাধীন পাঠান-রাজ্য হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত; সুতরাং সকলেরই সন্দেহ হইল, ঐ ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত আফ্রিদি-দেশের আফ্রিদি দস্যুরা ঐ কাণ্ড ঘটাইয়াছে। এই অত্যাচারের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে খাইবার গিরিসঙ্কটে লাণ্ডিকোটাল হইতে ৩ মাইল দূরে ইংরাজ-সেনানী মেজর এণ্ডার্সন ও মেজর অর গুপ্ত হত্যাকারীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের একটা কারণও নির্ণীত হইয়াছিল, ইহা নাকি পাঠানরক্তের বিনিময়ে রক্ত লইবার শপথের ফল। মুলতান নামক দুর্দ্দান্ত পাঠান-দস্যু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ধরা পড়ে, ঐ বৎসরেই পেশোয়ার সহরে মুলতানের ফাঁসি হয়। তখন কিন্তু কেহ ভাবে নাই যে, খাইবার সঙ্কটের হত্যাকাণ্ড এই ফাঁসির প্রতিশোধ। কিন্তু ১২ই এপ্রিল তারিখে সীমান্ত সরকার এক ঘোষণায় বলেন,—

"১০ই এপ্রিল তারিখে সিমলা দপ্তর হইতে লাণ্ডিকোটালে যে দুই জন ইংরাজ-সেনানীর হত্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই কাণ্ডের সহিত কোনও রাজনীতিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সীমান্তের চিফ কমিশনার ও তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ এ কথা মানেন না। তাঁহাদের ধারণা, খাইবার গিরিসঙ্কটের প্রান্তসীমায় দুই জন বৃটিশ সেনানীর হত্যার সহিত রাজনীতিক ব্যাপার নিশ্চিতই বিজড়িত আছে।"

সিমলার দপ্তর হইতে ১৫ই এপ্রিল তারিখে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইল, তাহাতেও হত্যার বিষয়ে নূতন তথ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। উহাতে বলা হইল, হত্যার সময় কোনও আওয়াজ হয় নাই, একটি গুলীও ছুটে নাই, হত্যাকারীরা শাণিত অস্ত্রে মিসেস্ এলিসকে হত্যা করিয়া কুমারী এলিসকে লইয়া কুচকাওয়াজের মাঠ পার হইয়া এমন নিঃশব্দে সহরের প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছিল যে, কেহ ঐ ব্যাপারের বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই।

এইটুকুই কেমন হেঁয়ালির কথা। অত্যাচারিতা জননী ও কন্যা কি চীৎকার করিবার সামান্য অবসরও পায়েন নাই? বাঙ্গলোর দাস-দাসীও কি কেহ ছিল না? তাহারা কি দস্যুদলের এত কাণ্ড কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পায় নাই? বাঙ্গলোর অপরার্দ্ধে নিদ্রিত ইংরাজ সেনানীও কি একেবারে মৃতবৎ নিদ্রিত ছিলেন? আটঘাট জানা না থাকিলে এবং পূর্ব্বে কোনওরূপ সঙ্কেতাদির বন্দোবস্ত না হইলে, দস্যুরা এমন অনায়াসে কিরূপে অত্যাচার করিয়া পলায়নে সমর্থ হইবে?

সরকারী ঘোষণায় এক দল পাঠানের উপর সন্দেহ অর্পিত হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই কোহাট সহরেই আর এক অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, সেই অত্যাচারের ফলে কর্ণেল ফুকস্ ও তাঁহার পত্নীকে প্রাণ দিতে হয়। বোস্তিখেল আফ্রিদিরা এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে বলিয়া কতকটা প্রমাণও পাওয়া গিয়াছিল। কোহাট পুলিসের কয়টা বন্দুক ও লুঠের মাল বোস্তিখেলদের গ্রামে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এই ফুকস্ হত্যাকাণ্ডের সহিত কোহাটের এই অত্যাচারের সম্বন্ধ আছে বলিয়া সরকার অনুমান করিয়াছিলেন। ফুকস্ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বোস্তিখেল আফ্রিদিদেশে বন্দুক ও লুঠের মাল খানাতল্লাসী হইয়াছিল; এই হেতু উহারা বিরক্ত হইয়া পুনরায় কোহাটে অত্যাচার করিয়াছে, সরকারের ইহাই অনুমান। কুমারী এলিসকে ধরিয়া রাখিয়া দস্যুরা টাকা চাহে, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

সাজ সাজ রব

বলা বাহুল্য, এই অভাবনীয় কাণ্ডে সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সমগ্র ইংরাজজাতি যেন আপনার ও জাতির আত্মসম্মান আহত হইয়াছে বলিয়া সিংহবিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। স্বাধীন জীবন্ত জাতির ইহাই লক্ষণ। ভারতে কুমারী এলিসের উদ্ধারের জন্য যেমন সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, বিলাতে তেমনই পার্লামেণ্টে ও সংবাদপত্রে দুষ্কৃতকারীদিগের দণ্ডবিধানে বৃটিশ সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবার জন্য ঘোর আন্দোলন চলিল। ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী আর্ল উইণ্টার্টনের জীবন প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ফল কথা, একটি ইংরাজ বালিকার অপমানে ইংরাজ জাতিটা যেন অপমানিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল। জাতির সজীবতা ও জাতীয়তার ইহাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

তদন্তের ফলে এইটুকু জানা গেল যে, এলিসদের বাঙ্গলোর যে দিকে এলিসরা থাকিতেন, তাহার অপর পার্শ্বে এক চৌকীদার শয়ন করিত। চৌকীদার রাত্রি ২টার

সময় এলিসদের অতিথি ইংরাজ সেনানীকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলে যে, সে কয়েকজন লোককে বাগান অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখিয়াছে ; সন্দেহ হয়, তাহারা দলে ৫ জনের অধিক হইবে না। তখনই খোঁজ লইয়া দেখা যায়, এলিসদের শয়নকক্ষে মিসেস্ এলিস নিহত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং কুমারী এলিস অপহৃতা হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ চারিদিকের ঘাঁটি ও পথঘাট আটক করিবার হুকুম হয়। উবলান গিরিসঙ্কট দিয়া দস্যুরা আফ্রিদি দেশে পলায়ন করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া পাঠান সৈন্য প্রেরণ করিয়া উহার পথও রুদ্ধ করা হয়। কিন্তু এত সতর্কতাও কোনও কাজের হইল না, দস্যুরা তৎপূর্ব্বেই বহুদূর পলায়ন করিয়াছিল।

প্রথম সন্ধান

১৮ই এপ্রিল তারিখে প্রথম খবর আসিল যে, টিরা অঞ্চলে আফগান সীমানার সন্নিকটে এক নদীর তটে দস্যুদিগকে কুমারী এলিসের সহিত বিশ্রাম করিতে দেখা গিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়টি খবর পাওয়া যায় :—

(১) দস্যুরা টিরা ষোয়াকি ও বোস্তিখেল আফ্রিদি জাতির দলভুক্ত।

(২) উহারাই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ও মিসেস ফুকসকে হত্যা করিয়াছিল।

(৩) দলে দস্যুরা ৫ জন ছিল। ঐ অঞ্চলের লোক এই পাপকার্য্যের বিরুদ্ধবাদী ছিল বলিয়া অতি গোপনে তাহারা চলা-ফিরা করিতেছিল, তাই প্রথমে তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(৪) ১৬ই এপ্রিল রাত্রে তাহারা কুমারী এলিসকে লইয়া ষোয়াকি টিরা অঞ্চলের সর্দার সুলতান মিরের গৃহে পৌঁছিয়াছে।

(৫) শুনা গিয়াছে, ফুকস্ হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে দণ্ডভোগের হাত এড়াইবার জন্য দস্যুরা এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে। ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য ১ জন আফ্রিদিকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্য অপরাধীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং কতক লোককে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। যে ১৬ই এপ্রিল তারিখে দস্যুরা কুমারী এলিসকে সুলতান মীরের আবাসে লইয়া যায়, ঐ তারিখেই দণ্ডের শেষাংশ পেশোয়ার সহরে অভিনীত হইবার কথা ছিল—ঐ দিন টিরা ষোয়াকিদিগকে পেশোয়ারে বন্দুক সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছিল।

(৬) এই ভাবে দণ্ডিত হইবার পর ঐ বদমাসরা সীমান্তেও দস্যুপদবাচ্য হইত—হয় ত তাহাদিগকে দেশঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইত। তাই তাহারা মরিয়া হইয়া একবার শেষ মরণকামড় দিবার জন্য এই অত্যাচার করিয়াছিল ; ভাবিয়াছিল, কুমারী এলিসকে ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পূর্ব্ব-দণ্ড ও বর্ত্তমান অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইবে, এবং বিনিময়ে অবরুদ্ধ বন্ধুগণকে ইংরাজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে।

(৭) টিরা অঞ্চলের কান্দিবাজার নামক স্থানের নিকটে স্পিন গাণ্ গ্রামে কুমারী এলিসকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইংরাজ মহিলার কার্য্য

এই সকল সংবাদ পাইবার পর সীমান্তের চিফ কমিশনার সার জন ম্যাফি কুমারী এলিসের আশু উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যাচারের সংবাদ পাইবামাত্র পেশোয়ার হইতে কোহাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রিসলদার মোগল বাজ খাঁ তাঁহার প্রধান দেশীয় সহকারী কর্ম্মচারী—তিনি স্বয়ং জাতিতে আফ্রিদি, সুতরাং আফ্রিদিদিগের হালচাল বিশেষ অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সার জন বুঝিলেন, এক জন ইংরাজ মহিলাকে সঙ্গে লইয়া গেলে কুমারী এলিসের উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের পথ সুগম হইবে, তাই তিনি পেশোয়ারের মেডিক্যাল মিশনের মহিলা ডাক্তার মিসেস্ ষ্টারের সকাশে টিরা-যাত্রার প্রস্তাব করিলেন। মিসেস্ ষ্টার কথামাত্র সানন্দে এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন। স্বাধীন জীবন্ত জাতির মহিলার ইহাই উপযুক্ত বটে! জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ইংরাজ মহিলার দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য এমন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত কত না আছে!

এই স্থানে মিসেস্ ষ্টারের একটুকু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মহিয়সী ইংরাজ মহিলা সীমান্তে নূতন আইসেন নাই,

সীমান্তের অভিজ্ঞতা তিনি বহুদিন হইতেই লাভ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামী ডাক্তার ষ্টারের সহিত বহুদিন পেশোয়ারের মেডিক্যাল মিশন হাঁসপাতালে কার্য্য করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিকালে কে এক জন ডাক্তার ষ্টারকে এক রোগী দেখিবার জন্ম ডাকিল। ডাক্তার শয়ন কক্ষ হইতে বারান্দায় পদার্পণ করিবামাত্র গুপ্ত হন্তা তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মিসেস্ ষ্টার স্বয়ং এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বয়ং এই সীমান্ত-নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করিয়াও মিসেস্ ষ্টার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই, ঐ মিশন হাঁসপাতালেই এ যাবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। চিফ কমিশনার যে এ হেন মহাপ্রাণ মহিলাকেই কুমারী এলিসের শান্তিদায়িনী রক্ষাকর্ত্রীরূপে মনোনীত করিলেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু অশান্ত টিরা অঞ্চলে এক জন ইংরাজ মহিলাকে লইয়া যাওয়া নিরাপদ হইবে কি না, তাহাও সিদ্ধান্ত করা সমস্যার কথা। এই জন্ম সকল দিকে আটঘাট বাঁধিয়া কার্য্য করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া চিফ কমিশনার সার জন ম্যাফি রিসলদার মোগল বাজ খাঁকে মিসেস্ ষ্টারের শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। পরন্তু আফ্রিদি ও ওরকজাই জাতির মালিকরা ভরসা দিলেন যে, পথে মিসেস ষ্টারের কোন বিপদ হইবে না। বিশেষতঃ ওরকজাই জাতির পরমপূজ্য ধর্ম্মগুরু মোল্লা মহম্মদ আথন্দজাদা প্রকাশ্যে কোহাটের অত্যাচারের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন; এই হেতু সীমান্তের স্বাধীন পাঠানরা অত্যাচারীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিসেস্ ষ্টারকে বিপদে ফেলিবে না, এ বিষয়ে চিফ কমিশনার অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। এ দিকে পোলিটিক্যাল এসিষ্টান্ট খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁ ১৯শে এপ্রিল তারিখে এক শক্তিশালী জিরগা সমভিব্যাহারে টিরা যাত্রা করিলেন।

যাত্রা

সকল আয়োজন সুসম্পন্ন হইলে চিফ কমিশনার স্বয়ং মিসেস্ ষ্টারকে সঙ্গে লইয়া ২০শে এপ্রিল তারিখে সীমানা পার করিয়া দিলেন। মিসেস্ ষ্টার বৃটিশ সীমানা পার হইয়া হঙ্গু হইতে ৫ মাইল দূরে সন্ধ্যাকালে খারাপ্পা নামক আফ্রিদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট আতিথেয়তা ও বন্ধুতা প্রদর্শন করিল। ঐ স্থান হইতে শিনাওয়ারী ২০ মাইল এবং শিনাওয়ারী হইতে কাঙ্কিবাজার ২০ মাইল পথ।

চিফ কমিশনার ওরকজাই সীমানায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। খাঁ বাহাদুর রিসলদার সর্দ্দার মোগল বাজ খাঁ কয়েকটি পাঠান জিরগা সমভিব্যাহারে মিসেস্ ষ্টারকে সঙ্গে লইয়া টিরাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ২০শে তারিখেই মিসেস্ ষ্টার খারাপ্পা গ্রাম হইতে চিফ কমিশনারকে খবর পাঠাইলেন যে, তাঁহারা ২২শে এপ্রিল তারিখের সন্ধ্যাকালে কাঙ্কিবাজার সহরে উপস্থিত হইবেন, এইরূপ আশা করেন। ঐ সময়ের মধ্যে কাঙ্কিবাজার সহরে খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁরও পৌঁছিবার কথা। পরন্ত বহু পাঠান জিরগা ও সর্দ্দার কাঙ্কিবাজারের দিকে নানা দিক হইতে যাত্রা করিয়াছিল। সকলেরই উদ্দেশ্য, চারিদিক হইতে চাপ দিয়া কুমারী মলি এলিসের উদ্ধারসাধন করা। অত্যাচারীদের দলপতির নাম আজব খাঁ, সে জাতিতে বস্তিখেল আফ্রিদি, এইরূপই প্রকাশ। সে কুমারী মলি এলিসকে কাঙ্কিবাজার সহরে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, মিসেস ষ্টার এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আজব খাঁর কথা

আজব খাঁ দুর্দ্দান্ত দস্যু বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সে কোহাটে ইহার পূর্ব্বে কর্ণেল ও মিসেস ফলককে হত্যা করিয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ী খানাতল্লাস হইবার সময়ে যে সব কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনও কাগজে নাকি লিখা ছিল যে, সে এই হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাও এমন নৃশংস অত্যাচার করিবে—যাহাতে ইংরাজ চমকিত হইয়া যাইবেন। ইহারই ফলে কুমারী এলিসের জননী নিহত ও কুমারী এলিস হৃত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কুমারী এলিস পঞ্চদশ বর্ষীয়া ইংরাজ বালিকা। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। যাহাই হউক, তিনি যে অল্পবয়স্কা, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিসেস্ ষ্টার খবর পাইলেন, আজব খাঁ কুমারী এলিসকে পথে ভয়ানক কষ্ট দিয়াছিল। অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় নগ্নপদে তাঁহাকে পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে অতি দ্রুত

হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, উহাতে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত ও দেহ শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যে এক জনরব রটিয়াছিল যে, তাঁহার উপর শারীরিক অত্যাচার করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষ এ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন। তবে তাঁহার উপর মানসিক অত্যাচারের যে চরম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু মাইল পথ এই ভাবে হাঁটিয়া এবং আহার ও বিশ্রামের সুযোগ না পাইয়া তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ এই অসভ্য দুর্দ্ধর্ষ পাঠান দস্যুদের সহবাসে তাঁহাকে যে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

কুমারী এলিসের উদ্ধার

২৪শে এপ্রিল সঠিক খবর পাওয়া গেল, মিসেস ষ্টার কুমারী এলিসের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। চিফ কমিশনার সার জন ম্যাফি পরবকাই সীমানার নিকট ২৩শে এপ্রিলের রাত্রিকালে কুমারী এলিসকে লইয়া মিসেস্ ষ্টার ও পাঠান জিরগা ও শরীররক্ষিগণকে আসিতে দেখিলেন। তখন তাঁহাদের কি আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যখন পিতাপুত্রীর সাক্ষাৎ হইল, তখন কাহারও নয়ন অশ্রুশূন্য ছিল না। মেজর এলিস চিফ কমিশনারের সঙ্গে কন্যার জন্য পরবকাই সীমান্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া মোটরযোগে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২৪শে এপ্রিল বেলা দেড়টার সময় পেশোয়ারে পৌঁছিলেন।

উদ্ধারের কথাবার্ত্তা

সার জন ম্যাফি কোহাট জিলার উত্তর সীমানায় হঙ্গু গ্রামের সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গুপ্তচরের মুখে ২৩শে এপ্রিল খবর পাইলেন,—

(১) মিসেস্ ষ্টার, রিসলদার মোগল বাজ খাঁ এবং কুমারী এলিস মোল্লা মহম্মদ আখন্দজাদার আশ্রয়ে রহিয়াছেন, ইংরাজ মহিলা ২ জন মোল্লার অন্তঃপুরে (হারেমে) স্থান পাইয়াছেন।

(২) কুমারী এলিসের উদ্ধার সম্বন্ধে অত্যাচারীদের সহিত আপোষ কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এখন আপোষের কথায় দুর্দ্ধর্ষদের দণ্ডের কথা পাড়িলে মহিলা ২ জনের নিরাপদে পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা পড়িতে পারে, তাই কেবল কুমারী এলিসের বিনিময়ে কত টাকা দিতে হইবে, তাহা লইয়া দর কসাকসি চলিতেছে।

(৩) অত্যাচারী দস্যুসর্দ্দার আজব খাঁ পলাতক আসামী। পূর্ব্বে সে কোহাট হইতে ৫ মাইল দূরে এক উপত্যকায় অবস্থিত গ্রামে বাস করিত। সে ও তাহার বস্তিখেল আফ্রিদিরা সরকারের বন্ধু বলিয়া সকলের ধারণা ছিল; কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে কোহাট পুলিসের কতকগুলি বন্দুক চুরি যায়। আজবের গ্রামে ঐ বন্দুক ধরা পড়ে। খানাতল্লাসীর সময় বন্দুকের সঙ্গে এমন কতকগুলি দ্রব্য আজবের গৃহ হইতে বাহির হয়, যাহা দেখিয়া জানা যায় যে,আজবই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ফুকস্ ও তাঁহার পত্নীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। আজব এই ব্যাপারের পর টিরা কাণ্ডয়াকি অঞ্চলের কাজিবাজার সহরে পলাইয়া যায় এবং তথায় সুলতান মীর নামক পাঠানের গৃহে সপরিবারে বাস করে। সেখানে থাকিয়া সে ইংরাজের কোহাট পুলিশের ঐ খানাতল্লাসীর প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করে এবং আর ৬ জন দস্যুকে নানা লুঠের প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাহাদের সহায়তায় মেজর এলিসের বাসায় গভীর রাত্রিতে ডাকাতী করে। মিসেস্ এলিসকে খুন করা এবং কুমারী এলিসকে হরণ করিয়া বিনিময়ে টাকা আদায় করা তাহার সঙ্কল্প ছিল।

কুমারী হরণের বিবরণ

কোহাটে মেজর এলিসের বাঙ্গলোয় নৃশংস আফ্রিদি দস্যুরা ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার শেষরাত্রিতে যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কুমারী এলিসের জননী বালিকা কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ বলি দিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিদি দস্যুরা যখন তাঁহাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, তখন ভীষণ ঝড় বহিতেছিল, বাঙ্গলোয় জানালা দরজা ঝন ঝন শব্দে আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল, গাছের ডাল মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সুতরাং চারিদিকে প্রকৃতির বিকট আরাবের মধ্যে কাহারও কথা শুনিবার সুযোগ ছিল না। মিসেস্ এলিস

প্রাণপণ চীৎকার করিয়া সাহায্য চাহিলেও কেহ শুনিতে পায় নাই।

দুর্বৃত্তরা সেই সুযোগে কুমারী এলিসকে ধরিয়া পোলোখেলার মাঠ দিয়া পশ্চিমমুখে লইয়া যায়, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই পূর্ব্বমুখে খুসলগড় অভিমুখে ধাবমান হয়, তৎপরে পেশোয়ার-কোহাট রাজপথের দক্ষিণে এবং কোহাট কোটালের পূর্ব্বে অবস্থিত পর্ব্বতমালার মধ্যে উপস্থিত হয়। পাহাড়ের উপর হইতে অভাগিনী বালিকা কোহাটের আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তাঁহারা পর্ব্বতের শিখর-দেশে। সারাদিন বালিকাকে ঘিরিয়া দুর্বৃত্ত দস্যুদল পাহারা দিতে লাগিল। বালিকার অঙ্গে আচ্ছাদনের আর কিছু ছিল না – দস্যুদলপতি তাঁহাকে একটা রক্তমাখা অঙ্গ-রাখা দিয়াছিল, উহাই তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিল। সে রক্ত কিসের, বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

রাত্রিকালে আবার দস্যুরা তাঁহাকে লইয়া চলিল। আহারের মধ্যে দুধ ও রুটী তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর চারি রাত্রি ও দিন কখনও হাটিয়া, কখনও লুকাইয়া, ক্ষতবিক্ষতপদে অবসন্ন শ্রান্তদেহে ছয়দিনের দিন বালিকা দস্যুদের টিরার আড্ডায় নীত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে একবার বালিকা তাহাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া দস্যুরা তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়; বালিকা ৭ ঘণ্টাকাল অচৈতন্য ছিলেন। একবার তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে অস্ত্রও উঠাইয়াছিল; কিন্তু বালিকা একবারও হতাশ হয়েন নাই, একবারও হা-হুতাশ করেন নাই।

উদ্ধারের বিবরণ

কুমারী এলিসের উদ্ধারসাধনের কৃতিত্ব সর্ব্বপ্রথমেই খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁকে দিতে হইবে। তিনি কুরম উপত্যকার পোলিটিক্যাল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। তিনি চরমুখে দস্যুদের আড্ডার কথা অবগত হইয়া বহু কষ্ট বিপদ অতিক্রম করিয়া কান্বিবাজারে মোল্লা মহম্মদ আখন্দজাদার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখনও তিনি কোথায় কুমারী এলিসকে রাখা হইয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। দস্যুরা কুমারী এলিসের কথা একেবারেই অস্বীকার করিল। কিন্তু তিনি নানা উপায়ে অবগত হইলেন যে, ৮ মাইল দূরে এক পার্ব্বত্য দুর্গে কুমারী এলিসকে বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছে। শেষে বহুকষ্টে তিনি কুমারী এলিসকে ভরসা দিয়া এক পত্র ও কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দ্রব্য পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। পরন্তু তিনি সংবাদ পাইলেন যে, দস্যুদের স্ত্রীলোকরা কুমারী এলিসের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেছে।

এদিকে মিসেস্ ষ্টার সাহসী রিসলদার মোগলবাজের আশ্রয়ে ওরকজাই দেশে প্রবেশ করিলেন। প্রথম প্রথম ওরকজাইরা – তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু যতই তাঁহারা ওরকজাই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার মন্দ হইতে লাগিল। মোল্লা মহম্মদ আখন্দজাদা তাঁহাদিগকে কোহাটে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, 'মেমসাহেবকে' আনিলে ভাল হইবে না, এইরূপ ভয়ও দেখাইলেন; কিন্তু মোগল বাজ কোনও বাধা না মানিয়া মিসেস্ ষ্টারকে লইয়া শিনাওয়ারী হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কান্বিবাজারে উপস্থিত হইলেন।

খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁ কুরম উপত্যকা হইতে তাঁহার কুরম পাঠান জিরগা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রিসলদার মোগল বাজের সঙ্গেও রক্ষী-সৈন্য ছিল। ইহা ছাড়া বিস্তর ওরকজাই ভারতীয় সেনানী কান্বিবাজারে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলের সমবেত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মোল্লা মহম্মদ শেষে কুমারী এলিসের উদ্ধার সাধনে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। তখন দস্যুসর্দ্দার আজব খাঁকে বলিয়া পাঠান হইল যে, তাহারই মঙ্গলের জন্য কুমারী এলিসকে মোল্লা মহম্মদের আশ্রয়ে আনায়ন করা কর্ত্তব্য, কেন না, যদি কুমারী এলিস অতিরিক্ত শ্রান্তিতে ইহলোক ত্যাগ করেন বা অন্য কোনও পার্ব্বত্য পাঠান জাতি তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সকল দিকই নষ্ট হইবে।

অতঃপর খাঁ বাহাদুর স্বয়ং একদল রক্ষিসেনা লইয়া ৮ মাইল দূরের সেই পার্ব্বত্য দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং এক জন পাঠান সেনা কুমারী এলিসকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া মোল্লা মহম্মদের গৃহে লইয়া আসিল। সেখানে স্বজাতীয়া মিসেস্ ষ্টারকে পাইয়া কুমারী এলিস অনেকটা শান্তি পাইলেন।

কিন্তু তখনও বিপদের একেবারে অবসান হয় নাই। ২২শে এপ্রিলের প্রাতঃকালে মিসেস ষ্টার কুমারী এলিসের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলেন। যখন তাঁহারা দুইজনে সুখ-দুঃখের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কহিতেছিলেন, তখনও দুর্দ্দান্ত দস্যুরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া রহিল। এই সময়ে সংবাদ আসিল, ইংরাজের আফ্রিদি রাইফল সেনা টিরা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শাজাদা নামক এক পাঠান ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মিসেস ষ্টারকে ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে পথ হইতে তাড়াইয়া দিল। এই লোকটা মিসেস এলিসকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ক্রুদ্ধ পাঠানরা ইংরাজ মহিলা ২ জনের উপর অত্যাচার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে মোল্লার গড়প্রাঙ্গণে আপোষ জিরগা বসিয়াছিল। মোল্লা শাজাদার এই দুর্ব্ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া তাঁহার গৃহের পবিত্রতা নষ্টকারী শাজাদাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। অতঃপরেই কুমারী এলিসকে ফিরাইয়া দিবার কথা স্থির হইয়া গেল।

২৩শে এপ্রিল প্রাতঃকালে কুলী খাঁ ও মোগল বাজ খাঁ স্থির করিলেন যে, আর বিপদের আশঙ্কা নাই, এখন কুমারী এলিসকে নিরাপদে পেশোয়ারে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে। ২৭ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর তাঁহারা মিসেস ষ্টার ও কুমারী এলিসকে লইয়া শিনাওয়ারী গ্রামে পৌঁছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহারা চিফ কমিশনার সার জন ম্যাফির সহিত মিলিত হইলেন। সার জন ম্যাফি কালবিলম্ব না করিয়া মোটরযোগে মিসেস্ ষ্টার ও কুমারী এলিসকে লইয়া পেশোয়ার যাত্রা করিলেন এবং ২৭শে এপ্রিল দ্বিপ্রহরে পেশোয়ারে পৌঁছিলেন।

দণ্ডের কথা

বিপদের অবসান হইলে ইংরাজ পাঠান দুষ্কৃতকারীদিগের দণ্ডবিধানে উদ্যোগী হইলেন। শুনা যায়, ইংরাজের কয়েকখানা উড়োকল টিরা জোয়াকিদিগের কাজিবাজারে বোমা ফেলিয়া পাঠানদের ঘরদ্বার জ্বালাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে বহু নির্দ্দোষ রমণী ও বালক-বালিকাও দণ্ডের ফলভোগ করিয়াছে। এমন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্নও উত্থাপিত হইয়াছে।

মিসেস্ ষ্টার।

কৃতিত্ব কাহার?

মেজর এলিস কন্যাকে লইয়া বিলাতে গিয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি দেশবাসীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যাকে যেন এখন কিছুদিন নির্জ্জনে শান্তি উপভোগ করিতে দেওয়া হয়। তাঁহার উপরোধ রক্ষিত হইয়াছে।

মিসেস ষ্টারের নাম আজ জগৎ ছাইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি মহিয়সী মহিলা। স্বজাতীয়া বিপন্না বালিকার জন্য তিনি যে বিপদ বরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়! তবে ঐ সঙ্গে আর ৩ জন লোকের নামও উল্লেখযোগ্য,—রিশলদার মোগল বাজ খাঁ, খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁ এবং সার জন ম্যাফি। মিসেস্ ষ্টার রাজদত্ত সম্মান লাভ করিয়াছেন। মোগলবাজ খাঁও পরে কৃতিত্বের পুরস্কার পাইয়াছেন, কিন্তু যিনি প্রথমে কাজিবাজারে বহু কষ্টে উপস্থিত হইয়া বন্দিনী উদ্ধারে পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, সেই খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁর নামোল্লেখও কুত্রাপি দেখা যায় না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ
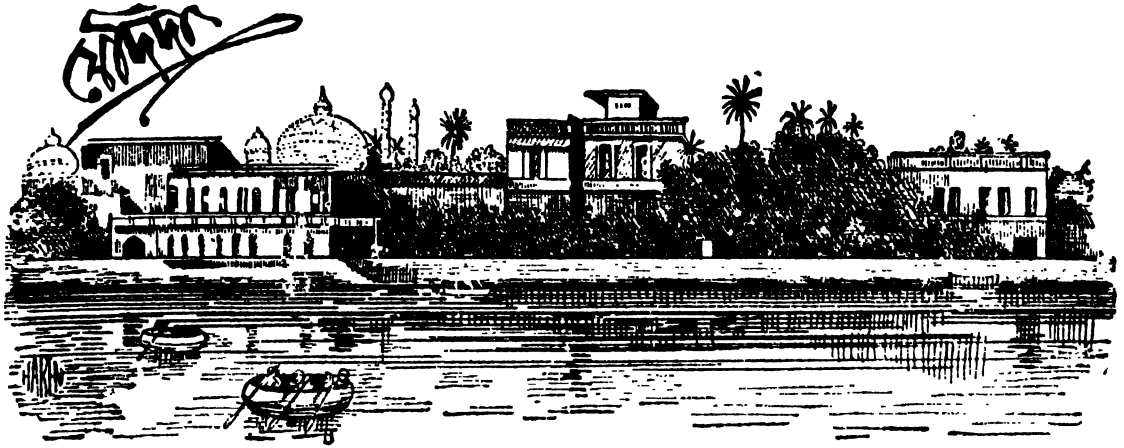
ফরিদা চলিয়া গেলে সাহিদ কেবলই ভাবিতে লাগিলেন—বাক্স ও সুন্দরী। এ সব আশা এত দিন তাঁহার মনে হয় নাই? আর তিনি তাঁহার সব শক্তি আমীরকে বড় করিবার জন্যই ব্যয় করিয়াছেন! কি জন্য? আমীর তাঁহাকে কি পুরস্কার দিয়াছেন? আজ যদি কোন কারণে তিনি আমীরের বিরাগভাজন হয়েন, তবে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না—নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড তাঁহাকে ভোগ করিতেই হইবে—হয় ত জীবিতাবস্থায় সমাধিতে যাইতে হইবে। তিনি ভৃত্য মাত্র—কুকুর ও চাকর উভয়েরই আদর প্রভুর মর্জ্জীর উপর নির্ভর করে। যত দিন তিনি আমীরের উপকার করিতে পারিবেন, তত দিনই তাঁহার আদর। এখনও তাঁহার ক্ষমতা আছে—যে লোক মরু-প্রান্তরে আবাদ করে, সে বর্ষার সময় জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু তিনি ত তাহা করেন নাই!

কৃতঘ্নতা! সাহিদের মুখ হাস্যে আরও বিকৃত দেখাইল! কৃতজ্ঞতা কিসের জন্য? তিনি যে কায করিয়াছেন, আমীর তাহার উপযুক্ত মূল্যও দেন নাই। তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা কেন? আর আমীরের জন্য তিনি যে সব ষড়যন্ত্র করিয়াছেন—কত লোকের প্রাণ লইয়া আমীরের প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, তাহার কি? সত্যই যে সব কায যদি তিনি আপনার জন্য করিতেন, তবে আজ তাঁহার পক্ষে সিংহাসনলাভ সহজসাধ্য হইত। তিনি মনে করিয়াছেন, তাঁহার মত বুদ্ধি আর কাহারও নাই। কিন্তু আজ তিনি বুঝিয়াছেন, সামান্য দাসী-কন্যা ফরিদার বুদ্ধি তাঁহার বুদ্ধিকে নিষ্প্রভ করিতে পারে।

কেবল কি বুদ্ধিতে? রূপেও ফরিদা অসামান্যা। তাহার সেই সুরমা আঁকা কৃষ্ণতার নয়নের বিলোল কটাক্ষ তাঁহার অন্ধকার হৃদয়ে বিদ্যুতের আলো জ্বালাইয়া গিয়াছে। ফরিদা ত তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেই আসিয়াছে। তাহারও হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ!

তিনি ইচ্ছা করিলেই ফরিদাকে পাইতে পারেন। আমারার দাড়িম্বক্ষেত্রে যখন দাড়িম্বের ফল পাকিয়া উঠে, তখন কে এমন মূঢ় যে, হাতের কাছে পাইলেও সে ফল আহরণ না করে? তিনি কি ফরিদাকে পাইয়াও হারাইবেন? না-না-না।

কিন্তু এই রূপবতী, বুদ্ধিমতী যুবতীকে তাহার উপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে। বহুমূল্য হীরক পাইলে কেহ কি তাহা গর্দ্দভের গলরজ্জুতে বাঁধিয়া দেয়? রাজার অন্তঃপুর ব্যতীত আর কোথাও ফরিদাকে মানাইবে না। সেই চক্ষু! সে দৃষ্টি কেমন আগ্রহ সহকারে—কত প্রেম লইয়া তাঁহার মুখে নিবদ্ধ ছিল!

রাত্রিকালে সাহিদ ঘুমাইতে পারিলেন না। ইহা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অননুভূতপূর্ব্ব অবস্থা। সাহিদের বুদ্ধি বাদ দিলে, তাঁহার আর সবই পশুর মত। নিদ্রাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি শুইলেই ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জন তাঁহার গাঢ় নিদ্রার পরিচয় দিত।

সমস্ত রাত্রি তিনি কেবল ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার যেন অশিক্ষিতপটুত্ব ছিল। আমীরের

সর্ব্বনাশ! সে ত তিনি ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন। সে কায করিতে কতক্ষণ? বিশেষ যে নূতন অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সে কায আরও সহজসাধ্য হইয়াছে। তুর্কীর ওয়ালী জানেন, আমীর তাঁহার হাতে খেলিবার পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন। এ সময় যদি তাঁহার মনে এতটুকু সন্দেহের সঞ্চার করা যায়, তবে আমীরের সর্ব্বনাশ হয়। যখন আকাশে মেঘ আর মরুভূমিতে বালুবাত্যা, তখন মাঝি ইচ্ছা করিলে টাইগ্রীসের জলে নৌকা ডুবাইতে কতক্ষণ লাগে?

সে বিষয়েও ফরিদা যাহা বলিয়াছে, তাহাই ভাল— আসন্ন যুদ্ধে যে পক্ষই কেন জয়ী হউক না, তিনি ইচ্ছা করিলে এমন ভাবে খেলিতে পারেন যে, জয়ের সুফল তাঁহার হাতেই আসিয়া পড়িবে। তিনি তাহাই করিবেন; এমন ভাবে খেলিবেন যে, লোক মনে করিবে, তিনি আমীরের কল্যাণ-চেষ্টাই করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেই কালেই আমীরের সিংহাসনে তিনি বসিবেন।

ভৃত্য বাতি নিবাইতে আসিলে তিনি নিবারণ করিয়াছিলেন। কক্ষ আলোকপূর্ণ ছিল। তিনি উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলেন, একটা লোহ বাক্স হইতে একখানা মানচিত্র বাহির করিলেন। সেখানি গোপনীয়—তাঁহারই নির্দ্দেশে প্রস্তুত করান হয়। যদি কখন কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করে, তবে কোথা কিরূপ সৈন্য সজ্জা করিলে কিরূপ ফললাভের সম্ভাবনা, সে মানচিত্রে তাহা দেখান ছিল। মানচিত্রের সঙ্গে একখানি খাতায় সে সব কথা আরও বিস্তৃতভাবে বিবৃত। সাহিদ সেই খাতাখানি লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল—রাজারক্ষার ছলে নগর হইতে দুই দিকেই শিবির সন্নিবেশস্থান স্থির করিয়া রাখিতে হইবে এবং তথায় বারুদখানা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। শিবির হইতে বারুদখানা যতটুকু দূরে থাকিবে, তাহাতে বারুদে অগ্নিযোগ হইলে শিবির উড়িয়া যাইবে। তিনি নিজে যদি সাহস দেখাইয়া—বিপদ অবহেলা করিয়া অগ্রসর হয়েন, তবে তিনি নিরাপদ স্থানে থাকিবেন, আর আমীর শিবিরে থাকিলে সেই সময় যদি বারুদখানায় অগ্নিযোগ হয়, তবে—! সাহিদ আপনার পাগড়ীটা খুলিয়া উপরে ছুড়িয়া ফেলিলেন—শিবির এমনই ভাবে উড়িয়া যাইবে।

প্রভাতে সাহিদ যখন আমীরের কাছে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় এক জন অশ্বারোহী সম্মুখের রাজপথে প্রাসাদাভিমুখে গেল। বেশ দেখিয়া সাহিদ বুঝিলেন, সে তুর্ক সরকারের ভৃত্য—সৈনিক, বোধ হয়, বাগদাদ হইতে আসিয়াছে।

সাহিদ প্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তুর্ক সরকারের সৈনিক আমীরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে বাগদাদ হইতে জরুরী পত্র লইয়া আসিয়াছে; সে পত্র আমীর ব্যতীত আর কাহারও হাতে দিবার হুকুম নাই।

সাহিদ বলিলেন, "আমি আমীরের মন্ত্রী, পত্রাদি খুলিবার অধিকার আমার আছে। আমাকে পত্র দিতে পার।"

সৈনিক অভিবাদন করিয়া বলিল, "ক্ষমা করিবেন— আমার প্রতি আদেশ, আমীর ব্যতীত আর কাহারও হাতে পত্র দেওয়া হইবে না।"

সাহিদ জানিতেন, আমীর সে সময় বাহিরে আইসেন না। কিন্তু বাগদাদের জরুরী সংবাদ—জানিতে বিলম্ব করাও সঙ্গত নহে। তাই তিনি এক জন ভৃত্যকে বলিলেন, "হারেমে সংবাদ দিতে হইবে।"

ভৃত্য যাইয়া এক জন দাসীকে ডাকিয়া আনিল।

সাহিদ তাহাকে বলিলেন, "তুমি ফরিদাকে ডাকিয়া আন, আমীরকে এখনই একটা সংবাদ দিতে হইবে।"

ফরিদা মুখের উপর হইতে বোরকার আবরণ ফেলিয়া —একগাল হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কক্ষে সৈনিককে দেখিয়া একটু যেন ব্যস্তভাব দেখাইয়া আবার সে আবরণ তুলিয়া দিল। সাহিদের মনে হইল, অকালজলদোদয়ে মরুদেশের আকাশে চন্দ্রালোক আবৃত হইয়া গেল। তিনি গুপ্ত কথা বলিবার ছলে ফরিদার একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে কক্ষের এক পার্শ্বে লইয়া গেলেন এবং অকারণ মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাগদাদ হইতে জরুরী সংবাদ লইয়া লোক আসিয়াছে; আমীরকে এখনই সংবাদ দিতে হইবে।"

ফরিদা সাহিদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি সংবাদ?"

সাহিদ বলিলেন, "আমীর ব্যতীত কাহারও হাতে পত্র দিবে না।"

"আমীর কি এখন বাহিরে আসিবেন?"

সাহিদ হাসিয়া বলিলেন, "আসিবেন কি না, সে কি ফরিদা জানে না? লুঠের আশা পাইলে আরব যে উৎফুল্ল হয়, মরুভূমিতে জলের সন্ধান পাইলে উট যে দ্রুত যায়—তাহা কি ফরিদা জানে না?"

"দেখি"—বলিয়া ফরিদা চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—আমীর শীঘ্রই আসিবেন।

আমীরের চরিত্র সাহিদ নখদর্পণে দেখিতেন। তিনি যে স্থির বুঝিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাইলে আমীর আর বিলম্ব করিবেন না, তাহাই ঠিক। রাত্রির পর সকালে উঠিয়া প্রসাধনে প্রৌঢ়ত্বকে যৌবনের ছদ্মবেশে সজ্জিত না করিয়া আমীর প্রায়ই বাহিরে আসিতেন না, পাছে ধরা পড়েন। আজ কিন্তু তাঁহার সে বিলম্ব সহিল না। তিনি বাহিরের বসিবার ঘরে আসিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইলেন—সৈনিককে লইয়া সাহিদ তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

সৈনিক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া পত্রখানি আমীরের সম্মুখে রক্ষা করিয়া আবার তাঁহাকে সেলাম করিল।

আমীর পত্রখানি তুলিয়া লইয়া তাহার গালাকরা মোহরছাপ ভাঙ্গিয়া খাম খুলিলেন। সে খামের মধ্যে আর একখানি খাম; তাহার মধ্যে পত্র। পত্র পাঠ করিয়া আমীর সেখানি সাহিদের হাতে দিলেন। সাহিদ পত্র পাঠ করিলেন—জার্ম্মাণীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধঘোষণা হইয়াছে—তুর্কী জার্ম্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিবেন। বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধঘোষণা হওয়ায়, জার্ম্মাণী হইতে সাহায্য আনিবার অসুবিধা হইবে; কাযেই তুর্কীকে আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে। ইংরাজ যদি তুর্কীকে আক্রমণ করেন, সেই ভয়ে নদীতে দুইখানি জাহাজ ডুবাইয়া পথ বন্ধ করিতে হইবে। আমীর যেন সতর্ক থাকেন। পত্র পাঠ করিয়া সাহিদ সৈনিককে বাহিরে যাইয়া বিশ্রাম ও অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

সৈনিক চলিয়া গেলে সাহিদ আমীরকে বলিলেন, "এ পত্রের উত্তর ত দিতে হইবে।"

আমীর উত্তর করিলেন, "কিন্তু কি লিখিবে?"

সাহিদ মৃদুস্বরে বলিলেন, "লিখিয়া দিব, আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব। জাহাজ যদি ডুবাইতে হয়, সে কাযের ভার আমরা লইতে পারি।"

আমীর অতিমাত্র বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কেন? আমরা সে ভার লইব কেন?"

সাহিদ বুঝাইলেন, "জাহাজ এমনভাবে ডুবাইব যে, তাহাতে জলপথ বন্ধ হইবে না। যদি তুর্কীর জয় হয়, ভালই; যদি ইংরাজের জয় হয়—তখন বলিব, আমরা ইংরাজের সুবিধার জন্যই সেইভাবে জাহাজ ডুবাইয়াছিলাম।"

আমীরের চক্ষুতে প্রশংসার দৃষ্টি প্রকাশ পাইল। এত গুণ নহিলে কি তিনি সাহিদকে ভালবাসেন!

কিন্তু আমীর সাহিদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না—সাহিদের বুদ্ধির কাছে তাঁহার বুদ্ধি পরাভব মানে। সাহিদের উদ্দেশ্য ছিল—তুর্কীর যদি জয় হয়, তবে জয়ী পক্ষকে বুঝাইবেন—আমীর যে বিপক্ষাচরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জলপথ জাহাজের পক্ষে সুগমই রাখিয়া জাহাজ ডুবাইয়াছিলেন; আর যদি ইংরাজের জয় হয়, তবে তিনি ইংরাজকে বুঝাইবেন—আমীর তুর্কীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনিই আমীরের কার্য্য ব্যর্থ করিয়া নদীর এক পার্শ্বে জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছেন।

ভৃত্য আদিষ্ট হইয়া কাগজ ও কলম আনিল। আমীরের কাছে বসিয়া সাহিদ পত্র লিখিলেন। পত্রে আমীরের মোহরের ছাপ দেওয়া হইল। বাতি ও গালা আনাইয়া আমীর স্বহস্তে খামে গালামোহর করিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় পত্র স্বহস্তেই গালামোহর করিতেন।

সৈনিককে ডাকিয়া পত্রখানি দেওয়া হইল।

আমীর ভৃত্যদিগকে কক্ষত্যাগ করিতে বলিলেন এবং তাহারা চলিয়া গেলে সাহিদকে বলিলেন, "তাই ত, সাহিদ, বড় বিষম সময় উপস্থিত।"

সাহিদ বলিলেন, "যুদ্ধ ও বিপ্লব ব্যতীত কোন নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বা প্রসার হয় না।"

আমীর ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার একটা অভ্যাস ছিল, তিনি কোন জটিল প্রশ্নের বিচারকালে দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতেন। তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন।

সাহিদ বলিলেন, "ভয় পাইতেছেন?"

আমীর বলিলেন, "ভরসার অবকাশ কি বড় বেশী আছে?"

"কোন দিন কি আমাদের পরাজয় হইয়াছে? বুদ্ধি-বলই বল। যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন কি কেহ আলো ঢাকিয়া রাখিতে পারে? তেমনই ভাগ্যোদয়ও কেহ নিবারণ করিতে পারে না। আমি ত আমাদের ভাগ্যোদয়ের আয়োজনই দেখিতে পাইতেছি।"

"তাহাই হউক"—বলিয়া আমীর আসন ত্যাগ করিলেন।

তিনি হারেমের পথে দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া চলিয়া যাইবার পরই ফরিদা আর একটি দ্বারের পর্দ্দার পার্শ্ব হইতে আসিয়া সাহিদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাহিদের মনে হইল, যেন অন্ধকারে সারদাবে সহসা এক টুকরা রৌদ্র আসিয়া পড়িল।

ফরিদা মুখে কিছু বলিল না। তাহার আঁখিঠারে প্রশ্ন হইল—কি খবর?

সাহিদ তাঁহার একটিমাত্র চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহার উত্তর দিলেন এবং শেষে তাহাকে তাহার গৃহে যাইবার জন্ম ইঙ্গিত করিলেন।

তাহার পর সাহিদ নানা কাজে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সব কাজের মধ্যে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—দিন কি দীর্ঘ! যখন নানা কাজে ব্যস্ত সাহিদের এইরূপ মনে হইতে লাগিল, তখন কোন কাজের অভাবে ফরিদা দিবাবসানের জন্ম কত ব্যস্ত হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সে কেবল পাছে তাহার ব্যাকুলতা কেহ লক্ষ্য করে, সেই ভয়ে কখন কোন বেগমের সঙ্গে রহস্য করিতে লাগিল, কখন বা অকারণে কোন দাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে আমীরের বসিবার ঘরে সাহিদের ডাক পড়িল। আমীর সে দিন দিবাভাগে নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করেন নাই—নূতন বা পুরাতন কোন বেগমকেও তিনি তাঁহার কাছে আসিতে আদেশ দেন নাই। তিনি কতকগুলা কাগজপত্র ও মানচিত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। সাহিদ আসিলে তিনি বলিলেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

প্রাচীন রাজদরবারে মন্ত্রীর পক্ষে সরাসরি আপনার মতপ্রকাশ করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। সাহিদ বলিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আপনার ভৃত্য তাহাই পালন করিবে।"

আমীর হাসিয়া বলিলেন, "সাহিদ, ঘাতুকের তরবারি যখন গ্রীবাদেশ স্পর্শ করে, তখন আর শিষ্টাচারের সময় থাকে না। তুমি কি করা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহাই বল।"

সাহিদ আমীরের আরও কাছে সরিয়া বসিলেন; একখানা মানচিত্র লইয়া দেখাইলেন, "রাজধানীর দুইদিকে ঘাঁটি আগলাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই দিকেই?"

"হাঁ। ইংরাজ ও তুর্ক উভয়কেই আমরা আমাদের দাবাখেলার বলরূপে ব্যবহার করিব।"

তিনি ঘাঁটির একটা স্থান নির্দ্দেশ করিলেন, টেসিফনের নিকটে।

আমীর ভাবিতে লাগিলেন।

সাহিদের অবশিষ্ট চক্ষুট প্রভুর মুখভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল। প্রভুকে চিন্তাকুল দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় করিবেন না। আমরা লাভবান্ হইবই।"

তাহার পর ঘাঁটি-রচনা সম্বন্ধে আমীরের সঙ্গে সাহিদের পরামর্শ হইল। সাহিদ এমন ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি আমীরের নির্দ্দেশই শিরোধার্য্য করিলেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমীরই তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পর প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সাহিদ আপনার গৃহে গমন করিলেন। ফরিদা পূর্ব্বেই তথায় গিয়াছিল—বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ফরিদা জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ?"

সাহিদ বলিলেন, "শুভ। যুদ্ধঘোষণা হইয়াছে—এইবার আমাদিগকে বুঝিয়া খেলিতে হইবে।"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "ইহাকে খেলোয়াড় এক বই দুই নাই।"

"সে কে?"

"সে কে?"—বলিয়া ফরিদা সোহাগ জানাইয়া বাহুযুগলে সাহিদের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল—"সে কি আর আমাকে বলিয়া দিতে হইবে? না—বন্ধু আপনি আপনার শক্তি জানেন না?"

সাহিদ বাহুবিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে সরিয়া গেল এবং বলিল, "তবে এ খেলায় আমরা জিতিব?"

সাহিদ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে গুণ গুণ করিয়া একটা গান গাহিতে লাগিল :—

"আস্‌ছে আমার আশার পরী
হাওয়ার উপর ভেসে ;
অরুণ-কিরণ আননখানি
মনভুলান বেশে।
আঁখির তারা নিবিড় কালো,
ফুট্‌ছে তা'তে প্রেমের আলো ;
বসোরার সব গোলাব দেছে
গন্ধ ঢেলে কেশে।
কোথায় ছিল আমার পরী
কোন্ স্বপনের দেশে ?
আস্‌ছে মেলে কোমল পাখা
ইন্দ্রধনু উজল আঁকা ;
হৃদয়খানি রাখছি পেতে
বস্‌বে ব'লে এসে।
আস্‌ছে আমার আশার পরী
হাওয়ার উপর ভেসে।"

গাহিতে গাহিতে ফরিদা ঘরের বাহিরে গেল।

সাহিদ ডাকিলেন—"ফরিদা! ফরিদা!" বাহিরে বাগানে কেবল তরল হাস্যধ্বনি শুনা গেল। পলাতের হরিণীর মত চঞ্চলপদে ফরিদা চলিয়া গেল।

সাহিদের মাথায় যেন নেশার ঘোরে সেই গান বাজিতে লাগিল—

"আস্‌ছে আমার আশার পরী
হাওয়ার উপর ভেসে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রান্ত-ভ্রান্ত

শ্রান্ত তুমি প্রমোদ-প্রাসাদ ঘুরে
নিত্য নূতন নূতন সভার পাশ,
আজকে এস, পালিয়ে এস দূরে,
শান্তি পাবে অশথ তলে বসি।

২

উৎসব এবং নৃত্য নানান জাতি—
নিমন্ত্রণের অন্ত যেন নাই,
আতসবাজি গন্ধ আলোর বাতি
কাতর ব্যাকুল করলে তোমায়, ভাই।

৩

গ্রামের রাখাল, রাজার পোষাক পরি
রাজপ্রাসাদে থাকতে কি আর পারে!
পুত্তলিকা সিংহাসন ওই গড়ি
দিবস নিশি ডাকছে শোনো তারে।

৪

মওয়ালীদের শিবজী মহারাজ
মোগলদের এই দরবারেতে এসে,
টুকরা রেশম খেলাৎ পেয়ে আজ
ব'সবে কেন পাঁচ হাজারীর বেশে?

৫

অন্যে থাকুক কায়দা কানুন নিয়ে,
স্বর্ণ থালে শোভুক আতর পান,
দিক্ কুর্ণিশ কেউ পিছিয়ে গিয়ে,
বন্ধু, তুমি শ্রান্ত ম্রিয়মাণ।

৬

অন্যে আলোক বেষ্টনীতে র'ক
তোমায় শুধু ডাক্‌ছি মোরা পথে,
ওরা আমার অন্যে যে হয় হ'ক
রুধবো তোমায় আবুহোসেন হ'তে।

৭

স্বাধীন বায়ু ডাকছে তোমায় একা
বক্সগোড়া ফিরিয়ে তোমার চাও ;
মণির মালা কাজ কি তোমার, সখা,
মুক্তা দিয়ে মুক্তি কিনে নাও।

৮

জমছে না আর এই নেরঙের খেলা,
ঠুংরী মোটেই লাগছে না আর ভালো
ডাক দিয়েছে শান্ত সাঁঝের বেলা
তুলসীতলা, সন্ধ্যা-দীপের আলো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জাতীয় পতাকা

জব্বলপুরে "জাতীয় পতাকা" লইয়া যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা ইতঃপূর্ব্বে পাঠকদিগকে দিয়াছি। জব্বলপুরে যাহা হইয়াছিল, নাগপুরেও তাহাই হইয়াছে। তথায়ও লোককে জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা করিতে রাজকর্ম্মচারীরা নিষেধ করিতেছেন। ১লা মে প্রথম মিছিল আরম্ভ হইয়াছিল এবং ২রা হইতে আইন অমান্য আরম্ভ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে যে ইস্তাহার জারি করেন, তাহার আদেশ অমান্য করায় ২রা তারিখে ১১ জন ও ৩রা আর ১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সব স্বেচ্ছাসেবককে দণ্ডদান করাও হইয়াছে। কিন্তু এক পক্ষে রাজকর্ম্মচারীদিগের জিদ যত বাড়িতেছে, অপর পক্ষে সত্যাগ্রহীরাও তত উৎসাহসহকারে শোভাযাত্রা করিতেছেন এবং নগরবাসীরাও তাঁহাদিগকে তত উৎসাহসহকারে সংবর্দ্ধিত করিতেছেন। গত ৮ই জুন পর্য্যন্ত মোট ৫ শত ২২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রথম গ্রেপ্তারের বৈশিষ্ট্য এই যে, নেতার কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া তাহার ৭৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা ও আর ১ জন স্বেচ্ছাসেবকের জননী আনন্দপ্রকাশ করেন এবং আপনারাও স্বেচ্ছাসেবক হইয়া কারাদণ্ড পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহিলাটি ৩রা তারিখে শোভাযাত্রায় যোগদানও করিয়াছিলেন। ৫০ বৎসর বয়স্কা ১ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করাও হইয়াছিল।

৮ই তারিখে যে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে একাধিক লক্ষপতি ছিলেন। দেশের ধনবান্ দলও যে জাতীয় মুক্তিচেষ্টায় এইরূপে যোগ দিয়েছেন, ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

সরকার সত্যাগ্রহীদিগের কোন কোন টেলিগ্রাম বন্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

এ দিকে গুজরাট কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটী নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন :—

"নাগপুরে জাতীয় পতাকার জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে, এই কমিটী সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে অনুরোধ করিতেছেন, কমিটী যেন প্রয়োজন হইলে নাগপুরের সত্যাগ্রহীদিগকে সাহায্য করেন ও স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করেন।"

পল্লী-পুণাতে বিরাট শোভাযাত্রা হয়। সে দিন শ্রীযুক্ত দেকাতে নেতা ছিলেন। সহস্র সহস্র লোক স্বেচ্ছাসেবকদিগের অনুসরণ করে। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন চারিদিকে জয়ধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নিজামুদ্দীন সত্যাগ্রহে সাহায্য করিবার জন্য জব্বলপুরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি নাগপুরে যাইয়া শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

এই সময় শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী নাম্নী মহিলাও গ্রেপ্তার হয়েন। তিনি বলেন, তিনি জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়াই আদালতে যাইবেন। শেষে তাঁহার সে প্রস্তাবেও সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিতে হইয়াছিল। তিনি যে মামলার দিন হাজির হইবেন, তাঁহাকে সেইরূপ প্রতিশ্রুতি বা জামীন দিতে বলা হয়। তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, তাঁহাকে হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। শেষে কিন্তু সেণ্ট্রাল জেল হইতে তাঁহাকে ও সন্ন্যাসী মৌনী বাবাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সত্যাগ্রহেরই জয় হয়।

জেলের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেকাতের বিচার হয়। দণ্ড :—

(১) ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাবাস ও ৫০ টাকা

জরিমানা—জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস;

(২) ১৮৮ ধারায় ১ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস ও ২০ টাকা জরিমানা—জরিমানা অনাদায়ে ১ সপ্তাহ বিনাশ্রমে কারাবাস;

(৩) আদালত অবমাননার অপরাধে ৩ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস।

অর্থাৎ আইনের ধারায় যতদূর পাওয়া যায়, তাহা ধরিয়া তাঁহাকে দণ্ডদান করা হইয়াছে।

নাগপুরে এই আন্দোলনে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই অনুষ্ঠানে বালক, বৃদ্ধ, মহিলা, সন্ন্যাসী সকলেই যোগ দিয়াছেন এবং তাহাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সরকারী ব্যবহারে দেশের লোক কিরূপ অপমান অনুভব করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, ব্যুরোক্রেশী লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছেন, লোকও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য তত বদ্ধপরিকর হইতেছে। দেশের লোক শোভাযাত্রা করিবে—তাহারা পতাকা লইয়া যাইবে, তাহাতে যদি সরকারের আপত্তি হয়, তবে লোক মনে করে, তাহাদিগের সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। সেই জন্যই আবালবৃদ্ধবনিতা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন।

বিস্ময়ের বিষয়, মিসেস্ বেসাণ্ট এই ব্যাপারটিকে ছেলেখেলা বলিয়াছেন। অথচ তিনিই যখন "হোমরুল" পতাকা উড়াইয়াছিলেন, তখন সেটা ছেলেখেলা ছিল না—সেটা ছিল, রাজনীতিক আন্দোলন। অবশ্য, তিনি যদি ব্যুরোক্রেশীরই মত মনে করেন, যে অনুষ্ঠান শ্বেতাঙ্গদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না—তাহাই ছেলেখেলা—তাহাই নাবালকদিগের অনুষ্ঠান, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু দেশের লোক সে মতে মত দেয় না। দেশের লোক মনে করে, মুক্তি বিদেশী দান করিতে পারে না, জাতিকে যোগ্যতা লাভ করিয়া তাহা অর্জ্জন করিতে হয়। যিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সেই শ্বেতাঙ্গ মিষ্টার হিউম বলিয়াছিলেন—"আপনাদের বলে জাতি গঠিত হয় By themselves are nations made, যতদিন দেশের লোক সে সত্য উপলব্ধি করে নাই, ততদিন কংগ্রেসও দুর্ব্বল ছিল, তত দিন তাহার ছিল, "আবেদন আর নিবেদন থালা বহে বহে নতশির।" ততদিন সে মাথা তুলিতে পারে নাই। তাহার পর যখন দেশাত্মবোধ আসিয়া—তখন জাতি আপনার আত্মার সন্ধান পাইল—তখন জাতি ত্যাগের পথে মুক্তির সন্ধান করিল। সে পথে জাতির পথপ্রদর্শক মহাত্মা গন্ধী।

শ্রীযুক্ত দেকান্তে।

আমরা বলিয়াছি, যে জাতি স্বাধীন নহে, তাহার জাতীয় পতাকা কথাটার অর্থ করা দুষ্কর। কিন্তু যে পতাকা বিদেশী শাসকদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়, তাহার সেই লাঞ্ছনাই তাহাকে জাতীয় পতাকার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

কংগ্রেসে মতভেদ

শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষাপূর্ত্তির পক্ষে যথেষ্ট নহে, এই বিশ্বাস হেতু—কলিকাতায় লালা লজপতরায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের কলিকাতার অধিবেশনে স্থির হয়, কংগ্রেসের লোক সকলেই ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন
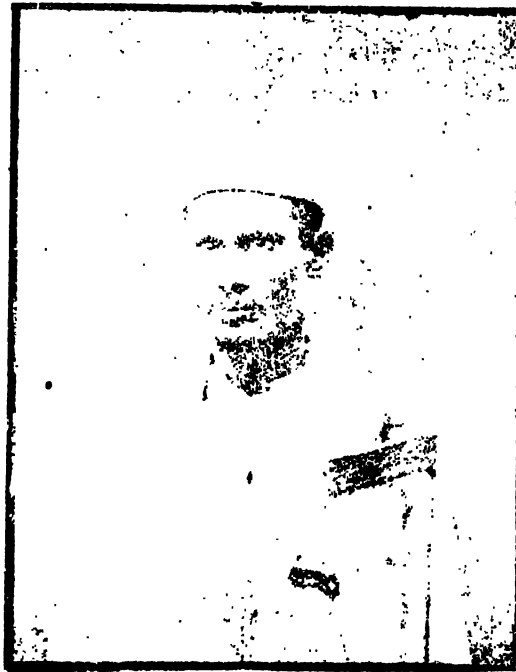
করিবেন। সেই ব্যাপার কত দূর সফল হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জনব্যবস্থাগুলির মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফল হইয়াছিল। তাহার পর নাগপুরে ও আমেদাবাদে কংগ্রেসের যে ২টি অধিবেশন হয়, তাহাতেও ঐ প্রস্তাবই গৃহীত হয়। যত দিন মহাত্মা গন্ধী কারারুদ্ধ হয়েন নাই, তত দিন বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষেই মত দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মার কারারোধের পর গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হইয়া চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সমর্থন করেন। কিন্তু গয়ায় সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

বিস্ময়ের বিষয়, গয়ায় ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও তাহার পর চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল প্রভৃতি আর কংগ্রেসের বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র দল গঠিত করেন এবং বলেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন। তবে তখনও চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন না। এখন আর তিনি সে মতেও অবিচলিত নাই; তিনি স্বয়ং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন।

দলাদলি যখন প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময় একটা আপোষ মিল হয়—কিছুদিনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ বিষয়ে কোন পক্ষই কোন কায করিবেন না; অর্থাৎ দাশ-নেহরুর স্বরাজ্যদলও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না; কংগ্রেসের দলও তাহার বিরুদ্ধ-মত প্রচার করিবেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিন শেষ হইতে না হইতে স্বরাজ্যদল তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইল। সেই অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যের মতে কংগ্রেসের নিদ্ধারণ নাকচ করা হইল। ৯৬ জন পক্ষে ও ৭১ জন বিপক্ষে মত দেওয়ায় মিষ্টার তাণ্ডনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য স্থগিদ রাখা হইবে; অর্থাৎ কংগ্রেস হইতে আর দেশের লোককে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতে বলা হইবে না, আর স্বরাজ্যদল সেই অবসরে কংগ্রেসের নামে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবেন।

এইরূপে কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের ৩টি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনায়াসে পদদলিত করিলেন। কিসের জন্য? —মিলনের জন্য?

এ মিলন কাহাদের সঙ্গে? যাঁহাদের সঙ্গে এই মিলন—তাঁহারা কংগ্রেসের বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই, অথচ মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন। এই মিলন যাঁহাদের সঙ্গে, তাঁহারা এমন কথাও বলিয়াছেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী, এমন কি, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনও যদি তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাঁহারা সে কথা মানিবেন না। যাঁহারা এই ভাবে কংগ্রেসের মর্য্যাদাহানি করিতে পারেন, তাঁহাদিগের সহিত মিলনের আগ্রহে কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি পরিত্যাগ করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

স্বরাজ দলের লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দাবি উপস্থাপিত করিবেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই পুরাতন আবেদন-নীতি অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদের আশা—বিদেশী বিজাতিগণের দয়াদত্ত দানে স্বরাজ লাভ করা যাইবে।

তাহার পর যদি তাঁহাদের দাবি অগ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ বিদেশী ব্যুরোক্রেশী যদি তাঁহাদের বক্তৃতায় ভয় পাইয়া তাঁহাদের দাবিশোধ অধিকার না দেন, তবে তাঁহারা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সরকারের সব প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন। অর্থাৎ সরকার যদি প্রস্তাব করেন, থানায় থানায় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হউক বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হউক বা দেশে জলকষ্টনিবারণকল্পে পুষ্করিণী খনন করান হউক, তবে তাঁহারা সে প্রস্তাবেও আপত্তি করিবেন। ফলে সরকার যে দেশের লোকের কাছে তাঁহাদিগকে দেশের লোকের মঙ্গলবিদ্বেষী প্রতিপন্ন করিবার সুযোগই পাইবেন, তাহাও তাঁহারা দেখিতেছেন না।

যিনি দেশের মুক্তিকামনার মূর্ত্ত-বিকাশ, বিদেশী ব্যুরোক্রেশী তাঁহাকে কারারুদ্ধ করায় যাহারা তাঁহার নির্দ্ধারণ অগ্রাহ্য করিয়া ও কংগ্রেসের বহু মতের অবজ্ঞা করিয়া অসহযোগকে সহযোগের নামান্তরমাত্রে পরিণত করিতে

চাহিতেছেন, দেশের জনগণ কি তাঁহাদের মতই গ্রহণ করিবে?

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটী যদি এমন ভাবে কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ নাকচ করিতে পারেন, তবে কমিটীর নির্দ্ধারণই কেন কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুবর্ত্তীদিগের অবশ্য গ্রহণীয় হইবে?

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী কমিটীর এই নির্দ্ধারণ অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করায় কেহ কেহ তাঁহাকে দেশদ্রোহী বলিতেছেন। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যদি কংগ্রেসদ্রোহী বলিতে হয়, তবে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের সম্বন্ধে কি বলা যায়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কারণ, দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে দেশের প্রতিনিধি সভা বলা যায় না, এবং সেই জন্য তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অগ্রাহ্য করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেস যাহাই কেন বলুন না, তিনি আপনাকে কংগ্রেসের বড় মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলেন, তিনি কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ পালন করিবেন না।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশনে গয়া কংগ্রেসে গৃহীত ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনপ্রস্তাবানুযায়ী কার্য বন্ধ রাখা স্থির হয়, তাহাতে মোট ৩ শত ৫০ জন সদস্যের মোট ১ শত ৭৮ জন মাত্র বা প্রায় অর্দ্ধাংশ মাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই ১ শত ৭৮ জনের মধ্যে ৯৬ জন বর্জ্জন-প্রস্তাবানুযায়ী কার্য স্থগিত রাখিবার পক্ষে এবং ৭১ জন বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন—অবশিষ্ট ১১ জন কোন পক্ষেই মতপ্রকাশ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আধিক্যও অধিক হয় নাই। স্বরাজ্যদলকে যদি শক্তিশালী বলা যায়, তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তদপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী দল কলিকাতায়, নাগপুরে, আমেদাবাদে ও গয়ায় ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জনই কর্ত্তব্য বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় হয় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর আর একটি অধিবেশন আহ্বান করিয়া, নহে ত কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন করিয়া এ বিষয়ে দেশের প্রকৃত লোকমত নির্দ্ধারণ করা হউক।

স্যার নারায়ণ চন্দাবরকর

পরিণত বয়সে কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি, বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ ও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবক স্যার নারায়ণ চন্দাবরকরের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে চন্দাবরকর মহাশয়ের জন্ম হয়। এলফিনষ্টোন কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন এবং কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ "দক্ষিণার ফেলো" নিযুক্ত হয়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বিধায় তিনি সংবাদপত্রসেবায় প্রযুক্ত করেন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশের' ইংরাজী বিভাগে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। তিনি 'ইন্দুর' সহিত সম্পাদকীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার পরও সংবাদপত্রসেবার মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং অনেক সময় সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন এবং সেই সময় রাজনীতিচর্চ্চায় মন দেন। কংগ্রেস হইতে বিলাতে ভারতকথা ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমে যে কয়জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নিযুক্ত হয়েন।

সমাজ-সংস্কারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাঙ্গালায় ব্রাহ্ম সমাজের মত বোম্বাইয়ে যে প্রার্থনা-সমাজ আছে, তিনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং জাতিভেদ দূর করিতে, বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত করিতে, অনুন্নত জাতির উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত করেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হয়েন। তাঁহার অভিভাষণে মামুলী কথার আলোচনা ছিল—কিন্তু কোন কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। এই অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে সভাপতি স্থির করা হয়, তাহাতে আবার তিনি সভাপতি হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশয় ছুটী লওয়ায় তাঁহাকে অস্থায়িরূপে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত

করা হইয়াছে। কাযেই তাঁহার অভিভাষণে যতটা সতর্কতা ও সংযম ছিল, ততটা তেজ ছিল না।

রাণাডের মৃত্যুর পর তিনি হাইকোর্টের স্থায়ী জজ নিযুক্ত হয়েন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে চীফ জাষ্টিস সার বেসিল স্কট ছুটী লইয়া যাইলে কিছুদিন তাঁহার স্থানে চাকরীও করেন।

দেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে এডুকেশন কমিশনে সদস্য মনোনীত করেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট হইতে বিদায় লইবার পর তিনি ইন্দোরের দাওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অধিক দিন সে কায করেন নাই।

তিনি যে মডারেট প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে সরকার তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। বাঙ্গালায় যখন প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত লোককে আটক করা হইতে থাকে এবং চারিদিকে তাহার প্রতিবাদ হয়, তখন সরকার সে সম্বন্ধে অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে সমিতির সদস্য ছিলেন মিষ্টার বীচক্রফট ও সার নারায়ণ চন্দাবরকর। সে সমিতির সিদ্ধান্তে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কি সাক্ষ্য সমিতির সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা না জানিয়া তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া সঙ্গত নহে।

সার নারায়ণ সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন এবং সংবাদপত্রসেবক রূপেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারকরূপেই তিনি বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন।

শেষে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন।

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা য়ুরোপীয় পরিচালিত একটি বড় ব্যাঙ্ক। সহসা সে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যখন এ দেশে দেশীয়-চালিত কোন ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তখন অনেক য়ুরোপীয় বলেন, "যা'র কর্ম্ম তাকে সাজে"— ও সব কায এ দেশের লোক পারে না। কিন্তু আমাদেরই জীবিতকালে এ দেশে অনেকগুলি য়ুরোপীয়-চালিত ব্যাঙ্ক "লালবাতি জ্বালাইয়াছেন"—যথা ওরিয়েণ্টাল, কলিকাতা, আগরা, কমার্শিয়াল ও বার্ম্মা। এলায়েন্স দেউলিয়া হওয়ায় এ দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ, যে অবস্থায় যে ভাবে এই ব্যাঙ্ক ফেল হইল, তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ বিদ্যমান। এলায়েন্সের পরিচালকরা যে টাকা ধার দিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু সে সব বুঝিয়াও গত বৎসর সার ডেভিড ইউল লোককে আশা দিয়াছিলেন, ভয় নাই। যখন সার ডেভিড এই কথা বলেন, তখনও ব্যাঙ্কে য়ুরোপীয়দিগের অধিক টাকা ছিল, সে টাকাটা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল। শেষে কর্ত্তাদের কাহারও সহিত অপ্রীতিহেতু গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁহার গচ্ছিত ৮ কোটি টাকা তুলিয়া লয়েন। ৮ কোটি টাকা তুলিয়া লইলেও এলায়েন্স বন্ধ হইবার কথা নহে কিন্তু তাহাই হইয়াছে।

এ দিকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সের সম্পত্তি হাতে লইয়া জাল গুটাইতেছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে পাওনাদারদিগকে শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে দিবেন এবং আর যাহা হয় "পিছে দেখা যায়েগা"। এ অবস্থায় "ঘর পোড়ার বাঁশ" হিসাবে কোন কোন পাওনাদার সন্তুষ্ট হইলেও সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। তাই বোম্বাইয়ের দেশীয় সওদাগর সভা কলিকাতায় ২ জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া পাওনাদারদিগের সভায় মেসার্স লাভলক এণ্ড লুইসের সঙ্গে মিষ্টার বিলিমোরিয়াকেও জাল গুটাইবার কাযে (liquidation) নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিদ্বয়ের অন্যতম মিষ্টার মনু সুবেদার পূর্ব্বে কলিকাতায় অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পাওনাদারদিগের সভায় যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—এলায়েন্সের ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং অনুসন্ধানফলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু মিষ্টার বিলিমোরিয়ার এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকিলেও মেসার্স লাভলক এণ্ড লুইস

কিছুতেই তাঁহার সহিত একযোগে কায করিতে সম্মত হয়েন নাই।

এ অবস্থায় পাওনাদাররা যে অনুসন্ধানসমিতি গঠিত করিয়াছেন, তাহার সদস্যরা বিশেষ চেষ্টা না করিলে সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে না। আশা করি, তাঁহারা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার দেনা-পাওনা হাতে লইয়াছেন। কিন্তু দেশী ব্যাঙ্কের সময় কোন য়ুরোপীয় ব্যাঙ্ক কি এরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন?

পিপল্‌স ব্যাঙ্কের পাওনা যে দেনা অপেক্ষা অধিক ছিল, তাহা দেখা গিয়াছে—কারণ, পাওনাদাররা পূরা টাকা পাইয়াছেন। কিন্তু পিপল্‌স ব্যাঙ্ক কেন দেউলিয়া হইয়াছিল? আজ যে লালা হরকিষণলাল পঞ্জাব সরকারের অন্যতম মন্ত্রী—ব্যুরোক্রেশীর বাম হস্ত, তিনিই শিল্প-কমিশনে সে সব কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিশনের সভাপতি তাঁহাকে তাঁহার দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে—তিনি সে দায়িত্ব বুঝিয়াই সে সব কথা বলিয়াছিলেন। কমিশনের রিপোর্ট হইতে (৫ম খণ্ড) আমরা তাহার কতকাংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি:—

(১) পঞ্জাবে (দেশীয়) ব্যাঙ্ক নষ্ট করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই সব ব্যাঙ্কে দেশের অনেক উপকার হইত। তাহারা এই সব ব্যাঙ্ক নষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। (১৭৫ পৃষ্ঠা)

(২) দেশীয় লোকের হাতে ব্যাঙ্কের কার্য্য যে উন্নতিলাভ করে, ইহা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। (১৭৫ পৃষ্ঠা)

(৩) এমন কথাও রটনা করা হইয়াছিল যে, এই সব ব্যাঙ্কের দ্বারা রাজদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। দেশীয় লোক লোপকারবারে ব্যাঙ্কিং আরম্ভ করিতে না করিতে য়ুরোপীয় সরকারী কর্ম্মচারী ও বে-সরকারী লোক তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠে। তিনি এ দেশে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবামাত্র সরকারী ও বে-সরকারী য়ুরোপীয়রা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এক জন সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাকে দস্যুদলের সর্দ্দার বলিয়াছিলেন। (১৮৭ পৃষ্ঠা)

(৪) পিপল্‌স ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে আনন্দ আর ঢাকা থাকে নাই। যে দিন পিপল্‌স ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়, সে দিন পাঞ্জাবে একটা ভোজ হয় এবং তাহাতে খুব উল্লাস প্রকাশ করা হইয়াছিল there was great rejoicing (১৯১ পৃষ্ঠা)।

যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, লালাজী তাহাদের নাম দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারী মিষ্টার মেনার্ড সে কথাটা চাপা দেন। ভোজটা কোথায় হইয়াছিল, তাহা লালাজী সাক্ষ্যে না বলিলেও আমরা জানি। আমরা বলিতে পারি, পাঞ্জাবের নামজাদা ছোটলাট সার মাইকেল ওডয়ার সে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন না।

তাহার পর স্বদেশী ব্যাঙ্ক। শুনা যায়, স্বদেশী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চুনিলাল সোবেধা রোপা "ধরিয়া রাখার" চেষ্টা করাতেই ব্যাঙ্ক বিপন্ন হইয়াছিল এবং বিপদটা সাগরপার হইতে আসিয়াছিল।

এলায়েন্স ব্যাঙ্ককে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যে সাহায্য করিয়াছেন, সে সাহায্য পাইলে পিপল্‌স ব্যাঙ্ক বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেশীয় ব্যাঙ্কের ভাগ্যে সে সাহায্যলাভ ঘটে নাই। অবশ্য, লালা হরকিষণলালও বলিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যে কায করিতেছেন, আইনতঃ তাহা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কেবল তাহাই নহে, বোম্বাইয়ের ভারতীয় সওদাগররা শাসাইয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে হাইকোর্টে নালিশ করিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ইম্পিরিয়াল এলায়েন্সের পাওনাদারদিগকে শতকরা ৫০্ টাকা দিয়া দিতেছেন।

যদি কোন অনাচারে ব্যাঙ্কের এরূপ দশা হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া এবং অপরাধীদিগের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। মান্দ্রাজে আরবুথনট কোম্পানী যেরূপ কায করিয়া বহু ভারতীয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, এলায়েন্সের কর্তারা যদি সেরূপ কোন কায করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত দণ্ডভোগ করাই লোকের অভিপ্রেত হইবে।

এক জন দেশীয় হিসাবনবিশকে যে এ কাযে বিদেশীদের সহকর্ম্মী হইতে দেওয়া হইল না, ইহাতেও লোকের মনে নানারূপ সন্দেহ উঠা অনিবার্য্য।

স্বরাজ-সাধনা

যদিও আমি সমগ্র ভারতবর্ষকে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত দেবালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তথাপি ঐ দেবালয়ের যে অংশের মৃত্তিকা, নদ-নদীর বাহুল্য প্রভৃতি প্রকৃতির কারুণ্যে ভোগের অন্ন-ব্যঞ্জন ফল-ফুল-শস্যাদি উপকরণ উৎপাদনে সর্ব্বাধিক সমর্থ, সেই বঙ্গই আমার এই প্রবন্ধের আদি লক্ষ্য। এই বঙ্গদেশেই ইংরাজের প্রথম অধিষ্ঠান। বঙ্গের কপিলমুনির আশ্রমে দাঁড়াইয়াই দূরাগত জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখিয়া পৃথিবী যে গোল, এই ভৌগোলিক তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রথমেই আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের অনেকটাই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বলিয়া অভিহিত হইত। ভোগ-বিলাসের সুলভ যোগানায় জাহাজ বোঝাই করিয়া আনিয়া ইংরাজ প্রথমে তাহা বাঙ্গালার বন্দরেই ঢালিয়া দেন। আবার দেবভোগের অগ্রভাগ এবং উপাসকের কোলের বস্ত্র বাঙ্গালার বন্দর হইতে সেই জাহাজ ইংরাজ প্রথমে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বোঝাই করেন। এই বঙ্গদেশেই পুরাতন ব্রাহ্মণের প্রথম জাতিপাত ও নূতন ব্রাহ্মণের প্রথম অভিষেক; ফাঁসিকাঠের ত্রিকোণে ঝুলিয়া নন্দকুমারের উপবীত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল, আর লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া ক্লাইভ প্রমাণ করিলেন ব্রাহ্মণ অবধ্য। বাঙ্গালীর ঘরেই প্রথম A B C সিঁদ কাটিয়া ঢুকিল; বাঙ্গালী প্রথমেই পাজামার পরিবর্ত্তে পেন্টালেন পরিধান করিলেন, চাপকানের ঝুল ছাঁটিতে ছাঁটিতে হাঁটুর উপর তুলিলেন, বাবরির কারবার উঠাইয়া দিয়া ঘাড় কামাইয়া আলবার্ট টেরি তুলিলেন, বাঙ্গালী ললনা-ই সর্ব্বাগ্রে শাঁখা খুলিয়া বেলোয়ারী চুড়ীর মোহে মজিলেন, বাঙ্গালার হাবড়াতেই প্রথম রেল খুলিল, বাঙ্গালী বামাগোপাল ঘোষই প্রথমে রেলে চড়িলেন। বাঙ্গালী বেনিয়ানই ইংরাজকে প্রথমে বাঙ্গালার বাজারে পরিচিত করিয়া দিলেন, এ দেশে ইংরাজ প্রতিষ্ঠানে যাহা কিছু পুণ্য আছে, তাহার পুরস্কার বাঙ্গালীর-ই প্রাপ্য, আর যদি কিছু পাপ থাকে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে, মাথা মুড়াইয়া গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে তুষানল-ও করিতে হইবে। এই সকল কারণে এবং নিজে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাকে বড় ভালবাসি বলিয়া বাঙ্গালার কথা আমি বেশী ভাবি, এতদ্ভিন্ন আজ সমগ্র ভারতবাসী যে চিন্তায় চিন্তিত, যে কল্পনায় অনুপ্রাণিত, যে ভাবে মাতোয়ারা, সে চিন্তা সে কল্পনা সে ভাব প্রথমে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে বাঙ্গালীর হৃদয়ে বাঙ্গালীর প্রাণে-ই উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার পাইয়াছে বলিয়াই নিশ্চিন্ত বাঙ্গালী আজ উদ্বিগ্ন, নিদ্রিত বাঙ্গালী আজ ধড়ফড় করিতেছে, প্রভু ইংরাজের স্বাধীনতা দেখিয়া দাস বাঙ্গালী আজ অধীনতার বেদনা বুঝিয়া অধীর হইয়াছে! ইংরাজের, তথা য়ুরোপের স্বাধীনতার ইতিহাস পড়িয়া বাঙ্গালী ভারতের, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে শিখিয়াছে, রাঁধিতে রাঁধিতে পাছে গালে ফুলিয়া বসে, এই ভয়ে মা-খুড়ী ছোট মেয়েকে রান্নাঘরে ঢুকিতে না দিলে সে যেমন ধুলা-বালি বস্ত্রখণ্ডের অন্ন-ব্যঞ্জন রাঁধিয়া গৃহিণীপনার সাধ মিটায়, বাঙ্গালী তেমনই প্রকৃত বীরত্ববিকাশের অঙ্গন-প্রবেশে বঞ্চিত হইয়া তাহার কাব্যে, উপন্যাসে, নাট্যে, রঙ্গমঞ্চে বীরভাবের খেলাঘর পাতিয়াছে।

কিন্তু মানুষ হইয়াছি দাই 'মা'র কোলে বসিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়ফড় করিতে করিতে 'পুণীর-মা পুণীর মা' বলিয়া ডাকিতেছি সেই দাই 'মা'কেই; পুণীর মা আগে সব ক্ষীরটুকু লুকিয়ে পুণীকে খাওয়াইয়া শুক্‌নো বোঁটাটা আমার মুখে পূরে দেয়, তবু সেই পুণীর প্রসাদের ভাগাভাগি লইয়াই দাই মা'কে আঁচড়াইতেছি, কামড়াইতেছি, 'পোড়ার মুখী' বলে গাল দিচ্ছি, সেই ইতরজাতীয়া নারীর স্তন্য পানে মুখের তার এমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, গর্ভধারিণীর হৃদয়স্থ স্নেহমাখা পয়োধরের চুচুকে মুখ দিতে একবার-ও প্রবৃত্তি হইতেছে না, মা আদর করিয়া কোলে বসাইয়া

নিজের পাতের অন্ন টিপিয়া টিপিয়া মুখে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলে-ও হামা দিয়া ছুটিয়া যাই পুনীর-মা'র পাতের থেকে 'বেগুন পোড়া' কাড়িয়া লইতে। মা'র পীড়ার সময় পুনীর-মা এক দিন আমাকে ঘরের মেজেয় শোওয়াইয়া দিয়া পুনীকে কোলে করিয়া পুনীকে চুমা খাইয়াছিল—সেই দিন হইতে আমার পুনীর মার উপর রাগ, রাগে একেবারে আমি রামমাণিক্য হইয়া গেলাম। দীনবন্ধু বাবুর সৃষ্ট রামমাণিক্য এক দিন মদের আসরে বসিয়া আমোদ করিতেছে, আর অটল নিমেদত্ত প্রভৃতি তাহাকে 'বাঙ্গাল', 'বাঙ্গাল' বলিয়া ক্ষেপাইতেছে, একে মদের নেশা তাহার উপর কানের কাছে 'বাঙ্গাল' 'বাঙ্গাল' রামমাণিক্যের মনে ধিক্কার জন্মিল, সে বলিল, 'বাঙ্গাল' কোউস্ ক্যান্—বাঙ্গাল কি ভাসে আসছে? কোল্‌কাত্তায় আইছি, মাগুরে চিকন ধুতি পরাইছি, বাণ্ডিল খাইছি, গোরার বাড়ীর বিসকাট ভোক্ষণ করছি, তবু হালার কোল্‌কাত্তার মত হতি পা'লাম না, আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দি, আমার দেহ হাঙ্গরে কুম্ভীরে ভোক্ষণ করুক। এই বলিয়া রামমাণিক্য পপাত ধরণীতলে।

ইলবার্টবিলের হাঙ্গামার সময়ে-ও বঙ্গের রামমাণিক্যরা ও বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এংরাজী পড়্‌লাম—বেলাত যাই-লাম, হ্যাট্‌কোট প্যাণ্ট পর্‌লাম, বিফ্ হ্যাম্ ভোক্ষণ কর্‌লাম, চাত্‌ভাইকে নেটিভ বল্লাম—মোচাকে ক্যানাকা ফুল কইলাম—তবু হালার সাহেব না বোলে অয়েলি বেঙ্গলী কয়? —তবে দেশহিতৈষী হইলাম—কংগ্রেস কর্‌লাম।

প্রায়শ্চিত্ত যে করিতে হইবে, তাহা বাঙ্গালী বুঝিয়াছে, তবে প্রায় ১৭০ বৎসরের সাধনাজনিত সংস্কারে তাহার রুচি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, যখন দেব-দুর্ল্লভ চন্দনে বীতরাগ হইয়া সে সুগন্ধ সুরাসারমিশ্রিত মৃতজীবের বসা সানুরাগে শিরোদেশে পর্য্যাপ্ত ম্রক্ষণ করিতেছে, তখন যে গোময় গুলিয়া তাহার পিতামহ নারায়ণশিলাকে স্নান করাইতেন, সে গোময় যে সে রসনার দ্বারা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিবে, তাহা কিছু বিচিত্র নয়। গোময় যে একটা সুখাদ্য, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু লোহার কড়াই হজম করিতে পারায় যেমন একটা বাহাদুরী আছে, তেমনি অপরাধ স্বীকার করিয়া গুরুতর দণ্ডগ্রহণ উদ্দেশ্যে ক্ষীর-সর-সেবাগ্রহণপটু রসনায় গোময় গ্রহণেও একটু পুরুষত্ব আছে। ক্যাথলিক জগতে ইটালী স্পেন ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অধীশ্বররা-ও গায়ে ছাই মাখিয়া গুণচট পরিয়া নিজের অঙ্গে নিজে বেত্রাঘাত করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। পুরাণপাঠে দেখা যায়, মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় কোটী তপস্বিগণ বিজনবনে অনশনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ড হইয়া মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর তপস্যা করিতেন। আর আমরা এই লৌকিক দেহে অধীনতা-নিগড় হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোথায় কতটুকু কি ভাবে সাধনা করিতেছি? সাধনার মধ্যে ত দেখিতে পাই, হয় ইংরাজের নিন্দা—না হয় ইংরাজের কাছে ভিক্ষা আর আপনাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ। উদীপরা দেশ-ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই ও আশ্রম-উপাধি নিন্দানন্দ স্বামী কুৎসানন্দ স্বামী দ্বন্দ্বানন্দ স্বামী বিদ্বেষানন্দ স্বামী প্রভৃতি। এ সন্ন্যাস গ্রহণ অপেক্ষা তাঁহারা যে তন্দারাম দাস ছিলেন, সেই তন্দারাম দাস থাকিলেই মন্দ হইত না। যৌবনে মানব-মনে ত্যাগের পিপাসা সহজে বলবতী হয়; প্রায় বিংশতি বৎসর হইল, এ দেশের কতকগুলি যুবক সেই দেব পিপাসার বশে দেশমাতার মন্দিরদ্বারে আত্মবলি প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই বলি-দানের উদ্যোগে আমরা 'জয় কালী' 'জয় কালী' না বলিয়া 'জয় পাঁঠা' 'জয় পাঁঠা' বলিয়া এত চেঁচাইলাম, ঢাক ঢোল বাজাইয়া ধূপ ধুনা দিয়া ফুল-মালা দোলাইয়া এত ধুমধাম করিলাম যে, সে বলিদান যেন একটা কসাইয়ের উৎসবে পরিণত হইল। তোমরা মুরুব্বীরা মুরুব্বীয়ানা ছাড়া কিছু পার না, তাই এই বাছারা বিজয়কামনা বিসর্জ্জন দিয়া লোকলজ্জা অগ্রাহ্য করিয়া অপমানের বোঝা মাথায় তুলিয়া, জেলের পান-আহার-প্রহারের অশেষ ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য বুক বাঁধিয়া তাহাদের অভিমানে 'অ্যাটিলান্টিক' ডুবাইবার জন্য যত-ই প্রস্তুত হইতে লাগিল, তোমরাও প্রতি-বাদের শিঙায় ফুঁ দিয়া 'ব্রাভো' 'ব্রাভো' 'এন্‌কোর' 'এন্‌কোর' বলিয়া তাহার সেই সঙ্কল্পিত 'আমিকে' শতগুণ ফুলাইয়া তুলিলে।

ধর্ম্মের জন্য দেশের জন্য ভালবাসার জন্য যে কোন উপাস্যের জন্য ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগের—এমন কি, জীবন-বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে, বিশেষতঃ হিন্দু-স্থানে ঐরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্তের জন্য পুরাণ বা

ইতিহাসের পাতা উল্টাইবার প্রয়োজন নাই; রাজ-বিধি-নিষিদ্ধ হইলে-ও পতির মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সতীর আকস্মিক না স্বেচ্ছাকৃত দেহত্যাগের কথা এখন ও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়; বারাণসী বৃন্দাবনাদি তীর্থে এখন-ও দেখিতে পাইবেন, কত রাজ-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন লোক সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের ধ্যানে রত আছেন। মানুষ অনেক ত্যাগ-ই করিতে পারে, কেবল সহজে ত্যাগ করিতে পারে না তাহার 'অহং'; যিনি দেশ সেবার অপরাধে অপরাধী হইয়া গিলটিনে বা ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন জরিমানা দিতেছেন, বোধ হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার-ও অন্তরে একবার 'আমি' উঁকি মারিয়া মনের কানে কানে জিজ্ঞাসা করে, কথাটা কাগজের কাগজে ভাল করিয়া ছাপা হইবে কি না, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে বিরাট শোক সভা হইবে কি না। আর যদি কেহ অনেক সাধনায় 'আমি'র মায়া কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার পারিপার্শ্বিকেরা তাহা করিতে দেয় না। এক একটা এমন দুষ্ট ছেলে আছে যে, নিজে-ও লিখিবে না, পরের ছেলের-ও দোয়াত কাড়িয়া লইবে। একবার শ্রীশ্রীকাশীধামে পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীপরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; দিগম্বর প্রাচীন পুরুষ, অধরে শিশুর মধুর হাসি, অধমের প্রতি কৃপা করিয়া কতক্ষণ ধরিয়া কর্ণে দেববাণী শুনাইলেন, শ্রীচরণাগে প্রণত হইয়া উঠিয়া আসিতেছি, এক জন পার্শ্বচর আসিয়া আমার হস্তে একখানি পুস্তিকা দিল, খুলিয়া দেখি, ইংরাজীতে ছাপা কয়েকটি পর্য্যটক বা উচ্চপদস্থ ইংরাজের ও দেশীয় লোকের প্রদত্ত স্বামীজীর প্রশংসা-পত্র; —হা রে! পরমহংসের সার্টিফিকেট! মন উঠিয়াছিল, গঙ্গাতীরস্থ বেণীমাধবের ধ্বজার উপর, পড়িয়া গেল একেবারে বিশ্বেশ্বরের পরিত্যক্ত ভগ্নমন্দিরের পশ্চাৎস্থিত অন্ধকূপ জ্ঞানবাপী পূতিগন্ধপূর্ণ কালিবর্ণ জলের নীচে।

কেন ভুলিয়া যাও,—সোনার চাঁদ ছেলেরা অভিমানের রজ্জু ত্যাগ করিয়া জেল-ঘরে ত্যাগ শিক্ষা করিতেছে; আবার তাহাদের গলায় ফুলের গোড়ে জড়াইয়া মাৎসর্য্যের রাজ্যে টানিয়া আনিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাও? দাসদাসী দ্বারা পরিবৃত করিয়া মাৎসর্য্যের ফণী দংশন করাইয়া তাহাদের ত জর্জ্জরিত করিয়াছ, যদি তাহারা পুরুষের তেজে বন্দিশালার কদর্য্য ভোজনের ও কর্কশ শয্যায় শয়নের জন্য প্রস্তুত হয়, কেন মায়াবিনী পিসীমার মত চীৎকার করিতে থাক যে, জেলের কর্তৃপক্ষ বাছাদের গদী বিছানা দিতেছে না, দাদখানি চালের ভাতের সঙ্গে পার্শ্বে মাছের ঝোল পরিবেশন করিতেছে না বলিয়া?

শাসনতন্ত্রের সমক্ষে অপরাধী ব্যক্তিকে শাসিত করিবার জন্য বন্দিশালা স্থাপনের সাধারণতঃ দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য; প্রথমতঃ যে সমাজের অনিষ্ট করিয়া সে অপরাধী, সেই সমাজের চক্ষে তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা; দ্বিতীয়তঃ যে দেহের সুখ ও আরামের জন্য যে দেহস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে লোকের অহিতকর অকর্ম্ম করিয়াছে, সেই দেহকে অশনে বসনে বিরামে বন্ধনে কষ্ট দিয়া তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা; (অবশ্য যেমন বেতের চোটে ছেলের পেটে বিদ্যা ঢুকাইয়া দেওয়া যায় না, তেমনি সবাই চোরকে-ও ঘানিতে ঘুরাইয়া কেশব সেন করা যায় না।) জেলের এই সব কার্য্য ব্যবস্থার উপর বৈশ্য ইংরাজ আবার বেশ একটু দোকানদারী-ও ঢুকাইয়াছেন, কয়েদীরা যখন ভাত খায়, তখন ঘানি টানিবে না কেন?

অন্যান্য দেশে রাজা-ই সমাজপতি, কিন্তু এক্ষণে আমাদের যাঁরা রাজা, তাঁদের সহিত আমাদের সমাজের কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে প্রজা রাজ চক্ষে অপরাধী হইলে-ও সমাজের চক্ষে অপরাধী হয় না। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাহারা জেলে যায়, সমাজ তাহাদিগকে সময় সময় ভ্রান্ত মনে করিলেও শান্ত বৈ অশান্ত মনে করে না; তাহাদের কৃত কর্ম্মকে অন্যায় মনে করিলে-ও উদ্দেশ্য স্বার্থশূন্য জানিয়া বরং মহত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন; সুতরাং সমাজের চক্ষে এসব বন্দী ঘৃণ্য না হইয়া সম্মান্য হয়, কাযেই মানের দিক্ হইতে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত যুবকদিগের কোন শাস্তি কোন ত্যাগ-ই নাই। যেমন যুধিষ্ঠিরের দর্শনে নরক-ও পবিত্র হইয়াছিল, এই সকল বন্দীদিগের পদার্পণে জেল-ও পবিত্র হইয়াছে। যেমন সেই অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশের সময় আলোকাকর গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন, সেইরূপ বোধ হয় অনেক রাজনৈতিক বন্দীর কারাসঙ্গী ছিলেন স্বয়ং নারায়ণ; অরবিন্দের সঙ্গে যে তিনি ছিলেন এবং গন্ধীর সঙ্গে যে তিনি আছেন, তাহা প্রত্যক্ষ।

রাজাও ভ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষে যে অপ-র . . তাহাকে শাসন দ্বারা সংশোধিত করিবার উদ্দেশ্য যে . . এবং রাজোচিত, ইহা তিনি মনে করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজবিধি যখন রাজনৈতিক বন্দীর মাথা হেঁট করাইবার জন্ত তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করে তখন বন্দী মাথা উঁচু করিয়া অধরে মধুর হাসি হাসিয়া দেখাইয়া দেয় যে, তাহার বিবেক-ও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বিবেক নিন্দনীয় নহে, বন্দনীয়; সেইরূপ কারা-দূতেরা যখন ঐ বন্দীর সম্মুখে কুকুরের-ও অগ্রহণীয় কদন্ন ধরিয়া দেয়, ছারপোকার উপনিবেশ-সংবলিত জীর্ণ কম্বলে শয়ন করিতে দেয়, তখন-ও তাহার সেই অন্ন দেব-ভোগ বলিয়া মুখে তুলিয়া এবং সেই লজ্জাকর শয্যাকে ফুলশয্যার আদর দিয়া দেখান উচিত যে, বিবেকের স্ফূর্তিতে আত্মার আরামে তাহার দেহাত্মবোধবুদ্ধি একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। গুরু মহাশয়ের বেত খাইয়া যে পোড়ো যত চেঁচায়, তার পিঠে তত বেশী বেত পড়ে, আর যে ডানপিঠে ছেলেটা দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া থাকে, গুরুমহাশয় তাহার কাছে হারিয়া যায়। এক সহিয়া থাক, মাথা পাতিও না—আর যদি হাড়িকাঠে মাথা পাত, তবে ফুলের খাঁড়ায় বৈষ্ণবী বলি প্রত্যাশা কর কেন?

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে, ভারতের অন্য অন্য প্রদেশ কেমন জীবন্ত, কিন্তু বঙ্গদেশ যেন নিবিয়া গিয়াছে—কোন উচ্চবাচ্য নাই। 'উচ্চবাচ্য' বঙ্গ-দেশ অনেক দিন ধরিয়া করিয়াছে; ৪০ বৎসরের উপর বাঙ্গালীরা দুহাতে দাঁড় টানিয়া তাহাদের নৌকাকে মাইলের পর মাইল বাহিয়া লইয়া গিয়া একটা মোহনার মুখে দাঁড় উঠাইয়া ধরিয়া চিন্তা করিতেছে—গলুয়ের মুখ কোন্ দিকে ফিরাইবে, তাই সেই নৌকা হইতে এখন ঝপ্ ঝপ্ শব্দ শুন যাইতেছে না; যে সব প্রদেশের লোক পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহারা এখন আগাইয়া আসিবার জন্ত ঝপাঝপ্ দাঁড় টানিতেছে, জল ছড়াইয়া নদী তোলপাড় করিতেছে। পুষ্করিণীতে কলসী ডুবাইলে যতক্ষণ জল প্রবেশ করিতে থাকে, ততক্ষণ একটা বক্ বক্ শব্দ হয়, কলস পরিপূর্ণ হইলে আর কোন শব্দ থাকে না। বাঙ্গালীর কলস প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাই শব্দোচ্ছ্বাস আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। এখন বাঙ্গালীকে ভাবিতে হইতেছে যে, ঐ জল সে স্বজনের পিপাসানিবৃত্তির জন্য ব্যয় করিবে, না কলসীর ভিতর গোবর গুলিয়া প্রতিপক্ষের মাথায় ঢালিয়া দিবে।

তেজস্বী অশ্বের ন্যায় যুবাজন-মন কার্য্য কার্য্য করিয়া আকুল হইয়া উঠে, স্থাবরের ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া পাশের পড়া মুখস্থ করিয়া-ই যুবক তাহার উদীয়মান জীবনসূর্য্যকে অস্তপথে যাইতে দিতে চাহে না, সে তাহার দেহ-মনকে খাটাইয়া লইতে চায়, খাটিতে তাহার আনন্দ, খাটুনি দেখিতে তাহার আনন্দ; সাফল্যপ্রদ শ্রমের পথ তাহাকে কেহ দেখাইয়া দেয় না বলিয়া-ই সে স্কুলে ছোটে, ফুটবলের মাঠে ছোটে, আবার কখন কখন পথভ্রষ্ট হইয়া মনে করে সে মজা লোটে। কিন্তু এ দেশের ভদ্র-ঘরের ছেলেরা ক্রমে শক্তিহীন হইতেছে; কৈশোরসুলভ রক্তের তেজে তাহারা হাউইয়ের মতন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া আকাশের দিকে উঠে বটে, কিন্তু ক্ষণপরেই নিবিয়া গিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। গ্রাজুয়েট জীবনের প্রারম্ভে তাহার উদ্যম উৎসাহ তেজের মধ্যে যে শক্তি থাকে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট অবস্থায় তাহার অর্দ্ধেকের উপর-ও কমিয়া যায়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সে রুগ্নদেহ মেরুদণ্ড ভগ্ন পঙ্গু-বিশেষে দাঁড়ায়. কেবল পেটের জ্বালায় ও পরিবারের তাড়ায় যা ট্রামভাড়া করিয়া পড়িয়া পড়াইতে আদালতে বিদ্যা ছড়াইতে বা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে কলম পিসিতে যায়। যাহারা জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি ব্যায়ামচর্চ্চায় বা ফুটবল ক্রিকেট আদি ক্রীড়ায় দেহের বল ও ক্ষিপ্রতার সমধিক পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের মধ্যে অনেককেই দেখা গিয়াছে,—৭৮ বৎসর যাইতে না যাইতে ক্ষীণশক্তি বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অনেকের বিশ্বাস যে, ছেলেরা তত দি মাছ মাংস বেশী খাইতে পায় না বলিয়া বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এ ধারণাটি নিতান্ত ভ্রমমূলক। অনেকের বাড়ীতেই হিন্দুস্থানী বেহারার ছেলে কাজ করে, একবার নিজের ছেলের কঙ্কালের সঙ্গে সেই হিন্দুস্থানী ছেলের গতর মিলাইয়া দেখিবেন দেখি, ঐ কাহারবাচ্ছার কি হাতের গুলি, কি বুকের ছাতি! আপনার ছেলের জলের গেলাসটি হাতে তুলতে আঙ্গুলে খিল ধরে আর বারো বছরের সীতারাম চৌবাচ্চার ভিতর বড় বোমা ডুবাইয়া দেড়শটা ফুলের টবে এক ঘণ্টার ভিতর জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে রামা হুগ্গা ভরতুয়ার

সঙ্গে কপাটী খেলিতে আরম্ভ করে। আবার এই ১২ বছরের সীতারাম ০২ বছর বয়সে বাঁকে করিয়া গঙ্গা হইতে জল আনিবে, বঁট পাতিয়া খড় কাটিবে, বড় বড় পেতলের হাঁড়া লোহার কড়া মার্জ্জনার ঘর্ষণে সোনারূপার ন্যায় চক্‌চকে করিয়া তুলিবে। ৫০বৎসর বয়সে ঐ সীতারাম ঐ সকল কার্য্য করিবে আর মাঝে মাঝে ছুটীতে মুল্লুক যাকে আপনা জমিনমে লাঙ্গল দেকে 'ক্ষেতি' করিবে। সীতারামের বাপ-মা ভূমিষ্ঠ হবার পর হইতেই সীতারামকে পুরুষ করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছে—তাই সীতারাম ১০ বৎসর বয়সে-ও জল-ভরা পিতলের কলসী কাঁধে লইয়া তেতালায় যাইতে পারে; সীতারামের প্রতিবেশীরা শিশু সীতারামকে বেশ গাট্টা-গোট্টা জোয়ান দেখে বলিলে সীতারামের পিসী সেই প্রতিবেশীকে তাহার ভিটেতে দ' পড়াইয়া তাহার বেটা কাটিয়া গালি দিল না বলিয়াই সীতারাম আজ মানুষ হইয়াছে—পুরুষ হইয়াছে। আমাদের ছেলেকে জোয়ান বলা দূরে থাক, কেউ যদি ছেলেটির দিব্যি শরীর, কোন অসুখ বিসুখ নেই বলে, তাহা হইলে হিতৈষিণী পিসী মাসীরা সেই সর্ব্বনাশীর শতেকখোয়ার করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তাহাকে আকন্দর ডাল চাপা দিয়া গলায় মামড়ার পাটি বাঘের নখ দোলাইয়া যমের হাত থেকে টানাটানি করিবার চেষ্টা করিতেছি—তা সে জগৎ সমস্ত দেখিবে না ত কি করিবে? ছেলে যদি একটু নারিকেলের শাঁস খালে তুলিল ত বাবা আসেন তেড়ে কলেরা কলেরা ক'রে, আর মুগের দালের বদলে অড়র ডালটি পাতে ঢালিলে ঠাকুরমা আসেন বাটি কাড়িতে, এই ছেলে বড় হয়ে কি মহিষাসুর বধ করিবে? ছেলের মা যদি অন্যমনস্কে ব'লে ফেলেন, "বাবা, আমার কাপড়খানা ছাদ থেকে তুলে আন্ দিকিন্", অমনি মেজঠাকুরঝি ব'লে উঠে—"বৌ, তোমার কেমন আক্কেল গা? ঐ ননীর বাছা, ওকে দিয়ে একটা বয়ারের কায করান?" এইরূপে ছেলেটিকে জন্ম অবধি বুঝাইতেছি যে তুমি মর-মর, তার উপর ফিন ফিনে ধুতি পরাইয়া বেলদার পিরান গায়ে দোলাইয়া যামিনী কামিনী নাম রাখিয়া তাহাকে বুঝাইতেছি, তুমি ললিত লবঙ্গলতা অবলা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মনুষ্য-চরিত্র গঠনে অশন বসন নামকরণ-ও অন্যান্য উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান। আমি কোথায় যেন লিখিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবুর নাম যদি গোবর্দ্ধন হ'ত, তা হ'লে তিনি কখনই বিষবৃক্ষ লিখ্‌তে পার্‌তেন না। আগে সব নাম ছিল কি পুরুষের মত! ভীম, অর্জ্জুন, কৃত্তিবাস, শম্ভু, জনার্দ্দন, পীতাম্বর, গোবিন্দ; তার পর না হয় হরেন্দ্র, নরেন্দ্র, বরেন্দ্র যা হোক মাঝা-মাঝি; আরে বাপ্ রে এ আবার কি? যামিনী কামিনী নলিনী রমণী অনঙ্গ; তা বেশ হয়েছে, মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার চাচ্চে, তাঁদের নাম হোক কেদার, হরি, নীলাম্বর, দ্বোয়ারি, ভরদ্বাজ ইত্যাদি।

অভ্যাসযোগ নামে একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে, আদরের নামে কতকগুলি কদভ্যাস করাইয়া আমরা ছেলেদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছি। প্রত্যেক বাবার বোঝা উচিত যে ছেলে তাঁর একলার নয়—ছেলে দেশের, ছেলে জগদীশ্বরের; তিনি বাল্যের জিম্মাদার—রসদদার মাত্র; তিনি যদি তাহাকে মানুষ করিয়া পুরুষ করিয়া তুলিতে পারেন, সে আজীবন দেবতাজ্ঞানে তাঁহার চরণে প্রণত হইবে, যাবামত তোমার সেবাতুষ্টি সম্পাদন করিবে, আর ভগবানের সৃষ্টির বিরোধী হইয়া যদি তুমি তাহার পৌরুষ নাশ কর, সে তোমাকে শত্রু জ্ঞান করিবে।

[ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

৩১শে বৈশাখ —

বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় মুক্তাকাশতলে আইন অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত। মোসলেম জগৎ সম্পাদক খাঁ মোহাম্মদ মৈনুদ্দীনের ১ম [illegible] সশ্রম কারাদণ্ড। পরমানন্দের রাজা যুক্তপ্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হইলেন; ছত্রীর নবাব অন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র নাগ লবণ-করের প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলেন। হাবড়ায় কয়েকজন যুবক মুসলমান মোটরে ডাকাতি করিতে যাইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার। কালীকটে হিন্দু ও মোপলাদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামায় একজন হিন্দু নিহত এবং ৫ জন হিন্দু ও ২ জন মোপলা আহত। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমায় নমঃশূদ্র ও মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা।

১লা জ্যৈষ্ঠ—

পাঞ্জাব, গোবিন্দপুর কংগ্রেসের সভাপতি অমরিক সিং বাটালী ও কুড়ী লইয়া লাহোরে লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিতে গিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মান্দ্রাজ, পেদ্দাপুর তালুকের বয়গানি গ্রামে রম্পা হাঙ্গামার সময় বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করায় তথায় পিউনিটিভ পুলিস বসাইবার আদেশ। দেশবন্ধু দাশের আবার আপোষ-চেষ্টা, বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় যোগদানের সঙ্কল্প। সারদাপীঠের জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রমুখ কয় জন কয়েদী [illegible] হইতে হাজারীবাগ জেলে স্থানান্তরিত। পাটনা মিউনিসিপ্যালিটীর গোবধ বন্ধের প্রস্তাব ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নাকচ। কলিকাতা রামবাগানের খুনী মামলায় গোপেন্দ্রনাথের ২ বৎসর ও গোপালের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ঢাকার উপকণ্ঠে প্লেগের আবির্ভাব, নয় জনের মৃত্যু। হাবড়া জেলায় মোটরচারী দস্যুদল কর্ত্তৃক জমীদার খুন। মিউনিসিপ্যালিটী কসাইখানা খোলায় বাঁকীপুর ও পাটনার কসাইগণের ধর্ম্মঘট। বৃটিশ মন্ত্রিসভার রুসিয়া-প্রদত্ত চরমপত্রের প্রত্যুত্তর; রুস প্রতিনিধি এম ক্রাসিনের লণ্ডনে আগমন ও পার্লামেণ্টে পত্রের আলোচনার সময় উপস্থিতি।

২রা জ্যৈষ্ঠ—

কলিকাতার কোন বাঙ্গালা জাতীয় দলের পত্র ও সার্জ্জেণ্টের কংগ্রেসের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কথা। মেদিনীপুরে সাঁওতাল বিভ্রাট উপলক্ষে এক জন কংগ্রেসকর্ম্মী ও কয়েক জন সাঁওতালের প্রতি ১৪৪ ধারায় বহিষ্কারের আদেশ। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীমান্ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার। নারায়ণগঞ্জ খেলাফৎ অফিসে খানাতল্লাস ও ডাকাতির সন্দেহে দুই জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। অমৃতসর ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক কেস। আমেরিকার আরকানসাস প্রদেশের হট স্প্রিং নগর জলপ্লাবন ও বজ্রাঘাতে ধ্বংস। বাগদাদ রেলের অধিকাংশ হিস্যা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হস্তগত করিবার বন্দোবস্ত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—

লরেন্স মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিবার ব্যাপারে অমুক সিংকে সাহায্য করায় যুগরাজের কারাদণ্ড; অমুক সিং পাগলা গারদে প্রেরিত। রাঁচীতে খানাতল্লাসীর ফলে "ভ্যানগার্ড" ও "এডভান্স গার্ড" পত্রিকা ধৃত। নাগপুর সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কংগ্রেসের টেলিগ্রাম আটক করিবার সংবাদ। বলশেভিক প্রচারক সন্দেহে পাঞ্জাবে ৭০ জন লোক গ্রেপ্তার। শুদ্ধি আন্দোলনে মৌলানা আজাদ সোভানি ও পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের পরিদর্শনের রিপোর্ট; তাঁহারা আর্য্য সমাজীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ দেখিতে পান নাই। [illegible] জেলায় অসহযোগ দমনে গ্রাম্য সরপঞ্চদিগকে বিনা মাহিনায় গোয়েন্দার কার্য্যে নিয়োগের সংবাদ। কলিকাতায় কলিন লেনে মৌলবী কুতবুদ্দীন আহম্মদের গৃহে খানাতল্লাস। মিঃ টি, জি, ওয়েষ্ট রক্সবর্গ কলিকাতার নূতন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত।

বহরমপুরের বাঙ্গালা সাপ্তাহিক "প্রতিকার" পত্রের ৫০ বৎসর পূর্ণ। লাহোরে ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াও দেউলে উঠিলেন। তুরস্কের সহিত পোলাণ্ডের বাণিজ্য সন্ধি-স্থাপনের কথাবার্ত্তা।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেসে কাউন্সিল বয়কট স্থগিতের প্রস্তাব গৃহীত। যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ত্তৃক তাঁহাদের মিউনিসিপ্যাল পার্টিকে উপদেশ দিবার জন্য একটি বুরো গঠনের প্রস্তাব। লরেন্স প্রতিমূর্ত্তি সম্পর্কে জাহাঙ্গীর চাঁদ গ্রেপ্তার। ঢাকা জেলা কংগ্রেস অফিস, উহার পার্শ্বস্থ একখানা বাড়ী ও টাউন-খেলাফৎ অফিসে খানাতল্লাস। রাজসাহী নওগাঁর যমুনা নদীতে বিপন্ন কোন যুবককে রক্ষা করায় রাম শীল ওঝা নামে গাড়োয়ানের প্রশংসা-পত্র লাভ। কৃষ্ণনগর আদালতের কোন উকীলের বিরুদ্ধ কুৎসিত অভিযোগে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক তাঁহার কান কাটার সংবাদ। ময়মনসিং, জামালপুরে দুই জন সন্ন্যাসী বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ করায় আদালতে জরিমানা, পুলিস সঙ্গে দিয়া ভিক্ষা করাইয়া জরিমানা আদায়ের সংবাদ। চট্টগ্রামে [illegible] ব্যাঙ্কের হুণ্ডী বাতিল হওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—

সালেমের ডাঃ বরদারাজুলু নাইডু [illegible] আয়কর প্রদান না করায় তাঁহার জমী নীলামে বিক্রয়। লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি সরাইবার চেষ্টায় [illegible]চাঁদ নামে জনৈক যুবক গ্রেপ্তার। বর্ত্তমান লরেন্স প্রতিমূর্ত্তি সরাইয়া আপত্তিকর লেখশূন্য অন্য একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রস্তাব গৃহীত। নাগপুরের পতাকা সংগ্রামে গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেসের সমর্থন ও স্বেচ্ছাসেবক দিয়া সাহায্যের সঙ্কল্প। যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধী অসুস্থ। মুন্সীগঞ্জের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সিংহের ঢাকার বাড়ী হইতে ১৫ হাজার টাকা চুরী।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—

হুগলী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রায়োপবেশনে [illegible] মিঃ ডিকেন্সনের নিকট ডাঃ আবদুল্লা সুহ্রাওয়ার্দ্দীর তার। বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোনার ল'র পদত্যাগ। নাইরোবীতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টিতে রেলপথ জখম, নদীর সেতু ধ্বংস। লসেনে ভরোস্কির হত্যা ব্যাপার লইয়া সুইস গবর্ণমেণ্টের সহিত সোভিয়েটের বিরোধ। চীনে ট্রেণের [illegible] দস্যুদল কর্ত্তৃক বিদেশীয়দের অপহরণে চীন সরকারের নিকট বৈদেশিক দূতদের কড়া তাগাদা।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—

অমৃতসর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক তিন মাসের স্থলে ছয় মাস অতিরিক্ত পুলিস পোষণের সঙ্কল্প; ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর। আগ্রা মিউনিসিপ্যালিটী বাড়ীর ও জলের ট্যাক্স না লইয়া কাজ চালাইতে পারেন কি না, সে বিষয়ে বিচারের জন্য কমিটী গঠন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ সরকার স্থানীয় ছোটখাট গ্রাম-শিল্পগুলির সাহায্যার্থ পাঁচ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, একটি শিল্প-বোর্ডও গঠিত হইয়াছে। [illegible] মন্দিরের জনৈক সন্ন্যাসী কোন বিধবা [illegible] উৎপাদনের জন্য খোরাক-পোষাকের দায়ী হইলেন। মিস এলিসের উদ্ধারকার্য্যে সাহায্য করার জন্য দুই জন ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীকে কাইসার-ই-হিন্দ [illegible] পুরস্কার মঞ্জুর। এই কোহাট কাণ্ডের দস্যুদের আশ্রয়দাতা গ্রাম গুলি ধ্বংস করা হইল; এই সম্পর্কে গিরিপথের আফ্রিদীদের লক্ষ টাকা জরিমানা, সেখানে খানাতল্লাস আদি করিবার এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার বসাইবার অধিকার আদায়। কাবুলের আমীর কর্ত্তৃক ভারতীয় আফগান প্রজা রুশ-তুর্কীস্থানের দূতপদে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ। কলোনে স্থিত জার্ম্মাণ সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্স কর্ত্তৃক ৬০০ কোটি মার্ক ক্রোক।

২য় বর্ষ } ১ম * আষাঢ়, ১৩৩০ * খণ্ড { ৩য় সংখ্যা

বেদান্ত কি ?

অনেকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বেদান্তদর্শন ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অন্তর্গত কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "বেদ" শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান"—"গ্রন্থ" নহে; আর "অন্ত" শব্দের অর্থ "পরিসমাপ্তি।" সুতরাং বেদান্ত শব্দের অর্থ পরম বা চরম জ্ঞান। সুতরাং "বেদান্তদর্শন" মানবের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছে এবং মুমুক্ষু তপস্বীদিগকে সেই পরম ফল লাভের পথ দেখাইয়া দিতেছে। মানবের বিষয়সম্বন্ধগত জ্ঞান ও আত্মবোধ, পরিশেষে মানবাত্মার সহিত নিত্য সত্যযোগে পরিসমাপ্ত হয়। সেই চরম সত্যই বিশ্বের সারশক্তি। তাহাই অসীম জ্ঞানের সমুদ্র। যেমন নদী সকল শত শত ক্রোশব্যাপী গিরিবন্ধুর প্রদেশ, কাননকুন্তলা সমভূমি এবং রম্য-হর্ম্ম্যমালা-চিত্রিত বিচিত্র নগর অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ দেশকালভেদে নানাশ্রেণীর নরনারী তাঁহাদিগের দেশকালোচিত নিজস্ব শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক অনুভূতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পরিণামে সেই এক সত্তা, চৈতন্য, পরমানন্দ ও প্রেমে বিলীন হয়।

এই যোগোপলব্ধি প্রত্যেক সত্যশাসিত ধর্ম্মের অপরিহার্য্য লক্ষ্য বলিয়া সমাদৃত হইবেই। পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি—প্রাচীন ভারতের ঋষিরা ইহা যেমন সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ কখনও করেন নাই।

পঞ্চ সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতভূমি এই পরম তত্ত্ব পরম যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে যে, সত্য এক, তাহার প্রাপ্তির পথ নানা। পৃথিবীর সংহিতসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম, তাহাতে লিখিত আছে:—যাহা একমেবাদ্বিতীয়ম্—লোক তাহাকেই নানা নামে পরিচিত করে। তাঁহাকেই ইহুদীরা যীহোবা, খৃষ্টানরা গড বা স্বর্গস্থিত পিতা এবং মুসলমানরা আল্লা, বৌদ্ধরা বুদ্ধ, আর জৈনরা জিন ও হিন্দুরা ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিয়া থাকেন।

সত্যের এই ভিত্তির উপর সমস্ত বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত। যে সকল মনীষী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, বেদান্ত নানা নামে যেমন ভাবে জীবাত্মার ও পরমাত্মার ঐক্য দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তেমন ভাবে আর কোন ধর্ম্মমত বা দর্শনই করিতে পারে নাই বলিয়াই ইহাকে ভিত্তি করিয়া যেরূপ ভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—সেরূপ আর কোন ধর্ম্মের দ্বারা হইতে পারে না। সুতরাং চেষ্টা করিলেই বেদান্তপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম ইহজগতের সমস্ত ধর্ম্মকে আপনার আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া বিশ্বব্যাপী পরমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

এই বেদান্তদর্শনোক্ত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্ম বা দর্শন কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে, তাহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত ও সমাদৃত হইতে পারে না। কোন ধর্ম্মকে জগন্মান্য ধর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগে তাহাকে কোন ব্যক্তির সহিত সম্পর্কশূন্য করিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মের কোন প্রবর্ত্তকের সন্ধান মিলিবে, তত দিন সে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতার প্রভাবে প্রভাবিত হইবে, তত দিন সে ধর্ম্ম খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ বা তদ্রূপ ধর্ম্মেরই মত সার্ব্বজনীন হইতে পারিবে না। এই সকল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া মূলনীতি উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের মতকেও স্বীকার করেন না। ফলে কত দ্বন্দ্ব, কলহ, অনাচার হয়, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেদান্তানুমোদিত ধর্ম্মের অনেক রূপ। জোরোয়াষ্টার ধর্ম্মমত, ইহুদিয়া ধর্ম্মমত, খৃষ্টান ধর্ম্মমত প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্মমত ইহজগতে পরমেশ্বরের বা কোন পবিত্র আদর্শের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সেরূপ সমস্ত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদমূলক ধর্ম্মই বেদান্তের দ্বৈতবাদে পাওয়া যায়। যে সকল ধর্ম্মে ভগবানের চিৎসত্তার শিক্ষা প্রদত্ত হয়, বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশাল বক্ষে সে সকলই আশ্রয় পাইতে পারে।

"ভগবান্ বিশ্বের মত মানবের দেহমন্দিরেও বাস করেন," "তিনিই পরমাত্মা," "মানুষ বিরাট একের অংশ মাত্র," "আমরা ভগবানের সন্তান"—"চিরানন্দের সন্তান"—এইরূপ সকল ভাবই বেদান্তব্যাখ্যাত ধর্ম্মে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদান্তের অদ্বৈতবাদই তাহার সর্ব্বপ্রধান অংশ। আধ্যাত্মিক একত্বের বিরাটত্ব সকল ধর্ম্মান্বেষী ধারণা করিতে পারেন না। কিন্তু এই ভাবেই বিজ্ঞানের ও দর্শনের সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং ইহাই সকল ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। এই ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে সাধক বলিতে পারেন না—"তত্ত্বমসি।"

বেদান্তে ধর্ম্মের ও দর্শনের সমন্বয়। গ্রীসে ও জার্ম্মাণীতে নানা দর্শন আছে বটে, কিন্তু সে সকলে মানবের মানসিক আদর্শের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই। ভারতের বেদান্তদর্শনে ভগবানের সত্তানুভবের এবং অজ্ঞতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের যেরূপ যুক্তিসঙ্গত উপায়-নির্দেশ আছে, সেরূপ আর কোন দেশের কোন দর্শনে নাই। যাহা যুক্তির বিরোধী বা যাহা বিজ্ঞান, দর্শন ও ন্যায়ের সহিত সামঞ্জস্যহীন—এমন কোন কথা বেদান্ত মানুষকে বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে বলে না। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কখনও বিজ্ঞান, দর্শন ও ন্যায় হইতে বিচ্ছিন্ন—স্বতন্ত্র হয় নাই। ফলে বেদান্তমত অতি প্রাচীন হইলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান—ইহা অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করে এবং ভবিষ্যতে যে সব সত্য আবিষ্কৃত হইবে, বেদান্তে সে সকলও স্থান পাইতে পারিবে।

বেদান্ত সাধনমার্গের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা বৈচিত্র্য সমর্থন করিয়া থাকে। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক হইলেও পরিণামে সকলেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হয় ও পরমতত্ত্বকেই লাভ করে। কেবল তাহাই নহে, সাধকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যে বাধা দেওয়া উন্নত বেদান্তধর্ম্মের বিরোধী। পরন্তু বেদান্ত মানবমনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যে পথ যাহার উপযোগী, তাহাকে সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। বেদান্ত মানবের চিত্তবৃত্তিসমূহকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; সেই চতুর্ব্বিভাগের বহু শাখা-প্রশাখাও আছে, কাযেই সর্ব্বজাতীয় লোক বেদান্তদর্শনোক্ত ধর্ম্মে আশ্রয় পাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, অধিকারিভেদে মানুষ যাহাতে সাধনার সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়া ক্রমে অত্যুন্নত ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিচার ও বিবেচনা করিয়া বেদান্ত তাহাদের সাধনপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। সংস্কৃত ভাষায় এই সব সাধনপ্রণালী "যোগ" নামে অভিহিত।

প্রথমে **কর্ম্মযোগের** কথাই বলিতেছি। যে সব ক্ষিপ্রকারী কর্ম্মঠ ব্যক্তি পরিশ্রম স্বীকার করিতে ও পরের হিতসাধনের জন্য শ্রম করিতে চাহেন, কর্ম্মযোগ তাঁহাদেরই উপযোগী। যাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যস্ত, সেইরূপ নরনারীর পক্ষে কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়। কর্ম্মযোগ মানুষকে কর্ম্মের অন্তর্নিহিত পরমতত্ত্ব শিখাইয়া দেয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ কেমন করিয়া নিত্যকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান ও প্রেম

রূপের পূজা করিতে পারে, কিরূপে মানব কর্ম্মের দ্বারা এই জীবনেই পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কর্ম্মযোগ তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়। যাঁহারা কর্ম্মপ্রিয়, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয় ও অপরিহার্য্য। অতি অল্প উদ্যমে কিরূপে মহৎ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায়, তাহা এই কর্ম্মযোগেরই অবলম্বনে বুঝিতে ও শিখিতে পারা যায়। এ দেশের অধিকাংশ লোকের মানসিক শক্তি দৈনন্দিন জীবনের অকারণ প্রাবল্যে অযথা অপব্যয়িত হইতেছে। আত্মসংযমের অভাবই এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। কর্ম্মযোগের অন্তর্নিহিত তথ্যটি ইঁহাদিগের জানা থাকিলে, ইঁহারা এই অপচয়ের প্রতীকার করিতে পারিতেন; বহুবিধ স্নায়ুরোগের প্রতিবিধান হইতে পারিত এবং লোকের আয়ু বৃদ্ধি পাইত। কর্ম্মযোগ এই রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া মানুষকে আত্মজয়ের পথ দেখাইয়া দিতেছে।

শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় উপায় *ভক্তিযোগ।* ভাবপ্রবণ মানবের পক্ষে ভক্তিযোগই সাধনার অবলম্বন। মানুষের সাধারণ চিত্তবৃত্তি বিধিসিদ্ধ নীতি অনুসারে নিয়মিত হইলে, তাহার দ্বারা অতি উচ্চ অঙ্গের অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় এবং পরিণামে সেই উপায়েই পরম জ্ঞান ও পরম প্রেমস্বরূপকে উপলব্ধি করা যায়। ইহাই সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য, এক কথায় এই মার্গই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমভক্তিমার্গ। ভক্তিতত্ত্বের অনুশীলন করিলে নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমের মাধুর্য্য অনুভব করা যায় এবং মানবের সকাম প্রেমকে কামপাশমুক্ত দিব্যপ্রেমে পরিণত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে পরমানন্দ লাভ করা যায়।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ *রাজযোগ।* রাজযোগের অবলম্বন চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং ঈপ্সিতের ধ্যান। রাজযোগের ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। সমগ্র অধ্যাত্মজগৎ ইহার প্রভাবক্ষেত্র। কি প্রকারে মানুষের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মশক্তি ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হয়, রাজযোগে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই যোগমার্গের অবলম্বনে সিদ্ধযোগীরা পরকীয় চিত্তের চিন্তাসমূহ জানিতে পারেন এবং দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় যোগীর সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহের অনুভূতি অতি প্রখর হয়। তিনি রোগীদিগকে রোগমুক্ত করিতে পারেন, আর সাধারণতঃ যে সকল ব্যাপারকে লোক দৈবব্যাপার বলিয়া জানে, তাহাও ঘটাইতে পারেন। নজারতের যীশু ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী যে অধ্যাত্মবল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমানকালেও সেই অধ্যাত্মশক্তির সাধন ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মানসিকচিকিৎসা, দৈবচিকিৎসা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা প্রভৃতি পুরাকাল হইতে ভারতীয় যোগিসমাজে প্রচলিত।

রাজযোগ এই সকল অধ্যাত্মব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত করে এবং সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া অভিনব বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রাণায়ামশিক্ষা ইহারই অন্তর্ভুক্ত। দেহে ও মনে এই প্রাণায়ামের আশ্চর্য্যজনক ফল প্রতীচ্যের মানসিক চিকিৎসকদিগের অজ্ঞাত নাই। রাজযোগ যেমন অধ্যাত্মশক্তিসমূহকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণ করে, তেমনই আবার শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দেয়—এই সব শক্তি লাভ করিলেই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হয় না। বিদেশের খৃষ্টান, বৈজ্ঞানিক ও মানসিক চিকিৎসকদিগকে এই সত্য ভারতের যোগীদিগের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে।

যাহারা অল্পবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞানী, তাহাদিগের কোন প্রকার আধ্যাত্মিকশক্তি হইলেই তাহারা সাধনার পথ পরিত্যাগ করে। যোগবলের প্রয়োগে মাথাধরা ও ফিকবেদনা সারাইতে পারিলে ইহারা মনে করে, তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। রাজযোগ মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, আধ্যাত্মিক শক্তির অপপ্রয়োগ ও তাহাকে ব্যবসায়ে পরিণত করা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায়। রাজযোগের লক্ষ্য অতি উচ্চ, ধ্যান ধারণা ও সমাধির দ্বারা অকপট যোগীকে ব্রহ্মচৈতন্যে পৌঁছিয়া দেওয়াই রাজযোগের অভিপ্রেত, রাজযোগের উচ্চমার্গে অধিরূঢ় হইয়া যোগী সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ জীবন্মুক্ত হয়েন, নিত্যানন্দ ও শাশ্বতী শান্তি লাভ করেন।

জ্ঞানযোগ আত্মলাভের চতুর্থ উপায় বা পথ। জ্ঞানযোগের অবলম্বনে শুদ্ধজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি লাভ করা যায়। যাঁহারা স্বভাবতঃ সূক্ষ্মদর্শী, বিচারবুদ্ধিশীল ও তত্ত্বানুশীলনতৎপর, এই মার্গ তাঁহাদিগেরই উপযোগী। সুতরাং একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে,

বেদান্তানুমোদিত সাধনমার্গ কত বিশ্বপ্রসারী। ইহাতে অধ্যাত্মদর্শনের মূলতত্ত্বগুলি বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পর আত্মার স্থিতি ও গতি সংক্রান্ত তত্ত্বও ইহার দ্বারা বুঝা যায়। কিরূপ আত্মা আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারে ·· এবং পরেই বা তাহারা কি গতি লাভ করে, ইহাতে তাহাও বুঝা যায়। পার্থিব সুখের অভিলাষী বা বিষয়বাসনাসক্ত আত্মা কর্ম্মপাশবদ্ধ; তাহা কিরূপে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহাও বেদান্তে বুঝা যায়। এক কথায় ইহা আত্মবিজ্ঞান প্রকাশ করে। সুইডেনবার্গ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার অনেক পূর্ব্বে বেদান্ত যোগের নিয়ম বিবৃত করিয়াছিল। বেদান্তধর্ম্মীরা পৃথিবীর সকল দেশের অধ্যাত্মবিৎ লোকশিক্ষকদিগের জ্ঞানের সমাদর করেন, তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত অবতার পুরুষদিগের আবির্ভাবের অবসর দিয়া থাকেন। ধর্ম্মতত্ত্বের যাহা আদি রহস্য, বেদান্ত তাহা বুঝাইয়া দেয়। আমরা কেন নীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইব? অমুক অমুক পুঁথিতে অমুক কথাটি লিখিয়া রাখিয়াছেন, অমুকের অমুক সংহিতায় অমুক অধ্যায়ে অমুক শ্লোকে লিখা আছে বলিয়াই যে আমরা তাহা গ্রহণ করিব, এমন নহে, পরন্তু পৃথিবীর বিশাল অধ্যাত্ম ঐক্যহেতুই তাহা স্বীকার করিয়া লইব। তুমি যদি অন্যের অপকার কর, তবে তোমারও অপকার হইবে; তুমি যদি মন্দ হও, তবে তুমি কেবল নিজের নহে, পরন্তু অপরেরও ক্ষতি করিবে। বেদান্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যের মধ্য দিয়া এই সত্য প্রকট করে যে, আমরা প্রতিবেশীদিগকে আপনার মত ভালবাসিব; কারণ, আত্মায় আমরা সেই প্রতিবেশীর সহিত এক বই ভিন্ন নহি।

পৃথিবীর ধর্ম্মগুলে শান্তি ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাই বেদান্তধর্ম্মনীতির মুখ্য লক্ষ্য। যে স্থানেই বেদান্তের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা, সেই স্থানেই ধর্ম্মের অনুশীলনে সাহচর্য্য ও ঔদার্য্যের রাজত্ব, সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণ বেদান্তবাদিনী ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। সেই পবিত্র আশ্রয়ে পরপীড়ার স্থান নাই।

বেদান্তধর্ম্মশিক্ষার্থী কোন সম্প্রদায়, কোন তন্ত্র বা কোন প্রকার উপাধির দাসত্ব করেন না। তিনি খৃষ্টান নহেন, মুসলমান নহেন, বৌদ্ধ নহেন, জৈন নহেন, হিন্দু নহেন। কিন্তু মূলতঃ তিনি সকলের সহিত এক। মন্দির, মসজিদ ও গির্জ্জা তাঁহার দৃষ্টিতে এক, তিনি যে কোন প্রকারের সাধনমন্দিরে যাইতে পারেন। তিনি যে নামরূপ উপাধিশূন্য অনন্তধর্ম্মাশ্রয়ী, তাহাই পৃথিবীর সমস্ত বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রাণশক্তিরূপে বিদ্যমান। বেদান্তপন্থী উত্তরোত্তর যতই এই বিশ্বধর্ম্মের রহস্যবিৎ হইতে থাকেন, ততই তাঁহার মুখ হইতে আচার্য্য ম্যাক্সমূলারের সেই মহতী বাণী উচ্চারিত হইয়া থাকে—"বেদান্ত সকল ধর্ম্মকেই আপনার ক্রোড়ে স্থান দিতে পারে, কেবল তাহাই নহে—বেদান্ত সব ধর্ম্মকেই প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কারণ বেদান্তের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার মূলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত সেই বাণী নিহিত রহিয়াছে,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" *

স্বামী অভেদানন্দ।

* মার্কিণে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ।

শক্তিতীর্থে

এ যে পুণ্য শক্তিতীর্থ দেবী নিকেতন,
বহিতেছে হেথা নিত্য রুধির-প্রবাহ,
হেথা কেন কামক্লেদ,—কামনার দাহ
ধিক্কৃত পশুত্বে কেন আত্মবিনোদন?
নিয়ে এস বীরখড়্গ—পৌরুষ-বিভব,
ছিন্ন কর খড়্গাঘাতে দৃঢ় কামপাশ,
মুক্তির পবিত্র তীর্থে এ কি আত্মনাশ?
জ্ঞানহারা, হীনবীর্য্য মৃত্যুমৌন শব।

দেবধর্ম্ম—বীরধর্ম্ম—স্বপ্ন,—স্মৃতিশেষ,
মুখে শুধু শূন্যগর্ভ বীর-অহঙ্কার,
কোন্ মন্ত্রে লভিবি রে পৌরুষ দুর্ব্বার
কেমনে সহিবি বক্ষে বজ্র-বেধ-ক্লেশ,
কে আছ পুরুষসিংহ,—ভক্তি-নম্রমনে
এস পূজি' চণ্ডিকারে বসি' বীরাসনে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গরীবের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ
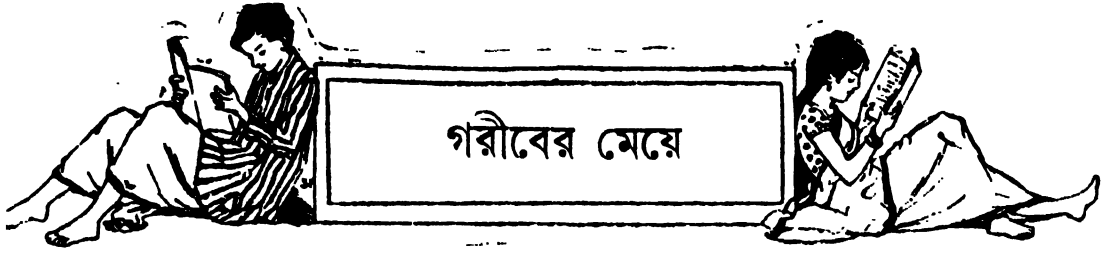
কলিকাতা শ্যামবাজারে ভুবনমোহন রায়ের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। তাঁহার সুদৃশ্য উদ্যানে যত স্বদেশী, ততই বিদেশী পত্র-পুষ্পের বৃক্ষলতা উজ্জ্বল শোভায় পথিকের নয়ন-মন মুগ্ধ করিত। তাঁহার আস্তাবলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া, ঝকমকে ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো ও মোটর। তাঁহার অতি মূল্যবান্ স্বদেশী বিদেশী গৃহসজ্জা প্রভৃতিতে সুরুচি, ধনবত্তা ও বিদেশের প্রতি অভক্তি না থাকিলেও স্বদেশের প্রতি যে ভক্তি আছে, তাহার পরিচয় প্রদান করে। বিশেষ যত্নপূর্ব্বক কাশ্মীর, লাহোর, মৃজাপুর, মোরাদাবাদ, কাশী ও মাদ্রাজ প্রদেশীয় অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভার যতদূর এ দেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশের আপাতমনোরম নিকৃষ্ট ও সহজলভ্য পদার্থ-দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ না করিয়া সযত্নে আহরণ করা হইয়াছে।

ভুবন বাবুর পৈতৃক বাটীতে যদিও এতটা ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ ছিল না, তথাপি সেই পুরাতন 'এজমালি'র সম্পত্তিকে তিনি কালের হস্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে সাহায্য করেন নাই। এ বিষয়ে অনেক বড় বড় নামজাদা কৃষ্ণ-বিষ্ণুদের পৈতৃক-গৃহ হইতে তাহার পৈতৃক গৃহকে সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে!

সে বাটীও সুবৃহৎ। যদিও তাহা উদ্যানবেষ্টিত নহে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে বহুদূর-বিস্তৃত প্রকাণ্ড ফলের বাগান অমূল্য ও অক্ষয় ফলের ভাণ্ডারস্বরূপ বারো মাসই গৃহস্থ পোষণ করিয়া আসিতেছে। উদ্যানে স্নান ও পানের জন্য একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে; তাহা সযত্ন রক্ষিত ও সুসংস্কৃত। বাসন মাজিবার জন্য অপর একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা ডোবা এই উদ্যানের এক পার্শ্বে অবস্থিত; তাহা হিঞ্চা, কলমী, পানা, পানিফল এবং শরৎ প্রারম্ভে কুমুদকহ্লার ও সুনীলবর্ণের পানা-ফুলে খচিত হইয়া থাকিত।

বাটীর সদরদরজা পার হইয়া সুপ্রশস্ত অঙ্গন; ইহার এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ; সাত আটটা সিঁড়ি দিয়া মণ্ডপে উঠিতে হয়। পুরাতন হর্ম্ম্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ আট-পলে জোড়া থাম, থামের মাথায় বিচিত্র পশু-পক্ষী, খিলানসমূহে নানাবিধ লতাপাতা ও জালির কায। এই অঙ্গনের দক্ষিণধারে সারি সারি বৈঠকখানা ঘর, তাহার সম্মুখে দৌড়দার টানা দালান। ঘরগুলি সেকালের প্রথা-মত নীচু চৌকির উপর ঢালা বিছানায় সজ্জিত। ছিটের জাজিমের উপর দুই একটা করিয়া তাকিয়া-বালিস রাখা। তাকিয়াগুলি অবশ্য সেকালের চেয়ে একালে হ্রস্বাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তা মানুষগুলিই কি হয় নাই?

এই বাড়ী এখন বিয়ে-বাড়ী। গৃহস্বামী ভুবন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা তরুলতার বিবাহ এই ফাল্গুন মাসেই স্থির হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভুবন বাবুরা সপরিবারে তাঁহাদের পল্লীগৃহে আগমন করিয়াছেন। যদিও এখনকার প্রথামত এই গ্রামের বাটীতে না আসিয়া তাঁহার সুখৈশ্বর্য্যমণ্ডিত কলিকাতার বাটীতে বিবাহ দেওয়াই সঙ্গত ছিল, তথাপি অনেক বিষয়ে আধুনিক হইলেও ভুবন বাবুর কতকগুলি সেকেলে মতামত ছিল; তাহার মধ্যের একটি এই পল্লীপ্রীতি। সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিলেও প্রতি বৎসর পূজাবকাশে তিনি তাঁহার অন্যান্য সমপদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় সিমলা, দার্জ্জিলিং বা মধুপুর যাত্রা না করিয়া পৈতৃক আবাসে আগমন করেন। বাটীতে তাঁহার যথেষ্ট সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব হয়। কলিকাতায় থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখিয়াও ভুবন বাবু সেই পৈতৃক পূজা উঠাইয়া দেন নাই, বরং মহার্ঘতা বৃদ্ধি পাইলেও সযত্নে সেই সব পুরাতন রীতি যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ভুবন বাবুর পিতা অমর বাবুর আমলে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ইতর-ভদ্র এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিত, এ দিনে গ্রামবাসী ভদ্রগণ অধিকাংশই দেশত্যাগী; তবে পল্লীবাসী অপর সকল ব্যক্তিরই এই তিন দিন বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বারণ আছে। এই দেশ-ভক্তি ও পল্লীপ্রীতিই কলিকাতানিবাসী ধনী ভুবন বাবুর কন্যার বিবাহ পল্লীগ্রামে ঘটাইয়া, তাঁহার অনেক ধনী ও

শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের মন ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কারণ, ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাঁহারা ত এখানে আসিতে পারেন না!

ভুবন বাবুর এতদূর সুখৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার সংসার শ্মশান। গৃহলক্ষ্মীশূন্য নিরানন্দ গৃহস্থালী মরুভূমির মতই সুখলেশহীন। প্রথম যৌবনের মুখে এত বড় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবন স্রোতোহত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্যগুণে তিনি নিজেকে ছন্নছাড়া ও নিরুদ্যম হইতে অবসর দেন নাই। বাহিরের প্রেয়সীকে অন্তরের মানসী-প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কট সঙ্কুল যৌবনকাল তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত কিরণ আজ অবসানের পথে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাধারণে এই ধনী ব্যক্তিটির এ ইচ্ছাকৃত ত্যাগের মর্ম্ম কোথায়, খুঁজিয়া পাইত না। বিশেষতঃ, তাঁহার অকাল-কালকবলিতা পত্নী চারুশশী দেখিতে একেবারেই সাদাসিদা ও সাধারণ ছিল। কলিকাতার বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের অভিভাবিকারূপে যে বালবিধবা ভগিনীটি বাস করিতেন, এখন তাঁহারও বয়স চল্লিশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নাম তাঁহার সরোজিনী। সরোজ পাঁচ জনের অনুরোধে দাদাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারে গৃহ-লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার কথা একবারমাত্র বলিতে গিয়াছিল, তাহার যে উত্তর সে তাহার দাদার নিকট পাইয়াছিল, তাহার পর আর কেহ দাদাকে বিবাহের কথা বলিতে অনুরোধ করিলে, জিভ্ কাটিয়া সে সভয়ে উত্তর দিত, "বাপ্ রে! আবার আমি বল্‌বো? বল্‌তে হয় ত তোমরা বল গে—আমি আর বল্‌তে যাচ্ছিনে।"

সরোজিনীর দাদা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আমায় কেন বিয়ে কর্‌তে বল্‌ছিস্? আমিও তা হ'লে তোকে বিয়ে কর্‌তে বল্‌বো; মনে মনে এই ইচ্ছা, না?"

সরোজ রাগ করিয়া বলে, "তুমি কি যে যা' তা' কথা বল! ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?"

দাদা বলেন, "মুখে নেই থাক্, মনে ত আছে? না হ'লে আমাকেই বা তুই কোন্ হিসাবে বল্‌তে পার্‌লি?"

সরোজ বলিল, "আমাতে আর তোমাতে?"

ভুবন বলিলেন, "কেন, তুই কি আমার চাইতে বিদ্যা-বুদ্ধিতে এতই শ্রেষ্ঠ যে, তোর সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না?"

সরোজ মুখ লাল করিয়া জবাব দিল, "যাও। তা' কি বলেছি? তুমি যে বেটাছেলে। বেটাছেলেরা ত দু'বার ছেড়ে চারবার বিয়েও করে, তুমিই বা আর একবার না কর্‌বে কেন?"

ভুবন বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "কোন কোন বিধবা শুনি লুকিয়ে মাছ খায়, তুইও কি তাই খাবি? ওই ও বাড়ীর লেডী ডাক্তার যখন তিনবার বিয়ে করেছে, তখন তুইও কেন আর একবার কর না?"

সরোজিনী বিপন্নভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "থাম, আর আমি কখন যদি তোমায় বিয়ে কর্‌তে বলি"

কিন্তু দাদা তখনই থামিলেন না, তিনি তেমনই সহাস্য-মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি তিন ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে যদি আবার বিয়ে কর্‌তে পারি, তা হ'লে তোর ত একটিও ছেলে-মেয়ে হয়নি, তোর বেলা ত মোটেই দোষ হ'তে পারে না! আজকালকার মেয়ে-পুরুষে যে ভেদ উঠেই যাচ্ছে; তবে তুই-ই বা কেন চিরকাল ধ'রে একাদশী ক'রে মর্‌বি, তার চেয়ে—"

সরোজিনী উঠিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে "ঘাট মানলুম তবু হলো না? বল্‌ছি, আমি আর কখন তোমায় এ কথা বল্‌বো না।"—বলিতে বলিতে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেই অবধি বাহির হইতে যত বড়ই উপদ্রব আসুক না কেন, ঘরের মধ্যে আর উপদ্রুত হইতে হয় নাই। নির্ব্বিবাদে নিজের কন্‌ট্রাক্টরীর কায দেখিয়া, স্বদেশী বিদেশী দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ডুবিয়া থাকিয়া ভুবন বাবুর দিন সুখে না হউক দুঃখেও কাটে নাই। ছেলে-মেয়েদের তিনি অন্তরের সহিতই ভালবাসিতেন। ছেলেটি যাহাতে তাঁহার উচ্চাদর্শ লইতে পারে, মানুষের মত হইয়া মানুষ হয়, এইটি বলিতে গেলে তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহারই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি নিজের বিশ্বাস ও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করিয়া আসিতে-ছিলেন। মেয়ে দুইটির নাম তরুলতা ও বিনতা—ছেলে ইন্দুভূষণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার সংসারে সরোজিনী গৃহ-কর্ত্রী হইলেও দেশের সংসারের কর্তৃত্ব যাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি ভুবন বাবুর জ্যেঠাইমা। বয়স তাঁহার সত্তরের উপর। মাথার চুলগুলির মধ্যে কালোর আঁক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখনও আখের টিকলী চিবাইয়া খাইতে পারেন। প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না এবং নিজের সংসারের দেবতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ-পালিত পশু হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী প্রতিপাল্য আত্মীয়-স্বজন ও আতুর শিশু পর্য্যন্ত সকলেরই তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। আবার শুধুই ঘরের কর্ত্রীত্ব করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি নাই, পড়শী বাড়ীর কোন্ শিশুটির পেটে প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বুকে-পিঠে 'কড়া'র জন্য রাংচিত্রার আঠা দিয়া 'দাগ' দিতে হইবে, কাহার ঘুংড়ি জ্বরের টোট্‌কা চাই, কোন্ অনাথা দরিদ্র বিধবার জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, তাহার জন্য তাহাকে দিয়া পৈতা তুলাইয়া কিনিয়া লওয়া, চরকা কাটাইয়া সেই সূতা চাকরের হাতে জোলার বাড়ী বেচিয়া দেওয়া, এই সমস্ত পরের 'বেগার' খাটিয়া বেড়াইতেও তাঁহার কখন আলস্য ছিল না। খাইয়া দাইয়া নভেল লইয়া পড়িতে বসা, তাস-পাশা বা দিবানিদ্রায় গা ঢালিয়া দিয়া সকল কার্য্যেই সময়ের অভাব বোধ করা তাঁহার সেকালের হাড়ে সহিত না। শাশুড়ী-বধূর মনের অমিল চলিতেছে, গৃহিণীর কানে উঠিলে, অমনই তিনি সেই বাড়ী যায়েন; উভয় পক্ষকে মিষ্টবাক্যে, কখনও সস্নেহ তিরস্কারে, নানারূপ উদাহরণ প্রদর্শনে ঠাণ্ডা করিয়া আইসেন। শাশুড়ীকে বলেন "সে কি বউ, তোমার গোপালের বউ, তোমার কত আদরের ধন, তাকে নিয়ে যদি সুখী হ'তে না পেলে, তা হ'লে তোমার সংসারই বা কি, আর অরণ্যই বা কি? না না বউ, এও কি একটা কথা, এই বেলা সাম্‌লে নাও, দশে না শোনে। লোক ত ওই সব গৃহ-ছিদ্র চায়। সাম্‌নে এসে 'আহা, বলে আত্মীয়তা জানাবে, আড়ালে গিয়ে হাস্‌বে। তুমি মা, তুমি একটু সয়ে যাও, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।" তাহার পর বধূর কাছে যাইয়া তাহাকে বলিলেন, "ওলো নাত্‌বৌ! 'মায়ে ঝিয়ে' ঝগড়া কেন লো? বলি, 'একটি পান কি কোঁকড়া' পেয়েছিলি নাকি? নে ভাই, শাশুড়ীকে গড় ক'রে পায়ের ধুলো তুলে মাথায় দে। সর্ব্বরক্ষে! শাশুড়ীর মুখের উপর চোপা কি কর্‌তে আছে? নিজের গর্ভধারিণী আর সোয়ামীর গর্ভধারিণীতে কি 'ফরক' আছে লো নেকি! দশ দিন ঘর কর্ না; তখন দেখ্‌বি, আবার সে মাকে ছেড়ে আস্‌তে যেমন মন কাঁদে, একে ছেড়ে গেলেও তেম্‌নি হবে।"

গ্রামশুদ্ধ ছোট এবং বড়, ইতর এবং ভদ্র সকলেই তাই এই প্রশস্তহৃদয়া উদার-চরিতা গৃহিণীর একান্ত বশীভূত।

ভুবন বাবু এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে আবার বাড়ীতে একটা সমারোহ বিবাহ উপস্থিত। বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, আর ভুবন বাবুর জ্যেঠাইমা'র ত বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই। ও দিকে রান্নাবাড়ীর উঠানে বড় করিয়া আটচালা বাঁধান, রান্নার জন্য জোয়াল কাটান, স্নানঘর সাফ করান, নিত্য-যজ্ঞের জন্য ধামা ধামা ডালের বড়ী তৈয়ারি করা ইত্যাদি শতাবধ কাজে তিনি এই বৃদ্ধবয়সেও চরকির মত পাক খাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মধ্যে মধ্যে আঁচলে চোখের জল মুছিয়া যাহাকে তাহাকে বলিতেছিলেন, "আজ যদি আমার বড় বউমা বেঁচে থাক্‌ত!"

যথাকালে কলিকাতা হইতে সকলে আসিয়া পৌঁছিলে রায়-গৃহিণী তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন—"এস বাবা এস, আয় মা, সরোজ! অমন রোগাটি হয়ে গেছিস্ কেন গো মা? সুশীল! ভাল আছ ত ভাই? কি গো আমার তরুরাণি! তরুণি! বলি এতদিনে তোমার 'তরুণে'র সন্ধান মিল্‌লো তা হ'লে? মনে মনে খুব আহ্লাদ হচ্ছে, না?"

তরুলতা ঠাকুরমার এই স্বাগতসম্ভাষে হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে পায়ের উপর একটা মৃদু রকমের চিম্‌টি কাটিয়া লজ্জায় রাঙ্গিয়া বলিয়া উঠিল, "যাও—তোমার আহ্লাদ হচ্ছে কি না?"

ঠাকুরমা তাহার দাড়ি ধরিয়া চুমা লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার আহ্লাদ ত একশোবারই হচ্ছে লো! তা ব'লে তুই কি আর তা থেকে বাদ পড়ছিস্, বোন্? তা' তরুর আমার তরুণটি কেমন হচ্ছে লা বিনুতা?"

বিনতা নিজেদের গহনার বাক্সটা তখন তাহার সেজ কাকীমা'র জিম্মায় সঁপিয়া দিতেছিল। সে এই সময় কাছে আসিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "এতক্ষণ পরে বিনুতার কথা হুঁস হলো মেয়ের! বল্‌বো না ত অনেক ক'রে এখন আমার খোসামোদ না করলে!"

ঠাকুরমা ছোট নাতনীকে গায়ের উপর টানিয়া লইয়া মুখে, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন, "ওলো ছুটু! তোর ত আদরের দিনই নিকট হয়ে এলো, দিদি পথ ছেড়ে দিচ্চে ত এইবার, আবার ছ'মাসের মধ্যেই তোর আদর বেশী করে করা যাবে তখন। এখন বল্ তো, বোন, আমার তরুর বরটি কেমন হচ্চে?"

বিনতা হাসিমুখে হাত পাতিয়া বলিল, "কি দেবে আগে দাও, তবে ত বল্‌বো? নইলে শুধু শুধু তোমায় বলতে যাব কেন?"

ঠাকুরমা তার ভরাগালে আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া বলিলেন, "ও মা! দুষ্ট মেয়ের রকম দেখ! ওগো! দোব, দোব, শীগ্‌গির একটি রাঙ্গা বর এনে দোব, দুটো দিন একটু সবুর কর।"

বিনতা এদিক ওদিক মাথা ফিরাইয়া দেখিল, কাছাকাছি কোন গুরুজন নাই, সে তখন ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "কিন্তু ঠিক রাঙ্গাবরটিই চাই, দিদির মতন যেন একটি কালো বর এনে জুটিও না বল্‌ছি—খবরদার!

ঠাকুরমা ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন দিদির বর কি কালো হলো? তোরা না তাকে দেখেছিস্?"

বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "দেখেছিই ত, তিনি যে নিজে কনে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ে করবেন পণ করেছিলেন, কালো বউ করবেন না, প্রতিজ্ঞা।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা কি বড্ড কালো? তরুর অপছন্দ হয়নি ত? ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলি? হাঁ্যা তরুদিদি! বরকে মনে ধরেছে ত?"

"যাও আমি দেখিনি।" বলিয়া লজ্জায় ঘাড় বাঁকাইয়া তরু মুখ ফিরাইয়া রহিল। বিনতা তাহার হইয়া জবাব দিল, "আহা, তোমার তরুদিদির বা পছন্দর ছিরি গো, ওটা তো একটা জড়পদার্থ! ও বরের কি জানে? বরে, বাবার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই ও-ই ভাল। বাইরের রূপ থাক্‌লে আমার হয় ত চোখে বেশী ভাল লাগত, কিন্তু তার ভিতরের গুণ কি আর আমি বেশী তলিয়ে বুঝতে পারতুম? ওঁরা আমাদের চাইতে শতগুণেই বেশী বুঝেন. ওঁদের কাছে এক দিনে যেটা ধরা পড়ে, আমাদের তাতে অন্ততঃ আট বৎসর সময় লাগবে। কি মজার কথা রে! আমি তা ব'লে ওসব শুন্‌ছিনে, বাপু, আমি এই স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, আমার কিন্তু ওরকম ময়লার গাইটি নিয়ে কিছুতেই চল্‌বে না।"

ঠাকুরমা তরুর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাবিত্রী-সমানা হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ও আমার ছোটকাল হতেই বড় ধীর, বড় বুদ্ধিমতী, তা দিদির যদি কালো বর মনে ধরে ত তোরই বা ধরবে না কেন, শুনি? তুই কি দিদির চেয়ে বেশী সুন্দরী?"

কিন্তু মুখরা বিনতাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই। সে-ও তৎক্ষণাৎ এ যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিল, "সুন্দরী নই বলেই আমার সুন্দর চাই। কেন, দিদির বর নিজে দেখতে ভাল নয় বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সুন্দর মেয়ে না হ'লে সে বিয়ে করবে না। তা ওঁরা যখন নিজেরা দেখতে খারাপ হ'য়ে সুন্দর বউ চান, তখন আমাদেরই কি সুন্দর বরের সাধ যায় না?"

বিনতাদেরই সমবয়সী তাহার মেজ কাকার একটি মেয়েও কালো বরে পড়িয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ বিনতার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্, বিনা! আমরাই বা ছাড়বো কেন, কেন আমরা কি মানুষ নই? ওঁরা সবাই চান রূপসী কনে, তার জন্য আমাদের দেখে মুখ সিঁটকে ফিরে যান, আমরাও যদি সেই পথ ধরি, তখন কেমন মজাটি হয়? কালো বরগুলি তখন কোথা থেকে রূপসী নিয়ে ক'রে ঘরে আনেন দেখি।"

ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এই সব মেয়েদের বড় ক'রে রাখার ফল হচ্ছে, আর কি! তা এদের অত বেশী বেশী স্বাধীন হ'তে দিলে ওই রকমই ত হবে। এর পরে দেখছি, পছন্দ করতে করতে মেয়ে পুরুষে আর মোটের উপর কারু বিয়ে করা হয়েই উঠ্‌বে না। আমাদের দেশের তিনভাগ লোকই ত কালো; আবার তার ওপর জাত, জন্ম, কুলশীল বাছতেও ত হয়। তবে ব্রাহ্মদের মতন একাকার ক'রে ফেললে, অবশ্য দু' পাঁচটা

মিলেও হয় ত মিল্‌তে পারে। কিন্তু একাকার হ'রেও ত বাপু ব্রাহ্মমেয়েদের বিয়ের অভাব বেড়েছে ভিন্ন কমেনি দেখ্‌ছি। অথচ হিন্দু-সমাজে কালো, কুৎসিত কেউ কখন পড়েও নেই এবং রূপের জন্যও কই কেউ যে বর বা কনেকে ত্যাগ করেছে, তাও ত বড় একটা শুনিনি বা দেখিনি। বরং মহা মহা রূপসীকেও গুণের অভাবে স্বামিত্যক্তা হয়ে থাক্‌তে চোখে দেখেছি। কালে কালে কতই হল!"

বিনতা তখন ঠাকুরমা'কে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিল, "ওগো, অত বড় ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে হবে না গো! সকল কালেই তোমার 'তরুদিদির' মতন মেয়ে কোনো এক রকম সামঞ্জস্য করে চালিয়ে নেবে। শুধু আমার মতন পাষণ্ডরাই ত আর একপা জন্মাবে না।"

এমন সময় ভুবন বাবু আসিয়া বলিলেন, "তরু মা! আমার হাতব্যাগের চাবিটা দেখে এস ত।"

অগত্যা তখনকার মত সভাভঙ্গ করিতে হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

যুক্তপ্রদেশের পদত্যাগী মন্ত্রী

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

এবার বাঙ্গালার লোক-গণনার ফলে দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালায় জন্মমৃত্যুর হার তুলনা করিলে মনে হয়—বাঙ্গালী মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। গত ১০ বৎসরে লোক-সংখ্যা মোট শতকরা ৩ জনও বাড়ে নাই; বাড়িয়াছে, ২·৯ জন মাত্র। অথচ ১০ বৎসর পূর্ব্বে যখন লোক-গণনা হয়, তখনও দেখা গিয়াছিল, ১০ বৎসরে বাঙ্গালায় জনসংখ্যা শতকরা ৮ জন বাড়িয়াছিল। কাজেই বলিতে হয়, ১০ বৎসরে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৪ গুণ হীন হইয়াছে। এই যে ১০ বৎসরে শতকরা প্রায় ২ জন বৃদ্ধি, ইহারই বা স্বরূপ কি? বিদেশীয়া বঙ্গদেশে আসিয়া যে সব কল কারখানা স্থাপিত করিয়াছে, সে সকলে খাটিবার জন্য বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি "বিদেশ" হইতে অনেক কুলী-মজুর আসিয়াছে এবং তাহাতেই কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। তাহাদিগকে বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, বলা দুষ্কর। গত লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী সব কয়টি জিলাতেই লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছিল; আর ১০ বৎসরে এই সব জিলাতেই অবস্থা বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। অবনতি কত দ্রুত, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

আবার লোক গণনার সময়েও যে সব স্থানে অবস্থা একান্ত শোচনীয় দেখা যায় নাই, পরে সে সব স্থানও শ্মশান হইতেছে—বুঝা যাইতেছে।

গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিবরণে দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালার অনেক স্থানেই মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা অধিক। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্র হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিবরণে লিখিত হইয়াছে, পর পর ৪ বৎসর বঙ্গদেশে মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। বাঙ্গালার কয়টি বিভাগের মধ্যে কেবল চট্টগ্রামে জন্মের হার কিছু অধিক হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, রাজসাহী ও ঢাকা ৪টি বিভাগেই মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা অধিক দাঁড়াইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কখনই ঢাকা বিভাগে এ অবস্থা দেখা যায় নাই। সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—মনে হয়—ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাদ্বয়ে পথের জন্য যে সব বাঁধ বাঁধা হইয়াছে, সেই সকলের ফলেই এমন ঘটিয়াছে এবং এই ভাবে বাঁধ দেওয়া চলিলে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগদ্বয়ে যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছে, ঢাকাতেও তেমনই হইবে; ফলে লোকের যেমন স্বাস্থ্যহানি হইবে, দেশের তেমনই সম্পদনাশ ঘটিবে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে নিম্নলিখিতরূপে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হইয়াছে :—

জিলা		হাজারে মৃত্যুর আধিক্য
দার্জ্জিলিং	...	১৩·৫
যশোহর	...	১১·৭
নদীয়া	...	১০·৫
বগুড়া	...	৯·৭
রাজসাহী	...	৯·১
ফরিদপুর	...	৮·৬
বর্দ্ধমান	...	৭·১
হুগলী	...	৬·৯
বাঁকুড়া	...	৬·৮
পাবনা	...	৬·৩
বীরভূম	...	৫·০
মেদিনীপুর	...	৪·৪
ঢাকা	...	২·৮
হাওড়া	...	২·২

এই অবস্থা আরও কিছু দিন চলিলে বাঙ্গালা কি দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এখন রোগভেদে মৃত্যুর সংখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু :—

রোগ		মৃতের সংখ্যা
কলেরা	...	৮০ হাজার ৫ শত ৪৭ জন
বসন্ত	...	৮ হাজার ১ শত ৫৭ জন
জ্বর	...	১০ লক্ষ ৭০ হাজার ৩ শত ৬৮ জন

শ্বাসরোগ ... ৩১ হাজার ৬ শত ৬১ জন

আমাশয় ও উদরাময় ২৫ হাজার ১ শত ২৮ জন

ইনফ্লুয়েঞ্জা বাঙ্গালায় স্থায়ী হইয়াছে এবং বাঙ্গালায় যক্ষ্মা ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার ও যক্ষ্মায় মৃত্যুর আধিক্য যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর আধিক্যেরই মত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির অন্যতম ফল অর্থাৎ দৈহিক দৌর্ব্বল্য-হেতুই যে দেহে এই সব রোগবিস্তারের ক্ষমতা আর থাকে না, তাহা বলাই বাহুল্য।
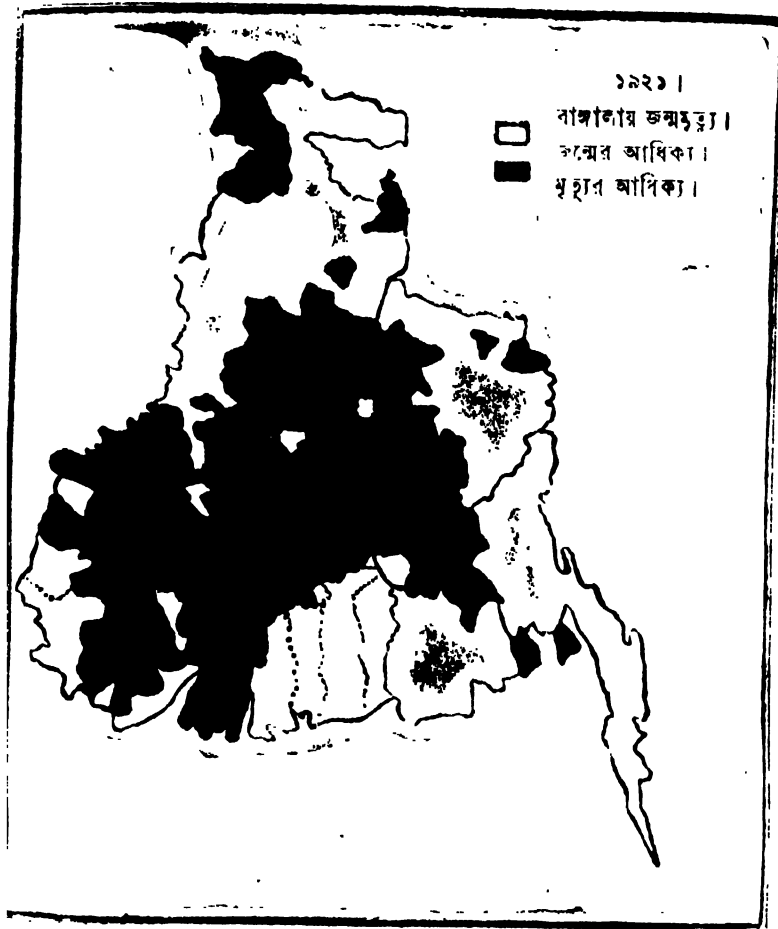
পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইলে কলেরা, আমাশয় ও উদরাময় হইতে অব্যাহতিলাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা হয় নাই। বঙ্গদেশে পানীয় জলের অভাব বুঝিয়া লর্ড কার্মাইকেল সে অভাব দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণকল্পে এক পরামর্শ সভা করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কায কিছুই হয় নাই। প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে (১৯শে আগষ্ট ১৯২২) বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে রাজসাহীতে বলিয়াছিলেন :—

২টি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন—

(১) পানীয়জল সংস্থান-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন

(২) চিকিৎসার ও চিকিৎসকের সংখ্যাবর্দ্ধন। এই ২টি অভাব এত প্রবল যে, অভাব দূর করিবার জন্য সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপ্রদান করাও প্রয়োজন।—The present deficiency in both respects is so great and so general that some help from Government is certainly required,

কিন্তু কলিকাতায় বিলাহিত গোরা সার্জ্জেণ্টদিগের বাসগৃহের জন্য অর্থ দিতে পারিলেও সরকার এই কাযে অধিক অর্থ দিতে পারেন নাই। আর এই প্রদেশে বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিয়া ক্যাম্পবেল স্কুলেও ইংরাজীতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া সরকার চিকিৎসা বিস্তার ব্যয় বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই ব্যয় বাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যয়-বৃদ্ধিও অনিবার্য্য; কারণ, ডাক্তাররা আর অল্প পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট হইয়া কায করিবেন না। এই জন্যই বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় পুরাতন আমলের "নেটিব ডাক্তারের" মত ডাক্তারের প্রয়োজন বাড়িয়াছে—কমে নাই। লর্ড রোণাল্ডসে বলিয়াছিলেন, ইংরাজীতে শিক্ষাদান-

ব্যবস্থা না হইলে নূতন নূতন আবিষ্কারাদি ডাক্তাররা জানিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি মনে করিতে পারেন নাই যে, "নেটিব ডাক্তার" শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে তাঁহাদের ব্যবহারের জন্ম বাঙ্গালাতেই ডাক্তারী পুস্তক ও ডাক্তারী পত্রাদি প্রচারিত হইতে থাকিবে। রুসিয়ায়, জার্ম্মাণীতে, ফ্রান্সে বা ইটালীতে ইংরাজীতে ডাক্তারী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই। সে সব দেশে কি ডাক্তার মিলে না?

আর অ্যালোপ্যাথীই একমাত্র চিকিৎসাপ্রণালী নহে। এ দেশে যে কবিরাজী চিকিৎসা-প্রণালী আছে, সরকার তাহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। এখনও এ দেশে অনেকে সেই প্রণালীতে চিকিৎসিত হয় এবং উপকার যে পায় না, এমনও বলা যায় না। মাদাজে কোন কোন স্থানে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া কবিরাজী ঔষধালয় তালুকা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বাঙ্গালার থানায় থানায় একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। অথচ নদীয়ায় যে পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ঔষধের মূল্য বাবদ সামান্য অর্থ লইলে এরূপ ঔষধালয়ে ব্যয়ও বড় অধিক হয় না।

সে দিন ডাক্তার সার নীলরতন সরকার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক যে জ্বরে জীর্ণ হয়, তাহা প্রতীকারসাধ্য। তবে প্রতীকার হয় না কেন? এই জ্বরে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য কিরূপ নষ্ট হইতেছে, তাহার প্রমাণ—সেকালের বাঙ্গালী, আর একালের বাঙ্গালী। আজ বাঙ্গালার কৃষকের স্বাস্থ্য এরূপ শোচনীয় যে, অনেক স্থানে কোল বা সাঁওতাল শ্রমজীবী আনিয়া চাষের কায চালাইতে হয়। কিন্তু শত বর্ষ পূর্ব্বে পর্য্যটকগণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের ও সজীবতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার নাবিকরা আর সাগরে পাড়ী জমায় না বটে, কিন্তু নদীবহুল বঙ্গের সর্ব্বত্র জলযানে বাঙ্গালী মাঝীমাল্লা। তখন মুটিয়া মজুর প্রভৃতির কায বাঙ্গালীই করিত। গ্রামে গ্রামে কুস্তীর আখড়া ছিল—কুস্তীতে জয়লাভ করিয়া ভদ্রসন্তানরাও সম্মান মনে করিতেন; তীর-ধনুক, শড়কী প্রভৃতির ব্যবহারে অনেক বাঙ্গালীই অভ্যস্ত ছিলেন। তখন বাঙ্গালার জমীদার কুঠীয়ালকে পাইক পেয়াদা প্রহরী সর্দ্দারের সন্ধানে পশ্চিমে যাইতে হইত না। প্রায় ৭০ বৎসরের কথা, তখন বাঙ্গালায় নীলের চাষ ছিল এবং বাঙ্গালার নানাস্থানে ইংরাজ নীলকরদিগের কুঠী ছিল। সেই সময় মোল্লাহাটী ("মাল্নাথ") কুঠী হইতে মিষ্টার গ্রাণ্ট যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে একখানিতে রুদী বিশ্বাস নামক কুলী সর্দ্দারের বিবরণ পাওয়া যায়। মোল্লাহাটী কুঠীতে অতিথি য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এক জনের কলিকাতায় একখানা জরুরী চিঠি পাঠানর প্রয়োজন হইয়াছিল। রুদী বিশ্বাস সেই দিন প্রাতঃকালে চাকদহ হইতে হাঁটিয়া মোল্লাহাটীতে আসিয়াছিল। সে যে সেই ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রভু তাহা জানিতেন না। তিনি রুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বকসিস পাইলে সে কলিকাতায় পত্র লইয়া যাইতে পারিবে কি না। রুদী সম্মতি জানায় এবং অপরাহ্ণ ৭টার সময় কুঠী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি মাঠের পথে হাঁটিয়া—১২ ঘণ্টায় ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যূষে ৭টার সময় কলিকাতা চৌরঙ্গীতে যাইয়া পত্র দেয়। তাহার পর নৌকায় সন্ধ্যাকালে চাকদায় পৌঁছিয়া সে আবার ১৬ মাইল পথ হাঁটিয়া মোল্লাহাটীতে পৌঁছায়। এরূপ ব্যাপার ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। আর আজ বাঙ্গালায় শতকরা ৫ জন সুস্থ ও সবল বাঙ্গালী পাওয়া দুষ্কর!

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য কিরূপ শোচনীয়, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ দেশ পল্লীপ্রাণ এবং এখনও শতকরা ৯০ জন লোক পল্লীগ্রামেই বাস করে। পল্লীগ্রামে কৃষকদিগের মধ্যেও শারীরিক বল ও উৎসাহ—ফূর্ত্তি নাই। ইহাতে এক দিকে যেমন জাতির সর্ব্বনাশ, অপর দিকে তেমনই সম্পদের অভাব হয়। এই দুই ব্যাপার আবার পরস্পরের উপর প্রযুক্ত হইয়া উভয়েরই প্রাবল্য বর্দ্ধিত করে। কাযেই এ অবস্থার আশু প্রতীকার ব্যতীত বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ও সম্পদ সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালার ভূমি স্বর্ণপ্রসূ—আজকাল পথঘাটের বাহুল্যে ধান্য চালানও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। তবুও গ্রামে শ্রী নাই, আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই—যেন গ্রামের উপর ধ্বংসের ছায়া নিবিড় হইয়া

রহিয়াছে—সে ছায়া ভেদ করিয়া আনন্দের আলোক ছুটিতেছে না। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলেই জমীতে একটি মাত্র ফসল হয় এবং সেই চাষের সময় গ্রামে একটু সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়। অর্থাৎ যেটুকু শ্রম না করিলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, বাঙ্গালার কৃষক অতি কষ্টে সেইটুকু পরিশ্রম করে। বলা বাহুল্য, এখন অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং অতিরিক্ত শস্য চালান দিবার যে সুবিধা ঘটিয়াছে, তাহাতে য়ুরোপ ও মার্কিণের মত জমীতে একাধিক ফসল উৎপন্ন না করিলে কৃষক-সম্প্রদায় কিছুতেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে না।

কৃষক বিশ্বাস।

মটকা উড়িয়া গেলেও বর্ষার বারিপাত নিবারণের প্রয়োজন না হইলে মটকা সারা হয় না। গ্রামের পানীয় জলের পুষ্করিণীতে আর সে "কাকচক্ষু" জল নাই; পানায় পুকুর ভরিয়া গিয়াছে। তাহার উপর আজকাল আবার কচুরী-পানায় খাল ও নদী আচ্ছন্ন হইয়াছে জল অপেয় ও জলপথ অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কালবৈশাখীর পূর্ব্বেই গ্রামের লোক যে সব নালা সংস্কৃত করিত, সে সব এখন বুজিয়া গিয়াছে। কেহ আর এ সব অবস্থার প্রতীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

অথচ ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গ্রামবাসীরা

কিন্তু সে কায করিবার মত উৎসাহ তাহাদের নাই। যেন মৃত্যু হয় না বলিয়াই তাহারা অতি কষ্টে জীবনের ভার বহন করে—কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। আর মৃত্যুও নানা উপায়ে তাহাদিগের জীবন শেষ করিয়া দেয়। বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান কৃষকের মধ্যে স্বাস্থ্যের যেমন অভাব, উৎসাহের তেমনই অভাব। উৎসাহের এমন অভাব, না হইলে গ্রামের এমন দুর্দ্দশাও হইত না। গ্রামের ঘরের চালে খড় নাই। সেকালে লোক ঘরের "কেয়ারী" করিত—একালে ঝড়ে

সোৎসাহে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিত—ধর্ম্মের অনেক অঙ্গে আনন্দ যোগ করিত। দুর্গোৎসবে "কাদামাটী", চড়কে "সন্ন্যাসী" হওয়া, "কাচাঁপাপ" প্রভৃতি জাতির সজীবতারই পরিচয় দিত। সন্ধ্যায় গ্রামে গান বাজনার আড্ডা বসিত—মনসার ভাসান, চপ, কীর্ত্তন প্রভৃতির চলন ছিল,—কথকতা হইত এবং তাহাতে পুরাণের পুণ্য আদর্শ গ্রামবাসীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইত। হাটে লোক কেবল বেচাকিনা করিতেই যাইত না—

দেখা-সাক্ষাৎ করিতে, কথাবার্ত্তা কহিতেও যাইত। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এ দিকে বর্দ্ধমানে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লোকসংখ্যা যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে স্থানে লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ছিল, আজ সে স্থানে মাত্র —১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯ শত ২৬ জন! ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও লোকসংখ্যা ইহার অপেক্ষা ৭৫ হাজার অধিক ছিল! নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জিলাদ্বয়েও অবস্থা এইরূপ।

বাঙ্গালার ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা ৭১ জনের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ। অন্যান্য দেশে এই যুবকদিগের মধ্যে অনবদ্য স্বাস্থ্য, অপরিসীম উৎসাহ ও অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

ম্যালেরিয়ায় এ দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহার আলোচনা আজ আর নূতন করিয়া করিব না; কারণ, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কিছু দিন পূর্ব্বে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, বাঙ্গালী "হুকওয়ারম" নামক জীবাণুর দ্বারা পীড়িত। এই জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া বংশবৃদ্ধি করে এবং তাহার উৎসাহ নাশ করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল, স্ফূর্ত্তিহীন করিয়া ফেলে। সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাঙ্গালায় কালাজ্বরে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই উভয় ব্যাধিই নবাগত। "হুকওয়ারম" সম্ভবতঃ মান্দ্রাজ হইতে এবং কালাজ্বর আসাম হইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে বঙ্গদেশে বিস্তারলাভের সুযোগ পাইয়াছে, তাহার কারণ—বাঙ্গালীর সাধারণ স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাহার রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিদেশী সরকার যে এ বিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্যপালনে অবহিত হইয়াছেন, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। চিকিৎসকগণ বলেন, কালাজ্বরের বিষ ছারপোকার দ্বারা বিসর্পিত হয়। অথচ এ দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য যানে—রেলে, ষ্টীমারে, ট্রামে অজস্র ছারপোকা; সে সব যান হইতে ছারপোকা দূর করিবার কোন আবশ্যক চেষ্টাই হয় না। এই যে কচুরীপানায় খাল-বিল নদী-নালা ভরিয়া গেল, ইহার উচ্ছেদসাধনে লোককে উৎসাহিত করিতে সরকার কি করিয়াছেন এবং আপনারাই বা কি কায করিয়াছেন? বঙ্গদেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিবার কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই। সম্ভবতঃ স্বাভাবিক কারণে বাঙ্গালার বড় বড় নদী মজিয়া যাওয়ার এমন হইয়াছে; সম্ভবতঃ সেচের খালে এবং রেলের ও অন্য রাস্তার বাঁধে সেই স্বাভাবিক কারণ অস্বাভাবিকরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কারণ যাহাই কেন হউক না, ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে প্রতীকারের উপায় না করিলে সমগ্র বঙ্গদেশ অচিরে শ্মশানে পরিণত হইবে; যে জাতির মধ্যে চৈতন্য, গদাধর, রঘুনন্দন, জয়দেব, চণ্ডীদাস হইতে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, রাসবিহারী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের আবির্ভাব অতি স্বাভাবিক নিয়মে হইয়াছে, সে জাতির কথা কি বিলুপ্ত জাতির ইতিহাসে লিখিত থাকিবে?

এ অবস্থার প্রতীকার করা সরকারেরই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেশে সরকারের সহিত দেশের লোকের সম্বন্ধ ঠিক অন্য দেশের মত নহে। সরকার বিদেশী এবং অনেক সময় স্বদেশী বণিক্সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া কায করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের ব্যয় বহন করিতে এত অধিক অর্থব্যয় হইয়া যায় যে, দেশে প্রজার অত্যাবশ্যক কাযের জন্যও অনেক সময় অর্থ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে।

কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে আবশ্যক মনোযোগ না দিলেও, এই যে মরণ বাঁচন সমস্যা—এ সমস্যা বাঙ্গালীর। সরকার যদি স্বদেশী হইতেন—সরকারের দায়িত্ব যদি দেশের লোকের কাছে থাকিত, তবে না হয়, সরকারকে দিয়া সরকারের কর্ত্তব্যপালন করাইবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু তাহার উপায় নাই।

সুতরাং বাঁচিতে হইলে তাহার উপায় আমাদিগকেই করিতে হইবে। সরকার বা অন্য কেহ তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করিলেন না বলিয়া আমরা ত আলস্য, ঔদাস্য ও বৈরাগ্য সম্বল করিয়া মরিতে পারি না। আর এ দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় যদি এ বিষয়ে অবহিত হইয়া আবশ্যক চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারাই বা বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর অপেক্ষা কিসে দেশের লোকের কল্যাণসাধন করিবেন? তাঁহাদিগকে শিক্ষিত স্বদেশসেবকের কর্ত্তব্য অবশ্যই পালন করিতে হইবে। একের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না, বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় সে কার্য্য সহজসাধ্য হইয়া উঠে। দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়কে অগ্রণী হইয়া দেশের জনসাধারণকে বুঝাইয়া—সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায় করিতে হইবে। সে কায বাঙ্গালীর।

মধ্যযুগে বাঙ্গালার শিল্প-কলা

২

মাটীর সাজ। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুজাতি মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। স্বভাবের অনুকরণে, অভাব ও প্রয়োজনের প্রেরণায় শিল্পকার্য্যের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টিত এই মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ জগতের সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতে আর্য্যজাতি যে অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া এই সরল শিল্পে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত নানা স্থানের ভগ্নাবশেষের ভিতর হইতে প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্রের আদর্শে দেখা যায়। অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া সারনাথে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রগুলি পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে এই কার্য্যে হিন্দুরা কত অধিক দক্ষ হইয়াছিলেন। অজন্তা বা ভুবনেশ্বরে অঙ্কিত কলসের গঠন যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা ভাল বুঝিবেন। সে স্থলে কলস বা ক্ষুদ্র ঘট সৌন্দর্য্যবিকাশের নিমিত্ত প্রস্তরের ক্ষোদিত। ভুবনেশ্বরে ক্ষোদিত ক্ষুদ্র কলসের কনিষ্ঠ সহোদর ঘৃত বা মধু রাখিবার সুগঠিত মৃৎঘটি এখনও বাঙ্গালায় অপ্রাপ্য নহে। বাঙ্গালায় প্রস্তরের অভাবে মাটীর গঠনের কার্য্য শীঘ্রই সভ্য সমাজের প্রয়োজনের অনুরূপ হইয়া উঠে। সম্প্রতি ধাতুপাত্র, কাচ ও অন্যান্য আপাত-মনোরম আধার মধ্যযুগের সুন্দর মৃৎপাত্রকে অপসারিত করিয়াছে। এখনও মুর্শিদাবাদে কাঁঠালিয়া প্রভৃতি স্থানে মাটীর বাসনে যে সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, তাহা দেখিবার মত। চাকের বা হাতের কারদায় এখনও খুলনা, দিনাজপুর ও অন্যত্র যে সমস্ত মাটীর পাত্র গঠিত হইতেছে, তাহা অন্য দেশের অনুকরণযোগ্য। বর্দ্ধমানের কয়েক স্থানে যে প্রকাণ্ড জালা (হাঁড়া) এখন প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিয়া লোক অবাক্ হইবে। পূর্ব্বে এগুলি আরও উত্তম হইত; কারণ, অবস্থাপন্ন লোক এখনও স্থায়ী ধাতুপাত্রের পক্ষপাতী। এক শত বর্ষ পূর্ব্বের নির্ম্মিত একটি হাঁড়া দেখিয়াছি, বাজাইলে ধাতুপাত্রের মত শব্দ হয়। ঘৃতের সুন্দর কলসী বা মুড়ী রাখিবার যে সুন্দর হাঁড়ি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং দেখিয়াছি, সে জাতীয় দ্রব্য এখন আর প্রস্তুত হয় না। এখন কয়েক স্থানে চায়ের উপকরণ কাপ, কেটলি, ডিস্ নির্ম্মিত হইতেছে; কিন্তু উন্নতির আশা নাই। মুসলমান অধিকারে রঙ্গ দেওয়া হাঁড়ি বা কলসীর প্রচলন ছিল। মীনা করা পাত্র, ইটের টালি প্রভৃতির নিদর্শন গৌড় অঞ্চলে আছে; এখনও চীনা মাটীর অনুকরণে নির্ম্মিত পাত্র মুর্শিদাবাদ, খুলনা, দিনাজপুরে মিলে। ভারতের অন্যত্র মাটীর কার্য্যের উন্নতি অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু হাঁড়ি-কলসীর গঠনসৌষ্ঠবে বাঙ্গালা বোধ হয় শীর্ষস্থানীয়। মুর্শিদাবাদে ও অন্য কয়েক স্থানে বিদরীর ফরসীর অনুকরণে কালো মাটীর সুন্দর ফরসীও বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচয়িতা বার্ডউড মহোদয় এ দেশের কুম্ভকারের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যদানশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রতিমানির্ম্মাণবিষয়ে বাঙ্গালী কুম্ভকারের নৈপুণ্য বর্ত্তমান যুগে বাড়িয়াছে। প্রাচীন কালের দুর্গা ও অন্য প্রতিমা না দেখিলেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বের প্রতিমার সহিত নদীয়া ও পূর্ব্ব-বর্দ্ধমানের বর্ত্তমানে নির্ম্মিত প্রতিমার তুলনায় এই নির্ম্মাণ-কৌশল কতটা বাড়িয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। নদীয়া কৃষ্ণনগরের এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্য স্থানের কুম্ভকারেরা যে সমস্ত সুন্দর পুতুল, জীব-জন্তু ও খেলানা নির্ম্মাণ করিতেছে, মুসলমান অধিকারের শিল্পীরা তাহার কল্পনাও করিতে পারে নাই। ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কুম্ভকারও মধ্যযুগের নির্ম্মাণ-প্রণালীই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের ধাতু ও প্রস্তরের আদর্শ দেখিয়া আমাদের কুম্ভকার মাটীর শিল্পে অন্যের গুরুস্থানীয় হইয়াছে। প্রতিমা এবং ছবি নির্ম্মা[ণে] নদীয়ার রামলাল পাল ও অন্য শিল্পে কৃষ্ণনগর স্বর্গীয় যদুপালের নাম ইতিহাসে অঙ্কিত থাকা উচিত।

কাঠের কাজ। প্রাচীন হিন্দুযুগে সূত্রধর কেবল রথাদি নির্ম্মাণেই কৃতী ছিলেন, এমন নহে; অনেকের মতে

'সূত' (সূত্রধর) জাতিই সারথির কার্য্য করিত। তাহা হইলে তাহারা কেবল বাসন-বাটালির সঙ্গেই পরিচিত ছিল না; তাহাদের অশ্বের সহিত যোদ্ধৃগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল। বাঙ্গালায় শেষে ক্ষত্রিয় জাতিরই অভাব হওয়ায় ছুতারের প্রত্যহ অর্থ হাত-পা ছাড়াইয়া গণনায় উঠিবার কল্পনা ছিল না। বৃহৎসংহিতা ও শিল্পশাস্ত্রে গাছ কাটিবার ও কাঠ পাকাইয়া লইবার এবং কোন কোন স্থানে উদ্দেশ্য কি প্রকারের গাছে খাট নির্ম্মাণ করা ভাল হয়, তাহাও লিখিত আছে। প্রাচীন বাঙ্গালার সূত্রধর নানাশ্রেণীর সিংহাসন বা খট্টা নির্ম্মাণের সুবিধা পাইয়াছিল কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় দেখি না। তক্তপোষ মুসলমান অধিকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা নিশ্চয়। কবিকঙ্কণ-নির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বলা দাসীর খাট বিছাইবার কথায় দেখা গিয়াছে, ধনবানেরও ভাল ছাপর খাট ছিল না। চৌকী বহুকালের জিনিস বটে। শাল, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি কাঠের চৌকী ও সিন্দুক, পিঁড়ি প্রভৃতি গাহস্থ্য উপকরণ। এই গুলিতেই সেকালের বাঙ্গালী ছুতারের কৃতিত্ব আবদ্ধ ছিল। লোহার কব্জা প্রভৃতির ত কথাই নাই। পল্লীগ্রামে ইঁসকল, হুমনী অতি অল্পকাল চলিত হইয়াছে। সাধারণ প্রচলিত 'আলের কপাট' ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। এই কপাটের নীচে উপরে দুই দিকের কোণ শূলের মত বাড়াইয়া লইয়া তাহাই উপরের দেওয়ালে এবং নীচের তলপড়ে বসাইয়া দেওয়া হইত; এখনকার মত চৌকাঠের প্রয়োজন ছিল না। এই কপাট প্রাচীন বঙ্গের কপাটের আদর্শ মনে করা যাইতে পারে; পরে বাতাবন্দী, পাথরাখোপী প্রভৃতি কপাটে ছুতারের কারিগরী বাহির হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের মাটীর ঘরে কাঠে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য একালে যাহা দেখা যায়, তাহা মন্দ বলা যায় না। মগধের সূত্রধর পুরাকালেও তক্ষণ-কার্য্যে নিপুণ ছিল; প্রতিবেশী বাঙ্গালী কি একেবারেই অজ্ঞ ছিল? পাটলিপুত্রের সম্রাট্ এবং রাজদরবারের রাজন্যবর্গের উৎসাহে তথায় কিছু অধিক উন্নতি সম্ভব। বাঙ্গালার সূত্রধরের কোন কোন পরিবার প্রস্তরে ভাস্করের কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, জাতীয় ব্যবসায়ে কিছুই করে নাই, ইহাও বলা যায় না। বাঙ্গালার জল, বায়ু, কাষ্ঠখণ্ডকে 'যুগ পরিমাণ' রাখে না, নতুবা প্রাচীন নমুনা দেখা যাইত। ১১৭২ সালের নির্ম্মিত পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার কড়ির প্রান্তে ক্ষোদিত যে হাতিশুঁড়া ও বাঘের মুখ দেখিয়াছি, একালে কোন বাঙ্গালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত করিতে দেখি না। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বের নির্ম্মিত এক মাটীর চণ্ডীমণ্ডপের ২টি কাঁঠালের খুঁটি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তাহার উপরে ক্ষোদিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য এখন আর দেখা যায় না। নেপালে ও মুঙ্গেরে এখনও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য হয়, শিশুকাঠে পশ্চিমা মিস্ত্রী সুন্দর লতা-পাতা-ফুল ফলায়; দক্ষিণ অঞ্চলেও কাঠের কাযের উন্নতি আছে। সাদাসিধে নকল চেয়ার আলমারীতেই এখন বাঙ্গালী ছুতারের বিদ্যা সীমাবদ্ধ। নৌকা নির্ম্মাণে অবশ্য বাঙ্গালী সূত্রধর বহুকাল হইতে সিদ্ধহস্ত; পূর্ব্বকালে বড় বড় জাহাজ যাহাদের হাতে জন্মাইত, তাহাদের বংশধররা পরে ময়ূরপঙ্খী, বজরা, পান্সী, ছিপ নির্ম্মাণে কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছে। মুসলমান অধিকারে নানা জাতীয় সুন্দর বজরা নির্ম্মিত হইয়াছে; উৎসাহের অভাবে এ শিল্পও এখন মৃতপ্রায়। ৬০ বৈঠার ছিপ, দশ ঘোড়ার বলবিশিষ্ট ষ্টীমারের নিকট পরাভূত। ডিঙ্গী এখন নদীকূলের অভাব পূরণ করে। বেহালা, তানপুরা প্রভৃতি সঙ্গীতের যন্ত্র এ দেশের মিস্ত্রীরা পূর্ব্বে প্রস্তুত করিত, এখনও করে; একালে অন্য দেশের আদর্শে এই সকল দ্রব্য এবং নানাপ্রকার কাঠের খেলানা নির্ম্মাণে দেশীয় কারিগর কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

লোহার কায। গৃহকার্য্যের উপকরণ দা, বঁটি, কাস্তে, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি এবং কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ফাল, কোদাল, বিদে, নিড়ানী ইত্যাদি দ্রব্য বাঙ্গালায় অন্য স্থান অপেক্ষা ভালই হইত। সেকালে দেশে লোহার স্বচ্ছলতা না থাকিলেও বাঙ্গালী কর্ম্মকার বহুকাল হইতে সাধারণ লোহা ও ইস্পাতের কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া আসিয়াছে। বলিদানের ব্যবস্থাটা বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হওয়ায় খাঁড়া, বগি, রাম দা প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট পা'ন দিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল। তলোয়ার, টাঙ্গা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রের বেলায় ততটা বলা চলে না; লোহার হাঁড়ি কলস বাঙ্গালায় চলে নাই। বর্দ্ধমান জিলার বনপাশ কামারপাড়া ও অন্যান্য স্থানের এবং মালদহের কর্ম্মকাররাই খাঁড়া, দা, ছুরী প্রভৃতি গঠনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বনপাশে পূর্ব্বে বন্দুক, তরবারি, এমন কি, বর্ম্মও প্রস্তুত হইত; এখন সেকাল

গণের। ইস্পাতের পা'নে সিদ্ধহস্ত সেই কর্ম্মকারদের লোক এখন সোনার গহনায় পা'ন দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের বিদ্যা শিখিয়াছে। রঙ্গপুরের খাঁড়া ও দিনাজপুরের কাঁতি কোন্ যুগের?

প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষের ইস্পাত পাশ্চাত্য সভ্যজগতে আদর লাভ করিয়াছিল। বার্ড উড্ প্রমাণ দিয়াছেন যে, দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ তরবারি ভারতজাত ইস্পাতে প্রস্তুত হইত; ভারতে নির্ম্মিত তরবারি পারস্য ও তুরস্কে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বে গ্রীকদিগের ভারতের ইস্পাত ব্যবহার করার কথার উল্লেখ আছে। তীর, ধনুক, বর্শা, গদা, টাঙ্গি, তরবারি নির্ম্মাণের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি জানা ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র বা নালিকাস্ত্র জিনিষটা কি, তাহা এখন নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই; তবে কামান, বন্দুক ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পরে ভারতবর্ষেও যে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান। মধ্যযুগে বাঙ্গালী কর্ম্মকার জনার্দ্দন, জন্মেজয়, বিশ্বম্ভর, জাহান্‌কোশা, দল-মর্দ্দন, কালে খাঁ, ফতে খাঁ প্রভৃতি যে বহু কামান নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা এখনও লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ যে হিন্দু কর্ম্মকারের অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান, সেই শিল্পীর উত্তরাধিকারীরা বাঙ্গালায় যে বার হাত কামান ঢালিয়াছে, তাহার লৌহ যেন এখনও নূতন। বাঙ্গালী শিল্পী সুন্দর পিত্তলের কামানও গঠিত করিয়াছে। তরবারি, গুপ্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র এখনও জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে ভাল হয়, কেন না ব্যবহার আছে। মধ্যযুগে এ দেশেও তলোয়ার হইত।

ভূষণ। অশন-বসনের দিকে বঙ্গবাসী যে ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, ভূষণের বেলা আর ততটা বলা চলে না। প্রথম কথা, বাঙ্গালার মাটী প্রথম দুইটি উপকরণের অনুকূল। কাব্যকলায় 'সোনার' বাঙ্গালা বলিলেই যে সোনা-রূপার খনি এ দেশে সুলভ হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে মানবসমাজে অলঙ্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল; তাই লতা-পাতা ফুল-ফলের হার বালা হইতে জড়োয়া গহনা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ভূষণ এখনও সভ্য অসভ্য নরনারীর কাল্পনিক সৌন্দর্য্যবিধানে নিয়োজিত। পাখীর পালক, মৃত জন্তুর হাড়, কড়ি, পলা প্রভৃতি কত শত উপকরণ রমণীর অলঙ্কারের আসন গ্রহণ করিয়াছে। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লোহা, পিতল, সোনা, রূপা পর পর বঙ্গীয় রমণীর সাধ পূর্ণ করিয়াছে। প্রাচীন বলিয়াই হাতের লোহা 'এয়োস্ত্রী'র লক্ষণ। বৈদিক যুগে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার ছিল; পৌরাণিক যুগে সোনা মাণিক আছে, অমরকোষ নানা অলঙ্কারের নাম দিয়াছে, কিন্নরী-রাক্ষসীও কবির কথায় নানালঙ্কারভূষিতা। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবির বর্ণনায়ও সোনা-রূপার ছড়াছড়ি আছে, দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পল্লীর দরিদ্র বঙ্গনারীর পক্ষে সে সব "শ্রুতৌ স্থিতঃ" মতই ছিল; অবস্থাবিশেষে অঙ্গে কাঁসা, পিতল হইতে রূপা পর্য্যন্ত উঠিত। একালের বাঙ্গালায় পিতল, কাঁসার অলঙ্কারের ব্যবহার ক্রমে উঠিয়া গেলেও প্রতিবেশিনী 'পশ্চিমা' রূপসীর হাতে পায় দশ পনের সের তথাকথিত অলঙ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বঙ্গপল্লীর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীদিগের বদর বপুর শোভা—সেকালের ভূষণ কল্পনা করিয়া লইতে পারি। আমরাই বাল্যে যে গোটা এবং বাঁক মল, গুজরী, পঞ্চম, হাঁসুলী, গোট, পইছে, খাড়ু, কঙ্কণ প্রভৃতি মোটা মোটা রূপার গহনা এবং ৬ অঙ্গুলি ব্যাসযুক্ত সোনার নথ ও বেসর ঝুমকো চৌড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার কারিগর একালে বর্ত্তমান থাকিলে কি পুরস্কারলাভ করিত, সে কথা না-ই ভাবিলাম। কিন্তু সেই সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া উল্‌কী-শোভিত কপালের উদ্ধদেশে সিন্দূরের অনুলেপন দিয়া, দাঁতে মিশি ঘসিয়া, কাজলে নয়ন উজ্জ্বল করিয়া স্বয়ং রম্ভাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেও একালের যুবকদল যে চমকাইয়া উঠিবেন, তাহা হলফ্ করিয়া বলা যাইতে পারে। সেকালের বঙ্গপল্লীতে কাঁসার খাড়ু গড়ায় ও রূপার মল বালা হাঁসুলী, কচিৎ কঙ্কণনির্ম্মাণে তথাকথিত স্বর্ণকার শিল্পকৌশল দেখাইবার অবকাশ পাইত। নগরে 'কলধৌত কণ্ঠমালা' বা 'সপ্তেশ্বরী' হারের অবকাশ ছিল এবং ব্যবসায়ী ধনাঢ্য লোক ধনপতির মত বাটী ফিরিয়া মানিনী গৃহিণীকে পাঁচ পল সোণা দিতে পারিত। কিন্তু ধনবানের দেখাদেখি ধার করিয়াও কানে সোনা পরা প্রাচীন বঙ্গের রীতি ছিল না। তাই বসন-ভূষণে বিলাস যোগান অধিকারের পূর্ব্বে এ দেশের গ্রাম্য সমাজে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই; এবং উৎসাহের অভাবে সোনাদানার শিল্প-কর্ম্ম মৃতপ্রায় ছিল। অবশ্য,দক্ষতর গ্রাম্য শিল্পীরাই

নগরে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। 'আমরা যাব গৌড় আন্‌ব সোনার গৌর' ছেলে-ভুলানো গানে ছিল; কাব্যের সাধু সোনার খাঁচা আনিতে কষ্ট করিয়া গৌড়ে গিয়াছিল, হোসেন শা'র সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র ব্যবহারের কথা প্রবাদমূলক ইতিহাস সমর্থন করে। গৌড়ের কথা যাহাই হউক, ঢাকার রূপার কাযে কারিগরী যে পরবর্ত্তীকালের, ইহা নিশ্চয়। ঢাকাই শাঁখার শিল্পও আধুনিক; ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে হাতযোড়া গালা-লাগান রঙ্গীন শাঁখার চলন ছিল। সোনা-জড়ান শাঁখা বা সোনায় ঢাকা লোহা একালের সৃষ্টি। মীনা করা বা গিল্টি ধাতুর গহনাদি সেকালে ছিল না বলাই বাহুল্য। প্রকৃতির কৃপায় 'পুষ্পফলে সমৃদ্ধ' বঙ্গে কোন কালেই ফুলসাজের অভাব হয় নাই। চীরা মালিনীই যে কেবল মালা গাঁথায় বাহাদুরী দেখাইয়াছে, তাহা নহে। গৃহস্থ-কন্যাও এই কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বড় বড় কায-কর্ম্মে মালীর সাহায্যের প্রয়োজন হইত। এখন 'তিলি, মালী, তাম্বুলী' ডাকনাম মাত্র শুনা যায়। মালাকার জাতি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেখা যায় না; তমোলুকে দুই দশ ঘর আছে। তাহারাও ফুলমালার কায করে না; সহরের বাজারে নানা শ্রেণীর লোক এখন এ কার্য্যে নিযুক্ত।

চিত্রবিদ্যায়ও মুসলমান অধিকারে বাঙ্গালার শিল্পী পশ্চাৎপদ ছিল। মোগলাধিকারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিত্রবিদ্যার সমধিক উন্নতি হইলেও বাঙ্গালায় উহার চিহ্ন দেখা যায় না। পরবর্ত্তীকালে প্রতিমাদির চালচিত্রে বা পটনির্ম্মাণে যেটুকু কৃতিত্ব হইয়াছিল, অনুমিত হয়, মুসলমানরাজের উৎসাহের অভাবে তাহাও পাতর চাপা পড়িয়াছিল। বিজেতা পাঠান বিশ্বাস করিত যে, চিত্রবিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী; এখনও প্রাণিচিত্রে অনেক মুসলমানের আপত্তি আছে। সেকালের হিন্দু ভূস্বামিবর্গেরও যে ইহাতে বেশ অনুরাগ ছিল,এমন প্রমাণ নাই। মনস্বী আকবর বাদশাহের উৎসাহে দিল্লী অঞ্চলে নানা ভাবের চিত্রবিদ্যার পরিপুষ্টি হইতেছিল, তন্মধ্যে হাতীর দাঁতের দ্রব্যের চিত্র প্রসিদ্ধ। রাজপুতানায় ইতঃপূর্ব্বেই চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মোগল অধিকারে পারস্য, ইটালী হইতেও চিত্রকর আনাইয়া কায শিখান হইত। কিন্তু সে স্রোত বাঙ্গালা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদে দুই চারিটি প্রাচীন চিত্রের যে নিদর্শন দেখা গিয়াছে, তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা সেকালের মুসলমান চিত্রকরেরই দক্ষতা সুস্পষ্ট। শেষে পটুয়া চিত্রকর নামে না হিন্দু না মুসলমান এক শ্রেণীর শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার যে চিত্র কৃষ্ণনগরে আছে, তাহা এই জাতি চিত্রকরের হস্তপ্রসূত; রাজা ও চামরধারীর মুখ একই রূপে রঞ্জিত। চালচিত্রে সাধারণ চিত্রকরের নৈপুণ্য সকলেই দেখিতেছেন; ইহার উপর কোন কালেই উঠে নাই। তবে নদীয়া অঞ্চলে প্রতিমার মুখগঠনের সঙ্গে উহার চিত্রেরও উন্নতি ঘটিয়াছে। বঙ্গের চিত্রকরের খেলানা পুতুল বা রং-দেওয়া পাত্রও নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পের নমুনা। রং করার কথায় বলা যাইতে পারে, নীল রঙ্গের সৃষ্টি বাঙ্গালায় না হউক, নীল গাছের চাষ ও নীলের উন্নতি এখানেই হইয়াছিল; তাহা য়ুরোপীয় আগমনের পরে নহে।

মীনা ও বিদরী। কলাই ও মীনা করার পদ্ধতি মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তিত বলিয়া মনে হয়। তাম্রপাত্রের কলাই করা ডেক্‌চী প্রভৃতি পাত্র পোলাও কালিয়া রান্ধিবার উপকরণ; হিন্দুর কার্য্যে খাঁটি তামা ভিন্ন লাগে না। মীনার ব্যবসায়ও সংবে মুসলমানের কার্য্য ছিল। বিদরীর কার্য্যে দিল্লী অঞ্চলে শিক্ষিত মুসলমান কারিগর বাঙ্গালার সেকালের রাজধানীর শিল্পীর গুরু। মোগল অধিকারেই এই শিল্পের সমধিক উন্নতি ঘটে; এই কারণে মুর্শিদাবাদী মুসলমান শিল্পীই এখনও বিদরীর কার্য্যে প্রসিদ্ধ; হিন্দু 'সোনার' তাহাদেরই নিকটে শিক্ষিত। হাতীর দাঁতের কায সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। হাড়ের বা দাঁতের পাশা বাঙ্গালীর নিজস্ব হইতে পারে; কিন্তু এখানে কারুকার্য্যের দৌড় 'চক্ষুদান' পর্য্যন্ত। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের সুন্দর কায এ কালের।

পেঁটরা পাটী। বেত ও বাঁশের পেঁটরা এবং ঝুড়ী, চুপড়ী নির্ম্মাণে বাঙ্গালীর দক্ষতা বহুকাল হইতে আছে; কারণ, উপকরণ এখানে যথেষ্ট। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় এবং তথাকথিত ভদ্রলোক এ সব হীন ব্যবসায় বলিয়া তুচ্ছ করায়, বাঙ্গালার পেঁটরা প্রতিবেশী বিহারী বা উড়িয়ার হস্ত-শিল্পের নিকট শীঘ্রই পরাভূত হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সব সুন্দর পেঁটরা

হইয়াছে, তাহা প্রায়ই পশ্চিমে নির্ম্মিত। পূর্ব্ববঙ্গে যে শিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছিল, বেতবনের আধিক্যই তাহার অন্যতম কারণ। শীতলপাটীও পূর্ব্ববঙ্গের শিল্প; মোগল অধিকারে শ্রীহট্টের শীতলপাটী দিল্লী-দরবারেও আদর পাইয়াছিল। মাদুরে মধ্যবঙ্গ মেদিনীপুরের মছলন্দের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। 'বেউনী টাঙ্গনি ঝাঁটি, ছাতা টোকা গড়ে নাটি' কথায় কবিকঙ্কণ ডোমের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চামড়ার কাজ। চর্ম্মের ব্যবসায় ও শিল্প হেয় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, বাঙ্গালায় কোনকালেই ইহার উন্নতি হয় নাই। সমৃদ্ধ লোক প্রাচীনকালেও পাদুকা ব্যবহার করিতেন; পাটলিপুত্রে ফুলদার পাদুকা মেগাস্থিনিস্ও লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালী চামাররা হিন্দু-যুগে এইরূপ পাদুকাদি নির্ম্মাণে কি পরিমাণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে যুদ্ধের উপকরণ চর্ম্মের ঢাল, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি বাঙ্গালী মুচির হাতে সুন্দর প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কবিকঙ্কণ গাহিয়াছেন, 'যোড়া পানাহি জীন্, নিরময়ে প্রতিদিন, চামার বসিল এক ভিতে'। পাদুকার প্রয়োজন সে যুগে অতি অল্পই হইত। পল্লীবাসী ভদ্রলোকেরও এক যোড়ামাত্র চটি চালের বাতায় তোলা থাকিত; অন্য স্থানে যাইতে হইলে তিনি কখনও হস্তে উঠিতেন, কখনও পায়ে পড়িতেন, ইহা বাল্যকালে দেখা গিয়াছে। খড়ম তখন নিত্যব্যবহার্য্য পাদুকা ছিল, একালের মত চর্ম্মবন্ধে আড়ষ্ট হয় নাই। জলের মশক, 'ভেস্তি' ও পেঁটরা বাঁধার উপযুক্ত চর্ম্মও বাঙ্গালী চামার প্রস্তুত করিত।

নৌশিল্প। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু কর্ম্মকার ও সূত্রধর নৌশিল্পে সিদ্ধহস্ত ছিল, এই কথার পোষক প্রমাণ এ যুগে ভূরি পরিমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদিক-যুগেও শতদাঁড়যুক্ত তরণী সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বীপাদিতে গমনাগমন করিত। রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতিসংহিতা-গুলিতেও জাহাজের খবর আছে; বৌদ্ধজাতক গল্পগুলিতে এবং মহাবংশ দীপবংশাদি পালিগ্রন্থে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার নানা সূত্রে সে বিষয় বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণের সমকালে যে বাঙ্গালীর জাহাজ রাজপুত্র বিজয় সিংহের 'সাত শত অনুচর' সহিত সিংহল যাত্রা করিয়াছিল, কবিকাহিনী কিঞ্চিৎ কমাইয়া ধরিলেও সেই জাতীয় পোত নির্ম্মাণকর্ত্তা বাঙ্গালী মিস্ত্রীর শিল্পকলা সে যুগের জগতের ইতিহাসে অসাধারণ। শিল্প-সংহিতা নামে এক সংস্কৃত পুঁথিতে * পূর্ব্বকালের হিন্দুদের নানা শিল্পকলার সহিত তরণী নির্ম্মাণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভোজ-নরপতি-কৃত শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে নানা স্থানে বচন উদ্ধৃত হওয়ায় কথিত পুস্তিকাখানি কিঞ্চিৎ অর্ব্বাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু বঙ্গের পাল বা সেন রাজগণের সময়ে ইহা সঙ্কলিত ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হয় না। ইহাতে রাজকীয় হস্ত্যশ্ব যান, বাহন, মণি অলঙ্কার প্রভৃতির সহিত নৌশিল্পের পরিচয় আছে। প্রাচীনরা কাষ্ঠের জাতি-বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ শ্রেণীর কাষ্ঠে কোন্ দ্রব্য নির্ম্মিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা লিখিয়াছেন। ভোজের মতে ক্ষত্রিয়জাতীয় সুদৃঢ় অথচ লঘু কাষ্ঠের তরণী সুখসম্পদদায়ী। সমুদ্রগামী পোত এই শ্রেণীর স্থায়ী কাষ্ঠেই নির্ম্মিত হইত। লৌহবদ্ধ তরণীও ছিল; কিন্তু সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন চুম্বকযুক্ত পাহাড়ে লাগিয়া পাছে নিমগ্ন হয়, এই ভয়ে সিন্ধুগা নৌকায় লৌহের জোড় বা পাত মুড়িয়া দেওয়া ভোজ নিষেধ করিয়াছেন। প্রাচীনকালের পক্ষে প্রযোজ্য নিয়ম পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যুক্তি-কল্পতরুর যুক্তি অবশ্য সূত্রধর সকল সময়ে অবলম্বন করে নাই; তাহাদের সে সব যুক্তি জানা ছিল কি না, তাহাই সন্দেহস্থল। তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন বাঙ্গালায় বহু পূর্ব্বকাল হইতে যে বৃহৎ সমুদ্রগা তরণী নির্ম্মিত হইত, তাহা মহাবংশ রাজাবলী প্রভৃতি পালিগ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। এই প্রাচীনের স্মৃতি আবহমানকাল চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনীগুলি পোষণ করিয়া আসিয়াছে।

শিল্পসংহিতায় সামান্য ও বিশেষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নানা জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী প্রস্তুত করিবার বিধান আছে। সামান্যের মধ্যে ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা হইতে মন্থরা

---

* ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সংস্কৃত পুস্তকের পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থে (Notices of Sanskrit MSS. Vol I, no cclxi) লিখিয়াছেন, "Yukti Kalpataru is a compilation by Bhoja Narapati. কিন্তু ভোজপ্রণীত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশের বিষয়ও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভোজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে। মগধ বা বঙ্গে ইহা রচিত হওয়া সম্ভবপর।

পর্য্যন্ত দশ প্রকারের নদীতে চালাইবার নৌকার নাম ও পরিমাণ আছে। বিশেষকে আবার দীর্ঘা ও উন্নতা নামে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। দোলা, সত্বরা, জঙ্ঘলা, গামিনী, প্লাবিনী ইত্যাদি দশ প্রকারের দীর্ঘা তরণীর দৈর্ঘ্য অধিক, কিন্তু উন্নতি অপেক্ষাকৃত অল্প, সম্ভবতঃ এই ধরণের নৌকাগুলি বৃহৎ নদী ও উপকূলে চালাইবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইত। উন্নতা শ্রেণীর ঊর্দ্ধা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিণী, মন্থরা প্রভৃতির দৈর্ঘ্যের তুলনায় উচ্চতা অধিক হওয়ায়, এগুলি গভীরজলে সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহৃত হইত, বুঝা যায়। এই সমস্ত তরণীর পরিমাণ নির্দ্দেশে 'রাজহস্ত-মিতা' বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট না হইলেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সংহিতায় নির্দ্দিষ্ট নৌকার মধ্যে ১৬ হাত দীর্ঘ পটলচেরা ক্ষুদ্র-ডিঙ্গী হইতে প্রায় ২ শত হস্ত দীর্ঘ অনেক পোত আছে। এ হিসাবে সিংহপুরের রাজকুমার বিজয়ের সহযাত্রী 'সাত শত' লোককে পুঁথির লিখিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজে স্থান দিতে গেলেও অন্ধকূপ-হত্যার প্রথম সংস্করণ বাহির করিতে হয়। * জাতক গল্পে ৮ শত হাত দীর্ঘ, ৬ শত হাত প্রস্থ জাহাজ ও ৫ শত গাড়ী মাল বোঝাই পোতের কথা পাই; কোন গল্পে আবার সেকালের এক জাহাজে হাজার লোক যাত্রার কথা আছে, হয় ত শিল্পসংহিতার নির্দ্দেশ অপেক্ষা আরও বৃহৎ পোত নির্ম্মিত হইত। যাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে এবং পূর্ব্ব উপ-দ্বীপ, চীন প্রভৃতিতে যাইতে হইলে, সুবৃহৎ পোতেরই প্রয়োজন। কলিঙ্গ ও পশ্চিম-ভারতের উপকূল হইতে পুরা-কালে পোত চলিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাজনক জাতকে চম্পানিবাসী বণিকসহ রাজপুত্রের সুবর্ণভূমি (ব্রহ্ম বা শ্যাম আনাম) যাত্রার গল্প আছে; ইহাতে বহুতর বাণিজ্য দ্রব্য ও ভারবাহী পশু পর্য্যন্ত চড়ান হইয়াছে। এ গল্প বাঙ্গালার প্রাচীন বহির্ব্বাণিজ্য সমর্থন করে। চম্পা বা ভাগলপুর হইতে বড় জাহাজ চালাইতে হইলে ভাগীরথীর গভীরতা বৃদ্ধি করিতে কলিকালে দ্বিতীয় ভগীরথের অবতারণা করিতে হয়। যাহা হউক, হিন্দুযুগে নিম্নবঙ্গে নদীমুখের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপযোগী জাহাজ যে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। শিল্পসংহিতায় নৌকা রং করা এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্রাদি-মণ্ডিত করার বিষয়ও আছে। চার মাস্তুলের জাহাজ শ্বেত, তিন মাস্তুলের গুলি লাল, দুই মাস্তুলের গুলি হরিদ্রা, এবং এক মাস্তুলের নৌকা নীল বর্ণে রঞ্জিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তরণীর অগ্র ভাগে ও মুখে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মকর, সর্প, ভেকাদি বা ময়ূর, হংস প্রভৃতি পক্ষীর মুখের অনুকৃতি দেওয়া রীতি ছিল। একালেও কলিঙ্গদেশীয় ক্ষুদ্র পোত, এবং বাঙ্গালার ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মকর বা হংসমুখী নৌকায় এবং সাধারণ ময়ূরপঙ্খী বজরায় ইহার নমুনা দেখা যায়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মা বা ভাগীরথীতীরবর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত সুন্দর বজরা বা ছিপ নির্ম্মিত হইত, এবং মাল বোঝাইয়ের উপযুক্ত প্রকাণ্ড 'পাতিলা' ও 'ভুকুনী' নির্ম্মাণে হিন্দু মুসল-মান মিস্ত্রী যে কারিগরী দেখাইত, তাহা আজ ষ্টীমারের প্রচলনে মধ্যবঙ্গে প্রায় লোপ পাইতে চলিল। সংহিতায় রাজতরীর মুখাগ্রভাগ সুবর্ণ ও মণিমালায় মণ্ডিত করার কথা আছে; এ যুগে সাধারণ লোকে পিতল ও কড়ি-পলায় সে সাধ মিটাইত। এখনও বাঙ্গালী মিস্ত্রীর নির্ম্মিত তরণীর সুদৃশ্য মুখাগ্রভাগ ভারতের অন্য প্রদেশে দুর্লভ। দেশজ কাষ্ঠে এই সকল নৌকা নির্ম্মিত হইত; কবির 'শাল পিয়াল কাটে খড়ি তেতুলী' ইত্যাদি বর্ণনা তাঁহার গঙ্গা হইতে দূরে রাঢ়ে বাস করার অনভিজ্ঞতা। পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গের কবি এ ভ্রম করেন নাই। চাঁদ সদাগরের পোতনির্ম্মাণ প্রসঙ্গে কবি গাহিয়াছেন:—

রাজার প্রসাদ পেয়ে, সূত্রধর চলে ধেয়ে
চিরিবারে লাগিল সত্বর।
পাট কর্ম্ম করি সারা, ছুতার চাপিয়া দাঁড়া,
জানাইল চান্দর গোচর।

* * * *

ষোল শত সূত্রধর, ডিঙ্গা গড়ে মনোহর
দিবা-রাত্রি নাহি অবসর।

গৌড়ে 'লাখাটি' ও 'চিড়াই বাড়ী' নৌকা নির্ম্মাণের স্থান ছিল। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান এখনও

* 'সাত শত' কথাটি শঙ্খ ও প্রবাদের বড়ই প্রিয়। বিজয়ের সহযাত্রীদের পরিবারবর্গের কথাও মহাবংশ নির্দ্দেশ করিতেছে, উহাদিগকে (৭ সাত শত পরিমাণ) এরূপ জাহাজে চড়াইয়া বিদায় দেওয়া হয়। [illegible] এবং সিংহের পুত্র ইত্যাদি কাহিনী অনেককে মহাবংশের সমগ্র আখ্যায়িকার ঐতিহাসিকত্বে সন্দিহান করিয়াছে। কিন্তু [illegible] সিংহল-বিজয় যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

আছে। সন্দ্বীপ, সোনার গাঁ প্রভৃতি স্থানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যখন রণতরীর মেলা বসিয়াছিল, তখন নানাজাতীয় তরণী নির্ম্মাণের পটুত্ব যে দক্ষিণপূর্ব্ব বঙ্গে সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামে হিন্দু মুসলমান শিল্পীর অধীনে বহু সূত্রধর পোত নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকিত। এমন দিন গিয়াছে, যখন ইস্তাম্বুলের খলিফা সুলতান মিসরের আলেক্জন্দ্রিয়ায় নির্ম্মিত জাহাজ অপেক্ষা চট্টলে প্রস্তুত বঙ্গীয় পোতের অধিক সমাদর করিতেন। সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে ভিনিসীয় বণিক্ সিজার ফ্রেডারিক সন্দ্বীপে আসিয়া চট্টগ্রামের তরণী নির্ম্মাণের কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবি-কল্পনায় মধুকর ডিঙ্গা হাজার দাঁড়ী হইয়াছে; পরবর্ত্তী যুগে বৃহৎ তরীর প্রয়োজনাভাবে এ শিল্পের অবনতি হইয়াছিল। তবে নদীবহুল স্থানে বাণিজ্যের উপযোগী তরণী চিরদিনই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তমোলুকে জাহাজ আসা বন্ধ হইলে চট্টগ্রাম, সাগর মোহানায় সন্দ্বীপ এবং নদীমুখের নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রাম প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া পড়ে। দেশে শাল, পিয়াল, সেগুণ, জারুল প্রভৃতি শক্ত আঁশের কাষ্ঠের কোন কালেই অভাব হয় নাই। এখনও চট্টলে বহু হিন্দু সূত্রধর বড় ডিঙ্গা গড়িতেছে। কবির "কুশাই কামিলা" পোতনির্ম্মাণে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, এখনও চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান মিস্ত্রী তাহার অংশ পাইতে পারে।

এ যুগে আবার চট্টলে পোতনির্ম্মাণের শুভ সূচনা দেখা দিয়াছে; নদীবক্ষে মহোল্লাসে বড় জাহাজ ভাসাইবার বর্ণনা কাহারও কাহারও মনে অতীতের স্মৃতি জাগত করিয়াছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিকাশ

বদ্ধ বুকের গন্ধ হঠাৎ
পথ পেল আজ কার বরে,
পাগল মৃগ পায় না খুঁজি'
কি এল তা'র অন্তরে।—

ফুটল প্রাণের গোপন কলি,
আয় রে ছুটে,—আয় রে অলি,
রূপের ফাগে খেল্‌ব হোলি
তরুণ প্রাণের বন্দরে।

মাধুরি কে রে অঙ্গে সুবাস,
আয় রে আকাশ,—আয় রে বাতাস,
আজকে যে মোর হ'ল বিকাশ
পূর্ণ তারই মন্তরে!

বিলা'ব আজ আপন পরে,
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব ভ'রে,
অরূপ যে আজ রূপের ঘরে
পড়ল' বাঁধা প্রেমডোরে।

আনন্দের আজ নাই সীমানা,
কবর কি তা'র নাই ঠিকানা,
উপ্‌চে হিয়া বাঁধ মানে না,—
রাখ্‌তে নারি আর ধরে!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

লণ্ডন-বন্দর

লণ্ডনের ঐশ্বর্য্য, লণ্ডনের সৌন্দর্য্য, লণ্ডনের বিপণিশ্রেণী, লণ্ডনের সজ্জা—এই সব দেখিলে 'মেঘনাদবধে' রাবণকৃত লঙ্কার বর্ণনা মনে পড়ে ;—

"—এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে।"

কিন্তু এই যে শোভা, এই যে ঐশ্বর্য্য, ইহার মূল কি? ইহার মূল বাণিজ্য। ইংরাজ কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সেই বাণিজ্যের জন্যই ইংরাজের দিগ্বিজয়। বণিকবেশেই ইংরাজ এই ভারতে আসিয়াছিল—দিল্লীর বাদশাহের দরবারে উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিল—উড়িষ্যার শাসকের চরণ-চুম্বন করিয়া বাণিজ্যের অধিকারলাভচেষ্টা করিয়াছিল—প্রাচীর রাজার অন্তঃপুরের জন্য ইংরাজ যুবতী যোগাইবার প্রস্তাবও আলোচনা করিয়াছিল। এই বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় ইংরাজ অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ওলন্দাজ, দীনেমার, ফরাসী সকলের সহিত এই বাণিজ্য লইয়া প্রাচীতে ইংরাজের বিগ্রহ হয় এবং শেষে ভাগ্য-লক্ষ্মী ইংরাজের গলেই জয়মালা প্রদান করেন। সে সকল কথা ভারতের ইতিহাসেই লিখিত আছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইংরাজের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, দেশে দেশে ইংরাজ-নাম যে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে বিক্রমে নহে—বাণিজ্যে, তরবারিতে নহে—(পণ্যবাহী) তরণীতে। "It is not our conquests, but our commerce, it is not our swords but our sayls, that first spread the English name in Barbary, and thence came into Turkey, Armenia, Moscovia Persia, India, China, and indeed over and about the world." ইংরাজের বল ও অর্থ সবই বাণিজ্যে। সেকালেও যেমন, একালেও তেমনই তাহার—

"—— জাহ্নবীর মত
শত মুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদরাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে।"

এক স্থানে যদি সে বাণিজ্যের স্বরূপ বুঝিতে হয়, তবে লণ্ডন বন্দরে যাইতে হয়। সে যেন ইংরাজের বাণিজ্যের হৃৎপিণ্ড। বিদেশ হইতে যে সব দ্রব্য লণ্ডনে আনা হয়, সে সব লণ্ডন বন্দরে গুদামে রাখিবার এবং সেই গুদাম হইতে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে। বন্দরের গুদামে মদ মিশাইয়া—বিক্রেতার প্রয়োজনানুরূপ করিয়া বোতলবন্দী করা হয়। ২ জন মাত্র লোক ১ সপ্তাহে ১৫ শত ডজন বোতল ছিপি-বন্ধ করিয়া দিতে পারে। পশম হইতে হাতীর দাঁত, আপেল হইতে মাংসের জন্য নিহত পশু-পক্ষী সবই এই বন্দরের গুদামে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কাযেই মৃত্তিকার উপর গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াই স্থানসঙ্কুলান করা সম্ভব হয় নাই—নিম্নেও ঘর করিয়া তাহাতে মাল বোঝাই করিতে হইয়াছে। ভূগর্ভে ২৮ মাইল স্থানে গুদাম।

লণ্ডন-বন্দর বহুকালের; ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বৃদ্ধি হইয়াছে। ক্রমে এক এক দেশের বাণিজ্য-তরী এক এক স্থানে মাল লইত ও নামাইত—এইরূপে লণ্ডন-বন্দরে কতকগুলি ডক সৃষ্ট হয় এবং সেগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে। শেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এ বিষয় অনুসন্ধান জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সে কমিশনের বিবরণ ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ যখন বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি, তখন তাঁহার চেষ্টায় বিলাতের সরকার ডকগুলি কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন। মূল্য স্থির হয়—৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তদবধি লণ্ডন-বন্দর একটি সঙ্ঘের অধীন হইয়াছে।

বর্ত্তমানে টিলবেরী ডক যেমন যাত্রীর প্রধান আড্ডা—রয়াল ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট ডকস তেমনই মালের প্রধান আড্ডা। এই ডক নদীকূলে ৩ মাইল দীর্ঘ। আলবার্ট ডক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, তদবধি উভয় ডকেই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলিয়া

জাহাজের শিকল।

আসিতেছে। সর্ব্বত্রই নদীতে মাটি কাটা চলে, মাটী কাটিয়া নদী গভীর করিয়া রাখা হইতেছে এবং জাহাজে মাল তুলিয়া দিবার ও জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত রেলপথ আছে। সমগ্র ডক যেন রেলের লাইনে ও মাল উঠান নামানর ক্রেণে পূর্ণ।

বিলাতে পৌঁছিবার ৩ দিন পরে (১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর) লণ্ডন পোর্টের কর্ত্তারা ভারতীয় সম্পাদকদিগকে পোর্ট দেখিবার ও তাহার পর তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আহারের জন্ম নিমন্ত্রণ করেন।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া বেলা ১০টার সময় আমরা হোটেল ত্যাগ করিয়া পোর্টে উপনীত হই।

বন্দরে প্রবেশ করিলেই ইহার বিরাটত্বে বিস্মিত, যেন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে কত পণ্য এই বন্দরে গুদামে নীত হইয়াছে, কতকগুলি লণ্ডনেই বিক্রীত হইয়া বিলাতে ব্যবহৃত হইবে; কতকগুলি নানাদেশে রপ্তানী করা হইবে। বন্দরে সাধারণতঃ ৮ হাজার হইতে ১০ হাজার শ্রমজীবী কাষ করে।

প্রথমে আমরা গজদন্তের গুদামে প্রবেশ করিলাম। গুদামের হর্ম্যতলে শত শত গজদন্ত রহিয়াছে। দন্তের গাত্রে একটা "নম্বর কার্ড"—তাহার সহিত মিলাইয়া ওজন প্রভৃতি দেখিয়া খরিদ্দার মাল পসন্দ করেন। আমরা যে দিন গুদাম দেখিতে গিয়াছিলাম, সে দিন ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার গজদন্ত গুদামে বিক্রয়ার্থ মজুদ ছিল ভারতবর্ষে হস্তীর সংখ্যা কত অল্প, তাহা এই গুদামে আসিলে বুঝিতে পারা যায়; এই সব দন্তের মধ্যে কোনটিই ভারতবর্ষ হইতে যায় নাই। সাইবিরিয়ার বরফের মধ্যে যে সব অতিকায় হস্তীর শব পাওয়া যায়, তাহাদেরই একটির দন্ত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার ওজন ২ মণ ৯ সের—মূল্য ২ হাজার ৬ শত টাকা। আর একটি বৃহৎ দন্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহা আফ্রিকার পূর্ব্বকূল হইতে প্রেরিত হইয়াছে। গজদন্তে পূর্ব্বকাল হইতে বহুবিধ বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম গজদন্ত রচিত হইতেছে। কিন্তু এই

পশমের গুদাম।

...মে দেখিলে মনে হয়, নকলে আসলের আদর কমে ...।

গজদন্তের গুদাম হইতে আমরা মসলার গুদামে গমন করিলাম। এই গুদামে নানারূপ মসলা ও গাছের ছাল প্রভৃতি রক্ষিত। এই স্থানে ভারতবর্ষের আমদানী লঙ্কা ...আকারে দেখিলাম। যে দেশে লোক ব্যঞ্জনে লঙ্কা ব্যবহার করে না, সে দেশে এত লঙ্কা কি হয়, জানিতে স্বভাবতই কৌতূহল জন্মে। লঙ্কা প্রধানতঃ চাটনী, পিকল্ যায়। চাটনীতে লঙ্কা ব্যবহৃত হয়। যে সব উপকরণে সাধারণতঃ চাটনী প্রস্তুত হয়, সে সব বিলাতে দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্য এখনও ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণ চাটনী বিলাতে রপ্তানী হয়। পূর্ব্বে এই চাটনীর কাযে হুগলী প্রভৃতি স্থানের বহু দরিদ্র মুসলমান পরিবারের অন্নসংস্থান হইত—মহিলারা কাঁচা বা ডাঁসা আম আনিয়া চাটনী প্রস্তুত করিতেন। তাহা বিদেশে রপ্তানী হইত। এখন অনেকগুলি বড় বড় কোম্পানী এ কায করিয়া লাভবান্
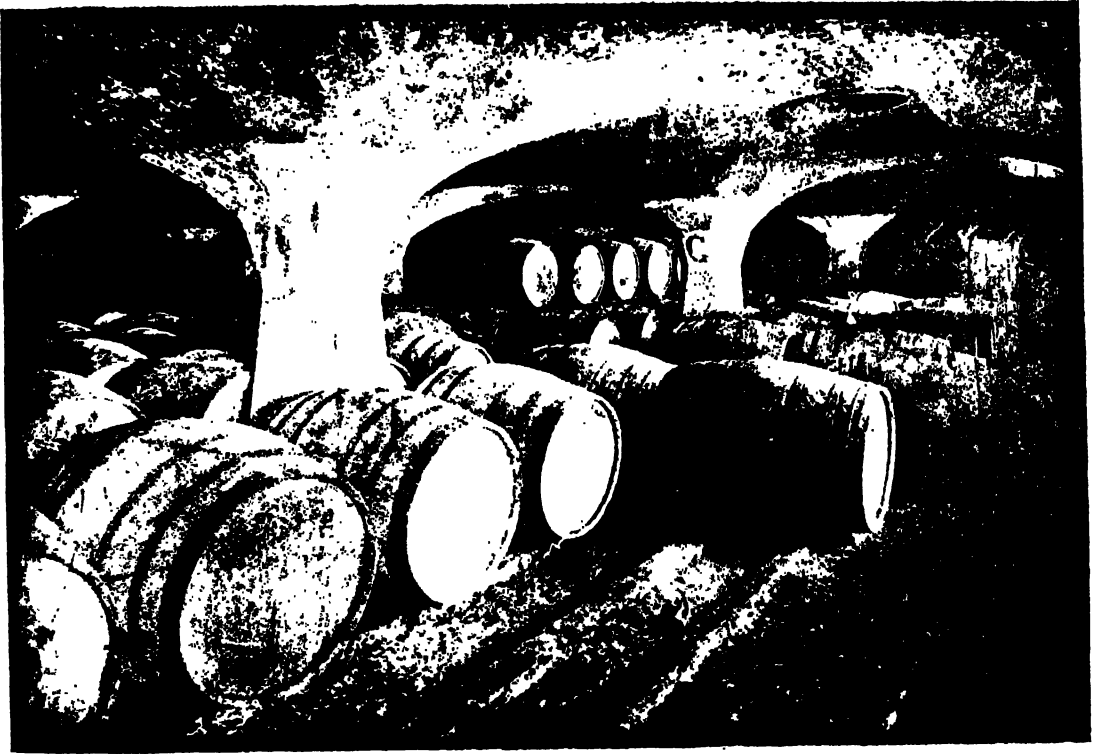
মদের গুদাম

প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন বিলাতের লোক এখন ক্রমে গোলমরিচের গুঁড়ার পরিবর্ত্তে লঙ্কার গুঁড়াও ব্যবহার করিতেছে। থ্যাকারে তাঁহার উপন্যাসে লঙ্কা-ব্যবহারের যে কৌতুকচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। যে সব ইংরাজ ভারতবর্ষে যাইয়া গোলমরিচের পরিবর্ত্তে লঙ্কা ব্যবহার করেন, তাঁহারা আর তাহার স্বাদ ভুলিতে পারেন না; তাই অনেক স্থানে এখন "রেড পেপার" বা লাল গোলমরিচ নামে লঙ্কার গুঁড়া ভোজের টেবলে দেখা হইতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সার মাঞ্চারজী ভবনগরী বিলাতে একটি সভায় বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ হইতে পীপায় চাটনী আমদানী হয়; বিলাতের ব্যবসায়ীরা তাহা বোতলবন্দী করিয়া বোতলে আপনাদের সুদৃশ্য লেবেল লাগাইয়া বাজারে বিক্রয় করেন—সেই বোতলবন্দী চাটনী ভারতেও প্রেরিত এবং তথায় চড়া দামে বিক্রীত হয়!

সার মাঞ্চারজীর এই কথায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। বিদেশী পণ্য কিরূপে বিলাতী বলিয়া বিক্রীত হয়, তাহার

দৃষ্টান্তও আমরা এই বন্দরের কারখানায় দেখিয়াছিলাম। জাপান হইতে টিনের কৌটায় সার্ডিন মাছ আসিয়াছে। নমুনা দেখিয়া নানা বিলাতী ব্যবসায়ী তাহা কিনিয়াছেন। যে যাহার ছাপা লেবেল দিয়াছেন; বন্দরের কারখানায় কলে লেবেল লাগাইয়া মাল দেওয়া হইতেছে। একই মাল লেবেল অনুসারে নানা কোম্পানীর বলিয়া বাজারে বিক্রীত হইবে। কলে মিনিটে ৭০টি কৌটায় লেবেল আঁটা হইতেছে।

এই মসলা'র গুদামেই স্পেনের পারা রক্ষিত হইয়াছে। গুদামে রবারের পরিমাণও কম নহে। আমরা যে দিন দেখিতে যাই, সে দিন গুদামে ২ হাজার টন রবার মজুদ ছিল। মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

এই গুদামের কাছেই তৈলের গুদাম। আর তাহারই কাছে একটি যাদুঘর বা মিউজিয়ম। দেশবিদেশ হইতে এই যে সব জিনিষ আমদানী হয়, এই সব জিনিষের বস্তায় পীপায় বা বাণ্ডিলে সাপ গিরগিট প্রভৃতিও আসিয়া পড়ে। এই যাদুঘরে সেইগুলি সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে।

চর্ব্বির গুদাম।

আমাদের গমনের দিন বন্দরের গুদামে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন কিউবার চিনি মজুদ ছিল। কিন্তু তাহাতে চিনির ব্যবহারে মিতব্যয়িতার নিয়ম বিন্দুমাত্র শিথিল কর হয় নাই।

তামাকের পাতাও গুদামে যথেষ্ট ছিল। জাপান, ব্রহ্ম, ভার্জ্জিনিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় বাণ্ডিলে তামাকের পাতা গিয়াছে, গুদামে তুর্কীর তামাকও মজুদ আছে। তামাকের পাতার মূল্য খুব অধিক নহে। তবে তাহার উপর খুব চড়া শুল্ক থাকায় চুরুটের ও সিগারেটের দাম চড়া হয়। ভারতবর্ষেও বিদেশী চুরুটের ও সিগারেটের উপর চড়া শুল্ক আছে। মিশরের সিগারেট জগতে প্রসিদ্ধ। "ও রসে বঞ্চিত হইলেও" আমি ধূমপায়ীদের কাছে তাহার গুণগান শুনিয়াছি। য়ুরোপ হইতে ফিরিবার পথে মিশরে আমি আমার কোন ধূমপায়ী সুহৃদের জন্য এক বাক্স সিগারেট কিনিয়াছিলাম। যখন দোকানদার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিগারেট শতকরা ৪৲ টাকা কি ৩৲ টাকা ॥০ আনা মাত্র চাহিল,
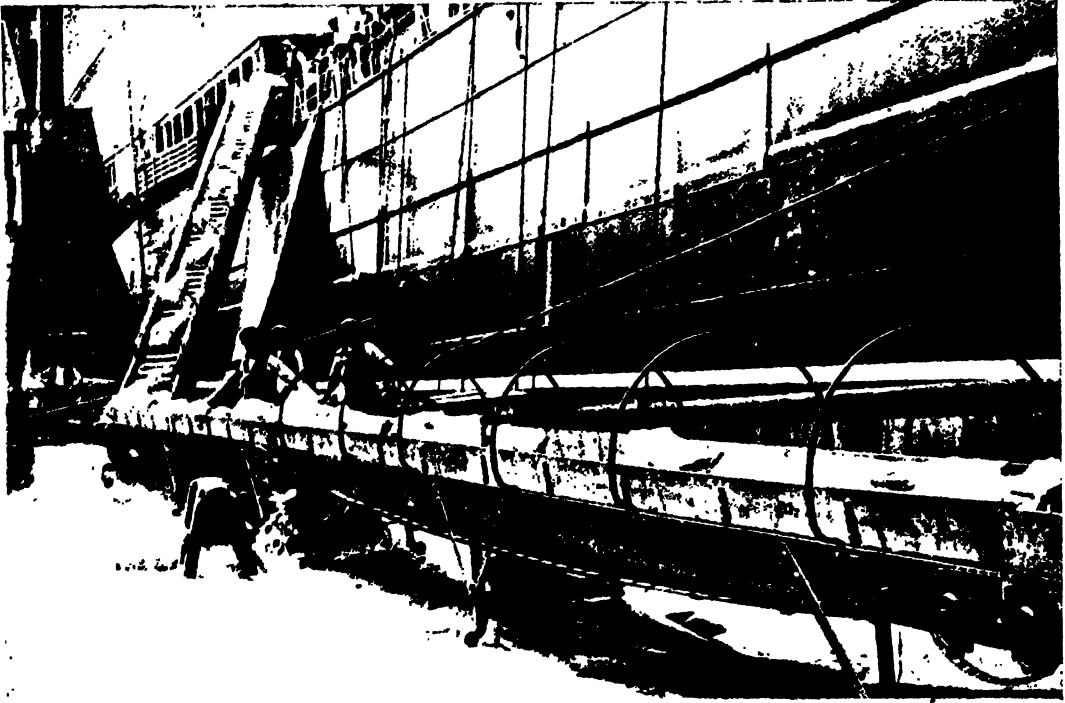
জাহাজ হইতে মাংস গুদামে লইতেছে।

তখন আমি বিস্মিত হইলাম। এক জন ভারতীয় ব্যবসায়ী আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, এই সিগারেটই শতে ৭ লাভে দামে বাড়িয়া কলিকাতার চৌরঙ্গীতে বড় বড় দোকানে শতকরা ১৬৲ টাকা বা ২০৲ টাকায় বিকায়! পয়সা পুড়াইয়া ছাই ও ধুম করিয়া উড়াইয়া দিবার প্রশস্ত উপায় বটে!

ইহার পর পশমের গুদামের উল্লেখ করিব। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, আর্জেণ্টাইন, এশিয়ামাইনর, পাটাগোনিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বিক্রয়ার্থ পশম লণ্ডনে নীত এবং বন্দরের গুদামে রক্ষিত হয়। মোট প্রায় ২৬ একর স্থান এই জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘরে পশম যে ভাবে খুলিয়া রাখা হয়, তাহা দেখিলে সহসা মনে হয় যেন তুষারপাত হইয়াছে। আজকাল কলে মেষের পশম কাটা হয়। পশমগুলি এমন ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া থাকে যে, বোধ হয়,—পশমাবৃত চর্ম্মই রহিয়াছে—না টানিলে পশম বিচ্ছিন্ন হয় না।

যে সব ভূমধ্যস্থ কক্ষে মদের পীপা ও চৌবাচ্ছা থাকে, তাহা অতি বিস্তৃত। এই সব স্থানেই একাধিক প্রকারের মদ্য মিশাইয়া ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন মত মদ্য প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা বোতলে ভরিয়া দেওয়া হয়। ২ জন লোক সপ্তাহে ১ হাজার ৫ শত ডজন অর্থাৎ ১৮ হাজার বোতল ভরিয়া ছিপি লাগাইতে পারে। মদের গুদামের ছাতে স্পঞ্জের মত এক প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়; কেবল ব্রাণ্ডির গুদামে তাহা জন্মে না। ব্রাণ্ডির গুদামে এক একটা চৌবাচ্ছায় ১০ হাজার গ্যালন মদও রক্ষিত হইতে পারে। যে স্থানে পীপা হইতে পোর্ট মদ্য লইয়া মিশান হইতেছে, আমরা তথায় উপস্থিত হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাসে পোর্ট ঢালিয়া আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হইল। আমরা ভারতীয় সম্পাদক ৩ জনই মদ্যপান করি না; আমরা গ্লাশ লইয়া ধন্যবাদসহ ফিরাইয়া দিলাম। 'ইংলিশম্যানের' সম্পাদক বন্ধুবর মিঃ স্যাণ্ডব্রুক ও আমাদের য়ুরোপীয় সঙ্গীরা মদ্যের সদ্ব্যবহার করিলেন। আমরা ব্রাণ্ডির গুদামে আসিলে মিষ্টার স্যাণ্ডব্রুক বড় চৌবাচ্ছা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, "ঘোষ, আমাকে ঐ চৌবাচ্ছায় ফেলিয়া দাও—ব্রাণ্ডিতে ডুবিয়া মরি। আর
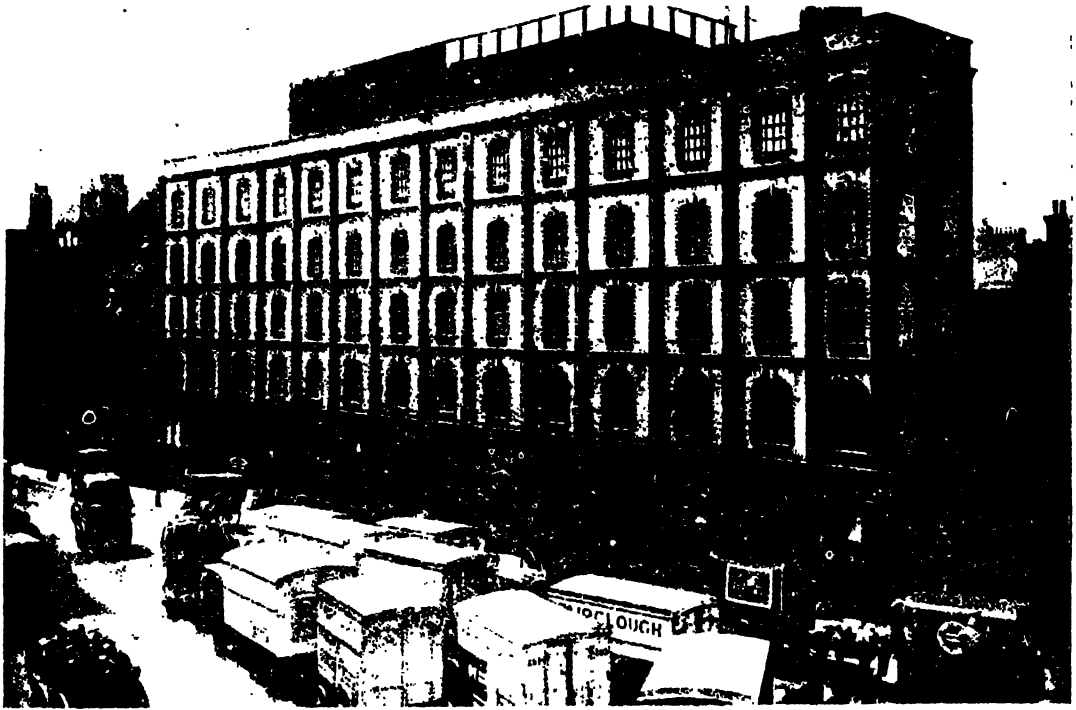
ঠাণ্ডা গুদাম।

তুমি মেজের উপর শুইয়া পড়—কলটা খুলিয়া দিয়া তোমাকে বাণ্ডিতে স্নান করাই—তোমার মোক্ষলাভ হইবে।"

মদের গুদামেরই মত ভূগর্ভস্থ ঘরে চর্ব্বির পীপা রক্ষিত হয়। শীতল গুদামের বর্ণনার সময় বিলাতে মাংসের ব্যবহারের কথা বলিব। চর্ব্বি সেই মাংসের ব্যবসার একটা অঙ্গ অর্থাৎ by-product। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে একটা চর্ব্বির গুদামেই ৩১ হাজার ৭ শত ২০টি চর্ব্বির পীপা ছিল। তাহার মূল্য প্রায়—৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

লণ্ডনের বাজারে কত মাংস বিক্রীত হয়, স্মিথফিল্ড মাংসের বাজারে প্রবেশ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে বন্দরে লণ্ডনের জন্য মাংস সঞ্চিত হয়, তাহার ১০ মাইলের মধ্যে ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বাস করে। ইহাদিগের জন্য মাংস আনিতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২ শত ১৮ খানি ষ্টীমার অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকায় গতায়াত করিয়াছিল। এই ১ শত ১৮খানি জাহাজে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ২ শত নিহত ভেড়ার দেহ নীত হইবার মত স্থান আছে। জাহাজে শীতল কক্ষে এই শব রক্ষিত হয় এবং জাহাজ লণ্ডন-বন্দরে আসিলে কলের ব্যবস্থাতেই জাহাজ হইতে শীতল গুদামে নীত হয়। কেহ সে সব স্পর্শ করিতে পারে না। গুদাম হইতে সে সব কলেই গাড়ীতে ও রেলে বোঝাই করিয়া বাজারে লওয়া হয়। কোনরূপে সে মাংস বিকৃত হইতে পারে না।

এই যে সব শীতল গুদাম, এ সব বিরাট ব্যাপার। লণ্ডনে যে কয়টি শীতল গুদাম আছে, সে কয়টিতে মোট ১১ লক্ষ ৫০ হাজার শব রক্ষিত হইতে পারে। আমরা যে গুদাম দেখিয়াছিলাম, তাহা পঞ্চতল, তাহাতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার শব রাখিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার নিম্নতল কক্ষের—মধ্যে এত শীত যে, ওভারকোট চড়াইয়া এবং তাহার কলার তুলিয়া গলবন্ধের কায করিয়া তবে তথায় তিষ্ঠিতে পারা যায়। গরুর ও ভেড়ার শব ব্যতীত সে গুদামে সহস্র সহস্র খরগোশ প্রভৃতির শব রহিয়াছে। লণ্ডনের মত একটা বিরাট সহরের অধিবাসীদিগের আহারের জন্য এত জিনিস দরকার হয়! দেখিলে বিস্মিত

হইতে হয়। আমাদের দেশের স্বভাবশিথিল লোক হয় ত দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিবেন, "স্বচ্ছন্দ-বনজাতেন শাকেনাপি" যে উদর পূর্ণ হয়, তাহার জন্য এত জীবহত্যা—এত আয়োজন কেন? কিন্তু ইহাতেই মানুষের কর্ম্মোদ্যম বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে দেশের লোকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয়, তাহার জন্য এই যে চেষ্টা, ইহা জাতির জীবনের লক্ষণ। শীতপ্রধান ইংলণ্ডে মাংস রক্ষা করিবার এমন চমৎকার ব্যবস্থা! আর আমাদের দেশে?—যেন তেন কোনরূপে দিন গত পাপক্ষয় হইলেই হইল। তাই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল—খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য। বলা বাহুল্য, দেশ স্বাধীন না হইলে এ সব ব্যবস্থার পথ বিঘ্নবহুল হয়। কিন্তু সেই জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আর পরের উপর রাগ করিয়া আপনি উপবাসী থাকা একই প্রকার বুদ্ধির পরিচায়ক। আমাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে, আমরা কেন তাহারই সদ্ব্যবহার করি না? রেল কোম্পানী মৎস্য আনিবার উপযোগী যানের ব্যবস্থা করেন না; আর আমরা সনাতন প্রথায় বরফ দেওয়া মৎস্য চড়া দামে ক্রয় করিয়া হা হতোস্মি করি-কিন্তু ঠাণ্ডা গুদাম করিয়া মাছ রাখিবার উপায় করি না।

মৎস্য ও মাংস সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, ফল ও তরকারী সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়—দুগ্ধ সম্বন্ধেও সেই কথা আমাদিগকে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেই কলিকাতায় দুগ্ধ যে দরে কিনিতে হয়, লণ্ডনে দুগ্ধের মূল্য তদপেক্ষা অল্প। কভেণ্ট গার্ডেন ফল ও সবজীর বাজার দেখিলে বুঝা যায়, লণ্ডনে ফল ও সবজীর কিরূপ আমদানী ও কাটতি।

ফল ও সবজী বাজার।
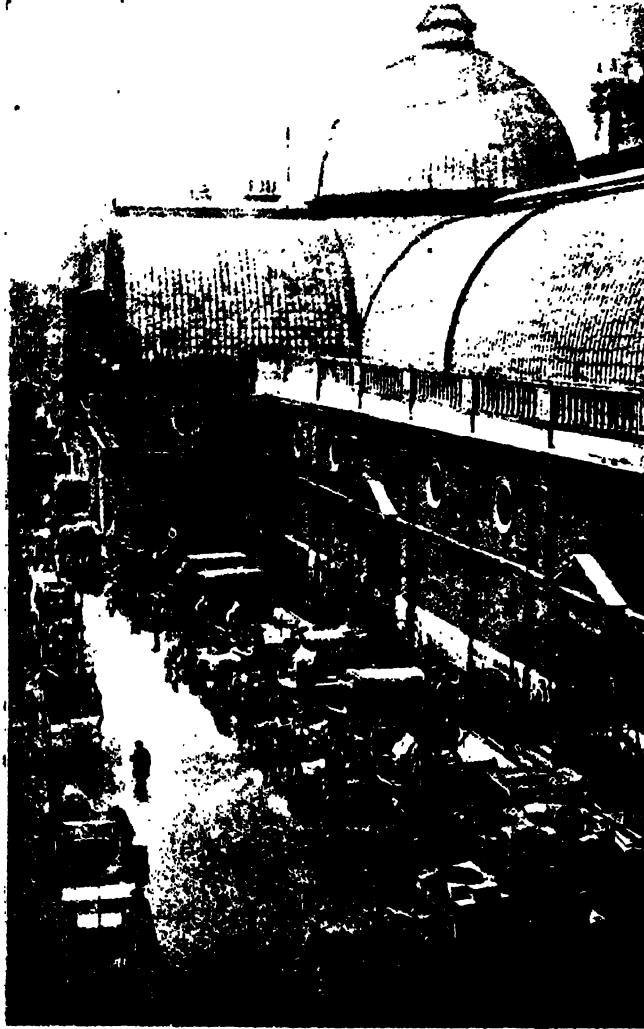
অষ্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়া হইতে লণ্ডনে কিরূপ আপেল আমদানী হয়, লণ্ডন বন্দরে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬ শত ১টি বাক্স আপেল আসিয়াছিল। পর বৎসরই ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭ শত ৫২ বাক্স আমদানী হয়। তাহার পর বৎসর বৎসর আমদানী বাড়িতেছে। বন্দরে আপেল বাছাই করিয়া উত্তম মধ্যম অধম হিসাবে ভাগ করা হয়।

বন্দর হইতে রেলে নানাস্থানে ফল লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও আছে। আর আমাদের দেশে? এ দেশে

টিলবেরী ডকে আপেল বাছাই।
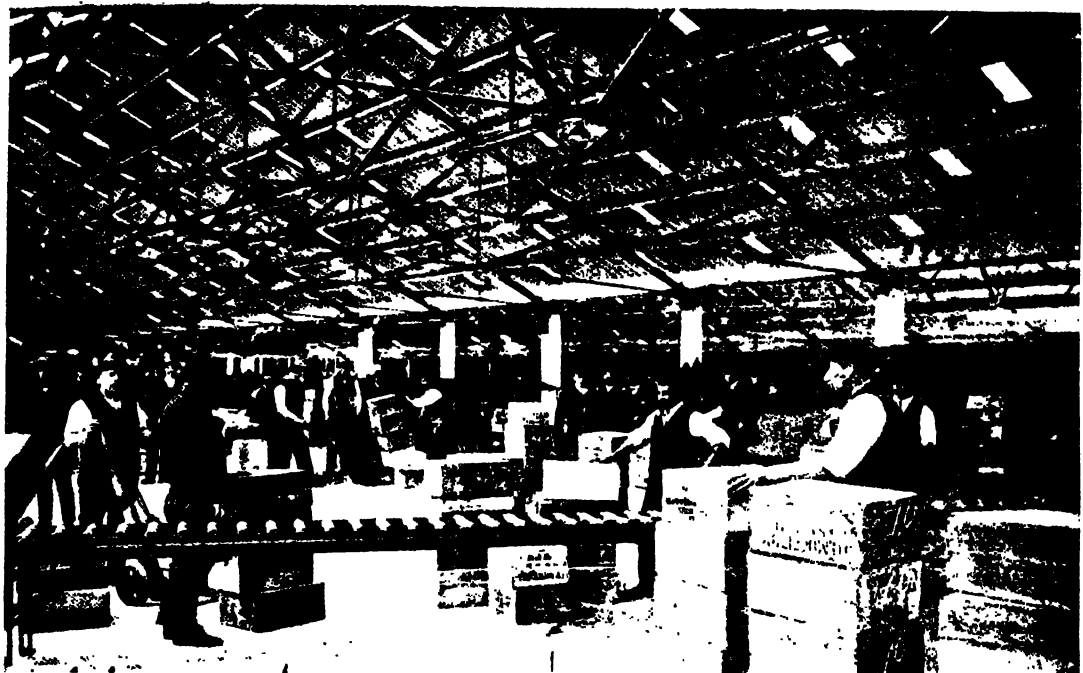
কাঁচা ফল যে ভাবে ঝুড়ীতে পাঠান হয়, তাহাতে কতক পচিয়া যায়, কতক চাপে নষ্ট হয়, কতক চুরী হয়—শেষে শতকরা ২৫টি ফল পাইলে তাহাই ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। ভারতবর্ষের মত ফলের দেশেও ফলের ব্যবসার ভালরূপ ব্যবস্থা হয় নাই!

বিদেশ হইতে বিলাতে কলা আনিবার কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাতে কলার আদর দিন দিন বাড়িতেছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও এক সপ্তাহে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ছড়া কলা বিলাতে আমদানী হইয়াছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে ক্ষেত্র হইতে কলা সমুদ্রকূলে আনিয়া জাহাজে বোঝাই করা হয়। প্রত্যেক জাহাজে ৬০ হাজার ছড়া কলা রাখিবার বন্দোবস্ত আছে এবং যে স্থানে কলা রাখা হয়, সে স্থানের উত্তাপ ৫৬ ডিগ্রী রাখা হয়।

উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইলে যে ভারতবর্ষ হইতেও প্রচুর ফল বিলাতে পাঠাইয়া লাভবান হওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমরা দেশের বড় বড় সহরের বাজারে ভাল করিয়া ফল চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। সে বিষয়ে আমরা কবে অবহিত হইব? কোন কোন ইংরাজ কার্য্যব্যপদেশে এ দেশে আসিয়া কুলু ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বাগিচা করিয়া ফলের ব্যবসা করিতেছেন এবং লাভবানও হইয়াছেন। তাঁহারা ফলগুলি কাগজে মুড়িয়া ছোট ছোট ঝুড়ীতে পরিষ্কার শুষ্ক ঘাসের মধ্যে বসাইয়া ডাকে বা রেলে চালান দেন। ঝুড়ীগুলিও শক্ত থাকায় মাল অধিক নষ্ট হয় না। কিন্তু এমন দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি নাই। তাহারা কেবল চাকরীর চেষ্টায় ফিরে এবং ফলে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে বাধ্য হয়। কাশ্মীর ফলের রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কাশ্মীর হইতে ফল রপ্তানীর ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় কয়বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীর-দরবার খরচা মাত্র লইয়া ডাকে ঝুড়ীতে আপেল প্রভৃতি পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। দরবারের উদ্দেশ্য ছিল—ব্যবসাটা লাভের বুঝিলে দেশের লোক সে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। এ কার্যের জন্য কাশ্মীর-দরবারের প্রশংসা করিতে হয়। দরবারের এই
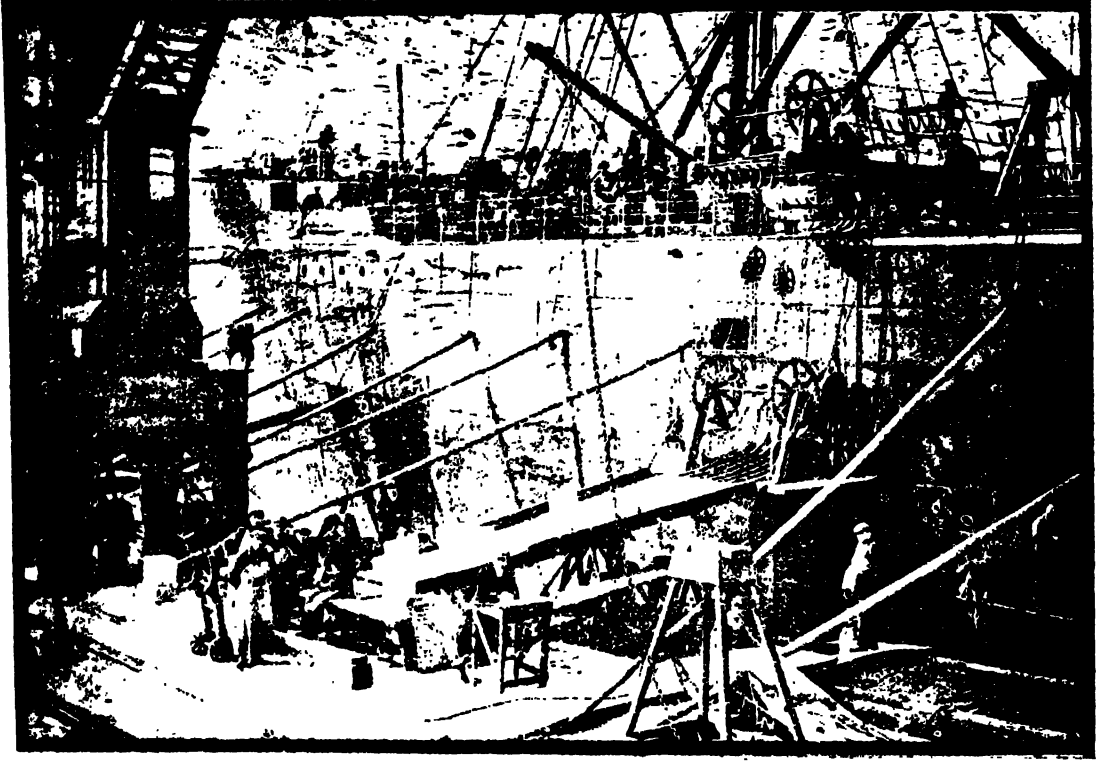
উত্তম [illegible] কি না, [illegible] আমাদের দেশের [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] পথ আবিষ্কার করিবেন ?

ফলের মত প্রচুর মাখন পনির প্রভৃতিও বিদেশ হইতে লণ্ডন বন্দরে আমদানী হয়।

লণ্ডন-বন্দরে দেখিবার জিনিষ এত অধিক যে, সপ্তাহ কাল দেখিলেও শেষ করা যায় না। কিন্তু দেখিবার জিনিষ অপেক্ষাও আমাদের পক্ষে শিখিবার জিনিষ অধিক।

বঙ্গদেশ হইতে কত চা বিলাতে যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার জন্য স্বতন্ত্র বৃহৎ গুদামের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালীর কাছে তাহা দেখিবার মত বটে। কিন্তু কয়টা বড় চা-বাগান বাঙ্গালীর? আর চা কিনা-বেচা করেন য়ুরোপীয় দালালরা। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কেবল কুলি-মজুর। নিজের দেশে আমাদের এই যে অবস্থা, ইহার জন্য কি আমাদের দায়িত্ব নাই ?

বন্দরে জাহাজ সরাইবার ব্যবস্থাও আছে।

বন্দর দেখিয়া আমরা "সিপ এণ্ড টার্টল" হোটেলে উপস্থিত হইলাম। বন্দরের কর্ত্তারা তথায় আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই হোটেলটির বয়স প্রায় শত বৎসর। আমাদের দেশে কতগুলা ব্যবসা এতদিন টিকিয়া থাকে ? এ বিষয়েও দুই দেশে এত প্রভেদ কেন ?

ঋণী

১

দরিদ্র বিধবার আদরের সন্তান এবং স্নেহের ও সংসারের একমাত্র অবলম্বন সত্যেন্দ্র, ধনী উকীল ধনেশ্বর বাবুর একমাত্র কন্যা সরোজিনীকে বিবাহ করিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিল যে, শ্বশুরের সাহায্যে লিখাপড়া মনের সাধ মিটাইয়াই করিতে পারিবে। বিবাহ হইয়াওছিল কতকটা সেই সর্ত্তে।—তবে কথাটা আরও পরিষ্কার হয় নাই। বিবাহের পর ধনেশ্বর বাবু সত্যেন্দ্রর জননীকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, তাঁহার ইচ্ছা—সত্যেন্দ্র তাঁহারই বাড়ীতে থাকিয়া লিখাপড়া করে; অন্যত্র রাখিয়া পড়াইবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাঁহার নাই। বিধবা এই পত্রপাঠে মনে মনে দুঃখিত হইলেও পুত্রের উন্নতির পথে বিঘ্ন হইবার ভয়ে তাহা চাপিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র কিন্তু এই পত্র পাইবামাত্র ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিল এবং মা'র হইয়া শ্বশুর মহাশয়কে লিখিয়া দিল,—"আমরা দরিদ্র বটে, কিন্তু বড়-মানুষের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা অপমানজনক বলিয়াই মনে করি। সত্য আমার চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিবে; তবুও বড়লোকের প্রসাদভোজী হইবে না।"

কিশোরী সরোজিনীর কিন্তু এ সকল একেবারেই প্রীতিকর বলিয়া মনে হইল না। বিবাহের পর যে সাত দিন সে শ্বশুরালয়ে ছিল, সেই সময়েই সত্যকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। কিশোরীর হৃদয়ের ভালবাসা সেই পায়ে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিল। তাই, সে যখন শুনিল যে, সত্যেন্দ্র তাহাদেরই বাটীতে আসিয়া থাকিবে, তখন সে কল্পনায় সোনার স্বপ্ন রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবী সুখের আশায় সে দিন-রাত্রি তন্ময় হইয়া থাকিত। স্বামীর পত্র তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। বড় ব্যথায় তাহার বক্ষ অকস্মাৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল; সান্ত্বনাহীন বেদনার আঘাতে অশ্রুও বড় কম ঝরিল না। সত্যর উপর নিবিড় অভিমানে তাহার বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ওগো নিষ্ঠুর! অপমান—শুধু অপমানটাই তোমার দৃষ্টিতে পড়িল! আর এই বুকভরা আশা কি একবারও তোমার মনে পড়িল না? নিজের উপরও তাহার অত্যন্ত ধিক্কার হইল; তাহার প্রেম কি এমনই তুচ্ছ যে, স্বামীর কাছে তাহার কোন আকর্ষণই নাই? পিতার উপর তাহার ক্রোধও সে দিন এত বেশী হইল যে, সে অসুখের নাম করিয়া সমস্ত দিন শয্যা আশ্রয় করিয়া রহিল! পিতার আহ্বান, মাতার অনুরোধ কিছুই অভিমানিনীকে টলাইতে পারিল না।

বৈকালে তাহার সমবয়সী সখী নলিনী আসিয়া ধরিয়া বসিল—"কি হয়েছে তোর? বল্ -বল্‌তেই হবে।"

সরোজিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"কি আবার হবে না—দেখ্‌ছিস, শরীর খারাপ—"

"শরীর আবার কোন্ যায়গায় খারাপ -নে ওঠ্, চল্ ঘাটে যাই—"

সমস্ত দিন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া সরোজিনীরও আর ভাল লাগিতেছিল না—তদ্ভিন্ন নিজের মনের ব্যথা এতক্ষণ পর্য্যন্ত মনে চাপিয়া রাখিয়া সে যে যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, তাহাও অসহ্য; তাই সে ধীরে ধীরে নলিনীর অনুসরণ করিল এবং পুষ্করিণীর শীতল জলে অবগাহন করিতে করিতে কথায় কথায় নিজের হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া যেন অনেকখানি সান্ত্বনা অনুভব করিল।

২

পরদিন মধ্যাহ্নে নিভৃতে বসিয়া নলিনী যখন তাহার স্বামীর প্রবল ভালবাসার সম্বন্ধে সখীর নিকট উচ্ছ্বসিত হইয়া গল্প করিতেছিল—তখন তাহার দুইটি নয়নে যে হর্ষের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সরোজিনীকে শুধু ব্যথিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই—তাহার সরল অন্তরে একটু ঈর্ষাও জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

তিন দিন হইল নলিনীর স্বামী আসিয়াছে; এ কয়-দিনের মধ্যে সে এমন একটুও অবকাশ পায় নাই যে, সরোজের সঙ্গে দুইদণ্ড গল্প করে। তাই সে আজ দ্বিপ্রহরে সখীর নিকট বসিয়া তাহার সেই তিন দিনের ইতিহাস

পুলকের আবেগে আত্মহারা হইয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। তাহার এই আনন্দের তরঙ্গ যে সখীকে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না, ইহা বুঝিতে তাহার তিলমাত্রও বিলম্ব হইত না, যদি তাহার অন্তর আজ বর্ষার নদীর মত কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া না থাকিত। নিজের মধ্যে সে আজ নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। আনন্দের চঞ্চল স্রোতঃ তাহার আবর্ত রচিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, চকল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে ; পশ্চাতে চাহিয়া, তরঙ্গের আঘাতে তটের কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর আজ সে পাইবে কেমন করিয়া? আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নলিনীর আজ অবসর কোথায় যে সে দেখিবে, তাহার এই আনন্দের ইতিহাস তাহার সঙ্গিনীকে কি নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছে? বৈকালে নলিনী চলিয়া গেল। তাহার স্বামিসৌভাগ্যের ইতিহাস সরোজের বেদনাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। সে ভাবিল, সে কি এমন অপরাধ করিয়াছে যে, এত বড় সৌভাগ্য হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে? এ অন্যায় সে নীরবে সহ্য করিবে না।

মা আসিয়া বলিলেন, "খাবি চ, সরো!"

সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমি খাব না; আমার বড় মাথা ধরেছে।"

কন্যার এই উপবাসের কারণ জননীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি বলিলেন, "রোজ রোজ উপবাস ক'রে কি কোন ফল হবে, মা? এস লক্ষ্মীটি—"

বৃথা বাদানুবাদ করিতেও আজ সরোজ বিরক্তি বোধ করিতেছিল—সে ধীরে ধীরে মা'র অনুসরণ করিল।

পরদিন সকালেই নলিনী আসিয়া বলিল—"আয় সরো, ঘাটে যাই।"

নিভৃতে ঘাটে বসিয়া নলিনী বলিল, "একটা উপায় ঠিক করেছি, ভাই।"

এ উপায়টা যে কিসের, তাহা সরোজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে চুপ করিয়া রহিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "শ্বশুরবাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়?"

সরোজ বলিল, "কে নিয়ে যাবে—যম?"

"হ্যাঁ, যম—তুই এক কায করতে পারবি?"

"কি?"

"একখানা চিঠি লিখ্‌তে পারবি?"

"কা'কে?"

"তোর বরকে।"

লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া সরোজিনী বলিল, "সে আমি পারবো না"—তাহার মনে জাগিতেছিল, তাহার স্বামীর সেই উপেক্ষার কথা।

"তবে কেঁদে মর্ গে যা।"

অনেক বাদানুবাদের পর সরোজকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল—নলিনীর কাছে না হউক, তাহার অন্তরের কাছে।

ইহার চারি দিন পরে সত্যেন আসিয়া সরোজকে লইয়া যাইতে চাহিল। স্ত্রীর অনুরোধ ও মিনতিতে ধনেশ্বর বাবু আপত্তি করিতে না পারিলেও, কন্যার অকৃতজ্ঞতায় মনে মনে যথেষ্ট দুঃখিত হইলেন; সন্তান কি এত অকৃতজ্ঞ হয়!

৩

কিশোরী পত্নী সরোজকে সত্যেন্দ্র ভালবাসিয়াছিল। সে যে বয়সের ধর্ম্ম। পত্নীর রূপ তাহার তরুণ অন্তর নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার মধুর হাসি, তাহার কথা, সবই যেন তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই সে এই কিশোরীকে নিজের সঙ্গিনী মনে করিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। কিন্তু যে দিন তাহার শ্বশুর মহাশয় তাহাকে ঘরজামাই-রূপে থাকিতে আহ্বান করিলেন, সে দিন ইহা যে শুধু দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণামিশ্রিত স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহাই নহে, ইহার সহিত যে তাঁহার আদরিণী কন্যার অসহ্য স্পর্দ্ধাযুক্ত আবদারের যোগ আছে, সে বিষয়েও তাহার মনে কোন সন্দেহই রহিল না। পূর্ব্ব-কল্পনাকে সে এই ভাবিয়া নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দিল যে, দর্পিতা পত্নীর আদেশ মাথায় বহিয়া বেড়াইতে তাহার জন্ম হয় নাই। প্রেমের দাবী যত বেশীই হউক না কেন, মানুষ হইবার অধিকার-টুকুও যদি সে গ্রাস করিতে আইসে, তবে তাহা কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না—অতএব, থাকুন তিনি পিতার আদরিণী হইয়া; সত্যর সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই ভাবিয়া সে যখন আবার তাহার পুস্তকরাশিতে মনো-নিবেশ করিয়া দর্পিতা পত্নীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিবার ব্যর্থ

·হার আপনাকে পীড়িত করিতেছিল, তখন সরোজের কট হইতে যে পত্রখানি আসিয়াছিল, তাহা শুধু তাহাকে ·ম্বিতই করে নাই, একটু অনুতপ্তও করিয়াছিল। পত্রখানি · বার বার পড়িল। উপেক্ষিতা পত্নীর নিবিড় অভিমানের ·দনা যেন পত্রখানির অক্ষরে অক্ষরে মূর্ত্ত হইয়া উঠি· ·ছে! কই, ধনীর কন্যার দর্পের লেশও ত সে পত্রে ·ঁজিয়া পাওয়া যায় না! অনুতপ্ত সত্যেন্দ্র পরদিনই যাইয়া সরোজকে লইয়া আসিল।

ইহার পর কিছুদিন যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা ·ই জনে জানিতেই পারিল না। কিন্তু সত্য যে তাহার বাড়ীতে থাকিতে অপমান বোধ করে, ইহার বেদনা কোন· মতেই সরোজ ভুলিতে পারে নাই—বিশেষ যখন এখানকার অপেক্ষা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিমাণে সেখানে অনেক বেশী। শেষে সে ভাবিল যে, বাড়ীতে সে যে তাহারই আশায় পথ চাহিয়া থাকিত; সে যে ধনী হওয়ার দর্পে স্বামীকে দান· রূপে পাইবার স্পর্দ্ধা কখনও রাখে নাই—এ সমস্ত কথা সত্যকে বুঝাইয়া বলিবে। তাই এক দিন অনেক সঙ্কোচ কাটাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব, বল্বে ?"

"আমি কি কখনও তোমার কাছে মিছে কথা বলেছি ?"

নিজের প্রশ্নে ও সত্যর উত্তরে সরোজ লজ্জা পাইয়া বলিল, "না—তা নয়—তবে—"

স্ত্রীকে আদর করিয়া সত্যেন্দ্র বলিল, "তবে কি বল,— আমায় ভয় ক'র না, সরো—"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বাবার চিঠি প'ড়ে তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে ?"

সত্যর একবার ইচ্ছা হইল যে, বলে—"না"—কিন্তু মিথ্যা কথা বলা তাহার অভ্যাসের এতই বাহিরে যে, অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল— "করেছিলুম।"

সরোজ যেন বড় একটা ব্যথা পাইল। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে সে তাহার ব্যপাটি কিছুতেই বুঝা- ইতে পারিল না! সরোজকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সত্য মনে মনে বিরক্ত হইল; সে ভাবিল, সরোজ বুঝি তাহাকে নিজের বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসি- য়াছে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাহার মন আবার বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

৪

পরস্পরের প্রতি নিবিড় অভিমান আপোষে মিটাইয়া না লইয়া দুইখানি হৃদয় যখন সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করে, তখন মিলন সম্পূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, মধ্যে মধ্যে ছোট- খাট সংঘর্ষই উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে এক দিন হয় ত তাহা গভীর বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করিয়া দুইখানি হৃদয়কে লক্ষ যোজন দূরে সরাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিল। সেই দিন হইতেই সত্যেন পত্নীর উপরে অকারণে বিরক্ত হইয়া রহিল। সামান্য সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সে সরোজকে অহঙ্কারী পিতার দর্পিতা কন্যা ইত্যাদি বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া যেন তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। সরোজ স্বামীকে সত্য সত্যই ভালবাসিয়াছিল; তাহার স্নেহ হারাইবার ভয়েই সে এই সকল লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। সে ভাবিয়া পাইত না, তাহার স্বামী তাহার হৃদয়ের সত্যটিকে ধরিতে না পারিয়া তাহার উপরে কেন অকারণে এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে। সে নারী বলিয়াই কি তাহার হৃদয়ের সত্য এমন নিষ্ঠুরভাবে উপে- ক্ষিত হইবে ? ইহা অন্যায়—কিন্তু তবুও অন্যায় হইলেও সে নীরবে সব সহ্য করিত। স্বামী কিন্তু তাহার এই নীরবতারও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। সে ইহাকে অহঙ্কারের অভিব্যক্তি মনে করিয়া নিষ্ঠুরতাকে এত ভীষণ করিয়া তুলিল যে, সরোজের পক্ষে তাহা সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। কেন না, সহিষ্ণুতা মানুষের যত বেশীই থাকুক না কেন, তাহার উপর অনুক্ষণ অত্যাচার চলিতে থাকিলে তাহা নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সরোজ তাহার স্বামীর রূঢ় ব্যবহার অনেক দিন সহ্য করিয়াছিল—এক দিন আর পারিল না। যখন সত্য আসিয়া অকারণেই তাহার পিতাকে দাম্ভিক ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তখন সে বলিল, "দেখ, যা বল্বে, আমায় বলো, বাবাকে কিছু বল্বার অধি- কার তোমার নেই! তাঁকে ভক্তি না কর্তে পার, অপমান করো না।" সত্য প্রথমটা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল—

সরোজ যে তাহার সম্মুখে এমন করিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। পরক্ষণেই সে চীৎকার করিয়া বলিল, "তিনি আমার অপমান করেন নি?"

"না—তিনি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তোমার মঙ্গলের জন্যই তিনি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।

সাহায্য!—দয়া!—আমি কি তাঁর দয়ার পাত্র? তোমারও দেখ্‌ছি স্পর্দ্ধা অল্প নয়! কেন, আমি কি পথের ভিখারী?"

ক্রোধে—অভিমানে সরোজও আজ জ্ঞান হারাইয়াছিল—সেও জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "ঋণ ক'রে যাকে সংসার চালাতে হয়, তা'কে স্বজনের সাহায্য কি অপমান? কিন্তু বাবার কথাই ঠিক, তুমি তা'রও অনুপযুক্ত—বাবার মর্য্যাদা বোঝবার শক্তি তোমার নেই।"

নিজেকে কোনমতে সংবরণ করিয়া লইয়া সত্য ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সে শক্তি যে নেই, সে কথা সত্য; কিন্তু এই আমাকেই ডেকে তিনি মেয়ে দিয়েছিলেন কেন—বলতে পার?"

"সেটা তাঁ'র এক মস্ত বড় ভুল—তার প্রায়শ্চিত্ত কি তাঁ'র মেয়ে ভাল ক'রেই কচ্ছে না?"

অসহ্য বেদনায় সত্যর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—সে প্রথমটা যেন তড়িৎস্পর্শে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পরে ক্রুদ্ধা পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত করতেই এসেছিলে, তা' আমি জান্‌তাম না। জান্‌লে আমি যত ছোটই হই, তোমাকে দুঃখ দিতে আমি এখানে কখনও বন্দী ক'রে রাখ্‌তুম না। আজ থেকে তুমি মুক্ত! ভুল তোমার বাবার যত বেশীই হোক্, তার চেয়ে ঢের বেশী হয়েছে আমার—এবার তাই, আমার প্রায়শ্চিত্তের পালা—আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে তোমার বাবাকে লিখে দিচ্ছি।"

৫

মা আসিয়া ছেলেকে ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, বৌমাকে একবার দেখে আয়।"

পুস্তক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সত্য বলিল, "মা, এখন ত কোন মতেই হ'তে পারে না—তা' ছাড়া—"

"তা' ছাড়া" যে কি, তাহা মাতার অজ্ঞাত ছিল না। পুত্র ও পুত্রবধূর বিচ্ছেদের কারণ তিনি সবখানিই না জানুন, অল্পবিস্তর জানিতেন। সরলস্বভাবা পুত্রবধূকে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বেশ চিনিয়া লইয়াছিলেন। তাহার আর যাহাই থাকুক, ধনীর দম্ভ যে ছিল না, এ বিষয়ে তিনি শপথ করিতে পারিতেন। সে তাঁহার পুত্রকে যত ব্যথাই দিয়া থাকুক না কেন, বড় ঘা খাইয়াই যে দিয়াছে, সে বিষয়েও তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহার পুত্রের প্রকৃতি যে তিনি বেশ জানেন। সে যে প্রিয়পাত্রকে নিতান্তই অকারণে ব্যথা দিয়া, নিজেকেও ব্যথিত করিয়া তুলে! এই ব্যথা দিয়া সে যেন নিজের ও পরের স্নেহের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে; কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ব্যথায় নিজেই জর্জ্জরিত হয়। সে যে অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আর কিছু বলিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন সন্ধ্যার আগে সত্য একখানি পত্র পাইল; তাহার শ্বশুর লিখিতেছেন, "বাবা, সত্য, সরোজ আমার মৃত্যুশয্যায় তোমায় দেখিতে চাহিতেছে। একবার এস।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি রে সত্য?"

সত্য চিঠিখানি মা'র হাতে দিল। মা পড়িয়া বলিলেন, "আহা! মা'কে তুই মেরে ফেল্‌লি, সত্য?—সে আমার সতীলক্ষ্মী, তোর মত হৃদয়হীন লোকের হাতে প'ড়ে তা'র এই দুর্দ্দশা।"

এ কথা সত্য সেই দিনই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে, যে দিন তাহার সহিত বিবাদ করিয়া সরোজ অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে। সে চুপ করিয়া রহিল, মা বলিতে লাগিলেন, "মা'র আমার যাবার দিন কি কান্না! পাষাণও সে অশ্রুজলে গলে যায়, কিন্তু তুই—"

সত্য অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, আমি চল্লুম তোমার বৌমাকে তোমার পায়ের তলায় ফিরিয়ে আন্‌তে।"

• • • • •

সরোজের তখন সবেমাত্র জ্ঞান হইয়াছে। তাহার মা বলিলেন, "মা, সত্য এসেছে—একবার চেয়ে দেখ।" বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সরোজ বহুকষ্টে চাহিয়া ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এসেছ—আমার এত বড় অপরাধ ক'রে, তুমি এসেছ?"

মুমূর্ষু পত্নীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অনুতপ্তস্বরে বলিল, "হাঁ—আমি এসেছি, তোমায় নিয়ে যেতে। মা তোমার আশায় পথের দিকে চেয়ে আছেন। শীঘ্র সেরে ওঠ, সরো—"

সরোজের অধরে যে ক্ষীণ হাসিটুকু দেখা গেল, তাহা আঁধার রাত্রিতে জ্যোৎস্নারই মত ম্লান হইলেও তাহার অন্তরের আনন্দটুকুকে বেশ ফুটাইয়াই তুলিল, সে বলিল, "কিন্তু ডাক্তার কি ব'লেছে শুনেছ ত?"

"কি!"

"আমার বাঁচবার আর কোন আশাই নেই—"

"মিথ্যা কথা—নিজের সমস্ত মাধুর্য্য দিয়ে আমায় সার্থক করে, সমস্ত অপমান সমস্ত বেদনা নীরবে সহ্য ক'রে তুমি যে আমায় শুধু ঋণী করেই রেখে যাবে—সে আমি কোন মতেই হ'তে দেব না। ঋণীর ঋণশোধের অবকাশ তোমায় দিতেই হবে।"

তখন সরোজের অচঞ্চল তৃপ্তির ক্ষীণ হাসি যেন চিত্রাঙ্কিত ওপারের আলোর মত স্থির হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়।

সতীর স্বর্গ

সব সুষমার সার সুষমায়
গড়ি তোরে বিধি নিপুণ করে,
নানা ফুলমাঝে শতদল সম
পাঠায়ে ছিলেন মোদের ঘরে।

মরতের এই মলিনতা মাঝে
না রাখি বিধাতা নিলেন তুলি,
অমরার সাথে অমরাবতীতে
কেমনে রহিবি মোদের ভুলি?

সহসা শুনিনু নাহি সে সুষমা
নাহি সে গরিমা—কমলা নাই,
পূত চিতানলে ভাগিরথী তীরে
কনক প্রতিমা হয়েছে ছাই!

নাহি সে মোদের স্নেহের পুতলী
নয়নের মণি—আর সে নাই,
ভাগিরথী তীরে শ্মশান-বাসরে
রাজরাণীবেশে হয়েছে ছাই!

এস অশ্রু এস আঁখিতট প্লাবি
নদী পারাবারে যাও গো মিশি।
অভিনয় নাহি হ'তে সমাপন
কাল-যবনিকা পড়িল খসি!

ফুলে ভরা শাখী কে দিল ভাঙ্গিয়া
স্বর্ণ পিঞ্জরের খুলিল দ্বার,
বসন্তের পাখী ফাঁকি দিয়ে আজি
চলে গেল কোন সাগর-পার!

ইহ জনমের অতৃপ্ত বাসনা
সাদরে রাখিব হৃদয়ে ধরি,
মরণের পারে আবার তোমারে
পাই যেন চির আপন করি।

শ্রীশিবানীবালা ঘোষ।

লাটু মহারাজ

২

বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে থাকার সময় গুটিকতক যুবক লাটু মহারাজের নিকট আসিয়া জুটে। যাহারা হীন, পরিত্যক্ত, অকিঞ্চিৎকর, এইরূপ লোককে তিনি ভালবাসিতেন। একটি ছেলে তাঁহার কাছে যাইত। তাহার মাতা নাকি জীবিত-অবস্থায় বারাঙ্গনা ছিল। ছেলেটিকে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন। তিনি বলিতেন, "জন্ম দেখ্তে নাই, কর্ম্ম দেখ্তে হয়।" তাঁহার উদারতা উপনিষদের সত্যকাম জাবালির ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়।

সংসারী লোককে তিনি দেবেন্দ্র ঠাকুর, কেশব সেন, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জীবন দেখিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, "দেবেন্দ্র ঠাকুর রাজা লোক, কিন্তু ভগবান্‌লাভের জন্য পাহাড়ে গিয়ে সাধনা করেছিলেন। এ কম কথা নয়। ঠাকুর তাঁকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি কলির জনক।' কেশব সেনের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এক যাগযাগ বড় বড় লোকের সমাগম হয়েছে, ঠাকুরও গিয়েছেন। ঠাকুর কেশব সেনকে বল্লেন, 'কেশব! লেকচার দেওয়া প্রভৃতি তোমার তিনটে শক্তি আছে, আর এই ছেলেটির (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) আট নটা শক্তি আছে।' কেশব সভার মধ্যে লাফিয়ে উঠে বল্লেন, 'মশাই! তাই ত চাই,—আমার চেয়ে বড় হবে। আমার চেয়ে ছোট হবে?' ঠাকুর বল্লেন, 'দেখ্ছিস্, কেশবের মোটে হিংসা নাই।' ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের মত দাতা নাই। কলিতে দানের চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই।" শিবনাথ শাস্ত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিলে! বাগবাজারের বলরাম বসু ও তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর জীবন উল্লেখ করিতেন। "বিদ্যাসাগর দেখ্বার জন্য ঠাকুর বায়না ধরিলে বলরাম বসু ঠাকুরকে লইয়া বিদ্যাসাগরের বাড়ী যান। পৌঁছিয়া ঠাকুর ও তাঁর সঙ্গিগণকে উপরের ঘরে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে নীচে চাকরের ঘরে ব'সে অপেক্ষা করেন। নিজে উপরে গেলেন না, পাছে বিদ্যাসাগর, ধনী লোক বলিয়া, ঠাকুরের সাম্‌নে, তাঁহার সমাদর আগে ক'রে ফেলেন।" রামকৃষ্ণ বসুর প্রসঙ্গে বলিতেন, "দেখ্ছিস্, রামকৃষ্ণ অন্ন দেয়, একটু আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা রাখে না।"

তাঁহার অন্নদাতা ভক্তবীর রাম দত্তের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "ঠাকুর বলেছিলেন, রাম! তোমার সংসার নহে—এ সংসার আমার। বলরাম বসু রামকৃষ্ণ বসু কম লোক নহে। আজকালের লোকের কেবল টাকা—টাকা—টাকা 'টাকা স্বর্গো টাকা ধর্ম্মো টাকা হি পরমং তপঃ!' আর এরা ভগবান্ নিয়ে, সাধু নিয়ে, ভক্ত নিয়ে, সংসার ক'রে জীবন কাটিয়ে গেল। ইহাদের অবিদ্যার সংসার নহে, বিদ্যার সংসার।" ইঁহাদের জীবনী উল্লেখ করিয়া সংসারী লোককে তিনি সত্ত্বগুণ, পবিত্রতা ও ত্যাগের উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন "pure (পবিত্র) হ'লে প্রকাশ হয়, লোকের গুণগুলো নজরে আসে। অপবিত্র হ'লে লোকের কেবল দোষগুলা নজরে পড়ে।"

তিনি পিতামাতার সেবা ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে খুব বলিতেন।—"চৈতন্যদেব অবতার, তিনিও গয়ায় নিজের চক্ষুর জলে মিশিয়ে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের বনবাস হ'লে বল্লেন, হে পিতৃগণ! কি অপরাধ করলুম? প্রসন্ন হউন।"

তিনি সকলকে "ক্রিয়াযোগের" উপর নিষ্ঠা করিতে বলিতেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার দর্শনে, পূজায়, প্রসাদধারণে কল্যাণ হয়—বলিতেন। তিনি মহাবীরের পূজা করিতেও বলিতেন; সূর্য্য নারায়ণকে প্রণাম করিতে বলিতেন। এ সব নিজেও করিতেন। তিন দিন মেঘ করিয়া ছিল, তিনি কাতর হইয়া এক জনকে লিখিয়াছিলেন, "আজ তিন দিন সূর্য্য-নারায়ণের দর্শন হয় নাই।" অনেককে পার্শেল করিয়া প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন; লিখিতেন, "চান ক'রে খেয়ো, শরীর মন শুদ্ধ হবে।" ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

যৎকিঞ্চিৎ পত্র পুষ্প ফল তোয় যে আমাকে ভক্তির সহিত

... করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির সহিত সমর্পিত বস্তু ...ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি; আর অনুগ্রহার্থ ...জন করি। সে জন্য প্রসাদ কল্যাণকর নিশ্চয়ই ...বে।

মহারাজ সাধুসঙ্গ করিতে উপদেশ দিতেন। সাধুসঙ্গ ... করিলে ধর্ম্ম যে কি জিনিষ, তাহা বুঝা যায় না। "হাজার ...ই পড়, কিছুই হবে না। জীবনে ফলবে না।" ভগবান্ ...লিয়াছেন—

"তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।

বেদপাঠ না করিলেও, আচার্য্যের উপাসনা না করিলেও, ব্রত-তপস্যা না করিলেও কেবল সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবান্-লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা ভারতীয় সাধনার নিজস্ব।

তিনি সকলকে সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের উপর খুব জোর দিতে বলিতেন। সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম অর্থাৎ এমন একটি ধর্ম্ম আছে যাহা মনুষ্যমাত্রেরই পালন করা উচিত। তাহাতে দেশীয় বিদেশীয়—এসিয়া য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ...ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কেহ বাদই ...দ পড়েন না। সেই ধর্ম্ম আগে পালন করিতে হয়, তবে ঈশ্বর শব্দ মুখে বলা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেচ্ছা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥"

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের হিত ও প্রিয়বাঞ্ছা, এইগুলি সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম। এই কয়টি মনুষ্যমাত্রেরই পালন করা উচিত। আজকাল বৈশিষ্ট্য শব্দের খুব ব্যবহার দেখা যায়। অমুকের এইটি বৈশিষ্ট্য, এইরূপ বলা হয়; কিন্তু বৈশিষ্ট্য বলিলেই "সামান্য" নজরে আইসে। সামান্য না থাকিলে বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। মনুষ্যজাতির অন্তর্গত হইয়া বৈশিষ্ট্য ফলাইতে হয়, সে জন্য মার্গবিশেষ লাভ করিতে হইলে, মানবধর্ম্ম আগে অভ্যাস করিতে হয়। 'সামান্য' ত্যাগ করিয়া 'বিশেষ' কি লাভ করা যায়? তিনি বলিতেন, "আজকাল কেউ কারুর ভাল দেখ্‌তে পারে না। হিংসার জন্য এত অন্নকষ্ট। মায়ার বিশেষ রূপ কামিনী। এ জন্য কামিনী হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

'নিকটে প্রমোদা প্রমাদ গণি
সমরে হবে না জয়ী রে
ব্রহ্মময়ী যে করুণাময়ী রে
বল জননী।'

ভগবান্ বলিয়াছেন—যোষিৎসঙ্গের মত বন্ধন আর কিছুতেই হয় না—যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসঃ... ......

কামিনীর ভুবনমোহিনী মায়া, মহাবল ধারণ করেন, এ কথা তিনি বলিতেন। এক দিন আহিরীটোলা হইতে আসিতেছেন, একটি পানওয়ালীর দোকান দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী মুখ ফিরাইয়া আসিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন, "থাখ্ থাখ্, একটি দশ্যের মত রোগা মেয়ে ব'সে রয়েছে, ৫।৬টা বড় বড় জোয়ান খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, নড়তে দিচ্ছে না। জোয়ানগুলোর আঙ্গুলের ভর সইবার শক্তি মেয়েটার নাই, কিন্তু কেমন বেঁধে রেখেছে। উঃ, কি শক্তি দেখ্‌ছিস্। অযুত খড়্গ-শূল গদার বল মা'র করপল্লবসঙ্গী।" তিনি বলিতেন, "ভগবানের মায়া এত মিষ্টি—ভগবান্ যে কি মিষ্টি, একবার দেখ্‌লি নি?"

ঠাকুর তাঁহাকে গেরুয়া দেন এবং ভিক্ষা করিতে আদেশ দেন। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহাতে অমানুষ অদ্ভুত ভাব দেখিয়া অদ্ভুতানন্দ নামে অভিহিত করেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী, তাঁহার দেহ অতি পবিত্র ছিল—একেবারে অপাপবিদ্ধ। দেখা গিয়াছে, তিনি ধ্যানস্থ আছেন, একটি বালক তাঁহার পা টিপিতেছে, বালকের চেহারা অন্য রকম হইয়া যাইতেছে, চোখ, মুখ রক্তবর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার আশ্রমে কেহ কুস্বপ্ন দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিতেন এবং গালাগালি দিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন।

তিনি বলিতেন, "ঠিক ঠিক সাধু হইলেই ভগবান্‌কে দেহ ধারণ করিয়া আসিতেই হইবে।"—গীতাতে আছে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্......"

ভাবস্থ হইয়া বলিতেন, "আমি ঠিক ঠিক সাধু।" পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "বরাহনগরে আছি, মনে হলো বেরিয়ে পড়ি, দিনকতক সাধুসঙ্গ ক'রে আসি। লাটু মহারাজ দূরে ব'সে জপ কর্‌ছেন। হঠাৎ কে দেখিয়ে

দিলে, ওরে, এত বড় সাধু কোথায় পাবি ? আমি সেবার অন্যত্র যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম।"

লাটু মহারাজ বলিতেন, "ভগবানের জীবের উপর খুব দয়া। জীব ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। তিনি জীবের মত মানুষদেহ স্বীকার ক'রে এসে বলছেন, 'আমি ভগবান।' জীব তাঁর সঙ্গে মানুষোচিত ব্যবহার করছে। তাঁকে পূজা ক'রে নিজের কল্যাণ করছে। এর চেয়ে অধিক দয়া আর কি হবে ? বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতাভিমানীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিতেন, "৫০ বৎসর কেটে

বারাণসীতে লাটু মহারাজের মন্দির।

গেল, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সিদ্ধান্তই হ'ল না, আর ছাই সাধন করবে কবে ?"

পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীর নাম করিতে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত ; কেবল বলিতেন, "স্বামীর নাম কর। ঠাকুরের কাছে যেতে হ'লে স্বামীর থ্রুক (through) দিয়ে যেতে হবে। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যেতে হ'লে যেরূপ হনুমানের সাহায্য দরকার, শিবের কাছে যেতে হ'লে যেমন সতীর কৃপা দরকার, সেইরূপ ঠাকুরের কাছে যাওয়া স্বামীর দয়াসাপেক্ষ।"

তাঁহার দেবদুর্লভ সঙ্গ যে করিয়াছে, সে-ই কিছু না কিছু লাভ করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গ অপার্থিব ; তাঁহার উপদেশও অমৃতময়। নিজে না দেখিয়া না বুঝিয়া উপদেশ দিতেন না ; বলিতেন, "নিজে বুঝি, তার পর বুঝাব।" নিজে বুঝা মানে নিঃসংশয় হওয়া। নিঃসংশয় দর্শন ছাড়া হওয়া যায় না। উপনিষদে আছে :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

সেই পরাবরকে দর্শন করিলে তবে অহঙ্কার যায়, তবে নিঃসংশয় হয়, তবে কর্ম্মক্ষয় হয়। শাস্ত্রে আছে—বাক্

"পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী।"

আগে বস্তুটা দেখিয়া নিজে বুঝিয়া তবে উপদেশ দিতে হয়। বস্তুটা—সাক্ষাৎকার করিয়া "মনোময়ং সূক্ষ্মং উপেত্য" অর্থাৎ মনের মধ্যে দিয়া আনিয়া কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে হয়। তবেই "ঋতং ব্রবীমি সত্যং ব্রবীমি" হয়, তবেই সেটি 'বাক্'। প্রসিদ্ধ কবি বা লেখকের ভাব ভাষা খুব চটক্‌দার হইতে পারে, খুব মৌলিক হইতে পারে, উহাতে খুব আমোদ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা মস্তিষ্কপ্রসূত, উহাতে সাক্ষাৎকারের সম্বন্ধ নাই, সে জন্য উহাতে শক্তি নাই, উহাতে কল্যাণ হয় না। কিন্তু এই নিরক্ষর সাধুর কথা মুখস্থ বা শুনা কথা নহে, উহা সাক্ষাৎকারের আকার, উপলব্ধির বাণী।

হাঁড়ার মাছ যেমন জলে যাইতে পারিলে, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, সেইরূপ ১৩২৭ সাল ১১ই কার্ত্তিক তারিখে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীতীরে, পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে শিবসন্নিধানে পাঞ্চভৌতিক কায়া পঞ্চভূতকে ফিরাইয়া দিয়া মহা আনন্দের অভিনয় করিতে করিতে লাটু মহারাজ নিজ প্রিয় প্রভু-নিকেতনে চলিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ মহাবাণীর পবননন্দন যেরূপ রত্ন, লাটু মহারাজ রামকৃষ্ণ-লীলা-মহাবাণীর সেইরূপ রত্ন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র

শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ সেন বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করিয়া লণ্ডন সহরে সাউথ কেনসিংটন আবহমন্দিরে কায করিয়াছেন। বায়ুর উচ্চ স্তরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া তিনি পুরস্কার স্বরূপ এম, এস-সি, উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি

২

নির্য্যাতন দণ্ড

এ দেশে পূর্ব্বে নানা রূপ অপরাধে নানা রূপ শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মাতলামী করিয়া অথবা রাত্রিকালে ডাকাতি করিয়া যাহারা শান্তিপ্রিয় গৃহস্থদের উত্যক্ত করিত, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য এক প্রকার প্রকাণ্ড গলবন্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সেই গলবন্ধ গলায় পরিয়া কয়েদীদিগকে রাস্তায় হাঁটিতে হইত। রাস্তার লোকরা আসিয়া গলবন্ধটা চরকার মত ঘুরাইত এবং তাহাতে কয়েদীর শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। ইহা আমাদের দেশে "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা" অপেক্ষা ভীষণ।

লোরেন্‌ৎস গির্জ্জা।

লৌহময়ী যুবতীমূর্ত্তি

এই সব শাস্তির সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণা অল্প-বিস্তর জড়িত থাকিত আর কতকগুলি দণ্ডের দৃশ্য দেখিলে বীভৎস ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। চিমটা দিয়া জিহ্বা টানিয়া আনা, চক্ষুতে ছিদ্র করিয়া দেওয়া, উলঙ্গ করিয়া কণ্টকপূর্ণ কাষ্ঠের বা লোহের বাক্সে গড়াগড়ি দেওয়ান—এ সব আদালতের দণ্ড ছিল।

আর একরূপ শাস্তির উল্লেখ করিব। একটি প্রকাণ্ড শূন্যগর্ভ লৌহময়ী যুবতীমূর্ত্তির দ্বার খুলিয়া তাহার ভিতর কয়েদীকে দাঁড় করান হইত, তাহার পর দ্বার বন্ধ করা হইত। মূর্ত্তির মধ্যে বহু কীলক এমন ভাবে সজ্জিত থাকিত যে, দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র সেগুলি কয়েদীর চক্ষু, মুখ, গলা, বক্ষ, উদর ইত্যাদি ছিদ্র করিয়া দিত। এই উপায়ে অনেক কয়েদীকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

নানাপ্রকার জানোয়ারের মুখোস পরাইয়া কয়েদীদিগকে রাস্তায় হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। রাজপথে নরনারী, বালকবালিকা তাহাদিগকে লইয়া যথেচ্ছা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে সামাজিক নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্লেশভোগও যথেষ্ট হইত।

লৌহময়ী যুবতীমূর্ত্তি

খৃষ্টান সমাজেও মধ্যযুগে যে সব দণ্ডব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সে সব নিষ্ঠুরতায় অনেক প্রাচ্য-পদ্ধতিকে পরাভূত করিতে পারে। এই নির্য্যাতন-গৃহের যে সকল নির্য্যাতনযন্ত্র দেখিলাম, তাহার অনেকগুলি শতবর্ষ পূর্ব্বেও য়ুরোপে ব্যবহৃত হইত।

ন্যুর্ণবার্গ-আকাদেমি

ন্যুর্ণবার্গের অনেক বাড়ীই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর বাসভবন বলিয়া বিখ্যাত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক বাস্তু এখনও বিদ্যমান—সেকালের সৌধে গোথিকজাতীয় গথিক স্থাপত্যরীতি সপ্রকাশ।

কাঠ খোদাইয়ের শিল্প ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত। কিন্তু খোদাইকরা কাঠের উপর চাপ দিয়া যে ছবি হয়, সেই চিত্রশিল্প ভারতে প্রচলিত ছিল না। "এচিং" ও "উডকাট" দুইই ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী। এই দুই শিল্পের জন্যই ন্যুর্ণবার্গ বিখ্যাত। ষ্টোস নামক শিল্পী ডিরেরের আমলের; এবং তাঁহার

য়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতরা ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিচার-প্রণালী ও দণ্ডব্যবস্থার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন, এসিয়ার জাতি-সমূহ বর্ব্বরোচিত অমানুষিক দণ্ডপ্রদানে অভ্যস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের এবং এসিয়ার অন্যান্য দেশের সমাজবিজ্ঞা-নানুশীলনকারীরা ন্যুর্ণ-বার্গের এই নির্য্যাতন-গৃহ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে সহজে জগদ্বাসীকে বুঝা-ইতে পারেন যে, প্রতীচীর

শারীরিক সাজার যন্ত্র।

খালের ধারে ঘর বাড়ী।

দুর্গ ও আশে পাশে ঘর বাড়ী।

"স্পেনিস কলার"

হাতের বহু চিত্র স্থির্ণবার্গের গির্জ্জায় গির্জ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থির্ণবার্গের এক জন অধিবাসী পকেট-ঘড়ী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আর এক জন স্থির্ণবার্গবাসী লোহার তার প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মানীতে বিখ্যাত হয়েন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যিনি সর্ব্বপ্রথম ভূমণ্ডলের "গ্লোব" বা গোলক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিও এই সহরের লোক। এই সকল আবিষ্কারকের মূর্ত্তি সহরের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

স্থির্ণবার্গের "গারমানিসে মুজেয়ুম" বিদেশীর অবশ্য দ্রষ্টব্য। সে কালের ও এ কালের জার্ম্মাণ সভ্যতার নানা উপকরণ এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এই ধরণের জার্ম্মাণ মিউজিয়ম জার্ম্মাণীর অন্য কোন সহরে আছে কি না সন্দেহ। বার্লিনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ সম্বন্ধে নানারূপ সংগ্রহশালা আছে; কিন্তু কেবল জার্ম্মাণী-সম্বন্ধীয় কোন মিউজিয়ম জার্ম্মাণীতে, বোধ হয়, আর কোথাও নাই।

জার্ম্মাণীর সুকুমার শিল্প

"গারমানিসে মুজেয়ুমের" বিপুল সংগ্রহ দেখিতে দর্শকদিগের অনেক সময় লাগে। দুই একটি বিভাগে প্রদর্শিত বস্তু সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব।

জার্ম্মাণ ভাস্করদিগের হাতের কায জগতের কোন নগরের মিউজিয়মে প্রায় একরূপ নহে। যুরোপ ও আমেরিকার সংগ্রহালয়ে পুরাতন গ্রীসের পর প্রধানতঃ বর্ত্তমান ফ্রান্সের স্থাপত্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু স্থির্ণবার্গের এই "মুজেয়ুমে" যে স্থাপত্য সম্পদ দেখিলাম, তাহা বাস্তবিকই জগতের শিল্পীদিগের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য। এ হিসাবে বার্লিনের "কাইজার ফ্রিডরিস মুজেয়ুমও" দ্রষ্টব্য।

নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি সহরের সংগ্রহালয় দেখিলে জার্ম্মাণ চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা জন্মে না। সে সব চিত্রশালায় ইটালীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসী শিল্পীদিগের চিত্র ব্যতীত অন্য কোন দেশীয় শিল্পীদিগের চিত্র দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। স্থির্ণবার্গের এই মিউজিয়ম দেখিলে জার্ম্মাণ চিত্র-শিল্পের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

কাষ্ঠশিল্পে ম্যাডোনা।

আর এক কথা।—সাধারণতঃ ফটোগ্রাফে জার্ম্মাণ চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের যে সকল প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, সে সকলের ভিতর তেজ ও পরাক্রমের পরিচয় থাকিলেও

সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের কমনীয়তা লক্ষিত হয় না; কিন্তু জার্ম্মাণ শিল্পের ওস্তাদরা এ সকল সৃষ্টি করিতেও অসমর্থ ছিলেন না। ন্যুর্ণবার্গে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই কথাগুলি মনে রাখিলে শিল্প-রসিকরা একটা নূতন শিল্পজগতের সন্ধান পাইবেন। বার্লিনের "নাৎসিওনাল" গ্যালারীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ চিত্রশিল্প দেখিলেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে।

ন্যুর্ণবার্গের সংগ্রহালয়ে একটি কাঠের ম্যাডোনা (মাতৃমূর্ত্তি) দেখাইয়া ডিরেক্টর হাম্পে বলিলেন, "এ… জার্ম্মাণ শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিখ্যাত। কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যে মধ্যযুগের জার্ম্মাণ শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষ… দেখাইয়া গিয়াছেন। বার্লিনের মিউজিয়মে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ন্যুর্ণবার্গের "মুজেয়ুমে" ড্যুরেরের অঙ্কিত যে কার্… গ্রোসে চিত্র দেখিলাম, সংগ্রহশালার পক্ষে তাহা যে অত্য… মূল্যবান্, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

আশা ছাড়ব না

ব্যবস্থাপক সভা—হই না কাণা, হই না খোঁড়া, ভরসা আছে মনে—
বিলাত যাব, যুদ্ধে জয়ী হবই আবেদনে।

বাঙ্গালা গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

অন্যান্য রচনা ও পদাবলীর ভাষা।

বিদ্যাপতি-বিরচিত পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি, ব্রজভাষা অথবা হিন্দী নয়, মৈথিলী অথবা মিথিলা ভাষা। চণ্ডীদাস কিংবা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যেমন বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ তাঁহার নিজের দেশের ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কালে মিথিলার লোক এই ভাষাকে অবহট্‌ঠ, অর্থাৎ গ্রাম্য ভাষা বলিত, তিনিও তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত 'কীর্ত্তিলতা' নামক গ্রন্থে লেখা আছে—

দেসিল বঅনা সব জন মিট্‌ঠা,
তে তৈসন জম্পও অবহট্‌ঠা।

অর্থ,—দেশী বচন (ভাষা) সকলের মিষ্ট (সকল লোকের প্রিয়), সেই জন্য সেইরূপ অবহট্‌ঠ (ভাষা) জল্পনা (আলোচনা ও রচনা) করিতেছি।

এই অবহট্‌ঠ ভাষাই পদাবলীর ভাষা এবং উহা মিথিলা প্রদেশের চলিত ভাষা ভিন্ন আর কিছু নয়। হিন্দুস্থানী অথবা ব্রজভাষার সহিত বিদ্যাপতির পদাবলীর কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নাই।

পদাবলী ছাড়া বিদ্যাপতি অপর অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। প্রাকৃতের অনুরূপ ভাষাতে লিখিত আর কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। কীর্ত্তিলতাতে তিনি নিজের নাম বিজ্জাবই লিখিয়াছেন, ইহা প্রাকৃতের অনুযায়ী বিদ্যাপতি শব্দের অপভ্রংশ। তাঁহার রচিত 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ এক কালে কলিকাতায় পঠিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কতিপয় কবিতায় জয়দেবের ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। জয়দেবের কৃত গঙ্গাস্তবের প্রথম ছুইটি শ্লোক এই—

মধুমথনমূর্ত্তিবর ইন্দুকরকার্মুকং
বহসি বহু বারি সুতরঙ্গে।
হরিচরণনখভিন্ন-জগদণ্ডনির্গতা
ব্রহ্মজলপাত্রকৃতসঙ্গে।
নমো দেবি গঙ্গে নমো দেবি গঙ্গে
হর নিখিলমঘমলকন্দনে॥

বিদ্যাপতির গঙ্গা-গীতের আরম্ভ—

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসসুবাসিনি
সাগর-নাগর-গৃহবালে।
পাতক-মহিষ-বিদারণ-কারণ
ধৃত-করবালবীচিমালে॥
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
শরণাগত-ভয়ভঙ্গে॥

মিথিলা ভাষাতেও তাঁহার রচিত ছুইটি গঙ্গা-গীত আছে।

রাজা শিবসিংহের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে বিদ্যাপতি যে কবিতা রচনা করেন, তাহার ভাষা সংস্কৃত নয়, পদাবলীর ভাষাও নয়।—

এক দিস সকল জবন বল চলিও
ওকা দিস সে জম রাএ চরু।
দুঅও দলটি মনোরথ পুরেও
গরুঅ দাপ সিবসিংহে করু॥
সুরতরু কুসুম ঘালি দিস পুরেও
দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারন
সুরগণ সতে গগন ভরু॥
আরম্ভিঅ অন্তেট্‌ঠি মহামখ
রাজসূয় অসমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ
জাচককাঁ ঘর দান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কবিবর এহ গাবএ
মানব মন আনন্দ ভএও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইঠ্‌ঠো
উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গএও॥

অর্থ,—এক দিকে সকল যবন সৈন্য চলিল, অন্য দিক্ হইতে যমরাজ (সসৈন্যে) আসিলেন, শিবসিংহ গুরু দর্পের সহিত ছুই দলের মনোরথ পূর্ণ করিলেন (অর্থাৎ পিতাকে অন্তিম-

কালে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া যমভয় নিবারণ করিলেন ও যবন-সৈন্তকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন)। কল্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া দিক্ পূর্ণ হইল, (আকাশে) দুন্দুভি সুন্দর ধ্বনি ধরিল (করিল)। বীরছত্র (শিবসিংহকে) দেখিবার কারণ শত শত সুরগণে গগন ভরিয়া গেল। অন্ত্যেষ্টি (আদ্যশ্রাদ্ধের) মহোৎসব রাজসূয় অশ্বমেধের ন্যায় আরম্ভ হইল। পণ্ডিতের ঘরে আচারের বাখান হইল, যাচকের ঘরে দানের কথা হইল। বিদ্যাপতি কবিবর এই গাহিতেছেন, মানবের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে বসিলেন, উৎসবে (লোক) বিষাদ বিস্মৃত হইল। এই কবিতাতেও বিদ্যাপতি নিজের নাম বিজ্জাবই লিখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির রচনাবলীর ভাষার তিন স্তর;—বিশুদ্ধ সংস্কৃত, প্রাকৃতের অনুরূপ এক ভাষা, আর অবহট্‌ঠ ভাষা। পদাবলী এই অবহট্‌ঠ ভাষার পরিণতি। ইহার সহিত আর কোন ভাষার কোন সংস্রব নাই, কোন মিশ্রণ নাই। বিদ্যাপতির রচনাকালে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যরচনার সূচনাই হয় নাই; সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার উপর বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ প্রভাব অসম্ভব। পক্ষান্তরে, চণ্ডিদাস যেকোথাও কোথাও বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা চণ্ডিদাসের পদাবলীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চণ্ডিদাসের কালে যে বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে পঠিত ও গীত হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ও তাঁহার পদাবলী মিথিলা ভাষায় বিরচিত, এই কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা নানা ভ্রমে পড়িয়াছি। ভাষা ভুলিয়া গিয়া পাঠবিকৃতি সংশোধন করিবার উপায় নাই। দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দাদির অর্থ যাহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছে, সে সেইরূপ করিয়াছে। সাহিত্যে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা করিলে, যাহাদের সাহিত্য তাহাদেরই ক্ষতি। এখন পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। প্রথম প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণে বিদ্যাপতির পদাবলীর সংখ্যা দুই শতও হইত না। এখন প্রায় এক সহস্র সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বিস্তর পদ সংগ্রহ করিতে বাকী আছে। এমন অনেক পদ পদকল্পতরুতেই আছে। কতক পদে ভণিতা নাই, কতক পদের এমন বিকৃতি হইয়াছে যে, কোন অর্থই করিতে পারা যায় না। আবার কতকগুলি পদ এমন আছে, যাহা স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির নয়, কিন্তু বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বলিয়া আমরা অসঙ্কোচে তাঁহার রচনা বলিয়া গ্রহণ করি। যেমন,—

শুন লো রাজার ঝি,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি।

• • • •

তারে হৃদয়ে দরশি থোরি,
তার মন করলি চোরি,
বিদ্যাপতি কহ শুন লো সুন্দরি
কানু জীয়াবে কি করি॥

• • • •

আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥

• • • •

বিদ্যাপতি কহে এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥

• • • •

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া দিয়ে।
গন্ধের কুটাগাছি শিরে ছোঁয়াইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥

• • • •

তাহার পিরীতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥

এই রকম আরও পদ আছে। সকল গুলিতেই ভণিতা বিদ্যাপতির, অথচ ইহার একটিও বিদ্যাপতির রচিত নয়। এই পদসমূহের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা; রাজা বসন্ত রায় কিংবা আর কাহারও কর্তৃক পরিবর্ত্তিত নহে। বিদ্যাপতির সময়ে এ ভাষা বঙ্গদেশেও প্রচলিত হয় নাই, তিনি স্বয়ং এ ভাষা জানিতেন না। এই রকম পদ হইতেও প্রমাণ হয় যে, বিদ্যাপতির ভাষা এ দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছে। ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু ভণিতায় নাম বিদ্যাপতির, এ প্রকার পদ দেখিলেই স্থির করিতে হইবে যে, ভ্রমপ্রমাদবশতঃ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদে বিদ্যাপতির নাম বসাইয়া দেওয়া

হয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে এ রকম পদের স্থান হওয়া উচিত নয়।

বিদ্যাপতি-বিরচিত সংস্কৃত ও সংস্কৃতেতর অপর এক প্রকার পদাবলীর উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৃতীয় অবহট্‌ঠ অথবা মিথিলা ভাষা। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী এই ভাষায় রচিত। এই ভাষায় বিদ্যাপতি হরগৌরী সম্বন্ধীয়ও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে সে সকল পদ পাওয়া যায় না। এই পদাবলীর ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং মিথিলায় এই সকল গান এখনও লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথম পদার্দ্ধ মেনকার উক্তি, অপরার্দ্ধ শিবের উত্তর। মেনকা শিবকে কহিতেছেন—

কতহু সমসধর কতহু পয়োধর
ভল বর মিলল সুশোভে।
অধঙ্গ ধইলি নারি ন গুনলি নিজ গারি
গরুঅ গৌরি গুনলোভে॥
আলো শিব শম্ভু তুমী শিব শম্ভু
তুমি যে বধিলো পচবানে॥

অর্থ,—কোথায় সমস্তধর (যিনি সমস্ত বিশ্ব ধারণ করেন, অর্থাৎ মহাদেব), কোথায় পয়োধর (গৌরীর ক্ষুদ্র কোমল দেহ) সুশোভিনীর (গৌরীর) ভাল (ব্যঙ্গোক্তি, অর্থ আচ্ছা, অযোগ্য) বর মিলিল। নারী (গৌরী) (তোমার) অর্দ্ধাঙ্গ ধারণ করিল, নিজ কুলের (আত্মীয়স্বজনের) গুরুতর গালি (নিন্দা) গণনা করিল না, গৌরী (মহাদেবের) গুণে লুব্ধ হইল। ওহে শিব শম্ভু, তুমি যে শিব শম্ভু, তুমি যে মদনকে বধ করিয়াছিলে (তুমি জিতেন্দ্রিয়, মদনকে ভস্ম করিয়াছিলে, তবে আবার বিবাহ করিলে কেন)?

উত্তরে শিব কহিতেছেন—

গাঙ্গ লাগি গিরিজাক মনউলিহে
ককে দেবি বোলহ মন্দা।
চরণ নমিত ফণী মণিময় ভুষণ
ঘর খিখিয়াষল চন্দা॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ ত্রিলোচন
পদ পঙ্কজ মোরি সেবা।
চন্দন দেইপতি বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা॥

অর্থ,—দেবি, কেন তুমি আমাকে কটু কহিতেছ? গিরিজার জন্য গঙ্গা মান করিল (গিরিজাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আমার জটাস্থিত গঙ্গার অভিমান হইয়াছে), (বক্ষঃস্থলের) ভূষণ শিরোমণিযুক্ত ফণী (অভিমানে বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়া) চরণে নমিত হইয়াছে (আমার চরণতলে নামিয়া গিয়াছে), চন্দ্র (তাহার) ঘরে (আমার ললাটে) রাগ করিয়াছে। (গৌরীকে বিবাহ করিয়া আমি এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছি, তাহার উপর আবার তুমি মন্দ কথা বলিতেছ)? বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ত্রিলোচন, (তোমার) পদপঙ্কজে আমার সেবা (আমি তোমার পদারবিন্দ সেবা করি); চণ্ডালিকা (পার্ব্বতীর বিগ্রহ) পতি বৈদ্যনাথ নীলকণ্ঠ হরদেব (আমার) গতি।

দ্বিতীয় পদ—

আই তাঁ শুনিয় উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ফিরে মুস ঝোরী মোর কাটী।
ঝোরীরে কাটিএ মুস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে॥
বেটারে কাত্তিক এক পোসল মজুর।
সেহো দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝুর॥
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা॥
ভনহি বিদ্যাপতি বাঁসক সিঙ্গা।
তপবন নাচথি ধতিঙ্গা তিঙ্গা॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, উমা, আজ ত বেশ আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সব শুনিতেছি। ইঁদুর আমার ঝুলি কাটিয়া ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে। ঝুলি কাটিয়া ইঁদুর জটা কাটিয়া খায়, মাথায় বসিয়া গঙ্গাজল পান করে। বেটা কার্ত্তিক এক ময়ূর পুষিয়াছে, সেটাকে দেখিয়া আমার সাপ ভয়ে অবসন্ন হইয়াছে। গৌরি, তুমি যে বড় মোটা সিংহটা পুষিয়াছ, সেটা দেখিয়া আমার ষাঁড় বেচারা ভয় পায়। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বাঁশের শিঙ্গা (বাজাইয়া) তপোবনে (মহাদেব) ধতিঙ্গা তিঙ্গা করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ

গদাধরের প্রতিকূলে বাগানের কর্ম্মচারিবর্গের ভিতরে যে একটা উগ্র অসন্তোষের ভাব দিন দিন ঘনাইয়া উঠিতেছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি মথুরের তাহা বুঝিতে বাকি ছিল না। কিন্তু তিনি কেবল মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। মথুর অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন, বাবার আচরণ বহির্দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ হউক, তাহা আত্মহারা প্রেমের উচ্ছৃঙ্খলতা বৈ আর কিছুই নহে। তিনি রাণীকে বলিলেন, এই প্রেমিক-সাধক তাঁহার ইষ্টদেবীকে শীঘ্রই জাগাইয়া তুলিবেন। কর্ম্মচারীরা তাঁহার নির্ব্বাক্ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মনে ভাবিল, ভিতরে ভিতরে বজ্রাগ্নি সঞ্চিত হইতেছে, একদিন অকস্মাৎ অশনিপাত হইবে।

হৃদয় মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল। মাতুলের উপর নিঃস্বার্থ ভালবাসায় তাহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র সজাগ। রাণীর জামাতা কাহাকেও কিছুই বলিতেছেন না, অথচ কোন ব্যাপারই যে তাঁহার লক্ষ্য এড়াইতেছে না, হৃদয় তাহা জানিত। ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে সে বাঁচে। কিন্তু নিরুপায়। মাতুলের উচ্ছৃঙ্খল আচরণগুলিকে যথাসম্ভব আবরণ দিয়া হৃদয় বড় অস্বস্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল। এমন সময় শিবমন্দিরে একদিন এক কাণ্ড ঘটল, যাহার জন্ম সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ঐ দিন গদাধর মহাদেবের মন্দিরে মহিম্ন-স্তোত্র পাঠ করিতেছিল। অকস্মাৎ ভাব-বিহ্বলতায় তাহার জিহ্বা জড়িত হইয়া আসিল এবং স্তবাবৃত্তি করিতে অশক্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, মহাদেব গো! তোমার গুণের

হৃদয়

কথা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব! তাহার আকুল ক্রন্দনে হৃদয় ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, কর্ম্মচারিবর্গ শিবমন্দির-দ্বারে বেশ একটি ছোট-খাট জনতা সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে স্বয়ং মথুর। কিন্তু কর্ম্মচারিগণের সে দিকে দৃষ্টি নাই। গদাধরের গদ্‌গদ-ভাব, আকুল ভাবোচ্ছ্বাস এবং মুখ, বুক, বস্ত্র ও মন্দির-তল ভাসাইয়া অবিরল অশ্রুপাত দেখিয়া তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'চল, চল! ছোট ভট্‌চাযের কাণ্ড, ও আর দেখ্‌বে কি!'

কেহ বলিল, "আরে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? মন্দিরের ভিতর থেকে বার ক'রে নিয়ে এস, নইলে আরও কি কাণ্ড ক'রে বস্‌বে!"

কর্ম্মচারীরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মথুর সেই সময় অগ্রসর হইয়া বজ্রকঠোর স্বরে বলিলেন, "খবরদার! যার দু'টো মাথা আছে, সেই এখন যেন বাবাকে স্পর্শ করে!"

তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া কর্ম্মচারিবর্গ বুঝিল, আর কিছুক্ষণ সেখানে থাকিলে যে একটা মাথা আছে, তাহাও বাঁচান শক্ত হইবে। যেন যাদুবলে সকলে অন্তর্ধান করিল।

কিছুক্ষণ পরে হুঁষ হইলে গদাধর দেখিল, মন্দিরদ্বারে মথুর দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসা করিল, "সেজ বাবু! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কিছু অন্যায় করেছি কি?"

মথুর ভক্তিভরে উত্তর দিলেন—"না, বাবা! আপনি স্তব পড়ছিলেন, পাছে কেউ বিরক্ত করে, তাই দাঁড়িয়ে-ছিলাম।"

মথুরের ব্যবহারে হৃদয় আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু তবু! বড় লোক, সহজেই অব্যবস্থিতচিত্ত, ইহাদের বিশ্বাস কি? আজ সদয়, কাল নিদয়! আজ মছলন্দ, কাল অর্দ্ধচন্দ্র! 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ।' যার উপায় নাই, তার সওয়া চাই। কাহার ওপর পাতিয়া হৃদয় দিন

হইতে লাগিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, মাতুলের উন্মত্ততা উত্তরোত্তর ততই বাড়িতে লাগিল। কই মা, কোথায় মা? মা—মা—মা! আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল মা—মা—মা! গ্রীষ্মের প্রখর তাপে, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাতে, দিন-রাত্রি মাথার উপর দিয়া সমানে বহিয়া যায়, পাগলের মুখে কেবল মা—মা—মা! গঙ্গার পরপারে পশ্চিম-গগন যখন সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত হয়, পাগল আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠে মা—মা—মা! অনিত্য জীবনে আর এক দিন বৃথা বহিয়া গেল! কৈ মা, কোথায় তুমি, মা—মা মা! সে আকুল ক্রন্দন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে দিগন্ত কাঁপাইয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া যায়; ভাগীরথীবক্ষে আছাড়িয়া আছাড়িয়া লুটে, বাতাস বিহ্বল হইয়া ছুটে, বৃক্ষ-বল্লী মর্ম্মরিয়া উঠে! আত্মহারা পাগল কখন বালিতে মুখ ঘষে, কখন কাঁটাবনে আছাড়িয়া পড়ে, মা—মা—মা! দেহে দারুণ দাহ, প্রতি লোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্তপাত অনিবার অশ্রু-ধারে মিশিয়া ধরাতল সিক্ত করে। পাগলের ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল মা—মা—মা! হৃদয় অনেক বুঝাইয়া অতি যত্নে মুখে আহার তুলিয়া দেয়! হায় মিছার জীবন, কি ছার আহার! মুখের গ্রাস মুখে থাকে, পাগল ব্যাকুল অন্তরে নিরন্তর ডাকে, মা—মা—মা!

এমনই করিয়া আশা ও নিরাশার দিনের পর দিন বহিতে লাগিল। একদিন শ্রীমন্দিরে সাধক-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গদাধর নিরতিশয় অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, 'মা, রামপ্রসাদ তোমার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আমার উপর কেন নিদয়া হয়েছ, জননি? আমি কি তোমার সন্তান নই? এত কাঁদি, এত ডাকি, আমি কেন সাড়া পাই না?' দুঃসহ যন্ত্রণায় পাগল ছটফট করিতে করিতে বার বার বলিতে লাগিল—'মা, দেখা দাও, দেখা দাও! দেখা দেবে না? তবে কেন পশুর মত বৃথা জীবনভার বহন করি?' সহসা গদাধরের উন্মাদ-দৃষ্টি বলিদানের খাঁড়ার উপর পড়িতে পাগল ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল। তখন চক্ষে তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি, বক্ষে উন্মাদের উত্তেজনা! মা, দেখা দেবে না? বলিয়া আত্মবলি দিবার নিমিত্ত খড়্গ তুলিয়া লইতেই শ্রীমন্দির সহসা দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং উদ্বেলিত সিন্ধুর ন্যায় সে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ চিন্ময় তরঙ্গ ভঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া অনন্ত বিস্তারে প্রসারিত হইয়া পড়িল! মহাকাশ বিহারী সে চিৎ সিন্ধুর হিল্লোলে গদাধর দেখিল, দিগ্‌দেশ সব যেন একে একে নিঃশেষে ডুবিয়া গিয়াছে। উদ্ভাসিত শ্রীমন্দির, উদ্যানাদি, জাহ্নবী কিছুই নাই! আছে কেবল তাহার মায়ের চিদ্‌ঘন চির-প্রেমাস্পদ মূর্ত্তি। গদাধর মা—মা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

ভবতারিণী

হৃদয় দেখিল, মাতুলের ভাবের আবার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কখন যেন কোন অমূল্য রত্নলাভ করিয়াছেন, এমনই পরমানন্দে পাগল; আবার কখন যেন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হৃদয়বিদারী হাহাকারে গগন ভেদ করেন। ইহা

পঞ্চবটী

ত বায়ুরোগ। কেহ উপস্থিত নাই, অথচ দিব্য হাসিয়া হাসিয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কখন বা রস-রঙ্গ করিতেছেন। রাত্রিতেও ঐ রকম! হয়, শয্যায় শয়ন করিয়া অমনই আলাপ-প্রলাপে প্রমত্ত, নয়, পঞ্চবটীমূলে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। আবার শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীদেবী-প্রতিমার সহিত তাঁহার ব্যবহারও অদ্ভুত! পূজা করিতে করিতে সহসা উঠিয়া শ্রীমূর্ত্তির হাত ধরিয়া নৃত্য! কখন চিবুকে হাত দিয়া কত মিষ্ট আদর। কোন দিন বা ভোগ নিবেদন করিতে করিতে 'মা খাও' বলিয়া এক গ্রাস অন্ন জগদম্বার মুখে তুলিয়া দেন। হৃদয় আর কত গোপন করিবে? গদাধরের আচরণ দেবালয়ের কর্ম্মচারিবর্গ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

গদাধর অপবিত্র স্থান পরিষ্কার করে। কাঙ্গালীদের এঁটো পাতা মাথায় করিয়া ফেলে। আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, এক হস্তে টাকা ও অপর হস্তে মৃৎপিণ্ড লইয়া 'টাকা-মাটী, মাটী-টাকা' বলিতে বলিতে জলে ফেলিয়া দেয়। পাকা আমের মত পাগল কি আর গাছে ফলে? ইহার হাতে জলগ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু উপায় কি? শ্রীশ্রীজগদম্বার ভোগ হইয়া গেলেই উদর এমন উৎপীড়ন করিতে থাকে যে, তখন আর আচার-অনাচার কোন বাছ-বিচারই থাকে না!

এক দিন কর্ম্মচারিবর্গ দেখিল, গদাধর বলিতেছে, 'আমাকে খেতে বল্‌ছিস, আচ্ছা, মা, আমি খাচ্ছি!' বলিতে বলিতে পাগল ভোগের অন্ন নিজ মুখে দিয়া পরে আবার জগদম্বার মুখে অর্পণ করিল! গেল, গেল! সব গেল! জগদম্বার জাতি গেল, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম গেল, মনিবের কর্ম্ম-কাণ্ড সব পণ্ড হ'ল! এই গণ্ডমূর্খ সব লণ্ড-ভণ্ড করলে! কিন্তু যে দিন গদাধর দেবীর ভোগের অগ্রভাগ 'মা, মা খিদে পেয়েছে? খাও!' বলিয়া শ্রীমন্দিরাগত ক্ষুধাতুর বিড়ালকে অর্পণ করিল, সে দিন আর কর্ম্মচারীদিগের ধৈর্য্য রহিল না।

"আরে-রে-রে-রে-রে, এ করলে কি, মশায়!"

মশায় তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত হইলেন, আজই ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিবেন। মথুরমোহনের নিকট পত্র

রত হইল। ছোট ভট্টাচার্য্য হয় পাগল হইয়াছেন, নয় ...কে ভূতে পাইয়াছে। উত্তরে মথুর বলিয়া পাঠাইলেন, ...ন নিজে দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিবেন, ইতোমধ্যে ...ন চলিতেছে, চলুক। কর্ম্মচারিগণের আর আহ্লাদের ...সীমা রহিল না। ব্যবস্থা? সে ত নিশ্চয় বরখাস্ত! ...ন পাষণ্ড কে আছে যে, দেবীর সেবাপরাধ ক্ষমা ...রবে? হরি-...ল! তা কি হয়? ...র কতই বা সয়, ...ল না? এ যে ...নয়-ছয় করলে! ...ড়মানুষদের ...পার কি জান? ...দিন ইচ্ছে, ...ল কাছি দিচ্ছে ... দিচ্ছে; কিন্তু ... দিন চেপে ...বে, সেই দিনই ...বাড় করবে! ...য় মনে মনে ...গা নাম জপ করিতে লাগিল।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া মথুর একদিন সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সরাসরি একেবারে শ্রীমন্দিরে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু দেব-গৃহে প্রবেশ করিতে তাঁহার কেমন গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল! গদাধর তখন পূজাসনে ধ্যানমগ্ন। মথুরের মনে হইল, যেন অচেতন সাধকের সম্মুখে সচেতন পাষাণ! প্রাণময়ী প্রভায় মায়ের শ্রীমুখ-কমল ঝলমল্ করিতেছে। দেবী মৃদুমন্দ হসিতাধরা, ত্রিনয়নে প্রেমধারা, সাধকের প্রতি করুণায় বরাভয়করা! কিছুক্ষণ পরে গদাধর ধ্যানস্তিমিত আরক্ত-নেত্র উন্মীলিত করিয়া মায়ের শ্রীপদে কুসুমাঞ্জলি দিতে দিতে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিল, "মা, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান, আমাকে শুদ্ধা-ভক্তি দে! এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য, আমাকে শুদ্ধা-ভক্তি দে! এই নে তোর ধর্ম্ম, এই নে তোর অধর্ম্ম, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দে! মা, এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দে!"

রাধাকৃষ্ণ

শুনিতে শুনিতে কাম কাঞ্চনাসক্ত মথুরের চিত্ত পুলকিত, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ কি প্রার্থনা! ধন-মান---ভোগ-যশ যাহা কিছু মানব একাগ্রমনে কামনা করিয়া ইষ্টদেবতার পায় প্রতিনিয়ত মাথা কুটিতেছে, চাতকের ন্যায় অতৃপ্ত তৃষ্ণায় রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, সংসারাসক্তিহীন এই দীন দ্বিজসন্তান সে সকল তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞানে চাহিতেছে কেবল—শুদ্ধা-ভক্তি! সাধারণ মানবের মত ইহার কি রক্তমাংসের গঠন নয়? কামিনী-কাঞ্চনের অমোঘ প্রভাব কি ইহার নিকট উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যের ন্যায় ব্যর্থ? আমি এতক্ষণ হেথায় রহিয়াছি,

কৈ, একবারও ত লক্ষ্য করিল না! কর্ম্মচারীদিগের দোষা-রোপ, মনিবের কোপ, তাহার ফলাফল, কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নাই! পূজার আসনে বসিয়া আছে যেন রাজ-রাজেশ্বরীর বেটা রাজরাজেশ্বর!

মথুর যেমন আসিয়াছিলেন,তেমনই গম্ভীরভাবে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত কেহ কাছে আসিতে সাহস করিল না। প্রভুর প্রস্থানের পর কর্ম্মচারিগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল—মশায় কি বুঝ্‌লেন!

ওর আর বুঝাবুঝি কি? মুখখানা দেখনি—তোলো হাঁড়ি? বড়লোক ওদের মায়া বোঝা শক্ত! মাথায় তুল্‌তেও যতক্ষণ, ঝেড়ে ফেল্‌তেও ততক্ষণ! এই দে না, হুকুম এল ব'লে।

হুকুম আসিল। কিন্তু মহাশয়দিগের আশানুরূপ নহে।

"কি হ'ল, মশায়?"

মশায় বলিলেন, "তাই ত!"

"তাই ত কি রকম?"

"রকম আর কি! হুকুম হয়েছে, উনি যেমন ইচ্ছা পূজা করুন, কেহ বাধা প্রদান করিবে না।"

মশায় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "কেমন, বলেছি কি না? বড়লোক—ওদের মায়া বোঝা শক্ত।"

হৃদয় আপাতত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

মুক্তি

মায়ের কোলে শিশুর মতন এই যে আছি ধরার পরে,
আমার মাথায়, আঁখির পাতায় তোমার প্রসাদ আশিস্ ঝরে,
জন্ম জন্ম এমনি সুখে
থাকি যেন মায়ের বুকে
উত্তরীয়ের আঁচল তোমার এম্নি যেন ব্যজন করে॥

হেথায় আছে অনেক ব্যথা বিফলতা বিষাদ জ্বালা,
সবই সহি স্নেহের সুধায় দেছ গলায় প্রসাদ-মালা।
মরব, ধূলায় ধূলি হ'ব
আবার পাব জীবন নব,
কীট-পতঙ্গ তরুলতা যা হই হব, ফির্‌ব ঘরে॥

ছায়া শীতল শস্যশ্যামল তোমার ভবন ভুবনখানি,
এই ত তোমার মুক্তি পরম রাখ্‌লে হেথায় বক্ষে টানি
তোমায় ছেড়ে মুক্তি পেতে
কোথায় আবার হবে যেতে?
পাঠাবে কোন্ তেপান্তরে নির্ব্বাসনে দ্বীপান্তরে?

শ্রীকালিদাস রায়।

কৈলাসযাত্রা

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তাকলাকোটে আমাদিগকে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই। ভুটিয়ারা ভারত হইতে কাষ্ঠ আনিয়া সে অভাব দূর করিত। এখন গোময় আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ ইন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র গাছ কাঁচা অবস্থাতেও বেশ প্রজ্বলিত হয়। এই তৃণহীন-প্রায় দেশে মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশু বেশ দৃঢ়কায় ও পরিপুষ্ট। হিমালয়ের তৃণবহুল প্রদেশের পশুর সহিত তুলনা করিলে তাহারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। মাংসভোজীরা এ প্রদেশের মেষের মাংসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। এ প্রদেশের তৃণ সারবান, অল্পেই তাহা শরীর পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই জন্যই এ প্রদেশের পশুসকল বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান্।

আমরা এখন যে প্রদেশে অবস্থান করিতেছি, তাহা সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫।১৬ হাজার ফুট উচ্চ। এরূপ উচ্চ স্থানে স্বভাবতঃই বেশী শীত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতও সন্নিকটে থাকায় শীতের মাত্রাটা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। শয়নকালে সমস্ত শীত-বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপরে কম্বল ঢাকা দিয়া কোনরূপে শীত নিবারণ করা যাইত।

তিব্বতের প্রান্তরে চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল প্রথম রজনী বেশ আনন্দে অতিবাহিত করা গেল। আবার প্রভাত হইল, আবার আমরা গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। তাকলাকোটে এক যোড়া ডোকচা (তিব্বতী পাদুকা—ইহার নিম্নভাগ চর্ম্মাবৃত, উপর প্রায় জানু পর্য্যন্ত লোমশ কম্বলে ঢাকা থাকে) লই। সেই গরম মোজা—তিব্বতী পাদুকা—ফ্লানেলের পট্টি ও পাজামা—এরূপভাবে পা ঢাকা থাকিলেও যখন বরফ চড়িয়া গমন করিতাম, বোধ হইত, পদদ্বয় যেন আমার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা গুরলামান্ধাতার অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলাম। গমনকালে আমরা কর্দ্দম বামে রাখিয়া বলদাক নামক স্থান অতিক্রমণ করিয়াছিলাম।

যাঁহারা পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্দ্দম নামের সহিত পরিচিত আছেন। অতি প্রাচীনকালে কর্দ্দম নামে এক জন প্রজাপতি ছিলেন। প্রজাপতি হইবার পূর্ব্বে তিনি এই স্থানে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে বর্ত্তমানকালেও সেই স্থান পরিচিত হইয়া থাকে।

যে স্থানে আমরা শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার অনতিদূরে চিরতুষারাবৃত গুরলামান্ধাতা। মান্ধাতার জন্মের প্রথম দিনে ইহার মস্তকোপরি যে তুষার পতিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সেই আদিযুগের তুষারসম্পৃক্তশীতল বায়ুস্পর্শে আমাদের শরীর শীতল হইয়াছিল। যে স্থানে অবস্থান করিয়া মান্ধাতা ঘোর তপস্যার প্রভাবে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীতে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন, আমি সে স্থানে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে পরম পবিত্র বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

আমাদের নেতা এই সময় হইতে খুব সতর্কতা সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন; নিকটে তিব্বতীদের কোন তাঁবু আছে কি না, তাহারও সংবাদ লইলেন। এরূপ সংবাদ লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে কহিলেন, যদিও আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদের সহিত বেশী ধন বা পণ্যদ্রব্য নাই, তথাপি একটু সাবধান হওয়া ভাল। দলের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী; যদি অকস্মাৎ ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এজন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে আমরা ৪।৫ জন বন্দুকধারীই ডাকাইতের দলকে দূর করিতে সমর্থ হইব। ভুটিয়া রমণীরা নিতান্ত ভীরু বা দুর্ব্বলা নহেন; কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা হইলেও তাঁহারা স্ত্রীলোক ত বটেন! এই বলিয়া আমাদের দলের নেতা তাঁহার যুদ্ধের "প্ল্যান" (মতলব) আমাকে জ্ঞাপন করেন। আমি আমাদের নায়ক—দলপতির রণবিষয়িণী প্রতিভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্ত্তন জন্য যুদ্ধের ভীষণতা বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু মূলসূত্র বা সিদ্ধান্তগুলি মান্ধাতার সময় যাহা ছিল, বর্ত্তমান সময়েও ঠিক তাহাই আছে।

যাহারা শত্রু কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়, তাহারা লুণ্ঠিত, পরাজিত ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে। উপযুক্ত সেনানী এরূপ শোচনীয় অবস্থায় কখনও পতিত হয়েন না। দুর্ব্বল যদি বলবান্‌কে এইরূপে যুদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনতিকালমধ্যে ধন ও নৈতিক বলসম্পন্ন হইয়া বিজয়-লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের নেতা মহাশয় রুদ্ধারেন এই মূলমন্ত্রের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। এরূপ নায়ক কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। মান্ধাতার চরণতলে দ্বিতীয় রাত্রিও বেশ কাটিয়া গেল।

লিপুলেক পাশের নিকট অসমতল দৃশ্য

রাত্রি ৩টার সময় নেতা মহাশয়ের আদেশে আমরা যাত্রা করিলাম। এরূপ অসময়ে যাবার কারণটা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। পাওনাদারকে প্রতারণা করিবার জন্য দুষ্ট লোক যেরূপ অকস্মাৎ স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরা কাহাকে প্রতারণা করিবার জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা জানি না। অন্য সময় হইলে নেতা মহাশয়কে তাঁহার এ আদেশ সম্বন্ধে পুনরায় বিচার করিতে অনুরোধ করিতাম, কিন্তু আজ আমি তাহা করিলাম না। আজ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিব—আজ কোটি কোটি নরনারীর আরাধনার বিষয় দর্শন করিব বলিয়া নেতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করি নাই।

আজিকার শীতটাও যেন মেরুপ্রদেশের শীত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কৈলাস দর্শনের উৎসাহ যদি ঝব্বুদের মধ্যে একটু থাকিত, তাহা হইলে আমরা শীঘ্র শীঘ্র রাস্তা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইতাম। আমাদের তাঁবুর কাছে একটা ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ ছিল, ঝব্বু কোনরূপে তাহা পার হইতে ইচ্ছুক নহে, আমিও তাহা হাঁটিয়া পার হইতে রাজী নহি। উভয়েই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। যখন উভয়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য দ্বন্দ্ব করিতেছিলাম, তখন ঝব্বুর লোক আসিয়া আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করে। সে ঝব্বুর নাকের দড়ি ধরিয়া তুষার-শীতল জলধারা পার করিয়া আমাকে রক্ষা করে। আমার এক জন সহযাত্রী ঝব্বু আরোহী, ঝব্বুর দুরাচারের জন্য শীতল-জল-সিক্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া যখন আমি জুতা মোজা খুলিবার কল্পনা করিতেছিলাম, সেই সময় ঝব্বুর লোক আমাকে অভয় দিয়াছিল।

যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশের ইহা প্রথম যাত্রা। আজ আমরা কৈলাস দর্শন করিব, এইজন্য সকলেই এক অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। এইজন্য শীত বা রাস্তার কষ্টের প্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। সকলের মনে যেন এক উৎসাহের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। সময় সময় আমরা পথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। সময় সময় আমাদের শরীর বরফের হাওয়াতে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সময় সময় ঝব্বু পদস্খলিত হইয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিল। এইরূপ নানা অবস্থা ভোগ করিয়া গরলামান্ধাতার গিরিপথ আমরা অতিক্রমণ করিয়াছিলাম।

অতি প্রত্যূষে আজ যে দৃশ্য দর্শন করিলাম, জীবনে আর কখন তাহা দেখিব বলিয়া মনে হয় না। যখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে কিরণজাল বিস্তার

রিতেছিল, সে সময় সূর্য্যকিরণ—তুষারমণ্ডিত কৈলাস-ের পতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রচনা করিয়াছিল। রক্তাভবর্ণ—দূরে যেন অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়াছে—ক নিশাবসানে ম্লান বিরাট প্রদীপ যেন নির্ব্বাপিত বার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। সূর্য্য-রণের বৃদ্ধির সহিত এ সৌন্দর্য্যের বিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ই অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। হাকে বাক্যের আয়ত্ত করিতে যাওয়া বালকত্ব ব্যতীত র কিছুই নহে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সূর্য্যের প্রকাশের বৃদ্ধির সহিত এই অদ্ভুত দৃশ্যের কেমন অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল! অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে অনভ্যস্ত আমার অশিক্ষিত চক্ষুর্দ্বয় যেন অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ গমনের পর এই অপূর্ব্ব দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। রাবণ-হ্রদের সুনীল জলরাশি অকস্মাৎ নয়নগোচর হইল। সম্মুখভাগে এই বিশাল নীলকান্তমণিপ্রভ জল থাকায় এ সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বিবর্দ্ধিত হইল। এক জন আস্তিক জাপানী এই মনো-মোহন দৃশ্য দেখিয়া একশত আটবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর এক জন সুইডেনবাসী অক্রিষ্টকর্ম্মা পরিব্রাজক বলিয়াছিলেন, যদি দৈবযোগে কেহ আমাকে স্থাননির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দিয়া এ দেশে আজীবন আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে আমি এই অনির্ব্বচনীয় দেশে স্থাননির্ব্বাচন করিয়া কৈলাস মানস গরলা-মান্ধাতার চির-অভিনব দৃশ্য দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া পরমসুখে জীবনযাপন করি।

এই প্রাণারাম ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য দেখিয়া পুষ্পদন্তের কথা পাঠ করিতে করিতে গলদশ্রুনয়নে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পুষ্পদন্ত যথার্থই কহিয়াছেন, হে ভগবন্!

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং,
তদপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি॥

গরলমান্ধাতা গিরিপথ।

এই বিশাল কৃষ্ণ-পর্ব্বত যদি কজ্জল হয়, সপ্তসমুদ্র যদি এই মসীর আধার হয়, সুবিস্তৃতা বসুমতী যদি পত্ররূপে পরিণত হয়—কল্পদ্রুমের প্রধান শাখা যদি লেখনী হয়, আর স্বয়ং ভগবতী বাগ্‌দেবী যদি অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও তিনি, হে ভগবন্, তোমার সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না।

আমার ভুটিয়া সহচর বলিলেন, এক জন ইংরাজ রাজপুরুষ এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার তন্ময়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শিথিলবসন হইয়াছিলেন।

এ সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, অন্যের অনুভবের কথা আলোচনা করিতে করিতে যখন অগ্রসর হইতে-ছিলাম, সে সময় একটি ঘটনা বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। আমাদের গমনপথে একটি শশক চলিয়া যায়। শশক দেখিয়া এক জন বন্দুকধারী ভুটিয়ার শিকারপ্রবৃত্তিটা আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিল না। সে শশকের অনুধাবন করিতে লাগিল। যখন শশক কোনরূপে শরীর গোপন

করিতে সমর্থ হইল না, সেই সময় শিকারী গুলী করিয়া নিরীহ শশককে নিহত করে। এই ঘটনায় আমরা তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করি। অন্ততঃ তীর্থযাত্রার সময়টা একটু সংযত হইতে তাহাকে উপদেশ প্রদান করি। বেচারা শিকারী সকলের কাছে ভর্ৎসিত হইয়া একটু লজ্জিত হইয়াছিল।

লিপুলেক পাসের নিকট

গমনকালে শাখাহীন শৃঙ্গদ্বয়যুক্ত হরিণও আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া দলভাবে তাহাদের পলায়ন দূরে গমন করিয়া আমাদের দিকে নিরীক্ষণ—তাহাদের নয়নাভিরাম অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক স্থানে হরিণের একটা শিং কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। সময় সময় বন্য অশ্বযূথও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

গরলামান্ধাতা গিরিপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ৯৷১০ টার সময় রাবণ-হ্রদের তটে আমরা উপস্থিত হই। ইহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা গেল। নানাপ্রকার জলচর পক্ষী আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। এই নির্জ্জন স্থানে তাহাদের আনন্দে বিঘ্ন করিবার কেহই নাই; সুতরাং অনবচ্ছিন্ন ধারায় তাহারা আনন্দভোগ করিতেছে দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। শীতসমাগমের সহিত এই সকল পক্ষী তিব্বত পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। ইহারা শীতের সমাগম বুঝিতে পারিয়া হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রদেশে আগমন করিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসে নেপাল তরাইএর অন্তর্গত জনকপুর দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বড় বড় পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকায় তিব্বতের নানাপ্রকার বর্ণের ও আকৃতির জলচর পক্ষী দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তথাকার স্থানীয় লোকদের মুখে শুনিয়াছিলাম, এই সকল দলই প্রতিবৎসর একরূপ সময়ে আগমন করিয়া এ অঞ্চলে শীতযাপন করিয়া থাকে। যাঁহাদের তিব্বতে যাইবার শক্তি নাই, অথচ তিব্বতীয় পক্ষীর বিষয় আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারা এ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

কিয়ৎক্ষণ রাবণ-হ্রদের তট দিয়া গমন করিয়া এক স্থানে আমরা বিশ্রাম করি। তথায় স্নান ও ভোজনাদি সমাপন করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করা যায়। কিছু দূর গমনের পর দেখা গেল, ৩৷৪টা কৃষ্ণবর্ণের তাঁবু হ্রদের তটে যেন রাস্তা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের নেতা ইহা দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হয়েন। তাঁবুর তিব্বতীরা আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন বৃদ্ধ ও বালককে ভিক্ষার ছলনা করিয়া আমাদের কাছে প্রেরণ করে। ইহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া আমাদের দলপতির সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হয়। এই সন্দেহের জন্য আমাদের দলের ভিতর বেশ একটু চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হয়। এখন কোন্ রাস্তা ধরিয়া গমন করা যাইবে, ইহাই হইল ভাবনার বিষয়। হ্রদের তীর ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত উঁচু। এই তীর মানস ও রাবণ হ্রদের মধ্যে প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থির হইল, এই পাহাড়ের উপর দিয়া গমন করা যাউক। যদি আমরা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তাহা হইলে উপর হইতে আক্রমণের সুবিধা হইবে। আমরা বিশৃঙ্খলভাবে গমন করিতেছিলাম, এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। দুই জন বন্দুকধারীকে অগ্রে, এবং মধ্য ও অগ্রভাগে এক জন এক জন স্থাপন করা গেল। স্ত্রীলোক আর আসবাবপত্র মধ্যভাগে

থাকিবার ব্যবস্থা করা গেল। এইরূপে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও লোকসংখ্যা সন্ধান-গ্রহণ-মানসে দলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ভিক্ষার ছলনা করিয়া দেখিতে লাগিল। আমরা তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে চলিয়া গেল, আমরাও পাঁচ তিব্বতী তাঁবু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেলাম। দেশ নির্ব্বিঘ্নে পার হওয়া গেল, কোনরূপ বিপদের এখন আর সম্ভাবনা নাই।

নিশ্চিন্ত হইয়া এখন আমি চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলাম। দুই পাশে নীলাভ বিস্তৃত জলরাশি, সম্মুখে ও পশ্চাতে বিমল স্ফটিকের বিরাট পর্ব্বত, উপরে নির্ম্মল, মেঘহীন সুনীল নভোমণ্ডল—এ দৃশ্যের তুলনা নাই। গরলাম্‌ধাতা কৈলাস হইতে প্রায় ৩ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ। ২০ মাইলের ভিতর এত বড় উচ্চ পর্ব্বত না থাকায় ইহার প্রাধান্য ও সৌন্দর্য্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। নংগা পর্ব্বত ব্যতীত সমস্ত এসিয়ার মধ্যে এরূপ আর দ্বিতীয় পর্ব্বত নাই।

এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের শুভাদৃষ্টক্রমে জল-ঝড়-তুষারপাতের কোনরূপ আশঙ্কা নাই। প্রাচীন কথায় বলে :—

বিনা বাদল হিম বর্ষে
মানসরোবর কোন স্পর্শে।
উড়ত কঙ্কর জীব তরসে,
নর-নারায়ণ যায় পরশে॥

যে স্থানে বিনা মেঘে তুষারপাত হইয়া থাকে, কঙ্কর সকল উড়াতে জীব ত্রাসযুক্ত হয়, এরূপ প্রদেশে অবস্থিত মানসরোবর, নর-নারায়ন ব্যতীত কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়? মানসরোবর দর্শন করিলাম বটে, কিন্তু এখনও স্পর্শ ও জলপান করিবার সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। অল্প অল্প চড়াই উতরাইএর পর একটা লবণাক্ত জলের খালের ধারে উপস্থিত হওয়া গেল। যাইবার সময় ভুটিয়া সঙ্গীরা এক প্রকার সুগন্ধী তৃণ সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইহা মসলারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মনে করা গেল, এই খালের ধারে রাত্রিবাস করা যাইবে; জল লবণাক্ত হওয়াতে তাহা হইল না, অদূরে রাবণ-হ্রদের তটে অবস্থান করা গেল।

আজ আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত হইয়াছিলাম, রন্ধন করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না—রন্ধন করিবার ইন্ধনও নাই; সুতরাং রন্ধন কিরূপেই বা করা যাইবে? ছাতু প্রভৃতি সঙ্গের খাবার খাইয়া কোনরূপে রাত্রি কাটান গেল।

মনে করিয়াছিলাম, জলের ধারে শীত একটু কম হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে শীতের প্রকোপ বেশ ভোগ করা গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, তাপমান যন্ত্রের পারদ ৩২এর দাগে নামিয়াছে। প্রত্যূষে উঠিয়া যাইবার জন্য সকলকে ডাকাডাকি করিলাম, ক্লান্তি ও শীতের জন্য যেন সকলে শয্যাত্যাগ করিতে চাহিতেছে না। আমি আর বেশী তাড়াতাড়ি করিলাম না; তাঁবুর বাহিরে রাক্ষসতালের তটে একটু পদচারণ করিতে লাগিলাম। এখন কৈলাস শৈলশ্রেণীর উপর সূর্য্যনারায়ণের প্রথম কিরণ পতিত হইয়া যেন তাহাকে ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে অথবা শৈলমালা দ্রবীভূত সুবর্ণের জলে যেন প্রাতঃস্নান করিতেছে।

এত দিনের সঙ্কল্প-পরিশ্রম—উদ্বেগ সাফল্যলাভ করিবে। আজ কৈলাসের দ্বার দারচিনে উপস্থিত হইব, আনন্দের সীমা রহিল না—সম্মুখে কৈলাস, চলিবার অধিকাংশ সময় দৃষ্টি কৈলাসে নিবদ্ধ ছিল। ইহাতে যেন এক প্রকার মত্ততা উপস্থিত হইয়াছিল। ভোগের বিষয় দর্শন, স্পর্শ ও ভাবনাতে যখন মত্ততা উপস্থিত হয়, তখন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে বিহ্বলতা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আজ গমনকালে অনেকগুলি সারস-বন্যঘোটক দেখিয়াছিলাম। এইরূপ দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণকালে দারচিনে উপস্থিত হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

নারীমন্দিরে পূজারিণীরূপে আহূত হইয়াছি; পূজা পৌঁছাইতে হইবে। কোন দেবতার কাছে? এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী কে? দশ মহাশক্তির কোন্ শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে? বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান যুগে নারীর আরাধ্যা কে? নির্গুণ নিদ্রিকারা কালিকা, না সত্ত্বগুণাত্মিকা রজঃপ্রধানা ভুবনেশ্বরী? স্নেহ, প্রেম, দান, ত্যাগ, তেজ ও ক্ষমার দ্বারা রক্ষণপালনশীল সুগৃহিণীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যস্বর্গ আজকালকার নারীর কাম্য না কেবলই পুরুষের সুবিধাজনক কৈবল্যমুক্তি—অর্থাৎ জন্মনপ্রাণে পুরুষের ইচ্ছায় লয়প্রাপ্তি?

চারিদিকে যে সকল ভৈরবরাগের গুঞ্জন শুনিতেছি, তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না, আজ নারীর ইষ্টদেবতা কে। তারাশতনামের মত বিদ্রোহিণী নারী-শতনামের মালা আজ গ্রথিত হইতে পারে। পুরুষ উপদেবতার পায়ে নারীর আত্মবলিদানের ভোগ আর বেশী দিন আসিয়া জুটিবে কি না সন্দেহ। আজ বঙ্গনারীরা নানা ভাষায় নানা ছন্দে বলিতেছেন, তাঁহারা আর শুধু কুণ্ঠিত, ভীতা পুরনারী নহেন; ভৈরবী-বেশে হুঙ্কার দিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে প্রস্তুত, প্রয়োজন হয়, ছিন্নমস্তা হইয়া নিজের রুধিরের ধারা নিজের অঙ্গাঙ্গী বিশ্বাস ও মত সখী দ্বয়ের জীবন পুষ্ট করিতে প্রস্তুত।

এই নবীনা স্বাধীনতাপ্রয়াসিনীদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক যে সকল বঙ্গ-নারী বাড়ীর পুরুষদের দেওয়া অনেকখানি স্বাধীনতা বিনা চেষ্টা-চিন্তায় পাইয়াছেন বা কেহ না দিলেও স্বপ্রতাপে ও স্বচেষ্টায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দশের দরবারে দরিয়াদ আনেন নাই; হয় চুপচাপে স্বত্বটি উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, কিংবা নারী-হিতকর ছোট বড় অনুষ্ঠানরূপ যজ্ঞ করিয়া হাতে-কলমে নারীর যোগ্যতার ও শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং অন্য নারীদের পথিপ্রদর্শিনী হইয়াছেন; কথা বেশী কহেন নাই; কায করিয়াছেন। কিন্তু কথাটাও একটা কায। অনেক সময় কথার অভাবেই কাযের ক্ষতি হয়। কার্য্যময়ী শক্তি ত শক্তি বটেই, কিন্তু বাঙ্ময়ী শক্তিও মহতী শক্তি, কাযের উত্তেজনা কথা হইতেই হয়। সুতরাং আজকাল যাঁহারা কথা কহিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত কায করিতেছেন।

এই তরুণী ফরিয়াদিনীদের মধ্যে দুই প্রকৃতির নারী দেখিতেছি। এক ধীরা, গম্ভীরা, বুদ্ধিবিচার পাণ্ডিত্যের দ্বারা স্বপক্ষ-প্রতিষ্ঠাকারিণী; অপর 'মরিয়া', অভিভাষিণী। এই শেষোক্তাদের বহু আস্ফালনে ভয় হয়, পাছে যতটা গর্জ্জায়, ততটা না বর্ষায়। কিন্তু দুই প্রকৃতির আন্দোলনকারিণীরই উদ্দেশ্য এক—যা নিজেরা ব্যষ্টিভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সমষ্টিভাবে নারী-সমাজে ব্যাপ্ত করা; যে মহার্ঘ্য বস্তুর স্বাদ নিজেরা মনে মনে বা বস্তুতঃ উপভোগ করিয়াছেন, তাহা নারীজাতির প্রত্যেককে আস্বাদন করান। তাই তাঁহারা দশের সমক্ষে উপস্থিত। তাঁহারা বলে! এখন নারী চায় কি? সে দিন গিয়াছে, যখন পুরুষ বলিতেন—"বুঝ্‌তে নারি নারী কি চায়!" সে চায় অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। পুরুষের স্বার্থপ্রণোদিত একদেশদর্শী বিচার, ব্যবস্থা, বুদ্ধি ও ইচ্ছার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বিচার, নিজের বুদ্ধি ও নিজের হিতাহিতজ্ঞানময় রুচি ও ইচ্ছানুকূল ব্যবস্থাসম্মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা; এক কথায় স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ। মনু বলিয়াছেন :—

"প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্।"

প্রতিদিনের লোকযাত্রা স্ত্রীর বশ, ইহা প্রত্যক্ষ। স্ত্রীর …তা ব্যতীত পুরুষের লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, …বং স্ত্রীকে স্বাতন্ত্র্য দিলে চলিবে না, তাহাকে পুরুষের …ন রাখা দরকার, পুরুষের পরতন্ত্র করার দরকার। পাছে …তন্ত্র হইতে চায়, পাছে বাঁকিয়া বসে, হাতছাড়া হইয়া …, নন্‌-কো-অপারেট করিয়া পুরুষের লোকযাত্রা …রালাইজ' করিতে উদ্যত হয়, তাই তাহাকে বিষয়-রসে …ইয়া আত্মবশে রাখ।

"বিষয়েষু চ সজ্জন্তু সংস্থাপ্য আত্মনো বশে!"

…তাকে দশটা কাজের কর্তৃত্ব দিয়া নিযুক্ত রাখ, মনটা যেন …ন থাকিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বিদ্রোহী হইবার সুযোগ … পায়।

"অর্থসংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে।"

…সাব-পত্র 'রান্না-বান্নার' ভারটা সব ইহাদেরই হাতে …ক। যেমন সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরাজরা যুক্তি …বিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে স্কুল কলেজ খুলিয়া দেওয়া …ক ভারতীয় প্রজা পড়াশুনায় নিযুক্ত থাকুক—তাহা …ইলে আর ইংরাজ তাড়াইবার খেয়াল সর্ব্বদা তাহাদের মাথায় ঘুরিবে না।

মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি ঘরে বাহিরে …হা কিছু অধিকার নারী পাইয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষদের আরাম ও সুবিধাকল্পে, নারীর দিক্ ভাবিয়া নহে। ছবিটা …দি সিংহের আঁকা হইত, সিংহ যেমন আর এক রকম করিয়া আঁকিত, তেমনই ধর্ম্মশাস্ত্র-রচনা নারীর হাতে পড়িলে শ্লোক কয়টা পুরুষকে উল্টা পড়িতে হইত। লোক…যাত্রা যেমন পুরুষের, তেমনই মেয়েরও। যেমন পুরুষের তাহা স্ত্রীর বশ, তেমনি মেয়ের তাহা পুরুষের বশ। মেয়েরাও বলিয়া থাকেন, পুরুষ বিনা সংসার কি? সুতরাং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-ফললাভের জন্য মেয়েদের চাই পুরুষের সাহচর্য্য—অতএব মনুর যুক্তি অনুসারে পুরুষকে হাতে রাখা, পুরুষকে স্ত্রীতন্ত্র করাই মেয়েদের স্বার্থ। কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলি সব পুরুষের একার গড়া, মেয়েদের 'ভোট' বা সম্মতি লইয়া গঠিত হয় নাই; সুতরাং ন্যায়তঃ অর্থাৎ কানুনতঃ পুরুষকে স্ববশে রাখিতে না পারায় সময়ে অসময়ে ছলে বলে কৌশলে সেটা তাহাদের করিতে হইয়াছে। খুসী রাখিয়া, ভুলাইয়া সবই আদায় করিতে পার, কিন্তু অধিকারের দোহাই দিয়া নয়—কেন না, অধিকারগুলি সব পুরুষের নিজের হাতে রাখা, নিজের রচিত আইনের লৌহ-প্রাচীরে ঘেরা, সেখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ। যেমন ইংরাজরা যতই রিফর্ম্‌স্ দিন, তোমাদের মিনিষ্টারই বানান আর লর্ড উপাধিতেই ভূষিত করুন—এ দেশের 'ল-মেকার' তাঁহারা, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা তাঁহারা, দেশীয়রা স্বত্ব হিসাবে, স্বাধিকার হিসাবে কিছুই পাইতে পারেন না; যাহা কিছু পাওনাটা আশটা সেটা ইংরাজের সুবিধানীতিমূলক অনুগ্রহবুদ্ধিসাপেক্ষ।

নিজের দিকটাই দেখা, নিজের দিকেই টানা, স্বার্থের পাল্লা ভারী করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দৌর্ব্বল্য। তথাকথিত সভ্য ইংরাজসমাজে পদে পদে তাহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রতি পৃষ্ঠায় ইহারই সাক্ষ্য দেয়। ক্রমাগত এক দল লোক আর এক দলের সঙ্গে লড়িয়া স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দিবে না যাহারা, তাহারাও নাছোড়বান্দা; লইবে যাহারা তাহারাও নাছোড়বান্দা। রাজনীতিকক্ষেত্রেও যেমন, স্ত্রী-পুরুষঘটিত ব্যবহারক্ষেত্রেও তাহাই। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরুষ-প্রকৃতিতে কোন ভেদ নাই। এই নিরেট স্বার্থপরতার নিগড় যে যত ভাঙ্গিতে পারিয়াছে, তাহার আত্মা তত শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়াছে। পরার্থপরতাই সভ্যতার মাপ-কাঠি। নারীর আত্মাভিমান অক্ষুণ্ন রাখিয়া তাহার সহিত নিঃস্বার্থ সসম্মান ব্যবহারেই পুরুষের পৌরুষ। নারীর ইচ্ছা, নারীর সুবিধা ও নারীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার অঙ্গীকারেই পুরুষের উন্নতমনস্কতার পরিচয়। কিন্তু এখনও এই নূতন আলোকের যুগে উদারনীতিক পুরুষরা নারীর 'নারীত্ব'র উপর মন্তব্য করিতে গিয়া, উদারতা দেখাইতে গিয়াও, ক্রমাগত প্রাচীন সংস্কারের চোরাবালিতে কেমন করিয়া পা ফাঁসাইয়া ফেলিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হই। গত বৈশাখের 'বসুমতী'তে এক জন সহৃদয় পুরুষ বলিয়াছেন, নারীর প্রধান গুণ সতীত্ব অর্থাৎ Fidelity, এবং পুরুষের প্রধান গুণ সত্য। যেন যে সতীত্বে নারীর 'নারীত্ব' এবং যে সত্যে পুরুষের 'পুরুষত্ব', তাহা ভিন্ন পদার্থ। বস্তুতঃ একই সৎ নারী-দেহে সতী এবং পুরুষ-দেহে সত্যবান্। পুরুষে যদি যথার্থই সত্য থাকে, তবে পুরুষও 'সতী' হয়—

যেমন রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন, এবং নারীতে সত্য থাকিলেই তবে নারী সতী হইবে। Fidelity বা Chastity যে শব্দেই সতীত্বের অনুবাদ কর, উভয়ই সৎ পুরুষের লক্ষণেও সমান ব্যবহার্য্য।

লক্ষণ বলিতে কি বুঝায়? যাহা পদার্থকে চিনাইয়া দেয়, তাহা সেই পদার্থের লক্ষণ। লক্ষণ দ্বিবিধ ;—স্বরূপ ও তটস্থ। যাহা পদার্থের বস্তুতঃ পরিচায়ক, যাহার দ্বারা আমরা পদার্থের প্রকৃত পরিচয় অবগত হই, তাহাই সেই পদার্থের স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ পদার্থের অনিত্য সহচরগণের (accidental attribute) নির্দ্দেশমাত্র; অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ বস্তুর স্বরূপের (essenceএর) জ্ঞাপক, আর তটস্থ লক্ষণ বস্তুর অস্থায়ী গুণের নির্দ্দেশক। যেমন মরণশীলতা বা বাক্‌শক্তিমত্তা মনুষ্যত্বের স্বরূপ লক্ষণ, কিন্তু সঙ্গীতপ্রিয়তা মনুষ্যত্বের তটস্থ লক্ষণমাত্র। বলা বাহুল্য যে, বস্তুর যথার্থ জ্ঞানপক্ষে তটস্থ অপেক্ষা স্বরূপ লক্ষণেরই উপযোগিতা অধিক।

নারীর 'নারীত্ব' বা পুরুষের 'পুরুষত্ব' বলিলে যাহা বুঝা যাইবে, তাহা নারী বা পুরুষ উভয়েরই তটস্থ লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ নহে। স্বরূপ লক্ষণ দুই জনেরই এক—তাহা 'মনুষ্যত্ব'। অধিকাংশ পুরুষই নিজের ভিতর অজর অমর শাশ্বত আত্মার খবর রাখেন না। অর্জ্জুনের ন্যায় মহাপুরুষেরও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপদেশকের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং নারীদেহে যে দেহী আত্মা, তাহাকে দেখিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি সর্ব্বদা পুরুষে কিরূপে প্রত্যাশা করা যায়? যে দেশের মুষ্টিমেয়মাত্র পুরুষের আত্মসম্মানবোধ সবে জাগ্রত হইয়াছে, শাসক জাতির হস্তে ব্যক্তিগত আত্মাবমাননা অসহ্য হইয়াছে, দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতাজাত সমষ্টি অবমাননা দুঃসহ হইয়াছে; কিন্তু যে দেশের শতকরা নিরনব্বই, অর্থাৎ তেত্রিশ কোটির মধ্যে বত্রিশ কোটি নিরনব্বই লক্ষ লোক আত্মসম্মান সম্বন্ধে এখনও অচৈতন্য—তাহাদের কাছে নারীদেহে অবস্থিত আত্মার উপলব্ধি ও সংস্কারের আশা কোথায়? যে কয়জন "আত্মানং বিদ্ধি" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, স্বপরদেহে আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষে ও নারীতে ভেদ করেন না। তাঁহারা বঙ্গনারীর মুক্তির পথের সমস্ত সুযোগগুলি খুলিয়া দিতে প্রস্তুত। সুতরাং এক দল বিদ্রোহিণীরা যে পুরুষমাত্রের উপর অভিমান করিতে চাহেন, দান পাওয়া স্বাধীনতাকে অবহেলা করিতে চাহেন, তাহা বুদ্ধিমত্তা নহে। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিচেষ্টা এবং প্রাপ্তের রক্ষা করিতে হইবে। পা রাখিবার সামান্য একটু যায়গা পাইলেই বিচক্ষণ সৈন্য পাহাড় টপ্‌কাইয়া কেল্লা ফতে করিতে পারে। সুতরাং সেই পায়েমেকং—কদমজমানর প্রথম পা রাখিবার জমিটুকু আয়ত্ত করা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা সে পুরুষের দানেই লব্ধ হউক আর লড়িয়া জেতাই হউক।

এক দিন ছিল—প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—যখন অন্ততঃ এক জন বাঙ্গালী পুরুষ অন্তর হইতে গাহিয়াছিলেন—"না জাগিলে সব ভারতললনা; এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" তাহাতে বহুশত বাঙ্গালী পুরুষের কণ্ঠে বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি শুনা গিয়াছিল। এক দিন ছিল—যখন মেয়েদের তিলমাত্র আত্মজাগরণ টিকিওয়ালা এবং অটিকিওয়ালা, মুণ্ডিতশির ও টেরিকাটা, ধর্ম্মধ্বজী এবং ধর্ম্মদ্রোহী উভয়বিধ বাঙ্গালী পুরুষপুঙ্গবের হাস্যামোদ ও ব্যঙ্গটিপ্পনী—এমন কি, মানহানি মোকদ্দমার উৎপত্তির কারণ হইত। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা পরস্ত্রী, পরমাতা ও পরকন্যাদের অশ্লীল ভাষায় কটুকাটব্য করিতেন, তাঁহারা নিজের স্ত্রী, নিজের জননী ও নিজের দুহিতার নিকট এখন পরাস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গৃহে গৃহে জাগ্রতা গৃহদেবীদের সম্মুখে তাঁহারা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যেমন ঘরে ঘরে বিলাত-ফেরৎ—কে কাকে একঘরে করে, তেমনই এখন ঘরে ঘরে 'স্বাধীন জেনানা'; স্বাধিকারপ্রার্থিনী শক্তিমূর্ত্তি, তাঁহারা না হইলে প্রতি ঘরে পুরুষের সংসারযাত্রা অচল, সুতরাং কে কাকে আর কটাক্ষ করিবে? এখন প্রায় প্রতি মাসিকে, সাপ্তাহিকে নারীদের জন্য বিশিষ্ট আসন, স্বতন্ত্র মন্দির। যেমন ক'নে বিকাইতে হইলে—ক'নে লিখা-পড়া জানে কি না—বরপক্ষীয়কে এই প্রশ্নের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়, তেমনই আজকাল পত্রিকা বিকাইতে হইলে গ্রাহকের একটু ইটপাটোর জন্য সর্ব্বদা পাতাভরা রাখিতে হয়, 'টক ফুরাইয়াছে' বলিলে চলে না—সেটি নারীর জাগরণ-বিষয়ক কথা। সে কথা ফুরায় না, জুড়ায় না।

অতএব কাজ অনেক অগ্রসর হইয়াছে—পুরুষের সাহায্যেই হইয়াছে। মহাকালের প্রেরণায় দুই চারিজন

পুরুষের প্রবর্ত্তিত এই কালধর্ম্ম আর কেহ রোধ করিতে পারিবে না। এখন কালকে দ্রুত পরিপক্ক করা তার নিজের আয়ত্তাধীন। কালের কাম কালকে একা করিতে না দিয়া কালকে সাহায্য করিলে, উন্নতশীল হলে, যথাযথ পথে স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলন করিলে, বিদ্যা-জ্ঞানক্রিয়া সংযম ও আন্তরিকতার বিকাশের দ্বারা নিজেকে যোগ্য করিলে, কাহারও সাধ্য নাই, তপস্বিনী নারীকে তাহার তপস্যার ফল হইতে বঞ্চিত করে। স্বাতন্ত্র্য-লাভ তাহার করতলগত আমলকীবৎ প্রত্যক্ষলব্ধ হইবে। কিন্তু এখনও দীর্ঘকাল কঠিন তপস্যা করিতে হইবে, প্রত্যেক নারীর সুপ্ত অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিতে হইবে, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ছাড়াইয়া উঠাইতে হইবে, উদারচেতা দলের দলবৃদ্ধি করিতে হইবে এবং লঘুচেতাগণের সম্মুখীন হইতে হইবে,----

বহ্নি! পারিবে কি যেতে? তুমি বিরুববচনা!
অশ্রু-আবিললোচনা।
দৃষ্টিবিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার!
করে নিত্য গরল উদ্গার!
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক
ফিরিছে গোপনে; আছে কণ্টক শতেক!
পারিবে সহিতে সব? রে সুখলালিতা!
দুরাশাচালিতা!
উজ্জ্বল দ্বিজসম হইবে কি সত্যসঙ্গরা!
অতন্দ্রিতা! চিরলক্ষ্যপরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবহণা?
লোকহাস, ভয়, লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্তচিত্তে? হে আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহসিকা!

শ্রীমতী সরলা দেবী।

পরলোকে রাজেন্দ্রনারায়ণ

রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গা-ধরের শেষ বৈদ্য-শিষ্য। চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ যশ ছিল এবং কবিরাজী শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

মিলনে

১

টেবলের উপর দুই তিনখানি পত্র ও একখানি সংবাদপত্র পড়িয়া ছিল। সকাল হইতে এই বেলা তিনটার মধ্যে রাখালরাজের সেগুলা পড়িবার সময়ই হইয়া উঠে নাই। অবশ্য—যদি প্রয়োজনবোধ থাকিত, তবে সংবাদপত্রখানা না হউক, পত্র কয়খানা এরূপ অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত না। সংসারে যাহাকে বলে একেবারে একক—তিনি তাহাই। একমাত্র ভাগিনেয় শ্রীমন্ত নিকটেই থাকিত, তিনি তাহাকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পত্রগুলি যে জমীদারীর কিংবা মক্কেলের, সে বিষয়ে রাখালরাজের তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না; আর সেই জন্যই সে কয়খানি হতাদরেই টেবলে পড়িয়া ছিল। যখন হয় পড়া যাইবে—এখনই পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, এমনই ভাব তাঁহার মনে ছিল।

সে দিন রবিবার; আদালত বন্ধ। তাই উকীল রাখালরাজ এক ঘুম দিয়া উঠিয়া টেবলের কাছে চেয়ারখানা সরাইয়া বসিয়া পত্রগুলা দেখিতে লাগিলেন।

একখানা পত্র দেওয়ান লিখিয়াছেন; নানাবিধ খবরে সে পত্রখানা পূর্ণ। সেখানা টেবলের ড্রয়ারে রাখিয়া তিনি আর একখানি পত্র খুলিলেন, সেখানা বউবাজার ষ্ট্রীট হইতে তাঁহার এক মক্কেল একবার দেখা করিবার কথা লিখিয়াছেন। সে পত্রখানা পকেটে ফেলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা, বিকেলবেলা দেখা যাবে।"

তৃতীয় পত্রখানা খুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। সে পত্রখানার উপর হইতে তিনি আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না, সেখানা ফেলিতেও পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে মনটাকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া তিনি পত্রখানা পড়িলেন। তাহাতে অতি সামান্য কথাই লেখা ছিল, পত্রখানা এই—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আজ বহুকাল পরে আপনাকে পুনরায় পত্র দিতেছি। সুদীর্ঘ আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আপনি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি আপনার একটী আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু আপনি একবার আমায় ডাকিলেন না। আমার অপরাধ কি এতই বেশী হইয়াছিল? আমার মা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তিনি ত আমায় এমনভাবে ত্যাগ করিতে পারিতেন না! কতবার কত অপরাধ তাঁহার কাছে করিয়াছিলাম, মা আমার সে কথা একবারও আপনাকে বলেন নাই, হাসিমুখে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। বাবা, আপনি আমায় ডাকেন নাই, আমি আসিয়াছি। আমার অবস্থা বড় শোচনীয়, আপনার পুত্র হইয়া কুড়ি টাকা বেতনে কায করিয়াছি, এখন শয্যাগত, বাঁচিব কি না জানি না। আমার অভাগিনী স্ত্রী—ও দুইটি ছেলেমেয়ে—তাহারা আজও জানে না, কে তাহারা? কোটিপতি জমীদার, উকীল রাখালরাজ রায়ের পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী বলিয়া নিজেদের পরিচয় তাহারা জানে না। বাবা, আজ আপনি যদি আমায় ক্ষমা করেন, তবে তাহারা জানিবে, নচেৎ এমনই অপরিচিত থাকিবে। শেষ ভিক্ষা চাহিতেছি,—অভাগা পুত্রকে ক্ষমা করুন।

হতভাগ্য রবীন্দ্র।

রাখাল রায় আড়ষ্টের মত অনেকক্ষণ পত্রখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

বহুদিনকার অতীত কথাগুলি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই রবি—তাঁহার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী,—সে আজ শয্যাগত! মানসচক্ষুতে পিতা দেখিলেন, সে পড়িয়া আছে একটা খোলার ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর, তাহার ব্যাকুল চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে পথের দিকে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার এক একটা দীর্ঘশ্বাস বুকটা সজোরে কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সেই রবি—যাহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়াও পিতা-মাতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; যাহার জন্য দুই জন ভৃত্য থাকিত; সে যাহা বাহানা লইত, পিতা-মাতা তাহাই দিতেন। অত্যন্ত আদরে ছেলে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যে একটা কথা আছে, রবিরও তাহাই হইল। সে লিখা-

... শিখিল না। পিতা-মাতা যাহা নিষেধ করিতেন, ... করিয়া তাহাই করিত।

তাহার অত্যাচার মা সবই সহ্য করিয়া যাইতেন, কিন্তু ... রাগিয়া উঠিতেন। তাহার যখন বিবাহের সম্বন্ধ বেশ ... ঠিক করা হইল, সে তখন ভবানীপুরে এক দীন-... বিধবার এক শ্যামবর্ণা মেয়েকে বিবাহ করিয়া ...।

পিতা একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়া পুত্রকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন, পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া গেল; কারণ, সে অত্যন্ত অভিমানী ছিল, কাহারও কথা তাহার সহ্য হইত না। মাতার চক্ষুর জলও তাহাকে আটক করিতে পারিল না।

পিতা রাগ করিয়া পুত্রের কোনও সন্ধান লইলেন না। মাতা স্বামীকে চিনিতেন, তিনিও আর পুত্রের নাম উল্লেখ করিলেন না, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া গুমরিয়া মরিলেন।

রাখাল রায় অভিমানে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যে ছেলেকে এমন করিয়া অপরিমিত স্নেহ ঢালিয়া "মানুষ" করিলেন, সে যখন চলিয়া গেল, তখন তিনিই বা তাহার খোঁজ লইবেন কেন? তিনি নিজের ভাগিনেয় শ্রীমন্তকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন।

পুত্রের সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; অভিমান, দুঃখ, ক্রোধ আসিয়া তাঁহার স্নেহ দূর করিয়া দিল। পত্রখানা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে ফেলিতে দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন, "না, ক্ষমা কখনই করব না। সব মিছে কথা, ব্যারামও নয়, শয্যাগতও নয়। তবে কষ্টে যে পড়েছে, এ কথা ঠিক। কষ্টে পড়েছে বলেই বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্যের কথা মনে পড়েছে। আমি কখনই ক্ষমা করব না; কখনই তাকে আসতে দেব না; আমি মনকে বুঝাব, আমার ছেলে নেই, আমার কেউ নেই।"

বৃদ্ধ দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিলেন

জোর করিয়া বলিলেই কি হয়—আমার কেহ নাই? মনের মধ্যে সে যে জাগিয়া আছে। এই আট বৎসর রাখাল রায় বিষয়কর্ম্মে আপনাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিয়াছেন, তাঁহার যে পুত্র ছিল, কখনও সে কথা মুখেও আনেন নাই, মনে আসিলেও অর্থের চিন্তায় সে চিন্তা চাপা দিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি রবিকে ভুলিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু আজ? আজ তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। অর্থ-চিন্তা, নিজের চিন্তা, সকলের উপরে জাগিতেছে সে, সে আজ ঐ যে বুকের মধ্যে কাঁদিতেছে, ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিতেছে—"বাবা—"

নাঃ, ক্ষমা করা কিছুতেই হইবে না। সত্যই কি রাখালরাজের হৃদয়ে একটু বল নাই? তিনি ত নারী নহেন! পুত্র তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, আবার আসিবে, তিনি তাহার যাইবার সময় কাঁদিবেন, আসিবার সময় আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন—না, ইহা করিতে গেলে চলে না। যাউক্ সে হতভাগা; দেখুক, তাহার পিতার হৃদয়ে বল আছে। তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন নাই, সে তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক।

অবাধ্য ছেলে—দেখুক এবার—

তিনি সংবাদপত্রখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু কি যে পড়িতে লাগিলেন, তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। মনটা তখন অভিমানে গর্জ্জিতেছিল;—ক্ষমা—সে স্ত্রীলোকের সম্বল, পুরুষ ক্ষমা করিবে না। মনে করিব, আমার ছেলে নাই, সে মরিয়াছে!

২

ইহার পর পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। মদ্যপ যেমন মদের নেশায় শোক-তাপ ভুলিয়া থাকে, বিষয়ী রাখাল রায় তেমনই অর্থ চিন্তায় পুত্রের চিন্তাকে অপসারিত করিলেন। কিন্তু রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক একবার যেন কানে ভাসিয়া আসে, "বাবা!"—দূর হউক্—ওটা শুধু মনের ভুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। না, এরূপ কোমলচিত্ত হওয়া কোনমতে উচিত নহে; কোমলতা নারীতে শোভা পায়, পুরুষে নহে; পুরুষে চাহি কঠোরতা।

সে দিন সকালে তিনি জমীদারীর খাজনার টাকা মিলাইতেছিলেন, গেটের কাছে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল,—

"ভবের খেলা সাঙ্গ হবে,
আকুল আমি ভেবে ভেবে।"

আঃ, হতভাগা ভিখারীগুলারও কি মরিবার যায়গা নাই? কানের কাছে আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া কান ঝালাপালা করিয়া দিল! "এই দারোয়ান, অবি উসকো নিকাল দেও।"

ভিখারী তখনও গাহিতেছিল—

"যারে আমি আপন ভাবি
সেই তো মুখে আগুন দেবে,
শেষে, চিতা ধুয়ে কাচা নিয়ে
হরি ব'লে চ'লে যাবে।"

গানটার শেষ শুনা হইল না, দারবান তাহার লাঠী লইয়া তাড়া করিতেই ভিখারী ছুটিয়া পলাইল।

অদূরে ফুটপাথের উপর দিয়া সহস্র লোক যাতায়াত করিতেছে, ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম গমনাগমন করিতেছে, মটরগুলা ভোঁ ভোঁ করিয়া ছুটিতেছে। রাখাল রায়ের সম্মুখে টাকার থলি পড়িয়া রহিল, তিনি আপনা হারাইয়া শূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ভিখারী গাহিয়াছিল—

"যারে আমি আপন ভাবি,
সেই তো মুখে আগুন দেবে,
শেষে চিতা ধুয়ে কাচা নিয়ে
হরি ব'লে চ'লে যাবে।"

কে আছে তাঁহার আপন, যে তাঁহার মুখে আগুন দিবে? সেই জীবনান্তের কাল যে ওই আসিয়াছে, অদূরে মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া, ওই যে! কে আছে—সে দিন তাঁহার মুখে শেষ জলটুকু দিবে, কাহার অশ্রু তাঁহার ললাটোপরি ঝরিয়া পড়িবে? হায়, পরপারের সম্বল যে কিছুই নাই, এ পারেই বা করিলেন কি? আপনার যাহা কিছু, জীবনের সম্বল, নয়নানন্দ, তাহাও বিলাইয়া দিয়া তিনি যে কেবল কতকগুলা রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করিতেছেন, যক্ষের ন্যায় বসিয়া সেগুলা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন? এই যে অর্থবর্দ্ধনস্পৃহা—এই বা কাহার জন্য? কে এ সব সম্ভোগ করিবে?

বুকের মধ্যে কে যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কেহ নাই! কেহ নাই! স্ত্রী নাই, একমাত্র বড় আদরের পুত্র, সে-ও নাই!

সেই পত্রখানার কথা রাখাল রায়ের মনে পড়িল। সে লিখিয়াছিল, সে শয্যাগত, সে বাঁচিবে না। সে ক্ষমা চাহিয়াছিল; সে বলিয়াছিল, তাহার মা যদি থাকিত, তবে কি এত দিন তাহাকে না ফিরাইয়া তিনি থাকিতে পারিতেন? আর স্ত্রী—সেই সেবানিরতা পত্নী; তিনি যে পুত্রের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! আর নিষ্ঠুর পিতা,—

সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে?

ভগবান—যদি সে বাঁচিয়া থাকে!—

রাখাল রায়ের চক্ষুতে জল আসিয়া পড়িল, তিনি টাকাগুলি সিন্দুকে তুলিয়া কোচম্যানকে গাড়ী তৈয়ারী করিতে বলিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া রাখাল রায় ঠিকানা বলিয়া দিলেন,—ভবানীপুর পদ্মপুকুর—

কিন্তু এখনও কি সে সেখানে আছে? ইহার আগে—অর্থাৎ যখন তাহার মা বর্ত্তমান ছিলেন, তখন গোপনে তিনি সরকারকে পাঠাইয়া জানিয়াছিলেন, সে পশ্চিমে গিয়াছে। ছয়মাস পূর্ব্বে সে যে পত্রখানা দিয়াছিল, তাহাতে ভবানীপুরের ঠিকানা ছিল। বাড়ীর নম্বরটা তাঁহার মনে ছিল।

রাখাল রায়ের মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাস্তবিক—তাহাকে খুব কষ্টই দেওয়া হইয়াছে। কোনও পিতা পুত্রকে এমন কষ্ট দিতে পারিবে না। এখন ক্ষমা করা নিশ্চয়ই উচিত। এখন সে বুঝিয়াছে, পিতার কত ক্ষমতা, এইবার তিনি পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের বাড়ীতে আনিবেন। তাহারা,কখনও স্বপ্নেও জানে না,তাহারা কাহার সর্ব্বস্ব। রাজপুত্র ভিক্ষুকের বেশে যাইয়া ভিখারিণীকে বিবাহ করিয়াছে। ছেলে-মেয়ে দুইটি জানে, তাহারা ভিক্ষুকের ছেলে-মেয়ে। তাহারা ঠাকুরদার বাড়ীতে আসিয়া কি ভাবিবে? এত বড় বাড়ী তাহাদের,—মটরকার, গাড়ী! এ সব দেখিয়া তাহারা কি ভাবিবে? তাহাদের পদ্মফুলের মত মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিবে। তাহা কল্পনা করিতে বৃদ্ধের চক্ষু দুইটি আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রবধূকে গৃহিণীর মুক্তা-হীরার অলঙ্কারগুলা পরাইয়া দেখিবেন—মা'কে কেমন দেখিতে হয়। আর—এ বুড়াবয়সে বৃথা খাটাই বা কেন? এখন রবিই বিষয়কর্ম্ম সব দেখিবে,

... অন্তঃপুর শাসন করিবেন, তিনি সব কাযকর্ম্ম ছাড়িয়া ... নাতিনাতনী লইয়া আনন্দে দিন কাটাইবেন।

পরলোকগতা পত্নীর কথা ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি ...র জন্য সজল হইয়া উঠিল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ...য়। তিনি ভাবিলেন, "কপালে নেই, তাই দেখতে ...লেন না।"

সারি সারি খোলার ঘরগুলির সম্মুখে পথের উপর গাড়ী ...ড়াইল, রাখাল রায় গাড়ী হইতে নামিবার আগেই দ্বার-... আসিয়া বলিল, "আমি আগে দে'খে আসি, হুজুর।"

নামিতে নামিতে রাখাল রায় বলিলেন, "না, তোমরা ...ড়ীতে থাক, আমিই যাচ্ছি।"

বারান্দায় এক জন বৃদ্ধ বসিয়া তামাকু টানিতেছিলেন। ...লের রায়ের উন্নত আকৃতি এবং বড় জুড়ীগাড়ীটার দিকে চাহিয়া হুঁকাটা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান, ...পনি?"

রাখাল রায় তাহার অপরিচ্ছন্ন কাপড়ের দিকে তাকাইয়া ... কুঞ্চিত করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "এই বাড়ীতে এক জন লোক থাকৃত—তার নাম"---তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল—"তার নাম রবীন্দ্রনাথ রায়, সে কোথায় আছে -- কোন্ ঘরটায় থাকে, জানেন ত ব'লে দিন।"

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার পানে চাহিল; তাহার পর বলিল, "সেই যার একটি ছেলে, একটি মেয়ে, আর মা লক্ষ্মীর মত স্ত্রী? আহা, ছেলে মেয়ে দুটি যেন পদ্মফুল, আমায় ঠাকুরদা ব'লে ডাকত; বউটি আমায় কাকা বলত, ছেলেটিও কাকা ব'লে ডাকত।"

উৎকণ্ঠিত রাখাল রায় বলিলেন, "হ্যাঁ—বোধ হয় সেই! তারা এখানে আছে তা হ'লে? কোন্ ঘরে আছে?"

বৃদ্ধ একবার কাঁপিয়া বলিল, "থামুন, মশাই, বল্‌তেই দিন সব কথা। সেই রবি—তার কি ব্যারাম হয়েছিল, জানি নে, প্রায় সাত আট মাস বিছানায় প'ড়ে, আহা, কি কষ্ট যে তাদের, তা আর বলতে পারি নে। ডাক্তার দেখান দূরে থাক্, খেতে পায় না। ছেলে-মেয়ে দুটি পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইত---তবে---"

"আঃ" বলিয়া রাখাল রায় ললাট টিপিয়া ধরিলেন।

বৃদ্ধ বলিয়াই চলিল, "তা—কিছুতেই মা লক্ষ্মী পাবলেন না। এত যত্ন তাঁর, এত খাটুনি—সব মিথ্যে ক'রে আজ দু' মাস আগে রবি মারা গেল। এই ঘরের ভাড়া দিতে পারেন নি, বাড়ীওয়ালা আজ মাসখানেক আগে তাঁদের বের ক'রে দিলে।"

"রবি—রবি—"

বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন. চোখ দিয়া হুহু করিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল।

দ্বারবান ছুটিয়া আসিল। রাখাল রায় মুহূর্ত্তে আত্ম-সংবরণ করিলেন, তাহাদের গাড়ীতে ফিরিতে আদেশ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সেই হতভাগার ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রী কোথায় গেছে, তা জানেন?"

বৃদ্ধ তাঁহার রোদন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, বলিল, "না, তা জানি নে। পথে পথে বেড়াচ্ছেন কি কোথাও ঝি কি রাঁধুনী হয়ে আছেন। শুনেছি, তাঁদের আর কেউ নেই, তাঁরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে দরিদ্র।"

টলিতে টলিতে রাখাল রায় গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

৩

তাদের কেউ নেই - তারা জগতের মধ্যে সব চেয়ে দরিদ্র—

—এই কথাটা রাখাল রায়ের মনে বজ্রের মত বাজিতে-ছিল। হতভাগ্য পিতা বাড়ী আসিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

হায় ভগবান, যদি পিতার মনে সুমতি দিলে পূর্ব্বে—সময় থাকিতে দিলে না কেন? তখন যদি পত্রখানা পাইয়াই রবিকে আনিতে ছুটিতেন—তখন যদি তাহাকে নিজের কাছে আনিতেন, তবে ত সে চলিয়া যাইত না। তাঁহার অদয় ভিখারীর গানটা শুনিয়া হাহাকার করিতেছিল, সে হাহাকার নিভিল না, আরও যে বাড়িল।

সে জানিয়া গিয়াছে, পিতা তাহাকে ক্ষমা করেন নাই। সে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিল, প্রাণটা তাহার বুকের মধ্যে আছড়াপিছড়ি করিতেছিল, আর্ত্তকণ্ঠে সে বোধ হয় ডাকিয়াও ছিল "বাবা! বাবা!" সেই কণ্ঠোচ্ছ্বাসটাই কি তাঁহার কানে অন্তরতঃ আসিয়া বাজিয়া-ছিল—"বাবা—বাবা!"

আজ এতটুকু সান্ত্বনার উপায় জগতে তাঁহার নাই। বৃদ্ধ রাখাল রায় তাই বুক ধরিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন

—"আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমার রবি—আয়, অনুতপ্ত বাপের বুকে ফিরে আয়। তোর এই অতুল ঐশ্বর্য্য, আমি যে এখনও যক্ষের মত আগ্‌লে নিয়ে ব'সে আছি।"

প্রথমটা তিনি খুবই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে আপনিই আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

আর না। আর কাহার জন্ত কাষ করা, কাহার জন্ত অর্থসঞ্চয় করা? যাহার জন্ত, সে ত চলিয়াই গিয়াছে। তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দিবেন।

তবু—সব আশা ছাড়িয়াও একটু আশার রেখা বৃদ্ধের বুকে রহিল—রবির স্ত্রী আছে, রবির ছেলে-মেয়ে আছে। বড় আদরের রবি তাঁহার—সেই রবির আদরের ছেলে-মেয়ে; তাহাদের আনিতে হইবে, খুঁজিতে হইবে, তাহাদের জিনিষ তাহাদের ফিরাইয়া দিতে হইবে। এ সব এখন তাহাদের,—তাহাদের না দিয়া গেলে মরিলেও তিনি শান্তি পাইবেন না। তাঁহার রবি পরলোক হইতে চাহিয়া আছে, তাহার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী সুখী হইলে সে-ও সুখী হইবে।

বৃদ্ধের হৃদয়ে আবার নূতন বল আসিল, নূতন উৎসাহে তিনি পৌত্র-পৌত্রী ও পুত্রবধূকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কোথায় তাহারা? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসরও ঘুরিয়া আসিল, তাহাদের ত সন্ধান মিলিল না।

তবে কি তাহারাও নাই? সাধ্বী সতী পুত্রবধূ কি বিয়োগযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু দুইটি—তাহারাও হয় ত অনাহারে বা রোগে ভুগিয়া মরিয়াছে।

বৃদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া আবার জলধারা গড়াইয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে শ্রীমন্তকে বলিলেন, "আমার যাওয়ার ঠিক কর, আমি দিনকত দেশে যেতে চাই। তার পর ফিরে এসে কাশী যাব, তারও ঠিক ক'রে রেখে দাও।"

কলিকাতায় তিনি আর থাকিতে পারিতেছিলেন না, তাই বহুকাল পরে তিনি দেশে চলিলেন।

রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হইবে। নামিয়া তিনি আহারাদি করিয়া লইবেন, ভাবিলেন। ওয়েটিংরুমে তিনি বিশ্রাম করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই সময় একটি সপ্তমবর্ষীয় বালক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটির চেহারা বড় সুন্দর—রং গোলাপ-ফুলের মত শ্বেতরক্তাভ, মাথাভরা কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দুইটি বড় বড় ও উজ্জ্বল। তাহার পরিধানে মলিন ও ছিন্ন একখানা ধুতি।

সে যে কিছু যাচ্ঞা করিবার জন্তই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাহাকে দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাহস করিয়া সে কিছু চাহিতে পারিতেছিল না, রাখাল রায়ের গম্ভীর মুখখানা দেখিয়া সে থতমত খাইয়াছিল।

রাখাল রায় বালকের দিকে তাকাইলেন, চকিতে তাঁহার মনে আর একখানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। সে-ও বাল্যকালে ঠিক এমনটি ছিল, এমনই কোঁকড়া চুলগুলি তাহার মাথা ঘিরিয়া রাখিত। তবে সে ছিল দাম্ভিক, তাহার মুখে বরাবরই অহঙ্কারের ভাবটাই জাগিয়া থাকিত, এ বালকের মুখে জাগিয়া আছে—দীনতা।

কণ্ঠস্বর কোমল, স্নিগ্ধ হইয়া আসিল; রাখাল রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও, খোকা? কিছু নেবে?"

এমন কোমল, স্নিগ্ধকণ্ঠ বালক আশা করে নাই; সে তাই হাঁ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; প্রথমটা কোন কথাই বলিতে পারিল না।

রাখাল রায় তাহার কাছে সরিয়া গেলেন, আরও স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কিছু দরকারে এসেছ আমার কাছে? বল। ভয় কি?"

বালক এবার সাহস পাইল; বলিল, "হ্যাঁ, দরকার আছে।"

রাখাল রায় বলিলেন, "বল, কি দরকার?"

বালক যাহা বলিল, তাহা এই,—তাহার একটি ছোট বোন ও মা আছে। বোনটির বড় অসুখ হইয়াছে, চিকিৎসা ও খাদ্যাভাবে সে মারা যায়; তাই তাহার মা তাহাকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন।

রাখাল রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ভিক্ষা ক'রে তুমি কি পেয়েছ?"

বালক কাপড়ের একটি কোণের গিরা খুলিয়া দেখাইল মাত্র ১৩টি পয়সা।

অশ্রুজড়িতকণ্ঠে সে বলিল, তাহার মা কলিকাতার কোনও এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসী ছিলেন, তাহারা দুই ভাই-বোনও অনেক কায করিয়া দিত। ভদ্রলোকটি

...র দুই বৎসর হইল, এই স্থানে আসিয়াছেন, তাহারা ...নও সেই বাড়ীতে কায করে। সে করবাইশ খাটে, ...হার পঞ্চমবর্ষীয়া ভগিনীটি ছেলে-মেয়েদের খেলা দেয়, সংসারের সব কায করেন। কিন্তু তাহার বোনটি ...সুস্থ হওয়ায় ডাক্তার সংক্রামক রোগ বলায় বাবু তাড়া-...য় দিয়াছেন, তাহারা একটা খোলার ঘরে থাকে।

নিজের পুত্র পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রীর কথা মনে করিয়া রাখাল রায়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। হায়, তাহারা ...দি বাঁচিয়া থাকিত—এমনই করিয়া কোথাও খাটিয়া খাইত কখনও না কখনও সে সন্ধান পাওয়া যাইতই। তাহারা যে ...চিয়া নাই, এই কথাটিই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়া-...ছিল। যদি বাঁচিয়া থাকিত, এই দুই তিন বৎসরের মধ্যেও ...ক আসিত না? রবির স্ত্রী—নিজের জন্য না হউক্—ছেলে-...য়ে দুইটির জন্যও আসিত। সংবাদপত্রে যে আজও সে ...বজ্ঞাপন রহিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে সে কি দেখিত না?

রাখাল রায় মুখ ফিরাইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি-লেন; বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি, খোকা, নিয়ে যাও, তোমার বোনের ...িকিৎসা করাতে তোমার মা'কে বলো। আর এর মধ্যে ...দি তোমার বোন ভাল হয়ে ওঠে, তবে তোমরা বরাবর কলকাতায় যেয়ো', রসা রোডে আমার বাড়ী, আমি তোমা-দের সেখানে রাখব। তোমার মা দুই একখানা কায কর্-বেন, তোমার কি তোমার বোনের কোনও কায করতে হবে না। এই আমার ঠিকানা, আর এই নাও টাকা—"

খানকতক নোট ও ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখিয়া রুমালে বাঁধিয়া তিনি বালকের হাতে দিলেন। সে হাঁ করিয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাখাল রায় বলিলেন, "যেয়ো, খোকা। বোনটি সারলেই তোমার মা'কে নিয়ে আমার বাড়ী যেয়ো; ভুলো না যেন। আমি আমার দেশে যাচ্ছি পনের কুড়ি দিন বাদেই ফিরব, ফিরে যেন তোমাদের আমার বাড়ীতে দেখতে পাই।"

বালক মাথাটা কাত করিয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

তাহার দিকে চাহিয়া রাখাল রায়ের বুক ভেদ করিয়া আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। আহা, এমনই যদি তাঁহার পৌত্রটিও আসিত!—

আঃ, বালক কি শাস্তিই দিয়া গেল! স্পষ্ট সে জানা-ইয়া গেল, কিসের জন্য অর্থ, কাহার জন্য এ সঞ্চয়, অর্থ ব্যবহার করিবার মালিক না থাকিলে এ সঞ্চয় করাই যে বৃথা। তিনি আজীবন কেবল সঞ্চয়ই করিয়া আসিয়াছেন, ভোগ করিবার লোক কই?

ট্রেণ আসিয়া পড়িল, রাখাল রায়ের আহারাদি আর হইল না। সে কথা তিনি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, মনে জাগিতেছিল—এই প্রিয়দর্শন বালকটি—আর নিজের পরলোকগত পুত্র রবি ও তাহার হতভাগ্য স্ত্রী, পুত্র-কন্যা।

৪

কুড়ি বাইশ দিনের স্থানে দেশে রাখাল রায়ের দেড় মাস অতীত হইয়া গেল।

গুরুদেব আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সদালাপে দিন-গুলা বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। যখন পরলোকগত পুত্রের কথা ভাবিয়া তাঁহার বুকটা অসহ্য যাতনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, তখন তিনি আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—"তুমিই দয়া ক'রে তাকে সরিয়েছ, অসীম দয়া তোমার, দয়াধার। আমায় যথার্থ ত্যাগী ক'রে গ'ড়ে তুলবে ব'লেই একে একে আমার বাঁধনগুলো নিজের হাতে তুমিই কেটে দেছ।"

যখন তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন সঙ্গে ছিলেন গুরুদেব। কথা ছিল, কলিকাতায় আসিয়া দুই দিন থাকিয়াই তিনি গুরুদেবের সহিত কাশীযাত্রা করিবেন।

কলিকাতায় আসিয়াই তিনি সেই বালককে নিজের বাড়ীতে দেখিতে পাইলেন। সে তাহার ভাগিনীটির হাত ধরিয়া দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল, কাছে যাইতে সাহস হইতেছিল না। রাণাঘাটে একশত টাকা লইয়া সেই বালকও বুঝিয়াছিল, লোকটি খুব বড়লোক এবং দাতা। এখানে আসিয়া বড়লোকের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়াই রাখাল রায় সহাস্যে বলিলেন, "এই যে, খোকা, তোমরা এসেছ! এইটি তোমার বোন বুঝি, ব্যারামে ভুগে বড্ড রোগা হ'য়ে গেছে। এস, খুকী, এ দিকে এস। তোমার নাম কি?"

খুকী উত্তর দিল না, ছেলেটি হাসিমুখে বলিল, "ওর নাম জ্যোতি, কিন্তু আমরা ওকে টুনি ব'লে ডাকি। আর আমার নাম মণীন্দ্র।"

টুনি ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "ইঃ, তোর নাম মণিন্দ বই কি ! তোর নাম ত মনা।"

শুনিয়া রাখাল রায় হাসিলেন।

কাশীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা হইয়া গেল। যদি রবির ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রী ফিরিয়া আইসে, তবে সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশ তাহারা পাইবে, শ্রীমন্ত এক তৃতীয় অংশ পাইবে। আর যদি তাহারা না আইসে, তবে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশ সাধারণের উপকারার্থ ব্যয়িত হইবে।

দাসী, চাকর সব কমাইবার ব্যবস্থা হইল, শ্রীমন্ত মুখ-খানা ভার করিয়া বলিল, "আবার এই যে তিন জনকে এনেছেন ওদের কি হবে ?"

রাখাল রায় বলিলেন, "ওরা থাকবে।"

শ্রীমন্ত বলিল, "মাগীটা বেজায় চোর। যা পাবে নে পায়, সব চুরি ক'রে বাক্সে ভরে। আবার শুনছি স্বভাবটাও ভাল নয়।"

রাখাল রায় নিমেষে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "প্রমাণ পেয়েছ, দিতে পার ?"

শ্রীকান্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "প্রমাণ ঢের আছে, কিন্তু আপনি হয় ত বিশ্বাস করবেন না।"

রাখাল রায় বলিলেন, "যদি প্রমাণ দিতে পার, বিশ্বাস করব, আর তা হ'লে এখানে রাখব না।"

একে ত মোটে এক তৃতীয়াংশ, তাহার উপর এই সব পোষ্য-পোষণ ! শ্রীমন্ত বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল।

৫

যে দিন রাখাল রায় কাশী যাইবেন—তাহার পূর্ব্বদিন বৈকালে শ্রীকান্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি বিশ্বাস করতে চাননি যে, ও মাগী চোর। দিনরাত ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে, আদতে কারও সঙ্গে কথা কয় না, এতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওর প'রে নজরও রেখেছিলুম। দেখুন, আজ ঠিক চোর ধরতে পেরেছি। এই দেখুন—এই আংটীটা—"

সেই আংটীটা রাখাল রায় হাতে লইয়াই চমকাইয়া উঠিলেন; স্তম্ভিত হইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। এ আংটী তাঁহারই পরলোকগত পুত্র রবীন্দ্রের। এ আংটী তিনিই গড়াইয়া দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে যে নীলা পাথর, জ্যোতিষীর উপদেশে তিনিই তাহা রবীন্দ্রের জন্য ২ হাজার টাকা দিয়া কিনিয়াছিলেন।

উত্তেজিত শ্রীকান্ত বলিল, "দেখছেন! কোন্ সময়ে এটা সরিয়েছে, তার ঠিক কি ? আমার মনে হচ্ছে, তার সেই ভাঙ্গা বাক্সটা খোঁজ করলে অনেক জিনিষই পাওয়া যাবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাখাল রায় বলিলেন, "এ আমার রবির আংটী, সে কোথায় পেলে এটা ? আচ্ছা—ডাক তাকে, আমি তাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

শ্রীমন্ত ভৃত্যকে আদেশ দিল, "নূতন ঝিকে ডেকে নিয়ে আয়, বল্ গিয়ে কর্ত্তাবাবু ডাকছেন।"

অবগুণ্ঠিতা টুনির মা বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইল।

তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "আজ হাতে হাতে চুরী ধরা পড়েছে—আর চালাকী চলবে না।"

রাখাল রায় শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "অভদ্র ভাষাগুলো ত্যাগ কর, শ্রীমন্ত, একটু ভাল ক'রে কথা বল। এ দিকে এস তো ঝি, কথা আছে।"

টুনির মা ধীরপদে অগ্রসর হইয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইল।

শ্রীমন্ত মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, ও মিষ্ট মুখের কথা নয়, মামাবাবু ! এ আংটী তুমি কোথায় পেলে ? শীগ্‌গির বল। তোমাকে পুলিসে দেব।"

টুনি ও মণীন্দ্র মা'র পিছনেই ছিল, পুলিসের নাম শুনিয়া আর্ত্তভাবে মা'কে জড়াইয়া ধরিল।

টুনির মা অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, একটু পরে উত্তর দিল, "আংটী আমার।"

"তোমার—তোমার আংটী ?"

শ্রীমন্ত কর্কশ হাসি হাসিয়া উঠিল, "শুনছেন, মামাবাবু, ঝির কায করতে এসেছেন, আড়াই হাজার টাকা দামের আংটীটা হ'ল ওঁর ? বল্, কোথা হতে চুরি করেছিস্—এখনও ?"

টুনির মা'র চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সত্যিই আমার আংটী, আমি চুরি করি নি।"

শ্রীমন্ত চীৎকার করিয়া বলিল, "চুরি করিস্ নি? আবার—এ ধরণের মেয়েলোকদের বিশেষভাবে দণ্ডিত হওয়া উচিত। এ মাগী তবে কুলটা।"

"কুলটা!—আমি কুলটা?"

টুনির মা'র চক্ষুর জল নিমেষে শুকাইয়া গেল, তাহার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল। দীপ্তমুখে, দীপ্তকণ্ঠে সে বলিল, "আমি কুলটা!—যে জিভ এ কথা উচ্চারণ করে, সে জিভ খসে যাক। আমার পরলোকগত স্বামীর আংটী এ, তিনি মরবার সময় আমায় দিয়ে গেছেন, আমি দু' তিন দিন খেতে পাই নি, তবু এ বিক্রী করি নি, বুকের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি। রবীন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রীকে এ কথা যে বলে—হে ভগবান্—তুমি তার সর্ব্বনাশ—"

কথা আর শেষ হইল না, কাঁপিতে কাঁপিতে টুনির মা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইল।

"মা আমার—মা সতী রাণী!—"

বৃদ্ধ রাখাল রায় বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

* * * *

টুনির মা'র যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিতে পাইল, শ্রীকান্ত কখন্ সরিয়া গিয়াছে, আর বৃদ্ধ রাখাল রায় এক কোলে পৌত্র ও এক কোলে পৌত্রী লইয়া কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন।

"মা, কি হ'তে এসেছিলে! এ যে তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, আমি যে তোমার বুড়ো ছেলে, আমার ভারও যে নিতে হবে। রাজেন্দ্রাণী মা আমার, আমি যে তোমাদের জন্যে এই তিন বছর হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছি। বড় ক্ষোভ রইল মা—আমি তোমায় সাজাতে পারলুম না। ওরে রবি, তুই আজ একবার আয়, বাপ, তোর ঘরের এই মিলনানন্দকে পূর্ণ করে দিয়ে যা।"

তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে টুনির মাও কাঁদিয়া আকুল হইল।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী।

শিবত্ব

মধুমেদুর পদ্মবুকে গুঞ্জরে ভ্রমরী,—
আমার হৃদয়মাঝে—তব মধুভাষা,—
মুছে গেল মুছে গেল—ইন্দ্রিয়-পিপাসা
শুদ্ধ হ'ল মায়ামন্ত্র,—চিরমুগ্ধকরী
কাম-কামনার বন্ধ,—কনক-শৃঙ্খল,
ছিন্ন হ'ল পদস্পর্শে—অয়ি বিজয়িনি!
এস রমা, এস বাণী,—বেদ-বিনোদিনী—
নিত্যজ্ঞান সুধাকুম্ভ—অমৃত-সম্বল!
দাসভাগ্য খণ্ডনের মহাব্রত লয়ে
ফিরে যারা—দিবানিশি শ্মশানে শ্মশানে,
নিত্য আত্মজয়মন্ত্র—তাহাদের কানে
আপনি শুনাও তুমি নিজ ব্রতালয়ে।
অগ্নিরূপে দহ তারে,—কাম ভস্মশেষ,—
ললাটে শ্মশানধূলি—সাজে সে মহেশ।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

হাঙ্গরের চামড়ার জুতা

এতদিন ক্রীড়া এবং লোক-রক্ষার জন্য হাঙ্গর-শিকার চলিত; কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়াছে, হাঙ্গরের দেহ হইতে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। 'ওসেন্ লেদার কোম্পানী'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার আলফ্রেড এরেন্‌রিচ্ সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, হাঙ্গরের চামড়ায় চমৎকার জুতা প্রস্তুত হইতে পারে। শুধু হাঙ্গর নহে, তিমি, শুশুক ও 'রে' মৎস্যের চর্ম্ম হইতেও জুতা এবং অন্যান্য নানাবিধ দীর্ঘকালস্থায়ী দ্রব্য তৈয়ার করা যায়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে এবং অন্যত্র ইহার জন্য কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।

ডাঃ আলফ্রেড এরেন্‌রিচ্ উত্তর কারোলিনা, ফ্লোরিডা এবং বামাস্ প্রভৃতি স্থানে হাঙ্গর ধরিবার জন্য আপিস খুলিয়াছেন। তাঁহার কারখানায় প্রত্যহ দুই শত হাঙ্গরচর্ম্ম ব্যবহারোপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইতেছে। কোন কোন হাঙ্গরচর্ম্মের পরিসর ১০ বর্গফুট পর্যান্ত হয়। যে মৎস্যের চামড়ার পরিসর ১ শত বর্গফুট পর্যান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। উত্তর-কারোলিনার সমুদ্রে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ হাঙ্গর গতাগাত করিয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপের চারিপার্শ্বে অসংখ্য হাঙ্গর পাওয়া যায়। হাঙ্গর ধরিবার এক প্রকার জাল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাল এমনভাবে নির্ম্মিত যে, হাঙ্গর জালবদ্ধ হইলে আর পলায়ন করিতে পারে না। তাহার মুখ এমনভাবে জালে বদ্ধ হয় যে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব।

জালের সাহায্যে হাঙ্গর শিকার

উল্লিখিত জাল দৈর্ঘ্যে ৫ শত ফুট। প্রতি ক্ষেপে অসংখ্য হাঙ্গর ধরা পড়ে। একবার জালক্ষেপণ করা ৩ শত ১৬টি হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছিল। বহিঃসমুদ্রে জালে হাঙ্গর ধরা তেমন সুবিধাজনক নহে। তথায় ডিনামাইট প্রভৃতির সাহায্যে হাঙ্গর শিকার করা হয়।

হাঙ্গরের মাথা গলাইয়া শিরীষ প্রস্তুত হয়। হাঙ্গরের দন্ত হস্তিদন্তের মত মূল্যবান্। মণিকারগণ উহা সাদরে ক্রয় করিয়া থাকে। হাঙ্গরের ডানা বা পাখা চীনারা অত্যন্ত পছন্দ করে। এক এক টুকরার দাম প্রায় ৪৲ টাকা। হাঙ্গরের চামড়ার জুতা দীর্ঘকালস্থায়ী; গোচর্ম্ম নির্ম্মিত জুতা অপেক্ষা অধিক মজবুত।

ভাঁজ করা চোখের ঠুলি

মোটর চালাইবার সময় চক্ষু ধূলি ও বায়ু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার সাধারণ ঠুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাতে চালকদিগের বড়ই অসুবিধা হয়। এই জন্য

হাঙ্গরের চামড়ার কারখানা। এই কারখানায় প্রত্যহ ২ শত চামড়া প্রস্তুত হইতেছে।

সংপ্রতি জনৈক ইংরাজ শিল্পী ভাঁজ করা এক প্রকার নূতন নয়নাবগুণ্ঠন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা কাচ-নির্ম্মিত নহে। সেলুলয়েডের সাহায্যে এই চশমার মত আবরণ প্রস্তুত করিয়া তিনি চালকদিগের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই ঠুলি নাকের উপর বেশ সহজভাবে লাগিয়া থাকে, চালকের টুপীর সহিত উহা এমনই ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, ইচ্ছা করিলে উহাকে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়।

পকেটে রাখা লিখন-যন্ত্র

জনৈক শিল্পী অতি ক্ষুদ্রাকার 'টাইপরাইটার' বা লিখন-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা এত ছোট যে, পকেটে অনায়াসে রাখা যায়। এত ছোট লিখন-যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আর নির্ম্মিত হয় নাই। সাধারণ আকারের বড় চিঠির কাগজ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া যন্ত্রটিকে বামহাতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে সহজে লিখিতে পারা যায়। বড় যন্ত্রে যেরূপ লিখা হয়, ইহাতেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

গঁদের গলফ্ খেলিবার জুতা

ইদানীং গলফ্ ক্রীড়ার জন্য রবারের তলার পরিবর্ত্তে গঁদের আটা হইতে জুতার তলা নির্ম্মিত হইতেছে। উহা পোনে এক ইঞ্চ পুরু। এই জুতা বেশ মজবুত, হাল্কা ও নমনীয়। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারেও উহা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বিজ্ঞানবলে সবই সম্ভবপর।

হাঙ্গরের চামড়ার বুট জুতা: বামে, দক্ষিণে গোচর্ম্ম নির্ম্মিত বুট জুতা। উভয় জুতা গত ৯০ দিন ব্যবহারের পর প্রদর্শিত।

বাজীখেলার মোটরগাড়ী

প্রতিযোগিতায় বাজী জিতিবার উদ্দেশ্যে সংপ্রতি আমেরিকায় এক জনের চড়িবার উপযোগী মোটরগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ীর নির্ম্মাতা অবিলম্বে সাধারণের সম্মুখে গাড়ীচড়ার পরীক্ষা দিবেন। এ পর্য্যন্ত বাজীখেলার জন্য যত প্রকার হাল্কা মোটর নির্ম্মিত হইয়াছে, আলোচ্য গাড়ী তাহাদের অপেক্ষা ৪ শত পাউণ্ড বা প্রায় ৫ মণ ওজনে কম। এই গাড়ী ঘণ্টায় ১ শত ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিবে

[illegible]

[illegible]

চোরা হাত

সভ্যতাবৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চুরী, জুয়াচুরী, জাল, বাটপাড়ী প্রভৃতি নানা অসৎ কার্য্যেরও বিজ্ঞানসম্মত উন্নতি ঘটিতেছে। নিউইয়র্কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চুরীর প্রাচুর্য্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। দোকানে চুরীর সংখ্যা এমন বাড়িয়াছে যে, পুলিস সে জন্য ব্যতিব্যস্ত। অনেকে ভদ্রমহিলার বেশে হীরা জহরতের দোকানে গিয়া কৌশলে মহামূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আনে। এ জন্য তাহারা কৃত্রিম হস্তও ব্যবহার করিয়া থাকে। পোষাকের নীচে আসল একখানি হাত এমন ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে, বাহির হইতে বুঝা যায় না, তাহার তৃতীয় হস্ত আছে; দোকানে গিয়া নানাবিধ দ্রব্য দেখিবার সময়, বস্ত্রান্তরাল হইতে আসল একখানি হাত বাহির হইয়া যাহা কিছু পায়, অপহরণ করে। পুলিস উপায়ান্তর না দেখিয়া দাগী চোরকে কোনও দোকানের কাছে দেখিলেই ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

রজ্জুনির্ম্মিত বিচিত্র ল্যাম্প

সংপ্রতি ডেট্রয় থিয়েটার-কোম্পানীর রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ রজ্জু হইতে এক বিচিত্র দীপাধার প্রস্তুত করিয়াছেন। সোনালীরজ্জু উহার সমগ্র উপাদান। সূক্ষ্ম রজ্জুর জালের দ্বারা উপরের ঢাকনী নির্ম্মিত। দীপাধারের নিম্ন-ভাগে ফুল দিয়া সুদৃশ্য করিবার জন্য একটি ঝুড়িও সমাবিষ্ট করা হইয়াছে। এই দীপাধারটি বাস্তবিকই অতি বিচিত্র-দর্শন।

বাজীর জন্য নূতন মোটরগাড়ী
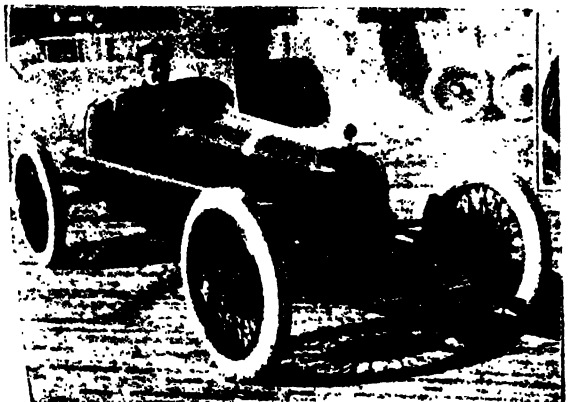
বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় শব রক্ষা

প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা মৃতদেহ রক্ষাকল্পে মোম ও নানা প্রকার মসলা ব্যবহার করিত। তাহাতে দেহ বিকৃত হইত না। জনৈক বৈজ্ঞানিক বহু বৎসর ধরিয়া তড়িৎশক্তির সাহায্যে মৃতদেহকে অবিকৃত রাখিবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা, সে সাধনা জয়যুক্ত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহকে মিশরের 'মমি'র অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারা যাইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস। উদ্ভাবনকারী স্বব্যয়ে যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা দেখিতে শবাধারের ন্যায়। এই আধারমধ্যে একটি কক্ষ আছে। কক্ষমধ্যে একটি তাম্র-নির্ম্মিত টেবল, উহার উপর শব শায়িত করা হয়। টেবল ও মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত। তড়িৎশক্তির প্রবাহ দেহমধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেহমধ্যস্থ জীবাণুসমূহকে ধ্বংস করিয়া (Sterilize) ফেলা হয়। দেহের জলীয়-ভাগও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

তড়িৎ-নির্ম্মিত শবাধার।

বৈদ্যুতিক উপায়ে অবিকৃতভাবে শব রক্ষা

নূতন প্রণালীতে ঝুড়ির ফুলগাছে জল দেওয়া
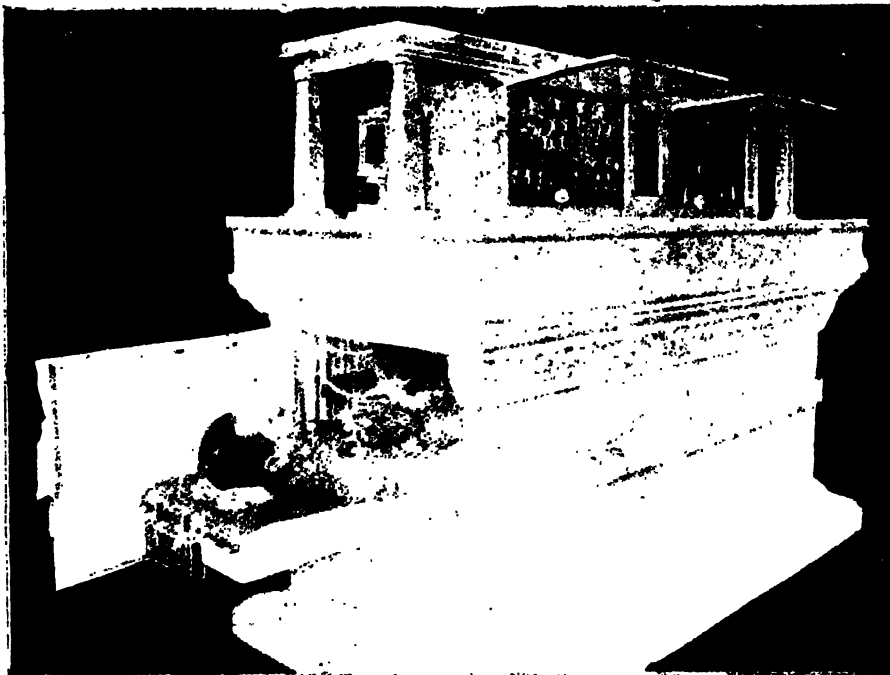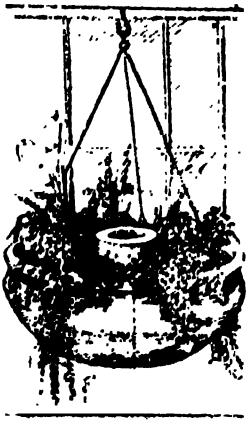
উদ্ভাবনকারী প্রথমতঃ মৃত কুকুর ও বিড়ালের দেহ লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন। অবশেষে বন্দুকের গুলীতে নিহত একটি মৃতদেহ লইয়াও তিনি পরীক্ষা করেন। মনুষ্যদেহের উপর উল্লিখিত পরীক্ষার সময় বহু অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অভিনব প্রণালীতে মৃতদেহ রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। উক্ত মৃতদেহের ওজন পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও দৈহিক কোনও প্রকার বিকৃতি হয় নাই।

দোদুল্যমান ফুলের টব

অনেকে ঘরের মধ্যে দোলান ফুলের টব বা ঝুড়ি রাখিতে চাহেন না। কারণ, উহা নামাইয়া জল দিতে হয়; অথবা সেই অবস্থায় জল ঢালিয়া দিলে, চোয়াইয়া জল পড়িয়া ভূমিতল সিক্ত করিয়া বিশ্রী করিয়া তুলে, সে জন্য নীচে অন্য কোন পাত্র রাখিতে হয়। এই সকল অসুবিধা হয় বলিয়া অনেকে ঘরের মধ্যে ও সকল হাঙ্গামা করিতে চাহেন না। উটা নগরে মিঃ গডন নামক এক ব্যক্তি এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ফুলগাছের ঝুড়ির মধ্যস্থলে যদি একটা সূক্ষ্মতম ছিদ্রবিশিষ্ট (Porous) একদিকে বন্ধ করা কোন গোলাকার পাত্র (যেমন বিদ্যুৎ ব্যাটারীর গোলাকৃতি পাত্র) স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে এই অসুবিধা আর থাকে না। উহাতে একবার জল ঢালিয়া দিলে কয়েকদিন আর জল দিবার প্রয়োজন হয় না। উক্ত পাত্রস্থিত জল, সূক্ষ্মতম ছিদ্রপথে অতি ধীরে ধীরে নির্গত হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ পুষ্পবৃক্ষকে রসযুক্ত করিয়া রাখে। চোয়াইয়া জল পড়িয়া কক্ষতল মলিনও হয় না। এই উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় আর একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে যে, ইহাতে গাছপালা বেশ সুস্থ ও সবল থাকে।

কাঁটার হাতা

কুইবেকের জনৈক কৃষি-ব্যবসায়ী ভারী পাথর বা কাষ্ঠ সহজে উত্তোলন করিবার জন্য এক প্রকার কাঁটাবিশিষ্ট হাতা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের হাতা দুই ফুট দীর্ঘ। উহার সাহায্যে নত না হইয়া ভারী কাষ্ঠ ও প্রস্তর অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায়। কাষ্ঠ বা প্রস্তরটিকে শক্ত করিয়া ধরিবার জন্য কাঁটার মুখের কাছে পেঁচ আছে। উহা প্রয়োজনানুসারে ছোট বড় করা যায়।

রোগীর ব্যবহার্য্য যষ্টি চেয়ার ও ক্রচ

আইওয়া নগরে জনৈক শিল্পী এক প্রকার অভিনব চেয়ার ও ক্রচ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, ব্যবহারকারী প্রয়োজনমত ক্রচটিকে চেয়ারে পরিণত করিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। সমগ্র ক্রচটির ওজন মাত্র

নূতন যন্ত্রের সাহায্যে ভারী কাষ্ঠ ও প্রস্তর স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

দেড়াই পাউণ্ড বা একসেরের কিছু বেশী। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ক্রচটিকে চেয়ারে পরিণত করা যায়। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে, রোগী অনায়াসে চেয়ার বিস্তৃত করিয়া বিশ্রাম করিয়া লইতে পারেন।

ক্রচ চেয়ার ও ক্রচ।

মরুভূমি জয়

সাহারা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া চিররহস্যময়ী নগরী টিম্বক্টুতে উপনীত হওয়া এতদিন দুঃসাধ্য ব্যাপারই ছিল। প্রাচীনকালের আরব দাস বিপণিক্ষেত্র টিম্বকটু হইতে বহু শতাব্দীর মধ্যে কোনও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। দুস্তর মরুসমুদ্র সাহারার দক্ষিণ-প্রান্তবর্ত্তী উল্লিখিত স্থান সম্বন্ধে কবি ও ঔপন্যাসিক কত গল্পই রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদিন পরে বিগত জানুয়ারী মাসে রহস্যময়ী নগরীর সকল রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'গ্রাফিক' পত্রে মেজর গর্ডন হোম্ সাহারা জয়ের একটি বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। উহা পাঠে জানা যায় যে, ফরাসী বিমানবিহারী দলে মিঃ আদোয়ে ডুব্রে যখন লেফটেনাণ্ট ছিলেন, সেই সময় সাহারা মরুসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার কল্পনা তাঁহার মানসপটে সমুদিত হয়। তিনি তাঁহার সঙ্কল্পের কথা ফরাসী মোটর কোম্পানীর পরিচালক মিঃ সিট্রোন্‌কে প্রকাশ করিয়া বলেন। মিঃ ডুব্রের প্ররোচনায় ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া মিঃ সিট্রোন্ মরুসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী মোটরগাড়ী নির্ম্মাণে অবহিত হয়েন।

তাহার পর মরুভূমি বিজয়ের একটি দল গঠিত হয়। এই দলে আট জন লোক ছিলেন। সিট্রোন মোটর কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টার মঁসিয়ে হার্ট, বিমানপোত বিভাগের প্রতিনিধি মঁসিয়ে ডুব্রে, এক জন ফটোগ্রাফার, এক জন বৈজ্ঞানিক এবং চারি জন মিস্ত্রী। দশ ঘোড়ার

প্রথম ওয়েসিস বা মরু-উদ্যানে যাত্রিগণের আনন্দ-ভোজ।

শক্তি-বিশিষ্ট চারিখানি মোটরগাড়ীতে চড়িয়া তাঁহারা মরু-যাত্রা করেন। বালুকারাশি যাহাতে গাড়ীর চাকা অথবা কল নষ্ট না করিয়া ফেলিতে পারে, তেমনভাবে মোটরগুলিকে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। এই মোটরগুলির গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ মাইল ছিল। গাড়ীর মধ্যে যাত্রিগণ তৈল, পানীয়

[illegible] চলিয়াছে।

জল ও আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। সাহারার মধ্যস্থলই অতি ভীষণ। সীমাহীন মরু-প্রান্তরে কোনও আশ্রয়স্থল নাই, পানীয়জল নাই। এই স্থান উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহারা বিশেষ সাবধানতা ও বিচক্ষণতাসহকারে আহার্য্য ও পানীয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাত্রীরা আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে অস্ত্রাদিও লইয়াছিলেন। বন্য মরুদস্যুর আক্রমণের আশঙ্কা খুবই ছিল।

দুই হাজার মাইল পথ তাঁহারা ২৯ দিনে অতিক্রম করিয়াছিলেন। উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যাহারা মরুক্ষেত্র পার হয়, অতি দ্রুত চলিলেও তাহারা ৩ মাসের পূর্বে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। এতদিন উষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোনও যানবাহন ছিল না। এখন নিরাপদে মরুপারে যাইবার উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় সব অসুবিধা চিরদিনের জন্য দূরীভূত হইয়া গেল।

সাধনা

আঁধারে মিলায়ে আলো, নাহি নাহি ভয়
সম্মুখে সম্মুখে চল, হবে হবে জয়।
শতাব্দীর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে আলো
নিভেছে প্রদীপ, তবে সেই দীপ জ্বালো
আবার! মানবতা মুক্তি সত্য প্রীতি
লক্ষ্য করি' চল সবে। মহান্ সে নীতি
জীবনে সফল কর। বিদ্বেষ ঘুচিবে
জাতির পার্থক্য সব সে দিন মুছিবে।
ভবিষ্যত পানে রাখি' লক্ষ্য তব স্থির
দিবানিশি আগে চল। এই ধরণীর
বিপুল উষার বুকে স্বরগ নামিবে,
যে দিন প্রেমের হাতে সংগ্রাম থামিবে
এ ধরায়। স্থির হিয়া সে দিনের লাগি'
নিষ্কম্প প্রদীপ প্রায় রহ রহ জাগি'!

হুমায়ুন কবির।

মিলন-রাত্রি

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

একে ত দুই ম্যাজিষ্ট্রেটে প্রকৃতিগত মিল বেশী ছিল না; দ্বিতীয়তঃ,—এ দেশে আসিয়া স্বার্থবুদ্ধিপূর্ণ আবহাওয়ার এ ভিন্ন-প্রকৃতির ইংরাজও ক্রমশঃ যেরূপ বেমালুম এক হইয়া পড়েন, এরূপ রূপান্তরিত হইবার সুযোগও মিঃ রো এ পর্য্যন্ত পায়েন নাই। ইনি নবাগত I. C. S. অল্পদিন-মাত্র ভারতবর্ষের মাটীতে পা দিয়াছেন এবং মিঃ ক্রাউডেনের অধীনে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করায় মহত্তর আদর্শেরই ছাপ ইঁহার মনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

অতএব মিঃ রো ভারতবাসীকে এখনও মিথ্যাবাদী, অসভ্য, বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করেন না; বাঙ্গালী যে কেহ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সংস্রবে আসে,—তাহাকে মনুষ্যোচিত ব্যবহারদানেই সম্মানিত করেন। বিচার সম্বন্ধেও বৃটিশ প্রেষ্টিজ—ইনি রক্ষা করিয়াছেন, ইনি নিরপেক্ষ বিচারক। পুলিস ইঁহাকে ভয় করে—তাহার সাজান মামলা-মোকদ্দমা ইঁহার নিকট আসিলে প্রায়ই ফাঁসিয়া যায়। সর্ব্বোপরি—ম্যাজিষ্ট্রেটের সুনাম—ইঁহার ভৃত্যবর্গ প্রভুর ভয়ে গরীবদের নিকট হইতে অযথা ভেট আদায় করিতে অর্থাৎ ঘুষ লইতে সাহস পায় না।

আসল কথা এই, মিঃ রো যদি জানিতে পারিতেন, তাঁহার কোন ভৃত্য ঘুষ লইয়াছে, তবে সে ক্ষমা পাইত না। বাহুল্যভয়ে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

সে দিন মিসেস্ রো তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না—মিঃ রো প্রাতঃকালে একাকী অশ্বারোহণে নিকটস্থ একটি গ্রাম্যস্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময় দেখিলেন—এক জন স্ত্রীলোক মাঠের ধারের অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে। সে ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেব'কেই অভিশাপ প্রদান করিতেছিল। তাহার পাশে দুই চারিখানা আখের গোছা পড়িয়া ছিল এবং নিকটে এক জন মুসলমান চাষী দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রবোধদান করিতেছিল। সেখানে আসিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাঁদে কেন স্ত্রীলোকটি, কি হয়েছে ওর?"

চাষী বলিল, "এজ্ঞে, ম্যাজিষ্টরের চাকর এসে—এ মাই-যের আখ দু'চারখান লই গেছে—"

স্ত্রীলোকটি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"দু'চারখান? মুই ত দু'চারখান আপনা হতেই তানারে দিছিনু—বেটা জোর করি আধেকের বেশী লইল, ঐ দেখ্ ক'খানই বা আছে মোর? আজ ছেলেগুলো আর খাইতে পাবে না, আখ বেচিই চাল মিলত হায় রে কপাল?" বলিয়া সে শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।

মিঃ রো বলিলেন—"আমিই সেই ম্যাজিষ্টর,—চল আমার সঙ্গে, কে আখ কেড়ে নিয়েছে দেখিয়ে দাও, তোমার আখের দাম তার কাছ থেকে তোমাকে দিইয়ে দেব।"

"আপুনি ম্যাজিষ্টর" এই কথা বলিয়া চাষী অবনত-মস্তকে সেলাম করিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল—"চ রে—আমিনা চল, তোর ভাগ্যি ফির্‌লো। মাঠের ফসল দু'চার-খানা সরকারকেও দিতে হয় বই কি—অ্যাতে এতুই কান্না-কাটি কেন করিস্?"

আমিনা কিন্তু কষ্টে দুঃখে নিতান্ত জ্বলিয়া আছে, সে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাক্যে আশ্বস্ত হইল না, তাঁহাকে সেলামও করিল না,—তাঁহার ভাল কথার উত্তরে রুক্ষস্বরেই বলিল—"না গো, সাহেব, মুই যা'ব না—এই কখানা আছে,—নাও গো নাও,—মুই ঘরকে চন্নু।"

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চাষী বলিল—"আরে—হতভাগ্যি,—সরকার তোর ভাল কর্‌বে—"

স্ত্রীলোক রাগিয়া বলিল—"ভাল কর্‌বে—মুইদের ভাল করে না—কেউ! মোর খসম যহন বাঁচি ছিল—তহন ম্যাজিষ্টরকে দুঃখের কথা কইতে গিয়ে কি মারটাই খাইছিল

সে! মরি রে মরি—দম ফাটি উঠে। মুই যাব না, ওদের দরবারে,—মসীবে যা লেগ্‌ছেন আল্লা—তাই হ'বে।" স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া মিঃ রো নিকটে আসিয়া তাহার হাতে ১০ টাকার একখানা নোট দিলেন। সে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তিনি অশ্ব ছুটাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, পরে তদন্তের ফলে সে সিপাহীর দোষ প্রমাণিত হইল—তাহাকে পদচ্যুত করিলেন।

পরদিন কলিকাতার ডাক্তার আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে শরৎকুমারের কথা জানাইলেন। রাজার সহিত তিনি বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত শুনিয়া ডাক্তার 'সাহেব' সংশয়চিত্ত হইয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—"আমি রাজাকে যত-দূর জানি—তাহাতে এ কথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ রাজাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় ইহাও সুজন রায়ের একটা চাল।"

ডাক্তার অতুলেশ্বরকে পূর্ব্বে চিকিৎসা করিতে আসিয়া সুজন রায়ের বিদ্বেষ-প্রসূত অনেক ঘটনার কথাই শুনিয়া ছিলেন, এই প্রসঙ্গে সে গল্পও দুই একটা তিনি করিলেন। মিঃ রো শরৎকুমারকে সুনয়নে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে দোষী মনে করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না, ডাক্তারের মুখে তাঁহার ইচ্ছার পোষকবাক্য তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াই শুনিলেন।

যথাসময়ে দুই জন কনষ্টেবল শরৎকুমারকে মিঃ রোর বাঙ্গালায় আনিয়া হাজির করিল। রোগীকে দেখিয়া আসিয়া দুই ডাক্তারে—consultation করিতে বসিলেন। শরৎকুমার বলিলেন, "একখানা অতি ক্ষুদ্র ভাঙ্গা হাড়ের কুচি এখনো ভিতরে আছে বলিয়া মনে হয়—সেটুকু বাহির করিয়া দিলেই রোগী আরাম হইয়া যাইবেন।"

শরৎকুমারের কথায় ডাক্তার আর একবার রোগীর পা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং তাঁহার মীমাংসাই ঠিক বুঝিয়া একটু অপ্রতিভভাবে কহিলেন—"অন্য ডাক্তারের উপর বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকাটাই দেখছি আমার ভুল হয়েছে। আর একবার তা হ'লে অপারেসনই না করলে চলবে না, দেখছি।"

শরৎকুমার বলিলেন—"সামান্য operation, তাতে ভয়-ভাবনার কোনই কারণ নেই।"

সেই দিনই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা মিলিয়া রোগীর ক্ষতস্থান হইতে যথানিয়মে ভাঙ্গা হাড়ের কুচি বাহির করিয়া দিলেন operation বেশ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল। ডাক্তার তখ. রোগীর তত্ত্বাবধান-ভার শরৎকুমারের উপর দিয়া অপরাহ্নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় মিঃ রো বলিয়া গেলেন—"এবার রোগী শীঘ্রই আরাম হ'য়ে উঠবেন, সম্ভবতঃ আমাকেও আর আস্‌তে হবে না। তবে যদি দরকার হয়—শরৎকুমার জানালেই আমি আস্‌ব।" প্রকৃতই অন্য কোন ডাক্তারকে আর ডাকিতে হইল না। শরৎকুমারের চিকিৎসায় রোগী এক সপ্তাহের মধ্যেই অল্প-স্বল্প নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষত স্থানের আঘাত বেদনা এমন বেমালুমভাবে মিলাইয়া গেল যে, পা ভাঙ্গিয়া এক দিন যে মিসেস্ রো অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন—তাহা স্মৃতির বিষয় মাত্রই হইয়া রহিল।

বলা বাহুল্য, মিঃ মন্‌রোর সতর্কতা সত্ত্বেও, এই চিকিৎসাসূত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতির সহিত শরৎকুমারের গভীর বন্ধুত্ব জন্মিল। বন্দীর সাজ-সজ্জা ফুঁড়িয়া—ভিতরকার আসল মানুষটি তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িল। শরৎকুমার যে নির্দ্দোষ, তাহাতেও তাঁহাদের সংশয়মাত্র রহিল না।

ইংরাজের আর যত দোষই থাকুক, সাধারণতঃ ইংরাজ গুণের বশ। একান্ত স্বার্থান্ধ না হইলে শত্রুর মনুষ্যত্বকেও শ্রদ্ধা না করিয়া ইংরাজ থাকিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই, অবস্থাচক্রে এ দেশের মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যই সচরাচর তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়ে।

যে দিন শরৎকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন যে, তাঁহার আর রোগীকে দেখিতে আসিবার দরকার নাই, সেই দিন 'সাহেব' মেম দুই জনেই দুঃখ অনুভব করিলেন। বিদায়দানের সময় মিঃ রো তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি?"

শরৎকুমার একটু ভাবিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়ই পারেন—কিন্তু জানি না, সে প্রার্থনা করা আমার পক্ষে ঠিক হবে কি না?"

মিসেস্ রো অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "বড়ই দুঃখ যে আমার স্বামী আপনাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। কেন না, আপনি যখন অভিযুক্ত তখন বিচার পর্য্যন্ত আপনাকে

লে থাকতেই হবে। তবে আমার ধ্রুব বিশ্বাস —বিচারে আপনি নিশ্চয়ই দোষমুক্ত প্রমাণিত হবেন।"

শরৎকুমার বলিলেন—"না, এরূপ অসম্ভব প্রার্থনার ইচ্ছা আমার মনে আসে নাই। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেব' অনুমতি দেন—তা হ'লে রাজাবাহাদুর যে কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত, টেলিগ্রাম ক'রে ক্লাউডেন 'সাহেবকে' আমি সে কথা জানাই। তিনি এখন পার্লামেণ্ট সভার একজন আইরিস মেম্বর, তাঁর উদ্যোগে রাজাবাহাদুর নিষ্কৃতি পেতে পারেন।"

ইতঃপূর্ব্বে পাঠককে জানান হয় নাই যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় মিঃ ক্লাউডেন কর্ম্মত্যাগ করেন এবং দেশে গিয়া পার্লামেণ্টের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েন।

রাজা ইতঃপূর্ব্বেই বন্দী হইয়া প্রসাদপুরে আনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপায় তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ থাকিতে হয় নাই, বিচার শেষ পর্য্যন্ত প্রসাদপুর রাজবাড়ীতেই তিনি interned হইয়া ছিলেন।

মিসেস্ রো আহ্লাদিতচিত্তে কহিলেন—"আচ্ছা আমি নিজেই এ খবর তাঁকে টেলিগ্রামে জানাব এবং চিঠিতেও লিখব। তিনি আমার cousin হন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শরৎকুমার ইহার পর শান্ত সমাহিতচিত্তে জেলে ফিরিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার জন্য আর কিছু করিতে না পারুন—নির্জ্জন কারাবাস হইতে সাধারণ জেলখানায় তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন এবং অন্য কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে হাঁসপাতালের কার্য্যভার তাঁহাকে দেওয়া হইল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা অতুলেশ্বর যে বিদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত, প্রসঙ্গক্রমে ইতঃপূর্ব্বেই পাঠক তাহা জানিয়াছেন; কিন্তু রাজার নিকট এই অভিযোগ-সংবাদ কিরূপে পৌছিল? সে বিবরণ এই পরিচ্ছেদে জানিতে পারিবেন।

হ্রদের ধারে ঘাটের বাঁধান চাতালের উপর কোমল আস্তরণ বিস্তৃত। মর্ম্মরাসনে রাজা সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই একাকী আসিয়া বসিয়াছেন। হাসি ও তাহার মা এবং দিদিমার সহিত রাজকন্যা বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, শ্যামাচরণও তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন।

চন্দ্রহীন রাত্রি, তারকা-ভূষিত আকাশচ্ছটায় কানন-হ্রদের স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডিতরূপ মূর্ত্তিমতী একখানি মায়া-রাগিণীর মত রাজার নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সুরলহরীর সেই চিত্রার্পিত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া মনের কোণে হারান গানের দুইটী ছত্র তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—

মুরলী কি বীণা —
আহা মরি কি বাজিল তা' ত জানি না!

সহসা মৃদুমন্দ শীত বাতাসে তালপত্রাবলী হইতে মর্ম্মর গীতি উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন এক সুরসিক অদৃশ্য জল-দেবতা, বাঁধা নৌকাখানাকে নৃত্যভঙ্গে দুলাইয়া দিয়া, পুষ্পগন্ধ উড়াইয়া লইয়া রাজার মুখে সকৌতুকে একটা ঝাপটা মারিয়া গেল।

একি! হাসি আসিল নাকি? ঠিক তাহারই অঙ্গবসনের সুবাস এ যে! রাজা আশে পাশে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, তিনি একাকী। একটা মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল — হাসির সে দিনের সেই শেষ কথা—"আপনি যে রাজা।"

সত্যই ত! ঠিকই ত! এই সামান্য একটি কথায় তাহার মনের সব কথাই কি সুন্দররূপে সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। সে যে নিতান্ত বালিকা, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা — কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে হাসি যে তাঁহার পুত্রবধূ হইতে পারিত। স্বল্পবয়স্কা এই বালিকার পক্ষে তিনি রাজা ছাড়া আর কি হইতে পারেন—কিছুই না—কেহই না।

তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল; "এ কি অসংযম! চিরদিন যে কাম নিন্দনীয় ভাবিয়াছ, আজ কি ভুলে নিজেই সেই ভুল করিতে প্রবৃত্ত—ছি ছি!"

রাজা চক্ষু খুলিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; জ্যোতির্ম্মণ্ডলীও যেন একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"হইতেই পারে না, ইহা হইতেই পারে না—তোমার মধ্যে যতক্ষণ এতটুকুও মনুষ্যত্ব আছে,— ততক্ষণ ইহা হইতেই পারে না।"

রাজা এইবার একটু হাসিলেন—হাসিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"ভিখারীর শূন্য ঝোলা তবে তোমাই

থাক। সে দিন এ গানটি যে গেয়েছিল, সে ঠিকই ইঙ্গিত করেছিল। পাশে ভৃত্য তাঁহার সেতারটি রাখিয়া গিয়াছিল—তিনি বাজাইয়া গান ধরিলেন; বিস্মৃতপ্রায় গানটির অনেকগুলি কলি হঠাৎ তাঁহার মনে আসিয়া পড়িল—

মুরলী কি বীণা!
আহা মরি কি বাজিল তা' ত জানি না!
সুধাঝরা সুরে সুরে, মনোপ্রাণ গেল পূরে?
যখন থামিল তান জাগিল চেতনা।
কে পথিক এসেছিল কোন পথ দিয়ে?
দূরে না দাঁড়ায়ে কাছে গেল বাজাইয়ে?
কোন ত সন্ধান তার খুঁজে না মিলিল আর
রেখে ত গেল না মরি একটুকু চিনা!

সপ্তর্ষি এক পাশ হইতে ঘুরিয়া অন্য পাশে গেল, ওরায়েন মাথার উপর চড়িল, সন্ধ্যা তারা ঢলিয়া পড়িল, রাজা এক মনে গাহিতে লাগিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী কিছুক্ষণ হইতে পিঠের দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গানের শেষ কলি হইতে রাজা যখন প্রথম কলিতে ফিরিয়া আসিয়া শম রক্ষা করিলেন—তখন রাণীও তাঁহার পিঠে হাত রাখিল। রাজা সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে রাণি? আয়, বোস্, কখন ফিরলি? কেমন দেখলি?"

"এইমাত্র ফিরেছি? বেশ দেখলুম, বাবা! তুমি ত গেলে না! রাত হয়ে গেছে—এখন খেতে চল—বাবুয়া!" বাবুয়া রাণীর আদুরে ডাক।

সেতারটা পাশে রাখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাসি কি এসেছেন?"

রাণী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল,—"না, তাঁরা সবাই বাড়ী গেলেন। আমি আর হাসিকে আন্‌বার কথা বল্‌তে পারলুম না, আন্‌লেই ভাল হোত—না?"

রাজা কচি মেয়েটির মত তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—"আনিস্‌নি ভালই হয়েছে, রাত হয়ে গেছে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার চোখের উপর তাহার হাসিমাখা চোখের উজ্জ্বলা ঢালিয়া বলিল,—"বাবা! একটা কথা বল্‌ব?"

রাজা আন্দাজে বুঝিলেন—কি কথা; একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বল্‌তে পারিস্।"

"ঠাকুরমাকে কবে আস্‌তে বল্‌ব, বাবা? হাসির মা এই ফাল্গুনে দিন ফেলেছেন।"

রাজা কন্যার গালে একটি মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন,—"আরে পাগলি,—তোরা তোদের নিজের মর্য্যাদা ভুলে যাস্, কিন্তু আমরা সে ভুল্‌তে পারিনে। হাসির সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব, সে আমার কন্যাতুল্য।"

রাজকুমারী এতদিন ধরিয়া মনে মনে যে কল্পনা-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সহসা তাহা চূরমার হইয়া গেল। মর্ম্মাহত হইয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন,—"তুমি এই রকম ভাবে কথা কচ্ছ, যেন বয়সে তোমাদের দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যি ত আর তা নয়—তোমার আর এমনি কি বয়স, বাবা! তোমাদের বিয়েটা কিছুতেই অশোভন হবে না। তোমার এই অস্বীকারে স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না; তুমি যে নিজেকে কি রকম খাট ক'রে দেখছ, তাই শুধু বোঝা যাচ্ছে। তোমার মত স্বামিলাভ কি সৌভাগ্যের বিষয় নয়;—তাঁরা ত সকলেই তোমার জন্য হা-প্রত্যাশ ক'রে আছেন।"

রাজা বলিলেন,—"কি যে বলিস্, পাগলি, কখনই না, কখনই না, আমি জানি তা ঠিক নয়। সকলে আমার জন্য হা-প্রত্যাশ ক'রে আছেন—কি যে অদ্ভুত কথা!"

জ্যোতির্ম্ময়ী ইহার অর্থ বুঝিলেন,—বুঝিয়া বলিলেন,—"আমি ঠিক বল্‌ছি, বাবা, সব্বাই তোমাকে চায়"—'সব্বাই' কথাটার উপর তিনি খুব জোর দিলেন।

"তুমি যদি এখন পিছোতে চাও ত খুবই আশাভঙ্গ হবে, সকলেরই। রাজি হও, বাবা, বৃথা কাল্পনিক কারণে অমত কোরো না। বাবুয়া লক্ষ্মীট!"

তিনি তাঁহার গলা ধরিয়া ছল ছল নয়নে প্রাণভরা অনুনয় বাক্যে এই কথা বলিলেন। রাজার মন গলিল, কিন্তু প্রাণ টলিল না। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিল,—তাহা তিনি তবুও ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ়স্বরেই বলিলেন,—

আচ্ছা, সে কথা হবে এখন রাণু,—পরে হবে—খেতে এখন, দেরী হ'য়ে গেছে।"

তাঁহার এমন অনুরোধও রাজার প্রাণস্পর্শ করিল না; অভিমানিনী কন্যা নীরব হইয়া রহিলেন।

রাত্রিকালে রাজা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—নৌকা চলিতেছে, মাঝি নাই, দাঁড়ি নাই, অকূল সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। যাত্রী তাঁহারা দুই জন;—তিনি ও হাসি। কাছাকাছি পাশাপাশি তাঁহারা বসিয়া—তবুও যেন কত দূরে, কত তফাতে। দৃষ্টির ব্যবধান নাই, কিন্তু কাহারও কথা শুনা যায় না, স্পর্শও মিলে না। হাসি নৌকার এমন ধারে বসিয়াছিল যে, প্রতিক্ষণে তাঁহার ভয় হইতেছিল, এখনই সে জলে পড়িবে; তিনি তাহাকে সাবধান করিতে চাহেন, কিন্তু ভাষা কণ্ঠস্ফুট হইতে অসমর্থ, ইচ্ছা তিনি তাহাকে সরাইয়া বসান, কিন্তু পদ অচল—কি যে অব্যক্ত গভীর যন্ত্রণা! সহসা হাসি জলে পড়িয়া গেল—তিনিও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহার দেহ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া তীরভূমিতে উঠিলেন। কিন্তু এ—কে? এ ত হাসি নয়। এ যে রাণীর শবদেহ তিনি স্কন্ধে ধারণ করিয়া আছেন! তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগিয়া মুক্তির আনন্দলাভ করিলেন,—স্বপ্ন—স্বপ্ন—তিনি শুধু স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—এ সত্য ঘটনা নয়!

উঠিয়া দেখিলেন, আজ সূর্য্য ওঠে নাই—অন্ধকার প্রাতঃকাল!

দ্বিপ্রহরের পর সেই দিন অনাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। অনাদিকে একাকী দেখিয়া প্রথমটা তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন,—পরে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, মিসেস্ রো'কে দেখিবার জন্য ডাক্তারকে তিনি লিখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর বল দেখি? সে কাজের জন্য গেলে, তার কি হোল? ডাক্তার কি মিসেস রো'কে চিকিৎসা করার জন্য সেখানে রয়ে গেলেন?"

অনাদি শুষ্ককণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া রাজার এতগুলা কথার উত্তরে শুধু বলিল,—"ডাক্তারদা পুলিসের হাতে বন্দী হয়েছেন।"

রাজা যেন হঠাৎ চারিদিক্ শূন্য দেখিলেন,—তাঁহারও মুখে আর কোন কথা ফুটিল না, যন্ত্রের মত কিছু পরে বলিলেন,—"তার পর?"

ইহার কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই হরকরা আসিয়া নমস্কার করিয়া রাজার হাতে একখানি কার্ড দিয়া বলিল, —"পুলিস 'সাহেব' দরজায় হাজির আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"পুলিস 'সাহেব'! আচ্ছা, আসতে বল!"

পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার-পত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"আপনি আমার বন্দী।"

"কি অপরাধে?"

"অপরাধ গুরু। রাজ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে আপনি অভিযুক্ত।"

অতুলেশ্বর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা।"

"সত্য মিথ্যা বিচার-সাপেক্ষ, এখন আপনি আমার বন্দী—আপনাকে প্রসাদপুরে যেতে হবে।

রাজা অভিযোগ পত্রখানা পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,— "বেশ; প্রস্তুত হ'য়ে নিচ্ছি। এখনি ত ট্রেণ নেই, আপনিও ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া ক'রে নিন।"

রাজা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় পাইলেন। পুলিস অতিথি, থানায় চলিয়া গেলে, তিনি অনাদিকে বলিলেন,—"তুমি এখনি মুখুয্যে-বাড়ী যাও, তাদের এ খবরটা জানিয়ে হাসি ও মুখুয্যে মশায়কে সঙ্গে নিয়ে এস।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

পুরী-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"আষাঢ় মাসে রথযাত্রা রথ-উল্টাটানি," এই ছড়া বলিয়া বাল্যকালে আমরা কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু সে কেবল কলিকাতার বাগবাজারের রথ অথবা শ্রীরামপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মাহেশের রথ দেখিয়া। পুরীর রথের অথবা তথাকার রথযাত্রা উৎসবের বিরাটত্ব আমরা তখন কল্পনার মধ্যেও আনিতে সমর্থ হইতাম না। পুরী ব্যতীত হিন্দুর আর কোন তীর্থস্থানে, রথযাত্রা ব্যতীত অপর কোন উৎসবে, একরূপ জনতাবাহুল্য, একরূপ কর্ম্ম-চাঞ্চল্য, ভক্তির একরূপ প্রবলোচ্ছ্বাস, দেবদর্শনের জন্য প্রাণের একরূপ ব্যাকুলতা দেখা যায় কি না সন্দেহ।

রথযাত্রা।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—রথারোহী শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দারিদ্র্য ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত মর্ত্ত্যধামে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী ভক্ত ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে এই সময়ে পুরীতে আগমন করেন। হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবমাত্রেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে; এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। যখন রেল হয় নাই, তখন লোক হাঁটাপথে অথবা কতকদূর জাহাজে চড়িয়া পুরীতে আসিত। এখন অধিকাংশ যাত্রীই রেলপথে পুরীতে আগমন করে। তবে অনেক দরিদ্র লোককে এবং সাধু-সন্ন্যাসীর দলকে এখনও পদব্রজে আসিতে দেখা যায়।

রথের সময় যাত্রী বহিবার জন্য রেল-কর্তৃপক্ষদিগকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ ট্রেন ব্যতীত দুই একখানি অতিরিক্ত ট্রেণের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীর বোঝা লইয়া একখানির পর আর একখানি ট্রেন সমস্ত দিনই পুরী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে কলেরা রোগ মহামারীরূপে পরিব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপন দিয়া যাত্রিগণকে সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতে সৌখীন যাত্রীর সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে কমিলেও বিশ্বাসী ভক্তের সংখ্যার বিশেষ হ্রাস হইতে দেখা যায় না। এই সময়ে পুরীর স্বাস্থ্যবিভাগ যাত্রীদিগের বাসস্থানগুলির পরিদর্শন এবং সেগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ রাখিবার জন্য সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যে সকল বাসায় যাত্রীরা অবস্থান করে, তাহাদিগকে লজিং হাউস (Lodging House) কহে এবং তাহার সমস্ত বিধিব্যবস্থা পরিচালন করিবার জন্য এক আইন প্রচলিত আছে। বহু যাত্রী একত্র এক গৃহে থাকিবার নিয়ম নাই। যে কোন গৃহে প্রত্যেক যাত্রীকে আইনমত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান দিতেই হইবে, নতুবা বাসাবাটীর অধিকারিগণকে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সাধারণতঃ পাণ্ডাগণই এই সকল বাসাবাড়ীর অধিকারী। তাহারা ষ্টেশন হইতে যাত্রিবর্গকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি জনকে তাহাদের নিজ নিজ বাটীতে স্থান দেয়। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীরই এই সকল বাসাবাটীতে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অন্যান্য উৎসব অপেক্ষা রথের সময়ে যাত্রীদিগের নিকট হইতে বেশী ভাড়া আদায় করা হয়; এমন কি, সময়ে সময়ে প্রত্যেক যাত্রীকে দৈনিক ৪।৫ টাকা হিসাবে ঘরভাড়া দিতে হয়। আমি যখন প্রথমে পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল বাসাবাটীর যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। ঘরগুলি প্রায় সবই চালাঘর, আয়তনে ক্ষুদ্র এবং গৃহগুলির মধ্যে আলোক ও বাতাসের বিশেষ অভাব বোধ হইয়াছিল। যথোচিত আলোক ও বায়ুসঞ্চালনের অভাবে ঘরের মেঝেও তাদৃশ শুষ্ক থাকিতে দেখি নাই। এখন বাসাবাড়ী সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পুরী সহরে কয়েকটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাত্রীদিগের থাকিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ্, মাড়োয়াড়ী-সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা, যাবতীয় সৎকার্য্যে অগ্রণী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ,

... সার্ হরিরাম গোয়েন্‌কা মহোদয় বহু অর্থ-ব্যয় ...য়া, শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে বড় রাস্তার উপরে একটি ...ল ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই ...রিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এই সুবৃহৎ ...বসম্পন্ন ধর্ম্মশালা স্বর্গগত রামচন্দ্র গোয়েন্‌কা মহা-...র নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশালায় যাত্রিগণ ...ড়া না দিয়া এককালে তিন দিবস অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

জল কত নির্ম্মল হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদুপরি অধিকাংশ লোকের আহার "আনন্দ-বাজার" হইতে ভাত, দাল ক্রয় করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে আবার পুরীতে মাছির বিষম উপদ্রব হইয়া থাকে এবং বাজারে খাদ্যদ্রব্যের উপর অসংখ্য মাছি বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় খাদ্য ও পানীয় যে বিবিধ সংক্রামক-রোগ-বীজ-দুষ্ট হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই অসম্ভব জনতার মধ্যে একটি
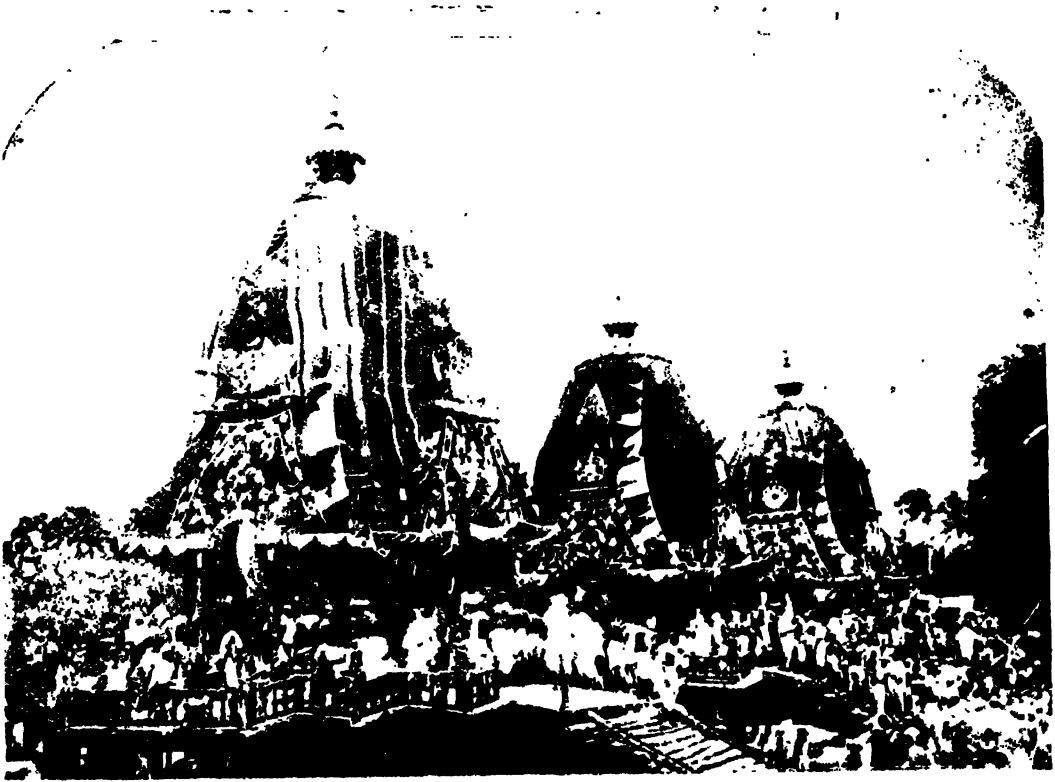
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

রথের সময়ে পুরীতে প্রায় প্রতি বৎসরই কলেরার বিষম প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। পুরী সহরের অভ্যন্তর-ভাগ মোটেই পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর নহে। রাস্তা-ঘাটে যেখানে সেখানে নানা প্রকার ময়লা ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায় এবং সহরবাসীদিগের কদভ্যাসের জন্য গৃহের আশ-পাশ ও যাতায়াতের পথ পরিষ্কার রাখা কঠিন হইয়া উঠে। পানীয় জলের জন্য এখানে সকলকেই কূপের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অপরিষ্কার সহরের কূপের

মাত্র কলেরা রোগ দেখা দিলে, রোগ-প্রতিষেধের সাধারণ নিয়ম বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে উক্ত রোগের সংক্রামক বীজ প্রচণ্ড অগ্নিশিখার ন্যায় শীঘ্র চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শত-শত যাত্রী ঠাকুর দেখিতে যাইয়া পুরীতেই দেহরক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে কলেরা রোগের চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু এত ভিড়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা

হওয়া বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। যাত্রীরা যদি বাজারে বিক্রীত অন্নের উপর নির্ভর না করে এবং পানীয় জল যদি যথারীতি সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা এই বিপদের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্ন গৃহে প্রস্তুত করিতে এবং পানীয় জল ফুটাইয়া লইতে মোটেই কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে, অথচ এই সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে কত বিপদ, কত ক্লেশ, কত অসুবিধা, কত মনস্তাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়! আশা করি, পুরীযাত্রিগণ এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া উপদেশমত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

রথের সময়ে পুরীতে যে কি অসম্ভব জনতা হয়, না দেখিলে তাহার ধারণা করা দুঃসাধ্য। স্নানযাত্রার পর শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ঠাকুররা রথে আরোহণ করেন। সেদিনকার জনতা এবং তাহার উৎসাহ ও চাঞ্চল্য বাস্তবিকই দেখিবার মত। কত দবদূরান্তর হইতে, কত ক্লেশ, অনাহার, অনিদ্রা সহ্য করিয়া, যাবজ্জীবন-সঞ্চিত অর্থনাশ করিয়া, আত্মীয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, শারীরিক ব্যাধি ও জরাজনিত যন্ত্রণা ও দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারী রথোপবিষ্ট দেবতাকে একটিবারমাত্র দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য রথের দিন পুরীতে সমাগত হইয়া থাকে। যদি ত্যাগই আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কোথায় দেখিতে পাইব? তাহার পর যখন মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া, "জয় জগন্নাথ" রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, তাহারা পথে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া দরদরিত ধারায় প্রবাহিত প্রেমাশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিতে থাকে, তখন সেই ভক্তি-উচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুর তীর্থ ব্যতীত বুঝি আর কোথাও এই পবিত্র দৃশ্য দেখিবার অবসর ঘটিবে না।

রথের দিন প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় এক ক্রোশব্যাপী সুবিস্তৃত রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। কাহার সাধ্য যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া এক পদ অগ্রসর হয়? রাস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত গৃহগুলির ছাত, আলিসা, বারান্দা, রোয়াক, দরজা, জানালা প্রভৃতি কেবল মনুষ্য-মূর্ত্তির দ্বারা পরিপূর্ণ। গৃহবাসিগণ এই সময়ে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যাত্রীদিগকে বসিবার কিংবা দাঁড়াইবার স্থানের জন্য ২৲১ টাকা মূল্য ধরিয়া দিতে হয়। কতশত লোক সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই পথিপার্শ্বস্থিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রথ দেখিবার জন্য বসিয়া থাকে। রাস্তার দুই পার্শ্বের বিপণিগুলি উন্মুক্ত ও সুসজ্জিত। এই ভিড়ের মধ্যেই কেনা-বেচার খুব ধুমধাম চলিয়াছে। বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, কটকের চটিজুতার দোকান, খেলানার দোকান ইত্যাদিতে লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা সুকঠিন। যাত্রীরা "রথ দেখা কলা বেচা" দুই কাযই একসঙ্গে সারিয়া লইতেছে। দোকানদাররাও সরলপ্রকৃতির বিদেশী নূতন খরিদ্দার পাইয়া অসম্ভব মূল্যে তাহাদের দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া সংবৎসরের লাভ এক দিনেই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক রথের সময়ে পুরীর সর্ব্বত্রই জীবনের যে প্রবল সাড়া পাওয়া যায়, আর কোনও উৎসবে তাহা লক্ষিত হয় না।

জগন্নাথ ও বলরামের বিশালবপু দারুমূর্ত্তিদ্বয়কে কাছি বাঁধিয়া মন্দির হইতে বাহির করা হয়। সুভদ্রা ঠাকুরাণী বাহকের স্কন্ধে চড়িয়া রথে আরোহণ করেন। যাত্রার সময়ে পাণ্ডাগণ বিগ্রহের পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া বিগ্রহকে পতন হইতে রক্ষা করে। মন্দির হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর প্রতিনিধি আসিয়া ঠাকুরের মস্তকে অর্ঘ্য বাঁধিয়া দেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে পূর্ব্ব হইতেই বিবিধবর্ণে রঞ্জিত সুসজ্জিত বিরাটদেহ মন্দিরাকৃতি তিনখানি রথ তিন দেবতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রথগুলি প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। রথের চতুঃপার্শ্বস্থিত প্রাচীর ও স্তম্ভের উপর বিস্তর দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত থাকিতে দেখা যায়। জগন্নাথের রথ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার পরে বলরামের। সুভদ্রা ঠাকুরাণীর রথ এই দুইখানি রথ অপেক্ষা উচ্চতায় ও আয়তনে ছোট। জগন্নাথের রথখানি এত বড় যে, উহার মধ্যে ন্যূনাধিক দুই শত লোকের স্থানসঙ্কুলান হয় এবং পাণ্ডাগণ ও তাহাদের অনুচরবর্গ রথে চড়িয়াই ঠাকুরের সহিত গুণ্ডিচা-বাটীতে গমন করে। জগন্নাথের রথে ১৬ খানি, বলরামের রথে ১৭ খানি এবং সুভদ্রার রথে ১২ খানি ক্ষোদাই করা বৃহদাকারের কাষ্ঠনির্ম্মিত চাকা সংযুক্ত থাকে।

রথ টানিবার জন্য এক দল লোক নিযুক্ত থাকিলেও অধিকাংশ সময়ে রথ-টানা-কার্য্য যাত্রীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। একক্রোশব্যাপী রাজপথে সমবেত জনতা, যাত্রীর দল, কাছিতে হাত লাগাইয়া রথগুলিকে ধীরে ধীরে শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচা-বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। বলরামের রথ সর্ব্বপ্রথমে, তৎপরে সুভদ্রা দেবীর এবং সর্ব্বপশ্চাতে জগন্নাথের রথ অবস্থিত থাকে।

রথ চলিবার পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের প্রধান সেবক পুরীর রাজা মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত একটি সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া রথের সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তৎপরে "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া যাত্রিগণ পরে পরে অবস্থিত তিনখানি রথের কাছি ধরিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়। রথগুলি অত্যন্ত ভারী, এত লোকের টানেও সহজে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। যাহা হউক, এইরূপ টানাটানি করিয়া ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে জগন্নাথের রথ তাঁহার মাসীর বাড়ীর (গুণ্ডিচা-বাড়ী) সিংহদ্বারে উপনীত হয়। কখন কখন রথ পৌঁছিতে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেরী হয়—এমন কি, সময়ে সময়ে রথগুলি সেখানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। রথযাত্রা উপলক্ষে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ইহা কবিতার আকারে সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের পাঠ্য পুস্তকেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পটি এই :—

বৃদ্ধা ও পঙ্গু এক দরিদ্র চণ্ডালরমণী রথে বামনমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুলপ্রাণে অতি কষ্টে কোনমতে শ্রীক্ষেত্রের হাঁটা পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহার গৃহ হইতে পুরুষোত্তম প্রায় শত ক্রোশ ব্যবধান। রথের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সে এই দীর্ঘ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রথের যখন সবেমাত্র দুই দিন বাকী আছে, সে তখন কোনমতে কটক পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, শ্রীক্ষেত্র আর কতদূর এবং রথের আর কয় দিন বাকী আছে। কটকের কোন লোক তাহাকে সংবাদ দিল যে, তৎপরদিনই রথযাত্রা, সুতরাং তাহার ভাগ্যে সে বৎসর রথ দেখা ঘটিবে না। বৃদ্ধা কিন্তু সে কথা কোনমতে বিশ্বাস করিল না। সে বলিল যে, রথে উপবিষ্ট ভগবানের শ্রীমুখ একবারমাত্র দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য সে বহুকষ্টে বহুদূর হইতে আসিতেছে। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, না করিলে তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক হইবে। বহুদূর হাঁটিয়া সে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছিল, তথাপি হৃদয়ে এই মধুর আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিয়া সে অতি ধীরে ধীরে পুনরায় পুরীর পথে অগ্রসর হইল।

এ দিকে রথযাত্রার দিন ঠাকুরকে মহা আড়ম্বরে রথের উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ যাত্রী রথের কাছি ধরিয়া রথ টানিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু প্রভুর রথ এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। অবশেষে মানুষ ছাড়িয়া রথে বিস্তর হাতী যুড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভগবান্ আজ তাঁহার অদ্ভুত লীলা দেখাইবার জন্য বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, হাতীর সাধ্য কি যে, রথ লইয়া এক পদও অগ্রসর হয়? পাণ্ডাগণ ব্যাকুল হইয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য জগন্নাথের স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিল এবং পথে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন দৈববাণী হইল যে, এক জন প্রকৃত ভক্ত তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। সে না পৌঁছিলে এবং রথের কাছি না ধরিলে রথ চলিবে না, অতএব শীঘ্র তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হউক। এইরূপ দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডাগণ চতুর্দ্দিকে প্রকৃত ভক্তের সন্ধানে ধাবমান হইল। কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত বৈষ্ণব-বৈরাগী, কত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে অনুসন্ধান করিয়া রথের নিকটে লইয়া আসিল। তাহারা জনে জনে এবং সকলে একত্র সমবেত হইয়া কাছি ধরিয়া কত টানাটানি করিল, কিন্তু রথ কিছুতেই অগ্রসর হইল না। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রধান পাণ্ডা দেখিতে পাইলেন যে, বহুদূরে পুরীর পথে এক বৃদ্ধা, খঞ্জ, প্রায় চলচ্ছক্তিহীনা, নীচজাতীয়া, দুঃখিনী রমণী অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে ভিখারিণী মনে করিয়া প্রধান পাণ্ডা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে চাহিলেন এবং সেই মধ্যাহ্নসময়ে প্রচণ্ড রৌদ্রে পথ চলিতে নিষেধ করিলেন। সেই রমণী ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল যে, সে রথোপবিষ্ট দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় শত ক্রোশ পথ কয় মাস ব্যাপিয়া কোনমতে অতিক্রম করিয়া

আসিয়াছে ; ঠাকুরের শ্রীমুখদর্শন ভিন্ন সে অন্য ভিক্ষার প্রার্থী নহে। যেমন করিয়াই হউক, সে তাহার চির-আরাধ্য ইষ্ট-দেবতার শ্রীমুখপঙ্কজ দেখিবেই দেখিবে। পাণ্ডা বৃদ্ধার ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং এই লোকই ঠাকুরের প্রকৃত ভক্ত স্থির করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই জীর্ণবাসা, মলিনদেহা, পঙ্গু, বৃদ্ধা রমণীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া পুরীর পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধা তখন "আমি অস্পৃশ্যা চণ্ডালরমণী, আমাকে স্পর্শ করিলে তুমি পতিত হইবে, অতএব তুমি আমাকে ত্যাগ কর" ইত্যাদি বহু কাতরোক্তি করিলেও পাণ্ডা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন যে, নীচজাতীয়া হইলেও ভক্তির গুণে বৃদ্ধা তাঁহার পরম গুরু, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তিনি আজ ধন্য হইয়াছেন।

কতক্ষণ পরে প্রধান পাণ্ডা বৃদ্ধাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা সাশ্রুনয়নে ভগবানের শ্রীমুখের উপর নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া ভ... ভরে সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণিপাত করিল এবং প্র... পাণ্ডার সবিনয় নির্ব্বন্ধে রথের কাছি স্পর্শ করিবামাত্র অ... রথ তখনই সচল হইল। বৃদ্ধার আগমনপ্রতীক্ষায় ... প্রাণ দেব এতক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিলেন, ভক্তের মন... বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তিনি নিজের "ভক্তবৎসল" নাম এইরূপে সার্থক করিলেন।

ভক্ত বিশ্বাসিগণ এই গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় ইহা এই স্থলে বর্ণিত হইল। "আষাঢ়ে গল্প" মনে করিয়া পাঠে যদি কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তাহা হইলে তিনি যেন নিজগুণে প্রাচীনভাবাপন্ন লেখকের বয়োধর্ম্মসুলভ ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচুণিলাল বসু।

স্বর্গীয় ললিতচন্দ্র মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র সাহিত্য-রসিক ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পরলোকগত হইয়াছেন। ললিত বাবু পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে সাহিত্যপ্রীতি পাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং অনেক-গুলি কবিতা ও গান রচনা করিয়া-ছিলেন। তিনি কলিকাতার সুধী-সমাজে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন এবং তাঁহার বহু সামাজিক গুণের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সুহৃদ্ ছিলেন এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া "বন্দে মাতরম্ সম্প্র-দায়ে" এক জন অগ্রণী
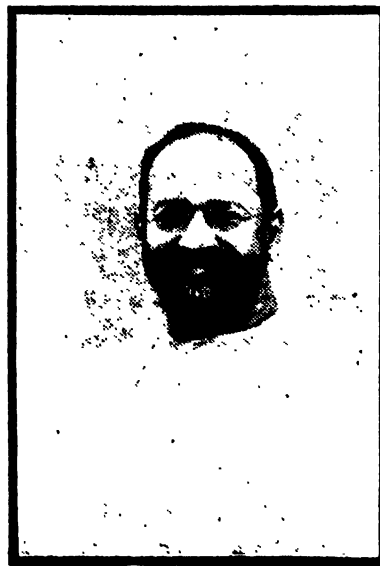
স্বর্গীয় ললিতচন্দ্র মিত্র।

হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সুরধামে' যে সাহিত্যিক বৈঠক বসিত, ললিতচন্দ্র সর্ব্বদা তাহাতে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহার সাহিত্যালোচনায় সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

ললিত বাবুর মৃত্যুতে কলিকাতার সাহিত্যিক সজ্জন-সমাজের যে ক্ষতি হইল, সহজে তাহা পূরণ হইবে না। তিনিই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবর্ত্তিত "পূর্ণিমা-মিলন" পুনরুজ্জীবিত করিয়া "দীনধামে" বহুবার সাহি-ত্যিক সমাগম-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আমার ডায়েরী

দুই দিন পরে

লজ্জা তো রাখ্‌তে পারলাম না। গান গাইতে হ'ল তো আজও। তিন জনেরই একান্ত অনুরোধ—কত আর ঠেলা যায়। কি সন্তর্পণে কত বেছে বেছে ভয়ে ভয়ে গাওয়া,—সে কি ভাল হয়? সগুণা কেমন ক'রে এও ধর্‌তে পারলেন, এই-ই আশ্চর্য্য! স্পষ্টই বল্লেন, "আপনি বড্ড বাছাই ক'রে ক'রে যেন ভেবে ভেবে গান গাইছেন! ওতে কি ভাল হয়! প্রাণে প্রথমেই যে গানটা ওঠে, সেইটাই গানের মুখের উৎস খুলে দেয়। আপনি সেই উৎসকেই যেন বরাবর চাপা দিয়ে চলেছেন।"

তা না দিয়ে আমার উপায় কি? আমি যে গানই গাইতে যাই, তাতেই যে আমার নিজের সুর বেজে ওঠে, অমনি ভয়ে চমকে তাকাই—কি করলাম বুঝি! কবি যার প্রাণের অধীশ্বরের উদ্দেশে যা নিবেদন ক'রে গেছেন, তা যে আমার প্রাণে, আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠান ক'রে আজ আমারই উপাস্যের উদ্দেশে ছুটে চলেছে। যাকে ছুঁতে নাই, তাতেই এই বিপদ ঘট্‌ছে।

বেশী দিন এই ভাবে আর তো বাছাই করাও চল্‌ল না। ক্রমে শুধু গান গান—আর গান, এ ছাড়া আর তো কিছু মনে থাক্‌ছে না! ভয় নয়, লজ্জা নয়, সন্দেহ নয়, বেদনা নয়। কেবল গেয়ে যাই যা মুখে আসে, মনে আসে। কেবল একটা কাজ করি, চোখ চেয়ে বা কারও দিকেই ফিরে গাই না। শ্রোতাদের দিকে সটান পাশ ফিরে বসি, অন্তরে থাকে শুধু আমার গান আর তার উপাস্য, আর কিছু না। এ কি আমার গান গাওয়া?—এ যে আমার বন্দনা—উপাসনা—স্তব—ধ্যানধারণা—যা বলে সব—সব।

সে দিন হরেন্দ্র ব'লে উঠলেন কি, "মশায়, আপনি যা গান করেন, আপনি ঠিক যেন তাই হয়ে যান। আপনি এক জন আদর্শ অভিনেতা হ'তে পারেন, দেখছি।" আমি সভয়ে তার পানে চাইছি, এমন সময় শুনলাম, সগুণা মৃদুস্বরে হরেন্দ্রর 'অভিনেতা' শব্দটির শ্রুতিকটুত্বকে সংশোধন ক'রে দিয়ে বল্‌ছেন—"কবি হ'তে পারেন—"

হরেন্দ্র তখন অপ্রস্তুতভাবে আম্‌তা আমতা ক'রে বললেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই-ই বলতে চাই। আমার ভাষার দৈন্যটা তো বুঝতেই পেরেছেন এত দিনে, নয় কি, মশাই?"

আমি কৃতজ্ঞনেত্রে তাঁর দিকে চাইলাম। পিতৃবন্ধু একটু যেন গর্ব্বের সঙ্গেই সকলের দিকে চাইতে লাগলেন। হরেন্দ্রর সঙ্গেও ক্রমে আমার বেশ আলাপ জমে আস্‌ছিল। লোকটি বড় সরল আর তত্ত্বসর্ব্বস্ব, একান্ত জ্ঞানপিপাসু। জীবনে জ্ঞানচর্চা ছাড়া বোধ হয় আর কিছু তিনি জানেন না।

লোকটির শিক্ষাদীক্ষা যথেষ্ট, বিদ্বান্ ব'লে, ভাল ছেলে ব'লে তার দেশের সকলের কাছেই নাম আছে; বিদ্বৎ সভায় বার করবার উপযুক্ত জিনিষ। তবু যেন কি একটা অভাব আমার চোখে প্রথম হ'তেই পড়েছিল। যাঁদের শিক্ষাকে ঠিক পঠিত বিদ্যারই রেখা টেনে মাপ কর্‌তে পারা যায়, ঠিক যেন সেই ধাতের মানুষটি। এক কথায় যেন একচক্ষু হরিণ।

যে গান আমি গাহিতাম, তার সুরের বা তাল লয়ের কোন বাহাদুরী থাকুক বা না-ই থাকুক, তাদের ভাষার অপরূপ মোহিনীজাল যে হরেন্দ্রর উপরে কোন প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পারছিল, এখনও আমার মনে হতো না। মনে যার এই অপরূপের আলো পড়েছে, যার নাম রস—সেই বস্তুটির আভাসও স্পর্শ করেছে, সে কি যেখানে সেখানে তার আভাস পড়বে, সেখানে তার নিজের চক্ষু, কর্ণ, মন-প্রাণকে অমন নিস্তরঙ্গ ক'রে রাখতে পারবে?—ভাল বলছে, বাহবা দিচ্ছে—একমনে শুনছে, তবু মনে হ'ত—এর চেয়ে একটা দেহতত্ত্বের বা সাধন-ভজনের গান গাইলেও হরেন্দ্রর কাছ থেকে বোধ হয় এমনি বাহবা পাওয়া যেত।

এমন কি, আমার এমনও মনে হয় যে, সগুণা না হ'য়ে যদি এমনি উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী ও ধনবান্ পিতার

একমাত্র দুহিতা অন্য কেউ হরেন্দ্রর জন্য উপস্থিত হ'ত, সে ক্ষেত্রেও হরেন্দ্রর আপত্তির বেশী কিছু থাকত না। সগুণা না হ'লেও যে কোন সুলক্ষণা কন্যারই সে পাণিগ্রহণে আপত্তি করত না।

যাই হ'ক, যদুর ভাগ্য তাকে অযাচিতভাবে যা দিচ্ছে, তার কাছে আমার মাথা নত ক'রে তো বলতেই হবে, হরেন শ্রেষ্ঠ, হরেন ভাগ্যবান্! এই যে আমি তাদের কাছে ব'সে দিনের পর দিন ধ'রে গান গেয়ে শুনিয়ে যাচ্ছি, এ যেন এক রাজরাণীকে তাদের সভার এক দীনগায়কের সঙ্গীতের উপহার নিবেদন! সে রাজা সে মহারাজা—আর আমি তার সৌভাগ্যের পানে লুব্ধদৃষ্টি এক দীনের দীন জীবনের হীন কাঙ্গাল কবি।

এমনি সমস্তক্ষণ ধ'রে তিল তিল ক'রে নিজের জীবনোপায় সংগ্রহ করা নিজের দিনপাতের উদ্দেশে (তাই বা কদিনের জন্য আর?) এই ভিক্ষুকপনা—এই উঞ্ছবৃত্তি যার, তার জীবনের অস্তিত্ব থাকার চেয়ে না থাকাই কি শ্রেয়ঃ নয়?

কি বলছি এ আবার? নিজেকে এত ঘৃণ্য, এত লজ্জাস্পদ ব'লে এ ধারণা কেন মনে আসছে? কিসের এ জীবন আমার—কি ই বা তার মূল্য?

কোথায় রেখেছি চরণ তাহা তো জানি না,
আছে কি বিশ্ব? রবে, তবু তাহা মানি না।
নাহি কোন বাধা—নাহি কোন গোল,
ঢেউ নাহি জলে শুধু কলরোল,
সেই এক গান, সেই এক তান,
সেই এক নামে বাজে বাণী!
ভালবাসি তারে ভালবাসি, শুধু ভালবাসি,
তারে ভালবাসি।
জীবন? মরণ? আছে কি না আছে
কি এর সত্য কে জানে,
একেরি আরতি বাজে শুনি নিতি,
একেরি আসন এখানে।
কাহার বারতা কে শুনিতে চায় বল না,
আশা নিরাশার শুভ্রকৃষ্ণ ছলনা!
নাহি কোন দ্বিধা নাহিক দ্বন্দ্ব,
মানি না মুক্তি মানি না বন্ধ,
হাসি কান্নায় মিলায়ে ছন্দ
এক সুরে বাজে সাধা বাঁশী—

আমার এ 'ভালবাসি' তো শুধু মাত্র এই কবিতা নয়,—এ যে আমার 'বেদনা' এ যে আমার জীবনের অস্তিত্ব—আমার আমিত্ব! আর তার চেয়েও বড় আমার সাধনা—আমার উপাসনা! সাধক প্রেমিক কবি বলেছেন—

"কথা ক্যায়সা বকা কয়সি যো উসকো
আসনা ঠ্যায়রে!

* * * *

হজরত মহম্মদ ঔর ইয়ুসুফ সে ক্যা নিসবৎ
এ মহব্বৎ জুলেখা যো উ মহব্বৎ খোদা ঠ্যায়রে!"

যে ভালবাসে, তার বাঁচাই বা কি, মরাই বা কি! তাকে যে শ্রেষ্ঠ সাধকের সঙ্গেই কবি তুলনা করেছেন, এ কথায়। যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁরও যেমন বাঁচা-মরা সমান, এও যে তেমনি বলছেন! শুধু কি এই? আরও কত বড় কথা—শুনতেও প্রাণ কুণ্ঠায় সঙ্কোচে কেঁপে ওঠে, আবার নিঃশব্দে কি ভরসাও পায়। হজরৎ মহম্মদ আর বিখ্যাত প্রেমিক হজরৎ ইয়ুসুফ এঁদের মধ্যে প্রভেদ কিসের? এক জন ভালবাসেন জুলেখাকে—আর এক জন ভালবাসেন খোদাকে—এই বই ত না!—

অভয়দাতা—ত্রয়ত্রাতা—বীরসাধক যোগী—কবি আমার তোমাদের পায়ে শত প্রণাম! তোমাদের মন্ত্র জয়যুক্ত হোক্—আমার প্রাণে স্ফূর্ত্ত হোক্—মূর্ত্ত হোক্! আর যেন না ভ্রান্তি আসে—বেদনার জড়তা আসে। "যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।" এ মন্ত্র আর যেন না ভুলি।—

—

এক মাস পরে

শরতের পর হেমন্ত এসেছে! কত দিন পরে আবার আমার এ খাতায় নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। গান শুনিয়ে আর কবে সগুণার পিতার ঈপ্সিত সেই আনন্দের দিন আসবে—যে দিনে আমি তাঁর দক্ষিণ হাত হয়ে তাঁর

...র স্থান অধিকার ক'রে সগুণাকে পাত্রস্থ ক'রে যাব ...দিনের অপেক্ষায় পিতৃবন্ধুর সঙ্গে আমারও দিন ...ছে। হরেন্দ্র দিনকতকমাত্র এখানে থেকে নিজের ...স্থান জব্বলপুরে চ'লে গিয়েছেন। পিতৃবন্ধুর ইচ্ছা ..., সগুণার বিয়ে নিজের দেশে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের ... দেন, কিন্তু হরেন্দ্র তাতে মোটেই সম্মত হ'ল না। ...রা যে দেশে এত দিন ধ'রে বাস ক'রে আস্‌ছে, সেই-খানেই তাদের বিয়ে হয়, এই হরেন্দ্রর মত। তার নিজের ...মা কিংবা আত্মীয়-স্বজনও এমন কেউ নেই—যার জন্য ...পুর থেকে দেশে যাওয়ার এই অকারণ ব্যয় সে ...ন করবে। এজন্য হরেন্দ্রর সঙ্গে কিছু বাগ্‌বিতণ্ডাও ..., শেষে পিতৃবন্ধুকে অগত্যাই সম্মত হ'তে হয়েছে।

সে যাক্—আমি কেন আছি এখানে এমন ক'রে? ...সের আশায়? কি দেখতে? এমনি ক'রে গান শোনানো এই-বা আর ক'দিন?

হোক্, তবুও পতঙ্গের জীবনের শেষ স্পন্দন পর্য্যন্ত সে আগুনের কাছ ছেড়ে পালাতে পারে কি? ঝল্‌সে— ...ছে তবু পাখা ঝাপ্‌টে আবার সেই আগুনেই পড়ছে! ...কালের সঙ্গীত-সভা আমাদের এখনও চলছে! এই ... আমার পূজার অবকাশ, এই যা আমার জীবনে আর ...দিনের জন্য সে স্বেচ্ছায় একে 'চাই না' ব'লে চ'লে ...? তাই পিতৃবন্ধুর অনুরোধ পেতেই সম্মত হয়ে ...ছি। তাঁরা এখনও সমান আদরেই আমার গান শোনেন। সগুণা আধুনিক বাঙ্গালা গান গোটাকতক আমারই কাছ থেকে শিখে একেবারে বাজিয়ে গাইতে পেরেছেন, সে জন্য বাপের আর মেয়ের দুজনেরই স্ফূর্ত্তিটা সমানভাবে জেগে উঠেছে। তাঁদের ইচ্ছে, এরই মধ্যে আরও ক'টা গান সগুণা আমার কাছ থেকে আদায় করেন। তারই জোর শিক্ষানবিশী চল্‌ছে।

হঠাৎ আজ কাকা (এঁকে এখন আমি কাকাই বলি) প্রাতর্ভ্রমণের পোষাকেই আমার কাছে একেবারে এসে উপস্থিত। এ রকম কখনও আসেন না। মুখটিতেও উত্তেজিত ভাব। আমায় বল্লেন, "নীরেন্দ্র, বেড়াতে যাবে এস।" বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে হঠাৎ এক সময় আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "হরেনের অন্যায় দেখেছ? এ রকম ব্যবহার তার পক্ষে কি অন্যায় নয়?"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে চাইলাম। এতক্ষণ যে তিনি একটি কথাও কননি, তাঁর ভাবান্তর দেখে আমিও বাক্যব্যয় করতে সাহস পাই নি। তিনিও তখন সেটুকু বুঝে একটু অপ্রস্তুতভাবে বল্লেন, "কাল হরেন কি লিখেছে জান? তার কোন এক খুড়ো তাকে বিলাত যাবার জন্য হাজার কতক টাকা দিচ্ছে, সে বিলাত যাচ্ছে।"

আমি এতে তাঁর রাগের কারণ কি আছে বুঝতে না পেরে বললাম—"সত্য নাকি?—এ তো খুব ভাল কথা।"

"ভাল কথা? ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাদের বিয়ে, আর সে নভেম্বরের প্রথমেই বেরিয়ে যেতে চায়—এ কি ক'রে সম্ভব হবে?"

আমি ঘোর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললাম, "তিনি কি বিয়ের আগেই যেতে চান?"

"প্রকারান্তরে তাই কি দাঁড়াচ্ছে না? লিখেছে, আপনি যদি নিতান্ত অমত করেন, তা হ'লে সাত দিনের মধ্যে বিয়ের সব ঠিক ক'রে রাখবেন, আমি বিয়ে ক'রেই অমনি বম্বে চ'লে যাব।"

এমন একটা স্তব্ধতা এসে পড়ছিল যে, কথা কওয়া সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়ালো! মোটে আর সাত দিন? জানতাম, এখনো এক মাস! তাঁর মুখের দিকে কিন্তু সেই বাক্‌রোধ অবস্থাকে সামনে নিতে চাইলাম। এক মাসের জায়গায় সাত দিন—এই মাত্র তো? যা অবশ্যম্ভাবী, তারই একটু নড়চড় এই বই তো না? তাতে কি এমন?—ছি: এ কি?—নিজের উপর খুব খানিক চোখ রাঙ্গিয়ে নিয়ে রীতিমত চেষ্টার সঙ্গেই বললাম, "তা হ'লে বড্ড তাড়াতাড়ি পড়লো তো!"

"তাড়াতাড়ি কি বলছ? এ কি কখনো সম্ভব? দেশ থেকে আমার সব আত্মীয়দের আনাবো, তাঁরা সব আসবেন ব'লে ঠিক হয়ে আছেন। মীরাটে সগুণার যে মামা আছেন যিনি হরেন্দ্রর সঙ্গে এই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে দেন, ডিসেম্বরে তিনি ছুটী নেবেন—এই বিয়েতে আসবার জন্যে। এটা আমাদের বাঙ্গালার কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, আমাদের কুলগুরু আর পুরোহিত তাঁরা লিখেছেন—এ মাসে আমাদের বিয়ে হয় না। তাঁরা সব অঘ্রাণে ভাল দিন স্থির ক'রে আমার পিস্‌তুতো ভাইকে ব'লে দিয়েছেন।

তাঁরা সব এই বিয়েতে আসবেন—বিয়ে দেবেন, আর সাত দিনের মধ্যে বিয়ে? হুকুম করলেই হ'লো?"

গতিক খারাপ দেখে আমি একটু ভয়ের সঙ্গেই বললাম, "তা হরেন্দ্র কি লিখছেন? তাঁর এত কি তাড়াতাড়ি?"

কাকা মাথা নেড়ে বল্লেন, "একেবারে আটঘাট বেঁধেই পত্র দিচ্ছেন তিনি। তাঁর সেই খুড়োর ছেলে দু' তিনবার সিবিল সার্ভিস ফেল ক'রে ফিরে আসছে—সেই রাগে খুড়ো হাজার কতক টাকা একেবারে হরেন্দ্রকে দেবে বলছে, যদি সে এখনই বিলাত যায়। ছেলের জন্য যে সব ব্যবস্থা করা ছিল, সেই সব সুবিধাগুলো হরেন্দ্র এখনি গেলে হরেন্দ্রকে তিনি পাইয়ে দেবেন। হরেন্দ্র লিখেছেন, দেরী করলে এ সুযোগ হারাব। শুধু তাই না—তার অস্থিরমতি কাকাকেও সে বিশ্বাস করে না। এর পর মন একটু শান্ত হ'লে আর সে দিতে চাইবে না, এই নাকি হরেন্দ্রর ধারণা, তাই সে দিন আটেকের মধ্যেই বিয়ে ক'রে যেতে চায়—নয় ত ফিরে এসে বিয়ে করবে লিখছে।"

"তবে? আট দিনের মধ্যেই তা হ'লে ঠিক করতে হচ্ছে! তা না হ'লে দু' তিন বছরের—"

"উনি আমার মেয়ে নেবেন ব'লে এত কৃতার্থ করেন নি—যে যা হুকুম করবেন, তাই আমায় মাথা পেতে নিতে হবে। নাই বা গেল বিলাত—কি এমন জরুরী তার? সিবিলিয়ানগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ও সব হবে-টবে না।"

তাঁর জিদ দেখে একটু আশ্চর্য্যই হলাম। ভয়ে ভয়ে বল্লাম, "কিন্তু তিনি তো জমীদারের ছেলে নন্ শুনেছি, রোজগার ক'রেই যখন তাঁকে জীবিকানির্ব্বাহ করতে হবে, তখন যাতে নিজের উন্নতি হয়—যাতে নিজে গণ্যমান্য হ'তে পারবেন, তাই ই তো তাঁর করা উচিত।"

"তুমিও এই কথা বলছ, বীরেন? বিলাত না গেলে গণ্য-মান্য হ'তে পারা যায় না, এখনও কি এ ধারণা দেশের লোকের আছে? তার যদি ঐ লাইনেই যেতে ইচ্ছে, তিন পুরুষ ধ'রে যারা মধ্যদেশবাসী, এম-এ, ল পাশ করে, তাদের জব্বলপুর কোর্টে উকীলের খাতায় নামও পড়ে। চেষ্টা করলে দেওয়ানী, ফৌজদারী যে দিকে তার মর্জি, সেই দিকেই আর একটা একজামিন দিয়ে নিয়ে ক্রমে উচুপদ পেতে পারবে! দেশী লোকরাও কি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কমিশনার এ সব হচ্ছে না? কিছু না কিছু না, ও একটা হুজুগ মাত্র। বিলেত যাবার একটা সুবিধে পেয়েছে—বাস্, আর কি, দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটতে হবে। বারণ ক'রে দিলাম, ও সব হবে-টবে না।"

আমি মৃদুস্বরে আবার একবার বল্লাম, "কিন্তু সে উন্নতি অনেক সময়সাপেক্ষ, আর এ—"

"বাপু, আমার তো ঐ এক মেয়ে, এত দিনে তার বিয়ে দিতে যাচ্ছি, কোথায় দুটিকে নিয়ে মনের আনন্দে এখন কিছুদিন কাটাবো, তা না এই সময়েই তার ইংলণ্ড-ফ্রান্স ছুটবার সৌক? কিছুতেই এ হবে না, তাকে আমি লিখে দিয়েছি। আমি ও লাইনটাকে পছন্দই করি না—আমার মেয়ের জন্যে যদি সে এতটুকু ইচ্ছাও দমন করতে না পারে—"

বলিতে বলিতে রাগটাকে কোনমতে চাপিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কাকা বলিলেন, "আমার যাতে একেবারে অনিচ্ছা, তা নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে আর তর্ক করো না। আমার সুগুণা এ বিষয়ে আমায় খুব চেনে। আমার মতের ওপর কখনও সে একটা উচ্চবাচ্য পর্য্যন্ত করে না। এ বিষয়েও সে কিছু বলবে না, দেখো।"

এইবার আমিও চুপ ক'রে গেলাম! বাবা রে, এ কি জেদী লোক? উচিত অনুচিতের একটা তর্ক পর্য্যন্ত যিনি সইতে পারেন না, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াও তো মহা দায়। মনে মনে একটু অবাক্ হয়েই থাকলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

প্রাচীন মিশরের ধনসম্পদ

প্রাচীন মিশরের সুপ্রসিদ্ধ ফারাও নরপতি টুট-আন্‌খ-আমেনের সমাধিভবন আবিষ্কৃত হওয়ায়, সমগ্র সভ্যদেশে বিপুল আলোড়ন ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মিশরীয় সভ্যতা, জীবনযাত্রার প্রণালী ও বিস্ময়কর চারুশিল্পের নিদর্শন সমাধি ভবনে আবিষ্কৃত দ্রব্যসম্ভারে পরিলক্ষিত হয়। আজ টুট-আন্‌খ-আমেনের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে—দেশ-বিদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক যাবতীয় সংবাদপত্রের স্তম্ভে এই ফারাও নরপতির নাম অলঙ্কৃত। ইতোমধ্যেই আমেরিকায়, ইংলণ্ডে টুট আন্‌খ-আমেনের নামযুক্ত পরিচ্ছদাদির নমুনা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সুধী ও ধনকুবের লর্ড কারনারভান, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ হাওয়ার্ড কার্টারের নেতৃত্বে, দীর্ঘকাল পরিশ্রম, চেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয়ের পর এই রহস্যময়, প্রাচীন সমাধিভবন আবিষ্কার করিয়া অতীতযুগের ধনসম্পদ, মিশরীয় সভ্যতাদ্যোতক, বিস্ময়কর চারুশিল্প প্রভৃতির মনোরম নিদর্শন লোকলোচনের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। সাফল্যের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড কারনারভন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নাম এই আবিষ্ক্রিয়ায় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মিশরীয় রাজন্যবৃন্দের সমাধিক্ষেত্র—উপত্যকাভূমির পশ্চিমের দৃশ্য। এ পর্য্যন্ত এই স্থানে ৪ জন মিশর-রাজের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় আমেনোফিস্, টয়েট এল-সুরব্ বা এপিসের সমাধি এবং অপর দুই জনের সমাধিতে কোনও শিলালিপি উৎকীর্ণ নাই।

তরুণ ফারাও নৃপতির সমাধি ভবনে আবিষ্কৃত তৈজসপত্র, যান, বসন-ভূষণ বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের পরিচয় দিবার পক্ষে টুট আন্‌খ-আমেনের সংক্ষিপ্ত জীবনকথার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অন্যতম ফারাও নরপতি আখেনেটেন্ মিশরের প্রচলিত ধর্ম্ম মানিতেন না। তিনি দেবপূজার বিরোধী

ছিলেন। তাঁহার আদেশে মিশরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবতা আমনের পূজা বন্ধ হইয়া যায়। সেই স্থানে 'এটন্' বা সূর্য্য-গোলকের (Sun's Disk) অর্থাৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের পূজা-পদ্ধতি মিশরে প্রচলিত হয়। দেশবাসী স্বেচ্ছায় এই নব ধর্ম্মমত গ্রহণ করে নাই—এ জন্য মিশরবাসীর উপর আখেনেটন বহুবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে আমন দেবতার মন্দির ছিল, তাহার অধিকাংশই তাঁহার অনুচরবর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। আখেনেটন্ অতঃপর পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী থিবস্ পরিত্যাগ করিয়া এল্ আমার্ণায় নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাল্যেই তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম নেফারতিতি। সমগ্র মিশরে তাঁহার তুল্য সুন্দরী রমণী আর ছিল না। আখেনেটনের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার পাঁচ কন্যা। প্রথমা কন্যার সহিত যে স্মেরাখের বিবাহ হয়, আখেনেটনের মৃত্যুর পর দেশের প্রচলিত বিধান অনুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস শাসনদণ্ড পরিচালনের পর তিনিও অকালে লোকান্তর গমন করেন। আখেনেটনের দ্বিতীয়া কন্যা পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, এ জন্য তৃতীয় কন্যা আনখ্ সেনপাটেনের স্বামী, [illegible] রাজ তুতানখেটেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কাহার সন্তান, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন ইতিবৃত্ত নাই, তাহার পূর্ব্ব-জীবনের কোনও ঘটনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক মিঃ নিউবেরী তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয়, সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর এই তরুণ নরপতি, শ্বশুরের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী এল্ আমার্ণায় মাত্র কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তত্রত্য ধ্বংসস্তূপ মধ্যে আবিষ্কৃত স্মৃতিস্তম্ভে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ আছে। আমনদ্বেষী রাজা আখেনেটন্ শত অত্যাচার ও প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সমগ্র মিশর হইতে প্রাচীন দেবতার উপাসক-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন নাই। দেশমধ্যে তখনও আমন দেবতার পূজা কোন কোন স্থানে প্রচলিত

তুতাংখামেনের সমাধিভবনের প্রবেশদ্বার।

...ন। পুরোহিতগণ দেবমন্দিরসমূহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন সত্য; অন্যান্য দেবতার পূজাপদ্ধতিও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি আখেনেটন্ সম্পূর্ণরূপে দেবপূজার বিলোপসাধন করিতে পারেন নাই। দেবতাদিগের প্রতি এই বিষয়ে একেশ্বরবাদী ফারাও নরপতির এমন আক্রোশ ছিল যে, তিনি আমন দেবতার নাম প্রত্যেক মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। জনসাধারণ তাঁহার এইরূপ অনাচার ও অত্যাচারে অত্যন্ত উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল—তাঁহার প্রতি কাহারও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না।

আমন দেবতার ভক্ত ও অনুরক্তগণ উৎপীড়িত হইয়াও গোপনে ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতে ছিল। প্রাণপণ চেষ্টার ফলে রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমে তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবশেষে টুটানখেটনের সিংহাসনাধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আধিপত্য আরও বাড়িয়া গেল। তরুণ নরপতি সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি আমন দেবতার পূজাপদ্ধতি দেশের মধ্যে পুনরায় প্রচলিত করিবেন, রাজধানীও থিব্‌সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাঁহার এই সংকল্পে দেশবাসী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নরপতি তাঁহার পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া টুট্‌ আনখ্ আমেন্ বা 'আমন দেবতার জীবন্ত প্রতিকৃতি' বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিলেন। রাণীর নামও পরিবর্ত্তিত হইল—নূতন নাম হইল আনখ্‌সেনামন্।

এই ফারাও নরপতির নাম বহু স্মৃতিসৌধে ও স্তম্ভে উৎকীর্ণ দেখা যায়। থিব্‌স্, এল্ আমার্না, মেম্‌ফিস্ এমন কি, সুদানের গেবেল্ বার্কাল্‌এর আবিষ্কৃত বহু স্মৃতিস্তম্ভেও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ টুট্‌-আনখ্-আমেনের নাম ক্ষোদিত দেখিয়াছেন। এই তরুণ, হৃদয়বান্ নরপতির হস্তে মিশরের শাসনভার অর্পিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের প্রাচীনতম দেবমন্দিরগুলির শ্রী ফিরিয়া গিয়াছিল, পুরোহিতগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ নিরুদ্বেগে উপাস্যদেবতার পূজা করিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে রাজার মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। রাজার আদেশে থিবীয় দেবমন্দিরে স্বর্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল, দেশে দেশে নূতন দেউল নির্ম্মিত হইল। রাজার ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেব-মন্দিরে প্রচুর পূজোপকরণ ও আহার্য্য দ্রব্য প্রেরিত হইতে লাগিল। নগরের গণ্যমান্য, পণ্ডিত ও রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তলের তৈজসপত্র মন্দিরে-মন্দিরে স্থান পাইল—দেবতার পূজায় সেগুলি ব্যবহৃত হইবে।

টুট-আন্‌খ আমেনের শিবা-শয্যা—স্থানান্তরিত করিবার জন্য বান্ধবন্দী করা হইতেছে।

সাড়ে ৩ হাজার বৎসর পূর্বের ফল ও মাংস কাষ্ঠাধারের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত। পরজগতে ফারাও নরপতি উহা উপভোগ করিবেন বলিয়া উপহৃত হইয়াছিল।

কক্ষমধ্যস্থ ধন-সম্পদের একাংশের ফটোগ্রাফ।

এই সকল দ্রব্য টুট-আনখ-আমেন পরজগতে ব্যবহার করিবেন বলিয়া কক্ষমধ্যে ছিল
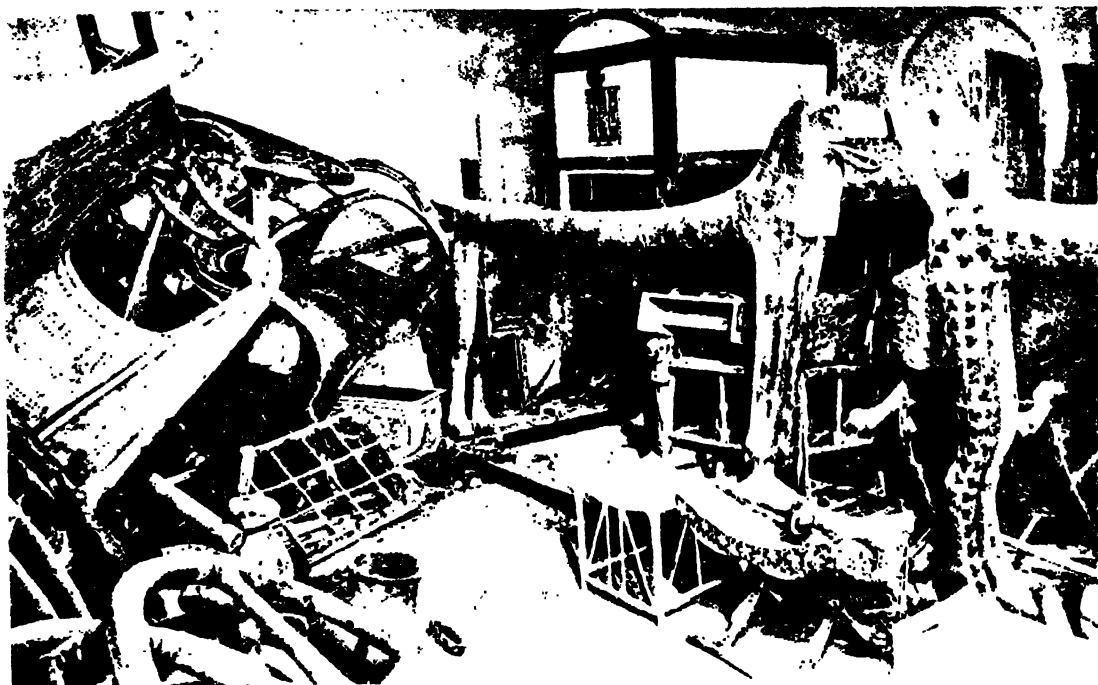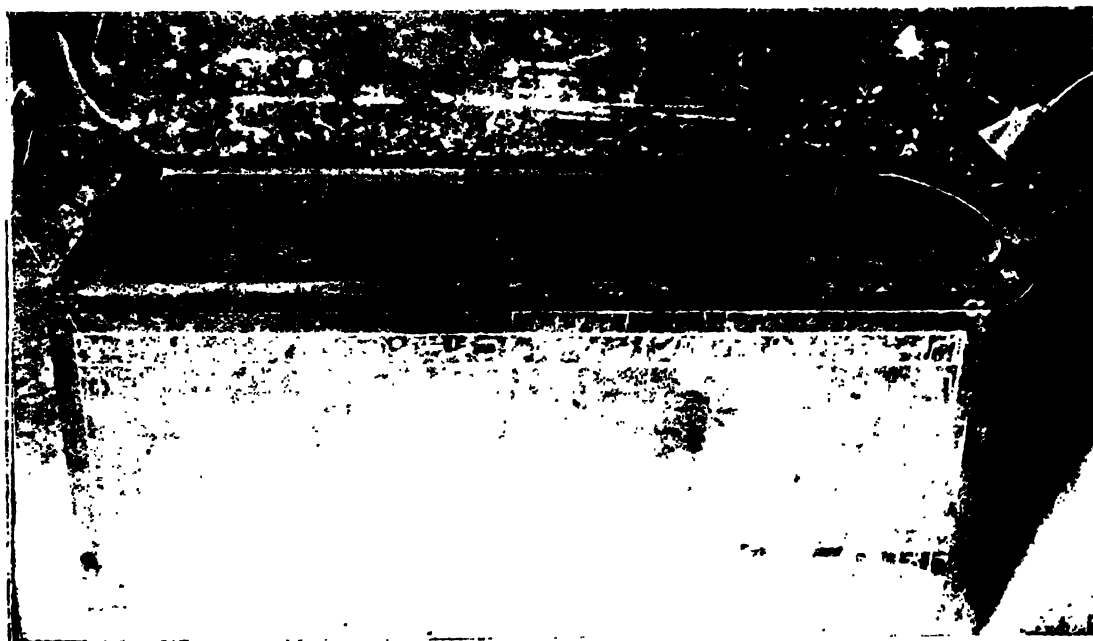
শবাধারে দ্বিতীয় আমেনোফিসের মৃতদেহ।

মন্দিরসংলগ্ন পুরোহিতভবনে, পরিচর্য্যার জন্য দাস দাসী নিযুক্ত হইল—পররাজ্যজয়ের ফলে যে ধন-সম্পদ্ লুণ্ঠিত হইত, দেবতা ও পূজারীর ব্যবহারের জন্য তাহা মন্দিরে মন্দিরে প্রেরিত হইত। আখেনেটনের রাজত্বকালে ‘এটনের’ উপাসনা-মন্দিরে তিনি বহুসংখ্যক দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা পরিচর্য্যাও করিত, নৃত্যগীতও করিত। টুট্ আনখ্-আমেন এই সকল দেবদাস ও দেবদাসীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া নীলনদের তীরবর্ত্তী যাবতীয় দেব-মন্দিরে নিযুক্ত করিলেন। টুট্-আনখ্-আমেনের রাজত্বকালে দেবমন্দিরসমূহে অজস্র মণি-মুক্তা, স্বর্ণরৌপ্য ও নানাবিধ বহুমূল্য বসন-ভূষণের সমাবেশ ছিল। মন্দিরমধ্যস্থ বায়ু প্রতিদিন গন্ধানুলেপন ও পুষ্প-নির্য্যাসের মধুর সৌরভে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত। গন্ধদ্রব্য প্রত্যহ ভারে ভারে দেব-মন্দিরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। নরপতির দেবভক্তি ও পুরোহিতের প্রতি অনুরাগ দর্শনে জনসাধারণের আনন্দের অবধি ছিল না। দেবতারাও তুষ্টি বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গন্ধানুলেপন পূর্ণ আলাবাষ্টার নির্ম্মিত পাত্রনিচয়।

ঐতিহাসিক নিউবেরীর মতে এই নবীন ফারাও নরপতি দীর্ঘকাল মিশরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন নাই। একখানি মদ্য রক্তে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বের ৬ষ্ঠ বর্ষের উল্লেখ তাহাতে আছে। উল্লিখিত বস্তুও তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে; তাহাতেই অনুমিত হয়, সম্ভবতঃ ৬য় বৎসরের অধিক কাল তিনি রাজত্ব করেন নাই। টুট্-আনখ্-আমেনের সম্ভবতঃ কোন সন্তানও ছিল না। সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদান হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, ফারাও নৃপতিদিগের অষ্টাদশ বংশ টুট্ আনখ্-আমেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর অন্য বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন

টুট্ আনখ্-আমেনের মৃত্যু হইলে, মিশরীয়গণ মহা সমারোহে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিভবনে রক্ষা করিয়াছিল। প্রচুর ধন-সম্পদ, দ্রব্যসম্ভার—মিশরীয় সভ্যতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পরজীবনে রাজার কাযে লাগিতে পারে ভাবিয়া দেশবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মৃতদেহকে উপঢৌকন দিয়াছিল। আজ—সাড়ে ৩ হাজার বৎসর পরে, সেই সকল
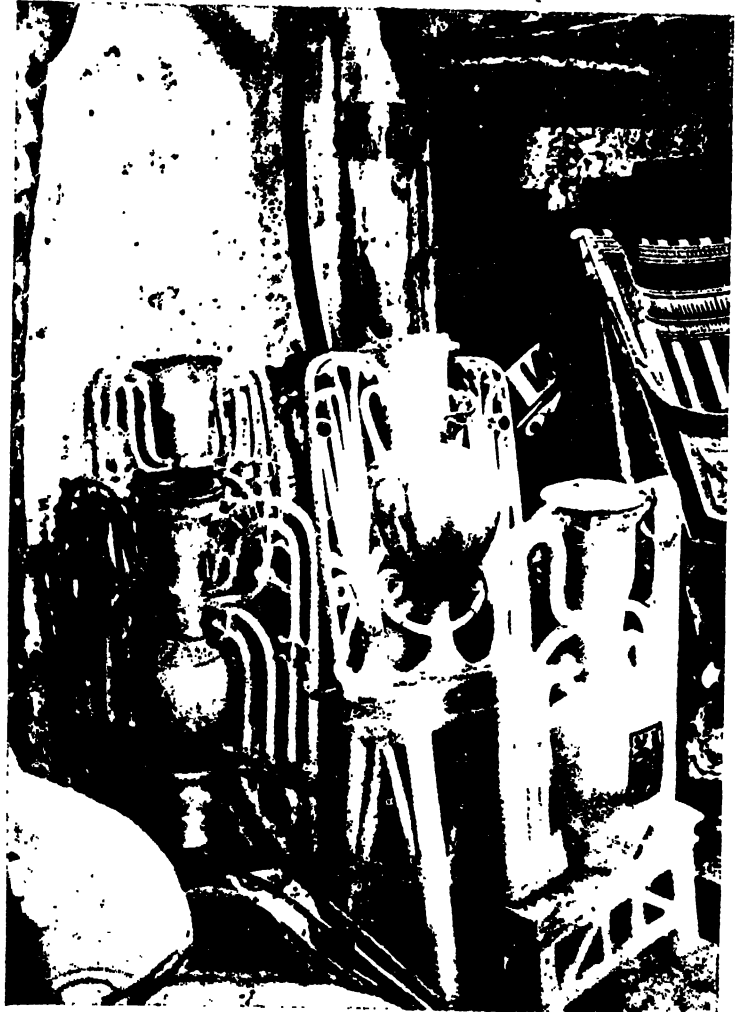
বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিতেছে। মিশরীয় সভ্যতা যে রূপ উন্নত ছিল, মিশরের ধন-সম্পদ্ যে কিরূপ অতুলনীয়, এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে সমগ্র সভ্যসমাজ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

প্রাচীন মিশরের এই অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভার—শিল্পকলার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দলে দলে কৌতূহলী পর্য্যটক, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সুপ্রসিদ্ধ ফারাও নরপতির সমাধি-স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। আমেরিকার খ্যাতনামা লেখক মেনার্ড উইলিয়ম্‌স্, প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ হাওয়ার্ড কার্টারের বিশিষ্ট বন্ধুপুত্র মিঃ চার্লস্ ব্রেস্‌টেড্ প্রভৃতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নবীন লেখক ব্রেস্‌টেড্ পিতার সহিত সমাধি-ভবনের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই নিমন্ত্রিত হইয়া মিশরীয় নৃপতিবৃন্দের সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হয়েন। কর্ণাকের মন্দির, লক্সর পল্লী অতিক্রম করিয়া নীলনদের পরপারবর্ত্তী উপত্যকাভূমিতে প্রাচীন মিশর-নরপতিদিগের সমাধিক্ষেত্র সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিদ্যমান। বহু মিশরীয় নরপতির সমাধি খনন করিয়া দস্যুতস্করগণ মিশরের দ্রব্যসম্ভার, মহামূল্য রত্নরাজি ইতঃপূর্ব্বেই অপহরণ করিয়াছিল। এখনও এই শ্রেণীর লুণ্ঠনকারীরা সতর্কভাবে সর্ব্বদাই সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় বহু মিশরীয় নরপতির সমাধিভবন ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন প্রসিদ্ধ মিশর রাজবংশীয়ের মৃতদেহও আবিষ্কৃত হইয়া কায়রো শহরের মিউজিয়মে (যাদুঘরে) সংরক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু অনুসন্ধানেও এতদিন টুটু-আনখ্-আমেনের সমাধিভবন আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এত কাল পরে অনুসন্ধানকারীদিগের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীদিগের অন্যতম মিঃ ব্রেসটেড, এই বিস্ময়কর দৃশ্যদর্শনে অভিভূত হইয়া লিখিয়াছেন, "সেদিনের সেই বিচিত্র দৃশ্য চিরদিন আমার মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। স্পন্দিত হৃদয়ে, কম্পিত চরণে সোপানাবলীর সাহায্যে আমরা যখন সমাধি-গৃহের প্রথম প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলাম, তখন আমার হৃদয়ে যেরূপ আলোড়ন ও অপূর্ব্ব ভাবের আতিশয্য অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশের ভাষা কোনও সাহিত্যে নাই। প্রবেশদ্বার সুদৃঢ় ইস্পাতের বৃতিযুক্ত। তাহার উপর শ্বেত যবনিকা ঝুলিতেছিল।
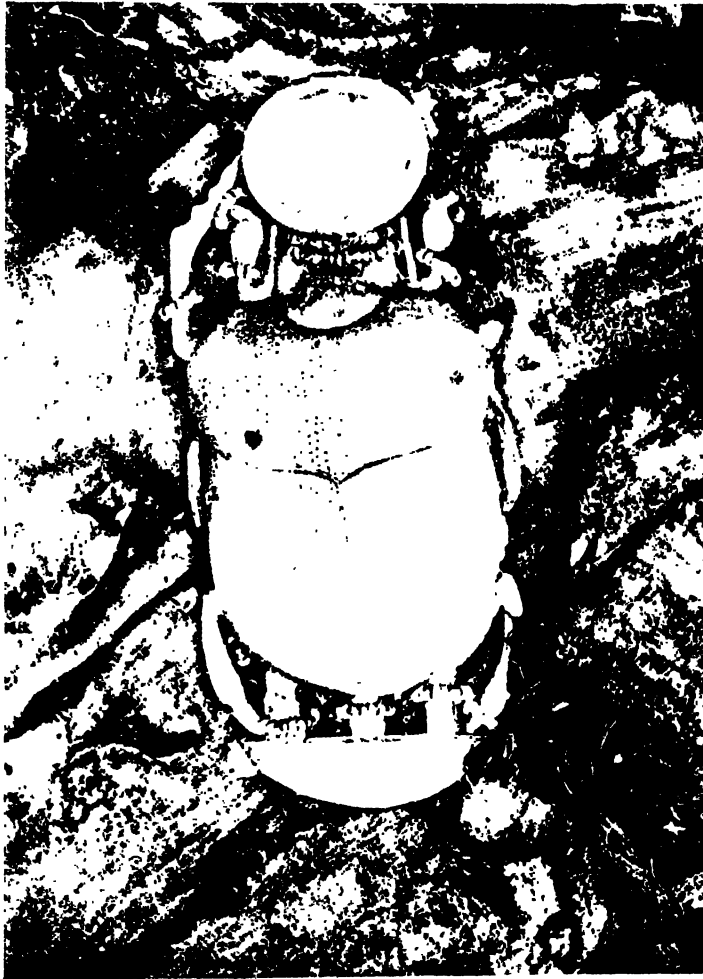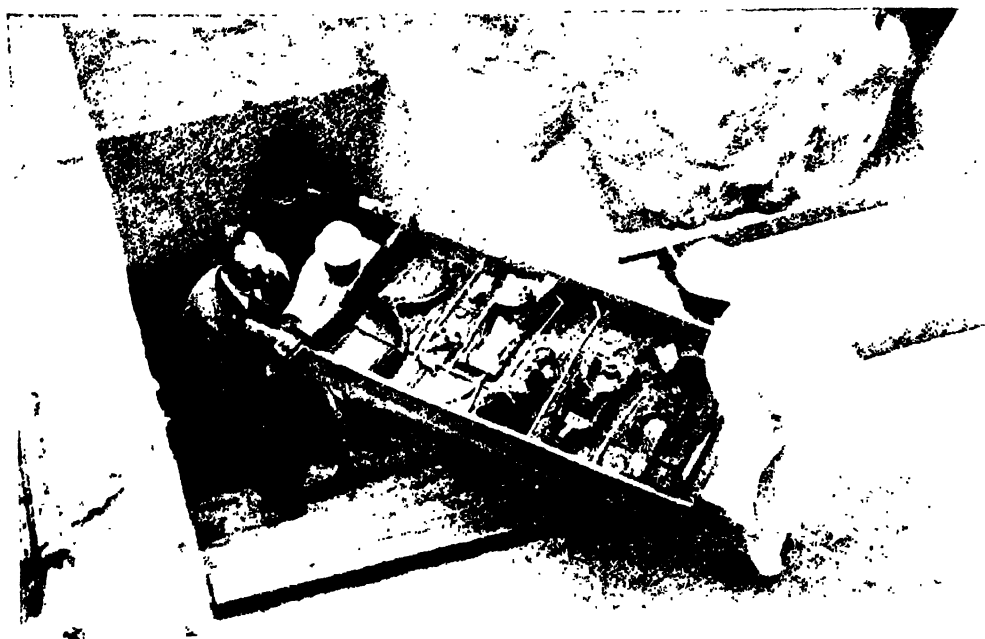
সোণার গুবরে পোকার বক্ষনী—রাজ পরিচ্ছদে সন্নিবিষ্ট।

আমেনহোটেপের নামাঙ্কিত দ্রব্য—রথের ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

কায়রো যাদুঘরে রক্ষিত মৃতদেহ। ইনি যুয়া মিশর রাণী টী'র পিতা। রাণী টী আখেনাটেনের জননী।

টুট্-আনখ-আমেনের কারুকার্য স্বর্ণমণ্ডিত উপাধান।

শবগৃহের রুদ্ধদ্বারপার্শ্বে স্থাপিত টুট্-আনখ-আমেনের দারুমূর্ত্তি যুগল।

মিঃ কার্টার বাম হস্তে যবনিকার প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্ত নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইলেন। তাহার পর তিনি অকস্মাৎ যবনিকা সরাইয়া ফেলিলেন। বিস্ময়স্তব্ধ হৃদয়ে, রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে রেলিংগুলির অবকাশপথে দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে সাড়ে ৩ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মিশরীয় দ্রব্যসম্ভার কক্ষমধ্যে স্তূপীকৃতভাবে বিদ্যমান! মনে হইল, ইহা স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল—না সত্য! বৈদ্যুতিক আলোক-প্রবাহ ক্ষুদ্রতম দ্রব্যের উপর পড়িয়া ঝক্-মক্ করিতেছিল। তাহাদের অতি সূক্ষ্মতম বর্ণরাগের রেখাও আমাদের দৃষ্টি এড়াইল না। সম্মুখেই তথানি সুখসেব্য কোচ বা আসন। সুদূর অতীতে, প্রাচীনতম যুগে এক কোনও তরুণ নরপতি এই আসনে উপবেশন করিতেন—অঙ্গ ঢালিয়া বিশ্রাম করিতেন। চারিপার্শ্বে নানাবিধ সিন্দুক, রত্নাধার, আলাবাষ্টার-নির্ম্মিত নানারূপ পাত্র, কারুকার্য্যমণ্ডিত টুল, চেয়ার এবং রাজ-ভাণ্ডারের দুর্ম্মূল্য দ্রব্যরাজি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। যখন মিশরীয় সভ্যতা চরমসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, রাজগৌরব, সম্ভ্রম ও শক্তির পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল, দেশে যখন ধনৈশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, এই সকল দ্রব্য সেই মহনীয় যুগের নিদর্শন। মিঃ কার্টার আরবী ভাষায় কি বলিলে জনৈক বিশ্বস্ত দেশীয় ব্যক্তি একগোছা চাবি লইয়া আসিল। সুদৃঢ় লৌহ-দ্বারের অর্গল মুক্ত হইল। সেই কর্কশ, ঝন্-ঝন্ শব্দে কিন্তু আমাদের মোহ বা আচ্ছন্নভাবের মাধুর্য্য অপসৃত হইল না। কার্টার সকলকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমাদের তখন সত্যই আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে ইহা মায়া-মরীচিকার মত অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া—মিথ্যা হইয়া যায়।

সমাধিগৃহে টুটেনখামেন আমেনের দারুময় মূর্ত্তি, যেন স্বীয় মৃতদেহের গৃহদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। হস্তে স্বর্ণময় পাশদণ্ড, বাম হস্তে দীর্ঘ স্বর্ণ যষ্টি।

"ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বয়স্কগণ নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের গতিবিধি দেখিতে লাগিলাম। আমার পিতা ও মিঃ উইন্লক্ মিঃ কার্টারের অনুবর্ত্তী হইয়া স্তম্ভিতভাবে কক্ষমধ্যে দাঁড়াইলেন। পিতা একবার চারিদিকে চাহিয়া, নিঃশব্দে মিঃ কার্টারের কর-কম্পন করিলেন। এই প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিকের আননে তখন উত্তেজনা ও আনন্দের ভাব-ধারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, বৈদ্যুতিক আলোকে তাহা আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল না। অনুসন্ধানব্যপদেশে খননকার্য্য করিতে করিতে, প্রথম যে দিন মোহরাঙ্কিত দ্বারপথের আকস্মিককৃত ছিদ্রপথে, বর্ত্তিকার আলোকে এই কক্ষমধ্যস্থ দ্রব্যসম্ভারের আব-ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে দিনের কথা মৃদুস্বরে তিনি বয়স্কগণকে শুনাইয়া দিলেন।

...আলোকে দেখিলাম, তাঁহার নয়নপল্লবে মুক্তার মত অশ্রু-...বিন্দু টল টল করিতেছে। আমার পিতা ও মিঃ উইন্‌লকও ...নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। পরীক্ষা-...শেষে বন্ধুবরা বাহিরে আসিলেন। বুঝিলাম, তাঁহারা ...মনই অভিভূত হইয়াছেন যে, অধিক সময় তথায় থাকি-...বার শক্তি তাঁহাদের নাই।

"মিঃ কার্টার আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি বাল্যাবধি আমাকে বিশেষরূপে ...নিতেন, অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সযত্নে তিনি আমাকে ...ত্যেক দ্রব্য দেখাইতে লাগিলেন। বহু সিন্দুক ও দ্রব্যাধার ...এখনও খোলা হয় নাই, অনেক জিনিষ তিনি তখনও স্বয়ং ...রীক্ষা করিবার অবকাশ পায়েন নাই।

অপূর্ব্বদর্শন রাজপরিচ্ছদ, বিনামা (পাতুকা), কারুকার্য্যখচিত নানা প্রকার বসন এবং রাজার পরিধানের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার একে একে তুলিয়া তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, আমাকেও দেখাইলেন। তিনি একখানি রথের নিকট আমায় লইয়া গেলেন; রথের চাকাগুলি স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত। ব্যাঘ্রচর্ম্মের আচ্ছাদন রথের আসনের উপর বিস্তৃত দেখিলাম। সাড়ে ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশররাজ এই রথের এই আসনে বসিয়া, শোভাযাত্রাসহ মহা আড়ম্বরে নগর প্রদক্ষিণ করিতেন। ঘরের এক পার্শ্বে স্তূপীকৃত ভ্রমণযষ্টি দেখিলাম—আবলুসকাঠে নির্ম্মিত; কোনটির শিরোদেশ গজদন্তনির্ম্মিত, কাহারও মাথা স্বর্ণমণ্ডিত—তাহাতে মূল্যবান্ মণিমুক্তার সমাবেশ। প্রাচীন মিশরীয় চারুশিল্পের কি অপূর্ব্ব নিদর্শন! যে সুদৃশ্য পরিচ্ছদাধারে রাজকীয় বসনাদি সজ্জিত ছিল, তাহার বহির্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রশিল্প—শিল্পীর তুলিকাস্পর্শের এমনই নিপুণতা যে, এখনও তাহা নূতন বলিয়া ভ্রম জন্মে! সুদীর্ঘকালেও তাহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

"একটি মোহরাঙ্কিত রুদ্ধদ্বারের উভয় পার্শ্বে তরুণ নরপতি টুট্‌-আন্‌খ-আমেনের কৃষ্ণবর্ণ দারুমূর্ত্তি যুগল অবস্থিত। উল্লিখিত রুদ্ধদ্বারের অপর পার্শ্বের কক্ষে নরপতির মৃতদেহ রক্ষিত বলিয়া সকলের বিশ্বাস। সে কক্ষ এখনও খুলিয়া দেখা হয় নাই। কার্টারের অনুমোদনক্রমে বামদিকে অবস্থিত পর্য্যঙ্কের তলদেশে হামাগুড়ি দিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। কার্টার বৈদ্যুতিক আলোকাধারসহ আমার অগ্রে অগ্রে সাবধানে আমারই মত হামাগুড়ি দিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। রুদ্ধ দ্বারের নিম্নপ্রদেশের একাংশ ভগ্নাবস্থায় ছিল (পরিশেষে কার্টার উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন)। সেই ফাঁক দিয়া আমরা দ্বিতীয় কক্ষে দৃষ্টিপাত করিলাম।

সমাধি-কক্ষে আবিষ্কৃত টুট্‌-আন্‌খ-আমেনের মূর্ত্তি। জনৈক দেশীয় ব্যক্তি আধারসহ উহা লইয়া যাইতেছে। আলোকচিত্রে দেখাইতেছে, মূর্ত্তি স্বয়ং যেন হাঁটিয়া চলিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে উহা তরুণ নরপতির পত্নীর মূর্ত্তি।

জগদ্বিখ্যাত দ্বিতীয় রামেসিসের বিরাট মূর্ত্তি। টুট-আনখ-আমেনের ১ শত ২৫ বৎসর পরে ইনি মিশরে রাজত্ব করেন। মিশরে পাষাণ-ফলকে ইনিই প্রথম প্রতিমূর্ত্তির প্রবর্ত্তন করেন। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ রাজগণের কীর্ত্তিস্তম্ভে, তাঁহাদের নাম মুছিয়া ফেলিয়া, রামেসিস নিজের নাম উৎকীর্ণ করাইতেন।

টুট-আনখ আমেনের সমাধিক্ষেত্রের বহির্দৃশ্য—সমাধিক্ষেত্রের পূর্ব্ব উপত্যকা ভূমি।

এডফু ও আস্যুয়ানের মধ্যবর্তী নদীপার্শ্বস্থ কম্‌ওম্বো মন্দির।

আবিষ্কৃত প্রথম সেটীর মন্দির-প্রাচীরে উৎকীর্ণ মিশরীয় শিল্পচাতুর্য্য।
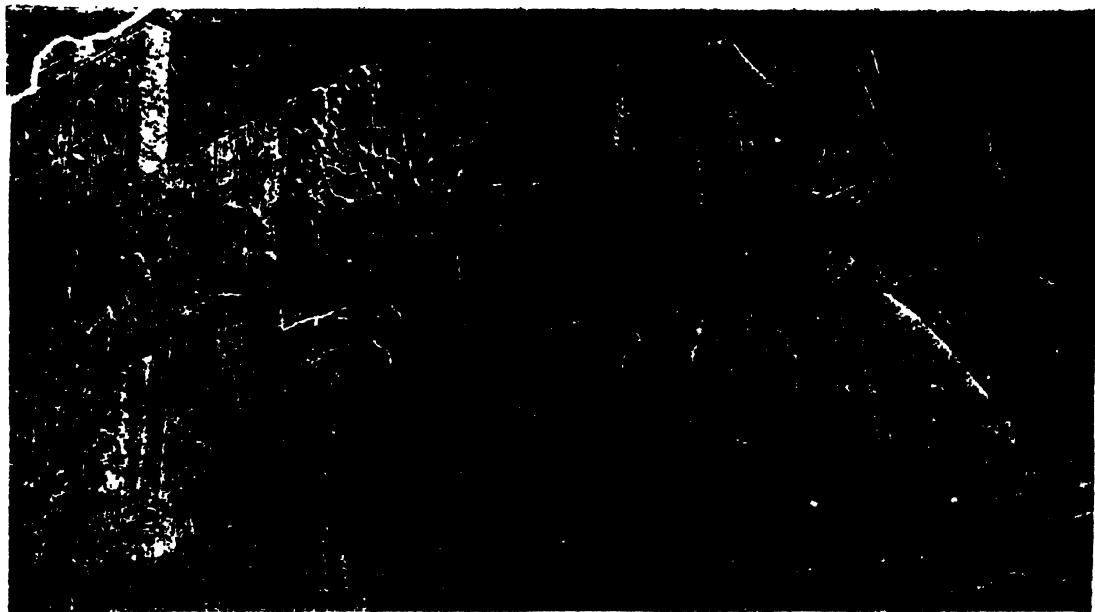
দেখিলাম, সে কক্ষেও অসংখ্য দ্রব্য স্তূপীকৃত হইয়া আছে। ভগ্ন দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, দাঁড়াইবার স্থানমাত্র নাই। মিঃ কার্টার আমাকে বলিলেন, দ্বিতীয় কক্ষটি তিনি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবেন। প্রথম কক্ষের দ্রব্যসম্ভার স্থানান্তরিত হইলে, দ্বিতীয় কক্ষের কার্য্য আরব্ধ হইবে। দুই বৎসরের পূর্ব্বে সে কক্ষের কার্য্য সমাপ্ত হইবার নহে।

...এর মুখাকৃতিবিশিষ্ট শয্যা—রাজপরিচ্ছদে পাওয়া গিয়াছে।

"গভীর শ্রদ্ধাসহকারে নিপুণ কলাবিদের ন্যায় কার্টার এক একটি দ্রব্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিন্দুকগুলি খুলা হইলে দেখিলাম, তন্মধ্যে মহামূল্য মণিমুক্তা ও ধনসম্পদ্ রহিয়াছে—পরিমাণ এত অপর্য্যাপ্ত যে, একবার দেখিয়া তাহার মূল্যনির্দ্দেশ করা বা গুরুত্ব উপলব্ধি করা কোনও মানবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। সাণ্ডালগুলির অধিকাংশই স্বর্ণরচিত—তাহাতে সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ। উপাধানগুলিও কি সুন্দর! তাহার কারুকার্য্যও অপূর্ব্ব। একটি ক্ষুদ্র আধারে রাজার কেশগুচ্ছ রক্ষিত দেখিলাম—আধারে উৎকীর্ণ লেখমালাদৃষ্টে তাহা বুঝা গেল। শিশুকালের কর্ত্তিত কেশগুচ্ছ সম্ভবতঃ মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোনও স্নেহময়ী রমণী স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরলোকের যাত্রাপথে—সমাধিভবনে তাহা উপনীত হইয়া থাকিবে। প্রথম কক্ষে শুধু একটিমাত্র পদার্থের বিশেষ অভাব দেখিলাম। তরুণ নরপতির রাজত্বকালে কাচনির্ম্মিত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ হইয়াছিল বলিয়া মিশরের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। কাচের এমন অপূর্ব্ব উন্নতি আর কোথাও কখনও হয় নাই। সে যুগের শিল্পীরা কাচের সাহায্যে অতি মনোরম ক... কার্য্যযুক্ত না... প্রকার ... প্রস্তুত করি... সেই সময়ের মিশরীয় ক...র কারুশিল্প ... বর্ত্তী যুগে সক... দেশে অনুকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও কোনও দেশ সেকালের কাচের উপর সূক্ষ্মতম কারুশিল্পের সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেই বিচিত্র কাচের জিনিষ এই কক্ষে দেখিলাম না, শুধু কাচের মালা কয়েক ছড়া মাত্র আছে। দ্বিতীয় কক্ষে হয় ত তাহার দর্শন মিলিলেও মিলিতে পারে।
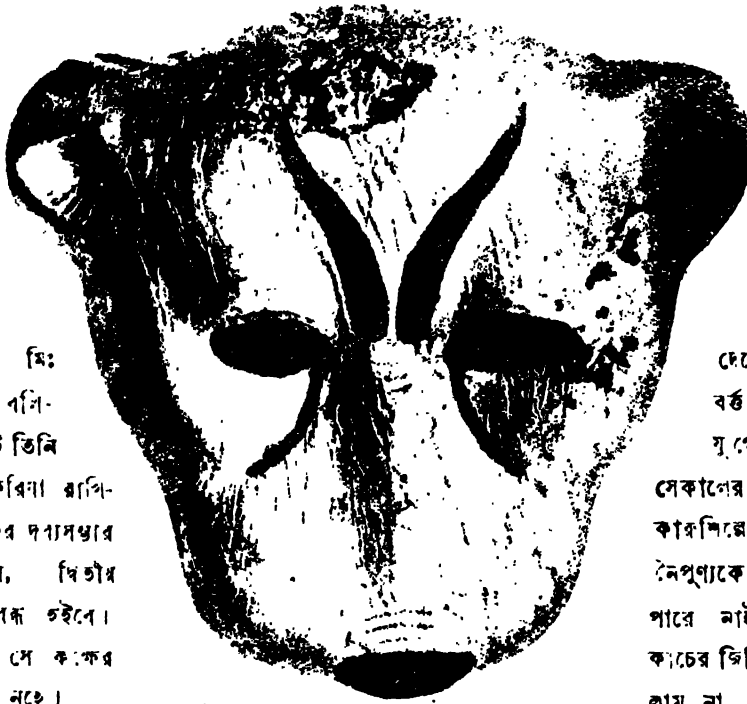
"কাচনির্ম্মিত কোনও পদার্থ দেখিতে না পাইলেও, এই কক্ষে শিল্পচাতুর্য্যের যে বিস্ময়কর সমাবেশ দেখিলাম, তাহাতে শুধু মিশর নহে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। প্রাচীন মিশরীয়গণ শুধু সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল না, তাহারা সামান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যও সুন্দর করিয়া তৈয়ার করিত। বর্ত্তমান যুগে কোনও প্রতীচ্য-দেশেও সামান্য বিষয়ে এমন অপূর্ব্ব শিল্পানুরাগ ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার নিদর্শন নাই। পানপাত্রগুলি এমনই ভাবে নির্ম্মিত, যেন তাহাদের ধরিবার দণ্ডগুলি এক একটি মৃণাল—নমনীয় ও কমনীয়ভাবে পানাধারের সহিত মিলিত হইয়াছে, ঠিক যেন পাত্রটি মৃণালযুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মের আকার ধারণ করিয়াছে! সূপকার বা পাচক যে সকল কড়াই, হাঁড়ি, হাতা প্রভৃতির সাহায্যে রন্ধন করিত, সেগুলিই বা কি চমৎকার! কোনটি পাখীর আকারবিশিষ্ট, কোনটি বা অন্য কোনও জন্তুর মত; শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেকটিতে যেন বিশেষ মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুসংখ্যক অতি

রাজপালঙ্কের শিরোদেশে কাষ্ঠময় টাইফন মূর্ত্তি।

... দ্রব্য এই ... দেখিলাম, ... প্রত্যেক- ... অননুকরণ- ... শিল্পচাতু- ... র অভিব্যক্তি ... । সবই সুন্দর, সমস্তই ... । যেন ... সৃষ্টি করিবার জন্যই সেগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটা পাদপীঠ দেখিলাম, যাহাতে এমনই সূক্ষ্ম শিল্পের সমাবেশ যে, রাজসিংহাসনের শিল্পচাতুর্য্য তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। ... আনখ-আমেনের সমাধি- ... হতে প্রাপ্ত দ্রব্য নিচয়ে যে সকল বিভিন্ন প্রকার শিল্প-চাতুর্য্য রহিয়াছে, বহু শতাব্দী ধরিয়া শিল্পিগণ তাহা হইতে নানা প্রকার নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন।"

আমেরিকার সুবিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক মিঃ বার্নার্ড ওবেন্ উইলিয়াম্‌স মিশরে গিয়া তত্রত্য প্রাচীন রাজন্যবর্গের সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। টুট-আনখ-আমেনের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার দেখিয়া তিনিও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে বুঝা যায় যে, বেলজিয়মের রাণী সেই সময় নবাবিষ্কৃত ফারাও নরপতির সমাধিভবন দেখিতে আসিয়াছিলেন।

আমনহোটপ মিশরপতি আখেনেটনের মৃতদেহ উত্‌স-কালেটেল্ এল্ আমার্ণা হইতে রাজন্যবর্গের সমাধিক্ষেত্রে আনীত হইয়াছিল। তাঁহার এই সমাধিভবন তেমন প্রসিদ্ধ নহে। উল্লিখিত সমাধিভবন সম্প্রতি আলোকচিত্র রচনার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মিঃ উইলিয়ামসের বিবরণ পাঠে জানা যায়, টুট-আনখ-আমেনের সমাধির প্রথম কক্ষে তরুণ রাজার যে দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি-যুগল তাঁহারই সমাধি-কক্ষের দ্বাররক্ষার্থ স্থাপিত, তাহাদের গাত্রবর্ণ মসীকৃষ্ণ। মিশরের শিল্পী স্ত্রীমূর্ত্তি হইতে পুরুষমূর্ত্তির পার্থক্য বুঝাইবার জন্য পুরুষকে কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করিয়া থাকে। এই দারুময় প্রতিকৃতির মস্তকে মিশরীয় উষ্ণীষ, শীর্ষদেশে রাজচিহ্ন-বিজ্ঞাপক সর্প ফণা ধরিয়া আছে। এই সর্প ব্রোঞ্জ ও স্বর্ণনির্ম্মিত। গলবন্ধ, বাহুর মধ্যভাগ, মণিবন্ধ, বাজুদণ্ড ও দীর্ঘ যষ্টি—সবই স্বর্ণমণ্ডিত। চরণের পাদুকাও সুবর্ণনির্ম্মিত। রাজার বিশাল নয়নযুগল সুন্দর, ... কনকখচিত।

উইলিয়াম্‌স যে সকল বড় বড় সিন্দুক দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটির বিষয় বর্ণনা করিবার সময় তিনি বলিয়াছেন

যে, উহার কারুকার্য্যের বর্ণনা করিবার ভাষা মিলে না। তথাপি উহার সমুদায় অংশ তিনি দেখিতে পারেন নাই। এই আধারের ডালায় ও পার্শ্বদেশে নানাবিধ শিকারের চিত্র অঙ্কিত। কোথাও রাজা যুদ্ধ করিতেছেন, কোথাও মৃগয়ায় ব্যাপৃত। যে কক্ষে কাষ্ঠাও নরপতির শব রক্ষিত আছে, তাহার রুদ্ধদ্বারটি কাষ্ঠনির্ম্মিত। উপরিভাগ পুরু সোনার পাত দিয়া আবৃত। উহার ঔজ্জ্বল্য প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে। সমগ্র দ্বারটির দৈর্ঘ্য ১৮ হইতে ২০ ফুট এবং প্রস্থে ১১ ফুট হইতে পারে। লেখক উহা মাপিয়া দেখিবার সুযোগ পায়েন নাই। সমগ্র দ্বারে নানাবিধ শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বারটির নিম্নভাগ কোনওরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখন উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেখক ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন, সংগৃহীত দ্রব্যের আলোকচিত্র লইয়াছেন। তিনি টুট-আন্‌খ-আমেনের দারুনির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। ইহাতে তরুণ নরপতির সাদৃশ্য পরিস্ফুট বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। অত্যন্ত শক্ত কাঠ কুঁদিয়া শিল্পী এই মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়াছিল। মূর্ত্তিটির যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ করিলে মানায়, তথায় সেই বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ আছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, উহা টুট-আন্‌খ-আমেনের পত্নীর মূর্ত্তি।

টুট-আন্‌খ-আমেনের সমাধিক্ষেত্রে যাইবার নীলনদস্থিত পারঘাট।

আলাবাষ্টার-নির্ম্মিত সুদৃশ্য তৈজসগুলির বর্ণনায় উইলিয়ামস্ যেন পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই বিচিত্রদর্শন, কারুকার্য্যসমন্বিত আধারগুলি প্রাচীনযুগের গন্ধানুলেপনে এখনও পূর্ণ আছে। তাহাদের সুগন্ধ সাড়ে ৩ হাজার বৎসরেও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে সূর্য্যালোক পাইলে গন্ধানুলেপন আঠার মত চটচটে হইয়া যায়। রাজপরিচ্ছদে তিনি এক প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যরচিত বন্ধনী (buckle) দেখিয়াছেন; তাহার আকার গুবরে পোকার মত। পুরাকালে মিশরীয়গণ গুবরে পোকাকে সূর্য্যদেবতার অনুচররূপে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। মিশরীয়গণ গুবরে পোকার সুন্দর প্রতিকৃতি রচনা করিয়া তদ্দ্বারা শীলমোহরের কায চালাইত। আলোচ্য বন্ধনীটিতে সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজপরিচ্ছদাধারে চিতাবাঘের মুখাকৃতিবিশিষ্ট আর একটি বন্ধনীও তিনি দেখিয়াছিলেন। একটি রাজবেশে উহা সন্নিবিষ্ট ছিল। শিল্পীর নৈপুণ্য ইহাতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। টুট-আন্‌খ-আমেনের ব্যবহৃত অপূর্ব্বদর্শন সাণ্ডাল জুতা দেখিয়া লেখক অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। পাদুকা চর্ম্মনির্ম্মিত, কিন্তু তাহার বন্ধনী ও

...য় পার্শ্ব স্বর্ণরচিত। মনোরম পদ্মগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। ...ল্পীর নিপুণতা দেখিলে বিস্ময়মুগ্ধ হইতে হয়।

মিশররাজ যে কোচ বা সুখসেব্য পর্য্যঙ্ক ব্যবহার করি...ন, তাহার একপ্রান্তে একটি 'টাইফন্' মুখ ক্ষোদিত। ...র মুখাগ্রভাগ দেখিতে অনেকটা অশ্বের মত। কাষ্ঠ ...হইতে কুঁদিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, জন্তুর দন্ত ও জিহ্বা ...দন্তনির্ম্মিত। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এই ...লঙ্কগুলি ব্যাবিলনে প্রস্তুত। সম্ভবতঃ ব্যাবিলনের রাজা উপঢৌকনস্বরূপ টুট্-আন্খ-আমেনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মিশরাধিপকে পাঠাইয়া দিয়া থাকিবেন। পর্য্যঙ্কগুলির যোড়ের মুখ ব্রোঞ্জের দ্বারা যুক্ত—ইহাতে উল্লিখিত যুক্তি সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ, মিশরীয় শিল্পীরা কোনও দ্রব্য এরূপভাবে প্রস্তুত করে না।

লেখক টুট্-আন্খ-আমেনের সমাধিভবন পর্য্যবেক্ষণের পর দ্বিতীয় আমেনেফিসের সমাধি দেখিতে গিয়াছিলেন। ইনি টুট্-আন্খ-আমেনের ৭০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমেনেফিসের মৃতদেহ বহুবার বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাত সহ্য করিয়াছে। বহু বৎসর ধরিয়া কৌতূহলী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহার শবদেহের ছায়াচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে আরও ৩টি দেহ রক্ষিত আছে। তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলে মনে শুধু বীভৎসরসেরই সঞ্চার হয়। লেখক বলিয়াছেন, টুট্-আন্খ-আমেনের মৃতদেহ যখন লোকলোচনের গোচরীভূত হইবে, তখন সে মূর্ত্তিরও এমনই দুর্দ্দশা হইতে পারে। লেখক আলোচনা-প্রসঙ্গে দুই জন সংবাদপত্র-প্রতিনিধির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এক জন বলিতেছিল,—"পার্শ্বের ঘরে যদি টুট্ আন্খ-আমেনের মৃতদেহ সত্যই থাকে, তবে মনে হয়, তাঁহার দেহে বহু মণিমাণিক্যের অলঙ্কার পাওয়া যাইবে।" অপর জন উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, যদি অবিকৃত অবস্থায় থাকেন। তবে একটা কথা, বাহিরে আসিলে আর সে সব দেখা যাইবে না—হয় ত তখন রিক্ত শবই দেখা যাইবে!"

রাণী নেফারতিতী—আমেনেটিসের পত্নী, টুট্-আন্খ-আমেনের শ্বশ্রূমাতা

তরুণ ফারাও নরপতির সমাধি আবিষ্কারে প্রাচীন মিশরের ধনসম্পদ ও শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া বিশ্ববাসী বিস্মিত হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন লোক বলিতেছেন, সমাধিভবন খনন করিয়া শবের শান্তিভঙ্গ করা হইয়াছে। কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, টুট্-আন্খ-আমেনের পবিত্র সমাধিক্ষেত্র এমনভাবে পর্য্যুদস্ত হওয়াতে লর্ড কার্নারভান অসময়ে

ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রাইডার হ্যাগার্ড, মারী করেলী প্রভৃতি আছেন। অবশ্য অনেকে ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন কুসংস্কার বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এখনও অনেক "শিক্ষিত" নরনারীর মন হইতে এই সব সংস্কার বা কুসংস্কার দূর হয় নাই। ইহার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, কে বলিতে পারে?

সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের ফুলের তোড়া—আধারে স্থাপিত।

মিশরের নৃপতিদিগের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাদের অশরীরী আত্মা আজও রহিয়াছে কি না, সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সাধ্য কাহার আছে? তবে প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে ফারাওর সমাধি মন্দিরে প্রাপ্ত দ্রব্যসম্ভার যে অমূল্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সংখ্যায় ফারাও নরপতির সমাধি-ভবনের ১৫খানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

ফারাও নরপতির রথের চাকা।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

জ্যোতিষী মহাশয়

(গল্প)

১

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার কোনও ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর একটি কক্ষে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মুণ্ডিত গুম্ফশ্মশ্রু প্রৌঢ়বয়স্ক স্থূলকায় শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। গৃহিণী ও কন্যারা নিম্নতলে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত, ছেলেরা ফুটবলের ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। জ্যোতিষী মহাশয় একাকী বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, আর আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছেন।

আজ প্রায় ২০ বৎসরকাল এই কলিকাতা সহরে তিনি জ্যোতিষ 'প্র্যাকটিস্' করিতেছেন, কিন্তু এমন দুর্ব্বৎসর কখনও হয় নাই। খবরের কাগজে তাঁহার বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে—সে সকল বিজ্ঞাপনের বিলের তাগাদায় তিনি অস্থির,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটি কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডারও আসিতেছে না। গরদ পরিয়া, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, তিনি তাঁহার দ্বারলগ্ন সাইনবোর্ডের ঘোষণা অনুসারে প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া হত্যা দিতেছেন, কিন্তু একটি লোকও হাত গণাইতে আসিতেছে না! বাড়ীর ভাড়া, ভৃত্যের বেতন, বিজ্ঞাপনের বিলের অনেক টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে; প্রতিদিনকার বাজার-খরচ চলাই কঠিন, এখন কি উপায় করিলে কিছু টাকা আসে, এই চিন্তাতে তিনি মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উত্থিত হইল—"জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন?"

শ্রবণমাত্র, হুঁকাটি দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সন্তর্পণে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়া, চিক ফাঁক করিয়া লোকটাকে দেখিলেন। বুঝিলেন, বাড়ীওয়ালার লোক নহে, বিজ্ঞাপনের বিল আদায়কারী দ্বারবানও নহে—মক্কেল হইলেও হইতে পারে। তখন নির্ভয়ে হাঁকিলেন—"কে ও?"

নিম্ন হইতে স্বর উত্থিত হইল, "জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন কি? তাঁর কাছে একটু দরকারে এসেছি।"

"আচ্ছা দাঁড়ান"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় চট্ করিয়া তাঁহার মিলের ধুতি ছাড়িয়া গরদ পরিলেন, চটি জুতা ছাড়িয়া খড়ম পায়ে দিলেন। আশান্বিত হৃদয়ে খট্ খট্ করিতে করিতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়া, সদর দরজা খুলিয়া তিনি প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন।

লোকটির বয়স আন্দাজ ৭৫ বৎসর; পরিধানে ধুতির উপর আধময়লা চাপকান, তাহার উপর পাকানো চাদর বিন্যস্ত—আফিসের বেশ। তিনি বলিলেন, "একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"আসুন"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন। অয়েলক্লথ মোড়া একটি টেবিলের তিন দিকে তিনখানি চেয়ার এবং এক দিকে একখানি বেঞ্চি। জ্যোতিষী মহাশয় একখানি চেয়ারে বসিয়া, অপর একখানিতে আগন্তুককে বসাইলেন।

২

আগন্তুক, আসন গ্রহণ করিয়া, যেন বড় ক্লান্তস্বরে বলিলেন, "জ্যোতিষী মশায়, শারীরিক কুশল ত?"

জ্যোতিষী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন। যাহারা গণাইতে আসে, তাহারা কেহ ত কৈ এরূপভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে না। যাহা হউক, তিনি শিরশ্চালনা ও একটা অস্ফুট ধ্বনির দ্বারা নিজ কুশল জ্ঞাপন করিলেন।

লোকটি অর্দ্ধমিনিটকাল নীরব থাকিয়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "তার পর—কায-কর্ম্ম চলছে কেমন?"

এই প্রশ্নে জ্যোতিষী মহাশয়ের মনে একটু রাগ হইল। কেন রে বাপু! তোর সে খোঁজে দরকার কি? গণাইতে আসিয়া থাকিস্, তাই বল্, টাকা বাহির কর্। কিন্তু এই বিরক্তিভাব মনেই গোপন করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "চলছে মন্দ নয়। আপনার নামটি কি?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমার নাম?—নামটা,—আচ্ছা সেটা পরে জানাব না হয়। এখন যে কাযের জন্য এসেছি, সেইটে প্রথমে নিবেদন করি।"—বলিয়া চুপ করিলেন।

নিজ নাম বলিতে লোকটির এই অনিচ্ছা দেখিয়া জ্যোতিষী যেন একটু সন্দেহযুক্ত হইলেন; মুখে বলিলেন, "সেই ভাল।"

বাবুটি তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি বল্লেন, আপনার কাজ-কর্ম্ম মন্দ চল্‌ছে না। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, যতটা ভাল চলা উচিত, তা চল্‌ছে না। কেমন কি না?"

লোকটা যে গণাইতে আসে নাই, ইহা জ্যোতিষী মহাশয় এবার নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া, বড় রাগ হইল। তিনি আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "আঃ, ও সব ভূমিকা রেখে দিন না, মশায়! কি জন্তে আপনি এসেছেন, সেইটে খোলসা ক'রে বলুন। সন্ধ্যে হয়ে এল, আমার পূজো-আহ্নিকের সময় ব'য়ে যাচ্ছে।"

বাবুটি এই মৃদু ভৎ'সনাটুকু মোটেই গায়ে মাখিলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, যে ব্যবসাই বলুন, আজকাল যে রকম দিন-সময় পড়েছে, বিনা বিজ্ঞাপনে—"

জ্যোতিষী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কি কোনও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ক্যান্‌ভাসার? তা হ'লে বৃথা আপনার সময় নষ্ট করবেন না। আমি দু'খানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। আর নূতন কোনও কাগজে"—বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

লোকটি শান্তভাবে বলিলেন, "আহা, চট্‌ছেন কেন? আমি বিজ্ঞাপন ক্যান্‌ভাসার নই—বসুন বসুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কি? ডিটেক্‌টিভ?"

"আজ্ঞে না, তাও নই। আমার চৌদ্দপুরুষে কখনও পুলিসের ছায়া মাড়ায় নি। আমি বল্‌ছিলাম কি, আপনার নামে আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। আপনার এক পয়সাও লাগ্‌বে না; খরচ আমার।"

এতক্ষণে জ্যোতিষী মহাশয়ের সন্দেহ হইল, লোকটা বোধ হয় পাগল। যাহা হউক, বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া তাঁহার একটু কৌতূহলও হইল। আবার তিনি বসিয়া, আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বাবুটি বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভাবছেন, কোথাকার কে তার ঠিক নেই, নিজের খরচে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার উপকার করতে আসে কেন? বিজ্ঞাপনটির দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনার কিছু উপকার হবে বটে, কিন্তু আসলে সেটি আমারই একটা অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্তে। অত কথায় কাজ কি, বিজ্ঞাপনটি পড়েই দেখুন না।"—বলিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একখানা হস্তলিখিত কাগজ বাহির করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় টেবিলের দেরাজ টানিয়া তাঁহার চশমাটি বাহির করিয়া চোখে দিলেন। তাহার পর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন—

হিন্দু জ্যোতিষ! ফলিত জ্যোতিষ!

আমি বহুকালাবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া, উভয় প্রণালীর সমন্বয়সাধনে যত্নবান্ আছি। আমার রিসার্চ্চের (গবেষণার) সুবিধার জন্ত জাতি ও বয়স নির্ব্বিশেষে কয়েকজন পস্থিউমস্ চাইল্ড (ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যাহাদের পিতৃ-বিয়োগ ঘটিয়াছে) তাঁহাদের শারীর স্থান ও হস্তরেখা পরীক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। আজন্ম পিতৃহীন যে সকল যুবকের চক্ষে এই বিজ্ঞাপনটি পড়িবে, আমার সানুনয় অনুরোধ, দেশীয় তত্ত্ববিদ্যার উন্নতিকল্পে তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্র দ্বারায় নিজ নিজ জন্ম-তারিখ-সমন্বিত পারিবারিক ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে আমায় লিখিয়া পাঠান; আমি অবসরক্রমে একে একে তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিব। ইতি—

শ্রীকমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব।
৯নং বেণী দত্তের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া জ্যোতিষী মহাশয় সন্দিগ্ধভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি? আপনার উদ্দেশ্যটা কি?"

বাবুটি চুপি চুপি বলিলেন, "উদ্দেশ্যটা বুঝ্‌তে পারলেন না? কোনও কারণে একটি লোকের আমি সন্ধান করছি; সে লোকটি আজন্ম পিতৃহীন। কিন্তু কোথায় যে সে আছে, তাও জানিনে, তার নাম কি, তাও জানিনে। তবে পারিবারিক ইতিহাসটুকু পেলেই আমি বুঝ্‌তে পারবো, ঠিক সেই লোক কি না।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কেন, তাকে খুঁজছেন কেন?"

"সে কথাটি এখন প্রকাশ করা ঠিক হবে না। যদি সে ... কে পাওয়া যায়, তা হ'লে আপনি তখন সবই জানতে ... বেন। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দিলেই, ... বিজ্ঞাপনটি আমি কয়েকখানি কাগজে ছাপতে দিই। ... এতে কিছুই লোকসান নেই, বরং দেশ-বিদেশে ... টা আরও জাহির হয়ে যাবে। বিশেষ, যাঁরা কোনও ... রিসার্চে প্রবৃত্ত, আজকাল লোক তাঁদের খুব সম্মানের ... দেখে। এতে পরোক্ষভাবে, আপনার কারকর্ম্মের ... বাই হবে। বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আচ্ছা, তা যেন হ'ল। ... লোকটিকেই যখন আপনার দরকার, তখন তার পারিবারিক ইতিহাসটুকু দিয়ে, নিজের নামেই বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছেন না কেন?"

বাবুটি বলিলেন, "কেন জানেন? সে লোক যদি এখন বেঁচে না থাকে, অন্য কেউ যদি জাল সেজে এসে তার নাম নিয়ে ঠকাতে চেষ্টা করে, এই জন্যে আর কি! বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমি আরও ৩৪ লাইন যোগ ক'রে দিতে চাই।"

"কি যোগ করবেন, বলুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় তখন কলম লইয়া, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে যোগ করিয়া দিলেন,—

"নির্ভুল ও অকাট্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার পারিশ্রমিক ১০৲ হইতে ৫০৲ মাত্র। প্রতিদিন প্রাতে সাতটা হইতে দশম ঘটিকা অবধি সমাগত নরনারীগণের হস্তরেখা বিচারে ফলাফল বর্ণনা করিয়া থাকি, পারিশ্রমিক ২৲ মাত্র।"

বাবুটি দেখিলেন, ইহা যোগ করিতে হইলে ৩৪ লাইনের মূল্য বাড়িয়া যায়। তথাপি তিনি স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তা বেশ। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠিপত্র যা আসবে, তা সব রেখে দেবেন, আমি মাঝে মাঝে এসে সেগুলি দেখে যাব।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান না, সেগুলো চাকর দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এখন। আবার কষ্ট ক'রে রোজ রোজ আপনি আসবেন!"

বাবুটি বলিলেন, "না না, কষ্ট কিছুই নয়। চাকর দিয়ে পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখে যাব। আজ হ'ল গিয়ে বুধবার ত? বিজ্ঞাপন বেরুতে তার জবাব আসতে অন্ততঃ ৩।৪ দিন লাগবে; রবিবারে এই সময় আবার আমি আসবো। আচ্ছা, এখন উঠি তবে—প্রণাম।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"কে লোকটা? নাম-ধাম কিছুই বল্লে না। যাবার সময় প্রণাম ব'লে গেল, তা হ'লে ব্রাহ্মণ নয়। কোনও মন্দ উদ্দেশ্য আছে কি না, তাই বা কে জানে!"

সন্ধ্যা হইল দেখিয়া, সদর বন্ধ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় খট্ খট্ করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

৩

রবিবার দিন যথাসময়ে সেই বাবুটি আসিয়া দর্শন দিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কোন চিঠি আসে নাই জানিয়া, ক্ষুণ্ণমনে তিনি প্রস্থান করিতেছিলেন, জ্যোতিষী আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া, কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। কথার কৌশলে তাঁহার পরিচয়, এবং বিজ্ঞাপন দিয়া লোক খোঁজার উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বাবুটি জ্যোতিষী মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিয়া, হাত দুটি জোড় করিয়া কহিলেন, "আমার পরিচয় দিলাম না ব'লে, সব কথা খুলে বললাম না ব'লে, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা আছে বলেই এ সব কথা এখন প্রকাশ করতে পারছিনে। যদি সে লোককে আমি খুঁজে পাই, তা হ'লে আমার যথাসাধ্য প্রণামী আপনাকে দিয়ে, আপনাকে খুসী করবার চেষ্টা করবো।"

"না না,—তার জন্যে আর কি, তার জন্যে আর কি! ওটা একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম বৈ ত নয়। সে যাক্।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। জিনিষ-পত্রের মহার্ঘতা, রাজপথে গুণ্ডার উপদ্রব "স্বদেশহিতৈষী"গণের ভণ্ডামী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে দুইজনে আলোচনা চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জানালার বাহিরে লম্বা চুলে টেড়িকাটা, চক্ষু বসা, খালি গা' এক যুবক দেখা দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ইসারায় তাহাকে কি জানাইতেই সে তখনই সেস্থান পরিত্যাগ করিল। আগন্তুক সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি সে যুবককে দেখিতে পান নাই, বা তাহার প্রতি জ্যোতিষী মহাশয়ের ইঙ্গিতও লক্ষ্য করেন নাই।

অবশেষে সন্ধ্যা হয় দেখিয়া বাবুটি উঠিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে, পশু বিকেলে আর একবার এসে খবর নিয়ে যাব। এখন আসি তা হ'লে। প্রণাম।"

"জয়োস্তু" বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বোক্ত টেড়িকাটা চক্ষু বসা যুবক, রাস্তার অপর পারে পাণের দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত চোখোচোখি হইতেই সে একটু হাসিল। বাবুটি অল্প দূর অগ্রসর হইলে, জ্যোতিষী মহাশয় একটা ইঙ্গিত করিলেন। সেই যুবক তৎক্ষণাৎ বাবুটির পিছু লইল। জ্যোতিষী মহাশয় দরজা বন্ধ করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই যুবক ফিরিয়া আসিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের সদর দরজার কড়া নাড়িল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠন হস্তে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া যুবককে ভিতরে ডাকিলেন। সে ভিতরে আসিলে, দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে কেবলা, কিছু সন্ধান পেলি?"

যুবকের নাম কেবলরাম। সে দন্তবিস্তার করিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, সব সন্ধানই নিয়ে এলাম। আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে, এই কেবলরামের অসাধ্যি কি কিছু আছে?"

"কি সন্ধান পেলি বল্ দেখি!"

কেবলরাম মাথাটি এক ধারে নত করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, টাকা দুটো!"

জ্যোতিষী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আগে টাকা নিয়ে তবে কথা বলবি? পাড়ার ছেলে তোরা, আমাকে এত অবিশ্বাস?"

কেবল বলিল, "হেঁ হেঁ অবিশ্বাসের কথা কে বল্ছে? তবে আজ টাকা দুটোর বিশেষ প্রয়োজন, ঠাকুর মশায়। আগে রাত ৯টা অবধি খোলা থাকত, আজকাল অ[illegible]র শালারা ৮টা বাজ্লেই দোকান বন্ধ ক'রে দেয়। ত[illegible] পাণওয়ালার দোকান থেকে ডবল দাম দিয়ে জলমিশা[illegible] কিন্তে হয়। সাতটা বেজে গেছে কি না, তাই বল্ছি।"

কেবলরামের এই স্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি শ্রবণ করিয়া একটু হাসিয়া, তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জ্যোতি[illegible] মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কেব[illegible] রামের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "এই ঘরটার মধ্যে আয়।"—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকিলেন।

কেবলরাম টাকা দুইটি ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বৈঠক খানা-ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠনটি টেবিলের উপর রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "কি কি জেনে এলি, বল্ দেখি। খুব আস্তে আস্তে কথা কোস্।"

কেবল তাঁহার অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "তার নাম হরিহর মিত্তির। টনি বাড়ীতে চাকরী করে। ১০০৲ মাইনে পায়। শ্যামবাজারে ৩২নং কালু ঘোষের লেনে থাকে। নিজের বাড়ী নয়, ভাড়া বাড়ী। যা যা জান্তে চেয়েছিলেন, দেখুন, সবই জেনে এসেছি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক খবর পেয়েছিস্ ত? ভুলটুল হয় নি?"

কেবল বলিল, "আজ্ঞে না, ভুল হবার যো কি? সেই পাড়ায় ৩।৪ জন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে এসেছি।"—হঠাৎ কক্ষস্থিত ঘড়ীর দিকে নজর পড়ায় বলিল, "উঃ, সাড়ে সাতটা যে! এখন আসি তবে ঠাকুর মশায়—প্রেণাম।"—বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিয়া নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তাকে প্রেহার ট্রেহার দিতে হবে কি? তা যদি দরকার হয় ত বল্বেন। কিন্তু সে ১০৲ টাকার কমে হবে না, আরও ২।১ জনকে সঙ্গে নিতে হবে কি না!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "না, সে সব এখন কিছু দরকার নেই।"

"আচ্ছা—যদি দরকার হয় ত পরে জানাবেন। আমরা আপনার হুকুমের চাকর। চল্লুম তবে, প্রেণাম।"—বলিয়া কেবলরাম দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

৪

একদিন অপরাহ্ণকালে জ্যোতিষী মহাশয়ের গৃহিণী, চৈতন্য লাইব্রেরীর একখানি উপন্যাস হস্তে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, কাল থেকে দেখ্‌ছি সদাই তুমি অন্যমনস্ক হয়ে থাক, মনে মনে কি যেন ভাবছ। কি হয়েছে গা?"

জ্যোতিষী মহাশয় প্রথমে তাঁহার চিন্তার বিষয় স্ত্রীকে বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া অবশেষে ব্যাপারটা জানাইতেই হইল। শুনিয়া গৃহিণী কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। শেষে উপন্যাসখানি কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া, তিনি স্বামীর নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"কি বল দেখি?"

"লোকটি ত এটর্ণি আফিসের বড়বাবু?"

"বড়বাবু কি না, তা জানি নে, ১০০৲ মাইনে পায় তাই শুনেছি।"

"আচ্ছা ধর, যদি এই রকম হয়?"

জ্যোতিষী মহাশয় সোৎসুকে তাঁহার স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী কহিলেন, "মনে কর এক জন লোক, তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায়, স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে, অর্থোপার্জ্জনের জন্যে কোনও একটা দূরদেশে চ'লে গেল। সেখানে গিয়ে কোনও অভাবনীয় উপায়ে, তার বিপুল অর্থলাভ হ'ল। সেই অর্থ নিয়ে সে বাড়ী ফির্‌ছে, পথে তার আসন্নকাল উপস্থিত। সে হিসেব ক'রে দেখ্‌লে, তার সন্তান তখনও জন্মায় নি। কোনও সাধু বা সচ্চরিত্র বন্ধুলোকের কাছে টাকাগুলি সে গচ্ছিত রেখে বল্লে, আমি ত মর্‌ছি, আমার যে সন্তান এখনও তার মাতৃগর্ভে আছে, সে যেন আমার এই টাকাগুলি পায়, তুমি তার ব্যবস্থা কোরো। এই রকম অনুরোধ ক'রে, টাকা গচ্ছিত রেখে, লোকটি ম'রে গেল। সেই সাধু বা বন্ধুলোক, কার্য্যগতিকে অনেকদিন বাঙ্গালাদেশে আসতে পারেন নি। এখন এসেছেন। এটর্ণি বাবুর সাহায্যে সেই ছেলেকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন। তাকে পেলে, টাকাগুলি তাকে দিয়ে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে যাবেন।"

জ্যোতিষী মহাশয় অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "গিন্নী, কি বুদ্ধি তোমার! অন্ধকারে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তবু বোধ হচ্ছে, ঠিক যায়গাটিতে না হোক্, তার অনেকটা কাছাকাছি তুমি পৌঁছেছ। কিন্তু, একটা কথা থেকে যাচ্ছে যে!"

"কি কথা?"

"তা হ'লে সে বন্ধু বা সাধু লোক, ছেলের বাপের নাম কি, তার বাড়ী কোথায়, এ সবই ত জান্‌তো। সেই গ্রামে গিয়ে খোঁজ-খবর নিত। এটর্ণির শরণাপন্ন হবে কেন? হরিহর ত বল্লে, সে কোথায় আছে, তাও তারা জানে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "এত বছরের পরে, সেই বাবুটির নাম, তাঁর গ্রামটির নাম সেই বন্ধু লোক যদি ভুলে গিয়ে থাকেন? সম্ভবতঃ সে বন্ধুটি নিজে বাঙ্গালী নন, সুতরাং বাঙ্গালীর নাম, বাঙ্গালা গ্রামের নাম মনে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন নয় কি?

"তা বটে!" বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় অবনতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, গৃহিণী বলিলেন, "কিংবা"—বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিংবা কি?"

"কিংবা ধর—বাঙ্গালাদেশের কোনও রাজা বা জমীদার লোক, অবিবাহিত, ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনও দূর জিলার পল্লীগ্রামে গিয়ে, স্বজাতীয়া একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে, তাকে বিবাহ ক'রে, কিছুদিন সেইখানেই বসবাস করছিলেন। ক্রমে জান্‌তে পার্‌লেন, তাঁর স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনা হয়েছে। তখন তিনি মনে ভাবলেন, দেশে ফিরে যাই, আত্মীয়স্বজনকে এ বিবাহের বিষয় জানাই, তার পর ফিরে এসে স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাব। কিন্তু পথেই, কিংবা বাড়ী পৌঁছেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁর ভাই কিংবা ভাইপো, সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ল। এ দিকে তাঁর স্ত্রী জানেও না যে, তার স্বামী কে, কোথাকার রাজা বা জমীদার। সুতরাং স্বামী ফিরে না আসাতে সেইখানে প'ড়ে প'ড়েই সে প্রাণত্যাগ করতে থাকলো। এ দিকে বহুকাল পরে, সেই রাজা বা জমীদারের ভাই কিংবা ভাইপো, দাদা কিংবা

খুড়োর বাক্স থেকে পুরাণো কাগজপত্র বের ক'রে পড়্তে পড়্তে, আসল ব্যাপারটা জান্তে পেরেছে। তখন সে শিউরে উঠেছে—অ্যাঁ!—কার বিষয় এতদিন আমি ভোগ কর্‌ছি! সেই গর্ভে দাদার যদি ছেলে হয়ে থাকে, তা হ'লে সেই ত এই সম্পত্তির মালিক। অথচ সে কাগজপত্র থেকে, দাদার শশুরবাড়ীর ঠিকানা সে আবিষ্কার কর্‌তে পারে নি; তাই কলকাতায় এসে, এটর্ণির শরণাপন্ন হয়েছে, আর এটর্ণি ঐ বিজ্ঞাপনের কৌশল খাটিয়ে, তার হেডবাবুকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল "

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় প্রশংসমান নেত্রে, স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, প্রথমে তুমি যেটা বলেছিলে, তার চেয়ে এইটেই যেন বেশী সম্ভব ব'লে আমার মনে হচ্ছে! কি বুদ্ধি তোমার! এ যেন একবারে আস্ত উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এত উপন্যাস ত তুমি পড়লে, একখানা লেখ না কেন!"

গৃহিণী মনে মনে খুসী হইয়া, মুখে বলিলেন, "যাও যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। আচ্ছা, তুমিও একটা কিছু ভাবছিলে ত? তুমি কি ভাবছিলে শুনি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমি, এটর্ণির কথা শুনে পর্য্যন্ত, একটা উইল-টুইলের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে, তাই ভাব্‌ছিলাম।"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা উইল-টুইল ঘটিতই হোক, আর যাই ঘটিত হোক, একটা সম্পত্তির ব্যাপার এর ভিতর আছেই আছে। নইলে দেখ্‌ছ না, পাছে সে লোক মরে গিয়ে থাকে, আর কেউ জাল সেজে এসে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে এত সাবধান হওয়া দরকার কি? নিশ্চয়ই দশ বিশ লাখ টাকা এর ভিতর আছে।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া গৃহিণী গৃহকার্য্যের জন্ত এবং জ্যোতিষী মহাশয় সন্ধ্যা-বন্দনার জন্য প্রস্তুত হইতে উঠিয়া গেলেন।

৮

মঙ্গলবারে হরিহর বাবু আসিয়া দেখিলেন, একখানিমাত্র পত্র আসিয়াছে। তিনি সেখানি পাঠ করিয়া, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল? এ নয়?"

"না।"

"বিজ্ঞাপনটি চালাচ্ছেন ত? কোন্ দেশে সে আছে, ত ঠিক নেই। কিছু দিন ধ'রে বিজ্ঞাপন চলে, ক্রমে তার চোখে পড়্‌বেই পড়্‌বে। বিজ্ঞাপনটি আরও কিছু দিন চলুক।"

"হ্যাঁ, তা ত চালাতেই হবে। পশু আবার আসব"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় যে বিজ্ঞাপনটি চালাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহার কারণ, আজন্ম পিতৃহীনের পত্র যত আসুক আর না আসুক, এই বিজ্ঞাপনগুলির ফলে কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডার কিছু কিছু আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রমে সেগুলি প্রস্তুত করিয়া একে একে ভি, পি, করিতেছেন।

বৃহস্পতিবার ডাকে আর একজন আজন্ম পিতৃহীনের পত্র আসিল। পূর্ব্ব পত্রখানি হরিহর বাবু ছিঁড়িয়া ফেলাতে, জ্যোতিষী মহাশয় এই পত্রখানি গোপনে নকল করিয়া লইয়া, মূলপত্র হরিহর বাবুর জন্য রাখিয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া, সে পত্রখানি পাঠ করিয়া হরিহর বাবু অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে ঠিক লোকটি পেয়েছি এবার। এতদিনে আমার চেষ্টা সফল হ'ল।"—বলিয়া ভদ্রলোক, জ্যোতিষী মহাশয়ের টেবিলের উপর পাঁচ টাকার একখানি নোট প্রণামী স্বরূপ অর্পণ করিয়া, হাসিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় দেরাজের গোপনস্থান হইতে নকলটি বাহির করিয়া একবার তাহা পাঠ করিলেন। তার পর, সেখানি হাতে লইয়া উপরে গিয়া ডাকিলেন, "ওগো, একটা কথা শুনে যাও।"

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইতেই চুপি চুপি বলিলেন, "হরিহর যাকে খুঁজ্‌ছিল, তার চিঠি এত দিনে এসেছে। এই দেখ।"—বলিয়া নকলখানি তাঁহার হস্তে দিলেন।

পত্রখানি এই:—

বেঙ্গলী মেস—মোরাদপুর
বাঁকীপুর।

মহাশয়,

বিশ্বদূত সংবাদপত্রে আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলাম। তদুত্তরে লিখিতেছি, আমি আজন্ম পিতৃহীন।

...ার পিতা ৺বরদাচরণ ঘোষ মহাশয় সিমলা-শৈলে বড় ...ট সাহেবের দপ্তরে চাকরী করিতেন, আমার মাতাঠাকু-...ী নদীয়া জিলায় মুকুন্দপুর গ্রামে আমার মাতুলালয়ে ...লেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে সিমলা শৈলে ... ও নিউমোনিয়া রোগে আমার পিতৃদেবের দেহান্ত হয়। ...মার জন্ম তারিখ জানি না, সন ১৩০০ সাল বৈশাখ মাস, ...টুকুমাত্র জানি। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি মাতৃ-...ন হই। পরে আমার মাতুল মহাশয় ও মাতুলানী ঠাকু-...ণীও স্বর্গারোহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে আমি প্রাতঃ-...রণীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর আশ্রয়লাভ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িয়া তথা হইতে বি, এ, পাস করিয়া, এখন বাঁকীপুরে ৫০৲ বেতনে শিক্ষকতা করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে ...ইন পড়িতেছি। আমার আত্ম-বিবরণ সংক্ষেপে আপ-...াকে জানাইলাম। ইতি

বিনীত

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

পত্রখানি গৃহিণী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া, স্বামীকে বলিলেন, "উঃ, দেখ একবার কাণ্ড! ৫০৲ টাকা মাইনের মাষ্টারি করছে,—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একটা মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে। একেই বলে অদৃষ্ট!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কিন্তু আমরা যে দুটো অনুমান করেছিলাম, কৈ তার কোনওটার সঙ্গে ত মিলছে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কি করে জানলে মিলছে না? অবিশ্যি,ঠিক ব্যাপারটা কি হয়েছে তা আমরা জানিনে। ধর, ঐ সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে তার বাপ যদি মস্ত এক-খানা হীরেই কুড়িয়ে পেয়ে থাকে, যার দাম দশ বিশ লাখ, সেই হীরে হয় ত কারু কাছে গচ্ছিত আছে, সে এখন উত্তরাধিকারীকে খুঁজছে। কিংবা মরবার আগে ওর বাপ হয় ত কোনও রাজা মহারাজার বিশেষ কোন উপকার করেছিল, সেই রাজা, সেই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ কোনও জায়গীর টায়গীর দেবার জন্য ছেলেকে এখন খুঁজছে। ঠিক কি, তাতো আমরা জানিনে।"

জ্যোতিষী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ তার আছে ব'লে আমারও বিশ্বাস হচ্চে। তা হলে, এখন কি করা যায় বল দেখি?"

"যা পরামর্শ ছিল, তাই কর। আজই রওয়ানা হয়ে তুমি বাঁকীপুরে যাও। তার সঙ্গে দেখা ক'রে, যে রকম বলেছিলে সেই রকম একখানা দলিল তার কাছে লিখিয়ে, কালই রেজিষ্টারি করে নাও। তার পর যা আছে অদৃষ্টে। কি রকম দলিল লেখাবে আর একবার বল দেখি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "লেখাব—আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপন-মূলে এবং আপনার উপদেশে চালিত হইয়া, আমি যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি লাভ করিতে পারিব, তাহার অর্দ্ধাংশ আপনার পারিশ্রমিক ও পরামর্শের মূল্য স্বরূপ, বিনা ওজরে আপনাকে আমি দিতে বাধ্য রহিলাম।—উকীলে সব ঠিক ক'রে লিখে দেবে এখন।"

স্বামিস্ত্রীতে আরও কিছুক্ষণ গোপন পরামর্শ চলিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পঞ্জাব মেলে, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দেব-সম্পত্তি

ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দ্বারা দেবস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে দেবসেবা প্রতিষ্ঠাতার প্রদত্ত সম্পত্তির আয়ে নির্ব্বাহিত হয়; কোন কোন স্থানে দেবদর্শনকামী "যাত্রীরা"ও অর্থ প্রদান করে। কোন কোন স্থানে দেবস্থানের অব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যানুযায়ী কায হইতেছে না।

সংপ্রতি যুক্তপ্রদেশে একটি মোকদ্দমায় সেই কথাটা বিশেষভাবে হিন্দুসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালা হইতে যে সব যাত্রী বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শেঠদের মন্দির দেখিয়া আসিয়াছেন। সে মন্দিরে নিম্নাংশ গিল্টিকরা তামার পাতে মোড়া বলিয়া সাধারণ লোক তাহাকে সোনার তালগাছ বলিয়া থাকে। সে মন্দিরের বৈশিষ্ট্য তথায় যে দেবমূর্ত্তির পূজা হয়, সেই শ্রীরঙ্গনাথজী বৃন্দাবনের অপরাপর কৃষ্ণমূর্ত্তির মত ত্রিভঙ্গ মুরলীধর নহেন --বামে রাধাও নাই। গোয়ালিয়র-রাজের কর্ম্মচারী গোকুলদাস পারকজী মথুরায় আসিয়া ব্যবসায়ে বিপুল অর্থলাভ করেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর সময় সম্পত্তি কর্ম্মচারী মণিরামকে দিয়া যায়েন। মণিরাম জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ৩ পুত্র সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা শ্রী-সম্প্রদায়ী রঙ্গাচার্য্য নামক কোন গুরুর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সম্পত্তির বার্ষিক আয় তৎকালে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মণিরামের পুত্রত্রয় সমস্ত সম্পত্তি স্বামী রঙ্গাচারীকে প্রদান করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী সম্পত্তির ব্যবস্থাবিষয়ে বিস্তৃত নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করেন এবং সমস্ত সম্পত্তি দেবতার নামে উৎসৃষ্ট করেন। তিনি আরও নির্দ্দেশ করেন —মন্দিরের আয় হইতে নূতন কোন সম্পত্তি হইলে তাহাও দেবোত্তরমধ্যে পরিগণিত হইবে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী তাঁহার প্রথম দানপত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া ট্রাষ্ট করেন। মন্দিরের আয়ে নূতন কোন সম্পত্তি হইলে তাহাও ট্রাষ্টভুক্ত হইবে, স্থির হয়। কথা থাকে, গদীনশীন ও আর ৬ জন ট্রাষ্টী হইবেন; কোন ট্রাষ্টীর পদ শূন্য হইলে অপর ট্রাষ্টীরা তাঁহার স্থানে ট্রাষ্টী নিয়োগ করিতে পারিবেন। গদীনশীনের পর তাঁহার কোন বংশধরকে দেওয়া হইবে। বংশধরদিগের মধ্যে তৎকালে উপযুক্ত লোকের অভাব হইলে ট্রাষ্টীরা অস্থায়িভাবে অন্যকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; তাঁহারা অযোগ্য গদীনশীনকে বিতাড়িত করিতেও পারিবেন।

ইহাতে বুঝা যায়, স্বামীজী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখন মথুরার ২ জন অধিবাসী এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ট্রাষ্টী বা কমিটী স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে কায করেন নাই এবং মন্দিরের সম্পত্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। গদীনশীন -স্বামীজীর পৌত্র ও আর ৫ জনের নামে নালিশ হয়। তাঁহাদের মধ্যে সুদর্শন স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। অভিযোগকারীদিগের প্রার্থনা —

(১) অযোগ্য ট্রাষ্টীদিগকে পদচ্যুত করা হউক;

(২) ট্রাষ্টীদিগের নিকট হিসাব লওয়া হউক এবং তাঁহারা দায়ী হইলে সেই টাকা তাঁহাদের কাছে আদায় করা হউক।

(৩) পদচ্যুত ট্রাষ্টীদিগের স্থানে নূতন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হউক।

...টের মন্দির।

২) ট্রাষ্টের সর্ত্ত ঠিক রাখিবার জন্য আর যাহা করা প্রয়োজন, তাহা করা হউক্।

এই মামলা দায়ের হইলে দেবসম্পত্তির গ্রাসরক্ষকরা এমন কথাও বলেন যে, গদীনশীনের পিতামহ সম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং তাহা দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি যে সব দলিলে ট্রাষ্ট গঠন করেন, সে সব বে-আইনী।

বিচারক কিন্তু এ কথা মানেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান গদীনশীন যে গদীতে থাকিবার অনুপযুক্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাকে গদীচ্যুত করা হউক্। তিনি বিনা অধিকারে মন্দিরের তহবিল হইতে অনেক টাকা ধার লইয়াছেন। তাঁহাকে সে সব টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং মোকর্দ্দমার খরচার জন্য দায়ী হইতে হইবে।

বিচারকের রায়ে আরও প্রকাশ,—দেবসেবায় শৈথিল্য ঘটিয়াছে এবং ট্রাষ্টীরা গদীনশীনের প্রতি অকারণ প্রীতি দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের অপরাধ এমন নহে যে, সে জন্য তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা সঙ্গত হইবে।

এখন এই মামলার আপীল হইয়াছে।

এই মন্দিরে দেবসম্পত্তির ব্যবহারবিষয়ে যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেবসম্পত্তি সম্বন্ধে সেই অভিযোগ উপস্থাপিত করা যায়। স্থানে স্থানে মোহান্ত বা সেবাইত মালিক হইয়া সম্পত্তি নিজসম্পত্তিরূপে ব্যবহারও করেন। দেবতার সেবাইত হইয়া কেহ কেহ কিরূপ কদাচারী হয়েন, তারকেশ্বরের এলোকেশীর মোকর্দ্দমায় তাহা দেখা গিয়াছিল। সেরূপ কদাচারীকে যে দেবসেবার অধিকার হইতে দূর করাই সঙ্গত—সেরূপ কদাচারী যে দেবস্থান কলঙ্কিত করে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সমগ্র ভারতবর্ষে যে সব দেবস্থান আছে, সে সকলের বার্ষিক আয় যদি জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হয়, তবে যে দেশের অনেক উপকার হয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু অনেক স্থানেই অতিথি ভোগ পায় না—দেবসেবাও উপযুক্তরূপ হয় না, অথচ সেবাইত নিজের বিলাসবাসনা-তৃপ্তির জন্য দেবস্থানের অর্থ ব্যয় করেন। এই সব সেবাইতের প্রাসাদোপম অট্টালিকা—মোটরগাড়ী

প্রভৃতি থাকে; বিলাসের আরও নানা উপকরণের অভাব থাকে না। আবার কোন কোন "সন্ন্যাসী" সেবাইত রাজদরবারে গতায়াত করেন। তাঁহারা His Holiness! কেহ কেহ আবার লোককে বলেন, সম্পত্তি তাঁহাদের ব্যক্তিগত; অথচ ইনকাম টেক্স দিবার সময় দেবসম্পত্তির দোহাই দিয়া অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করেন।

এই মন্দিরের চূড়া।
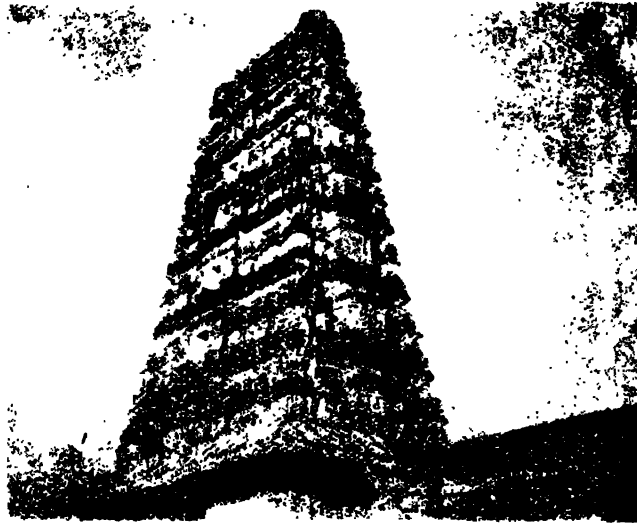
হিন্দুর দেবস্থান-সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়া হিন্দুসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে ভারত-কথা

অনেক দিন হইতে চলিল, সার ফিরোজশা মেটা একবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, আমরা আজ আমলাতন্ত্র শাসনের অধীন আমলাতন্ত্র অপেক্ষা পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করা ভাল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়—"একই ছাঁচে ঢালা দুই—এ পিঠ ও পিঠ।" বিশেষ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের ভার তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত। লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন, স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের (man on the spot) উপর নির্ভর করিতে হয়। সেই জন্যই তিনি বিনা বিচারে নির্ব্বাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াও শেষে লর্ড মিণ্টোর কথায় তাহারই সমর্থন করিয়াছিলেন।

এবার যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বড়লাট লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিয়া দিলেও পার্লামেণ্ট ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করিবেন, তাঁহাদের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। প্রথমে সহকারী ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন, এ কথার আলোচনা করিবার সময় পার্লামেণ্টের নাই। তাহার পর শ্রমিক সদস্য মিষ্টার ট্রিভেলিয়ান পার্লামেণ্টে এই কথা তুলিয়াছিলেন।

মিষ্টার ট্রিভেলিয়ান বলেন, লবণের শুল্কবৃদ্ধি বড় কথা নহে, বড় কথা—শাসন-সংস্কার আইনে বড়লাটকে যে বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত ও বুদ্ধির পরিচায়ক কি না? তাঁহার মতে ব্যবস্থাপক সভার সহিত সরকারের মতভেদে যখন তখন এই যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। এবার সে ক্ষমতা প্রয়োগের কোন কারণ ঘটে নাই। ইহাতে যে রাজনৈতিক বিপদ ঘটিয়াছে, উপকার তাহার অনুরূপ হয় নাই। ভারতে এখন সঙ্কটসময় উপস্থিত। এখন দেখিতে হইবে, শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিবে, কি না? ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলেও এক দল লোক সে ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন—ইংরাজের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহাদের বিশ্বাস অবিচলিত। তাঁহাদের দ্বারাই শাসন-সংস্কারে সাফল্যলাভ করা সম্ভব। এবার বড়লাটের কার্য্যে ইংরাজের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহাদের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। সরকারের সঙ্গে মতে না মিলিলেই সরকার যদি ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ পদদলিত করেন, তবে ত কেবল নূতন নামে সেই পুরাতন স্বৈরাচারই বিদ্যমান রহিল—(The old autocracy wearing a parliamentary cloak), লোক এখন দেখিবে—বৃটিশ সরকারের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করা যায়—কি না।

মিষ্টার ট্রিভেলিয়ানের কথায় বেশ বুঝা যায়, লবণের শুল্ক দ্বিগুণ হওয়ায় ভারতবাসীর কষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাঁহার

... বেদনায় কাতর হয় নাই। তাঁহার ভয়, পাছে মডা-রেটরাও শাসন-সংস্কারে প্রদত্ত অধিকারের স্বরূপ বুঝিয়া ফেলেন এবং সেই জন্ম শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। তাঁহার উদ্দেশ্য, যাহা দেওয়া হইয়াছে, ভারতবাসী তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকুক—আর কিছু না চাহে। আর একটুও অধিকার দেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাও বুঝা গিয়াছে। কারণ, তাঁহার কথার উত্তর দিতে উঠিয়া সহকারী ভারত-সচিব আর্ল উইণ্টারটন যখন বলেন—শাসন-সংস্কার আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, সে কথার আলোচনা তিনি করিবেন না বটে; কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মিঃ ট্রিভেলিয়ান কি সে আইনের পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত আছেন?—তখন মিষ্টার ট্রিভেলিয়ান মাথা নাড়িয়া বলেন—"না"—অর্থাৎ যাহা দিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট—আর দেওয়া হইবে না।

ইহার পর আর্ল উইণ্টারটন বড়লাটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত সরকারের কার্য্যের সমর্থনচেষ্টা করেন। তিনি ছেলেভুলান হিসাবে বলেন, সত্য বটে, লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীর বহুমত লবণ-শুল্কবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার আর একটা ভাগ আছে—সেটা কাউন্সিল অব ষ্টেট। দুই ভাগের মত যদি জড়াইয়া ধরা যায়, তবে ত বলা যায়, ব্যবস্থাপক সভার বহুমত বড়লাটের কার্য্যের সমর্থনই করিয়াছে! যাহাকে "ন্যায়ের ফাঁকি" বলে—ইহা তাহাই। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে বলিয়াই কাউন্সিল অব ষ্টেট গড়িয়া রাখা হইয়াছে এবং তথায় সরকারের ইচ্ছানুরূপ কায করাইয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ।

আর্ল উইণ্টারটন যে পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে সরকার যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াছেন, সে কথা কি সত্য? প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা হয় নাই। চেষ্টা করিলে এবং ইচ্ছা থাকিলে ব্যয় অনেক কমান যায়। বাঙ্গালার ব্যয়সঙ্কোচ সমিতি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, গভর্ণরের ব্যাণ্ড ও বডিগার্ড অনাবশ্যক বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক যে সরকারের কর্তাকে স্বীকার করিতে হয়, দেশে স্বাস্থ্যোন্নতিকর, শিক্ষাবিস্তারজনক ও দেশের সম্পদবৃদ্ধিকারী নানারূপ উপায় করা প্রয়োজন—কেবল অর্থাভাবে সরকার তাহা করিতে পারিতেছেন না, সে দেশের সরকারের পক্ষে গভর্ণরের ব্যাণ্ড ও বডিগার্ডে অর্থব্যয় অনাবশ্যক বিলাস ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ভারত সরকার পুনঃ পুনঃ যেরূপ লোকশান করিয়াছেন, তাহার জন্যও তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দের বাজেটে দেখা যায়, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "পেপার কারেন্সী রিজার্ভে" যে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেখান হইয়াছিল, তাহা অযথার্থ; তাহার প্রকৃত মূল্য ৫৫ কোটির অধিক হইতে পারে না। অথচ ভারত সরকার যখন এই টাকাটা বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, তখন অর্থ-সচিব সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, সে টাকায় বৃটিশ ট্রেজারী বিল খরিদ করা হইয়াছে—তাহা স্বর্ণেরই সঙ্গে তুল্যমূল্য! হিসাবে যে ভুল ধরা হইয়াছিল, অর্থ-সচিবকে তাহাও স্বীকার করিতে হইয়াছিল—"The sterling part of the Reserve turns into fewer rupees than the amount at which it is held in the accounts."

দেশের লোকের কথায় যদি দেশের শাসন, পালন, পোষণ, গঠন সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হইত, তবে অবশ্যই "পেপার কারেন্সী রিজার্ভ" টাকাটা দেশ হইতে বিদেশে পাঠান হইত না।

এ অবস্থায় বুঝিতে বিলম্ব হয় না, মিষ্টার ট্রিভেলিয়ান কেন শাসন-সংস্কার আইন পরিবর্তনে সম্মত হইতে পারেন নাই, আর কেনই বা আর্ল উইণ্টারটন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ কোনকালে স্বায়ত্ত শাসনশীল হইবে, সকলেই এই আশা করিলেও নূতন আইনে এমন কোন কথা বলা হয় নাই যে, অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হইবে বা যোগ্যতাবিচার না করিয়াই একটা নির্দ্ধারিত দিবসে ভারতবর্ষ সে অধিকার পাইবে।

"The Government of India Act did not give immediate self-government and had not promised that self-government would be granted automatically on any arbitrary date irrespective of the degree of progress shown."

অতএব "সন্দেহ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল"। আজ যে মডারেটরা দলবদ্ধ হইয়া বিলাতে যাইতেছেন, উদ্দেশ্য—বিলাতের লোককে বুঝাইয়া দিবেন, ডায়ার্কী বা ভাগাভাগী

শাসন চলিবে না, তাহাতে কেবল অনাচারই হইবে—আর্ল উইণ্টারটনের স্পষ্ট কথায় তাঁহাদের মোহ ঘুচিবে কি? বিলাতের কোন সম্প্রদায়ই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার দিতে সম্মত নহেন। কাযেই এ কথা বলা যাইতে পারে, ভিক্ষার দ্বারা স্বরাজলাভ হয় না।

এই কথাই মহাত্মা গন্ধী বুঝাইয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া স্বরাজ লাভ করিতে হয়। সে যোগ্যতার পরীক্ষা ত্যাগে। তিনি দেশের লোককে সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন—সাফল্যের সিংহদ্বার দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাচীর পথ। তাহা প্রতীচীর রক্তসিক্ত পথ নহে, পরন্তু অহিংসার পথ। দেশের লোক কি সেই পথ অবলম্বন করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া স্বরাজ লাভ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে?

মহাত্মা ও চিত্তরঞ্জন

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে অধিকাংশ উপস্থিত সদস্যের মতে স্থির হয়, কংগ্রেসের গত ২টি অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তদনুসারে কায বন্ধ রাখা হইবে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লোককে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়া হইবে না। এইরূপে কংগ্রেসের বহুমত ত্যক্ত বা বিকলাঙ্গ করাইবার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার ব্যবস্থাপক সভাপ্রবেশপ্রয়োজনপ্রস্তাব লইয়া মাদ্রাজে গমন করেন। তথায় গত ৩০শে মে তারিখে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, :—

"আমি স্বয়ং নেতা হইয়া লোককে কারাগারে লইয়া গিয়াছি। বঙ্গদেশে আমিই সে অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে আমি আমার পুত্রকে কারাগারে পাঠাই। আমার পত্নী তাহার অনুসরণ করেন। তাহার পর আমি নিজে কারাগারে যাই; কারণ, আমি জানিতাম, তথায় বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। আমি জানিতাম, প্রতিরোধের যে ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বলশালী এবং অতিগর্ব্বিত সরকারকেও তাহার কাছে নতজানু হইতে হইবে। সত্যই অতিগর্ব্বিত সরকার তাহার কাছে নত হইয়াছিলেন। তোমরাই ভুল করিয়াছিলে—সব নষ্ট করিয়াছিলে। আর এখন তোমরা লোককে কেবল চরকা চালাইতে বলিতেছ। অতিগর্ব্বিত সরকার তোমাদের কাছে নত হইয়াছিলে। আমার কাছে (মিটমাটের) সর্ত্ত দাখিল করা হইয়াছিল। তখন আমি কারাগারে, তাই সে সব সর্ত্ত যথাস্থানে—উপরওয়ালাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমি কারাগারে না থাকিলে দেশকে সে সর্ত্ত গ্রহণে বাধ্য করিতাম। সে সর্ত্ত গৃহীত হইলে অবস্থা অন্যরূপ দেখিতে।"

চিত্তরঞ্জনের এই বক্তৃতায় "উত্তম পুরুষের" অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ যে অবিনয়ব্যঞ্জক, তাহা তাঁহার ত্যাগের প্রশংসাকারীদিগের পক্ষে মর্ম্মবেদনাদায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। তিনি যে অপরকে, এমন কি, তাঁহার পত্নী-পুত্রকেও তাঁহাদের কৃত কার্য্যের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালায় লোক যখন কারাবরণ করিয়াছিল, তখন সে অনুষ্ঠান কংগ্রেসের কমিটী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়; চিত্তরঞ্জন একা তাহার স্রষ্টা নহেন।

কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় সে-ও তুচ্ছ কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার নত হইয়া মিটমাটের সর্ত্ত পাঠাইয়াছিলেন; তিনি কারাগারে না থাকিলে স্বৈরাচারী হইয়া দেশকে সেই সব সর্ত্ত লইতে বাধ্য করিতেন অর্থাৎ কংগ্রেসের নামে সে সব সর্ত্ত গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা গন্ধী বুদ্ধির দোষে সে সব সর্ত্ত স্বীকার না করায় সব নষ্ট হইয়াছে।

ব্যাপারটি কি? ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস যখন ভারতে আগমন করেন এবং মহাত্মার নির্দ্দেশে দেশের অধিকাংশ লোক তাঁহার অভ্যর্থনা বর্জ্জন করে, তখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য উভয়দলে মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী মনে করিয়াছিলেন, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসকে আনিতে হইলে ভারত সরকার প্রজার অভিযোগের কারণ দূর করিবেন এবং সেই জন্য তিনি রাজপুত্রের আগমনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি ভারত সরকারের পক্ষ হইয়া কায করিতেছিলেন না। সুতরাং চিত্তরঞ্জন যদি তাঁহাকে দূত বা plenipotentiary মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনিই ভুল করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণদাস" ছদ্মনামধারী এক বাঙ্গালী যুবক তৎকালে তাঁর কাছে ছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর অনুরোধে তিনি এই ব্যাপার-সংক্রান্ত সব টেলিগ্রাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পণ্ডিতজী মহাত্মাকে টেলিগ্রাম করেন, তিনি ২১শে তারিখে বড়লাটের কাছে ডেপুটেশনে যাইয়া একটা পরামর্শ-সভা করাইবার ব্যবস্থা করিতে কলিকাতায় আসিতেছেন এবং ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বলিবার জন্য যমুনাদাসকে ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে মহাত্মার কাছে পাঠাইতেছেন। যদি সরকার পরামর্শ-সভায় সম্মত হয়েন, দমননীতি বন্ধ করেন এবং কারারুদ্ধ নেতৃগণকে মুক্তি দেন, তবে মহাত্মা প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনাবর্জ্জন বন্ধ করিবেন এবং সভা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আইনভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন না—এই কথা বলিবার জন্য অনুমতি তিনি মহাত্মার নিকট চাহেন।

১৯শে তারিখে যমুনাদাসের ও হৃদয়নাথের সহিত সাক্ষাতের পর মহাত্মা পণ্ডিতজীকে টেলিগ্রাফ করেন—"দমননীতির জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। সরকার যদি সত্য সত্যই অনুতপ্ত না হইয়া থাকেন এবং পঞ্জাব, খিলাফত ও স্বরাজ এই ৩ ব্যাপারের মীমাংসা করিতে আগ্রহশীল না হয়েন, তবে পরামর্শ-সভায় কোন ফল হইবে না।"

এই সময় পণ্ডিতজী কারাগারে চিত্তরঞ্জনের ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারা মহাত্মাকে টেলিগ্রাফ করেন—

"আমরা নিম্নলিখিত সর্ত্তে (রাজপুত্রের আগমনে) হরতাল বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি—

(১) সরকার শীঘ্রই একটি পরামর্শ-সভা করিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃক উত্থাপিত সকল বিষয়ের বিবেচনা করিবেন।

(২) সরকার সংপ্রতি যে সব ইস্তাহার এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের ও পুলিসের হুকুম জারি করিয়াছেন, সে সকলের প্রত্যাহার করিবেন;

(৩) নূতন আইনে যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, বিনা সর্ত্তে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।

অবিলম্বে প্রেসিডেন্সি জেলে জেলারের কাছে উত্তর দিবেন।

এই টেলিগ্রাম "ক্লিয়ার দি লাইন" এবং জেল হইতে প্রেরিত। সুতরাং এমন কথা মনে করা যাইতে পারে যে, সরকার এ সব জানিতেন।

এই টেলিগ্রামের উত্তরে মহাত্মা বলেন :—

"আপনাদের তার পাইলাম। আপোষের পূর্ব্বে স্থির করা প্রয়োজন, কবে পরামর্শ-সভা বসিবে এবং কে কে সে সভায় থাকিবেন। আর যাঁহারা ফতোয়ার জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মুক্তি দিতে হইবে—করাচীর বন্দীদিগকে (মৌলানা মহম্মদ আলি ও শৌকত আলিকে) মুক্তি দিতে হইবে। আপনারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া যদি এই সব হয়, তবে, আমার মতে, হরতাল বন্ধ করা যায়।"

ইহার পর শ্যামসুন্দর বাবুর তার। তখন শ্যামবাবু বাঙ্গালায় দাশ মহাশয়ের স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি, তিনি যে তার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মতে নহে—দাশ মহাশয় যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই। তিনি তার করিলেন :—

"পরামর্শ-সভা হইলে রকার যে আলোচনা হইবে, বাঙ্গালোক তাহার পক্ষে মত প্রকাশ করিতেছে। * * আপনি যাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার কথা বলিয়াছেন, পরামর্শ-সভার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। তারে পরামর্শ জানাইবেন।"

মহাত্মা উত্তর দিলেন :—

"আমার মতে অসহযোগের কায বন্ধ না করিয়া পরামর্শ সভা হইতে পারে। যদি সন্ধি করিতেই হয়, তবে পূর্ব্বাহ্নে সভার উদ্দেশ্য ও সদস্য প্রভৃতির বিষয় স্থির করা প্রয়োজন। আমরা আইন অমান্যের কাযে আক্রমণকারী নহি। যদি সরকার সত্যসত্যই সদুদ্দেশ্যে কায করেন, তবে তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবকসংগ্রহ বন্ধ, সভাবন্ধ প্রভৃতির সম্বন্ধে ইস্তাহারের প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং যাঁহাদিগকে অকারণে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যে সব আইন নাকচ করিবার কথা হইয়াছে, এ সময় সেই সব প্রয়োগ করা কি অন্যায় নহে? সরকার সর্ব্ববিধ অনাচার বন্ধ করুন। আমরা প্রাণ দিয়াও মতপ্রকাশস্বাধীনতারোধের প্রতিবাদ করিব।"

পণ্ডিতজী তার করিলেন—"দাশ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উপর পরামর্শ-সভার দিন ও গঠন স্থির করা

হইবে—এখন জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী ও বাধা ব্যতীত আবকারী দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ ছাড়া অসহযোগের আর সব কাষ বন্ধ করিতে সম্মতি দিউন।"

মহাত্মাজী কিন্তু সম্মতি দিলেন না। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা নেতারই উপযুক্ত কথা :-

"এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। যদি পরামর্শ-সভায় সুফল ফলে, তবেই অসহযোগের কায বন্ধ করা যায়—নহিলে নহে।"

এই সব টেলিগ্রাম পাঠ করিলেই বুঝা যায়, কে ভুল করিয়াছিলেন, মহাত্মা—না চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি?

বাস্তবিক লর্ড রেডিং লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার মত কোন প্রস্তাব করেন নাই বা কোন প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, জাতির আত্ম-সম্মান রক্ষা করাই নেতার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তিনি সেই কর্ত্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। সে জন্য জাতি চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

পণ্ডিতজী ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, লর্ড রেডিং যে ভাবে পঞ্জাবের ও খিলাফতের ব্যাপারের প্রতীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারিলে, তিনি কখনই রাজপুত্রের আগমনে মত দিতেন না।

এই প্রসঙ্গে তিনি শেষে বলিয়াছেন :—

বারদলীর ও দিল্লীর সিদ্ধান্ত অত্যাচারমূলক আইন-অমান্য আরব্ধ করিবার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে পরিহার। ঐ সময়ের হিংসাহীন ও উপদ্রববিহীন অবস্থা দেখিয়া সব কাযের পূর্ব্বেই দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক সভা করা উচিত ছিল। তাহা হইলে সরকার দেশের লোকের দাবী বুঝিতে পারিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়া সরকারের সহিত দেশের লোকের সদ্ভাব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার তাহা না করিয়া বিনা কারণে চণ্ডনীতি চালাইয়া গিয়াছেন। ভারতের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি দেশে কোটি কোটি দেশবাসী ও বিদেশে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত,তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া সরকার তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যে ব্যক্তির প্রচারকার্য্যে ও প্রভাবের ফলে সমগ্র দেশে—বিশেষ বিপ্লবের সময়েও অহিংসনীতি পালিত হইয়াছে, তিনি, লাজপৎ রায়, সর্দ্দার খড়গ সিং, আলি ভ্রাতৃযুগল, ডাক্তার কিচলু, লালা দুনীচাঁদ প্রভৃতির মত বহু সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তিও বাদ পড়েন নাই। এই ভাবে অশেষ দুঃখ ও অপমানের দ্বারা সরকার দেশের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়কে বিরোধী করিয়া দিয়াছেন এবং দেশে ও বিদেশে সকল চিন্তাশীল লোকের দ্বারাই নিন্দিত হইয়াছেন।

উপনিবেশে ভারতবাসী

যে সময় আমাদের দেশের এক দল লোক মনে করিতেছেন, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে খরচ দিয়া বক্তৃতা করিতে পাঠাইলেই উপনিবেশে ভারতবাসী সাধারণ বৃটিশ প্রজার সমান অধিকার পাইবে, ঠিক সেই সময় মালয় হইতে এক জন ভারতীয় কুলীর প্লীহা-ফাটানর সংবাদ আসিয়াছে। সংবাদে বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার গৌরাঙ্গীর পদাঘাতে ভারতবাসীর প্লীহা ফাটিয়াছে—গৌরাঙ্গের নহে।

চেল্লামুট্টা মাদ্রাজী কুলী। গত ১৮ই মে সে ম্যানেজারের বাঙ্গলার বাগানে আগাছা তুলিতেছিল। ম্যানেজার এথোর্ণের স্ত্রী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দেয়। বুঝাইয়া দেওয়াটা কিরূপে হইয়াছিল, তাহাও জানিবার বিষয়। এথোর্ণ-পত্নী স্বীকার করিয়াছে, সে তামিল জানে না—ইশারায় কুলীদিগকে কায বুঝাইয়া দেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে "সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা" ব্যাপারে কুলীদের পক্ষে ভুল বুঝাও বিস্ময়কর নহে। কিন্তু সে যখন আসিয়া দেখে, কুলী অগাছা তুলিতে কয়টা ফার্ণও তুলিয়াছে, তখন সে কুলীকে পদাঘাত করে। কুলী পড়িয়া যায় এবং উঠিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে অল্প দূর যাইয়াই আর চলিতে না পারিয়া মাটীতে পড়ে।

প্লীহা ফাটিয়া রক্তপাতে কুলীর মৃত্যু হয়।

করোণার এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"সিংগপ্প ষ্টেটের তামিল কুলী চেল্লামুট্টা ৮ই মে তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লীহা ফাটায় রক্তস্রাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর কয় মিনিট পূর্ব্বে সে ষ্টেটের ম্যানেজার এথোর্ণের বাগানে আগাছা পরিষ্কার করিতেছিল। সে

কয়ারীতে আগাছা তুলিতে ফার্ণ তুলিয়াছিল বলিয়া এপোর্ণের পত্নী তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল এবং ক্রোধে তাহাকে পদদ্বারা ঠেলিয়া দিয়াছিল বা পদাঘাত করিয়াছিল। আঘাতের পর চেল্লামুট্টা কয় পদ যাইয়াই পড়িয়া যায় ও তাহার মৃত্যু হয়। তাহার প্লীহার অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে সামান্য আঘাতেই তাহা ফাটিয়া যাইতে পারিত। সে আহত না হইলে হয় ত এখনও বাঁচিয়া থাকিত। কাযেই সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে বলিতে হয়, এপোর্ণ-পত্নীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থাপিত করা যায়। তবে আমার মতে আঘাত অতি সামান্য এবং আঘাত করা এপোর্ণ-পত্নীর উদ্দেশ্য ছিল না। সে চেল্লামুট্টার প্লীহার অবস্থা অবগত ছিল না এবং আঘাতে যে কুলীর লাগিবে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। এপোর্ণ শ্রমিক আফিসে চেল্লামুট্টার বিধবার জন্য কিছু টাকা (a certain some of money) দিয়াছে; তাই আমার উপদেশ, এপোর্ণ-পত্নীর নামে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া কায নাই।"

শ্বেতাঙ্গ করোণারের এই মন্তব্য-সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এপোর্ণ-পত্নী চেল্লামুট্টাকে পদাঘাত করিয়াছিল; কিন্তু "আঘাত করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না!" তবে উদ্দেশ্যটা কি ছিল? পদাঘাত প্রেমালিঙ্গন নহে; চেল্লামুট্টাও এপোর্ণ পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলে নাই :—

"স্মরগরলখণ্ডনং　　মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

কুলী যদি শ্বেতাঙ্গ হইত, তবে কি শ্বেতাঙ্গীর এই সাহস হইত? আর কালা কুলীর জীবনের মূল্য "কিছু টাকায়" নির্দ্ধারিত হইয়াছে! কত টাকা? অমৃতসরে প্রহৃত শ্বেতাঙ্গীর জন্য ভারত সরকার ক্ষতিপূরণে যে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, মালয়ে নিহত ভারতবাসীর জন্য সরকার ক্ষতিপূরণে কি তাহার তুলনায় যথেষ্ট টাকা এপোর্ণের নিকট হইতে পাইয়াছেন?

এরূপ অত্যাচারের পর কৃষ্ণাঙ্গরা যদি বাইবেলে বর্ণিত নীতিই শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া বিবেচনা করে—"চক্ষুর বদলে চক্ষু, দন্তের বদলে দন্ত, হস্তের বদলে হস্ত, পদের বদলে পদ" —তবে কি অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গরা তাহাদিগকে দোষ দিতে পারিবে? সকল সভ্য জাতির আইনই মানুষকে আত্মরক্ষার অধিকার দেয় এবং বলে—উত্তেজনাবশে কোন কায করিলে তজ্জনিত অপরাধ লঘু হইয়া যায়।

পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(১)

বারিয়ালায়

যুক্তপ্রদেশে বারিয়ালায় পুলিসের বিরুদ্ধে যে সব বিষম অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, রায়বাহাদুর সীতারাম ও শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দয়াল সে সকল সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধানে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। প্রথম কথা এই যে - মজঃফরনগর হইতে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী এই গ্রামে পুলিস খানাতল্লাস করিতে যায়। তথায় পুলিসের সহিত গ্রামের লোকের সংঘর্ষ হয় এবং গ্রামের লোকের কাছে পুলিস প্রহৃত হয়। ইহার পর প্রহৃত পুলিসের সাহায্যার্থ ২১শে মে তারিখে ৩ দল পুলিস গ্রামে যায়—

(১) বিজনুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও তীসসার জমীদার ফৈজ আলীর নেতৃত্বে তীসসা হইতে এক দল;

(২) মজঃফরনগরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে একদল;

(৩) বিজনুর হইতে এক দল।

প্রথম ও তৃতীয় দলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দলে পুলিস ছিল জন ছয়েক; আর আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় ৫ শত বাজে লোক তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া দল ভারী করিয়াছিল।

গ্রামবাসীরা ভয়ে গ্রামত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারা এত ভয় পাইয়াছে যে, সাহস করিয়া সকল কথা বলিতে চাহে না। তদন্তকারীরা পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে অভয় দিবার পর তবে তাহারা সত্য কথা প্রকাশ করে। শেষে তাহারা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটও সেই সব কথা বলিয়াছিল। তিনিও লুণ্ঠিত গৃহাদি দেখিয়াছিলেন।

তীসসার দলের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ (১) লুট ও (২) স্ত্রীলোকদিগের উপর পৈশাচিক অত্যাচার। গ্রামবাসীরা বলে, পুলিস উপস্থিত হইয়াই বহু গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে ও তাহাদিগকে গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়।

যতক্ষণে প্রকৃত পুলিসের উদ্ধারসাধন করা হয়, ততক্ষণে পুলিসের সঙ্গে আগত বাজে লোকরা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসীরা ভীত হয়—অনেকে পলাইয়া যায়। যাহারা ছিল, তাহাদের উপর অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়; এবং নারীদিগের উপর লোকগুলা অকথ্য অত্যাচার করে। চৌহানরাই নাকি পুলিসকে প্রহার করে—শেষে তাহারাই অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল। তাহাদের গৃহের মেঝে ভগ্ন আসবাবপত্রে পূর্ণ—কোন কোন গৃহের মেঝে খনন করা হইয়াছে। বোধ হয়, টাকা বা অলঙ্কার লুকান আছে, এই সন্দেহে ঘর খুঁড়িয়া দেখা হইয়াছিল।

জিলার কর্তারা বলেন, গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে গ্রামবাসীরা পলাইয়া গিয়াছিল এবং পলাইবার সময় তাহাদের দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা স্বীকার করেন, পুলিসের সঙ্গে দুই চারিজন বদমায়েস ছিল এবং তাহারা হয় ত দুই চারিটা জিনিষ লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা বলেন, সাধারণভাবে লুঠ হয় নাই এবং গ্রামবাসীদের বিশেষ কোন ক্ষতিও হয় নাই।

এই কথার উত্তরে পণ্ডিত হৃদয়নাথ প্রভৃতি বলেন—হয় ত কোন কোন শঙ্কিত গ্রামবাসী গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং কিছু কিছু জিনিষ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। হয় ত বা পার্শ্ববর্তী স্থানের লোক সুযোগ পাইয়া শস্য ও চিনি সরাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কতটুকু সময় পাইয়াছিল? মজঃফরনগরের পুলিস যে দিন চলিয়া যায়, বিজনুরের পুলিস সেই দিনই গ্রামে প্রবেশ করে। আবার বিজনুরের পুলিস যে দিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরদিনই গ্রামে প্রবেশ করিয়া বিশম্ভর দয়াল দেখেন, গ্রাম লুণ্ঠিত ও পরিত্যক্ত। কাযেই সব বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, তীসদার বাজে লোক গ্রাম লুঠ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে সংযত রাখা যায় নাই বা হয় নাই। গ্রামের লোক যে তাহাদের লাঙ্গল, দড়ী, কাপড় সবই সরাইয়াছিল—মহিলাদিগের দেহ হইতেও অলঙ্কার খুলিয়া রাখিয়াছিল—এমন কি, রন্ধনপাত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল—ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর তাহা হইলে কি তাহারা তাহাদের মূল্যবান ইক্ষুক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ হইবে জানিয়াও গবাদি পশু রাখিয়া যাইত?

লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি গোযানে বাহিত হইয়াছিল। নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক অধিবাসী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছিলেন—তিনি দেখিয়াছেন, লুঠের মাল বোঝাই কয়খানা গাড়ী তাঁহার গ্রামের রাস্তা দিয়া গিয়াছে। গাড়ী কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব পাইয়াছিলেন—"আপন কাযে মন দাও। নহিলে তোমার গ্রামও লুণ্ঠিত হইবে।" কতক মাল কোথায় আছে, সে সংবাদও তদন্তকারীরা পাইয়াছিলেন এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়াছিলেন। আবার কয় জন লোক বলিয়াছে, তাহারা গ্রেপ্তার হইয়া একটা তুঁত গাছের তলে থাকে। যখন তাহাদের মাল গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহা দেখিতে পাইয়া তাহারা পুলিসকে সে কথা জানাইলে পুলিস তাহাদিগকে সরাইয়া একটা ঝোপের পার্শ্বে লইয়া যায় যে, তাহারা গাড়ী দেখিতে না পায়।

শেষ অভিযোগ গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবৈধ অত্যাচারের। তদন্তকারীরা বলেন,—"আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচারের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। যাহাদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছে—বিশেষ তাহার মধ্যে যাহারা এখনও অবিবাহিতা, তাহাদিগকে এ বিষয়ে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতে সম্মত করা দুষ্কর। তবে কতকগুলি স্ত্রীলোকের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, সে বিষয়ে আমাদের আর কোন সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারের সম্বন্ধে কয় জন লোকের ও এক জন পুলিসের লোকের নাম কর্ত্তাদের কাছে বলাও হইয়াছে। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট যখন গ্রামে গমন করেন, তখন তিনি যে এক জন মহিলা ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সে কাযের প্রশংসাই করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ১২ জনের অধিক লোকের দেখা হয় নাই। কাযেই লেডী ডাক্তারকে ঘটনাস্থলে লইয়া যাওয়ায় সত্য নির্ণয়ের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। যে সব অবিবাহিতা বালিকার উপর অত্যাচার হইয়াছিল, তাহারা তখন গ্রামে ছিল না। তাহাদের যে সব আত্মীয়স্বজন গ্রামে ছিল, তাহারা কোন কথা প্রকাশ করিবে না। আর অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন না হইলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন থাকে না। বিজনুরের পুলিসের

যাহারা ২১শে রাত্রিকালেও গ্রামে ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। এক জন স্ত্রী-লোকের প্রতি অত্যাচারের কথা বড়ই লজ্জাকরজনক। তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের কাছে তাহা জানান হইয়াছিল এবং আমরা সে বিষয়ে সাক্ষ্যও লইয়াছিলাম। মজঃফরনগরের পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সে সব কথা লিপিবদ্ধও করিয়াছিলেন।"

এই অভিযোগের ফল কি হইয়াছে?

জিলার কর্ত্তাদের কার্য্যসম্বন্ধে তদন্তকারীরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য—

২১শে মে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। কাযেই লোক এমন আশা করিতে পারে যে, সংবাদ পাইয়াই মহকুমার হাকিম তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; বোধ হয়, তাঁহার অজুহত—ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ২৬শে তারিখে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও লেডী ডাক্তারকে লইয়া সে গ্রামে গমন করেন—তাঁহার সঙ্গে জন ১২ লোকের দেখা হয় এবং তিনি বোধ হয়, পূর্ব্বপ্রাপ্ত সব সংবাদ অবিশ্বাস করেন। তিনি কয় ঘণ্টা মাত্র গ্রামে থাকিয়া মজঃফরনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মনে হয়, গ্রামে ও পথে বিশেষ কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই। বোধ হয়, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পুলিসকর্ম্মচারী ২০শে তারিখের পুলিসপ্রহারের তদন্ত করিতে গিয়াছিল, লোক তাহার কাছেই সব কথা বলিবে। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই:—

(১) এই কর্ম্মচারীটিকে ২১শে তারিখের ঘটনা তদন্ত করিতে বলা হয় নাই।

(২) যে কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে তদন্ত করিতে হইবে, সে তদন্তকারী কর্ম্মচারী অপেক্ষা উচ্চপদস্থ।

তদন্তকারীরা বলেন, যে ভাবে তদন্ত হওয়া উচিত ছিল, সে ভাবে তদন্ত হয় নাই। সরকার যদি নিরপেক্ষ-ভাবে তদন্ত করেন, সে জন্য তাঁহারা আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের কথা—সরকার যদি আপনাদের সুনাম রক্ষা করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে—সরকারী কর্ম্মচারীরা যেমন সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগের কার্য্যে বাধা-প্রদানকারীদিগকে দণ্ড দিতে পারেন, তেমনই আবার সম্রাটের প্রজাদের উপর যাহারা অত্যাচার করে, তাহা-দিগকেও উপযুক্তরূপে দণ্ডিত করিতে পারেন।

দিল্লী কংগ্রেস কমিটী এ বিষয়ে বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। দেশের লোক সেই তদন্তের ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিবে।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ প্রভৃতি যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে কেবল পুলিসের কর্ত্তব্যশৈথিল্যই আছে বলিয়া মনে হয় না। পরন্ত বলিতে হয়, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটও এ ব্যাপারে যথাকর্ত্তব্য করেন নাই। তিনি যেন ব্যাপারটা সত্য বলিয়া বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। না পারিবারই কথা। কারণ, এরূপ ব্যাপার ঘটা যে কোন সভ্য সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা। কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল এবং সরকারের সকল কর্ম্মচারীরই বুঝা উচিত—সে কলঙ্কের কারণ ঘটিয়া থাকিলে সত্য প্রকাশ করা ও অপরাধীদিগকে উপযুক্ত দণ্ডদান করাই সে কলঙ্ক-প্রক্ষালনের একমাত্র উপায়।

(২)

চরমানাইর

পুলিসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ বাঙ্গালায়। সে ঘটনার স্থান ফরিদপুর জিলায় চরমানাইর গ্রাম।

চরমানাইরে পুলিসের সহিত গ্রামবাসীর সংঘর্ষ হয় এবং ফলে পুলিস শেষে গ্রামবাসীদিগের উপর অত্যাচার করে, এই সংবাদ অবগত হইয়া ফরিদপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর তদন্তসমিতির কয় জন সদস্য ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে বিবরণ বিবৃত করেন, তাহা এইরূপ:—

ফরিদপুর জিলার সদরপুর থানার এলাকায় চরমানাইর গ্রামে আদু মোল্লা নামক এক জন ধনবান্ মুসলমানের বাস। গত ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) রাত্রিকালে আদুর বাড়ীতে ডাকাইত পড়ে। ডাকাইতরা যখন গৃহস্থদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, সেই সময় শিবচর থানার দারোগা পুলিস লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েন। তিনি বলেন, ডাকাইতরা শিবচর থানার

এলাকায় সমবেত হইবে সংবাদ পাইয়া তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া চরমানাইর গ্রামে আসিয়াছেন। পুলিসের আবির্ভাবে দস্যুদল পলায়নপর হয়। গ্রামের লোক তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পুলিসকে পুলিস বলিয়া বিশ্বাস করিল না, মনে করিল, তাহারা ছদ্মবেশী ডাকাইত। গ্রামবাসীরা সংখ্যায় প্রবল। তাহারা পুলিসকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল—বাঁধিয়া রাখিল। পুলিস কিন্তু গুলী চালাইল না।

পরদিন সংবাদ পাইয়া নানাস্থান হইতে পুলিস সমাগত হইল এবং গ্রামবাসীদিগের উপর অনাচার চলিল—স্ত্রীলোকদিগের উপরও অত্যাচার হইল।

কয় দিনে বহু লোককে ফরিদপুরে চালান দেওয়া হইল। অনেক স্ত্রীলোক ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল—গ্রাম যেন শ্মশান হইল। তাহার পর গত ৫ই জুন আবার নূতন অঙ্কে যবনিকা উঠিল। সে দিন ঘাটে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্টীমার বাঁধা। আসামী গ্রেপ্তার ও মালক্রোকের পরোয়ানা লইয়া পুলিস গ্রামে প্রবেশ করিল। পুলিস ঘর ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র লুঠ ও নষ্ট করে, আর—বলিতে লজ্জা হয়—বহু স্ত্রীলোকের উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। যে সব স্ত্রীলোক পলাইয়া লুকাইয়াছিল, তাহাদিগকেও নাকি টানিয়া আনা হয়। অনেক স্ত্রীলোক ভয়ে কুম্ভীরের আবাস আরিয়লখাঁ নদীর জলেও লুকাইতে গিয়াছিল।

গত ২রা জুলাই সরকার যে বিবরণ প্রচার করিয়াছেন এবং পরে ব্যবস্থাপক সভায় সরকারপক্ষ হইতে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—১৩ই জুন শিবচরে সভায় যে বিবরণ মাদারীপুরের ডেপুটী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দাখিল করেন, তাহাতে প্রকাশ পায়, মাদারীপুরে জনরব রটিয়াছে—(১) বহু স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হইয়াছে, (২) গইজুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি প্রহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ইত্যাদি।

১৫ই জুন অর্থাৎ ঘটনার প্রায় ১ মাস পরে এই সব সংবাদ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হওয়া যে সুব্যবস্থার পরিচায়ক নহে, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আরও বিস্ময়ের বিষয়, এমন ভীষণ অভিযোগের সংবাদ পাইয়াও ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই ঘটনাস্থানে গমন করিলেন না; কেন তাঁহার ষ্টীমারের বয়লার সাফ করা হইতেছিল! এ কথায় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত বলিয়াছেন, যেন মোটর-গাড়ীর এঞ্জিন ঠিক না থাকায় সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে পারিলেন না! শেষে ১৮ই জুন রওনা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯শে তারিখে চরমানাইরে উপনীত হইলেন!

ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাটিকে একেবারে লঘু করিয়া দিয়াছেন। পুলিস যে স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়াও ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে দোষ দেখেন নাই। তিনি বলেন, ফেরার আসামীদের বাড়ী ভাল করিয়াই খানাতল্লাস করিতে হয়; তাহাদের বাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করিতে হয়—সেই সময় পুলিস কোন কোন স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছে, তাহাতে তাহাদের ইজ্জৎ গিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, বিনা প্রয়োজনে পুলিস এই সব স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া কি কোন অপরাধ করে নাই? ঠিক এইরূপ অবস্থায় পুলিস যদি কোন শ্বেতাঙ্গের পত্নীর হাত ধরিত, তবে তাহা দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত কি না? ইহার অপেক্ষা সামান্য কারণে সরকার শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছেন। অস্ত্রের সন্ধানে পুলিস তাঁহার জননীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া আইরিশ নেতা পার্ণেল ইংরাজের শত্রু হইয়াছিলেন।

এ দেশে স্ত্রীলোকরা আপনাদের সর্ব্বনাশের কথা প্রকাশ করিতে কত কুণ্ঠা বোধ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তবুও ৪ জন স্ত্রীলোক যে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সে সব অভিযোগ যে ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়!—

(১) রহিমুদ্দীনের নাতবৌ এক জন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করে। আদালত সে মামলা ডিসমিস করিয়াছেন। ইহাই কি যথেষ্ট যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে?

(২) মনিরুদ্দীনের বিধবাও এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করে এবং তাহার এক জন আত্মীয়া সে কথার সমর্থন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, তাহারা ভিখারিণী, আসামীকে সনাক্ত করিতে পারে না এবং তাঁহার মতে সাক্ষ্যে কিছুই

সাব্যস্ত হয় না! ভিখারিণীর ইজ্জত বা সত্যনিষ্ঠা কি ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নীর ইজ্জতের বা সত্যনিষ্ঠার সমান হইতে পারে না?

(৩) এক জন প্রৌঢ়া বলে, এক জন কনষ্টেবল তাহাকে টানিয়া পাটক্ষেতে লইয়া যাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। বর্ষাকালে যখন গাছ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, তখন ঘটনার ১ মাস পরে ভাঙ্গা পাটগাছ দেখিতে না পাইয়া এবং ঘটনাস্থলের ৩ দিকে ৬০ গজের মধ্যে বাড়ী আছে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই!

রহিমুদ্দীনের নাতবৌ।

(৪) আর এক জন স্ত্রীলোকের ঐরূপ অভিযোগও তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

তাহার পর গইজুদ্দীনের মৃত্যুর কথা। গইজুদ্দীনের ভগিনী আয়েসা বিবি বলে, কনষ্টেবলদিগের প্রহারে তাহার মৃত্যু হয়। শেষে কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ভ্রাতার কথাই শুনেন—তাহার মৃগীরোগ ছিল এবং তাহাতে ঠিক ঐ দিনই তাহার মৃত্যু হয়; আর অসহযোগীদের শিখানয় সে পুলিসের প্রহারের কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কেন যে ঘটনাস্থল হইতে ১৫ মাইল দূরে শব কবর দেওয়া হয় এবং কেনই বা শব তুলিয়া পরীক্ষা করা হয় নাই, তাহা সরকারী বিবরণে জানা যায় না।

তথাপি বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তই যথেষ্ট, সরকার এ বিষয়ে আর কোন তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করেন না! ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত বলিয়াছেন—ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত চূড়ান্ত বলা যায় না—the enquiry has not at all been conclusive তিনি অভিযোগে বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করা না করা ব্যক্তিগত ব্যাপার—আমরাও বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিতে পারি। বিশেষ বিরুদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত আমরা এ সব ব্যাপার এমন লঘুভাবে দেখিতে পারি না। ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা ব্যক্তিবিশেষের কথা এবং সে ব্যক্তি পুলিসের কর্ত্তা। কেবল তাহাই নহে, এই ম্যাজিষ্ট্রেটই এত বড় ঘটনার পরে ১ মাস অতীত না হইলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা ব্যক্তিবিশেষের কথা, কিন্তু লোকমত তাহা নহে, vox populi, vox Dei সেই লোকমত সরকারের সৃষ্ট ব্যবস্থাপক সভাতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এ অবস্থায় বাঙ্গালা সরকার যখন পুনরায় তদন্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তখন এ ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা দেশের লোকের অবশ্য-কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদের অনুসন্ধানফল শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং তখন দেশের ও বিদেশের লোক প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তি হইতে দেশের লোক কি ইহাই বুঝিবে যে, সরকারের পুলিস পুরনারীর হাত ধরিলে পুলিসের কোন অপরাধ হয় না? ইন্দুবাবু বলিয়াছেন—"The deepest feelings of the people have been stirred, the most sacred sentiments of the whole nation have been wounded." আর যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে সে কাযের দায়িত্ব উচ্ছৃঙ্খল জনতার নহে

—দস্যুদলের নহে—সরকারের শান্তিরক্ষার উপায়—দেশের লোকের অর্থে পালিত পুলিসের। এরূপ ব্যাপারেও যদি সরকার যথেষ্ট তদন্ত করা প্রয়োজন মনে না করেন, তবে কিসে প্রয়োজন মনে করিবেন?

(৬)

দারিয়াপাড়া ও চরমানাইয়ে যে সব অনাচারের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে সে সকল পুলিসের বিরুদ্ধে। পুলিস আমাদের দেশের লোক। দেশের লোক হইলেও তাহারা যে অনেক স্থলে অনাচারী হয়, তাহা পুলিস কমিশনের রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরও পুলিসের অনাচারের অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নিরপরাধ কুলবালাদিগকে গ্রেপ্তার করা ও হাজতে রাখাও হইয়াছে। সরকার সে লাঞ্ছনার জন্য ক্ষতিপূরণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

প্রকাশ—এই সব স্ত্রীলোক পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল।

এবার ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, এ দেশের লোকের বিশ্বাস—পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে প্রতীকার ত হয়ই না; পরন্তু আরও বিপদ্ ঘটে!

যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, সেরূপ অভিযোগের কথা আয়ার্লণ্ডে শুনা গিয়াছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডে ইংরাজ সেনাদল ঘর জ্বালাইয়াছিল, লুঠ করিয়াছিল, লোককে নিহত করিয়াছিল এবং বহু স্ত্রীলোকের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছিল। "Numerous houses were burnt and plundered, and several murders took place, while outrages onw ome were apparently extremely common."

এইরূপ অভিযোগ বেলজিয়মে জার্ম্মাণদিগের সম্বন্ধে শুনা গিয়াছিল সে কথা ব্রাইস কমিশনের বিবরণে দেখা যায়। কিন্তু দেশের লোক দেশের লোকের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে পারে—প্রাচীর লোক এ সব ব্যাপারে প্রতীচীর পশু-বৃত্তির অনুকরণ করিতে পারে—ইহা মনে করিতেও বেদনা বোধ হয়। যে মনোবৃত্তি এরূপ অঘটন ঘটাইতে পারে, সে মনোবৃত্তির উৎস কোথায়, সন্ধান করা প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার

আজকাল সকল সভ্য দেশেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতেছেন। কোন কোন দেশে সরকারের সাহায্য না লইয়াও দেশের লোক সেইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মে মন্দিরে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ অকাতরে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে বিদ্যাবিক্রয় পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ব্রাহ্মণগণ বিনা শুল্কে বিদ্যাবিতরণ করিতেন। এখন সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অথচ পাশ্চাত্য সরকার এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক

সভায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার প্রস্তাব করেন, তখন সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাহার পর কোন কোন প্রাদেশিক সরকার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে কায বড় কিছু হয় নাই। অর্থাভাবই তাহার প্রধান কারণ।

সংপ্রতি কলিকাতায় রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর বালকদিগের জন্ত স্বনামে ও বালিকাদিগের জন্ত স্ত্রীর নামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া দেশের লোকের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। গত ১১শে আষাঢ় এই ২টি বিস্তালয়ের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে ও শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দে।

উদ্বোধন উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেন, ১০ মাস পূর্ব্বে শশীবাবু তাঁহার কাছে ২টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন তখন এইরূপ বিস্তালয়প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলেন। শশীবাবুর প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া কর্পোরেশন বিস্তালয় ২টি আদর্শ বিস্তালয়ে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করেন। ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে কর্পোরেশন জমী কিনেন। শশীবাবু তাহার মধ্যে ২০ হাজার টাকা দেন ও নিজ তত্বাবধানে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২টি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক বাড়ীতে ১০টি করিয়া ক্লাস হইবার ঘর আছে; প্রতি ঘরে ৩০ জন করিয়া শিক্ষার্থীর স্থান হইবে; অর্থাৎ ২টি বিস্তালয়ে মোট ৬ শত ছাত্র-ছাত্রী পড়িবে।

শশীবাবু মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। স্কুলের জন্ত যে টাকা ব্যয় হইবে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ শশীবাবুর প্রদত্ত অর্থের আয় হইতে পাওয়া যাইবে; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ কর্পোরেশন দিবেন। শশীবাবুর মনোনীত ৫ জন ও কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত ৫ জন এই ১০ জন সদস্ত লইয়া স্কুলের পরিচালন সমিতি গঠিত হইবে। স্কুলের শতকরা ২৫ জন ছাত্রছাত্রী শশীবাবুর স্বজাতীয় (সুবর্ণবণিক) বাছিয়া লওয়া হইবে।

শশীবাবুরই স্বজাতীয় দাতা মতিলাল শীলের দানে কলিকাতায় ১টি অবৈতনিক কলেজ চলিতেছে।

বিস্তালয়ের উদ্বোধন উৎসবে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন শশীবাবুকে ধন্তবাদ দিয়া বলিয়াছেন—"আমরা দেশের সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি। শশীবাবু তাহার প্রথম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করায় সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালা দেশের লোক এত দরিদ্র যে, অর্থব্যয় করিয়া পুত্রকন্তাকে বিস্তালয়ে পাঠাইতে পারে না। শশীবাবু যে কার্য্য করিলেন, সেইরূপ কার্য্যে দেশের দরিদ্রদিগের বিশেষ উপকার হইবে।"

তাহার পর গভর্ণর সাহেব বলেন, আশা করি, দেশের ধনীরা সে বিষয়ে অবহিত হইবেন :—

"দেশের ধনীরা যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েন, তাহা হইলে দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না।"

দেশের যে সব ধনী উপাধিলাভই মোক্ষলাভের নামান্তর বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদিগকে উপাধির আশা দিলে লর্ড লিটন যত শীঘ্র "প্রত্যক্ষফল" দেখিতে পাইবেন, তত দেশহিতের কথা বলিলে পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাঁহারা যেমন দেশীয় পণ্য ত্যাগ করিয়া বিলাতী পণ্যের আদর করেন, তেমনই "সরকারী ছাপ" না থাকিলে কোন অনুষ্ঠানেই অর্থদান করেন না।

পিয়ের লোটী

"পিয়ের লোটী" ছদ্ম নামধারী ফরাসী লেখক লুই জুলিয়েঁ ভিয়ডের মৃত্যুতে সাহিত্যক্ষেত্রে একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মত শক্তিশালী লেখক বর্ত্তমান যুগে অধিক দেখা যায় না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি ফরাসী নৌ বিভাগে চাকরী করেন। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঞ্চ একাডেমী তাঁহাকে সদস্য করিয়া লয়েন।

অধুনা বিলুপ্ত 'সাধনা' পত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বাঙ্গালী পাঠকের সহিত লোটীর প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি 'সাধনায়' লোটীর একখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করেন—"পিয়ের লোটী ও ইস্তাম্বুল।" তাহার পর তাঁহার "করুণা ও মৃত্যুর কথা" পুস্তক হইতে কয়টি অধ্যায় বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে এই ফরাসী কবি সাহিত্যিকের রচনা-রসের আস্বাদ প্রদান করে।

পিয়ের লোটী

লোটী অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—কোনখানির আবহাওয়া জাপানের, কোনখানির ইস্তাম্বুলের, কোনখানির জেরুজালেমের। তিনি ভারত-ভ্রমণেও আসিয়াছিলেন। সাধারণ য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা যে ভাবে দেশ দেখেন, লোটী সে ভাবে দেখিতেন না। তিনি এঞ্জিনিয়ারের মাপের ফিতা, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা বা শিকারীর মাংসলুব্ধ দৃষ্টি লইয়া দেশ দেখিতেন না—তিনি কবির ভাবে দেশ দেখিতেন, বাস্তবের উপর কল্পনার রঙ দিয়া যেন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেন, যাহাতে মানুষের মনে সহানুভূতির উৎস উদ্গত হয়—মানুষ ভাবাবেগে অভিভূত হয়, তাহাই লোটী দেখিতে পাইতেন এবং তাহার বর্ণনা করিয়া পাঠককে মুগ্ধ করিতেন। বারাণসীর শ্মশানের বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালীর কাছে এই পুস্তকের কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

লোটীর সব পুস্তকেই নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আছে—জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়ও তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন পুস্তকখানি কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ফ্রান্সের জন্য এই ফরাসী লেখকের বুকের ব্যথা যেন রচনায় বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল। সে পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছে, আমাদের পূর্ব্বদৃষ্ট যুদ্ধস্থল যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আর সেই সব বর্ণনায় কি কারুণ্য মাখা।

লোটীর প্রায় সকল পুস্তকই য়ুরোপের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যখন পৃথিবীর সাহিত্যের সহিত পরিচয়পিপাসু হইয়া আমরা অনুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারিব, তখন লোটীর অমর রচনাও বাঙ্গালায় অনূদিত হইবে।

লোটী ফরাসী সাহিত্যগুরুদিগের মধ্যে আসন পাইয়াছেন। যখন আজিকার অনেক লেখকের নাম লোক বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তখনও লোটীর নাম যশের কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

—

এতিমখানার পতন

গত ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার কলিকাতায় হ্যারিসন রোড ও সেন্ট্রাল এভিনিউর মোড়ের নিকট শীলস্ ফ্রি কলেজের বাড়ীর উত্তরে সৈয়দ শেলী লেন নামক একটি রাস্তায় ইসলামিক এতিমখানা নামক মুসলমানদিগের একটি অনাথ-আশ্রম বিদ্যালয় অপরাহ্নে আন্দাজ আড়াইটার সময় হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাড়ীটি দোতলা ছিল, তিন

এতিমখানা।

তলা নূতন নির্ম্মিত হইতেছিল। দ্বিতলের তিনখানি ঘরে ও নীচের তলায় ছাত্ররা ছিল। দ্বিতল ও ত্রিতল ভাঙ্গিয়া পড়ায় ভগ্নস্তূপ চাপা পড়িয়া ও ইটপাটকেল-কড়ি-বরগার আঘাতে ৫২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন বাহিরের লোক—হিন্দু সাধু। ৫০ জন লোক আহত হয় ও তাহাদের মধ্যেও কয়েক জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। অনাথ-আশ্রমটি প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব চীফ জজ আবুল হোসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমগৃহটি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতার মত সহরে মিউনিসিপালিটির এত কড়া আইন থাকা সত্ত্বেও এইরূপ একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিপদ হওয়া বিশেষ দুঃখের কথা। সকল দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে না চাপাইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন ও আশ্রমের পরিচালকগণকে কতকটা দায়ী করিয়া এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত হওয়া দরকার। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এমন ব্যাপার না ঘটে, তাহার জন্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

যাহাতে এই ব্যাপারে বিনষ্ট এতিমখানা গৃহ পুনরায় নির্ম্মিত হইতে পারে এবং আহত ছাত্ররা সাহায্য পায়, সে বিষয়ে দেশের লোককে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

—

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পরলোকগত বাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সে কালের হিন্দু কলেজের ছাত্র। প্রথমতঃ নিরঞ্জন বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে সরকারের সেবা করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তিনি কাশীধামে গমন করেন। তথায় রেওয়ার মহারাজ রঘুরাজ সিংহ বাহাদুরের সুনজরে পড়িয়া তিনি তাঁহার অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং কার্য্যদক্ষতার গুণে পরিণামে রেওয়ার দেওয়ান পদে উন্নীত হয়েন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাকে স্বীয় আলোকচিত্র উপহার দিয়াছিলেন। কার্য্যদক্ষতার জন্য নিরঞ্জনবাবু যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ৮৮ বৎসর বয়সে তিনি উপযুক্ত পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

—

মৃত জে, এফ, মেডান
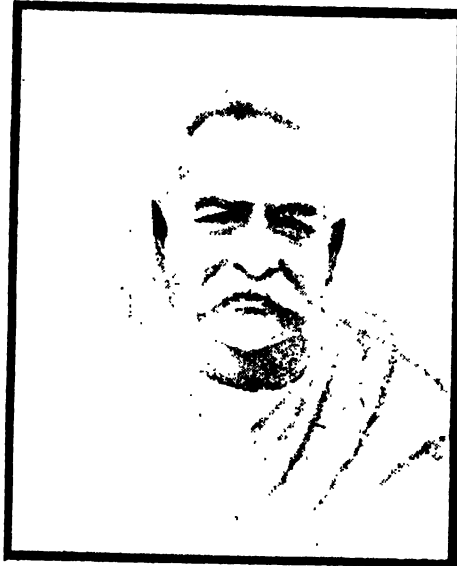
গত ১৭ই আষাঢ় ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতার প্রসিদ্ধ পার্শী ব্যবসায়ী মেডানের জীবনান্ত হইয়াছে। বায়স্কোপের চলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইলেও তিনি কেবল বায়স্কোপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না। অনেক ব্যবসায়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাফল্য যেন উপন্যাসের ঘটনা। অতি সামান্য বেতনে দীনভাবে বালক মেডান রঙ্গালয়ে ভৃত্যের হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অদম্য উৎসাহের ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনই অকাতরে দানও করিয়াছিলেন। প্রার্থী কখনও রিক্ত হস্তে তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিত না। তিনি এক দিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি প্রতি মাসে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে ৭।৫ শত টাকা দান করিতেন।

জীবনে তিনি বোধ হয়, ২০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ব্যবসা-বুদ্ধির একটু পরিচয় দিব। যে স্থানে

জে. এফ. মেডান।

আজ কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের সুরমা গৃহ বিদ্যমান, তথায় প্রথমে তাঁবু ফেলিয়া বায়স্কোপের চিত্র দেখান হইত। এক দিন দারুণ বর্ষায় তাম্বুর মধ্যে জল উঠিল—২ জন মাত্র দর্শক উপস্থিত। কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুই জনকে টিকিটের পয়সা ফিরাইয়া দিয়া ছবি দেখান বন্ধ করিব কি ?" উত্তর হইল, "না—ভাল করিয়া ছবি দেখাও।" তিনি বলিলেন, যে স্থানে ২ জন লোকও এত জলে বসিয়া ছবি দেখে, সে স্থানে সোনা আছে। তিনি তথায় থিয়েটার-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।

এক দিন তিনি কার্য্যোপলক্ষে পরলোকগত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের সহিত 'বসুমতী'-সম্পাদকের নিকট আসিয়াছিলেন। একত্র যাইবার সময় আমরা লক্ষ্য করিলাম, তিনি মসজেদ দেখিয়া প্রণাম করিলেন, কালীতলায় মন্দির দেখিয়াও মস্তক নত করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন, যে স্থানে ঈশ্বরের উপাসনা হয়, সেই স্থানই পবিত্র। এমন অসাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস সচরাচর লক্ষিত হয় না।

মৃত মেডান মহাশয় যেমন অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, তেমনই বিনয়ী ও নম্রস্বভাব ছিলেন।

সার্লে ট্রিমেয়ার্ণ

গত ৭ই জুলাই বাঙ্গালোরে সার্লে ট্রিমেয়ার্ণের মৃত্যু হইয়াছে। ট্রিমেয়ার্ণ কলিকাতার—কেবল কলিকাতার নহে, সমগ্র ভারতের সওদাগর-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন এবং বিখ্যাত 'ক্যাপিট্যাল' পত্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২১শে আগষ্ট বিলাতে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি ৫২ বৎসর ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া ভারতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর লণ্ডনে কয় বৎসর ব্যবসাসম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং অল্পদিন পরে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে চাকরী লইয়া রেঙ্গুনে গমন করেন। তথা হইতে তিনি কলিকাতা

সার্লে ট্রিমেয়ার্ণ।

কারেন্সী আফিসে চাকরী করিতে আসিয়া ক্রমে হাই-কোর্টের ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করেন ও পরে পর পর কয় জন চীফজাষ্টিসের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কায করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার হয়েন।

হাইকোর্টে চাকরী করিবার সময়েই তিনি ব্যবসাবিষয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে 'পাইওনীয়রে' সপ্তাহে ব্যবসাবিষয়ক একখানি পত্র লিখিতেন এবং প্রতি পত্রের জন্য ১ শত টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। একবার পূজার সময় 'পাই' লিখিলেন, বাজার যখন বন্ধ, তখন ২ সপ্তাহ আর পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের কথা। ট্রিমেয়ার্ণ 'ক্যাপিট্যাল' প্রকাশ করিলেন। প্রকাশের পরই 'ক্যাপিট্যালের' খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং পরে মিষ্টার প্রেমস লুক "ম্যাক্স" ছদ্মনামে তাহাতে লিখিতে থাকেন।

ট্রিমেয়ার্ণ বহুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন এবং তথায় ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সকল কমিশনারই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি কখন পক্ষপাতিত্ব করিতেন না। কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় আমরা প্রথম তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। সে দিন ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ হইবে। ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে সভা হইতেছিল। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে পদের অন্যতম প্রার্থী। নীলাম্বর বাবু কাশ্মীরে মন্ত্রী ছিলেন। কোন কোন য়ুরোপীয়ের বিশ্বাস ছিল, তিনি রুসিয়ার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। সেই জন্য তিনি যখন কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন পথে রেলে তাঁহার সব মালপত্র সরিয়া যায়। তাঁহাকে এই পদ দেওয়া অনেক ইংরাজেরই অনভিপ্রেত ছিল। তাঁহারা বলিলেন, নীলাম্বর বাবু ফাটকার বাজারে সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত—তাঁহাকে এ পদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। সে দিন ট্রিমেয়ার্ণ যেরূপ সিংহবিক্রমে নীলাম্বর বাবুর পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখন ভুলিতে পারিব না। 'ক্যাপিট্যালের' সৌজন্যে আমরা তাঁহার সেই সময়ের প্রতিকৃতি প্রদান করিলাম। তিনি ভারতবাসীর সহিত য়ুরোপীয়দিগের সদ্ভাবসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। রাজনীতিকব্যাপারে আমাদের সহিত সর্ব্বত্র তাঁহার মতের ঐক্য না থাকিলেও আমরা তাঁহার স্বাধীনচিত্তের প্রশংসা করি। তিনি এ দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিতেন এবং এই মত প্রকাশ করিতেন যে, এ দেশে রাজনীতিকদিগকে পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা বোর্ড প্রভৃতিতে প্রথম শিক্ষালাভ করিতে হইবে। গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হয়—চূড়া হইতে নহে।

তিনি এ দেশে ইংরাজের কর্ত্তব্য এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ;—

(১) যাহাতে ভারতবাসীর মনে আঘাত লাগে, এমন ভাষা প্রয়োগ হইতে বিরত হওয়া। কারণ, সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা রাজনীতিক হিসাবে অগ্নিযোগ করারই নামান্তর।

(২) শিক্ষিত ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উদারতা অবলম্বন করা ও সহানুভূতিশীল হওয়া। বিশ্বাস করিলে ভারতবাসীরা যেমন ইংরাজের প্রতি প্রীতিপরবশ হইবেন, অবিশ্বাসে তেমনই তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

কয় জন ইংরাজ ট্রিমেয়ার্ণের এই কথা স্মরণ রাখিয়া কায করেন?

—

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

পরিণতবয়সে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি ময়মনসিংহে

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

…ব্যবহারাজীবের কায করিতেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় তিনি সে ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বেদে তাঁহার অধিকার ছিল এবং প্রাচীন সাহিত্য হইতে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার সকল মত যে পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত

বাগদাদে রামকৃষ্ণ সমিতি।

হইবে, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্য সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

বাগদাদে হিন্দু উৎসব

কার্য্যোপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালী বাগদাদে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা, উৎসাহ ও উদ্যোগে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদ সহরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথি উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তত্রত্য ভক্ত ও অনুরাগী বাঙ্গালী যুবকগণ পূর্ব্ববৎসরেও অনুরূপ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। আলোচ্য উৎসব উপলক্ষে কর্ম্মকর্ত্তৃগণ নগরের মধ্যেই একটি বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া যাবতীয় গণ্যমান্য ও শিক্ষিত অধিবাসীদিগকে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আমন্ত্রণ করেন। বাগদাদে ইদানীং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের বহু লোক নানা কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই সানন্দে হিন্দুর এই ধর্ম্মোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন—প্রায় সহস্রাধিক দর্শক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও শিক্ষকও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

ইংরাজ মিশনারী মিঃ গ্রেগ আলেকজাণ্ডার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উদারচেতা মাদ্রাজী ধর্ম্মযাজক

ফ্রান্সিস্ কিংসবেরী রামকৃষ্ণের ধর্ম্মমত ও তাঁহার জীবন-কথার আলোচনা করেন। তিনি কোনও স্বর্গীয় ধর্ম্ম-যাজকের দিনলিপি হইতে রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া সকলের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সে দিন স্থানীয় গির্জায় প্রধান পর্ব্ব উপলক্ষে একটি ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন থাকা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ উৎসবে যোগদান করিতে তাঁহারা বিরত হয়েন নাই। কয়েকজন তরুণ যুবক (শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত হেমকুমার দাস)

বাগদাদে ভারতীয় সমিতি।

রামকৃষ্ণের জীবনকথা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মিঃ আলেকজান্দার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষকে ধর্ম্মভূমি বলিয়া অভিহিত করেন। আর্য্যসমাজের দুই জন কর্ম্মী, বেদ ও সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

উৎসবক্ষেত্রে সমগ্র দিবসব্যাপী পূজা, অর্চ্চনা, আরাধনা ও সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। বহু দরিদ্রনারায়ণের সেবায় কর্ম্মিগণ অক্লান্ত উত্তমে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। সন্নিহিত অট্টালিকার ছাদ ও বাতায়নে দাঁড়াইয়া মহিলারা সাগ্রহে এই উৎসব-অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন।

যমুনালাল বাজাজ

১৮ই জুনের গন্ধী-পুণ্যাহ উপলক্ষে নাগপুরের সত্যাগ্রহ মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য যখন ভারতের নানা স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবকদল সমবেত, সেই সময়—১৭ই জুন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ গ্রেপ্তার হয়েন। যমুনালাল নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীতে যেমন, নাগপুরেও তেমনই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ১লা মে হইতে তথায় প্রথম জাতীয় পতাকা সত্যাগ্রহের সূত্রপাত হয়। নাগপুরের আন্দোলন যখন তাঁহাদের ব্যবস্থায় নিখিল-ভারত আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইল, তখন গবমে'ণ্ট আর স্থির

বাগবাজারে রামকৃষ্ণ উৎসব

থাকিতে না পারিয়া নেতাদের গেপ্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। যমুনালাল সে দিন সত্যাগ্রহের স্থলে গিয়াছিলেন। পুলিস তাঁহাকে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১০৯, ১১৭, ১২০ বি ও ১৮৮ ধারায় গেপ্তার করিল। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বাজাজজী যথানিয়মে জেলের হাজতেই নীত হইলেন। তথায় ২৬শে জুন তারিখে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রেণোর এজলাসে তাঁহার মামলার বিচার হইয়া গেল। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইল তিনি ৬ দিন বে-আইনী জনতা করিয়াছেন, অর্থাৎ জাতীয় পতাকার শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছেন। তাহার পর, তিনি কেন দণ্ডিত হইবেন না, তাঁহাকে তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইল। বাজাজজী সে সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ প্রদান প্রয়োজন মনে করেন নাই, কাজেই তিনি উত্তরে জানান—তিনি সেরূপ কারণ দেখাইতে অপারগ।

বাজাজজী আদালতে এক লিখিত একরার পেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাহায্যার্থে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা ধর্মজ্ঞানেই করিয়াছি। এ জন্য আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, সে দণ্ডভোগ করিবার সাহস যেন ভগবান আমাকে প্রদান করেন। আমার প্রার্থনা, আইন অনুসারে যত গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হইতে পারে, বিচারক যেন আমার প্রতি সেইরূপ দণ্ডেরই ব্যবস্থা করেন।

এ দিন বিচার শেষ হইলেও রায় দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গবাসীর রাজা ।

রায় দিবার জন্য ৩০শে জুন দিন স্থির করা হয়। কিন্তু সে দিন মামলা উঠিলে আবার ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত (রায়) মুলতুবী রাখা হয়। এ দিন রাজাজীকে জামীনে মুক্তি লইতে বলিলে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর সার ফ্রাঙ্ক শ্লাই এই সময় শিমলা-শৈলে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রাজাজীর মামলার সহিত সে সাক্ষাতের কোন সম্পর্ক ছিল কি না, প্রকাশ নাই, কিন্তু ৩০শে জুন তারিখে সরকারী উকীল রায় মুলতুবীর প্রার্থনা জানাইবার সময় বলিয়াছিলেন, তিনি প্রাদেশিক সরকারের আদেশমতই কার্য্য করিতেছেন। রাজাজী অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী ও এক জন বড়দরের ব্যবসায়ী। ৩০শে জুন রাজাজীকে এমন কথাও বলা হইয়াছিল যে, তিনি পরদিন আদালতে উপস্থিত হইবেন, শুধু এইরূপ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেই তাঁহাকে উপস্থিত জেলের হাজতে যাইবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। রাজাজী সে প্রলোভন সংবরণ করিয়া বলেন, তিনি যে কোনদিন আদালতে আসিতে পারেন, কিন্তু অমুক দিন আসিব বলিয়া আবেদন করিতে পারিবেন না।

অতঃপর ১০ই জুলাই তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ১২৩ ধারার অপরাধে দোষী স্থির করিয়া ৩ দিনের জন্য ৩ দফায় দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক দফায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড।

দামোদরদাস বর্ম্মন

গত আষাঢ় কলিকাতার অভিজাত-সম্প্রদায়ের অন্যতম অলঙ্কার দামোদর-দাস বর্ম্মন্ মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী না হইলেও কেহ কখন তাঁহাকে বিদেশী মনে করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার এমনই আপনার হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাধারণতঃ "রাজাবাবু" নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার সেই নামেই তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। পরমধার্ম্মিক বিনয়ী বর্ম্মন্ মহাশয় কখন রাজদত্ত উপাধি-লোলুপ হয়েন নাই। কিন্তু যে সব গুণে মানুষ মানুষকে রাজা মনে করে, সেই সব শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক গুণ তাঁহার ছিল বলিয়াই তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে "রাজাবাবু" বলিত। তিনি ছিলেন prince among men. তিনি অসাধারণ ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার "ঠাকুর-ঘরের" কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু কলিকাতার কোন মহারাজ এক দিন সে ঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিয়া—তাহার পবিত্রতার পরিবেষ্টনে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সে কালের যে সব যে স্বভাবতঃ সৌজন্যাধার লোকের আদর্শ আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে আমাদের সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে রাজাবাবু তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন।

[illegible] পিউনিটিভ পুলিস স্থাপন। কলিকাতায় বড়বাজার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান্ মণিলাল হরেকচাঁদ কর্তৃক অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙ্গিবার জন্য সত্যাগ্রহের প্রবর্তন। কলিকাতায় আর দশ জন গুণ্ডার প্রতি বহিষ্কারের আদেশ। সিরমার নালাগড় রাজ্যে বেগার প্রথা রহিত। গুজরান্‌ওয়ালায় গঙ্গা বক্সিওয়ালী ও রহিম সুলতানের মল্লযুদ্ধ; রহিমের জয়লাভ। [illegible] বহরের প্রধান আড্ডা উত্তরসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে লইয়া যাইবার [illegible] যুদ্ধে জার্মানীর নিকট প্রাপ্ত ভাসমান ডক সিঙ্গাপুরে পাঠাইবার [illegible]। রয়াল কমিশনের সদস্যনিয়োগ। লোহিত সাগরে পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ময়দান জাহাজ জলমগ্ন। লণ্ডনে [illegible] নাবিক হাসপাতালে ভারতীয়দের জন্য একটি ওয়ার্ড রাখিবার জন্য বোম্বায়ের ব্যবসায়ী শ্রীযুত পি জি সিংহানীর লক্ষ টাকা দান। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক পিয়ের লোটির লোকান্তর।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—

জেলে লালা লাজপৎ রায়ের রোগে আক্রান্ত। কলিকাতা সত্যাগ্রহে শ্রীযুত দলবাহাদুর গিরির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সিং গ্রেপ্তার। কারাগারে মহাত্মার স্বাস্থ্যোন্নতির সংবাদ। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। জব্বলপুর সত্যাগ্রহে স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ গ্রেপ্তার। সিন্ধু, নাউশেরার পঞ্চায়েতের সম্পাদক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মানহানি করিবার অপরাধে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের কংগ্রেসের মূল নীতিতে সন্দেহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সেনেট কর্তৃক কমিটি গঠন। বন্যায় খালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ও অন্যান্য [illegible] আরও ক্ষতি। লাহোরের বিধবা সহায়ক সমিতির চেষ্টায় বর্তমান [illegible] বৎসরে এ পর্যন্ত ২১৮টি বিধবার পুনর্বিবাহ হইয়াছে, কর্মীদের [illegible]। বোম্বাইয়ে [illegible] সাপ্তাহিকো স্থানান্তর, দরিদ্র যাত্রীদের কষ্ট, টাইনাকে কলেরা, রেলে টিকিট দেওয়া বন্ধ। লর্ড সিংহের [illegible] লাট পদত্যাগের আরও অনেক রহস্য প্রকাশিত; মরিশসের জন্য ভারতে দেড় হাজার শ্রমিক সংগৃহীত হইতেছে। বর্তমান [illegible] স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্কল্প।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ—

লাহোরের "ইন্‌কলাব" পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত গোলাম হোসেন গ্রেপ্তার। কলিকাতা সত্যাগ্রহে শ্রীযুত গোবৰ্দ্ধন ভাই প্যাটেলের [illegible]; সিউনীর শ্রীযুত মেটা, জশন প্রভৃতি চার জন নেতা নাগপুর সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দণ্ডিত। কলিকাতার নূতন সাপ্তাহিক যুগান্তরের সম্পাদক শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার সেন ও শিবরাম চক্রবর্তী এবং মুদ্রাকর শিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায় জাতি-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত। দিল্লীর বোমার মামলার কয়েদী শ্রীযুত নন্দ সিং কারাগার হইতে পলায়ন করায় নূতন দণ্ডে দণ্ডিত। ছিন্দওয়ারার গোচর-কর বন্ধ করিয়া সত্যাগ্রহ করিবার আয়োজন। আমেদাবাদের ধর্ম্মঘটী মজুররা কাযে ফিরিতেছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেনের লোকান্তর। মান্দ্রাজে মিশনারীদের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্কল্প। মেদিনীপুরের শিলদা ও গিধনীতে পিউনিটিভ পুলিস স্থাপন; পূর্ব্ববর্তী চণ্ডনীতির আহকে অনেকের দেশত্যাগের সংবাদ। যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও আরও কয়েকজন নেতা বিদ্রোহীদের হাতে নষ্ট। জার্মানীর ক্ষতিপূরণ সমস্যা লইয়া ইংরেজ-ফরাসীতে মনোমালিন্যবৃদ্ধি। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অভিযোগের উত্তরে সোভিয়েটের নরম-গরম উক্তি।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—

কলিকাতা সত্যাগ্রহে শ্রীযুত রাম অবতার সিং ও আর দুই জন গ্রেপ্তার। সিউনীর সত্যাগ্রহীদের নাগপুর গমনের সময় ট্রেণে চড়ায় বাধা। নবযুগ-সম্পাদক শ্রীযুত কল্যাণজী মেটা রাজদ্রোহে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ইম্পিরীয়াল কনফারেন্সে সার তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে পাঠাইবার সঙ্কল্প। করাচীর প্রিন্স-অব-ওয়েলস ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত ৫০ হাজার টাকা সিন্ধু ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রদান। বোম্বাই হাইকোর্টে ইম্পিরীয়ালের অংশীদার শ্রীযুত আলপাইওয়ালার অভিযোগে এলায়েন্সের টাকা দেওয়া বন্ধ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—

বালাঘাট জেলা কংগ্রেসের সহযোগী সম্পাদকের ও জব্বলপুরে আর এক কংগ্রেস কর্ম্মীর নাগপুরে পঞ্চ-পুণ্যাহের সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সন্ত্রীক যোগ দিবার জন্য গমন। বাঙ্গালায় খদ্দর প্রসারে সাহায্যকল্পে নিখিল ভারত খদ্দর বিভাগের বিনা সুদে ৫০ হাজার টাকা ধার দিবার সঙ্কল্প। কলিকাতা সত্যাগ্রহে তিন জন গ্রেপ্তার। কাশীর [illegible] সহিত শ্রীযুত দাশের সাক্ষাৎ; খদ্দর-প্রচারে স্বামীজীর তিন শত টাকা সাহায্য। নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটী গবর্ণরকে অভিনন্দন-প্রদানে অসম্মত। তিনেভেলীতে শ্রীযুত দাশের সংবর্দ্ধনা। [illegible] অনাচার তদন্ত কমিটীতে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন ব্যারিষ্টার সদস্য কর্তৃক পুলিস ডাকিয়া দিয়া সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার। পাটনা মিউনিসিপ্যালিটীতে কসাইদের ধর্ম্মঘটে নূতন কসাইখানা আশ্রয় প্রত্যাখ্যাত করিতে হইল। বিহারেও হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্যের সংবাদ। কলিকাতার স্মিথ ষ্টানিষ্ট্রীটের দোকানে ভুল ঔষধ দিয়া রোগী মারিয়া ফেলিবার অপরাধে ম্যানেজার ও জনৈক কম্পাউণ্ডারের জরিমানা। চৈনিক প্রেসিডেণ্ট লিউ-য়ানহাং টিয়েনসিনের গবর্ণরের সেনা দ্বারা বন্দী। পার্লামেণ্টে সহকারী ভারতসচিব কর্তৃক লবণ-করের সমর্থন, অযুক্ত, ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন বা তাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্তাম্বুলিস্কী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ—

৭৫ জন গুজরাটী স্বেচ্ছাসেবক—পুরুষ ও মহিলা সমভিব্যাহারে জাপানী তালুকদার দেশাইয়ের সস্ত্রীক নাগপুরে উপস্থিতি। কলিকাতা সত্যাগ্রহে উদ্ধত পুলিস কর্তৃক রাজপথের প্রায় পাঁচ শ জন গ্রেপ্তার। পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রতীকারে দিল্লীতে খেলাফৎ ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন। বরিশালের পুলিস অনাচারের অভিযোগ সরকারী তদন্তে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত। নদীয়া, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীতে জল-নিকাশের সুব্যবস্থা করায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিশেষ হ্রাস। স্বনামধন্য দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর লাইসেন্স অফিসার ললিতচন্দ্র মিত্রের লোকান্তর। জাল নোটের সন্ধানে লাহোরের ২৫ যায়গায় খানাতল্লাস। অতিরিক্ত গরমে জামসেদপুরে কয়জন য়ুরোপীয় সাহিগরমীতে মারা যাইলেন।

১লা আষাঢ়—

শ্রীযুত কাজী আবদার রসিদ খাঁ নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটীতে কমিশনার নির্বাচিত। যুক্তপ্রদেশে মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলা বোর্ডে লাট ছাড়া অন্যের অভিনন্দন বন্ধে লাটের আপত্তি। কলিকাতা হইতে নাগপুর সত্যাগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ। ভূতপূর্ব্ব দৈনিক নবযুগের সম্পাদক শ্রীযুত মুজফ্‌ফর আহমদ ১৮ আইনের ৩ আইনে আলিপুর জেলে আটক, কয় দিন তিনি জামীনে মুক্ত ছিলেন। কলিকাতা সত্যাগ্রহের আসামী রাম অবতারের প্রতি আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। ভিক্ষু উত্তমের বিলাতযাত্রা। নাগপুর সত্যাগ্রহে ১লা মে হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত ৫৫৫ জন দণ্ডিত, তাহাদের মোট জরিমানা ২০৩৮৫ টাকা। ফৈজাবাদের নিকট চলন্ত ট্রেণে এক য়ুরোপীয়-মহিলা গুণ্ডা কর্তৃক লাঞ্ছিত, মহিলাটিকে ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার একখানা পাঁজরা ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে। রাজপুতানায় শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার সঙ্কল্প। চাঁদপুর অঞ্চলের সাংঘাতিক ধরণের ম্যালেরিয়া বলিয়া সংবাদ। বাবর আকালী হাঙ্গামায় জলন্ধর দোয়াবে সৈন্য প্রেরণ। কেম্‌ব্রিজের সিনিয়র ট্রাইপসের পরীক্ষায় শ্রীযুত এস মিত্রের সাফল্য। কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তুভিটায় বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলন—প্রধান সভাপতি শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল। কলিকাতা তালতলায় জাল টাকার গুপ্ত টাকশাল আবিষ্কার। এক দল ইংরেজ বণিকের সহিত তুর্কীর বাণিজ্যসন্ধি। রূঢ়ে আবার পাঁচ জন খনি-পরিচালক গুরুদণ্ডে দণ্ডিত।

২রা আষাঢ়—

নাগপুর সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ ও সত্যাগ্রহ প্রচার বিভাগের কর্তা শ্রীযুত নীলকান্ত রাও গ্রেপ্তার; শোভাযাত্রা নিষেধ আদেশের মেয়াদ আরও দুই মাস বাড়িল; রাত্রে মহাত্মা ভগবান দীন-জীও গ্রেপ্তার। ফরিদপুরে এক জন সভায় গবর্ণরের পরিদর্শন বয়কটের সঙ্কল্প। আসাম, গোলাঘাট মিউনিসিপ্যালিটীতে তিন জন অসহযোগী নির্বাচিত। নোয়াখালীতেও পোগে পুলিসের কড়াকড়ি। কলিকাতায় ৪০ হাজার রাজমিস্ত্রী ধর্ম্মঘট করিয়া আছে। অমৃতসরে স্বর্ণ-মন্দিরের পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবার ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য বহু শিখের সমাগম। প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ সৈন্যদলের কর্ম্মচারী কাপ্তেন মোয়ান গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত।

৩রা আষাঢ়—

নাগপুর সত্যাগ্রহে পতাকা-পূজার মহোৎসব উপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে সমাগত ২৬০ জন সত্যাগ্রহী পথে সে সত্যাগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই ধৃত। পতাকা-পূজা উপলক্ষে বাঙ্গালার নানা স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। কাপুর, নাগোরা গ্রামে বোমা ফাটিয়া দুই জন নিহত ও ৭ জন আহত। উত্তর-ভারতের সনাতনী হিন্দুদের কতিপয় ধর্ম্মসভা মালকানা রাজপুতদিগকে শুদ্ধ করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আজমীরের রাজস্থান মহাসভার কতিপয় ছাত্র পঞ্জাবে তাঁহাদের শাখা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতায় কড়া পাহারা-দির জন্য পদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীদের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা। শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে বাঙ্গালার রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। দিল্লীতেও জাল নোট বাহির। মোরাদাবাদে হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ ৩ জন হিন্দু ও এক জন মুসলমান আহত, ১৮ জন গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামে ভীষণ বৃষ্টিতে ট্রেণ চলাচলে বাধা। মর্ম্মরা সাগরে বৃটিশ কর্তৃক তুর্ক রণতরী আটক। সিসিলি দ্বীপে এটনার উত্তর পূর্ব্ব অংশ হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত।

৪ঠা আষাঢ়—

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ম্যালেরিয়ায় পীড়িত। ইণ্ডিপেণ্ডেন্টের মুদ্রাযন্ত্র নীলামে বিক্রয় হইল। হিন্দু মুসলমান একতা প্রচারের জন্য দিল্লীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক কমিটী নিয়োগ। লাহোরে জাতীয় মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা। নাগপুরের অন্যতম কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত আবেদ আলিকে ট্রেণে চড়িতে না দেওয়ায় ও তাঁহার জোর করিয়া ট্রেণে চড়ার অপূর্ব্ব বিবরণ। মেদিনীপুরে কেয়াটপুর গ্রামে ডাকাতিতে দুই জন কনষ্টেবলের হাত হইতে ডাকাতদের বন্দুক কাড়িয়া লইয়া পলায়ন, এক জন কনষ্টেবল আহত। বিহার সরকার প্রচার বিভাগ তুলিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুনর্নির্ব্বাচন। প্লাবনে মৌলবীবাজার মহকুমার ফসল নষ্ট। এটনার গলিত ধাতব পদার্থগুলি এক মাইল বিস্তৃত ও ৫০ ফিট গভীর অবস্থায় ঘণ্টায় ২৫ গজ হিসাবে অগ্রসর হইতেছে; ৩০ হাজার লোক নিরাশ্রয়, বারোটি রন্ধ্রমুখ হইতে গলিত পদার্থ সকল নির্গত হইতেছে। বিসুবিয়সেও অল্পপরিমাণ অগ্ন্যুদ্গার। টাঙ্গানিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এতদিন পরে আবার দোকান খুলিতেছেন। সিরিয়া সীমান্তে আবার তুর্কসৈন্য সমবেত, ফরাসী কর্তৃপক্ষেরও কড়া চিঠি। লণ্ডনে আপত্তিজনক ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য মিসেস্ রিচার্ডস্ (লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মিঃ রিচার্ডসের সহধর্ম্মিণী) বায়স্কোপ-হলের শো-কেস ভাঙ্গেন, আদালতে বিচারে তিনি মুচলেকায় আবদ্ধ।

৫ই আষাঢ়—

নাদিয়াদ ও সুরাটে এখনও অনেকে মিউনিসিপাল টেক্স দিতেছেন না; ক্রেতার অভাবে তাঁহাদের জিনিস-পত্রও নীলাম করিয়া আদায় করা যাইতেছে না। হায়দরাবাদের সেণ্ট্রাল জেলে সিন্ধুর শক্তিপত্রের তরুণ সম্পাদক শ্রীযুত হেমনদাসের শিখা কর্ত্তন ও অন্যান্য নিগ্রহের সংবাদ। নাগপুরে অন্যান্যের সহিত বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবকগণেরও এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। কলিকাতা বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী দামোদর দাস বর্ম্মনের লোকান্তর। রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটী সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড হার সুদে বিলাতে তিন লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করিতেছেন। বাবর আকালীদের অন্যতম সর্দ্দার সন্তু সিং সশস্ত্র অবস্থায় পাতিয়ালায় গ্রেপ্তার; ওদিকে জলন্ধর অঞ্চলে সৈন্যদের সাহায্যার্থ বর্ম্মাবৃত মোটর প্রেরণ, উড়োকল হইতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নরম-গরম ইস্তাহার; ব্রহ্মের ইনান-ইয়াংয়ের তেলের খনির শ্রমিক সমিতির সর্দ্দারের প্রতি তিন দিনের মধ্যে খনি অঞ্চল পরিত্যাগের নোটিশ; সর্দ্দার ধর্ম্মঘট ছাড়ে নাই। গিরিডীতে ডাকাতদল ধরিবার সময় তাহাদের গুলীতে এক জন গ্রামবাসী জখম, কয়েকজন ডাকাত গ্রেপ্তার। চরমনাইর কাণ্ডের ৪০ জন আসামী (গ্রামবাসী) জামীনে খালাস। এটনার অগ্ন্যুদ্গম কয়েকখানি গ্রাম, রেল-ষ্টেশন, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি মরুভূমিতে পরিণত করিয়া কমিতে আরম্ভ করিল। মিশরে সুরাহা, কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদীর মুক্তি।

৬ই আষাঢ়—

সালেমের ডাঃ বরদারাজলু নাইডুর খরচের দায়ে আবার তাঁহার জমী নীলাম। কলিকাতা পোদ্দার আফিসে খানাতল্লাস, কয়জনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থাপিত। আহমদনগর হইতে নাগপুরযাত্রী ১২০ জন স্বেচ্ছাসেবক খাণ্ডোয়ায় নামিতে বাধ্য হইয়াছেন। লাহোরের দেশ-সেবকের সম্পাদক ১০৭ ধারায় গ্রেপ্তার। এলায়েন্স ব্যাঙ্কের রাওল-পিণ্ডী শাখার তহবিল তছরূপের অপরাধে ছয় জন আসামীই দণ্ডিত। আক্কলকোটের রাজা কোন চিকিৎসকের দোষে মারা যাওয়ায় তাহার তিন মাস কারাদণ্ড হয়, আপীলেও দণ্ড কমিল না। রঙ্গপুরে ৭ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে বারোয়ারীর কালীমূর্ত্তি ধ্বংসের অভিযোগ। আরাকানে অকালে ভীষণ বন্যা, একটি শিশু ও একটি স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ, বহু ফসল ও সম্পত্তি নষ্ট।

৭ই আষাঢ়—

সার সুরেন্দ্রনাথ বনাম অমৃতবাজারের মামলা আপোষের জন্য স্থগিত। লবণ-শুল্কবৃদ্ধির প্রতিবাদে যুক্তপ্রদেশের মুন্সী ঈশ্বর শরণের পদত্যাগ। এলাহাবাদে কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রতাপগড়ে তদন্ত চলিতেছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থামত গোপনে জাপানে সাবমেরিনের চিত্র ডেলি হেরাল্ড প্রকাশ করায় তাঁহাদের অফিসে খানাতল্লাসী। নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে সত্যাগ্রহীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্ট্রিক মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় বর্ষ } ১ম * শ্রাবণ, ১৩৩০ * খণ্ড { ৪র্থ সংখ্যা

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার

সভা সমিতির নাম শুনিলে আজকাল হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইদানীং নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে সভা আহূত হইয়া নানা প্রকার বার্ত্তা প্রচার উপলক্ষে দেশের হৃদয়ের স্পন্দন কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। দেশের যে এখন ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আর কাহারও উপলব্ধি করিতে বাকি নাই। এই বোধই আমাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত করিবে। দেশবাসীর মনে আজ যে ব্যাকুলতা আসিয়াছে, তাহাতেই শেষে সফলতা আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাই চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার দুঃখ ক্লেশের মধ্যেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হই না। আজ এই সভায় মহিলারা আসিয়াছেন। দেশের সমস্ত মঙ্গল প্রচেষ্টার সঙ্গে ইঁহারা কায়মনে যোগদান না করিলে এ দেশ জাগ্রত হইবার আশা করা বৃথা।

আমি সাধারণতঃ খদ্দর সম্বন্ধেই বলিয়া থাকি। কিন্তু বারোয়ারী উপলক্ষে মিলিত হইয়া কোন জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিতে চাহি না। বারোয়ারী বলিতে আমরা সাধারণতঃ 'দোকানদারী কাণ্ড' বুঝি। জানি না, এ স্থানে কয়জন দোকানদার উপস্থিত আছেন। বারো রকম লোক রংতামাসা করিবার জন্য যে 'সামাজিক' প্রয়োজনে মিলিত হয়, তাহাকেই বলে—বারোয়ারী। কিন্তু আজ বাঙ্গালা দেশে মুখরোচক আলোচনার বিষয় কোথায়? যে স্থানেই যাই, দেখি, যুবক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত, কাজেই আমাকে অনেক অপ্রিয় সত্য প্রচার করিতে হয়। এই যুবকগণই সমাজের আশা ও ভরসাস্থল। কাজেই আজও আমাদের সামাজিক কতকগুলি দৌর্ব্বল্যের কথা বলিব।

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। তখন হিন্দুসমাজে ঘোর বিপ্লবের সময়। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় যুবকবৃন্দ অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের উৎসাহে সমাজদেহে এক বিরাট চেতনার অনুভূতি-সঞ্চার হইয়াছে। তাহার পর আবার অবসাদের যুগ আসিয়াছিল। এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া সমাজে নানা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। এখন হিন্দুসমাজে সকল অনাচারই সহিয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া যথেষ্ট উদারতা যে আসিয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণই নাই। বাহ্যিক ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের সমাজের উদারতা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, 'সমাজের' 'মনের' বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমাদের অনেক ব্যাধি। শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অনাচারের নাগপাশে সমাজদেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহনের সময় হইতে এক শতাব্দীর প্রচেষ্টায়ও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যৌবনে শিক্ষার্থিরূপে ছয় বৎসর একাদিক্রমে এবং পরে আর তিন বারে দর্শকভাবে দুই বৎসর বিলাতে বাস করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া যে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা আমাদের অন্তরের দৈন্য ও দুর্দশার প্রকৃত মূর্ত্তি বুঝিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। আজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলিব।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা জাতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত একটি যুবকদলের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম আমাদের ব্যাধি-ক্লিষ্ট সমাজ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ডিরোজিওর উন্মাদিনী শিক্ষার প্রভাবে এই নবীন সংস্কারকদল প্রতীচীর সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া লইতেন। আর যাহা কিছু প্রাচ্য এবং ভারতীয় আদর্শ, তাহাকেই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে অন্তরায় বলিয়া ধরিয়া লইলেন। ইঁহাদের অন্তঃকরণে যে যথেষ্ট পরিমাণ স্বদেশহিতৈষণা জাগ্রত হয় নাই, এরূপ ভাবিবার কোন হেতু নাই। ইঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে জাতীয় মুক্তি সাধিত হইবে বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন। জাতীয় হীনতায় এবং অবনতিতে মনে সংস্কারের ইচ্ছা বলবতী হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু এই সংস্কারের ইচ্ছা কিছু উৎকট আকার ধারণ করিয়াছিল। আঘাত করিবার ইচ্ছা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, ইঁহারা প্রকাশ্যে গোমাংস ভোজন করিয়া হাড় প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বর্গীয় মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পর্য্যন্ত এক সময়ে প্রকাশ্যে মদ্যপান করা অতি বড় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ, বিলাতী সভ্যতাই জাতিকে মোক্ষ দিয়া যাইবে এ বিশ্বাস করিতেন। তাহার পর মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন এবং হাইকোর্টে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখনই এই "সাহেবিয়ানার" স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইল। বিদেশী ধাঁচে বাস করা, বিদেশী ঢঙে পোষাক পরা ও কথা বলাই এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া উঠিল। হোটেলে গৌরাঙ্গদের সঙ্গে বাস করা এবং সযত্নে বাঙ্গালীত্বের সমস্ত চিহ্ন সঙ্গোপনে দূর করিবার প্রয়াসই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। কিন্তু আজ মনকে জিজ্ঞাসা করিবার সময়

রাজনারায়ণ বসু

আসিয়াছে, সেই ধারা কি বন্ধ হইয়াছে? এখনও কি বাঙ্গালীর অন্তরে ইহাই বীজমন্ত্র বা article of faith নহে? এই 'জাতীয়তার' উদ্বোধনের দিনেও আমাদের মনে, "সাহেবীর" ইচ্ছা কোন কোন অন্তরে বর্ত্তমান!

ইহারই ফলে, একটি প্রতিঘাত দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির "আর্য্যামীর" পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়। একদিকে যেমন উৎকট "সাহেবিয়ানা"ই জাতিকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতেছিলেন, তেমনই এই আর্য্যামীর আস্ফালন আরম্ভ করিলেন আর এক দল। সেই সময় ব্রহ্মের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর General Assembly Hallএ একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন "আর্য্যামী ও সাহেবিয়ানা"। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তখন লিখিয়াছিলেন :—

"মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য্য,'
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
মোরা বড় ব'লে করেছি ধার্য্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।"

ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনের পর হইতে এই উৎকট "সাহেবিয়ানাকে" আমরা আর বড় প্রকাশ্যে আমল দিই না, কিন্তু ইহা ওতপ্রোতভাবে যেন আমাদের নব্য সমাজের অস্থিমজ্জায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ঘটনার কথাই বলিব। আজকাল চা প্রায় সকলেই পান করেন, কিন্তু এই চা-ই আমাদের দেশের অজীর্ণতা এবং দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি আধুনিক ব্যাধিগুলির অন্যতম কারণ। এই চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাওয়াও আজকাল fashion হইয়া দাড়াইয়াছে। এক টিন বিলাতী হাণ্টলী পামারের বিস্কুটের মূল্য ১৷৹ টাকা দিতে হয়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি বলিতে পারি, এই বিস্কুট আমাদের দেশের মুড়ি অপেক্ষা কোনমতে খাদ্যরূপে উৎকৃষ্ট নহে। এ কথা অনেকে জানেনও; কিন্তু মুড়ির নামে কে না নাসিকা কুঞ্চিত করেন? এই যে মনোভাব, ইহার মধ্যে কি "সাহেবিয়ানা" খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ভদ্রলোক-অতিথিকে বিস্কুটের পরিবর্ত্তে মুড়ি দিয়া অভ্যর্থনা করিবার সাহস নাই কেন? এই বিস্কুটের জন্য যে প্রতি দিনে অন্যূন ৩৲ টাকা বেশী খরচ করিতে হইতেছে, তবু করি কেন? আমরা কি বিলাতকে এতই ভালবাসি যে, প্রতি দিন বিস্কুট কিনিবার উপলক্ষে ৩৲ টাকা মণি অর্ডার করিয়া সাহায্য করিতে ব্যস্ত হই?

এই তথাকথিত "সাহেবি" সভ্যতার বাহিরের পরিচায়ক চিহ্ন কি? অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, ইহা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ চৌরঙ্গীতে থাকিতে হইবে অর্থাৎ আমি যাহা নহি, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে। যাহারা বিলাত হইতে ডাক্তার-ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন, তাঁহাদিগকে প্রথমেই মোটর কিনিতে হইবে, বাহিরের নানাপ্রকার জাঁক-জমকের দ্বারা লোক ভুলাইতে হইবে। সমাজের চক্ষুতে ধূলি দিয়া ধাঁধা লাগাইতে হইবে যে, আমার পসার বেজায়। এই মিথ্যা অনুষ্ঠানের উপর দাঁড় করান আমাদের "সাহেবিয়ানার" প্রভাব সমাজ-দেহে সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদিগকে আরও সহজ একটা উদাহরণ দিব। বিবাহ উপলক্ষে পাকা দেখার খাওয়া আজকাল একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দাড়াইয়াছে। মহারাজকেও পরাস্ত করিয়া অকালের ফল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভোজের আয়োজন দরিদ্র কেরাণী পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। অকালের আম কি খাইতে বেশী সুস্বাদু? অত্যধিক মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিবার মত বিত্তশালীও সকলে নহে। তবু ইহা কোন্ উদ্দেশ্যে করা হয়? নিমন্ত্রিত দশ জনের দৃষ্টিতে নিজের কদর বাড়াইবার এবং নিজেকে ধনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছাই কি ইহার মূলে দেখিতে পাই না? এইরূপ মিথ্যাচার আজ সমাজের সর্ব্বত্র।

পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে আজকাল যে বিলাসিতা ঢুকিয়াছে, অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ মূলতঃ তাহার পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ কোন অংশে কম যায়েন না, পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজই অগ্রণী। সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি-প্রচেষ্টাই কি এই বিলাসিতার একমাত্র কারণ? দশজনের মধ্যে বস্ত্র এবং অলঙ্কারের বহুমূল্যতা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কোন ইচ্ছা কি ইহাতে অবর্ত্তমান থাকে? মুখে জাতীয়তার আদর্শ আওড়াইলে কি হইবে? ভারতের চিরন্তন আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে থাকে কোথায়? দরিদ্র দেশকে এই সমস্ত বিলাসিতার অনাচার

দ্বারা আমরা আরও দরিদ্র করিয়া তুলিতেছি এবং সর্ব্বনাশের পথে লইয়া চলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারে তাহা যে বুঝিয়াছি, তাহার প্রমাণ কোথায়?

বিলাতের অনুকরণস্পৃহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত। প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিডনী স্মিথ বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে "Poverty is regarded as infamous." আমরাও সেই আদর্শ মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাই ইংরাজের দেখাদেখি সহজে ধনী হইবার আশায় যৌথ কারবারের পত্তন করিতেছি। পত্রান্তরে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামক যে উৎকৃষ্ট নকসা বাহির হইয়াছিল, অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। প্রথম প্রথম লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া এই সমস্ত কোম্পানী বাহির করা হইত, এখন ক্রমেই মাত্রা বাড়াইয়া ২০।২৫ লক্ষে এবং কোটিতে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজের কাজ করিবার পদ্ধতির অনুকরণ করিবার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র যত্নবান নহি। তাঁহাদের ব্যবসায়ে কৃতী হইবার জন্য যে যত্ন ও অধ্যবসায় আছে, তাহা আমাদের নাই। কিন্তু বাহিরের আড়ম্বর, চটক ও জাঁক-জমক এবং ধরণধারণ নকল করিয়াই আমরা সফল হইবার আশা করি। ইংরাজের ব্যবসায়ে সততা আমরা অনুকরণ করি না। অনেকে নিজেদের ব্যবসায়ে কুকীর্ত্তি দুই একটা ইংরাজ কোম্পানীর আচরিত জুয়াচুরীর দোহাই দিয়া ক্ষালন করিতে চাহেন। তাঁহারা ভুলিয়া যায়েন, কদাচিৎ দুই একটা ইংরাজ কোম্পানীই এরূপ করিয়া থাকে। অধিকাংশই সততার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অংশীদারদের স্বার্থরক্ষা করিয়া থাকে। আর যদি বা ইংরাজ কোম্পানীগুলি অসাধু হইত, ইংরাজ পাপাচরণ করে বলিয়া কি আমাদেরও তাহা করিলে পুণ্য হইবে? ইংলণ্ডে দারিদ্র্য দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই বলিয়া, আমরা কি বুঝিব যে, জীবনে যত কিছু কুকার্য্যই করি না কেন, যদি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারি এবং অনেকে আমার অনুগ্রহভিখারী হয়, তবে আমার সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে? যদি কোন সাধু এবং সদ্ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনে কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, তবে কি তাঁহার দারিদ্র্য দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইবে? আমাদের দেশে এই বিকৃত পাশ্চাত্য

মনোমোহন ঘোষ।

আদর্শ আসিয়াছে। কারণ, এ দেশে দারিদ্র্য কোন দিন লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পত্নী অলঙ্কারের অভাবে বাম মণিবন্ধে লাল সূতা বাঁধিয়া রাখিতেন; কিন্তু জানিতেন, সে সূতা যে দিন খুলিতে হইবে, নবদ্বীপ সে দিন অন্ধকার হইবে। চরিত্রহীন ব্যক্তি আজ যদি লাটের সভার সভাসদ্ হয়েন, তবে কি আমরা তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া নানা প্রকার চাটুবাক্যে তাঁহার তোষামোদ করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হই? দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতিই আমাদের যত কিছু সামাজিক শাসন। শুধু তাহার দারিদ্র্যের অপরাধেই যত প্রকার সামাজিক উৎপীড়ন আমরা করিয়া থাকি। যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার বালিকা বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেয় এবং যদি তাহার যথেষ্ট অর্থবল না থাকে, তবে তাহার অপরাধ; আর ধনীর এইরূপ আচরণে কোন বিশেষ সামাজিক গোল হয় না। তিনি তাঁহার অর্থের প্রভাবে হেলায় বৈতরণী পার হইয়া যায়েন।
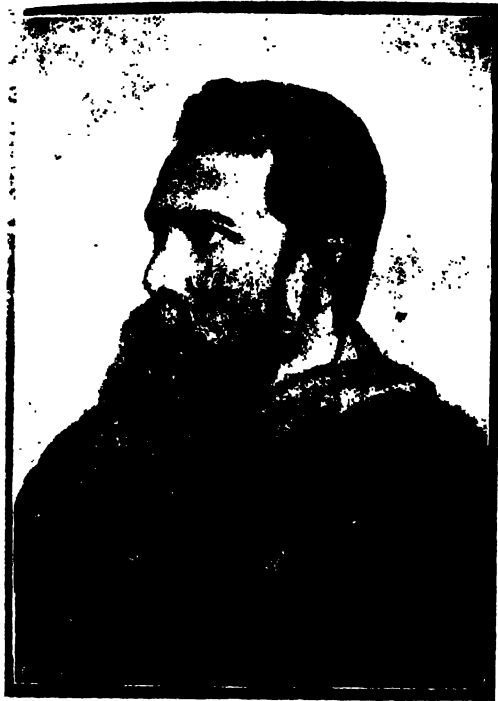
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর একটি সামাজিক কুপ্রথার কথা বলিব, এ সম্বন্ধে ঢের আলোচনাও হইয়াছে। পণ-প্রথায় আমাদের দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। বড় বড় বক্তৃতা, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ইত্যাদি সব কার্য্যই আমরা যথানিয়মে পালন করিয়াছি। কিন্তু নিজের পুত্রের বিবাহে অন্তঃপুরের দোহাই দিয়া যুগপৎ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ এবং অর্থলোভের সমন্বয় করিয়া থাকি। শত শত স্নেহলতার মৃত্যুতে কলঙ্কিত এই বঙ্গদেশে আজিও এই রোগের উপশম হইল না! তাই কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রাগ্রস্ত এই জাতি কোন দিন জাগিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই পণ-প্রথার সহিত অপর একটি প্রথার উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। সম্প্রতি বিবাহে লৌকিকতা প্রদান করাও একটা ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহা আমরা আমাদের গুরু ইংরাজের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজের বড় বড় বিবাহের পরদিন কাগজে লাট-সভার সদস্য, বণিক, সিবিলিয়ান প্রভৃতির প্রদত্ত উপহারের তালিকা প্রকাশিত হয় এবং আমাদের দেশীয় এক দলও ঐরূপ কাগজে নিজের উপহারের বিজ্ঞাপন দেখিবার চরম সুখটুকু লাভ করিবার জন্য বহুমূল্য উপহার অকাতরে অর্থ ঢালিয়া ক্রয় করিয়া থাকেন। আজকাল কোন কোন অঞ্চলের fashionable weddingএ উপহার-তালিকা বাহির হইয়া থাকে। ইহা আবার দেশীয় পরিচালিত (native) কাগজে হইলে চলিবে না; খাস চৌরঙ্গীস্থ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে তবে নেটিব-জীবন ধন্য হইবে। আর আমাদের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণী ধনীদের অনুকরণ করিয়া এই লৌকিকতাকে উৎপীড়নের একটি যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। তবে সুখের বিষয়, কায়স্থ-সমাজে সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি কতিপয় অগ্রণীর চেষ্টায় এই কুপ্রথার প্রচলন কিছু কমিয়াছে। বিবাহে পণপ্রথা নিবারণ করিতে অনেক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সুফল কিছু হয় নাই, হইবেও না যত দিন কন্যাদিগকে আমরা সযত্নে শিক্ষা দিয়া আত্মমর্য্যাদাবোধে প্রবুদ্ধ না করিতেছি। সম্প্রতি দেখিয়া আসিলাম, বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কলেজে কলেজে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। আমরা ত হিন্দুত্বের বড়াই করিয়া থাকি। সে দেশীয় ব্রাহ্মণরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কি দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা অনেকেই জানেন; "মচ্ছলি" খায় শুনিলে তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। অথচ তথায় স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাদ্রাজী লিখিয়াছিলেন---সমাজ-সংস্কারে বাঙ্গালা অগ্রণী। যে দেশ রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জন্ম দিয়াছে, তাহা সমাজ সংস্কারের দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় সমাজ-সংস্কার কোথায়? আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে সত্য, বিলাতী সভ্যতা আমরা অনেকেই গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু সমাজ-সংস্কারের পথে দিন দিনই আমরা পশ্চাতে যাইতেছি। অথচ বাহিরের দিকে দেখিলে আমাদের সংস্কারের অবশিষ্ট অতি অল্পই আছে। এখন আহার-বিহারের কোন বাধাই আমরা মানি না। কেশব বাবুর সময়, এক পূর্ব্ববঙ্গবাসী কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছিল, "কেশব সেন, উইলসেন (Wilson's Hotel) এবং ইষ্টিসেন (station) এই তিন সেনে মিলিয়া বাঙ্গালা দেশের জাতি নষ্ট করিতেছে।" এখন কেলনারের হোটেলে খাইতে আমাদের আর কোন বাধা নাই। কিন্তু সামাজিক নিমন্ত্রণে পংক্তিভোজন করিলেই যেন জাতি নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে সমাজের এক অঙ্গকে ক্রমাগত অপাংক্তেয়

পুকুরে স্নানাদিতেও কোন সামাজিক বাধা নাই। মাদ্রাজে নিম্নশ্রেণীর প্রতি কিরূপ নির্য্যাতন করা হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পারিয়াদের প্রতি অত্যাচার যে কত বড় জাতীয় কলঙ্ক, তাহা এই জাতীয়তার জাগরণের দিনে আর বেশী করিয়া কি বলিব?

আর্য্য-সমাজ সম্প্রতি রাজপুতানার ৬ হাজার রাজপুত মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে সমস্ত মুসলমানসমাজে কি আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে! ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সামাজিক সমন্বয়ের এত বড় আদর্শ এক ইসলাম ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম্মে নাই। তাই নির্য্যাতিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলামের আশ্রয়ে মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার আশায় যাইতেছে। আমাদেরই বাঙ্গালা দেশে ফরিদপুর অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের প্রতি সামাজিক নির্য্যাতনের ফলে গ্রামের পর গ্রাম হয় খৃষ্টান, না হয় মুসলমান হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমাদের সমাজে কোনরূপ বিক্ষোভ উঠিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

অস্পৃশ্য করিয়া আমরা হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, মাদ্রাজে ২ লক্ষ তিয়ার মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ সামাজিক উৎপীড়ন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কায়স্থে শিক্ষা দীক্ষা প্রতিষ্ঠায় কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু মাদ্রাজে অব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার অসহনীয়। বাঙ্গালায় যদি, দানবীর তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, সারদাচরণ মিত্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের মনীষী বর্গকে সামাজিক অত্যাচারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে কি মর্ম্মান্তিক হইত, শুধু তাহাই কল্পনা করুন। এই তিয়ার সম্প্রদায় সমাজের সামান্য অধিকারটুকু লাভ করিতে অক্ষম হইয়াই আজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন। বাঙ্গালায়ও নমশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতি আমরা অবিচার করিয়া থাকি। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালায় দৃষ্টিদোষে ভোজন নষ্ট হয় না কিংবা এক

দীনবন্ধু মিত্র

বাঙ্গালার হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ; আর মুসলমানগণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ, মুসলমানদের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আছে। তাহার পৈতৃক ভিটা আগ্‌লাইয়া, বাপ-পিতামহের নাম [illegible] রাখিতে ব্যস্ত হইয়া, যখন ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত [illegible], তখন মুসলমান যুবকরা পদ্মার অজানা চরে যাইয়া [illegible] করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে ব্যস্ত; কেহ [illegible]রে খালাসী, সারেঙ্গ হইয়া স্বতন্ত্র জীবিকা অর্জ্জন করিয়া [illegible] পিতামহের দুই বিঘা জমীতে ভাইদের সঙ্গে ভাগ বসাই[illegible]ছে না। যে ভাবে বাঙ্গালার হিন্দুজাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ২৫ বৎসর পরে হিন্দু মুসলমান [illegible]র মীমাংসা আপনিই হইয়া যাইবে। প্রকৃতিকে এড়াইয়া [illegible] দিয়া বাঁচা অসম্ভব। You cannot cheat nature [illegible] her dues প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইবেই [illegible]বে। শুধু আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিয়া জগতে বাঁচিয়া [illegible] যায় না। সামাজিক দুর্নীতি সকল কুটুম্বকে দূর হয়।

হিন্দুদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেই জগতে [illegible]দের স্থান হইবে না। আমরা যদি অচিরে সমস্ত সামা[illegible]ক সমস্যার প্রকৃত সমাধান না করি, তবে আমাদের [illegible] যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, তাহা না বলিলেও বলা [illegible]তেছে।

আজকাল যেমন কালাজ্বর ও হুকওয়ার্ম নূতন ব্যাধি দেশে দেখা দিয়াছে, তেমনই সমাজে আর একটা বড় ব্যাধি আসিয়াছে—জুয়া। জুয়াখেলা যে আকারে সমাজে চলিত, তাহাতে মানুষের কত বিপদ্ হইতে পারে, মহাভারতে অক্ষক্রীড়ায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির দুর্গতিতে তাহা দেখান হইয়াছে। আর আজ—রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টায় সহরে ঘরে ঘরে জুয়াখেলা! তুলার খেলায় অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আবার ঘোড়দৌড়ের নেশা না কি অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

যদি কাহারও মনে কোন ব্যথা দিয়া থাকি, তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ রাখিলে রোগ সারিবে না। এই অধঃপতিত জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন বিষাদে আক্রান্ত হয়। জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত একাসনে বসিবার স্থান পাইতে হইলে সমাজ দেহের ক্ষতগুলির উপর অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। ইহাতে যে বেদনা বোধ হইবে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া সহ্য করিতে হইবে।

আজ, আমাদের হৃদয়ের অবসাদ দূর হইয়া এই জাতি নব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠুক এবং অন্তরে জাতীয় জীবন দেবতার আহ্বান-ভেরী শুনিয়া আমরা জাতি-গঠনের কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত করি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

[illegible] বক্তৃতার সারাংশ।

উদ্ভট-সাগর

সন্ধ্যাকাল হইলে কে কে হাসে ও কে কে কাঁদে, তাহাই [illegible] এই শ্লোকে কহিতেছেন।

> উন্মুদ্রিতমধুকং কুমুদিনী কিঞ্চিৎ স্মেরাননী
> চক্রী চক্রবিয়োগিনী পতিভয়াদ্ বালা বধূস্বামিনী
> মুন্না বেশবিধায়িনী বিরহিণী নেত্রাম্বুসংবাহিনী
> ভানৌ যাতি নগেন্দ্রকোণকুহরে পশ্যামি চেত্যাদ্ভুতম্।

দিনমণি চ'লে যায় কে আর ফিরাবে তায়
মনোদুঃখে কমলিনী মুদিল নয়ন।
বহু বিচ্ছেদের পর আসিতেছে শশধর
মহানন্দে কুমুদিনী প্রফুল্ল বদন।
দিবসের সুখ যত এখনি হইবে হত
এই ভয়ে চক্রবাকী প্রাণে ম'রে রয়
যেতে হবে পতি পাশে কি ঘটিবে তাঁর পাশে
বালবধূ মনে মনে পাইতেছে ভয়।
সাজ পরা নানামত করিতেছে যুবতী যত
ভুলাইতে প্রেমাস্পদ যুবকের মন
কোথায় গেছেন স্বামী তবে নাহি পাব আমি
হেথা তাঁরি বিরহিণী করিছে রোদন॥
সন্ধ্যাকাল যবে আসে কেহ কাঁদে, কেহ হাসে
বিধির বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে?
কারো ভাগ্যে মহাসুখ কারো ভাগ্যে মহাদুখ
সুখ দুঃখ চক্রবৎ ফিরে এ সংসারে॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর

ভালবাসা ?

১

"আপনার পিতা অত্যন্ত পীড়িত। শীঘ্র আসুন।

পার্ব্বতী"

বর্দ্ধমান জিলার নবাবগঞ্জের তালুকদার যুবক শক্তিপদ মজুমদার সে দিন মধ্যাহ্নে এই টেলিগ্রাম পাইল, সে দিন সন্ধ্যার সময় তাহার জমীদারী পরিদর্শনে যাইবার কথা। যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে পত্নী কুসুমকুমারী বাক্স গোছাইয়া দিয়াছে, বিছানা বাঁধাও হইয়াছে। এমন সময় মধ্যাহ্নে টেলিগ্রাফ-পিয়ন দুই মাইল দূরবর্ত্তী ডাকঘর হইতে এই সংবাদ লইয়া আসিল।

টেলিগ্রাম পাইয়া শক্তিপদ কিছুক্ষণ কি ভাবিল। কুসুমকুমারী কাছে ছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?" তাহাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া শক্তিপদ যেন চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া বলিল, "এলাহাবাদ থেকে খবর এল—বড় অসুখ।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাবে না?"

"তাই ভাবছি।"

পিতার এরূপ সংবাদ পাইয়া পুত্র যাইবে কি না, ভাবিতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু শক্তিপদর পিতা শ্যামাপদর ইতিহাস যাহারা জানিতেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহার এই ভাব বিস্ময় উৎপাদন করিত না।

শক্তিপদ ভাবিতে লাগিল—পিতা! যে পিতাকে ভক্তি করিবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলে সে চেষ্টা করিয়া সেই ব্যাকুলতার গতিরোধ করিয়াছে; যে পিতাকে সে দেখে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যে পিতার স্নেহের কোন পরিচয়ই সে পায় নাই, অথচ প্রতি মাসে যাহার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ পাইয়া আসিয়াছে; যে পিতা সে সাবালক হইলেই তাহার সম্পত্তি তাহাকে দানপত্র করিয়া দিয়াছেন; যে পিতা তাহার পক্ষে যেন জীবিত হইয়াও মৃত; যে পিতার জন্য সে সমাজের কাছে লজ্জানুভব করে; যে পিতার জন্য তাহার মা'র জীবন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস—সেই পিতা। তিনি জীবনে তাহাকে কাছে ডাকিতে পারেন নাই। আজ যখন পরপার হইতে তাহার জন্য ডাক আসিয়াছে—কিন্তু এ আহ্বান তাঁহারই? কে বলিবে? টেলিগ্রাম করিতেছে—পার্ব্বতী।

শক্তিপদ কাগজখানা খুলিয়া আবার পড়িল। তাহার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। কি সাহস! যে মায়াবিনী তাঁহাকে স্ত্রীপুত্রপরিজন—এমন কি, সমাজ হইতেও পর করিয়া লইয়া—সকলের মাথা হেঁট করাইয়াছে, সে কি না সাহস করিয়া তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছে? না—সে যাইবে না।

কুসুম এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল, "কিন্তু তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

শক্তিপদ বলিল, "সেখানে—সে বাড়ীতে আমি কেমন ক'রে যাব?"

অনেক সময় দেখা যায়, পুরুষ যে স্থলে চুলচিরা বিচারে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না, নারী সে স্থলে যেন সহজাত-সংস্কারে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া ফেলে। কুসুম বলিল, "যমের সামনে সে সব কথা ভাববার সময় থাকে না। তিনি যখন ডেকেছেন তোমাকে যেতে হবে।"

"কে বল্লে, তিনি ডেকেছেন? টেলিগ্রাম করেছে সে সেই—"

"সেই কথা! তিনি না বল্লে সে কি কখন সাহস ক'রে, তোমায় ডাকতে পারে? কখনই না। তুমি যাও।"

শক্তিপদ ভাবিল তাই কি? প্রকৃত কথা, পিতাকে ভক্তি করিবার জন্য তাহার একটা প্রবল ব্যাকুলতা ছিল, অনেক চেষ্টায় সে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু বরফের নিম্নে কুসুমকলির মত ঘৃণার তলে সে ব্যাকুলতা নষ্ট হয় নাই। সে টেলিগ্রামখানা লইয়া মা'র সন্ধানে গেল।

সুরেশ্বরী তখন স্বহস্তে ঠাকুরঘর মুছিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিতেছিলেন—তাহার পর যাইয়া স্বপাকে আহারের আয়োজন করিবেন। মাথার ভিজা চুল তখনও শুকায় নাই,—পৃষ্ঠে চওড়া লালপাড় গরদের কাপড়ের উপর ছড়াইয়া আছে। পুত্রকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, শক্তি?"

"এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে।"

"টেলিগ্রাম ?"

"বাবার বড় অসুখ—যাবার জন্যে—"

"কখন যাবি ?"

"যাব কি ?"

"তা' যাবি নে ? তুই ছেলে ছেলের কাজ করবি নে কি ?"

"টেলিগ্রাম করেছে কিন্তু—"

"তা' হ'ক গে—তোকে যেতে হয়।"

মা'র এই সব কথার মধ্যে উৎকণ্ঠার বা ব্যাকুলতার কোন নিদর্শন শক্তিপদ পাইল না। কুসুম বলিয়াছিল, যমের সম্মুখে এ সব কথা বিচার করিবার সময় নহে। সেই কথা মনে করিয়া সে একবার ভাবিল, মা'কে জিজ্ঞাসা করে, তিনিও যাইবেন কি না ? তিনি তাহাকে ছেলের কাজ করিতে সত্পদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রী—তাঁহার কর্ত্তব্য ?

শক্তিপদ সে কথা ভাবিল বটে, কিন্তু মা'কে বলিতে পারিল না। মা'র নিরুদ্বেগ ভাব লক্ষ্য করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। সে যদি মা'র ব্যবহারে এতটুকু উৎকণ্ঠার চিহ্ন পাইত, তবে তাহার মানবহৃদয় যেন অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিতে পারিত। কিন্তু মা'র ব্যবহারে সে সেরূপ চিহ্ন পাইল না—না পাইয়া হতাশ হইল।

বাড়ীর কাছে যে ষ্টেশন, সেই ষ্টেশনে যাত্রিগাড়ী ধরিয়া বর্দ্ধমানে যাইয়া ডাকগাড়ীতে উঠিতে হইবে—কাজেই সময়ও যে বড় অধিক ছিল, তাহা নহে। মা'র কাছ হইতে বাহিরে আসিয়া শক্তিপদ পুরাতন কর্ম্মচারী দত্ত মহাশয়কে ডাকাইয়া আনিল এবং তাঁহাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে বলিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে গাড়ীর উপর বিছানা, বাক্স এবং গাড়ীর ভিতরে দত্ত মহাশয়কে তুলিয়া লইয়া শক্তিপদ পিতাকে দেখিতে চলিল। পুত্রের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই পঁচিশ বৎসরে সে পিতাকে দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবুও সে পিতাকে দেখিতে যাইতেছে। কিন্তু মা ? যিনি তাহার পিতার ধর্ম্মপত্নী—সমাজ যাঁহাকে সেই পত্নীত্বের গৌরবান্বিত অধিকার দিয়াছে—যিনি পিতার পুত্রের জননী, এ সংবাদে তাঁহার মুখে এতটুকু উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিল না! তাহার কোন অপরাধে—সে অপরাধ করিলেও কি এমন সংবাদে কুসুম এমন নিরুদ্বিগ্ন—অচঞ্চল ভাবে থাকিতে পারে ? শক্তিপদ ভাবিতে লাগিল।

২

সে আজ অনেক দিনের কথা—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কিশোরী সুরেশ্বরী নববধূরূপে এই পরিবারে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা বৈষ্ণব-পরিবারের বধূ হইয়াছিলেন।

বিধবা শাশুড়ীর অপরিসীম স্নেহযত্নে পিত্রালয়ের কথা ভুলিয়া যেন শ্বশুরপরিবারেরই হইয়া গিয়াছিলেন। শাশুড়ীর এক পুত্র, এক কন্যা। কন্যা ব্রজকিশোরী বিবাহিতা—সচরাচর পিতৃগৃহে আসিতে পারেন না; পুত্র অপুত্রক মাতুলের কাছে এলাহাবাদে থাকিয়া লিখাপড়া করেন। বাড়ীতে শাশুড়ী আর বধূ আর গৃহদেবতা রাধারমণ। তাঁহার নিত্যসেবার বিস্তৃত ব্যবস্থা না থাকিলে শাশুড়ীর সময় কেমন করিয়া কাটিত, বধূ তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্বামী বিদেশে, তাই বধূও সেই সেবার কাজে শাশুড়ীকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। কেবল শ্যামাপদ যখন ছুটীতে এলাহাবাদ হইতে আসিতেন, তখন কাহারও কাজে অবসর থাকিত না।

তিন বৎসর পরে শ্যামাপদ উকীল হইলেন এবং পর-বৎসর প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বিসূচিকা সহরে ছড়াইয়া পড়িলে, মামা ও মামী দুই দিনের ব্যবধানে পরলোকগত হইলে, মামার সব সম্পত্তি এবং অনেকগুলি মক্কেল তাঁহারই অধিকৃত হইল। তাহার পর শ্যামাপদ স্ত্রীকে এলাহাবাদে লইয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবার জন্য মা বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না।

প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবজ। দার্শনিকরা বলেন বটে, ভোগে তাহার নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু ভোগবাসনাকে যত চাপিয়া রাখা যায়; গৃহীর—ভোগের মধ্যে বর্দ্ধিত ব্যক্তির, মনে তাহা তত প্রবেশ করে। তাই মানুষ যাহা পায় না, তাহাই চাহে। তখনও ছেলের দলে "আমার দেশ" ভাবটা প্রবল হয় নাই—য়ুরোপীয়ের অনুকরণ বেশে, বাসে, আহারে-বিহারে য়ুরোপীয়ের অনুসরণ তখন যুবক-সমাজে আদৃত। শ্যামাপদ কিন্তু কখনও সে পথের পথিক হইতে পারেন নাই। বাড়ীতে বিধবা মা—দেবসেবা লইয়া ব্যস্ত;

ওদিকে মামা-মামী পরম বৈষ্ণব; কাজেই শ্যামাপদ কোন দিন নব্য চালে চলিতে পারেন নাই।

যে বাসনা শ্যামাপদ এত দিন পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই, এখন তাহার পরিতৃপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইল। মামার বাড়ীতে আবশ্যক পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন করিয়া ড্রয়িংরুম, ডিনিংরুম প্রভৃতি সাজান হইল; পূজার ফুলের জন্য যে বাগান ছিল, তাহা "লনে" পরিণতি লাভ করিল এবং খানাপিনারও নূতন ব্যবস্থা হইল। এ সব সুরেশ্বরী অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর গৃহসংস্কারের পর, পরিচ্ছদসংস্কারের পালা পড়িল। স্বামীর জন্য তিনি সেমিজ জ্যাকেট পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন মোজা জুতার আমদানী হইল এবং তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য "জেনানা মিশনের" বিবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বলের অস্ত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিতেও তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তাঁহার আপত্তি যত আত্ম প্রকাশ করিতে লাগিল, শ্যামাপদর জিদ ততই বাড়িতে লাগিল।

এই অবস্থায় সুরেশ্বরী পিত্রালয়ে আসিলেন এবং তথায় সকলেই একবাক্যে হিন্দুর মেয়ের বিবি হওয়ার নিন্দা করিয়া তাঁহার যে কাযে আপত্তি আরও বাড়াইয়া দিলেন। পিত্রালয়ে প্রসবের পর ছয় মাসের পুত্র লইয়া সুরেশ্বরী শাশুড়ীর কাছে আসিলেন এবং পুনরায় এলাহাবাদে যাইবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে অসম্মত হইলেন।

পুত্রের চালচলন যে মা'র ভাল লাগিত, তাহা নহে; কিন্তু তিনি মনে করিতেন, স্ত্রীলোক "যেন পতিং শুশ্রূষতে, তেন স্বর্গে মহীয়তে"। তাই শ্যামাপদ যখন স্ত্রীকে লইতে আসিলেন, তখন তিনি পুত্রবধূকে যাইবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। সুরেশ্বরী কোন উপদেশই শুনিলেন না। শ্যামাপদ রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শাশুড়ী বধূকে বলিলেন, "বৌমা, বড় ভুল করলে। এখন কি করবে?"

সুরেশ্বরী বলিলেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—আমার কাযের অভাব হবে না। শক্তি আছে, আর আপনার পদসেবা করব—রাধারমণের সেবা করব।"

"শক্তিপদ বেঁচে থাক। কিন্তু আমি আর ক'দিন? আর রাধারমণের সেবা—সে ত তুমি করতে পারবে না!"

সবিস্ময়ে সুরেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, মা?"

"তবে বলি, শুন। জান ত এ বাড়ী, এ সম্পত্তি সব আমার দিদি শাশুড়ীর? তিনি ছিলেন তাঁর বাপের এক মেয়ে—মা-মরা, বড় আদরের। তাঁর বিয়ে দিয়ে তাঁর বাপ যখন বৃন্দাবনবাসী হ'ন, তখনই ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা ক'রে, সব দেবতার সম্পত্তি ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্কল্প ক'রে তিনি গুরুদেবকে আনিয়ে পরামর্শ করেন। তিনি শুনে বলেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি কোন্ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করা হবে।' পর দিন তিনি যখন রাধারমণ-প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর প্রতিষ্ঠার আবার রকম আছে না কি?' গুরুদেব বলেন, 'আছে—অধিকারিভেদ মানতেই হয়। নারীর মনে স্বামীর উপর যে ভালবাসা—যা'তে আর সব ভুলিয়ে দেয়, তাই যখন দেবতাকে দেওয়া যায়, তখন মুক্তি হয়। গোপীরা সেই প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছিল। যে স্বামীকে ভালবাসতে পারে না,—রাধা ভাবে প্রিয়তমের সব ত্রুটিও ক্ষমা করতে পারে না, সে কেমন ক'রে ভগবানকে—অনন্তসুন্দরকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করবে? তাই আগে রাধাভাব। তা'র পরে বাৎসল্যে বুক আপনি ভ'রে উঠে—সেই ভাবে যশোদা বালগোপালকে পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমের পর বাৎসল্য। তাই আমি রাধারমণ-প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিচ্ছি। প্রেমের মধ্য দিয়েই সহজে প্রিয়তমকে পাওয়া যায়—আর কিছুতে নয়।' এই কথা—গুরুদত্ত এই উপদেশ দিদি-শাশুড়ী আমার শাশুড়ীকে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁরা দুই জনেই হাতের নোয়া—মাথার সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে গেছেন। আমি হতভাগিনী বুঝি তাঁদের উপদেশ তেমন ক'রে পালন করতে পারিনি, তাই স্ত্রীলোকের যা' সব চেয়ে দুঃখ, সেই বৈধব্য ভোগ করছি। মা, তুমি এলাহাবাদে যাও—স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম—স্বামী যা'তে সুখী, স্ত্রীর তাতেই সুখ।"

সুরেশ্বরী কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেবতার সেবায় আর পুত্রের লালনপালনে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিলেন। প্রতিদিন বৃদ্ধ গোস্বামী ঠাকুর শাশুড়ীকে কৃষ্ণলীলাকথামৃত শুনাইতেন—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক বুঝাইয়া দিতেন। সুরেশ্বরী তাহা শুনিতেন—

...ই সব কথা ভাবিতেন, আর তিনি যখন ঠাকুরঘরে কাজ ...িতেন বা রাত্রিতে শয্যায় শুইতেন—তখন তাঁহার মনে ...ত, তিনি নন্দপুরচন্দ্রের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন— ...ন তিনি গোপালগণ সঙ্গে শৃঙ্গবেণুরব করিতে করিতে ...নের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, কখন তিনি কালিন্দীর কূলে ...শীবটমূলে একান্তে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, কখন তিনি ...েকিত বনভূমিতে রাসরঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে বৃন্দা-...ন তিনি কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, সেই বৃন্দাবন যেন তাঁহার কাছে একান্ত পরিচিত বলিয়া মনে হইত। আর শক্তিপদকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইত, কৃষ্ণ যেন বাল-গোপালরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে মা যশোদার স্নেহসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। ভিক্ষালাভের আশায় প্রভাতে বৈষ্ণব আসিয়া দাশরথির গান গাহিয়া যাইত—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি;
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।"

তুমি আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে আসিতে কি আপত্তি করিবে?—

"যদি বল রাখালপ্রেমে　　বন্ধ আছ ব্রজধামে
(এই) জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি।"

সমস্ত দিন সেই গান সুরেশ্বরীর বুকের মধ্যে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া উঠিত।

ভাবপ্রবণ মনের এই যে দিব্যোন্মাদ—ইহাকে আজ-কাল ডাক্তাররা বলেন, "হিষ্টিরিয়া"; কিন্তু তাহা যদি একটা ব্যাধিই হয়, তবে তাঁহাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান তাহার কোন ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে কি?

শাশুড়ী বধূর এই ভাবের কোন ঔষধ পাইলেন না। যুক্তি, উপদেশ, অনুরোধ, দৃষ্টান্ত সবই ব্যর্থ হইল। বালক যেমন রাগ করিলে প্রস্ফুটিত কমল পদতলে দলিত করিয়া নষ্ট করে, সুরেশ্বরী তেমনই স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়া দেবতা-হৃদয়ের প্রবল প্রেম দলিত করিয়া নষ্ট করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই-লেন। একবার তিনি মনকে জিজ্ঞাসাও করিলেন না—"কাহে তুঁ কলহ করি কান্তসুখ তাজলি?"

৩

এই ভাবে মাসের পর মাস কাটিয়া বৎসরও ঘুরিয়া গেল। বধূর ব্যবহারে শাশুড়ী ক্রমে নিরাশ হইলেন। ওদিকে যে সব কর্ম্মচারী কার্য্যব্যপদেশে উপদেশ লইতে শ্যামাপদর কাছে এলাহাবাদে যাইতেন, তাঁহাদের কাছে ক্রমেই অধিক শঙ্কাজনক সংবাদ আসিতে লাগিল। শ্যামাপদ সংসারী—কিন্তু সংসার করিতে পারিলেন না। সেই অভিমানে—দারুণ ক্ষোভে তিনি সমাজকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সুরার উত্তেজনায় আপনার হতাশার বেদনা ভুলিতে চাহি-লেন। ওকালতীতে তাঁহার পসার খুব জমিয়াছিল; উচ্ছৃ-ঙ্খলতাও যেন দিন দিন বাড়িতেছিল। সে সংবাদে শাশুড়ী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বধূকে নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরী কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না। যে স্বামীর "সাহেবী" চাল তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই, সে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার সান্নিধ্যও তাঁহার কাছে বিষম ভীতির কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই এলাহাবাদে যাইতে সম্মত হইলেন না; পরন্তু দেবতার সেবায় মনো-যোগের মাত্রা যেন আরও বাড়াইয়া দিলেন। শাশুড়ী বলি-লেন, "বৌমা, বড় ভুল করলে। শেষে এর ফল পাবে।" তিনি পুত্রের অনেক "ত্রুটি" ক্ষমা করিতে পারিলেন; কিন্তু বধূর "অপরাধ" ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তৃতীয় বৎসরের আরম্ভে তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কে শাশুড়ী এক দরিদ্র বৃদ্ধাকে বধূর কাছে রাখিয়া তীর্থদর্শনে গমন করিলেন। শ্যামাপদকে তিনি সে কথা লিখিয়াছিলেন; শ্যামাপদও সুবোধ পুত্রের মত তীর্থ-ভ্রমণের ব্যয়বাবদে হাজার টাকা পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন—"তোমার যেখানে যেখানে ইচ্ছা, ঠাকুর দেখিতে যাইও। কোনরূপ কষ্ট করিও না। আর যে টাকা দরকার হয়, আমাকে লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।"

তিন চারি মাস তীর্থে তীর্থে ফিরিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিলেন; মনে করিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় এলাহাবাদে নামিয়া তীর্থদর্শন ও পুত্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। তথায় তিনি সংবাদ পাইলেন, পুত্র সিমলায় গিয়াছিলেন—ফিরিবার সময় একটি পাহাড়ী কিশোরীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন—সে এলাহাবাদে তাঁহার বাটীতে রহিয়াছে। শুনিয়া সে দিন তিনি আর জলস্পর্শ করিলেন না। যে বংশে কখন কোনরূপ অনাচার প্রবেশপথ পায় নাই, সেই গৃহের বংশধর এ কি করিল? রাধারমণ, তোমার মনে কি এই ছিল? তিনি সমস্ত দিন অনাহারে গোবিন্দজীর

মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া দেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন, আর তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বধূর দোষেই এ সর্ব্বনাশ হইল।

মা গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন; স্থির করিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কয় দিন শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিবেন। সে প্রস্তাব তিনি পুত্রের নিকট করিলে শ্যামাপদ আপনি আসিয়া "পুলিনে" তাঁহার জন্য একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া মা'কে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। মা তিন বৎসর পরে বৃন্দাবনের রজেই দেহ রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে শ্যামাপদ ছয় সাতবার মা'র কাছে আসিয়া সময় সময় কয় দিন করিয়া কাটাইয়া গিয়াছিলেন এবং মা'র শেষ পীড়ার সময় আসিয়া অন্তিমসময়ে তাঁহার মুখে গোবিন্দজীর চরণতুলসী দিয়াছিলেন।

এ দিকে গৃহে গৃহিণী হইয়া সুরেশ্বরী দেবসেবা ও পুত্র পালন করিতেছিলেন। পুত্র ক্রমে বড় হইল; তিনি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া গৃহেই তাহার শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল। সুরেশ্বরী তাহাকে প্রতিদিন দেবপ্রণাম করাইতেন; সে মা'র কাছে বসিয়া স্তবপাঠ শুনিত, আর সে যখন বালকণ্ঠে নবশিক্ষিত গান গাহিত—

"আর ত ব্রজে যা'ব না ভাই, যেতে প্রাণ আর নাহি চায়;
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মথুরায়।
মা পেয়েছি বাপ পেয়েছি, ছেলে খেলা ভুলে গেছি;
তোমরা সবাই মা ব'লে, ভাই, ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায়—
ননী খেয়ো গোঠে যেও প্রেম বিলায়ো গোপিকায়।"

তখন শ্যামবিরহী বক্ষের ব্যথায় সুরেশ্বরীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। তিনি পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেন। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রকে বুকে লইয়া মা যশোদার হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিতেন। পুত্রের মা ছাড়া আর কেহ ছিল না—মা'রও সেই পুত্রমাত্র সম্বল।

বাড়ীর সব কায সুরেশ্বরীই দেখিতেন। অথচ সে একটু বিষয়সম্পত্তি ছিল, তাহার কাযের উপদেশ কর্ম্মচারী দত্ত মহাশয় শ্যামাপদর কাছে লইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইয়া নিকাশপত্র বুঝাইয়া আসিতেন। মা বৃন্দাবনবাসী হইবার পর বৎসরই শ্যামাপদ বলিয়া দেন, "দেখ্‌বেন, দত্ত মশাই, কাছে পিঠে ভাল সম্পত্তি থাকে ত খবর দেবেন।" তদবধি দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ক্রয় করা হয়।

শক্তিপদর বয়স যখন উনিশ বৎসর হইল, তখন সুরেশ্বরী তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দত্ত মহাশয়কে এলাহাবাদে পাঠাইলেন। তখন শক্তিপদ সম্পত্তির কাযকর্ম্ম দেখিতে শিখিয়াছে। শ্যামাপদ দত্ত মহাশয়কে বলিয়া দিলেন, "শক্তিপদর মা'কে বল্‌বেন, তিনিই তা'র মা বাপ দু'জনের কায করেছেন তিনি যেখানে ভাল বুঝবেন, সেখানে ছেলের বিয়ে দেবেন, আমার কোন আপত্তি হ'বে না।" আর তিনি সমস্ত সম্পত্তি ছেলেকে দান করিয়া রেজেষ্টারী-করা দানপত্র দত্ত মহাশয়ের মারফতে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, "এবার আমার ছুটী।"

তাহার পর এই চারি পাঁচ বৎসর প্রতি মাসে শক্তিপদর নামে পাঁচ শত, সাত শত, হাজার টাকা আসিয়াছে। শক্তিপদর কাছে তাহার পিতা যেন দুর্ভেদ্য রহস্য। তিনি এক দিনের জন্য তাহাকে দেখিলেন না, অথচ এই সম্পত্তি এত টাকা সব যেন তাহারই জন্য অর্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহার মধ্যেই কি পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? যিনি দূরে থাকিয়াও এমন ভাবে তাহার প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন অথচ তাহার কাছে কর্ত্তব্যপালনের প্রত্যাশাও করেন না, সে তাঁহাকে ভক্তি না করুক, ভাল না বাসুক—ঘৃণা করিতে পারিত না। বরং অনেক সময় তাহার মনে হইত, তিনি কেন এমন হইলেন? কেহ কি তাঁহাকে পারিতীর মোহমুক্ত করিয়া আনিতে পারে না? সে যদি তাঁহাকে দেখিতে যায়? কিন্তু মনের কথা মনেই থাকিত, সে মা'র কাছে কোন দিন মুখ ফুটিয়া সে সব কথা বলে নাই।

তাহার পর বিবাহিত জীবনে সে যখন কুসুমের ভালবাসায় যেন নূতন জগতের সন্ধান পাইল, তখন তাহার মনে হইল—সত্যই কি তাহার পিতা এমনই নিষ্ঠুর যে, স্ত্রীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছিলেন? না—মা-ই ত আর তাঁহার কাছে যাইতে চাহেন নাই! তিনি এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন? পিতা দুরন্ত—তাঁহার দোষ-গুণ দুই-ই শক্তিপদ কল্পনা করিত; কিন্তু তাঁহাকে সে কিছুতেই যেন বুঝিতে পারিত না।

এই ভাবে এত দিন কাটিয়াছে। তাহার পর পিতার রোগশয্যার উপস্থিত হইবার জন্য এই আহ্বান। শুনিয়া

মাও বলিলেন, তাহাকে যাইতে হইবে; কেন না, যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতেছে। কিন্তু মা? মা'র কর্ত্তব্যের কি অবসান হইয়াছে?

ট্রেণে উঠিয়াও শক্তিপদ কেবল এই সব ভাবনা ভাবিতে লাগিল। রাত্রিতে সে ঘুমাইতে পারিল না। সকালে ট্রেন যত এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। সে মনকে বুঝাইল —সে কর্ত্তব্যপালন করিবে।

এ দিকে পুত্রকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বরীর মনে পড়িল, শাশুড়ী একদিন বলিয়াছিলেন, বুঝি তিনি তাঁহার শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ীর উপদেশ পালন করিতে পারেন নাই, তাই বৈধব্যদুঃখ ভোগ করিলেন। তিনিও কি সে উপদেশ যথাযথরূপে পালন করিতে পারেন নাই? তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—তবুও হিন্দুনারীর চিরাগত সংস্কার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই—যে নারী সধবা অবস্থায় চিতায় শয়ন করিতে পারে, তাহার জন্য স্বর্গে শঙ্খনাদ হয়। যাহারা বৈধব্য এড়াইবার জন্য পতির চিতায় সহমৃতা হইতেন, তাঁহাদের সেই সংস্কার আজও হিন্দুনারীর অস্থি-মজ্জায় জড়াইয়া আছে—তাহা দূর করা সহজ নহে।

কিন্তু সে চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে বলিয়া সুরেশ্বরী যতই ঠাকুরঘরের কাযে ব্যাপৃতা হইলেন, ততই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতিগুলা কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। সে সবই কি দুঃখের? তাহাও ত মনে হয় না! এই পঁচিশ বৎসর তিনি যে ভাবে প্রতিদানের কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া—সর্ব্বস্ব দিয়া দেবতার সেবা করিয়াছেন—পাষাণের মধ্যে চৈতন্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদি তেমনই ভাবে স্বামীর সেবা করিতে পারিতেন, তবে কি—? কিন্তু এত দিন পরে আজ আর সে সব কথা কেন? সুরেশ্বরী আপনার দৌর্ব্বল্যকে উপহাস করিয়া মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু তবুও স্মৃতিগুলাকে দেবপূজার বাসী ফুলের মত ফেলিয়া দিতে পারিলেন না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের—তাহারও পূর্ব্বের যুবক শ্যামাপদর তরুণ লাবণ্যভরা মুখ আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। কেন? বৈধব্য—তিনি ত সধবা হইয়াও বিধবা। যে দেবতার চরণে তিনি হৃদয়ের সব দুঃখ নিবেদন করিয়া তাঁহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতার চরণই তিনি প্রবল আবেগে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত দিন একবারও যে কথা তাঁহাকে বিচলিত করে নাই, আজ সেই কথাই কেবল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল—প্রেমময় দেবতা যে যুগলমূর্ত্তিতে ভক্তহৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত! এত দিন পরে আজ তাঁহার মনে হইল, সত্যই কি তিনি ভুল করিয়াছিলেন?

৪

শ্যামাপদ রোগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন—দুর্ব্বলদেহভার যেন তিনি আর বহন করিতে পারেন না। পার্শ্বে একটি ছোট টেবলে ঔষধের শিশি, গেলাস, পথ্য। পার্ব্বতী শিয়রে বসিয়া তাঁহার বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতেছিল আর ভাবিতেছিল। তাহার মুখ মলিন। শ্যামাপদর মুখে মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছিল। এত দিন সে যাহা মনেও করিতে পারে নাই—ভালবাসা তাহার পক্ষে যে চিন্তার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সেই চিন্তাই পার্ব্বতীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল—ইহার পর? যে ভালবাসার জন্য সে আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, সে ভালবাসার অবলম্বন যদি মৃত্যু কাড়িয়া লয়, তবে সে কোথায় আশ্রয় পাইবে?

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—বাড়ীর লোক আসিয়াছেন।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "দত্তমশায়?"

"হাঁ। আর এক বাবু।"

পার্ব্বতী বলিল, "দত্তমশায়কে ডাক।"

দত্ত মহাশয় আসিয়া শ্যামাপদকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবু এসেছেন।"

শ্যামাপদ বিস্মিত ও শঙ্কিতনেত্রে পার্ব্বতীর দিকে চাহিলেন। পার্ব্বতী বলিল, "আমি আসতে তার করেছিলাম।"

শ্যামাপদ ক্ষুণ্নভাবে বলিলেন, "কেন?"

"রোগে শোকে ছেলে—"

"কিন্তু তা'কে যে আমি দেখিনি বললেও হয়।"

"সে ছেলে।"

পার্ব্বতী দত্ত মহাশয়কে বলিল, "তাঁ'কে নিয়ে আসুন।"

পার্ব্বতী উঠিয়া গেল।

দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে শক্তিপদ পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

পিতা! পুত্র কয় মুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার পর পিতাকে প্রণাম করিল।

শ্যামাপদও কথা বলিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল। তিনি ইঙ্গিত করিলে পুত্র পার্শ্বে চেয়ারে বসিল; তিনি দুর্ব্বল-হস্ত পুত্রের মস্তকে রাখিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া শীর্ণ গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামাপদ বলিলেন, "এসেছ, ভালই হয়েছে; মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাকে দেখতে পেলাম। দেখবার যে তৃষ্ণা এত দিন মিটেনি—তা মিটল।"

পিতার কথায় ও কণ্ঠস্বরে যে কাতরতা ছিল, তাহা পুত্রকে ব্যথিত করিল। সে বলিল, "আপনি ত আমাকে আসতে বলেননি!"

শ্যামাপদ বলিলেন, "না; বলিনি। কেন বলিনি—বলতে পারিনি, তা তোমাকে বলব। মরবার আগে ব'লে যাবার সুযোগ পেলাম—এ বড় সুখ।"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "অনেক বেলা হয়েছে; স্নানের জল দেওয়া হয়েছে।"

শ্যামাপদ পুত্রকে বলিলেন, "যাও, বাবা, স্নান ক'রে এস!"

তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "খাবারটা আমার ঘরে—" বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; পুত্রের আচার ব্যবহার তিনি জানেন না; যেরূপ তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে তাহার আপত্তি থাকিতে পারে।

শক্তিপদ চলিয়া গেল। শ্যামাপদের দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিল। তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন—পুত্র তাঁহার সম্বন্ধে মনে কি ধারণা করিয়া আছে? সে তাঁহার সম্বন্ধে কি জানে? উত্তরে তিনি আপনার মনকে বুঝাইলেন, সে যদি তাঁহাকে ঘৃণা করে, তবে তাঁহার পীড়ার সংবাদে আসিবে কেন? পিতার প্রতি আকর্ষণ ব্যতীত যে পুত্রের আসিবার অন্য কোন কারণও থাকিতে পারে—যে পিতা তাহাকে অর্থ ব্যতীত আর কিছুই দেন নাই, সে পুত্র যে পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির আশায়ও আসিতে পারে—আজ তাহা বিষয়ী—চতুর ব্যবহারাজীব শ্যামাপদের কল্পনাতেও স্থান পাইল না। তিনি ব্যবসায়োপলক্ষে মানব চরিত্রের মন্দ দিকটা অনেকবারই দেখিয়াছেন, কিন্তু আজ সে দিকটা যেন তিনি দেখিতেই পাইলেন না—কল্পনা করিতেও পারিলেন না। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি যে স্নেহকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সে বন্যার বেগে তাঁহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

তিনি কেবল ভাবিলেন, পুত্রকে কি করিয়া সব কথা বলিবেন—সব কথাই কি বলিবেন?

অনেক ভাবিয়া শ্যামাপদ স্থির করিলেন, তিনি সব কথাই পুত্রকে বলিবেন—নহিলে মনের এ ভার যাইবে না। যখন শরীর দুর্ব্বল হয়, তখন মনেরও বল কমিয়া আইসে—বিলম্বে আর ধৈর্য্য থাকে না। তাই শ্যামাপদ কেবলই পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কয়বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া পার্ব্বতী তাঁহার সেই অধীরতা-জনিত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিল।

পিতার ঘর হইতে বাহির হইয়া শক্তিপদ গামছা, কাপড় প্রভৃতির জন্য বাক্স খুলিবার উদ্যোগ করিলে ভৃত্য বলিল, "সব গোসলখরে দেওয়া হয়েছে।"

স্নানের ঘরে যাইয়া শক্তিপদ দেখিল, সব জিনিষ এমন-ভাবে সাজান যে, দেখিলে মনে হয়—সে নবাগত নহে, ভৃত্য তাহার দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া রাখিতেই অভ্যস্ত।

দেশ হইতে কর্ম্মচারীরা মধ্যে মধ্যে আসিতেন বলিয়া তাঁহাদের আহারের স্বতন্ত্র ঘর ছিল। সেই ঘরে শক্তিপদের ও ও দত্ত মহাশয়ের আহার সজ্জিত হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যে আহার্য্যের এত আয়োজন!

আহার শেষ হইলে ভৃত্য শক্তিপদকে একটি কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষটি সুসজ্জিত—খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। ভৃত্য বলিল, "যদি একটু বিশ্রাম করেন,—মা বল্লেন, রাত জেগে এসেছেন।"

কিন্তু প্রায় সেই সময়েই আর এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু ব'লে দিলেন, যদি বিশ্রাম না করেন, তাঁ'র কাছে যা'বেন।"

বিশ্রাম করিবার বিশেষ প্রয়োজন যে শক্তিপদের ছিল, তাহা নহে। সে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া পিতার কক্ষে উপনীত হইল। শ্যামাপদ পুত্রের আগমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুত্র তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাওয়ার কষ্ট হয়নি ত?"

শক্তিপদ বলিল, "না।"

পিতা পুত্রের একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে ধরিলেন—যেন তিনি যে তৃপ্তি অনুভব করিলেন, তাহা তাঁহার

কল্পনাতীত ছিল। তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমাকে আমি সব কথা বল্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।"

শক্তিপদ বলিল, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি না সারলে আমি ত ফিরে যাব না।"

"সারা!"—বলিয়া শ্যামাপদ একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন—যেন শরতের লঘু মেঘের উপর একটু বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—"ডাক্তার আমাকে সব কথা খুলেই বলেছেন। তোমাকে পেয়ে সব কথা বল্‌বার এ অবসর আমি ত্যাগ করতে পারব না। হয় ত সব শুনে তুমি তোমার হতভাগ্য বাবাকে ক্ষমা করতেও পার।"

তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন:—

"আমরা যখন লিখাপড়া শিখি, তখন স্বদেশী ভাব দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ে ছিল না—স্বরাজের স্বপ্ন তখনও কেহ দেখেনি। তখন বেশে, ব্যবহারে, ভাষায়, আচারে ইংরাজের অনুকরণ করাই ছিল লোকের আকাঙ্ক্ষা। তখন সে অনুকরণ যে কেবল আমি ক'রেছিলাম, তা' নয়; প্রায় সকলেই করেছিলেন। সেই অনুকরণই আমার পক্ষে একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি নেশাখোরের নেশার ঝোঁকে চলেছিলাম। তাই নিয়েই তোমার মা'র সঙ্গে আমার মনান্তর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, স্বামী যে স্ত্রীকে সত্য সত্যই ভালবাসে, সে স্ত্রী স্বামীর মনের মত কাজ করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। বোধ হয়, ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারি না, আজন্ম নিষ্ঠাচারী মা আমার যে অপরাধ স্নেহে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, স্ত্রী তা' ক্ষমা করতে পারলেন না কেন? তবে—আজ আর তা' বুঝবার চেষ্টা করা বৃথা।

"আমার আশা ছিল, আমার আচারে তোমার মা'র আপত্তি সময়ে কেটে যাবে; আমি তোমাকে আমার মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুলব। কিন্তু আমার সব আশায় বজ্রাঘাত হ'ল—যখন তোমাদের আনতে গিয়ে আমাকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হ'ল। সে হতাশার যে কি বেদনা—কি যাতনা, তা' বলতে পারি নে। মৃত্যুযন্ত্রণা তার তুলনায় সুখ বল্লেও বলা যায়।

"আমি ফিরে এলাম। আমার পত্নী আমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করলেন; আমার পুত্রকে আমি কোলে পেলাম না; কিন্তু আমার অপরাধ? কোন অপরাধ আমি খুঁজে পেলাম না। তবে—এ কি বিচার? তবে সমাজ, ধর্ম্ম—সবই মিথ্যা! শূন্য গৃহে বেদনা-কাতর হৃদয়ে আমি আপনার সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হলাম; মদের উত্তেজনায় সব ভুলতে চেষ্টা করলাম। পথ পিচ্ছিল একবার যখন পা হড়কাল, তখন ক্রমেই নীচে নামতে লাগলাম। সঙ্গীও জুটল।

"এইভাবে কিছু দিন কাটবার পর আমরা জন কয়েক গ্রীষ্মের সময় সিমলা পাহাড়ে গেলাম। সেখানে, বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে, আমার ডবল নিউমোনিয়া হ'ল। বন্ধুরা প্রমাদ গণলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন আমোদ করতে বেড়াতে; রোগীর সেবা করতে রোগ নিয়ে বিব্রত হ'তে নয়। কারও কারও বিলম্ব করবার উপায়ও ছিল না—কাযের ক্ষতি হবে। তাঁরা ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা করলেন—কেন না, সিমলায় কালা আদমীর জন্য ভাল হাসপাতাল নেই; তারা গোলামী করবে মরবে। তাদের জন্য কে মাথা-ব্যথা করে? মা তখন তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। বন্ধুরা তাঁকে খবর দিতে চাইলে, আমি বারণ করলাম। কিন্তু তাঁরা তোমার মা'কে বিপদের কথা জানালেন।"

মা শুনিয়া কি করিলেন, জানিবার জন্য কৌতূহলে শক্তিপদ ঋজু হইয়া বসিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্যামাপদ বলিলেন: "বড় আশা ছিল, তিনি না এসে থাকতে পারবেন না। সে আশায় হতাশ হলাম। এত বড় আঘাত বুঝি আমি আর কখন পাই নাই। দুর্ব্বল দেহে সে আঘাত সহ্য করা বুঝি আরও কষ্টকর হয়েছিল। পীড়া বেড়ে গেল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

"ডাক্তার ও নার্স ছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত সেবা করেছিল—যমের গ্রাস হ'তে আমাকে ফিরিয়েছিল—পার্ব্বতী। পিতৃমাতৃহীনা কিশোরী খুড়ার সঙ্গে কুলু থেকে চাকরীর আশায় সিমলায় এসে প্রথম চাকরীতে প্রবেশ করে, আমাদের বাসায়। সে বাড়ী থেকে কেবল এসেছিল—তখনও টাকা চিনে নি—মনের স্বাভাবিক কোমলতা হারায় নি। মাসাধিক কাল সেবা ক'রে সে যখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে জীবনকেই জয়ী ক'রে আনলে, তখন আমি শিশুর মত অসহায়। আমার ঔষধ-পথ্য দিতে, আমাকে দেখতে—সর্ব্বদা তা'র দরকার—ঠিক এখনকার মত।

"তার পর সেরে উঠলাম। সঞ্চয় যা কিছু ছিল, ফুরিয়ে এসেছিল। বাড়ী থেকে টাকা আনতে প্রবৃত্তি হ'ল না। কর্ম্মস্থানে ফিরে যাব। কিন্তু কিন্তু—পার্ব্বতী তখন এমনই ভাবে আমার পক্ষে দরকারী হয়ে পড়েছে যে, আমি প্রস্তাব করলাম, সে আমার সঙ্গে যাবে। আমার মনে হ'ল, আমি যখন মৃত্যুর দ্বারে, তখনও যিনি একবার দেখতে আসেন নি, তাঁর প্রতি আমার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। সমাজের কাছে আমি কি পেয়েছি যে, সমাজকে ভয় করব?

"পার্ব্বতী কিন্তু যেতে অস্বীকার করলে। আমি অনেক বললাম—সে শুনলে না। কিন্তু আমার যাবার দিন যত নিকট হ'তে লাগল, সে তত যেন তখন তখন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সেও আমাকে ছাড়তে চায় না। তবে? কিন্তু সে যেতে পারে, যদি আমি তা'কে বিবাহ করি। তা'দের বিবাহ একটা বাঁকাবোক্ত, আর তা'দের স্বজনদের এক দিন খাওয়ান। বিবাহের স্বজন ক'জনই বা আছে? আমি সম্মত হলাম। কিন্তু আমি তখন সেটা যা ই কেন মনে ক'রে থাকি না, পার্ব্বতী তা'র গুরুত্ব দেখেছিল ও বুঝেছিল।"

শ্যামাপদ চুপ করিলেন।

শক্তিপদ বলিল, "আপনি আর বেশী কথা ক'বেন না পরিশ্রম হবে।"

"কিন্তু বল্বার যদি সময় না পাই। হৃদয়ের স্পন্দন যে যখন তখন থেমে যেতে পারে! বল্বারও আর বেশী কিছু নেই। এখানে এসে সে আমাকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনলে—ঠিক যেমন ক'রে মৃত্যুর দ্বার হ'তে ফিরিয়ে এনেছিল। পার্ব্বতী আমাকে তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে—বুঝিয়ে দিয়েছিল। তারই জিদে আমি প্রতি মাসে উদ্বৃত্ত টাকা তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। তা'র স্বজনরা মধ্যে মধ্যে এসে টাকা নিয়ে যেত ব'লে সে তা'দের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করলে। সে বাঙ্গালা শিখলে আমার ভাষা জান্বার জন্য, ইংরাজী শিখলে আমার কাযে সাহায্য কর্বার জন্য; সে সংসারের সব ভার নিলে। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই রাখলে না। সঞ্চয় যা কিছু সে তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে; এখন আছে কেবল এই বাড়ী আর এই সব আস্বাব। এই-ই পার্ব্বতীকে উইল ক'রে দিয়েছি। কিন্তু যথেষ্ট হ'ল কি?"

শক্তিপদ বলিল, "সে জন্য আপনি ভাব্বেন না। আপনার ছেলে এমন কৃতঘ্ন হবে না যে, আপনার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ না ক'রে স্বার্থসর্ব্বস্ব হয়ে থাক্বে।"

শ্যামাপদর নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; একখানি হাত তুলিয়া পুত্রের মস্তকে স্থাপন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

৬

এতক্ষণ কথা বলার শ্রমে ও মানসিক চাঞ্চল্যে শ্যামাপদ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন—যেন একটু শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতেছিলেন।

পিতার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শক্তিপদ ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যকে ডাকিল। কিন্তু সে জানিত না, পার্ব্বতীর শঙ্কা-সতর্ক দৃষ্টি পর্দ্দার আড়াল হইতে রোগীকে লক্ষ্য করিতেছিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, টেবলের উপর দক্ষিণ দিক্ হইতে দ্বিতীয় শিশির ঔষধ এক দাগ খাওয়াইতে হইবে। শক্তিপদ মস্তক হইতে পিতার হাত নামাইয়া টেবলের কাছে যাইতে না যাইতে কিন্তু পার্ব্বতী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; পর্দ্দা ঠেলিয়া আসিয়া গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে পান করাইল। শ্যামাপদ তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন—সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বসিল।

শক্তিপদ প্রথম পার্ব্বতীকে দেখিল—সে মুখে শঙ্কার ও উৎকণ্ঠার নিবিড় ছায়া দেখিলে তাহার জন্য দুঃখ হয়। এত ক্ষণে সে পার্ব্বতীর সম্মুখে পড়িল—মধ্যে পীড়িত পিতা, মৃত্যুশয্যায়—দুই পাশে তাহারা দুই জন। এই যে নারী, যে সমস্ত জীবন যথাশক্তি তাহাকে ঘৃণা করিতেই চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আজ পিতার কথা শুনিবার পর, তাহাকে দেখিয়া সে আর কিছুতেই তাহাকে ঘৃণা করিতে পারিল না। যে মা তাহার পিতা মাতা উভয়ের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন—নিবিড় স্নেহে তাহাকে সর্ব্ববিধ আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই মা'র নারী-জীবনের সব সুখ এই নারী অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু—কিন্তু—!

মা কি ইচ্ছা করিয়াই সে সুখ ঠেলিয়া ফেলেন নাই? স্বামীর জীবন-সঙ্কট জানিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মা আহূতা হইয়াও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গমন করেন নাই;

পর এবারও স্বামী মৃত্যুশয্যায় শুনিয়া তিনি কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই! তাহার সামান্য অসুখে কুসুম কিরূপ চঞ্চল হয় কত ভয় পায়, তাহা শক্তিপদর মনে পড়িল। যে মা'র ব্যবহার কোন দিন তাহার কাছে কোনরূপ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় নাই, সেই মা'র ব্যবহার আজ যেন এমন অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শক্তিপদ এমন যে সংশয় অনুভব করে নাই, আজ সেই সংশয় তাহাকে পাইয়া বসিল।

নিশ্চিন্তচিত্তে স্নান করিতে করিতে স্নানার্থী যদি অনুভব করে, বানের জল তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যেমন হয়, শক্তিপদর অবস্থা যেন সেইরূপ হইতে লাগিল। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস যেন সে সহসা হারাইয়াছে! যে মা'র স্নেহে সে "মানুষ" হইয়াছে তাঁহার কোন ত্রুটি সে কোন দিন কল্পনা করিতেও পারে নাই, সেই মা কি কোনরূপ ভুল করিয়াছিলেন? তিনি কি স্বভাব ব্যবহারেই নারী-জীবনের সব সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া সে জীবন দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট করেন নাই? স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা তিনি দেবতাকে দিয়া আপনার জীবন পূজার অর্ঘ্য করিয়াছেন, সে ভালবাসায় কি তবে কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা ছিল?

সেবানিরতা পার্ব্বতীর ব্যবহার সে যতই লক্ষ্য করিতে লাগিল, তাহার মনে এইরূপ চিন্তা ততই প্রবল হইতে লাগিল। মা'র পিতার অপরাধ? তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার মা তাঁহার প্রিয় আদর্শের অনুসরণ করেন! ইহা কি এমনই "অপরাধ" যে, সেই জন্য মা তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাঁহার প্রতি পত্নীর সব কর্ত্তব্য পদদলিত করিয়া যাইয়া দেবসেবায় ও পুত্রপালনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন? পিতার আর কোন অপরাধের কথা সে ত কখনও শুনে নাই।

আর সে জীবন ব্যর্থ হইতে দেয় নাই তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পিচ্ছিল পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে এই নারী; সমাজের কাছে সে তাঁহার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারও বুঝি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যাহাকে লোক ঘৃণা করিয়াছে, সে-ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে; অথচ সে ভালবাসার জন্য আত্মীয়-স্বজন স্বদেশ সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চাহে নাই—কখনই আশা রাখে নাই!

প্রথমে শক্তিপদর সম্মুখে আসিতে পার্ব্বতী যে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল, বিপদের আশঙ্কায় তাহা কাটিয়া যাইবার পর সে আসিয়া আপনার পরিচিত সেবাকর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। তিন দিন পার্ব্বতী ও শক্তিপদ রোগীর দুই পার্শ্বে বসিয়া রোগীর সেবা করিল।

তৃতীয় দিন শ্যামাপদ একবার পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, একটা কথা তোমার মা'কে বলবে, আমি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তিনি যেন ক্ষমা করেন। তিনি তোমার মত ছেলে পেয়েছেন, দেবসেবায় শান্তি পেয়েছেন তাঁর সে সুখশান্তি যেন অক্ষয় হয়।"

শক্তিপদ আর পারিল না; বলিল, "আপনি কোন অপরাধ করেন নি; একটা ভুল হয়েছিল!"

শ্যামাপদ চক্ষু মুদিত করিলেন। পুত্রের কথা যেন প্রবাদ মত বোধ হইল।

চতুর্থ দিন কি একটা কথা বলিবার চেষ্টার উত্তেজনায় শ্যামাপদর দুর্ব্বল হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া গেল।

৭

পিতার শব দাহ করিয়া শক্তিপদ যখন গৃহে ফিরিল, তখনও পার্ব্বতীর যেন চেতনা নাই। তখন তাহার মূর্চ্ছার অবসান হইয়াছে, কিন্তু সে যেন বাহ্যসংজ্ঞাবিরহিতা! এই ভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল। বাড়ীতে মা'র কাছে ফিরিবার জন্য শক্তিপদ যতই কেন ব্যাকুল হউক না এ অবস্থায় পার্ব্বতীকে ফেলিয়া যাইতেও পারিল না। দ্বিতীয় দিন চিকিৎসকের ঔষধেই হউক, আর অবসন্নতার জন্যই হউক বা উভয়ের প্রভাবেই হউক, পার্ব্বতী ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পর সে কতকটা প্রকৃতিস্থা হইল।

তখন শক্তিপদ তাহাকে বলিল, সে বাড়ী যাইবে, আর বিলম্ব করিতে পারে না।

তাহারই জন্য যে শক্তিপদ ইতঃপূর্ব্বে যাইতে পারে নাই, তাহা মনে করিয়া পার্ব্বতী যেন কুণ্ঠিতা হইল; বলিল, "তা সেখানে ত কাব [illegible]"

শক্তিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জন্য কি ব্যবস্থা করতে হবে?"

পার্ব্বতী উত্তর দিল, "আমার আর কিসের দরকার হবে? কি ব্যবস্থা হবে?"

"আপনি যেমন বলবেন, তেমনই ব্যবস্থা করা হবে। আপনি ত এখানেই থাকবেন ?"

"তা' ত ভেবে ঠিক করতে পারছিনে ! আত্মীয়-স্বজন কারও সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিনি। যে অবলম্বন পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কিছুরই দরকার হবে না, সে অবলম্বন যে কেউ কখন কেড়ে নিতে পারে, তা' তখন মনে হয়নি।" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে পার্ব্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শক্তিপদর নয়নও আর্দ্র হইয়া আসিল। সে বলিল, "আপনি এখানেই থাকবেন। এ বাড়ী বাবা আপনাকেই দিয়ে গেছেন।"

পার্ব্বতী বলিল, "তা শুনেছি। কিন্তু এতে বা আমার কি দরকার ? তুমি তাঁর ছেলে, এ সব তোমার। আমার আর কিসের দরকার ?"

"না, আপনি বাবার এই বাড়ীতেই থাকবেন। এইটুকু মনে রাখবেন, আপনার স্বামীর ছেলে আছে। আমার নিজের মা'র সম্বন্ধে আমার যেমন কর্ত্তব্য আছে, আপনার সম্বন্ধেও তেমনই কর্ত্তব্য আছে।"

পার্ব্বতী আর কোন কথা কহিতে পারিল না। কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। আর তাহার নারী হৃদয়ে যে মাতৃদেবী স্নেহাস্নিগ্ধ পবিত্র সুন্দর ভাবটি ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, আজ সহসা তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার বুক ভরিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—শক্তিপদ তাহার স্বামীর ছেলে—তাহারও পুত্র-স্থানীয়। পার্ব্বতীর বুকের স্নেহ যেন শক্তিপদকে প্লাবিত করিয়া দিতে চাহিতেছিল।

৮

শক্তিপদ গৃহে ফিরিল। কয় দিনের উদ্বেগ ও অনিয়ম তাহার উপর পথশ্রম; পুত্রের স্নানের, হবিষ্যান্ন রন্ধনের আয়োজনে সুরেশ্বরী ব্যস্ত হইলেন।

শক্তিপদ ভাবিল, পার্ব্বতীর মুখে সে বৈধব্যের যে ম্লান ও নিবিড় ছায়াপাত দেখিয়াছিল, মা'র মুখে তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। সুরেশ্বরী পূর্ব্ব হইতেই আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন—একবারমাত্র রাধারমণের প্রসাদ পাইতেন। অঙ্গে অলঙ্কারের মধ্যে ছিল,—হাতে সধবার চিহ্ন "লোহ" আর দুইগাছি মাত্র চুড়ী। তিনি তাহা ত্যাগ করায় হাত দুইখানা যেন দীর্ঘ দেখাইতেছে। আর তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর।

শক্তিপদ ভাবিতে লাগিল, মা কি স্বামীকে একেবারে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন ? ভালবাসা মুছিয়া ফেলা যায় ?

বাস্তবিক সুরেশ্বরীর কাছে স্বামী আর প্রত্যক্ষ ছিলেন না—স্মৃতিগত হইয়াছিলেন। তাই শক্তিপদ যখন বলিল, "মা, মরবার দিন বাবা তোমাকে বলতে বলেছিলেন, তিনি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকেন, তুমি ক্ষমা করো"—তখনও সে কথা তাঁহার অভ্যস্ত স্থৈর্য্য বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অশ্রু নয়নের প্রান্তে দেখা দিল না।

মা'র এই ব্যবহার কিন্তু যুবক শক্তিপদর কাছে এতই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল যে, কুসুম যখন তাহার কাছে, কৌতূহলবশে, শ্বশুরের শেষশয্যার নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন কথায় কথায় সে, তাহাকে তাহার বিস্ময়ের কথাও বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া কুসুমেরও বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। শ্যামাপদর অজ্ঞাত "অপরাধ" যত দিন অজ্ঞেয় ছিল, তত দিন তাহারা তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে কত কল্পনাই করিয়াছিল ! কিন্তু এই কি "অপরাধ !" এই "অপরাধের" জন্য তিনি এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন ! তিনি কত কষ্টই পাইয়াছেন !

কুসুম স্বামীকে বলিল, "ভাগ্যে তুমি শেষ-সময় গিয়েছিলে ! মরবার সময় তিনি কত শান্তি পেয়েছেন !"

শক্তিপদ বলিল, "এখন কেবল ভাবছি, আরও আগে কেন যাইনি ! তিনি ডাকতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন ; কিন্তু আমি ছেলে, আমি কি না ডাকতে যেতে পারতাম না ? কই, তিনি ত আমাকে ভুলতে পারেননি ; যেন সমস্ত জীবন আমার জন্যই অর্থার্জনও ক'রে গেছেন।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

শক্তিপদ বলিল, "তাঁ'র যেন কারও উপর রাগ-দ্বেষ ছিল না। শেষে ব'লে গেলেন, যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকেন, মা যেন ক্ষমা করেন। মা যে দেবতা আর ছেলে নিয়ে শান্তি পেয়েছেন—তাতেও তাঁ'র কত তৃপ্তি !"

কুসুম বলিল, "আমরা না জেনে তাঁকে কি ভুলই বুঝেছিলাম !"

পক্ষি-বিজ্ঞান

পাখীর শ্রেণীবিভাগের চেষ্টায় যে বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা কত দূর প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে, বোধ হয়, আমাদের দেশের অনেকেই তাহার বিশেষ কোনও সংবাদ রাখেন না। এই শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা য়ুরোপে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আজও যে এ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে বিহঙ্গতত্ত্ব জিজ্ঞাসু [illegible] সহজে পৌঁছিতে পারিবেন না। পূর্বে যে পথ অবলম্বিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেন তাহা পরিত্যক্ত হইল এবং প্রথমে যে পন্থা অনুসরণ করিয়া সুধীগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবার [illegible] তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বপরিচিত পথ হইতে সরিয়া গিয়া ডারউইনের মতের অনুসারে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্য ও আন্তরিক সাফল্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে হয়।

প্লিনী।
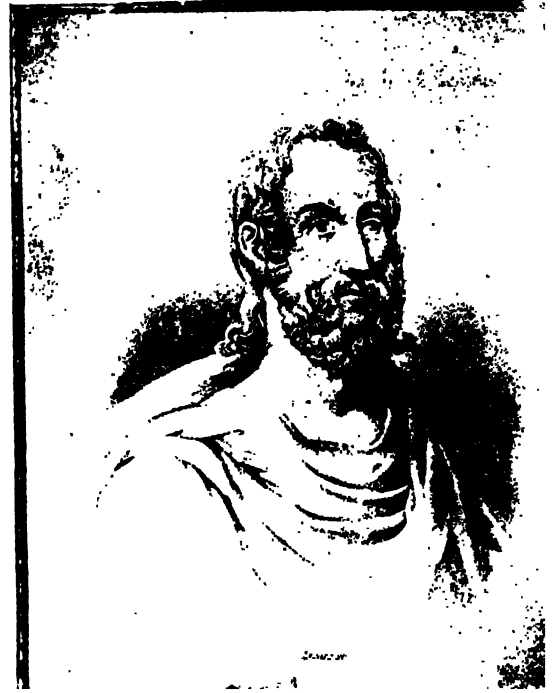
আনন্দের উপকরণ হিসাবে পৃথিবীর সকল দেশে পাখী বহু পূর্ব হইতেই মানুষের মন মুগ্ধ করিয়া আসিতেছিল। প্রথম যখন কোনও কোনও সাহিত্য-মহারথ জগৎ-তত্ত্বের উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তখন প্রকৃতির বিপুল ক্ষেত্রে ছোট বড় বিহঙ্গ তাঁহাদিগকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিজয়ী মনস্তত্ত্ববিৎ আরিষ্টটল (Aristotle) পক্ষীকেও যথাসাধ্য অবেক্ষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া স্বনামখ্যাত রোমক সুধী প্লিনী (Pliny) পাখীর শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে যে লক্ষণ অনুসারে তাঁহারা বিবিধ বিহঙ্গকে গোষ্ঠীবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পক্ষিবিজ্ঞান তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করে না সত্য; কিন্তু য়ুরোপ মহাদেশে গ্রীক ও রোমক যুগে পাখীর পা অথবা অন্য কয়েকটা বহিরবয়ব দেখিয়া বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ এমনই করিয়া আরব্ধ হয়। পরবর্তী বর্বর বিপ্লবে য়ুরোপ যখন বিধ্বস্ত হইল, সেই তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগে বিহঙ্গ-জীবনের উপর

আরিষ্টটল।

কোনও নূতন আলোকরশ্মিপাত হইল না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগীজ, স্প্যানিয়ার্ড ও ইংরাজ নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের সংস্পর্শে আসিয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু নূতন পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের প্রথম পরিচয় পাইলেন। আবার নূতন করিয়া পাখীর আলোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু বিশেষ কোনও অভিনব রীতি অথবা system অনুসারে যে এই আলোচনা চলিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবুও অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হইবে যে, মধ্যযুগের সহস্রবর্ষব্যাপী গভীর অবসাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানুষ আবার পাখীর সত্তা সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। এই জাগরণের পর আর তাঁহার সুষুপ্তি আইসে নাই, রূপে ও গীতে পাখী তাঁহাকে জাগরণের আনন্দে মুগ্ধ করিয়া রাখিল; তিনিও তাঁহার এই স্বল্পপরিচিত নৈসর্গিক প্রতিবেশিবর্গের আরও সবিশেষ পরিচয় লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পক্ষিবিশেষকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, শুধু সেই বিহঙ্গটিকে সমগ্র পক্ষিজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার চরিত্রবিশ্লেষণ করিলেই চলিবে না। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী পৃথিবীর উপরে সে যে বিধির আকস্মিক খেয়ালে জীবনলাভ করিয়া একক ও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতেছে না; কোনও একটা বিশিষ্ট জাতির, বিশিষ্ট বর্গের সহিত তাহার যে নাড়ীর টান, নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অন্তগূঢ় রহিয়াছে; তাহাকে চিনিতে হইলে যে সেই নাড়ীর টানের কথা, সেই নিবিড় ঘনিষ্ঠতার প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিহঙ্গবিশেষের সহিত বিহঙ্গবিশেষের সম্বন্ধ বিচার করিতে বসিয়া, শ্রেণীবিভাগরূপ পক্ষিবিজ্ঞানের প্রথম সোপানে য়ুরোপীয় সুধীগণ এইরূপে অধিরোহণ করিলেন। পরে কেমন করিয়া তাঁহারা ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সোপান হইতে সোপানান্তরে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, তাহার আলোচনা করিতে বসিলে প্রথমেই ফরাসী সুধী বেলঁর (Belon) কথা মনে পড়ে। কেবলমাত্র পাখীর বহিরঙ্গ দেখিয়া ইনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। পাখীর দেহ তত্ত্ব সম্বন্ধে বেলঁর যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। একাধিক পাখীর ভিতর ও বাহির যথাসম্ভব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রেণীবিভাগ করার এই ক্ষীণ চেষ্টা বিহঙ্গতত্ত্বের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে প্রথম দেখা গেল। কিন্তু তিনিও তাঁহার গ্রীক্-রোমক আবেষ্টনী হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পাখীর নামকরণেই তাহা বুঝিতে পারা যায়; অথচ এই নামকরণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ তাঁহাদের জ্ঞানের ও ক্ষমতার অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গস্‌হকের কথা ধরুন। বেলঁ গ্রীক্ নির্দ্দেশ অনুসারে ইহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলেন। বেলঁর পুস্তকে ইহার গ্রীক্ নাম "কাইগোলোগাস" ভিন্ন অন্য কোনও অভিধা যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীন ধীশক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনও দ্বিধাই থাকিত না। আরিষ্টটল (Aristotle) বর্ণিত "কাইগোলোগাস" এ বস্তু হইতে পারে না, স্বনামখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বাফঁ (Buffon) তাহা বলিয়া দিয়াছেন। সে যাহা হউক, এদিকে পক্ষিবিজ্ঞানে সেক্সপীয়রের উক্তি খাটে না। After all, what is in a name? তবে বেলঁর নিকটে পরবর্ত্তী যুগের বিহঙ্গজিজ্ঞাসুর যৎকিঞ্চিৎ ঋণ অস্বীকার করা চলে না।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুই জন ইংরাজ ফ্রান্সিস্ উইলোবি (Francis Willughby) ও জন রে

ফ্রান্সিস্ উইলোবি

বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সে কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ব্লাইথ এখানকার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জীবতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া এ দেশে আসিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসার ইতিহাসে ইঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কথা পরে বলিব।

সে যাহা হউক, হক্সলী প্রমুখ সুধীগণ পক্ষিদেহের অস্থিসংস্থান অথবা অন্য কোনও প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন। কেন করিলেন, হক্সলী তাহা অল্প কথায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলেন, কোনও একটা জীবকে স্বাধীনভাবে বিবেচনা করিলে চলিবে না, অথবা সে যে কোনও অন্যান্য সচেতন পদার্থের সহিত এবং বিভিন্ন দেশকালের সহিত কোনও প্রকারে সংসক্ত, শুধু সে কথা মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, সে কোনও একটা নির্দিষ্ট বিধানে স্বতঃ রচিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর হইতে পারে এবং কল্পনা করাও যাইতে পারে যে, প্রত্যেক জীবের সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিধানে নিয়মিত; অন্য কোনও জীবের নির্দিষ্ট জীবনবিধানের সহিত তাহার কিছুমাত্র সাম্য নাই। যে পুঞ্জীভূত শক্তিসমষ্টিকে আমরা জীব নামে অভিহিত করি, সে হয় ত অসংখ্য বিচিত্র পারম্পর্যের ফলস্বরূপ। এত বিচিত্র যে, কিছুতেই আমরা মনে করিতে পারি না যে, হরিণ, ঈগল, কুম্ভীর, প্রজাপতি, চিংড়ি একই বিধানে রচিত। যদি সকল জীব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সম্বদ্ধ হইত, তাহা হইলে যে শ্রেণীবিভাগের কথা আমরা এখন ভাবিতেছি, তাহা অসম্ভব হইত। অঙ্গীর অঙ্গরচনার উপর নির্ভর করিয়া এই যে morphological শ্রেণীবিভাগ, ইহা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এরূপভাবে সচেতন জীবগণের মধ্যে একরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নাই। পরন্তু জীবরাজ্যের অন্তর্গত উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যায় সকলেই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট; অনেকগুলির বহুসংখ্যক জীবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; তদপেক্ষা আরও অধিকসংখ্যক জীবের কয়েকটির অল্পসংখ্যক জীবের সহিত সংস্রব আছে। সাধারণতঃ কতকগুলির মধ্যে পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, তাহাদের পার্থক্য নাই বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত সাম্য-লক্ষণের বিবৃতিকে morphological শ্রেণীবিভাগ বলা হইয়া থাকে।

এই ত গেল হক্সলীর কথা। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু উপরে উক্ত morphological লক্ষণ কি, তাহা সাধারণতঃ ভাল বুঝিয়া উঠা যায় না। অথচ উহা না বুঝিলে শ্রেণীবিভাগ চেষ্টা পণ্ড হইবে। ঐ সকল লক্ষণকে কেন জৈব লক্ষণ (zoological characters) বলা হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না। বহুসংখ্যক পাখীর পায়ের অংশবিশেষ (tarsus), তালব্য (palate) ও বক্ষোদেশের (sternum) অস্থিসংস্থান এবং কণ্ঠস্বর-নির্গমযন্ত্র (larynx) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সাম্য-লক্ষণগুলি মিলাইয়া লওয়া হইল। এই রকম পরীক্ষাকে morphological বলা যাইতে পারে। আর ঐরূপ লক্ষণগুলির প্রত্যেকটিকে জৈব বা zoological লক্ষণ বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত লক্ষণের সমতার উপর নির্ভর করিয়া পক্ষী সকলকে ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিভুক্ত করার নাম taxonomy। এইরূপ সমষ্টিভুক্ত করিবার চেষ্টায় বিহঙ্গকুলের বংশপরিচয় অনেকদূর পর্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কারণ, সন্তানের মধ্যে জনক-জননীর দেহগত ও স্বভাবগত প্রায় সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। তবে নানা কারণে বহুযুগ ধরিয়া দেশকালের নানা আবর্তনের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে একই আদিম জনক-জননীর বংশানুক্রমিক ধারার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কোনও এক বিস্মৃত যুগে পক্ষিজাতি নানা উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রত্যেক উপজাতির অন্তর্গত পক্ষিবিশেষের সমষ্টিগত বৈলক্ষণ্য প্রকটিত হইল। ঘুঘু ও পারাবত একই পরিবারের অন্তর্গত; ইহাদিগের চঞ্চুর গঠন, পদাঙ্গুলির ও প্রাথমিক পতত্রের সংখ্যা, তালু ও নাসার অস্থিবিন্যাস, বক্ষের অস্থিসংস্থান ইত্যাদি দেহাঙ্গগত morphological লক্ষণগুলির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা যায়। অতএব ইহাদিগকে এই সকল লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কোনও বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করাই বিজ্ঞানসঙ্গত বিধি বা taxonomy। কিন্তু ঘুঘুর সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য পারাবতের সমষ্টিগত লক্ষণগুলি হইতে কতকটা পৃথক্, সন্দেহ নাই। কবে এবং কি নৈসর্গিক

৫ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এ দেশের আরও যে সকল Passeres আছে, তাহাদের প্রাথমিক পত্রসংখ্যা ৯; কিন্তু ইহাদিগের অন্যান্য লক্ষণগুলি এত স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট যে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করা সহজ। মিঃ ওটসের Fauna of British India পুস্তক প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইতোমধ্যে পক্ষিবিজ্ঞান জগতে পাখীর নামকরণে এমন একটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার উল্লেখ না থাকায় এবং সেই নব রীতি অনুসৃত না হওয়ায় পুস্তকখানির আধুনিকত্ব মর্য্যাদার হানি হইল। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝান প্রয়োজন। লিনিয়সের সময় হইতে গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাখীর নামকরণে তাহার জাতিগত ও উপজাতিগত (generic and specific) লক্ষণের নির্দ্দেশ থাকিবেই, উপরন্তু আরও কিছু থাকা প্রয়োজন যাহাতে তাহার বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খঞ্জনকে য়ুরোপে মধ্যযুগে 'কাইপোজেলেস' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, কেন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাওয়া যায় না, কেবল বুঝিতে পারা যায় যে আরিষ্টটলের গ্রন্থে এই নামের কোনও পাখীর উল্লেখ আছে। লিনিয়স লাটিন মোটাসিলা (Motacilla) শব্দ গ্রহণ করিলেন এবং উপজাতিগত বর্ণবৈশিষ্ট্য (শ্বেত, alba) নামের উপর আরোপ করিয়া পাখীটার নাম রাখিলেন Motacilla alba। প্রত্যেক পাখীর নামে এই প্রকার দুই অংশ থাকায় অনেক সুবিধা হইল। এই পদ্ধতিকে দ্বিনাম বা binomial রীতি বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে খুব সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করিয়া অনেকে বুঝিতে পারিলেন যে, কোনও species বা উপজাতিকে কোনও বিশিষ্ট লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কোনও বিশেষ কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। কারণ, ইহার মধ্যে এত গোলমালের সম্ভাবনা আছে যে, কোনও পাখীকে যে দিন যে উপজাতির অন্তর্গত করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোনও বিশেষ কারণে হয় ত আজ তাহাকে জাত্যন্তর করিতে বাধ্য হইতে হইল। সেই কারণটি অনেক ক্ষেত্রে দেশকালিক, ভৌগোলিক। এখন সেই জাত্যন্তরিত নূতন পাখীকে কি আখ্যায় অভিহিত করিলে তাহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে? ওটস্ লিখিলেন, ভারতবর্ষের পাখীর কথা! এ দেশের সাদা খঞ্জনকে কি Motacilla alba অভিধায় পরিচিত করিলে কোনও ভুল হয় না? এ প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে এ দেশের সাদা খঞ্জনের সম্ভবতঃ ভৌগোলিক কারণ বশতঃ কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, তখন ইহাকে য়ুরোপের আবহমান প্রচলিত দ্বিনাম (binomial) আখ্যায় অভিহিত করিয়া তৃপ্তি বোধ করা যাইতে পারে না। ইহার নামে আরও একটা নূতন উপসর্গ থাকা উচিত। বৈজ্ঞানিক স্থির করিলেন, ইহার নাম হওয়া উচিত Motacilla alba dukhunensis। এমনই করিয়া নূতন পদ্ধতিতে পাখীর নামকরণ সমীচীন বিবেচিত হইল। কুয়ে-(Coues) প্রমুখ মার্কিন পক্ষিতত্ত্ববিদগণ এই পদ্ধতি অনেক দিন অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। ইদানীং য়ুরোপে ইহা সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে।

ওটস্ ও নীবস সদ্যঃপ্রসূত শাবকের লক্ষণগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া পাখীর শ্রেণীবিভাগে তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন। এখন মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার পক্ষি-ডিম্বের কয়েকটি বাহ্যলক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিয়া পাখীর শ্রেণীবিভাগে তাহাদের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে তৎপর হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ডিম্বের আকার-প্রকার, বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি কোনও বিহঙ্গজাতির (genus) অথবা পরিবারের (family) বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিয়া পরস্পরের নিগূঢ় আত্মীয়তাসূত্র নির্দ্দেশ করিবার সহায়তা করে। ওটস্ রচিত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সময়ে পাখীর ডিম্বের কথা মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার বিশেষ করিয়া বলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি বলেন—A bird's egg may be a valuable clue to show us where we should expect to find its nearest allies or on the other hand, may cause us to suspect that it should be removed from amongst those with which it is now placed—একটা পাখীর ডিম এই হিসাবে আমাদের কাছে মূল্যবান্ হইতে পারে যে, ইহা নির্দ্দেশ করে—কোথায় পাখীটার নিকটতম আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে অথবা পক্ষান্তরে যাহাদের সহিত ইহাকে পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতে ইহাকে অপসারিত করা উচিত কি না, এই দ্বিধা আমাদের মনে জাগাইয়া দেয়।

ডাক্তার সার্প।

টিকেল।

আর একটা কথা উঠিয়াছে। ওটস পাখীর আহার-বিহার, বাসরচনা প্রভৃতি কয়েকটি স্বভাবগত লক্ষণ তাহার শ্রেণীবিভাগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করেন ডাক্তার সার্প (Sharp) ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। সম্প্রতি মিঃ ফিন্ এই প্রসঙ্গে বলেন যে, পাখীর এই সমস্ত স্বভাবজ স্বভাব তাহার জীবনের পক্ষে অনুকূল। স্বভাবগত এই সকল স্বভাবানুযায়ী তাহার স্নায়ু, মাংসপেশী, অস্থিসংস্থান পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর। অতএব স্বভাবের বশে অবয়বের গঠনসামঞ্জস্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পক্ষিদেহের গঠনের বিষয়

হজসন

পর্য্যালোচনা করিতে হইলে পক্ষি বিশেষের স্বভাবগত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণের পর্য্যালোচন প্রয়োজন। অর্থাৎ পাখীর habits-এর সহিত তাহার structure-এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বে আমরা পক্ষলক্ষণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। মিঃ পাইক্রাফ্ট প্রমুখ কয়েকজন ইহাও বলেন যে, পক্ষ আছে বলিয়া বিহঙ্গ বিশেষভাবে পক্ষী। পক্ষই ইহার উন্নতি ও অবনতির মানদণ্ড। চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্রভাবে দেখিলে পাখী প্রধানতঃ উড্ডীয়মান জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব পাখীর বিষয়ে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে

বাঙ্গালা গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

বিদেশী ভাষা ও বিদেশী কবির প্রতিষ্ঠা

অন্য দেশের, অন্য ভাষার কবিকে এরূপ করিয়া নিতান্ত নিজের করিয়া লওয়া সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। বিদ্যাপতি স্বয়ং তিনটি স্বতন্ত্র ভাষায় কাব্য ও অপর গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষার সহিত কোনটিরই কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। তথাপি বিদ্যাপতি বাংলা ভাষার আদি কবি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস দুই নাম সর্ব্বদাই একত্র উল্লিখিত হয়। স্কটলণ্ডের ভাষা ও ইংলণ্ডের ভাষাতে অনেক প্রভেদ, তথাপি স্কটলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি রবর্ট বার্ণস্ ইংলণ্ডেরও এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। বার্ণসের কবিতার ভাষা এইরূপ—

Wee, modest, crimson-tipped flower,
Thou's met me in an evil hour ;
For I maun crush among the stoure
Thy slender stem ;
To spare thee now is past my pow'r
Thou bonnie gem.

অথবা—

Is there for honest poverty
That hings his head, and a' that ;
The coward-slave—we pass him by,
We dare be poor for a' that,
For a' that, and a' that,
Our toil's obscure and a' that,
The rank is but the guinea's stamp,
The man's the gowd for a' that.

ইংরাজীতে ও এই ভাষার শব্দের আকারের ও উচ্চারণের প্রভেদ, ভাষার মজ্জাগত অথবা প্রাণগত কোন পার্থক্য নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের কথিত ভাষায় যেরূপ প্রভেদ, সেইরূপ।

ঈশান কোনে ম্যাঘ উঠেছে কত্তিছে গোঁ গোঁ
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো।
হাদে দ্যাখ চাকচিকুনি, দেহিবি হানে ঝলের ঘানি,
ঝড়ো দাদা উস্কে কোরে আসতেছে সোঁ সোঁ।

এ ভাষাকে বাংলা স্থির করিতে কোন দ্বিধা হয় না, কিন্তু—

গোধুলি পেখল বালা
জব মন্দির বাহর ভেলা।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারিয় গেলা॥
ধনি অলপ বয়সি বালা
জনি গাঁথলি পুহপ মালা।
থোরি দরসনে আস ন পূরল
বঢ়ল মদন জ্বালা॥

এ ভাষা বাংলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু এই ভাষার মোহিনী শক্তি বৈষ্ণবকাব্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আধুনিক কবিরাও এই ভাষার অনুকরণে কবিতা রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যাপতিকে বাংলার কাব্য-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা সম্যক্‌রূপে বুঝিতেন। কালবিগুণে আমরা সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি, বিদ্যাপতিকৃত অনেক পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার রচিত বলিয়া আমরা জানি না এবং পাঠবিকৃতি সংশোধন করিবার ও অজানিত শব্দাদির অর্থ করিবারও আমাদের ক্ষমতা নাই। ফলে বিদ্যাপতির প্রতিভার প্রসারের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদের নাই এবং যে পদগুলি আমরা আলোচনা করি, তাহার অতিরিক্ত যে আরও অনেক উৎকৃষ্ট পদ আছে, তাহা আমরা জানি না।

বিদ্যাপতির রচনার প্রধান গুণ সারবত্তা ও সংক্ষিপ্ততা। কেবল শব্দ যোজনা করিয়া কবিতা দীর্ঘ করিবার অথবা শ্রুতিমধুরতা প্রসারিত করিবার প্রয়াস কোথাও নাই। অনুপ্রাসের অতিরিক্ত ছটা কিংবা অনর্থক শব্দাড়ম্বর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দের চয়ন ও বিন্যাস এবং ছন্দের নিবিড় সংক্ষিপ্ততার একত্র সমাবেশ! যেন চিত্রকরের তুলির এক টানে সহসা একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়।—

কনকলতা অরবিন্দা।
দমনা মাঝ উগল জনি চন্দা॥

এই এক শ্লোকে রাধার রূপবর্ণনা হইল। কনকলতার উপর কমল, কিরূপ, না, যেন পুষ্পিত দ্রোণলতার মধ্যে চন্দ্রোদয় হইল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, তন্বী, চন্দ্রাননী রূপসী নায়কের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

মাধবের ভাবের প্রথম আবেশ লক্ষ্য করিয়া রাধা সখীকে কহিতেছেন,—

হমে হসি হেরলা থোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে॥
হেরিতহি হরি ভেল আনে রে।
জনি মনমথে মন বেধল বানে রে॥
মথল ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে॥

(হরি) অল্প হাসিয়া আমাকে দেখিল, সখি, আমার কৌতূহল সফল হইল। (আমাকে) হেরিতেই হরি অন্য (রূপ) হইল, যেন মন্মথ (তাহার) মনে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম, মনে হইল যেন পদ্মপত্র স্পর্শ করিতেছি, (তাহাকে চক্ষুতে দেখিয়া মনে মনে স্পর্শসুখ অনুভব করিলাম)। চক্ষুতে দেখা ও পদ্মপত্র স্পর্শ করার অনুভূতি তুল্য হওয়া কিরূপ অবস্থায় সম্ভব?

তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে অথচ তাহার অলক্ষ্যে কিরূপে প্রেম সমুৎপন্ন হয়, সখীতে সখীতে সে কথা হইতেছে।—

জুবতি চরিত বড় বিপরীত
বুঝএ কে দহ পার।
বুঝএ চেতন গুন নিকেতন
ভুলল রহ গমার॥
সাজনি নাগরি নাগর রঙ্গ।
সঙ্গহি রহিঅ তেসর ন বুঝ
লোচন লোল তরঙ্গ॥
বলিত বদন বাঙ্ক বিলোকন
কপটে গমন মন্দা।
দুই মন মিলল ঠাম অঙ্কুরল
পেম তরুঅর কন্দা॥

অর্থ,—যুবতী-চরিত্র বড় বিপরীত, কেহ কি বুঝিতে পারে? চতুর গুণনিকেতন বুঝে, মূর্খ গ্রামবাসী (পাড়াগেঁয়ে) ভুলিয়া থাকে (বুঝিতে পারে না)। সজনি, নাগরী ও নাগরের (নগরবাসী চতুর যুবক-যুবতীর) (এমন) রঙ্গ, সঙ্গে থাকিয়া তৃতীয় ব্যক্তিও লোচনের লোল তরঙ্গ বুঝিতে পারে না। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বঙ্কিম দৃষ্টি, কপটে ধীর গমন; দুই মন মিলিত হইয়া সেই স্থানেই প্রেম-তরুবরের মূল অঙ্কুরিত হইল।

এই স্থানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যে সকল পদ আমি উদ্ধৃত করিতেছি, পূর্ব্বে এ সকল পদ এ দেশে প্রচলিত ছিল না; কিংবা ইহার কোন কোন পদ পদকল্পতরুতে থাকিলেও বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া লোকে জানিত না। ইহাতে লাভ দুই প্রকার, কবির কতকগুলি নূতন পদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও কিছু প্রশস্ত হয়। সখী কৌতুক করিয়া রাধাকে কহিতেছে,—

বড় কৌশল তুয় রাধে
কিনল কহ্নাই লোচন আধে॥
ঋতুপতি হটবএ নহি পরমাদী।
মনমথ মধথ উচিত মূলবাদী॥
দ্বিজ পিক লেখক মসি মকরন্দা।
কাপ ভমরপদ সাখী চন্দা॥

অর্থ, রাধে, তোমার বড় কৌশল, কানাইকে অর্দ্ধলোচনে (কটাক্ষে) কিনিয়াছ। ঋতুপতি বসন্ত দোকানদার অপ্রমাদী (ভুলিবার লোক নয়), উচিত মূল্যবাদী মদনকে মধ্যস্থ মানিল। দ্বিজ কোকিল লেখক, মধু মসি, ভ্রমরের পদ লেখনী, চন্দ্র সাক্ষী (হইল)।

বিদ্যাপতি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে এই পদের অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

রত্নাকরসুতা ভার্য্যা যস্য কৃষ্ণস্য রাধিকে।
লোচনার্দ্ধেন স ক্রীতস্ত্বয়া তে কৌশলম্মহৎ॥
হট্টাধিপো বসন্তসোঽপ্রমাদী বিচক্ষণঃ।
যোগ্যমূল্যার্থবাদী চ মধ্যস্থো মন্মথোঽভবৎ॥
ভ্রমরস্য পদং কল্পো লেখকঃ কোকিলো দ্বিজঃ।
অভূৎ কৃষ্ণক্রয়ে রাধে শশী পাত্রং মসির্ম্মধু॥

অভিসার

রাধার অভিসারের অঙ্গবিন্যাস দূতীর মনোমত হইল না—

সহজহি আনন অতুল অমূল।
অলকে তিলকে সবধর তুল॥
কা লাগি অইসন পসাহন দেল।
জে ছল রূপ সেহও দূর গেল॥

অর্থ, স্বভাবতঃ মুখ অমলা ছিল, অলকে তিলকে শশধর তুল্য (হইল), (তোমার মুখ তুলনারহিত, অলক তিলক ধারণ করিয়া চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কযুক্ত হইল)। কিসের জন্য এমন প্রসাধন দিলে (এমন করিয়া সাজাইলে)? যে রূপ ছিল, তাহাও দূরে গেল।

বর্ষার অভিসার অতি সংক্ষেপে অথচ কৌশলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। রাধার আগমন অপেক্ষা করিয়া মাধব শঙ্কিত কহিতেছেন,

কাজরে সাজলি রাতি
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি॥
বরিস পয়োধর ধার।
দূর পথ গমন কঠিন অভিসার॥
জমুন ভয়াউনি নীরে।
আরতি যুবতি পাউতি নহি তীরে॥
বিজুরী তরঙ্গ ডরাই।
জৌ ভল কর জোঁ পলটি ঘর জাই॥

অর্থ, রাত্রি কাজলে সাজিল, মেঘমালা ঘন হইয়া বর্ষণ করিতেছে। মেঘ ধারা বর্ষণ করিতেছে, দূর পথ গমন করিয়া অভিসার কঠিন। যমুনার জল ভয়ানক, অনুরাগে আতিশয্যে (রাধা যদি তাহাতে) পড়ে (বেগে প্রবেশ করে) তীর পাইবে না, (উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না)। বিদ্যুৎ তরঙ্গে ভয় পায়, যদি ঘরে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল হয়।

রাধার সঙ্গে অভিসারে আসিয়া দূতী মাধবকে বলিতেছে,

বাট বিকট ফনিমালা।
চউদিস বরিসএ জলধর জালা॥
হে মাধব বাহু তরিএ নদি ভাগে
কতএ ভীতি জৌঁ দৃঢ় অনুরাগে॥

অর্থ, পথে বিকট বিষধর সর্পসমূহ, চারিদিকে জলধর জাল বর্ষণ করিতেছে। হে মাধব, (রাধা) ভাগ্যে বাহুদ্বারা (সন্তরণ করিয়া) নদী উত্তীর্ণ হইল, যদি দৃঢ় অনুরাগ, (তাহা হইলে) ভয় কোথায়?

অন্ধকার রাত্রিতে, প্রচ্ছন্নভাবে, গোপনে, সর্পসঙ্কুল পথ দিয়া অভিসারে গমন রাধার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, জ্যোৎস্না রাত্রিতে সকলের সম্মুখ দিয়া প্রকাশ্যভাবে নির্ভয়ে অভিসারে যাইবেন।—

সখি হে আজ জাএব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহী॥
চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূষন কএ গজমোতী।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী॥
ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগনে উগত
সহসে সহসে চন্দা॥
ন হমে কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে।
অধিক চোরী পর সঁও করিঅ
এহে সিনেহক সোতে॥
ভনে বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
সাহসে সকল কাজে।
বুঝ সিবসিংহ রস বসময়
সোরম দেবি সমাজে॥

অর্থ, হে সখি, আজ আমি যাইবই। ঘরে গুরুজনের ভয় মানিব না, বাক্যচ্যুত হইব না। (যখন যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন নিশ্চিত যাইব)। চন্দন আনিয়া আনিয়া অঙ্গে লেপন করিব, গজমুক্তার ভূষণ করিব। অঞ্জন বিহনে লোচনযুগল ধবল জ্যোতি ধরিবে (চক্ষুতে অঞ্জন দিব না)। শুভ্রবসনে তনু আবরণ করিব, যদ্যপি আকাশ জুড়িয়া সহস্র সহস্র চন্দ্র উদিত হয় (তথাপি) মন্দগতি গমন করিব (অর্থাৎ আত্মগোপনের তরে কোন উপায় অবলম্বন করিব না)। আমি কাহারও দৃষ্টি নিবারণ করিব না, আমি গোপন(ও) করিব না। পরের নিকট হইতে (সঙ্গে) অধিক চুরী করিবে, ইহাই প্রেমের অপহৃত ধন। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতি, সাহসে সকল কায (সিদ্ধ হয়)। রসময় শিবসিংহ সুরমা দেবীর সহিত রস বুঝেন।

দূতী কহিতেছে, অন্ধকার রাত্রিতে যাইবে কেন, পূর্ণিমা রাত্রিতেই ত তোমার যাওয়া উচিত! দূতীর মুখে এই কবিতাটি কাব্যসাহিত্যে বড় বিরল।—

আজ পুনিম তিথি জানি মোয়ে এলিহু
উচিত তোহর অভিসার।
দেহ জোতি সসি কিরন সমাইতি
কে বিভিনাবয় পার॥
সুন্দরি অপনহু হৃদয় বিচারি।
আঁখি পসারি জগত হম দেখল
কে জগ তুয় সনি নারি॥
তোহে জনু তিমির হীত কয় মানহ
আনন তোর তিমিরারি।
সহজ বিরোধ দূরে পরিহর ধনি
চল উঠি জতয় মুরারি।
দূতী বচন হীত কয় মানল
চালক ভেল পচবান
হরি অভিসার চললি বর কামিনী
বিদ্যাপতি কবি ভান॥

অর্থ, আজ পূর্ণিমা তিথি জানিয়া আমি আসিলাম, (আজ) তোর অভিসার (অভিসারে গমন করা) উচিত। দেহজ্যোতি শশিকিরণে প্রবেশ করিবে, কে বিভিন্ন করিতে পারিবে? (তোমার দেহের কান্তি জ্যোৎস্নাতুল্য, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় তাহা মিশিবে, কেহ প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না)। সুন্দরি, আপনার হৃদয়ে বিচার করিয়া, চক্ষু প্রসারিত করিয়া (সমস্ত জগতে) দেখিলাম, জগতে তোর তুল্য নারী কে? তুই তিমিরকে মঙ্গল করিয়া মানিস্ না, তোর মুখ তিমিরারি (তোর মুখ চন্দ্রতুল্য তিমিরকে নাশ করে, অতএব অন্ধকারে গমন করিলে তোকে সকলে দেখিতে পাইবে)। ধনি, স্বভাবের বিরোধ (অন্ধকার এবং আলোকের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ বিরোধ) দূরে পরিহার কর, উঠিয়া যেখানে মুরারি, (সেখানে) চল্। (রাধা) দূতীর বচন হিত করিয়া মানিল, পঞ্চবাণ মদন চালক হইল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, কামিনী-শ্রেষ্ঠ হরি অভিসারে চলিল।

৬০—৫

লাথ

বিদ্যাপতির পদাবলীতে লাথ নামে এক শ্রেণীর কবি[তা] আছে। লাথ অর্থে ছলনা-ছুতা। আমাদের চলিত কথা 'ছুতা-নাতা' শব্দে এই কথা পাওয়া যায়। 'নাতা' ও 'লা[থ]' একই শব্দ। অভিসারের অপরাধ গোপন করিবার জ[ন্য] কোন কল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করার নাম লাথ। এই শব্দ এই রকম পদ পদকল্পতরুতেই আছে, কিন্তু এ দেশের পা[ঠক] কথা তাহা জানেন না। ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতি[র], না থাকিলে বিদ্যাপতির নয়, এই সহজ হিসাব আমরা ধরিয়া রাখিয়াছি; কবির ও কাব্যের ভাষাগত ও ভাবগত ভিতরে যে একটা প্রমাণ আছে, এ কথা কে ভাবিয়া দেখিয়াছে? পদকল্পতরুতে একটি পদ আছে, তাহার ভণিতা নাই এবং পাঠবিকৃতির জন্য কোন অর্থ হয় না। সেই পদ মিথিলাতে অর্থযুক্ত ও বিশুদ্ধ পাঠ সমেত পাওয়া গিয়াছে। এ দেশে প্রচলিত পাঠের মূর্তি কিরূপ, একটি শ্লোকেই বুঝিতে পারা যায়,

জনু পরাণী পদতলে জল ঢালয়
পরশল সুরকিরণ মনে।
ঐছন হেরি তনু নাহ করহ জনু
বেকত লুকাওত কোণে॥

ইহার ত কোন অর্থই হয় না। কেহ যে কোন অর্থ করিতে পারেন না, এমন কথা বলিতে সাহস করি না। কারণ, বিদ্যাপতির ভাষার ও শব্দের এরূপ অদ্ভুত পাঠ ও অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় যে, ইচ্ছা করিলেই যে কেহ সেইরূপ করিতে পারে। এই পদাংশের মিথিলার পাঠ এইরূপ —

জনি গজেন্দ্রমারি গাজ নলিনি নড়াইলি
পরসলি খর কিরণে।
ঐসন দেখিঅ তনু লাথ করহ জনু
বেকত নুকাওব কোণে।

অর্থ,—যেন গজমর্দিত (গজকর্তৃক পদদলিত) মৃণাল (তুল্য) নিক্ষিপ্ত হইল, (অথবা) সূর্য্যকিরণ (তাহাকে) স্পর্শ করিয়াছে (সূর্য্যকিরণে মৃণাল শুকাইয়া যায়), (তোর) অঙ্গ এরূপ দেখিতেছি; লাথ (কপট) করিস্ না; (যাহা) ব্যক্ত, তাহা কোন্ (উপায়ে) লুকাইবি?

নাথের একটি পদের আরম্ভ,—

খরি নরি বেগে ভাসলি নাই
ধরএ ন পারথি বাল কন্হাই ॥
তেঁ ধসি জমুনা ভেলাহু পার।
ফুটল বলয়া টুটল হার ॥

অর্থ,—খরস্রোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই ধরিতে (নৌকা সামলাইতে) পারিল না। সেই জন্য জলে পড়িয়া (সাঁতার দিয়া) যমুনা পার হইলাম, (তাহাতে) বলয় ভাঙ্গিল, হার ছিঁড়িল।

মান ও অপর পদাবলী

সখী রাধাকে মান শিক্ষা দিতেছে,

খনরি খন মহথ ভই কিছু অরুণ নয়ন কই
কপটে ধরি মান সম্মান লেহী।
কনক ভএও্রা পেম কসি পুণু পলটি বাঙ্ক হসি
আধি সএেন অধর মধু পান দেহী।

অর্থ, ক্ষণকালের জন্য মধ্যস্থ হইয়া, কিছু অরুণ নয়ন করিয়া (কপট কোপ করিয়া), কপট মান ধরিয়া (করিয়া) সম্মান (অধিক আদর) লইবি। কনকের ন্যায় প্রেমকে কষিয়া (মানরূপ কষ্টিপাথরে প্রেমকে পরীক্ষা করিয়া) আবার ফিরিয়া বঙ্কিম ভাবে হাসিয়া অল্প অধরের মধু পান করিতে দিবি।

মান কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা ত রাধা জানেন না। ধ্যানে জ্ঞানে তিনি মাধবকে চিন্তা করেন, মাধবকে দেখিলে তিনি আত্মহারা হন, কেমন করিয়া তিনি মাধবের উপর মান করিবেন? রাধার মনের ভাব আর এক সখী বলিতেছে,—

কোপ করএ চাহ নয়নে নিহারি বহু
ধরিবা ন পারয় তাসে।
ন বোল পরুস বাক ন মুখ অরুণ থাক
চাঁদ কি জলই হুতাসে।
এ সখি মান করিবা ন জানে।
কত খন সিখাউবি আনে ॥

অর্থ,—(রাধা) কোপ করিতে চায়, চক্ষু দেখিয়া থাকে মাধবকে দেখিয়া ভুলিয়া যায়), হাসি ধরিতে (রাখিতে) পারে না। পরুষ বাক্য বলে না। মুখ অরুণ বর্ণ (কোপের চিহ্ন) থাকে না, চন্দ্র কি হুতাশনের ন্যায় জ্বলে? হে সখি! (রাধা) মান করিতে জানে না, অপরে কতক্ষণ শিখাইবে?

অল্প কথায় উজ্জ্বল ছবি আঁকিতে বিদ্যাপতি যেমন পারিতেন, এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন আয়োজন আড়ম্বর নাই, একেবারে গুটিকতক কথায় চক্ষের সম্মুখে নয়ন-মনোমোহন একটি ছবি ফুটিয়া উঠে। কৌতুক রসের একটি পদ,

হরি ধরু হার চেউকি পরু রাধা।
আধ মাধব কর শিম রহু আধা ॥
কপট কোপে ধনি দিঠি ধরু ফেরী।
হরি হসি রহল বদন বিধু হেরী ॥

* * * *

চিকুরে চমরে ঝরু কুসুমক ধারা।
পিবিকহু তম জনি বম নব তারা ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর বানী।
হরি হসি মিললি রাধিকা রানী ॥

অর্থ,—(পশ্চাৎ হইতে চুপি চুপি আসিয়া) হরি হার ধরিলেন, রাধা চমকিয়া পড়িলেন (উঠিলেন)। অর্দ্ধ (হার) মাধবের হস্তে, অপরার্দ্ধ (রাধার) গলায় রহিল। ধনী কপট কোপে দৃষ্টি ফিরাইয়া ধরিলেন (ফিরিয়া মাধবের দিকে চাহিলেন); হরি (রাধার) বিধুবদন দেখিয়া হাসিয়া রহিলেন (হাসিতে লাগিলেন)। চামরের (ন্যায়) চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল, যেন অন্ধকার পান করিয়া নব তারা নিঃসারিত করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি সুন্দর বাণী কহিতেছে, রাধিকা রাণী হাসিয়া হরিকে মিলিলেন।

ধন্যাত্মক পদে রাসের নৃত্যগীতের বর্ণনা —

চৌদিগে চারু অঙ্গনা বেড়ি
রঙ্গিনি কত গাউনী।
তুতা তা থৈয়া থৈয়া
থৈয়া বোলনী ॥
মাঝে বিরাজে সাম
সুঘড় সিরোমনী।
কিঙ্কিনি কিনি কিনি রোলনি ॥

পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি

জার্ম্মাণী হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ছাড়পত্র (pass port) খানি আবার যথারীতি আমেরিকার ইংলণ্ডস্থ কনসাল কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। কনসাল মহাশয় আমাকে আমার যুক্তরাজ্যে গমন করিবার অভিপ্রায়, অবস্থিতিকালের পরিমাণ ও আমার অন্যান্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, সন্দেহশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই ছাড়পত্র সম্বন্ধে পাঠককে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। কারণ, সাধারণ পাঠক ছাড়পত্রের ব্যাপার অবগত নহেন বলিয়াই মনে হয়।

আমরা ইংরাজের অধীন প্রজা। আমাদের দেশ স্বাধীন নহে, ইংরাজের অধীন। আমাদের দেশে কোন বিদেশী কখন কি অভিপ্রায়ে আসেন, তাহার সন্ধান বিবরণ ইংরাজ সরকারেরই হাতে। অন্যান্য দেশের কথা স্বতন্ত্র। দেশ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, যদি তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ভিন্নদেশবাসী বিনানুমতিতে সে দেশে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাহাতে দেশের বা জাতির বিন্দুমাত্র অকল্যাণসম্ভাবনা আছে, স্বাধীন দেশবাসী সে ক্ষেত্রে কাহারও খাতির রাখে না। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই শান্তির সময় বিভিন্ন স্বাধীন দেশের এক জন করিয়া দূত বা কনসাল থাকেন। এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইলে পুলিসের অথবা দেশের কনসাল মহাশয়ের নিকট ছাড়পত্র লইতে হয়। আমি যখন এ দেশ হইতে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় যাতায়াত করিয়াছিলাম, তখন আমাকেও সেই সেই দেশের কনসালের নিকট ছাড়পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকাযাত্রাকালে আমেরিকার ইংলণ্ডস্থ কনসালের দ্বারা ছাড়পত্র দ্বিতীয়বার স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী যাত্রাকালে এই একই ব্যবস্থা। ছাড়পত্র একখণ্ড ভাঁজ করা কাগজ—ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকার আকার। ইহার সঙ্গে যাত্রীর আলোকচিত্র বা ফটো সংলগ্ন থাকে। যাত্রীর জন্মভূমি, জাতি, বয়স, যাত্রার উদ্দেশ্য, অবস্থিতিকালের পরিমাণ প্রভৃতি সবই লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট থাকে। আমার pass portখানি আমি ইংলণ্ড হইতে দ্বিতীয়বার আমেরিকার কনসাল দ্বারা স্বাক্ষরিত করাইয়া ইংলণ্ডের সাদাম্পটন বন্দরে আমেরিকাগামী সুবৃহৎ একুইটানিয়া নামক জাহাজের একটি কামরায় আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিলাম। জাহাজ মন্থরগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার বিরাট দেহ ক্রমশঃ বন্দরের বাহিরে আনিয়া বিশাল মহাসাগরে উপস্থিত হইল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে একুইটানিয়ার চিত্র প্রদত্ত হইল। উহা যেন পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্যজনক অভিব্যক্তি। আমাদের দেশবাসী যাঁহারা কার্য্যবশতঃ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, য়ুরোপ বা আমেরিকাগমন যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারা এক জন সাধারণ বাঙ্গালীর কৌতূহলবিস্ফারিত দৃষ্টিতে এমন একখানি জাহাজ দেখিবেন না। যাঁহারা এ যাবৎ দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়কর কৌতূহল-উদ্দীপক আর কিছুই নাই। কিন্তু এ জাহাজ বিস্ময়করই বটে। আমাদের স্বদেশে অধুনা স্বদেশী আন্দোলনের চরম অভিব্যক্তি এক কিম্ভূতকিমাকার 'পাচশ-মুণে' জড় কিংবা যদি আকার ত্যাগ করিয়া বিলাসিতার দিক্ দিয়া দেখিতে হয়, তবে না হয় বলিব, একখানা ষোল দাঁড়ের বজরা বা পানসী। ইহার সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র ১০টি মাটীর বা পিতলের থালা, ঘটি, বাটি, ঘড়া, কলসী, ডাব, চকমকি, হুঁকা, কলিকা, মাদুর, কম্বল হইতে জোর ২।৪টি বিলাসের দ্রব্য, তাহাও বিলাতী। এই পর্য্যন্ত। যাঁহাদের দেশের নৌ-শিল্পের এমন শোচনীয় অবস্থা, তাঁহারা বিলাতী জাহাজে দুই একবার যাতায়াতের আনন্দ ও বিলাস উপভোগ করিয়া যদি মনের ক্ষুধা মিটাইয়া ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তেমন প্রবৃত্তি প্রশংসার বিষয় নহে বলিতে হইবে।

এই একুইটানিয়া জাহাজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ নহে; বোধ হয়, তখন আয়তনে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৯০১ ফুট, প্রস্থ ৯৭ ফুট, গভীরতা ৯২—৬ ফুট; ইহার ভারবহনশক্তি ৭৭ হাজার টন। (এক টন

দিয়া কুরিয়া কুরিয়া খাইতেন; শুনিতাম, ফলগুলি মিষ্ট ও সুস্বাদু। ইহাকে তাহারা grape fruit বলিতেন। কেবিনগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ। আমাদের দেশের রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কক্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ. সাধারণতঃ একটি কেবিনে দুইটি করিয়া যাত্রীর স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। নীচে বসিবার স্থান ও উপরে রেলের কামরার ন্যায় 'বাঙ্ক' আছে। ইহা ব্যতীত বাথরুম, বিশ্রামের জন্য চেয়ার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও দ্রব্যাদি রাখিবার, বেশবিন্যাস করিবার স্থান আছে। কোনও প্রকার অভাব অনুভব করিতে হয় না। সকল বিষয়েই ব্যবস্থা পারিপাট্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ প্রকৃত আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। সে কি দৃশ্য! এমন বিশাল, এমন মহান, এমন হৃদয়স্পর্শী প্রাকৃতিক শোভা কে কোথায় দেখিয়াছে! মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশ্বপিতার এত বড় স্তম্ভ কোথায় আছে যে, তাহার দর্শনমাত্রে হৃদয় ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে; সাংসারিক চিন্তা কোথায় ভাসিয়া যায়, নাস্তিক আস্তিক হইয়া পড়ে? কল্লোলরাশিমালা এমন দৃশ্য বরুণের বাসা আর দ্বিতীয় নাই। দিগন্তপ্রসারিত নীলাম্বুরাশির সে নীলদ্যুতি, আর তাহার উপর বালসূর্য্যের প্রকাশমাত্রে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তাহার তুলনা কোথায়? অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণ রশ্মি অসংখ্য কিরণসম্পাতে দীপ্ত, প্রশান্ত জলরাশির বক্ষে যে কোটি কোটি মণিমাণিক্যের উদ্ভব হয় তাহা এ সব জগতের কোন্ রাজার রাণী গাঁথিয়া পরিতে পারিয়াছেন? প্রকৃতি এই সৌন্দর্য্যে পূর্ণা, সালঙ্কৃতা প্রকৃতি অতুলনীয়া। বিভোর হইয়া এই দৃশ্য দেখিতাম; এমন তন্ময়তা জীবনে বোধ হয় আর কোনও দিন আইসে নাই। অনন্তকে হৃদয়ে স্থান দেয় কাহার সাধ্য? হৃদয় কতটুকু? এত বড় সুসজ্জিত জাহাজ সমুদ্রের বক্ষে মোচার খোলা এক বিন্দু। সমুদ্র এমন বিশাল। সেই বিশাল সমুদ্র সৌর জগতের কতটুকু? ঐ আকাশ, অসংখ্য নক্ষত্ররাজি, উহাদের অনেকে যে এক একটা সৌরজগৎ; অনন্ত স্থানে অনন্তকাল ধরিয়া উহারা কোন্ অনন্তের লীলায় বিভোর; আমি কত ক্ষুদ্র, আমার অহমিকা কিসের? আমার হৃদয়ের দ্বেষ-হিংসা, আমার শ্লাঘানুভূতি, আত্মানুভূতি কোথায় ভাসিয়া গেল। সমুদ্র হাসিতেছে; সে প্রফুল্ল প্রশান্ত হাসিতে লীলাময়ের অনন্ত হাসির অভিব্যক্তি দেখিলাম। এমন হাসি যে প্রাণ মেলিয়া দেখিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে। যদি হাসিতে মন না মজে, তবে সমুদ্র আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে। সে বিভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি! ভীষণ জলকল্লোল, জলদৈত্যের অবিশ্রান্ত তাণ্ডব। সে ভীষণ দৃশ্য দেখিলে দেহ-মন আতঙ্কে অবশ হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন, করাল কাল সৃষ্টিলোপের উদ্যোগে আনন্দে মত্ত হইয়াছে। মানুষ আপনার ক্ষুদ্র শক্তি উপলব্ধি করিয়া অনন্ত শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কখন রোষকষায়িত লোচন, ভীম হুহুঙ্কার, কখনও বা প্রশান্ত সস্নেহ দৃষ্টি; কখন সৌম্য, কখন বিরাট রূপ, ইহাই অনন্তের রীতি। সমুদ্রবক্ষে ইহা দেখিবার এ সৌভাগ্য প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কখন কখন এমন হয় যে, তরঙ্গমালা একেবারে জাহাজের সর্ব্বোচ্চ ছাতের উপর দিয়া বহিয়া যায়। কামরার দ্বার, জানালা ও ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলে আর জল প্রবেশ করে না। জাহাজ যেন ভয়ঙ্কর ভাবে আন্দোলিত, আলোড়িত হইতে থাকে। যাত্রীরা অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। কখন কখন ২।৩ দিন কেহ কিছু আহার করিতে পারে না; সমস্তই বমন হইয়া যায়। অনেকে সরলভাবে দাঁড়াইতে পারে না; শয্যায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এই জন্য জাহাজের ডিনার টেবল অনেক সময় সাধারণ টেবলের ন্যায় হয় না; টেবলের তক্তাখানি ছিদ্রযুক্ত, ঐ ছিদ্রপথে এমনভাবে পায়া প্রবেশ করান থাকে যে, টেবল কিছুতেই উল্টাইয়া যায় না। ঝটিকা হইবার পূর্ব্বেই জাহাজের কাপ্তেন যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন। কোনও আরোহী কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি সানন্দে তাহার উত্তর প্রদান করেন; তবে যাহাতে আরোহিগণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, এমন কথা বা ভাব সচরাচর প্রকাশ করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজের কামরাগুলিকে —কামরাগুলিকেই বা বলি কেন, সমস্ত জাহাজখানিকেও air-tight ও water-tight করিয়া ফেলা যায়; ইহার উপর দিয়া জলতরঙ্গ চলিয়া গেলেও জল আসিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থ কোনও পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না। আবার এই আমেরিকাযাত্রাকালে ঝড়ের বেগ এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, তরঙ্গের আঘাতে জাহাজের সর্ব্বোচ্চ হারিকেন ডেকটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এমন তুমুল কাণ্ড কখনও দেখি নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের

বিষয়, আমার কোন প্রকার অসুখ হয় নাই; আমি বরাবর সুস্থই ছিলাম।

জাহাজে আমার সহযাত্রিগণের অধিকাংশই মার্কিন। জাহাজে পূর্ণসংখ্যক যাত্রী ছিলেন। এত লোকের মধ্যে ভারতবাসী আমিই—একমেবাদ্বিতীয়ম্‌স্বরূপ হইয়া ছিলাম। মার্কিণ যাত্রিগণ প্রথমতঃ আমাকে স্পেনদেশের মনে করিয়াছিলেন। যখন আমি আমাকে Indian বলিয়া পরিচিত করিলাম, তখন অনেকে বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আমি ইণ্ডিয়ান ভারতবাসী। তখন তাঁহাদিগের বিস্ময় দূর হইল। তাঁহাদের দেশে নিগ্রোজাতিকে রেড ইণ্ডিয়ান বলে। আমার রূপ আকৃতি, তাহাতে আমি রেড ইণ্ডিয়ান কিরূপে হইতে পারি, এই ভাবিয়াই তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম, ভারতের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ সম্বন্ধে অনেকেরই অতি উচ্চ ধারণা। আমাকে আমাদের দেশে প্রচলিত বর্ত্তমান রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করিলেন; আমিও যথাসাধ্য তাঁহাদের কৌতূহল দূর করিলাম। আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন, ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা কেমন সুখভোগ করিতেছি, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কি প্রকার, স্বায়ত্ত শাসন সাঁচ্চা কি মেকি, এ সব সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন হইতে লাগিল। দেখিলাম, অনেকে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াও তাহা গোপন করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন।

সাধারণতঃ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা ১০ দিনের পথ। আমাদের একুইটানিয়া অতি দ্রুতগামী জাহাজ; সুতরাং ৬ দিনেই আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার কিছু পরেই দেখিয়াছিলাম, এক দল পক্ষী আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই গন্তব্য স্থানের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। তখন বুঝিতে পারি নাই, অনন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রমধ্যে কোন্ স্থলভাগ ইহাদের লক্ষ্য। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পক্ষীগুলি বরাবর দিবারাত্রি আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল বেগে অবিশ্রান্ত উড়িয়া আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভাবিলাম, এমনই এক দিন আমেরিকার চিরপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক কলম্বস এই পক্ষীর গতি লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে স্থলভাগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আমেরিকার ৩ মাইল দূরে আসিয়া জাহাজ স্থির হইল। পরে নিউইয়র্ক বন্দর দেখা যাইতে লাগিল। সে কেমন দেশ, কেমন নগর, তাহার সৌধশ্রেণী ও রাজপথ কি প্রকার, পরে বিবৃত করিব তবে এখন এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি: এ পর্য্যন্ত য়ুরোপে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা আমেরিকার ব্যাপার বহুগুণ রহস্যময় ও আশ্চর্য্যজনক। জাহাজ নিশ্চল হইতেই মার্কিণ রাজ্যের কাষ্টম অফিসার, ডাক্তার এবং পাসপোর্ট অফিসার ছোট লঞ্চে করিয়া আমাদের জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা আন্দাজ ৭টা। কাষ্টম অফিসার আসিয়াই জাহাজে যে মদ্যের দোকান ছিল, তাহা শিল করিয়া ফেলিলেন—অর্থাৎ আর একবিন্দু মদ্যও কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আমেরিকায় মদ্যের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ। এ ব্যাপারের পূর্ণ পরিচয় পরে প্রদান করিব, তবে এখন যাহা দেখিলাম, তাহাই বলিতেছি। মদ্যের দোকানে সরকারী তালা ঝুলিল। ক্রমশঃ আরোহীদিগের স্বাস্থ্যপরীক্ষা চলিতে লাগিল। অসুস্থ ব্যক্তিকে জলে জলেই ভাসিতে হইবে; যদি তাহার দেহের রোগ আমেরিকাবাসীর মধ্যে সংক্রমিত হয়, এই ভয়ে তাহার অবতরণ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। দেহপরীক্ষার পর ছাড়পত্র পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ভাবিলাম, এইবার অব্যাহতি লাভ করিব। মানুষ জলজন্তু নহে; তবে যতক্ষণ জলের উপর মহাসমুদ্রবক্ষে ছিলাম, কোথায়ও কূলকিনারার চিহ্নমাত্র ছিল না, তখন স্বভাবতঃই সেই কূলহীনতার অসীমতার সৌন্দর্য্যই উপভোগ করিতেছিলাম; এখন কূলে আসিয়াছি, সম্মুখে ঐ নিউইয়র্ক বন্দর, ঐ সব মনুষ্যাবাস, এ অবস্থায় কি আর জাহাজে আটক থাকিতে কেহ ইচ্ছা করে? কিন্তু দেখিলাম, অব্যাহতিলাভ এখনও সুদূরপরাহত।

যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সে স্থানের নাম—হডসন বে। ইহা হডসন নামক নদীর বিস্তৃত মোহানা; ইহারই উপর কিছু দূরে জগদ্বিখ্যাত নিউইয়র্ক বন্দর। আমাদের সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড Libertyর (স্বাধীনতার) মূর্ত্তি। ইহা হডসন বের মধ্যে অবস্থিত। ইহা এমন বৃহৎ যে, না দেখিলে ইহার বিশালত্ব ও উচ্চতার উপলব্ধি হয় না। সম্মুখেই
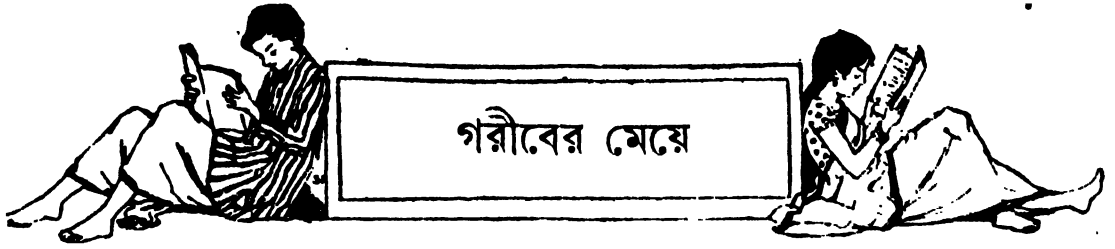
সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে শুভ-বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। এখন শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই হয়, গলিতপত্র শীতশীর্ণ বৃক্ষলতা নবকিসলয়ে আপ্রান্ত ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের কোথাও কোথাও নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ উজ্জ্বল ও বিচিত্র শোভায় দিক আলো করিয়া আছে। বিরলসলিলা দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীগুলিতে জলজ পুষ্প আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু স্থলের মূর্ত্তি সহজেই চোখে পড়ে। গ্রামের মধ্যে মধ্যে অদূর-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র শুভ্র মূলকফুলে, হরিদ্র সরিষাপুষ্পে এবং উজ্জ্বল বেগুনী বর্ণের কড়াইসুঁটীর পুষ্পগুচ্ছের প্রাচুর্য্যে অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছিল। ভিন্ন রক্ত ও পীত কুসুমকুলের ক্ষেত্রগুলি সকল শোভার যেন আধার হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তভাগে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর গোচারণের মাঠ। মাঠের ইতস্ততঃ কতকগুলি বিশালকায় অশ্বত্থ, বট, তিন্তিড়ী ও পাকুড় বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে এক আধটা শিরীষ, সেগুন, ছাতিম এবং আম-কাঁঠালের গাছও আছে। ইহারা পথিকদের বিশ্রামস্থল হয় ও রৌদ্রক্লান্ত চরণশীল গাভীদিগকে আশ্রয় প্রদান করে। ইহাদের তলায় বসিয়া রাখাল বালকরা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া পুরাকালের গোষ্ঠলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের অনতি-উচ্চ শাখায় দড়ি দিয়া, দোলনা প্রস্তুত করিয়া, গ্রাম্য বালকবৃন্দ সানন্দচিত্তে দোল খায়। এই গ্রামের অনতিদূরে একটি নদী। নদীর অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়, ইহার স্থানে স্থানে চর দেখা দিয়াছে, নদীগর্ভ ক্রমে ক্রমে মজিয়া আসিতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের রেলপথ-বিস্তৃতি ও খালকর্ত্তনের গুণে এমন অবস্থাপ্রাপ্তি অনেক নদীরই ভাগ্যে ঘটিতেছে। তথাপি নদীতীরবর্ত্তী সুসমৃদ্ধ গ্রামের শোভা যে কোন সৌধ, অট্টালিকাবিমণ্ডিতা নগরীর তুলনায় শতগুণেই শ্রেষ্ঠ। শুভ্র জলধারার পরপারে শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজী, পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যেন চিত্রাঙ্কিতবৎ শোভা পাইতেছে। ক্বচিৎ তাহাদের বুক চিরিয়া একটি বড় প্রাচীন প্রশস্ত চাতাল ও শিবমন্দিরসমন্বিত বাঁধাঘাট নামিয়া আসিয়াছে। এ পারের সেটঘাটের উপরেই একটা প্রকাণ্ডাকার বটবৃক্ষের তলদেশ সানবাঁধান। গ্রামের সেটি ষষ্ঠীতলা। অদূরে জমীদার বাবুদের দ্বারা সদ্যঃসংস্কৃত বহু পুরাতন শ্মশানেশ্বর শিবের অনতিবৃহৎ মন্দির ও ভোগঘর; ইহারই এক পাশে পূজারীর থাকিবার জন্যখানি খড়োচালা। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসেই এখানে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া নদীতীরে মেলা বইসে, শিবের মাথায় জল ঢালিতে চারিদিকের গ্রাম ও পল্লী সকল হইতে দলে দলে লোক আইসে। চম্পক-চামেলীর ও কচি বিল্বপত্রের ভারে শ্মশানেশ্বরের বিশাল মূর্ত্তিটিও তখন চাপা পড়িয়া যায়। এক্ষণে কেবলমাত্র দুইচারিটি শুষ্ক বিল্বপত্র ও কয়েকটি কুন্দ ও গাঁদা লিঙ্গমূর্ত্তির পিনাকের উপর পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শ্মশানযাত্রীরাই শুধু এক একটা প্রণাম করিয়া যায়।

শুভেন্দু বিবাহবাড়ীতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই। নিজের সমবয়সী অথবা অধিকাংশ বয়ঃকনিষ্ঠ বালক, এমন কি, দুই চারিটি বালিকাকেও নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়া সে সারাগ্রাম ও গ্রামান্তর পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার সুন্দর চেহারায় এবং নানারূপ উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে বোধ করি কোনরূপ সম্মোহনের ক্ষমতাও নিহিত ছিল; দুই দণ্ডের পরিচিত সকলেই একবাক্যে যেন কতকালের দলপতির মত তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া সেই আকর্ষণী-শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া রোধ করিতে পারে নাই। ইহাদের দ্বারা নির্ব্বিরোধে শুভেন্দু অনেক প্রকার অকথ্য, অকর্ম্মের সাহায্য পাইতেছিল, সাজা-পান চুরি ও আচার চুরিতে ইহারাই সকলের অগ্রবর্ত্তিনী।

এই দলের মধ্যে ভুবনবাবুর ছেলে সুশীলই শুভেন্দুকে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। সুশীল শুভেন্দুর ঠিক সমবয়সী হইলেও এবং স্কুলের পড়ায় এ পর্য্যন্ত ভাল ছেলে বলিয়া গণ্য হইতে থাকিলেও এবার এই শুভেন্দুর শুভাগমনে তাহার নিজেকে নেহাৎ ছেলেমানুষ ও নিতান্তই নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হইল। কলিকাতায় সে এক প্রকার বন্দিদশায় কাল কাটায়। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠা হইতে রাত্রিতে বিছানায় প্রবেশ করা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটিই তাহার একই নিয়মসূত্রে গ্রথিত হইয়া, একখানা রুটিনের লেখার মত হইয়া আছে, ইহার একটি দিনের নিয়মও কখন উলোটপালট হইতে পায় না। আজও সকালে সেই মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসা, পরিশেষে চাকরের হাতে তেল মাখিয়া সাবান ঘষিয়া পরিপাটী স্নান ও অত্যন্ত সাবধানতাপূর্ণ ভাবে অর্থাৎ তেল, ঝাল, টক ও মশলা নামের অহিতকারী, মৎস্য, ফল সমস্তই বর্জ্জন করিয়া ভোজন পথ্যানুমোদিতভাবে গুরুজনের শাসন দৃষ্টির তলে আহার এবং গাড়ী চাপিয়া মাষ্টারের সঙ্গে স্কুলে গমন। বাকী দিনটার ইতিহাসও এই প্রথাক্রমের সহিত নেহাৎ বেখাপ নয়। খেলার ছক অবশ্য সে পায়, সেও এক আনন্দ উৎসাহবিহীন প্রাণহীন খেলা। বাড়ীর কড়া 'গার্জেন' মাষ্টারমশাই, বাবা এবং বাবার বন্ধু এক আত্মজনের সঙ্গেই আর সব নিয়মের মতই সে খেলা সীমাবদ্ধ। পিংপং, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, কখন বা ঘরের মধ্যে বিলিয়ার্ড টেবলে এমনই নিরুৎসাহে বিলিয়ার্ড বল গড়ান। ছোটাছুটি ভুবনবাবুর একটি ভাই যুবাবয়সে ফুটবল খেলিতে গিয়া গুরু আঘাত প্রাপ্ত হয়েন ও তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে, সেই পর্য্যন্ত এ পরিবারে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর হাডুডু, গুলিডাণ্ডা এ সব এখনও ছোটলোকের ছেলেরা খেলিতেছে বটে, তবে আশা আছে যে, দুই দিন পরে তাহারাও আর খেলিবে না, টেনিস খেলাই আরম্ভ করিবে। কাজেই সুশীলের নিগড়বদ্ধ জীবন পল্লী স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার শুভেন্দুর মত এক জন সর্ব্বাবস্থায় বিশারদ সঙ্গী লাভ করায় তাহার মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। যদি বা এক দিন পিসীমা, দিদি, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি অশেষবিশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহার স্নানাহারটাকে কতকটা নিয়মিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শুভেন্দুর শুভাগমনাবধি আর কাহারও সাধ্যে তাহাকে আঁটিয়া উঠা সম্ভবই হইল না।

বাড়ীর বড় পুষ্করিণীতে সচরাচর বাহিরের লোক স্নান করিতে পায় না। বাড়ীর বাবুরা বা বধূ ও কন্যাগণ স্নান করিয়া থাকেন। আজকাল বিবাহবাড়ীতে এ নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, এখন দিবারাত্রিই নিমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিতাগণের দ্বারা পুষ্করিণীর জল আলোড়িত হইতেছিল। কলিকাতাবাসী সুশীল ইতঃপূর্ব্বে বাটী আসিলে নদীর তোলা জলেই স্নান করিত। পুকুরে নামিয়া স্নান করায় তাহার মনেও বিলক্ষণ ভয় আছে এবং বাড়ীর লোকেরও নিষেধ ছিল। শুভেন্দু আসায় সে ভয় ও নিষেধ কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার আর কিছুই ঠিকানা পর্য্যন্ত রহিল না। প্রথম দিন সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া ঘটি করিয়া মাথায় জল পড়িল, দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দুর বিশেষ সাহায্যে ডুব দিয়া স্নান হইল, তৃতীয় দিবসে পল্লীর অন্যান্য বালকদিগের সহিত সমান পাল্লা দিয়া সুশীল পুষ্করিণীবাসী মৎস্য, শম্বুক ও কর্কটিকার দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে বাড়ীর লোকের তাড়নার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার চেষ্টায় পরামর্শ করিয়া এক দিন তাহারা নদীস্নান করিতে গেল। সে দিন তরুর গায়েহলুদ। বাড়ীর লোক সেই সব ব্যাপারেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। ইহারই ফাঁকতালে সুশীল এই নদীযাত্রার দলে ভিড়িয়া পড়িতে বিশেষভাবেই সুবিধা পাইয়াছিল। নতুবা হয় ত তাহার গমনে বাধা পড়িত।

সাঁতার দিতে শুভেন্দুর জুড়ি পাওয়া খুঁজিয়া মিলে না। কোন্ বিদ্যাটারই বা তাহার অভাব আছে! সুশীলের খুড়তুতো ভাই সলিলকুমারের সহিত "বাচ" লাগাইয়া সে মাঝনদী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিল, সুশীল তখনও ভরসা করিয়া জলে নামে নাই। শুভেন্দুর মতলব ফাঁসিয়া গেল। মিছামিছি নিজের হার স্বীকার করিয়া লইয়া সে সলিলের পাশ কাটাইয়া ফিরিল। চারিদিকের তরঙ্গ ধ্বনির মধ্য দিয়া দৃক্‌পাতশূন্যভাবে তীরে উঠিয়া সে সুশীলের নিকট আসিলে নিতান্ত ম্রিয়মাণভাবে সুশীল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সলিলদার কাছে তুমি হেরে গেলে? কিন্তু তুমিই ত তখনও অনেকখানি এগিয়েছিলে, হার স্বীকার ক'রে নিলে কেন? ও কক্ষণো অতদূর যেতে পার্‌তো না।"

শুভেন্দু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল, "তুমি জলে না নেমে সংএর মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তাইতেই ত

আমার শুধু শুধু হার মেনে নিয়ে ফিরে আসতে হলো। তুমি একেবারেই 'গুড-ফর-নথিং বয়'!"

এই ইংরাজী গালিটুকু সে তাহার সম্বন্ধে অনেকের মুখেই শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই আজ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া এক হাত লইল।

সুশীলের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে; বাড়ীতে ত কথাই নাই। এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে সে শুনিতে পায় নাই। কাজেই মনে মনে রাগিয়া সে মুখখানা হাঁড়ি করিয়া জলে নামিল এবং প্রায় আবক্ষ জলে পৌঁছিয়াই গভীর জলের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গেই ডুবিয়া গেল। সেখানটায় একটা গভীর খাদের মত গর্ত্ত ছিল।

ঘাটশুদ্ধ ছেলের দল অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেকেই আবার, সুশীল এটা ডুব দিল কি ডুবিল, তাহারও কোন স্থিরতা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদের কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাহবা, সুশীল!"

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শুভেন্দুর একটুও বিলম্ব ঘটে নাই। সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া জলে পড়িয়াছিল এবং খানিকটা পরে অনেকখানি জল খাইয়া প্রায় অর্দ্ধমৃত সুশীলের শিথিল দেহ সাপটাইয়া ধরিয়া কোনমতে তাহাকে উদ্ধার করিল। শুভেন্দু ও সলিলে মিলিয়া যখন সুশীলকে তীরে উঠাইল, তখন সুশীলের সমস্ত দেহ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-পা শীতে নীল হইয়াছে, দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া যাইতেছে, পেটের মধ্যেও কিছু জল গিয়াছে; তবে খুব বেশী নয়। স্তব্ধ, ভয়াকুল সঙ্গীর দল এতক্ষণে কিছু ভরসা পাইয়া একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল, "বাড়ীতে খবর দেওয়া দরকার।" "একখানা ডুলি আনাতে হবে।" "কিন্তু জ্যোঠামশায় কি ভয়ানক যে চটে যাবেন, সে বল্‌বারই নয়।" ভয়ে অনেকেই আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দুই এক জন বালক বার্ত্তাবহের কায করিতে উদ্যত হইয়া বাড়ীর পথে পা বাড়াইতেই সুশীলকে লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত শুভেন্দু তাহাদের হুকুম দিয়া বলিল, "খবরদার! এ সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কারুর মুখ থেকে বার হ'তে না পায়! সুশীল! এই সুশীল! তোর কি ডুলি চ'ড়ে বাড়ী যাবার সাধ হচ্ছে না কি রে? দিদির বরের মতন?"

সুশীল অনেকখানি সাম্‌লাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক পেট জল খাইয়া তাহার শরীরের মধ্যে তখন এক রকম হাঁস্‌-ফাঁস্ করিতেছে, বমনেচ্ছা হইতেছে। সে এই অবমাননাজনক পরিহাসে ইহারই মধ্যে কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সবেগে মাথা নাড়া দিল, "ছাৎ!"

শুভেন্দু বলিল, "তা হ'লে সব্বাই মিলে কথাটা একেবারেই চেপে যাও। তোমরা সব বাড়ী ফিরে যাও, সুশীলের খোঁজ হ'লে বল্‌বে যে, সেও বাড়ী এসেছে। ওই ওদিকে আছে, ডেকে আন্‌ছি, এ না ব'লে সটান স'রে পড়বে। আমি একটু পরেই ওকে নিয়ে যাচ্ছি। এই নিতা! একটা কায কর্ দেখি, ওই মন্দিরবাড়ীর পুরুতের কাছ থেকে একটা নুন নিয়ে আয়, সেইটে জলে গুলে খাইয়ে দিলে বমি হয়ে যাবে। তা হ'লেই সব সেরে ঠিক হয়ে যাবেখ'ন।"

নিতা আদেশপালনে ছুটিল। সলিলের মেজ ভাই অনিল বলিয়া উঠিল, "শুভেন্দুর যে ডাক্তারীও পড়া আছে দেখ্‌ছি!"

গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া শুভেন্দু সেই ফুলান বুকে তাল ঠুকিয়া কহিল, "থাক্‌বে না! আমি যে 'লাষ্টো কেলাশের আউট' হওয়া ছেলে, তার খবর রাখো কিছু? আমার কোন্ বিদ্যাটাই বা কম?"

এই গর্ব্বোক্তির মধ্যে অর্থ কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, উহার বলিবার ধরণে কথাটা শুনিয়া সকলেই খুব একচোট হাসিল এবং নুন খাইয়া সুশীলের পেটের জল অনেকখানি বাহির হইয়া গেলে, সুশীলকে কতকটা সুস্থ দেখিয়া শুভেন্দুর পরামর্শমত তাহাদের দুই জনকে শুধু সেখানে রাখিয়া অপর সকলে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। সুশীলের জলমগ্ন হওয়ার খবরটা বেমালুমভাবে চাপিয়া যাওয়া হইবে বলিয়াই সেই পঞ্চায়েত সভায় একবাক্যে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সুশীলের জলে ডোবার সংবাদটা বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখা হইল বটে, এবং সে দিন তরু ভাবী শ্বশুর-বাড়ী হইতে তত্ত্ব আসার গোলমালে সুশীলের গৃহে অনুপস্থিতিও কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না বটে; তথাপি সুশীলের নিজের মনের মধ্যে এ দিনের এই ঘটনাটা কেমন যেন একটা অপরাধের গুরু ভারের মতই ভারী হইয়া রহিল। বিবাহবাড়ীর আমোদে সকলেই সুখোন্মত্ত।

তরুর শাশুড়ীর সুবিবেচনায় ও শ্বশুরের মুক্তহস্ততার খাতিরে সে দিন বাড়ী ছাপাইয়া দেশ ভরিয়া গেল। পাড়াশুদ্ধ, গাঁশুদ্ধ, ছেলেমেয়েরা তরুর সদ্যঃপ্রাপ্ত খেলানার রাশির চারিদিকে, বসন্তপুষ্পসম্ভারের চারি পাশে আকর্ষিত মধুপ কুলের ন্যায়, গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পর ম্লানমুখে আসিয়া সেই যে সুশীল একটিবারমাত্র দিদির বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের পানে অনাগ্রহভাবে তাকাইয়াই আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, সেটা আর কেহ লক্ষ্য না করুক, তরুলতা করিয়াছিল এবং স্নেহের ভাইটির এই প্রকার বৈরাগ্যপূর্ণ অবহেলার ভাব তাহাকে একটু ব্যথিত করিতেও ছাড়ে নাই। তরু ভাবিল, "এ সব জিনিস, বোধ হয়, সুশীলের পছন্দ হয়নি। আমি কোথায় ভেবেছিলুম, এগুলি সব হাতে পেলে এর থেকে ভালগুলি বেছে বেছে সুশু আর বিনাকে অনেকগুলোই দিয়ে দেবো। কিন্তু কেন ওর কিছু ভাল লাগলো না? আচ্ছা, আমি ওকে ছেড়ে চ'লে যাব, তাই মনে ক'রে কি ওর মুখটি অত শুকনো দেখাচ্ছে!" সুখ সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াও ছাপাইতে পারিল না।

সুশীলের অথচ এ সব বিষয়ে কোনমতেই আজ মন লাগিতেছিল না। মাতৃহীন সুশীল পিতার বড় আদরের ধন। ভুবনবাবুর নিজের একটা আদর্শ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, ছেলেরা শাসনে একেবারেই বিগড়াইয়া যায়, অতএব তাহাদের সতত আদর করিবে; কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য রাখিবে—তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দিকে। মিথ্যাবাক্যকথন এবং মিথ্যাচরণ না ঘটিতে পারিলেই শিশুজীবন চিরনিরাপদ হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা এবং আজীবন এই শিক্ষাতেই তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে "মানুষ" করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুশীলও এই অনুসারে পিতার সহিত কোন বিষয়ে লুকাচুরি করিতে কখন শিক্ষা করে নাই, এবং এ পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজনও কখন ঘটে নাই। কলিকাতাবাসী বালকের ছাত্রজীবন এমনই ঘড়ীর কাঁটার মত নিয়মতন্ত্রতায় গঠিত যে, তাহা হইতে এতটুকুও এদিক্ ওদিক্ সরিবার তাহার কখনই দরকার হয় না। আজ জীবনে এই প্রথমবার শুভেন্দুর পরামর্শের কুহকে পড়িয়া সুশীল পিতার নিকট কথা গোপন করিল এবং তাহাই তাহার বিবেককে ভীমরুলের হুলের মত কাঁটা বিধাইতেছিল।

অবশ্য সুশীলের সপক্ষ যুক্তিরও কিছু অভাব ছিল না। শুভেন্দু তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, ইহাকে মিথ্যাচরণ মনে করা সুশীলের নিছক কল্পনামাত্র। অপর কোন যথার্থ কারণ ইহার সঙ্গে নাই। যেহেতু, সুশীলের পিতা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এ বিষয়ে তিনি তাহাকে কোন প্রশ্নও করিতেছেন না, এবং সে-ও সে প্রশ্নের ভুল উত্তরও দিতেছে না। তবে তাহার ইহা মিথ্যাচরণ কিসে হইতে গেল? —কিসে যে হইতে গেল, শুভেন্দুর সে কথা বুঝিতে পারা সম্ভব ত ছিলই না, সুশীলেরও সমস্ত সত্তা এই গোপনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকিলেও সেটাকে ভাষা দিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিতে কতকটা তাহার অনভিজ্ঞতা ও কতকটা মানসিক দোর্ব্বল্য তাহাকে বাধা দিতেছিল। সে-ও, মনে না হউক, অন্ততঃ মুখেও মৌন রহিয়া এ মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাইয়া আত্মপ্রতারণার সূত্রপাত করিল। কিন্তু চিরদিনের শিক্ষাকে ত সহজে কেহ এড়াইয়া যাইতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে মনটা তাহার এমন সুখের দিনেও একান্ত নীরস, তিক্ত ও সুখলেশহীন হইয়া রহিল, আর পাছে কোনরূপ কূটপ্রশ্নে পড়িতে হয়, এই ভয়ে পিতার চির-ঈপ্সিত সঙ্গের আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক পিতার সান্নিধ্যকে সে যথাসাধ্যই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।—এ ঘটনাও সুশীলের জীবনে এই প্রথম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাকালে তরুর বিবাহ সাড়ম্বরে সমাধা হইয়া গেল কিন্তু রোশনাইএর আলো দিয়াও বরের কালো রঙ ঢাকা পড়ে নাই। বর দেখিয়া ঘরে পরে অনেকেই মুখ বাঁকাইলেন; কেহ কেহ আবার সেই বাঁকামুখে মন্তব্য করিলেন— "মেয়ে সেয়ানা আছে লো! জানে মনে, বড়লোক বিয়ে করলে হীরের পাশবালিসও পায়ে দিয়ে শুতে পারে। নাই বা হইলো বরের অঙ্গে রূপ, রূপোর ত আর তা' ব'লে তার অভাব নেই! তাই হলেই হলো: গায়ের রং চেপে যাবে।"

ইহা শুনিয়া এক জন স্বামিসোহাগিনী রূপসী ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব করিলেন, "তা' যা' বলিস্ আর যাই কোস্ বোন্! আমি বাবু হক কথা বল্‌বো: রূপো যতই কেন সিন্দুকে সিন্দুকে ঠাসা থাক, কি মেয়ে কি পুরুষ অঙ্গে যদি

একটু রূপই না রইল ত সকলি বাবু 'বেরথা' হলো। ওই যে কুল-আঁটির মতন মুক্তর মালা গলায় দুল্ছে, ও যদি বটঠাকুরের ছেলে—কি ওই ওঁর বন্ধুর ছেলে শুভঙ্কর গলায় ওঠে ত দেখবে, ওর না জেল্লা খুলে যাবে! আর এ'র গলায় মনে হচ্ছে যেন সেই 'কার' গলায় মতির মালা!"—

মহিলাকুল অনেকেই এই অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন উপমাটিকে স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে উপহাসের অজস্র হাসি হাসিয়া উঠিলেন এবং সে হাসি থামিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এমন সময় কর্ম্মব্যস্ত বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা সেইখান দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আনন্দস্মিতমুখে বলিয়া গেলেন, "ওলো, তোরা আমার ভুবনের জামাই দেখ্লি? তা বেটাছেলে, শ্যামবর্ণ রং একটু বটে, তাতে আর হয়েছে কি? মুখছিরিটুকুন্, বাপু, দিব্যি আছে!"

জ্যেঠাইমা'র মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই নাক সিঁটকাইয়া ঠোঁট উল্টাইলেন। তাঁহার পিছন ফিরিতে যেটুকু দেরি, তাহার পরই তাঁহাদের তীব্রভাষার ঝাঁজে ভুবনবাবুর নব জামাতার 'মুখছিরিটুকু'র সমস্ত শ্রীই প্রায় ঝলসিয়া গেল। ভুবনবাবুর ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "ও বল্তে হয়, তাই বলা। যখন ঘরের জামাই হচ্ছেন, তখন ওকথা না ব'লে আর কি বলা যাবে? তবে সত্যি কথা বল্তে হ'লে বাবু বল্তে হয় যে, মুখে 'ছিরি'টিরি ব'লে ত কোন জিনিষই দেখতে পেলেন না।"

ইঁহার আর এক জন জা বলিলেন,"সে কি লো, সেজদি! দেখতে পেলিনি কি বল্? কেন, দিদি! অমন খাঁদা নাক, অমন দুটি কোটরে ঢাকা চক্ষু আর অমন 'ট্যাকতোলা' চোড়া 'চৌরস গড়ের মাঠের মতন' প্রকাণ্ড কপাল রয়েছে, মুখে আর নেই কি?"

আর এক জন বলিলেন, "ওলো, ব্যাখ্যানা কর্চ্ছিস্ কি? বড় কপাল যে ভাগ্যবন্ত পুরুষের লক্ষণ। দেখ্ছিস্ না, তাই অমন কপালে-পুরুষ। পাঁচটা না ছ'টা পাশ দিয়েছে, আবার শুন্তে পাই নাকি খুব ভাল চাকরীও পেয়ে গেছে এই বয়েসে।"

"তার উপর অমন রূপেগুণে বৌ পেলে।"

মেয়ের খুড়ী একটুখানি চেপা হাসি হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, "তা হোক, ভাই, সে ত অনেকেরই হয়, তা ব'লে মুখের অর্দ্ধেকখানি কপাল কিন্তু ভগবান্ সব্বার জন্যেই তৈরি করেন না।"

বাসরঘরে সুরসিকা ঠান্দি বরের পাশে বসিয়া সুর করিয়া গানের ছন্দে সখেদে গাহিলেন- "হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!"

বর যতীন্দ্র দেখিতে সত্যসত্যই ভাল নহে। সংসার-শুদ্ধ সকলকেই যে ভাল হইতে হইবে, এমনও ত কোন কথা নাই। কেহ বা রূপে মন্দ, কেহ বা গুণে মন্দ, আবার কেহ কেহ রূপেগুণে সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কোথাও ঠিক উল্টাও ঘটে। যতীন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিতে বসিলে আরম্ভেই তাহাকে ফেল করিয়া বসিতে হয়; কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, বিদ্যা এবং বিনয়নম্রতা এ সকল গুণ নাকি কখন চামড়ার রঙের উপর নির্ভর করে না, সেই হেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছোট বড় ডিগ্রিধারী পরমপণ্ডিত সুচারু ছেলেটি এক দিকে কঠোর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বড় রকম মাহিয়ানার একটা উচ্চপদ এবং অপর পক্ষে সুবিজ্ঞ ভুবন-মোহনের নিকট হইতে সাধারণ-রূপা ও কন্যারত্ন এতদুভয়ই লাভ করিয়া বসিল। ভাগ্যবিধাতা তাহার অন্তর ও বাহির ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিতে কোথাও কোন কার্পণ্য দেখাইলেন না। আবার শুভদৃষ্টির সময় তরুণী তরুর সলজ্জ স্মিতমুখখানি পলকের মধ্যে দেখিয়া ফেলিয়া যতীন্দ্রের তরুণ চিত্ত আশার পুলকে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তরুর মুখে ত কোথাও অসন্তোষের ছায়া নাই! তাহা হইলে কুরূপ যতীন্দ্রের প্রতি তাহার মনে কোন বিরুদ্ধভাবের উদয় হয় নাই, নতুবা অমন মন্দমধুর হাসির ছটায় কখন ঐ দুইটি ক্ষুদ্র প্রবাল রক্ত ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত? গুরুজনের আদেশে যখন সে তাহার ভূমিলগ্ন অব-নত নেত্র দুইটি উঠাইয়া স্বামী যতীন্দ্রের মুখে বারেকের জন্য স্থাপন করিল, সেই পলকের মধ্যের চকিত দৃষ্টিটুকুর তলায় কি অপূর্ব্ব বরাভয় সে যে দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই সুখজড়িত বিপুল বিস্ময়ে তাহার যৌবনোন্মেষিত আশা-ভরা চিত্ত যেন মুহুর্মুহু সুখভরে নর্ত্তিত ও কম্পিত হইতেছিল। অন্তরে নিহিত সেই গভীর পুলকের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়া তাই সে ঠান্দির অনুযোগের উত্তরে সহাস্যমুখে জবাব দিতে পারিল,—

"যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর আহার,
কমলে কণ্টক হায় বিধান তাহার।"

ঠানদিও তেমনই! তিনিও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিমুখে কহিয়া উঠিলেন, "ঠিক বলেছ, ভাই! 'কমলে কণ্টক হায় বিধান তাহার!' ওলো ও সাবিত্রি! চপলা, বেলা! তোরা ওটা গানটান গা' না, লা। বলি সেই 'রাধাশ্যামের' গানটি গা দেখি, বেশ অক্ষরে অক্ষরে হুবহু মিলে যাবে এখন। ও মা, জানিসনে কি লো! অবাক কথা মা! আজকালকের ছুঁড়ীগুলো সব কি গো! রজনী সেন আর রবি ঠাকুরকে নিয়েই ওরা উন্মত্ত, আমাদের সেকেলে সব কত সুন্দর সুন্দর বাসর-জাগার গান ছিল, সে সব দেখছি তোদের হাতে প'ড়ে লোপ পেয়েই যাবে। নে, তা হ'লে আমিই না হয় তোদের বদলে গেয়ে দিচ্ছি। আমার এমন সুখের দিনে একটু গানও গাইব না? তা' দেখিস্, ভাই, শেষে যেন গলা শুনে হেসে বিষম খেয়ে মরিস্‌নে সব। আমাদের সেকালে অত গলা কলার ভাবনা ছিল না, বাড়ীতেই হোক, পাড়াতেই হোক, বর দেখলেই আমাদের গানে পেত, তা গলা থাক বা নাই থাক।"

"কই ঠানদি, গান গাও, বক্তৃতাই ত দিতে লাগলে।"

"এই যে গাচ্ছি লো, এই যে কলি, এসেছিস্, তুই ত গানটা জানিস্, আয় আমার সাথে গা' দেখি

'রাধাশ্যাম একাসনে মিলেছে ভাল।
মিলেছে ভাল রাধাশ্যাম সেজেছে ভাল
রাই আমাদের সোনার বরণ, শ্যাম চিকণ কাল'।"

গান শেষ হইলে সভামধ্যে একটা চাপা হাসির তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে দুই এক জন চাপা গলায় বলাবলি করিলেন, "তা ঠিকই হয়েছে বটে, 'রাই আমাদের সোনার বরণ, শ্যাম চিকণ কাল!' তা ঠিক।"

গান শেষ হইলে যতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "গান এমন প্রত্যক্ষভাবে কারও জীবনে দেখা দেবার সুযোগ কিন্তু সর্ব্বদা পায় না। না, ঠানদি?"

ঠানদি অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাকুক, সপ্রতিভ ভাবে হাসিয়াই উত্তর দিলেন, "তা হ'লে গানটা তোমার ভাল লেগেছে? দেখ ভাই, রাগটাগ করনি ত?"

সস্মিতমুখে যতীন্দ্র কহিল, "রাতকে যখন দিন করবার পথ জানা নাই, তখন রাগ ক'রে আর উপায় কি? ওই শ্রেণীর গান আপনাদের আর কতগুলি পুঁজি আছে?"

এবার ঠানদির পূর্ব্বেই তাঁহার পিছন হইতে এক জন আত্মপরিচয়গোপনকারিণী শাশুড়ী-সম্পর্কীয়া সকৌতুকে বলিয়া উঠিলেন—"কেন, শিখবে না কি?"

যতীন্দ্র পূর্ব্ববৎ হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "শিখতে চাইনে, তবে যাকে লক্ষ্য ক'রে আপনারা এই সমস্ত বিষবাণগুলি ঝাড়লেন, আজকের এত বড় পরীক্ষার দিনটায় প্রাণপণে সবাই মিলে একসঙ্গে আপনাদের সমস্ত চোখা চোখা শরসন্ধান ক'রে তাকে একেবারেই বিঁধে ফেলুন না? তার পর দেখা যাক্, এরও পরে তিনি নিজেকে খাড়া রাখতে পারেন কি না। তবেই বুঝবো, আমার কতখানি জোরকপাল, তবেই জানবো, উনি কত বড় বীর।"

এই হাসির সঙ্গে একত্র মিশ্রিত তীব্র ব্যঙ্গভরা কঠিন অনুযোগের কথা সেই বাসরঘরের অল্পবুদ্ধি মহিলামণ্ডলীর বুকে পড়িয়া তাহাদের চিত্তকেও যেন একসঙ্গে লজ্জায় শিহরিয়া তুলিল। সত্যই ত তরুর সাক্ষাতে এ আলোচনাটাকে এত-দূর অবধি গড়াইতে দেওয়াটা ভাল হয় নাই। তথাপি মুখে কি কেহ কখন নূতন বিবাহের বরের কাছে নিজেকে হার মানাইতে চায়? শ্যালীসম্পর্কীয়া কলিকা রোখ করিয়া বলিল, "তা যতীনবাবু! আমরা না হয় রাতকে দিন ক'রে ফেলেছি—'ওহে সুন্দর' ব'লে তানই ধরলেম, কিন্তু ওই যে হাতের পাশে হাতখানা রয়েছে, এ দুখানার তফাৎ কি আর তরুণী নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে না? পরের মুখে ঝালই খাওয়া যায়, পরের কথায় কি কালোকে সাদা দেখা চলে?"

কলির কথায় সকলের চক্ষু বর-কনের যুগল হস্তের উপর আসিয়া পড়িল এবং তরুলতা তৎক্ষণাৎ ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে নড়িয়া চড়িয়া নিজের সুগঠিত ও সুগৌর হাতখানাকে একেবারে কাপড়ের তলায় ঢাকা দিয়া ফেলিল।

তখন যতীন্দ্র সকৌতুক হাসিমুখে মুখ তুলিয়া তাহার আক্রমণকারিণীকে স্মিতহাস্যে কহিল, "এই আমার উত্তর শুনুন।"

কলিকাও তখন হাসিয়া ফেলিল; সহাস্যে বলিল, "তা হ'লে দ্বিতীয়বার গান্ধারীর অভিনয় করবে বোধ করি, তরু।"

এই সময় বিনতা নিজের দলবল লইয়া এই ঘরের দ্বারে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছিল, কথাগুলা তাহার কানে ঢুকিতেই সে সেইখান হইতেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা বুঝি তুমি জান না, কলিদি! দিদি বলেছিল যে, রূপ নাকি আবার একটা কিছু জিনিষ! গুণ থাকলেই হলো।"

কলি উচ্চহাস্যের সহিত কহিয়া উঠিল, "ওই শোন, ভাই প্রভু! তোমার গুণগ্রাহিণীর গুণের কথা শুনলে ত?"

যতীন্দ্র হাসিমুখে কহিল, "নিজেরাই শুনুন আর শিখুন। যেহেতু, এ বাড়ীর জামাইদের মধ্যে দেখলুম, আমার মত আফ্রিকাবাসী নাই হোক, তবু আরও দু'চার জন কালোও আছেন। তাঁদের পক্ষে কিছু সুবিধা হ'তে পারবে।"

তখন এই বয়সে অত বিবেচনা ও গুণগ্রাহিতার জন্য তরুর প্রশংসায় শতমুখ হইয়া পড়িয়া বাসরবাসিনীগণ পূর্ব্ব আলোচনাতে ইতি করিলেন এবং অবশেষে সকলেই যে তরুর সহিতই একমত, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রমাণ হইয়া গেল। তাহার পর যখন আপোষে কতকটা মিটমাট হইয়া গিয়া আসর কিছু নরম পড়িয়াছে, তখন ঠানদির দল নিরস্ত হইয়া শ্যালিকার দলকে গান শুনাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। তখন অর্গ্যানের ঢাকা খোলা এসরাজ বেহালা সেতারের সুর বাঁধার ধূম পড়িয়া গেল। যতীন্দ্রও তখন ভরাবুকে পার্শ্ববর্ত্তিনীর প্রতি একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে সঙ্গীত-সুধা পান করিতে মনোযোগী হইল। জীবনের প্রথম পরীক্ষা-সাগর সে সাঁতার দিয়া আসিয়াছে, কখন ফেল হয় নাই। জীবনের মধ্য-পরীক্ষাতেও ভাল হইলে হয় ত সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

শুচি ও অশুচি

'শর্ব্বনিবাসের মন্দিরে নব পুরোহিত মহোদয়,
করেন নিষ্ঠা শৌচাচারের অভিমান অতিশয়।
দিনে তিনবার স্নান ক'রে তিনি হন শুচি নিরমল,
ঘণ্টা ঘণ্টা দেয়ালে উঠানে ছিটান গঙ্গাজল;
মুখে বম্ বম্ হাতে জপমালা পরণে পট্টবাস
ললাটে রক্তচন্দন-লেখা দেখে মনে জাগে ত্রাস;
শুচিতার ত্রুটি দেখিলে রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হন
দেউল-সোপানে উঠিতে পায় না অস্নাত কোনো জন।
মন্দির-মাঝে পশিতে বসিতে পায় শুধু ব্রাহ্মণে
নীচ জাতি কোনো আসিতে পায় না মন্দির-প্রাঙ্গণে
একদা স্বপ্নে কহিলেন প্রভু, "পূজারী শ্রবণ কর,
কিছুদিন হ'তে মন্দির মোর অশুচি হ'তেছে বড়।"
স্বপ্নের কথা সকলেরে ডেকে শুনায়ে দিলেন ভোরে,
গঙ্গা-সলিলে মন্দিরতল ধুইলেন ভাল ক'রে।
কেউ ফুল তুলে চন্দন ঘষে কেউ ভোগ করে পাক
কেউ করে নৈবেদ্য রচনা কেউ বা বাজায় শাঁখ;
কেউ করে গৃহমার্জ্জনাকারী পরিচারকের কাজ,
শুনিল সবাই, শুনিয়া সবার মাথায় পড়িল বাজ।
কারেও শাসিয়া কারেও তাড়ায়ে কারে বা প্রহার করি
শুদ্ধির লাগি করিলেন হোম সারাটি দিবস ধরি;
নিজ হাতে ক'রে করিলেন তিনি মন্দির মার্জ্জনা
উঠিতে পারে না কার্পাস-বাসে মন্দিরে কোন জনা।
পাচক তাড়ায়ে গৃহিণী নিলেন ভোগ রাঁধিবার ভার,
তীর্থ-উদক আনিতে পূজারী গেলেন হরিদ্বার।
হরিদ্বারেতে পৌঁছিলে প্রভু স্বপ্ন দিলেন পুন
"নিষ্ঠা-আচার-গর্ব্বে অন্ধ মূঢ় ব্রাহ্মণ শুন'
এতদিন পরে মন্দিরে মোর অশুচিতা হ'লো দূর
তোমার পরশে অশুচি কিন্তু আমার তীর্থপুর,
মন্দির মোর হলো পবিত্র, লভিয়াছি সন্তোষ,
তীর্থে অশুচি করিয়া মথ জাগায়ো না মোর রোষ।"

শ্রীকালিদাস রায়।

ভক্তি ও মুক্তি

৬

আমার অস্তিত্ব আমার সুখের জন্য নহে, আমার অস্তিত্ব আমার দুঃখ মিটাইবার জন্যও নহে; কিন্তু, আমার অস্তিত্ব সেই বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের প্রীতির বা সেবার জন্য, এই অত্যুদার ভূমাত্মভাবই মানব-জীবনে ভক্তিময় শান্তিনিকেতনের স্থির ও দৃঢ় ভিত্তি, ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ ভক্তিলক্ষণে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" এই বিশেষণ পদের ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তির আর একটি বিশেষণ হইতেছে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"। এই বিশেষণ দ্বারা কি সূচিত হইতেছে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

কৃষ্ণানুশীলন বা শ্রীভগবানের সেবা জ্ঞান বা কর্ম্মের দ্বারা আবৃত হইলে, তাহা বিশুদ্ধ ভক্তি হইবে না। জ্ঞানাবৃত বা কর্ম্মাবৃত অনুরাগ কেন যে শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হয় না, এখন তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জ্ঞান যদি জীব ও ব্রহ্মের অভেদমাত্রকেই অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে ভক্তির আবরক বলা যায়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, আমার 'আমিত্ব' কল্পিত, বাস্তবিক আর কিছুই নহে। এইরূপ ঈশ্বরত্বও ব্রহ্মের উপর কল্পিত, আমার ও ঈশ্বরের বাস্তব সত্তা নাই; এক ব্রহ্মই বাস্তব সৎ; এই প্রকার যে অত্যন্তাভেদজ্ঞান, তাহা ভক্তির অনুকূল নহে। এই প্রকার জ্ঞান দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকিলে ভগবদ্ভজন সম্ভবপর নহে। এই প্রকার আত্যন্তিক অভেদজ্ঞান ভগবদ্ভজনের বিরোধী হইয়া থাকে, এই কারণে ভক্তের পক্ষে ইহা একান্ত পরিহরণীয়।

এই সিদ্ধান্তটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে; সুতরাং তাহারই আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রথমে বুঝিতে হইবে কিরূপ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রমাণ বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, যাহার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রমাণ। এই বিষয়ে সকল দার্শনিকেরই যে সম্মতি আছে, তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইয়া থাকে, ইহাও এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত বলিতে পারা যায়। চার্ব্বাক নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ যদিচ কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রকার মত যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ, অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার না করিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য সম্ভবপর হয় না। ইহা প্রত্যক্ষমাত্রেরই প্রামাণ্যবাদী চার্ব্বাককেও অঙ্গীকার করিতে হইবে। চার্ব্বাক যে প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া মানেন, সেই প্রত্যক্ষ কেন প্রমাণ হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, চার্ব্বাককেই যুক্তির উপন্যাস করিতেই হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে চার্ব্বাক অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, এই কথা তাঁহার শোভা পায় না। কারণ, যুক্তির দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করার নামই অনুমান; সুতরাং অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া তাঁহাকে মানিতেই হইবে। এইরূপে অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই দ্বিবিধ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিবিধ প্রমাণসাহায্যে আমরা যে সকল বস্তু জানিতে পারি, তাহা সকলই লৌকিক বা ব্যবহারিক। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমাদের নিকট যে সকল বস্তু প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাদেরই অস্তিত্ব এই প্রত্যক্ষ বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার প্রমাণ আছে, যাহার নাম শব্দ বা আগম। এই আগমপ্রমাণ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিবার অন্য কোন উপায় নাই।

এই আগম বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা ব্যবহারিক বস্তুও আমাদের প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। ইহা সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক বস্তুসিদ্ধির জন্য যে আগমপ্রমাণ অপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে সেই প্রকার আগমপ্রমাণ প্রকৃতপক্ষে লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এইরূপ আগমপ্রমাণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে।
অনুমানগতার্থত্বাৎ।"

(শব্দ ও সাদৃশ্য প্রতীতিমূলক উপমানকে পৃথক্ প্রমাণ রূপে অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ, এই দুইটি "তথা-কথিত" প্রমাণের সাহায্যে যে বস্তু বুঝা যায়, তাহা অনুমান-প্রমাণের বিষয় ছাড়া আর কিছুই নহে।)

এই অনুমান বা প্রত্যক্ষমূলক শব্দপ্রমাণ ভিন্ন আর এক জাতীয় শব্দপ্রমাণ আছে এবং সেই শব্দপ্রমাণ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝা যায় না বলিয়া শাস্ত্র ঈশ্বরকে 'ঔপনিষৎ' পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"
ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

নারদ সনৎকুমারকে বলিতেছেন, "আমি আপনার নিকট এই ঔপনিষৎ পুরুষের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

এই উপনিষৎ বা পরমার্থ বস্তুসাধক আগমপ্রমাণকে দার্শনিকগণ অপৌরুষেয় প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেন যে তাঁহারা ইহাকে অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা না বুঝিলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না, এই কারণে এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, শব্দ দুই প্রকার; —ধ্বনি ও বর্ণ। মানবের কণ্ঠ, তালু ও বক্ষঃ প্রভৃতির সাহায্যে যে শব্দ উৎপন্ন হয় না, তাহাকে ধ্বনি বলা যায়। আর যে শব্দের উৎপত্তি মানবের কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের সাহায্যেই হইয়া থাকে,তাহাকেই বর্ণ বলা যায়। স্বর ও ব্যঞ্জন-ভেদে ঐ বর্ণাত্মক শব্দ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। সেই বর্ণগুলি মিলিত হইয়া যথাক্রমে পদ, বাক্য, ও মহাবাক্যরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টিই যদি উপনিষৎ হয়, তাহা হইলে তাহা ত পুরুষ অর্থাৎ মানবের উচ্চারিত শব্দই হইল। মানব যাহা নিজে বুঝে বা কল্পনা করে, তাহা অপরকে বুঝাইবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রকার বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টির উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহাই যদি হইল সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, তবে উপনিষৎ বা ঈশ্বরতত্ত্ববোধক আগম-প্রমাণও পুরুষোচ্চারিত, সুতরাং তাহা অপৌরুষেয় হইবে কি প্রকারে? যদি বল, পুরুষ শব্দের অর্থ সংসারী জীব, (সংসারী জীবের উচ্চারিত শব্দই পৌরুষেয়) ঈশ্বর সংসারী জীব নহেন—এই কারণে তাঁহার উচ্চারিত শব্দরূপ যে উপনিষৎ, তাহা অপৌরুষেয় হইবে, তাহাতে বাধা কি?

নাস্তিক দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, এই প্রকার উক্তি ও যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেদের বা উপনিষদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ করা এবং তাহার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রমাণতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যেহেতু, এইরূপ করিলে অন্যোন্যাশ্রয়রূপ একটি গুরু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উপনিষদের প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইতেছে, আবার ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধি করিবার জন্য উপনিষদের প্রামাণ্য মানিতে হইতেছে; সুতরাং এইরূপ দোষযুক্ত যুক্তির দ্বারা আগমের অপৌরুষেয়ত্ব এবং তন্মূলক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্রই হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, নাস্তিক দার্শনিকগণের এই প্রকার আক্ষেপের নিরাকরণ করিবার জন্য আগমপ্রামাণ্যবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ কি বলিয়া থাকেন।

তাঁহারা বলেন—এই যে আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব বুঝিয়া থাকি, ইহা কি আমাদের যথার্থ জ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান, তাহা বুঝিবার উপায় কি বল দেখি? আমরা যাহা দেখি বা অনুমান করি বা শুনি, তাহা যে ভাবে আমাদের জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, সেই ভাব বা তত্ত্ব বাস্তব কি না, তাহা জানিবার উপায় কি? আমি পর্ব্বতের নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থিত যে শিখরকে উচ্চ বলিয়া বোধ করি, সেই শৃঙ্গকেই পর্ব্বতের উচ্চতর শৃঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তি নিম্ন বলিয়া বোধ করিয়া থাকে; আবার তাহার সমোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট তাহা উচ্চ ও নিম্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, কিন্তু সম বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে বাস্তবিকপক্ষে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ উচ্চ, নীচ বা সম এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকারের হইবে, তাহার নিরূপণ কে করিবে? একই বস্তু উচ্চ, নীচ ও সম হইতে পারে না; সুতরাং বলিতে হইবে, সেই শৃঙ্গ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উচ্চ, আবার অন্যের পক্ষে নীচ, এইরূপ অপর এক জনের পক্ষে সম। বাস্তবপক্ষে সে কিন্তু উচ্চও নহে, নীচও নহে, সমও নহে। আমার পক্ষে তাহার উচ্চতা ব্যবহারিক, শ্যামের পক্ষে তাহার নীচতাই

ব্যবহারিক, সেইরূপ রামের পক্ষে তাহার সমস্তাইও ব্যবহারিক। এই ভাবের ব্যবহারিক তত্ত্বই আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল ব্যবহারিক স্বরূপের মধ্যে একটা অপরিবর্ত্তনশীল পারমার্থিক কোন এক স্বভাবাক্রান্ত কিছু আছে, তাহা আমরা কোন প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়া থাকি, তাহারও ত নির্ণয় করা প্রয়োজন। আর বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের ভোগ্য বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি আমাদের রুচি, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয়ের প্রভাবে প্রত্যেকেরই নিকটে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীত হইয়া থাকে ও হইবারই ত কথা। কারণ, প্রমাতার বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রমাণেরও বৈলক্ষণ্য হওয়াই উচিত। প্রমাণের বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রমারও বৈলক্ষণ্য স্বতঃসিদ্ধ। প্রমার বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রমেয় বস্তুর ভাববৈলক্ষণ্যও অপরিহরণীয়। এই যে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমা ও প্রমেয়ের পরস্পরসাপেক্ষ বৈলক্ষণ্য, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বানুভবসংবেদ্য। তাহার অপলাপ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। শরতের বিমল স্নিগ্ধ নীলাকাশে সমুদিত রজতধবল পূর্ণচন্দ্রের দিগন্তপ্রসারিণী মধুর জ্যোৎস্নার শান্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া যখন পাপিয়ার মর্ম্মস্পর্শিনী কলকাকলী সুষুপ্তির আবেশে অলস প্রাণিবৃন্দের নয়নে, শ্রবণে ও অন্তঃকরণে আনন্দচঞ্চল সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ জাগাইয়া তুলে, তখন তাহা সুখের বিলাস-বিহ্বল যুবক ও যুবতীর হৃদয়ে মধুরতাময় বলিয়া প্রতীত হইলেও বিরহীর হৃদয়ে দহনজ্বালাবর্ষীর ন্যায় দুঃখময় বলিয়াই আস্বাদিত হয়। আবার সংসারবিরক্ত শান্তহৃদয় সমদর্শীর নিকট তাহাই শান্তিময় প্রবাহের চিরমনোহর উৎস বলিয়াই অনুভূত হয়। এই একই প্রকারের সৌন্দর্য্যের অনুপম বিবর্ত্তের যে অনুভূতিগত বৈলক্ষণ্য, তাহা যে প্রমাতার বৈলক্ষণ্য প্রসূত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহারই বিবরণ করিতে যাইয়া বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন

> কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্যমেকস্যাং প্রমদাতনৌ
>
> পরিব্রাড় কামুকশুনামিতি তিস্রো বিকল্পনাঃ॥

মদিরার তীব্রমদাবেশে লুপ্তচেতনা রাজমার্গে নিপতিতা একটি বারবনিতাকে দেখিয়া বিস্মিতহৃদয়ে নির্নিমেষনয়নে সৌন্দর্য্যানুভবে বিভোরপ্রাণ এক জন যুবক তাহার ... রণের অপেক্ষায় বিশ্বস্ত প্রহরীর কার্য্য করিতেছে— দাঁড়াইয়া একটা মাংসলোলুপ কুক্কুর তাহাকে দৈবপ্র... ভক্ষ্য বিবেচনা করিয়া রসনা-পরিতৃপ্তির শুভ সুযোগ অ... করিতেছে, আর সেই পথের পার্শ্ব দিয়া এক জন বিরক্তপ্র... শ্রমণক যাইতে যাইতে দেখিতে পাইয়া তাহাকে এক প্র... "জীবিত শব" বিবেচনায় উপেক্ষার সহিত অতিক্রমণ করি... চলিয়া যাইতেছে; ইহাই হইল লৌকিক প্রমাণের বি... পরিণতি। ইহারই নাম ত্রিবিধ বিকল্পনা। লৌকিক প্রমা... এই প্রকার প্রমাতৃসাপেক্ষ বৈচিত্র্যের এইরূপ অসংখ্য নিদর্শন, পর্য্যবেক্ষণশীল বিবেকীর নিকট অহরহঃই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু অবিবেকী প্রমাতার নিকট এই বৈচিত্র্যের স্পষ্ট অনুভূতি সম্ভবপর নহে, সে দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে আত্মাভিমানের চশমা পরিয়া যাহা কিছু দেখিয়া থাকে, তাহারই সংস্কারানুসারী বিকল্পনিচয়কে যথার্থানুভব বলিয়া বোধ করে ও তদনুসারে প্রাপঞ্চিক বস্তুনিবহের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই ব্যবহারিক সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মূল কারণ হইতেছে দেহাত্মাভিমান ও তন্মূলক আত্মার কল্পিত প্রমাতৃভাব এই লৌকিক প্রমাতৃভাব মানবের যতদিন নিবৃত্ত না হয়, ততদিন তাহার বাস্তব সৎপদার্থ দর্শনে অধিকার জন্মে না ইহাই হইল অধ্যাত্মবিদ দার্শনিকগণের লৌকিক প্রমাণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত।

এই জাতীয় লৌকিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সুখের ও দুঃখের উত্তেজনাপূর্ণ ব্যবহার-পরম্পরা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও সংসারের শেষদিন পর্য্যন্ত চলিবে; কিন্তু অবিশ্রান্ত বিপদের কশাঘাতে এবং সর্ব্বশক্তিমান কালের প্রাতিকূল্যের প্রভাবে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতীকারচেষ্টার অকৃতকার্য্যতায় মানবের কল্পিত কর্ত্তৃত্বের অভিমান যখন বিদূরিত হইতে আরম্ভ করে,—তখন তাহার চিত্তদর্পণে সুচিরসঞ্চিত দেহেন্দ্রিয়াধ্যাস আবরক ধূলিরাশি সুপ্ত প্রবুদ্ধ বিবেক-মারুতের উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রবল হিল্লোলে অপসারিত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় সদ্গুরুর কৃপায় সাধুসঙ্গের প্রভাবে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ও দৃঢ়তার সহিত অবলম্বিত সাধনসামগ্রীর প্রভাবে তাহার সঙ্কীর্ণ প্রমাতৃভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে—পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মভাবের

আবরণ দূর হইয়া যায়। এই প্রকার সৌভাগ্যলব্ধ অবস্থায় হৃদয়ে যে পরমার্থবস্তুপ্রবণ নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি স্বতঃই উদিত হয়, তাহাকেই যোগিগণ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ইহাকেই বোধিচিত্ত বলিয়া থাকেন। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বা বোধিচিত্তে ব্যবহারাতীত অথচ সারসত্যভূত বস্তুনিচয় প্রতিভাত হয়। এই প্রকার অবস্থায় উপনীত মানবের বস্তুদর্শনকে পৌরুষেয় দর্শন বলা যায় না। ইহাই হইল পরমার্থদৃষ্টি। এই পরমার্থদৃষ্টি হইতে সমুৎপন্ন যে ভাষা বা বাক্যসমূহ, তাহাই অপৌরুষেয় বাক্য বা সমাধিভাষা।

এই অপৌরুষেয় বাক্য কখনও ব্যভিচারী হয় না, ইহাই স্বতঃ প্রমাণ-পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই স্বতঃ প্রমাণভূত-বাক্যনিবহেরই নাম শ্রুতি। সারসত্যের সংবাদ এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারাই মানব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সম্পদ, শান্তি ও অনাবিল আনন্দের ইহাই অক্ষয় উৎস। ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে ইহার সন্ধান মরণধর্ম্মী মানবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এই অপৌরুষেয় দর্শন-প্রাপ্ত মানবের বা ঋষির সমাধিপূত হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া তাহার বাক্‌শক্তিকে নিয়মিত করিয়া শ্রুতিবাক্য-রূপে প্রকাশিত হইয়া দুঃখনিমগ্ন জীবগণের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন; তখন সাধনাসিদ্ধ পুরুষের সেই ভাষাই আমাদিগকে বলিয়া দেয় —

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মার (সমাধিপূত হৃদয়ে) বেদসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই স্বয়ংপ্রকাশ ও ক্রীড়নশীল এবং আপনা হইতেই বুদ্ধিতে আবির্ভাবী পরমেশ্বরকে আমি শরণ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি।

এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিই ঈশ্বরতত্ত্ব-নির্ণয়ে অসাধারণ প্রমাণ। প্রাকৃত বা মায়িক বস্তুনিচয় যাহার সাহায্যে প্রতীত হয়, পারমার্থিক সদ্‌বস্তুকে যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সেই লৌকিক বা ব্যবহারিক প্রমাণ কখনই ঈশ্বরতত্ত্বকে প্রকাশিত করিতে পারে না। তাহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, যথা —

"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।"

যিনি আদিকবিদর্শী ব্রহ্মাকে তদীয় সমাধিপূত হৃদয়ের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন, লৌকিক প্রমাণের নির্ভরশীল পণ্ডিতগণ যাহাকে বুঝিতে সমর্থ হয়েন না।

তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উক্ত শ্রুতি বলিতেছে —

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

তাঁহা হইতে পৃথক কোন কার্য্যই নাই, আবার সেই কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার কোন পৃথক সাধনও নাই; কেহই তাঁহার সদৃশ নহে বা তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার স্বরূপভূত শক্তি যে কত প্রকার, তাহা বলিবার উপায় নাই এবং সেই শক্তিসমূহও প্রাকৃতশক্তি হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ; সুতরাং তাহা পরা, তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক, তাঁহার বল অনন্তসিদ্ধ এবং ক্রিয়া বা জগদুৎপাদন অনুকূল উন্মেষও অকৃত্রিম।

এই শ্রুতিতে যে ভগবানের স্বরূপভূত পরাশক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটু বিশদ পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং অগ্রে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে —

শক্তি কারণের ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ধর্ম্ম কারণ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক, ইহা বলা যায় না। আবার তাহা যে কারণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাও বলা যায় না। তাহা কারণ হইতে ভিন্নও নহে, কারণ হইতে অভিন্নও নহে — তাহার ঠিক স্বভাবটি কি, তাহা আমরা জানি না, বুঝাইবার সামর্থ্যও কাহারও নাই; অথচ তাহার স্বরূপ মানি না, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

এই জন্যই শক্তিবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন —

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যা তর্কগোচরাঃ।"

সকল বস্তুর যে সকল শক্তি লোকপ্রথিত আছে, তাহা অচিন্ত্য এবং তাহা তর্কের গোচর নহে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও উত্তাপ এই কয়টি বস্তুতে জগতের সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষের উৎপত্তির অনুকূল শক্তি নিহিত আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এক মৃত্তিকা লইয়া দেখা যাউক, সেই শক্তির স্বরূপ কি? তাহাতে তূলার বীজ বপন কর, যে তূলা উৎপন্ন হইবে, তাহার স্বভাব হইল কোমলতা; তাহাতে কণ্টকের বীজ বপন কর, যে কণ্টক উৎপন্ন হইবে, তাহার স্বভাব হইবে কঠিনতা; এইরূপ জল, বায়ু ও উত্তাপ একই প্রকার হইলেও একই সময়ে একই অবস্থায় তাহাদের কার্য্যে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ কঠোরতা ও কোমলতা আসিল কোথা হইতে? যদি মৃত্তিকা প্রভৃতি সাধারণ কারণ হইলেও অসাধারণ কারণ যে বিভিন্ন প্রকৃতির বীজসমূহ, তাহাদেরই স্বতঃসিদ্ধ এক রূপ প্রকৃতি অনুসারে তূলায় কোমলতা ও কণ্টকে কাঠিন্য আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও নিস্তার নাই। কারণ, সেই বীজসমূহও ত মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে; একই প্রকারের মাটী হইতে তূলার বীজ ও কণ্টকের বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সকলেই দেখিয়া থাকেন, অথচ সেই বীজের কোনটিতে কাঠিন্যের শক্তি নিহিত হয়, আবার কাহাতেও কোমলতার শক্তি নিহিত হয়, ইহার হেতু কি, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

আরও দেখ, একই মৃত্তিকা হইতে ধান্য উৎপন্ন হইল, তাহা ভক্ষণ করিতেছে ছাগ, মেষ, গো, মহিষ প্রভৃতি নানা জীব। সেই ধান্য ছাগের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া ছাগের দেহের উপযোগী চর্ম্ম, অস্থি, কেশ প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হইল আবার তাহাই মেষ, গো প্রভৃতি পশুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ অস্থি, চর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হইল। এই বৈচিত্র্যময় কার্য্যসমূহের উপাদান কিন্তু সেই একই মাটী বা মাটী হইতে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য। এই বিচিত্র কার্য্য-নির্ম্মাণের অনুকূল শক্তি একই রূপ কারণে নিহিত আছে; তাহার সত্তা সেই একই কারণের সত্তার সহিত অনুস্যূত, সুতরাং তাহাকে ঐ কারণ হইতে পৃথক্ বলা যায় না। অথচ কারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ একরূপতায় তাহার বিচিত্ররূপতার সামঞ্জস্য করা যাইতেছে না বলিয়া তাহাকে কারণ হইতে অভিন্নও বলা যায় না। সুতরাং শক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কারণের এই বিচিত্র-স্বভাবতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে একরূপতা ও নানারূপতা একেরই স্বভাব বলিয়া বাধ্য হইয়া মানিতে হয়, আর তখন মানুষের লৌকিক বিচারশক্তি বস্তুনিরূপণ ব্যাপারে স্বতঃই প্রতিহত হইয়া যায়।

এই পরিচ্ছিন্ন বিচারশক্তি লইয়া অপরিচ্ছিন্ন অলৌকিক শক্তিনিবহের একীভূত কেন্দ্র জগৎকারণ জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য মানবের প্রয়াস-পরম্পরা যে অজ্ঞতামূলক অভিমানের বিজৃম্ভণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

তাই দার্শনিক-শিরোমণি বিদ্যারণ্য মুনি স্বীয় পঞ্চদশী নামক সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তপ্রকরণ গ্রন্থে শক্তিতত্ত্বনিরূপণ প্রসঙ্গে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন—

"নিরূপয়িতুমারব্ধে পণ্ডিতৈঃ সকলৈরপি।

অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥"

জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া এই কার্য্য-কারণভাবশক্তিতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেও কয়েক কক্ষা অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে বস্তুতত্ত্বের আবরক অজ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের বিচারশক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া দেয়, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষের সৌজন্যে।

যুগলরূপ

"যুগলরূপে যায় সে বয়ে প্রেমের তরঙ্গ।"

লুপ্তনগরের কাহিনী

প্রাচীনযুগে মরুসমুদ্রের দক্ষিণে শৈলমালাবেষ্টিত একটি রমণীয় নগর ছিল। এই 'রক্তগোলাপের' মত সুদৃশ্য পার্ব্বত্য নগরের নাম পেট্রা। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কোন আকস্মিক বিপৎপাতে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া পেট্রার নাম শুধু জনশ্রুতিতেই পর্য্যবসিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুর্খা-র্ডের চেষ্টায় এই লুপ্তনগর পুনরাবিষ্কৃত হয়। কিন্তু উহার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। রসিটা ফর্বেস্ নাম্নী একজন ভ্রমণকারিণী এই নগরটি স্বয়ং দেখিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টা ও যত্নের ফলে তিনি এই সুদুর্গম প্রদেশে উপনীত হয়েন। এই নবাবিষ্কৃত নগরটি দেখিয়া তিনি উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জুন মাসের 'গ্রাফিক' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

পেট্রা'র ধ্বংসক্ষেত্রে বন্ধুবর্গসহ রসিটা ফর্বেস্।

হেজ্জিয়াসের অন্তর্গত মা-য়ান্ হইতে মোটরে চড়িয়া, পরে অশ্বারোহণে একদিনে পেট্রায় পৌঁছান সম্ভবপর। তিনি এই উপায়েই লুপ্তনগরের প্রান্তদেশে উপনীত হয়েন। পথটি সুগম নহে, পাষাণখণ্ডবহুল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিতে রসিটা ফর্বেসের মোটর বহুবার বাধা পাইয়াছিল। অবশেষে এক স্থানে মোটরের গতিরোধ হইলে, ভ্রমণকারীর দল অশ্বারোহণে গন্তব্যস্থানে গমন করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা বিলুপ্ত বহু গ্রামের নিদর্শন পাইয়াছিলেন। অবশেষে একটি শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া তাঁহারা ওয়াদি-এল্ আরাবীন স্রোতোধারা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়েন। এই বিশালকায় নদ মরুসমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া হেব্রনে গিয়া পড়িয়াছে। নদের তীরদেশে বীসে বা অদ্রিমালা গাঢ় নীল মেঘপুঞ্জের মত শোভা পাইতেছে। উহার বহু নিম্নে লোহিতবর্ণের শৈলপুঞ্জের শিখরসমূহ উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান। এই তরঙ্গায়িত স্থানটিকে উচ্চ স্থান হইতে দেখিলেই সহসা যেন মনে হইবে, বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা অকস্মাৎ মন্ত্রবলে পাষাণে পরিণত হইয়া আছে।

উল্লিখিত লোহিত শৈলমালার অন্তরালে পেট্রানগর অবস্থিত। প্রাচীন যুগে নাবাতীয়গণ উহাকে 'সেলা' নামে অভিহিত করিত। এক সময়ে আরিটাস তাহাদের রাজা ছিলেন। এই আরিটাসের কন্যার সহিত হেরদের পরিণয় হইয়াছিল। হেরোদিয়াসের জন্য হেরদ তাঁহার উল্লিখিত পত্নীকে পরে পরিত্যাগও করিয়াছিলেন। নাবাতীয়গণ প্রথমতঃ সিনাই ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী মরুপ্রান্তরে, বাণিজ্যযাত্রীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া জীবনযাপন করিত। ইতিহাসে এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, সেই যুগের সাবিয়ান্ জাতিও উহাদের সহিত যোগ দিত। এই সাবিয়ান্‌গণ মিশর রাজশক্তির অধীন ছিল। পরবর্ত্তী কালে নাবাতীয়গণ লুণ্ঠনকার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। প্যালেষ্টাইনের নানা নগর ও

বন্দরে সে সময়ে চন্দনকাষ্ঠ, নানাপ্রকার মসলা, হস্তি-দন্ত প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। নাবাতীয়গণ ঐ সকল দ্রব্য কিনিয়া প্যালেষ্টাইনে ব্যবসা চালাইত।

ইতিহাসপাঠে জানা যায়, পেট্রা বা সেলা প্রাচীন যুগের সুসভ্য রাজ্যসমূহের প্রান্তদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া পারস্য, ব্যাবিলন ও ম্যাসিডোনিয়ার উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া লোক এই রহস্যময় নগরের অভ্যন্তরের কোনও সংবাদই পায় নাই। সকলেই শুধু কানাকানি করিত, কত ধনরত্ন বা ঐশ্বর্য্য সে দুর্ভেদ্য, লোহিত শৈলমালার অন্তরাল-স্থিত নগরে আছে, তাহার কোনও তত্ত্ব বহি-র্জগতের কেহ কখনও পায় নাই। পরিশেষে উহা শুধু কিংবদন্তীতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বহু নর-পতি বিপুল সেনাবলসহ এই নগর অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বভাবতঃ পেট্রা এমনই সুরক্ষিত ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত যে, প্রতিবারেই অভিযানকারী নরপতিকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ 'দী'র মন্দির।

ধনৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেট্রার আরব অধি-বাসীরা তদানীন্তন রাজনৈতিক ব্যাপারের অভিনয়ে বড় বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। নাবাতীয়গণের দ্বারাই মিশররাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার লোহিত সমুদ্রস্থিত রণপোতবহর ধ্বংস হইয়া যায়। মিশরের সহিতও পেট্রার সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাস হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ১০৬ খৃষ্টাব্দে পেট্রা রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রোমকরাজ ট্রাজান সেই সময়েই পেট্রাতে রোমক প্রভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। রোমের কলা-শিল্প, ধর্ম্মপ্রভাব সবই পেট্রানগরের স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতিতে বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে পেট্রায় বড় বড় দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পেট্রার প্রবেশপথে কোনও পর্ব্বতগুহায় রসিটার শয়নাগার।

রসিটা ফর্বেস্ এই সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, পেট্রার যে সকল মন্দির ও সৌধ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাতে রোমক ও মিশরীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ এমনভাবে গঠিত,

সমাধিক্ষেত্র, পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া সমাধিগৃহসমূহ বিনির্ম্মিত।

পাহাড়, তাহাতে মন্দির ও সমাধিগৃহ; মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া ক্রমে নগরের দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও ফলের বাগানগুলিকে রসসিক্ত করিতে থাকে। এই সঙ্কীর্ণ পথই প্রত্যেক মন্দির ও সমাধিগৃহের পার্শ্বে বিদ্যমান রসিটা ফর্ব্বেস্ লিখিয়াছেন, "দীর্ঘ এক মাইল এইরূপ দৃশ্যের পর দৃশ্য বিদ্যমান। উভয় পার্শ্বস্থ সমুন্নত শৈলশিখর যেন গগন স্পর্শ করিতেছে--আলোকরেখার প্রবেশের পথ যেন নাই। প্রত্যেক বাঁকের নিকটে আসিলেই দর্শকের নয়ন বর্ণবৈচিত্র্যের প্রভাবে মুগ্ধ হইবে! যাহার বিন্দুমাত্র কল্পনাশক্তি নাই, তিনিও যদি একবার দৃষ্টি তুলিয়া ঊর্দ্ধপানে আলোকের প্রত্যাশায় নেত্রপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহারও মনে হইবে, অকস্মাৎ তিনি যেন কোনও প্রাচীনযুগের দেবনিবাসে উপনীত হইয়াছেন। এ স্থানে সেই যুগে ভক্তগণ শুধু বলির উপচারই নিবেদন করিত- উৎসৃষ্ট পশুর রক্তরাগ এখনও যেন পাষাণে পাষাণে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে! উভয় পার্শ্বের শৈলশৃঙ্গগুলি প্রায় ৬ শত ফুট উচ্চ—মধ্যস্থ স্থানের পরিসর সামান্য—দর্শক বাহুযুগল প্রসারিত করিলে উভয় পার্শ্বের পাহাড় স্পর্শ করিতে পারেন। সেই সঙ্কীর্ণ পথে স্রোতোধারা বহিতেছে। লোহিতাভ পাহাড়ের অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল আরণ্যগুল্ম, তাহাতে রক্তবর্ণ কুসুমপুঞ্জের শোভা কি বিচিত্র, কি মনোরম!

"গিরিপথের মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সহসা সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায়। যেন মনে হইবে, পাহাড় কাটিয়া মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। গুহার ভিতরে মন্দিরের কক্ষগুলি একের পর আর একটি নির্ম্মিত। সমাধিক্ষেত্রও ঐরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত। উল্লিখিত মন্দির ও সমাধিগৃহে যাইতে হইলে সঙ্কীর্ণ স্রোতোধারা অতিক্রম করিতে হয়। অর্থাৎ দুই পার্শ্বে উন্নতচূড়

আরব রক্ষিপরিবৃত রসিটা ফর্ব্বেস্।

প্রাচীন যুগের দেবমন্দির,—নিহত পশুরক্তে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণ ধৌত হইত।
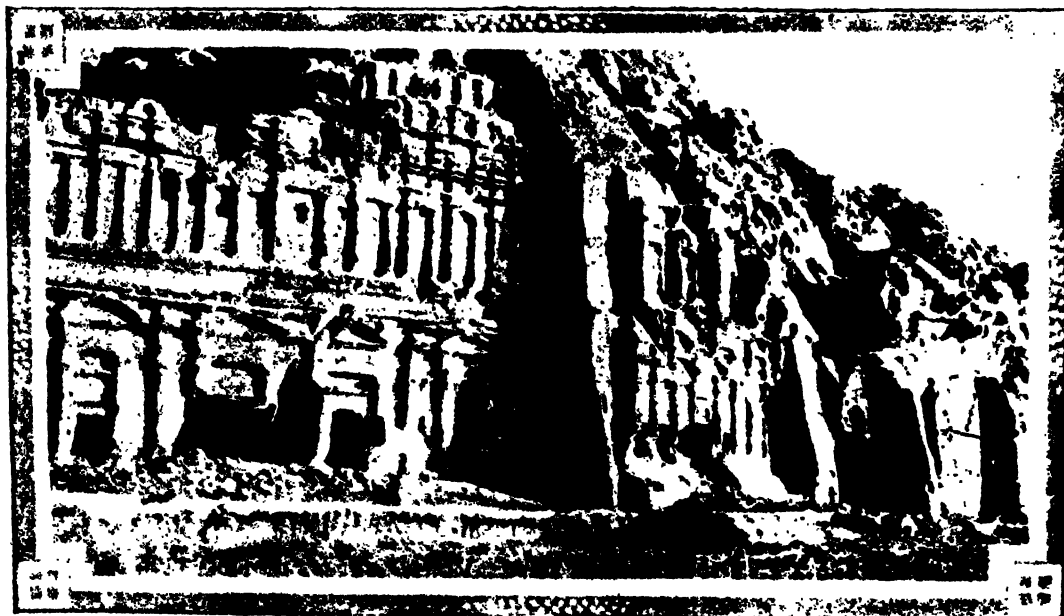
রোমকযুগের মন্দির—দেখিলেই মনে হইবে, যেন পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত।

গিরিবর্ত্ম যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে 'আইসিসে'র মন্দির। পেট্রার যাবতীয় স্মৃতিসৌধের মধ্যে 'পান্থ-মন্দির'ই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়। প্রাচীনযুগে নাবাতীয় মরুযাত্রীর দল দেশভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে দেবতার আশীর্ব্বাদলাভের অভিপ্রায়ে এই মন্দিরে সমবেত হইত। তৃতীয় শতাব্দীতে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উল্লিখিত মন্দিরের উপরিভাগে প্রাচীনতম যুগের আর একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বলিদানের স্থানে উপনীত হইতে হয়। এডমের পুরোহিতগণ এই স্থানে সে যুগের প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে দেবতার তৃপ্তির জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেন। পাহাড়ের শীর্ষদেশ কাটিয়া সমতল বেদীতে পরিণত, তথায় প্রধান পুরোহিতের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। উৎসৃষ্ট পশুকে স্নান করাইবার জন্য জলকুণ্ড, জল-নির্গমনের প্রণালী, এ সকল ব্যবস্থাও তথায় এখনও বিদ্যমান। সন্নিকটে বড় বড় গহ্বর! বুঝা গেল, এই সকল গহ্বরে দেবতাকে অর্চ্চনা করিবার জন্য পবিত্র গন্ধতৈলের পাত্রগুলি রক্ষিত হইত। জল্লাদের খড়্গা যে পাষাণে শাণিত হইত, তাহারও চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

"পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে পৌরাণিক যুগের আরবের সমাধিসৌধ। এই স্থান হইতে ওয়াদি এল্-আরাবীর স্রোতোধারা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু মধুচক্রের ন্যায় গুহানিচয় প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গে দৃষ্টিগোচর হইবে। শুধু তাহাই নহে, সমাধিসৌধগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে বিদ্যমান। ওয়াদিমুসা বেদুইনগণ শীতকালে পেট্রার এই সকল গুহায় আশ্রয় লইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তাহারা পশুপালসহ দূরবর্ত্তী প্রান্তরে চলিয়া যায়।"

রমিটা ফ্রেসের প্রদত্ত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগের সেলা (পেট্রা) নগরের অধিবাসীদিগের সমাধি ব্যবস্থায় একটা বৈচিত্র্য ছিল। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমিতে নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহার দৈর্ঘ্য ২ বা ৩ মাইলের অধিক নহে। নগরের অনতিদূরেই সমাধিক্ষেত্র। পাহাড় কাটিয়া সমাধিগৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত। আবার একটি সমাধিগৃহের উপরে আর একটি সমাধিগৃহ। প্রত্যেক সমাধিগৃহ যেন একটি বাসভবন। সম্ভবতঃ গৃহস্বামী সপরিবারে সমাধিগৃহসংলগ্ন অন্যান্য কক্ষে বসবাস করিত। ধনী ও দরিদ্র, সকলের পক্ষেই, বোধ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। শুধু ধনীর সমাধিগৃহগুলি প্রশস্ত, সুদৃশ্য, এইমাত্র পার্থক্য। বড় বড় সমাধির পার্শ্বে অনেকগুলি করিয়া কক্ষ, প্রত্যেক কক্ষে চূর্ণবালির কাম। এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবার দ্বারও বিদ্যমান।

ওয়াদিমুসা উপত্যকাভূমি; এই স্থানে পেট্রার ধ্বংসাবশেষ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত-সমিতির আদর্শ ব্যর্থ হ'ল কেন?

এই পরিচ্ছেদে যা' লিখ্‌তে যাচ্ছি, তা' "ধান ভানতে শিবের গীত" ব'লে অনেকের মনে হ'তে পারে, তেমনও লিখছি এবং পরেও লিখ্‌বার আশা রাখি; কারণ, ইহা বাদ দিলে এরূপ প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন কিছু থাক্‌তে পারে ব'লে মনে হয় না। যাই হ'ক্, যত সংক্ষেপে পারি, আমার বক্তব্য শেষ করতে চেষ্টা করব।

আমাদের গুপ্ত সমিতির আদর্শ ছিল এ দেশকে স্বাধীন করা। পূর্ব্বেই বলেছি, এই স্বাধীনতা মানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আমাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণের অভাব আছে, যা' এই প্রকার স্বাধীনতা শুধু নয়, কোন প্রকার স্বাধীনতা লাভের পক্ষে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ক'রে রেখেছে। এ কথা স্বীকার করা নেহাৎ কষ্টদায়ক হ'লেও, অস্বীকার করবার উপায় নাই; কারণ, আমাদের চারিত্রবলের অভাব না থাকলে আমরা আজও প্রায় সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন হয়ে আছি কেন? আরও দুঃখের সহিত স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, কোনও দিন যে আমরা স্বাধীন হ'তে পারি, তার সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ের ধারণা, সেকালে করতে পারলেও এই সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর আমরা এখন আর কল্পনাতেও ক'রে উঠতে পারি না। তাই যাদুকরের যাদু, দেবতার লীলা বা আদেশ, অথবা দুষ্কৃতের দমনের জন্য অবতাররূপে স্বয়ং ভগবানের সম্ভব হওয়ার প্রতিশ্রুতির উপর ঐকান্তিক নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই।

যাই হ'ক্, আমাদের স্বভাব নূতন ভাব গ্রহণে অক্ষম হয়ে গেছে। অথবা এ কথা বলা যেতে পারে যে, এ দেশের সাধারণ লোক বিশেষ কোন অভাব অনুভব করবার শক্তি হারিয়েছে, কিংবা তীব্র দুঃখ অনুভব করবার এবং অধিকতর সুখ আকাঙ্ক্ষা করবার শক্তি তাদের নষ্ট হয়ে গেছে: ইহাই আমাদের আদর্শের ব্যর্থতার বিশিষ্ট কারণ। ইহাই এখন আমাদের আলোচ্য।

আমাদের দেশে নূতন কোন ভাব বা আদর্শ প্রবর্ত্তন করবার প্রচেষ্টা (movement) বা আন্দোলন গৌণভাবে এক আধটুকু সার্থক হ'লেও মুখ্যভাবে মোটের উপর যুগে যুগে প্রায় ব্যর্থ হয়ে আসছে। এ কথা আমাদের দেশের সাধারণ লোক অর্থাৎ শূদ্র ও শূদ্রেতর সম্প্রদায়ের প্রতিই বিশেষভাবে খাটে।

আমরা দেশ বা সমাজ বলতে সাধারণ লোককেই বুঝি। "তথাকথিত" সভ্যাগণ থেকে আজ অবধি নিছক তাদেরই অবস্থার উন্নতি করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা কখনও হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও বোধ হয় প্রমাণাভাব। উত্তরোত্তর তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার চেষ্টাই চিরকাল সফল হয়ে আসছে। কিন্তু, কোন অবতার, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রচেষ্টায় তাদের সেই চিরবন্ধন স্থায়িভাবে একটুও কখন মোচিত হয়েছিল, তা'র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যে নাই, তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। এমন কি, সে অমানুষিক বন্ধন যে কখনও একটু শিথিল হয়েছিল, তা'ও বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু, জগতের সবই পরিবর্ত্তনশীল ব'লে সেই শূদ্র বা শূদ্রেতর সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন মন্দই হ'ক্ বা ভালই হ'ক, সর্ব্বদা ঘটে আসছে: কারও চেষ্টার অপেক্ষা রাখেনি। সে কেবল কালের চক্রে ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপেই সাধিত হয়েছে।

অথচ এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, কোন দেশে কোন প্রচেষ্টা কখনও হয় ত পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ, সকল প্রচেষ্টারই বিলম্বে বা অনতিবিলম্বে প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে প্রচেষ্টার গতিরোধ করে বা গতির মুখ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রচেষ্টার যে প্রতিক্রিয়া আসে, তা'র বেগ এমন প্রচণ্ড হয় যে, গন্তব্যপথ থেকে ত তা'কে বিচলিত করেই, তা'র উপর সে প্রচেষ্টার সুফল ত

দূরের কথা, তা'র প্রতিক্রিয়ার কুফল আমাদের মজ্জায় মজ্জায় চিরকালের তরে জড়িত হয়ে থাকে।

বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানের আদর্শ গ্রহণ ক'রে ভারতের বাহিরে জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক ধন্য হ'লেও আমাদের সনাতনধর্ম্মের দেশে তা' যে শুধু ব্যর্থই হয়েছিল, তা' নয়, তা'র প্রবল প্রতিক্রিয়ার দাপটে দেশ আজও খোলা চোখে দিন-দুপুরে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। অথচ পৃথিবীর মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাপুরুষ আমাদের দেশের লোক, আর অন্য দেশের অত লোককে নিজের আদর্শ দিতে পেরেছিলেন ব'লে চেঁচিয়ে গৌরব অনুভব করতে আমরা একটুও লজ্জা বোধ করি না!

যাই হ'ক্, উক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে সাধারণ লোক যখন শত শত বৎসর যাবৎ ত্রাহি ত্রাহি কর্‌ছিল, তখন "তথাকথিত" সনাতনধর্ম্ম আর সামাজিক রীতিনীতির নৃশংস বন্ধন থেকে স্বাধীনতার এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। প্রতিক্রিয়ার ফলে তা'র পরিণাম যে কি নিদারুণ হয়েছে, তা' বোধ হয়, আর কাউকে ব'লে দিতে হ'বে না।

এই প্রকারে মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত যুক্তিবাদ (Rationalistic movement) আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বিহীন জনসাধারণের শিক্ষার (Secular mass education) আদর্শ অনুযায়ী ফল ফল্‌তে না ফল্‌তেই প্রচণ্ড বেগে প্রতিক্রিয়া এসে সব ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে। তা'র ফলে যে সকল দোষ মানুষের চরিত্রে থাকতে কোন দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা কখনও উন্নত হয়নি, সেই সকল দোষ এ দেশে এমন শিকড় গেড়ে বসেছে যে, তা' থেকে মুক্তির আশা করবার মত কোন কিছু আজও খুঁজে পাইনি বল্‌লে, বোধ হয়, অন্যায় হবে না।

যাই হ'ক্, স্বাধীনতার আদর্শ এ দেশে যে সকল কারণে ব্যর্থ হয়েছে, তা'র মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অভাববোধের শক্তি নাশই প্রধান।

অভাব বল্‌তে কি বুঝি, তা' পরিষ্কার ক'রে বলা উচিত মনে করি। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকায় মানুষ অন্য জীব থেকে নিজেকে উন্নত ব'লে মনে করে, সেই সকলের অভাবকেই আমরা অভাব বল্‌ছি। এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই অভাববোধ না থাক্‌লে মানুষকে আর মানুষ বলা চলে না। ইহাই মনুষ্য-চরিত্রের গোড়ার কথা। মানুষের উন্নতির সীমা আমরা যেমন ধারণা করতে পারি না, এই উন্নতির পথে বাধা, বিঘ্ন, অন্তরায়েরও তেমনি ইয়ত্তা করতে পারি না। এ হেন বাধা-বিঘ্নাদির কবল হ'তে ক্রমে যে অব্যাহতি বা যে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বা চেষ্টাকে ভিত্তি ক'রে মানবস্বভাব বা চরিত্র গঠিত, আমাদের সেই স্বাধীনতার অভাববোধ কোথায় গেল, আর কেমন ক'রে গেল?

অভাববোধই যদি জীবনের আদি লক্ষণ হয়, তবে যে জীব যত অধিক অভাব বোধ করে, সে জীব তত অধিক জীবনের পথে অগ্রসর অর্থাৎ উন্নত। আমরা দেখতে পাই, মানুষ ছাড়া প্রায় অন্য সকল জীবের অভাববোধের সীমা আছে, তাই তা'রা সীমাবদ্ধ জীব। মানুষের অভাববোধের সীমা নাই ব'লে মানুষ এক অসাধারণ উন্নত জীব। মানুষ নিজের চেষ্টায় কত দূর উন্নত হ'তে পারে, তা'র সীমা নির্দ্দেশ বা তা'র ধারণা করতে মানুষ পারে না। অন্য মানুষের কথা পৃথক, কিন্তু আমরা, অন্য জীব অপেক্ষা যে সকল অতিরিক্ত অভাবের বোধ থাকাতে মানুষ নামে অভিহিত, সেই সকল অভাবের যে তীব্র জ্বালা আমাদের নাই, যা' থাকলে তা'র তাড়নায় আমরা সে অভাবমোচনের চেষ্টায় প্রাণপণ করতে পারি। অধিকন্তু, বড়ই অসাধারণ ব্যাপার এই যে, অভাবের জ্বালা বোধের পরিবর্ত্তে আমরা এক রকমের অহেতুক সন্তোষ অনুভব ক'রে থাকি। অভাবের দুঃখ বা জ্বালা আমাদিগকে দগ্ধ করে না, কাজেই অভাবের কারণ এবং অভাবমোচনের উপায় অনুসন্ধানে প্রেরণা দেয় না, সেই জন্য আমাদের চিন্তাশক্তির সম্যক বিকাশ কোন দিন হ'তে পারেনি, তা'র ফলে আমাদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, অভাবের দুঃখে আমরা তৃপ্তি বা শান্তি লাভ করি কেন? কারণ, অভাব বোধ না করাই যে আমাদের সনাতননীতির প্রধানতম কর্ত্তব্য অর্থাৎ যদিচ নেহাত অভাব বোধ ক'রেই ফেলি, তবে তা'তে দুঃখ প্রকাশ না করা অথবা যে অভাবমোচনের চেষ্টা করার পরিবর্ত্তে, সেই অভাবের অবস্থায় তা'র দুঃখটি সইতে পারার আত্ম-প্রসাদ লাভ করাতেই ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা

পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে শিক্ষিত হয়ে আসছি। সেই শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে আমাদের স্বভাবের স্তরে স্তরে বিরাজ করছে। ইহাই আমাদের 'তথাকথিত' সাত্ত্বিক ভাব; ইহাই শুধু আমাদেরই নহে, সমস্ত মানবগণের মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহাই জগৎকে নাকি ভারতের দান; ইহাই সেই শান্তি, যা আমাদের সনাতন ভারতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, আমরা সনাতন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে গিয়ে মানবতার বৈশিষ্ট্য যে হারিয়ে ফেলেছি!

এক দিকে অভাবজনিত দুঃখ অনুভব করা যেমন অতি নিন্দনীয় মহাপাপ, অন্য দিকে অভাবের দুঃখে শান্তি অনুভব করাও তেমনই মহাপুণ্যের কার্য্য। এক দিকে পরম সাধনার বস্তু সাত্ত্বিকতা, অর্থাৎ ত্যাগ, নিবৃত্তি, বৈরাগ্য, দৈন্য, দারিদ্র্য, ভিক্ষাচর্য্যা, সুখে দুঃখে সমজ্ঞান ইত্যাদির মহিমায় যেমন আমরা মহিমান্বিত, অন্য দিকে তেমনই অভাবজনিত দুঃখমোচন বা অভাবপূরণের চেষ্টার ফলে যা ঘটে থাকে, তাকে রাজসিকতা অর্থাৎ প্রবৃত্তি, লালসা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, বাসনা, বিলাসিতা, পরানুকরণ প্রভৃতি লোকসমাজে নিন্দিত অবস্থা নামে অভিহিত ক'রে, তা থেকে নিবৃত্ত থাকাই পরম পরমার্থ বলেই, অবশ্যপালনীয় কার্য্য করতে শিক্ষিত হয়েছি, এখনও হচ্ছি।

কিন্তু মানুষের এই অভাববোধশক্তিকে ধ্বংস করলে অতিকাল থেকে মানুষকে একেবারে বর্জিত করলে মানুষ আবার পশুতে পরিণত হ'য়ে পড়ে। সেইজন্য বলা, এই বাস্তব স্বাভাবিক অভাববোধের বদলে লোকে অস্বাভাবিক, নিছক কাল্পনিক, নিতান্ত অবোধ্য একটি পদার্থের অভাব বোধ করতে শেখান হয়েছে। সেই পারমার্থিক জিনিসটির নাম পরকালে মুক্তি বা নির্ব্বাণ আনন্দ— যা অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়, অভাবনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহকালে অভাবমোচন অর্থাৎ ইহার নামান্তর, লোভ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির চরিতার্থের চেষ্টা করলে পরকালে অনন্ত দুঃখ, নরক ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যপক্ষে ইহকালে সুখে দুঃখে সমজ্ঞান অর্থাৎ কেবল বেঁচে থাকতে হ'লে যে সকল অভাব পূরণ করতেই হয়, তা ছাড়া আর সব কিছু অভাবমোচনের চেষ্টা না ক'রে যদি দুঃখ সয়ে থাকতে পারলে পরকালে মুক্তি। আর ইহকালেও এই মুক্তির সাধনা লোকসমাজে শ্রদ্ধা, মান, ভক্তি, পূজা, অর্থ প্রভৃতি অর্জ্জনের সহজ ও শ্রেষ্ঠতম উপায়।

কিন্তু আমাদের অভাববোধের প্রকৃত ক্ষমতা লোপ পেলেও পূর্ব্বোক্ত আফিমখোরের মত ইদানীং আমাদের মধ্যে বাহিরের প্রবল তাড়নায় অতি অল্পমাত্র বেহুঁস্ অভাববোধ জেগেছে ব'লেই না আমরা নামে মাত্র স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করতে পেরেছি?

আমাদের অভাববোধ-শক্তিনাশের জন্য আর একটা উপায় অবলম্বিত হয়েছিল। অভাবটা এমনই জিনিস যে, অনেক সাধাসাধনার একটি অভাবমোচন হ'তে না হ'তে আমরা আরও বৃহত্তর অনেক অভাব অনুভব করি, তাও যদি কোনও প্রকারে দূরীভূত হয় ত' আবার নূতন নূতন অভাব আসে। এই প্রকারেও অভাবের শেষ হয় না। এ কথা অতি সত্য। কিন্তু এও অতি সত্য যে, এমন জঙ্গলবাসী মানুষ আদিম অবস্থায় এখনও আছে, যাদের অভাববোধ না থাকাতে হাজার হাজার বৎসর প্রায় এক রকম অবস্থাতেই কাটিয়েছে, ক্রমোন্নতি ব'লে জিনিসটা তাদের মধ্যে নাই। আন্দামানবাসীরা এইরূপ জাতি।

তা'র পরে অভাবমোচনের চেষ্টাতে যখন যে অভাব দূরীভূত হয়ে আবার নূতন নূতন অভাব উদ্ভাবন বেড়েই যায়, তখন অভাবমোচনের চেষ্টা যে নিতান্ত বৃথা আর সেই জন্যই মত, তা' আমাদের নীতিবেত্তারা সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত শিখিয়ে আসছেন। কারণ, অভাববোধই যত দুঃখের মূল, আর অভাবের বৃদ্ধিতেই দুঃখেরও বৃদ্ধি, এই যুক্তিকে আমাদের অভাববোধ নাশ করতে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করবার জন্য ইহার অন্য দিকটি অতি সন্তর্পণে আমাদের জ্ঞানের বাহিরে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, অভাববোধে দুঃখ যেমন আছে, অভাবপূরণে সুখও তেমনই আছে। অভাবের বৃদ্ধিতে দুঃখের যেমন বৃদ্ধি, সেই বর্দ্ধিত অভাবের পূরণে সুখেরও তেমনই বৃদ্ধি আছে। দুঃখ বিনা সুখ যদি অসম্ভব হয়, তবে এই দুঃখ সুখেরই জনক। কিন্তু এ সুখ নাকি মর্ত্ত্য, বাস্তব (materialistic) তামসিক সুখ। ভারত নাকি এ সুখ চায় না; কারণ, ইহা দুঃখের উৎপাদক, ক্ষণিক, অলীক ইত্যাদি। ভারত চায় সচ্চিদানন্দ, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

অভাববোধ-নাশের তৃতীয় উপায় হচ্ছে—আমরা যা' কিছু করি বা সুখ-দুঃখ যত কিছু ভোগ করি, তা' আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুযায়ীই ক'রে থাকি মনে করা। ইহজন্মে আমাদের কর্ম্ম ও সুখ-দুঃখের মাত্রা আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই সৃষ্টিকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। হাজার চেষ্টাতেও তা'র একটুও মাত্র পরিবর্ত্তন করা নাকি একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আমাদের অভাব দূর করবার চেষ্টা পাগলের অকারণ কষ্টমাত্র। আর নাকি সেরূপ করাটা ভগবানের সঙ্গে চালাকি করা; কাজেই পাপ। পরজন্মে যদি আমরা আমাদের মঙ্গল চাই, তবে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, যোগ, সাধনা, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা ইত্যাদি, আর বিশেষ ক'রে দান দক্ষিণা দ্বারাই তাহা সম্ভব।

চতুর্থ, আমাদের ইহকালের যাবতীয় কর্ম্মের ও সুখ-দুঃখের আর এক নিয়ামক হ'চ্ছে গ্রহতারাদি। জন্মরাশি নক্ষত্রাদির অবস্থান অনুযায়ী গ্রহাদি আমাদের শুভ বা অশুভ ফল দেয়; সুতরাং গ্রহাদির বিরুদ্ধে অভাবপূরণের জন্য মানুষের নিজের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

পঞ্চম, মানুষের স্বভাবের মধ্যে গৌরব বোধ করবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। গৌরব বা যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ভাবী উন্নতির জন্য প্রেরণা দেয়। মাদকদ্রব্যের নেশার মত যশ, নাম, গৌরব বা কীর্ত্তিজনিত আনন্দেরও উগ্র নেশা আছে, যা'তে মানুষ বিভোর হ'তে চায়। আবার ইহা অতীব সংক্রামক। আর অতীত গৌরবও তেমনই আনন্দদায়ক; ইহারও তেমনই উগ্র নেশা আছে, যা' একবার ধর্‌লে ছাড়ান প্রায় অসম্ভব। ইহাও তেমনই সংক্রামক। কিন্তু ইহা সব চেয়ে উন্নতির পথ-রোধক। ইহা সহজলভ্য; কারণ, ইহা লাভ করতে একটুও নড়্‌তে চড়্‌তে হয় না, মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তেও হয় না। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বা জাতিবিশেষকে অধঃপাতে দিতে হ'লে, অতীত গৌরবের নেশাটি একবার ধরিয়ে দিলেই—বস্। আমাদের অভাববোধ-শক্তি-নাশের জন্য এই অব্যর্থ বিষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীতকে, অসম্ভব সম্ভব, সঙ্গত অসঙ্গত বিচার না ক'রে মানুষের কল্পনায় যত রকম অদ্ভুত কীর্ত্তির দ্বারা যত অধিক গৌরবান্বিত করা যেতে পারে, তা' করা হয়েছিল। এখন আবার তার ব্যাখ্যা (Interpretation) দিয়ে দিন দিন এমনই ক'রে তুলা হয়েছে যে, তেমন কীর্ত্তি বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন মানুষের বা মনুষ্য-সম্প্রদায়ের সাধ্য ব'লে ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই আমরা ভবিষ্যৎকে কার্য্যতঃ ছেড়ে দিয়ে অতীত গৌরবের নেশাতেই মস্‌গুল হয়ে আছি। আর সেই অসম্ভব অতীতকে টেনে নিয়ে এসে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা করবার বাচনিক আশাতে শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ছি।

অতীত গৌরবের আর একটা বড়ই অদ্ভুত রহস্য এই যে, অতীতের যে কীর্ত্তির জন্য আমরা সাধারণ লোক গৌরব অনুভব করি ব'লে ভবিষ্যতে নূতন কোন গৌরব অর্জ্জনের কল্পনাও করি না, সেই সকল অতীত গৌরবের কার্য্য করেছিল যা'রা, তা'রা নিশ্চয় দেশের সাধারণ লোক নয়। তবে সাধারণ লোকের মধ্যে এক আধ জন যা'রা কিছু ক'রেছিল, তা'রা শাপভ্রষ্ট দেবতা, মহাপুরুষ, অথবা ভগবান লীলা করবার জন্য নিজে সাধারণের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছিল, জনসাধারণ কীর্ত্তি বা গৌরব লাভের অধিকারী নহে, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে কোনও গৌরবজনক কার্য্য করবার আকাঙ্ক্ষা বামনের চন্দ্রলাভকামনারই তুল্য। তা'র পর পুরাণসংহিতাদিবর্ণিত কোনও কীর্ত্তিমান ব্যক্তিকে যে আদর্শ ক'রে বা তাহাদের অনুকরণে কোন মহৎ কার্য্যাদিরেব দ্বারা পূজ্য হবে, সে পথও একেবারে বন্ধ। কারণ, কর্ম্মের অধিকারভেদ আছে; ফলেরও ভেদ আছে। এইরূপ ক'রে সাধারণের গৌরব অর্জ্জনের পথ যা'রা বন্ধ করেছে, তাদেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে নিজেদের যশোগৌরবের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে ব'লে মনে করতে জন্ম জন্ম অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। কাজেই আমরা নিজেরা গৌরবজনক কার্য্য ক'রে গৌরব অর্জ্জন করার অভাব বোধ করি না।

ষষ্ঠ, জানবার ইচ্ছা মানুষেরই ধর্ম্ম; জানবার ইচ্ছাতে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জেগে উঠে, তা'র ফলে সত্য আবিষ্কারের বিমল আনন্দ উপভোগ ক'রে মানুষ ধন্য হয়। একটির পর একটি এই প্রকার সত্য আবিষ্কার ও উপলব্ধি করবার ফলে মানুষের জ্ঞান বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে আনন্দও বাড়ে, তা'তে মনুষ্য-জীবন সার্থক হয়। এরূপ জ্ঞানই আমাদের অভাবপূরণের সহায় হ'তে পারে জেনে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় যে অনুসন্ধিৎসা, তা' একেবারে যা'তে জন্মাতে না পারে, তা'র একটি অমোঘ উপায় অবলম্বিত হয়েছিল।

সাধারণ লোককে বিশ্বাস করান হয়েছিল যে, স্বয়ং ভগবান্ থেকে আরম্ভ ক'রে দেবতা, ঋষি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রকাররা সর্ব্বজ্ঞ ; তাঁ'দের প্রণীত স্ববিরোধী বা পরস্পর-বিরোধী সমস্ত শাস্ত্র অভ্রান্ত ; সাধারণ লোকের জ্ঞানপিপাসা-নিবৃত্তির জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত সব জ্ঞান বা সত্য এই সকল শাস্ত্রে নিবদ্ধ ; আর এই সকল শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন ক'রে সত্যজ্ঞান উদ্ধার করার দায় থেকে তা'দের মুক্তি দেওয়ার জন্যই শাস্ত্রের সত্য প্রচারের ভার পুরোহিতদিগের উপর অর্পিত। কাজেই আমাদের কোন কিছু জানবার প্রবৃত্তি গজাবার পূর্ব্বেই এমনই ভাবে পুরোহিতরা আমাদের জ্ঞান দিয়ে রেখেছিলেন (এখনও কতকটা রেখেছেন) যে, আমাদের কোন কিছু নূতন ক'রে জানবার অভাবই হয় না। তা'র পর ঐ সকল শাস্ত্রে আমাদের সকল রকম কর্ত্তব্য আর অকর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে। নিজের কর্ত্তব্য নিজজ্ঞানের সাহায্যে নিজে খুঁজে যদি নিই আর তা' যদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয়, তা' হ'লেই মহাপাপ করা হয়, আর শাস্ত্রদ্রোহী ব'লে বিবেচিত হ'তে হয়। এই প্রকারে নিজের বিচার বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত কর্ত্তব্যপালনজনিত আত্মপ্রসাদ লাভের অভাব জনসাধারণ যাতে কখনও অনুভব না করে, শাস্ত্রে তা'র অসংখ্য প্রকার ব্যবস্থা আছে। পরমভক্তি সহকারে সেই সকল ব্যবস্থা অন্ধভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেই আমাদের বিচারবুদ্ধি (Conscience) একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

এই অভাববোধ-শক্তি নাশের যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়েছিল, ও হয়ে আসছে, তা'র মধ্যে কয়েকটিমাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল। তাই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করবার পক্ষে বোধ হয় যথেষ্ট। এখন দেখা যা'ক, কেন এই অভাববোধ-শক্তি নষ্ট করা হয়েছিল।

এক জাতি অন্য জাতিকে অথবা এক সম্প্রদায় ভিন্ন সম্প্রদায়কে যখন চিরকাল অধীন রাখ্‌তে চেয়েছে, এমন কি, চিরক্রীতদাসে পরিণত করতে চেয়েছে, তখন ভবিষ্যতে যা'তে সেই অধীনস্থ জাতি কখনও স্বাধীন হ'তে না পারে, তা'র জন্য তাদের স্বাধীনতালাভের সকল পথ রুদ্ধ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। এইরূপে চির-অধীন ক'রে রাখবার অবলম্বিত পথ অনেকগুলি। তা'র মধ্যে অধীনস্থ জাতির অভাব-বোধ-শক্তির নাশই অন্যতম। ইহার দ্বারা অধীনস্থ জাতিকে অর্থাৎ বিজিতকে চিরদাসে পরিণত করবার চেষ্টা কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধ হয়েছে, তা' আমাদের ভারতে যেমনটি প্রতিপন্ন হয়েছে, বোধ হয়, তেমনটি আর কোথাও হয় নি।

সনাতন ভারতে আর্য্যরাই জেতা আর শূদ্র এবং শূদ্রেতর নামে অভিহিত জনসাধারণ বিজিত। অবশ্য আর্য্যসম্প্রদায়ের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন বেগতিকে প'ড়ে শূদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল। আর শূদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন গতিকে বা কোন কারণে শূদ্রসম্প্রদায় থেকে ডিগবাজী খেয়ে আর্য্যদের দলে কচিৎ মিশেছে, এখন বরং অধিক পরিমাণে মিশছে। সেকালের "তথাকথিত" আর্য্য-সম্প্রদায় এখন 'ভদ্র' নামে অভিহিত ; আর জনসাধারণ "তথাকথিত" ভদ্রলোকদের দ্বারা কখনও কখনও মুখ ফুটে (আর সর্ব্বদা মনে মনে) ইতর বা অন্ত্যজ বলেই বিবেচিত হয়।

নিম্ন সম্প্রদায় উচ্চ সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যায় নিতান্ত অধিক ব'লে বহুকাল যাবৎ বৃহত্তর সংখ্যার অভাববোধ নাশ করবার চেষ্টায় যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল, সেই ফাঁদে অবশেষে অল্পসংখ্যক ভদ্রলোকরাও পড়েছেন। তা'র মানে ভদ্র-লোকদেরও অভাববোধ-শক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে অন্য এক বিদেশী জেতার চেষ্টায় অতি মন্থর গতিতে অথচ বেগে সে কোন কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অভাব বোধ করতে আমরা আরম্ভ করেছি। অথচ তারাও সর্ব্বকালের সকল জেতাদের মতই আমাদিগকে অধীন ক'রে রাখতে চায়। কারণ, আমাদের সংখ্যা এত বেশী যে, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির অধিবাসীর মত সংখ্যা হ্রাস বা নাশ করা সম্ভব নয় ; বিশেষতঃ ভারত তা'দের উপনিবেশের যোগ্য নয় ব'লে ভারতবাসীর একটু আধটু অভাববোধ-শক্তির প্রশ্রয় না দিলে তা'দের সাম্রাজ্য অধিকারের প্রধানতম উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা স্বদেশবাসীর ধন-সম্পদবৃদ্ধির পথ সুগম করাই সেই উদ্দেশ্য। আমরা অভাব বোধ না করলে তা'দের পণ্য বিক্রীত হয় না। ধনের দ্বারাই যে সকল অভাব দূর করা যেতে পারে, এ কথা তা'রা ধ্রুব সত্য ব'লে জেনে ফেলেছে, এবং এও জেনে ফেলেছে যে, যত দিন ভারতের উচ্চনীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমরে পোকা আর আরশুলার সম্বন্ধ থাকবে, তত দিন ভারতের সাধারণ লোকের স্বাধীনতার অভাববোধ যথাযথরূপে পুনরুদ্দীপিত হ'বে না।

আর ততদিন ৩২ কোটি উৎপাদনে অক্ষম ক্রেতা সমন্বিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বাজার তাঁদের হাতছাড়া হ'বে না।

পরিশেষে অভাববোধ হারিয়ে আমরা চিন্তায় আর কাযে এমনই শ্রমকাতর হয়ে পড়েছি যে, "পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাওয়া" আমাদের সুখের আদর্শ হয়েছে। তা'র পরিণামে নূতন কিছু কর্‌বার প্রবৃত্তি (innovation) আমরা হারিয়ে ভূতপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছি। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্যপ্রণবতা হারিয়ে শাস্ত্র, লোকাচার, গুরু বা নেতার অন্ধ অনুগমন ক'রে ধন্য হচ্ছি। অনুকরণের আতঙ্ক এমনই বেড়ে উঠেছে যে, বিদেশী কিংবা বিধর্ম্মীর কাছ থেকে, যুক্তিসঙ্গত নূতন কোন কিছু সত্য এবং আবশ্যক ব'লে জেনেও যদি শিখি, তবে জাতীয়তা গেল, ভারতের বৈশিষ্ট্য গেল ব'লে আঁৎকে উঠ্‌তে দেখি; অথচ দেশে এক আধ শতাব্দী বা তা'রও পূর্ব্বে যা অন্যের নিকট থেকে অনুকৃত হ'য়েছিল, তা' নিতান্ত অন্যায়, যুক্তিবিরুদ্ধ, অনিষ্টকর জেনেও অন্ধভাবে অনুকরণ কর্‌লে, আর তা' আমাদের মানবতার পরিপন্থী হ'লেও জাতীয়তাতে একটুও বাধে না, বরং তা'তে জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য, প্রাণ, ভিতরকার বস্তু - আরও কত কি রক্ষিত হয়!

এইরূপে নূতনত্ব গ্রহণের পথ রুদ্ধ ক'রে আমরা এখনও কূপমণ্ডুক হয়ে আছি। তা'র ফলে, চিন্তায়, কাযে, বচনে, চলনে, সমস্ত বিষয়ে কেবল লীলাই প্রকট ক'র্‌ছি। এই লীলা প্রকট যত দিন হ'তে থাক্‌বে, ততদিন আমাদের গুপ্ত সমিতির আদর্শ কেন, যে কোন মহান্ আদর্শ গ্রহণ কর্‌তে আমরা অক্ষম হবই।

এক জন মহাপুরুষের নিকট এই লীলা শব্দের যা' ব্যাখ্যা শুনেছিলাম, তা' ব'লে এই পরিচ্ছেদ শেষ করি। যা' সঙ্গত নয়, যা'র কোন অর্থ হয় না, যা' রুচিবিরুদ্ধ, যা' অনিষ্টকর বা নীতিবিরুদ্ধ, তা' যদি এমন কোন বিশেষ লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় যে, তাঁ'র প্রতি পরম ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভাবের উদ্রেক না হয় অর্থাৎ তাঁ'র ঐ প্রকার কাযের জন্য নিন্দা করা না চলে, তা' হ'লে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে লীলা বলা যেতে পারে। নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এই পণ্ডিতজী এও বলেছিলেন যে, এমন শব্দ নাকি আর কোনও ভাষায় নাই। এমন লীলাও বুঝি বা কোন দেশে প্রকট হয় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

বাউল

সবাই যখন জাগ্‌বে এবার
　　জাগ্‌বে গানের সুরে,
তুই কি তখন ঘুমের ঘোরে
　　রইবি স্বপনপুরে?
　　　রইবি স্বপনপুরে!

সবাই যখন আলোর টানে
ছুট্‌বে হেসে সমান তানে,
তুই কি তখন আঁধার পথে
　　মরবি শুধুই ঘুরে?
　　　মরবি শুধুই ঘুরে!

সবাই যখন সবার তরে
　　ছুট্‌বে দেশের কাযে,
তুই কি তখন আপ্‌না নিয়ে
　　থাক্‌বি গভীর লাজে?
　　　থাক্‌বি গভীর লাজে।

টুট্‌বে নাকি ঘুমের ঘোর?
ভাঙ্গবে নাকি ঘরের দোর?
বাজ্‌বে নাকি করুণ-গাথা
　　পাষাণ হৃদয় জুড়ে?
　　　পাষাণ হৃদয় জুড়ে।

শ্রীবেলা গুপ্ত

বিংশ পরিচ্ছেদ
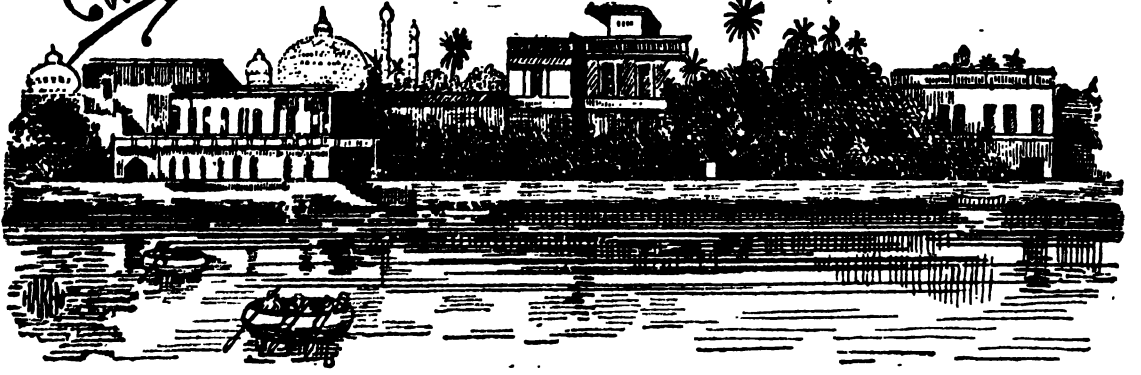
তুর্কী জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পর সাত মাস অতীত হইয়াছে। বিগেডিয়ার জেনারল ডিলেমেন ফাও জয় করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত জয়লক্ষ্মী ইংরাজের পক্ষেই অচলা হইয়া আছেন। বসোরা বিজয়ের পর ইংরাজ কারণা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। বসোরার ওয়ালী সুফী বে ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সাইবা'র যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তুর্কীর সেনাপতি সুলেমান আসগরী অপমানের ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তুর্কীরা পারসী ইরাকে উৎপাত করিতেছিল; আওয়াজ হইতে যে নলে তৈল আবাদানে আনিয়া পরিষ্কার করা হয়, সেই নল কাটিয়া দিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। তাহারাও পরাভূত হইয়াছে।

মেজর-জেনারল টাউনসেণ্ড কারণা পর্য্যন্ত যাইয়া শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই কারণা বাইবেলের নন্দন কানন। এই স্থানে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিশ নদীদ্বয় মিলিত হইয়া সাতল-আরব নদীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মরুমধ্যে কারণা শ্যামশোভাময়। কারণায় আসিয়া টাউনসেণ্ড অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছিলেন। অগ্রসর হইতে একটু বিলম্ব হয়। বিলাতের সামরিক বিভাগ য়ুরোপের রণক্ষেত্রে সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম যোগাইতেই ব্যস্ত—প্রাচীর দিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই। তাই ইরাকে যুদ্ধের সব ব্যবস্থা করিবার ভার ভারত সরকারের উপর পড়িয়াছে। বোম্বাই ও করাচী হইতে জাহাজে সৈনিক, ঘোড়া, রসদ হইতে ঘোড়ার ঘাস ও শিবিরের চাটাই পর্য্যন্ত আসিতেছে; কিন্তু তবুও সুব্যবস্থা হয় নাই। সব জিনিস সময়মত আসিয়া পৌছিতেছে না, সব জিনিস আবশ্যক যোগান দেওয়া যাইতেছে না। ইরাক মরুদেশ; তথায় না আছে আহার্য্য, না আছে রন্ধনের ইন্ধন। সবই সাগরপার হইতে আনিতে হইতেছে। বসোরা দেখিলে বুঝা যায়, ভারতবর্ষই দেহের রক্ত দিয়া ইংরাজের জন্য ইরাক জয় করিয়া প্রাচীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছিল। এইরূপে দ্রব্যাদি লইয়া যে স্থানে অগ্রসর হইতে হয়, তথায় অতি সাবধানে পথ দেখিয়া সব দিক বিবেচনা করিয়া পদক্ষেপ করিতে হয়। বিশেষ এ দেশে ইংরাজ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কেহ ইংরাজকে সাহায্য করা ত পরের কথা, সুযোগ পাইলেই পীড়া দেয়। বসোরার পরপারে ভান্নমায় এক দল বৃটিশ সৈনিক আরবদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। জলপথে গমন করা নিরাপদ নহে। কারণ, টাইগ্রীস নদী স্থানে স্থানে অতি স্বল্পপরিসর—দুই দিক হইতে আরবরা গুলী চালাইতে পারে—নদীপথও জানা নাই—বিশেষ রাত্রিকালে বিপদ অনিবার্য্য। স্থলপথেই যাইতে হইবে। টাউনসেণ্ড বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন, আর দূরে মরুপ্রান্তরে সূর্য্যাস্তশোভা দেখিতেছিলেন। প্রথমে আকাশ যেন রক্তবর্ণ,—দেখিতে দেখিতে বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—যেন ইন্দ্রধনুর সকল বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া নর্ত্তকী লঘুগতিতে নৃত্য করিতেছে, আর তাহার ওড়না বাতাসে উড়িয়া ঘুরিয়া যাইতেছে।

রাত্রির পাহারার ব্যবস্থা হইতেছে, এমন সময় এক জন ইহুদী প্রহরীর নিকটবর্ত্তী হইল। প্রহরী বন্দুক তুলিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে বলিল।

ইহুদী দাঁড়াইয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "আমি শত্রু নহি ; ইংরাজের বন্ধু।"

ইংরাজী কথা শুনিয়া প্রহরী তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিল এবং সে তাহার কাছে আসিলে—বাঁশী বাজাইয়া আর কয় জন প্রহরীকে ডাকিল। তাহারা আসিয়া ইহুদীর বস্ত্র পরীক্ষা করিল—কোন অস্ত্র আছে কি না; নিশ্চিত হইয়া তাহারা ইহুদীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

দায়ুদ বলিল, সে সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।

প্রশ্ন হইল, "কি প্রয়োজনে ?"

দায়ুদ বলিল, "এই যুদ্ধে তুর্কীর সর্ব্বনাশসাধনে ইংরাজকে সাহায্য করিতে।"

উদ্দেশ্যটা যতই অদ্ভুত হউক, ইংরাজের কাছে আদরের বটে। প্রহরীরা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিল, তাহার পর দায়ুদকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের উপরিস্থিত কর্ম্মচারীর কাছে লইয়া গেল।

কর্ম্মচারী যখন তাহাকে নানারূপ জেরা করিতে ছিলেন—সে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর কি না, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার তাম্বুর দ্বারে এক জনকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। টাউনসেণ্ড একবার শিবির ঘুরিয়া যাইতেছিলেন—তিনিই তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাম্বুর মধ্যে এক জন ইহুদীকে দেখিয়া টাউনসেণ্ড কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে ?"

দায়ুদ সেলাম করিয়া বলিল, "আমি তুর্কীর শত্রু।"

"তুমি এখানে কেন ?"

"তুর্কীর নিপাতসাধনে যদি আপনাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, সেই জন্য বহু দূর হইতে আসিতেছি।"

"কোথা হইতে ?"

"আপাততঃ কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে" বলিয়াই সে বলিল, "আমি বোম্বাই হইতে বহুকষ্টে তথায় গিয়াছিলাম ; তাহার পর এখানে।"

"কোন্ পুরস্কারের আশায় তুমি আমাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছ ?"

"আমি কোন পুরস্কার চাহি না। তুর্কীর নিপাতই আমার কাম্য—তাহার অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমি আর কিছু কল্পনা করিতে পারি না।"

ইহুদীরা যে তুর্কীর উপর প্রসন্ন ছিল না এবং অনেক অনাচারী তুর্কী রাজকর্ম্মচারী যে সময় সময় ইহুদীদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা টাউনসেণ্ড জানিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এ এত আগ্রহে তুর্কীর নিপাত কামনা করিতেছে কেন ? ইহুদীদিগের অর্থলোভ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে—এ পুরস্কারও চাহে না ! লোকটা বোম্বাই হইতে আসিয়াছে—ইংরাজীও বেশ ভাল বলিতে পারে। সে যাহা বলিতেছে, তাহাই সত্য কি না, ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য টাউনসেণ্ড তাহাকে আপনার তাম্বুতে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি আর একবার দায়ুদকে জেরা করিলেন। দায়ুদ তাহার সব কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিল। তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ টাউনসেণ্ড দেখিলেন না। তাহার ইচ্ছা যেমনই অস্বাভাবিক হউক—এ যে বড় একটা গল্প একখানা উপন্যাস রচনা করিয়া সে ছল আসিয়াছে, তাহা তাঁহার মনে হইল না। সে যদি উপন্যাস রচনা করিয়া আসিত, তবে কি জেরায় ধরা পড়িত না ? তাহার কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহার দ্বারা ইংরাজের বিশেষ উপকার হইতে পারে। এ দেশে ইংরাজ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। এ অঞ্চলের আরবদিগকে সহসা বিশ্বাস করাও সুবুদ্ধির কাজ নহে ; তাহারা দস্যু—অনেকের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই, কোনরূপে লাভবান হইতে পারিলেই তাহারা সব করিতে পারে। এ অবস্থায় দেশের ভাষাভিজ্ঞ ও দেশের সংবাদসংগ্রহে পটু লোক পাইলে অনেক সুবিধা হয়। দায়ুদ বলিয়াছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সে বোম্বাই হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলে গিয়াছিল। তথায়, তুর্কীর রাজধানীতে তাহাকে তুর্কী সরকারের কর্ম্মচারীদিগের অনাচারের প্রতীকারচেষ্টা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তাহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে—বিচার সে পায় নাই। সে কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই—বড়লোক তুর্কী, অনাচারের কুকার্য্যগামী সরকারের কাছে বিচারের আশা কোথায় ? তাই সে প্রতিহিংসার অনল বক্ষে বহিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে—দক্ষযোগ্য হইয়াছে, এই সময় যদি সে প্রতিশোধ লইতে পারে—এই ভরসায় সে সমস্ত পথ সমরসজ্জা প্রভৃতি লক্ষ্য

করিতে করিতে আসিয়াছে—তাহার অভিজ্ঞতার ফল সে ইংরাজকে দিতে আসিয়াছে—সে তুর্বল, সবলকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহে।

টাউনসেণ্ড বলিলেন, "কিন্তু তোমার কত বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ ?"

দায়ুদ হাসিয়া উঠিয়া উত্তর করিল, "আপনি আমার কথা শুনিয়াছেন; বিপদে আমার ভয় কি ? বিপদ আমি বরণ করিয়া লইতে চাহি। আমার কেবল এক উদ্দেশ্য—প্রতিহিংসা। তাহার জন্য সব সহ্য করিতে নরকে যাইতেও আমি প্রস্তুত।"

টাউনসেণ্ড তাহাকে সে দিন শিবিরে থাকিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে এক জন প্রহরী দায়ুদকে লইয়া গেল। দায়ুদ পাহারায় থাকিল।

আজকাল যুদ্ধের পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সেনাদল যখন অগ্রসর হয়, সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হয়। টেলিগ্রাফের জন্য তারও দরকার হয় না, বিনা তারে সংবাদ পাঠান ও পাওয়া চলে। দায়ুদ বলিয়াছিল, সে বোম্বাই হইতে আসিয়াছে। টাউনসেণ্ড তাহার বোম্বাইয়ের ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বসোরায় টেলিগ্রাফ করিলেন, বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাফ করিয়া তাহার কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা হয়।

পরদিন প্রাতরাশের পর জেনারল দায়ুদকে তলব দিলেন। তিনি মানচিত্র লইয়া বসিয়াছিলেন। দায়ুদ আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন পথে অগ্রসর হওয়া তুমি সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা কর ?"

মানচিত্রে অঙ্গুলী দিয়া দায়ুদ দেখাইয়া দিল; বলিল, "বাগদাদ অধিকার করিতে পারিলেই ইরাকে তুর্কীর বিষদন্ত উৎপাটিত হইবে। কাযটা কঠিন নহে; কারণ, বসোরার পতনে ও ওয়ালীর আত্মসমর্পণে তুর্কীরা সন্ত্রস্ত হইয়াছে। ইরাকে তুর্কের সংখ্যা অতি অল্প—ভারতবর্ষে ইংরাজেরই মত। আরবদিগকে লইয়া তাহারা ইরাক শাসন করে, সে কেবল আরবরা তাহাদিগকে ভয় করে বলিয়া। সে ভয় কাটিয়া গেলে তুর্কী আর এ দেশে প্রাধান্য রাখিতে পারে না। বসোরার পতনে সে ভয় কাটিয়া যাইতেছে।"

টাউনসেণ্ড [illegible]লেন, "কিন্তু বাগদাদ যে বহুদূর !"

দায়ুদ হাসিয়া বলিল, "ইংরাজ যে বিলাত হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ বিজয় করিয়াছে, সে কি খুব কাছে ?"

টাউনসেণ্ড তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

দায়ুদ বলিল, "কারণায় থাকিয়া কোন ফল নাই। আপনাকে প্রথমে আমারায় যাইতে হইবে। তথায় পাইবেন—থাকিবার ভাল স্থান আর যথেষ্ট রসদ। আমারায় যাইয়া তথা হইতে সংবাদও সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। অগ্রসর হইবার সময় আলীগারবীতে বা শেকসাদে আড্ডা লইয়া কুট-এল-আমারায় পৌছিয়া বাধলা হইয়া টেসিফনে পৌছিতে পারিলে, বাগদাদ আর অজেয় রহিবে না।"

দায়ুদের আশায় টাউনসেণ্ড বিস্মিত হইলেন—তাহা যেন তাঁহাতেও সংক্রমিত হইল। তিনি যেন একটু অধীরভাবে বোম্বাইয়ের টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন যখন টেলিগ্রাম আসিল, বোম্বাইয়ের পুলিস অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ দিয়াছে, দায়ুদের সব কথাই সত্য, তখন টাউনসেণ্ডের মুখে আনন্দের হাসিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি এত দিন পরে সাফল্যের সিংহদ্বারের সন্ধান পাইলেন। তিনি ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে দায়ুদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

দায়ুদ পরামর্শ দিল, যত শীঘ্র সম্ভব কারণা হইতে শিবির তুলিয়া আমারায় যাওয়া সঙ্গত। কারণা অস্বাস্থ্যকর স্থান—বাগদাদ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কাযেই কারণা হইতে বাগদাদের সংবাদ, তুর্কীর রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা জানিবার পথ বিঘ্নবহুল। কারণা বসোরা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দূর হইলেও তথায় রসদের জন্য সর্ব্বতোভাবে বসোরার চালানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, আমারায় তাহা হইবে না। বসোরায় ও আমারায় শাক-সব্জীর অভাবে সৈনিকদিগের দলে কণ্ডূতি চর্ম্মরোগ দেখা দিতেছে, প্রতিদিন তাহাদিগকে লেবুর রস পান করাইয়াও রোগব্যাপ্তি নিবারণ করা যাইতেছে না—রোগগ্রস্তদিগকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া পাঠাইতে হইতেছে; আমারায় শাক-সব্জীর অভাব হইবে না; ভারতীয় সৈনিকদিগের ব্যবহার্য্য চাউলও আমারায় পাওয়া যাইবে। তথায় নদীতে সেতু আছে এবং সহরের পরপারে দাড়িম্বক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপনের আবশ্যক স্থানের অভাব

হইবে না। আমারায় ইহুদীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহারা তুর্কীর বিরোধী।

দায়দের যুক্তি টাউনসেণ্ডের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। তিনি তখন বাগদাদ বিজয় করিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসে আপনার যশ অক্ষয় করিবার আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত; যশ অর্জ্জনের এমন সুযোগ তিনি জীবনে আর কখন লাভ করেন নাই; এমন সুযোগ সচরাচর লাভ করাও যায় না। ভারতবর্ষে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে পার্ব্বত্য জাতির সহিত খণ্ডযুদ্ধে এরূপ যশ অর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

যখন টাউনসেণ্ড এইরূপ চিন্তা করিয়া কারণা হইতে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন ও বসোরায় সেনাপতির সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় অদৃষ্ট যেন সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাঁহার ঈপ্সিত সুযোগ আনিয়া দিল। আওয়াজ হইতে যে নলে আবাদানে তৈল নীত হয়, তুর্কীরা ও তাহাদের প্ররোচনায় আরবরা সে নল কাটিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল দশ সহস্র আরব সে কার্য্যে তুর্কীদিগের সহায় হইয়াছিল। মেজর জেনারল গরিঞ্জ তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আমারার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুমতির অভাবে ও আয়োজনের ত্রুটিতে তিনি আমারা আক্রমণ করিতে পারেন নাই। ভারত সরকার সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম যোগাইতে প্রাণপণ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু এত বড় যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখন হয় নাই, ভারত সরকার কোন দিন এরূপ যুদ্ধের আয়োজনও করেন নাই। কাজেই নানারূপ অসুবিধা হইতেছিল। ভারতবাসীকে বিশ্বাস করিয়া বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ প্রায় সৈনিক ও সরঞ্জামশূন্য করিয়া ইরাকে যুদ্ধের উপকরণ যোগাইয়াছিলেন, তবুও তিনি অজ্ঞতার অপবাদ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। সে সব বিবেচনা করিয়া গরিঞ্জ তখনও আমারা আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু তুর্ক দলের সেনারা তখনও কারণার কাছে ছিল এবং যুদ্ধ হইলেই লুণ্ঠনের সুযোগ পাওয়া যাইবে বুঝিয়া আরবরা যখন তখন ইংরাজ শিবির আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল ইংরাজ শিবির হইতে বন্দুক, রসদ, ঘোড়া প্রভৃতি চুরী করিয়া পলাইতেছিল। কারণায় ইংরাজ শিবির স্থাপিত হইবার পর হইতে তাহার সান্নিধ্যে তুর্কীর সেনাদল ও সেই দলের সঙ্গী আরবরা সমাগত হইতেছিল; দিন দিন তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল।

কারণার উত্তর দিকে তুর্কীর আড্ডা দিন দিন বড় হইতে লাগিল। দায়ুদ নানা উপায়ে, আরবদের সঙ্গে মিশিয়া, ইহুদীদের ধরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। সে সংবাদ আনিল, তুর্কীর লোক মনে করিয়াছে, এইবার ইংরাজকে পরাভূত করিবে; লুণ্ঠনের সুযোগ ঘটিবে, এই আশায় হাজার হাজার আরব দস্যু তাহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে। তবে দায়ুদ টাউনসেণ্ডকে বলিল, "এই আরবদের দ্বারা তুর্কদের কোন সুবিধা হইবে না; পরন্তু বিপদ ঘটিতে পারে। ইহারা চাহে লুণ্ঠন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে শত্রুমিত্র বিচার না করিয়া হত্যা করে— পোষাক হইতে বন্দুক পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে, একটা অঙ্গুরীর লোভে আহত কিম্বা জীবিত সৈনিকের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা যে পক্ষে থাকে, সেই পক্ষকেই বিব্রত করে।"

টাউনসেণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংখ্যায় আরবরাই ত অধিক?"

"হাঁ। তবে তুর্ক সংখ্যায় অল্প হইলেও খুব ভাল যোদ্ধা। বিশেষ গোলন্দাজ সবই তুর্ক। তাহারা জার্ম্মাণদের কাছে শিক্ষা পাইয়াছে।"

টাউনসেণ্ড যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্নে তুর্কীর ছাউনীর উপর একখানা এরোপ্লেন দেখা গেল। সেই দিনই দায়ুদ সংবাদ আনিল, টাইগ্রীস বাহিয়া বাগদাদ হইতে তুর্কীর একখানি ক্ষুদ্র রণতরীও আসিয়াছে নাম, মার্ম্মারিস। তাহাতে যে কয়টি কামান আছে, সে কয়টি হইতে বহু দূরে গোলা বর্ষণ করা যায়। বোধ হয়, স্থলপথ ও জলপথ দুই দিক হইতেই ইংরাজকে আক্রমণ করা হইবে। শুনিয়া নদীর দিক রক্ষা করিবার জন্য সেই মুখে কামান সাজাইবার আদেশ প্রদান করিয়া টাউনসেণ্ড স্থলপথে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনিও সঙ্কল্প করিলেন, এই আক্রমণে তুর্ককে যে শিক্ষা দিবেন, তাহার ফলে সে আর সহসা ইংরাজকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না।

পরদিন অপরাহ্ণে ইংরাজশিবির হইতে পর্য্যবেক্ষণের জন্য এরোপ্লেন উঠিলেই তুর্ক-শিবির হইতে এরোপ্লেন উঠিয়া

অগ্নি বর্ষণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নদীবক্ষে তুর্কীর রণতরী হইতে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ইংরাজ অপ্রস্তুত ছিল না—এরোপ্লেন হইতে সঙ্কেত পাইয়া ইংরাজের কামান নদীতে রণতরী লক্ষ্য করিয়া অগ্নি বৃষ্টি করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই রণতরীতে কামানের গর্জ্জন নিবৃত্ত হইল। রণতরীর কল সেলের আঘাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তরী ডুবিবে বুঝিয়া জাহাজের লোক বিশৃঙ্খল-ভাবে কেহ জলে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল, কেহ বা ছোট তরী নামাইয়া তাহাতে উঠিল।

জয়ের উৎসাহ যেমন সংক্রামক, পরাভবের অবসাদ তেমনই দ্রুত ব্যাপ্ত হয়। জলপথে পরাভবে স্থলে সেনাদলে কেমন অবসাদ লক্ষিত হইল। অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার আদেশ পাইয়া তাহারা অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সে কালে তাহাদের সে উৎসাহ ছিল না।

এ দিকে ইংরাজ তুর্ক সেনাদলকে আক্রমণ করিতে না করিতে পশ্চাতে আরবরা তুর্ক শিবির লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল। সম্মুখে ইংরাজের কামানের গোলা, পশ্চাতে আরবদিগের বন্দুকের গুলী দুই দিকে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া তুর্ক সেনা মরিতে লাগিল। তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইয়া ইংরাজের কামান দখল করিবার চেষ্টা করিল; সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দায়ুদ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল—আরবরাই তুর্কদিগকে সমধিক বিপন্ন করিল।

শেষে তুর্কদল পলায়নপর হইল। টাউনসেণ্ড তাহাদের ১ হাজার ৭ শত ১৭ জন সৈনিক ও ১৭টি কামান পাইলেন। তাহাদের রণতরী টাইগ্রীসের জলে ডুবিয়া গেল।

টাউনসেণ্ড শিবিরে ফিরিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি আমারার দিকে পলায়নপর তুর্কদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহার মনে দুরাকাঙ্ক্ষা—তিনিই বাগদাদ জয় করিবেন; আর সে আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে ইন্ধন যোগান করিতেছিল দায়ুদের উৎসাহ। ভবিষ্যতের অন্ধকারে তিনি তাঁহার ভাগ্যলিপি পাঠ করিতে পারিলেন না। পলায়নপর তুর্কসেনার পশ্চাতে আসিয়া তিনি আমারা অধিকার করিলেন। যুদ্ধের ইতিহাসে আর এক অধ্যায় শেষ হইল।

—

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আমারায় আসিয়া টাউনসেণ্ড বুঝিলেন, দায়ুদ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই বটে; আমারায় সেনানিবাসস্থানও ভাল—রসদ সংগ্রহ করাও সম্ভব। যে পারে সহর ও বাজার, সে পারে দ্রব্যাদির অভাব নাই। পরপারে দাড়িম্বক্ষেত্র—সেনা নিবাসের যথেষ্ট স্থান আছে। মধ্যে সেতু—শুল্ফনৌকা সংযুক্ত করিয়া সেতু নির্ম্মিত। পলায়নপর তুর্করা সে সেতু নষ্ট করিয়া যাইতে পারে নাই।

টাউনসেণ্ড স্থির করিলেন, তিনি আমারায় থাকিয়া সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবেন এবং বাগদাদবিজয়ের আয়োজন করিবেন। দায়ুদ তাঁহার সঙ্কল্পের সমর্থন করিল। সে তথায় স্থির হইয়া বসিয়া চারিদিকের সংবাদ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিল।

ইংরাজের সেনাদল কারণা হইতে আমারায় আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দায়ুদের পরামর্শেই টাউনসেণ্ড আমারায় আসিয়াছেন, জানিয়া তাহারা দায়ুদের অনুরক্ত হইয়া পড়িল। আমারায় একটি বহুমূল্য প্রতিষ্ঠান ইংরাজের হস্তগত হইল। সে আমারার তুর্কী হাসপাতাল। এই হাসপাতালে তুর্কীর সেনাপতি জার্ম্মাণীর আমদানী ঔষধ, অস্ত্র প্রভৃতি রাখিয়াছিলেন—দুর্দ্দিনে সে সকল ইংরাজের পক্ষে বড়ই উপকারী হইয়াছিল।

দায়ুদ আমারায় টাইগ্রীসের কূলে একটা বাড়ী দখল করিল এবং তথায় থাকিয়া জাল ছড়াইতে লাগিল। আমারায় অনেক ইহুদীর বাস—তাহারা ব্যবসা করে। তাহাদিগের দ্বারা দায়ুদ কার্য্যসিদ্ধির আয়োজন করিতে লাগিল। সে বসোরা হইতে নানা পণ্য আনাইয়া লইল এবং সেই সব পণ্য বিক্রয়ের ছল করিয়া তাহার চর ইহুদীরা বাগদাদ পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল। প্রাচীতে সংবাদ চলাচলের এইরূপ উপায় বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে।

আমারায় আসিয়া দায়ুদ আর একটা কাজ করিল। তাহার মনে ছিল, ফরিদা তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। সে জানিত, এই যুদ্ধে আমীর কোন না কোন পক্ষ লইবেনই—কাজেই ফরিদাকে "হাত" করিতে পারিলে সংবাদসংগ্রহের সুবিধা হইবে। সে দুই জন ইহুদীকে আমীরের রাজধানীতে পাঠাইল—সঙ্গে এক জন ইহুদী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি চতুর। সে পণ্য লইয়া আমীরের অন্তঃপুরে গতায়াত

করিবে এবং সুযোগমত ফরিদাকে পাইলে বলিবে, রুথের স্বামী যুদ্ধের সংবাদ জানিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছে। সে ফরিদার জন্য একখানা পান্না উপহার পাঠাইয়া দিল। অনিশ্চিত সাফল্যের আশায় চর পাঠাইবার সময় দায়ুদ কল্পনাও করিতে পারে নাই, ফরিদা কত সংবাদ সংগ্রহ করিবার উপায় করিয়াছে। ফরিদার গোপন বাসনার কথাও সে জানিত না; কাজেই অনুমান করিতে পারে নাই যে, তাহার দূতীর কথায় ফরিদার মনে সুপ্ত বাসনা কত প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিবে।

প্রায় এক মাসের মধ্যে দায়ুদ তাহার গুপ্তচর বিভাগের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল—চারিদিক হইতে তাহার সংবাদ আসিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক সংবাদ আসিল, ফরিদার নিকট হইতে।

বাস্তবিক দায়ুদের সংবাদ পাইয়া ফরিদার মনে যে দুরাশা জাগিয়াছিল, তাহা যেন তাহাকে বিচারবিবেচনাশূন্য হইয়া একই লক্ষ্যাভিমুখে লইতেছিল দায়ুদলাভ। দায়ুদকে দেখিয়া তাহার মনে সেই বাসনা দেখা দিয়াছিল; তাই সে রুথের সঙ্গে ছলনা করিয়াছিল। দ্বিতীয় দিন আমীরের সরবতের জন্য মাদকদ্রব্য দেয় নাই; কিন্তু দায়ুদকে ধরিবার জন্য সে যে জাল পাতিয়াছিল, আমীর পদাঘাতে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। সে আশা করিয়াছিল—মুক্তি। সে মনে করিয়াছিল, মুক্তি পাইলে সে দায়ুদের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং আমীরের সর্ব্বনাশসাধনে তাহার সহায় হইয়া ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় জয় করিবে। দায়ুদ সবল পুরুষ; ফরিদার বিশ্বাস ছিল, সে রূপসী—দায়ুদ কি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে? তাহার কাছে ভালবাসা ভোগের নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার পর সে দায়ুদের আর সন্ধান পায় নাই; কিন্তু তাহাতেই আমীরের প্রতি তাহার ঘৃণা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রতিশোধ লইবে। সেই জন্যই সে ছলনায় সাহিদের হৃদয় জয় করিয়াছে। ছলে ও কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে।

দায়ুদের সংবাদ পাইয়া ফরিদার আশা আবার দেখা দিল। এবার অদৃষ্ট সহায়—নহিলে, এত দিন পরে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দায়ুদ তাহারই কাছে লোক পাঠাইবে কেন? দায়ুদ তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। ফরিদা কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিল। সে সুন্দরী। রুথও সুন্দরী ছিল। কিন্তু ইহুদার সৌন্দর্য্যে দৌর্ব্বল্যের একটু আভাস থাকে। তাহার পর সে দায়ুদের উপহার পান্না বুকের কাপড়ের মধ্য হইতে বাহির করিল। তাহার বক্ষের স্পর্শে পান্নাখানি যেন তখনও উত্তপ্ত। সে পান্নাখানি চুম্বন করিল—চক্ষু মুদিয়া মনে করিতে লাগিল, সে দায়ুদকেই চুম্বন করিতেছে। কল্পনার উল্লাসে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যায় সে আবার সাহিদের গৃহে গেল এবং কথায় কথায় যুদ্ধের সব সংবাদ জানিয়া লইল। সাহিদ তখন সে দিনের সংবাদ মিলাইয়া একখানা মানচিত্রে রেখা টানিতেছিলেন। ফরিদা জানিত, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এইরূপ একখানা মানচিত্র সাহিদ আমীরকে পাঠাইয়া দেন। সে বলিল, সে তাহা লইতে আসিয়াছে। সাহিদ সেখানা তাহাকে দিয়া বলিলেন, "না হয়, একটু পরেই যাইবে!"

ফরিদা বলিল, "আমীরকে একটু ব্যস্ত দেখিলাম।"—তাহার পর সে বলিল, "তোমার কাছে থাকিবার অবসর কত দিনে হইবে?"

সাহিদ বলিলেন, "সেই ভাবনাই ভাবিতেছি।"

ফরিদা মানচিত্র লইয়া চলিয়া গেল। সাহিদ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ফরিদা ব্যস্ত ও ত্রস্তভাবে ফিরিয়া আসিল—মুখে বোরকা নাই, কেশ স্রস্ত, বেশ অসংলগ্ন।

তাহাকে দেখিয়া সাহিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, ফরিদা?"

ফরিদা বলিল, "কাগজখানা লইয়া আমি বাজারে গিয়াছিলাম; সেখানা কাপড়ের মধ্যে ছিল। কোথায় পড়িয়া গিয়াছে।"

"বল কি?" বলিয়া সাহিদ ঋজু হইয়া বসিতে না বসিতে ফরিদা বাহুবন্ধনে তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাঁহার অঙ্কে মাথা রাখিয়া বিলোলকটাক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমীর জানিতে পারিলে আমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবে।"

সাহিদ তাহা জানিতেন। যে ফরিদা আপনি আসিয়া তাঁহাকে ধরা দিয়াছে, যাহার জন্য তিনি প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে উদ্যত, সেই ফরিদার লাঞ্ছনা কি তাঁহার দ্বারা হইতে পারে? না। তিনি ফরিদাকে হারাইতে পারিবেন না। ছার—নক্সা। নক্সা যদি অপরের হাতে পড়ে? কে বুঝিতে পারিবে?

পারিলেই বা ক্ষতি কি? এ নগরে তুর্কীর কোন শত্রু নাই। যদি তিনি জানিতে পারেন, নক্সা আর কাহারও হস্তগত হইয়াছে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

দেখিতে দেখিতে এই সব চিন্তা বিদ্যুদ্বিকাশের মত তাঁহার মনে খেলিয়া গেল। তিনি বাহুবিস্তার করিয়া ফরিদাকে আলিঙ্গন করিলেন। ফরিদা এত দিন কখন তাঁহার আলিঙ্গনে ধরা দেয় নাই—আজ ধরা দিল। তাহার কুসুম-কোমল যৌবনপুলকিত-পরিপূর্ণ দেহ বক্ষে ধরিয়া সাহিদ তাহার সব অপরাধ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কেবল মনে হইল, ইহাকে লাভ করিতে হইবে—এ বাদশাহী হইবার উপলক্ষ বটে। সাহিদ সাগ্রহে ফরিদার মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইলে ফরিদা সরিয়া গেল; হাসিয়া বলিল, "আজও ফরিদা আমীরের ক্রীতদাসীর কন্যা সামান্যা দাসী; সে তাহার প্রেমাস্পদের পত্নী হইতে পারে নাই। সে সেই দিনের আশায় তাহার চুম্বন আলিঙ্গন উপহার দিবে বলিয়া রাখিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে কেবল হৃদয় দিয়াছে।"

ফরিদা চলিয়া গেল।

অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইবার পর কিছুক্ষণ যেমন অন্ধকার গাঢ়তর মনে হয়, ফরিদা চলিয়া গেলে সাহিদের তেমনই মনে হইল—জীবনের অন্ধকার যেন গাঢ়তর। তাঁহার মন নানা দুশ্চিন্তায় ঝটিকাহত সাগরের মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন তাঁহার মনে পড়িল, নূতন করিয়া নক্সা প্রস্তুত করিয়া আমীরকে পাঠাইতে হইবে, তখন তিনি দুশ্চিন্তা হইতে বলপূর্ব্বক আপনাকে মুক্ত করিয়া আবার নক্সা অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময় পণ্য লইয়া ইহুদী পশারিণী হারেমে আসিলে ফরিদা আগিয়ারে তাহাকে কক্ষে যাইতে বলিল। বেগমরা ইচ্ছামত জিনিষ কিনিবার পর পশারিণী ফরিদাকে বলিল, "চল, দিদি, তোমার ঘরে যাই।"

এক জন বেগম বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কি কিনিবে, ফরিদা?"

ফরিদা কথায় কম যায় না। সে বলিল, "কিনিবার মত কিছু কি আর তোমরা রাখিয়াছ?"

"হবে, তোমার আর কিনা হইবে না?"

"আমরা ত আর লীরায় কিনা বেগম নহি যে, কিনা-বেচা ছাড়া আর কিছু বুঝি না! আমরা গরিব—গরিবের সঙ্গে না হয়, দুই দণ্ড গল্পই করিব।"

আমীর অনেক টাকায় সে বেগমকে কিনিয়াছিলেন—তিনি নিরুত্তর হইলেন।

আর এক জন বলিলেন, "ফরিদা, তুই মানুষ কিনবি কবে?"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "মনের মত মানুষ যে পাই না। পাইলেই কিনিব—তবে বিনামূল্যে।"

"কেন, তোর নিজের দাম কি এক কেরাণও নহে?"

"সে তোমরা বুঝিতে পারিবে না। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার কাছে কি আর আপনার কোন মূল্যবিচার করিয়া আপনাকে দিতে হয়? তবে আল্লা রাখিয়াছেন দরিদ্রের জন্য—ভালবাসা আর বেহেস্ত; আর ধনীর জন্য ভোগ আর জাহান্নম।"

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা এক বেগম বলিলেন, "কেন ফরিদার সঙ্গে লাগিতে যাও! উহার সঙ্গে কথায় কি কেহ কখন পারে? বড় বেগম বলেন, উহার কথায় ক্ষুরের ধার।"

দালানে বহুকণ্ঠের ধ্বনি শুনিয়া কৌতূহলবশে বড় বেগম বিপুল দেহভার বহন করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে চুপ করিল—বড় বেগমের মুখে মৃদু হাসি ও মিষ্ট কথা লাগিয়াই থাকিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে কি দেখিতেছ?"

এক জন বলিলেন, "এই ইহুদী জিনিষ বেচিতে আসিয়াছে।"

"কেমন, ভাল জিনিষ?"

"হাঁ। আপনি কিনিবেন?"

বড় বেগম মিষ্ট হাসি হাসিয়া আপনার চুলে হাত দিয়া বলিলেন, "মিস্‌মিসে কাল পরচুলা থাকে ত কিনি। কি বলিস্, ফরিদা?"

ফরিদা বলিল, "না, মা, তোমায় তোমার ঐ চুলেই ভাল মানায়—ছলনা তোমাকে সাজে না।"

বড় বেগম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুই কি কিনিলি—দেখি?"

"আমি আবার কি কিনিব?"

"কেন ? তোর যাহা ইচ্ছা কিনিয়া ফেল্। যে দাম হয়, আমি দিব।"

এই কথা বলিয়া বড় বেগম আপনার কক্ষে গমন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ফরিদাকে একটা লীরা দিয়া আবার চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "যদি আর কিছু লাগে, লইয়া যাইবি।"

অন্য বেগমরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "বড় বেগম ফরিদাকে সত্যসত্যই ভালবাসেন।"

তাহার পর ফরিদা ইহুদাকে আপনার কক্ষে লইয়া গেল।

কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ফরিদা উপাধাননিম্ন হইতে পূর্ব্ব রাত্রিতে সংগৃহীত নক্সাখানি বাহির করিয়া ইহুদাকে দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সাবধান! যদি কেহ জানিতে পারে তোমারও প্রাণ যাইবে, আমারও প্রাণ যাইবে এইখানি দায়ুদের হাতে দিয়া বলিবে—যুদ্ধের এই নক্সা তাহার জন্য প্রাণপণ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। বলিও ফরিদা তাহার; তাহার আশাপথ চাহিয়া আছে; বলিও আমীরের নিধনে আমিই তাহার অস্ত্র।"

ফরিদা ইহুদাকে বড় বেগমদত্ত লীরাটি দিল। ইহুদা লীরা ও নক্সা বক্ষের বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বলিল, "দুই একটা জিনিষ রাখ, নহিলে লোক সন্দেহ করিবে।"

ফরিদা সামান্য দুই চারিটা জিনিষ রাখিয়া দিল।

ইহুদাকে ফরিদা বাহিরে লইয়া চলিল—আদেশ ব্যতীত কোন স্ত্রীলোকেরও হারেমে গতায়াতের উপায় ছিল না। তবে ফরিদার আদেশই ছাড়। যাইবার সময় ইহুদা সম্মুখে যে দুই জন বেগমকে দেখিল, তাঁহাদিগকে বলিল, "আমি আজ বাগদাদে ফিরিয়া যাইতেছি। এবার আসিবার সময় আরও ভাল ভাল জিনিষ লইয়া আসিব।"

ইহুদাকে লইয়া ইহুদীরা সেই দিনই আমারা যাত্রা করিল। নিকটস্থ স্থানে আসিয়া তাহারা নৌকা ভাড়া করিল। টাইগ্রীসের খরস্রোতে নৌকা আরোহীদিগকে লইয়া দ্রুত ভাসিয়া চলিল। নৌকা আমারার ঘাটে পৌঁছিলে ইংরাজের সিপাহী অগ্রসর হইয়া আরোহীদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা টাউনসেণ্ডের ছাড় দেখাইল। সিপাহী তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা ঘাট হইতে টাইগ্রীসকূলে দায়ুদের গৃহে গেল।

প্রহরী তাহাদের আগমনবার্ত্তা জানাইলেই দায়ুদ তাহাদিগকে আনিতে বলিল এবং তাহাদিগকে রাখিয়া প্রহরী চলিয়া গেলে তাহাদের কাছে সব সংবাদ সংগ্রহ করিল।

নক্সাখানি পাইয়া দায়ুদ যেন তুর্কীর মৃত্যুবাণ হস্তগত করিল। এত দিন সে বাগদাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছিল না। তুর্করা যে রাজধানী রক্ষার কোন আয়োজন করিতেছে না, ইহা কি সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? এই নক্সায় তাহার কারণ বুঝিতে পারা গেল: তুর্করা টেসিফনে আসিয়া ঘাঁটি করিবে। যদি তথায় তাহারা পরাভূত হয়, তবে বাগদাদরক্ষার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া বাগদাদ ত্যাগ করিয়া উত্তরে কোথাও সরিয়া যাইয়া আড্ডা লইবে।

ইহুদীদিগকে পরদিন আসিতে বলিয়া নক্সা লইয়া দায়ুদ টাউনসেণ্ডের কাছে গেল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া টাউনসেণ্ডের কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন না করিয়াই দায়ুদ বলিল, "আমি তুর্কীর সেনাসন্নিবেশের নক্সা পাইয়াছি।"

টাউনসেণ্ড চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার চিন্তাবিষ্ট শীর্ণ মুখে আনন্দের আভা দেখা গেল চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে নিজ করে দায়ুদের কর চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পর নক্সাখানি টেবলের উপর বিছাইয়া উভয়ে তাহা দেখিতে লাগিলেন। এ যেন শত্রুর গুপ্ত অস্ত্র তাহাদের হস্তগত হইল! যে এই অস্ত্র আনিয়া দেয়, সে কত আদরের বন্ধু! কোন্ পথে কি ভাবে তুর্কী সেনা পরিচালিত করিবে, তাহা জানা গেল। এইবার আত্মরক্ষার ও শত্রুকে আক্রমণের সুবিধা হইল। যেন দুর্গের যে রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিবার কোন উপায় তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, সেই দ্বার সহসা মুক্ত হইয়া গেল! ভাগ্যদেবতা তবে প্রসন্ন! তবে বাগদাদ বিজয়ের গৌরব তাঁহারই করতলগত হইবে যে পথে এক দিন পৃথিবীজয়ের দুরাশামত্ত বীরবর নেপোলিয়ন প্রাচী আক্রমণের কল্পনা করিয়াছিলেন, সে পথ তিনিই ইংরাজের অধীন করিতে পারিবেন—তিনিই জার্ম্মাণীর দর্পকেতন পরাজয়ের কর্দ্দমে ফেলিয়া পদদলিত করিবেন—তিনিই য়ুরোপে দুর্ব্বল তুর্কীর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে সহায় হইবেন—ইতিহাসে তাঁহার

বিজয়কীর্ত্তি বর্ণিত হইবে। অদৃষ্টের অন্ধকারে কুট-এল-আমারার কথা তিনি কল্পনাও করিতে পারিলেন না।

এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী কয় দিন হইতে কর্ম্মচারীদিগের একখানি ফটো তুলিবার অনুমতি চাহিতেছিল। আজ টাউনসেণ্ড তাহাকে ডাকিয়া অনুমতি দিলেন; বলিলেন, "আকাশ পরিষ্কার, আমাদের অদৃষ্টও এই রৌদ্রের মত সমুজ্জ্বল হইবে। আজ ফটো তুল।"

ফটো তুলিবার সময় তিনি ইংরাজের বিপদে বন্ধু বলিয়া দায়ুদকে পার্শ্বে বসাইলেন; অন্য কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, "যে ইহুদী দেখিবে, ইংরাজ সাহায্যকারীকে কত আদর করে, সেই ইংরাজের সাহায্য করিতে আগ্রহী হইবে।"

পরে সে কথা শুনিয়া দায়ুদ তাঁহাকে ফটোগ্রাফখানির প্রকাশ বন্ধ করিতে বলিয়াছিল; কারণ, তুর্কীরা জানিতে পারিলে আর কোন ইহুদীকে বিশ্বাস করিবে না এবং বহু মালো ইহুদীর দ্বারাই তাহাকে সব সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু প্রচারনিষেধের আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি ফটোগ্রাফ নানা সৈনিকের হস্তগত হইয়াছিল এবং যাহারা অসুস্থ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা লইয়া গিয়াছিল।

নক্সা হস্তগত হইবার পর দায়ুদের প্রতি টাউনসেণ্ডের বিশ্বাস অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল।

দায়ুদ সংবাদসংগ্রহবিভাগ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিল। এবার যখন সেই দুই জন ইহুদী পশারিণী ইহুদাকে লইয়া আমীরের রাজধানীতে পণ্য বিক্রয়ের ছলে গেল, তখন তাহারা পথে মধ্যে মধ্যে ঘাঁটি বসাইয়া গেল। প্রতিদিন ফরিদা যে সংবাদ দিত, তাহা ঘাঁটির পর ঘাঁটি হইয়া দ্রুত আমারায় আসিত। টাইগ্রীসের খরস্রোত দ্রুত সংবাদবহনে তাহাদের সহায় হইত।

সৈনিকদল রক্ষায় তুর্কী আমীরকে সর্ব্বপ্রধান সহায় করিয়াছিল। আমীরের রাজধানীর সব গুপ্ত সংবাদ সাহিদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ফরিদা প্রতিদিন ইংরাজশিবিরে পাঠাইয়া দিতে লাগিল। সংবাদসংগ্রহে ফরিদার আগ্রহ দেখিয়া সাহিদ মনে করিতেন, সে তাঁহাকে লাভ করিতে এতই ব্যস্ত হইয়াছে যে, কবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবে, তাহাই বুঝিতে ব্যাকুল হইয়াছে। রমণীরূপলাবণ্য কুশাগ্রবুদ্ধি সাহিদকেও এমনই ভাবে ভুলাইয়াছিল!

[ক্রমশঃ।

উদ্বোধন

বাজে রে শঙ্খ বাজে
জননীর স্নেহ   আহ্বান ওই
বাজে মন্দির মাঝে।

জাগিয়া উঠিল লক্ষকোটি প্রাণ
মোহ-ঘুমে যারা ছিল ম্রিয়মাণ,
নূতন আলোকে   আকুল পুলকে
ছুটিল মায়ের কাছে।

শিরায় শিরায়   আজি বহে যায়
আগুনের মত রক্ত;
ছুটে দলে দলে   সবে 'মা' 'মা' ব'লে
মন্দিরে শত ভক্ত।

ভুলিয়া গিয়াছে মান-অভিমান,
মিলন সূত্রে বাঁধিয়াছে প্রাণ,—
'ভাই' 'ভাই' ব'লে   ধরি গলে গলে
(মায়ের) চরণ সেবিয়া রাজে।

শ্রীবেলা গুহ।

গ্লাসগো দেখিয়া যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে মদ্যব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য ২রা অক্টোবর (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে) সন্ধ্যায় আমরা কার্লাইলে উপনীত হইলাম। কার্লাইলে পোর্ট সানলাইটের কর্ত্তাদের নিমন্ত্রণ পাইলাম—তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের কারখানা-সহর দেখাইতে ইচ্ছা করেন; আমরা তথায় যাইলে বিশেষ আনন্দিত হইবেন। সেই নিমন্ত্রণ পাইয়া আমরা পরদিন চেষ্টারে উপনীত হই ও তথায় কুইন হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মোটরে পোর্ট সানলাইটে যাই।

পোর্ট সানলাইটকে আমি কারখানা-সহর বলিয়াছি। লোকে ব্যবসার ইন্দ্রজাল বলে, এই সহর দেখিলে তাহার স্বরূপ বুঝা যায়। বিলাতে আমরা যে সব বড় বড় কারখানা দেখিয়াছিলাম, সানলাইট সাবানের কারখানা সেগুলির অন্যতম। ইহার বৈশিষ্ট্য কারখানাটির জন্যই একটি সহর গঠিত হইয়াছে। ব্যবসার ইন্দ্রজালে জলাভূমিতে সহর গড়িয়াছে।

সানলাইট সাবান পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আর সানলাইট সাবানের বিজ্ঞাপনের ইংরাজী ছড়া "Just a little water and just a little tub"—প্রভৃতি অনেকেরই নিকট পরিচিত।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে উইলিয়াম হেসকেথ লেভার ওয়ারিংটনে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। তখন কারখানায় সপ্তাহে ২০ টন (প্রতি টন ২৮ মণ) সাবান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা ছিল। সাবানের কাটতি যেমন বাড়িতে লাগিল, কারখানাও তত বাড়ান হইতে লাগিল। প্রথমে সপ্তাহে ৯০ টন, পরে ২ শত ৭০ টন ও শেষে ৮ শত ৫০ টন মাল উৎপন্ন করিয়া সরবরাহ করা হইতে লাগিল। শীঘ্রই এই কারখানায় কুলাইবে না, বুঝিতে পারিয়া দূরদর্শী ব্যবসায়ী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে ছিলেন। স্থানটি গ্রামের কাছে হওয়া প্রয়োজন এবং তাহাতে ও রেলে পণ্যের উপকরণ আনাইবার ও পণ্য চালান দিবার সুবিধাও থাকা চাই। বাছিয়া বাছিয়া তিনি লিভারপুলের পরপারে ব্রমবরো পুল পসন্দ করিলেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ তারিখে তাঁহার পত্নী তথায় কার্য্যারম্ভের সূচনা করিয়া দিলেন।

এই স্থানেই একটা বিষয় বিশেষরূপ লক্ষ্য করা

ওয়ারিংটনে কারখানা

প্রয়োজন। আমরা আজ বুঝিয়াছি, দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান হইবে না। এ সময় পোর্ট সানলাইটের উন্নতির ইতিহাস মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব -রাতারাতি বড় হইবার চেষ্টায় অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া পণ্যের টানের সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহের ব্যবস্থা বড় করাই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের উপায়। অভিজ্ঞতা এক দিনে লাভ করা যায় না। মোটা লাভও এক দিনে হয় না। ইহা ব্যবসায়ের এই মূল কথা মনে রাখিয়া কায করাইতেই সান লাইট সাবানের অধিকারীরা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ারিংটনে ছোট কারখানা করিয়া ক্রমে আজ পোর্ট সানলাইটে বিরাট কারখানা-সহর রচনা করিতে পারিয়াছেন। কারবার বড় হইলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সেটি যৌথকারবারে (Limited Liability) পরিণত করা হয়। মূলধন স্থির হয় ২৫ কোটি টাকা।

পোর্ট সানলাইটের সাফল্যে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় --শ্রমিকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার। যে দিন এই স্থানে কারখানা পত্তনের কায আরম্ভ হয়, সেই দিনই মিষ্টার লেভার বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কল্পনা -এই স্থানে তাঁহারা স্নানাগার ও উদ্যানশোভিত সহর করিয়া শ্রমিকদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

ক্রমে ক্রমে জমী বাড়াইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পোর্ট সানলাইটে ৪ শত ৭২ একর জমীর উপর সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ৭টি কারখানায় সপ্তাহে ৪ হাজার টন সাবান প্রস্তুত হয়, আর তদ্ভিন্ন গ্লিসারিণ ও তৈল প্রস্তুত করিবার কারখানা, ছাপাখানা, ডক, রেলের সাইডিং, হেড আফিস প্রভৃতি আছে। ব্যবসা কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হয়, সানলাইট সাবান বিক্রয়ের জন্য অষ্ট্রিয়ায়, বেলজিয়মে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণীতে, হলাণ্ডে, সুইটজারলাণ্ডে, অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও জাপানে শাখা আছে। তৈলের জন্য প্যাসেফিকে কোম্পানীর নারিকেলগাছের বাগান এবং বেলজিয়ান কঙ্গোয় তালবাগান আছে। আর তৈলের কল আছে পোর্ট সানলাইটে, সিডনীতে, ডারবানে, লগসে ও ওপোবিয়োয়।

পোর্ট সানলাইটে কারখানা।

শ্রমিকদিগের স্বার্থের সহিত মহাজনের স্বার্থের সামঞ্জস্য সংরক্ষণের যে চেষ্টা এই কারবারে হইয়াছে, তাহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। শ্রমিকদিগের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সব বাড়ী ভাড়া দিয়া লাভ করা কোম্পানীর উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে শ্রমিকরা সুখে বাস করিতে পারে--পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করে ও সর্ব্ব-বিষয়ে উন্নতির পথ দেখিতে পায়, তাহাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। পোর্ট সানলাইটের কর্ত্তারা ইহাকে "লাভের অংশ"দান (Prosperity-sharing) বলিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় কেবল যে শ্রমিকরা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নানারূপ উন্নতির উপায়-সন্ধান পায়, তাহাই

নহে ; পরন্তু তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাও সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় না।

প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে একটি করিয়া উদ্যান আছে. পাছে কোন গৃহসংলগ্ন উদ্যান শ্রীহীন হইয়া সমগ সহরের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করে, সেই আশঙ্কায় কোম্পানীই সে সব বাগান রক্ষার ভার লইয়াছেন। দেখা গিয়াছে, অতি অল্প-ব্যয়ে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক উদ্যানে অতিরিক্ত ১ টাকা এই ৫ টাকা হিসাব করিয়া ভাড়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বাড়ীর পশ্চাতে যে জমী আছে বার্ষিক ২ টাকা ৮ আনা ভাড়া দিলেই তাহা পাওয়া যায়। শাকসব্জী উৎপন্ন করিতে যে জল লাগে, তাহা কোম্পানী বিনামূল্যে প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক শ্রমিক এই জমীতে শাক-সব্জী করিয়াও লাভবান্ হয়।

ইহাতে এক দিকে যেমন কোম্পানীর বদান্যতার প্রশংসা

হেড আফিসের একাংশ

সপ্তাহে ৩ আনা মাত্র ব্যয় পড়িত। তদ্ভিন্ন গৃহের পশ্চাতে জমী আছে। গৃহবাসীরা ইচ্ছামত তাহাতে সব্জীবাগ করিতে পারে বা মুর্গী প্রভৃতি রাখিতে পারে।

গৃহগুলি সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহাই ভাড়ারূপে লওয়া হয়। মাসিক ৩২ টাকা ভাড়ায় এইরূপ গৃহ ভাড়া পাইবার কল্পনাও অন্যত্র লোক করিতে পারে না গৃহনির্ম্মাণব্যয়ের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে সুদ ও করিতে হয়, অপর দিকে তেমনই শ্রমিকদিগের শ্রমনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের দেশে যে আলস্যহেতু আমরা বাড়ীর সম্মুখে কচু ও কালকাসুন্দার জঙ্গল সাফ করি না বাড়ীর উঠানে আঁস্তাকুড়ে আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত করি এবং বাড়ীর পার্শ্বেই পানা ডোবা রাখিয়া বাস করি, সে আলস্য সেবা করিলে এমনভাবে বাস করা যায় না—এমন লাভবান্ হওয়া যায় না। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কারণের

সহিত এই জাড্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা আজকাল হইতেছে. কিন্তু এই জাড্য পরিহার করিলে যে আমাদের অন্নসংস্থানের সুবিধা হয় এবং পূর্ণাহারে আমরা সবল হইতে পারি, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। এ দেশে বড় সহর ব্যতীত আর প্রায় সর্ব্বত্রই বাড়ীতে একটু জমী থাকে. কয় জন সেটুকুতে শাকসব্জী বা ফুল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন? দেখিবার পরিশ্রমের ভয়ে আমরা অনেকে বাড়ীতে গরু হইয়াছে এবং তাহার জন্য প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের অঙ্কিত বহু চিত্র বহু ব্যয়ে ক্রীত হইয়াছে।

কোম্পানীর ব্যয়ে অল্পবয়স্ক শ্রমিকরা সান্ধ্যস্কুলে পাঠ করিতে পারে এবং বালকবালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় আছে পোর্ট সানলাইটে হাসপাতালের সুব্যবস্থা আছে এবং যে সব স্ত্রীলোক কারখানায় কাজ করে, তাহারা অবসরকালে বিশ্রাম করিবে বলিয়া সুসজ্জিত বিশ্রামাগারও করা হইয়াছে

শ্রমিক-গৃহ ·

রাখি না. তাঁহারা সেই সব "জমাট-শুষ্ক" দুধের টিন কিনিয়া ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করি. আপনাদের এ সব ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইয়া সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে.

পোর্ট সানলাইটের অধিকারীরা সহরে খেলিবার স্থান, বক্তৃতাগার, পুস্তকাগার, চিত্রশালা, গির্জ্জা, ক্লাব প্রভৃতি করিয়া দিয়াছেন. লেডী লেভারের নামে প্রতিষ্ঠিত হুম (Hulm) হল ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত

কাজের সময় মধ্যাহ্নে শ্রমিকরা যে আহার করে, সে জন্য কারখানায় স্বতন্ত্র গৃহ আছে. পুরুষদিগের ও নারীদিগের কক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র. তথায় যে আহার্য্য প্রদত্ত হয়, তাহাতে লাভ করা হয় না. ঠিক খরচ খতাইয়া মূল্য লওয়া হয়। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পূর্ব্বে নারী-শ্রমিকরা ৩ আনা দিলে মাংস, তরকারী ও পায়স পাইত. তাহাদের জন্য স্নানাগারও আছে।

এই বিরাট কারখানায় কত লোক কাম করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য কত চেষ্টা করা হয়, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি আর কয়টি কথা বলিব।— ইহাদের জন্য ছুটীর ক্লাব আছে; সেই ক্লাবে যাহারা সঞ্চয় করে, তাহাদিগকে সময় সময় বাহিরে প্রদর্শনীতেও লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সহ-অংশী হয়; সাধারণতঃ ইহারা বৎসরের বেতনের শতকরা ১০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাভ পাইয়া থাকে। লাভ অধিক হইলে তাহাদের লাভও অধিক হইবে বলিয়া শ্রমিকরা সার্টিফিকেটের সর্ত্ত অনুসারে সময় বা উপকরণ নষ্ট করে না বার্দ্ধক্যাদি কারণে কেহ কাষ ত্যাগ করিয়া গেলে তাহার পুরাতন অংশের সার্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার

বালক বালিকাদিগের বিদ্যালয়

দীর্ঘকাল চাকরী করিলে সে জন্য প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় এবং কেহ ২০ বৎসর কাষ করিয়া ৬৫ বৎসরে (স্ত্রীলোকরা ৬০ বৎসরে) অবসর গ্রহণ করিলে বা তৎপূর্ব্বে অসুস্থতা হেতু অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে সে কিছু অর্থ পায় বিধবা ও পিতৃহীনদিগের সাহায্যের ব্যবস্থাও করা হয় আবার শ্রমিকদিগের সাহায্যের জন্য Co-Partnership নামক একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ২৫ বৎসর বয়সের যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমিক ৫ বৎসর কাষ করিলে

সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাহাতে সে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে না পাইয়া ৫ টাকা হিসাবে পাইবার অধিকারী হয়।

যেরূপ স্বাস্থ্যকর ভাবে শ্রমিকদিগের বসবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সুফল পোর্ট সানলাইটে জন্মমৃত্যুর হারে বেশ বুঝিতে পারা যায়। পোর্ট সানলাইটে জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক অধিক; মৃত্যুর হার যে স্থানে ৯·৭, জন্মের হার সে স্থানে ২৬·৮।

এই কারখানা-সহরে শ্রমিকদিগের বসবাসের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে আর একটা উপকার হয়। তাহাতে শ্রমিকরা পারিবারিক জীবনে আকৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির প্রসারবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ হয়। উটজ শিল্পের সহিত বড় বড় কলকারখানার—বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এই স্থানেই প্রবল প্রভেদ। কলকারখানার শ্রমিকরা সামাজিক জীবন হইতে দূরে যাইয়া অনেক সময় দুর্নীতি-পরবশ হয় আপনাদের সর্ব্বনাশ করে এবং সমাজকে অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে টানিয়া লইয়া যায়। উটজ শিল্প শিল্পীকে তাহার গ্রামে স্বগৃহে পারিবারিক পুণ্য পরিবেষ্টনে পণ্য উৎপন্ন করিবার সুযোগ দিয়া প্রলোভন হইতে রক্ষা করে। উদরান্ন সংস্থান করিবার জন্য বড় বড় কারখানায় কায করিতে আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া কত নারী যে আপনাদের সর্ব্বনাশ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে হিসাবে বড় বড় কারখানাগুলিকে সমাজের সর্ব্বনাশ-সাধক ব্যাধির কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পোর্ট সানলাইটের অধিকারীরা যে উপায়ে বর্ত্তমানকালের বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এই বিষম সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমাদের দেশেও ক্রমে এইরূপ বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দুর্নীতির উৎস উন্মুক্ত হইতেছে ; এ সময় পোর্ট সানলাইটের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানপ্রতিষ্ঠাতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলে ভাল হয়। নহিলে আমাদের সমাজেও দুর্গতির অন্ত থাকিবে না।

কারখানার একাংশে ছাপাখানায় আবশ্যক লেবেল প্রভৃতি ছাপা হইতেছে। বাক্স প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও কারখানার মধ্যে আছে।

আর সাবানের কারখানার বিরাটত্বে যেন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়।

আমরা যে দিন পোর্ট সানলাইটে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম, সে দিন রবিবার ; কারখানার কায বন্ধ। কিন্তু আমাদিগকে দেখাইবার জন্য আবশ্যক কায চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাবানের কারখানায় প্রকাণ্ড ঘরের চারিদিকে বারান্দা—তথায় বড় বড় চৌবাচ্চায় সাবানের উপকরণ রক্ষিত ও মিশ্রিত হইয়া কটাহে নীত হইতেছে। তথায় জ্বাল দিয়া তাহা সাবানে পরিণত হইলে চতুষ্কোণ নলে বাহিত হইতেছে—নলের উপরিভাগ মুক্ত। সেই নল হইতে সমদূরবর্ত্তী ভাবে সরু নল নামিয়া আসিয়াছে—প্রত্যেকটির নিম্নে টেবল। টেবলের উপর ছাঁচে সাবান পড়িতেছে এবং ছাঁচ কলেই সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক টেবলের পাশে এক জন করিয়া নারী দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কলে কোথাও কোন দোষ হইতেছে কি না।

নারী-শ্রমিকদিগের বিশ্রামাগার

সাবানের ছাঁচ নানা আকারের—দেশভেদে ছাঁচের আকার ভিন্ন হয়। যে দেশে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত, সে দেশের জন্য সেই ওজনের সাবান প্রস্তুত করা হয়। ভারতে সিকি চলিত আছে, ৪ আনা দামের সাবান ভারতের জন্য প্রস্তুত হয়। সেইরূপ মিশরে পিয়াস্তার চলিত থাকায় ২ পিয়াস্তার বা ৫ আনা দামের সাবান তথায় প্রেরিত হয়। আবার শ্যামদেশে অন্য ওজনের সাবান চালান হয়।

নারী-শ্রমিকরা আহার করিতেছে

এই কারখানায় কেবল যে সানলাইট সাবানই প্রস্তুত হয়, তাহা নহে। প্রথম উপকরণ যে সাবান তাহাতে নানারূপ গন্ধ দিয়া নানা আকারের নানা প্রকার সাবান বাজারে চালান দেওয়া যায়। দেখিলাম, পৃথিবীর বিখ্যাত "ভিনোলিয়া" সাবান এই কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। আবার এই কারখানাতেই আর এক জাতীয় "সাবান" প্রস্তুত হয়। তাহা পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত হয় এবং ব্রুকস মঙ্কি ব্রাণ্ড অর্থাৎ বানর মার্কা সাবান নামে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সুপরিচিত।

কি বিরাট ব্যাপার! দেখিলে প্রথমে মনে হতাশার সঞ্চার হয়। যাহারা এত বড় কারবার করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেমন করিয়া সাফল্য লাভ করিব? কিন্তু মনে করিলাম, ইহারাও এক দিনে এত বড় কারবার করে নাই, করিতে পারে নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সানলাইট সাবানের কারখানা ছোটই ছিল। আমাদের ছোট কারবারই বা কেন ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিবে না? আমাদের দেশেও ছোট ছোট সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অভিজ্ঞতার ও কার্য্যদক্ষতার ফলে সেগুলিই বা কেন এইরূপ আকার ধারণ করিবে না? "না হও নিরাশ।" জাতির পরমুখাপেক্ষিতার দুর্দ্দশা দূর হইবে।

"সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর প্রাণপণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না, মানব।

* * * *

সঙ্কল্প সফল হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে;
সময়ের সার বর্ত্তমান।"

কারখানা ঘুরিয়া আমরা সহরের একটু অংশ দেখিতে বাহির হইলাম। সে দিন রবিবার ছুটী; ছেলেমেয়েরা

সাবান হাতে বাক্সে ভরা হইতেছে।

বাগানে খেলা করিতেছে; প্রশস্ত রাজপথে (রাজপথ প্রায় ৯০ ফিট প্রশস্ত) সুবেশসজ্জিত নরনারী গতায়াত করিতেছে তাহারা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। বাগানে গাছে এবং বাড়ীর প্রাচীরে ও ছাতে লতায় ফুল। চারি দিকে কেমন যেন প্রাচুর্য্যের ও সন্তোষের ভাব।

ফিরিয়া আসিয়া কারখানার ম্যানেজারের গৃহে আমরা আহার করিলাম। তাহার পর বিদায়ের পালা। দ্বারের কাছে সোপানের উপর আসিয়া ম্যানেজার আমাদিগকে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন ছবি তুলা হইবে।

ছবি তুলা হইলে তিনি আসিয়া আমাদিগকে মোটরে তুলিয়া দিলেন। যখন সেই সঙ্গে প্রত্যেক অতিথির জন্ম একটা কাঠের বাক্সভরা নানারূপ সাবানও দিয়া উপহাররূপে তাহা গ্রহণ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন, তখন হেমচন্দ্রের সেই কবিতা আমার মনে পড়িল—

"খেয়ে যান নিয়ে যান—আর যান চেয়ে,
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

আমরা আবার চেষ্টারে ফিরিয়া চলিলাম।

যতক্ষণ পোর্ট সানলাইটে ছিলাম, ততক্ষণ যাহা ভাবিয়া ছিলাম, চেষ্টারে ফিরিবার পথেও তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। যাহারা ব্যবসায়ে এত অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদিগকে স্বদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পথ বিঘ্নবহুল। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা নিরাশ হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইব? যে সকল গুণে—যে সাধনায় ইহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমাদের পক্ষে সে সকল গুণ অর্জ্জন করা, সে সাধনা করা অসম্ভব নহে। যাহা অন্তের কাছে অসম্ভব হয় নাই,

আমাদের কাছেই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন? হয় ত কোন কোন বিষয়ে আমাদিগকে অসাফল্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু তাহাতে ভয় কি? চেষ্টার অসাধ্য কায নাই।

বিশেষ আমরা যদি সকলে একযোগে চেষ্টা করি, তবে সাফল্য বিলম্বিত হইবে কেন? ভারতবর্ষে আমরা বহুদিন হইতে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার সহায়তাকল্পে বিদেশী পণ্যের উপর রক্ষাশুল্ক সংস্থাপন করিবার কথা বলিয়াছি ও বলিতেছি। বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক মিষ্টার অষ্টিন চেম্বারলেন স্বীকার করিয়াছেন—শিক্ষিত ভারতবাসীরা মনে মনে সকলেই সংরক্ষণনীতির সমর্থক এবং সুযোগ পাইলে তাহারা বিলাতী পণ্যের উপরও শুল্ক সংস্থাপিত করিয়া দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু শুল্কসংস্থাপনের অধিকার আমাদের নাই। কেন-না, আমরা স্বায়ত্ত-শাসনশীল নহি, পরন্তু বিজিত। যে ইংরাজ সরকার ভারত শাসন করিতেছেন, তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক সংস্থাপিত করিবেন অর্থাৎ স্বদেশের ক্ষতি করিয়া ভারতের উপকার করিবেন, এমন আশা অবশ্য করা যায় না।

"— —মাটী কাটি লভি কোহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়,
কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটী মাখিয়া প্রচুর?"

কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে দেশীয় শিল্পকে যে সাহায্য দিতে পারি, রক্ষাশুল্কেও সে সাহায্য হয় কি না, সন্দেহ। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি, স্বদেশী পণ্যই ব্যবহার করিব।

কলে সাবান বাক্সে ভরা হইতেছে।
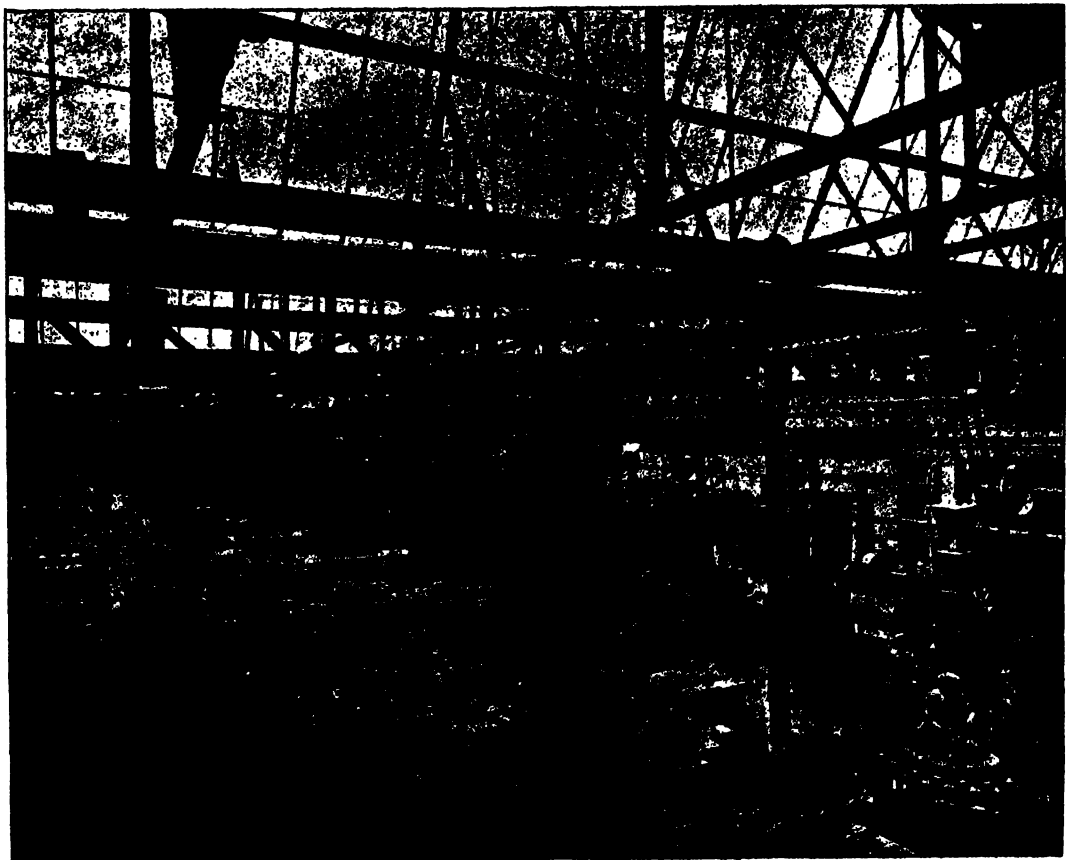
পোর্ট সানলাইটে ভারতীয় সম্পাদকগণ।

এ বিষয়ে আমরা বিলাতের দৃষ্টান্তেরই অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে পারি। বিলাতের রাস্তায় বিলাতী পণ্যের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—"স্বদেশী শিল্পের সাহায্য করুন।" যে দেশপ্রেম মানুষকে দেশের জন্য প্রাণপাতও করিতে প্রোৎসাহিত করে; যাহাতে মানুষ মনে করে "দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"—৩৩ কোটি ভারতবাসীর মনে যদি সেই দেশপ্রেম প্রস্ফুরিত হয়, তবে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে কি আর বিলম্ব হয়? সেই প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে আমাদের কি আর কোন শক্তির অভাব থাকিতে পারে?

কৈলাস যাত্রা

পঞ্চদশ অধ্যায়

মঙ্গলবার ২৩শে জুলাই ৭ই শ্রাবণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা অপরাহ্নকালে দারচিনে উপস্থিত হইলাম। অবস্থান জন্য আমাদের নেতারা যে স্থান নির্ব্বাচন করিলেন, তাহা আমার মনের মত হইল না। স্থানটির চতুর্দ্দিকে কটিদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে. যাত্রীরা ইহার মধ্যে মেষ প্রভৃতি রাখিয়া থাকে; তাহাদের মলমূত্রের তীব্র দুর্গন্ধে স্থানটি পরিপূর্ণ। আমাদের দলের লোকের স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া স্থানটি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিকটে যদি অন্য ভাল স্থান দেখিতে পাই, তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। নিকটে এ স্থানের রাজকর্ম্মচারীর গৃহ। তথায় যদি ভাল স্থান পাওয়া যায়, সেই আশায় আমি গমন করিতে লাগিলাম। উত্তরাভিমুখে গমনকালে দেখিলাম, আমার দক্ষিণে কৈলাসের তুষার বিগলিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কল কল করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার সঙ্কীর্ণ স্থানে কয়েকখানি পাথর দিয়া গমনাগমনের জন্য রাস্তা করা হইয়াছে। এই পুলটি কৈলাস-পরিক্রমারও রাস্তা; যে সময় আমি এই রাস্তার নিকট উপস্থিত হইলাম, সে সময় দেখিলাম, কয়েক জন ভক্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া আগমন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যুবক-যুবতীও দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ চাপল্যের লেশমাত্র দেখিতে পাইলাম না। সকলেই ভক্তিগদ্‌গদভাবে তন্ময় হইয়া পরিক্রমা করিতেছেন। এইরূপ পরিভ্রমণে ১৫।২০ দিন সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। বাল্যকালে (প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা) এইরূপ দণ্ডবৎ প্রণামের দৃশ্য-দর্শনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থের ঘাটে স্নান করিয়া 'দণ্ড খাটিতে খাটিতে' ভক্তকে তারকেশ্বরে গমন করিতে দেখিয়াছিলাম, সে প্রায় ১২ ক্রোশ বা ২৪ মাইল পথ হইবে। কৈলাসের পরিক্রমা ৩০ মাইল হইবে। রাস্তা বিকট—স্থানে স্থানে উচ্চস্থান হইতে খাড়া নিম্নে রাস্তা গিয়াছে। সে স্থানে প্রণাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করা সামান্য ব্যাপার নহে।

রাজকর্ম্মচারীর গৃহে গমন করিলাম। তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী আমার কথা শুনিয়া, চতুর্দ্দিক দেখাইয়া একটা অন্ধকারপ্রায় কক্ষে আমায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহার মধ্যে রৌদ্রের প্রবেশপথ নাই, আকাশ ও বায়ুর প্রবেশ তথায় যেন নিষিদ্ধ; ইচ্ছা করিয়া শরীরকে কারাগারে রাখিতে স্পৃহা হইল না। প্রধান কর্ম্মচারী দ্বিতলের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সৌজন্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। কর্ম্মচারী মহাশয় বেশ ভদ্রপ্রকৃতির; যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি তাঁহার বেশ লক্ষ্য আছে, দেখিলাম।

দ্বারদেশে কয়টি ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার মধ্যে একটি বন্য অশ্ব; অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। তাহার সুগঠিত, পরিপুষ্ট অবয়ব বেশ সুন্দর। বন্য স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখিলাম। মনুষ্যপ্রদত্ত সুখ তাহাকে কোনরূপ আনন্দপ্রদানে সমর্থ হইতেছে না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য সে নানাপ্রকার প্রযত্ন করিতেছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া, যে স্থানে আমাদের ডেরা পড়িয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলাম। তখন আমাদের সঙ্গীদের সমবেত চেষ্টায় স্থানটি বেশ পরিষ্কার হইয়াছে; দুর্গন্ধও যেন অনেকটা কম বলিয়া বোধ হইল।

আজ ভোজনের জন্য খিচুড়ীর বন্দোবস্ত করা গেল। গতকল্য সমস্ত দিন, আর আজও অন্ন উদরগত হয় নাই। অন্নগতপ্রাণ আমরা অন্নের জন্য একটু ব্যাকুলও হইয়াছিলাম। ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতে আর প্রবৃত্তি হয় না। উচ্চস্থান বলিয়া চাল দাল সিদ্ধ করিতে একটু বিলম্ব হইল। রুটী প্রস্তুত করিতে কিন্তু বড় বেশী বিলম্ব হয় না।

বহুদূরদেশ হইতে যাত্রিসকল আগমন করিয়াছেন। অনেকে কৈলাস পরিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার আগমন করিতেছেন। "জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী", জীবমাত্রকে আনন্দবিহ্বল করিয়া, ভূতভাবন ভগবান যে

আনন্দস্বরূপ, যেন তাহাই প্রমাণ করিতেছেন! লীলাময় শ্রীভগবানের ইহা যেন লীলানিকেতন। তাই বুঝি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-জাল বিস্তার করিয়া প্রভু আমার তাঁহার প্রিয় নিবাসে ক্রীড়া করিতেছেন। পূর্ণকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রমা সুধাধারা বিতরণ করিয়া যেন জগৎকে সুধাসিক্ত করিতেছেন; এই সুধাসিক্ত রজনী তাঁহার প্রিয় বলিয়া কি তিনি সুধাংশুশেখর হইয়াছেন? তুষারকান্তিধবল ভগবানের এ রূপ যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যে কোন সম্প্রদায়-গত হউন না কেন, তাঁহাকে অভিভূত হইতে হইবে, তাঁহাকে মুগ্ধ হইয়া মস্তক অবনত করিতে হইবে, ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহাকে পুলকিত হইতে হইবে।

আশা পূর্ণ হইলে অবসাদ আসিয়া থাকে; সাফল্যজনিত এক প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়। আমাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ণিমা রাত্রির এ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইলাম না, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পৃষ্ঠে শয্যাস্পর্শমাত্র নিদ্রাদেবী আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। আমার এ অভ্যাসের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটস্থ স্থানে একটু বেড়াইতে লাগিলাম। কারণ, হ্রদের তটে শীত যেন একটু বেশী বোধ হইয়াছিল, অথচ চিরতুষারাবৃত কৈলাসের পাদদেশে ততটা বোধ হয় নাই। উদর পূর্ণ ছিল বলিয়া, বোধ হয়, শীত ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

বুধবারে আমরা দারচিনে অবস্থান করি। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল ভোজন করিয়া কৈলাস-পরিক্রমায় বাহির হওয়া যাইবে, স্থির হইল। পরিক্রমা পদব্রজেই বিধেয়; এ জন্য এ স্থানে ঝব্বু ও অতিরিক্ত বোঝা রাখিয়া শয্যা—রন্ধনপাত্র আর দুই দিনের উপযোগী আহার্য্যদ্রব্য লইব ঠিক করিলাম। এ সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য এক জন কুলীর দরকার। নেতা মহাশয় ভারবাহী আনিয়া দিলেন; তাহাকে দৈনিক সাড়ে চারি আনা হিসাবে দেওয়া হইবে স্থির হইল। পরিক্রমা করিতে ২ দিন লাগিয়াছিল; ৯ আনা পয়সায় তাহাকে ৩০ মাইল পরিক্রমার মজুরী দিয়াছিলাম।

যখন পরিক্রমার সব বন্দোবস্ত হইতেছিল, তখন আমার ভুটিয়া সঙ্গীরা আমাকে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আমাকে দারচিনে অবস্থান করিতে পরামর্শ দেন। এক জন বলিলেন, "প্রথমবারে যখন আমি আসি, সে সময় আমার অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। আপনি এ স্থানে থাকিয়া যাউন, কৈলাসের যখন দ্বারদেশ দর্শন করিলেন, তখন আর আপনাকে ক্লেশ করিতে হইবে না—অনেক চড়াই চড়িতে হইবে—অত্যন্ত কষ্ট হইবে। বৃথা এ কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।" প্রায় ১৯ হাজার ফিট উঠিতে হইবে। উচ্চতা বড় সামান্য নহে। এরূপ অবস্থায় হৃদয়ের স্পন্দনরোধ হইতে পারে! কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। এখন কি করি? মনে একটু সন্দেহ আসিল। দারচিনে কৈলাসের দ্বারে যখন এরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তখন না জানি, সর্ব্বোচ্চ স্থানে কত কষ্ট হইবে! এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইল। দুইটি বিষয় আমার এ সংশয় ও দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ-রূপে দূর করিয়া দিয়া নূতন বল ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। প্রথম, মৃতসঞ্জীবনী একটি শ্লোক, অপর আমার সুহৃদ্ ভুটিয়া নেতা। ভুটিয়া বন্ধু বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনি কোন কথায় কর্ণপাত করিবেন না, একটু কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু সে কষ্ট সহ্য করিবার সামর্থ্য আপনার প্রচুর পরিমাণে আছে। আপনাকে যাইতেই হইবে।" শ্লোকটি ২।৩ বার আবৃত্তি করিতে করিতে আমার জড়তা দূর হইল, যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে শরীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সাধারণে আমার প্রিয় মন্ত্রটি গ্রহণ করিবেন আশায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

একোঽহমসহায়োঽহং কৃশোঽহমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেঽপ্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥

আমি একাকী—আমি অসহায়—আমি দুর্ব্বল আমি অপরিচ্ছদ, এরূপ চিন্তা স্বপ্নেও মৃগেন্দ্রের আইসে না। যে যুগে ভারতবাসী ভুজবলে—বুদ্ধিবলে—চরিত্রবলে পৃথিবী জয় করিতেন, সে যুগের কবির এই কথা।

আমাদের অতি প্রাচীন সাহিত্যে কৈলাস-পর্ব্বত নানা প্রকার বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল, এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময় স্থানে স্থানে "বিচ্ছু" গাছ ব্যতীত কোনরূপ বৃক্ষলতার চিহ্নও তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? তাঁহারা কি না দেখিয়াই ইহার বর্ণনা করিয়াছেন? ইহা ত আমার বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, নৈসর্গিক

কালিদাস তাঁহার অমর কাব্যসমূহে নানা প্রদেশের ও নানা বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন। সে সকল পাঠ করিলে মনে হয়, সেরূপ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না।

চিরতুষারাবৃত কৈলাসের কথা কবিকুলতিলক কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কালিদাসের বর্ণনাপাঠে বোধ হয়, তিনি স্বয়ং কৈলাস দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কৈলাসের প্রথম দর্শন দিবাভাগে করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের কৈলাসের দৃশ্যের সহিত তাঁহার বর্ণিত কৈলাসের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কৈলাসের সহিত কালিদাসের বর্ণনার বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস মেঘকে কৈলাসের কাছে লইয়া গিয়া কহিয়াছেন :

> "গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ,
> কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
> শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
> রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

সুন্দর পরিত্যক্ত পাহাড়।

কারণে অবস্থাবিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে স্থান এক সময় শ্যাম বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহা তুষারাবৃত হইয়া মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়াছে। আমাদের ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন সরস্বতী প্রবাহিতা হইতেন, সে সময় (বর্ত্তমান মরুপ্রদেশ) নানা প্রকার হরিৎ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহার পর পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকাররা "মজা" সরস্বতী দেখিয়া তাহাকে "বিনশন" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মরুভূমির স্থানে স্থানে বর্ত্তমানকালেও প্রাচীনকালের নদীর অবস্থানচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ১৭ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অতিকায় জন্তুর অস্থির অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় এ সকল জন্তু এ প্রদেশে বাস করিত, সে সময় এ স্থান নানা প্রকার বনস্পতিপূর্ণ থাকা সম্ভব বটে।

পাশ হইতে তিব্বতের দিকে নামিতেছে।

হে বারিদ! তুমি একটু ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া (বোধ হয়, গরলা মান্ধাতাকে অতিক্রমণ করিবার জন্য কালিদাস মেঘকে ঊর্দ্ধদিক্ দিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন) কৈলাসের অতিথি হইবে। এই পর্ব্বত অত্যন্ত শুভ্র ও স্বচ্ছ হওয়ায় অমর-অঙ্গনাদিগের দর্পণস্বরূপ হইয়াছে। মহাদেব প্রতিদিন যে অট্টহাস্য করেন, সেই হাস্য সকল পুঞ্জীকৃত হইলে যেরূপ দেখায়, কৈলাস যেন সেইরূপ শোভা পাইতেছে। ঐ নগরাজ কুমুদশুভ্রশিখরশ্রেণী দ্বারা আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন দশমুখ রাবণ ভুজ দ্বারা ইঁহাকে উত্তোলন করাতে ইঁহার প্রস্থসন্ধি উচ্ছ্বসিত (ফাটিত) হইয়াছে।

এ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। ভক্তেরা বলিয়া থাকেন যে, যে সময় রাবণ কৈলাসকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সে সময়কার রজ্জুবন্ধনচিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তদল সাগ্রহে সে চিহ্ন দর্শন করিয়া থাকেন। সেই ভগ্ন স্থানে তুষার অবস্থান করিতে না পারাতে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। শৈব কালিদাস মহাদেবের অট্ট হাস্যের সহিত অনির্ব্বচনীয় কৈলাসের তুলনা করিয়া অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার প্রভাতের সহিত কৈলাসপ্রদক্ষিণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এক পাকের খিচুড়ী এরূপ অবস্থায় বড়ই উপযোগী; তাহাই পাক করিয়া ভোজনান্তে গমন জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল, অতিরিক্ত দ্রব্য সকল দারচিনে রাখিয়া দেওয়া হইল। ঝব্বু ওয়ালারা আমাদের পরিত্যক্ত শিবিরের রক্ষক নিযুক্ত হইল। আমরা নিশ্চিন্তমনে প্রায় ৯ টার সময় যাত্রা করিতে বহির্গত হইলাম। যাত্রাকালে যাত্রীরা সংযত মৌন-ভগবৎপ্রসঙ্গপরায়ণ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিব্বতী ভক্তরা কেহ বা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন—কেহ বা "মণিপদ্মে হুং" মন্ত্রপাঠ—কেহ বা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে গমন করিতেছেন। যাঁহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গমন করিতেছেন, তাঁহাদের স্থূল অঙ্গাবরণের উপর চর্ম্মের আচ্ছাদন থাকায় প্রস্তরঘর্ষণ হইতে বস্ত্র রক্ষিত হইতেছে, দেখিলাম। তাঁহারা কাহারও সহিত কোনরূপ আলাপ না করিয়া যেন চলন্ত প্রস্তরের ন্যায় গমন করিতেছেন। আমি কখন বাম দিকে রাবণ হ্রদের সুনীল জলরাশি, কখন বা মহাদেবের রাশীভূত অট্ট-হাস্য উপভোগ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। গমনকালে কখন কখন কৈলাসের চূড়া আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইতে লাগিল। এইরূপে আমরা নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের যাত্রী একত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ধনি-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সবল-দুর্ব্বল, নানা শ্রেণীর লোক সমবেত হইলেন; সকলেই নিজের অবস্থাগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া একভাবে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পশ্চিমাভিমুখে গমনের পর আমরা উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। এখন দৃশ্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। এখন বোধ হইল, যেন এক বিরাট পার্ব্বত্য দুর্গের পদতল দিয়া আমরা গমন করিতেছি। সেই দুর্গের স্থানে স্থানে আগ্নেয় অস্ত্র রাখিবার জন্য যেন স্থান সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রস্তর সকল স্তরে স্তরে নিবদ্ধ থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন, মনুষ্যের বাসোপযোগী প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল বিস্ময়প্রদ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বামদিকে একটু উন্নত ভূমির উপর নন্দিগুম্ফা দেখিলাম। এই গুম্ফা

তিব্বতী নৃত্য।

ভুটানের অধিপতি এক সময় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কোন কোন বিদেশী লোক বিস্মিত হইয়াছেন। বাস্তবিক ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কাশীতে যেরূপ ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যের নরপতিগণের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়—সেইরূপ কোটি কোটি বৌদ্ধ নরনারীর পবিত্র তীর্থস্থলে ভুটানাধিপতি মঠ নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা কিছু বিস্ময়কর নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দারজিলিংএর নিকটবর্ত্তী চুম্বী প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী আগমন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। দারচিনে যদি হিন্দু সাধু মতেরপন্থী বাবা ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিতেন, তাহা যেরূপ বিস্ময়ের বিষয় হইত না, সেইরূপ ভুটানাধিপতির মঠনির্ম্মাণও বিস্ময়ের বিষয় নহে। বহু যাত্রী উপরে নন্দি গুম্ফা দর্শন করিতে গেলেন। সাধারণ গুম্ফা যেরূপ হইয়া থাকে—ইহাও সেইরূপ। এক সময় উপরে কৈলাস হইতে একখানি বৃহৎ প্রস্তর নিপতিত হইয়া ইহাকে ভগ্নসঙ্কুল করিয়াছে।

এখন যাত্রীরা উত্তরাভিমুখে নদীর তট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কৈলাসের দক্ষিণের দৃশ্য যেরূপ উন্মুক্ত প্রান্তর এ স্থান সেরূপ নহে। উত্তরদিকে পর্ব্বত থাকায় যেন যাত্রিগণের হৃদয়ে অদ্ভুতরস সঞ্চারিত হয়। আমরা বহুজন একত্র হইয়া গমন করিয়াছিলাম বলিয়া সে নির্জ্জনতা সে ভীষণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। স্থানে স্থানে কৈলাস হইতে জলধারা পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, এক বিশাল রাজভবনের পয়ঃপ্রণালী হইতে বুঝি জলধারা পতিত হইতেছে। এই জলপতন জন্য প্রস্তর সকল বিবর্ণ হইয়াছে। এইরূপ দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলাম। যে সময় আমরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করি, সে সময় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইতে হইয়াছিল। ইহা পার হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বাভিমুখে গমনের সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের রচনা হইয়াছিল। এতক্ষণ আমরা বেশ পরিষ্কার নির্ম্মল আকাশ উপভোগ করিতে করিতে আসিতেছিলাম, এখন সমস্ত জগৎ যেন ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। এই অন্ধকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শ্বেতবর্ণে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন নানাবর্ণের প্রস্তর সকল তুষারাবৃত হওয়ায় সব একবর্ণ হইয়া গেল। এ দৃশ্য যদি আমরা উপভোগ না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, কৈলাস পরিক্রমের মধুরতাও বুঝিতে পারিতাম না। কটিদেশ পর্য্যন্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, কৃষ্ণবর্ণ ছত্র শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল, যেন বোধ হইল, ত্র্যম্বকের রাশীকৃত অট্টহাস্যে মগ্ন হইয়া গেলাম। এই অপূর্ব্ব অট্টহাস্য উপভোগ করিবার আমাদের শক্তি নাই, তাই আমরা মনে করিতে লাগিলাম, কতক্ষণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইব। বিপন্ন সামুদ্রিক ও মরুযাত্রী আশ্রয়ের জন্য দ্বীপ ও ওয়েসীসের কামনা করিয়া থাকে; আমরাও তখন মনে করিতে লাগিলাম, কতক্ষণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইব। তদভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম। যে গুম্ফার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহার নাম জুন-টুল-ফুক গুম্ফা, তিব্বতী এই শব্দের যদি বাঙ্গালা অনুবাদ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—অলৌকিক গুহা। এক সময় এই স্থানে বিস্ময়াপন্ন অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। আমাদের পক্ষেও এই গুহা অপূর্ব্ব অলৌকিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন আমরা তুষারাবৃত হইয়া আশ্রয়স্থানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম, সে সময় এই গুহা ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্টির ন্যায় আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল। গুহায় যাইয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্বেই অনেক যাত্রী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের অগ্রণীরাও অগ্রে গমন করিয়া আমাদের জন্য স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন; আর রাখিয়াছেন প্রজ্বলিত অগ্নি। এ অগ্নি আমাদের হিমজনিত কাতরতা হরণের পক্ষে উপযোগী হইয়াছিল। প্রিয়জনের সঙ্গের ন্যায় এ অগ্নি আমাদের আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য দীর্ঘ যষ্টির অগ্রভাগে তাহা বাঁধিয়া অগ্নির উপরে স্থাপন করিলাম। দেখিলাম, গুহানির্ম্মাণের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যে মসীপুঞ্জ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা যেন নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে। যষ্টি ও বস্ত্রের সংস্পর্শে পুঞ্জীভূত মসী আমাদের হস্ত ও বস্ত্রকে তদ্ভাবাপন্ন করিয়া তুলিল। যে গৃহে আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, তাহার নিম্নে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল, তাহার ধূমনির্গমনের জন্য আমাদের অবস্থান গৃহের মধ্যস্থলে একটি অবকাশ ছিল, তাহার মধ্য দিয়া ধূমপুঞ্জ বাহির হইতেছিল; সময় সময় আমাদের অবস্থানস্থানও ধূমপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া চক্ষুর্জ্বালা উপস্থিত করিয়াছিল। নানা দেশীয় ও জাতীয় যাত্রীর কলরবে সেই গৃহ মুখর হইয়াছিল।

নিম্নের অগ্নিকুণ্ডে রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন সম্পন্ন করা হইয়াছিল। এ ভোজনে কোন কষ্ট হয় নাই, বরং আনন্দই হইয়াছিল। লামা মহাশয় গুহার যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। ইনি আগ্রহের সহিত ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি দেখাইলেন। কিছু দক্ষিণা দিয়া তাঁহার প্রসন্নতাও লাভ করিয়াছিলাম।

ভোজনের পর শয়নের পূর্ব্বে প্রয়োজন হেতু নিম্নে গমন করিয়াছিলাম। তথায় উৎকট দুর্গন্ধ বোধ হয়। প্রত্যাগমন কালে সে দুর্গন্ধের স্থান দ্রুতবেগে অতিক্রম করায় বোধ হইল, যেন মৃত্যু আসন্ন; হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, বাক্ রোধপ্রায় ও চক্ষু কপালে উঠিবার প্রায় হইয়া উঠিল। উক্ত প্রদেশে দ্রুতবেগে গমনই ইহার কারণ হইয়াছিল। শয্যা প্রস্তুত ছিল, কোনরূপে তথায় গমন করিয়া বহুক্ষণ পরে সুস্থ হই।

আবার প্রাতঃকাল হইল; আবার গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। জুন-টুল-ফুক গুম্ফাকে চিরকালের জন্য বিদায় দিয়া নিম্নাভিমুখে কিছু অবতরণ করিতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ অবতরণের পর একটি ক্ষুদ্র সেতু পার হইলাম। ধীরে ধীরে এখন আমরা উপরে চাড়তে লাগিলাম। গতকল্য অপরাহ্নের সে বিরাট দৃশ্যের এক কণাও দেখিতে পাওয়া গেল না। কার্পাসকণার ন্যায় হিমানীপতনের কোনরূপ চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এ যেন সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য। এখন প্রকৃতি দেবী স্নিগ্ধ ও প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া আমাদের হৃদয়কে শান্তিরসে পরিপ্লুত করিতে লাগিলেন। গমনকালে রাস্তার নিম্নে ঝব্বুর লোমে নির্ম্মিত কৃষ্ণবর্ণ কয়েকটি শিবির দেখিতে পাইলাম। সেই শিবিরের রক্ষক সারমেয় সকল ভীষণ শব্দ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। সেই শব্দ পর্ব্বতমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। আমাদের দলপতি মহাশয় পাছে ইহা দস্যুদের শিবির হয় ভাবিয়া আমাদিগকে একত্র ও সতর্ক হইয়া গমন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শিবিররক্ষক ব্যতীত শিবিরবাসীরা আমাদের প্রতি কোনরূপ দুষ্টভাব প্রকাশ করে নাই।

ধীরে ধীরে আমরা উপরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃহৎ বৃহৎ নানাবর্ণে চিত্রিত প্রস্তর সকল আমাদের রাস্তার উভয় পার্শ্বে পতিত ছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি প্রস্তরখণ্ডের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলাম। এতক্ষণ বিশ পঁচিশ হাত যাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম; যত উপরে উঠিতেছিলাম ততই এই বিশ্রামের স্থান স্বল্পব্যবধান হইয়াছিল। শেষে এরূপ হইয়াছিল যে, চার পাঁচ হাত যাইয়াই বসিতে হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে শ্বাসকৃচ্ছ্রতাও অনুভব করিয়াছিলাম। যখন আমি অবসন্নপ্রায় হইয়াছিলাম, সে সময় এক অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। বোধ হইল, ভগবান্ প্রমথনাথ আমার সাহায্যের জন্য এক প্রমথ প্রেরণ করিয়াছেন। পরিচয়ে অবগত হইলাম, এই দৃঢ়কায় প্রমথ আর কেহই নহেন, লামার একজন লামা। তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি চার পাঁচ পা যাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম; তাঁহাকেও আট নয় পা যাইয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। স্থানের প্রভাব তিনিও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এইরূপে গমন করিয়া উলমা লা গিরিপথে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ১৯ হাজার ফিট উচ্চ। তিব্বতী ভক্তরা নানাবর্ণের পতাকা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা রজ্জুতে গ্রথিত করিয়া, এই গিরিপথের বিশাল মস্তকোপরি স্থাপন করিয়াছেন। এ স্থান হইতে কৈলাস ও নিকটবর্ত্তী দৃশ্য বিস্ময়াবহ। কৈলাস তখন একটি স্ফটিকনির্ম্মিত মন্দির বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। আমাদের অনতিদূর হইতেই কৈলাসের গাত্র তুষারাচ্ছাদিত হইয়াছে। আমরা আমাদের গন্তব্য সর্ব্বোচ্চস্থানে উপনীত হইয়াছি। এই স্থানে যাত্রীরা কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া ভজন, সাধন ও বিশ্রাম করিয়া থাকেন, আর সঙ্গের আনীত খাদ্য সকল পরস্পর বিতরণ করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। এই স্থানে, এক স্থানে ভক্তরা নিজ নিজ কেশ ও দন্ত শরীর হইতে উৎপাটন করিয়া অর্পণ করিয়া থাকেন। আমার একটি দন্ত কৈলাসযাত্রার প্রথম হইতে "চলিত" হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে এই স্থানে উৎসর্গ করিব, কিন্তু এ স্থানের জলবায়ুর প্রভাবে সে দৃঢ়মূল হয়। এখনও তিনি আমার দন্তশ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান আছেন, আমাদের আনীত খাদ্যের কিছু কিছু অংশ সকলকে দিয়াছিলাম; ভুটিয়ারাও তাহাদের চালকলাইভাজা প্রদান করিয়াছিল; আর দিতে আনিয়াছিল তাহাদের প্রস্তুত একপ্রকার মদ্য। প্রথমোক্ত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, শেষোক্ত পেয় লামা মহাশয়কে দেওয়াতে তিনি আনন্দিত হইয়া পান করিয়াছিলেন।

এইরূপে এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। গমনপথে তুষারাচ্ছাদিত গৌরীকুণ্ড দর্শন করিলাম। ইহার সমস্ত তুষার তখনও গলিয়া যায় নাই। যে স্থানে গলিয়া গিয়াছে, সে স্থানে নীল জল আর শ্বেত তুষার উভয়ের সম্মিলিত দৃশ্য বেশ নয়নরঞ্জন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, গৌরীকুণ্ডের জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিব; কিন্তু অবতরণ সুবিধাজনক নহে বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলাম।

এখন আমরা নামিতে লাগিলাম; নামাটাও খুব নীচের দিকে হওয়াতে খুব সাবধানতার সহিত অবতরণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অবতরণের পর আমরা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ গমনের পর জণ্ডুকোক নামক মঠের নিম্নে জলধারার তটে শক্তু গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্নের ভোজনক্রিয়া সমাপন করি। এখন আমরা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। আমাদের বামদিকে ববখার প্রান্তর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, বিশাল মানসসরোবর, আর গুরলা মান্ধাতার অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিলেন, অদ্য এই স্থানেই রাত্রিবাস করা যাউক। যখন আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, সেই সময় এক দল তিব্বতী দারচিন অভিমুখে গমন করিতেছেন, দেখিলাম। তাঁহারা অতি প্রত্যূষে দারচিন পরিত্যাগ করিয়া এক দিনেই কৈলাসপরিক্রমা সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিয়া আমরা সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম; আমরাও গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। পথে এক স্থান হইতে ভূটিয়া যাত্রীরা কৈলাসের রজঃ সংগ্রহ করিতেছিলেন দেখিয়া আমিও কিছু কৈলাসের রজঃ সংগ্রহ করিলাম। দুই দিনের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দারচিনে আমাদের পরিত্যক্ত আবাসগৃহে পুনরায় উপস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

আয়-ব্যয়

ছোট বড়

১
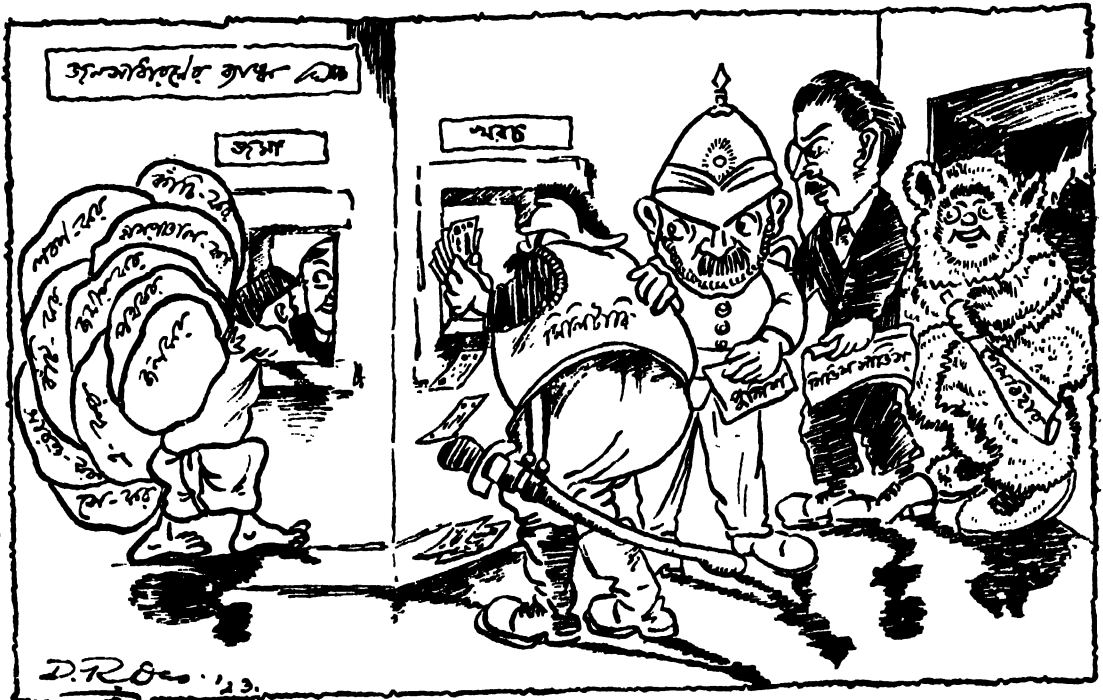
বেলপুকুরের বিশে ডোম দাঙ্গা-হাঙ্গামার অপরাধে বার বার তিন বার জেল খাটিয়া, এবং ডাকাতীর অপরাধে দুই বার প্রমাণাভাবে জেলের দরজা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাঠি ফেলিয়া যখন হরিনামের মালা ধরিল, তখন লোক তাহাকে 'অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ' এই প্রবাদ বাক্যের উদাহরণস্থল করিয়া তুলিল।

কিন্তু বিশু যে বাস্তবিকই লাঠি ধরিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে; বয়স পঞ্চাশ পার হইলেও তাহার দেহে তখনও যে শক্তি ছিল, অনেক ত্রিশ বৎসরের যুবকের দেহে তেমন শক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখনও বিশে ডোম লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইলে তাহার সম্মুখে অগ্রসর হয়, এমন লাঠিয়াল সে তল্লাটে ছিল না। তখনও সে 'বাও' (ব্যাম) ঠুকিয়া ইটের প্রাচীর না হউক, মাটীর দেওয়ালকে কাঁপাইয়া দিতে পারিত। বছর দুই আগেও তাহারই লাঠির জোরে চৌধুরী বাবুরা বাতাসপুরের বোস বাবুদের হাত হইতে রূপনারায়ণের চরটা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই দাঙ্গাই কিন্তু বিশুর শেষ দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় বোস বাবুদের তিন শত লাঠিয়ালের সম্মুখে বিশু একা যেরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাকে সেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। তা ছাড়া এই দাঙ্গায় বিশুকে যত মাথা ফাটাইতে হইয়াছিল, বিশু জীবনে কখনও তত মাথা ফাটায় নাই। কিন্তু এত অধিক মাথা ফাটাইবার জন্য বিশুর একটুও দুঃখ ছিল না,—লড়াই করিতে গেলে হয় নিজের মাথা ফাটিবে, নয় পরের মাথা ফাটাইতে হইবে, তা দুইটাই হউক বা দশটাই হউক। কিন্তু সেই দশ বিশটা মাথার সঙ্গে সে তাহার ওস্তাদ নকুড় সর্দ্দারের পুত্র অর্জ্জুন সর্দ্দারের মাথাটা কখন্ যে ফাটাইয়া দিয়াছে, নেশার ঝোঁকে, উত্তেজনার প্রাবল্যে তাহা আদৌ জানিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল, তখন ভয়ে বিস্ময়ে সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, লাঠি সমেত তাহার হাত দুইখানা দেহ হইতে যেন খসিয়া পড়িতেছে, পরলোকগত ওস্তাদজীর ক্রোধরক্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাহার শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব সব পুড়াইয়া দিতেছে। গুরুপুত্রের রক্তপাত! এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

প্রায়শ্চিত্তের উপায় বিশু খুঁজিয়া পাইল। চৌধুরী বাবুদের পয়সার জোরেই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, পুলিস তাহাকে ধরিতে না আসিলেও সে নিজে গিয়া খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ধরা দিল এবং নিজ মুখে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া হাজতে ঢুকিল। অম্বিকা চৌধুরী তাহাকে জামীনে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন; কিন্তু বিশু জামীনে মুক্তিলাভ করিতে চাহিল না, উকীলমোক্তারদিগের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সে হাজতবাস করিতে লাগিল।

বহু চেষ্টা সত্বেও অম্বিকা বাবু এই মোকর্দ্দমায় হারিয়া গেলেন। তাঁহার পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড ও বিশুর কঠোর পরিশ্রমসহ দেড় বৎসরের কারাদণ্ড হইল। বিশু প্রফুল্লচিত্তে জেলে ঢুকিল, অম্বিকা বাবু রাগে বিশে ডোমের মুণ্ডপাত করিতে করিতে অর্থদণ্ড দিয়া ম্লানমুখে ঘরে ফিরিলেন।

দেড় বৎসর পরে জেল হইতে খালাস পাইয়া বিশু শুনিতে পাইল যে, অর্জ্জুন আহত অবস্থায় যখন হাসপাতালে ছিল, তখন তাহার বড় ছেলেটি রোগে পড়িয়া বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে। উঃ, বিশে ডোম ওস্তাদজীকে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণাই দিয়াছে! বিশুর ইচ্ছা হইল, একবার সে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিয়া উঠিল না।

ঘরে ফিরিয়াই বিশু আপনার লাঠিগুলাকে চিরিয়া উনানে দিল। তার পর গৌরদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হরিনামে মনঃসংযোগ করিল। তাহার এই আকস্মিক হরিপ্রেমাসক্তি-দর্শনে লোক শুধু বিস্ময় অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহার এই ভণ্ডামীর অন্তরালে কি এক ভয়ানক অসদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, এবং অচিরেই যে কোন এক

শিল্পী—শ্রীআধাকুমার চৌধুরী

"ব'সেছি বিজন রাজপথ পানে চাহি
বাতায়ন তলে ব'সেছি ধূলায় নামি
ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি
হতাশ পথিক সে যে আমি সেই আমি।"

স্থানে ভীষণ ডাকাতী হইবে, সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া পড়িল।

২

"দীনের দিন গেলো হে হরি।
আমি ভজোন পূজোন কখোন্ কোরি?
দিন গেলো হে হরি।"

"হাদে মিন্‌সে, ভজোন পূজোন কর্‌বি কি খেয়ে বল্ তো?"

স্ত্রীর রোষগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যমুখে বিশু উত্তর করিল, "তিনি যা খেতে দেবে, গরব, তাই খেয়েই ভজোন পূজোন কর্‌বো।"

রোষবিকৃত মুখে ঝঙ্কার দিয়া গরব বলিল, "তিনি ছাই খেতে দেবে এবার।"

মৃদু হাসিয়া বিশু বলিল, "তেনার দেওয়া ছাই- সেই ছাই-ই যে অমৃত হয়, গরব।"

তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া তর্জ্জন সহকারে গরব বলিল, "সে অমেত্তো তুই পেটে ভ'রে খাস্। কিন্তু আমরা কি খাব?"

"তিনি যা জোটাবেন।"

রাগে কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে গরব বলিল, "দেখ্ মিন্‌সে, এতটা সাধুগিরি ভাল নয়।"

হাসিতে হাসিতে বিশু বলিল, "তবে কি ভাল, গরব; চুরী-ডাকাতী?"

"কেনে, চুরী-ডাকাতী ছাড়া আর কি কায নেই?"

"আছে, কিন্তু ভাল লাগে না।"

"তা ভাল লাগবে কেনে, ব'সে ব'সে খাচ্ছো, আর মালা ঠক্ ঠক্ কচ্ছো। কিন্তু মালা ঠক্‌ঠকই কর, আর যাই কর, আমাদের মা-পোয়ের একটা ব্যাবস্তা ক'রে দাও। আমরা এ রকমে উপোস দিয়ে তোমার মালা ঠক্‌ঠকানি দেখ্‌তে পার্‌বো না।"

সত্যই ত, সে না হয় নিজের পরকালের উপায় করিতেছে, কিন্তু এই একজন স্ত্রীলোক, একটি ছেলে, ইহাদের কি উপায় হইবে? সে নিজে কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য ইহারা কষ্ট সহিবে কেন? বিশুর হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। একটু ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল থালাখান বাঁধা দিয়ে কত এনেছিলে না?"

ঝঙ্কারের সহিত গরব বলিল, "হাঁ, অনেক এনেছি, মোটে আট গণ্ডা পয়সা। তার পাঁচ আনা আগেকার চালের ধার শোধ দিয়েছি, দু' আনার চাল এনেছি, তিন পয়সার নুণ-তেল এয়েচে। একটা পয়সা প'ড়ে রয়েছে।"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশু বলিল, "আর কিছু জিনিষপত্তর নেই?"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে গরব বলিল, "আছে একখান মেটে পাথর। কিন্তু রাখবে কে?"

বিশু চুপ্ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। গরব বলিল, "দেখ, যা হয় একটা উপায় কর বলছি। না হয় ত বল, আমরা মায়ে পোয়ে এক দিকে চলে যাই। এমন ক'রে আমি আর পেরে উঠবো না।"

গরব চলিয়া গেল। বিশু চিন্তা-গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল, "দীনের দিন গেলো হে হরি।"

কিন্তু গান আর ভাল লাগিল না, দিন চালাইবার কি উপায় করিবে, সেই চিন্তাতেই মনটা তোলাপাড়া করিতে লাগিল। গান ছাড়িয়া বিশু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় কে ডাকিল, "বিশু, ওহে বিশ্বনাথ!"

চমকিতভাবে বিশ্বনাথ উত্তর দিল, "কে গা?"

"আমি জয়রাম আকুলি।"

চৌধুরী বাবুদের গোমস্তা জয়রাম আকুলিকে বিশু বেশ চিনিত। নাম শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "কে, আকুলি মশাই? পেন্নাম।"

বাহিরে একটা ভাঙ্গা চালা ছিল সেখানে একটা খড়ের বিড়া আনিয়া দিলে আকুলি মহাশয় তাহাতে উপবেশন করিলেন। বিশু তামাক সাজিয়া আনিয়া কলাপাতার নল করিয়া তাঁহাকে তামাক খাইতে দিল।

৩

তামাক খাইতে খাইতে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তাই ত বিশু খুড়ো, কাযকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে তুমি একেবারে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে পড়লে দেখছি।"

দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বিনীতভাবে বিশু বলিল, "অমন কথা কইবেন না, আকুলি মশাই, আমি ছোট জাত, ডোমের ছেলে, সাধু গোঁসাইদের চরণে এক ফোঁটা জল দেবার শক্তিও আমার নেই।"

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক আকুলি মহাশয় বলিলেন, "ছোট জাত হ'লে কি হয় হে 'বিশুখুড়ো,' মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে!' তা বেশ, এ ত আর মন্দ কায নয়, তবে আমাদের ভুলে গেলে, এই যা দুঃখ।"

আকুলি মহাশয় বিষাদসূচক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বাস্তভাব সহিত বিশু বলিল, "অমনতর হুকুম করবেন না, আকুলি মশাই, আমি আপনকারদের দাস, আপনকারদের চরণের তলাতেই প'ড়ে রয়েছি।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে আকুলি মহাশয় বলিলেন, মুখে ত বরাবর প'ড়ে রয়েছি, কিন্তু কাযে ত তা' দেখতে পাইনে।"

যোড়হাতে বিশু বলিল, "হুকুম করলে আপনকারদের পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলতে পারি।"

কলিকাটা মাটীর উপর রাখিয়া, একটু চাপিয়া বসিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁত দিয়ে তুলতে হবে না, হাত দিয়েই তুলে দাও দেখি।"

"হুকুম করুন!"

"একটু গোপন জায়গা চাই।"

ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশু বলিল, "এখানে কেউ কোথাও নেই।"

আকুলি মহাশয়ও চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া লইলেন; তার পর একটু সরিয়া বসিয়া অতি নিম্ন স্বরে যে হুকুম করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—দুই এক দিনের মধ্যেই বোসেদের রহিমপুরে সদরকাছারী হইতে খাজনার টাকার বড় চালানটা যাইবে। সেই চালানটা লুঠ করিতে পারিলে এক পক্ষে অম্বিকা বাবুর যেমন লাভ, অপর পক্ষে বোসেদের তেমনই ক্ষতি। এই ক্ষতি সামলাইতে বোসবাবুদের অনেক বেগ পাইতে হইবে, চাই কি, উহাদের কতক মহালও যাইতে পারে।

হুকুম শুনিয়া বিশু শিহরিয়া উঠিল; ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মাপ করবেন, আকুলি মশাই, আমার দ্বারায় এ সব লাঠিবাজীর কায আর হবে না।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তোমার দ্বারায় এ সব কায হবে না ত আমার দ্বারায় হবে কি? আর তা হ'লে তোমার কাছেই বা আসবো কেন?"

বিশু বলিল, "আমার কাছে না এসে বীরু সর্দ্দারের কাছে গেলে ভাল হ'ত।"

তাচ্ছিল্যসূচক মুখভঙ্গী করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "আরে রেখে দাও বীরু সর্দ্দার। বীরু সর্দ্দারের ক্ষমতা কত, তা জানতে আমার বাকী নেই।"

বিশু বলিল, "না না, বীরু ত মন্দ লোক নয়।"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "সে আমার মত লোকের কাছে। চালানের সঙ্গে দু'টো ভোজপুরী থাকে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিশু বলিল, "রেখে দাও ত তোমার ভোজপুরী। সাতটা ভোজপুরীকে বগলে পূরে রাখতে পারি।"

উৎসাহসূচক স্বরে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "সে কথা কি আমি জানি নে বিশুখুড়ো, তুমি লাঠি ধরলে দু'শ বেটা ভোজপুরী কলাগাছের মত শুয়ে যায়? তা হ'লে দশটা টাকা বায়না দিয়ে যাচ্ছি, কায হাসিল ক'রে এলে আর দশ টাকা।"

মাথা নাড়িয়া বিশু বলিল, "না, আকুলি মশাই, এ কায আমি হাসিল কত্তে পারবো না।"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "খুব পারবে হে, খুব পারবে। আচ্ছা, চল্লিশ টাকাই পাবে, আমার দালালীটা না হয় ছেড়ে দিলাম। এই নাও পনেরো টাকা বায়না।"

আকুলি মহাশয় কোঁচার খুঁট হইতে টাকা খুলিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বিশুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে বিশুর বুকের ভিতরে ঝনাৎ করিয়া উঠিল। দুই গণ্ডা পয়সার জন্য স্ত্রীপুত্রের উপবাসের উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় কর্‌করে পনেরোটা টাকা! এ কি তোমার প্রলোভন, প্রভু? ইহা প্রলোভন, না পরীক্ষা? মূর্খ আমি, দরিদ্র আমি, এমন কঠোর পরীক্ষায় ফেলিও না, ঠাকুর!

বিশু চকিতে টাকাগুলার দিক্ হইতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। আকুলি মহাশয় বলিলেন, "আমি তা হ'লে উঠি এখন, বিশু খুড়ো, তুমি সন্ধ্যার পর একবার দেখা ক'রো। ওরা কখন্ রওনা হয়, সঠিক সংবাদ নিয়ে রাখব।"

বিশু মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "তা নিও ; এখন টাকা-গুলো নিয়ে যাও, আকুলি মশাই।"

আকুলি মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; বিশুর কথা শুনিয়া খুব বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "আমি টাকা নিয়ে যাব কেন? তুমি তুলে রাখ না।"

তাঁহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বিশু বলিল, "না, টাকা তুমি তুলে নাও।"

বিশুর সেই রোষকঠোর দৃষ্টি ও দৃঢ় অবজ্ঞার মত সেই বজ্রকঠোর স্বরে আকুলি মহাশয় ভীত হইলেন ; তিনি প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইয়া আস্তে আস্তে টাকাগুলি তুলিয়া লইলেন এবং আর কোন কথাই না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে বিশু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া বাড়ী ঢুকিল। গরবী হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা দিয়ে গেল গা?"

গম্ভীর মুখে বিশু উত্তর করিল, "কে টাকা দেবে? কোথায় টাকা?"

ঘাড় দোলাইয়া আবদারের সুরে গরবী বলিল, "কোথায় টাকা বৈ কি! আমি যেন টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনতে পাইনি।"

বিশু বলিল, "ঐ শব্দ শুনেই পেট ভরাও, টাকা আমি ফেরং দিয়েছি।"

মুখখানাকে ভারী করিয়া গরবী বলিল, "ফেরং দিলে কেন?"

"রাহাজানি কত্তে পারবো না ব'লে।"

"তবে কি মালা জপ করলেই পেট ভরবে?"

"পেট না ভরুক, বুক ভরবে।"

স্বামীর কথা শুনিয়া গরবী কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিল ; তার পর তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্লে?"

স্থির শান্তস্বরে বিশু বলিল, "সে লক্ষ্মী মাথায় থাক্, তার চেয়ে আমি ভিক্ষে ক'রে খাব।"

রোষরুদ্ধ কণ্ঠে গরবী বলিল, "ভিক্ষে ক'রেই আজকার খাওয়ার যোগাড় ক'রে নিয়ে এস তা হ'লে।"

"তাই কচ্ছি" বলিয়া বিশু বাহির হইয়া গেল। গরবী স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা স্মরণে মনে মনে গুমরাইতে লাগিল।

৪

ভিক্ষা করিব বলিয়া বাহির হইলেও বিশু কিন্তু সত্যই ভিক্ষা করিতে পারিল না, বাজারপাড়ায় গিয়া রাঘব পোদ্দারের কাছে একটা টাকা ধার চাহিল। টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় হইলেও পোদ্দার মহাশয় যাহাকে তাহাকে ধার দিতেন না, স্থানকালপাত্র বুঝিয়া, উপযুক্ত জামীন রাখিয়া চড়াসুদে টাকা দিতেন। সুতরাং বিনা জামীনে চার পয়সা সুদেও বিশে ডোমকে একটা টাকা ধার দিয়া সেই টাকাটা জলে ফেলিতে পারিলেন না। হাত খালি বলিয়া আজ তিনি যে কিরূপে বাজার করিবেন, তাহাই ভাবিয়া কাতরভাবে বার বার গৌরাঙ্গ প্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিশু অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া পরিশেষে চার গণ্ডা পয়সা চাহিল ; পোদ্দার মহাশয় কিন্তু চারিটি পয়সা দিতেও অসামর্থ্য প্রকাশ করিলেন। অগত্যা বিশুকে হতাশচিত্তে ফিরিয়া সাধু পালের শরণাপন্ন হইতে হইল।

সাধু পালও দুই গণ্ডা পয়সা ধার দিয়া বিশুকে অনাহারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সে নিজের কন্যার বিবাহে ও জামাতার 'তত্ত্বতাবাসে' কত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহারই সুদীর্ঘ তালিকা সগর্ব্বে ব্যক্ত করিতে ব্যস্ত হইল। সে সুদীর্ঘ তালিকা শুনিয়া কোন ফল নাই দেখিয়া বিশুকে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

এইরূপে একে একে দশ বার জনের দরজায় ঘুরিয়াও বিশু যখন একটা পয়সা ধার পাইল না, তখন সে নিতান্ত হতাশচিত্তে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঘরে ফিরিয়াই বা কি উপায় করিবে? স্ত্রী তাহার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে, ছেলেটা এতক্ষণ ক্ষুধায় ছটফট করিতেছে ; নিজেরও শরীর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। এ অবস্থায় সে রিক্তহস্তে কোন্ মুখে ঘরে ফিরিবে? দয়াল ঠাকুর, তুমি সকলের খোঁজ রাখিয়া থাক, কিন্তু এই তিনটি প্রাণীর খোঁজ রাখিতেই কি ভুলিয়া গিয়াছ? সামান্য কীটপতঙ্গও তোমার কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় না, কিন্তু বিশে ডোম আর তাহার স্ত্রী-পুত্র কোন্ মহাপাপে তোমার সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইল?

মাথার উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। রাস্তার ধারে দীঘির পাড়ে বড় অশ্বত্থগাছের তলায় গামছা পাতিয়া বিশু শুইয়া পড়িল। রৌদ্রে দীঘির কালো জল ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, গাছের ডালে পাখীগুলা ডানা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, একটা পাখী 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিয়া উচ্চ চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া দিতেছিল, রৌদ্রপ্রদীপ্ত নীলাকাশে দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ দিশাহারা পথহারা তরণীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। দীঘির চক-চকে কালো জলের দিকে চাহিয়া বিশু শুইয়া রহিল।

বাবাজী বলেন, সংসার অসার, স্ত্রী-পুত্র সব মায়ার বেড়ী সাধনাপথের কাঁটা। কথাটা মিথ্যা নয়। এই স্ত্রী-পুত্রের জন্য সে সকাল হইতে কতই না ভাবিয়াছে; ভাবিয়া কোন উপায় করিতে পারে নাই, তথাপি ভাবিয়াছে। অথচ যাহাকে ডাকিলে ফল হইবে, ইহকাল পরকালের উপায় হইবে, এতক্ষণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে একবারও প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে নাই। বেড়ী—বেড়ী, মায়ার বেড়ী! এই বেড়ী যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিশেকে পায় কে? তাহা হইলে বিশে ডোম কি আজ এই রৌদ্রে দুই পয়সার জন্য ভিখারীর মত লোকের দরজায় দরজায় ঘুরিতে যাইত? নিজের পেট? দুই আঁজলা জল খাইলেও পেট ভরে, একদিন না খাইলেও চলিয়া যায়। কিন্তু এই স্ত্রী পুত্র? দয়াল ঠাকুর হে, নীচ ডোমজাত বলিয়া তোমাকে একবার ডাকিবার অবসরও কি পাইব না, শুধু স্ত্রী পুত্রের ভাবনা ভাবিয়াই দিন কাটাইয়া দিব?

ভাবিতে ভাবিতে বিশু ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশু উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে গৃহাভিমুখে চলিল।

ঘরে যাইতেই ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বাপের কাপড় চাপিয়া ধরিল, "কি নিয়ে এলি, বাবা, কি নিয়ে এলি?"

কিন্তু কাপড়ের কোথাও কোন খাদ্যদ্রব্য নাই দেখিয়া সে হতাশভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল। বিশুর বুকের ভিতরটা যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। শবরী ঘরের দাবায় ধূলার উপর পড়িয়া ছিল। সে উঠিয়া সকরুণ নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু পেয়েছ গা?"

ধরা-গলায় বিশু উত্তর দিল, "কিছু না।"

শবরী আর কোন কথা না বলিয়াই পুনরায় শুইয়া পড়িল। ছেলে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে, বাবা, কি খাব?"

ছাই, ছাই, ছাই! সংসারটাই ছাই দিয়া ভরা! ওঃ, চুরী, ডাকাতী, রাহাজানি, খুন—এই দৃশ্য হইতেও কি এ সব কঠিন—ভয়ানক? বিশুর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত শরীরের রক্ত যেন চন্ চন্ করিতে লাগিল। ডোমের ছেলে, তুচ্ছ পাপ-পুণ্যের ভয়ে এতটা সহ্য করিয়া থাকিবে? দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বিশু স্থির আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছেলের কান্না শুনিতে লাগিল।

না না, এ যে তোমার পরীক্ষা ঠাকুর! এমনই ভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে তুমি মানুষকে দয়া দেখাও। আমি মূর্খ, নীচজাতি, তোমার এই পরীক্ষার কঠোরতা যেন সহ্য করিতে পারি।

বিশু ছেলের হাত ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া ভাঙ্গা চালাটিতে বসিল, এবং বসিয়া বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"দীনের দিন গেলো হে হরি।"

হরিকে ডাকিতে ডাকিতে বিশুর চঞ্চল চিত্তটা ক্রমেই স্থির, শান্ত হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় জমীদারের পাইক মেদা সর্দ্দার আসিয়া তাহাকে জানাইল যে, নায়েব মহাশয় তাহাকে তলব করিয়াছেন, এখনই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বিশু উঠিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

●

নায়েব মহাশয় বিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার ভিটের খাজনা তিন বছর বাকী পড়েছে। আজ খাজনা মিটিয়ে দাও, নয় ত কাল তোমার নামে বাকী খাজনার নালিশ রুজু হবে।"

বিশু শুনিয়া ভীত হইল; সবিনয়ে নায়েব মহাশয়কে জানাইল যে, বছর তিনেক আগে বাবুরা কোঁচাপাড়ার হাটপুকুরটা কিছুতেই দখল করিতে না পারিয়া বিশুর

সাহায্য লইয়াছিলেন, এবং লাঠির প্রভাবে বিশু তাহা দখল করিয়া দেওয়ায় বড়বাবু সন্তুষ্টচিত্তে পুরস্কারস্বরূপ তাহার ভিটার খাজনা মকুব্ করিয়াছিলেন। নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু যে খাজনা মকুব্ ক'রে-ছিলেন, তার ছাড়পত্র আছে ?"

বিশু বলিল, "ছাড়পত্তর কিছুই নাই, বাবু শুধু মুখেই বলেছিলেন। হয় নয়, বাবুকে জিগ্যেস্ ক'রে দেখুন।"

বক্রভাবে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "জিগ্যেস্ করতে হয়, তুমি গিয়ে জিগ্যেস্ কর, আমি অত শত বুঝি না ; তিন বছরে খাজনা সুদে আসলে তেরো টাকা সাত আনা আট গণ্ডা তিন কড়া তিন ক্রান্তি হয়েছে, আজ কড়ায় গণ্ডায় সব মিটিয়ে দাও, নয় কাল সকালেই নালিশ রুজু করবার জন্য উকীলের কাছে লোক পাঠাব।"

বিশু ভীত হইয়া পড়িল। বাবুর কাছে যে ছুটিয়া যাইবে, সে উপায়ও নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন। বিশু তখন আপনার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কান্নাকাটায় নায়েব মহাশয় ভুলিলেন না ; তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, "বাপু, তুমি খেতে পাও বা না পাও, তাতে জমিদারের কিছু লোকসান নেই, তুমি খেতে পেলেও জমিদারকে খাজনার এক পয়সা বেশী দেবে না, আর না খেতে পেলে জমিদারও তোমাকে খাজনা রেহাই দিতে পারবে না ; খেতে পাও না পাও, রাজার রাজস্ব তোমাকে দিতেই হবে।"

এমন স্পষ্ট জবাবের পর আর অনুনয় বিনয় চলে না। কাজেই বিশু কাঁদাকাটা ছাড়িয়া বাবুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সময় চাহিল। নায়েব মহাশয় কিন্তু এক দিনও সময় দিতে রাজী হইলেন না। বিশু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। নায়েব মহাশয়ের হঠাৎ এই নালিশের কারণ বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। আকুলি মহাশয়ের প্রস্তাব সদর্পে প্রত্যাখ্যান করার জন্যই যে নায়েব মহাশয় তাহাকে জব্দ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। কাজেই বিশু অনুনয়-বিনয় নিষ্ফল বোধে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া আকুলি মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল।

আকুলি মহাশয় কিন্তু তাহাকে আশা দিতে পারিলেন না ; নিতান্ত উপেক্ষার সহিত বলিলেন, "আমি কি করবো, বিশু খুড়ো, নায়েব মহাশয় কি রকম একরোখা লোক, জান ত ?"

জানিলেও বিশু তাঁহাকে ছাড়িল না, তাহাকে বাঁচাইবার একটা উপায় করিয়া দিবার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। আকুলি মহাশয় তখন গম্ভীরভাবে উপদেশের স্বরে বলিলেন, "বিশু খুড়ো, ভগবান্ এই যে এত জাতের সৃষ্টি করেছেন, যে যেমন জাত, তার তেমন কাজ ঠিক ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর হুকুম অমান্য ক'রে উল্টো কাজ করলে তাঁর রাগ হয় না কি ? চামার ছেলে বামুনের মত যদি ঠাকুরপূজো করতে যায়, তাতে তার পাপ হয় না বা সে কষ্ট পায় না কি ?"

সত্যই কি তাই ? ডোমের ছেলে লাঠিবাজি ছাড়া, দাঙ্গা, ডাকাতী, খুন ছাড়া তাহার অন্য কাজ নাই কি ? অপর কাজ করিতে গেলে ভগবান্ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কি কষ্ট দিয়া থাকেন ? তবে কি বিশু লাঠি ছাড়িয়া, ভগবানকে ডাকিয়া, দয়াল গোবরের অঁতাতের ক্রোধের ভাজন হইয়াছে ? ভক্তি করিতে নম্র করিতে গিয়া ভগবানকে সে অপমান করিয়াছে ? হায়, দীননাথ, নীচজাতি বলিয়া তোমাকে ডাকিবার অধিকারও কি দাও নাই ? তবে না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, সে অপরাধ মার্জ্জনা করা চাকর !

বিশু নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল : সত্যই ভগবান্ তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছেন, নতুবা তাহার এত দুর্গতি হইবে কেন ? স্ত্রীপুত্র খাইতে পায় না, নিজে অনাহারে মৃতপ্রায়, জমিদার নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিতে উদ্যত। যখন সে লাঠিবাজি করিত, তখন ত তাহার এমন অবস্থা ছিল না।

বিশু বলিল, "কাল যদি কাহারো উদ্ধার ক'রে দিতে পারি, তা হ'লে কি দেবে, আকুলি মশাই ?"

উৎফুল্লভাবে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "বলেছি ত, নগদ পঞ্চাশ টাকা।"

বিশু বলিল, "বায়নার টাকা দেবে ত ?"

মাথা নাড়িয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "না খুড়ো, কাল যদি উদ্ধার ক'রে দিতে পার—"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া বিশু বলিল, "দিতে পারি কি, বিশে ডোম লাঠি ধরলে কি না করতে পারে বল ত ? বায়নার টাকাগুলো দাও।"

বায়নার পনের টাকা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বিশু ঘরে ফিরিল।

৬

"কে, বিশু দাদা না কি? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?"

"কে, অর্জ্জুন? তুই কোথায় চলেছিস?"

"বোস বাবুদের ভাতমারার সদর কাছারীতে।"

"চালান নিয়ে না কি?"

"হাঁ।"

বিশুর ললাট কুঞ্চিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখন বোস বাবুদের তরফে চাকরী করিস্ না কি?"

অর্জ্জুন উত্তর করিল,"কচ্চি বৈ কি। তুমি কি শোননি?"

মুখ মচকাইয়া বিশু বলিল, "না।"

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিল, "এ দিকে কোথাও যেতে হবে না কি?"

"না।"

"তবে চল না, দু'জনে গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাই অনেক দিন ত আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।"

অর্জ্জুনের সে কথার উত্তর না দিয়া তাহার স্কন্ধস্থিত চালানের থলিটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশু বলিল,"তুই এক-সঙ্গে দরোয়ান মুটে দুই কাজই কচ্চিস্ বুঝি?"

অর্জ্জুন বলিল, "কি করি, দাদা, টাকার বোঝা যার তার মাথায় দিয়ে বিশ্বাস হয় না।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বিশু বলিল, "তা এই ভারী বোঝাটা অনেক দূর ব'য়ে এনেছিস্, এখন আমার ঘাড়ে দে, আমি ব'য়ে নিয়ে যাই।"

সন্দিহান চিত্তে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তা' হ'লে এই বোঝা বইতেই এসেছ, বিশু দাদা?"

গম্ভীর মুখে বিশু বলিল, "তা নয় ত শুধু শুধু কি তোর সাথে দেখা কত্তে এয়েচি?"

অর্জ্জুন এবার হাসিল; বলিল, "তোমাকে এতটা কষ্ট কত্তে হবে না, বিশু দাদা, আমার পিছনে দু'জন ভোজপুরী আসছে, দেখেছ?"

বিশু উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুই কি তোর বিশু দাদাকে চিনিস্ নে, তাই ভোজপুরীর ভয় দেখাচ্ছিস্?"

অর্জ্জুন বলিল, "ভয় দেখানো নয়, খালি হাতে এই তিনটে জোয়ানের সাথে লড়াই --".

ভ্রূকুটী করিয়া বিশু বলিল, "বিশে ডোমের হাত দুটোই দু'খানা পাকা লাঠি, তা জানিস্?"

পিতার শিষ্য বলিয়া সম্মান করিয়া চলিলেও বিশুর এতটা অহঙ্কারপ্রকাশ অর্জ্জুনের সহ্য হইল না; সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যেন একটু উপহাসের স্বরেই বলিল, "আচ্ছা, ভোজপুরীদের তোমার পাকা লাঠির বহর না দেখিয়ে, আগে আমাকেই একটু দেখাও দেখি।"

টাকার থলিটা মাটীর উপরে ফেলিয়া দিয়া অর্জ্জুন লাঠি বাগাইয়া ধরিল।

বিশু হাসিয়া বলিল, "তা' হ'লে টাকার থলিটা এবার আমি কাঁধে তুলে নেব ত?"

দৃঢ় স্বরে অর্জ্জুন বলিল, "আমার জান থাক্‌তে নয়।"

তাহার উত্তর শেষ না হইতেই বিশু লাফাইয়া অর্জ্জুনের উপর পড়িল, এবং অর্জ্জুন সেই অতর্কিত আক্রমণের বেগ হইতে আপনাকে সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই বিশু এমন কৌশলে তাহার হাত হইতে লাঠিখানা ছিনাইয়া লইল যে, অর্জ্জুন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বিশু বলিল, "এবার তোর জান ত আমার হাতে, অর্জ্জুন!"

অর্জ্জুন হতাশ দৃষ্টিতে পশ্চাদ্বর্ত্তী ভোজপুরীদিগের দিকে চাহিল। ভোজপুরীদ্বয় চালানের রক্ষণার্থ নিযুক্ত হইলেও 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া পশ্চা-দ্বর্ত্তী গ্রামে ভজা ময়রার দোকানে উদরদেবের পূজা করিতে একটু পিছনে পড়িয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর উদরপূজা শেষ করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে তাহারা যখন অর্জ্জুনের কাছা-কাছি উপস্থিত হইল, তখন অর্জ্জুনের সম্মুখে এক অপরিচিত জোয়ানকে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া "কা হুয়া রে, কা হুয়া রে" বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল। আসি-য়াই "শালে ডাকু" বলিয়া বিশুকে লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল, কিন্তু সে লাঠি বিশুর গায়ে পড়িবার পূর্ব্বেই বিশুর লাঠি আসিয়া এক জন ভোজপুরীর স্কন্ধদেশে এমন বেগে পতিত হইল যে, সে ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অপর ভোজপুরী ব্যাপার দেখিয়া বিশুকে 'শ্বশুরা' সম্বোধন করিতে করিতে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির অনুসরণ করিল।

"এইবার অর্জ্জুন ?"

অর্জ্জুন বলিল, "আমি কিন্তু জান্ থাকতে পালাব না। আমার জান্ নাও, বিশু দাদা।"

বিশু বলিল, "মানের চেয়ে কি জান্ বড়, অর্জ্জুন ?"

অর্জ্জুন মাটীর দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিশু তখন টাকার থলিটা নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া অর্জ্জুনের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ক্ষ্যামতা থাকে, আমার কাছ থেকে চালান কেড়ে নে।"

অর্জ্জুনের মুখখানা সিঁদূরের মত লাল হইয়া উঠিল; ভাঁটার মত চোখ দুইটা দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। এত অহঙ্কার ! গায়ে জোর থাকিলে এমন করিয়াই কি অহঙ্কার দেখাইতে হয় ? অর্জ্জুনের গায়েও কি জোর নাই ? সে কি ওস্তাদের কাছে লাঠি ধরিতে শিখে নাই ? অর্জ্জুনের বুকের ভিতর রি রি করিতে লাগিল। পাশেই আহত ভোজপুরীর লাঠিখানা পড়িয়া ছিল। সেটা তুলিয়া লইয়া অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় বিশুর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "জান্ দেব, বিশু দাদা, তবু মনিবের টাকা ছাড়্বো না।"

বিশু উচ্চ হাস্যধ্বনিতে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "তোর জান্ ত একটা পিঁপড়ের জান্।"

"পিঁপড়ের কামড়ের জ্বালা কত, তা দেখ এবার।"

বলিয়া অর্জ্জুন বিশুর মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি উঁচাইল। বিশুও ক্ষিপ্রতার সহিত টাকার থলি ফেলিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল। তখন সেই নির্জ্জন প্রান্তরে উভয় বীরের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের হুঙ্কারশব্দে প্রান্তর প্রকম্পিত হইতে থাকিল। "সাবাস অর্জ্জুন ! হাঁ, লাঠি ধরতে শিখেছিলি বটে। কিন্তু সামাল্ দে এইবার। হাঁ, খুব সামলে নিয়েছিস, নকুড় সর্দ্দারের নাম রাখ্তে পারবি তুই। কিন্তু এইবার—এইবার যাঃ !"

বিশুর লাঠি সবেগে আসিয়া অর্জ্জুনের মাথায় পড়িতেই অর্জ্জুনের সর্ব্বশরীর একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার রক্তাক্ত দেহ বিশুর পদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

"অর্জ্জুন, অর্জ্জুন !" আর অর্জ্জুন ! ও বিশে, কি করলি তুই ? কয়টা টাকার জন্য কাহার মাথা ফাটাইলি ? কিন্তু এই কয়টা টাকাই বা দেয় কে ? চার গণ্ডা পয়সার জন্য যে তাহার স্ত্রীপুত্রকে উপবাস দিতে হইয়াছে। অর্জ্জুন, অর্জ্জুন ! তুই নিমকের মান রাখ্লি, আমি কিন্তু ওস্তাদের মান রাখ্তে পারলাম না। পিছনে ও কারা চীৎকার করে ? অর্জ্জুনের স্ত্রীপুত্ররা কি ? না না, সেই ভোজপুরী ব্যাটা বোধ হয় পলাইয়া গিয়া গ্রাম হইতে লোকজন ডাকিয়া আনিতেছে।

বিশু তাড়াতাড়ি টাকার থলিটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া তীরবেগে ধাবমান হইল।

৭

"হ্যাদে মিন্‌সে, তোর মালা ঠক্‌ঠকানির হ'লো কি ? মালা যে চালের বাতায় ঝুল্‌তেই লেগেচে।"

বিকৃতমুখে বিশু বলিল, "দূর মাগী, ছোট জাত ডোম, তার আবার মালা ঠক্‌ঠক্, তার আবার হরিনাম। রেখে দে, নামের মালা শিকেয় তুলে।"

গরবী হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে তোর মালার সখ্ ফুরিয়ে গেল বল্।"

মুখ মচ্‌কাইয়া বিশু বলিল, "ফুরিয়ে না গেলে কি লাঠি ধরি ?"

গরবী বলিল, "লাঠি ধরবি না ত কি করবি বল। লাঠি ধরেছিলি ব'লেই তো দু'টাকার মুখ দেখতে পেলি। এদ্দিন মালা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কি পেয়েছিলি বল্ তো ?"

"ছাই উপোস।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে বিশুর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হায় ঠাকুর, ছোট জাত বলিয়া তোমাকে ডাকিবার অধিকারও কি নাই ? ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল ভদ্রলোকদের জন্য, আর ছোটলোকরা শুধু চুরী, ডাকাতী, খুন করিয়াই বেড়াইবে ? বাবাজী বলেন, তুমি অধমতারণ। তবে এই অধমদের উদ্ধারের কি উপায় ক'রে রেখেছ ঠাকুর ?

বিশুর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। গরবী পাছে তাহা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি গরবীর সম্মুখ হইতে উঠিয়া গেল।

আকুলি মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই রে বিশু খুড়ো, আপদ্ চুকে গিয়েছে। সেই যে ডোম ব্যাটা—কি নাম তার ?"

ব্যস্ততার সহিত বিশু বলিল, "কে, অর্জ্জুন ?"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সেই ভীমের ব্যাটা অর্জ্জুন, সে ব্যাটা হাঁসপাতালে মারা গিয়েছে।"

রুদ্ধশ্বাসে বিশু বলিয়া উঠিল, "মারা গিয়েছে ?"

মস্তকসঞ্চালন সহকারে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "মারা যাবে না ? তোমার লাঠি খেয়ে বেঁচে ওঠে, এমন জোয়ান ত এ তল্লাটেই দেখতে পাই নে। তা ঈশ্বর যা' করেন, মঙ্গলের জন্য। ব্যাটা বেঁচে উঠলে তোমার নাম প্রকাশ ক'রে দিত।"

যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিশু বলিল, "আমার নাম বলেনি ?"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "না না। নাম জানবার তরে পুলিস এ ক'দিন অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ব্যাটা কিছুই বলেনি। নিজের মাথার ঘায়েই অস্থির, তা' পরের নাম করবে কি।"

আকুলি মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে আহ্লাদের হাসি বিশুর কানে যেন প্রেতের অট্টহাস্যধ্বনির মত বিকট বোধ হইল, কথাগুলা ছুঁচের মত পাঁজরার হাড়ে গিয়া বিঁধিতে লাগিল, দিনের আলোটা আগুনের হল্কার মত আসিয়া চোখ দুইটাকে যেন পোড়াইয়া দিতে থাকিল। অব্যক্ত বাতনায় মুখ বিকৃত করিয়া বিশু দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

আকুলি মহাশয় কিন্তু তাহার এই অন্তর্বেদনার গভীরতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সহাস্যমুখে তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যাক্, আপদ্ গিয়েছে, বাঁচা গেল। ভোজপুরী ব্যাটারা ত তোমায় চেনে না। আমাদের ধরা পড়ার আর কোনই সম্ভাবনা নেই।"

চোখ হইতে হাত সরাইয়া বিশু বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাকে কিন্তু ধরা দিতেই হবে, বাবাঠাকুর।"

বিস্ময়ে চমকিত হইয়া আকুলি মহাশয় শঙ্কিতস্বরে বলিলেন, "ধরা দিতে হবে ? সে কি, বিশু খুড়ো ?"

দৃঢ়স্বরে বিশু বলিল, "হাঁ, ধরা দিতেই হবে আমাকে।"

শঙ্কাবিমলিন মুখে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "বল কি ? তুমি সর্ব্বনাশ করবে নাকি ?"

বিশু বলিল, "ভয় নেই, বাবাঠাকুর ; সর্ব্বনাশ হয়, আমারই হবে, তোমাদের গায়ে তার আঁচড়ও লাগবে না।"

আকু। কিন্তু ধরা দিলে ফাঁসী যেতে হবে, তা জান ?

বিশু। খুব জানি।

আকু। জেনে শুনে ফাঁসীকাঠে গলা বাড়িয়ে দেবে ? এ কি রকম বুদ্ধি তোমার, বিশু খুড়ো ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিশু বলিল, "ছোট জাতের বুদ্ধি এই রকমই, বাবাঠাকুর। আমরা খুন কত্তেও যেমন ভয় পাইনে, ফাঁসী যেতেও তেমন ভয় পাইনে।"

দুঃখগম্ভীর স্বরে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু ফাঁসী হ'লে তোমার স্ত্রী-পুত্রের দশা কি হবে ?"

বিশু। তাদের বরাতে যা' আছে, তাই হবে। তাদের তরেই ত খুন করেছি।

আকুলি মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিশু যাহাতে তাঁহাদিগকে বিপন্ন না করে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন বিশু হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল। বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল।

আকুলি মহাশয় নায়েবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিশে ব্যাটা এবার দ্বীপান্তরে বসে প্রাণ ভ'রে হরিনাম ক'রবে।"

নায়েব মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ভাগ্যো ব্যাটা একাই হরিনাম কত্তে গেল, আমাদেরও সঙ্গে নিলে না !"

আকুলি। না, বিশের ধর্ম্মজ্ঞান একটু আছে।

নায়েব। আরে, রেখে দাও তোমার ধর্ম্মজ্ঞান ! ছোট জাতের আবার ধর্ম্মকর্ম্ম ! বাঘ মশায়ের মাংসে অরুচি !"

নায়েব মহাশয়ের সহিত আকুলি মহাশয়ও উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই উপহাসের তীব্র হাস্যধ্বনি বিশুর কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে তখন বহু দূরে জেলের অন্ধকারে বসিয়া আপন মনে গাহিতেছিল—

"দিন গেলো হে হরি।
আমি ভজোন পূজোন কখন্ কোরি।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কেনিয়া

কেনিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইংরাজের একটি উপনিবেশ বা Crown Colony. অন্যান্য উপনিবেশের ন্যায় কেনিয়াতেও কতকগুলি ইংরাজ অর্থার্জ্জনের আশায় গিয়াছে এবং তথায় তাহাদের প্রাধান্যে তাহাদের জন্মগত অধি

সেইরূপ উদ্ধত ব্যবহার করিতেছে। বৃটিশজাতের অভ্যাস এই যে, সে যে স্থানেই যায়, সেই স্থানেই সে বিজিত অধিবাসীদিগের অভিভাবক সাজিয়া তাহাদিগকে সভ্য করা তাহার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করে এবং মনে করে সকল সার বস্তুতে তাহারই অধিকার। এই সভ্য করা বা Civilizade এর কথা ইংরাজ লেখক মিল তাঁহার স্বাধীনতাবিষয়ক পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বলপূর্ব্বক কোন সম্প্রদায়কে "সভ্য" করিবার অধিকার অন্য সম্প্রদায়ের নাই "I am not aware that any community has a right to force another to be civilized." কেবল তাহাই নহে, এই সভ্য করা অনেক সময় "অসভ্য" জাতিকে "সভ্য" জাতির অর্থার্জ্জনের উপায়-মাত্র করার নামান্তর এবং এই "সভ্যতা" অনেক সময় "সভ্য" জাতির অন্যান্য পণ্য হইতে মদ্য পর্য্যন্ত "অসভ্য" জাতির মধ্যে প্রচার করায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

কেনিয়ায় ইংরাজের সভ্যতাবিস্তারচেষ্টায় এ নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। বিলাতের 'নেশান এণ্ড এথিনিয়ম' পত্র এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

কেনিয়া— মানচিত্র।

"এত দিন পর্য্যন্ত কেনিয়ার শাসনপদ্ধতি সাধারণ ক্রাউন কলোনীর শাসন পদ্ধতির মতই ছিল, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকরা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন করিত; কিন্তু সভায় সভ্যগণের মনোনীত সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকায় হস্তগত থাকিত। কেনিয়ার (শ্বেতাঙ্গ) সরকার (শ্বেতাঙ্গ) উপনিবেশিকদিগের প্রতি অন্যায় সদয় ব্যবহারই করিয়া আসিয়াছেন। মালভূমিতে উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড হয় তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইয়াছে, নহে ত সামান্য মূল্যে ৯ শত ৯৯ বৎসরের জন্য তাহাদিগকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে। যে স্থলে উৎকৃষ্ট জমী আফ্রিকানদিগের অধিকৃত ছিল, সে স্থলে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমীতে সরাইয়া উর্ব্বর জমী শ্বেতাঙ্গদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যখনই আফ্রিকানরা অতি সামান্য বেতনে শ্বেতাঙ্গদিগের শ্রমিকের কায করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তখনই সরকার নানা উপায়ে তাহাদিগকে স্বল্প পারিশ্রমিকে কায করিতে বাধ্য করাইয়াছেন।

"কিন্তু কিছু দিন হইতে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকরা বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, জমী কমাইয়া বা কর বাড়াইয়া সরকার আফ্রিকানদিগকে তাহাদের কাছে শ্রমিকের কায করিতে বাধ্য করুন। সরকার তাহা করিতে সম্মত না হওয়ায় তাহারা বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ স্থলে স্বায়ত্তশাসন

বলিলে বুঝিতে হইবে, ব্যবস্থাপক সভায় ১০ হাজার শ্বেতাঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক থাকিবে এবং তাহারাই যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে। আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে শ্বেতাঙ্গরা এইরূপ আবদার করিয়াছে এবং তাহাদের আবদার রক্ষা করিয়া বৃটিশ সরকার দেশের ভূমি ও অধিবাসীদিগকে তাহাদেরই হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন।"

কেনিয়ায় কেন তাহাতে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, তথায় বহু ভারতীয় বাস করিতেছে। কেনিয়ার লোকসংখ্যা এইরূপ :—

আফ্রিকান	...	...	২৫ লক্ষ
ভারতীয়	...	...	২২ হাজার ৮ শত ২২
আরব	...	...	১০ হাজার ১ শত ২
য়ুরোপীয়	...	...	৯ হাজার ৬ শত ৫১

ভারতীয়রা জিজ্ঞাসা করিল, যদি ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাধিক্য হয়, যদি কেনিয়ায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তবে ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে? ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র ভারতবাসীর তুল্যাধিকার স্বীকৃত হইবে, সে প্রতিশ্রুতি কি তবে ছলনা মাত্র? মিথ্যাবাদীর অবিশ্বাস্য প্রতিজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নহে? এই কথার উত্তরে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বলিল, কেনিয়া শ্বেতাঙ্গদিগের উপনিবেশ। এককালে এক জন কলোনিয়াল সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন, কেনিয়ার মালভূমিতে সূচ্যগ্রভূমি কাল বা মেটে লোককে দেওয়া হইবে না। এ দেশে ভারতবাসীর আগমন বন্ধ করিতে হইবে। যে সব ভারতীয় বর্ত্তমানে দেশে আছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে হইবে। ভারতবাসীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যনির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে না। কারণ, তাহাদিগকে সে অধিকার দিলে কেনিয়া সরকার তাহাদেরই হস্তগত হইবে এবং এসিয়াবাসী হিন্দু-মুসলমানকে আফ্রিকানদিগের নিয়তিনির্ণয়ের অধিকার দিলে শ্বেতাঙ্গরা সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে। সে কর্ত্তব্য-পালনে বাধা পাইলে, শ্বেতাঙ্গরা বিদ্রোহী হইয়া অস্ত্রধারণ করিবে। যাহারা বলপূর্ব্বক আফ্রিকানদিগকে অল্প পারিশ্রমিকে কার্য্য করাইয়া লাভবান হইতে চাহে, তাহারা কিরূপ সভ্য ও খৃষ্টধর্ম্মানুসারে আপনাদের কার্য্য কিরূপ নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন' পত্রের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :

"কেনিয়ার এক সহস্রেরও কম য়ুরোপীয় ১১ হাজার বর্গমাইল স্থান পাইয়াছে

কেনিয়ায় পল্লীদৃশ্য।

আর ভারতীয়রা মোট ২২ বর্গমাইল জমী অধিকার করিতে পাইয়াছে। আফ্রিকানরা এক বিঘা জমীও পাইতে পারে না! এমন কি, অল্পদিনের মধ্যে দেশীয়দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমীও কেনিয়া সরকার শ্বেতাঙ্গদিগকে দিয়াছেন। বলিতে গেলে দেশীয় লোক ঘণ্টায় ২ পয়সা পারিশ্রমিক লইতে বাধ্য এবং তাহাদের পারিশ্রমিকের সিকি ভাগ সরকারকে কর হিসাবে দিতে হয়। য়ুরোপীয় কেবল বৎসরে ১৫ টাকা কর দিয়াই নিষ্কৃতি পায়। কেনিয়ায় ভারতীয় নেতৃগণও আর আফ্রিকানদিগের অভাব লইয়া আন্দোলন করিতে সাহস করেন না; কারণ, তাঁহারা যখন সে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তখন যে সব নিরস্ত্র আফ্রিকান তাহাতে যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল।"

এই সব নরহন্তা পিশাচই বলে, তাহারা জগতে সভ্যতা বিস্তার করিবার অধিকারী! ইহারাই পাপ রসনায় যিশু খৃষ্টের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া ভণ্ডামীর চূড়ান্ত পরিচয় দেয়!

ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত নির্ব্বাচনের তুল্যাধিকার চাহিল এবং বলিল, কেনিয়ায় ভারতবাসীর গমনাগমনে কোনরূপ বাধা থাকিবে না।

গত বৎসর বিলাতে মিটমাটের একটা কথা হয়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা বলে, তাহাদের পূরা দাবি গ্রাহ্য না হইলে তাহারা বলপ্রকাশ করিবে। তাহারা বিলাতে লোকমতগঠনের চেষ্টায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সংবাদপত্রাদিতে তাহারা কিরূপ মিথ্যা প্রচার করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি—

লর্ড ডিলেমেয়ার বলিয়াছেন, "কেনিয়া দিন দিন স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর হইতেছে, এই বিশ্বাসেই (শ্বেতাঙ্গ) ঔপনিবেশিকরা তথায় গিয়াছে। সেই বিশ্বাসে তাহারা তথায় গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চহিল প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, কেনিয়ায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতীয়দিগের দাবি পূর্ণ করা হইলে, সে সব ব্যর্থ হইবে।"—কেনিয়ায় স্বায়ত্ত-শাসন বলিলে সহজবুদ্ধিতে অবশ্য আফ্রিকানদিগের শাসনই বুঝিতে হয়। সে যাহা হউক, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা মনে মনে যে আশা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিশ্রুতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মিষ্টার চার্চ্চহিল কোন দিন এমন কথা বলেন নাই যে, কেনিয়ায় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকরা স্বায়ত্তশাসন পাইবে। তাঁহাদের মতে স্বায়ত্ত-শাসন আর শ্বেতাঙ্গশাসন অভিন্ন।"

'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' বিলাতের উদারনীতিক দলের অন্যতম মুখপত্র। এই পত্রে লিখিত হইয়াছে:—

(১) বৃটিশের রক্ষিত অবস্থায় কেনিয়ায় বা অন্যত্র ভারতের কোটি কোটি লোককে বাড়িতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

(২) যে প্রবলপ্রজননশক্তিসম্পন্ন জাতি প্রজনন সংযত করিতে জানে না ইচ্ছাও করে না, তাহাদিগের পৃথিবী ছাইয়া ফেলা নিবারণের দ্বিবিধ উপায় আছে—যুদ্ধ ও অনাহার।

(৩) কয় হাজার ভূতপূর্ব্ব কুলীকে ৩০ লক্ষ আফ্রিকানের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা অসম্ভব এবং বৃটিশ গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী।

যদিও লোকগণনায় দেখা গিয়াছে, প্রজনন প্রতিহত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিজ্ঞ য়ুরোপীয়রা কেনিয়ায় যেরূপ বংশবৃদ্ধি করিয়াছে, অজ্ঞ ভারতবাসীরা সেরূপ পারে নাই, তথাপি তাহাদিগকে বৃটিশের ছত্রচ্ছায়ায় বাড়িতে দেওয়া ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদিগের অভিপ্রেত নহে। তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প করিবার উপায় দ্বিবিধ। অবশ্য যুদ্ধ অনাবশ্যক। তবেই অবশিষ্ট রহিল—অনাহার। সেই জন্যই কি শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণকায়দিগের দেশের সার শোষণ করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন? বলা হইয়াছে, কেনিয়ার ভারতীয়রা ভূতপূর্ব্ব কুলী। অবশ্য তাহা সত্য কথা নহে। তবে অসত্যে এই সব শ্বেতাঙ্গের অরুচিও নাই। কিন্তু যাহাদের মধ্যে গুরু অপরাধে দণ্ডিত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের সন্তানরা যে কোন সামাজিক সম্মান পাইতেছে, তাহারা কুলীকে ঘৃণা করে কোন্ অধিকারে? আর ইহাই কি গণতন্ত্র? যে ইংলণ্ডে শ্রমিকদিগের প্রভাব অসাধারণ, যে ইংলণ্ডে কিয়ার হার্ডির মত শ্রমিক নেতা বলিয়াছিলেন—রাজমুকুট ও অভিজাতসম্প্রদায়ের শিরাবরণ একই কটাহে গলান হইবে, যে ইংলণ্ডে জন বার্ণসের পক্ষে মন্ত্রীর পদ অনধিগম্য হয় নাই—সেই ইংলণ্ডের উদারনীতিক দলের সংবাদপত্রের মুখে এই কথা! জাতিহিসাবে ইংরাজের কতটা অধঃপতন হইয়াছে? এ কোন্ ইংলণ্ড? এ কি পীম হাম্পডেনের ইংলণ্ড? না—যে ইংলণ্ড মিথ্যাচারী ক্লাইবকে সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আদর করিয়াছিল এবং

কেনিয়ার আফ্রিকান।

যে ইংলণ্ড জার্ম্মাণ যুদ্ধে জয়লাভের পর রাষ্ট্রপতি উইলসনের চতুর্দ্দশ সর্ত্ত অবজ্ঞা করিয়াছে, সেই ইংলণ্ড?

কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকরা যে বলিয়াছিল, ভারতীয়দিগকে রাজনীতিক অধিকার দিলে তাহারাই ২৫ লক্ষ আফ্রিকানের শাসক হইয়া দাঁড়াইবে, সে কথাও মিথ্যা। কেন না, ভারতবাসিগণের প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন :-

(১) যত দিন পর্য্যন্ত আফ্রিকানরা স্বায়ত্ত শাসনলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে না, তত দিন তাহাদের স্বার্থের বিরোধী ব্যবস্থা প্রবৃত্ত করিবার জন্য সরকারের মনোনীত সদস্য সংখ্যা অধিক থাকাই প্রয়োজন।

(২) ভারতীয়রা আফ্রিকানদিগের শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না; সে কাযের ভার বৃটিশ কলোনিয়াল আফিসের উপর থাকুক।

কাযেই শেষ কথা দাঁড়াইয়াছিল আফ্রিকানরা স্বায়ত্ত শাসনে উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার তাহাদের দেশ ন্যাসরূপে রক্ষা করিবেন? না মুষ্টিমেয় বৃটিশ উপনিবেশিককে আফ্রিকানদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতা দিবেন?

আর কথা - ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীকে যে তুল্যাধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার সে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন? না ললাটে কপটাচারীর কলঙ্ককালিমালেপ লইয়া সভ্যজগতে মুখ দেখাইবেন?

বিলাতের সরকার এ কথার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গত ২৫শে জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতের সরকার অবশ্য নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া বলিয়াছেন, কেনিয়ায় তাঁহারা আফ্রিকানদিগের স্বার্থই সর্ব্বপ্রধান মনে করিয়া কায করিবেন এবং করিতেছেনও বটে। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থায় যে সে পরিচয় পাওয়া যায়, এমন নহে :-

(১) বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা হইবে না। কারণ, অল্পকালমধ্যে কেনিয়ায় স্বায়ত্ত শাসনপ্রবর্ত্তন সম্ভব নহে।

(২) ভারতবাসীকে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যনির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে বটে; তবে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, অর্থাৎ ভারতীয়রাই ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে।

(৩) প্রতিনিধির সংখ্যা এইরূপ হইবে —

২৩ হাজার ভারতীয় ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে;

১০ হাজার আরব ১ জন মনোনীত প্রতিনিধি ব্যতীত ১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে;

১০ হাজার যুরোপীয় ১১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে।

(৪) মালভূমিতে য়ুরোপীয় ব্যতীত আর কাহারও অধিকার থাকিবে না।

(৫) বৃটিশ সাম্রাজ্যের একাংশে অন্য অংশের লোকের গমন বন্ধ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু সে দেশের লোকের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া অন্যদেশীয়ের আগমন নিয়ন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় বিচার জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইবে।

তাহা হইলেই বুঝা গেল, লোকসংখ্যার তুলনায় ভারতীয়দিগের প্রতিনিধির সংখ্যা অল্প হইবে এবং মালভূমি য়ুরোপীয়দিগের জন্য স্বতন্ত্র রাখায় ভারতীয়দিগের ললাটে হীনতার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইবে।

বিলাতের সরকার স্বীকার করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহারা ভারত সরকারের মতানুসারে কায করেন নাই।

তবেই দেখা গেল—বৃটিশ সরকারের কাছে ভারত সরকারের মত অনায়াসে অবজ্ঞাত হইতে পারে এবং বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি সর্ব্বত্র পালিত হয় না।

এ দিকে কেপটাউনের সংবাদে প্রকাশ, জেনারল স্মাটস নাটালে ভারতীয়দিগকে নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রস্থানে বাস করিতে বাধ্য করিবার জন্য আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের ইচ্ছামত কায করিব"—"We ask to be masters in our own house and to regulate South Africa according to our own ideas."

বিলাতে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা স্বদেশে যখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাধিকার লইয়াছে, তখন বিদেশে তাহা লইবে না কেন? আর ভারত-সচিব লর্ড পীল, ভারত সরকারের কথা শুনা ত পরের কথা,—বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন হীনতার চিহ্ন নহে। কিন্তু যে স্থলে ১০ হাজার য়ুরোপীয় ১১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, সে স্থলে ২৩ হাজার ভারতবাসী ৫ জনের অধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না; আর মালভূমি যে শ্বেতাঙ্গদিগের জন্যই স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইবে—ইহা কি দাসত্বের চিহ্ন নহে?

কেনিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিরা বৃটিশ সরকারের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া ভারত সরকারকে তার করিয়াছেন—ইহাতে বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হইয়াছে। এই

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

মীমাংসা ও ভারতবাসীকে স্বতন্ত্র স্থানে আবদ্ধ রাখিবার জন্য জেনারল স্মাটসের চেষ্টা ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। তাই তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স হইতে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রত্যাহার করা হউক এবং ভারত সরকার সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করুন।

উপনিবেশের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের দুরাশায় ভারত সরকার যে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে উপনিবেশসমূহে পাঠাইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন :-

"কেনিয়ার ব্যাপারের মীমাংসা ভারতের পক্ষে অসাধারণ অপমানজনক। ইণ্ডিয়া আফিস ও ভারত সরকার কেনিয়ার বহু লোকের স্বার্থরক্ষার ভার পাইয়াছেন। যে স্বার্থ রক্ষিত হয় নাই—অবজ্ঞাত হইয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রিসমাজ বর্ণগত বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক **ভারতবাসীরা আর বৃটিশ সাম্রাজ্যে তুল্যাধিকারী অংশী নহে—তাহারা এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসমাত্র।**"

মিষ্টার এণ্ডরুজ বলেন, এ মীমাংসায় ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। কেনিয়ার মালভূমি শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখায় ভারতীয়দিগকে নিম্নাবস্থ করা হইয়াছে। নাটালে ও ট্রান্সভালের মত কেনিয়াতেও ভারতবাসীর দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না।

কেনিয়া সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের মীমাংসার সংবাদ পাইয়া লেজিসলেটিভ এসেমব্লী ডাক্তার গৌরের প্রতিশোধাত্মক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। সে আইনে কেবল বলা হইয়াছে, বৃটিশের অধীন যে সব দেশে ভারতবাসী যেরূপ ব্যবহার পায়, সে সব দেশের অধিবাসীরা ভারতে আসিলে সেইরূপ ব্যবহার পাইবে—সপার্ষদ বড়লাট এরূপ নিয়ম করিবেন। নিয়ম ব্যবস্থাপক সভার উভয় অংশের দ্বারা মঞ্জুর করিয়া লইতে হইবে।

বিস্ময়ের বিষয়, এই সামান্য প্রতিশোধব্যবস্থা অবিলম্বে করিতেও ভারত সরকারের হোম মেম্বার সার ম্যালকম হেলীর আপত্তি ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের সংখ্যাধিক্যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সার ম্যালকমের এই ব্যবহারে ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছিলেন—এত দিনে তিনি বুঝিয়াছেন, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঠিক কাজ করিয়াছেন—যাঁহারা বর্জ্জন করেন নাই, তাঁহারাই ভুল করিয়াছেন।

এখন ভারতবাসীকে ভারতবাসীর এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবাসীকে ভারতবাসী রক্ষা না করিলে আর কে করিবে?

নিষ্ফল আক্রোশ

মহাত্মা গান্ধী—ইহারা যদি একযোগে আক্রমণ করিতে পারিত, তবে হয় ত আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিত।
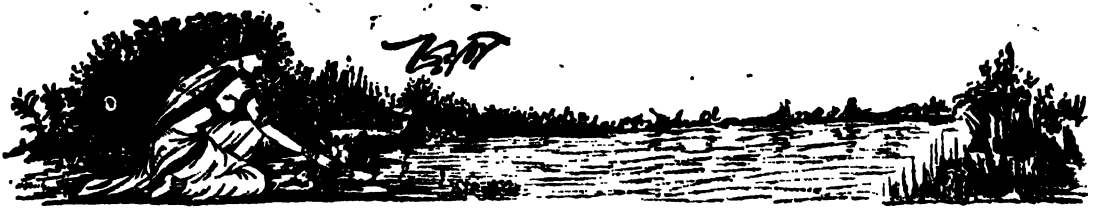
পোলোখেলার ইতিবৃত্ত

পোলোখেলা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনুকৃত হইয়াছে। জনৈক মার্কিণ লেখক সম্প্রতি পত্রান্তরে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে পারস্যদেশে এই খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল। পারস্যের কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে, পোলোখেলা রাজপরিবারেই নিবদ্ধ ছিল-- বিশেষ ধনবান্ ব্যতীত কেহ এই ক্রীড়া করিতে পারিত না। সাসানীয় নরপতি ও তাঁহাদের মহিষীরা পোলোখেলার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। খসরু পারউইজ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার রূপবতী খৃষ্টান মহিষী সিরীন্ অন্তঃপুরচারিণীদিগকে লইয়া পোলোখেলা করিতেন।

উল্লিখিত মার্কিণ লেখকের মতে পোলোখেলা পারস্যদেশ হইতে তুর্কীস্থান ও তিব্বতে প্রচলিত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে এই খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল। চীনের ট্যাং-রাজবংশীয়রা পোলোখেলার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ঘোড়ায় চড়িয়া কাঠের বল লইয়া তাঁহারা খেলা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ চীনভাষাবিৎ মিঃ হার্ব্বার্ট গাইল্‌স্ চীন-সম্রাটগণের পোলোখেলার চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

চীন সম্রাট মিংহুয়াং পোলোখেলার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং এক জন ভাল খেলোয়াড়ও ছিলেন। পোলোখেলা দেখিতে তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইত, এমন আর কোনও বিষয়ে হইত না। তাঁহার আদেশে বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমীর-ওমরাহকেও এই খেলায় প্রতিযোগিতা করিতে হইত। খেলার সময় অনভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধগণ ঘোড়ার উপর হইতে অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে তাঁহার ভারী আনন্দ হইত। চীন-সম্রাট সাধারণের সহিত মিশিয়া

প্রাচীন যুগে চীন-সম্রাট অন্তঃপুরচারিণী ও সম্রান্ত ওমরাহগণসহ পোলো খেলিতেছেন।

প্রাচীন যুগে চীন-সম্রাট একা পোলোখেলায় রত।

পোলো খেলিতেন বলিয়া বহু সভাসদ ও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী বিশেষ আপত্তি করিতেন। প্রজার সহিত সম্রাট খেলা করিবেন, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হইত; কিন্তু সম্রাট তাঁহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতেন না।

প্রাচীন যুগের চীন রাজান্তঃপুরচারিণীরাও তাঁহাদের সমসাময়িক পারস্য-মহিলাদিগের ন্যায় ব্যায়াম-ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ট্যাং-বংশীয় কোনও রাজকুমার তাঁহার অন্তঃপুরচারিণীদিগকে পোলোখেলায় উৎসাহ দিতেন। অশ্বের পরিবর্ত্তে মণিমাণিক্যখচিত রত্নাসন গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আঁটিয়া দিয়া অন্তঃপুরিকারা তাহাতে আরোহণ করিয়া পোলো খেলিতেন। ট্যাং-বংশের রাজত্বকালে প্রত্যেক সভাসদকে পোলো খেলিতে হইত। রাত্রিকালেও খেলা চলিত, তখন ক্রীড়াক্ষেত্রে বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। খেলোয়াড়দিগের মধ্যে যাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন, সম্রাট স্বয়ং তাঁহাদিগকে কাছে ডাকিয়া সংবর্দ্ধনা করিতেন—পুরস্কার দিতেন।

১১৬৩ খৃষ্টাব্দে কোনও চীন-সম্রাট এমন ঘোষণাও করিয়াছিলেন যে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পোলো খেলিতে হইবে। বৃষ্টি হইলেও খেলার বিরাম ঘটিত না। সে সময় ক্রীড়াক্ষেত্রে 'তেল-কাপড়' বিস্তৃত করা হইত এবং তাহার উপর শুষ্ক বালুকা ছড়াইয়া দেওয়া হইত। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু চীন-সম্রাট মন্ত্রিবর্গের নিষেধসত্ত্বেও খেলায় বিরত হইতেন না। একবার ক্রীড়াকালে জনৈক চীন-সম্রাট একটি বারান্দার কাছে আসিয়া পড়েন। অশ্ব তখন পৃষ্ঠদেশ হইতে সম্রাটকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। সম্রাট মাটীতে না পড়িয়া বারান্দার একপ্রান্ত ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন। তাঁহার বিপদাশঙ্কায় সকলে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পায়। সম্রাট অবিচলিতভাবে তাঁহার ঘোড়াটিকে ধরিয়া দিতে অনুরোধ করেন। সম্রাটের এইরূপ অবিচলিত সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া সকলেই তাঁহার জয়ঘোষণা করিয়াছিল।

ওষ্ঠাধরের বিচিত্র আভরণ

আফ্রিকার ফরাসী-অধিকৃত প্রদেশে—সারাস্‌-ডিঞ্জেস্‌ জাতির নারীদিগের সম্বন্ধে একটা বিচিত্র সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে একটা প্রথা আছে, কোনও পুরুষ কোন বালিকার পাণিপ্রার্থী হইলে সেই কুমারীর যুগল ওষ্ঠাধর তীক্ষ্ণমুখ কণ্টক অথবা শল্যের দ্বারা ঋজুভাবে বিদীর্ণ করা হয়। প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত কর্ত্তিত অংশের মধ্যে প্রথমতঃ দুই খণ্ড দীর্ঘ তৃণ প্রবিষ্ট করান হইয়া থাকে; এইরূপে দুই তিন সপ্তাহ অতীত হইলে, দুইটি ক্ষুদ্র গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড সেই ছিদ্রপথে তৃণখণ্ডের স্থান গ্রহণ করে। এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে ওষ্ঠাধরের কর্ত্তিত অংশ আর জুড়িয়া যাইতে পারে না, বরং ক্রমশঃ ফাঁক হইতে থাকে। উল্লিখিত কাষ্ঠগোলকগুলির শেষপ্রান্ত সম্মুখস্থ দন্তপাতির মাড়ি স্পর্শ করে। কুমারীর ওষ্ঠাধর যখন এই অবস্থায় পরিণত হয়, সেই সময় তাহাকে পল্লীসুন্দরী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অতি শৈশব অবস্থা হইতেই বালিকাদের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনপ্রণালী আরব্ধ হইয়া থাকে। মধ্য আফ্রিকার প্রত্যেক অসভ্য জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত। আলোচ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চারি পাঁচ বৎসরের বালিকার ভাবী স্বামী নির্ব্বাচিত হয়। এমনও দেখা যায় যে, সূতিকাগার হইতে বাহির হইতে না হইতেই শিশুর জন্য স্বামী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কুমারীর বয়ঃক্রম ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যেই তাহার ভাবী স্বামী তাহার ওষ্ঠাধরের প্রতি উল্লিখিত অস্ত্রোপচার করিয়া থাকে।

কাফ্রীসুন্দরীর পানীয়-গ্রহণ।

চাদ হ্রদের সন্নিহিত প্রদেশে ফরাসী রাজ্যের প্রচার-বিভাগের জনৈক তরুণ চিকিৎসক, ডাক্তার মুরাজ মধ্য আফ্রিকার জাতিসমূহের সম্বন্ধে নানা প্রকার কৌতূহলজনক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত বীভৎস আচারসংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণার ফলে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্মানের নিদর্শনরূপে নারীর ওষ্ঠাধর বিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে; কালক্রমে ওষ্ঠাধরের ছিদ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কাষ্ঠগোলকের পরিবর্ত্তে ক্রমে বৃহত্তর দারুপাত্র বিচ্ছিন্ন ওষ্ঠাধরে সংযুক্ত করা হয়। দারুপাত্রগুলিতে নানাবিধ নক্সা থাকে। এইরূপ পাত্রধারিণী নারীদিগের সৌন্দর্য্য দর্শকের মনে কিরূপ বীভৎসরসের সঞ্চার করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সম্প্রদায়ের কাফ্রীসুন্দরীরা পানভোজনে নানাবিধ অসুবিধা যে ভোগ করিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কথা কহিবার শক্তিও তাহাদের ক্রমশঃ অস্ফুর্ত্তিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠাধর বিলম্বিত পাত্রের আকারও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাত্রের ভারে মুখের মাংসপেশীও ক্রমে বিলোল হইয়া আইসে।

ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে এই কদাচার দমন করিবার জন্য আইন জারী করিয়াছেন; ক্রমে ক্রমে এই প্রথাও হ্রাস পাইতেছে।

ওষ্ঠাধরবিলম্বিত পাত্রধারিণী কাফ্রীসুন্দরীদিগের বিভিন্ন দৃশ্য।

দৃষ্টি আকর্ষণের অভিনব প্রণালী

সাক্রামেন্টো প্রদেশের সুন্দরীরা ভ্রমণকারীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যুবতী টুপী পরিয়াছে।

যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস প্রাসাদের চূড়ার আকারে মাথার টুপী নির্ম্মাণ করাইয়া যুবতীরা উহা মাথায় ধারণ করে। তাহার শীর্ষদেশে একটি ছোট গোলক; উহা তড়িতালোকে উদ্ভাসিত করিবার ব্যবস্থা আছে। পকেটে ব্যাটারী রাখিয়া টুপীর সহিত সুকৌশলে উহা এমনই ভাবে তারযুক্ত হয় যে, সহসা টুপীর শীর্ষস্থ গোলকটিকে উদ্দীপ্ত করিতে পারা যায়। টুপী পরিহিতা যুবতী যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়। তাহার টুপী পরার উদ্দেশ্য, নবাগতকে আহ্বান করা।

দীর্ঘশ্মশ্রু নর

সানফ্রান্সিস্কো নগরে দুই জন অধিবাসী আছেন, তাঁহাদের মত দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী লোক পৃথিবীতে আর নাই। এক জনের শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট, অপর জনের ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি। দীর্ঘকালের ক্রমবর্দ্ধিত শ্মশ্রু অধুনা রজ্জুর আকার ধারণ করিয়াছে। উহার মালিকরা সযত্নে এই বিচিত্র শ্মশ্রু গলদেশে বিলম্বিত করিয়া রাখেন।

শিল্পীর নৈপুণ্য

জনৈক বেহালা-বাদকের একটি দামী বেহালা ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বেহালা প্রেগ্ নগরের সঙ্গীতজ্ঞদিগের সমাজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বেহালা-বাদক সদলবলে কানাডার কোনও স্থানে ঐক্যতান-বাদ্য শুনাইতে গিয়াছিলেন; উল্লিখিত বেহালাখানি তাঁহার সঙ্গে ছিল। উহার মূল্য ২ হাজার ৪ শত ডলার হইবে। পথিমধ্যে চোর বেহালাখানি অপহরণ করে। অশ্বারোহী পুলিস-সৈন্য অনেক কষ্টে অপহৃত বেহালার উদ্ধারসাধন করিয়া মালিককে প্রদান করে। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাঁহার মোটর-গাড়ী উল্টাইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট বেহালাখানি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। ৮৬ খণ্ডে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। স্পোকানি নগরের কোনও সঙ্গীতযন্ত্রমেরামতকারী উহার পুনঃ-সংস্কারের ভার গ্রহণ করে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দুই মাস পরিশ্রমের পর উক্ত যন্ত্রশিল্পী এমন বেমালুমভাবে বেহালার সংস্কার-সাধন করিয়াছে যে, উহা একেবারে যেন

উপরের দৃশ্য—৮৬ খণ্ডে বেহালা বিভক্ত; নিম্নের দৃশ্য সুসংস্কৃত বেহালার অবস্থা।

সম্পূর্ণ নূতন বেহালা। দুর্ঘটনার পূর্ব্বে বেহালা হইতে যেরূপ মধুর স্বরলহরী উত্থিত হইত, অধুনা তাহার বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

'এক্স-রে' সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা

মার্কিণ বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষার ফলে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ হইতে ৭০ জনের শরীরে কোন না কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা আছে—কাহারও হয় ত মেরুদণ্ড বক্র, কাহারও বা অন্য কিছু। ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা ২ জন যে হৃদ্‌যন্ত্র সংক্রান্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার প্রতীকারকল্পে মিনিয়াপলিসের চিকিৎসক-সম্প্রদায় বালকদিগের শারীরিক অসম্পূর্ণতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অভিনব প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক বালককে একটি স্থিতিশীল দ্বিচক্রযানের উপর বসাইয়া পরীক্ষক তাহাকে চাকা চালাইতে আদেশ করেন। সেই অবস্থায় 'এক্স-রে' সংযুক্ত ক্যামেরার সাহায্যে বালকের হৃদ্‌যন্ত্রের আলোকচিত্র গৃহীত হয়। তাহার পর বালকের হৃদ্‌যন্ত্রে যে অসম্পূর্ণতা থাকে, চিকিৎসক তাহা দূরীভূত করিয়া থাকেন।

স্থিতিশীল দ্বিচক্রযানে উপবিষ্ট বালকের হৃদ্‌যন্ত্রের ফটোগ্রাফ তুলা হইতেছে।

মার্কিণ হোটেলে জাপানী উদ্যান

আমেরিকায় সবই বিচিত্র। নিউ ইয়র্কের কোনও বিশিষ্ট

নিউ ইয়র্ক হোটেলের ছাতের উপর কৃত্রিম জাপানী প্রমোদোদ্যান।

হোটেলের ছাতের উপর জাপানের প্রমোদোদ্যানের আদর্শে একটি কৃত্রিম উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। জনৈক জাপানী নিসর্গশিল্পী এই উদ্যান রচনা করিয়াছেন। টোকিও রাজ-উদ্যানের আদর্শে নানাবিধ ফল-ফুলের গাছ এই কৃত্রিম উদ্যানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জাপানী ফুল ও ফলের নানা প্রকার বৃক্ষ-লতার দ্বারা আলোচ্য উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করা হইয়াছে। একটি কৃত্রিম হ্রদও উদ্যানমধ্যে আছে ; তাহাতে ছোট ছোট হংস বিচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রমোদোদ্যানটিকে স্বাভাবিক করিবার জন্য শিল্পী যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য।

অতিকায় গণ্ডার

মঙ্গোলিয়ার মৃত্তিকাস্তর পরীক্ষা করিতে করিতে যে সকল প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জীবের কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অভিজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীনতম যুগে উত্তর আমেরিকা ও এসিয়ার সহিত বিশেষ যোগসূত্র ছিল। অর্থাৎ এই উভয় মহাদেশের মধ্যে জলের ব্যবধান ছিল না—উভয় মহাদেশ ভূমির দ্বারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল। বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে উটা এবং মনটানা অঞ্চলে একই প্রকার জীবজন্তু বিচরণ করিত। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমেরিকায় যে শ্রেণীর অতিকায় গণ্ডার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বিচরণ করিত, সেই শ্রেণীর জীব এসিয়ায় ছিল। স্থলপথে উভয় মহাদেশে গতায়াত সম্ভবপর না থাকিলে একই জাতীয় গণ্ডারের কঙ্কাল উভয় স্থানে পাওয়া যাইত না। মঙ্গোলিয়ায় সম্প্রতি যে কঙ্কালটি মৃত্তিকাস্তর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট এবং উচ্চতা ১২ ফুট হইবে। এরূপ অতিকায় জন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগেও দুর্ল্লভ ছিল।

অতিকায় গণ্ডারের পার্শ্বে আধুনিক যুগের আফ্রিকাদেশীয় গণ্ডার কত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে! মানুষের তুলনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের গণ্ডার কত বড় ছিল, তাহাও এই চিত্র হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারী জিনিষ তুলিবার সহজ উপায়

বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার বাষ্প (Fluid) আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অত্যন্ত ভারী জিনিষও সহজে উত্তোলন করা যায়। এই বাষ্পীয় পদার্থ লৌহনির্ম্মিত বোতলে পূর্ণ করিয়া একটি বালকও অনায়াসে যথেচ্ছ লইয়া যাইতে পারে। বোতল হইতে বাষ্প নির্গত করিবার সুব্যবস্থা আছে। কোনও উত্তোলন যন্ত্রের (Jack) দ্বারা কোনও ভারী জিনিষ তুলিবার সময় বোতল হইতে বাষ্প যদি উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে অনায়াসে সেই ভারী পদার্থকে স্থানচ্যুত করিতে পারা যায়। পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ৩ সেকেণ্ডে ৩০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩ শত ৬৬ মণ ওজনের ভারী জিনিষ এই বাষ্পের সাহায্যে উত্তোলন করা যাইতে পারে।

নূতন দমকল

আমেরিকায় সম্প্রতি এক প্রকার অগ্নিনির্ব্বাণোপযোগী দমকল নির্ম্মিত হইয়াছে ; ইহার সাহায্যে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিরাপদে অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে পারা যায়। এই দমকল একটি দ্বিচক্রযানের উপর অবস্থিত। অতি সহজে ও শীঘ্রগতিতে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে এই দমকল লইয়া যাওয়া যায়। গাড়ীর উপর এক জনের বসিবার আসন আছে। সেই ব্যক্তি আসনে বসিয়া কলের সাহায্যে সম্মুখস্থ প্রচণ্ড অগ্নিশিখার উপর প্রবলবেগে সলিলধারা বর্ষণ করিতে পারে। আরোহীর পশ্চাতে একটা নল ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত, তাহার শীর্ষদেশে বহুছিদ্রযুক্ত একটি চাকৃতি আছে। অগ্নিকুণ্ডের

উপর জলধারা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এই চাকৃতির ভিতর দিয়া ছত্রাকারে জলধারা উত্থিত হইতে থাকে। বর্ষণকারীর চারিদিকে তখন যেন একটা জলের প্রাচীর তুলিতে থাকে। ইহাতে কোনও দিক হইতে অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বা তাহার কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। অগ্নিনির্ব্বাণ কারী দমকলের নলটি এমনইভাবে গাড়ীর উপর সন্নিবিষ্ট যে, মুহূর্ত্তের চেষ্টায় তাহাকে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। এই নূতন দম কলের আবিষ্কারে অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে, প্রজ্বলিত অট্টালিকা প্রভৃতির অত্যন্ত নিকটে যাইয়া ইহার দ্বারা অগ্নিনির্ব্বাণ করা যাইতে পারে। এই যন্ত্র হইতে ১ শত ২৫ ফুট উর্দ্ধে জলধারা নিক্ষিপ্ত করা যায়। আরও সুবিধা এই যে, উহার সহিত ৫।৬টা অন্য সাধারণ নলও যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে সলিলধারা বর্ষণ করা চলে।

অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে সলিল-প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া নবাবিষ্কৃত দমকলের সাহায্যে অগ্নির উপর জলধারা বর্ষিত হইতেছে।

ভারতে মূষিক কর্ত্তৃক অপচয়

পুসা কৃষি-গবেষণা মন্দিরের প্রকাশিত পত্রে প্রকাশ যে, ভারতে নিত্য গড়ে ৮০ কোটি মূষিক শস্য নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদিগের এক একটি অন্ততঃ প্রতিদিন গড়ে এক ছটাক শস্য ভোজন করে। তাহা হইলে বৎসরে ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার মণ শস্য নষ্ট হয়। এই পরিমাণ গোধূম ও অন্যান্য শস্যের মূল্য প্রায় ৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ভারতের ন্যায় দেশের পক্ষে এরূপ ক্ষতি উপেক্ষণীয় নহে, অন্যান্য দেশে মূষিক ধ্বংস করিবার জন্য সমিতি আছে এবং বিশেষ বিশেষ দিনে ইঁদুর মারিবার ব্যবস্থা থাকায়, তথায় এত অধিক মাল অপচয় হয় না। সরকারী কৃষিবিভাগের কীটতত্ত্ববিদ্ বলেন, ফাঁদ পাতিয়া, বিষ বা ধূম প্রয়োগে মূষিক নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোন কোন কেন্দ্রে এ বিষয়ে পরীক্ষা হইতেছে। এক স্থানে বহু সহস্র ইন্দুরের গর্ত্তে বিষ ঢালিয়া দিয়া সেগুলির মুখ বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে ফললাভও হইয়াছিল। এই মূষিক-নিধনকার্য্যে তিনি দেশবাসীকে সরকারকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কচুরী পানা

কয় বৎসর হইতে বাঙ্গালায় এক নূতন আপদ দেখা দিয়াছে; বাঙ্গালার জলপথ কচুরী পানায় আচ্ছন্ন ও দুর্গম হইয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। এই পানার উৎপত্তি-স্থান—ব্রেজিল। কিরূপে ইহা এ দেশে নীত হইয়াছে, বলা যায় না। ফ্লোরিডায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এবং কুইনসল্যাণ্ডে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহার ব্যাপ্তিতে লোক শঙ্কিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহার সুন্দর ফুলের জন্য [illegible] খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জের মিষ্টার জজ মর্গান গাছ আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না-ও হইতে পারে। [illegible] খৃষ্টাব্দে ঢাকার সওদাগর সভা এই আপদের কথা সরকারের গোচর করেন।

তদবধি ইহার বিস্তার বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক খাল বিল নদীতে জলযানের যাতায়াত দুষ্কর কার্য্য হইয়াছে এবং মাঠ পানায় আচ্ছন্ন হওয়ায় ধানের চাষ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, দার্জ্জিলিং, মালদহ ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে বাঙ্গালার আর সব জিলাতেই এই আপদ অল্পাধিক পরিমাণে দেখা দিয়াছে। ইহা যেরূপ দ্রুত-বর্দ্ধনশীল, তাহাতে এমনও মনে হয় যে, অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালায় ধান্যের আবাদও নষ্ট হইয়া যাইবে এবং নিরন্ন প্রজা অন্নের জন্য রক্তারক্তি করিবে।

কাজেই ইহার প্রতীকারোপায় চিন্তা করা সরকারের ও দেশের লোকের অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব হয় তদনুসারে, বাঙ্গালায় কচুরী পানার ব্যাপ্তি ও তাহার নিবারণোপায় সন্ধান করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার এক সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এই সমিতির কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন এবং সমিতি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন।

সংপ্রতি সেই অনুসন্ধান-সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে পানার যে মূল থাকে, তাহা হইতেই নূতন গাছের উদ্ভব হয় এবং একটিমাত্র মূল বা শিকড় হইতে যে গাছ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতে কয় মাসের মধ্যেই ৬ শত বর্গ গজ স্থান আবৃত হইয়া যাইতে পারে। মার্কিণে এই পানা নষ্ট করিবার জন্য সোডিয়াম্ আর্সিনেট (Sodium Arsenate) পিচকারীর দ্বারা গাছের উপর দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হইলেও গাছ এত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায় যে, জলপথ পানামুক্ত করা যায় না। বিশেষতঃ ইহাতে গবাদি পশুর বিপদ-সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। এই সকল কারণে মার্কিণ সরকার সে উপায় ত্যাগ করিয়াছেন। মার্কিণের এই পিচকারী ব্যবহারের খরচ—প্রতি ১৬ লক্ষ বর্গ গজে ৯০ হাজার টাকা। তাহার পর মার্কিণে পানার উপর তৈল ছড়াইয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিযোগ করা হয়। ফলে পানা পুড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে নূতন পানার উদ্ভব নিবারিত হয় নাই।

ইতোমধ্যে মিষ্টার গ্রিফিথস নামক এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রকার গাছ নষ্ট করিবার জন্য একরূপ তরল পদার্থ ব্যবহার করিতেছেন। তাহা উদরস্থ হইলে পশুর মৃত্যু হয় না। ইনি ঢাকাতে ইঁহার আবিষ্কৃত তরল পদার্থের ব্যবহারফলও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইঁহার উপায়ের উপযোগিতা সম্বন্ধেও সমিতির সদস্যরা একমত হইতে পারেন নাই। বিশেষ আচার্য্য বসু মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন, এই তরল পদার্থ পিচকারীযোগে

গাছের উপর ছড়াইয়া দিবার সুবিধা হইবে না। অবশ্য এরোপ্লেন হইতে পিচকারী চালান চলিবে না! সে অবস্থায় জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পানায় কিরূপে ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে? তাহা হইলেই নৌকা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং ব্যয় যথেষ্ট পড়িবে। কেবল তাহাই নহে—গাছ যদি জলেই পচিয়া যায়, তাহা হইলেও জল অব্যবহার্য্য হইয়া ব্যাধিবিস্তারকেন্দ্রে পরিণত হইবে। সর্ব্বোপরি বসু মহাশয় বলেন, যখন শিকড় হইতেই নূতন পানার উদ্ভব হয়, তখন বিষাক্ত ঔষধ দিয়া পানার পাতা নষ্ট করিলে কখনই ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না—নূতন পানার উদ্ভব নিবারিত হইবে না।

এই পানা কি কি কাযে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

ইহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিন্তু স্বল্পব্যয়সাধ্য উপায়ে তাহা করিবার ব্যবস্থা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

ইহা সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সার হিসাবে গলিত কচুরী পানা গোময় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ইহা পোড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায়, তাহাও উত্তম সার। এ কথা কৃষকদিগকে জানান হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিতে যত্ন না লওয়ায় বিশেষ কোন সুফল ফলে নাই।

এই পানা কাগজের উপকরণরূপে ব্যবহার করা যায় কি না, তাহাও পরীক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, কাগজের উপকরণ হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা হাকিম জানান, কচুরী পানার ফুল হইতে ব্লু-ব্ল্যাক কালী প্রস্তুত হইয়াছে এবং দ্রাবকযোগে তাহার বর্ণ ম্যাজেণ্টা-লোহিতে পরিণত হয়; আবার সোডা দিলে তাহা সবুজ হয়। কিন্তু সে রং পাকা করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত না হওয়ায় কোন কায হয় নাই।

দেখা যায়, যখন ঘাসের অভাব হয়, তখন গবাদি পশু জলাশয়ে নামিয়া কচুরী পানার পাতা খায়। যে সব স্থানে পাতা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে সব স্থানে সময় সময় ঘাসের অভাব হইলে লোক পশুখাদ্যরূপে পানার পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল সে পাতা পশুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য হয় না—সঙ্গে অন্যান্য জিনিষ মিশাইতে হয়। সেরূপ পশুখাদ্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা এ দেশে এখনও হয় নাই এবং হইলেও তাহার দর সস্তা হইবে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

এই সব বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, বর্ত্তমানে পানা নষ্ট করিয়া ফেলা ব্যতীত অন্য কোন কায করার সুবিধা দেখা যায় না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগ হইতে যে প্রস্তাব প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মিষ্টার গ্রিফিথ্‌সের উপায় অবলম্বনের বিরোধী হইলেও বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী নবাব নবাব আলী চৌধুরী সেই উপায় অবলম্বনে অনিচ্ছুক নহেন। তাই বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমান বৎসর হইতে উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বনের ব্যয়নির্দ্ধারণকল্পে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

যে উপায়ের সাফল্য সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয়ের মত বিশেষজ্ঞের বিশেষ সন্দেহ আছে, সহসা বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা হিসাবে (an extensive demonstration) সে উপায় অবলম্বনে লোকের আপত্তির অবশ্যই কারণ আছে। বিস্তৃতভাবে পরীক্ষায় অবশ্য যথেষ্ট ব্যয় হইবে। শেষে সে কাযটা যেন তাঁহাদের অর্থার্জ্জনের আর একটা উপায়মাত্রে পরিণত না হয়।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের প্রস্তাব, পানা তুলিয়া গর্ত্তে ফেলা বা পুড়াইয়া দেওয়া হউক। তাহাতে পানা নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিবে না। কারণ, পানা তুলিলে সঙ্গে সঙ্গে জলমধ্যে ভাসমান শিকড়গুলিও উঠিয়া আসিবে এবং নূতন পানা উৎপন্ন হইবার আর উপায় থাকিবে না।

লোককে উৎসাহিত করিলে ও পারিশ্রমিক দিলে তাহারা যদি অবসরকালে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পানা তুলিয়া দেয়, তবে পানানাশের সঙ্গে সঙ্গে পানায় যাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহারা কিছু কিছু অর্থার্জ্জনও করিতে পারিবে।

ইহাতে আর একটি উপকার হইবে—লোক নিজের কায নিজে করিতে শিখিবে—স্বাবলম্বনের শিক্ষা পাইবে।

এ ব্যবস্থায় ব্যয়ও অল্প হইবে। জিলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়েন, তবে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ হইতে পারে এবং গ্রামের লোকের সাহায্যও লাভ করা সহজ হইবে।

নবাব নবাব আলী চৌধুরী

পানা তুলিয়া ফেলিবার যে ব্যবস্থার কথা আচার্য্য বসু মহাশয় বলিয়াছেন, তাহার ফলাফল পরীক্ষা না করিয়াই সরাসরি মিষ্টার গ্রিফিথ্‌সের উপায় পরীক্ষা করিতে যাইবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগ ও সে বিভাগের চূড়ামণি নবাব নবাব আলী চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে কি বলিলেন? আর এ বিষয়ে বাঙ্গালার লোক আত্মরক্ষার জন্য কি করিতেছেন? দেশের লোককেও এ বিষয়ে বিশেষরূপে সচেষ্ট হইতে হইবে।

শিখরাজার রাজ্যত্যাগ

গত ৭ই জুলাই সিমলায় নাভার মহারাজের সম্বন্ধে যে সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ মহারাজ স্বেচ্ছায় রাজতক্ত ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। তিনি সেজন্য কেবল কতকগুলি সর্ত্ত করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে প্রধান--

(১) রাজ্যভার ভারত সরকারকে দেওয়া হইবে। মহারাজ এখন নামেমাত্র রাজা থাকিবেন। তাঁহার ৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র সাবালক হইলে তিনি যথারীতি রাজ্য ত্যাগ করিবেন। (২) মহারাজ ভবিষ্যতে রাজ্যসীমার বাহিরে বাস করিবেন। (৩) পাতিয়ালা দরবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদে প্রভূত অর্থ প্রদান করা হইবে। (৪) মহারাজ নাভায় বা আর কোন স্থানে যাইতে হইলে তজ্জন্য সরকারের অনুমতি লইতে বাধ্য থাকিবেন। (৫) মহারাজ উপাধি সম্ভোগ করিবেন এবং বৃত্তি পাইবেন। (৬) তিনি ইংরাজ-রাজের ও ভারত সরকারের কাছে রাজভক্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন।

ব্যাপারটা এতই জরুরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যে, সংবাদ প্রকাশের পূর্ব্বেই ভারত-সচিব ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ভারত সরকার অবিলম্বে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

অর্থাৎ প্রায় ১৮ বৎসরের জন্য নাভারাজ্য বৃটিশ সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। কথিত আছে, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এক দিন ভারতের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে রক্তবর্ণে রঞ্জিত অংশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এটা লাল কেন?" ইংরাজাধিকৃত অংশ লোহিতে রঞ্জিত শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "সব লাল হো যায়েগা।"

ভারতবর্ষের যে অংশ "রক্ষিত শিখরাজ্য" (Protected Sikh States) বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্যে আবার ৩টি রাজ্য সাধারণতঃ ফুলকিয়ান ষ্টেটস নামে পরিচিত। ফরিদকোট বাদ দিয়া পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত। ৩টি রাজ্যের রাজাই একবংশোদ্ভূত এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইলে এই ৩টি রাজ্যই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শিখশক্তির মানমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিল। নাভার বর্ত্তমান ভাগ্যহীন অধিপতির পিতাই পঞ্জাবে রাজন্যমণ্ডলে দলপতি বলিয়া গৃহীত হইতেন এবং সকল গৃহবিবাদ তিনিই মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন।

আজ সহসা তাঁহার পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল কেন? সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পাতিয়ালা রাজ্যের সহিত নাভা রাজ্যের যে সব বিষয় লইয়া বিবাদ চলিতেছিল, সে সকল সম্বন্ধে রিপোর্ট ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ৬টি অভিযোগে নাভা দরবার দোষী প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তদন্তে বুঝা গিয়াছে, পাতিয়ালা সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে নাভার পুলিস ইচ্ছা করিয়া পাতিয়ালা রাজ্যের লোকদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা উপস্থাপিত করিয়াছে। এই সব মামলায় নাভার আদালত যে সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দণ্ড দিয়াছেন, সে সব কোনরূপেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং তাহাতে বোধ হয়, এ বিষয়ে নাভার বিচারবিভাগেরও যোগ ছিল। দেখা যায়, নাভা দরবারের বিচারকার্য্যে নিযুক্ত অনেক উচ্চ কর্ম্মচারী পাতিয়ালার ক্ষতি করিবার জন্য অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এ বিষয় যে নাভার প্রধান মন্ত্রীর ও প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীর অগোচর ছিল না, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। একটি মামলায় মামলা তুলিয়া লইয়া বা মুলতুবী রাখিয়া অভিযোগের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য মহারাজকে বলাও হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। অনুসন্ধানফলে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এ সব ব্যাপারে নাভার মহারাজের যোগ বা সম্মতি ছিল। বিচারের নামে এই সব ব্যাপারে চূড়ান্ত অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত সরকার যখন এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় নাভার মহারাজা পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তে রাজ্যত্যাগের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

কোন দেশীয় রাজাকে রাজ্যচ্যুত করার প্রথম বা প্রধান দৃষ্টান্ত-- গাইকবাড় মালহার রাও। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও তিনি নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ তক্ত পায়েন। পরে জানা যায়, জ্যেষ্ঠের পত্নী লক্ষ্মীবাই গর্ভবতী। লক্ষ্মীবাই পরম সুন্দরী যুবতী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হইলে সে-ই রাজ্যলাভ করিবে বলিয়া নূতন গাইকবাড় তাহাকে হত্যা করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে কোন

ইংরাজ মহিলার কাছে রাখা হয়। গাইকবাড় সে বাড়ীর কাছে সৈনিক রাখিতেন এবং গর্ভপাতের আশায় কামান দাগিতেন। শেষে লক্ষ্মীবাই এক কন্যা প্রসব করেন। দুষ্ট লোক প্রচার করে, তাঁহার পুত্র হইয়াছে। গাইকবাড় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং শেষে প্রকৃত সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আপনার পাগড়ী লুফিতে থাকেন। লক্ষ্মীবাই মাসিক ২৫৭০ টাকা বৃত্তি লইয়া পুণায় গমন করেন। শেষে গাইকবাড় ইংরাজদূতকে সংহার করিবার চেষ্টায় অভিযুক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়েন এবং সরকার কর্তৃক আহূত হইয়া লক্ষ্মীবাই বর্তমান গাইকবাড়কে পোষ্যপুত্র লয়েন।

সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর কেবল হোলকার নাভার মহারাজার মত পুত্রের উদ্দেশ্যে রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতেও সরকারের হাত বুঝা গিয়াছিল।

নাভার বর্তমান মহারাজা যখন যুবরাজ বা টিক্কা সাহেব, তখনই তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, নাভার যুবরাজ হইয়াও তিনি অনেক প্রস্তাবে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে ভোট দিতেন! ব্যুরোক্রেশীর মতে গোখলে তখনকার দিনের চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

টিক্কা সাহেব যখন বিলাতে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কিন্তু সরকার কর্তৃক তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। তখনই নাভা দরবার ভারত সরকারের অধীন। পূর্ব্বে যখন এই সব দেশীয় রাজ্য পঞ্জাব সরকারের তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন জালন্ধরের কমিশনার শিখ সামন্তরাজ্যগুলির রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাহার পর রাজ্যগুলিকে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন করা হয়। ফলে, রেসিডেণ্টের সঙ্গে সময় সময় মহারাজের মতান্তর হইয়াছে এবং তিনি রাজ্যরক্ষা আইন চাহেন নাই।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে (৫ই মে) নাভার রাজাকে ভারত সরকার যে সনন্দ দেন, তাহাতে লিখিত ছিল, তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা চিরকাল রাজ্যে পূর্ণ অধিকার সম্ভোগ করিবেন—"The Raja and his heirs for ever will exercise full sovereignty over his ancestral and acquired dominions" (Aitchison). রাজা তাঁহার প্রজাদের মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকারও লাভ করেন এবং বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দেন—তাঁহার কোন প্রজার কাছ হইতে কোন নালিশ গ্রহণ করিবেন না।

এখন কথা, ভারত সরকারের এই ব্যবস্থায় কি নাভার মহারাজের full sovereignty রক্ষিত হইল?

সরকারী বিবরণের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, মহারাজের অপরাধ তাঁহার কর্ম্মচারীরা পাতিয়ালার অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বিচারের নামে অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ভারত সরকারের বিশ্বাস, মহারাজের জ্ঞাতসারে তাহা হইয়াছে। তাহাতে ভারত সরকারের সহিত তাঁহার সন্ধিসর্ত্ত কিরূপে ক্ষুণ্ণ হয়?

তাহার পর কথা—সরকারী বিবরণে প্রকাশ, মহারাজ স্বেচ্ছায় গদী ত্যাগ করিলেন। কেন? তিনি গদী ত্যাগ করিলেও যে উপাধি প্রভৃতি বজায় রাখিতে চাহিলেন, তাহাতেই মনে করিবার কারণ আছে ইচ্ছাটা হয় ত স্বতঃই সমুদিত হয় নাই।

শেষ দুই কথা—

(১) রাজ্যভার ভারত সরকারকে সমর্পণ করিলেও কেন তিনি রাজ্যমধ্যে বাস করিতে পারিবেন না এবং তথায় বা অন্যত্র যাইতে হইলে সরকারের অনুমতি লইতে বাধ্য থাকিবেন? এরূপ ব্যবস্থা দাগীদের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে।

(২) মহারাজকে ইংরাজরাজের ও ভারত সরকারের কাছে রাজভক্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে হইবে—এ সর্ত্ত করা হয় কি জন্য? পাতিয়ালায় ও নাভায় যদি কলহ হইয়া থাকে এবং নাভা দরবার যদি তাহাতে অনাচার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তিনি বৃটিশ সরকারের সম্বন্ধে রাজদ্রোহী হইয়াছেন বা রাজভক্তির অভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

এই সব ব্যাপারে মনে হয়, সরকারী বিবরণে যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, ততটাই সব নহে—মধ্যে আরও কিছু আছে।

আর এক কারণে এই রহস্য যেন ঘনীভূত হইয়াছে। পঞ্জাবের শিখদিগের কোন পত্রে প্রকাশ, মহারাজকে স্থানান্তরিত করিতে প্রাসাদে যাইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কই—সে আকালী কোথায়?"

এই উক্তি সত্য হইলে, ইহার সার্থকতা কি?

নাভার রাজার রাজ্যত্যাগে শিখসমাজে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের গদীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সব ঘটনার পর নাভার মহারাজের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি স্বেচ্ছায় গদী ত্যাগ করিয়াছেন।

এ দিকে কিন্তু কোন কোন শিখ পত্রে প্রকাশ, তিনি বাধ্য হইয়া রাজ্যত্যাগপ্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাইয়াই তাহা প্রত্যাহার করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

আর একটি কথা—এ বিষয়ে ভারত সরকার কি রাজেন্দ্র-মণ্ডলের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন? ভারত সরকার যে রাজেন্দ্র-মণ্ডলকে শাসনব্যাপারে সহকর্ম্মী বলিয়া থাকেন, তাহার কোন প্রমাণ বর্ত্তমান ব্যাপারে পাওয়া গিয়াছে কি?

হাওড়া পুল

কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে নদীর উপর যে সেতু বিদ্যমান, তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেতুটি পুরাতন—বর্ত্তমানে তাহার উপর যে পরিমাণ লোক ও মাল যায়, তাহার উপযোগী নহে। পরন্তু এ সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িতেও পারে। সেই জন্য ইহার পরিবর্ত্তে আর একটি সেতু গঠনের প্রস্তাব কিছু দিন হইতেই হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের সময় আবশ্যক উপকরণের অভাবে নূতন সেতুগঠন সম্ভব হয় নাই বলিয়া পুরাতন সেতুর সংস্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন সে প্রস্তাব আবার হইয়াছে।

এই জন্য এঞ্জিনিয়ারদিগের যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার মতে "ক্যান্টিলেভার" স্থায়ী সেতু করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। সে জন্য যে যে বাবদে ব্যয় পড়িবে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) সেতুটি নির্ম্মাণের খরচ;

(২) যে জমী লইতে হইবে, তাহার মূল্য ও সেতুতে যাইবার পথ নির্ম্মাণের ব্যয়;

(৩) স্থায়ী সেতু হইলে সেতুর উত্তরে বড় জাহাজ যাইতে পারিবে না বলিয়া যে সব ডক প্রভৃতির ক্ষতি হইবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ।

সব লইয়া ব্যয় পড়িবে—৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। ৬০ বৎসরে শোধ করিবার সর্ত্তে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে টাকা ধার করিয়া এই সেতু রচনা করিলে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ বাবদে টাকা কিছু কমও লাগিতে পারে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণে সমিতি মনে করিয়াছেন, বৎসরে ৩১ লক্ষ টাকা আয় হইলেই কুলাইবে।

যে সেতু এখন আছে, তাহার সংস্কারাদির ব্যয় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে হাওড়ার মালের উপর মণকরা ২ পাই শুল্ক

প্রস্তাবিত সেতু

হইতে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের বার্ষিক কর হইতে নির্ব্বাহিত হয়। পূর্ব্বে সেতুর উপর যাত্রীর ও গাড়ীর টেক্স লইয়া সেতু নির্ম্মাণের ব্যয় তুলা হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সে টাকা ওয়াশীল হইয়া গেলে সে টেক্স তুলিয়া দেওয়া হয়।

এবার বার্ষিক ৩১ লক্ষ টাকা তুলিবার প্রস্তাবে অর্থ-সমিতির ১১ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন একমত হইয়া নিম্নলিখিত উপায়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন—

		টাকা
কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপ্যালিটীর সেতুশুল্ক	...	৬ লক্ষ
হাওড়ার শুল্ক	...	১ "
মণকরা ১ পাই হিসাবে রেলে ও জলপথে মালের উপর শুল্ক	...	৭ "
রেলে যাত্রীদিগের ৩ পাই হিসাবে শুল্ক		৫ "
সমুদ্রপথে আগত যাত্রীদিগের ৮ আনা হিসাবে শুল্ক	...	১ "
পোর্ট কমিশনারের খেয়া ষ্টীমারে যাত্রীর টেক্স	...	১ লক্ষ ২০ হাজার
ট্রামের টেক্স	...	৫০ হাজার
বাঙ্গালা সরকারের দান	..	৫ লক্ষ
ভারত সরকারের দান	...	৫ "
মোট		৩১ লক্ষ ৭০ হাজার

কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট-উইলিয়ামস খেয়া ষ্টীমারে যাত্রীদের উপর শুল্কের বিরোধী।

তদ্ভিন্ন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, কিলবরণ কোম্পানীর মিষ্টার ওকলী, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, পূর্ব্ববঙ্গ ষ্টীমার কোম্পানীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা প্রস্তাবিত "ক্যান্টিলেভার" সেতু বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার সার ব্রাডফোর্ড লেসলী যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য। তিনি বর্ত্তমান সেতুর মত ভাসমান সেতুর সহিত "ক্যান্টিলেভার" সেতুর তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত:—

(১) স্থান

১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়, যে স্থানে বর্ত্তমানে সেতু আছে, সেই স্থানেই নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে। হাওড়া ষ্টেশনের সান্নিধ্যে এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই এই স্থানে হ্যারিসন রোড বাহির করা হইয়াছে। যদি বর্ত্তমান সেতুর পরিবর্ত্তে এইরূপ ২টি সেতু রচিত হয়, তবে বর্ত্তমান স্থানেই সেতু রাখা যাইবে। "ক্যান্টিলেভার" সেতু রচনা করিলে বর্ত্তমান স্থান হইতে ২ শত গজ উত্তরে যাইতে হইবে। তাহাতে ২ দিকে ৪ শত গজ ঘুরিয়া লোককে গতায়াত করিতে হইবে এবং লোকের বিশেষ অসুবিধা হইবে। এই গতায়াতে যে লোকের অনেকটা সময়ও যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

(২) সময়

বর্ত্তমান সেতুর মত যুগ্মসেতুর নক্সা, খরচের হিসাব প্রভৃতি প্রস্তুত আছে। ২ বৎসর ৬ মাসের মধ্যে সেতুনির্ম্মাণ শেষ হইতে পারে। "ক্যান্টিলেভার" সেতুর জন্য নদীর উভয় কূলে রাস্তা করিতেই অন্ততঃ ৬ বৎসর লাগিবে। তাহার পর সেতুনির্ম্মাণ।

(৩) স্থায়িত্ব

উভয় সেতুই ১ শত ৫০ বৎসর চলিবে।

(৪) ব্যয়

সেতুর খরচ, জমীর দাম, টাকার সুদ প্রভৃতি খতাইলে ভাসমান সেতুর খরচ মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। আর "ক্যান্টিলেভার" সেতুর খরচ —৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ৬ লক্ষে কুলাইবে না।

বলা বাহুল্য, ভাসমান সেতুর আর একটি সুবিধা আছে। বর্ত্তমান সেতু বজায় রাখিয়া প্রথমে পার্শ্বে একটি সেতু রচনা করিয়া তাহার পর এটি খুলিয়া দ্বিতীয়টি নির্ম্মাণ করা চলিবে।

সার ব্রাডফোর্ড "ক্যান্টিলেভার" সেতুর খরচ ধরিয়াছেন, ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। সে স্থলে সমিতির নির্দ্দিষ্ট ব্যয় অর্থাৎ ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা হইলেও ব্যয় ভাসমান সেতুর অপেক্ষা অধিক হইবে।

মিষ্টার ওকলী ভাসমান সেতুর পক্ষে মত দিয়া ব্যয়-নির্ব্বাহকল্পে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন :—

		টাকা
রেল-যাত্রীর উপর টেক্স	...	৫ লক্ষ
সমুদ্রপথের যাত্রীর উপর টেক্স	...	১ "
পোর্টকমিশনারের খেয়া জাহাজে যাত্রীর উপর টেক্স	...	১ লক্ষ ২০ হাজার
ট্রামের টেক্স	...	৫০ "
ভারত সরকারের দান	...	৩ লক্ষ
বাঙ্গালা সরকারের দান	...	২ লক্ষ ৩০ হাজার
মোট		১৩ লক্ষ

ইহাতে কলিকাতা বা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর উপর করভার স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিক এই ২টি মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে নূতন করভার বহন করাও দুঃসাধ্য। কলিকাতা কর্পোরেশন জল সরবরাহের যে নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে প্রচুর অর্থব্যয় অনিবার্য্য। হাওড়ার অবস্থা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, ড্রেণ শেষ না করিয়া আর কোন কাযে হস্তক্ষেপ করা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে সঙ্গত হইবে না। এ অবস্থায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান যে অধিক ব্যয়ের বিরোধী, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান দেখাইয়াছেন, হাওড়ার অধিবাসীরা শতকরা ২৫ টাকা হইতে সাড়ে ২৮ টাকা টেক্স দেয় এবং ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের টেক্স হইবে বলিয়া শিক্ষা-শুল্ক স্থাপিত করা যায় নাই। এ অবস্থায় হাওড়া হইতে বৎসরে লক্ষ টাকা দিতে হইলে করদাতাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতায় আয়ে ব্যয়সঙ্কুলান হওয়াই দুঃসাধ্য এবং শীঘ্রই কর বাড়াইতে হইবে। তাহার উপর যদি মিউনিসিপ্যালিটীকে সেতুর জন্য বৎসরে ৬ লক্ষ টাকা দিতে হয়, তবে অসুবিধার অন্ত থাকিবে না।

গত ২১শে জুলাই তারিখে বাঙ্গালা সরকার যে প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, অর্থ-সমিতির নির্দ্ধারণে দেখা যায়—"ক্যান্টিলেভার" সেতু নির্ম্মাণ অসম্ভব নহে; কাযেই বাঙ্গালা সরকার সেইরূপ সেতু নির্ম্মাণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহারা কেন আবার এ বিষয়ে লোকের মত জানিতে চাহিয়াছেন? লোকমত জানিতে চাহিয়া তৎপূর্ব্বেই নিজ মত স্থির করা বিস্ময়কর ব্যবস্থা বটে!

তবে একটা কথা—যত অধিক টাকা সেতুনির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে, তত অধিক টাকা বিলাতে যাইবে এবং তথায় বেকার-সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে।

—

কালার জীবনের মূল্য

গত মাসে আমরা মালয়ে কোন ষ্টেটের ম্যানেজার এণোর্ণের পত্নীর পদাঘাতে চেন্নামুট্টু নামক এক জন ভারতীয় কুলীর মৃত্যু-সংবাদ পাঠককে দিয়াছি। চেন্নামুট্টু আগাছা তুলিতে কার্য তুলিয়াছিল, এই "অপরাধে" এণোর্ণ পত্নী তাহাকে পদাঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে তাহার মৃত্যু হয়। করোণার স্থির করেন, ভারতীয় কুলীর প্লীহাই প্রকৃত দোষী; কেন না, প্লীহা অস্বাভাবিক বর্দ্ধিতায়তন ছিল—সামান্য আঘাতে না ফাটিয়া থাকিতে পারিত না।

এক মাস যাইবার পূর্ব্বে সেই মালয় হইতে শ্বেতাঙ্গের আঘাতে আর এক জন ভারতীয় কুলীর মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে। আর এ ক্ষেত্রেও শ্বেতাঙ্গ বিচারক আসামীকে হত্যাপরাধে অপরাধী বলেন নাই। এবার কলাং পুলিস আদালতে তানাভক ষ্টেটের ম্যানেজার ফার্গাসন ও তাহার কেরাণী শিরীবর্দ্ধন অভিযুক্ত হয়। তাহাদের প্রহারে কুলী অনাথনের মৃত্যু হইলেও সরকারপক্ষে শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারাজীব ল্যাংওয়ার্দ্দী তাহাদের বিরুদ্ধে কেবল প্রহারের অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় পাঠ করিলেই জানা যায়, ফার্গাসন ও তাহার কেরাণীর পক্ষে উত্তেজিত হইয়া অনাথনকে প্রহার করিবার কোনই কারণ ছিল না।

অনাথনের বিধবা যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ,—বাগানের কর্ত্তারা চাউল না দেওয়ায় পূর্ব্ব-রাত্রিতে অনাথনের ও তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের আহার জুটে নাই। সেই জন্য সে পরদিন কাযে যাইতে অস্বীকার করে এবং ম্যানেজারকে সেই কারণ বুঝাইয়া দেয়। ম্যানেজার তাহার জেরায় বলিয়াছে—অনাথনের কৈফিয়ৎ ও কৈফিয়ৎ প্রদানের পদ্ধতি য়ুরোপীয়ের পক্ষে অপমানজনক

(insulting to a European) অর্থাৎ যাহাদের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে অপমান করা হয়, কালা আদমীর একটু উচ্চ কথায় তাহাদিগের অপমান হয়। আর তাহারা যখন ধলা অর্থাৎ কালাদের বিজেতা, তখন সে অপমান তাহারা সহ্য করিতে বাধ্য নহে এবং কালাকে প্রহার করিবার অধিকার তাহারা তাহাদের আছে বলিয়াই ধরিয়া লয়!

এ ক্ষেত্রেও যে ঠিক তাহাই হইয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে তাহা বুঝা যায়।

সাক্ষ্য প্রকাশ -ফার্গাসন প্রথমেই অনাথনকে প্রহার করে। অনাথন আত্মরক্ষার চেষ্টায় তাহার হাত ধরে। ফার্গাসন হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে পুনরায় প্রহার করে। সে অনাথনের মুখে বা পশ্চাদ্ভাগে প্রহার করে। তখন দ্বিতীয় আসামী শিরীবর্দ্ধন আসিয়া কুলীকে আক্রমণ করে। অনাথন পড়িয়া যায় ও প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

অনাথন যদি ফার্গাসনের হাত না ধরিয়া তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিত এবং তাহাকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাতে তাহার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত পুরস্কার দিত, আর সেই প্রহারে ফার্গাসনের প্লীহা ফাটিয়া যাইত, তবে অনাথনের অবশ্যই ফাঁসি হইত। অনাথন শ্বেতাঙ্গের আঘাতে মরিয়াছে, না হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুতে, বোধ হয়, অনাচারী শ্বেতাঙ্গদিগের শিক্ষা হইত এবং ভবিষ্যতে তাহারা অনায়াসে ভারতীয়দিগকে প্রহার করিতে সাহস করিত না।

সে যাহাই হউক, প্রহারের ১ ঘণ্টার মধ্যে যখন অনাথনের মৃত্যু হইল, তখন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার তাহার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিলেন। ডাক্তার বলিলেন—প্লীহা ফাটিয়া কুলীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু প্লীহাটা স্বাভাবিক আকারের ছিল না ; পরন্তু তাহার প্রায় দ্বিগুণ ছিল।

অবশ্য সেই প্লীহা লইয়াই অনাথন জীবনযাত্রা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল।

আসামী ফার্গাসন বলে, সে প্রহার করিয়াছিল মাত্র। আর আসামী শিরীবর্দ্ধন বলে, সে ফার্গাসনের সাহায্যের জন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং সে আত্মরক্ষার অধিকারে অধিকারী। সে গিয়াছিল, অকারণে অনাথনকে মারিতে ; আর সে দাবী করিল—আত্মরক্ষার অধিকার!

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। তিনি, বোধ হয়, মনে করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ; আপনাকে অপমানিত মনে করিলে কালাকে প্রহার করিবার সনাতন অধিকার ধলার আছে।

তিনি হত্যাব্যাপারের আলোচনা না করিয়া পাশ কাটাইয়া আর এক দিকে গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আসামীর দণ্ডবিধানকালে একটা কথা বিচার করিতে হইবে। ফার্গাসন বাগানের ম্যানেজার, কাযেই কুলীদিগের স্বাস্থ্যের জন্য সে দায়ী। সে স্বীকার করিয়াছে, প্রহারের পর অনাথনকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন, সে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবুও সে তখনই সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

বিচারকের মতে এই লঘু অপরাধই পিশাচ ফার্গাসনের একমাত্র অপরাধ। সে যে পূর্ব্বদিন অনাহারে অবসন্ন কুলীকে প্রহার করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, সে কথার উল্লেখমাত্র রায়ে নাই।

আর, শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারাজীবের হাস্যোদ্দীপক কথাই বিচারক বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—ফার্গাসন যে অনাথনকে প্রহার করিয়াছিল, সে, স্কুলমাষ্টার যেমন করিয়া ছাত্রকে মারে, সেই ভাবে। কেন না, আঘাতের চিহ্ন ছিল না। চিহ্ন ছিল কি না, তাহাও দেখিয়াছিলেন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার।

রায়ে বিচারক বলিয়াছেন, রাগ করিয়া কাহাকেও প্রহার করিলে মনে কোন দাগ থাকে না! অর্থাৎ প্রহারের জন্য ফার্গাসনের কোন দোষ ছিল না—অবশ্য হত্যাটা ফাউ। দোষ কেবল এই যে, যখন প্রহারে অপ্রত্যাশিত ফল ফলিল, তখন লোকটা সামলাইয়া না উঠা পর্য্যন্ত সে সে স্থানে থাকে নাই।

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ফার্গাসন নিরপরাধ কুলীকে প্রহার করিয়াছিল, বিচারকের পক্ষেও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার অপরাধ লঘু বিবেচনা করায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। তাই লঘু অপরাধে শ্বেতাঙ্গ বিচারক শ্বেতাঙ্গ হত্যাকারীর দণ্ড দিলেন—১ শত ৫০ ডলার জরিমানা, অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাবাস।

আর দ্বিতীয় আসামী? সে না বুঝিয়া যে প্রহার করিয়াছিল, তাহাতেই প্লীহা ফাটিয়া কুলীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার

দণ্ড—২৫ ডলার জরিমানা—অনাদায়ে ১৪ দিন সশ্রম কারাবাস। সমস্ত রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট কোথাও কার্গাসনের বর্ব্বর ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, এই যে প্রায় ৫ শত টাকা জরিমানা—ইহার কিছুই অনাথনের বিধবাকে দিবার ব্যবস্থাও করেন নাই।

অথচ ইহাকেই বিচার বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে!

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বারাণসী দাস চতুর্ব্বেদী মালয় সরকারকে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

(১) যে সব কুলী মালয়ে যায়, তাহারা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বা যাত্রা করিবার সময় বা মালয়ে তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে ডাক্তারের দ্বারা তাহাদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কি না? কুলীরা যখন কাযে নিযুক্ত থাকে, তখন কি মধ্যে মধ্যে তাহাদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করান হয়? যদি পরীক্ষা করান হয়, তবে যে সব কুলীর প্লীহা স্বাভাবিক আকারের দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ, তাহাদিগকে কি কায করিবার অনুপযুক্ত বলা হয়?

(২) কোনরূপে জীবনধারণ করিবার উপযুক্ত পারিশ্রমিক কি শ্রমিকরা পাইয়া থাকে?

কলাং-এর মোকদ্দমায় প্রকাশ, নিহত কুলী অনাথন ম্যানেজারকে জানাইয়াছিল, পূর্ব্ব রাত্রিতে সে চাউল পায় নাই এবং আদালতে তাহার বিধবা আঙ্গাম্মা বলিয়াছিল, তাহার স্বামীকে যখন প্রহার করা হয়, তখন সে উপবাসী। এমন ব্যাপার ঘটিল কেমন করিয়া? মালয়ের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিষ্টার নাম্বিয়ার লিখিয়াছেন, মালয়ে অনেক ষ্টেটে কুলীরা প্রতিদিন ২৭ সেণ্টের অধিক পায় না: অথচ শ্রম-কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, পুরুষ কুলীরা অন্ততঃ ৫০ সেণ্ট ও স্ত্রী কুলীরা ৪০ সেণ্ট পাইবে। মালয়ের শ্বেতাঙ্গ ধনীরা সে নির্দ্ধারণ পদদলিত করিতেছে।

(৩) এই ২টি ব্যাপারে চেল্লাম্মুটার ও অনাথনের বিধবা ও পরিবারবর্গকে উপযুক্তরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে কি?

(৪) যে ২টি ষ্টেটে এই ২টি ব্যাপার ঘটিল, সেই ২টি ষ্টেট সম্বন্ধে শাসনাত্মক কোন ব্যবস্থা করিয়া "মেম সাহেব", "সাহেব" ও তাহাদের ভৃত্যদিগকে এরূপ কার্য্যে বিরত করিবার কোন ব্যবস্থা মালয় সরকার করিয়াছেন বা করিবেন কি?

এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর মালয় সরকারই বা দিবেন কেন? যে ভারত সরকার এ দেশ হইতে মালয়ে কুলী পাঠাইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সে সরকারের দায়িত্ব কি শ্বেতাঙ্গ ব্যুরোক্রেশী অস্বীকার করিতে পারিবেন? তবে তাঁহাদের সুবিধা এই যে, তাঁহারা কোনরূপে এ দেশের প্রজার কাছে—মালয়ে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদের স্বজাতীয়দিগের কাছে—কৈফিয়তের জন্য দায়ী নহেন।

ভারতবাসী কি উদ্ধত বর্ব্বর শ্বেতাঙ্গদিগের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার নিয়তি বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে?

বিলাতের স্বার্থরক্ষা

রেলপথের উপযোগিতা যদিও কেহই অস্বীকার করে না, তবুও যে ভাবে ভারতে রেলপথবিস্তার হয়, তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ যে থাকে না, এমন বলা যায় না। দেশের জলনিকাশ কোন্ দিক্ দিয়া হয়, তাহাও প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এ দেশে রেলপথ রচিত হয় এবং সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই রেলের বাবদে অর্থ ব্যয় করা হয়। অন্যান্য দেশে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই রেলবিস্তার হয়, এ দেশে লক্ষ্য রাখা হয়—বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে। বিদেশী সওদাগররা পণ্যবহনের সুবিধা হইবে বলিয়া রেলপথবিস্তারের জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তাহাতে ভারত সরকারের এক জন অর্থসচিবও একবার বিরক্তি ও বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে একবার বলিয়াছিলেন, এ দেশে যে টাকা রেলের বাবদে ব্যয় হইয়াছে, তাহা যদি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয়িত হইত, তবে দেশের লোকের কত সুবিধাই হইত! এখনও ভারত সরকার এক দিকে বলিতেছেন, লবণের শুল্ক দ্বিগুণ না করিলে আয়ে ব্যয় কুলাইতে পারা যায় না; আর এক দিকে ৫ বৎসরে ১ শত ৫০ কোটি টাকা রেলবিস্তার বাবদে ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন।

রেলের বাবদে যে টাকা খরচ হইবে, তাহা "মূলধন" হিসাবে ধরা হয় এবং তাহার জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয়। এবার বিলাতের পার্লামেণ্টে যখন এই ঋণের আলোচনা হয়, তখন সার রবার্ট হাচিন্‌সন প্রস্তাব করেন, যে টাকা ঋণ

গ্রহণ করা হইবে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ বিলাতে খরচ করা হউক।

মিষ্টার চেম্বারলেন জিজ্ঞাসা করেন—বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ভারত-সচিব কি ভারত সরকারের সঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, এই টাকাটা যথাসম্ভব বিলাতের বাজারেই খরচ করা হইবে?

বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহার কতকটা পরিচয় মিষ্টার চেম্বারলেন দিয়াছেন—"আমরা যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিয়া এবং প্রচুর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের 'সওকারী' পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং ঋণদাতা হিসাবে লণ্ডনকে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত করিয়াছি। বর্ত্তমানে আর কোথাও ভারতবর্ষ এত টাকা ঋণ পাইতে পারে না। এখন ভারতবর্ষ যদি প্যারিসে বা নিউ ইয়র্কে মাল কিনিতে যায়, তবে আমরা এমনভাবে আমাদের অর্থ দিতে পারি না। * * * দাম যদি কিছু অধিক পড়ে, তবুও ভারতের জন্য আবশ্যক রেলের উপকরণ বিলাতেই ক্রয় করা কর্ত্তব্য।"

যখন বিলাতের অনেক লোক বেকার বসিয়া আছে এবং কাব না পাইলে তাহারা ভারতের নিরীহ প্রজার মত চুপ করিয়া মরিবে না, পরন্তু "খাবার দাও! খাবার দাও!" বলিয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করিবে, তখন দর বেশী হইলেও ভারতবর্ষকে বিলাতের বাজারে মাল খরিদ করিয়া এক হাতে গৃহীত ঋণের টাকা অপর হাতে দিতে হইবে। কথাটা নূতনও নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে হাই কমিশনার সার উইলিয়ম মায়ার স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি ভারতের জন্য রেলের এঞ্জিন কিনিবার সময়ে দিলে অন্য দেশের কারখানাওয়ালারা যে দর দিয়াছিল, বিলাতের দর তদপেক্ষা অধিক হয়। তিনি বিলাতের কারখানাওয়ালাদিগকে সে কথা জানাইলে তাহারা দর কিছু কমায়। তখনও বিলাতের দর বিদেশের দর অপেক্ষা অধিক থাকিলেও তিনি বিলাতেই মাল খরিদ করিয়াছিলেন। কারণ, যুদ্ধের সময় বিলাত ভারতের জন্য অনেক কায করিয়াছে! আমরা ত জানিতাম, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষই বিলাতের জন্য অকাতরে ধন-প্রাণ দিয়াছে এবং অর্থ-সচিব সার উইলিয়ম মায়ারই ১ শত ৫০ কোটি টাকা ভারতের রাজস্ব হইতে বিলাতের সরকারকে দানের ব্যবস্থা করেন। সেই জন্যই তিনি সুপারটেক্স স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে (১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে) কোন্ দেশে ভারতে রেলের জন্য কত টাকার মাল খরিদ হইয়াছে—এই প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেণ্টে বলা হয়—ভিন্ন ভিন্ন দেশে ক্রীত মালের মূল্য এইরূপ—

বিলাতে	...	৫৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত টাকা
জার্ম্মাণীতে	...	১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬ শত টাকা
বেলজিয়মে	...	৬১ হাজার ৫ শত টাকা
আমেরিকায়	...	৩ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত টাকা
সুইডেনে	...	২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা

অর্থাৎ যে স্থলে আর সব দেশে মোট ৭।৮ লক্ষ টাকার মাল খরিদ হইয়াছে, সেই স্থলে এক বিলাতে ৫৩ লক্ষ টাকার মাল খরিদ হইয়াছে।

এক বৎসর পরে (গত ১৭ই জুলাই তারিখে) মিষ্টার চেম্বারলেনের প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত-সচিব বলিয়াছেন—গত জানুয়ারী হইতে জুন এই ৬ মাসে যে মাল খরিদ হইয়াছে, তাহার জন্য শতকরা ৫ টাকা মাত্র বিদেশে গিয়াছে, অবশিষ্ট ৯৫ টাকার মাল বিলাতেই খরিদ হইয়াছে।

এ দিকে এই সঠিক সংবাদ। ও দিকে যখন রেলের বাবদে ৫ বৎসরে ১ শত ৫০ কোটি টাকা খরচ বরাদ্দ হয়, তখন লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীতে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়—যাহাতে এই বরাদ্দ ১ শত ৫০ কোটি টাকার যথাসম্ভব অধিক ভাগ ভারতে ব্যয়িত হইতে পারে, তজ্জন্য আবশ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত সরকার কি করিবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হউক। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুসারে যে সমিতি গঠিত হয়, তাহাতে সরকারী চাকরীয়া মিষ্টার এ, সি, চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দিলে ৩ জন ভারতীয় সদস্য ছিলেন—শ্রীযুক্ত লালুভাই শ্যামলদাস, শ্রীযুক্ত রামশরণ দাস, মিষ্টার কমট। এই ৩ জন ভারতীয় সদস্য রিপোর্টের সঙ্গে যে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল:—

(১) যদিও সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তাদরে যে মাল পাওয়া যায়, তাহা খরিদ করাই করদাতাদের স্বার্থসঙ্গত; তথাপি এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, উৎসাহের বা স্বার্থত্যাগের অভাবে যদি ভারতে মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা বিদেশী প্রতিযোগিতার ব্যর্থ হয়, তবে মোটের উপর

করদাতাদের ও দেশের ক্ষতি ব্যতীত লাভ হইবে না। বর্ত্তমানে যখন রেলের উপকরণ বাবদে ৭০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে, তখন সে শিল্পের সাহায্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

(২) বর্ত্তমানে বিলাতের কারখানাওয়ালারা যে দামে মালগাড়ী সরবরাহ করিতেছে, তাহা পড়তা অপেক্ষা কম কি না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। সরকার যখন ১০ বৎসরের জন্য মাল সরবরাহের চুক্তি করিবেন, তখন দাম এত কম হইবার কারণ বুঝিতে হইবে। অনুসন্ধানে যদি দেখা যায় (এ দেশের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে) বিলাতের কারখানাওয়ালারা পড়তা অপেক্ষা অল্প দামে মাল দিতেছে, তবে ভারত সরকার তাহার প্রতীকারকল্পে আবশ্যক ব্যবস্থা করুন।

এ কাল পর্য্যন্ত যে টাকা রেলের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিলে এত দিনে ভারতবর্ষ যে রেলের উপকরণবিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিত, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে অনেক টাকা যে দেশেই থাকিয়া যাইত, কেবল তাহাই নহে; পরন্তু ব্যয় কম হইলে রেলে যাত্রীর ও মালের ভাড়াও এত বাড়াইতে হইত না। অনেক আন্দোলনের পর ভারত সরকার এ দেশে কোন লোহার কারখানার সঙ্গে চুক্তি করেন যে, বিদেশের সঙ্গে সমান দরে বৎসরে ২০ হাজার টন রেল লইবেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে মালগাড়ী সরবরাহ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়, ভারত সরকার এ দেশে ১০ বৎসরের জন্য বৎসরে ৭ হাজার করিয়া মালগাড়ী খরিদ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

কিন্তু বিদেশে—বিশেষ বিলাতে ব্যবসার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে এবং ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যে বিলাতের কারখানাওয়ালারা যদি পড়তা অপেক্ষা কম দামে মাল দেয়, তবে ভারতে কোনকালে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

তাহার উপর বিলাতের লোক ত নির্লজ্জভাবেই বলিতেছে—বেশী দাম হইলেও ভারতকে বিলাতে রেলের উপকরণ কিনিতে হইবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—মুচী তাহার "লাষ্ট" লইয়া থাকুক—Let the cobbler stick to his last—সে হিসাবে ইংরাজ ঋণদাতাকে বলা যায়, "তুমি সুদ লইয়া সন্তুষ্ট থাক।" কিন্তু ইংরাজ ব্যবসায়ীরা সর্ত্ত করিতে চাহে, সে টাকার শতকরা ৭৫টি বিলাতেই মাল খরিদ করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাটা যেন শাঁকের করাতের মত যাইতে আসিতে কাটিবে। আর ইংরাজ যখন প্রভু, তখন যে তাহা হইবে, পূর্ব্বোদ্ধৃত সার উইলিয়ম মায়ারের কৃত কার্য্যের বর্ণনায় তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

শতকরা ৯৫ টাকার রেলের উপকরণ এখনও বিলাতে খরিদ হয়—আর প্রায় ৭০ বৎসর এ দেশে রেলপথ রচিত হইলেও আজও এ দেশে সে সব উপকরণ উৎপন্ন করিবার উপযোগী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় না! এরূপ বিস্ময়কর ব্যবস্থা কেবল স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত দেশেই সম্ভব।

— —

বড়লাটের ক্ষমতা

যখন লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীর নির্দ্ধারণ অমান্য করিয়া বড়লাট লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিয়াছিলেন, তখন এসেম্ব্লী তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই গত ৪ঠা জুলাই এসেম্ব্লীতে পঞ্জাবের ডাক্তার নন্দলাল প্রস্তাব করেন যে, যাহাতে এসেম্ব্লীর নির্দ্ধারণ পদদলিত করিয়া বড়লাট কোন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে না পারেন, সে জন্য সপার্ষদ বড়লাটকে আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে এসেম্ব্লী অনুরোধ করিতেছেন।

শেষে এই প্রস্তাবে একটু পরিবর্ত্তন হয়। বঙ্গের প্রতিনিধি মিষ্টার জে, এন, বসু প্রস্তাব করেন আইনে যে আছে—"যদি এসেম্ব্লী বা কাউন্সিল অব ষ্টেট সরকার যে আকারে কোন আইন করিতে চাহেন, তাহা উপস্থাপিত করিতে বা তাহাতে সম্মতি দিতে অসম্মত হয়েন, তবে বড়লাট ফতোয়া দিতে পারেন যে, বৃটিশ-শাসিত ভারতের বা তাহার কোন অংশের নিরাপদভাব, শৃঙ্খলা বা স্বার্থরক্ষার জন্য তাহা প্রয়োজন"—তাহাতে "বা স্বার্থ" বাদ দেওয়া হউক।

অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বার্থ ভারতবাসী যত বুঝে, তত আর কেহ বুঝে না। কাজেই আপনাদের স্বার্থের অনুকূল বুঝিয়া ভারতবাসীরা যে বিধি চাহে না, সে বিধি বিদেশী বড়লাটের খেয়ালে চালান সঙ্গত নহে। তবে কোন বিধি যদি ভারতে নিরাপদভাব বা শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য প্রয়োজন

হয়, তবে বড়লাট তাহা বিধিবদ্ধ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারত সরকারের হোম-মেম্বার সার ম্যালকম হেলী যেরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক সদস্যই অবিচলিত থাকিতে পারেন নাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন সদস্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। তাই এক জন সদস্য বলিয়াছিলেন, এ ব্যবস্থাপক সভার আয়ু শেষ হইতেছে বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার "বক বলিয়াছে"। তিনি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টকেই বেদ বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারত সরকার যাহা করিতেছেন, তাহা করিবার অধিকার সে রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে এবং রাজপিতৃব্য রাজার প্রতিনিধিরূপে যে বলিয়াছিলেন "ভবিষ্যতে আমরা কোন ব্যয় করিলে ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি লইয়াই করিব, যদি কর স্থাপন করি, সভার সম্মতি অনুসারেই করিব"—তাহার মধ্যেও "কিন্তু" ছিল। কারণ, ভারত সরকারের দায়িত্ব ভারতবাসীর কাছে নহে, পরন্তু বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে।

কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যাখ্যাই সদস্যরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। তাই তিনি ও যুক্তপ্রদেশের কর্ণেল সার হেনরী ষ্টানিয়ন আর এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমে সার হেনরী বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এসেম্বলীতে হয় ত অসহযোগীর দল আসিবেন। সে অবস্থায় ভারতের বড়লাট যদি এসেম্বলীর সিদ্ধান্ত পদে পদে পদদলিত করিতে না পারেন, তবেই সর্ব্বনাশ হইবে সরকারের কল অচল হইবে। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান ব্যাপারে ভারত সরকারের অর্থাৎ বড়লাটের কায যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা সার ভ্যালেনটাইন চীরলও স্বীকার করিয়াছেন। সার ভ্যালেনটাইন বলিয়াছেন, "ভারতের 'সওকারী' ক্ষুণ্ণ হয় নাই (অর্থাৎ সে জন্য নূতন কর স্থাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না) কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা-বিষয়ে বৃটিশ রাজনীতিকদিগের আন্তরিকতায় বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইল।"

ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদিগকে আক্রমণ করিয়াও যখন সার ম্যালকম বুঝেন, তাঁহার জয়াশা নাই, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আরও বিস্ময়কর। তিনি বলিয়াছিলেন—আবার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচনকাল সমাগত এ সময় সরকারের সহানুভূতি অবশ্যই এক পক্ষে থাকিবে. যাঁহারা শাসন-সংস্কার সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহারাই সরকারের সহানুভূতিভাজন হইবেন। এত দিন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিয়া আজ কি স্বীকার করিবেন, তাঁহাদের গত ৩ বৎসরের কায ব্যর্থ হইয়াছে? তাঁহারা কি বলিবেন, শাসন-সংস্কার অচল হইয়াছে—ভারতে শাসন-সংস্কার নাই—আছে কেবল আমলাতন্ত্র আর স্বৈরাচার? শাসন-সংস্কার সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বলিলে কি ভাল হইবে? আমার উপদেশ—যে দল সরকার ও ব্যবস্থাপক সভা নষ্ট করিবে—এমন কি ভারতবর্ষও নষ্ট করিবে—যাহাতে তাহাদের প্রাধান্য হয়, এমন আন্দোলনে সদস্যরা যেন যোগ না দেন।

এ দেশে একটা কথা আছে—"ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল; শল্য হ'ল রথী!" এও তাহাই। শেষে সার ম্যালকম হেলী—ভারত সরকারের হোম-মেম্বার বলিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা করিলেন।

তিনি যে সদস্যদিগকে সরকারের সহানুভূতির প্রলোভন দেখাইয়াছেন, তাহার স্বরূপ কি? সরকারের সহানুভূতিতে অবশ্য প্রতিপক্ষকে ভোট-যুদ্ধে পরাভূত করা যায় না। তবে কি বুঝিতে হইবে, সে সহানুভূতি অন্য কোন আকার ধারণ করিবে? এমন কথাও কি মনে করা যাইতে পারে যে, সরকারের মেম্বার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে দারোগা দফাদার পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে কোন কোন প্রার্থীকে সাহায্য করিবেন? যে কথার এমন অর্থ হইতে পারে, সে কথা যে হোম মেম্বার ব্যবস্থাপক সভায় বলিতে পারেন, তিনি কি পদোচিত গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, বলা যায়?

সার ম্যালকম বলিয়াছেন, শাসন-সংস্কার সফল হয় নাই এবং ভারতে আমলাতন্ত্র ও স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছুই নাই, এমন কথা স্বীকার করিও না—প্রতিপক্ষ হাসিবে। **Tell it not in Gath; publish it not in the streets of Askelon.** কিন্তু সদস্যরা সত্য গোপন করেন নাই। শেষ দিন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছেন—ব্যবস্থাপক সভায় ৩ বৎসর কায করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঠিক কায করিয়াছিলেন।

ভারতে স্বৈরাচার নাই? যদি তাহাই হয়, তবে কোন্ অধিকারে বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ অমান্য করিয়া স্বেচ্ছায় লবণের শুল্ক দ্বিগুণ করিলেন?

অসহযোগীরা বর্ত্তমান ব্যুরোক্রেশীর উচ্ছেদকামী হইতে পারেন; বর্ত্তমান অক্ষম ব্যবস্থাপক সভার ধ্বংস চাহিতে পারেন; কিন্তু ভারতবর্ষ নষ্ট করা কথাটার অর্থ কি? তাঁহারা কি ডায়ার-ওডয়ার অপেক্ষাও ভয়ানক?—টমসন-হেলী যদি ভারতবর্ষ ধ্বংস করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে অসহযোগীরা তাহা পারিবেন কি? টমসন-হেলী ভারতে ইংরাজের সুনাম যেরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই পারে নাই।

ব্যবস্থাপক সভার বহুমত বড়লাটের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল।

এই ব্যাপার লইয়া বিলাতের 'টাইমস্' পত্র ভারতবাসীকে স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন—

(১) বড়লাটের বিশেষ অধিকার রাখিতেই হইবে।

(২) এখন আর শাসন-সংস্কারের কথা বলা যাইতে পারে না।

'টাইমস্' সোৎসাহে হোম-মেম্বার সার ম্যালকম হেলীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—ভারতে আজ যদি স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করা হয়, তবে সর্ব্বনাশ হইবে—ভারতে আর শান্তি শৃঙ্খলা থাকিবে না। যেন স্বায়ত্ত-শাসন ও শৃঙ্খলা ভারতে একত্র বিরাজ করিতে পারে না। এ কথা সার ম্যালকম বা 'টাইমস্' কোথা হইতে জানিলেন এবং তাঁহাদের সংবাদ গোয়েন্দা পুলিসের দপ্তর হইতে সংগৃহীত কি না, বলিতে পারি না। তবে ইহার মধ্যে ইংরাজের সে কালের সেই দাম্ভিক ভাবটা ফুটিয়া উঠিতেছে—ভারতবাসী নাবালক ও নালায়েক, ইংরাজ তাহাকে রক্ষা না করিলে তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

তাহার পর প্রবন্ধের উপসংহারে 'টাইমস্' বলিয়াছেন—

"আজ মনে হইতেছে বটে ভারতবর্ষ শান্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—দূরে অশান্তির গুঞ্জন শ্রুত হইতেছে। পঞ্জাবের অবস্থা, হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অশান্তি, চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার সমর্থকদিগের আন্দোলন প্রভৃতিতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবর্ষে এখনও বৃটিশের দৃঢ় শাসন প্রয়োজন এবং এখন আরও শাসনসংস্কারের কথা বলিবার সময় হয় নাই।"

সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা শীঘ্রই আর এক কিস্তি শাসন-সংস্কার পাইবার আশা করিতে পারেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এখনও শাসন-সংস্কারের কথা মুখে আনিবার সময় হয় নাই।

'টাইমস্' যে দৃঢ় শাসনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার স্বরূপ আমরা কেনিয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের ব্যবস্থায় বুঝিয়াছি। সে নিদ্ধারণের বিষের জালায় মডারেটরাও কিরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহা বোম্বাইয়ের ভারতীয় সওদাগর সভার সভাপতি সার ফজলভাইএর তারে জানা যায়। তিনি সভার পক্ষ হইতে বড়লাটকে জানাইয়াছেন:—

"১৯২১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যমধ্যে ভারতবাসীকে যে তুল্যাধিকার প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহার পর (বৃটিশ সরকারের) সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত ও অন্যায়। ইহাতে বুঝা যায়, বৃটিশ-সাম্রাজ্য শ্বেতাঙ্গদিগেরই সাম্রাজ্য। অতঃপর এই সাম্রাজ্যের সহিত আপনাকে একীভূত করিতে অস্বীকার করা ব্যতীত ভারতের আর কোন উপায় থাকিবে না।"

কোন চরমপন্থী কি ইহার অতিরিক্ত কোন কথা কোন দিন বলিয়াছেন?

রামভজদত্ত চৌধুরী

পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও কংগ্রেসকর্ম্মী পণ্ডিত রামভজদত্ত চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। চৌধুরী মহাশয় বহুদিন হইতে কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন এবং আর্য্যসমাজ-সম্প্রদায়ে তাঁহার খ্যাতিও ছিল।

তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও তাহাই করিবার সাহস তাঁহার ছিল। ওডয়ারী শাসনে যখন পঞ্জাবে অসাধারণ অনাচার অনুষ্ঠিত হয় এবং ওডয়ারের কথায়—কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই লর্ড চেমসফোর্ড—পঞ্জাবে সামরিক আইন প্রবর্ত্তনের অনুমতি দেন, তখন শাসক-সম্প্রদায়ের রোষ রামভজদত্ত বুক পাতিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সে সময় তিনি কারাবরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সস্ত্রীক পণ্ডিত রামভজদত্ত চৌধুরী।

বাঙ্গালাদেশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিতা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা বিদুষী শ্রীমতী সরলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেশপ্রেমই বোধ হয় ইঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই সরলা দেবী বঙ্গদেশে বীরাষ্টমী-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং মাল্লাজা প্রভৃতির সাহায্যে বাঙ্গালীকে লাঠি ও তরবারখেলায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর শ্রীমতী সরলা দেবী পঞ্জাবে গমন করেন এবং তথায় দেশের কাযে স্বামীর সহযোগী হয়েন।

বোধ হয়, পঞ্জাবে অনাচারের বিবরণ তাঁহার পত্রেই অবগত হইয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রদত্ত উপাধি বর্জ্জন করিয়া তাঁহার লাঞ্ছিত স্বদেশীয়দিগের সহিত একাসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রামভজদত্ত মহাত্মা গন্ধীপ্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ-নীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পঞ্জাবে রাজনীতিক জীবনে তাঁহার কৃত কার্য্য উপেক্ষণীয় নহে।

কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল।

শ্রীমতী সরলা দেবীর এই দারুণ শোকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

রাষ্ট্রপতি হার্ডিং

মার্কিণের রাষ্ট্রপতি হার্ডিং কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পর রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের স্থানে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি কালিডোনিয়ায় বিদ্যারম্ভ করিয়া ওহিয়ো সেনট্রাল কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পঠদ্দশায় কখন বা কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের কায করিয়া, কখন বা গোলায় রং লাগাইয়া অর্থার্জ্জন করিতেন। ১৯ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে শিক্ষকের কায করেন। পরে আইন পাঠ করিয়া তিনি সংবাদপত্রসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কম্পোজিটারের কায হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পাদক হইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি হার্ডিং।

২৫ বৎসর বয়সে তিনি রাজনীতিচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং একবার ওহিয়োর লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরের পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনেটে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় মত দেন।

আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট লর্ড কুলিজ।

তিনি রাষ্ট্রপতি উইলসনের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। রাষ্ট্রপতি হইয়া তিনি ব্যয়সঙ্কোচে মনোযোগ দেন। তিনি কৃষিবিষয়ে বিশেষ উৎসাহশীল ছিলেন। রাষ্ট্রপতি হার্ডিং জাতিসঙ্ঘে যোগদানের বিরোধী ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে কলভিন কুলিজ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলেন।

কারাগারে বিজয়লাল

শ্রীমান্ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় গত ১১ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন সিংহের বিচারে রাজদ্রোহের অভিযোগে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বিজয়লাল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকরূপে কুষ্টিয়ায় যাইয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহার জন্য ১৬ই মে তারিখে তিনি কৃষ্ণনগরে তাঁহার পিতৃভবনে গ্রেপ্তার হয়েন। তাহার পর আদালতের বিচারে তাঁহার প্রতি ঐ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরাধীন দেশে রাজদ্বারের দণ্ডে সকল সময় মানুষের দোষগুণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজয়লালের সম্বন্ধে সে কথা যে কতক পরিমাণে সত্য, ইহা সুনিশ্চিত। বিংশতিবর্ষীয় যুবক বিজয় স্কুলে-কলেজে, কংগ্রেসের জন্য স্থানীয় কার্য্যক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলত্র পাওয়া যায় না। ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েটে বৃত্তিলাভ করিয়া বিজয়লাল ইতিহাস ও ইংরাজীতে অনার সহ বি, এ, পড়িতেছিলেন, টেষ্ট পরীক্ষাতেও তিনি কলেজে সহযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তাহার পরই তিনি অসহযোগ অবলম্বন করিয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিজয় অক্লান্তকর্ম্মী ও একনিষ্ঠ দেশসেবক ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম সম্বন্ধে এইটুক

কারাগারে বিজয়লাল।

বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি জামীনে মুক্তি লইতে সম্মত হয়েন নাই। বিজয়-লালের পিতা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় সরকারী চাকুরীয়া। সেই জন্য লোক অনুরূপ চেষ্টা-যত্নেরও আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে সব কিছু হয় নাই বা হইতে পায় নাই। বিজয়লাল তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবীর নিকট হইতে অকপটতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি উচ্চ ভাবগুলি পাইয়াছেন। বিজয়ের গ্রেপ্তারের দিন এই বীর-জননীর বিদায়বাণী বাঙ্গালী সমাজে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিবার উপযুক্ত—"চল, মায়ের সুযোগ্য সন্তান, তোমাকে নিজ হাতে বীরের সাজ পরিয়ে মুক্তির সংগ্রামে পাঠিয়ে দিই; মায়ের শৃঙ্খল মোচন করিয়া নিজেকে ধন্য কর, আমিও তোমার জননী ব'লে ধন্য হই।"

বিজয়লাল বিচারালয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে যে বর্ণনাপত্র প্রদান করেন, তাহাও বাঙ্গালার অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইতিহাস ও রাজনীতিতে যে গভীর জ্ঞান, যে সাহস ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় উহাতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। আমরা নিম্নে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"গবর্মেণ্ট কি এ কথা জানেন না যে, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বা কোনও মণ্ডলীবিশেষের একটা ভাবকে মাত্র অবলম্বন করিয়াই এ পর্য্যন্ত কোনও বিশাল আন্দোলনের সৃষ্টি হয় নাই? * * কেবলমাত্র নিছক ভাবের উপরে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন বিরাট আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ভাবের পিছনে থাকে ভাতের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠের সমবেত হাহাকার। * * যুগে যুগে নগ্ন, ক্ষুধিত ব্যক্তি প্রবলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া যেমন মুক্তির জন্য ছটফট করিয়াছে—ভারতবর্ষও আজ তেমনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করিতেছে। ইহার মধ্যে যাঁহারা কোনও ব্যক্তিবিশেষের উষ্ণ মস্তিষ্কপ্রসূত থিওরীর বা ভাবের খেলা দেখিয়াছেন, অথবা ভাবী অরাজকতার আভাস পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে, বিচারককে এই কথা বলিয়া রাখি, অনর্থক কোনও বিদ্বেষ বা ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা এই আন্দোলনে যোগদান করি নাই—কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের হিংসা করা অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে; ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের কর্ম্ম, ভারতের শিল্প, ভারতের সাহিত্য, ভারতের সাধনা—এক কথায় ভারতের সভ্যতা যাহাতে বহিঃশক্তির নির্ম্মম চাপে বিনষ্ট না হইয়া স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। * * আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, দেশের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর যদি অচিরে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়---তবে এই প্রাচীন জাতির মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। * * আমি বক্তৃতায় বলিয়াছি,—আমরা বৎসর বৎসর যে ট্যাক্স দিই, গবর্মেণ্ট তাহার অধিকাংশ ব্যয় করেন-- গোলাগুলী ও বন্দুকের জন্য। গবর্মেণ্ট কি সমগ্র দেশবাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সামরিক ও পুলিস বিভাগের জন্য অধিকাংশ টাকা ব্যয় করেন না? * * জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলার মুখোস পরিয়া 'ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা' কি বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করিতেছে, টলষ্টয় আমাদিগকে সে কথা বুঝাইয়াছেন। * * আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি; ইহার জন্য ভাগ্যে দুঃখ, যাতনা, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন, যাহা কিছু আসে, তাহাকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমি এই কণ্টকময় পথে যাত্রা করিয়াছি।"

অম্বিকাচরণ উকীল

হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলী প্রভৃতি বহু সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গদেশে সুপরিচিত অম্বিকাচরণ উকীল মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার এক জন কর্ম্মীর তিরোভাব হইল।

অভিভাষণ

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনারায়ণ আজ আমাদিগের এই সারস্বত-যজ্ঞে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া বেদী ও মণ্ডপ রক্ষা করুন। যেন এই যজ্ঞ উৎপাত-রহিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, এই যজ্ঞ যাহাতে শুভপ্রদ, শান্তিপ্রদ, জ্ঞানপ্রদ হয়, হে মঙ্গলময় হরি তুমি তাহাই কর! বিদ্যার আলোচনা যাহাতে আমাদের লোচন-পথে গোলোকের আলোক উদ্ভাসিত করিয়া অবিদ্যা-রূপ অন্ধতা নষ্ট করে হে গোলোক-বিহারি তুমি তাহাই কর!

শুভ্রশতদলবাসিনী সুহাসিনী সুভাষিণী বাগ্‌বাদিনী দেবী সরস্বতি, তোমার অভয়প্রদ চরণকমলে আমি বার বার প্রণাম করি। মা, তুমি আজ এইখানে আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হও। মা, শুনিয়াছি—তুমি মূককে বাচাল কর—কিন্তু রসনায় আসীনা হইয়া নীলনয়নে একটু খরদৃষ্টি রাখিও,মা, যেন আমি অধিক বাচাল বা বেচাল না হইয়া যাই। যেন মা, আমার স্মরণ থাকে, আমি কামারবাড়ীতে সূচ বেচিতে আসিয়াছি, যেন মা, ভুলিয়া না যাই যে, আমি শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, শিক্ষা দিতে আসি নাই; যেন মা, মনে থাকে আজ এখানে আমার আহ্বান শুভ-শঙ্খবাদনের জন্য, একটিমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষণ-স্থায়ী ফুৎকারে মঙ্গলকার্য্যের সূচনামাত্র করাই আমার অধিকার;—বেণু বীণা সারঙ্গ সেতার মৃদঙ্গ মন্দিরা বাদনক্ষম কলাবিদ্‌গণ এখানে অনেকেই উপস্থিত—পরস্পরকে প্রফুল্ল প্রমোদিত ও পরিতৃপ্ত করিবেন তাঁহারাই।

পঞ্চোত্তরপঞ্চাশৎ বৎসর গৃহাশ্রমে ব্রতধারী হইয়া নিত্যসাধনার অভিজ্ঞতায় এই উপলব্ধি লাভ করিয়াছি যে, দাস্যভাবে সাধনার জন্য দুইটিমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় আছে—এক শাস্ত্রোক্তমতে হনুমানের ভাবে নিমগ্ন হইয়া সাধনা, আর এক প্রাজাপত্যভাবে পতিরূপে সাধনা। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমার মর্কটবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইয়া হনুত্বলাভে সমর্থ হয় নাই সুতরাং "তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ" মন্ত্রসাধনে জীবনে কি সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা বুঝি নাই কিন্তু পতিত্বের সাধনায় বুঝিয়াছি যে, কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণনাম—"তথাপি মম সর্ব্বস্বং গৃহিণী রক্তলোচনা।"

আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে এই সাহিত্য-শাখার সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন তাহাতে আমি এই সভার দাসত্বের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। একমুঠা মোটা চাউলের ভাত একখানা মোটা কাপড় সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিব; তাহা গ্রহণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন অভিমান অশ্রুবিসর্জ্জন নিত্যকর্ম্ম যাহা করিতে হয় করিবেন, কিন্তু সভাসুন্দরী যদি অলঙ্কারের প্রত্যাশা করেন তবে এখন হইতেই পত্যন্তর গ্রহণ করুন, আমি নিষ্কৃতি পাই! সাহিত্যের সাতনর কাব্যের কণ্ঠমালা পদ্যের পদক বিজ্ঞানের ব্রেস্‌লেট্ উপন্যাসের উপলোজ্জ্বল বাজুবন্ধ নাটকের নেক্‌লেস্ এমন কি মতামতের মাকড়ীটি পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা আমার নাই; চাটুবাদের চন্দ্রহার পরাইলেও পরাইতে পারিতাম কেন না ধারে মেলে কিন্তু ও অলঙ্কারখানি বোধ হয় বর্ত্তমানযুগে অশ্লীল।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য প্রায়ই ভক্তিরসাশ্রিত ও পদাবলীতে লিখিত, সেগুলি আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি; যাঁহাদের বাটীতে নিত্যসেবা আছে তাঁহারা উহা কিছু কিছু প্রত্যহ ব্যবহার করেন, আমরা সাধারণ লোক উহা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজাদি দেবকার্য্যোপলক্ষে ব্যবহার করি মাত্র। এ দেশে এমন এক দিন ছিল যখন লোক দেবতাকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিতেন না ভোজ্যও নয় পরিধেয়ও নয় পাঠ্যগ্রন্থও নয়। উপাস্যের পূজা যে উঠিয়া গিয়াছে, এমন কথা আমি বলি না, তবে দেবতার নামপরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে; সেকালের গ্রন্থকার গণেশবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, গুরুবন্দনা লিখিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেন, এখনকার বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক লেখকগণ কেহ কেহ রাজস্তোত্র, পরিদর্শক স্তোত্র লিখিয়া নিজের ও শিশু-ছাত্রদিগের ইহপরকালের পথ পরিষ্কার করেন, আর কাব্যাদির লেখকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের রসসিক্ত পত্রাবলী উৎসর্গ করেন কোনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারীর নামে, অথবা উপাস্য দেবী "আমার মর্ম্মের মর্ম্ম সেই"—নামে!

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে কয়খানি গ্রন্থ গদ্যে লিখিত হইয়াছিল, সে গদ্য জামাইঠকান খাদ্য। পূর্ব্বে পল্লীবাসী ললনাগণ যেমন নবাগত জামাতার সঙ্গে রসিকতা করিবার অভিপ্রায়ে কচুর কেশুর বাঁশের আঁখ কলার এঁটের ডাব পিটুলির চন্দ্রপুলি ডালবাটার ক্ষীরের ছাঁচ খয়েরের কালজাম প্রভৃতি সুদর্শন খাদ্য সকল শিল্প-কৌশলের অপূর্ব্ব চাতুরী দেখাইয়া অতি যত্নে অতি পরিশ্রমে প্রস্তুত করিতেন অথচ গলাধঃকরণ করা দূরে থাক্ খাদ্য রসনাস্পর্শ করিবামাত্র জামাইবাবু "তিড়িং-লাফ্" মারিয়া উঠিয়া পড়িতেন ও সময়ে সময়ে "গালফুলা গোবিন্দের মা" হইয়া যাইতেন ; সেইরূপ গদ্যলেখকগণও বড় পরিশ্রমে বড় যত্নে সংস্কৃত অভিধান ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া চোয়ালচূর্ণক্ষম উৎকট শব্দ সকল বাহির করিয়া তাহাতে মাঝেমাঝে পারসীর রঙ্গ-ছিটা লাগাইয়া মহাশব্দাঢ়ম্বর মালা গাঁথিতেন।

আজিকার এই শিষ্যগোষ্ঠীতে উপস্থিত হইয়া আমরা এক বিশাল তরুবরের ফল ফুল-পত্র শোভিত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসাদি বিবিধ শাখার পত্রচ্ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়াছি ; যে শাখায় বসিয়া আমি এক্ষণে কলরব করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহার নাম "সাহিত্য-শাখা"। ক্ষুদ্রতম বিহঙ্গম আমি একটি-মাত্র পত্রান্তরালে আমাতকপমাণ কুলায়মধ্যে অনায়াসে আমার স্থানসঙ্কুলান হয়, কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার শক্তি আমার কোথায়? কিন্তু আপনারা পণ্ডিতমণ্ডলী দেখিতেছেন যে, যে মহান্ বৃক্ষ হইতে এই সকল শাখা উদ্গত হইয়াছে তাহার নাম "জ্ঞান-বৃক্ষ"। জ্ঞানবৃক্ষের মূলোত্থিত রসসঞ্চার ভিন্ন কোনও শাখাই ফলপ্রদ হইতে পারে না, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবজন্মলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য— ঐ বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা দ্বারা ভগবদ্জ্ঞানলাভে জীবাত্মাকে জাগরিত করা। নবজাত শিশু জন্মমাত্র ক্ষুধার উদ্রেকে একটিমাত্র স্তনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, পরে বাড়িতে বাড়িতে সে বোঝে যে তাহার এক জন মা আছেন, ঐ স্তন তাঁহার অবয়বের একটি মঙ্গলপ্রদ অংশমাত্র ; আর একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন হাঁটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, তখন সে গৃহের কোনও স্থান হইতে একটা মিষ্টান্ন বাহির করিয়া বলে, "আমি কেমন একটা সন্দেশ পেয়েছি" ; আবার কোন স্থান হইতে একটা কাজললতা বাহির করিয়া বলে, "আমি কেমন একটা জিনিষ পেয়েছি" ; আবার কোনও স্থান হইতে একটা খেল্‌না বাহির করিয়া বলে, "আমি কেমন একটা পুতুল পেয়েছি।" কিন্তু বুদ্ধির একটু বৃদ্ধির সহিতই শিশু বুঝিতে পারে যে, খেল্‌না সন্দেশ কাজললতা তাহার মা'র, মা তাহার জন্য বা অন্য ভাইবোনদের জন্য রাখিয়াছেন, সে হাতে করিয়া তুলিয়া আনিয়াছে মাত্র। এইরূপে সে যখন আধ-আধ স্বরে "মা বাবা দাদা কাকা-—বটি বাটি কাপড় জামা—চাঁদ তারা বাতাস জল" প্রভৃতি কথা বলে, তখন না বুঝিলেও পরে বোঝে — সে তাহার মায়ের কাছে শুনিয়া বা বাপের কাছে শুনিয়া ঐ সকল কথা শিখিয়াছে। মানবও সেইরূপ সাহিত্যের আলাপে ইতিহাসের চর্চ্চায় দর্শনের আলোচনায় শিশুর ন্যায় মনে মনে স্পর্দ্ধা করে যে, আমি কত বিদ্বান্ হইয়াছি ; কিন্তু সাধনার সাহায্যে ভগবৎকৃপায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে সে বুঝিতে পারে যে, সেই অনন্তময়ের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের এক অণুবীক্ষণিক অংশমাত্র তাহার আয়ত্ত। নিউটন্ যে বলিয়াছিলেন, তিনি অসীম সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্ষুদ্র কয়েকটি শিলাখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বিনয়ের বশে নহে—জ্ঞানদৃষ্টিতে সৃষ্টিচাতুর্য্যের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াই তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। জড়-বিজ্ঞানে যাঁহারা মহামহোপাধ্যায়, তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায় স্ব স্ব উদ্ভাবনী বা আবিষ্ক্রিয়াশক্তির বিকাশে তাঁহারা অহঙ্কৃত হয়েন না, বরং প্রকৃতি দেবীর অলোকসামান্য শক্তির সমক্ষে নিজ নিজ মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া দেন। আমাদের দেশে বসুকুলোদ্ভব আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন ; পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহিত আলাপেও ঈশ্বরশক্তির অসীম মহত্ত্বের সম্মুখে বিজ্ঞানবিদ্‌কে মস্তক নত করিতে আমি বার বার দেখিয়াছি। কবি যদি সত্য কথা কহেন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে মহান্ ভাব ও সুললিত পদাবলী তাঁহার রসনা হইতে কেমন করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন না "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ"—কালিদাসের বিনয় নহে, কবি রাজ-রাজেশ্বরের সৃষ্টিরূপ মিষ্ট মহাকাব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি আপনাকে বামন বুঝিয়াছিলেন।

সেই ঈশজ্ঞানরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথম আমাদিগকে আত্মশুদ্ধি শিক্ষা করিতে হইবে—'অহং'কে বিসর্জ্জন দিয়া রিপু ও প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিয়া ; দ্বেষ-হিংসা লোভ

ক্রোধ মাৎসর্য্য অহঙ্কার দুর্ব্বলদলনে আত্মপ্রাধান্য-লাভের কামনা যাঁহাকে চাবুক মারিয়া ডাহিনে বামে ফিরাইতেছে, কুসুমকানন বিদলিত করিয়া কণ্টকারণ্যে ছুটাইতেছে— পথিপার্শ্বস্থ প্রণালীতে নিপাতিত করিতেছে, তিনি কেমন করিয়া আপনাকে জ্ঞানবান্ বলিয়া পরিচয় দেন? তিনি শব্দসারসংগ্রহপূর্ণ জীবন্ত অভিধান হইতে পারেন, তার্কিক-রূপে দম দেওয়া কলের পুতুল হইতে পারেন, ভৌতিক দ্রব্য সংযোগে অজ্ঞানকে বিজ্ঞানের চমক দেখাইয়া বাজীকর হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনই জ্ঞানবান্ নহেন। আর অর্থোপার্জ্জনকেই যাহারা বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া "ক খ" না শিখিয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা শেয়ারের বাজারে যাতায়াত করিলেও হয় ত অধিক-তর ফললাভ করিতে পারেন।

কলের দৌরাত্ম্যে আমাদের মধ্যে অনেক লৌকিক হিসাবে ভগবদ্বিশ্বাসী লোকও ভগবদ্ভক্তি ভগবদ্জ্ঞান আলাদা করিয়া রাখিয়া সামাজিক রাজনীতিক শৈল্পিক বা সাহিত্যিক কার্য্য পরিচালনা করিতে চেষ্টা করেন বলিয়াই আমার উক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন সূর্য্যকে বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে রৌদ্রের সম্যক্ ধারণা হয় না, সেইরূপ ঈশজ্ঞানকে সরাইয়া রাখিলে কোনও বস্তুকেই প্রকৃত জ্ঞান নামে অভিহিত করা যায় না। ঈশ্বরোপাসনা কেবল ধ্যানে পূজায় স্তোত্রপাঠে বা তপস্যায়ই যে হয়, তাহা নহে, জাতির কল্যাণসাধন জীবের দুঃখবিমোচন সংসারে আনন্দদান সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে পবিত্র ও মধুময় করাই ঈশ্বরের কার্য্য; যিনি ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু এবং আপনাকে তাঁহার দাস মনে করিয়া—জগদীশ্বর যন্ত্রী, মানব যন্ত্রমাত্র—এই মনে করিয়া অনাসক্তভাবে কার্য্য করিতে পারেন তিনি যে কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুন না কেন সেই কার্য্য দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা করেন। ঋষি তপস্যায় যোগী ধ্যানে ঋত্বিক্ যজ্ঞে অধ্যাপক জ্ঞানদানে কৃষক হলচালনে গোপ গোপালনে ঈশ্বরেরই উপাসনা করে; ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছি মনে রাখিয়া সাহিত্যব্রতে ব্রতী হইলে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় না।

বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন **সাহিত্য**। মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালার ভাণ্ডারে এখন যে সকল পুস্তক মজুত আছে, তাহার ভুল-ভ্রান্তি দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে ও শুদ্ধ সমালোচকের সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া অবশিষ্ট ও পরিষ্কৃত যাহা থাকে তাহাকেও একটা সাহিত্য বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি।

ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বিদ্বজ্জনরা যে তাঁহাদের মাতৃভাষাকে কি উদ্দীপনা শক্তিতে কি পদ-লালিত্যে কি অর্থবোধে কি শ্রুতিমাধুর্য্যে কি ভাব-সম্ভারে কি অলঙ্কারের সুষমায় অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছেন এ কথা বলিলে অপর প্রদেশবাসিগণের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, যে নারীর হৃদয় মাতৃভাবে পরিপূর্ণ তিনি আপনার ছেলে পরের ছেলে বিচার করেন না, সকলের প্রতি তাঁহার সমান মাতৃভাব। সেইরূপ ভাষা-জননীও আপন স্তন্য কেবলমাত্র নিজ গর্ভজাত সন্তানকে পান করাইয়াই সার্থকতা অনুভব করেন না, পিপাসী শিক্ষার্থীকেই সেই সুধা বণ্টন করিয়া দিতে সদা প্রস্তুত রহেন সতত লালায়িতা। আমার বিশ্বাস এই বঙ্গভাষাই অদূরভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে শিষ্টভাষা হইবে; ইহারই মধ্যেই অনেক বাঙ্গালা পুস্তক হিন্দী মারহাট্টী গুজরাটী তেলেগু তামিল উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় সাহিত্যও আছে সাহিত্যিকও আছেন; নাই কেবল সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে সাহিত্য! পরস্পরের মধ্যে সেই সাহিত্যের অভাব এতদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে যে, সাহিত্য শব্দের মিলনার্থ আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে—সেই জন্যই আজ এই সাহিত্য-সম্মিলনে (?) সুধী-জনকে "আহ্বান ক'রে ডেকে (?)" আনতে হয়েছে। লোক-সমাজের মত সাহিত্যসমাজেও বর্ণভেদ এক প্রকার সহজ অবস্থা, কর্ম্মগুণে গুণী মানব সহজেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইয়া পড়ে, কিন্তু যেমন আমাদের সমাজপতির অভাবে এক্ষণে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিকৃত হইতেছে, আপনার ইচ্ছায় কেহ বা পৈতা ত্যাগ করিতেছে কেহ বা পৈতা গ্রহণ করিতেছে, সেইরূপ সাহিত্য-সমাজেও সমাজপতির অভাবে সাহিত্যিকের মধ্যে বর্ণ বিচার করিয়া থাক বাঁধিয়া দিবার লোকের অভাব, সেই জন্য আমার মত সংস্কারহীন সাহিত্যিকও আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত, আর যে রাজ্যে রাজরাজেশ্বরীপ্রণীত পুস্তকও কাঞ্চনমূল্যে বিক্রীত হয়, সে রাজ্যেও মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রভৃতির দেশেও যে কালে সাহিত্যিকমাত্রেই বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন

করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু যেমন যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রোচ্চারণে হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দক্ষিণা-প্রাপ্তিতে সন্তোষলাভ করেন, তাঁহার অর্থ-গ্রহণকে বৈশ্যবৃত্তি বলা যায় না—আর যে 'বিপ্রবংশসম্ভূত বামুন ঠাকুর' "আব্রহ্ম-ভুবনে লোকা প্রণিপত্য প্রচোদয়েৎ" "সপ্ত পাতক সংহন্ত্রী সপ্তজন্ম বিনাশিনী" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়াই চাল কলা কাপড় পয়সার পুঁটুলি বাঁধিয়া রুক্ষমুখে যজমানের গৃহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার কার্য্যকেও ব্রাহ্মণবৃত্তি বলা যায় না, সেইরূপ গ্রন্থকারের মধ্যে অনেকেই পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিলেও নিজের প্রতিভাগত ব্রাহ্মণত্ব অটুট রাখিয়াছেন; আবার রক্তবীজের ন্যায় এক ঝাড় গ্রন্থকার বাড়িয়া উঠিতেছে —যাহারা মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি যদৃচ্ছা মন্ত্রোচ্চারণে দক্ষিণাদানেই প্রভূত পুণ্যসঞ্চয়, এই নিগূঢ় তত্ত্ব পাঠক-পাঠিকাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। সারস্বত ব্যভিচারের এই মহাপাতকে আমিও হয় ত' অজানিতভাবে লিপ্ত আছি যদি থাকি, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

যাঁহার কুঞ্জদ্বারের পরিক্রম-সীমামধ্যে আজ এই সারস্বত উৎসব সম্পাদিত হইতেছে, সেই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে সমাজপতি-পদে সার্ব্বলৌকিকমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এই পদে আরোহণ করা বঙ্কিমবাবুর পক্ষে অসাধারণ গৌরবের বিষয়, কারণ তিনি যখন প্রথম গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকের নিকট তিনি নিজেই পাংক্তেয় বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই। মধুসূদনও পরলোকগমনের পূর্ব্বে দুই একটা চড়ুইভাতি বা প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত হইতেন মাত্র, বিবাহের বৌভাতে বা আদ্যশ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজনে পাত পাতিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। বৈদেশিক সমাজ হইতে প্রাপ্ত কৌলীন্যের পুষ্পমালা কণ্ঠে দোলাইয়াও রবিবাবু সর্ব্বসম্মতিক্রমে এখনও সাহিত্য-সমাজপতি নহেন। এই জনতন্ত্র যুগে স্বরাজের এই আখ্‌ড়াই বাজনা'র দিন এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান;- কেহ বা সাহিত্য সুলতান কেহ বা কাব্য-কৈসার কেহ বা বিজ্ঞান-বাহাদুর কেহ বা কবি-বিরূপাক্ষ, কেহ বা নাট্য-নেপোলিয়ন্!

ইংরাজদের আর কিছু থাক্ না থাক্, বহুদিনের অভ্যাস-যোগে একটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালী গঠন করিবার শক্তিটা লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের গ্রন্থকার-সমিতি আছে পাঠক-সমিতিও আছে; অভিনেতৃ-সমিতি আছে অভিনয়-দর্শক-সমিতিও আছে; তাঁহাদের "আমি" শব্দটি বৃহদক্ষরে লিখিবার প্রথা থাকিলেও কোনও কার্য্য-বিশেষের উদ্দেশে দশটা "আমি"র তেরিজ কষিয়া টোটালে একটা বড় "আমি" গড়িতে পারেন। একখানি রথ টানিবার সময় সকলে একটা কাছিতে হাত লাগাইয়া আপন আপন বলানুসারে একদিকেই টান দিতে পারেন। আমাদের কিন্তু ঐখানেই গোল; পরাধীন জাতি আমরা, শক্তিসঞ্চালনের ক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র অতি সঙ্কীর্ণ; সুতরাং যোগেযাগে যদি একখানা রথ টানিবার সুযোগ পাই ত' অমনই সেই রথের গায়ে ইচ্ছামত কাছি বাঁধিয়া যে যাহার কেরামতি দেখাইতে উদ্যোগী হই। রাম যদি দক্ষিণদিকে টানিতে যায়, শ্যাম অমনই মারেন হ্যাচ্‌কা পূর্ব্বদিকে—নেপাল টানেন পশ্চিমে ও গোপাল টানেন উত্তরে,—তাহাতে রথ উল্টাইয়াই পড়ুক আর নারায়ণ মাটীতে গড়াগড়িই যান, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, কে কেমন 'হেঁইয়োটান্' মারিয়াছি শ্যামকে কেমন জব্দ করিয়াছি গোপাল কেমন হারিয়া গিয়াছে—এই বাহাদুরী লইয়া তালপাতের ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে বাড়ী ফিরি। পূর্ব্বে যে এক কর্ত্তা ও এক গৃহিণীর কর্ত্তৃত্বে বড় বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হইতে পারিত, তাহার মূল কারণ ছিল 'কর্ত্তাগিন্নী'র রাজমর্য্যাদাপ্রদীপ্ত মহৎ মন ভাই বোন্ ছেলেমেয়ে নাতিনাত্‌নী বড়বৌ মেজবৌ ছোটবৌ এমন কি ঝি-চাকরেরও ঠোনাটা ঠানাটা চিম্‌টীটা আস্‌টা সহ্য করিয়া সুশাসনকৌশলে সমগ্র সংসার শান্তিতে পরিচালিত করিতে পারিত। ছেলে মেয়ে বৌরাও তাঁহাদের আদর্শে ভবিষ্যতের কর্ত্তা গিন্নী গড়িয়া তুলিবার জন্য আপনা-দিগকে প্রস্তুত করিতে পারিত; এখনকার কর্ত্তাগিন্নীরা সে ধৈর্য্য সে সহগুণ হারাইয়াছেন, তাহার উপর খোকা-খুকীদেরও এখন আর 'তর' সয় না—দোলায় দুলিতে দুলিতেই মতামত প্রকাশ করিতে ও হুকুম চালাইতে বাছারা উদ্‌গ্রীব হয়েন; তাই এক্ষণে একান্নবর্ত্তী সংসার একপ্রকার রূপকথায় দাঁড়াইয়াছে। এক উদরে জন্মলাভ করিয়াও ভায়ে ভায়ে মনের মিল হয় না, তা' আবার একপাড়া একগ্রাম একদেশে জন্মিয়াছি বলিয়া পাতান ভাইয়ের প্রেমে মাতিব উঠিব!

কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আমাদিগকে করিতেই হইবে। আত্মাভিমানরূপ পাপপুরুষই মিলনপথে দস্যুরূপে

দাঁড়াইয়া বঙ্গের সাহিত্যপরিবারকে পরস্পরের নিকট অগ্রসর হইতে দিতেছে না; এই পরিবারের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবীণ তাঁহারাই অগ্রে স্নেহের হাস্যে অধর উৎফুল্ল করিয়া আদরের আলিঙ্গনের জন্য বাহু-বিস্তার করিয়া কনিষ্ঠদিগকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া আনুন, কাশ্মীরী শাল বিছাইয়া তাহাদিগকে বসাইয়া নিজে কুশাসন গ্রহণ করুন। কোনও শাস্ত্রেই অহঙ্কারীকে জ্ঞানী বলে না। এই বঙ্গদেশেই ভগবান্ অবতারস্বরূপ আসিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন—অমানীকে মান দিতে তৃণাদপি সুনীচ হইতে। সাহিত্য-সংসারে যাঁহারা প্রবীণ শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত তাঁহারা যাহা উইল করিবেন সেই সম্পত্তিই পরবর্ত্তী বংশ ভোগদখল করিবে; উইলে অহঙ্কারদান করিয়া যান, পরবর্ত্তী বংশও অহঙ্কারী হইবে; বিনয় দান করিয়া যান, পরবর্ত্তী বংশও বিনয়ী হইবে; উইলে প্রেমদান করিয়া যান, উত্তর পুরুষ প্রেমিক হইবে; বিদ্বেষদান করিয়া যান, একটা বিদ্বেষী সাহিত্যিকের ঝাড় বঙ্গদেশে বিদ্বেষের বড়মানুষী করিবে।

আজ আমাদের এই সম্মিলন ঘটিয়াছে এক পুণ্যতীর্থে। ঐ অতি সন্নিকটে পূতসলিলা ভাগীরথী, পশ্চিম পারে চুঁচুড়া —যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের আদিগুরুগণের অন্যতম দেবোপম ভূদেব মুখোপাধ্যায় শুদ্ধান্তঃকরণে আজীবন সরোজবাসিনী সরস্বতীর শুভ্রচরণপ্রান্তে সিতশতদলের অঞ্জলি প্রদান করিয়া গিয়াছেন; বঙ্গের আদি নাট্যকার তারাচাঁদ শিকদারের সমসাময়িক স্বর্গীয় হরচন্দ্র ঘোষ সেক্ষ্‌পীয়রের 'মার্চ্চেণ্ট্ অফ্ ভেনিস্' বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন; ঐ চুঁচুড়াতেই সহজ কবি গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিভার জ্যোতিঃতে নিজের কবি-যশঃ-প্রদীপ মলিন হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন; ঐ চুঁচুড়ার হুগলি কলেজই বাঙ্গালার অনেক কৃতী সন্তানের ধাত্রীমাতা, ঐ হুগলিতেই উইল্‌কিন্স "সাহেবের" অদ্ভুত অধ্যবসায়প্রসূত বাঙ্গালা অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হ্যাল্‌হেড্ "সাহেবের" ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। অদূরে শ্রীরামপুর—যেখানে মার্শম্যান্, কেরি প্রভৃতি মিশনারী মহাশয়গণের যত্নে বাঙ্গালার প্রথম ব্যবহারোপযোগী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সুপ্রকাশ ঐ শ্রীরামপুর হইতেই। মিশনারী মহাশয়দিগের উদ্যোগেই শ্রীরামপুর হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; যে কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ অদ্যাপি বাঙ্গালীগৃহে চরিত্রগঠনের প্রধান আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, যে রামায়ণ মহাভারত নিরক্ষর বঙ্গকে শিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই রামায়ণ মহাভারতও প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ঐ শ্রীরামপুর হইতেই।

তাহার পর ভাগীরথীর এই পূর্ব্বপার; বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবদ্বীপ ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার পার্শ্বে আমরা উপস্থিত হইয়াছি; শত শত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ শুদ্ধাত্মা সাধক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রবিৎ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজকবি ও পাঠকগণের অক্ষয় অমর স্মৃতির সহিত এই ভট্টপল্লীর নাম অতি মধুরভাবে জড়িত।

এই ভট্টপল্লী এখনও পণ্ডিতপ্রসবিনী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষের পুরাতন মৃত্তিকা খনন করিয়া অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক কঙ্কালে জীবন-সঞ্চার করিয়াছেন, তিনি যত্ন করিলে তাঁহার গৃহ-প্রাচীরসংলগ্ন ভট্টপল্লীর গৌরবের ইতিহাস তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে দান করিতে পারেন। এই পুণ্যপল্লীর পণ্ডিত কবি ও পাঠকগণের মহিমামাধুরীপূর্ণ পূত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহায্য করিতে পারেন—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ অনেক পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের উজ্জ্বল স্মৃতি এখনও নবীন। পণ্ডিত প্রমথনাথের স্বর্গীয় পিতা কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত কবি তারাচরণের সংস্কৃত কবিতারচনা সম্বন্ধে দৈবশক্তি ছিল; প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি সুললিত সংস্কৃতে মুখে মুখে পদরচনা করিতে পারিতেন, ইহা আমি 'চোখে' দেখিয়াছি। বোধ হয়, যে ঋতুবর্ণনাদি-সংবলিত সুললিত 'প্রতিমালা' বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ কথক মহাশয়রা এখনও আবৃত্তি করিয়া যশোপার্জ্জন করেন—তাহা ভট্টপল্লীরই কোন পণ্ডিতরচিত।

উত্তরে কিঞ্চিদ্দূরে হালিসহর; সাধকোত্তম রামপ্রসাদের লীলাভূমিকে লোক হালিসহর বলিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে কালীসহর; এক দিন ঐ পুণ্যতীর্থ হইতে যে কালীনামের পবিত্রগাথা প্রবাহিতা হইয়াছিল যুগযুগান্তরেও তাহা বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া রাখিবে। ঐ সহরেই ঈশ্বর গুপ্তভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া যৌবনে কবিতার মাধুর্য্যবৃষ্টি করিয়া বঙ্গের চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাহার পর কাঁঠালপাড়া। বঙ্গবাসীর পুণ্যতীর্থ বঙ্গভাষার পুণ্যতীর্থ বঙ্গসাহিত্যসেবীর পুণ্যতীর্থ কাঁঠালপাড়া। কে তিনি রসিক যিনি ভবিষ্যসূচনা করিয়া ঐ ক্ষুদ্র গ্রামখানির নাম রাখিয়াছিলেন কাঁঠালপাড়া? কাঁঠাল ভিন্ন অন্য কোনও তরু দেখি নাই যাহাতে এক গাছে একসঙ্গে এত অধিক বৃহৎ বৃহৎ রসাল ফল ফলে! আবার এক এক ফলের ভিতর কত কোয়া! সঞ্জীব গিয়াছেন, বঙ্কিম গিয়াছেন, পূর্ণও সে দিন গেলেন। কিন্তু ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা চিরদিন মধুময় থাকিবে রেল-ওয়ের রাক্ষস-উদর ও বংশধরগণের অনাদর কাঁঠালপাড়ার প্রিয়দর্শন কবিকুঞ্জকে হতশ্রী করিয়াছে, তথাপি এমন একটি কাঁঠাল সেখানে ফলিয়াছিল যাহার মোহিনী সুরভি মদির-মধুরতা ও প্রাণদায়িনী পোষণশক্তি আজীবন বঙ্গভাষাকে প্রফুল্ল প্রমোদিত ও প্রবৃদ্ধ করিয়া রাখিবে। বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের নাম যদি গোবদ্ধন হইত, তবে তিনি যেমন 'বিষ-বৃক্ষ' লিখিতে পারিতেন না তেমনই কাঁঠালপাড়ায় না জন্মিলে কাব্যাবতারকপে তাঁহার আবির্ভাবেরও বুঝি সম্পূর্ণ সার্থকতা হইত না। বাহিরে গোঁফদাড়ী হাকিমের ভ্রুকুটি-ভঙ্গকুঞ্চিত কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ আবরণ, বোটার আটা এক বার হাতে লাগিলে অনেক তেল খরচে তবে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইত, কিন্তু ভিতরে কোয়ায় কোয়ায় ভরা — সেই কোয়ায় কি সুগন্ধ! আম আনারস পেয়ারা রম্ভা প্রভৃতি অনেক ফল সুগন্ধ ছড়ায় বটে, কিন্তু কাঁঠাল সময়ে সময়ে মাটীর নীচে ফলিয়াও সৌরভের আহ্বানে রসগ্রাহীকে আকর্ষণ করে! তাহার পর রস কি ঘন কি স্বর্ণবর্ণ কি মধুর হইতেও মধুরতর! কাঁঠালের ভিতর পাতকুয়ীও আছে ভুতুড়ীও আছে, কিন্তু যে খাইতে জানে তাহার নিকট পাত-কুয়ী ভুতুড়ীও মিষ্ট! এমন অরুচির রুচি মিষ্ট বীচি কাঁঠাল ভিন্ন অন্য কোন ফলের আছে কি? বঙ্কিম-রসালের বীজ রসনাগ্রাহ্য আহার্য্য ত বটেই - তদুপরি সেই বীজ হইতে কত নবীন তরু উৎপন্ন হইয়া বঙ্গদেশকে রসাল ফলপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিতেছে। বঙ্কিম-প্রসূতি কাঁঠালপাড়া, অবনত মস্তকে ভক্তিভরে তোমার ধূলিতে আমি মস্তক লুণ্ঠিত করি, পুণ্যতীর্থ-দর্শনে ভক্তমনে যেমন ভগবানের উদ্দীপনা হয় তেমনই তোমার দর্শনে কাঁঠালপাড়া, এই প্রাচীন অসাড় প্রাণেও কল্পনার সাড়া পড়ে!

চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস নরোত্তম দাস কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদ সেন কেতকা দাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের কবিদেবতাগণ কাব্যভুবনের অমরলোকে অনেক দিন অবধি বসতি করিতেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন রমেশচন্দ্র দত্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি পূজনীয় পণ্ডিতগণ ইঁহাদের ও অন্যান্য বঙ্গীয় লেখকদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং সে সকল কথার পুনরুল্লেখ করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। বৃটিশ যুগে প্রথম সাহিত্যকর্ত্তাদের কথা আসিলেই প্রথমে মনে পড়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" "ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী"র মত বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে আজও পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাঁহার 'রসতরঙ্গিনী' ও 'বাসবদত্তা' কেন যে বর্ত্তমানকালে পাঠকদিগের কাছে ততটা আদর পায় না, তাহা বুঝিতে পারি না; আদিরস ইদানীং মদনকে বিদায় দিয়া প্রণয় নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, পেটে-পাড়ার পাট উঠাইয়া দিয়া সীমন্তে পাতা কাটিতেছে, মালতীমালা ভাসাইয়া দিয়া ক্যামেলিয়ায় কবরী আলোকিত করিতেছে, চুয়া-চন্দন কেশরের পরিবর্ত্তে রুস্ ভেজেলিন্ হেলিওট্রোপে অঙ্গরাগ করিতেছে, নলিনীপত্র শয়নে হাহুতাশ না করিয়া সোফায় হেলান দিয়া আলুলায়িত কেশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে বলিয়াই 'বাসবদত্তাদি' কাব্য এখনকার রুচির আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারিতেছে না। ভাবের সহজ সৌন্দর্য্য ও পদাবলীর রসমাধুর্য্যে ঈশ্বর গুপ্ত এক দিন সাহিত্যগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; রঙ্গলাল দীন-বন্ধু, বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্য মহারথিগণ প্রায় সকলেই প্রথম যৌবনে গুপ্ত কবির প্রতিভার দীপ্ত-আলোকের নিকট বসিয়া দাঁড়ি টানিয়া আসিয়াছেন। গুপ্ত কবির সঙ্গে সঙ্গেই খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার শব্দ-চাতুর্য্যের শর্করাসংযোগ আনারসের ন্যায় রসভরা মধুর ফলকেও মধুরতর করিয়াছিল; কাব্যকলার গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া তিনি তপস্বী মৎস্যকেও বিলাসী-পূজ্য ভোজ্যে পরি-ণত করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির পর বঙ্গদেশে অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক কবিতা সকল দেশে সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যে বরণীয় হইবার উপযুক্ত

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনাপাঠের লালসা যে বর্ত্তমান শিক্ষিত জনগণের অন্তর হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এ কথা মনে করা যায় না; জরী বারাণসী তসর গরদ কিংখাব আপনার প্রাপ্য আদর ও সম্মান সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু 'সিমলের' কালাপেড়ে ধুতি বাঙ্গালীর কাছে চির-নূতন! আজকালকার লিখিত কি গদ্য কি পদ্যকাব্যে যেন একটু রাণ্ডির তীব্র উত্তেজনা, শ্যাম্পেনের উদ্দাম প্রফুল্লতা, শেরীর সুরভিমত্ততা আছে; সপ্তসাগরপারাগত এই মদিরমধু-সংযোগে আমাদের কাব্যের যে জাতিপাত ঘটিয়াছে এ কথা আমি স্বীকার করি না, তবে মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণের জন্য মনটা কেমন কেমন করে বটে!

বর্ত্তমান জাতীয় গদ্যের প্রাসাদগঠনে প্রথম কর্ণিক চালাইয়া গিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামরাম বসু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি। আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিতেছি না মোটামুটি আলোচনা করিতে করিতে যে দুই চারিটি নাম মনে আসিতেছে বলিয়া যাইতেছি, তাহাও পর্য্যায়ক্রমে বলিতেছি না, সুতরাং অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ অনেক নাম বাদ পড়িয়া যাইতেছে ও যাইবে, তাহার জন্য উকীল পোষণে অক্ষম এই দীনের নামে অনুগ্রহ করিয়া কেহ মানহানির মকদ্দমা রুজু করিবেন না।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও বিশেষ বিভাগীয় গ্রন্থগুলি বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহা কবিতা ও কথা-সাহিত্য। কথা-সাহিত্যপ্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচরণ মিত্রকে। টেকচাঁদ ঠাকুর শিউলীফুল কুড়াইয়া কৃষ্ণকলি তুলিয়া অপরাজিতা গাঁথিয়া তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে' বাঙ্গালার সুবচনী পূজার এক গ্রাম্য মাধুরীপূর্ণ অপূর্ব্ব মালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'—নামটি আটপৌরে বাঙ্গালা, ইহার ভাষা আটপৌরে বাঙ্গালা, ইহার ভাব গল্প পাত্র পাত্রী সব বাঙ্গালীর নিজস্ব। সংসারে নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে একেবারে দোষশূন্য যে কিছু আছে, বলা যায় না; সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলালও' একেবারে দোষশূন্য হইতে পারে না। কিন্তু পরমপূজ্য রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে দুই একটি দোষ ধরিয়াছেন, তাহাতে আমি সায় দিতে পারি না—এ কথা আমি তাঁহার চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন, "তাঁহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বলিল—মতি, তোমার ভগিনী ও বিমাতার সকল দিন আধপেটা খাওয়াও হয় না; মতি অমনি রাগিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া মায়ের গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল।" -এই কথা কি মনে ধারণা করা যায়? ঐরূপ প্রহার করাইবার অগ্রে মায়ের সহিত কোনওরূপ কলহ করাইলে ভাল হইত না কি?—কেন? অশেষশাস্ত্রাধ্যায়ী পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারেন, আর মূর্খ উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধতস্বভাব মতি তাহার মায়ের গালে একটি চড় মারিতে পারে না? আর প্রহারের পূর্ব্বে মাতার সহিত কলহ না করুক, মতি যে অভাবের দায়ে তাহার মনের সহিত করুণ কলহ করিতেছিল, এ কথা উক্ত না হইলেও মনস্তত্ত্ববিদের নিকট সম্পূর্ণ ব্যক্ত। আর এক স্থলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শ্রাদ্ধবাড়ীতে বিদায়লোভে অনবরত গতায়াতের কথা উল্লেখ করাতেও "বামনে বুদ্ধি প্রায়ই মোটা হয়" এই কথা বলাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় টেকচাঁদের নিন্দা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেমন করিয়া মনে করিলেন, প্যারীচাঁদ বাবু পরমপূজ্যপাদ উদারপ্রাণ স্বাধীনচেতা অধ্যাপকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ করিয়াছেন? সেকালের কথা দূরে থাক্, আজ পর্য্যন্ত সেরূপ অধ্যাপকগণ পত্র আদায় করিতে কাহারও দ্বারে উপস্থিত হয়েন না, অনেক আরাধনা করিয়া তবে তাঁহাদিগকে পত্র গ্রহণ করাইতে হয়। মাসী পিসী ভাগিনেয় জামাই প্রভৃতির সুপারিস লইয়া যে সব বিপ্রবংশসম্ভূত অদ্ভুত পদার্থেরা একমাত্র অধ্যাপকগণের প্রাপ্য পত্রের অংশীদার হইতে আসেন, মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আর ন্যায়শাস্ত্রে বিপুল ব্যুৎপন্ন হইয়াও পণ্ডিতগণের যে বিষয়বুদ্ধি কম থাকে, প্যারীবাবু তাহাই বোধ হয় বলিয়াছেন।

একটা কথা আমি সাধারণভাবে বলিয়া যাই। রহস্য করিলেই যে গালাগালি দেওয়া হয়, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, এইরূপ একটা সাধারণ ভ্রমাত্মক গোলমাল অনেকের মনে আছে। এ দেশে ঠাকুরদাদারা নাতী-নাতিনীকে শালা-শালী বলিয়া ঠাট্টা করেন। তাহা কি গালাগালি না অনাদর

প্রদর্শন ? আগেকার ভক্তবৈষ্ণব-পরিচালিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক যাত্রার পালাতেও বৈরাগীর সং আনিয়া রঙ্গ করা হইত—সেটা কি বৈষ্ণবনিন্দা? সেকালে য়ুরোপে ধর্ম্মপুস্তকের অংশবিশেষকে নাট্যাকারে পরিণত করিয়া Mystery নামক এক জাতীয় অভিনয় হইত, ঐ অভিনয়-সূত্রে রঙ্গরসের উদ্দেশে বাইবেলোক্ত চরিত্র লইয়াও হাস্য-রসের অবতারণা হইত, কিন্তু তাহাতে কেহ খৃষ্টধর্ম্মে বিদ্রূপ করা হইতেছে, এরূপ মনে করিত না। সার ওয়াল্টার স্কট লিখিয়াছেন যে, আয়ারল্যণ্ডের ন্যায় গোঁড়া ক্যাথলিক প্রদেশেও ঐরূপ রঙ্গরস হইত; কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ের ভক্তি কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইত না।

যে কথা সাহিত্যের উজ্জ্বল অলঙ্কারে বঙ্কিম বাবু প্রমুখ কাব্যোপাসকগণ বঙ্গের ভাষাপ্রতিমাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম বেশকারী যে টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা উচিত নহে। তবে প্যারীচাঁদ বাবু দেবীকে যে কাপড় পরাইয়াছিলেন তাহা একেবারে কোরা তাঁত হইতে নামান ও মায়ের হাতে দিয়াছিলেন—তৈলাক্ত কড়া ও কাঁচা! বঙ্কিম বাবু এক দিকে সেই বসন উত্তম 'ধোলাই' করিয়া এবং অপর দিকে সরল সংস্কৃতে বাড়ি বাড়ী একটু হালকা করিয়া পরিয়া মায়ের অঙ্গরাগক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর যে ভাষার ছটায় আজ বঙ্গবাণী সমুজ্জ্বল, সেই ভাষার মূল বোধ হয় যেন উহার "আলাল" ও মধ্যাহ্নে "জয়দেব"।

বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নাম বাদ দিলে অপরাধ হয়। কলিতে অশ্বমেধযজ্ঞের প্রথা প্রচলিত না থাকায়, বঙ্কিম বাবু মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সিংহ মহোদয়ের গদ্য মহাভারত সাহিত্যরাজ্যে এ যুগের অশ্বমেধ। সত্য, তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর সাহায্যে ঐ লোককল্যাণকর ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেমন Hamiltonএর বাড়ীর অলঙ্কার সুনিপুণ দেশী কারিকর দ্বারা প্রস্তুত হইলেও উহা Hamiltonএর বাড়ীরই গহনা, তেমনই কালীসিংহের মহাভারত কালী-সিংহেরই মহাভারত। বঙ্গভাষাকে তাঁহার আর এক দান 'হুতুম পেঁচার নক্সা'; অধিক পরিমাণে গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট হইলেও 'হুতুম পেঁচা' 'হুতুম পেঁচার'ই মত মিষ্ট উহার আর অন্য তুলনা নাই। বোধ হয় 'হুতুম পেঁচা' প্রকাশের পর বাটবার বর্ষবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত ও ধরণের পুস্তক আর বাঙ্গালাভাষায় কেহই লিখেন নাই। 'হুতুম পেঁচা' শুধু রহস্যের খনি নয়—এক সময়ের বঙ্গদেশের—অন্ততঃ কলিকাতা নগরের সামাজিক ইতিহাস।

ঈশ্বর গুপ্তের "মিউটিনী" প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" আবৃত্তি করিয়া বাখারী ঘুরাইয়া আমি এক দিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ চঞ্চল হইতেছে।

বৃটিশ বাঙ্গালী এক দিন My dear Fatherকে বাঙ্গালায় (মাতৃভাষায়) পরম পূজনীয় পিতা লিখিতে লজ্জা বোধ করিতেন, আর আজ সেই বাঙ্গালী—ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী গভীরতম চিন্তাপ্রসূত সন্দর্ভ সকল আপনার ভাষায় লিখিতেছেন, মাতৃভাষার পূজা করিয়া ধন্য হইতেছেন! বাঙ্গালার গ্রন্থকারের সংখ্যা আজ গণনা করা যায় না, তাই আজ কি আনন্দের দিন! এ আনন্দ বাঙ্গালায় কে আনিল? বঙ্গদেশকে গঙ্গাস্নান কে করাইল? এই পবিত্র যজ্ঞের পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র। ভাষাকে মাতৃবধূবোধে কি সংস্কৃতজ্ঞানাভিমানী, কি ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী সঙ্কোচে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন। দীনবন্ধু, রামদাস সেন, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি তন্ত্রধারক পূজক বেশকারীদিগকে সঙ্গে লইয়া পুরোহিতরূপে বঙ্কিম বাবুই প্রথমে যেন মন্ত্রবলে তাঁহাদের মুখ ভাষাদেবীর দিকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ, উনিই তোমাদের মা!" শুভক্ষণে ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হইল; সকলে দেখিল, মায়ের মুখ কি সুন্দর কি পবিত্র কি মাধুর্য্যমণ্ডিত তেজোজ্জ্বল! তখন জ্ঞানকাননের কুসুমরাশি আহরণ করিয়া সকলে মায়ের পদে অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প ঢালিয়া দিতে লাগিল; চিন্তা ও কল্পনার ভাণ্ডার হইতে হিরণহীরা মণিমুক্তা বাহির করিয়া

মাতৃদেবীর অঙ্গে ভূষণ পরাইতে লাগিল ;—স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, কলিকাতায় 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্য্যদর্শন' প্রকাশিত হইল, ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' প্রতিষ্ঠিত করিলেন প্রাচীন ঋষিগণের চিন্তা, সংস্কৃত দার্শনিক সংহিতাকার ও কবিগণের চিন্তা, ইংলণ্ডের চিন্তা, ফ্রান্সের চিন্তা, জার্ম্মাণীর চিন্তা, ইটালীর চিন্তা এই সকল পত্রিকার পৃষ্ঠে মঙ্গলময় কোমল বাঙ্গালায় কথা কহিতে লাগিল। 'বঙ্গদর্শনের' পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রিকা ছিল বটে—তন্মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত 'রহস্য-সন্দর্ভের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; সে সকল পত্রিকা মিশনরী কার্য্য দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালায় Baptise করিল 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্কিম বাবু যদি বাঙ্গালায় একখানি পুস্তকও না লিখিয়া শুধুই 'বঙ্গদর্শনের' প্রবর্ত্তনা করিতেন, তাহা হইলেও তিনি ধন্য হইতেন এবং বঙ্গদেশও ধন্য হইত।

ধন্য হইত, বলিলাম কি, বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের অগণণ্য আমার বঙ্গমাতার ন্যায় ধন্যা ভূমি আর কোথায়? মা, আজ তুমি দুর্ভিক্ষের দায়ে উপবাসী, বন্যার প্লাবনে কাল তোমার বক্ষে জলরাশি, বিদেশী তোমায় উপাধি দিয়াছে দাসী, তোমার লেখনীতে আইনের ফাঁসী, ধনবলে তুমি দীনা, পশুবলে তুমি ক্ষীণ—তথাপি কিঞ্চিদধিকশত শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের এই বেলাভূমিতে নারিকেলের ন্যায় পিপাসাহারী, তরমুজের ন্যায় স্নিগ্ধকারী, আনারসের ন্যায় রসবর্ষী, ইক্ষুর ন্যায় মধুস্রাবী, আম্র-পনসের ন্যায় মিষ্টতায় তৃপ্তিদায়ী ফলের রাশি ভারতে আর কোথায় ফলিয়াছে? বাঙ্গালার পদ্যেও কবিতা, গদ্যেও কবিতা। নদীমাতৃকা বলিয়া কি মা তুমি এমন কুলুকুলুকলে বিশ্ববিমোহন গান গাহিতে শিখিয়াছ? ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যেন্দ্র দত্ত, কালিদাস রায়, জীবেন্দ্রকুমার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক পর্য্যন্ত কত বাণীপুত্র না তুমি অঙ্কে ধারণ করিয়াছ! রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত কাহার নাম করিব, কত নাম করিব; সে নামাবলী ত' অক্ষরে অক্ষরে আপনাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে! আমি কৃতীর মৃত্যুতে—কবির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করি না একে ত' মৃত্যুশোক বা mourning কথা হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত নাই, তাহার পর যে কবি মরে—সে কবিই নয়। কবির প্রাণের সহিতই আমাদের পরিচয়, দেহের সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই; আমি এখানে ব্যাপকার্থে কবি শব্দ ব্যবহার করিতেছি অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র জীবিত, তারানামে রামপ্রসাদ অমর, পৌত্তলিকতার মধ্যে নূতন চিন্তা ত' রামমোহন রায়রূপে প্রাণে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, বসুন্ধরাক্ষেত্রে দর্ভাসনে বসিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল যেন প্রত্নতত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামদাস সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, পদ্মচন্দ্র বসু সবাই অমর, জীবিত!

এই আষাঢ়ে আনারস মুখে দিয়া রসনাপরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের আনারসরসে হৃদয় পুলকিত করি; মধুসূদনের মেঘনাদ কি আজও শঙ্খনাদে বঙ্গের মঙ্গলসূচনা করিতেছে না? হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" এখনও এই প্রাচীন প্রাণে বসন্তের বাতাস বহাইয়া দেয়। যে হেমচন্দ্র এক দিন বারাণসীতে বসিয়া ঐ "হতাশের আক্ষেপের" শ্লেষাত্মক অনুকরণ শুনিয়া নিজের বিদ্রূপের নিজে প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই উদারহৃদয় রসরাজের কি কখনও মৃত্যু হয়? সারদা চরণের এই সমবয়সী অমর, 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়া নবীন বিখ্যাত, চিরজীবিত। নবীন আমার প্রথম যৌবনের বন্ধু, যখন দুই দশ জন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভিন্ন নবীন ডেপুটী নবীনের অন্তরে যে কবিত্বের যাদুঘর আছে আর কেহ জানিত না, তখন আমার নবীনের সহিত পরিচয়, আর আজ এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরেও আমার মনে হয়, তাহার সহিত নিত্য বসি, নিত্য কথা কই। স্বদেশভক্ত বন্ধু কাব্যবিশারদ, হৃদয়খানা বড় বিশাল ছিল বলিয়াই কি বিশাল সাগরবক্ষে দেহরক্ষা করিলে? তোমার শ্লেষেও যে মাধুর্য্য, তাহাতে লবণ সমুদ্রও কলঙ্কের জন্য ক্ষীরোদ হইয়া যায়! আর বঙ্কিম! বঙ্কিমের যদি নাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এখন কে মোহন মুরলী বাজাইতেছে? আর সেদিনকার খোকা সত্যেন্দ্রাদি অনেক গান গাহিয়া মায়ের কোলে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।*

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

* কাঁঠালপাড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

বিচারকের বিচার

(সত্য ঘটনা)

জবর হাকিম করেন বিচার
বিচার-আসনে বসি,
আইনের তিনি বেসাতি করেন
প্রতি গ্রামে গ্রামে পশি।

রেলেতে চড়িয়া দেন না মাশুল
লোকে নানা কথা কয়,
দ্রব্য বেচিয়া মূল্য চাহিলে
দেখান জেলের ভয়।

হেলায় কাহারো টাক্স বাড়ান
কাহারো মারেন রুটী,
সাধু চোর হয় বিচারে তাঁহার
করে মাথা কুটাকুটি

এস্তাক মিঞা গ্রামের মোড়ল
সাধু সজ্জন অতি,
কি কারণে তায় হাকিম চটিল
সহসা তাহার প্রতি।

জুলুমেতে তার করেনিক ভয়
করেছিল প্রতিবাদ,
ভাবিছে হাকিম কেমন করিয়া
মিটাবে তাহার সাধ।

মামলায় এক আসামী হয়েছে
এস্তাজ মিঞা, বুঝি
এত দিন পর ব্যাঘ্র তাহার
শীকার পেয়েছে খুঁজি।

হাতকড়ি দিয়া মনের সাধেতে
ঘুরাইল সারা গ্রাম,
লাঞ্ছনা তার বহুত করিল,
বিধি যে তাহারে বাম।

হইল ফাটক তিন মাস তার
হাকিমের বাহুবলে,
আপীলে কেবল খালাস পাইল,
নিজের পুণ্যফলে।

এস্তাজ রয় মরমে মরিয়া
বিনা দোষে জেল খাটি,
আল্লার পদে এত নির্ভর
একেবারে হ'ল মাটী।

একমনে শুধু পড়ে সে কোরাণ
জলে উঠে চোখ ভিজে,
বিচারের ব্যথা ভুলিতে পারে না
আনমনে ভাবে কি যে।

আশা না পাইলে কাঙাল হৃদয়
কেমন করিয়া বাঁচে,
কাঁদে আর বলে আল্লা আছেন
এখনো আল্লা আছে।

দু' বছর গেছে প্রবল হাকিম
বদলী হয়েছে কবে,
ভিতরের তার রোগের বীজাণু
কয় দিন ছাপা রবে?

তাহার ঘুষের গোপন কাহিনী
উঠেছে সবার কানে
ধর্ম্মের ঢোল আপনিই বাজে
চিরদিন লোক জানে।

জজের বিচারে হ'ল হাকিমের
পূরা দু' বছর জেল,
পাপীর বুকেতে আজিকে পশিল
বিধির বজ্র-শেল।

আজিকে আপীল দাঁড়ায়ে আসামী
ভয়ে ঠেকে পায়ে পায়,
পূর্ব্ব হুকুম বাহাল রহিল
প্রকাশ হইল রায়।

বসিয়া পড়িল অসাধু হাকিম;
সংজ্ঞা লভিয়া শেষে,
পুলিসের সাথে পুতুলের মত
চলিয়াছে দীন বেশে।

সুমুখে উহার দাঁড়ায়ে কে ওই
সেলাম করিল ধীরে?
'এস্তাজ সেখ' বলিয়া কয়েদী
দাঁড়াল চমকি ফিরে

আভূমি আনত সেলাম করিয়া
কহে এস্তাজ মিঞা,
হুজুর আজিকে হ'ল সাক্ষাৎ
যেতে এই পথ দিয়া।

দেখালেন দিয়া চক্ষে আঙুল
ভুলে যাই মোরা পাছে,
আল্লা এখনো আছেন হুজুর
আল্লা এখনো আছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মাতৃ-মন্দির
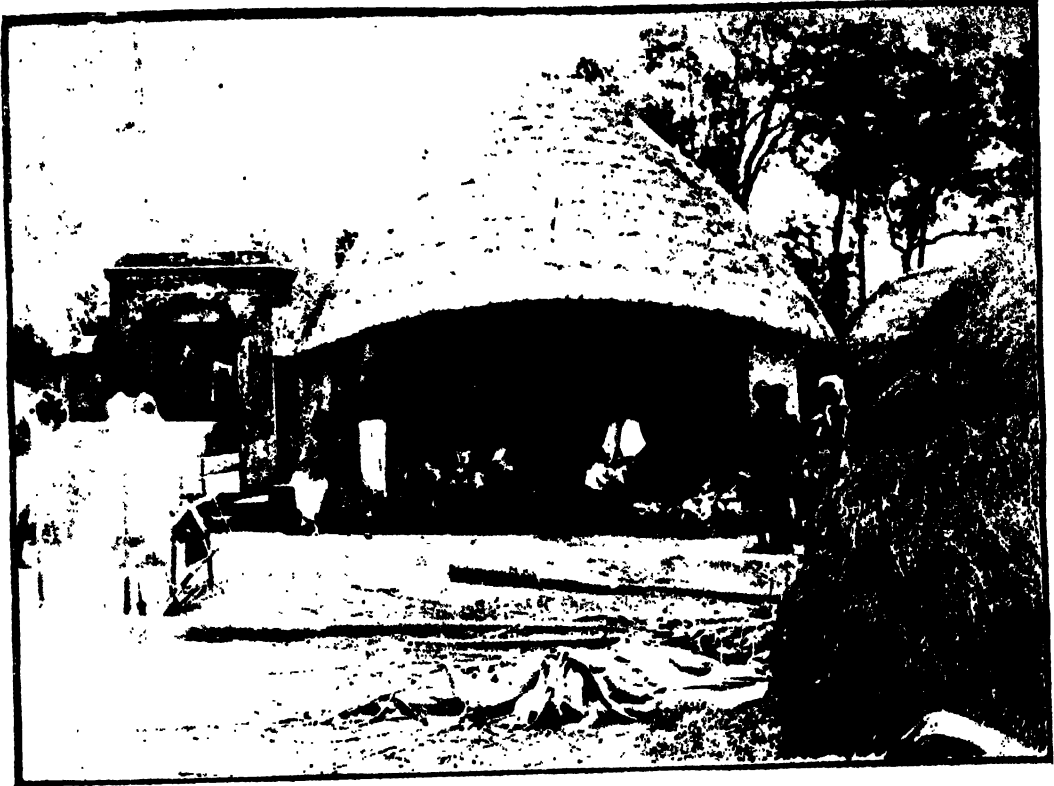
জয়রামবাটী কুটীরের দৃশ্য—পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণীর পিতৃভবন।

যখন বাঙ্গালীর দেহে, মনে, চরিত্রে ও ব্যবহারে শক্তি ছিল—তখন বাঙ্গালার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে শক্তি-পূজার, নারীপূজার মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিত; তখন মন্দিরে মন্দিরে—নারী-শক্তিকে মাতৃরূপিণী ব্রহ্মময়ীরূপে কল্পনা করিয়া—নানাভাবে তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বাঙ্গালীর কাম, উহাই ছিল বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালার সেই গৌরবময় যুগে বাঙ্গালার সাধক, বাঙ্গালার কবি নারীকে শক্তিরূপিণী মহামায়ার অংশ ভাবিয়া পূজা করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার পুরুষ যে দিন হইতে মহাশক্তিরূপিণী মাতৃজাতিকে মা বলিয়া ভাবিতে ভুলিয়াছে, নারীকে শুধু বিলাসের উপকরণ করিয়া তুলিয়াছে, তখন হইতেই বাঙ্গালার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

বহুকাল পরে, পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মাতৃনামবিস্মৃত বাঙ্গালীকে আবার 'মা' বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছিলেন, বাঙ্গালায় শক্তিপূজার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা পরমহংসদেবের জীবন-চরিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, আশৈশব ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, নবশক্তিপূজার প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণীকে তন্ত্রমতে, মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় এক অপূর্ব্ব আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শক্তিপূজার উদ্বোধনের মহামন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই—বাঙ্গালী আবার শক্তিরূপিণী নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতে, দেউলে, মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্য-সেবক ও ভক্তমণ্ডলী, তাঁহার চিরব্রহ্মচারিণী পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যক্ষ শক্তিরূপিণী

নবনির্ম্মিত মাতৃ-মন্দির রামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

জননী বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহরক্ষার পর তাই বাঙ্গালী মাতৃপূজার নিদর্শনস্বরূপ মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল; তথায় তাঁহার মূর্ত্তিকে বিগ্রহরূপে স্থাপন করিয়াছে।

হুগলি জিলার অন্তর্গত 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাই পরমহংস রামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী। এই মহীয়সী নারী চিরব্রহ্মচারিণীরূপে স্বামীর ধর্ম্মানুগামিনীই ছিলেন। তাঁহার পবিত্রতম জীবনযাত্রার প্রণালী বাঙ্গালার নারী-সমাজের আদর্শ স্বরূপ। বাঙ্গালার পুরুষ, শক্তিরূপিণী নারীকে আবার মহামায়ারূপে পূজা করিতে শিখিয়া স্বয়ং ধন্য হইতেছে—জাতিকে নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিবার অবকাশ দিতেছে। পরমহংসদেবের সাধনা যে ব্যর্থ হয় নাই, জয়রামবাটী পল্লীতে মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ভক্তগণ তাহার অবাধ প্রমাণ দিয়াছেন।

যে গৃহে রামকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের অনেক কাল যেখানে যাপন করিয়াছিলেন, সেই পল্লী-কুটীরকে পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া, রামকৃষ্ণের ভক্ত সেবকগণ তথায় বহুব্যয়ে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; তথায় মাতৃমূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশদেশান্তর হইতে শত শত ভক্ত, সেবক ও অনুরাগী পল্লীর উৎসবক্ষেত্রে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

বহু বহু শতাব্দীর পরে বাঙ্গালার পল্লী প্রান্তরে নারী-শক্তির, মাতৃপূজার উদ্বোধন-মন্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদের মত এই নারী-পূজার মন্ত্র—মাতৃনামগান সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিবে কি? বাঙ্গালী নারীজাতিকে মা বলিয়া ডাকিতেও

যেন এখন কুণ্ঠা বোধ করে, নারীজাতিকে মাতৃভাবে চিন্তা করিতেও অধঃপতিত বাঙ্গালী যেন ভুলিয়া গিয়াছে। এই বোধন-মন্ত্র সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া বিলাসবাসন-ক্লিষ্ট, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে নারী-শক্তিপূজায় অবহিত করিয়া তুলিবে কি? নারীজাতিকে আবার মা বলিয়া ভাবিতে ও ডাকিতে শিখাইবে কি?

হিন্দু যত দিন শক্তিপূজায় অবহিত ছিল, তত দিন সে তাহার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্যও রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ বাঙ্গালী হিন্দু—দশভুজার পূজাই তাহার প্রধান পূজা বলিয়া মনে করিত—মা "দশপ্রহরণধারিণী" আবার মা বরাভয়প্রদায়িনী বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে গীত হইয়াছিল—

"বাহুতে তুমি, মা, শক্তি
হৃদয়ে তুমি, মা, ভক্তি।"

হিন্দুর পুরাণে কীর্ত্তিত হয়, যে কার্য্য দেবতার সাধ্যাতীত হইয়াছিল দেবী তাহাই সম্পন্ন করিয়া অনাচার-দানব নষ্ট করিয়া ত্রিভুবন নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রামপ্রসাদ মা নামে অজ্ঞান হইতেন; বাঙ্গালী কি সেই মাতৃমন্ত্র ভুলিতে পারে?

মাতৃমূর্ত্তি।

আজ এই নূতন মাতৃ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় মনে আবার আশা হইতেছে, বাঙ্গালী মাতৃমন্ত্রের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে এবং জগতে আবার আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

জ্যোতিষী মহাশয়

(গল্প)

৬

পরদিন প্রাতে, একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় পদব্রজে বাকীপুর সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোরাদপুরে গিয়া "বেঙ্গলী মেস" অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রথমে পথচারী কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। অবশেষে এক জন বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি, কাউ-লজ, আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।" নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন, মেস বাড়ীটির সম্মুখে খানিকটা খোলা যায়গায় বিস্তর গরু বাঁধা রহিয়াছে। পথপ্রদর্শক বাবুটি বলিলেন, "এটিই বেঙ্গলী মেস, তবে ঐ গরুগুলো সামনে থাকার জন্যে লোক এটাকে কাউ-লজ বলে। যান, ঐ দরজা দেখা যাচ্ছে।" বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় সাবধানে গরুর ভিড় ঠেলিয়া, সদর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, নিম্নতলের বারান্দায় ২।৩ জন বাবু চলাফেরা করিতেছেন। তখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, সুধীর বাবু এখানে আছেন কি?" বাবুরা বলিলেন, "ছাতে ঐ তেতালার ঘরে আছেন। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।"

জ্যোতিষী মহাশয় তেতালায় উঠিয়া দেখিলেন, তথায় একখানিমাত্র ঘর, বাকী সমস্ত ছাত। সুধীর তখন নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইতে যাইবার আয়োজন-স্বরূপ, নিজ তক্তপোষে বসিয়া সিগারেট সেবন করিতেছিল। "বাবাজী, তুমিই সুধীরকুমার?" বলিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বেশী প্রবীণ ভদ্রলোকটিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সুধীর সিগারেটটি লুকাইয়া ফেলিয়া, তক্তপোষ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

প্রশ্নের উত্তর দিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাবাজী, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। এ ঘরে কি তুমি একাই থাক?" —বলিয়া কক্ষটির অপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর একখানি তক্তপোষে কম্বলে ঢাকা বিছানা গুটানো রহিয়াছে।

সুধীর বলিল, "আপাততঃ একা বটে। আর এক জন থাকেন, তিনি সম্প্রতি বাড়ী গেছেন।"

"তোমার ইস্কুল কখন্?"

"সাড়ে দশটা থেকে"

"ল-কলেজ?"

"বেলা ৭টা থেকে ৫টা।"—বলিয়া সুধীর সবিস্ময়ে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, লোকটিই বা কে, আমার সকল খবর জানিলই বা কোথা হইতে? বিবাহের ঘটক নাকি? জিজ্ঞাসা করিল,"মশাইয়ের নামটি কি?"

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, পরে সে সমস্তই জানতে পারবে।"

"আচ্ছা,আপনি বসুন তা হ'লে।" বলিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিষী মহাশয় তখন সেই তক্তপোষে জাঁকিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধীর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মুখ-হাত ধোবেন?"

"না, আমি সে সব ইষ্টিশান থেকেই সেরে এসেছি।"

"আপনার স্নানাহার—"

"সেটা, এইখানেই করতে পারলে ভাল হয়। সে সব হবে এখন, ব'স দেখি, সব কথা তোমায় বলি।"

সুধীর উপবেশন করিলে, জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া, একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া বলিলেন, "আমিই কাগজে কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম; আর তুমি তাই প'ড়ে, আমায় যে পত্রখানি লিখেছিলে, এই তার নকল।"— বলিয়া নকলখানিও সুধীরের হস্তে দিলেন।

দেখিয়া সুধীর বলিল, "ওঃ, বুঝেছি। আপনি হস্তরেখা-টেখা দেখতে এসেছেন।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার হাত দেখি, দাও।"

সুধীর হাত বাড়াইয়া দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুতে দিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ মনোযোগের ভাণ করিয়া সুধীরের করাঙ্ক পরীক্ষা করিলেন; শেষে বলিলেন, "যা গণনা করেছিলাম, ভুল হয় নি, ঠিকই সমস্ত মিলে যাচ্ছে।"

সুধীর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মিলে যাচ্ছে? প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "না হে না, সে সব কিছু নয়; ও প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য পিসাচ-কিসাচ নয়, বিজ্ঞাপনের ও সমস্তই বাজে কথা। আসল কথা তোমায় বলি, শোন। আমি গণনায় জানতে পেরেছিলাম যে, সম্প্রতি কোনও আজন্ম পিতৃহীন যুবকের একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ আছে। কিছু ধনরত্ন সে পাবে। সে যুবকটি যে কে, তাই আবিষ্কার করবার জন্যে আমি ঐ বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছিলাম। তোমার জন্ম সন ও মাস তোমার চিঠিতে পেয়ে বুঝলাম যে, সে ভাগ্যবান্ যুবা তুমিই। তোমার কর রেখাতেও সেই কথা মিলে যাচ্ছে।"

যুবক বলিল, "তা' কবে আমার সে প্রাপ্তিযোগ ঘটবে? কি পাব?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক করে, তা' বলতে পারিনে, বাবাজী, তবে অধিক বিলম্ব নেই। আর কত, তাও শাস্ত্রে লেখে না। দশ টাকাও হ'তে পারে, দশ লাখ হতেও আটক্ নেই। তবে, ধনরত্নপ্রাপ্তিযোগটা ধ্রুব। কিন্তু তার জন্যে একটি বিশেষ কষ্টসাধ্য দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক, এবং সে দৈবকর্ম্মটি আমি ছাড়া অপর কারুর দ্বারা হবে না।"

কথাটা শুনিয়া সুধীর কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে তাহার মুখে ব্যঙ্গভাবে পূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

জ্যোতিষী মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজী! তুমি ভাবছ, বামুন এই ব'লে ভুজুং দিয়ে, দৈবকর্ম্ম করবার নাম ক'রে কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার মতলবে এসেছে? তা নয়, বাবাজী! কি মতলবে আমি এসেছি, তা বলি শোন। আমি কলির ব্রাহ্মণ, লোভটা পুরোমাত্রাতেই আমার আছে; তুমি আমার সহায়তায় যা কিছু ধনরত্ন লাভ করবে, তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে, এই অঙ্গীকার ক'রে যদি তুমি রীতিমত দলিল লিখে রেজিষ্টারি ক'রে দাও, তবেই আমি সেই দৈবকর্ম্মটি করব। নচেৎ নয়। এই জন্যেই গাড়ীভাড়া খরচ করে এত দূর এসেছি, বাবাজী। বস্, সমস্ত খোলাখুলি তোমায় বল্লাম।"

সুধীর অবাক্ হইয়া জ্যোতিষীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

জ্যোতিষী বলিলেন, "ভেবে দেখ কথাটা। এই যে দলিলের কথা বল্লাম, এর সমস্ত খরচ—ইষ্টাম্পের মূল্য, রেজিষ্টারি খরচা, উকীলের ফী সমস্ত আমি বহন করব, তোমার এক পয়সা লাগবে না। যদি আমার গণনায় কিছু সত্য না থাকে, দৈবকর্ম্মের কিছু শক্তি না থাকে, তোমার তাতে সিকি পয়সারও লোকসান নেই। যদি থাকে, আমার পারিশ্রমিকস্বরূপ বল, গুণের পুরস্কারস্বরূপ বল, যা পাবে, তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে। যদি ১০টা টাকা পাও, ৫টা আমায় দিও। যদি ১০ লাখ পাও, ৫ লাখ দিও।"

সুধীর বলিল, "পাঁচ লাখ!"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "কি ছেলেমানুষ তুমি! যখন আমার বিনা সাহায্যে তুমি মোটেই কিছু পাচ্ছ না, তখন অর্দ্ধেক হোক, সিকি হোক, যা পাবে, তাই ত তোমার লাভ। কথাটা ভেবে দেখ।"

সুধীর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল; শেষে বলিল, "আচ্ছা, টাকা যা পাব, তার অর্দ্ধেক না হয় আপনাকে দিলাম। আপনি বলেছেন ধনরত্ন। যদি একটি রত্ন পাই, তার অর্দ্ধেক আপনাকে ভেঙ্গে কি ক'রে দেবো?"

"তার উচিত মূল্যের অর্দ্ধেক আমায় দেবে। সে সব কথা দলিলে স্পষ্ট করেই লেখা থাকবে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া কোথায় হবে?"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "যে কোনও এক জন ভাল উকীলের বাড়ীতে। বড় রাস্তার মোড়ে যে এক জন নাম্জাদা উকীলের সাইনবোর্ড দেখে এলাম, উনি কেমন?"

সুধীর বলিল, "কেশব বাবু? ভাল উকীল।"

"তবে, বাবাজী, যদি রাজি থাক, এখনই ওঠ। চল, কেশব বাবুর বাড়ী যাই। আর বিলম্ব নয়। রাজি না থাক, বল, আমি বিদায় হই।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলুন, আমি রাজি।"

এই সময় ভৃত্য সুধীরের চায়ের পেয়ালা হস্তে প্রবেশ করিল। সুধীর মুখ পুড়াইয়া সেই গরম চা এক নিশ্বাসে পান করিয়া লইয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত উকীলবাড়ী গেল।

সেই দিনই অপরাহ্ণের ট্রেণে, রেজিষ্টারি দলিলখানি ব্যাগে ভরিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময়, সুধীরকে নিজ যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়া লইলেন যে, প্রাপ্তিযোগটি সফল হইবামাত্র সে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিবে।

৭

কলিকাতায় ফিরিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় গৃহিণীকে সকল সংবাদ জ্ঞাত করিলেন এবং আশান্বিত হৃদয়ে উভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ কাটিল, পক্ষকাল কাটিল, কিন্তু সুধীরের নিকট হইতে কোনও প্রকারের সংবাদ নাই। এ দিকে এটর্ণিরা তাহাকে লইয়া কি করিল না করিল, তাহাও জানিবার কোনও উপায় নাই।

তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় পুনর্বার বাকীপুর যাত্রা করিলেন। বেঙ্গলী মেসে গিয়া শুনিলেন, সপ্তাহখানেক হইল, ইস্কুলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া সুধীর চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যাইতেছে, তাহা কাহাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কর্তা গৃহিণীতে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে রাজা জায়গির দিবে, সেই রাজার নিকটেই সুধীর বোধ হয় গমন করিয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, "শেষে কি ফাঁকি দেবে আমাদের?"

জ্যোতিষী বিমর্ষভাবে বলিলেন, "পৈতে ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছি, ফাঁকি দেন, নরকে প'চে মরবেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাতে ত আমাদের ভারি লাভ! আচ্ছা, এই দু'বার বাকীপুর যাতায়াতে, দলিল-টলিলে, কত খরচ হ'ল?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "সেই হিসেবই সে দিন দেখ্‌ছিলাম। ৪০৷৷০ খরচ হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ সবগুলো টাকাই জলে গেল!"

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। সে দিনও অপরাহ্ণে জ্যোতিষী মহাশয় দ্বিতলের সেই কক্ষটিতে বসিয়া আপন মনে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উঠিল—"জ্যোতিষী মশায়! জ্যোতিষী মশায়!"

বারান্দায় গিয়া চিক ফাঁক করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন—সুধীর। কিন্তু সে নিজস্ব মোটরগাড়ীতে বা ল্যাণ্ডো হাঁকাইয়া আসে নাই—সাধারণ গৃহস্থের সাজে, পদব্রজে আসিয়াছে, দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের বুকটা দমিয়া গেল।

জ্যোতিষী মহাশয় ভগ্নমনে নামিয়া গেলেন; দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "এই যে সুধীর বাবাজী, এত দিনে মনে পড়ল? এস এস, ভিতরে এস।"—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন।

সুধীর তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার কৃপায়, ধনরত্ন আমি লাভ করেছি। আমার সর্ত্ত অনুসারে, তার অর্দ্ধভাগ আপনাকে আমি দেবো ব'লে ডাক্‌তে এসেছি।"

যুবকের অঙ্গে লক্ষপতির পোষাক না থাকিলেও, তাহার মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের একটু ভরসা হইল। ভাবিলেন, লাখ-লিখ না হউক, তবু বোধ হয়, বেশ ভাল রকমই কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়াছে। নিজে বসিয়া, সুধীরকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমটা কি হ'ল, সব বল দেখি বাবাজী!"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ্ঞে, আগে কিছু বল্‌বো না;—আমার সঙ্গে আসুন, একবারে দেখাব। আপনাকে নিতে এসেছি, চলুন।"

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দূর?"

"কাছেই। শ্যামবাজার।"

"আচ্ছা, ব'স বাবা, আমি কাপড় বদ্‌লে আসি।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। কি ধনরত্ন সুধীর লাভ করিয়াছে, যাহার অর্দ্ধেক তিনি এখনই পাইবেন, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীকে সংবাদটা জানাইয়া আসিবারও অবসর হইল না।

যুবকের সহিত শ্যামবাজারে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে,

ইহা ত সেই হরিহর মিত্রেরই ঠিকানা—৩২ নং কালু ঘোষের লেন!

সুধীর, বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে বসাইয়া, পার্শ্বদ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া সুধীর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জ্যোতিষী মশায়, আপনার কৃপায় আমি নগদ ১০১৲টি টাকা পেয়েছি। এই নিন আপনার ভাগ।"—বলিয়া দশ টাকার পাঁচখানি নোট এবং একটি রূপার আধুলি সে জ্যোতিষী মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিয়া, বলিল, "নগদ এই। আর পেয়েছি, একটি রত্ন। ওগো, এস।"

বলিতেই পর্দ্দা সরাইয়া, ১৪।১৫ বৎসরের একটি সুন্দরী মেয়ে, একখানি আসমানী রঙের শাড়ী পরিয়া, সভয়-পদক্ষেপে অবনত-বদনে প্রবেশ করিল। সুধীর, হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আর—এই স্ত্রীরত্ন।" বলিয়া সকলে জ্যোতিষী মহাশয়কে প্রণাম করিল। তাহার পর, হাসিতে হাসিতে বলিল—"রত্ন অবিভাজ্য মূল্যের অর্দ্ধাংশ আপনার প্রাপ্য হ'লেও, কোন উপায় নেই—কারণ, আমার এ রত্নটি অ-মূল্য।" বলিয়া সুধীর হাসিতে লাগিল।

জ্যোতিষী মহাশয় মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইলেন। সুধীরের দেওয়া পাঁচখানি নোট হইতে একখানি তুলিয়া লইয়া, মেয়েটির হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বেঁচে থাক মা সুখে থাক। মেয়েটি কার হে সুধীর?"

বধূকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিয়া, সুধীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, "এটি হরিহর বাবুরই মেয়ে। হয়েছে কি জানেন? আমার বাবা, আর হরিহর বাবু, এঁরা বাল্যবন্ধু ছিলেন; একসঙ্গে পড়তেন। তাঁরা পঠদ্দশাতেই আমোদ ক'রে পরস্পর বেয়াই সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। আমি যখন মাতৃগর্ভে, তখনও বাবা সিমলা থেকে হরিহর বাবুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'আমার যদি ছেলে হয়, তবে সে তোমার জামাই হয়ে রইল।'—তাহার পর, বাবা ত মারা গেলেন। হরিহর বাবু প্রথম প্রথম আমার মা'র খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, তাহার পর সে সব আর হয়নি। ক্রমে তাঁর ছেলে-মেয়ে হ'তে লাগ্‌লো। ১০০৲ টাকা মাইনের চাকরী, কলকাতা সহরের খরচ, বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছেন। তার উপর, এর পূর্ব্বে দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন—এইটি তৃতীয় এবং শেষ মেয়েও। মেয়েটি বড় হ'ল। মনের মত পাত্রের দর ওঠে ৫ হাজার—১০ হাজার। অথচ এ দিকে একটি পয়সা সঞ্চয় নেই। তখন সেই বাল্য ও যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়ল। আমি যদি বেঁচে থাকি, কোথায় আছি, তা জানেন না, তাও বটে, আর লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে আছি, না চোর-গুণ্ডা হয়েছি, তাও জানেন না, তাই ঐ কৌশল ক'রে আপনার নামে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন। আপনি বাঁকীপুর থেকে চ'লে আসবার পরের রবিবারে, হরিহর বাবু আমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত। সব কথা আমায় ভেঙ্গে বল্লেন, বাবার চিঠিপত্র আমায় দেখালেন। পিতৃ-আজ্ঞা আমি পালন করতে প্রস্তুত আছি জেনে বল্লেন 'বাবাজী, তবে এখান কার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চল। সেখানে ল-কলেজে ভর্ত্তি হবে, এবং আমি যে এটর্ণি বাবুদের বাড়ী চাকরী করি, সেখানে তোমায় আর্টিকেল কবিয়ে দেবো, আমি বাবুদের ব'লে রেখেছি। সেই আফিসে তুমি কায-কর্ম্মও করবে, পকেট খরচস্বরূপ গোটা ৫০৲ টাকা বাবুরা তোমায় দেবেন, স্বীকার করেছেন।' এই কথা শুনে, আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলাম। এই এক হপ্তা হ'ল বিবাহ হয়েছে।"

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় মৌখিক সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি উঠিলেন। নোটগুলা ও আধুলিটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। বলিলেন, "বাবাজী, টাকাগুলো তুলে রাখ।"

সুধীর বলিল, "সে কি জ্যোতিষী মশায়! টাকা রেখে যাচ্ছেন কেন? আপনার ভাগের টাকা ব'লে রহস্য করেছি বৈ ত নয়! ঐ টাকা দিয়ে আমরা দুজনে আপনাকে প্রণাম করেছি! নিন্—নিন্।"—বলিয়া সুধীর নোটগুলি জ্যোতিষী মহাশয়ের পকেটে ফেলিয়া দিল।

"আচ্ছা, তবে তাই!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয়, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "গিন্নি—বাঁকীপুর যাতায়াতে, দলিল খরচায় ১০৷৷০ জলে গিয়েছে বলেছিলে; তা' যায়নি, সেই ১০৷৷০ টাকা জল থেকে উঠে ফিরে এসেছে। এই নাও।"—বলিয়া টাকাগুলি স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়া, তামাক সাজিতে বসিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তিনি স্ত্রীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জানাইতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পরলোকগত দামোদর দাস বর্ম্মন

৮ই আষাঢ় —

কৃষ্ণনগর জেলে শ্রীযুত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রায়োপবেশন। ঢাকা চকবাজারে পিকেটিংয়ের জন্য নয় দশ বৎসরের দুইটি বালকের কারাদণ্ডের নৈহাটীতে বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ সাহিত্য-সম্মিলন; প্রধান সভাপতি বর্দ্ধমানাধিপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাজেট; প্রায় ১।০ লক্ষ টাকা ফাজিল। [illegible] ২০ জন আসামীর (লবণ তৈয়ারী সংক্রান্ত) মামলা বরিশালে স্থানান্তরিত। সীমান্তে বোমা-নিক্ষেপের সময় আফগান রাজ্যে বোমা পড়ায় আমীরের ২ জন প্রজা নিহত ও ৫ জন আহত হয়; আমীর ক্ষতিপূরণ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন। মার্কিণ জাহাজী [illegible] পরিদর্শনে আগত ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্টের পুত্রের (মিঃ রুজভেল্টের) বোম্বাই হইতে য়ুরোপ যাত্রা। জার্ম্মাণ সমস্যায় বৃটিশ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ, উভয়ের মনোমালিন্য মিটাইবার চেষ্টা। লণ্ডনে [illegible] ও তুর্ক প্রতিনিধিদের গোপন পরামর্শ। মাদক বর্জ্জিত আমেরিকায় বৃটিশের মদের জাহাজ আটক।

৯ই আষাঢ়

নৈহাটী ষ্টেশনের নিকট চলন্ত ট্রেণে দুইটা পল্টনে গোরা কর্ত্তৃক বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর মিঃ মিত্রের চশমা, ব্যাগ আদি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা; আসামীরা ধৃত। দিল্লী জেলা কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানে একতা-রক্ষার জন্য শান্তি ও একতা সভায় অর্থ সাহায্য করিতেছেন, মিউনিসিপালিটীর কংগ্রেস-সদস্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ও সংবাদপত্রে জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল সংবাদ প্রকাশে বাধা দিবার জন্য সাব কমিটীও নিযুক্ত করিয়াছেন। নৈহাটী সাহিত্য সম্মেলনের মণ্ডপ হইতে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে শোভাযাত্রা করিয়া গমন। সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লোকান্তর।

১০ই আষাঢ় —

নাগপুরে ভারতমাতা শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধীর শ্রীযুত দেবীদাস ও রামদাসের সহিত উপস্থিতি। কাঁচড়াপাড়ায় বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য সরকারের অনেক সাধের রচিত জেলখানার মাল-মসলা নীলামে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা। নরসিংপুরে চৌধুরী শঙ্করলালজী প্রমুখ চার জন নেতা গ্রেপ্তার। চন্দননগরে সন্ত্রাস-বাদের অভিযোগে ফরিদপুরে সরকারী ব্যবস্থায় সনাক্তের চেষ্টা। মোপলা বিদ্রোহের সময় গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়া ঘুষ লইবার অপরাধে দারোগা রায় বাহাদুর নায়ারের কারা ও অর্থদণ্ড। লাহোরের আউধ ব্যাঙ্কও গণেশ উল্টাইলেন। জেলে চুরীর হুজুগে ভুসাওয়ালে এক ব্যক্তি জনতার নির্ম্মম প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত [illegible] বহু টাকার জাল নোট প্রাপ্তি। পারস্যের ভূমিকম্পের সঠিক বিবরণ; তিন হাজার লোক নিহত। আফগানিস্থানের শিক্ষাসচিব, আমীরের ভ্রাতা [illegible], তথা হইতে প্যারিস যাইবেন। রাইন প্রদেশে স্বতন্ত্র সাধারণ-তন্ত্র স্থাপনের চেষ্টার কথা, প্রধান উদ্যোগীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় ফরাসী হাই-কমিশনারের গোপনীয় চিঠি। মহাসভায় প্রশ্নে প্রকাশ, আফগানসীমান্তে বহু রুশ সৈন্য সমবেত।

১১ই আষাঢ় —

ওয়ার্দ্ধায় তামিল নাড়ু কংগ্রেস কর্ত্তৃক নাগপুরের জন্য প্রেরিত ১৪ জন স্বেচ্ছাসেবক তন্মধ্যে শ্রীযুত বরদাচারী ও সুব্রহ্মণ্যম এম এ বি এল এবং শ্রীযুত ভগবতীয়াস বি এ—ভবঘুরেগিরির অভিযোগে ধৃত। মাননীয়া বাঈ আম্মা ও বেগম মহম্মদ আলি রাজকোটে মৌলানা সৌকত আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আবেদনে উত্তর পর্যন্ত দেন নাই, ১৪ মাস যাবৎ সৌকত আলির খবর পাওয়া যায় নাই। কণিকায় এখনও অনাচার হওয়ার অভিযোগ। নরসিংপুরে কংগ্রেস অফিসে ও এক জন সম্প্রতি 'সহযোগী' উকীলের অফিসে খানাতল্লাস; শঙ্করলালজীর সহধর্ম্মিণী স্বামীর গ্রেপ্তার প্রভৃতি আকস্মিক বিপদে মনোভঙ্গ ও খানাতল্লাসের জন্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরে থাকায় সর্দ্দির ফলে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত, শঙ্করলালজী জামীন দিয়া স্ত্রীকে শেষ দেখা দেখিতে যাইতে অসম্মত। ভিজিগাপত্তন এজেন্সী বিভাগে রম্পার বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে ১২ জনের শাস্তি, আরও ৭ জন অভিযুক্ত। কলিকাতায় সৈয়দ সালে লেনে মোসলেম এতীমখানার বাড়ী পড়িয়া ৪৭ জনের মৃত্যু। [illegible] গুণওয়ারা গ্রামে এক রাজপুত উপবীত ধারণ করায় ও তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তাহার বাড়ী লুট করিয়াছে, বহু লোক গ্রেপ্তার। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মোরাদাবাদ শাখার ভূতপূর্ব্ব সাব-এজেন্ট তহবিল তছরূপের অপরাধে চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। এটনার অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ।

১২ই আষাঢ় —

নরসিংপুরে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন নিষিদ্ধ, নাগপুর গমনেও গ্রেপ্তারের ভয় প্রদর্শন। ওয়ার্দ্ধায় তামিল নাড়ুর বরদাচারী, সুব্রহ্মণ্যম প্রভৃতির কারাদণ্ড। চৌরীচৌরার ১৯ জন ফাঁসীর আসামীর জন্য বড় লাটের নিকট প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা বিফল। বোম্বাই হাইকোর্টে বিচারপতি কাজীজী এলাহেশ সাহেবের ব্যাপারে ইম্পিরীয়ালের [illegible] বহাল রাখিলেন। লাহোর মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারের আশ্বাস, পদত্যাগীদের পুনরায় যোগদানের অনুরোধ। [illegible] একখানি জাহাজের বৃটিশ পতাকা অবনমিত ও পদাঘাতে অবমানিত। পিকিনে ভূতপূর্ব্ব চীন সম্রাটের প্রাসাদ ভস্মীভূত। আষ্ট্রেলিয়ায় দুই জন আইরিশ রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইলেও তাঁহাদের প্রতি দেশান্তরে প্রেরণের আদেশ।

১৩ই আষাঢ় —

বহরমপুর জেলে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বিশেষ স্বাস্থ্য-হানির সংবাদ; কাজী নজরুল ইসলামও অসুস্থ। রোটকে আর্য্য-সমাজের নগর-কীর্ত্তনে বাধা প্রদানের সংবাদ। রাজমহেন্দ্রীতে পতাকা মিছিলে

পুলিসের বাধা। সালেম মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শ্রীযুত দাশের সংবর্দ্ধনা দাশ-রাজা গোপালাচারীর মিলন। প্রবন্ধক কমিটীর কর্ম্ম-কর্ত্তা সর্দ্দার দলীপ সিং গ্রেপ্তার। বহু বায়স্কোপ ও থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী পার্শী ধনকুবের জে এফ ম্যাডান মহাশয়ের লোকান্তর। বরোদা রাজ্যে বিবাহ রেজেষ্টারী ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হইল। যুক্তপ্রদেশে তরাই অঞ্চলে ৪৫০০ মাইল লম্বা খাল খননের কাষ আরম্ভ, মোট ব্যয় হইবে ৮০ কোটি টাকা। চুণার হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলিকাতার ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটীর শ্রীমান অম্বুজাক্ষ দত্ত ও বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। কলিকাতায় লীগ (ফুটবল) খেলার শেষ, ক্যালকাটা প্রথম, মোহন বাগান চতুর্থ স্থান পাইয়াছে। মূলাজোড় গ্রামে ভারতচন্দ্র স্মৃতি-মন্দির ও পুস্তকাগারের ভিত্তি-স্থাপন।

১৪ই আষাঢ় —

লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটী লাট-বেলাটের আগমনে অভিনন্দন দিবেন না এবং 'এম্পায়ার ডে'র পরিবর্ত্তে তিলক মহারাজ ও মহাত্মার জন্মদিনে ছুটী দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। টিকেন্দ্রনীর শ্রীযুত এস আর লক্ষণ আয়ারের কলম্বো অবতরণে বাধা; তিনি সিংহল হইতে বিতাড়িত, সিংহল পুলিস তাঁহার ব্যাগ খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি কংগ্রেস পুস্তিকা পাইয়াছিল। চম্পারণে কতকগুলি কারখানায় আবার অনাচারের অভিযোগ। বাঙ্গালার জেল রিপোর্টে প্রকাশ, অসহযোগের জন্য জেলের খরচ ৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় রেসিপ্রসিটি বিল অর্থাৎ উপনিবেশিকরা ভারতীয়দের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, ভারতে তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারের আইন করিবার নোটিশ। হুগলী, বালি নিবাসী শ্রীযুত তুলসীচরণ শেঠ কর্ত্তৃক স্থানীয় সদ্গোপজাতীয়া ২৭ বৎসর বয়স্কা এক বিধবার পাণি-গ্রহণের সংবাদ। বিবাহটি বাকি সবর্ণের নহে। মোরাদাবাদ জেলার মিলাক গ্রামে ডাকাত ভ্রমে পুলিসকে মারপিট করার আসামীরা হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইল। রুর পর্য্যন্ত রূঢ় অধিকারের জন্য ফ্রান্সকে ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মঞ্জুর করিতে হইল, ফরাসী সেনা কর্ত্তৃক লিম্বার্গ অধিকার, রেলপথ নষ্ট করার জন্য সাত জন জার্ম্মাণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। বৃটিশ সোভিয়েটের নূতন চুক্তিতে বৃটেনের বিরুদ্ধ আন্দোলনে বাধা।

১৫ই আষাঢ় —

ওয়ার্দ্ধায় নাগপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুত শেঠ চিরঞ্জীলালের কতকগুলি জিনিষপত্র নীলামে চড়াইয়া জরিমানা আদায়, কাযেই দণ্ডভোগ শেষ হইবার কয় দিন পূর্ব্বে তাঁহার মুক্তি। কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় বোম্বায়ের আপোষ ব্যবস্থাই গৃহীত, চেয়ারম্যানের কাযে তদন্তের জন্য কমিটী গঠন। পরিদর্শন শেষ করিয়া শ্রীযুত দাশ মাদ্রাজে ফিরিলেন। লাট-বেলাট ছাড়া যুক্ত-প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটীগুলিকে অন্য কাহাকেও অভিনন্দন দেওয়ায় সরকারের বাধায়, এলাহাবাদের প্রতিবাদ। খড়িবাড়ীয় পুলিস অনাচার সম্বন্ধে তদন্তে পণ্ডিত শ্যামবাণ কুঞ্জরু প্রভৃতির বিষম অভিযোগ। টাঙ্গাইল, নাগরপুরের শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চৌধুরী স্বগ্রামে নিজ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আবার ৫০ হাজার টাকা দান করিলেন; প্রতিষ্ঠায় জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। নোয়াখালীর বধূহত্যার মামলায় রায়, আসামীদের অব্যাহতি। টাটা ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মিলনের চেষ্টা। বরিশাল, মেহেন্দীগঞ্জ থানায় দুই বিবি নামে এক মুসলমান স্ত্রীলোক তাহার সতীত্ব-হরণের চেষ্টাকারীকে দা দিয়া আহত করিয়াছে, আঘাতের চিহ্নে আসামী গ্রেপ্তার। ঝাড়গ্রামে সাঁওতাল হাঙ্গামার সময় গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়া উৎকোচ আদায়ের চেষ্টায় অভিযুক্ত দফাদার যতীন্দ্রনাথ পানীর মামলা স্থানান্তরিত করিবার আবেদন অগ্রাহ্য; আবেদনে স্থানীয় পরন্তু রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগের সংস্কার চেষ্টা।

১৬ই আষাঢ়—

গুজরাটের ৫৬ জন সত্যাগ্রহী ও তাঁহাদের নেতা ডাঃ চতুলাল নাগপুরের পথে আম্বালী রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কেলকার কারাগারে শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মাদ্রাজ শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব আইন সদস্য সার শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের পরলোক। হাওড়া টাউন হলে সাহিত্য সম্মেলন, প্রধান সভাপতি কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-শাখার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুণায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যজীর সভাপতিত্বে এক হিন্দু সভায় বৈষ্ণ নামক এক খৃষ্টানকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। ময়মনসিং, জামালপুরের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক গ্রাম্য সভাদের কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা এবং ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেড় হাজার টাকা বরাদ্দ করিলেন। ডুইসবার্গে বেলজীয় সৈন্যের ট্রেণে বোমা ফাটায় রাইন প্রদেশের আন্তর্জাতিক কমিশন কর্ত্তৃক তীব্র দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন।

১৭ই আষাঢ় —

কানপুরের কংগ্রেস কর্ম্মী পণ্ডিত জগদম্বাপ্রসাদ রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। রেঙ্গুন মেলের সম্পাদক শ্রীযুত এস সদানন্দও রাজদ্রোহে ধৃত। চেয়ারম্যানের কাযে সরকারী ইস্তাহার; অধিকাংশ অভিযোগে অবিশ্বাস। রায়বেরিলী জেলে দুই জন কংগ্রেস কর্ম্মীর প্রতি বেত্রাঘাত, প্রতিবাদে অন্যান্য রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রায়োপবেশন। কলিকাতা শ্যামনগর খেলাফৎ আফিসে পুলিস কর্ত্তৃক কয়জন স্বেচ্ছাসেবক ও সম্পাদক গ্রেপ্তার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চৌকীদারী বিলে সরকারের পরাজয়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সরকারী বিল প্রত্যাহৃত হওয়ায় বে-সরকারী বিল দুইটিও প্রত্যাহৃত। বেশ্যাবৃত্তি নিবারক আইন কমিটীর হস্তে অর্পিত, প্রেসিডেন্সিতে প্রকাশ, সরকার নূতন এক স্কুল শিক্ষা আইন প্রস্তুত করিয়াছেন। কটক জেলায় শঙ্করপুর গ্রামে ডাকাতিতে ২০ হাজার টাকা লুণ্ঠন। নায়কের শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ষ্টেটস্ম্যানের শ্রীযুত প্রিয়নাথ গুহ প্রভৃতির মানহানির মামলায় বাদী শ্রীযুত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের অভিযোগ প্রত্যাহার। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত লালা লাজপৎ রায়ের মুক্তি-প্রদানের প্রস্তাবে লালাজীর নিকট হইতে সেরূপ দরখাস্ত না পাওয়ার অজুহাত প্রদর্শন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বায় হ্রাসে অনেক আবশ্যক কার্য্য বাধা। লবণ-শুল্কের প্রতিবাদে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় সেই সংক্রান্ত সরকারী বিল নাকচ। ফিরোজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রতিনিধি গ্রহণের নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদে হিন্দু সদস্যদের পদত্যাগ। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নেপালে জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্রের নূতন সংবাদ। জার্ম্মাণীতে ৪০ জন বোম্বায়ের ছাত্রের শিক্ষালাভের জন্য গমন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে লরেন্স মূর্ত্তি সমস্যা; ভারত সরকার ভারত-সচিবের অনুমতি না লইয়া কিছু করিবেন না।

১৮ই আষাঢ় —

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সহকারী সভাপতি শ্রীযুত ললিতমোহন দাসের বোম্বাই সিদ্ধান্ত-সমস্যার জন্য পদত্যাগের সঙ্কল্প; লালা বাবু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুত দাশ বেলোরের পথে বেঙ্কটগিরিতে অবতরণ না করায় তাঁহার ট্রেণের সম্মুখে জন-মণ্ডলীর শয়ন। লবণ-শুল্কের প্রতিবাদে লালা বিষম্ভরনাথের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ পরিত্যাগ। ১৯০৮ অব্দের ফৌজদারী সংস্কার আইনের সম্পূর্ণ তিরোভাব-প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত। গুজরাটের ৫৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত ডাঃ চতুলালেরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নূতন সরকারী ইস্তাহার; আলোচনা

অস্থায়িভাবে স্থগিত। বোম্বাই হাইকোর্টে এলায়েন্স ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত মামলায় ইম্পিরিয়ালের অংশীদার শ্রীযুত আলপাইওয়ালার আপীল অগ্রাহ্য।

১৯শে আষাঢ়—

গোল টেবিল ব্যাপারে পণ্ডিত মালবাজীর বিস্তৃত বিবরণ, মহাত্মা গন্ধী দায়ী নহেন। বোম্বায়ে দেওসানী গোরাবাস্কিকের পার্শ্বস্থিত ভাগপুর গ্রামবাসীর হরতালে সাফল্যের সংবাদ। বলশেভিক প্রচার সম্পর্কে কলিকাতায় শেরিফ লেনে ও ইমদাদ আলি লেনে খানাতল্লাস, এক জন গ্রেপ্তার। লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় কংগ্রেস ও খেলাফতের চেষ্টায় আপোষ। মিস্ এলিসের উদ্ধারকার্য্যে সহায়তা করায় মিসেস্ ষ্টার ও দুই জন ভারতীয় বড়লাটের নিকট পদক পুরস্কার পাইলেন। আসাম সরকার কর্তৃক জেলে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানের সঙ্কল্প। নিজাম বাহাদুর হায়দরাবাদে অনাথ আশ্রম ও শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে ২০ হাজার টাকা দান করিলেন। অমৃতসরের আঞ্জুমান ইসলামিয়া কর্তৃক পণ্ডিত মালব্য ও অন্যান্য নেতাদের হিন্দু-সংগঠনের বিরুদ্ধে দোষারোপ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কারাগারে বেত্রদণ্ড উঠাইয়া দিবার অনুকূল এক প্রস্তাব ভোটের জোরে গৃহীত; চরমনাইর কাণ্ডের আলোচনায় শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দত্তের তীব্র বক্তৃতা।

২০শে আষাঢ়—

যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার সেনের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের প্রত্যাহার। মধ্যপ্রদেশে, নরসিংপুরে শ্রীযুত শঙ্করলালজী প্রভৃতি নেতাদের মামলা, নেতাদিগকে হাতে হাতকড়ি দিয়া ও হাঁটাইয়া জেলখানা হইতে আদালতে লইয়া যাওয়া ও তথা হইতে জেলে আনা হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানের জাল নোটের মামলার বিচারের জন্য বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ। পার্লামেণ্টে ভারতের লবণ শুল্কের আলোচনা, বড়লাটের কার্য্যের সমর্থনে সহকারী ভারত-সচিব বলিয়াছেন, শুল্ক বৃদ্ধিতে দরিদ্রের কষ্ট হয় নাই। রুঢ়ে চণ্ডনীতি—প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক বিতাড়িত, অধিকৃত অঞ্চল প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত, মোটর গাড়ী চড়া বন্ধ, কয়েক স্থানে সামরিক আইন জারী, ছাড়পত্র ব্যতিরেকে রপ্তানী বন্ধ। ইংলণ্ডে অনেকগুলি ডকে ধর্ম্মঘট। জগলুল পাশা প্রমুখ সামরিক আইন অনুসারে দণ্ডিত ২০০ জন মিশর নেতাকে মুক্তি দিবার আশ্বাস। চীনে টাকার টানাটানিতে অর্থ সচিবের রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন।

২১শে আষাঢ়—

নিজাম রাজ্যে "দেশ সন্দেশ" নামে মারাঠী সংবাদপত্রের প্রবেশ বন্ধের সংবাদ। ভাগলপুর জেলে অসহযোগী কয়েদীদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের অভিযোগ। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত মালব্যজীকে কতকগুলি সর্ত্তে লালাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, এ জন্য পণ্ডিতজী সাক্ষাৎ করেন নাই। নাদুবার তাড়ির দোকানে পিকেটিংয়ে দুইদলে ১৮ জন গ্রেপ্তার, পুলিস পাহারার ঘটা। বড়বাজার নেবুতলা লেনে শশিভূষণ দে অবৈতনিক বালক বিদ্যালয় ও রাজরাজেশ্বরী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণী সুপ্রভা দেবীর বিবাহ, লক্ষাধিক টাকার যৌতুক প্রদান। মুলতান মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনীয়ার রাস্তার ধূলা মারার উদ্দেশ্যে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তথায় তাহার পরীক্ষা হইতেছে। ওয়াজিরিস্থানে লেপ্টেনাণ্ট ওয়েবষ্টার গুপ্ত ঘাতকের গুলীতে নিহত। মরক্কোর পার্শ্ববর্ত্তী রিফ অঞ্চলের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় উহার কারণ নির্ণয়ের জন্য তদন্ত কমিটীর ব্যবস্থা। চৈনিক রেলে আবার দস্যুর উপদ্রব, চীনা পুলিসের শিক্ষার জন্য লণ্ডন হইতে একজন পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী প্রেরণের ব্যবস্থা। গ্রীস ও তুরস্কের অমীমাংসিত বিষয়গুলিতে আপোষ।

২২শে আষাঢ়—

আলিপুর মামলা সম্পর্কে দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত কণ্ঠভূষণ রায়ের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি। রেঙ্গুন মেলের সম্পাদকের রাজদ্রোহ অভিযোগে দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। নাগপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন। নাগপুরে ধরপাকড় উপলক্ষে সরকার নাগরিকদের সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিবাদ। মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক ডাঃ আন্সারীর অভিনন্দন ব্যবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আপত্তি। কলিকাতার ক্যাপিটাল পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মিঃ মার্শ টিম্যাণের দেহান্তর। নাইরোবীর মাসাই হাঙ্গামায় ৭ জনের প্রাণদণ্ড ও ৬ জনের দ্বীপান্তর। মেসোপটেমিয়ার প্রসিদ্ধ সিয়া নেতা সেখ মেহদী খালিসী, যাঁহাকে ইরাক হইতে দুই পুত্র সমেত নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, তাঁহাকে বোম্বায়ে আনা হইয়াছে, গন্তব্য স্থান অজ্ঞাত।

২৩শে আষাঢ়—

নাগপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটীর অধিবেশন, বোম্বায়ে কাউন্সিল-বর্জ্জনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার নিন্দাসূচক প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য; জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সাহায্য-প্রার্থনার প্রস্তাব গৃহীত, স্বরাজ্য দল প্রস্তাবে ভোট দেন নাই। কলিকাতার বড়বাজার কংগ্রেস হইতে আর ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে নাগপুরে প্রেরণ। কাণপুরের প্রতাপ পত্রের উদয়পুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ। শ্রীযুত দাশের সহিত একমত হইতে না পারায় বোম্বায়ের স্বরাজ্য পার্টির ১১ জন নেতার পদত্যাগ। নীলফামারীর ডোমর কংগ্রেস কমিটী পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করায় মাড়োয়ারী দল কর্ত্তৃক দোকান লুঠের চেষ্টার অভিযোগ, ফলে কংগ্রেসের সম্পাদক ও দুই জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। নাভার মহারাজার সপরিবারে রাজ্যত্যাগ। রুসিয়া, ইউক্রেন, হোয়াইট রুসিয়া, ট্রান্স-ককেশিয়া, আজারবেজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া—এই সাতটি সোভিয়েটের সন্ধি, সাম্রাজ্যসংক্রান্ত কার্য সকলের এক যোগে পরিচালন ব্যবস্থা।

২৪শে আষাঢ়—

হুগলী জেলে রাজনীতিক কয়েদীদের অভিযোগের প্রতীকার না হওয়ায় শ্রীযুত জনার্দ্দন খাসনেলের প্রায়োপবেশন। লাজপৎ পুণ্যাহে কলিকাতায় মীর্জ্জাপুর পার্কে সভা। রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা প্রদানে কাণপুরের পণ্ডিত শ্রীযুত জগদম্বাপ্রসাদের দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীতে প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলিকে বোম্বাই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করাইবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য; কাউন্সিল সমস্যায় বোম্বায়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসাইবার প্রস্তাব গৃহীত। মেদিনীপুরের শ্রীযুত শৈলজানন্দ সেন প্রভৃতির মামলা স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা হাইকোর্টে গ্রাহ্য। অপ্রকাশ ঘোষের অভিযোগে তাহার স্ত্রী চন্দননগরের সুশীলাবালাকে ভুলাইয়া আনা প্রভৃতির অভিযোগে ভোলানাথ মিত্রের ছয় মাস দশ দিন সশ্রম কারাদণ্ড। মানভূম জেলায় সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি জাতিদের সামাজিক উন্নতির চেষ্টা। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দ্বীপান্তরপ্রথা রদের প্রস্তাব, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সম্মতি লওয়া বাকী। জঙ্গী লাটের ঘোষণা, সামরিক বিভাগে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়-হ্রাস করা হইয়াছে। লসেনে তুরস্কের সহিত প্রাথমিক সন্ধি। সিয়া-নেতার নির্ব্বাসনে ইরাক-পরিত্যাগী সিয়া উলেমাদের পারস্যে সাদর অভ্যর্থনা। লণ্ডনে অভূতপূর্ব্ব ঝড় বৃষ্টি, তিন হাজার তার ছিঁড়িয়াছে।

২৫শে আষাঢ়—

নাগপুরে অবৈধ জনতা করার ও তাহাতে সাহায্য করার অভিযোগে শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজ, মহাত্মা ভগবান দীন, দেশমুখ ও আবেদ আলির দণ্ড, তিন দিনের অপরাধের জন্য ছয় মাস হিসাবে আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে প্রত্যেক দিনের জন্য হাজার.

পাঁচ শত, পঁচিশ ও পঞ্চাশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড; দেশমুখ সত্যাগ্রহের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা ও আবেদালি সম্পাদক ছিলেন। নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শ্রীযুত দাশের অভিনন্দন। জোড়হাটের ডেপুটী কমিশনার স্থানীয় অসহযোগী ও অসহযোগের প্রতি সহানুভূতিকারকদের নামের তালিকা জোগাড় করিতেছেন। বোম্বাইয়ের আপোষ ব্যবস্থার বিরোধী প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলির কার্য্যে ওয়ার্কিং কমিটীর নিন্দাসূচক প্রস্তাব নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীতে গৃহীত না হওয়ায় প্রধান কমিটীর কয়জনের পদত্যাগ; কমিটীতে কিন্তু আপোষ ব্যবস্থার সমর্থন এবং বিরোধীদের নিন্দা ও কার্য্য স্থগিতের প্রস্তাবও পরে গৃহীত হয়, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর পক্ষ ভোট দেন নাই। এলাহাবাদের মিউনিসিপাল সভার কর্ম্মচারীদিগকে খদ্দর পরিবার অনুরোধ-প্রস্তাব গৃহীত। শ্রীমতিলাল মান্না চৌধুরী নামে এক জন নৌকার মাঝী কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট হইলেন। শ্রীযুত বাজাজ প্রভৃতি নেতাদের কঠোরতম কারাদণ্ডে নাগপুর হরতাল। হাঁসপাতালে বাহিরের লোকেদের নিকট আর ঔষধের জন্য কিছু লওয়া হইবে না বলিয়া ইস্তাহার। মধ্যপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার বিপিনকৃষ্ণ বসু তথায় বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার জন্য বার্ষিক ছয় শত টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিলেন। শান্তিপুরের শ্রীযুত অটলবিহারী মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সর্ব্বস্ব—১৬১ হাজার টাকার সম্পত্তি শিল্পশিক্ষার উন্নতিকল্পে দান করিলেন। বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রয়োগ ব্যবস্থা লুপ্ত করার প্রস্তাব সভায় ভোটাধিক্যে গৃহীত। ফরাসী ও বেলজীয়দের-দাবী অনুসারে রূঢ়ে অত্যাচারমূলক প্রতিকূলতায় জার্ম্মাণ সরকারের বাধাদানের প্রতিশ্রুতি।

২৬শে আষাঢ় —

সরকার কর্ত্তৃক উটক্রেরি জনশক্তি বয়কট হওয়ার সংবাদ। নাগপুরে ৫ দলে ১৭ জন গ্রেপ্তার; তন্মধ্যে কলিকাতার ৫ জন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় লালা লাজপৎ রায়, আলি ভাই, মহাত্মা গন্ধী প্রভৃতির মুক্তিপ্রার্থনার প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য। এণ্টালী থানার দুর্ঘটনার জন্য কলিকাতার অন্যান্য পুরাতন বাড়ীর সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটীর সাবধানতা। এবার ১৩৮৪৩ ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায়, ১৯০৯ আই এ, ১৯২৪ আই এস সি ও ৪১৯ ছাত্র বি এস সি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধ উপস্থাপিত সার সুরেন্দ্রনাথের মানহানির মামলার আপোষ নিষ্পত্তি। মাণিকতলা ষ্ট্রীট গুণ্ডা কর্ত্তৃক মোটরগাড়ী আক্রমণ, ছোরার আঘাতে এক জন নিহত ও দুই জন আহত। এলাহাবাদ হাইকোর্টে মুসলমান পরিবারের অপূর্ব্ব মামলা, স্বামীর ক্ষমতা প্রদর্শনের সময়প্রাপ্তি। হরিপাল-নিবাসী তারকদাস ঘোষ বি এ ফুটবল খেলিতে গিয়া আঘাত লাগায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইরাক হইতে উলেমা কয়জনের তিহারাণ গমনে তথায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প। প্যালেষ্টাইনে বৃটিশের উপর অত্যাচার, মোটর উল্টাইয়া দিয়া গুলীবর্ষণ।

২৭শে আষাঢ় —

শ্রীযুত শেঠ যমুনালালের কারাদণ্ডে অমরাবতীতে হরতাল। মাদ্রাজের উদিপি অঞ্চলে বন্যায় তিন হাজার গৃহ ভাসিয়াছে। বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা জুন পর্য্যন্ত ৬০টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সিভিল সার্ভিসের বেতন-বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব সভায় আলোচনার দাবী। আকালী ও নামধারী দলের সংঘর্ষে ত্রিশ জন আহত। ডাঃ মিস্ কিংসলী রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রথম মহিলা কমিশনার হইলেন। লাটপ্রাসাদে গবর্ণর কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় আইন-সমস্যার সমাধান; সম্মিলিত কনফারেন্সের প্রস্তাব। জাতি-সংঘের অধীন টাঙ্গানিকা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের অভিযোগে সংঘে ভারত সরকারের অর্থসাহায্য সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা। তিহারাণে পাকা সেণ্ডিকেট সচিব নিযুক্ত। লণ্ডনে ডক দুর্ঘটে এক জাহাজ জলমগ্ন নষ্ট। সিঙ্গাপুরে বৃটিশ নৌ-বন্দরের আড্ডার জন্য জমী-জমা ক্রয় ও বৃটিশকে অর্পণ।

২৮শে আষাঢ়—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পদত্যাগ নামঞ্জুর। চরমানাইর কাণ্ডে শ্রীযুত প্রতাপ গুহরায় গ্রেপ্তার। কলিকাতা জোড়াসাঁকো থানার দুই জন কনেষ্টবল বালিকা-হরণের অপরাধে দণ্ডিত। কুমারী সুজাতা বসু লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাশাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পি এণ্ড ও কোম্পানীর বার্ষিক সভায় লর্ড ইঞ্চকেপের উক্তি—বৃটেনের এই অধীন রাজ্য (ভারতবর্ষ) সম্বন্ধে ভয়ের কারণ নাই।

২৯শে আষাঢ়—

বোম্বায়ের দৈনিক খেলাফতের সম্পাদককে রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য জামীন মুচলেকা প্রদানের আদেশ। শ্রীযুত বাজাজ জেলে বিশিষ্ট ব্যবহার গ্রহণে নারাজ। বাঙ্গালা হইতে নাগপুরে ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ। মান্দ্রাজ পিকেটিংয়ের আসামীদিগকে জেলখানায় লইয়া যাইবার সময় কতিপয় দর্শক পুলিসের সঙ্গীনের খোঁচায় জখম। দার্জ্জিলিঙ্গে ছয় জন গোরা সৈন্যের গুণ্ডামীর জন্য শাস্তি। আরাকানের সন্নিহিত রামরী দ্বীপে বন্যায় ৪৫ হাজার টাকা ক্ষতি, অনেক গরু মহিষ মারা গিয়াছে। আকালী-নামধারী হাঙ্গামার ফলে তরণ-তারণে গ্রেপ্তারের ধূম। কচুরী পানা ধ্বংসে সরকারী কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ। চীনে আমীরের হিন্দু প্রতিনিধি মহেন্দ্রপ্রতাপ, তিনি দুই দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

৩০শে আষাঢ় —

নাটাল ও কেনিয়ার ব্যাপারে বোম্বায়ের মডারেট সভা—ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এসোসিয়েসনের প্রতীকারের দাবী, নতুবা সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সহযোগ বন্ধ করার সঙ্কল্প। চরমানাইরে কংগ্রেস তদন্ত কমিটীর উপস্থিতি। কলেজ ষ্ট্রীট ঘোষ এণ্ড দাসের দোকানে ডাকাতির চেষ্টায় দরোয়ান খুন। অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ অম্বিকাচরণ উকীল মহাশয়ের লোকান্তর। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ হইতে তিন জন যুবক উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের জন্য জার্ম্মাণীতে প্রেরিত। শ্রীহট্ট, নবীগঞ্জে রথযাত্রায় পুলিসের অনাচারে দোকান-পাট বন্ধ। রেঙ্গুনে বাঙ্গালার রথযাত্রা। মিশরের তীর্থযাত্রীদের সহিত চিকিৎসক-সঙ্ঘ প্রেরণে বাধায় মিশর ও হেজের বিবাদ।

৩১শে আষাঢ়—

কৃষ্ণনগর জেলে অখাদ্য কুখাদ্য সরবরাহের অভিযোগ, জেল পরিদর্শনে নদীয়ার মহারাজার অপূর্ব্ব আবিষ্কার। রাজদ্রোহ প্রচারে গোরক্ষপুরের স্বদেশ সম্পাদকের এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ড। নাগপুরে রেল ষ্টেশনে অজানা স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত বাঙ্গালার কয় জনও গ্রেপ্তার। নাভা ব্যাপারে শিখ-সমাজে চাঞ্চল্য, আকালীতে-পরদেশী পত্র ডাকযোগে প্রেরণ ও উক্ত পত্রের অফিসে চিঠি-পত্র বিলি বন্ধ। মেদিনীপুরে জলের কলের পাইপ খারাপ থাকায় সহরবাসীর ৪ লক্ষ টাকা নষ্ট হইবার আশঙ্কা। কলিকাতার মিউনিসিপাল বোর্ডের মামলায় মিঃ ওয়াইটের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহৃত। বরিশালে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন। রামবাগানের খুনের সম্পর্কে ২০ জন গ্রেপ্তার। অমৃতসরে শিখদের কর সেবার শেষ উৎসব। জাণ্ডনোটে ২৫০ টাকার অধিক হইলে দুই আনা টিকিট লাগার ব্যবস্থা, নূতন আইন পাশ। যুদ্ধ স্থগিতের পর হইতে কনষ্টান্টিনোপলে আড্ডা রাখিতে বৃটিশের ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। অধিকৃত জার্ম্মাণীতে প্রবেশ নিষেধের আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি; বোমা ফাটার জন্য বোচাম অবরুদ্ধ, রুপের কারখানাতেও ফরাসীদের অধিকার বৃদ্ধি।

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন-যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূর্য্যমুখী

শিল্পী—মজুমদার

২য় বর্ষ } ১ম ✽ ভাদ্র, ১৩৩০ ✽ খণ্ড { ৫ম সংখ্যা

খদ্দর পরিব কেন ?

প্রতি পক্ষী পুণ্যাহে আমরা যুগাবতার মহাত্মার নাম স্মরণ করি। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার সত্যের জন্য জীবন-উৎসর্গের কথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। মহাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত আর এক জন কর্ম্মী, যিনি অতুল বিভব ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন—সেই যমুনালাল বাজাজের কথাও মনে পড়ে। বিলাসের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াও ক্রোরপতি বাজাজ, জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বেচ্ছায় কারাদণ্ডকেই প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কথাও এই দিনে স্বতঃই মনে উদিত হয়। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবে তিনি অবিচলিত চিত্তে সাধারণ কয়েদীর ব্যবস্থা পাইতেই চাহিয়াছেন।—এই সমস্ত ত্যাগ ও নিষ্ঠার স্মৃতি জাতির অমূল্য সম্পদ—উন্নতির জয়যাত্রায় মূল্যবান্ সঞ্চয়।

আজ বিদেশী আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। বাস্তবিক, এ কলঙ্কের কথা স্মরণ করিলে মস্তক লজ্জায় অবনত হয়। যে দেশের বস্ত্র-শিল্প অতি প্রাচীনকালেও পৃথিবীর গৌরব ছিল, সে দেশের পক্ষে ইহা কি পরিতাপের কথা! রোমের সম্রাটগণ ঢাকার মসলিন ব্যবহার করিতেন এবং প্রাচীনকালেও ইহার গৌরব বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এই অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম শিল্পের ধ্বংস ত হইয়াছেই, অধিকন্তু এখন বিদেশী আসিয়া আমাদের বস্ত্র না জোগাইলে আমাদিগকে দিগম্বর হইতে হয়।
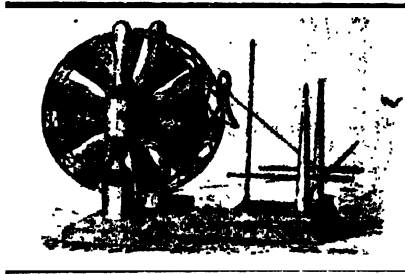
কলিকাতার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। যদি বৌবাজার হইতে হেদোর মোড় অবধি লোকের চলাচল লক্ষ্য করা যায়, তবে সহস্রে এক জনেরও পরিধানে পূর্ণমাত্রায় খদ্দর আছে কি না সন্দেহ হয়। বাঙ্গালীর গত বৎসরের খদ্দরের উৎসাহ আজ কোথায়? খড়ের আগুনের মত সে উৎসাহ কি একবার প্রজ্বলিত হইয়াই নিবিয়া গিয়াছে? গত বৎসর কি বিলাতী কাপড়ের দর চড়া ছিল বলিয়া আমরা খদ্দর পরিয়াছি? তাহা হইলে, আমাদের দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছে কোথায়? আন্দোলনের দ্বারা হুজুগ সৃষ্টি করিয়া জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হয় না। দেশের

মহাত্মা গন্ধী।

সস্তা। বিলাতী কাপড় যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে ধোপা-বাড়ী, ডাইং ক্লিনিং প্রভৃতিতে কাপড় দিতে হয়। ধোপা কাপড়ের কি সর্ব্বনাশ করে, তাহা সকলেই জানেন। সোডা, ক্ষার প্রভৃতি অনিষ্টকারী তীব্র ক্ষারদ্রব্যের দ্বারা, পরিষ্কার করিবার শ্রম ইহারা লাঘব করিয়া থাকে। আর যে ভাবে পাটের উপর নির্দ্দয়ভাবে আছড়াইয়া কাপড় পরিষ্কার করা হইয়া থাকে তাহা Mark Twain লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"breaking a stone with a piece of muslin cloth" খদ্দর যাঁহারা পরেন, তাঁহারা খদ্দরের আদর্শও গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাবলম্বনই খদ্দরের মূল কথা। নিজের কাপড় নিজে সাবানে কাচিয়া লওয়া বিশেষ কষ্টকর নহে, আমরা অনেকেই তাহা করিয়া থাকি। ফলে কাপড় তিন গুণ টেকে।

আমরা একেবারে অধঃপতিত হইয়াছি। আমাদের সহরের বিলাসিতা পল্লীগ্রামেও সংক্রমিত হইয়াছে। বিজাতীয় সভ্যতার কৃত্রিম উত্তেজনার দ্বারা আমরা আমাদের অবসাদ দূর করিতে শিখিয়াছি। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবার দৃঢ়তা আর আমাদের নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার আমি নিন্দা করি না। কিন্তু বিকৃত সভ্যতা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখিয়াও কি আমরা তাহার প্রশংসা করিব? আমি বিলাতে ৪ বার গিয়াছি এবং প্রায় ৮ বৎসর বিলাতে বাস করিয়াছি। প্রকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার আমি বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু এই বিকৃতি ও ব্যভিচার, ইহাই যে আমাদের চরম আদর্শ হইয়া উঠিতেছে! বিলাতে যাইয়া জজ, ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে আসিয়া গৌরাঙ্গটোলায় বাড়ী করা এবং

মনের স্তরে স্তরে যদি ওতপ্রোতঃ ভাবে দেশের কল্যাণ এবং শ্রেয়ের আদর্শ স্থান লাভ না করে, তবে বৃথা কোলাহল করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনার সৃষ্টিতে কোন লাভ নাই। আমি বিশ্বাস করি, খদ্দর লোপ পাইবার নহে। যিনি খদ্দরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া একবার ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, কুলের কাঠের আগুনের মত তাঁহার মনে ইহার প্রতি ভালবাসা জ্বলিয়া থাকিবেই।

বিলাতী কাপড়ের তুলনায় খদ্দরের দাম বেশী। তাই বলিয়া অনেকে খদ্দর কিনিতে চাহেন না। যাঁহারা খদ্দর ব্যবহার করেন, তাঁহারা জানেন,—বাস্তবিকপক্ষে খদ্দরই

খানসামা-বাবুর্চ্চি-পরিবৃত হইয়া মানবজীবনের চরম সুখ ও সৌভাগ্য ভোগ করাই যদি আদর্শ হয়, তবে দেশের যে কি ভীষণ মানসিক অধঃপতন হইয়াছে, ভাবিয়া মন বিষণ্ণ হয়

খদ্দর পরিধান কি? খদ্দর জীবনের আবিলতাশূন্য সহজ গতির মূর্ত্ত প্রকাশ; বিলাসিতাবর্জ্জিত মনের সরল ও সহজ গতির মুক্ত পথ।

অনেকে বলেন, খদ্দর বড় গরম। গরমের দিনে হয় ত একটু গরম। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনেও কি প্যাণ্ট, কোট, কলার, টাই প্রভৃতি ধড়াচূড়া পরিতে আমরা কিছু কসুর করি? চাকরী বজায় রাখিতে সে গরম যদি সহ্য করিতে পারি, তবে দেশমাতৃকার সেবার জন্য এই সামান্য কষ্টটুকু কেন স্বীকার করিতে পারিব না? পূজার পর যখন উত্তরের হাওয়া বহে, পৌষমাসে যখন কনকনে শীত পড়ে, তখন যে শুধু খদ্দরের একটি জামা, চাদর ও কাপড় হইলেই চলিয়া যায়; flannel, পশম, র্যাপার ইত্যাদির বাহুল্যের কোন প্রয়োজনই হয় না।

যমুনালাল বাজাজ।

খদ্দর পরার অর্থ শুধু খদ্দর পরিধান করা নহে। যে পরিবারে খদ্দর ঢুকিয়াছে, সে পরিবারে এক নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে। খদ্দর মানসিক পরিবর্ত্তন আনে। খদ্দরের বর্ম্মের কাছে বিলাসিতার লেশমাত্র ঘেঁসিতে পারে না। যে খদ্দর পরে, তাহার সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতিতে অযথা অর্থব্যয় হয় না; বিলাসব্যসনের প্রবৃত্তি চলিয়া যায়; সুগন্ধী তৈল ও সাবান দরকার হয় না।

ইংরাজের কাছে আমাদের জানিবার ও শিখিবার অসংখ্য জিনিষ আছে। তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞান বাদ দিলেও তাহাদের সাহস, অধ্যবসায়, পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি আমাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। কিন্তু বাহিরের চাকচিক্যই আমাদের ক্ষীণদৃষ্টি নয়নকে আকৃষ্ট করে। তাহারই অন্ধ অনুকরণ করিয়া সভ্যতার বিকৃতিকেই আমরা সভ্যতা বলিয়া ধরি। তাই আমরাও "সাহেবদের" মত উড়ে বেহারাকে মানুষের অধম গণ্য করি, আচারে ব্যবহারে বিজাতীয় ভাবের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। খদ্দর সাম্য ও মৈত্রীর নিদর্শন। দেশের জনসাধারণের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইবার উপায় খদ্দর। খদ্দর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একপ্রাণতা আনিয়া মহামিলনের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

খদ্দরের আপাততঃ দাম বেশী। আপাততঃ আমাদিগকে Patriotismএর (স্বদেশপ্রেম) উপর নির্ভর করিয়া খদ্দর চালাইতে হইবে। সব দেশেই লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারকে অর্থ-সাহায্য (Subsidy) দিতে হইয়াছে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা ইহা আশা করিতে পারি না। কাযেই এই ভার আমাদিগকেই লইতে হইবে। এই সামান্য ত্যাগস্বীকার করিতে যদি আমরা দ্বিধাবোধ করি, তবে মহাত্মা গন্ধীপ্রমুখ ত্যাগী কর্ম্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কেবল মৌখিক। সামান্য

ত্যাগস্বীকার করিয়া তাঁহাদের বিরাট ত্যাগের মর্য্যাদা আমরা কি রক্ষা করিব না? বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৯৫ জন পল্লীবাসী। সহরে আর কয়জন বাস করে? সহরের অধিবাসীদের হয় ত জীবিকা উপার্জ্জনের সংগ্রামে সময়ের অভাব। তাঁহাদের হয় ত নিজেদের প্রয়োজনের খদ্দর প্রস্তুত করিবার সময় নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই ত পল্লীবাসী। খদ্দর প্রস্তুত করিতে যদি অধিক দামই লাগে, তাহা হইলেও তাহা ত গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেই এই অর্থ বিভক্ত হইয়া গ্রামকে সমৃদ্ধিশালী করিবে। গ্রামের তাঁতি ও কাটুনী, ছুতোর প্রভৃতিই এই অর্থে উপকৃত হইবে। খদ্দরে যদি ৪৲ টাকা পড়ে এবং বিলাতী কাপড় যদি ২৲ টাকায় হয়, খদ্দরের জন্য অধিক অর্থব্যয়ে আমারই গ্রামবাসী উপকৃত হইবে। আর বিলাতী কাপড়ের ২৲ টাকা ত দেশ হইতে চিরকালের জন্যই চলিয়া যায়। আমরা আজ Industry, Technology, লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক কথাই বলি। কিন্তু এই যে প্রতি বৎসর কেবল বাঙ্গালা দেশ হইতেই কাপড়ের জন্য ৬০ কোটি টাকা বিদেশে যাইতেছে, ইহা রোধ করিতে চেষ্টা করি কোথায়? খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় এবং এখন উত্তরবঙ্গের বন্যার পরে আমরা চরকার প্রচলন এবং তাঁতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছি। ইন্দ্রনারায়ণ সেন ও দুর্গানারায়ণ সেন প্রমুখ কর্ম্মিগণ নিজের সমস্ত সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া অক্লান্তভাবে ইহার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে ধান ভাঙ্গা ও চরকার দ্বারা দরিদ্রের উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য আমরা সাহায্য করিতেছি। এখন তুলার দাম বেশী। বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমাদিগকে তুলা আনিতে হইতেছে। ৭৫৲ টাকা তুলার দর। কাযেই এখন সূতা করিতে খরচ পড়ে বেশী। কিন্তু আমরা আশা করি, অচিরেই আমরা নিজেদের তুলা উৎপন্ন করিয়া এই খরচ কমাইতে পারিব। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের এ হাল ছিল না। তখন ঘরে ঘরেই তুলা ফলিত, চরকা ঘুরিত; পাড়ায় পাড়ায় তাঁত চলিত। আজও আমাদের দেশে—গ্রামে চরকা সম্বন্ধে কত প্রবাদ আছে। গৃহস্থবাড়ীর আদর্শ ছিল, ধানভাঙ্গা, রান্না ও গৃহস্থালী এবং অবসর-সময়ে চরকা কাটা। কিন্তু আজকাল শুনি, সময় কোথায়? আজকাল আষাঢ়ান্ত বেলা, ৫।০টায় সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত ৭টায়। দিনমান প্রায় ১৪ ঘণ্টা সময়। আবালবৃদ্ধবনিতা এই সময় কি করিয়া কাটাইয়া থাকেন? আর আমাদের কৃষকশ্রেণী? আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র- প্রায় আড়াই মাস বীজ লাগান, ক্ষেতের কায প্রভৃতি করে। কিন্তু তাহার পর আর নড়িবে না! ধান কাটা আর নিজেরা করিবে না! পশ্চিম হইতে শ্রমজীবী আসিয়া তাহাদের ধান কাটিয়া দিবে! বৎসরের বাকী ৮।৯ মাস ইহারা কি ভাবে যাপন করে? শ্রমবিমুখতাই আমাদের জাতির অধঃপতনের মূল কারণ। কোন জাতিই ফাঁকি দিয়া বড় হইতে পারে নাই। প্রত্যেক দেশের সমৃদ্ধিরই অন্তরালে সে দেশের জনসাধারণের প্রাণপাত পরিশ্রম রহিয়াছে। আর আমাদের দেশের ভদ্রসাধারণ? সমস্ত দেশের অনুপাতে কলিকাতায় আর কয় জন উপার্জ্জন করিতে বাস করেন? কলিকাতা ত বিদেশীর। কলিকাতায় চৌদ্দ আনা ধন বিদেশী (অ-বাঙ্গালী) উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশের ধোপা, নাপিত, ছুতোর মিস্ত্রী—ইহারা কি এতই ধনী যে, ইহাদের আর স্ব স্ব ব্যবসা করিবার প্রয়োজন হয় না? বেণ্টিক ষ্ট্রীট অঞ্চল ত এখন চীনাদের দেশ। তেমনই নাপিত বাঙ্গালী পাওয়া যাইবে না, জুতা সেলাই করিবার জন্য খোট্টা মুচি ভিন্ন বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এক জন জুতা সেলাই করিয়া যাহা রোজগার করে, অনেক Graduate তাহা পারেন না। চাকর উড়িয়া বা খোট্টা। পাচকও তাহাই। বাঙ্গালী এই সমস্ত শ্রেণীর লোক কি করে? আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা আনিয়া দেয়। কাযেই জীবনের প্রতি-ক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতেছি। খদ্দরের প্রচলনে দেশের আত্মনির্ভরতার বৃদ্ধি হইবে; কর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্মেষণে জীবন-সংগ্রামের জন্য আমরা অধিকতর উপযোগী হইব।

আমরা আত্রাই অঞ্চলে চরকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি। ৭ হইতে ১৫ দিনেই যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়, তাহাতে এক জন যুবক প্রতিদিন প্রায় ৮ তোলা সূতা কাটিতে পারে। আমাদের দেশে বিধবাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। ইঁহারা যদি প্রতিদিন ৮ তোলা সূতা কাটিতে পারেন, তবে সংসারের কত উপকার হয়! ভদ্র-পরিবারের অবিবাহিতা কন্যারা আজকাল আর ১৬।১৭

বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় পাত্রস্থা হয় না। ৭ বৎসর বয়স হইতে ১৬ অবধি এই ৯ বৎসরকাল ইহারা সংসারের কোন্ প্রয়োজনে আইসে? গৃহস্থালীর অল্পস্বল্প সাহায্য হয় ত করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও অনেক সময় আরও কায করিবার সময় থাকে। প্রতিদিন চরকা কাটিয়া যদি ১ তোলা সূতাও প্রত্যেকে তৈয়ারী করে, তবে তাহা হইতে বৎসরে ৭ খানা কাপড় হইতে পারে। অধিক কাটিলে ১৪ খানা এবং ২১ খানা কাপড়েরও সূতা দিয়া ইহারা সংসারের সাহায্য করিতে পারে। একটি ছোট পরিবারে বৎসরে ২১ খানার বেশী কাপড়ের দরকার হয় না। বাড়ীতে একটি আইবুড়ো মেয়েই এই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারে। এইরূপ একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যায়, আমরা কত শক্তির অপব্যয় করি। একটু নিষ্ঠার সহিত এই শক্তিকে নিয়োজিত করিলে আমরা নিজেদের কত উপকার করিতে পারি। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে টাকায় ২ সের দুধও পাওয়া যায় না; আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য্যের সংস্থান হয় না। বাঙ্গালী আজ অর্থাভাবে যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই হীনবল। কিন্তু এই দারিদ্র্য কতকটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত। লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া রেল-পুলের আগে ধাওয়া করিয়া মাড়োয়ারীরা আজ ক্রোরপতি। শুধু উৎসাহ ও শ্রমপ্রবণতাই এই উন্নতির মূল। ভগ্ন দেহ ও মন লইয়া আজ আমরা ধ্বংসোন্মুখ। আর এক পুরুষ পরে হয় ত বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বই লোপ পাইয়া যাইবে। তাই আজ সময় থাকিতেই আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

খদ্দরের অনুষ্ঠানে গ্রামের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বস্ত্র-সমস্যার দায় হইতে অব্যাহতি দিবেন। প্রতি বৎসর শোণিত সম ৬০ কোটি টাকা বস্ত্রের জন্য দরিদ্র দেশের অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে ইহার নিবারণে প্রত্যেকে সাহায্য করিবেন। কলিকাতায় ঘর-ভাড়া, সেলামি, মিউনিসিপ্যাল টেক্স প্রভৃতি দিয়া খদ্দর বিক্রয় করিতে গেলে দাম বেশী পড়িবেই। এত খরচ চাপাইলে খদ্দর চলিতে পারে না। তবে আপাততঃ সহরবাসীদের নিকট হইতে আমরা এ ত্যাগ-স্বীকারটুকু আশা করি। এখন একটু বেশী দাম দিয়াও তাঁহাদিগকে খদ্দর কিনিতে হইবে। না হইলে ইহা দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না।

খদ্দরের প্রসার মা লক্ষ্মীদের উপর নির্ভর করে। চরকাকে গৃহদেবতার মত যদি নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা সেবা করেন, তবে আর স্বামি পুত্র পরিবার বস্ত্রের জন্য ভাবিতে হইবে না। দেশের এই সংগ্রামে ললনাগণকেই অগ্রসর হইতে হইবে। পরিবারের স্বাবলম্বন তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। দেশের অর্থনীতিক ও নানাবিধ মুক্তিসাধনের জন্য যে সমস্ত ত্যাগ শত কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ত্যাগ আমাদিগকে একাগ্রতা প্রদান করিয়া খদ্দর ও চরকার সেবায় নিযুক্ত করুক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

স্বামি-হীনা

আজি এ আঁধার রাতি, জীবনের চির-সাথী,
কোথা তুমি আজ?
আমারে একাকী ফেলে, কতদূরে চ'লে গেলে,
সাঙ্গ করি কায;
আমি আজও শত কাযে, রহিতু শতের মাঝে,
তুমি যে গো নাই!

হৃদয় তোমারি তরে, দিবানিশি হাহা করে,
কাঁদে সর্ব্বদাই।
দিন শেষ করি একা, আবার পাব তো দেখা?
মিলিব দুজনে?
"আবার মিলিব পরে" ব'লে যে গিয়েছ মোরে
থাকে যেন মনে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কাউখালি-আলোকগৃহ

কাউখালির আলোকগৃহ।

ভাগীরথীবক্ষে যাতায়াতকারী সমুদ্রযাত্রিগণ নিশ্চয়ই এই নদীর মোহানামুখে পশ্চিম কূলে অবস্থিত বহুদূর হইতে পরিদৃশ্যমান কাউখালির সমুচ্চ আলোকস্তম্ভটি দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে এই আলোকগৃহের আলোক-প্রজ্বালন স্থগিত হইয়াছে। জাহাজের যাতায়াতের পথের পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দে জর্জ হিরোণ (George Heron) (১) ও ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে টমাস্ বোরী (Thomas Bowrey) (২) কর্ত্তৃক প্রস্তুত হুগলী নদীর নৌপথের মানচিত্রগুলিতে কাউখালির অবস্থান প্রদর্শিত আছে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের নাবিকদিগের মানচিত্রে খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জলপ্রবাহের নাম কাউখালি নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) এই নদীর ক্ষীণ অবশেষ এখন কাউখালি খালরূপে বর্ত্তমান। (৪) ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রেণেল্ 'সাহেব' যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে কাউখালির নিকট দিয়া জাহাজের গতিপথ (Cockalee Passage) চিহ্নিত দেখা যায়। (১) কাউখালি খালের সান্নিধ্যে সামুদ্রিক বাঁধের পার্শ্বেই আলোকমঞ্চটি বিদ্যমান। স্থানটির নাম কাউখালি নহে—থানা বেড়িয়া। কাউখালি গ্রাম বহুপূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে। মিঃ বেলীর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সেটেলমেণ্ট বিবরণে দৃষ্ট হয় তিনি পুরাতন কাগজপত্রে কাউখালি নামক গ্রামের নাম পাইয়াছিলেন—কিন্তু উহার অবস্থান অনুসন্ধানে গ্রামটি সমুদ্রগত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। (২) প্রাগুক্ত মানচিত্রগুলিতে কাউখালির দক্ষিণে ককস্ নামক দ্বীপ দৃষ্ট হয়; উক্ত দ্বীপ এখন বর্ত্তমান নাই, অথবা কালক্রমে ইহা সাগরদ্বীপের অঙ্গ পুষ্ট করিয়া থাকিবে। ইহাকে কক্ আইল্যাণ্ড বা কক্ আইল্ও (Cock Island or Isle of Cock) (৩) বলিত। ইহার অবস্থান বর্ত্তমান ফুলডুবি বা মগরার দ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। ওয়ারেণ্ ও উডের মানচিত্রে কাউখালি-ককার্লিস্ আইল্যাণ্ড (Cockerles Id.) বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৪) বোরী কাউখালিকে ককালি
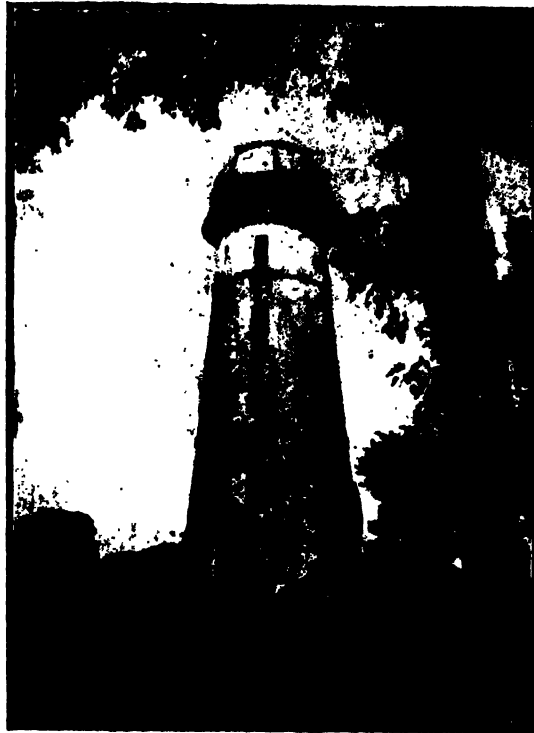
(১) Copy of the chart in the British Museum (Add. Mss. 5222.8.) vide Bowrey's *A Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal* Haktt. Society's edn.

(২) *Hedges' Diary, Vol. III.*

(৩) *Sailing Directions* of Warren and Wood.

(৪) "—these again were divided into two distinct islands by the river Cowcolly, of which the channel has now completely vanished."

C. R. Wilson's *Early Annals of the English in Bengal* Vol. I. P. 105.

(১) Rennell's Atlas,—Sheet No. XIX.

(২) H. V. Bayley's *Jellamoota Settlement Report*, P. 237.

(৩) Bowrey's *Countries round the Bay of Bengal*, P. 200, and foot-note.

(৪) *Hedges' Diary* Vol. III. P. CCVII.

(Cuckalee) এবং থরনটন ককালি (Cockaly) (১) করিয়াছেন। কক্‌স্ আইল্ বা কক্ আইল নামের সহিত ককালি, ককালিস বা কাউখালি নামের সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। কারণ, কক্‌স্ আইলের সোজাসুজি অদূরবর্ত্তী দেশভাগ ও নদীকে বুঝিবার জন্য নাবিকরা উহারই অনুকরণে ককালি বা কাউখালি নাম রাখিতে পারে। কাউখালিই ভাগীরথীর মোহানার কাছে অবস্থিত শেষ দেশভাগ। নাবিকগণের পক্ষে উহা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কাউ নামক এই দেশজ একপ্রকার বৃক্ষের নামের সহিত বর্ত্তমান খালের সম্বন্ধের জন্য কাউখালি নামের উৎপত্তি অনুমান করা যায় না। কারণ, কাউখালি নদী খালে পরিণত হইবার পূর্ব্বেও কাউখালি নামেই অভিহিত হইত। সুতরাং এককালীন সাগরদ্বীপের উত্তরপশ্চিমবর্ত্তী কক্‌স্ আইল্যাণ্ড নামের সাদৃশ্যে কাউখালি নাম হওয়াই সম্ভব। এই নাম যে তৎকালীন নাবিকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম হিজলী পর্য্যন্ত বড় জাহাজ আসিতে আরম্ভ করে। (২) ইহার পূর্ব্বে বালেশ্বর পর্য্যন্ত জাহাজ আসিতে পারিত; —কারণ, তখন এ দিকে জাহাজের গমনাগমনের পথ বা 'হাল' চিহ্নিত হইয়া Pilot's establishment বা চরবহুল নদীমুখে জাহাজপরিচালনকারী নাবিকসংঘ গঠিত হয় নাই। ছোট ছোট 'স্লুপ' (Sloop) নামক জাহাজে বালেশ্বর হইতে মালপত্র বোঝাই করিয়া কলিকাতাদি বন্দরে প্রেরিত হইত। এইরূপ জাহাজের গতায়াতে ও নানাদেশীয় বণিক্‌গণের সমাবেশের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে খেজুরী একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দরে পরিণত হয়। কিন্তু কাউখালির নিকট তখন 'হাল' না থাকায় বোধ হয়, ঐ স্থানে আলোকগৃহ স্থাপনের প্রয়োজন হয় নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ জে, র‍্যানসম্ লিখিয়াছেন যে, কাউখালির নিকটে একটি 'হাল' বা নৌপথ গঠিত হইয়াছে। (১) এই 'চানেল' রেণেলের মানচিত্রে 'কাউখালি প্যাসেজ' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই 'হালের' উপযোগিতা বুঝিয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কাউখালির আলোক গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সেটেলমেণ্টের বিবরণে মিঃ বেলী লিখিয়াছেন, কাউখালির পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র ক্রমে ক্রমে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে চর পড়িতেছে। (২) আলোকগৃহটি

নদীর মোহানা।

(১) Thornton's English Pilot Pt. III. P. 7 of 1711.

(২) Sir R Temple's note in '*Bourey*' P. 166.

(১) "I find no visible alteration in the river at the last survey,—Cowcolly only excepted, where there is a good navigable channel opened within the buoy of the flat of the shore, preferable either to the outward channel commonly called the new channel or the old channel of Cowcolly."

Rev. J. Long's *Records of the Govt. of India P. 10.*

(২) "It was erected in 1810 to guide vessels into the Kedgeree roads, and is still useful to passenger steamers of light draft going down the western channel to Chandbali."

Midnapore District Gazetteer, P. 198.

Since it was erected the sea has considerably encroached upon the adjacent lands.

Mr. H. V. Bayley's *Majnamootah Settlement Report, 1844. P 102.*

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত খেজুরী থানায় অবস্থিত। ইহার আলোক ১৮১০ খৃষ্টাব্দেই প্রদর্শিত হইয়াছিল। (১) সাগরদ্বীপস্থ আলোকগৃহের নির্ম্মাণকল্পনা মাত্র ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, (২) কিন্তু ইহার আলোক-প্রদর্শন ১৮২১ খৃষ্টাব্দে হয়। (৩) মহানদীর মুখে ফলস্ পয়েণ্ট আলোকগৃহের প্রথম আলোকপ্রদর্শন ইহারও পরে অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। (৪) সুতরাং কলিকাতার পোর্ট কমিশনারগণের এলাকাভুক্ত আলোকগৃহগুলির মধ্যে কাউখালির আলোকগৃহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কাউখালির আলোকগৃহ ৮০ ফুট উচ্চ একটি পঞ্চতল ইষ্টকস্তম্ভ। গৃহগুলি প্রশস্ত ও বাসোপযোগী, গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্নতল হইতে সর্ব্বোচ্চ তল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ২১° ৫০′ ৯.৯″ উত্তর দ্রাঘিমাংশ ও ৮০° ৫৬′ ৪০.৯″ পূর্ব্ব অক্ষাংশের মধ্যে ইহা অবস্থিত। আলোকটি পূর্ণ জোয়ারের জল-রেখার ৭৫ ফুট উর্দ্ধে বর্ত্তমান ছিল। মেঘ ও কুজ্ঝটিকা-বর্জ্জিত দিনে ইহার আলোক ১৫ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যাইত। ইতঃপূর্ব্বে ইহার আলোকের আকারপ্রকার কয়েক বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান আলোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহা উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব ৯৬° ডিগ্রি স্থান ব্যাপিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি রেখায় আলোকদান করিত। পূর্ব্বে ইহা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইহার শেষ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী মিঃ ও, এইচ, ডিটোর্সের (O. H. Detours) সময়ে ইহার ভার জনৈক দেশীয় টিণ্ডালের (Tindal) উপর ন্যস্ত হয়। বোধ হয়, সেই সময় হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুদীর্ঘ এক শতাব্দী কালের উপর প্রত্যহ প্রদর্শিত হইয়া গত জার্ম্মান্ যুদ্ধের সময়, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'এমডেনের' আশঙ্কায় অস্থায়িভাবে একমাসের জন্য ইহার আলোক নির্ব্বাপিত ছিল। তাহার পর নিয়মিত আলোক প্রজ্বলিত হইয়া গত জানুয়ারী মাস হইতে অপ্রয়োজনীয়তার জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। জানি না, ভাগীরথী এই আলোকগৃহের নিকটে আবার নূতন 'হালের' পত্তন করিয়া কখনও ইহার নির্ব্বাণ-দীপ প্রজ্বলিত করাইবেন কি না। এই আলোকগৃহের কার্য্য বন্ধের জন্য অনেকগুলি দরিদ্র পল্লীবাসীর অন্নের উপায় গিয়াছে। তাহারা বহুদিন এই আলোকগৃহে চাকরী করিত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ।

---

(১) "The light was first exhibited in 1810."
O. C. Ollenbch's "*Tide tables for the River Hooghly*" P. 85.

(২) "The plan of an erection of a Light house on Sougor Island, having been approved by the Court of Directors an artist for the superintendence of the work was sent from England and arrived in Calcutta by the late ships."

Adapted from H. D. Sanderson's *Selections from Calcutta Gazettes, Vol. II P. 101.*

(৩) Ollenbach's *Hooghly River, P. 80.*

(৪) Ibid—P. 87.

শুভ-যোগ

১

কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান থিয়েটার দুইটির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। সপ্তাহের মধ্যে তিন দিনই অভিনয়কালে দুইটি থিয়েটারই এমন ভাবে ভরিয়া যাইত যে, কোন্‌টির লোকসংখ্যা বেশী এবং কোন্‌টির কম, তাহা গণনা না করিয়া বলা কঠিন হইত।

এই দুই থিয়েটারের দুই দল পক্ষপাতী দর্শকও ছিল; তাহারা নিজ নিজ বচন ও বচসার দ্বারা উভয় থিয়েটারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইয়া রাখিত এবং বাড়াইয়া তুলিত। কবি থিয়েটারের পক্ষপাতী দল বলিত, বাঙ্গালা দেশের থিয়েটারের সমগ্র ইতিহাসে সুরমার মত গায়িকা ও অভিনেত্রী এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, এবং তদুত্তরে বীণা থিয়েটারের ভক্তগণ বলিত, অভিনয়কৌশলে পরেশ মিত্রের সহিত সুরমার তুলনাই চলিতে পারে না—পরেশ মিত্র এত বড় অভিনেতা। ইহা লইয়া পথে, ঘাটে, পার্কে, ক্লাবে, এমন কি, সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত তুমুল দ্বন্দ্ব চলিত; কিন্তু তদ্দ্বারা এই দুই জন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহার মীমাংসা এক দিনও হইত না। তবে এ কথায় মতভেদ ছিল না যে, অভিনয়-পটুত্বে ইহারা দুই জনই অনন্যসাধারণ এবং ইহাদের দুই জনের জন্যই দুইটি থিয়েটারের এত প্রসার ও প্রতিপত্তি। ফণী যেমন একাগ্র সতর্কতার সহিত মণি রক্ষা করিয়া চলে, দুই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ঠিক তেমনই সাবধানতার সহিত এই দুই জন অভিনয়কারীকে রক্ষা করিয়া চলিতেন। ইহারা না চাহিয়াই যে বেতন মাসে মাসে পাইত, অপর অভিনেতৃগণ পীড়াপীড়ি করিয়াও তাহার এক-চতুর্থাংশ পাইত না।

কিন্তু ক্রমশঃ সুরমার খ্যাতিই বেশী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে ত কেবলমাত্র এক জন সুদক্ষা অভিনেত্রী নহে, সে অদ্বিতীয়া গায়িকা। তাহার কণ্ঠনিঃসৃত স্বরলহরী পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া যখন কবি-রঙ্গমঞ্চের প্রশস্ত কক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিত, তখন আত্ম-বিস্মৃত শ্রোতৃবর্গ গভীর বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকিত। প্রতি গীতই, উচ্ছ্বসিত প্রার্থনার অনুরোধে, সুরমাকে দুইবার গাহিতে হইত। গিটকারী, গমক, মূর্চ্ছনা ও মীড় লইয়া সে স্বরের আতস-বাজী খেলিত। লোক বলিত, সুরমা বঙ্গদেশের সুকণ্ঠ পাপিয়া।

ইহা ত গেল অভিনয় ও গানের কথা। কিন্তু শুধু এই দুই বিষয়েই তাহার মোহিনী শক্তি নিবদ্ধ ছিল না। চিত্তজয় করিবার তৃতীয় অস্ত্র ছিল তাহার অম্লান সৌন্দর্য্য। সে যখন তাহার স্নিগ্ধ রূপশিখাটি জ্বালাইয়া প্রথম মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইত, তখন স্তবকে স্তবকে গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্পে পুষ্পে তাহার পদতল ভরিয়া উঠিত! সে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিত। তাহার নয়নে বিলোল কটাক্ষ খেলিত না, ওষ্ঠাধরে লঘু চপল হাস্য ভাসিত না, দৃষ্টি তাহার কোন দর্শকেরই উপর নিবদ্ধ হইত না, অথচ প্রত্যেকে এমনভাবে আকৃষ্ট হইত, যেন সে শুধু তাহাকেই আকর্ষণ করিতেছে!

সেই সকল দর্শক আবার যে দিন বীণা থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হইত, পরেশ মিত্রের অভিনয় দেখিয়া বিস্ময়ে এবং পুলকে নিমজ্জিত হইয়া যাইত! সহজ, সুন্দর, শান্ত অভিনয়,—লম্ফ নাই, ঝম্প নাই, চীৎকার নাই, অথচ প্রতি বাক্যে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, প্রতি ভঙ্গীতে অর্থ উছলিয়া পড়ে! দূরাগত সিন্ধু কল্লোলের মত গভীর-মিষ্ট কণ্ঠস্বর। আকাশের মত স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যে রসাত্মগত ইঙ্গিত, এবং দীর্ঘ সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহের স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতি! সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, হাস্য-রোদন এই ভাবের বাজীকর নিমেষের মধ্যে অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলে।

২

সহরের পূর্ব্বাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়া পরেশ বাস করিত। আত্মীয়পরিজন কেহ ছিল না, থাকিলেও কলিকাতার বাসায় কাহাকেও কখন দেখা যাইত না। থাকিবার মধ্যে ছিল একমাত্র ভৃত্য যদু; কাপড়কাচা,

বাসনমাজা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নপাক পর্য্যন্ত সংসারের সকল কায সে একাই করিত।

সংসারই বা কোথায়, আর তাহার কাযই বা কি? দুই ঘণ্টা প্রাতে এবং দুই ঘণ্টা সন্ধ্যায় কায করিয়া মধুর আর কিছু করিবার থাকিত না। তথাপি মাঝে মাঝে সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, কুণ্ঠিত স্মিতমুখে বলিত, "বাবু, আর এক জন লোক নইলে ত আর চলে না।"

পরেশ হাসিয়া বলিত, "কেন রে? এত কি কায বেড়ে গেল যে, আর এক জন লোক নইলে চল্‌ছে না?"

ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মধু বলিত, "কায না বাড়ুক, বয়স ত বাড়ছে বাবু! ঘরসংসারের কায, আবার রান্নাবাড়ার কায, দুই-ই এক জনকে দিয়ে কি ক'রে হয় বল?"

"না যদি হয় ত এক জন রসুইয়ার সন্ধান দেখ্; হোটেলে খাওয়া ত আমার দ্বারা হবে না, মধু। সে বার পোনের দিন হোটেলে খেয়ে ছমাস অরুচি সারতে লেগেছিল।"

নতদৃষ্টি একেবারে কড়িকাঠের উপর তুলিয়া মধু কহিত, "আমি কি বামুন চাকরের কথা বলছি, বাবু? আমি বলছি, একটা না হয় বিয়ে-থাওয়া কর- বউমা এক দিক সামলাক্, আমি আর দিক সামলাই। আপনি ত দিনে রাত্তির বাইরে বাইরে কাটাবে। শূন্যো ঘরে একা একা বড় উদাস্ লাগে, বাবু!" বলিয়া মধু সসঙ্কোচে নিঃশব্দে হাসিতে থাকিত।

পরেশ হাসিমুখে বলিত, "আমি বিয়ে করলে তোর উদাস মন সারবে কেন রে? তার চেয়ে তুই একটা বিয়ে কর্, দু'জনে এখানে থাক্‌বি, আমি খরচ দেব।"

শুনিয়া মধু পুনরায় মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিত; বলিত—"আমার তিন কুলে কেউ নেই। তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার আবার বিয়ে! আপনি ছেলে মানুষ, আপনি কর!"

পরেশ মনে মনে বলিত, 'তিন কুলে আমারি কেউ আছে কি না!' মুখে বলিত, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে অখন। এখন আর বকাসনে, পালা!"

মধু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিত।

ঠিক এই না হউক, এইরূপ কথোপকথন প্রভু-ভৃত্যে মাঝে মাঝে প্রায়ই হইত।

প্রাতঃকালে রাস্তার ধারের ঘরে বসিয়া পরেশ নূতন নাটকের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ-ভূমিকাটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। নাটকটি সুলিখিত। পরেশ দেখিতেছিল, তাহার ভূমিকায় এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সে অবলীলাক্রমে দর্শকমণ্ডলীকে দুঃখে, হর্ষে, ঘৃণায়, বিস্ময়ে আলোড়িত করিয়া দিতে পারিবে। অভিনয় যাহাতে সফল ও সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে নাট্যকার স্বয়ং পরেশের হাত ধরিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। নিজ ভূমিকার জন্য পরেশ ভাবিতেছিল না; সে ভাবিতেছিল, চারুশীলার জন্য—যাহাকে প্রধান স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। গ্রামোফোনের মত যে গান গায় ও কথা কয়, এবং পুতুলনাচের পুতুলের মত যে ওঠে বসে, নড়েচড়ে, তাহাকে লইয়া অভিনয় করার মত বিড়ম্বনা আর নাই! কি করিয়া চারুশীলাকে একটু গড়িয়া পিটিয়া চলনসই করিয়া লইবে, পরেশ তাহাই মনে মনে ভাবিতেছিল। এমন সময় রাস্তায় জানালার ধারে কে ডাকিল, "পরেশ, বাড়ী আছ?"

"আছি" বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দ্বার খুলিয়া পরেশ বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল, তাহার সহপাঠী যোগেন্দ্র পথে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া পরেশ কহিল, "আমি যে এখানে থাকি, তা কি ক'রে আবিষ্কার করলে, যোগেন?"

যোগেন্দ্র সহাস্যে কহিল, "পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে, অতএব এর জন্য অত বিস্মিত হয়ো না। এখন ডেকে বসাবে, না ফিরে যাব? বল।"

পরেশ হাসিয়া কহিল, "এতখানি যে সন্ধান ক'রে এসেছে, তাকে ডেকে না বসালেও সে ঢুকে বসবে। কিন্তু তার দরকার নেই, তুমি একশ'বার এস! তবে এক জন পাঁচশ' টাকার ডেপুটীকে ডেকে বসান এক জন থিয়েটারের অ্যাক্টারের পক্ষে ধৃষ্টতা কি না, তাই ভাবছি!"

যোগেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমি হলফ ক'রে বলতে পারি, তা' তুমি ভাবছ না, শুধু রহস্য করছ। পাঁচশ' টাকার ডেপুটীর প্রতি তোমার কোন মোহ নেই, তা' যে আমি জানি, তা' তোমার ভাল করেই জানা আছে। পাঁচশ'

টাকার ডেপুটী হবার অধিকার আমার চেয়ে তোমার কম ছিল না, তা আমিও জানি, তুমিও জান।"

একটা চেয়ার কোঁচার কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া, যোগেন্দ্রর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া পরেশ কহিল, "হ'তে পার্তাম আমি একটা মস্ত বড় বীর সে সব কথা ছেড়ে দাও! মানুষ যা'র ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তা'র ওপরেই তা'র অধিকার; যা'র ওপর দাঁড়াতেও পারে না, তা'র ওপর তা'র কোন অধিকার নেই। সে সব কথা যাক, এখন তোমার খবর সব বল, শুনি।"

কিছুক্ষণ দুই বন্ধুতে ঘরসংসারের কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর যোগেন্দ্র কহিল, "আমি এসেছি তোমার থিয়েটার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলতে।"

পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "পাপপথ থেকে আমাকে টেনে তুলবে না কি?"

যোগেন্দ্র কহিল, "রক্ষে কর, ভাই, অত শক্তি আমার নেই। আমাকেই কে টেনে তোলে, তার ঠিক নেই, তা তোমাকে তুলব। তোমার জয় জয়কার হোক, কিন্তু তোমার থিয়েটারকে একটু টেনে তুলতে পারলে মন্দ হয় না।"

পরেশ ঈষৎ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি রকম?"

তখন কিছু পূর্ব্বে পরেশ যে তর্কটি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছিল, তাহাতেই যোগেন্দ্র একেবারে প্রবলভাবে আঘাত দিয়া বসিল। বলিল, "আমি তিন মাসের ছুটী নিয়ে এসেছি· এসে কয়েক দিনই থিয়েটার দেখে বেড়িয়েছি। তোমার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। তুমি যে এক জন ষ্টেজ-অ্যাক্টর, সে জন্য আমার মনে কিছুমাত্র দুঃখ বা গ্লানি নেই; কিন্তু শুধু এক জনকে নিয়ে ত প্লে হয় না, ভাই। তোমার পরে আর যা'রা—নায়িকা থেকে আরম্ভ ক'রে দাসদাসী পর্য্যন্ত সব একছাঁচে ঢালা; প্রত্যেক অভিনয়ে তোমার সঙ্গে চারুশীলা ব'লে যে মেয়েটিকে জুড়ে দেওয়া হয়, সে ত প্রত্যহ তোমাকে রীতিমত খুন করে, হাতে ছুরী থাকে না ব'লে তোমার রক্ত পড়ে না!" বলিয়া যোগেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "কি করব বল, অভিনয়ই করা যায়, অভিনেত্রী করা যায় না ত!"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কেন করা যায় না? বিলেতে করে কি ক'রে?"

পরেশ কহিল, "কি ক'রে করে, তা জানিনে। কিন্তু এরা ত একেবারে কাঠের পুতুল; শেখালেও শেখে না, বোঝালেও বোঝে না!"

যোগেন্দ্র কহিল, "কিন্তু আমাদের দেশেও ভাল অভিনেত্রী আছে ত, পরেশ। রুবি থিয়েটারের সুরমা চমৎকার অভিনয় করে। সে তোমার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি তা'র অভিনয় দেখে আর তা'র গান শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছি! তুমি তা'র অভিনয় দেখ নি?"

পরেশ কহিল, "শুনেছি সে এক জন ভাল অভিনেত্রী, কিন্তু এক দিনও তা'র অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়ে উঠেনি।"

যোগেন্দ্র সনির্ব্বন্ধে কহিল, "তা হ'লে দোহাই তোমার, এক দিন দেখ; দেখলে তুমি উৎসাহ পাবে, বুঝবে যে, তোমার সঙ্গে অভিনয় করতে পারে, এমন অভিনেত্রীও বাঙ্গালা ষ্টেজে আছে। বাস্তবিক, পরেশ, তুমি আর সুরমা যদি একসঙ্গে অভিনয় কর, তা হ'লে মণি-কাঞ্চনের যোগ হয়!"

অর্দ্ধঘণ্টাকাল এই বিষয় আলোচনা করিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো। এতে অন্যায় কিছুই নেই। তুমি যে চিরকাল বীণা থিয়েটারে আটক থাকবে বা সুরমা যে চিরকাল রুবি থিয়েটারে বন্দী থাকবে; তা'র কোন মানে নেই।"

পরেশ কহিল, "সুরমা যদি বীণা থিয়েটারে আসে, আমার কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আমি যদি বীণা থিয়েটার ছেড়ে চ'লে যাই, তা হ'লে প্রোপ্রাইটারের সমূহ ক্ষতি হবে; অকারণে আমি কি ক'রে তা করি?"

যোগেন্দ্র কহিল, "একটুও অকারণে নয়; প্রোপ্রাইটারের ব্যাঙ্কের জমা বাড়িয়ে তোলাই থিয়েটারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যা'রা পয়সা দিয়ে থিয়েটার দেখে, তা'দেরও অধিকার আছে ভাল অভিনয় দেখবার। রেল কোম্পানীর কর্ত্তব্য হচ্ছে আরোহীকে এক যায়গা থেকে আর যায়গায় পৌঁছে দেওয়া; কিন্তু তাই ব'লে এঞ্জিনের চোঙ্গে বেঁধে তাকে নিয়ে যেতে পারে না।"

যোগেন্দ্রকে ট্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া পরেশ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নূতন নাটকটি লইয়া বসিল। কিন্তু সে নাটকে ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না, যোগেন্দ্রর কথা ভাবিতে লাগিল।

৩

সে দিন রবিবার ছিল। নূতন নাটকের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া পরেশের বীণা থিয়েটারে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। সন্ধ্যার সময়ে সে কবি থিয়েটারে উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া সর্ব্বত্র তাহার সম্মান ও সমাদর ছিল; তাহাকে দেখিতে পাইয়া এক জন গার্ড সসম্ভ্রমে ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে পরেশ উৎসুকচিত্তে সুরমার প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম দৃশ্যে সুরমার ভূমিকা ছিল না, শুধু আখ্যায়িকার নায়ক অনিরুদ্ধের পরিচয় ছিল। দ্বিতীয় দৃশ্য শোণিতপুরের রাজপ্রাসাদ। পটোত্তোলন হইলে দেখা গেল, সুসজ্জিত শয়নকক্ষে স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর নিদ্রিতা বাণরাজদুহিতা সুন্দরী উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। সম্মুখে কক্ষপ্রাচীরে অনিরুদ্ধের অস্পষ্ট চিত্রিত স্বপ্নমূর্ত্তি। পরেশ অপলক নেত্রে উষার ভূমিকায় সুরমাকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু কক্ষ অন্ধকার ছিল বলিয়া তাহার আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না।

সহসা স্টেজের এক দিক হইতে উষার মুখের উপর উজ্জ্বল নীলাভ আলোক প্রতিফলিত হইল। সেই সমুজ্জ্বল আলোকে আর কিছুই অদৃশ্য রহিল না; দেখা গেল, উষা নিমীলিতনেত্র, কিন্তু অপূর্ব্ব মাধুরীমণ্ডিত তাহার মুখে থাকিয়া থাকিয়া বিচিত্র ভাবরাশি ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। নিঃসন্দেহ বুঝা গেল, সে কোন একটা সুখস্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার পর নিমেষের মধ্যে নীলাভ আলোক পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ গোলাপী বর্ণের আলোক ফুটিয়া উঠিল। বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী সবিস্ময়ে দেখিল, সেই নিমেষেরই কোন সময়ে উষার মনোহর মুখে সলজ্জ, অপরূপ মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল দর্শকমণ্ডলী সহর্ষ-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই সহসা রঙ্গকক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহস্র করতালির বিরাট্ধ্বনি উত্থিত হইল। যেন সেই প্রচণ্ড শব্দেই চকিত হইয়া সুরমা পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল, তাহার পর এক মুহূর্ত্ত বিহ্বলভাবে বসিয়া থাকিয়া, সহসা দুই হস্তে নেত্রদ্বয় মর্দ্দিত করিয়া, ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে চোখে তাহার নিদারুণ নৈরাশ্য ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইল করুণ মর্ম্মস্পর্শী বিলাপগীতি! 'ওগো বন্ধু! ওগো দয়িত! কোথায় তুমি, কোথায় তুমি! যদি রহিবে না, তবে দেখা দিলে কেন? যদি দেখা দিলে, তবে রহিলে না কেন? এস এস, ফিরিয়া এস!" সুর, লয়, মূর্চ্ছনা, মীড়ের সংযোগে সেই করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস শ্রোতৃবর্গের চিত্তে এক অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা জাগাইয়া তুলিল! পরেশ দুই হস্তে তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সেই আকুল আহ্বানধ্বনি শুনিতে লাগিল। তাহার অধীরোন্মত্ত চিত্ত অনিরুদ্ধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তাহার পভীরাকৃষ্ট চেতনা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া সেই অনতিক্রমনীয় আহ্বানকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল!

তাহার পর অনিরুদ্ধের জন্য আকুল অন্বেষণ; সখী চিত্রলেখা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন; বিরহ-বিধুরা উষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন; ক্রমশঃ সেই কথা অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ বাণরাজ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধকে নিহত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ; অনিরুদ্ধের হস্তে সৈন্যগণের পরাভব। তৎপরে বাণরাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐন্দ্রজালিক মায়ার দ্বারা অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলেন। তখন উষার কি অব্যক্ত যাতনা, কি উন্মত্ত অস্থিরতা! অভিনয়ের প্ররোচনায় দর্শকবৃন্দ কাঁদিয়া অস্থির হইল। অবশেষে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন বহু সৈন্যসহ শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোণিতপুরের রাজপথ রুধিরে রুধিরে প্লাবিত হইয়া গেল; ভীষণ যুদ্ধের পর বাণ পরাস্ত হইলেন। তখন যাদবগণ অনিরুদ্ধ ও বধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় উষার সুন্দর মুখে মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

যবনিকাপতনের অল্পক্ষণ পরে প্রহসন আরম্ভ হইবে। প্রহসনে সুরমার কোনও ভূমিকা ছিল না; সে উষার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "বীণা থিয়েটারের পরেশ মিত্র দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুরমা বলিল, "কোথায় ?"

পরিচারিকা কহিল, "পর্দ্দার পাশে।"

ক্ষিপ্রপদে বাহিরে আসিয়া পরেশকে সম্মুখে দেখিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি অবনত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

পরেশ শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি ! কর কি, সুরমা ! পায়ে হাত দিচ্ছ কেন ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুরমা কহিল, "আপনি কি আজ সমস্তক্ষণ ছিলেন ? আমি ত আপনাকে দেখতে পাইনি !

পরেশ স্নেহগম্ভীরস্বরে কহিল, "সমস্তক্ষণ ছিলাম ত বটেই, মুগ্ধ হয়ে ছিলাম ! কি সুন্দর অভিনয় কর তুমি, সুরমা, কি চমৎকার গান গাও ! তুমি যখন উষা হয়ে অভিনয় করছিলে, তখন ইচ্ছা হচ্ছিল, অনিরুদ্ধ হয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই।" বলিয়া পরেশ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরমার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি নত করিয়া কহিল, "তা যদি গিয়ে দাঁড়াতেন, তা হ'লে আমার অভিনয় তাঁর জন্যেই ভাল হয়ে যেত ! আপনাদের মত লোকের সহায়তা পেলে মনে হয়, অনেক উন্নতি করতে পারতাম। আমার অহঙ্কার ক্ষমা করবেন, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করতে হয়, তাঁদের সঙ্গে অভিনয় ক'রে মন ভরে না।"

পরেশ সুরমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ রহিল, তাহার পর মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "আমারও ত' ঠিক সেই দুঃখ, সুরমা ; চারুশীলার বদলে তোমাকে যদি পাশে পেতাম, তা হ'লে আমিও অভিনয়ের ইন্দ্রজাল তৈরি করতে পারতাম।"

সুরমা উৎফুল্ল কৃতজ্ঞ-নেত্রে একবার পরেশের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

৪

তাহার পর মধ্যে মধ্যে সুরমায় ও পরেশে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। কখনও সুরমার গৃহে, কখনও পরেশের গৃহে, কখনও বা রুবি থিয়েটারে।

যোগেন্দ্রর প্রস্তাব ও যুক্তি পরেশ বিস্মৃত হয় নাই ; থিয়েটার যে শুধু অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায় নহে, এক দিক্ দিয়া তাহা যে সাধারণেরও সামগ্রী, এবং তদনুসারে কেবল-মাত্র স্বত্বাধিকারীর স্বার্থই সংরক্ষণীয় নহে, এ কথা ক্রমশঃই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অবশেষে সে এক দিন স্পষ্ট করিয়া তাহার মনোভাব সুরমার নিকট ব্যক্ত করিল ; সে বলিল, "দেখ, সুরমা, তোমার প্রোপ্রাইটারেরও মঙ্গল হোক, আমার প্রোপ্রাইটারেরও মঙ্গল হোক, আমার তা'তে কিছুমাত্র আপত্তি নেই ; কিন্তু অর্থের জন্যই বল আর কলার জন্যই বল, থিয়েটারকে যখন জীবনের মধ্যে অবলম্বন করেছি, তখন থিয়েটারকে অবহেলা করলেই জীবনকে অবহেলা করা হবে।"

সুরমা জিজ্ঞাসু-নেত্রে পরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তা' ত নিশ্চয়ই, কি করতে হবে, বলুন ?"

তখন পরেশ একে একে সকল কথা খুলিয়া বলিল ; যোগেন্দ্রের আগমন, তাহার সহিত তর্ক ও আলোচনা, যোগেন্দ্রের উপদেশ, তাহার নিজের অভিমত, কিছুই বাকি রাখিল না। সে বলিল, "থিয়েটার ত' শুধু টিকিট বিক্রী আর ব্যাঙ্কের খাতা নয়, তার মধ্যে শিল্প আছে, সাহিত্য আছে, কলা আছে, লোককে উন্নত করবার উপায় আছে, লোককে অবনত করবার আশঙ্কা আছে। সেই কথাগুলি মনে ক'রে এস, একবার তুমি আর আমি পাশাপাশি হই। আসবে, সুরমা ?"

উৎসাহে ও আনন্দে সুরমার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "নিশ্চয়ই আসব ! আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রইলাম, যে দিন আপনি ডাকবেন, সেই দিনই যাব। যদি বলেন ত কালই আমি ম্যানেজারকে নোটিস দিই।"

পরেশ সন্তুষ্টচিত্তে কহিল, "কোন কাজই অত তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। ভাববার জন্য খানিকটা সময় নেওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা আমি ভেবে দেখেছি যে, আসতে যদি হয় ত' আমারই তোমার থিয়েটারে আসব। থিয়েটার ছাড়ায় যদি কিছু গ্লানি বা অন্যায় থাকে, তবে আমিই তা বহন করব। তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে তা থেকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য।"

পরেশের এই সদয় আশ্বাসবাক্য শুনিয়া সুরমার অন্তরে আনন্দ নিরুদ্বেগ হইল। মুখ দিয়া কৃতজ্ঞতার কোনও বাণী নির্গত না হইলেও তাহার চোখের পরিতৃপ্ত দৃষ্টির মধ্যে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এক থিয়েটার পরিত্যাগ

করিয়া অপর থিয়েটারে যোগদান করার যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা হইতে পরিত্রাণলাভের প্রতিশ্রুতিতে সুরমার মনে আর কোনও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব রহিল না। পরেশের সহিত একত্র অভিনয় করিবার কল্পনায় সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এ বিষয়ে সুযোগও এক দিন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরমা ও পরেশের মধ্যে নিত্য-বর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার কথা ক্রমশঃ প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। রবি থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী এক দিন কথায় কথায় সুরমাকে কহিল, "তোমার সঙ্গে পরেশ মিত্রের ত বেশ আলাপ হয়েছে, তা'কে কোনও রকমে আমাদের থিয়েটারে আনতে পার না?"

সুরমা মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "বোধ হয় পারি।"

স্বত্বাধিকারী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তা যদি পার, সুরমা, তা হ'লে তোমাকে আর পরেশ মিত্রকে নিয়ে রবি থিয়েটারে আমি সোনা ফলাই! লক্ষ্মীটি, এ সুযোগ যেমন ক'রে পার, তুমি ঘটাও! পরেশ সেখানে তিনশ' টাকা মাইনে পাচ্ছে, আমি তাকে সাড়ে তিনশ,' এমন কি, চারশ' পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।"

এ কথায় সুরমা আরও আনন্দিত হইল। এমনিই ত' পরেশ আসিবার জন্য ইচ্ছুক, তদুপরি বেতনবৃদ্ধির যোগ থাকিলে আর বাধা কোথায়? সে প্রতিশ্রুত হইল, পরেশকে সম্মত করাইবে।

"তা হ'লে কবে এ বিষয়ে সঠিক জানতে পারব?"

সুরমা একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বোধ হয় কালই।"

পরদিন সুরমা স্বত্বাধিকারীকে বলিল, "পরেশ বাবু রাজি হয়েছেন।"

শুনিয়া স্বত্বাধিকারী লাফাইয়া উঠিল। "রাজি হয়েছে? বেশ্ সুরমা, বেশ্! তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! মাইনে কত চায়? চারশ'ই পূরো?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "সে কথাটা আপনি তাঁ'র সঙ্গে নিষ্পত্তি করবেন। তা'র মধ্যে আমার না থাকাই ভাল।"

"কেন? মাইনে বাড়ানর কথা আমি ত তোমাকে বলতে বলেছিলাম। বলনি?"

"বলেছি।"

"চারশ' পর্য্যন্ত?"

"চারশ' পর্য্যন্ত।"

"তাতেও রাজি নয়?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, তা'তে রাজি নন।"

শুনিয়া স্বত্বাধিকারী চিন্তিত হইয়া পড়িল; বলিল, "চারশ'র বেশী হ'লে চাপাচাপি হয়ে পড়বে যে!"

সুরমা তেমনই স্মিতমুখে কহিল, "আপনি ভাবিত হবেন না। ও কথা খুব সহজেই স্থির হয়ে যা'বে।"

সুরমার প্রতি উৎসুকভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বত্বাধিকারী কহিল, "তা তুমি কি ক'রে বলছ? কোন কথা সে বলেছে নাকি? খুলে বল না, সুরমা!"

সুরমা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁ'র মুখ থেকেই কথাটা আপনি শোনেন। কিন্তু আপনি যখন এত ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন আমাকেই বলতে হোল। তিনি আড়াইশ' টাকা বেতনে আপনার থিয়েটারে আসবেন।"

"আড়াইশ' টাকায়! তার মানে? সে ত বীণায় তিনশ' পাচ্ছে?"

"তা পাচ্ছেন।"

"তবে আড়াইশ' টাকায় এখানে আসবে কেন? তামাসা করছ, সুরমা?"

সুরমা শান্ত মুখে সসম্মানে কহিল, "আমি কি আপনার সঙ্গে কখনও তামাসা করি?"

স্বত্বাধিকারী কহিল, "না, তা কর না। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা কমে আসতে চাচ্ছে কেন, তা ত আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছিনে!"

সুরমা কহিল, "কথাটা এমনই অদ্ভুত যে, আমিও তা'র মানে বুঝতে পারিনি। চলুন না, এখনও তিনি বাড়ীতেই আছেন—তাঁ'র মুখ থেকেই কথাটা আপনি শুনবেন।"

কথা স্থির করিবার জন্য এক জন অভিনেতার গৃহে যাইতে স্বত্বাধিকারী একবার দ্বিধা বোধ করিল। কিন্তু স্বার্থ ও কৌতূহল উভয়ই এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুরমাকে লইয়া সে অবিলম্বে পরেশের গৃহে উপনীত হইল।

পরেশ সাদর অভ্যর্থনায় আহ্বান করিয়া স্বত্বাধিকারীকে তাহার বাহিরের ঘরে বসাইল।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর মাহিনার কথা উঠিলে পরেশ কহিল, "হ্যা, সুরমা আপনাকে ঠিকই বলেছে, আড়াইশ' টাকা মাসিক বেতনে আমি আপনার থিয়েটারে যা'ব।"

স্বত্বাধিকারী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, "কেন বল দেখি? পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি ক'রে এসে তোমার কি লাভ হ'বে? আমি ত তোমাকে তিনশ'রও বেশী দিতে প্রস্তুত আছি।"

পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা' ত সুরমা আমাকে বলেছে। কিন্তু দেখুন, টাকার জন্যে ত আমি আপনার থিয়েটারে যাচ্ছিনে, টাকা ত চাইলে আমি বীণা থিয়েটারেই পেতে পারি। আমি যাচ্ছি আপনার থিয়েটারে—সুরমা অভিনয় করে ব'লে। আমার মনে হয়, আমরা দু'জনে এক-সঙ্গে অভিনয় করলে তা'রও উপকার হবে, আমারও উপকার হবে, আর নাট্যকলারও উপকার হবে।"

স্বত্বাধিকারী কহিল, "তা ত নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সেখানে যা পাচ্ছ, এখানে তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিতে চাচ্ছ কেন?"

পরেশ একটু নীরব থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "বীণা থিয়েটার ছেড়ে, আমার জন্য সেখানে যা ক্ষতি হবে, তা'র দণ্ডস্বরূপ আমি পঞ্চাশ টাকা কম নিয়ে রবি থিয়েটারে আসতে চাই। রবি থিয়েটারে আমার আসার সঙ্গে টাকার যে কোন সংস্রব নেই, সে কথাটা মনের মধ্যে ভাল ক'রে সজাগ রাখবার জন্যে আমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করেছি।"

এ কৈফিয়ত ব্যবসায়ী স্বত্বাধিকারীর মনে সন্তোষজনক হইল না। এক জন তিন শত টাকার লোক আড়াই শত টাকায় আবদ্ধ থাকিবে, ইহা তাহার ধারণার বহির্ভূত ব্যাপার। শক্তির পরিমিত শক্ত রজ্জু দিয়া প্রাণীকে বাঁধিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই মাসিক পঞ্চাশ টাকার লোভ পরিত্যাগ করিয়া তিন শত টাকায় পরেশকে স্বীকৃত করিবার জন্য প্রোপ্রাইটার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

পরেশ হাসিয়া কহিল, "আপনি অনর্থক মনে দ্বিধা করবেন না। আড়াইশ' টাকাই আমার অভাবের পক্ষে যথেষ্ট। যখন অসুবিধা বোধ হ'বে, মাইনে বাড়াবার জন্যে আমি নিজেই আপনাকে অনুরোধ করব।"

কথাটা সেই দিনই রাষ্ট্র হইল এবং বীণা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটারের কর্ণেও পৌঁছিল।

উদ্বিগ্ন প্রোপ্রাইটার পরেশকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা সত্যি?"

পরেশ কহিল, "সত্যি।"

"তার মানে? এখানে তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?"

পরেশ কহিল, "কিছু অসুবিধা হচ্ছে না।"

"তবে ছেড়ে যাচ্ছ কেন?"

পরেশ সংক্ষেপে তাহার রবি থিয়েটারে যাইবার কারণ ব্যক্ত করিল।

শুনিয়া বিরক্তিতে ও বিস্ময়ে প্রোপ্রাইটার অধীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া পরেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি পাগলামী করছ, পরেশ, নাট্যকলার উন্নতির জন্যে তুমি আমার থিয়েটার নষ্ট ক'রে দিতে চাও? কেন, আমাদের চারু সুরমার চেয়ে কোন্ অংশে কম?"

পরেশ মৃদুস্বরে কহিল, "আমার ত' মনে হয় সব অংশে।"

প্রোপ্রাইটার অধীর উচ্চকণ্ঠে কহিল, "ও সব বাজে কথা—নাট্যকলার উন্নতি আর সাহিত্য আর শিল্প রেখে দাও! আমি তোমার মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি। আসছে মাস থেকে তোমার সওয়া তিনশ' টাকা মাইনে হোল। যাও, আর কোনও কথা কয়ো না।"

পরেশ কহিল, "আমি সামান্য পঁচিশটা টাকার জন্যে এ সব কথা বলছি, এ আপনি কেন ভাবছেন?"

প্রোপ্রাইটার মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "আচ্ছা, যাও, সাড়ে তিনশ' টাকা। আর কিন্তু আমি কোনও কথা শুনতে চাইনে!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরেশ কহিল, "একটা কথা কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে।"

উৎসুক ও আশান্বিত হইয়া প্রোপ্রাইটার কহিল, "কি কথা?"

পরেশ কহিল, "রবি থিয়েটারে যাওয়া আমি স্থির করেছি, আর টাকার লোভে আমি সেখানে যাচ্ছিনে। রবি থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার আমাকে চারশ' টাকা দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা কমে অর্থাৎ আড়াইশ' টাকায় আমি সেখানে যাচ্ছি।"

প্রোপ্রাইটার সবিদ্রূপে কহিল, "এত কৃপা যে?"

পরেশ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "কৃপা নয়, দণ্ড। আপনার থিয়েটার ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যেটুকু অন্যায় হচ্ছে, তা'র শাস্তির জন্যে আমি মাসিক পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি।

আমার মনে এ সান্ত্বনাটুকু থাকবে যে, টাকার লোভে আমি আপনার থিয়েটার ছেড়ে যাইনি।"

প্রোপ্রাইটার মুখভঙ্গীর সহিত কহিল, "ওঃ! তা হ'লে ত আমার থিয়েটার একেবারে দেউলে হয়ে যাবে!"

তাহার পরই কিন্তু সে বিপদ উপলব্ধি করিয়া একেবারে অবনত হইয়া পড়িল। মিনতির কণ্ঠে কহিল, "দেখ, পরেশ, তোমার সাহসে এত খরচ ক'রে তিনখানা নাটক মাউণ্ট করেছি। তোমাকে নিয়েই বীণা থিয়েটার, তোমার জোরেই আমার জোর। তুমি চ'লে গেলে অপমানে আমার মাথা কাটা যাবে। হৃদয় দত্তর টিটকারীতে সহরে আমার বাস করা ভার হবে।"

কিন্তু তাহাতেও পরেশ টলিল না। তখন প্রোপ্রাইটার পর্য্যায়ক্রমে লোভ দেখাইল, ক্রোধ প্রকাশ করিল, অনুনয় বিনয় করিল, অবশেষে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "তবে দূর হও, আমার সম্মুখ থেকে!"

পরেশ কোনও কথা না বলিয়া নত হইয়া নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

৫

পরেশ মিত্র যোগ দেওয়ার পর কবি থিয়েটারের প্রতিপত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। অভিনয়ের দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সমস্ত বক্স রিজার্ভ হইয়া যায় এবং বৈকালে টিকিটঘর খোলার পর এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। তাহার পর অসংখ্য আশাহত দর্শক টিকিট কিনিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। প্রোপ্রাইটার সুযোগ বুঝিয়া প্রথম শ্রেণীর আসন পিছাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনের গণ্ডীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। সেইরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর আসন গ্যালারীর ভিতর প্রবেশ করিল। আট সারি গ্যালারী এই প্রক্রিয়াফলে দুই সারিতে পর্য্যবসিত হইল। রঙ্গালয়ের গৃহ সংস্কৃত হইল, দৃশ্যপট শোধিত হইল, নূতন নূতন সাজসজ্জা ক্রয় করা হইল এবং এতদুপরি ব্যাঙ্কের জমা নিয়ত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু পরেশ মিত্রের অভাবে বীণা থিয়েটারের যে ক্ষতি ও অবনতি ঘটিল, তাহার তুলনায় কবি থিয়েটারের এ উন্নতি কিছুই নহে। পূর্ব্বে লোক কবি থিয়েটারে স্থান না পাইলে বীণা থিয়েটারে যাইত এবং সেইরূপে বীণা থিয়েটারে স্থানাভাবে কবি থিয়েটারে আসিত। এখন কবি থিয়েটারের কেহ লোক অপর থিয়েটারে যায়, তথাপি বীণা থিয়েটারে যায় না। বীণা থিয়েটার হইতে পরেশ মিত্র বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই কথাই সকলের মনে জাগরূক থাকিত। পরেশ মিত্র বাদেও বীণা থিয়েটারে অবশিষ্ট কি আছে, সে হিসাব কেহ করিত না।

৬

প্রতি অভিনয়ে পরেশ হইত নায়ক এবং সুরমা হইত নায়িকা। ইহাদের যুক্ত অভিনয় দেখিয়া কেহ কেহ বলিত যে, পূর্ব্বজীবনে ইহারা দুই জনে প্রেমিক প্রেমিকা ছিল, জন্মান্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়া তাহার প্রভাব এখনও ইহাদের মধ্যে আছে বলিয়া এরূপ প্রাণস্পর্শী অভিনয় ইহারা করিতে পারে। দূরদর্শিতার অহঙ্কারে তাহারা ইহজীবনকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বজীবনের হিসাব করিত। নিখিল নায়ক নায়িকার মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই যে ইহারা প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে ইহাদের বাস্তব জীবনে নায়ক-নায়িকা হইয়া উঠিতেছিল, তাহা কেহ উপলব্ধি করিত না।

পৌরাণিক যুগের সুখ-দুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দিয়া চিত্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। সীতার পরিতাপ, রামের অনুতাপ, নলের দুঃখভোগ, দময়ন্তীর পতিব্রতা, তিলোত্তমার প্রণয়, জগৎ সিংহের সঙ্কট, তাহাদের উভয়ের হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে লাগিল। মিলনান্ত নাটকের অভিনয়ের পরে উভয়ে শান্ত-প্রফুল্লচিত্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে; বিয়োগান্ত অভিনয়ের শেষে ক্ষুব্ধ ত্রস্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া যায়, বিনিদ্র রজনী অজ্ঞাত আশঙ্কায় শেষ হইয়া আসে! ভ্রমরের ভূমিকা অভিনয় করিয়া দুঃখে অভিমানে সুরমা পরেশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না, রাজসিংহের ভূমিকা অভিনয়ের পর সুরমার প্রতি প্রীতি এবং প্রেমে পরেশের চিত্ত ভরিয়া থাকে! অভিনয় তাহাদের অভিনয় বলিয়া মনে হয় না, কল্পনাকে তাহারা বাস্তবের মত সত্য বলিয়া অনুভব করে।

অবশেষে এক দিন ভাষার মধ্য দিয়া কথাটা সুস্পষ্ট হইয়া গেল। উভয়ের প্রতি যে তীব্র প্রেম উভয়ে মনে মনে বহন করিতেছিল, তাহা বাক্যের স্রোতে বাহির হইয়া আসিল। তখন হইতে অভিনয়ের ব্যাপারটা তাহাদের মধ্যে ঈষৎ সঙ্কোচজনক হইয়া পড়িলেও বাহিরের লোকের কাছে তাহা আরও উপাদেয় হইয়া উঠিল। সুস্বাদ পানীয় রস-সংযুক্ত হইয়া মিষ্টতর হইল।

কিন্তু এই নিরুক্ত নিরাকৃত প্রেম লইয়া মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে জীবনযাপন পরেশের নিকট ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। যত দিন ইহা অভিনয়ের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল, তত দিন অভিনয়ের প্রয়োজন এবং মাদকতা ছিল, কিন্তু এখন যখন ইহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তখন আর অভিনয়ের শুষ্ক কুসুমপল্লবের আধারে আবদ্ধ থাকিয়া কোন লাভ নাই।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া এক দিন পরেশ কথাটা সুরমাকে খুলিয়া বলিল। বলিল, "দেখ সুরমা, নাচ-গান, খেলা-ধূলা ত অনেক করা গেল, এখন চল, অন্য জীবনের মধ্যে প্রবেশ করি।"

সুরমা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জীবন?"

তখন পরেশ ধীরে ধীরে তাহার কল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রটি সুরমার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিল। সে জীবনে তাহারা আর রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী নহে। পবিত্র গৃহ-প্রাঙ্গণে তাহারা স্বামি-স্ত্রী; বাঙ্গালা দেশের কোন এক সুদূর শান্ত গ্রামে তাহাদের একখানি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন গৃহ; অদূর প্রান্তরে শস্যক্ষেত্র, তৎসংক্রান্ত লাঙ্গল, বলদ, কৃষক; গৃহসংলগ্ন ভূমিতে ফলফুল শাক-সব্জীর বাগান; মরাইয়ে ধান্য, গোহালে গরু। সেখানে রাজধানীর বিলাস-বৈভব, উল্লাস-উদ্দীপনা থাকিবে না বটে, তেমনই ধূলি-ধূম শ্রান্তি-কোলাহলও থাকিবে না; থাকিবে অনাবিল শান্তি এবং অনুগ্র আনন্দ। তাহার পর এক দিন শিশুর কলকণ্ঠ-স্বরে তাহাদের শান্ত গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিবে; তখন জনক-জননীর সুগভীর কর্ত্তব্যের প্রেরণা তাহাদের জীবনকে রমণীয় করিয়া তুলিবে।

শুনিতে শুনিতে আনন্দে ও আবেগে সুরমার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। পরেশের দুই হস্ত নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া সে উচ্ছ্বাসের সহিত তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহার পর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয়ে মিলিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। পরেশ কহিল, "আসল চিন্তার কথা হচ্ছে টাকা। কিন্তু আমার সঞ্চিত যা আছে, তা'তে সংসার পাতবার মত যথেষ্ট হ'বে। দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চিতও কিছু থাক্‌বে।"

সুরমা সোৎসাহে কহিল, "আমারও ত কিছু আছে, তা' নিয়ে তুমি যে রকম ইচ্ছা খরচ কর।"

পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "গৃহ পাতবার জন্যে গৃহ-লক্ষ্মীকে রিক্ত করা সুলক্ষণ হ'বে না। সে টাকাটা আমার গৃহলক্ষ্মীর ঝাঁপিতে অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে।"

সুরমা মুখে আর কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল।

৭

রুবি থিয়েটারের প্রোপ্রাইটারকে পরেশ এক দিন কথাটার আভাস দিল। শুনিয়া বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় প্রথমটা প্রোপ্রাইটারের মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইল না। তাহার পর বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করিয়াও পরেশকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে না পারিয়া সে আক্রোশের সহিত কহিল, "তুমি যে এতবড় বেগোজল, তা' ত জানতাম না হে! তুমি আমার আসল জলকে বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে জানলে তোমাকে আমার থিয়েটারের ত্রি-সীমানায় আসতে দিতাম না। পেটে পেটে তোমার এ বুদ্ধি ছিল, তা কে জানত বল?"

পরেশ দৃষ্টি নত করিয়া কহিল, "তা আমিও জান্‌তাম না। কিন্তু এ কথাও ত ছিল না যে, এ রকম ব্যাপারটা কোন রকমেই ঘটতে পারবে না।"

এই উদ্ধত উত্তরে প্রোপ্রাইটারের পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে কহিল, "আচ্ছা, যাও যাও! আমার এ্যাটর্ণির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা না কয়ে আমি তোমার সঙ্গে আর একটা কথাও কইতে চাইনে।"

অবিচলিতকণ্ঠে পরেশ কহিল, "আমাকে এ্যাটর্ণির ভয় দেখান বৃথা। কারণ, আমি যাবই, কলকাতা হাই-কোর্টের সমস্ত এটর্ণি আপনার থিয়েটারের সম্মুখে সার গেঁথে দাঁড়ালেও আমাকে আটকাতে পারবে না। তবে সুরমার ওপর আমি কোন রকম জোর খাটাব না, তা'কে যদি

আপনি রাখতে পারেন ত রাখুন।” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে প্রস্থান করিল।

সেই দিনই প্রোপ্রাইটার সুরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সুরমা সম্পূর্ণভাবে পরেশের কথার সমর্থন করিল।

প্রোপ্রাইটার কহিল, “বেশ ত, তোমাদের মধ্যে যদি এ রকম অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে, তোমরা বিয়ে কর না! কিন্তু তা’র জন্যে থিয়েটার ছাড়বে কেন? বিলাতে এমন ত হামেসা হচ্ছে যে, একসঙ্গে অভিনয় করতে করতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হয়ে, বিয়ে করছে, তার পর স্বামিস্ত্রী হয়ে থিয়েটারেই থাকছে। সেখানে তাদের এমন সমাজ যে, থিয়েটার ছেড়ে সমাজে এসে আশ্রয় নিলে কোনও ক্ষতি হয় না, সমাজ তাদের সযত্নে গ্রহণ করে। তোমরা ত বিয়ে ক’রে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করবে বলছ; কিন্তু সেখানকার সমাজ তোমাদের গ্রহণ করবে ব’লে আশা করছ নাকি? স্বপ্নেও তা মনে ভেবো না। একঘরে হয়ে তোমরা একপাশে প’ড়ে থাকবে, অসুখ হ’লে কেউ একবার উঁকি মারবে না, বিপদের দিনে কেউ একবার এসে দাঁড়াবে না। তা’র পর ধর, গ্রামের জমীদার বা সমাজপতি যদি পিছনে লাগল, তা’ হ’লে ধোপা নাপিত ডাক্তার বন্ধি বন্ধ হ’বে, পুকুরে জল সরতে দেবে না, দোকানে জিনিষ কিনতে পাবে না। এ কি খুব সুখের আর সম্মানের জীবন হ’বে, সুরমা? কল কাতায় কেউ তোমাদের কেশস্পর্শ করতে পারবে না। নিজের জোরের উপর থাকবে। তা’র পর তোমাদের ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হবে, সে অনেক দিনের কথা- তখন সমাজের অবস্থাই অন্য রকম হয়ে যাবে।”

সুরমা প্রোপ্রাইটারের দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল, কোন কথা কহিল না।

তখন প্রোপ্রাইটার অন্য দিক হইতে সুরমাকে আক্রমণ করিল; বলিল, “সকলের বড় কথাটাই এখনও বলিনি, সুরমা। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথাটা একবারও ভেবে দেখেছ কি? তা’ যদি দেখ্‌তে, তা হ’লে এ পাগলামীর কথা একবার মনেও স্থান দিতে না।”

প্রোপ্রাইটার ধীরে ধীরে একটি রত্নখচিত ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। বলিল, “এখনি যা’র মুখের একটি কথার জন্যে - কণ্ঠের একটি গানের জন্যে হাজার হাজার লোক নিশ্বাস বন্ধ ক’রে ব’সে থাকে, যা’র পায়ের তলায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বাঙ্গালা দেশের গণ্যমান্য ধনীরা কৃতার্থ মনে করে, দু’ দিন পরে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে, একবার ভাবছ কি? আজ তোমাকে লোক বাঙ্গালা দেশের পাপিয়া বলছে, দু’ দিন পরে ভারতবর্ষের পাপিয়া বলবে, তার পর তোমার নাম সাগর পার হয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। কাগজে কাগজে তোমার ছবি বেরোবে, জীবনকাহিনী প্রকাশিত হ’বে, ট্রামে—ট্রেণে—জাহাজে লোক তোমার গল্প করবে, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রামোফোনে তোমার গান চলবে, হাজার হাজার লোক থিয়েটারে ব’সে তোমার অভিনয় দেখে গান শুনে আত্মহারা হবে, আর তার তিনগুণ লোক টিকিট না পেয়ে নিজেদের অদৃষ্টকে নিন্দা করতে করতে বাড়ী ফিরে যা’বে! যে দিন তোমার অভিনয় থাকে, সে দিন টিকিটঘরের সামনে মারামারিটা একবার দেখবে, সুরমা? তা হ’লে বুঝতে পারবে, কোথায় তুমি স্থান পেয়েছ। এই খ্যাতি, এই সম্মান, এই আদর-উপাসনা ছেড়ে এমন জলজলে ভবিষ্যৎকে নষ্ট ক’রে দিয়ে যে জীবনে যেতে চাচ্ছ, তা’র কাব্য দেখতে দেখতে দুদিনে শুকিয়ে যাবে, তখন অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না। সহর থেকে উপন্যাসে গল্পে পল্লীগ্রাম ভারি চমৎকার; কিন্তু সন্ধ্যা হতেই পায়ে যখন গোখুরা সাপ জড়াবে; মাছি, মশা, পোকা-মাকড়ে জীবন যখন অতিষ্ঠ ক’রে তুলবে; ম্যালেরিয়ায় দেহ যখন জীর্ণ হয়ে আসবে, তখন এই কবিত্বহীন কলকাতার কথাই বারংবার মনে পড়বে; তা’র পর হয় ত এক দিন কুইনাইন মিক্‌শ্চারের বোতল হাতে ক’রে ফিরেই আসতে হ’বে এই কলকাতা সহরে - দুঃখ দৈন্য অভাব অভিযোগের মধ্যে! ছেলেমানুষী কোরো না, সুরমা, তোমার বয়স অল্প, সব কথা তলিয়ে বোঝবার শক্তি হয়নি। আমি তোমার পিতৃতুল্য, আমার কথা শোন; বিয়ে করতে হয় কর, আমিই ব্যবস্থা ক’রে করিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে যেয়ো না। স্বামিস্ত্রী হয়ে তোমরা দু’জনে অভিনয় করতে থাক, আমাদের দেশে একটা নতুন জিনিষ হোক; এত বড় একটা উন্নতির প্রবর্ত্তক ব’লে তোমাদের দুজনের নাম অভিনয়-জগতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বুঝলে?”

সুরমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে!

উৎফুল্ল হইয়া প্রোপ্রাইটর বলিল, "তোমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন কাশীর গুণ্ডাদের হাত থেকে কি ক'রে তোমাকে উদ্ধার করি, সে কথা মনে আছে ত? তার পর এই পাঁচ বৎসর কি রকম ক'রে তোমাকে মানুষ করেছি, বোধ হয়, তাও ভুলে যাও নি? তবে আমার কথার অবাধ্য হয়ো না।"

সুরমা প্রতিশ্রুত হইল, প্রোপ্রাইটারের কথামত পরেশকে স্বীকৃত করিবার চেষ্টা করিবে।

কিন্তু পরেশ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। বলিল, "তা হবে না। বিয়ের পর আর এক দিনও আমি তোমাকে থিয়েটার করতে দেব না।"

সুরমা ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিল, "কিন্তু বিলাতে ত' স্বামিস্ত্রী হয়েও থিয়েটার করে।"

পরেশ কহিল, "তা করুক, আমরা তা করব না।"

প্রোপ্রাইটরের ঔষধ সুরমার মনে সবলে কার্য্য করিতেছিল। অভিনেত্রীর সমুজ্জ্বল জীবনের কাছে গ্রাম্যবধূর অনুজ্জ্বল জীবন নিষ্প্রভ ও নিরানন্দ মনে হইতেছিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরমা ভয়ে ভয়ে কহিল, "কিন্তু বরাবর সহরে থেকে পাড়াগাঁ আমাদের সইবে কি? ম্যালেরিয়া আছে, সাপ-খোপ আছে"

পরেশ একটু হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি, সুরমা, এ আলোচনায় কোন ফল নেই! তোমার এখনও বোঁটা শক্ত আছে। তুমি থাক; আমি কিন্তু চল্লাম।"

কয়েক দিন ধরিয়া সুরমা কাঁদিল কাটিল, অনুরোধ-উপরোধ করিল। কিন্তু পরেশ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, সে রুবি থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বন্যার জলকে রোধ করিবার জন্য প্রোপ্রাইটার একবার চেষ্টাও করিল না, সে আসল জলকে আটকাইয়া রাখিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া বাঁধন দিতে লাগিল।

রুবি থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া পরেশ মনে মনে নিজেকে অভিনেতার জীবন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া লইল; স্থির করিল, দুই চারি দিন কলিকাতায় থাকিয়া অনাবশ্যক দ্রব্যাদি এবং আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া দিয়া, অপর কোন যায়গায় না হইলে, নিজ পল্লী-গৃহে গিয়া বাস করিবে।

দুই চারি দিনের মধ্যে কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠিল না; এমন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত সে পাইয়াছিল যে, কয়েক দিন অলস অবস্থায়েই কাটিয়া গেল। মনের যখন এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট শিথিল অবস্থা, বীণা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হঠাৎ এক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে কহিল, "দেখ পরেশ, আমি সব কথা শুনেছি। তুমি যে প্রকার আঘাত পেয়ে এসেছ, তা জানতে আমার বাকি নেই। তুমি রাগ কোরো না। আমার মনে হয়, তুমি যে আঘাতটা আমাকে দিয়ে এসেছিলে, তারই পাপে এ আঘাতটা তোমাকে সইতে হ'ল।"

পরেশ উদাস অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হবে। অসম্ভব নয়।"

"তবে চল, যে ক্ষতিটা ক'রে এসেছ, সেটা পূরণ করবে চল। যে জিনিসটা ভেঙ্গে দিয়ে এসেছ, সেটা গ'ড়ে দেবে এস।"

প্রোপ্রাইটারের কথা শুনিয়া পরেশ করযোড়ে কহিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, থিয়েটার আর করব না ব'লে আমি স্থির করেছি। আমি যেতে পারব না।"

প্রোপ্রাইটার দুই হস্তে পরেশের যুক্ত কর চাপিয়া ধরিল। বলিল, "তোমার জন্যে না যাও, আমার জন্যে চল; আমার জন্যে না যাও, আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে চল! অবস্থার কথা বেশী কি আর বলব, পরেশ, তাদের দু'বেলার আহারে টান ধরেছে—আমার ছেলেটার দুধ যোগাতে পাচ্ছিনে। অনেক জিনিসই ভাঙ্গে বটে, কিন্তু তুমি যে রকম ক'রে ভেঙ্গে এসেছ, সে রকম করে কোন জিনিসই ভাঙ্গে না।"

প্রোপ্রাইটারের কথা শুনিয়া পরেশের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে কহিল, "আমি গেলে যদি খোকার দুধের ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে কালই আমি যাব। কিন্তু বেশী দিন বোধ হয় আমি থাকতে পারব না।"

উৎফুল্ল হইয়া প্রোপ্রাইটার কহিল, "আসা-যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া সব তোমার হাতে আমি সঁপে দিলাম, তুমি শুধু চল।"

নিষ্ফলতার মধ্যেই কোন্ দিক হইতে শক্তিলাভ করিয়া পরেশ দ্বিগুণ উৎসাহে বীণা থিয়েটারের উদ্ধারসাধনে লাগিয়া গেল। চারুশীলা তাহার হস্তে শিক্ষা পাইয়া দিন

দিন উন্নতি করিতে লাগিল। প্রোপ্রাইটার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে কলিকাতা সহর মুড়িয়া ফেলিল।

অবশেষে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রোপ্রাইটারের ব্যাঙ্কের খাতায় জমার দিক বাড়িয়া চলিল; খোকার দুধের বাটি খাঁটি দুধে ভরিয়া উঠিল।

৮

কিছুদিন পরে রুবি থিয়েটারের আসল জলে কীট দেখা দিল; সুরমা ব্যাধিগ্রস্ত হইল। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল গলক্ষত, সারিতে সময় লাগিবে এবং যত দিন না সারে, কণ্ঠকে পূর্ণরূপে বিশ্রাম দিতে হইবে।

প্রোপ্রাইটার স্বয়ং অর্থব্যয় করিয়া সুরমার চিকিৎসা করাইতে লাগিল। সুরমার অসুখ তাহার নিজের অসুখের চেয়ে বেশী উপেক্ষণীয় ছিল না। কলিকাতার বিখ্যাত যত চিকিৎসক একে একে সকলেই সুরমাকে দেখিল, কিন্তু রোগের কোন উপশম হইল না। ক্রমশঃ স্বর এমন বদ্ধ ও বিকৃত হইয়া আসিল যে, এক দিন সুরমা যে তাহার বাক্যে এবং গীতে এক রঙ্গালয় লোককে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিত, তাহার কোন পরিচয়ই তন্মধ্যে রহিল না। এমন কি, সময়ে সময়ে সুরমা নিজে এবং প্রোপ্রাইটার সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিত।

দীর্ঘ ছয় মাসের পর ডাক্তারেরা স্থির করিল যে, গলক্ষত বলিয়া এত দিন তাহারা যাহা মনে করিতেছিল, তাহা গলক্ষত নহে, ভীষণ ক্যান্সার রোগের সূচনা। তখন যুক্তি পরামর্শের ফলে স্থির হইল যে, অবিলম্বে কণ্ঠের দূষিত স্থলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে। তৎসংক্রান্ত খরচের তালিকা ও পরিমাণ দেখিয়া প্রোপ্রাইটার চিন্তিত হইয়া উঠিল; কিন্তু এত ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া এত দূর অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া নিরস্ত হওয়ার মধ্যে কোন সান্ত্বনাই ছিল না। অগত্যা সেই বহুব্যয়সাধ্য অস্ত্রাঘাত ও তৎপরবর্ত্তী চিকিৎসার ভার প্রোপ্রাইটারকে লইতেই হইল।

অস্ত্রাঘাত হইল এবং তৎপরে তিন মাস বিপুল ব্যয় এবং সেবার পর সুরমা ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের বিশেষ কোন উন্নতি হইল না। প্রোপ্রাইটার অধীর হইয়া উঠিল এবং পুনরায় কয়েক জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে একত্র করিয়া সুরমার কণ্ঠ পরীক্ষা করাইয়া পরামর্শ লইল। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, সুরমা রোগমুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই, এইরূপই বিকৃতস্বর চিরদিন থাকিয়া যাইবে।

তখন ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে প্রোপ্রাইটারের বিলম্ব হইল না। অকর্ম্মণ্য এবং উপকারহীন সুরমার প্রতি অর্থব্যয় করিবার আর কোন কারণই বর্ত্তমান রহিল না। বিকল যন্ত্রে তৈলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ অর্থহীন বলিয়া মনে হইল।

ডাক্তারদের অভিমত জানিতে পারিয়া সুরমা দুঃখে, চিন্তায় এবং নৈরাশ্যে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর যখন বুঝিতে পারিল এক দিন যে ব্যক্তি স্বর্ণময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে পথিভ্রষ্ট করিয়াছিল, সে সময় বুঝিয়াই একেবারেই অদৃশ্য হইয়াছে, তখন দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত তমসাবৃত ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিয়া তাহার দুই চক্ষু বিদীর্ণ করিয়া জল ভরিয়া আসিল। প্রোপ্রাইটারের অন্তর্ধানে সে বুঝিতে পারিল, যাহা লইয়া এত দিন তাহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। থাকিবার মধ্যে রহিল শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণার্ত্ত দেহের বোঝা, যাহার ভার তাহাকে এখন হইতে নির্দ্দয়ভাবে চূর্ণ করিবে। তবে কি এই স্থূল দেহটার রক্ত-মাংসের সাহায্যে এখন হইতে জীবনধারণ করিতে হইবে! উদার উন্মুক্ত সাগরবক্ষ হইতে তবে কি এবার দুর্গন্ধ পল্বলের পঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে! মনের মধ্যে শিহরিয়া উঠিয়া সুরমা সভয়ে এই বীভৎস চিন্তাধারাকে সংবরণ করিল।

পরেশের কথা মনে পড়িল। তাহাকে শুভ সুন্দর জীবনের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য সে এক দিন আসিয়াছিল। কিন্তু অর্থের লোভে, যশের লালসায় সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এখন পরেশ যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত, আর সে অবনতির ধূলিকঙ্করে অবলুণ্ঠিত! এখন আহত গৌরব লইয়া পরেশের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! আজ প্রোপ্রাইটারের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিত ছিল, "তোমার অসুখের সময়ে আমাকে বাধ্য হইয়া প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। বিলগুলি

দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অপ্রয়োজনে একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই। ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ তুমি এই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। আশা করি, অবিলম্বে তুমি এ ঋণ পরিশোধ করিবে।" ঋণ পরিশোধ করিতে সুরমা সমর্থ না হইলে সহরের এক জন ধনবান্ যুবক এক বিশেষ সর্ত্তে তাহাকে ঋণমুক্ত করিতে প্রস্তুত আছে—সে কথাও তাহাতে লিখিত ছিল। প্রোপ্রাইটার লিখিয়াছিল, "আমি তোমার পিতৃতুল্য হিতৈষী—আমার মনে হয়, এ ব্যবস্থা হইলে তোমার বাকি জীবন সুখে সমাদরে কাটিবে—ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।"

চিঠিখানা সম্মুখে পড়িয়া ছিল। চিঠির কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সুরমা মনের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল। বুঝি বা অবশেষে এই সর্ত্তেই স্বীকৃত হইতে হয়! জঠরের ক্ষুধার নিকট অন্তরের প্রবৃত্তিকে বুঝি এমনই করিয়াই বলি দিতে হয়! দুঃখে ও অপমানে সুরমার দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল।

"মা, এক জন বাবু দেখা করতে এসেছেন।"

সুরমা চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "কে বাবু?"

পরিচারিকা বলিল, "নাম বল্লেন, পরেশ মিত্র।"

সুরমার মুখ সীসার মত ফিকা হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "ডেকে নিয়ে আয়।"

পরেশ প্রবেশ করিয়া বিমূঢ় সুরমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বীণা থিয়েটারে একেবারে ইস্তফা দিয়ে এসেছি, সুরমা!"

সুরমা অস্পষ্ট বিহ্বল-কণ্ঠে কহিল, "কেন?"

পরেশ তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মী ক'রে আমার দেশের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে!"

সুরমা অপলক-নেত্রে ক্ষণকাল পরেশের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "কিন্তু—" আর কোন কথা তাহার অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না।

পরেশ আগাইয়া আসিয়া হাস্যমুখে কহিল, "আর কিন্তু নয় সুরমা, এবার অতএব!"

দুইখানি ব্যাকুল হস্ত দৃঢ়বন্ধনে পরেশের পদদ্বয় বেষ্টিত করিয়া ধরিল এবং একরাশি শিথিল বিস্রস্ত কেশজালে সেই হস্ত পদের শুভযোগ আবৃত হইয়া গেল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

করবী

প্রভাতের মন্দবায়ে মুখটি তুলে'
করবি, বল্‌তে কি চাস্ ঘোমটা খুলে'?
ওলো ও রঙ্গভরা
ছি ছি! আজ পড়্‌লি ধরা
অরুণের রূপের হাটে, লজ্জা ভুলে'!

আরো ত পাড়ায় তোর ওই গুল্মে গাছে
চেয়ে ত্থাখ্, এক বয়সী অনেক আছে;
কেহ বা পাতার আড়ে
লুকিয়ে ঘাড়টি নাড়ে—
বড় জোর গল্প করে হাওয়ার কাছে।

চাঁপা, সে উচ্চকুলের স্বর্ণরাণী
তারো কি অমনি খোলা আননখানি?
সেও ত্থাখ্ শাখায় পাতায়
লুকিয়ে গন্ধে মাতায়,
তারো ত তোর মত নয় আনচানানি!

করবি, তোরেই তবু ভালোই বাসি,
হেরি তোর মন-মাতানো মুখের হাসি;
জানি, সে আপনা-ভোলা
সে যে হয় ঢাকনা-খোলা,
দেখি, সে সকল ভুলে' হয় উদাসী,
করবি, তাইতে তোরে ভালোই বাসি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি।

লৌহতত্ত্ব

১

যে কোন লোক প্রথমে নিভৃত শান্ত পল্লীভবন হইতে কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করেন, নগরীর বিশালতা তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। অগণিত হর্ম্ম্যশ্রেণী, বিশাল রাজবর্ত্ম, নানাদেশীয় অসংখ্য মনুষ্যস্রোতঃ দেখিয়া তাঁহাকে কতকটা চকিত, কতকটা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সারি সারি লৌহস্তম্ভের উপর টেলিগ্রাফের, টেলিফোনের ও বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রবাহিণীর তার, রাস্তায় লৌহের রেলের উপর বৃহৎকায় ট্রামগাড়ীসমূহ, যোযান, অশ্বশকটের শ্রেণী, দ্রুত সঞ্চরণশীল ও মধ্যে মধ্যে বিকট নিনাদকারী মোটর। দেখিয়া মনে হয় যেন, একটা বিরাট কর্ম্মশালার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, ইহা এই কর্ম্মশালার অধ্যক্ষ ইংরাজ জাতির বিপুল শক্তির পরিচায়ক। ইহার কোনটারই সহিত তিনি তাঁহার পল্লী-জীবনের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পায়েন না; এই যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকটা নিদর্শন কলিকাতা মহানগরী, ইহার সহিত ভারত ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ কোথায় বা কতটা, এই প্রশ্নটি মনে জাগে; সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্যতার মূল উপাদান কোনগুলি, তাহাও চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। শক্তিসাধক পাশ্চাত্যজাতি কোন কৌশলে, কোন্ কোন্ উপাদান লইয়া আধিকালি জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, মনে স্বতঃই সে প্রশ্ন উঠে। দেখিতে পাই, পূর্ব্বে যে স্থানে পশুর শক্তি ও শ্রমজীবী মানবের শক্তিতে মানুষ নিজের কার্য্য সকল করাইত, আজ অগ্নির উত্তাপশক্তি, জলপ্রপাতের ভীষণ বেগশক্তি, বায়ুতরঙ্গের উদ্দাম গতিশক্তি, বাষ্পের সম্প্রসারিণী শক্তি ইত্যাদিকে তথায় মানুষ দাসরূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আর সে এই শক্তিপুঞ্জকে যে আধারমধ্যে বদ্ধ করিয়া এই দাসত্বে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, লৌহধাতু তাহার মধ্যে অন্যতম। মানুষমাত্রই বল, আর জাতিমাত্রই বল, শক্তিমানকে কে না পূজা করে? যে দিন ভারতের ক্ষেত্রে ইংরাজজাতি লৌহবর্ত্ম পাতিয়া বাষ্পীয় যান চালাইল, ভারতবাসী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে এই শক্তির পরিচয় দেখিল। যে দিন ভারতের উপকূলে বাষ্পীয় অর্ণবপোত আসিয়া লাগিল, সে দিন ভারতবাসী এই নবশক্তির পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইল। দিনের পর দিন ভারতের সহিত প্রতীচীর সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই প্রতীচীর নব নব শক্তির ব্যবহারের নিদর্শনে ভারতবাসী নিজেকে অকর্ম্মণ্য বোধ করিতে লাগিল।

প্রতীচীর এই শক্তিসাধনার মূলে ধাতুতত্ত্ববিদ্যা বিশেষতঃ লৌহধাতুতত্ত্বজ্ঞান যে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা শিল্প-বিজ্ঞানের পাঠকমাত্রই জানেন। অথচ ভারতের জনসাধারণের গৃহে ভারতের বিশাল কৃষিক্ষেত্রে লৌহ ও লৌহজ নানা বস্তুনিচয়ের ব্যবহার দেখিতে পাই, এবং সামান্য অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, সেই বস্তুনিচয় এ দেশজাত নহে; সমস্তই প্রতীচীর কর্ম্মশালা হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছে। এখন আমরা নিজেদের ব্যবহার্য্য ধাতুনিচয় নিজেরা উৎপাদনে অক্ষম, তখন আমরা এই বর্ত্তমান যুগের শক্তিসাধনার অধিকারী নহি, এ কথাটা যেন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, আমরা ভারতবাসী—আমরা কি চিরকাল এই অবস্থায় ছিলাম? এই যে কৃষি-প্রধান ভারত, ৩৩ কোটি মানবের বাসভূমি, ইহাতে কেবল ভূমিকর্ষণের জন্য যে লৌহের হল প্রয়োজন হয়, তাহা কি য়ুরোপীয়গণ চিরকাল আমাদিগকে যোগাইত? কাষ্ঠচ্ছেদন, মৃত্তিকাখনন, গৃহনির্ম্মাণের জন্য যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাও কি চিরকাল য়ুরোপ আমাদিগকে পাঠাইত? শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ভারতবাসী শক্তিশালী সমরপরায়ণ জাতি ছিল, কোন্ জাতি তাহাদের যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদিই বা যোগাইত? আর প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে যে ধাতুনির্ম্মিত তৈজসপত্রাদি আছে, তাহাও কি পাশ্চাত্যজাতির নিকট পাইতাম? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে একটা কথা জানিতে পারি,

য়ুরোপীয়ের সহিত আমাদের এই ভাবের বাণিজ্যসম্বন্ধ দীর্ঘকালব্যাপী নহে।

তবে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের নিজেদের কথা য়ুরোপীয়ের মুখে না শুনিলে

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ।

যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। এই অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পাই যে, ভারতভূমি পুরাকালে যে কেবলমাত্র পরাবিদ্যা, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চ্চায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু নানা সাধারণ ব্যবহারিক উপাদানের জ্ঞান বহুপূর্ব্বে ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরীতে বৃটিশ সমিতির অধিবেশনে সভাপতি স্যর জন্ হীক্স (Sir John Hickshaw) বলেন, খৃষ্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে বহু পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হইত এবং প্রতীচ্যের সভ্য-জগতে ভারত হইতেই লৌহ সরবরাহ হইত। প্রতীচ্য ধাতুতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাও স্বীকার করেন যে, খনিজ প্রস্তর হইতে লৌহ ও ইস্পাত নিষ্কাশন ভারতেই প্রথম হইয়াছিল।

এই সকল বিবরণ যে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থে আবদ্ধ আছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান দিল্লী সহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে বিখ্যাত কুতব মিনারের প্রাঙ্গণে যে বিশাল লৌহস্তম্ভ আছে, তাহা জমীর উপরে ২২ ফুট উচ্চ এবং ভূগর্ভেও ৩ ফুটের অধিক প্রোথিত আছে। ইহার নিম্নদেশের ব্যাস প্রায় ১ হাত (১৬।০ ইঞ্চ) এবং ইহা ওজনে ১৬৫ মণের অধিক। ইহার গায়ে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা চন্দ্র নামক নরপতির গুণাবলীকীর্ত্তন। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে ইনি মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। এই নিষ্কলঙ্ক লৌহস্তম্ভ বিশুদ্ধ লৌহ ধাতুতে নির্ম্মিত বলিয়া রাসায়নিকরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। রসায়নবিৎ রস্কো (Roscoe) এবং শরলেমার (Schorlemmer) তাঁহাদের রসায়ন পুস্তকে এই ভাবের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "হিন্দুগণের লৌহধাতু নির্ম্মাণের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয়স্বরূপ এই বিশাল স্তম্ভ আজিও দণ্ডায়মান আছে। বর্ত্তমান প্রতীচ্যের বৃহৎ কর্ম্মশালায় বাষ্পীয় মুদ্গরের সাহায্যেও এরূপ প্রকাণ্ড লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিরূপে কোন্ কৌশলে যন্ত্র সাহায্য ব্যতিরেকে হিন্দুগণ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।"

তদ্ব্যতীত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রস্তরযোজনার নানা স্থানে নানা প্রকারের লৌহকীলকের ব্যবহার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার "উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব" পুস্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সময় যে মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি পুরীর প্রধান মন্দির হইতে রথোপরি লইয়া যাইয়া দশ দিনের জন্য রক্ষিত হয়, তাহার নাম 'গুণ্ডিচা মন্দির।' দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবলমাত্র এই মন্দিরনির্ম্মাণে ভিন্ন মাপের

পুরাতন কামান।

২ শত ৩৯ খণ্ড কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে। কনার্কের সূর্য্যমন্দির-নির্ম্মাণে ৩০ খণ্ড নানা ব্যবধানের লৌহের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৃহত্তমটি ৩৫ ফুট লম্বা ও ওজনে ৭৫ মণ। পুরাতন মালবের রাজধানী ধার নগরীতে আর একটি বৃহৎ স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে স্তম্ভের ৩ খণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং মধ্যভাগের খণ্ডটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সকল খণ্ড সংযোজন করিলে দৈর্ঘ্যে ৪১ ফুট হয় এবং ওজনে ২ শত মণেরও অধিক হইবে, এইরূপ অনুমিত হয়। আবুপর্ব্বতের অচলেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে ১৩ ফুট উচ্চ এক বিরাট ত্রিশূল দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, পর্ব্বত আক্রমণকারী পরাজিত মুসলমান সেনার অস্ত্রে এই ত্রিশূল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যখন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবর্ত্তন মুসলমানরাজত্বকালে এ দেশে হইয়াছিল, তখন নানা প্রদেশের রাজন্যবর্গ বহুসংখ্যক নানা আকারের কামান এ দেশের শিল্পিগণের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহারও কয়েকটি আজিও ধ্বংসরাশির মধ্যে লক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদে, ঢাকা সহরে, বিজাপুরে, গুলবর্গার দুর্গপ্রাঙ্গণে হিন্দু শিল্পিগণের শিল্পদক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ কামান আজিও রহিয়াছে।

যে ডামাস্কস্ তরবারির সুখ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত, তাহার ইস্পাত নিজাম প্রদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে প্রস্তুত হইত এবং সুদূর পারস্য হইতে বণিক্‌বৃন্দ আসিয়া তাহা তথা হইতেই লইয়া যাইত, এ কথা বিল্‌গ্রামী (Bilgrami) মহাশয় ইংলণ্ডের বিখ্যাত "লৌহ এবং ইস্পাত সমিতি"র পত্রিকায় (Journal of the Iron and Steel Institute) বিবৃত করিয়াছেন। আর যে কেহ সারনাথের বৌদ্ধবিহারের কঠিন প্রস্তরের স্তম্ভ সকল, সাঞ্চীর স্তূপের তোরণদ্বার, বুদ্ধগয়ার বিরাট প্রস্তর মন্দির, মাদুরার বিশালকায় মন্দিরের ও ভাস্করশিল্পের ও তক্ষণশিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন; যে কেহ ভারতময় পরিব্যাপ্ত অগণিত নানাজাতীয় কঠিন প্রস্তরনির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন; আর যে কেহ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে অন্যতম, যেন স্বপ্নে প্রণোদিত, মর্ম্মরনির্ম্মিত তাজমহলের দিকে একবার চাহিবেন, তিনি নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, সেই সকলের নির্ম্মাণকল্পে শিল্পিগণ তাঁহাদের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিবার জন্য অবশ্যই সুকঠিন ও তীক্ষ্ণধার লৌহাস্ত্র সকল ব্যবহার করিতেন। অনেক পুরাতত্ত্ববিদের মতে প্রাচীন মিশরের কঠিন প্রস্তরক্ষোদিত মূর্ত্তিসমূহ ও বিশাল প্রস্তরমন্দিরসমূহ ভারতজাত উৎকৃষ্ট লৌহাস্ত্রের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই সকল লৌহ ও ইস্পাতের অস্ত্রের যথোপযুক্ত কাঠিন্যসম্পাদনের জন্য তাহাতে 'পান' দিতে হইত। এই 'পান'-বিষয়ক জ্ঞান তাহাদের অজ্ঞাত থাকিলে এ সকল নির্ম্মাণ অসম্ভব হইত।

সুশ্রুতের ব্যবচ্ছেদশাস্ত্রে নানা আকারের সুতীক্ষ্ণ সূক্ষ্মধার যে সকল অস্ত্রের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সপ্রমাণ হয় যে, সে কালের অস্ত্রশিল্পিগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট কুশলী ছিলেন। এখনও রাজন্যবর্গের গৃহে যে সকল পুরাতন দেশজাত তরবারি দৃষ্ট হয়, তাহার তীক্ষ্ণতা ও বিমলতা আধুনিক প্রতীচ্যের কর্ম্মশালায় প্রস্তুত অস্ত্রে পাওয়া দুষ্কর। কোন্ উপাদানে এই সকল অস্ত্র নির্ম্মিত হইত এবং কোন্ প্রথায় ইহাতে 'পান' দেওয়া হইত, বর্ত্তমান ভারতবাসীর তাহা অজ্ঞাত।

প্যারিসের সন্নিকটে সেভ্র (Sevres) নগরীতে মাপযন্ত্র এবং ওজন পরিমাণের এক আন্তর্জ্জাতিক পরীক্ষাগৃহ আছে (Bureau International Poids et Mesures) তথাকার অধ্যক্ষ মুঁসিও গিওম্ (M. Guillaume) ইনভার (Invar) নামক মিশ্র লৌহধাতুর আবিষ্কর্তা।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনার সময় ইস্পাতে 'পান' দেওয়ার কথা উঠে। তিনি আমাকে ভারতীয় অস্ত্রশিল্পিগণের তরবারিতে 'পান' দিবার একটা ব্যবস্থার কথা বলেন। তাহা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তরবারিতে 'পান' দিতে হইলে সাধারণতঃ তরবারি বেশ লাল করিয়া উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ শীতল জলে ডুবাইতে হয়। এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু হিন্দু শিল্পিগণের 'পান' দিবার প্রথার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। 'পান' দিবার পূর্ব্বে কর্ম্মশালার সম্মুখে এক জন অশ্বারোহীকে রাখা হইত। যখন তরবারি অগ্নিতে পুড়িয়া বেশ লাল হইত, সহসা এই অশ্বারোহী তরবারি ফলক লইয়া সবেগে অশ্বকে পরিচালিত করিত,—সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে ফলক ঘুরাইত। এই ভাবে তরবারিতে উত্তম 'পান' হইত। বায়ুর সাহায্যে উত্তপ্ত লৌহ সহসা শীতল হইয়া যে 'পান'

হয়, তাহার তথ্য বর্ত্তমান ধাতুতত্ত্ববিদগণ অতি অল্পদিন হইল পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য্য যে, সাধারণ লৌহ বা ইস্পাত এ ভাবে 'পান' দেওয়া যায় না, কয়েকটি মিশ্র লৌহ ধাতুকে এই প্রথায় 'পান' দেওয়া যাইতে পারে। এই তথ্য যে ভারতীয় শিল্পিগণের জ্ঞাত ছিল, তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন্ গ্রন্থে এই প্রকরণের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গ্রন্থের নাম বলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, আমি ভারতবাসী, আমার তাহা জানা উচিত। আমরা নিজেদের শাস্ত্রের বিষয়ে এত শ্রদ্ধাহীন ও আমাদের তৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এত অল্প যে, তাহা বলিতেও লজ্জিত হইতে হয়। যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক আমাকে এ বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট বাধিত হইব।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতে লৌহ" নামক পুস্তিকায় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার পুস্তক হইতে অনেক সন্ধান গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী।

ভারতে উৎপন্ন লৌহ সম্বন্ধে যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা গেল। তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, ভারতবাসীর ধাতুবিদ্যার জ্ঞান যে ছিল না, তাহা নহে। তবে বর্ত্তমান প্রতীচীতে যে সকল ধাতু নিষ্কাশনের বিরাট কর্ম্মশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার মূলে গত উনবিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবিত যে নানা প্রকারের শক্তিসংযোজিনী যন্ত্রাগার (Motive Power Engines), তাহার তথ্য ভারতবাসীর অজ্ঞাত ছিল।

যে অবসাদের যুগ ভারতে আসিলে, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি নানা বহির্জ্জাতি ভারত আক্রমণে সমর্থ হইয়াছিল ও ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, আত্ম-চেষ্টায় বিশ্বাসস্থাপন, স্বাধীন চিন্তা দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। কেন যে এই অবসাদ আসিয়াছিল, কোন্ কার্য্য-পরম্পরা ও ঘটনাবলী এই অবসাদের নিদানীভূত হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকরা বলিতে পারিবেন এবং তাহা এত জটিল যে, নির্দ্ধারণ করা অতীব সুকঠিন। আমি ঐতিহাসিক নহি, সুতরাং আমি এই জটিল সমস্যার সমাধানে অসমর্থ। যখন প্রতীচী ঐ শক্তির ব্যবহারের যন্ত্রাবলী উদ্ভাবনে ও নির্ম্মাণে ব্যস্ত, তখন আমরা অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর তাড়নায় ব্যস্ত ; তাই এই অবস্থা।

এক্ষণে এ প্রবন্ধে জগতের নানা স্থানে কি ভাবে ও কি পরিমাণে লৌহ ধাতুর পরিব্যাপ্তি পণ্ডিতরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানের বিভিন্ন সভ্য পাশ্চাত্য জাতি কি প্রথায় কত পরিমাণে লৌহ ধাতু নিষ্কাশন করিতেছেন, তাহার একটা সামান্য বিবরণ প্রকাশ করিব এবং পাশ্চাত্য প্রথানুসারে যে ভাবে ভারতে লৌহ নিষ্কাশনের সূচনা হইয়াছে, তাহার কথাও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

খনিজ লৌহ প্রস্তর ও তাহার পরিব্যাপ্তি

মার্কিণ দেশীয় পণ্ডিত এফ্ ডব্লিউ ক্লার্ক (F. W. Clarke) মহাশয় নানা গবেষণার পর ভূকঙ্কালের উপাদান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নের তালিকাতে তাহার একটু আভাস দিলাম।

শতকরা	অম্লজান	৫০ ভাগ
"	বালুকার মূল উপাদান সিলিকন	২৬ "
"	মৃত্তিকার " " আলুমিনিয়ম	৭·৪৫ "
"	লৌহ	৪·২০ "
"	চূণের মূল উপাদান ক্যালসিয়ম	৩·২৫ "
"	ম্যাগ্নেসিয়ম	২·৩৫ "
"	লবণের মূল উপাদান সোডিয়ম	২·৪০ "
"	সোরার মূল উপাদান পটাসিয়ম	২·৩৫ "

অন্যান্য উপাদানের ভাগ শতকরা একেবারে কম হওয়ায় এই তালিকাভুক্ত করা গেল না।

যাহাকে চলিত ভাষায় মৃত্তিকা বলা যায়, তাহা অম্লজান, আলুমিনিয়ম্ ও সিলিকনের সংযোগে গঠিত বলিয়া রাসায়নিকরা নির্দ্দেশ করেন এবং বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দুগ্ধফেননিভ শ্বেতবর্ণ হওয়া উচিত, এই কথা বলেন।

সাধারণ মৃত্তিকার বর্ণ বাস্তবিক লৌহসংযোগে এইরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, এবং সাধারণ মৃত্তিকা পোড়াইলে যে রক্তবর্ণ ইষ্টক হয়, তাহাও লৌহের সাহচর্য্যহেতু। আর কৃষ্ণ, পীত, লোহিত, নীলাভ, যে সমস্ত প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদেরও বর্ণ-বৈচিত্র্য লৌহসংযোগে হয় বলিয়া

পণ্ডিতরা নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং লৌহ পৃথিবীময় পরি-ব্যাপ্ত, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশুদ্ধ লৌহ ধাতু ভূপৃষ্ঠে কুত্রাপি পাওয়া যায় না, এ কথা বলা চলে; আকাশ-পতিত উল্কাতে ও আগ্নেয় গিরির স্রাবপ্রস্তরের মধ্যে কখন কখন ইহা সামান্য পরি-মাণে পাওয়া যায়। লৌহের পরিব্যাপ্তি যখন পৃথিবীময় এত বিস্তৃত, তখন সহসা মনে হইতে পারে যে, পৃথিবীর জাতিনিচয় নিজেদের ব্যবহার্য্য লৌহ ধাতু স্বদেশ হইতেই আহরণ করিবে না কেন? কিন্তু লৌহ ধাতু নিষ্কাশন অতীব দুরূহ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ধাতুতত্ত্ববিদগণ যে সকল পদার্থ হইতে লৌহনিষ্কাশন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, তদ্বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভূতত্ত্ববিদগণ খনিজ পদার্থমাত্রকেই "প্রস্তর" (Ore) এই আখ্যা দিয়া থাকেন। তবে কোনটাকে লৌহপ্রস্তর, কোনটাকে তাম্রপ্রস্তর, কোনটাকে সীসপ্রস্তর, কোনটাকে গন্ধকপ্রস্তর বলা যাইবে, এ বিষয়ে একটা নিয়ম নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। প্রস্তরমাত্রেই যখন একের অধিক উপাদানে গঠিত, তখন যে যে প্রস্তর হইতে যে যে ধাতু সহজে নিষ্কাশন করা যায়, তাহাকে সেই ধাতু প্রস্তর নাম দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তর সাধারণতঃ কলিকাতার রাস্তা তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহারও উপাদানমধ্যে শতকরা ৩ হইতে ৭ ভাগ লৌহ আছে এবং লৌহ যেমন চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, এই প্রস্তরমধ্যে অনেক সময় সেইরূপ এক এক খণ্ড প্রস্তর পাওয়া যায়, যাহা চুম্বক কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই প্রস্তর হইতে লৌহনিষ্কাশন এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সেই জন্য এই প্রস্তরকে লৌহ-প্রস্তর বলা যায় না। অনেক প্রস্তর পাওয়া যায়, যাহাতে ৪০ ভাগেরও অধিক লৌহ থাকে; তবে গন্ধকের সহিত এরূপ রাসায়নিক সংযোগে তাহা গঠিত যে, তাহা হইতে গন্ধক দূরীকরণ বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে অসম্ভব বা ব্যয়সাধ্য। এ জন্য সে সকল প্রস্তরকে লৌহ-প্রস্তর না বলিয়া গন্ধক-প্রস্তর বলা যায়। তবে ভবিষ্যতে যদি লৌহ হইতে গন্ধকের পৃথক্‌করণ কোন সহজসাধ্য প্রথা দ্বারা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হয়, তবে তখন ইহা লৌহ-প্রস্তর বলা যাইতে পারিবে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ফস্ফরাস-দুষ্ট লৌহ-প্রস্তর হইতে ফস্ফরাসের পৃথক্‌করণের প্রথা অজ্ঞাত ছিল। সেই কারণে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রস্তরখনি হইতে উত্তোলিত বহু পরিমাণ লৌহ-প্রস্তর পুনরায় ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রথানুসারে সেই প্রস্তর হইতে অনায়াসে লৌহনিষ্কাশন সম্পাদিত হইত এবং এই জ্ঞানের অভাবে মূল্যবান্ লৌহ-সম্পদ এক রকম অব্যবহার্য্য হইয়াছে; তদ্ব্যতীত টিটানীয়ম (Titanium) আর্সেনিক সংযোগে প্রস্তরকে দূষিত করে এবং লৌহের পরিমাণ যথেষ্ট থাকিলেও তাহা হইতে বিশুদ্ধ লৌহনিষ্কাশন সহজসাধ্য না হওয়ায় তাহাকেও "লৌহ-প্রস্তর" আখ্যা দেওয়া যায় না।

রাসায়নিক উপাদানের পার্থক্যহেতু লৌহ প্রস্তরকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১ম। চৌম্বক, ম্যাগনেটাইট (Magnetite) অতি বিশুদ্ধ প্রস্তর। ইহাতে শতকরা ৬০ হইতে ৬৫ ভাগ নিষ্কাশন-যোগ্য লৌহ থাকে। নরওয়ে, উত্তর ও মধ্য সুইডেন প্রদেশে এই প্রস্তরের বিশাল ক্ষেত্র আছে। অতি বিশুদ্ধ সুইডীস লৌহ এই প্রস্তর হইতে নিষ্কাশিত হয়। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে তথা হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে প্রস্তর রপ্তানী হয়।

জার্ম্মাণীর থুরিঙ্গিয়া প্রদেশে হার্জ (Harz) পর্ব্বতের সান্নিধ্যে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসীয়া অঞ্চল ও ভারতে উড়িষ্যার দক্ষিণে মহারাজা ভিজিয়ানাগ্রামের তালুকের এক পর্ব্বতের শিখর-দেশ এই প্রস্তরে পরিপূর্ণ।

২য়। গৈরিক হেমেটাইট (Hamatite) ইংলণ্ডের লাঙ্কাসায়ারে কম্বরলাণ্ড বিভাগে এই প্রস্তর লৌহনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তর স্পেনের বিলবাও নগরীর সান্নিধ্যে এল্‌বা দ্বীপে, মার্কিণের যুক্তরাজ্যে, রুসিয়ার ক্রিভোয়গ্রস্ (Krivoigros) অঞ্চলে ইহার বিশাল খনি আছে। ভারতের ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে যে প্রস্তর লক্ষিত হইয়াছে, তাহাও এই জাতীয়। চীনের মঙ্গোলিয়ায় ও কোরিয়া প্রদেশে এই জাতীয় প্রস্তরের খনি আছে।

৩য়। পাটল প্রস্তর, লিমোনাইট (Lemonite) পোলাণ্ডে, উত্তর ফরাসীদেশে বেলজিয়মে, লক্সেমবর্গে, আল-সাস্ লোরেন ক্ষেত্রে, জার্ম্মাণীর রুর উপত্যকায়, রুসিয়ায়,

স্পেনে, স্কটলাণ্ডের কয়েক স্থানে, মার্কিণের যুক্তরাজ্যে এই জাতীয় প্রস্তর বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ভারতের নানা স্থানেও এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

৫র্থ। স্প্যাথিক প্রস্তর (Spathic Iron Ore) অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরির নানা স্থানে, বেলজিয়মে, জার্ম্মাণীর নানা প্রদেশে, স্পেনদেশে, ফরাসীদেশের নানা বিভাগে ভূরি পরিমাণে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। আমাদের রাণীগঞ্জের নিকটে এই জাতীয় প্রস্তর হইতে প্রথমে লৌহ-নিষ্কাশন প্রবর্ত্তন হয়।

এক্ষণে এই লৌহ-প্রস্তর কি ভাবে বর্ত্তমান জগতের নানা স্থানে ব্যাপ্ত আছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের ষ্টকহল্‌ম নগরীতে আন্তর্জ্জাতিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের (Geologists) এক সভা হয়। পণ্ডিতবর্গ জ্ঞাত এবং পরীক্ষিত ভূপৃষ্ঠে ১২ লক্ষ কোটি টন লৌহ প্রস্তর এবং তাহা হইতে ন্যূনাধিক ৭০ লক্ষ কোটি টন লৌহ ধাতু নিষ্কাশিত হইতে পারে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। যে ভাবে বর্ত্তমানে নিষ্কাশনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রসার যে গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, এই লৌহের অধিকাংশ ভাগই এই বিংশ শতাব্দীতেই নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা। তবে য়ুরোপখণ্ডের ও মার্কিণের যুক্তপ্রদেশের খনিজ তথ্যানুসন্ধান একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে মাত্র; এসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডের বহু স্থান বর্ত্তমানে পরীক্ষিত হয় নাই। বিগত ২০ বৎসরের অনুসন্ধানফলেও ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের পণ্ডিতগণ বিস্তীর্ণক্ষেত্র পাপ্তিসম্বন্ধে কতকটা হতাশ্বাস হইয়াছিলেন। এবং গত ১৫ বর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাপ্রদেশের বিশাল লৌহ প্রস্তরক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমিত হয় যে, ভারত মধ্যেই অন্যান্য স্থানে আরও অনেক অজ্ঞাত ক্ষেত্র আছে। অতি বিশাল চীনরাজ্য এখনও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে। আফ্রিকার প্রদেশসমূহের পরীক্ষার সূচনা হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যানীর মধ্যে কত বিশাল ক্ষেত্র গোপনে রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? অষ্ট্রেলিয়ার মহাপ্রদেশের সামান্য প্রদেশমাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীতে আরও কত ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার।

বর্ত্তমানে য়ুরোপখণ্ডে ফরাসীজাতি প্রস্তর-সম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলা যাইতে পারে। ইহাদের অধিকারে যে সকল প্রদেশ আছে, সে সকল হইতে ৩ লক্ষ কোটি টন প্রস্তর উদ্ধৃত হইবে। সুইডেন ও নরওয়েতে মোটামুটি ২ লক্ষ কোটি টন, ইটালীর সন্নিহিত এল্‌বা দ্বীপে লক্ষ কোটি টন, গ্রেটবৃটেনে অর্দ্ধ লক্ষ কোটি, স্পেনে অর্দ্ধ লক্ষ কোটি টন পাইবার সম্ভাবনা। রুসিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যের কথা সবিশেষ কিছুই বলা যায় না। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ২ লক্ষ কোটি টন, তৎসন্নিহিত কিউবা দ্বীপে লক্ষ কোটি টন, দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে ২০ লক্ষ টনের সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে।

গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পরস্পর যুধ্যমান জাতিবৃন্দের ধাতুতত্ত্ববিদ্যা ধাতুসম্পদ যথাযথভাবে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় বিষয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা য়ুরোপীয় মনীষিবর্গ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

জার্ম্মাণীর মহাশক্তির মূলে তাহার ধাতুসম্পদ ও ধাতুতত্ত্ববিদ্যা কি ভাবে সমরাঙ্গনে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সমগ্র পৃথিবীর লৌহসম্পদ অন্যান্য ধাতুর তুলনায় কোন স্থান অধিকার করে, তাহা সামান্য উদাহরণেই পরিস্ফুট হইবে। বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে মূল্যবান স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি ধাতুর মূল্য শত কোটি মুদ্রাতে পরিগণিত হয়, এবং ঐ সময়ে লৌহ ও কয়লা তদপেক্ষা সতগুণ মূল্যে নিষ্কাশিত হইয়াছিল। মূল্য ব্যতিরেকে যদি পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে লক্ষিত হয় যে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র ৮ কোটি টন লৌহ নিষ্কাশিত হয়, ১০ বৎসর পরে তাহা অষ্ট কোটিতে পরিণত হয়। একরূপ সংখ্যা সাধারণতঃ ধারণার বহির্ভূত বলিলেও চলে, তবে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে গেলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এক বৎসরে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ লৌহ নিষ্কাশিত হয়, তাহাতে কেহ যদি একটা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে এবং স্তম্ভের ব্যাস যদি ১ শত ফুট হয়, তবে স্তম্ভের শীর্ষদেশ জমী হইতে সাড়ে ৮ ক্রোশ উচ্চে থাকিবে। কলিকাতার ময়দানে স্তম্ভটি বসাইলে স্তম্ভের পায় মধ্যভাগ হইতে হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ লক্ষিত হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে য়ুরোপখণ্ডে বহুকাল ধরিয়া ইংলণ্ড লৌহ-প্রস্তর উদ্ধারে এবং লৌহনিষ্কাশনে

নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, বিশাল নৌবাহিনী, বিপুল শিল্প বাণিজ্যসম্পদে সভ্যজগতে তাহার স্থান সর্ব্বোচ্চে ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একা ইংলণ্ড ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন লৌহ তাহার খনি হইতে উত্তোলন করিত, মার্কিণরাজ্য এবং জার্ম্মাণী প্রত্যেকে ৭০ লক্ষ টন মাত্র উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল। ১০ বৎসর পরে মার্কিণরাজ্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন আহরণে কৃতকার্য্য হয়। এ দিকে ইংলণ্ডে উহা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া ১ কোটি [illegible] লক্ষ টনে পরিণত হয়। আরও ১০ বৎসর পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী শিল্প বাণিজ্যে প্রসার লাভ করিয়া ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন এবং যুক্তরাজ্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন উত্তোলন করে। যে ফরাসীজাতি ২০ বৎসর পূর্ব্বে ২০ লক্ষ টন বৎসরে উত্তোলনে সমর্থ ছিল, তাহারাও ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন আহরণ করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ রাজ্য সকলকে অতিক্রম করিয়া ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টন আহরণ করিতেছিল। হওয়ায় অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসীজাতি নূতন উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং সমগ্র জগতের একটা বিষম অর্থকষ্ট ও বাণিজ্যহ্রাসসত্ত্বেও ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন আহরণ করিতেছে এবং যুক্তরাজ্য ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টন উদ্ধার করিতেছে।

এই সঙ্গে ভারতের কথা বলিয়া এই তালিকার পরিসমাপ্তি করিব। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ন্যূনাধিক ৪ লক্ষ টন প্রস্তর উদ্ধৃত হয়। যুদ্ধের সময় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৪৷৷০ লক্ষ টন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সহসা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ১৷৷০ লক্ষ টনে পরিণত হয়।

রেখাচিত্রে লৌহনিষ্কাশনের যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে যে ভাবে লৌহনিষ্কাশন প্রস্তর উত্তোলনের অনুপাতে সঙ্গে সঙ্গে হ্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হইবে।

একণে নিষ্কাশিত লৌহ ধাতু যে ভাবে কোনও দেশের শিল্প ও বাণিজ্যবিস্তারের উপাদানস্বরূপ দ্রব্যসম্ভারের এক

নিম্নে খনিনিচয়ের ১৮৮০ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত প্রস্তর সম্পদের ধারাবাহিক কাহিনী এক রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখান যাইতেছে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ও যুদ্ধসময়ে খনিনিচয়ের বিবরণ চিত্রদৃষ্টে সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে। যখন ফরাসী লৌহক্ষেত্রনিচয় যুদ্ধদানবের তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, জার্ম্মাণীর লোকবল সমরক্ষেত্রের রঙ্গলীলাতে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহাদের উদ্ধারিণী শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যুক্তরাজ্যও মিত্রশক্তিনিচয়কে নানা যুদ্ধোপকরণ সম্ভারাবলী নির্ম্মাণকল্পে লৌহসরবরাহ করিবার ক্ষমতা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টনে পরিণত করে। যুদ্ধাবসানে জার্ম্মাণী তাহার আলসাস্ লোরেন্ ক্ষেত্র হারাইয়া এবং রুর উপত্যকার খনিসমূহ ফরাসীর আয়ত্তাধীন

বিভিন্ন জাতির লৌহ নিষ্কাশনের তালিকা

আমার ডায়েরী

পরদিন

কাল বিকেলেও যথানিয়মে একবার ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু বড় অস্বাচ্ছন্দ্য লাগছিল। কি জানি, ওদের মনে এখন কি রকম উৎকণ্ঠা বা অস্বস্তি চলছে, এ সময়ে পরের উপস্থিতি কেমন লাগবে তাঁদের। কিন্তু না গেলেও কাকা মশায় পাছে মনে ক'রে বসেন, তাঁর ঐ রকম মতের জন্য আমিও বুঝি মনে মনে বিরুদ্ধ তর্ক চালাচ্ছি। পছন্দ করতে পারছি না ব্যাপারটাকে, তাই সেখানে যাচ্ছি না। কথাটায় একটু সত্যও আছে। যিনি নিজের মেয়েকে এতখানি শিক্ষিতা ক'রে তবে বিয়ে দিচ্ছেন, তিনি জামাইয়ের বিলাত যাবার নামে এত শঙ্কিত হয়ে উঠবেন, এটা একটু অসঙ্গত ব্যাপার ব'লেই আমার মনে যে না লাগছিল, তা নয়! তবে তাঁর কন্যা যদি এতে আপত্তি না করেন, তাই কি হরেন্দ্রও হয় ত শেষে নিজের দাবী ত্যাগ করবেন! আমি কেন মাঝে হ'তে তাঁর বিরক্তি সঞ্চিত করাই! আর এটুকুও বুঝলাম যে, সত্য তিনি মেয়ে জামাই নিয়ে ঘরকন্না করবার জন্যও বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ধুমধাম ক'রে বহুদিনের দূরপরিত্যক্ত আত্মীয়স্বজনকে কাছে এনে মেয়েটির বিয়ে দেবেন, তার মধ্যে জামাইয়ের এই বাদ সাধা! তার পরে বিবাহ হ'বামাত্রই দুই তিন বৎসরের মত তাদের সঙ্গে জামাইয়ের এই বিচ্ছেদ এ বেচারার মোটেই ভাল লাগবার কথাও নয়।

উনি সাক্ষাতে যা বলেছিলেন, সেটাও দেখছি কতকটা সত্যই বটে! সগুণার মুখে পর্য্যন্ত এতটুকু ভাবান্তর দেখতে পেলাম না, কাজে যে নয়ই — বাপের মতের সঙ্গে তা হ'লে মেয়েরও বোধ হয় ঠিক মত। তা হ'লে হরেন্দ্রও মত ফেরাতে নিশ্চয়ই বাধ্য হবেন; গোল তো চুকেই গেল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সাত-দিনের মধ্যেই নয়, এখনো যে একমাস সময় আছে; এতে একটা সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপারই যেন কানের কাছ দিয়ে চ'লে গেছে, এই ধরণে মনের এই নিশ্বাস ফেলায় অন্তরে অন্তরে আমি নিজের কাছে একটু লজ্জিতও হচ্ছিলাম, আবার তার দীনতা দেখে অনুতাপের একটু হাসিও মনে যে না আসছিল, তা নয়! হায় রে ভিখারি, এ একমাস আর সাত দিনে তোর কতটাই বা লাভ-লোকসান? এ উঞ্ছবৃত্তিতে তোর কতটাই বা লাভ? তোর না এ পূজা, এ না আশাহীন উদ্দেশ্যহীন ভালবাসার সাধনা মাত্র? তবে এতটুকুতেও লোভ কেন? এই তো দিনকতক পরে শুধু এই সুযোগে ব'সে গান গাইবার স্মৃতিমাত্র সম্বল ক'রে আর এই গানগুলিকে মাত্র সম্বল নিয়ে জীবনসমুদ্রে চিরকালের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে! সেই সমুদ্রের তীরে ব'সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে পাছে মনের কিসেরই এত স্বস্তি বা অস্বস্তি?

ভুল, সব ভুল! মানুষ মানুষই! যতক্ষণ এই তার রক্তমাংসের উপাদান এই চোখ কান নাকের সাফল্য সে পাবে, ততক্ষণ তার সাধ্য কি যে, সে লোভকে ত্যাগ করে! অতীন্দ্রিয় গুহায় সে কখন ঢুকে বসবে যখন সে বাইরের আর কিছু পাবে না মনে ভিন্ন তখন আর বাইরে তার বিন্দুমাত্রও কিছু থাকবে না তখনই। তার আগে নয়।

২১| নভেম্বর, ২০শে কার্ত্তিক: ওঁদের বাড়ীতে একখানা পাঞ্জী দেখলাম, মেয়ের বিয়ের জন্যই বোধ হচ্ছে সগুণার বাবা এই বাঙ্গালা পাঞ্জীখানা আনিয়েছেন। তারিখটা চোখে পড়লো যে লিখেও ফেলছি — আজ আমার এই অপূর্ব্ব ডায়েরীতে, যাতে 'কালে'র সঙ্গে স্থানের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই যাতে আছে কেবল একটিমাত্র জিনিষ! যার নাম 'পাত্র' আর তারই এত আক্ষেপ-বিক্ষেপের তালিকা মাত্র।

হরেন্দ্র এসেছেন। দিন কতক মাত্র এসেছেন, তাই বাইরের লোক আমি, এখনই সেখানে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, কিন্তু কাকার আহ্বান এসে আমায় ঘরে 'টিকতে' দিল কই? নিজের মনও অবশ্য যথেষ্টই উৎসুক্য বোধ করছিল! এ আহ্বানকে অবহেলা করতে তো সে পারলে না!

বাংলোটার এক পাশ দিয়ে গিয়ে তবে কাকার ঘরে পৌঁছুতে হয়। যথানিয়মে সেইখান দিয়ে যেতে খোলা জানালার পথে হঠাৎ একখানি অপরিচিত মুখ দেখে মনে মনে একটু প্রশ্নজিজ্ঞাসু হয়ে পড়লাম। কে ইনি? এঁদের কি আত্মীয়া কেউ হরেন্দ্রর সঙ্গে এসেছেন? মুখখানি রমণীর—বিধবা রমণীর। তাঁর কাছে সগুণাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি একখানি হাত সগুণার কাঁধের উপর রেখে আর একখানিতে বোধ হয় তাঁর একটা হাত ধ'রে মুখের পানে চেয়ে কি যেন বলছিলেন, আর সগুণা মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। এই দৃশ্যে চোখ পড়বা মাত্র আমি অবশ্য চোখ নামিয়ে নিজের গন্তব্য-পথে চললাম, কিন্তু সেই অপরিচিতা রমণীর শান্ত পবিত্র মুখখানি তখনই যেন মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল! মন বার বার প্রশ্ন করতে লাগল কে ইনি! কাকার ঘরে গিয়ে গৃহের এক দিকে উপবিষ্ট হরেন্দ্রর মুখের দিকে নজর পড়তেই মন ব'লে উঠলো "চিনেছি।" এই ধরণেরই সুগঠন মুখের ডৌল পরিষ্কার রং আরও সুন্দর চক্ষু, নিশ্চয়ই ইনি হরেন্দ্রর কেউ হবেন। পিসী মাসী হবার মত তাঁর বয়স তো বোধ হ'ল না। আমাদের সমবয়সী বলেই যেন বোধ হয়, হয় ত দুই এক বৎসরের বড়ও হ'তে পারেন! তবে কি হরেন্দ্রর দিদি বা বোন ইনি? এঁকেও নিয়ে যখন হরেন্দ্র এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই সগুণার পিতার মতেই সম্মত হয়েছেন! উৎসুকভাব সঙ্গে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে সাগ্রহে ব'লে বসলাম, "এই যে এসেছেন। যাক বিলাতী ভূত ঘাড় থেকে নেমেছে তো?" প্রশ্নের কোন উত্তর তো পেলামই না, উপরন্তু যাঁ'র দিকে এতখানি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলাম তিনি একটু বিমর্ষভাবে একবার চেয়ে তখনই দৃষ্টি পর্য্যন্ত নামিয়ে নিলেন। আমি অপ্রস্তুত-ভাবে দাঁড়িয়ে গেছি দেখে কাকা ঘরের আর এক কোণ থেকে আমাকে ডাকলেন, "এ দিকে এস, নীরেন।"

কুণ্ঠিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি রাগে যেন টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছেন! গোঁ গোঁ ক'রে আমায় যা বল্লেন, তার এই অর্থোদ্ধার করলাম—হরেন্দ্র তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। সে এই আট দিনের মধ্যেই বিবাহ সেরে বিলাত যেতে চায়, নয় ত বছর দুই পরে ফিরে এসে বিয়ে করবে বলছে। কিন্তু তিনিও তা কিছুতেই দেবেন না। যদি হরেন্দ্র তাঁর মেয়ে চায়, এই বিলাত যাওয়ার হুজুগ তাকে ত্যাগ করতেই হবে, নইলে সে যা ইচ্ছা করুক, তার সঙ্গে আর তাঁদের কোনই সম্পর্ক থাকবে না।

সম্মুখে হরেন্দ্র ব'সে, আর তারই সামনে একটা পর বাইরের লোককে কাকার এই কথাগুলো বলা হরেন্দ্রর পক্ষে যে কতখানি পীড়াদায়ক, তা মনে ক'রে আমার লজ্জায় মাথা তুলতে ইচ্ছে করছিল না। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আমি "আমায় কেন এ সব বলছেন" ব'লে উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড ধমকের সঙ্গে "শোন আগে সব কথা" শুনে ব'সে পড়তেও বাধ্য হয়েছি। লোকটি জগতের সকলের উপরেই জোর চালাতে চান। আমিও যেন তাঁর সগুণা, হরেন্দ্র বা তাদেরই মত পুত্র স্থানীয় কেউ একজন, যারা তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য। কিন্তু মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও তাঁর জোরকে অস্বীকার করতেও তো পারলাম না, ব'সে সব কথাগুলি শুনতেও তো হ'ল।

তাঁর বক্তব্যগুলি শেষ ক'রে যখন তিনি থামলেন আমি তখন আবারও যখন বললাম, "আমার মতামতে আপনাদের কি হবে! আপনারা কি কেউ নিজের মত ত্যাগ ক'রে আমার পরামর্শ নেবেন যে, তাই আমায়ও এর মধ্যে জড়াচ্ছেন?" তখন তিনি একটু অপ্রসন্নভাবে "না, আমার যা মত আর শেষ কথা, তাই ই তোমায় শোনাতে ডেকেছি। তোমরা ইয়ংম্যান, শেষে না আমায় দোষ দাও! সগুণার উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবে না। আচ্ছা, তুমি এখন না বসতে চাও, যেতে পার" ব'লে আমায় ত মুক্তি দিলেন। আমিও বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে তখনই নিজের বাসার দিকে রওনা হব ভাবছি, এমন সময়ে দেখি, হরেন্দ্রও ঘর থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। লোকটির বিপন্ন অবস্থা বুঝে মনটার মধ্যে ভারি অস্বস্তি ধরেছিল। এ কি জুলুম, আর তার জন্য এই রকমে লোকটিকে নাজেহাল করা! পূর্ণ সহানুভূতিতে তাঁর পানে চেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময়ে তিনিই আমার পানে অত্যন্ত বিব্রতভাবে চেয়ে বিষণ্ণ-স্বরে বললেন, "কি করা যায় বলুন তো।" এবার আর পরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত বোধ করলাম না; উত্তেজিতভাবেই ব'লে উঠলাম, "শোনেন কেন ওঁর কথা; সগুণাকে জানিয়ে তাঁ'র এ বিষয়ে কি

পরামর্শ, কি তাঁ'র মত, জেনে সেই রকম কাজ করুন।"

হরেন্দ্র কিন্তু একটুও উত্তেজিত না হয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন, "যাই হোক, এ আটদিনের মধ্যে ওঁর এতখানি অমতে বিয়ে তো একেবারে অসম্ভবই বুঝছি! সগুণাকেও আমি তাঁ'র বাপের অমতে এমনই কোন অন্যায় অনুরোধও করতে পারব না। মুস্কিল এই হচ্ছে যে, দিদিকে কোথায় রেখে যাই। শুধু এই সব কথাবার্ত্তার পরে দিদিকে আর তো এঁদের কাছে রাখতে অনুরোধ করতে পারছি না!"

তা হ'লে হরেন্দ্র বিলাত যাবার জিদ বজায়ই রেখেছেন! কিন্তু ঐ আর একটি জেদী লোক তাঁর জিদ্ বজায় না থাকলে তিনি যে কি মূর্ত্তি ধরবেন, কি না করতে চাইবেন, তা এখনও হরেন্দ্র ধারণায় আনতে পারছেন না। কিন্তু আমি যে এই গত দু' মাসেই তাঁর চরিত্র অনেকটা আয়ত্ত করতে পেরেছি। এর ফল যে ভাল হবে না, হরেন্দ্র যে ভাবছেন, কালে উনি শান্তমূর্ত্তি ধরবেন, এ আন্দাজ যে তাঁর মিথ্যাও হ'তে পারে, এইটা আমি তাঁকে বোঝাতে গেলাম। তিনি সমান নিরুত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন, "ও আমার সম্ভব ব'লে মনে হয় না। কালে ওঁর এ রাগ প'ড়ে যাবে। এঁরা শিক্ষিত লোক সগুণাও বাঙ্গালার দশ বছরের মেয়ে নয়। ছ'টো বছরের জন্য আর এই রকম কারণে কি কোন রকম অন্যায় এঁরা করতে পারবেন? ওঁর এ একটা সাময়িক জিদমাত্র! বিলাত যাওয়াটা পছন্দ করেন না, তাই এ রাগারাগি; পরে ঠাণ্ডা হবেন। আমি বেশী বিব্রত হচ্ছি আমার দিদির কি ব্যবস্থা করব ভেবে! আমার দ্বিতীয় অভিভাবক আর কেউ তো নেই, জব্বলপুরের বাস উঠিয়ে দিয়েই এসেছি। ভেবেছিলাম, দিদিকে এঁদের কাছেই রেখে যাব কিন্তু এই রাগারাগিতে সেই সুবিধাটি নষ্ট হ'ল।"

আমি নিজের উত্তেজিতভাবে তাঁর কাছে একটু লজ্জিতই হয়ে পড়লাম। হরেন্দ্র যা বুঝেছেন, এই হয় ত ঠিক,—আমি বুঝি একটা গোঁয়ার্তুমিরই পরামর্শ দিতে যাচ্ছিলাম। সগুণাকে যেন আমিই হারিয়ে ফেলছি, এমনই একটা উত্তেজনা মনে জেগে উঠছিল। একটু সামলে নিয়ে বল্লাম, "আপনার দিদি, তাঁকেও বুঝি এনেছেন? কেন যে আপনার কাকা বিলাত যেতে টাকা দিচ্ছেন তাঁর সংসারে—" "সে হবার যো নেই, তিনি সে রকম লোক নন। টাকাটা দিচ্ছেন একটা ঝোঁকের মাথায় বৈ তো না। দিদিকে দেশের বাড়ীতে ব্যবস্থা ক'রে রেখে আসতে গেলে মেল্‌টা তো আর ধরতে পারব না। তা হ'লে সবই মিথ্যে হয়ে যায়।"

"যদি পৌঁছুবার মাত্র দরকার হয়, আর আপনার সত্যই তাতে কিছু উপকার হয়, তা হ'লে সে-সে-ই তো এ কাযটা পারবে। আমাকেই যদি বলেন—"

হরেন্দ্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে ফেলে ব্যগ্র কৃতজ্ঞস্বরে বল্লেন, "পারবে, ভাই, তুমি? সত্য বলছ? আঃ, তা হ'লে তো ভাবনাই থাকে না।"

"কিন্তু আপনি ব্যবস্থা করার কথা কি বলছিলেন, সে কি আমার দ্বারা হবে?"

"তোমায় কিছু করতে হবে না ভাই, আমার দিদি নিজেই সে সব ঠিক ক'রে নিতে পারবেন। মাত্র দেশে পৌঁছুনো। এতটা উপকার যদি কর—"

আজ হরেন্দ্র আমায় নিকট-বন্ধুর আসন দিলেন দেখছি। আমিও বল্লাম, "তোমার যিনি দিদি, তিনি আমারও দিদি। আমিও তো দেশে যাব এইবার। তখন ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।" হরেন্দ্র একটু চিন্তিতভাবে বল্লে, "কিন্তু, ভাই, ততদিন ওঁকে কোথায় রাখব? আমার যে আজই একবার যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করতে বম্বে যেতে হবে—সেই কাকার কাছে। তিনি মাঝে মাঝে তাঁ'র বিষয়কর্ম্মে বম্বে এসে হোটেলে থাকেন। দিদিকে এঁর এই ভাবের পর এখানে রেখেই কি যাব? অবশ্য আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি—" তার মুখের কথা আর শেষ হ'লো না। পাশের একটা দুয়ার খুলিয়া সেই দিদি বাহির হয়ে এসে একেবারে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্লেন, "হরেন যে ক'দিন ফিরে না আসবে, আর তোমার দেশে না যাওয়া হবে—সে ক'দিন তোমার বাসাতেই আমি থাকতে পারব।"

আমি ত্রস্তে তাঁহাকে প্রণাম করে কুণ্ঠিতস্বরে বল্লাম, "কিন্তু, দিদি, আমার বাসায় যে চাকর বামুন ছাড়া আর কেউ নেই, আপনার যে অসুবিধা হবে!"

"কিছু না, একটা ঝি এনে দিও তা হ'লেই হবে। হরেনের বন্ধু তুমি, তোমার বাসায় অসুবিধা কেন হবে? আমি এখনই তোমার বাড়ী যাব, একটা গাড়ী ডাক তোমরা।"

বুঝলাম, এঁদের ব্যবহারে হরেন্দ্রর যেটুকু রাগ না জন্মেছে, এঁর তার চেয়ে অনেকটা বেশী রাগই

হয়েছে। তাই এঁদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে একান্ত পর যে আমি, আমার বাসাতেও তিনি এখনই যেতে ইচ্ছে করেন।

তাঁর ইঙ্গিতে হরেন্দ্র একটা টঙ্গা ডেকে নিয়ে এসে তাঁকে তুলে নিয়ে আমার বাসার দিকে রওনা হ'ল আর আমিও একটু কর্ত্তব্যমূঢ়ভাবে তাদের অনুসরণ করলাম। পিতৃবন্ধু হয় ত আমার উপর অসন্তুষ্টই হবেন, কিন্তু আমি আমার মনুষ্যত্বকে তো বিসর্জ্জন দিতে পারি না। এ ক্ষেত্রে এই বিপন্নদের আশ্রয় মানুষমাত্রেই দিতে বাধ্য। তবে হরেন্দ্র যে একটু কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, এ বল্‌তেই হবে। ওর অসম্মতি জেনেও কি ব'লে সে এত কুণ্ঠনিশ্চিত হয়ে বোনকে পর্য্যন্ত সঙ্গে ক'রে এনে উপস্থিত হয়েছে। বাপের দৃঢ়তার জন্য সগুণাও বোধ হয় লজ্জিত বা দুঃখিত হয়েই হরেন্দ্রর দিদির এই চ'লে আসায় একবার বাধাও দিলেন না।

৮ই নবেম্বর। হাঁ, ইনি দিদিই বটেন, এঁর জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হয় না। সব ব্যবস্থা ইনি নিজেই ক'রে নিতে পারেন। হরেন্দ্র ঠিকই বলেছিল।

'নিজের ব্যবস্থা তো ক'রে নিয়েইছেন, আমার এই ক্ষুদ্র সংসারেরও 'দিদি' হয়ে ব'সে আছেন। এই ছন্নছাড়া ঘর ক'টা এরই মধ্যে এমন গুছিয়ে গাছিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে চারদিকের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, এ ঘরকন্নার পাট যে আমার শীগ্‌গিরই তুলতে হবে, তা মনে ক'রে দুঃখ হচ্ছিল। দিদি কিন্তু সে কথা শুনে ব'লে বস্‌লেন, "অকারণে যে ঘর গ'ড়ে ওঠে, সে ঘর ত সহজে ভাঙ্গে না, ভাই।"

সত্যই কি আমি এবার এখানকার দোকানপাট তুলে ফেলতে পারব? দিদিকে রাখতে তাঁদের দেশে ও সেই সঙ্গে নিজের দেশেও একবার যেতে হবে বটে, কিন্তু না, এর বেশী আজ আর কিছু ভাবতে পারছি না।

হরেন্দ্র সেই দিনই বম্বে চ'লে গেছে। মাঝের এই তিন দিনের মধ্যে একবারমাত্র আমি কাকার কাছে গিয়েছিলাম।- তিনি আমার কাছেই খবর পেলেন যে, হরেন্দ্র তার কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার দিদিকে আমার কাছে রেখে বম্বে চ'লে গিয়েছে। তিনি কোন প্রশ্ন না ক'রে গম্ভীরভাবে মনে মনে কেবল আমার দিকে চেয়েছিলেন। কেন জানি না। অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, নাচার।

কিন্তু আমার এই একটু আশ্চর্য্য লাগ্‌ল যে, সগুণা এসে একবার হরেন্দ্রর দিদির খোঁজও করলেন না। তিনি তো তাঁদের অতিথি, এমন ভাবে তিনি চ'লে গেছেন, এর জন্যও বাপ বা মেয়ে কেউ যে একটু খোঁজও নিলেন না, এ ব্যাপারটা আমার একটু বিসদৃশই লাগ্‌ছিল। খুব সম্ভব, সগুণার এখন মনের মধ্যে একটা সংক্ষোভ চল্‌ছে, বাইরের লোকের সম্মুখে বেরুবার বা কথা কইবার তার সময় নয়; কিন্তু দিদির কি ব্যবস্থা হ'ল, এটুকু জিজ্ঞাসা করতেও কি তার একবার আমার সামনে আসা উচিত ছিল না? বাপের অমতে কি এটুকুও করা যায় না? তাঁর বাপ কি মেয়ের এই মনুষ্যত্বটুকুরও বিরোধী হবেন?

ব'সে ব'সে এই কথাগুলোই ভাবছিলাম; বুঝি ডাক্ এলো। হরেন্দ্রর চিঠি! তার কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর উত্তেজনায় ও সঙ্গীর সুবিধা হওয়ায় হরেন্দ্র এই মেলেই ইংলণ্ড রওনা হ'ল! আমার কাছে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে যাতে তার দিদিকে সুবিধামত দেশে পৌঁছে দি, তার জন্য সানুনয় অনুরোধ ও বর্হাবধ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে সে পত্র শেষ করেছে। দিদিকেও প্রয়োজনীয়বিষয়ক কথায় পূর্ণ একখানা পত্র এই সঙ্গে দিয়েছে। আমার উপরে তিনি যেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার নির্ভরতার সঙ্গেই এ কয়দিন আমার কাছে অপেক্ষা করেন ইত্যাদি কথাও সে পত্রখানার শেষে আছে।

'দিদি' আমার জলখাবার হাতে ক'রে এসে দাঁড়াতেই "আমায় ডাকলেন না কেন, দিদি" ব'লে কুণ্ঠিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে আমার হাতের পানে চেয়ে বল্‌লেন, "হরেনের চিঠি কি?" "হাঁ এই দেখুন।" ব'লে চিঠিগুলো তাঁর হাতে দিয়ে খাবারের রেকাবটা টেনে নিতে তিনি, "তুমি খাও ততক্ষণ" ব'লে, চিঠি পড়তে মন দিলেন।

আমি তাঁর সযত্ন-প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদকে মনে মনে তারিপ্ করছি এমন সময়ে দিদি তাঁর পত্রপাঠ শেষ ক'রে একটু স্তব্ধভাবে থেকে শেষে আমার দিকে চেয়ে বিষণ্ণ স্বরে বল্‌লেন, "তার পরে? দিদিটি যে এখন একেবারেই ঘাড়ে পড়ল, ভাই? একে কাঁধ থেকে কবে ফেলতে পারবে?"

আমি তাঁর ব্যথিত ভাবটা বুঝতে পেরে কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলাম—

"এমন কথা কেন ভাবছেন, দিদি? আপনি যদি বলেন, আজই চলুন আপনাকে নিয়ে দেশে রওনা হচ্ছি। আমার দিদি নেই, হরেন্দ্র এই দুদিন যে আমাকে তাঁর দিদিটি দান করেছেন, এতে আমার কি লাভ ছাড়া লোকসান হয়েছে ভাবছেন, দিদি?"

'দিদি' সেই একই ভাবে বললেন, "লাভ লোকসানের কথা থাক, তবে তুমি যে আমার জন্মান্তরের ভাই, এই দু'দিনেই তো বেশ বুঝতে পারছি। আমার জন্য তোমার কোন ক্ষতি করো না,—যে দিন তোমার সুবিধা হবে--"

আমি সহাস্যে উত্তর দিলাম, "আমার ক্ষতিবৃদ্ধির কিছুই যে নেই; দিদি। ঘরে ব'সে থাকা আর পথে বেরুনো দুইয়েই আমার সুবিধা অসুবিধা সমান। তবে জন্মে কখনো দিদি পাইনি, এখানে এসে দুদিনে হঠাৎ ভাই পেয়ে এই দুদিনের ঘরেও যে একটু মন ব'সে গেছে, যে কটা দিন এখন পথে না বেরুতে হয়, সেইটুকুই যে লাভ, এটুকুও স্বীকার করছি।" "দিদি"র নিজের ভাবনায় ঈষৎ ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি আমার এই কথায় যেন ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, আর তাঁর চোখের কোণ দুটো কেমন যেন চক্‌চকে হয়ে উঠল। মা যেমন কোন ছেলের মা নেই শুনে মমতা-বিদ্ধ অন্তরে হঠাৎ "আহা" ব'লে ওঠেন, এই 'দিদিটি'ও বোধ হয় এই তাঁ'র দুদিনের ভাইটি 'দিদিহীন' শুনে তেমনই করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠলেন। তখনই বলেও ফেললেন, "দিদি না থাক, মা তো আছেন?"

"তা আছেন বটে, কিন্তু তাঁর এ ছেলেটি মাথাপাগলা দেখে এর প্রত্যাশা তিনি অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছেন। যাকে এখনই আপনার জন্মান্তরের ভাই ব'লে স্বীকার করলেন, সেটি যে আপনার পাগল ভাই, তা বোধ হয় এতদিনে বুঝতেও পেরেছেন, দিদি?"

'দিদি' একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা পেরেছি সেই দিনই। এ ক'দিন এ জন্মের ভাইটির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন বাস্তবাগীশ স্বভাবের জন্য যা অস্বাচ্ছন্দ্য লাগছিলো, আজকে তা'র শেষ সীমায় ভাইটি পৌঁছে দিয়ে গেলেন ব'লেই বোধ হয়, আজ তা'র কাণ্ডকে আর অসঙ্গত লাগছে না। এই আমাদের পাগল ভাইটিকে ফিরে পাবার জন্যই যেন এ সব অসম্ভব কাণ্ড ঘটার দরকার ছিল। মাথাস্থির ভাইটি তো আমার এমনই কাণ্ড ক'রে তুললেন, যাতে সগুণাদের ওপোরেও আমার আর ক্ষোভ রাখা চলছে না। তার এ স্বভাবের ওপর সে ভদ্রলোকের নির্ভর না হবারই তো কথা। সগুণা মেয়েটিও তার স্বভাব বোধ হয় ভাল ক'রেই জেনেছেন,—আচ্ছা, এঁদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, নীরেন?"

"কিছুই না, দিদি, উনি আমার বাপের বন্ধু ছিলেন, তাই কাকা বলি।"

"তবে এখানে তুমি কত দিন থেকে আছ?"

"মাস তিনেক হ'তে চললো, দিদি। আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ছিল না, বেড়াতে বেড়াতে এসে প'ড়ে পরিচয় ক্রমে ফুটে উঠলো। তার পর---এইবার চ'লে যাব --"

"আমায় রাখতে যেতে হবে বলেই কি এ যাওয়া তোমার?"

"না, দিদি,—এইবার - যেতেই হ'ত--"

"তোমার যাওয়া না যাওয়ায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই যখন, তখন আমায় পৌঁছে দিয়েও তো চ'লে আসতে পারবে। এখানটি যখন তোমার ভাল লেগেছিল, তখন আবার না হয় ফিরে এস। আমার যাওয়ার সূত্রই তোমায় স্থানভ্রষ্ট না করে যেন, দাদা।"

তাঁ'র এই ভদ্রতা ও স্নেহব্যগ্র চিন্তামাখা কথাটার ঠিক্ উত্তর বোধ হয় দিতে পারিনি! অন্যমনস্কভাবে কেবল "না" টুকু মাত্র বলেছিলাম, তাই তিনি যেন একটু বিস্মিত, একটু অনুসন্ধিৎসুভাবে, আমি আরও একটু কিছু তাঁকে বলি, এই রকম ইচ্ছা ও প্রতীক্ষা নিয়েই, বোধ হয়, আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। কিন্তু আর আমি একটা কথাও কইতে পারলাম না! যেতে হবে, মনের এই ভাবনার আন্দোলনে তখন অন্য কথা কওয়া আমার পক্ষে অসম্ভবই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে উঠে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, আর দিদি সেইভাবে ঘরের ভিতরেই বোধ হয় তখন দাঁড়িয়ে রইলেন।

সম্মুখেই দেখি, কাকার বেয়ারা একখানা চিঠি নিয়ে আসছে। এই দু'দিন যাইনি দেখে বোধ হয় ডেকে পাঠিয়েছেন। কেন আর এ মিছে আত্মীয়তা! আর একে বাড়িয়ে কাষ কি? যেতে তো হবেই,—তবে আর কেন?

চিঠিখানা ভারী, এত কি লিখেছেন! রাগ করেছেন, হয় ত, তাই ব'কে পাঠিয়েছেন বুঝি। এই কথা ভাবতে ভাবতেই চিঠিখানা খুলতে লাগলাম।---রাগ নয়—সম্পূর্ণ

উল্টো কথা!—দু'খানা চিঠি, একখানা হরেনের চিঠি—তাঁকে লিখেছে। অন্য খানায় কাকা আমায় লিখছেন—

নীরেন্—কেন তুমি এ দু দিন এলে না? আমারও মন বড় উৎক্ষিপ্ত ছিল, নইলে এতদিন তোমায় ধ'রে নিয়ে আস্তাম! আজ সুস্থির হয়েছি। এই কতক্ষণ হরেন্দ্রর চিঠি পেলাম, এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি, দেখো। তাঁ'র সঙ্গে আমি যে প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ হয়েছিলাম, তা থেকে নিজেকে মুক্ত বোধ করছি। যদিও তিনি তাঁ'র অসঙ্গত স্পর্দ্ধা আর আশার শেষ পর্য্যন্ত জের্ টেনে গেছেন, বিলাত থেকে ফিরে তিনি আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রে আমায় কৃতার্থ করবেন, এবং আশা রাখছেন, তখন আমি আমার এ রাগ ভুলে যাব! কিন্তু তাঁ'র এত কৃতার্থ আমায় করবার কোনই দরকার দেখছি না। আমাদের সঙ্গে তাঁ'র আর কোন' সম্পর্কই নেই। এ কথা আমি অনেকবারই তাঁ'কে জানিয়ে দিয়েছি। সগুণাও আমারই মেয়ে, তিনি তার সুসংযত পবিত্র সুন্দর স্বভাবের ওপর যতই আস্থা স্থাপন করুন না কেন, তাঁ'র এ সব স্তুতিবাদ এখন অসহনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করছে মাত্র। তার প্রসঙ্গ আমাদের মধ্যে আর নয়।

তোমার কি তোমার নিজের লেখা সেই চিঠিখানার কথা মনে আছে? যাতে তুমি সগুণাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলে? আর সে কথাটাও কি তোমার মনে আছে যে, তোমার বাবা আমার সঙ্গে এ কথাটা বহুদিন আগে স্থির ক'রে রেখে স্বর্গে যান? মাঝে তোমার আত্মীয়-স্বজনের ঔদাসীন্যে আমি দুঃখিত হয়ে তার জন্য অন্য পাত্র খুঁজি, আর সেই সময়েই এই মাকালফলটি আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। তোমার প্রার্থনায় যে আমি পরে আর কান দিই নি, সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হরেন্দ্রর এই কাণ্ডে শেষ হ'ল। এখন বুঝছি, সগুণা তোমারই জন্য বিধিনির্দ্দিষ্টা হয়ে আছে। তুমি আজই আমার সঙ্গে দেখা করো।—আশীর্ব্বাদ জেনো। হরেন্দ্রর 'দিদি'র কি ব্যবস্থা সে ক'রে গেছে! তাঁ'কে পৌঁছুতে তোমারই কি দেশে যেতে হবে? প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরও তোমার এই সহৃদয়তা দেখে বড় সুখী হয়েছি।—প্রতীক্ষায় থাকলাম এখনি একবার আসতে পারবে কি?

ইতি—তোমার কাকা।

জানি না, লোকটাকে কি ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলাম। কি করেছিলাম—কি ভেবেছিলাম, তখন কিছু জানি না! কতক্ষণ পরে যে 'দিদি'র ডাকে সজাগ হয়ে তাঁ'র নির্দ্দেশমত স্নানাহারের জন্য উঠলাম, তা এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

৯ই নবেম্বর। আবার সেই সম্পূর্ণ বিষম বস্তুর অনুভব! "বিষামৃতে একত্র করিয়া।" এ অমৃত অবশ্য অন্তরের অনুভবের নয়, কিন্তু আজকের এই বিষ—স্বপ্নেও যার আর আশা করিনি, সেই কল্পনারও অস্পৃশ্য রত্নকে ফিরে পাবার আনন্দকে যে নীল ক'রে তুলছে. একে তো কোনদিন অনুভব করিনি! সগুণাকে আমি পাব বা পেতে পারি—কিন্তু এই পাওয়ার মধ্যেও প্রাচীর তুলে দাঁড়াচ্ছে—এরা কে? নয়—নয়—আমার পাবার নয় সে!—তাই-ই হরেন্দ্র যাবার সময়ে আমায় হঠাৎ এই বন্ধুত্ববন্ধনে বেঁধে গেল! সেই জন্যই 'দিদি'কে সঙ্গে এনে আমায় দান ক'রে গেল। তবে ভাগ্যের এ পরিহাস—এ বিদ্রূপ-হাস্য কেন?

কাকা যেতে লিখেছেন। গিয়ে তাঁকে কি বলতে হবে? পারব না। আমি আমার নিজের জীবনের আশা, আনন্দ, সুখ—এক কথায় নিজের সর্ব্বোত্তম সবকে মাথায় তুলে নিতে—ঘরে তুলে নিতে পারব না। সগুণাকেও আমি চাই না,—এও আমায় মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে? ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করতে হবে? এও যে আমি পারব না—পারব না!

কি হবে তবে? কি করব তবে? কিছু না—কিছু না।—কি লিখছি কি করছি কি বলছি কাকে? কেউ না—কিছুই না!

'দিদি' এসেছিলেন এখনই। কি রকম করুণ আর অবাক্ চোখে তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন! আমার হঠাৎ কি হয়েছে, তাই ভাবছেন বোধ হয়। কাল কাকার চিঠি আসা আর সেটা প'ড়ে থাকাও তো তিনি দেখেছেন। না জানি কি ভাবছেন। কি সংযত সুন্দর স্বভাব! একটি প্রশ্ন ক'রেও আমায় উৎপীড়িত করছেন না; কিন্তু যেন একটু প্রতীক্ষার ভাব মুখে চোখে মাখা রয়েছে। আমি যেন আমার চিন্তার আর সুখদুঃখের অংশ তাঁ'র কাছে কোন এক সময়ে ঢেলে দেবই, ঠিক সেই প্রতীক্ষায় যেন প্রস্তুত হয়ে আছেন। যথানিয়মে আমার খাওয়া শোয়ার একটুও ব্যতিক্রম হ'তে দিচ্ছেন না।—কিন্তু সেও তো আমি পারবো না। ব্যাপারটা বাইরে থেকে কথার দ্বারা কি

বোঝাবে ? যেন আমি এই সুযোগেরই প্রত্যাশায় ছিলাম তাই 'দিদি'র ভার নিজে নিয়ে তাকে বিলাত যেতে সাহায্য ক'রে পথের কাঁটা দূর করলাম। এখন নির্লজ্জের মত— ওঃ— না! যখন আমার কথা—কথা দিয়ে কাউকে বোঝাবার উপায় নেই, তখন কেন তাকে ভাষায় টেনে আনা? গানকে সুরকে কি কেউ ভাষায় বোঝাতে পারে? পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের আর গোলাপের শোভা গন্ধ এ যে কিসে মানুষের চোখকে নাককে অভিভূত করে, সে কি মুখের কথায় বোঝাতে পারা সম্ভব? কেন গন্ধ ভাল লাগে, কেন রূপ ভাল লাগে—কেন মানুষ ভালবাসে এই সব কেনর উত্তর কি? আমি কেন এমন করলাম, এ তো কাউকে বোঝাতে পারব না।

১০ই আর দেরী ক'রে কি হবে! এইবার 'দিদি'কে নিয়ে চলি!—পাততাড়ি গুটিয়ে। অনেক দিন পরে আজ 'বিভাসে'র করুণ উদাস সুর অন্তরে বেজে উঠেছে। "এবার চলিতে হবে, সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে * * নিঃস্ব আমি আজি, আর নাই দেরী, ভৈরব ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি: তুমি আছ ঘুমনিমীল নয়নে"

এখানে এসে সুরের ভাষা যে কোন্ আবেগে ধরে চলে যাচ্ছে! আমার সম্বন্ধে সে নিমীল নয়নে সত্যই ঘুমাচ্ছে; এ ঘুমের স্বপ্নের কোন কোণেও বোধ হয় আমার চিহ্নমাত্র নেই! যদি তার মধ্যে একবারও সে কেঁপে থাকে, সে হবে ক্ষণই বিবাহস্বপ্নে নিশ্চয় কেঁপেছে, তবে আর কেন আমার এই দ্বন্দ্ব! সগুণা যেমন হরেন্দ্রর বিষয়েও বাপের অমত বুঝে এমন নিরপেক্ষভাবে থাকলো তেমনি বাপের অন্য আজ্ঞাতেও যদি থাকে, তবু স্বামী তাকে পাব কি? পাব হয় তো শুধু বাপের আজ্ঞানুবর্তিনী শান্তস্বভাবা মেয়েটিকে! সত্যই কি সে একটা অপমান? এমন ব্যাপারে কি তার মনে কোন তরঙ্গ উঠছে না? বিশেষ সে অতখানি সুশিক্ষিতা বিদুষী? না উঠছে, তা কখনই এ ক্ষেত্রে আমার অন্তঃকরণ উঠতে পারে না! না না এ লোভে কাজ নেই, হয় তো কেবল দ্বিগুণ বেদনাই সার হবে। "যা ফুরায়, সে রে ফুরাতে।"

কাল সকালে এই কথা লিখে গেছি, আর আজ সারাদিনের সন্ধ্যার কথা, রেনকার কথা, তাও লিখে রাখি আমার এই জীবন খাতায়? ঐ 'যা ফুরায়, সে রে ফুরাতে' লিখে খাতা বন্ধ করতেই দেখি, কাকা এসে একেবারে আমার কাছে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে অমন হঠাৎ দেখে আমি কি রকম হয়ে গেছিলাম, জানিনে—যাতে তিনি নিজেই আসন নিয়ে আমার পাশে ব'সে প'ড়ে "কি হয়েছে নীরেন? আমার ঠিকই মনে হয়েছিল, তোমার কোন অসুখ করেছে; বল আমায়, কি হয়েছে?" ব'লে সস্নেহে মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন; আর তাঁর সেই সাদর সান্ত্বনায় আমার চোখ দিয়ে ছেলেমানুষের মত যেন জল ঝরে পড়ছে দেখে একেবারে আমার মাথাটা প্রায় তাঁর বুকের উপরেই টেনে নিলেন। খানিকক্ষণ পরে আমি সামলে লজ্জিতভাবে উঠে বসলে তখন তিনি একটু হেসে বললেন, "আমার মনে তোমার ওপোরও যা একটু অভিমান জন্মেছিলো, তা ধুয়ে গেল। কিন্তু, নীরেন! এখন বল দেখি, ব্যাপারটা কি! কেন আমার চিঠি পেয়েও এলে না? কথাটা বিশ্বাস করতে পারনি বুঝি? না?"

আমি তাঁর কথায় ঘাড় নেড়ে মাত্র সম্মতি জানালাম। তিনি তখন সস্নেহে হেসে বললেন, "তোমার সঙ্গে কি আমি এই নিয়ে ঠাট্টা করতে পারি, বাবা? তোমার সে চিঠির কথা আমি কি ভুলে গেছি, মনে কর? তুমি যখনি সগুণাকে গান শোনাতে, গান শেখাতে, হরেন্দ্র আর তার সঙ্গে গল্প করতে, আমার বুকে ছুরী বিঁধত! কি করব, একবার কথা দিয়ে ফেলে বিনা কারণে সে কথা তো উল্টাতে পারি না। আজ আর আমার সে বাধা তো নেই, আজ আমি তোমার বাবা থাকলে এত দিন যেমন ক'রে তোমায় নিতাম, তেমনি আদর ক'রে নিয়ে গিয়ে সগুণাকে তোমার হাতে দেব। ও কি—তুমি যোড় হাত করছ? কেন, নীরেন—আবার কি বলতে চাও তুমি?"

"মাপ করুন—আমায় মাপ করুন।"

"কেন কি জন্য? কিসের মাপ করব তোমায়?"

"আমি বলতে পারব না—শুধু মাপ করুন।" এর বেশী একটা কথাও আমার মুখে ফুটলো না। তিনি তখন যেন একটু আহত হয়ে খানিক স্তব্ধভাবে থেকে শেষে বললেন, "বুঝতে পারছি, এই হরেন্দ্র-ঘটিত ব্যাপারে তোমার সেন্টিমেন্টাল স্বভাবে কোথাও আঘাত পাচ্ছে। কিন্তু এও জেনো, যে আমার এত বড় অবাধ্য, তাকে আমি কখনই আর জামাই করব না। সে ফিরে এসে যদি আমার পায়ে

আত্মানুভব

'হত্যা' হয়, তবুও নয়। এই বুঝে তুমি যথাকর্ত্তব্য স্থির কর। হরেনের সঙ্গে তোমার এমন কোন বন্ধুত্বও নেই যে, যার জন্য তুমি নিজের কাছেও লজ্জিত হবে! আমাদের ভাবী সম্পর্ক নিয়েই তো মাত্র তোমাদের মুখের আলাপ, সেটুকুও ভদ্রতার গণ্ডী কোন দিন সে ছাড়ায় নি, এও আমি জানি তো? তবে কিসের তোমার এ আপত্তি?"

তবুও আমি মাথা তুলতে পারছি না দেখে আবার তিনি বললেন, "তবে কি তুমি সগুণার সম্বন্ধেই কোন মত পোষণ কর? সে হরেন্দ্রর বিশেষভাবে পক্ষপাতিনী, এই রকম ভাবছ —আর সেই জন্যই তোমার এই অসম্মতি? আমি বলছি তোমায়, তোমার এ ধারণার কোন মূল্য নেই। আমি বাপ, আমি কি তা বুঝতে পারতাম না? সে যেটুকু যত্ন আতিথ্য তাকে দিয়েছে, তা কি তোমায়ও দেয় নি? আর যদি কিছু দিয়ে থাকে, সেও আমারই আদেশে ও? তার সঙ্গে বিয়ে দেব জেনেই ত? সে যে আমার কি রকম বাধ্য আর শান্ত মেয়ে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বলছি, ও সব মিথ্যা ভাবনা ভেবো না। আজ সন্ধ্যায় তোমার আমার ওখানে নিমন্ত্রণ বুঝেছ? আমি বলছি, তুমি এ রকম ভাবে না থেকে আগের মত যাবে তাকে গান শেখাবে তার পরে ও দিনে যদি তোমার এ ভ্রম ভেঙ্গে না যায় তো কি বলেছি! সন্ধ্যায় যেও বুঝলে? আমি পথ চেয়ে থাকব ভুলো না?" আমার আর কোন আপত্তি জানাবার অবসর না দিয়ে, এই ব'লে ঝড়ের মতই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তার পরে সন্ধ্যায়ও আমায় একই ভাবে জানালার সুমুখে ইজিচেয়ারে প'ড়ে থাকতে দেখে 'দিদি' এসে বল্লেন, "ও কি, তুমি এখনো যাও নি?"

আমি শান্তভাবে প্রশ্ন করলাম, "কোথায়, দিদি?"

"কেন, ওঁদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে?"

বুঝলাম, তিনি সবই শুনেছেন। লজ্জার একটি ঝলক অন্তর ছেপে বাইরেও আত্মপ্রকাশ করতে আসছিল। অতি কষ্টে তাকে দমন ক'রে একই ভাবে উত্তর দিলাম, "নিমন্ত্রণে তো যাব না, দিদি।"

"সে কি! কেন যাবে না? উনি নিজে এসে নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন যে! আমিও তো ঠাকুরকে তোমার নিমন্ত্রণ আছে ব'লে দিয়েছি।"

"ব'লে দেন আবার তাকে—নিমন্ত্রণ নেই।"

'দিদি' আর বাক্যব্যয় না ক'রে বোধ হয় মহারাজকে কিছু আদেশ দিতে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে একটা কাঠের চৌকী টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে শান্ত স্নেহমাখা মুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "নীরেন, আমি তোমার ঠিক 'দিদি' তো?"

"হাঁ, দিদি।"

"তাতে কোন ভুল নেই ত, ভাই?"

"না।"

"তবে আমায় বল, কেন তুমি নিমন্ত্রণে যাবে না?"

বুঝলাম, তাঁর মত বুদ্ধিমতীর কাছে আর লুকাচুরি ঠিক নয়, কি জানি, তিনি হয় ত আন্দাজে আন্দাজে কত দূরই চ'লে যাবেন। তখনো নির্বোধ আমি এটুকু বুঝি নি যে, যত দূর বুঝবার, এই ক'দিনে সবই তিনি বুঝে নিয়েছেন! যা বাকি ছিল, কাকার আজকের কথাবার্ত্তায় তা পূরণ করেছে। বললাম, "কেন, তা তো আপনি শুনেছেন, দিদি।"

"হরেন্দ্রর ওপর অন্যায় হবে ব'লে?"

"তাও বটে।"

"শুধু 'তাও বটে' নয়, ভাই; বুঝেছি, এইটাই তোমার আসল বাধা। কিন্তু কেন? হরেন তো তোমার বন্ধু নয়।"

"বন্ধু না হোক, মানুষ।"

"যে কোন মানুষের জন্যই তুমি এই রকম ত্যাগস্বীকার করতে পার, নীরেন?"

আমি শুষ্ক হাসি হেসে বললাম, "ত্যাগস্বীকার? কি আমার আছে দিদি, যে তাই নিয়ে এই ত্যাগস্বীকার-টিকার, এত বড় বড় কথা আমার সম্বন্ধে খাটতে পারে?"

"আছে কি না আছে, তার তো প্রমাণও না পেলি, ভাই উনি না লিখেছেন, ঠিকই; হয় ত সগুণা তোমারই বিধি নির্দ্দিষ্টা বটেন। হরেন্দ্রর জন্য সে নয়। তাই হরেন্দ্র এমন করলে। তুমি আর ওঁদের কষ্ট দিও না। নিজেকেও কষ্ট দিও না। আমি তো হরেনের বোন? আমি বলছি, তোমার এ ক্ষেত্রে কিছু দোষ স্পর্শাবে না। উনি তো হরেন্দ্রকে জানিয়েই দিয়েছেন এ কথা। আর তুমিও তাকে বোঝাতে কম কর নি নিজের কানেই শুনেছি তো।"

"কিন্তু দিদি, হরেন বাবু তবুও এ কথা মনে কখনই করতে পারবেন না যে, বিপন্ন অবস্থায় যাকে বিশ্বাস ক'রে—"

"তার দিদির ভার দিয়ে গিয়েছে, এই বই তো নয়? সে ভার তো তুমি কাঁধেই নিয়েছ! সগুণার ভার তো সে তোমায় দিয়ে যায় নি। আমার মনে হচ্ছে এখন, সে অধিকার তার ছিলো কি না, তাও সন্দেহ। তা হ'লে কি সে এত নিশ্চিন্ত হ'তে পারত? আর আমাদের দেশের দশ বছরের মেয়েরা এ রকম করতে পারে বটে, কিন্তু সগুণার মত বয়স ও শিক্ষা পাওয়া মেয়ের এ রকম উদাসীনভাব, এতে আমি সে দিন অবাকই হয়েছিলাম। সে দিন ওঁদের ছ'জনের ব্যাপার দেখে সগুণার মতটা কি জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে একটুও টলাতে পারি নি। আজ আমারও মনে হচ্ছে, তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই। তুমি তাঁদের নিমন্ত্রণ রাখতে স্বচ্ছন্দেই যেতে পার।"

তর্ক করবারও আর শক্তি ছিল না, বিদ্রোহের ক্ষমতাও যেন হ্রাস পেয়ে আসছিল। যেটুকু এতক্ষণ ছিল, 'দিদি'ই যেন তা লোপ ক'রে দিলেন ক্রমশঃ।

একটু পরে দিদি বল্লেন, "তোমার বাবা আর সগুণার বাবা ছ'জনে বুঝি ছ'জনের বেহাই হ'তে চেয়েছিলেন?

আমি একটু গলা ঝেড়ে বললাম, "সে অনেক দিনের কথা।"

"যাক, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গেছিল কে? তুমি নিজেই বুঝি?"

"হঁ।"

দিদি একটু হাসলেন। তার পরে বল্লেন, "সে দিন ওর সে চিঠিখানা নিয়ে তুমি অজ্ঞানের মত হয়ে বসেছিলে, তোমায় ডাকতে গিয়ে তার কটি অক্ষরে হঠাৎ আমার চোখ পড়েছিল, ভাই। হরেনের হাতের লেখা চিঠিতে আবার না জানি কি খবর এসেছে ভেবে, আমি অনিচ্ছায়ও সে দিকে চেয়ে ফেলেছিলাম একটু। তাতে দেখলাম, উনি সগুণাকে তোমার বিধিনির্দ্দিষ্টা ব'লে কি খানিকটা লিখেছেন। সেটুকু দেখে ফেলেছি ব'লে তুমি কিছু মনে করবে না তো?"

"না, দিদি; তবে আপনি দিদি কিসের? ইচ্ছে করেন তো সবটাই এখন দেখতে পারেন।" ব'লে উঠে, চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি ছ' মুহূর্ত্ত সে দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তার পরে বল্লেন—"শুধু এটুকু দেখে কি হবে? সব গল্পটা বলতে পার, তবে ত বুঝি ছোট ভাই!"

নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লাম! এ-ও কি বল্‌বার মত কথা! লজ্জার সঙ্গে হেসে উত্তর দিলাম, "গল্প তো নেই কিছু, যেটুকু আছে, তা তো আপনি বুঝতেই পেরেছেন দেখছি।"

"আমিই বলি তবে! সগুণাকে জানবার অনেক আগে দেশে থাকতে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিলে, তার পরে এখানে এসে তাকে দেখে—"

"কিন্তু হরেনের সঙ্গে তখন এ সম্বন্ধের কথা আমি জানতাম না।"

তিনি তখন একটু স্নেহের সঙ্গেই বল্লেন, "তাতেই আমার ভাইটি এমন ঘরছাড়া উদাসী! যাক, ভাইয়ের বিয়ে দিতে এসে একেবারে শুধু হাতে ফিরে যাব না, এই একটু লাভ হ'ল। এক ভাইয়ের না হ'ল—আর একটি ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে দেশে যাব।"

যদিও হাসির সঙ্গে, আর একটু মমতার সঙ্গেই কথাটা বল্লেন তিনি, তবু আমার মনে আবার কেমন একটা আঘাত লাগলো। মনে হ'ল, তাঁর ওপর মুখটি বিবর্ণ—আর নীচের মুখটিতে হাসি! আবার বল্লেন, "এইবার যাও তবে নিমন্ত্রণ খেতে।"

"আজকে আর নয়।"

১১ই। সকালে উঠে বেড়ানোর বেশেই একেবারে কাকার কাছে গেলাম। তিনিও বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন, আমাকে দেখে একটু অভিমানের সঙ্গেই যেন বল্লেন, "কাল রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

আমি সলজ্জে বল্লাম, "কাল বড় মাথা ধরেছিল,—আজকে যাব।"

"সগুণাকে ব'লে দিয়ে যাই,—এই বেলাতেই তো?—চল, আমিও বেড়িয়ে আসি।"

খানিক দূর গিয়ে আমার দিকে ফিরে তিনি বল্লেন, "তোমার দ্বিধা দেখে, আমি কাল সগুণাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, হরেন্দ্র ফিরে এলেও আমাদের সঙ্গে আর তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কোন সুপাত্রে তাকে আমি দান করব।" নিঃশব্দেই তাঁর কথা শুনে যেতে লাগলাম। হরেন্দ্রর উদ্দেশে কতকগুলি বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে আবার

তিনি বল্‌লেন, "সগুণাকে এ সব আমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। সে চুপ ক'রে শুনে গেল। আমার দুর্ম্মতিই যে, তোমার সেই চিঠি পেয়ে, তোমার মন জেনেও, হরেন্দ্রর প্রত্যাশায় ছিল, সে কথাও আমি তার কাছে স্বীকার করলাম। তখনি যদি মন ফিরাই, তা হ'লে কি এই কেলে-ঙ্কারীটি কপালে ঘটে! সবাই ত জেনেছে, বিয়ে না ক'রে সে জোর দেখিয়ে বিলাত চ'লে গেল! এ কি অপমান নয়?"

আমার কথা, আমার সেই চিঠির কথা--সগুণাকে তাঁ'র বাপের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার কথা সব আজ জেনেছেন তা হ'লে সগুণা? কি ভাবলেন তিনি? বাপের কথার উত্তরে কি বল্‌লেন, তা তো এঁ'র মুখে একটু আভাসও পেলাম না। নিজে যা যা বলেছেন সগুণাকে, তাই কেবল অনর্গল তিনি ব'লে যেতে লাগলেন, আর লজ্জায়-- ভয়ে- দুঃখে--আর কেমন একটা উৎকণ্ঠায় আমার ভেতরটা আবার সেই ধড়াস্ ধড়াস্ উথাল-পাথাল করতে লাগল। আর বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভবই হয়ে উঠলো, কাকা উত্তেজনার বশে দিব্য জোরে জোরে পা ফেলে চলেছিলেন, আর আমি কেবলই পেছিয়ে পড়ছিলাম! হঠাৎ এক সময়ে সেটা লক্ষ্য ক'রে তিনি বল্‌লেন, "আজও তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি দেখছি, চল তবে ফিরি। তুমি কিছু নিরুৎসাহ হয়ো না, সে আমার কথার ওপর কথা কইবার মেয়েই নয়। স্নানটা সেরে সকালেই এস। বুঝেছ? ডিসেম্বরের যে তারিখটা ঠিক্ করা আছে, সেইটাতেই আমার ইচ্ছা! দেরী করার প্রয়োজন কি? এস তা হ'লে শীগ্‌গির- বুঝলে? যত শীগ্‌গির পার, স্নান সেরে নাও গে। আচ্ছা, এস।"

দুজনে ভিন্ন পথ ধরলাম। কি বল্‌তে চান তিনি? এই অঘ্রাণেই?—এ কি সম্ভব? সগুণা কি শুনেছেন এ কথা? কি ভাবছেন তিনি এখন?--আমার সেই গানগুলো --তাদের কি চিনতে পারছেন তিনি এখন? তিনি কি ভাবছেন, আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই--?--না- না- এ তিনি কখনই ভাবতে পারেন না! তাঁর বাবা যদি না তাঁকে বল্‌তেন, এ কথা তো চিরদিনের জন্যই লুকানো থাকতো। তাঁকে তো কখনো আভাসেও এ কথা আমি জানতে দিই নি। তবে কেন তিনি তা ভাববেন?

তিনি এই কথাগুলোই কেবল ভাববেন? আর কিছু কি একবারও মনে করবেন না? মনে করবেন না কি--

আমায় যে স্নান ক'রে এখনই তাঁ'রই সুমুখে যেতে হবে, তাঁ'র হাতের পরিবেশন খেতে হবে। আজই কেন কাকা তাঁ'কে সব জানতে দিলেন? (এই সব কথা মনে ভাবতে গিয়েও কিন্তু মনে একটা দুঃখের হাসি আসছে। কি জানেন তাঁ'র বাবা? সবের কত কতটুক্? মাত্র নীরেন তাঁ'র মেয়েকে চেয়েছিল, এইটুকু বই ত না? কিন্তু এই কি মাত্র আমার সব কথা?) অন্ততঃ আজকের দিনটাও সেই আগের মত খেয়ে আস্‌তে পারলেই যে ভাল ছিল।

স্নান ক'রে নিয়ে বেরুবার আগে 'দিদি'র সন্ধানে গিয়ে দেখলাম, তিনি দুটি চারটি এই মরশুমি ফুলপাতা বাংলোর চারদিক থেকে সংগ্রহ ক'রে পূজোয় বসেছেন। তাঁকে আর অন্যমনা না ক'রে আমি চ'লে এলাম। ঐ রকম অসংখ্য আন্দোলনে মন সমানভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েই রইলো। .. কাকা আদরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালেন, নিজেও পাশে বসলেন। মহারাজই প্রধানতঃ পরিবেশন করছিলেন, সগুণাও এটা ওটা দিতে দিতে হঠাৎ একেবারে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "দিদি কোথায় আছেন? এখনো কি তাঁ'র দেশে যাওয়া হয়নি?"

আমার হয়ে কাকাই তখনি উত্তর দিলেন, "কি ক'রে আর যাবেন? নীরেন নিজের সুবিধামত যখন যাবেন, তখনই তো? সে এখনো কিছুদিন দেরী আছে।"

শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে সগুণা আবার প্রশ্ন করলেন—"এখনো কি আপনার যেতে দেরী আছে? শুনেছিলাম যে, শীগ্‌গির যাবেন?"

কাকা ব্যস্ত হয়ে এবারও আমায় উত্তর দিতে না দিয়ে ব'লে উঠলেন, "কে বল্লে তোমায় এ কথা? এখন কিসের জন্য অনর্থক দেশে যাবে?--সে তখন --"

তাঁকে কোন রকমে থামিয়ে আমি ধীরে ধীরে উত্তর দিলাম, "তিনি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এ ক'দিন আছেন, যে দিন তিনি বল্‌বেন, সেই দিনই তাঁকে নিয়ে যেতে পারব।"

"তা ব'লে তোমার ডিসেম্বরের এ দিকে আর যাওয়া হবে না, তা কিন্তু ব'লে রাখছি, নীরেন—সেই অঘ্রাণের শেষে একেবারেই যাবে তোমরা! উনিও সেই সময়েই যাবেন

না হয়। থাকুন না কেন এ কটা দিন যেমন আছেন তেমনি।"

সগুণা ধীরে ধীরে আবার বললেন, "কাল আমি তাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে যাব আপনার বাড়ীতে।" "যদি বলেন, তাঁকে এখানেই নিয়ে আসতে পারি, আপনি দেখা করতে চান বল্লেই তিনি আসবেন।" "না, আমি নিজেই যাব।"

কাকা এবার অসহিষ্ণুভাবে 'আচ্ছা, আচ্ছা সে তখন যাস আমার সঙ্গে; নীরেনের বাসায় তো তোর এদানী অনেক দিন যাওয়া হয়নি। কাল আমরা যাব, বুঝেছ, নীরেন? তোমায় কাল ভাল ভাল গোটাকতক গান শোনাতে হবে। আজও সন্ধ্যায় এসে তুমি গান শোনাবে আর কালকের সন্ধ্যার ক্ষতিপূরণ করবে বুঝলে?" এই রকম উনি অনর্গল যা খুসী ব'লে যেতে লাগলেন আর আমি সগুণার আনত মুখের পানে কয়বার চেয়ে নিলাম। মুখটা যেন একটু বেশী সাদা, মুখে কেমন একটা পরুষ-ভাব, এ রকম তো কখনো দেখিনি। জানি না, আমারও এ সন্দেহমাত্র কি না! শ্বেত পাথরের মত মসৃণ সুন্দর ললাটে কেমন একটা স্থির সঙ্কল্পের চিহ্ন, গণ্ডের অধরের আরক্ত আভার মধ্যে কেমন যেন বিবর্ণ ভাব। হঠাৎ আমার দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিল্‌তেই তিনি চোখ নামালেন। জানি না, চোখে কি দেখলাম! কি এ চিনি না, জানি না! আমার সব জানার জন্যই কি এ সঙ্কোচ লজ্জা! বিগত ঘটনার জন্য গ্লানি, অনুশোচনা; না হরেন্দ্রর জন্য বেদনা! কিংবা সব জিনিষগুলো মিলিয়েই একটা রহস্যময় বিদ্যুৎবিকাশ! কি জানি।

সন্ধ্যা। খাওয়ার পরে বাড়ী এসে ঘণ্টা কতক বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসেছি, 'দিদি' এসে সহাস্যে "কি কি খেলে" ব'লে প্রশ্ন করলেন। ভোজের লিষ্ট তাঁ'র কাছে দাখিল ক'রে সগুণা তাঁ'র সম্বন্ধে যে যে কথাগুলো বলেছে তাঁকে জানা-লাম। তিনি সকৌতুকে "আজ বুঝি 'দিদি'র খোঁজ পড়েছে?" ব'লে এমন একটু মিষ্ট হাসি হাসলেন, যাতে আমার মনের কেমন একটা শঙ্কিত ভাব মুহূর্তেই উড়ে গেল। আমিও যেন আজ তাঁ'র এ সংবাদ লওয়ার একটি সরল অর্থ দেখতে পেলাম।

দিদি বল্লেন, "আসুক সে কাল, বুঝিয়ে দেব তাকে যে, বৌ না নিয়ে আমি দেশে ফিরে যাব না।"—আমায় বল্লেন, "সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ আছে; তা তো এতক্ষণ বলনি, মহারাজকে বারণ করি তা হ'লে।" আমি উত্তর দিলাম—"না, দিদি—এ বেলা আর নয়—সকালে ওঁদের সঙ্গে ক'রে আনতে যাব।"

"ওঁরা প্রতীক্ষা করবেন হয় ত।"

"তা করুন—আজ আর পারব না।"

১২ই। রাত্রি। আজকের কথাটাও লিখি। না হ'লে যে আমার সব কথার প্রধান কথাটিই বাকি থেকে যায়। সকালে উঠে গিয়েছিলাম তাঁদের বাংলোতে—তাঁদের সঙ্গে ক'রে আনতে। সম্মুখেই সেই জানালাটা খোলা, যেখানে এক দিন হরেন্দ্রর দিদির কাছে সগুণাকে দেখে-ছিলাম। আজও বুঝি সেই আশায় আমার অজ্ঞাতেই চোখ সেই পথে দৃষ্টি ফেল্‌তেই সে যা চেয়েছিল, তাই-ই পেলো! সগুণাই দাঁড়িয়ে আছেন বটে—জানালার রেলিং ধ'রে! আমার চোখের সঙ্গে তাঁর চোখ মিল্‌তেই এক মুহূর্ত তিনি স্থিরদৃষ্টিতে বোধ হয় আমার মুখের দিকেই চাইলেন। উঃ, এখনো মনে করতে অন্তর থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠছে! কি সে চোখ! বজ্র-বিদ্যুৎ-ভরা কালো মেঘে আঁধার কাল্‌বৈশাখীর আকাশের মত! ওষ্ঠ অধরের সেই যে অপরূপ ভঙ্গীর মধ্যে আরক্ত আভা, ঘৃণার বিষে তাও যেন কালিমাখা হয়ে উঠেছে! একটা প্রস্তরের কঠিনতা যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থেকে ফুটে উঠছে, আর কান, নাক, গাল দুটো দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে! তীব্র তীক্ষ্ণ ঘৃণার আগুনভরা চোখে দু এক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে তার পরেই তিনি পাশে স'রে গেলেন।

কতক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না—কাকা এসে আমার বাহু ধ'রে নাড়া দিয়ে বল্লেন, "ঘরে এসো—অনেক কথা আছে।" তাঁর মূর্তিও বিশৃঙ্খল বিষম উত্তে-জিত। এক রকম টেনেই প্রায় আমায় তাঁর ঘরে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে বল্লেন, "শোন, আমার শান্ত বাধ্য মেয়েটির কথা শোন! তিনি বল্লেন, আমার আদেশ তিনি এক রকমে পালবেন—হরেন্দ্রকে বিয়ে করতে না অনুমতি দিই—বিয়ে করবেন না,—কিন্তু আজীবন কুমারী থাকবেন। আমি বলেছি, তাকে বিয়ে করতেই হবে তোমাকে, এই অঘ্রাণ মাসে—সেই তারিখেই! তাতে উত্তর দিয়েছে প্রাণ গেলেও সে তোমার মত লোককে বিয়ে করবে না—

এতে তার কপালে যাই ঘটুক!" জড়ের মত আমি শুনে গেলাম। ভাবনা, বেদনা তখন আর আমার কিছু নেই—সব অনুভবের শেষ হয়ে গেছে যে তখন। তিনি আবার হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "কিন্তু কত বড় স্বাধীন আর শিক্ষিত মেয়ে সে হয়েছে, আমি দেখে নেব। যদি আমার কথা না রাখে, সে আমার ত্যাজ্য্যা! আমার মেয়ে নেই! সে চ'লে যাক্, যা খুসি করুক, কোন সম্বন্ধ নেই তার আমার সঙ্গে! দূর হোক সে আমার বাড়ী থেকে।" আবার সেই শ্বেত পাতরের মূর্ত্তি, একটা জড় আর একটা উন্মত্তের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো! সুদৃঢ় স্বরে বল্‌লো, "তাই হবে, বাবা, আমি এখানকার গার্ল বোর্ডিংয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রুক্মিণী বাই পিসীমার কাছে যাচ্ছি। পুনায় তিনি আমার পিসীমা হতেন, তাঁর কাছে"

বাপ উন্মত্তের মত লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন, "তোর যেখানে খুসী যা, অকৃতজ্ঞ হতভাগা মেয়ে—"। সগুণা তাঁর উদ্দেশে একবার মাথা নামিয়ে তার পরে বাংলো থেকে নেমে রাস্তায় পড়তে যাচ্ছেন দেখে আমার সে জড়ভাব তখন ছুটে গেল। তখনই ছুটে তাঁর সামনে গিয়ে দু'হাত জোড় ক'রে "আমার একটা কথা শুনুন—" বলতে না বলতেই তিনি সবেগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করলেন—"স্বার্থপর, নীচ।" তার পর সোজা রাস্তা বেয়ে এক দিকে অদৃশ্য হলেন।

একটু পরে চেয়ে দেখি, কাকা সেই উন্মত্ত মূর্ত্তিতেই আমার দু'হাত ধ'রে টানতে টানতে বল্‌ছেন "আজ থেকে তুমি আমার ছেলে—তুমি আমার মেয়ে। এস, তুমি আমার ঘরে এস।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

ভারতে প্রথম মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট
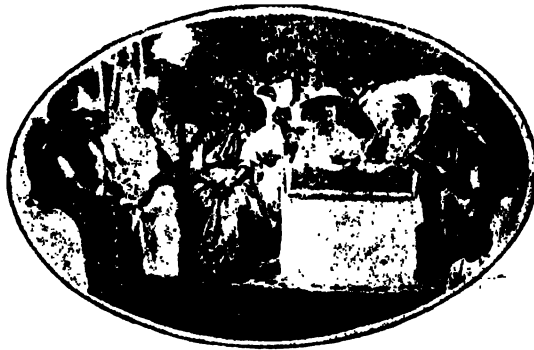
ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজেই প্রথম মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। এই ইংরাজ মহিলাকে মাদ্রাজের মহিলারা এক সভায় অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাহারই চিত্র প্রদত্ত হইল।

এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্ক

১

যুদ্ধের জন্য একদিকে ইংরাজ ও ফরাসীতে, অপরদিকে জার্ম্মাণীতে প্রবল প্রতিযোগিতায় মারণাস্ত্রে পরস্পরকে পরাভূত করিবার প্রবল প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি কিরূপে ব্যবহার হইয়াছে, তাহার প্রমাণ যেমন নূতন নূতন কামানে ও গোলায় পাওয়া গিয়াছে, তেমনই পাওয়া গিয়াছে আকাশে এরোপ্লেনে, ভূমিতে ট্যাঙ্কে আর জলে সাবমেরিণে। আমরা লণ্ডনে এরোপ্লেন, বার্ম্মিংহামে ট্যাঙ্ক ও এডিনবরায় সাবমেরিণ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

এরোপ্লেন যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। ফরাসীরা এই বিমানরচনায় অগ্রণী। পাখী যেমন পক্ষ ভর দিয়া বায়ুপথে গতায়াত করে, তেমনই পক্ষ দিয়া এই বিমান রচনার কল্পনা। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার উন্নতি মন্থরভাবেই হইতেছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে সে উন্নতি দ্রুত হয়। যেমন শত্রুকে আক্রমণ করিতে বা শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দ্রুত গমন করিতে হয়—forced march করিতে হয়, তেমনই এই যুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের দ্রুত উন্নতি সাধন করিতে হইয়াছিল। জার্ম্মাণী জেপলিন প্রস্তুত করিয়াছিল—তাহাকে আকাশের জাহাজ বলা যায়। তাহাতে আসিয়া জার্ম্মাণরা লণ্ডনের উপর

বিমানের পার্শ্বে ভারতীয় সম্পাদকগণ।
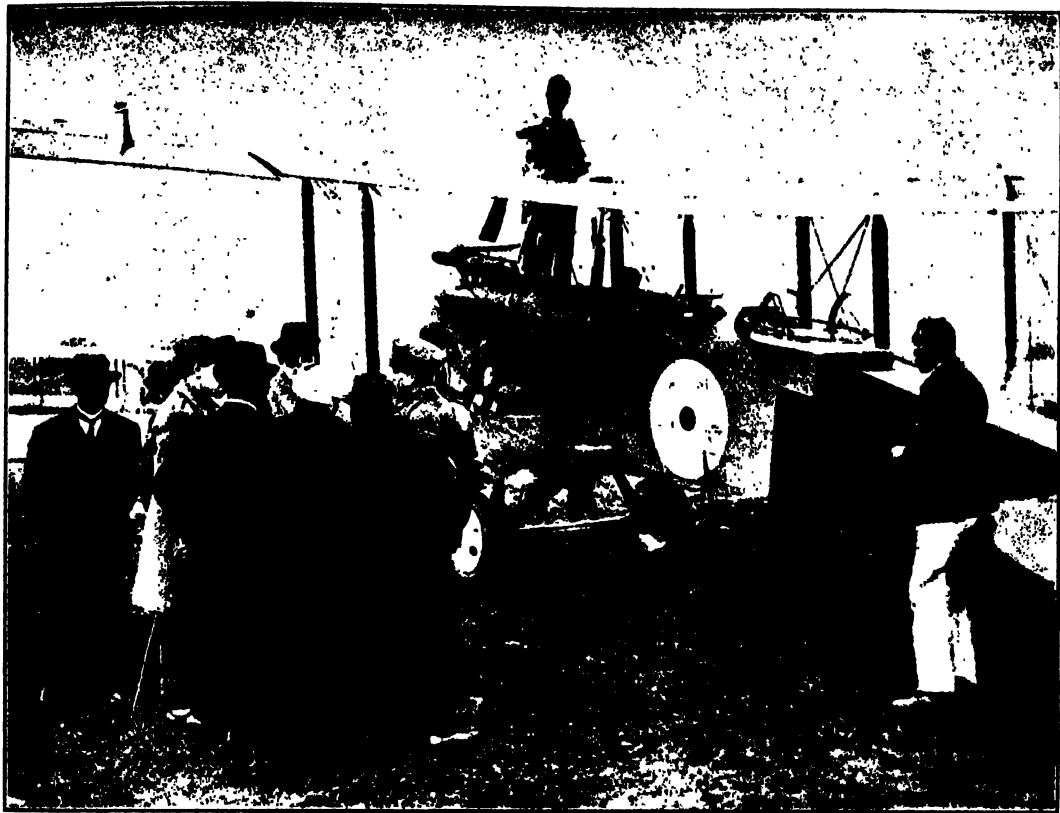
বিমান-পর্য্যবেক্ষণ।

বোমা বর্ষণ করিয়া গিয়াছে—পাছে বোমা বর্ষিত হয়, সেই ভয়ে লণ্ডনে বাকিংহাম প্রাসাদের ছাতের উপর জাল দেওয়া হইয়াছিল। পাছে জল দেখিয়া তাহারা স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে, সেই ভয়ে হাইড পার্কে ছোট ছোট জলাশয় ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জেপলিন বড়—এরোপ্লেন ছোট। প্রথম ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান যুদ্ধে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য বেলুনের ব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু বেলুনের ব্যবহারে অনেক অসুবিধা। এরোপ্লেনে সে সব অসুবিধা দূর হইয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধে এরোপ্লেন যে কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

১৫ই অক্টোবর (১৯১৮) প্রভাতে প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমরা লণ্ডনে হোটেল হইতে যাত্রা করিয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠে হেণ্ডনে বিমানবন্দরে উপস্থিত হই।

বিমানীত্রয়ের আফিস ঘরের দ্বারে কারখানার অধ্যক্ষ ও আফিসের কর্ত্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বিমানাশ্রয়ে লইয়া গেলেন। একখানি হেণ্ডলী পেজ বিমানে আমাদিগকে তুলিবার ব্যবস্থা ছিল।

প্রথমে কারখানার কর্ত্তা ও বিমানচালক (Pilot) আমাদিগকে বিমানের কলকব্জা ও তাহার গঠন-প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। আমরা কেহই এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী না হওয়ায় এবং কলকব্জার বিষয়ে আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায়, স্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেবল কৌতূহলী শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধর প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; আর কারখানার অধ্যক্ষ ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। আমাদের বিমান পরিদর্শন পরিশেষ হইলে বেশ পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। যাহারা বিমানের পুরোভাগে থাকিবেন, তাঁহাদিগের ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকায় তাঁহাদিগকে ওভার কোট ও লোমশ টুপী পরান হইল। ওভার কোটের

উপরিভাগে মসৃণ চর্ম্ম, অভ্যন্তরে লোম। দেবধর ও মৌলবী সাবুব আসন পুরোভাগে চালকের সঙ্গে বসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা অবশিষ্ট কয়েকজন তাঁহাদিগকেই "আসর দিয়া" পশ্চাদ্ভাগে যাইতে সম্মত হইলাম। আমাদিগকে আর অধিক বেশ পরিধান করিতে হইল না। কেবল নিজ নিজ ওভার কোট চড়াইয়া টুপীটা মাথায় দিতে হইল। পুরোভাগে যাঁহারা আরোহণ করিলেন, তাঁহাদের সে বেশে তাঁহাদিগকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর মত দেখাইতে লাগিল।

আমরা যে যাহার স্থান অধিকার করিলে কারখানার কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা সকলে প্রস্তুত?" আমরা বলিলাম—"হাঁ।" তখন চালক কল চালাইয়া দিলেন। অনতিবিস্তৃত তৃণাস্তৃত ময়দানের এক প্রান্ত হইতে চাকার উপর বিমান ছুটিয়া গেল। পাখীরা যেমনভাবে একটু অগ্রসর হইয়া তাহার পর ডানায় ভর দিয়া উড়ে, এও তেমনই। তাহার পর বিমান শূন্যে উঠিল।

আমি স্থল ব্যতীত বড় ভাল থাকি না। জলপথে যাইলেই সামুদ্রিক পীড়ায় আমাকে শয্যা-গ্রহণ করিতে হয়। এবারও বিমান যখন প্রথম শূন্যে উঠিল, তখন যেন মাথাটা একটু ঘুরিয়া গেল। কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না। বিমান ঘুরিয়া অগ্রসর হইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কখন মেঘের মধ্যে—কখন সূর্য্যালোকে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সময় সময় নিম্নে মেঘের উপর সূর্য্যালোক-সংপাত-দৃশ্যে আমরা মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। নিম্নে গৃহগুলি যেন জাপানী খেলনা-বাড়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার প্রতীচ্য বিজ্ঞানের রচনা এই এরোপ্লেনে উঠিয়া মনে পড়িল, কত শতাব্দীর পূর্ব্বে "ভারতের কালিদাস" কবিকল্পনায় এই বিমানে গমনের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আজও অতুলনীয়। রাবণকে বধ করিয়া ধর্ম্ম নিঃশঙ্ক করিয়া রামচন্দ্র রাহুমুক্ত চন্দ্রের মত সীতাকে লইয়া পুষ্পকরথে গগনপথে লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; আর সীতাকে নানা স্থান দেখাইয়া সে সকলের বিবরণ শুনাইতেছেন। লঙ্কা ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী সেতু দেখাইয়া তিনি বলিলেন :—

"হের প্রিয়ে, সেতু মম মলয়-শিখরী
স্পর্শি দূরে বিভাগিল ফেনিল সাগর;
শোভে যথা ছায়া-পথ দ্বিখণ্ডিত করি'
তারকা-খচিত চারু শারদ অম্বর।"

সমুদ্রের উপর হইতে দূরে তালীবনশ্যাম বেলাভূমির দৃশ্য—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

সাগর কামরূপ

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর;
শত মুখে নদীকুল চুম্বিছে তাঁহারে;
সকলের মুখে দিয়া তরঙ্গ-অধর
চতুর সরিৎ-পতি তুষেন সবারে।"

রঘুপতি সীতাকে পম্পা সরোবর দেখাইতেছেন,—

"আসি, প্রিয়ে, এই স্থানে তব অন্বেষণে—
হেরিনু স্ফটিকবারি পম্পা সরোবর
বিহরিছে চক্রবাক চক্রবাকী সনে
এ উহার মুখে দিয়া মৃণাল কেশর।"

তবে কালিদাসের কবিকল্পনা বাস্তবেই আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। তাই তাঁহার বর্ণনা—

"প্রসারি গবাক্ষপথে ও কর তোমার
পরশিছ যবে তুমি জলধরদল;
বিজলী-বলয় তা'রা আনি উপহার
পরাইছে করে তব ক্ষণ-সমুজ্জ্বল।"

ক্রমে ক্রমে এরোপ্লেন ভূমি হইতে ৩ হাজার ২ শত ফুট উচ্চে উঠিল। বিমান যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই নিম্নের গৃহাদি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উপরে মেঘমালা—আমরাও মেঘমালার মধ্যে অবস্থিত; নিম্নে গ্রামশস্যাস্তৃত ভূমি ও গৃহাদি—সে সকলের উপর কখন রৌদ্র কখন বা মেঘের ক্ষণ ছায়া; যেন কেবল মেঘালোকের মনোরম ক্রীড়া।

৩ হাজার ২ শত ফুট উঠিবার পর চালক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আরও উঠিতে চাহি, না এখন তিনি
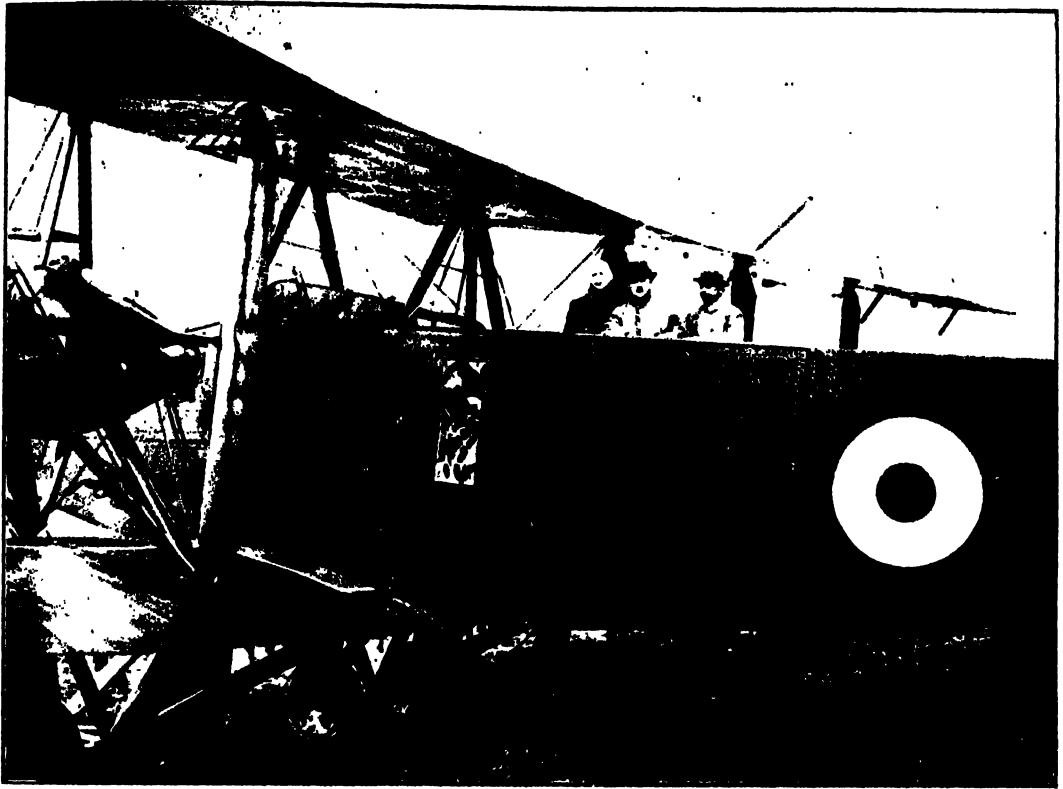
বিমানে

বিমান নামাইবেন ? আমরা নামাইতে বলায় তিনি নিম্নাভিমুখে বিমান চালাইলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই কতকটা নামিয়া আসিয়া তাহার পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিমান কারখানার প্রাঙ্গণপ্রান্তরে উপনীত হইল।

আমরা নামিয়া পড়িলাম।

মেসোপোটেমিয়ায় আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এরোপ্লেন দেখিয়াছিলাম শুনিয়া কারখানার অধ্যক্ষ এক বৎসরে এরোপ্লেনের কত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি বলিলেন, "শুনিয়াছি, আপনাদের আজ অনেক কায আছে; আপনারা এখান হইতে পার্লামেণ্টে হাউস অব লর্ডসে যাইবেন এবং তাহার পর আবার রাত্রিতে সংবাদপত্রসেবকদিগের সংবর্দ্ধনা আছে। আমি আর অধিক সময় আপনাকে আটকাইয়া রাখিব না। ওদিকে খাবার প্রস্তুত। চলুন, খাইতে বসিয়া এ কথার আলোচনা করা যাইবে।"

তাহাই হইল। আমরা আফিস ঘরের পার্শ্বস্থিত ঘরে আহার করিতে বসিলাম। কারখানার অধ্যক্ষ আমার পার্শ্বেই বসিয়া পূর্ব্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আহার শেষ করিয়া আমরা যখন যাত্রার আয়োজন করিলাম, তখন দেখি, কয়টি চড়াই পাখী বাতায়নপথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অধ্যক্ষকে বলিলাম, "এরোপ্লেন ইহাদেরই বৃহৎ সংস্করণ।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাই বটে। আমরা বড় জিনিসটা রচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু সব চেয়ে বড় জিনিসটার সন্ধান পাই নাই—সেটা জীবন।" আমি বলিলাম, "আর এই যুদ্ধে সেই সবচেয়ে বড় জিনিসটা যে ভাবে নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন, আমরা সেটাকে একান্তই তুচ্ছ মনে করি।" তিনি বলিলেন, "সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

১

ট্যাঙ্ক একটি অদ্ভুত আবিষ্কার। কে ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন অর্থাৎ এইরূপ যানের কল্পনা প্রথমে কাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছিল, সে বিষয়েও মতভেদ আছে। আর কেন ইহার এমন নাম হইল, তাহাও বলা দুষ্কর। একটা মাঝারী আকারের লৌহনির্ম্মিত ঘর সর্ব্বাঙ্গে শৃঙ্খল আর তাহাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইলে ঘর অগ্রসর হয় যেন একটা বিরাটকায় শুঁয়াপোকা!

ট্যাঙ্ক ও আরোহী।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া দিলে নিশ্চিন্ত। সাধারণ গোলাগুলীতে ইহার লৌহপ্রাচীর নষ্ট হয় না তবে বড় গোলার কথা স্বতন্ত্র। ইহা কর্দ্দমের উপর দিয়া অগ্রসর হয় পরিখা ইহার গতিরোধ করিতে পারে না কাঁটাতারের বেড়া ইহার গতিবেগে ছিঁড়িয়া যায়। কাজেই যুদ্ধের দিকে ইহা যে কত উপযোগী, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার ইহার মধ্যে বসিয়া শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িবার ব্যবস্থা আছে।

ট্যাঙ্ক নাকি ইংরাজের আবিষ্কার। উদ্ভাবনী-শক্তিতে ইংরাজের প্রাধান্য অনেকেই স্বীকার করেন না। সে বিষয়ে জার্ম্মাণরাই অগ্রণী। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আবিষ্কারের গৌরব ইংরাজের। জার্ম্মাণরা ইংরাজের ট্যাঙ্ক দেখিয়া ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে ট্যাঙ্কও আমরা দেখিয়াছি। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বিকল ট্যাঙ্কই দেখা যায়। আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। ইংরাজরা বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহাদের ট্যাঙ্কই ভাল।

বার্ম্মিংহামে ৩০শে অক্টোবর আমরা মেট্রোপলিটন ক্যারেজ, ওয়াগন ওয়ার্কস দেখিতে যাই। তখন আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আমরা যেন সে কারখানার নাম ও তথায় কত ট্যাঙ্ক প্রস্তুত হয়, তাহা প্রকাশ না করি। ভয় পাছে কোনরূপে জার্ম্মাণরা সন্ধান পায় এবং বোমা ফেলিয়া কারখানা নষ্ট করে। তখন সময়ও

বড় ভয়ানক ছিল। তাহার প্রথম পরিচয় গমনপথে মিশরেই পাইয়াছিলাম। তথায় রেল গাড়ীতে ইস্তাহার ছিল—

সাবধান—গুপ্তচর আছে

কোন প্রকাশ্য বা গুপ্তস্থানে নৌসেনাবিভাগের বা সামরিক কথার আলোচনা করিও না। মনে রাখিও, তুমি কোন বন্ধুকে যে কথা বলিতেছ, তাহা তিনি আবার কোন গুপ্তচরের সম্মুখে বলিয়া ফেলিতে পারেন।

আজ আর সে দুর্দ্দিন নাই। তাই আজ আর কারখানার নাম প্রকাশে কোন বাধা আছে বলিয়া বিবেচনা করি না। বিশেষ যে কারখানা যুদ্ধের সময় ইংরাজের সাফল্যের অন্যতম অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, নাম প্রকাশে তাহার অধিকার অবশ্যই আছে।

কারখানার ভিন্ন ভিন্ন অংশে কিরূপে ট্যাঙ্কের নানা অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা সব জুড়িয়া ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করা দেখিলাম। তাহার পর আমরা বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে খানিকটা খোলা জমী কর্দ্দমাক্ত স্থানে স্থানে জল বাধিয়া আছে—কোথাও কোথাও গর্ত্ত কাটা। এই স্থানে ট্যাঙ্কের পরীক্ষা হয়।

আমাদের জন্য একখানি ট্যাঙ্ক তথায় ছিল। দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। ট্যাঙ্কের দ্বার অবশ্য তাজমহলের তোরণের মত হইতে পারে না—নীচু হইয়া ট্যাঙ্কে প্রবেশ করিতে হয়। আমাদের মধ্যে মিষ্টার স্যাণ্ডক্রক বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আমি বলিলাম, "স্যাণ্ডক্রক, তুমি আগে ঢুকিয়া পড়—আমরা তোমার অনুসরণ করি। তুমি যদি ঢুকিতে পার, তবে আর সকলেই পারিবে।"

স্যাণ্ডক্রক পাল্টা জবাব দিলেন, "ঘোষ, দেহায়তনে তুমি আমার সমান না হইলেও তোমার পট্টুর ওভারকোটটি গায় থাকায় তুমিও বড় কম যাও না।"

যাহা হউক তিনিই প্রথম ট্যাঙ্কে প্রবেশ করিলেন। আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

কোনরূপে স্থান করিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম। যুদ্ধের সময় বিলাতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগকে যুদ্ধের কায করিতে বাধ্য করায় স্ত্রীলোকদিগকে এমন অনেক কায করিতে হইয়াছিল, যে সব পূর্ব্বে কেবল পুরুষরাই করিত। অমনিবাস—ভাড়াগাড়ীর কণ্ডাক্টরের কায সে সকলের অন্যতম। বেশ আঁটা পোষাকপরা মেয়েরা কণ্ডাক্টরের কায করিত; তাহারা যখন মিহি গলায় ভাড়া চাহিত—"Fares please" তখনই বুঝা যাইত নারীকণ্ঠ। আমরা উপবেশন করিলে স্যাণ্ডক্রক নারী কণ্ডাক্টরের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া বলিলেন ভাড়া কই—Fares please. ট্যাঙ্কের মধ্যে হাসির রোল উঠিল।

তাহার পর চালকরা লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ট্যাঙ্ক চালাইলেন। মন্দগতিতে ট্যাঙ্ক চলিতে লাগিল—অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে না দেখিলে কোন্ দিকে যাইতেছি বা সম্মুখে কি আছে, বুঝিবার উপায় নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে ঝাঁকীতে বুঝা যায়, অসমান স্থানে যাইতেছি হয়ত বা গর্ত্তে পড়িয়া আবার উঠিতেছি। আমাদিগকে দেখাইবার জন্য পথের মধ্যে এক স্থানে কাঁটাতারের বেড়াও দেওয়া হইয়াছিল—কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ বৃতির বাহুল্য। ফিরিয়া আসিয়া ট্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া আমরা দেখি, তাহা ছিঁড়িয়া ট্যাঙ্ক তাহার উপর দিয়া গিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আমাদিগকে লইয়া ট্যাঙ্ক সেই স্থানটায় ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার পর আবার কারখানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। তখন ট্যাঙ্কের সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমলেপ। আর ট্যাঙ্কের গতায়াতে সমস্ত জমীটা এমন কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল যে, তাহার উপর দিয়া কারখানায় আসা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই এবং কর্দ্দমলেপে জুতার স্বরূপ এতই আবৃত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

অনেক কষ্টে ওভার কোট বাঁচাইয়া আমরা যখন কারখানায় উপস্থিত হইলাম, তখন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত অধ্যক্ষ প্রভৃতি বলিলেন, "ট্যাঙ্কে চড়িলে একটু কষ্ট আছেই"; আর আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কারখানায় কার্য্যরতা যুবতীরা আমাদের দিকে এবং পরস্পরের দিকে চাহিয়া খুব হাসিয়া লইল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও হাসি পাইতেছিল; তাহাদের হাসিতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

এক একটা ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করিতে খরচও বড় কম পড়ে না। তাহার কলকব্জা—লোহার পাত—শৃঙ্খল এ সবই খুব মজবুদ না হইলে শত্রুর অগ্নিবর্ষণে তাহা দেখিতে দেখিতে অচল হইয়া যায় এবং একবার অচল হইলে তাহার আরোহীরা শত্রুর হস্তে পতিত হয়।

যুদ্ধের সময় এরোপেনের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহারই ফলে আজ বিমানে ডাক ও যাত্রী গতায়াতের সময় মানবের অন্তবিধ প্রয়োজনে যখন ইহা প্রযুক্ত হইবে, তখন ইহার দ্বারা মানবের ও সভ্যতার উপকার সাধিত হইতে পারিবে।

জার্ম্মাণ যুদ্ধে মানবের ও সভ্যতার ক্ষতি বড় অল্প হয় নাই। ফ্রান্সে ও বেলজিয়মে সাজান বাগান শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—মানবের রক্তে মেদিনী রঞ্জিতা হইয়াছেন—অগ্নিদাহে গৃহ গ্রাম শস্য ভস্মীভূত হইয়াছে। সকলের

সারি সারি ট্যাঙ্ক।

ব্যবস্থা হইতেছে। বিজ্ঞান দূরত্বের ব্যবধান লোপ করিয়া দিতেছে। তাই এই সব যান এখন ভারতচন্দ্রের "অশ্ব মনোরথ"কেও পরাভূত করিতে উদ্যত হইয়াছে :—

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥"

ট্যাঙ্ক যুদ্ধের প্রয়োজনে সৃষ্ট ও পুষ্ট। ইহাও মারণাস্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইতে থাকিবে। কিন্তু যুদ্ধের পর শান্তির বড় ক্ষতি—মানুষের হিংস্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে—"ধরায় শান্তির রাজ্য" সংস্থাপনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়াছে।

কিন্তু এই যুদ্ধের জন্য কয় বৎসর ধরিয়া যুরোপীয় জাতিসমূহ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে যেরূপ উৎসাহ সহকারে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইবে? সে সব যন্ত্রাদি কি শান্তির সময় সত্যসত্যই মানবের কল্যাণসাধনে সহায় হইবে না? যদি না হয়, তবে সভ্যতা বিস্মৃতির অতলতলে

ডুবিয়া যাইবে—সমাজের উন্নতি হিংসার অনলদাহে লুপ্ত হইবে—মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল সংসার-শ্মশানে তাণ্ডব-লীলা প্রকট করিবে। সে কথা মনে করিতেও শঙ্কা হয়।

কিন্তু যদি এই শক্তি—এই বিজ্ঞানানুশীলনস্পৃহা কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতবাসীকে তাহার শান্তিস্নিগ্ধ তপোবনের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ দেখাইবার জন্য এক জন যুগপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হইয়াছে। য়ুরোপের রণক্ষেত্রে—যুযুধান জাতিসমূহের মধ্যে—কবে সেইরূপ যুগপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হইবে?

স্বরাজ্য দড়ির খেলা

বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

বিরহ

বিরহের ব্যাকুলতা বহুভাবে বহুসংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে। রাধা বলিতেছেন

জলউ জলধি জল মন্দা।
যতা বসে দারুন চন্দা॥

যেখানে দারুণ চন্দ্র বাস করে, (সেই) মন্দ জলধির জল পুড়িয়া যাক।

বিরহের অবস্থায় চন্দ্র, কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতিকে গালি দেওয়া সনাতন প্রথা; কিন্তু চাঁদের ঘর পুড়িয়া যাক, এ প্রকার অভিসম্পাত নূতন রকমের।

আর এক পদে রাধা কহিতেছেন,—

খেদব মোএ কোকিল অলিকুল বারব
করকঙ্কন ঝনকাই।
জখনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব
তখনুক কওন উপাই॥

অর্থ,—কোকিলকে আমি খেদাইয়া দিব, ভ্রমরদলকে করকঙ্কণের ঝঙ্কারে নিবারণ করিব, (কিন্তু) ধবলাগিরি হইতে আসিয়া জলদ যখন বর্ষণ করিবে, তখনকার কোন্ উপায়? (কোকিল ও ভ্রমরকে যত সহজে তাড়ান যায়, মন্থরগতি জলভরা মেঘকে ত সেরূপ অনায়াসে বিদায় করিতে পারা যায় না)!

বর্ষাকালের বিরহের প্রসিদ্ধ পদ—

সখি হে হমর দুখক নাহি ওর।
ই ভর বাদর মাহ ভাদর।
সূন মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া॥
কুলিস কত সত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি জাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর জামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

অর্থ,—এই ভরা বাদল, ভাদ্র মাস, আমার শূন্যগৃহ। মেঘ সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে, ভুবন ভরিয়া বর্ষণ করিতেছে। কান্ত প্রবাসী, দারুণ কাম সঘনে খর শর বর্ষণ করিতেছে। কত শত বজ্রপতন হইতেছে, আনন্দিত ময়ূর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মত্ত দর্দ্দুরী ও ডাহুকী ডাকিতেছে, বুক ফাটিয়া যাইতেছে। দিক ভরিয়া তিমির, যামিনী ঘোর অন্ধকার, অস্থির বিজলীপংক্তি। বিদ্যাপতি কহে, হরি বিনা কেমন করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিবে?

এই পদে পাহুন শব্দের অর্থ সচরাচর পাষাণ করা হয়। পদাবলীর ভাষা এ দেশে ভুলিয়া যাওয়াতে এই ভ্রম ঘটিয়াছে। বিদ্যাপতি অনেক স্থানে এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও অর্থ পাষাণ নয়। পূর্ব্বে যে এ শব্দের অর্থ বাংলা দেশে লোক জানিত, তাহা রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি পাহুন শব্দের অর্থ পথিক করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত অর্থ। আজ পর্য্যন্ত মিথিলা ও বেহারে সর্ব্বত্র, এমন কি, এলাহাবাদ কানপুরেও অতিথিকে পাহুন বলে। বিদ্যাপতির আর এক পদে আছে, "সামর পুরুসা মঝু ঘর পাহুন," শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার ঘরে অতিথি। যে অতিথি, সে প্রবাসী, অতএব কন্ত পাহুন অর্থে কান্ত প্রবাসী। কান্ত পাষাণ বলিলে অসঙ্গত অর্থ হয়। হরি প্রবাসী বলিয়াই রাধা বলিতেছেন, তাঁহার গৃহ শূন্য ও কবি কহিতেছেন যে, তাঁহার বিহনে রাধা কেমন করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিবেন?

একটি খুব ছোট পদে বিরহের ব্যাপকতা যেন মনকে

ভরিয়া দেয়। ইহাতে কোন কথাই নাই, তবু যেন বিরহের চঞ্চলতার একটা বিস্তার অথচ আবেগশূন্যতা চিত্তকে অধিকার করে, যেন বিরহ-জলধির জোয়ার পূরিয়া আসে।—

ললিত লতা জনি তরু মিলতী।
তহি পিঅ কণ্ঠ গহএ জুবতী॥
আজু অপন মন থির ন রহে।
মধুকর মদন সমাদ কহে॥

অর্থ,—ললিত লতা যেমন তরুর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ যুবতী প্রিয়জনের কণ্ঠ গ্রহণ করে। আজ আপনার মন স্থির থাকে না, মধুকর মদনের সংবাদ কহিতেছে।

বিরহের পূর্ণবিকার নিম্নোদ্ধৃত পদে বর্ণিত হইয়াছে।—

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত।
সুন্দরি ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
অপন গুন লুবুধাই॥
মাধব অপরূব তোহর সিনেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জর জর
জিবইতে ভেলি সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি!
অনুখন রাধা রাধা রটতহিঁ
আধা আধা বানি॥
রাধা সঞো জব পুনতহি মাধব
মাধব সঞো জব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত,
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুঁ দিস দারুদহনে জৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

অর্থ,—অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী (স্বয়ং) মাধব (তন্ময়াপন্ন) হইল। আপনার গুণে লুব্ধ হইয়া (আপনার প্রতি আপনি অনুরক্ত হইয়া) নিজের ভাব (এবং) স্বভাব বিস্মৃত হইল। মাধব, তোমার অপূর্ব্ব প্রেম! আপনার বিরহে আপনার তনু জরজর (মাধবের ও রাধার উভয়বিধ বিরহ স্বয়ং অনুভব করিতেছে), বাঁচিতে সন্দেহ হইল (তাহার প্রাণ সংশয়)। বিহ্বল হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে দেখিতেছে, ছল ছল লোচনে হস্ত (অর্পিত)। আধ আধ কথায় (ভগ্ন-কণ্ঠে) অনুক্ষণ রাধা রাধা রটিতেছে (আপনাকে মাধব মনে করিয়া রাধার বিরহে কাতর হইতেছে)। যখন রাধার ভাব, তখন মাধবকে ডাকিতেছে, যখন মাধবের ভাব, তখন রাধাকে ডাকিতেছে। দারুণ প্রেম তথাপি ভাঙ্গে না, বিরহের ব্যথা বাড়ে। কাষ্ঠখণ্ডের দুই দিকে (প্রান্তে) অগ্নি লাগিলে (সেই কাষ্ঠখণ্ডমধ্যস্থ) আকুল-প্রাণ কীট যেমন দগ্ধ হয়, কবি বিদ্যাপতি কহে, (হে) বল্লভ, সুধামুখীকে (রাধাকে) এইরূপ দেখিতেছি।

এই গীতের গূঢ় ও গভীর অর্থ বুঝিলে বৈষ্ণব ভক্ত, সাধক ও কবিগণ বিদ্যাপতির স্থান এত উচ্চে কেন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে প্রেমে এরূপ বিরহ, যাহাতে এরূপ দিব্যোন্মাদ, সে কিরূপ প্রেম?

মিলনের কল্পনা

মথুরা হইতে কৃষ্ণ আর ফিরিয়া আসেন নাই, রাধার আর শ্যামের আর দেখা হয় নাই, ব্রজলীলা ব্রজেই সাঙ্গ হইল। ব্রজবালক ও ব্রজবালা, ব্রজকিশোর ও ব্রজকিশোরী মথুরায় কেহ যায় নাই। বিরহের অবস্থাতে চিত্তবিকারে অথবা আগ্রহাতিশয়ের জন্য পুনর্ম্মিলনের কল্পনা বৈষ্ণব ভক্ত ও কবিগণ ভাবোল্লাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে এরূপ কোন পদ নাই। এই শ্রেণীর গীতের প্রথম রচয়িতা বিদ্যাপতি। তাঁহার অনুকরণে ও তাঁহারই ভাব অনুসরণ করিয়া ভাবোল্লাসের পদসমূহ রচিত হইয়াছে।

এই উল্লাসের দুই অবস্থা;—প্রথম, স্বপ্নসন্দর্শন, দ্বিতীয়, জাগ্রত কল্পনা। স্বপ্ন দেখিয়া রাধা সখীকে কহিতেছেন,—

স্বপনে আএল সখি মঝু পিয়াপাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় উলাসে॥
ন দেখিঅ দমু গুণ ন দেখু সন্ধানে;
চৌদিস পরএ কুসুমসর বানে॥

বঙ্কবিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥
উঠলি চেহাএ আলিঙ্গন বেরী।
রহলি লজ্জাএ সুনি সেজ হেরী ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পূরতোহ মনে ॥

অর্থ,—সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার পাশে আসিল। তখনকার হৃদয়ের আনন্দ (উল্লাস) কি কহিব! কুসুমশর মদনের ধনুক ও গুণ অথবা সন্ধান কিছুই দেখি না, (কেবল দেখি) চারিদিকে (তাহার) বাণ পড়িতেছে। (মাধবের) বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকসিত, সমুদ্র হিল্লোলে যেন চন্দ্র উদয় হইল। আলিঙ্গনের সময় চমকিয়া উঠিলাম, (তখন) শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম। বিদ্যাপতি কহে, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহা মনে পূর্ণ হইবে। [মনে পূর্ণ হইবে, কিন্তু প্রকৃতই যে এইরূপ ঘটিবে, কবি সে কথা বলিলেন না।]

রাধা আবার কহিতেছেন, স্বপ্নে প্রাণপ্রিয়কে দেখিয়া প্রণাম করিলাম।

আর একটি পদে রাধা বলিতেছেন,—

জখন আওব হরি রহব চরন ধরি
চাঁদে পুজব অরবিন্দা।

হরি যখন আসিবেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া রহিব, (আমার) করকমল দ্বারা তাঁহার চরণচন্দ্র পূজা করিব। এই পদে উপমাবৈপরীত্য কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে।

স্বপ্নের পর কল্পনা। মাধব অঙ্গনে আসিয়া রাধাকে সম্ভাষণ করিবেন,—

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পলটি চলব হম ইসত হসিয়া ॥
আবেসে আঁচরে পিয়া ধরবে।
জাওব হম জতন বহু করবে ॥
কঁচুয়া ধরব জব হঠিয়া।
করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥
রভস মাগব পিয়া জবহিঁ।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি নহি ॥
সহজহি সুপুরুখ ভমরা
মুখ কমল মধু পীয়ব হমরা ॥
তৈখনে হরব মোর গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে ॥

(আমার) অঙ্গনে যখন রসিক (মাধব) আসিবে, আমি ঈষৎ হাসিয়া ফিরিয়া যাইব। আবেশে প্রিয় (আমার) অঞ্চল ধরিবে, আমি যাইব, বহু যত্ন করিবে। হঠ (মাধব) যখন কাঁচলি ধরিবে, কুটিল অর্দ্ধদৃষ্টি (কটাক্ষ) করিয়া হস্ত দ্বারা (তাহার) হস্ত রোধ করিব। প্রিয় যখন মিলন মাগিবে, মুখ ফিরাইয়া, মুচকিয়া হাসিয়া, না না, বলিব। সুপুরুষ স্বভাবতঃ ভ্রমর (তুল্য), আমার মুখকমলমধু পান করিবে। তখন আমার জ্ঞান হরণ হইবে। বিদ্যাপতি কহে, ধন্য তোর ধ্যান!

এই গীতটি আলেখ্যচিত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। কবি রাধাকে কহিতেছেন, ধন্য তোমার ধ্যান! ইহাই ধ্যানমিলন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিজপত্নীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ *

অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই যে মনুষ্যদিগের সুখ বা স্নেহ বৃদ্ধি হয়, এরূপ নহে, তোমরা আমাতে মন সমর্পণ করিয়াছ, অতএব অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

সকলের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদ,—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি সুনল
শ্রুতিপথে পরস না গেল ॥
কত মধু জামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল ॥

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ।

কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রান জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক॥

এই কবিতার অপূর্ব্ব মানোহারিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কাহারও মতে ইহার ভিতর মর্ম্মোচ্ছুসিত গভীর নিরাশার সুর আছে, কেহ বা কবির প্রতি অনুকম্পা করিয়া বলেন, এই পদ বিদ্যাপতির অপর নিকৃষ্ট পদাবলীর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তিনি যে এমন কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বিস্ময়ের কথা। এই পদে অর্থের গূঢ়ত্ব "অনুভব" শব্দ লইয়া। রাধা সখীকে যে অনুভূতির কথা বলিতেছেন, সে কিরূপ অনুভূতি? কালপরিমাণে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কৈশোর অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। তবে অনুভব কি? কেন এই পদে অনন্ত কালের অতৃপ্তি মূর্ত্তিমতী রাগিণী হইয়া বিরাজ করিতেছে? কেমন করিয়া এই কিশোরী চক্ষুর, কর্ণের, হৃদয়ের অসীম অপরিমেয় অতৃপ্য লালসা অনুভব করিলেন? কালের বহু যুগ অনুভবের নিকট মুহূর্ত্ত মাত্র। এই জন্য কবি বলিয়াছেন, অনুভব কাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্তে রাধা এই বলিয়া মাধবকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—

সুনু রসিয়া।
অব নই বজাউ বিপিন বসিয়া॥
বার বার চরণারবিন্দ গহি
সদা রহব বলি দসিয়া।
কি ছলহুঁ কি হোয়ব সে কে জানে
বৃথা হোয়ত কুল হসিয়া॥
অনুভব ঐসন মদন ভুজঙ্গম
হৃদয় হমর গেল ডসিয়া।
নন্দনন্দন তুয় শরন ন ত্যাগব
বরু জগ অহাঁ দুরজসিয়া॥
বিদ্যাপতি কহ সুনু বনিতামনি
তোরে মুখে জীতল সসিয়া।
ধন্য ধন্য তোর ভাগ গোয়ালিনি
হরি ভজু হৃদয় হুলসিয়া॥

অর্থ,—শুন রসিক, এখন বিপিনে বাঁশী বাজাইও না। বার বার তোমার চরণারবিন্দ গ্রহণ করিয়া দাসী হইয়া থাকিব। কি ছিলাম কি হইব, সে কে জানে, কুলের হাসি বৃথা হইবে। এরূপ অনুভব হইতেছে, মদন-ভুজঙ্গম আমার হৃদয়ে দংশন করিয়া গেল। নন্দনন্দন, তোমার শরণ ত্যাগ করিব না, (আমার জন্য) তোমার অপযশ না হয়। বিদ্যাপতি কহে, শুন রমণীমণি, তোর মুখ শশীকে জয় করিয়াছে, গোয়ালিনি, ধন্য ধন্য তোর ভাগ্য, উল্লসিত হৃদয়ে হরিকে ভজনা কর।

বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া শ্যামের বাঁশী বাজিতেছে, সে সুর শুনিয়া রাধা মদনমোহনের দাসী হইয়াছেন, আর তাঁহাকে বাঁশীতে আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি?

স্তোত্র এবং শিবগীত

নিম্নোদ্ধৃত গম্ভীর স্তোত্র এখনও বাংলা দেশে সর্ব্বত্র গীত হয়।—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিনাম নিরাশা
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিসোয়াসা॥
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনিরসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনু তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অবতারন ভার তোহারা।

বাংলার গীতিকাব্যে বিদ্যাপতিপ্রসঙ্গ এই স্থানেই সমাপ্ত

করা যায়, কিন্তু শিবপার্ব্বতী সম্বন্ধেও বিদ্যাপতির অনেক পদ আছে। যাঁহারা মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলায় লইয়া যান, তাঁহারা বৈষ্ণব; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ছাড়া অন্য পদ সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু এই সকল গীতেও কবির প্রতিভা লক্ষিত হয়। হরি ও হর যে অভিন্ন, একটি পদে তাহার বর্ণনা আছে,

ভল হর ভল হরি ভল তুয় কলা ;
খনে পিত বসন খনে বঘছলা ॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি ;
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি ॥
খনে গোকুল ভএ চরাইঅ গায়।
খনে ভিখি মাঁগিঅ ডমরু বজাএ ॥
খনে গোবিন্দ ভএ লিঅ মহদান।
খনহি ভসমে ভরু কাঁখ বোকান ॥
এক সরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ণ ও সুলপানি ॥

অর্থ, হর বেশ, হরিও বেশ, তোমার কলাও (লীলাও) উত্তম। (পরিধানে) কখন পীত বসন, কখনও বাঘছাল। কখন পঞ্চানন, কখন চতুর্ভুজ, কখন শঙ্কর, কখন দেব মুরারি। কখন গোপাল হইয়া গোচারণ কর, কখন ডমরু বাজাইয়া ভিক্ষা চাও। কখন গোবিন্দ হইয়া মহাদান গ্রহণ কর, কখন কক্ষের ঝুলি ভস্মপূর্ণ। এক শরীরে দুই বাসস্থান লইল, ক্ষণে বৈকুণ্ঠ, ক্ষণে কৈলাস। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বিপরীত কথা, যে নারায়ণ, সেই শূলপাণি।

বিদ্যাপতিরচিত শক্তিস্তোত্র কাব্য সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ।

বিদিতা দেবী বিদিতা হো
অবিরলকেস সোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিনি
অরি রঙ্গা পুরনন্তী ॥
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅও
উজ্জল রূপ তুঅ বানী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিএ
গঙ্গা কহিএ পানী ॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মানী কহিএ
হরঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিএ
কে জান উত্তপতি তোরী ॥
বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাওল
জাচক জনকে গতী।
হাসিনি দেই পতি গরুড় নরায়ন
দেবসিংহ নরপতি ॥

অর্থ,—ঘনকেশশোভিনী দেবী, বিদিতা হও, বিদিতা হও! তুমি একে অনেক, সহস্রকে ধারণ কর, অরির রঙ্গস্থল (আত্মসম্ভূত সৈন্য-বল দ্বারা) পূর্ণ কর। তোর কজ্জল রূপ কালী কহে, তোর উজ্জ্বল রূপ বাণী, রবিমণ্ডলে প্রচণ্ডা কহে, জলে গঙ্গা কহে। ব্রহ্মার ঘরে ব্রহ্মাণী কহে, হরের ঘরে গৌরী কহে, নারায়ণের ঘরে কমলা কহে, তোর উৎপত্তি কে জানে? কবিবর বিদ্যাপতি এই গাহিল, হাসিনী দেবীর পতি নরপতি দেবসিংহ গরুড় নারায়ণ যাচক জনের গতি।

সর্ব্বত্র নানারূপে একই শক্তির বিকাশ এই কয়টি কথায় মনে মুদ্রিত হইয়া যায়।

উপসংহার

চৈতন্যদেবের কালে সঙ্কীর্ত্তনের সময় জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করা হইত। ইঁহাদের গান চৈতন্যদেব বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার সময়কার অথবা তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার সংক্রান্ত কোন গ্রন্থে কোন বিশেষ পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এমন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল একখানি গ্রন্থে বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে যখন শ্রীচৈতন্য আগমন করেন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে মহা সমাদরে ভোজন করাইয়া সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধানশ্রী রাগে আচার্য্য বিদ্যাপতির একটি পদের ধুয়া গাহিলেন—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥"
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
(আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন) ॥

স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গীত শ্রবণ করিতে করিতে 'ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।'

পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বন্দনা আছে। আবার চতুর্থ শাখায় এই প্রাচীন পদকর্ত্তাদের বর্ণনা আছে। এগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির সমাদর সকলের অপেক্ষা অধিক। একটি পদ উদ্ধৃত হইল।—

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
জাক গীতে　　জগতচিত চোরাওল
গোবিন্দ গোরি সরস রস গানে॥
ভুবনে অছয় জত ভারতি বানি।
তাকর সার　　সার পদ সঞ্চয়ি
বাঁধল গীত কতহুঁ পরমানি॥
জে সুখ সম্পদে সঙ্কর ধনিয়া।
সে সুখময় সার　　সার সব রসিকহি
কণ্ঠহি কণ্ঠ পহিরাওল বনিয়া॥
আনন্দে নারদ ন ধরয় থেহা।
সে আনন্দ রস　　জগ ভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতি রস মেহা॥
জত জত রস পদ করলহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি শ্রবণ পয় পাইয়ে
সুনইতে আনন্দে লাগয় ধন্ধে॥
সে রস সুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে　　কত চিত চমকয়
ঐসন রসময় চান্দ বিথারি॥
গোবিন্দ দাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ　　রহইতে আনমন
জৈসন বামন ধরবহি চন্দে॥

অর্থ,—মতিমান কবিপতি বিদ্যাপতি, যাঁহার গীতে, গোবিন্দ ও সুন্দরী রাধার সরস রস গানে জগতের চিত্ত চুরি করিল। ভুবনে যত ভারতী বাণী আছে, তাহার সার সার পদ সঞ্চয় করিয়া কত প্রমাণে গীত বাঁধিলেন। যে সুখ-সম্পদে শঙ্কর ধন্য, সেই সুখময় সার সার সাজাইয়া সকল রসিকের কণ্ঠে কণ্ঠে পরাইলেন। আনন্দে নারদ স্থৈর্য্য ধরেন না, সেই আনন্দরস বিদ্যাপতিরূপ সুখময় রস মেঘ জগৎ ভরিয়া বর্ষণ করিল। যত যত রস পদ রচনা করিলেন, কোটি কোটি শ্রবণ পাইলেও শুনিতে আনন্দে বিস্ময় লাগে। সে রস শুনিয়া নাগর ও নারীশ্রেষ্ঠ কি কি করিয়া চমকিতচিত্ত হয়, এরূপ রসময় গন্ধ পদ্য গ্রন্থ বিস্তারিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস মন্দমতি, এত সুখ-সম্পদ থাকিতে অন্যদিকে মন যায়, যেমন বামন চাঁদ ধরিবে।

কবির সম্মান ও প্রশংসা ইহার অপেক্ষা অধিক কল্পনা করা যায় না। বিদ্যাপতির কাল বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগ। মিথিলা হইতে তাঁহার পদাবলী আনিয়া যাঁহারা তাঁহাকে বিজয়-মাল্যে ভূষিত করিয়া বঙ্গবাণীর কমলাসনের পার্শে স্থান দেন, তাঁহারাই সাহিত্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বন্দনার পদরচয়িতা বিদ্যাপতির বিরচিত নানা গন্ধ পদ্য গ্রন্থের সংবাদ রাখিতেন। 'চম্প' শব্দ হইতে তাহা সূচিত হইতেছে।

কালে রুচি বদলায়, সুতরাং বিদ্যাপতির বিরুদ্ধে কেহ কোন ইঙ্গিত করিলে কিছু বলিবার নাই এবং সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এখন লোকের সুরুচি, আর চৈতন্যদেবের কালে লোকের কুরুচি ছিল, এমন কথা বলা আর বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি কটাক্ষপাত করা সমান। কারণ, বিদ্যাপতিকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় শুধু কবি মনে করিতেন না, মহাজন মনে করিতেন। পদাবলীর সকল বিভাগের পূর্ব্বেই গৌরচন্দ্রিকা আছে, সকল প্রকার ভাবই শ্রীগৌরাঙ্গে আরোপিত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি সঙ্কলন গ্রন্থে বিদ্যাপতি কিংবা অপর কবির পদাবলী কেবল কাব্য-স্বরূপে রক্ষিত হয় নাই, বরং হরিসংকীর্ত্তনের অঙ্গীভূত বিশুদ্ধ পবিত্র গীতিমাল্যরূপে। এ মালা কখন ম্লান হয় না, ইহার সুরভি কখন তিরোহিত হয় না। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে যেমন Psalms কিংবা The Song of Solomon, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে এই সকল গীতও সেইরূপ। এক জন ইংরাজ মিথিলায় গিয়া কতকগুলি বিদ্যাপতির পদ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout

Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest" * যাঁহারা অশ্লীলতার বিরোধী, তাঁহারা devout Hindu অথবা Christian priest না হইতে পারেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেও পারা যায় না; কিন্তু তাঁহাদেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, শ্রীচৈতন্যের মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী এই সকল পদ শুনিয়া আনন্দে এবং ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইতেন কেন? পূর্ব্বের অনেক মহাকবি ও শ্রেষ্ঠ লেখক এখন থাকিলে যে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতেন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। বিদ্যাপতি ত কোন্ ছার, যদি তাঁহার কাব্যগুরু কালিদাস স্বয়ং তাঁহার মন্দ প্রাক্তন বশতঃ এই শুভকালে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত ঋতুসংহার, বা শৃঙ্গারতিলক অথবা পুষ্পবাণবিলাস কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত না, শকুন্তলা, মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নি ও বিক্রমোর্ব্বশী নজীর দেখাইলেও উক্ত কাব্যগুলি প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইত না। বিশেষতঃ যে রাজপুরুষ সাহিত্যের কর্ণধার, তিনি কবির ও কাব্যের কর্ণ ধারণ করিয়া নিঃসংশয় সাহিত্যের সমুদ্রতীর হইতে বাহির করিয়া দিতেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন।

১। বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নন এবং বাংলা ভাষা তিনি জানিতেন না। তিনি যে সময় তাঁহার গ্রন্থাদি রচনা করেন, সে সময় বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই।

২। যে সময় তাঁহার পদাবলী বঙ্গদেশে আনীত হয়, সে কালে তিনি কোন্ দেশের লোক, তাহা এ দেশে সকলে জানিত এবং পদাবলীর ভাষাও বুঝিত। তিনি যে পশ্চিমদেশবাসী, রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সঙ্কলিত পদামৃত-সমুদ্রে সে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৩। কালে বিদ্যাপতি কোন্ দেশের লোক, এ দেশের লোকরা সে কথা ভুলিয়া যায়, সেই সঙ্গে তাঁহার রচিত পদাবলীর ভাষাও ভুলিয়া যায়।

৪। ইহার ফলে অনেক পদের ও শব্দের পাঠ ও অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। এমন অনেক পদাংশ আছে, যাহার কোন অর্থই হয় না।

৫। বিদ্যাপতির রচিত সকল পদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব-কাব্য সঙ্কলনে আরও পদ পাওয়া যায়। কোনটির পাঠবিকৃতির কারণে অর্থ হয় না, কোনটির ভণিতায় অন্য নাম, কোনটিতে নাম নাই।

৬। বিদ্যাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি দেশী বচনে বা ভাষায় রচনা করিতেছেন। তাঁহার দেশী ভাষা মিথিলা ভাষা।

৭। বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন বঙ্গদেশে প্রচলিত, সেইরূপ মিথিলাতেও পাওয়া যায়। যে পদ এখানে বিকৃত ও অর্থশূন্য, সেই পদ অবিকৃত ও অর্থযুক্ত আকারে মিথিলায় পাওয়া যায়।

৮। বিদ্যাপতির ভাষা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলিয়া এ দেশের অনেক কবি সেই ভাষাতে পদাবলী ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। অনুকরণ কাহারও উত্তম হইয়াছে, কাহারও বা হয় নাই। যাঁহারা ভাষার অনুকরণ করেন নাই, তাঁহাদের রচনাতেও বিদ্যাপতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

৯। বিদ্যাপতি স্বয়ং কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত কবিদিগের নিকট অশেষ ঋণী। অনেক পদ কালিদাসের এবং অপর কবিদের ভাবে রচিত, অনেক স্থানে সংস্কৃত কবিতা ভাষান্তরিত। কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা রচনায় বিদ্যাপতি জয়দেবের অনুকরণ করিয়াছেন।

১০। যত দিন এ দেশের লোক বিদ্যাপতির নিবাসস্থান জানিত ও তাঁহার ভাষা বুঝিত, তত দিন ব্রজবুলি বা ব্রজভাষার নামগন্ধ হয় নাই। ব্রজবুলি শব্দ আধুনিক ও কাল্পনিক এবং প্রমাদপূর্ণ।

১১। 'বুলি' বলিতে যদি কোন প্রাদেশিক ভাষার কোন শাখা বুঝায়, তাহা হইলে ব্রজ প্রদেশের সহিত ব্রজবুলির কোন কিছু সম্বন্ধ থাকিত, কিন্তু মথুরা জিলার ও তাহার আশপাশের ভাষাকে যদি ব্রজভাষা মানিয়া লওয়া

* গ্রীয়ার্সন। লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আলোচনার ৯/০ পৃষ্ঠা।

নয়, তাহা হইলে এই ভাষায় ও আমরা যাহাকে ব্রজবুলি বলি, তাহাতে আসমান-জমিন তফাৎ। আর মথুরা-বৃন্দাবন হইতে ব্রজবুলি যে একলম্ফে বঙ্গভূমে আসিয়া পড়িবে, মান্দ্রাজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত তাহার কোন নাম-নিশানা পাওয়া যাইবে না, ইহাও বড় আশ্চর্য্য কথা। সমুদ্র অথবা দেশ লঙ্ঘন করা ভাষা অথবা বুলির কাষ নয়। যাহাদের ভাষা, তাঁহাদের সঙ্গে আসে বটে, কিন্তু ব্রজবাসী যে কোন কালে বঙ্গবিজয় করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন কথা ত ইতিহাসে কোথাও লিখে না। বাঙ্গালী বৈষ্ণবযাত্রী ব্রজপুরীতে গিয়া ব্রজবুলি শিখিয়া আসিয়া থাকিবেন, এ কথাও অমূলক কল্পনা। কারণ, আমরা যাহাকে ব্রজবুলি বলি, ব্রজ অঞ্চলে সে বুলি পাঁচশত কি হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কেহ বলিত না, এখনও বলে না।

১২। মিথিলা ও বাংলা ভাষা মিশাইয়া ব্রজবুলির সৃষ্টি, এ কথাও অপ্রামাণ্য।

১৩। বিদ্যাপতি-বিরচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ও হর-গৌরী পদাবলীর একই ভাষা। ব্রজবুলিতে শিবপার্ব্বতীর গীত রচিত হইয়াছে, এ কথা কেমন শোনায়?

১৪। যে ভাষার নাম বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ দিয়াছিলেন, তাহাই পদাবলীর ভাষা। আমরা যাহাকে ব্রজবুলি বলি, তাহা অবিমিশ্রিত, খাঁটি মিথিলা ভাষা। ঐ ভাষা বাংলার সঙ্গে একেবারেই মেলে না, হিন্দীর সঙ্গেও সাদৃশ্য সামান্য, তবে মিথিলা ভাষায় প্রচুর হিন্দী শব্দ পাওয়া যায়।

১৫। মিথিলা ভাষা না জানিলে বিদ্যাপতির পদাবলীর অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন এবং বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত শব্দাদির অর্থ করিতে পারা যায় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মহিলা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

শ্রীমতী শ্যামলাল নেহরু।

অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে মহিলারা যে সব অধিকার ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। নূতন আইনে মিউনিসিপ্যালিটীতে মহিলাদিগের ভোট দিবার ও কমিশনার হইবার অধিকার হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ইতঃপূর্ব্বেই মহিলারা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হইয়াছেন। কলিকাতায় একজন বিদেশী মহিলাকে কমিশনার মনোনীত করা হইয়াছে।

এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল নেহরু মহাশয়ের পত্নী প্রথম মহিলা কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কি ভাবে কর্ত্তব্যপালন করেন, দেখিবার জন্য লোক উৎসুক হইয়া রহিল।
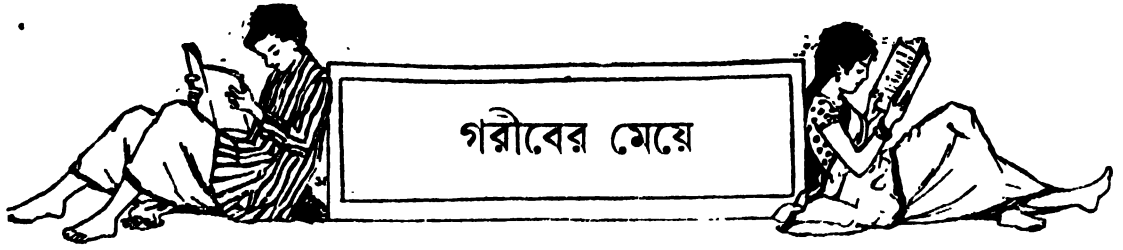
নবম পরিচ্ছেদ

নদীর ধারে ধারে আমগাছের সারি, কাঁঠাল নারিকেল সুপারির সুনিবিড় বন। ইহারই ইতস্ততঃ কয়েকটা জাম, জামরুল, গোলাপজাম, পেয়ারা, লিচু, বেল ও কপিত্থ বৃক্ষ। বাদাম ও কলসা গাছও দুই একটা করিয়া আছে। বাগানখানা ভুবনবাবুদের ছোট শরিক বিপদাস চৌধুরীর। বিপদাস বাবু রায়পরিবারের জামাই ছিলেন; একণে তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুতে দ্বিতীয় সংসার; বাহিরে উভয় পরিবারে অসৌজন্য না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে কাহারও সহিত কাহারও বেশ মনের মিল ছিল না। জমাজমি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক আধবার ফৌজদারীও হইয়া গিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন হইতে আর কোন গোলমাল হয় নাই; তরুর বিবাহে বিপদাস বাবুর বর্ত্তমান স্ত্রী নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করেন নাই। তবে একটা বাঁধা পাণ খাইয়াছিলেন।

ছেলের দল ঐ বাগানখানার উপর চিরদিনই লোলুপ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল; কিন্তু ভয়ে কখনও সেই জমিতে পা দিতে পারে নাই। শুভেন্দুর কাছে সেই কথাটা ফাঁস হইতেই সে সকলকেই টিটকারী দিয়া উঠিল, "আরে ছ্যাঃ! আমি হ'লে এদ্দিনে অন্ততঃ এর তিন ভাগ ফল পেড়ে খেয়ে নিতাম।"

সলিল মাথা দুলাইয়া বলিল, "তাই বৈ কি! মুখে ওসব বলা ভারি সহজ, ও বড় বিষম ঠাঁই, এর একটা আনারস উপড়ে যেদো তাঁতি জেল খেটে মরেছিল। চারটে আম পেড়ে হরে ধাড়া নাকে খত দিয়ে তবে কোনরকমে ছাড়ান পায়। যাও না একবার পেয়ারা পাড়তে, টেরটি পেয়ে এস না দেখি।" শুভেন্দুর মনের মধ্যে যে মত লবটা খেলিয়া গেল, সে তখন আর সেটাকে ফাঁস করিল না, চাপিয়া গিয়া অবান্তর কথা পাড়িয়া বসিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুশীলকে একপাশে টানিয়া আনিয়া শুভেন্দু তাহার কানে কানে বলিল, "জানিস্, সুশী! আজ একটা খুব সাহসের কাজ করতে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়া কিন্তু তোর কর্ম্ম নয়, তুই বরং বাড়ী যা।"

শুভেন্দু জানিত, সুশীলের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই। হইলও তাহাই, সাগ্রহে সুশীল প্রশ্ন করিল, "কি কাজ করতে যাচ্ছ শুনি?"

শুভেন্দু যেন কতই অনিচ্ছুকভাবে থামিয়া থামিয়া জবাব দিল, "সে তোমার শুনে লাভ নাই, তোমাদের মধ্যে কেউ সে কাজে হাত দিতে কখনই ভরসা করবে না। সলিল-দের বিশ্বাস, তা করা অসম্ভব, তাই আমি তাদের দেখাতে চাই যে, যা তোমাদের সবার পক্ষে অসম্ভব, তা একা আমার পক্ষে অতি সহজ এবং " সুশীল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে একটা ঠেলা দিল ও ঔৎসুক্য সহ-কারে বলিয়া উঠিল, "চল একুণি, আমিও যাব।"

শুভেন্দু যেন কতই বিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, "তুমি!"

সুশীল গম্ভীর ও দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "হুঁ" এবং এই বলিয়া লম্বা পা ফেলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। তখন শুভেন্দু মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, "আরে সোজাই চল্লে যে, আমাদের পথটা যে একেবারেই বাঁকা "

ফলের বাগান এখন ফলশূন্য-প্রায়, তাই বাগানের রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা কিছু শিথিল, কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী আছে তাহাতে অনেক মাছ ফেলা হইয়াছিল, বাবুর মাছ ধরিবার সখ বড়ই প্রবল; পাছে সেই মাছ কেহ ধরিয়া লয়, সেই ভয়ে বিশেষ-ভাবেই পাহারার বন্দোবস্ত করা আছে, আশপাশ দেখিয়া শুভেন্দু সে খবরটা জানিতে পারে নাই এবং সম্পূর্ণরূপেই জনশূন্যবোধে তাহারা দুই জনে কুল ও পেয়ারা যত পারা যায়, নিজেরা খাইয়া সঙ্গীদের দেখাইবার জন্যও অপর্য্যাপ্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন ঝপাং করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়াছে, অমনি সেই প্রায়ান্ধকারে কাহার বজ্রমুষ্টি তাহার পিঠের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে দড়ি

দিয়া তাহার দুখানা হাতকেই কেহ চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সুশীলের অবস্থাও ততক্ষণের মধ্যে তাহার অপেক্ষা যে বেশী ভাল ছিল না, সেটুকু দেখিতে পাওয়ার মত আলো সেখানে ছিল।

ঘাটের রাণায় মাচা বাঁধিয়া বসিয়া বিপ্রদাস বাবু একান্ত-মনে ছইলের ছিপে একটা বড় কালবোস মাছকে গাঁথিয়া ফেলিবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, পারিয়া উঠেন নাই, তাই মনটা বেজার হইয়া গিয়াছে। একবার ফাৎনায় টান পড়িল, ভারি ঠেকিল, তুলিয়া দেখেন, একটা মস্ত কোলা ব্যাং—আবার একটা কাঁকড়া আসিয়া চার খাইয়া গেল—কি মুস্কিল !···

এমন সময় বাগানের দুই জন মালী তাঁহার সঙ্গের দরওয়ানটার সাহায্যে দুই কিশোর চোরকে হাত বাঁধিয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ও সুদীর্ঘ সেলাম বাজাইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার ! এই দোনো চোট্টা মিল কর, কলমবালা আমরুত সবকিছ তোড়্‌তাড় লিয়া, অউর পাটনাবালা বইরভি বহুত চোরায়কে লে যাতে রহা। মালিলোককে সাথ মিলকর দুষমনকো পাকড়া গায়ে।"

জলের মধ্যে একটা বড় মাছের পাখনা নাড়ার মৃদু কম্পন অনুভব করিয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই ধর্ম্মাবতার বিচার শেষ করিলেন, "থানা লে যাও।"

বিচারের রায় শুনিয়া শুভেন্দু সকোপে দাঁত দিয়া নিজের ঠোট কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু সুশীল কোনমতেই আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল, সমস্ত শরীর ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সকরুণ আর্ত্তস্বর বাহির হইয়া পড়িল। শব্দটা বিপ্রদাসের কানে গেলেও তাঁহার প্রাণে উহা স্পর্শমাত্র করিল না, তিনি যথা-পূর্ব্ব ছইলের চাকার দিকেই চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কর্কশ-কণ্ঠে দরওয়ানজী—বাজপেয়ী হাঁকার দিয়া উঠিল "আরে চলরে চল"—বলার সঙ্গে ছেলেদুইটির হাতে বাঁধা দড়ীতে একটা হেঁচকাটানও সে দিল, ভদ্রলোকের ছেলে বুঝিয়াও ছাড়ান দিল না। কিন্তু সুশীল তাহাতেও নড়িল না। যতদূর সাধ্য, শরীর মনে তাহার যতখানি বল যেখানে আছে, সে সমস্তকেই একত্র সংগ্রহ করিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল, মুখেও হয় ত কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রবল অশ্রুজলের কম্পনে কথা তাহার কণ্ঠের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছিল এবং কি কথাই বা তাহার বলিবার আছে, তাহাও সে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ না কহিলেও যে এখনই কি সর্ব্বনাশ তাহার ঘটিয়া যাইবে, তাহা মনে করিয়া তাহার ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। শুভেন্দুর অবস্থা দেখিবার অবসর তাহার মোটেই ছিল না, নিজের কথাই এখন তাহার কাছে সমস্ত পৃথিবীর আকারের অপেক্ষাও অনেক বেশী বড়। সর্ব্বশরীরের চলন্ত রক্ত উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া যেন তখন শুধু রুদ্ধ-কল্লোলে এই কথাই তাহাকে বলিতেছিল "বাবা জানলে কি করবেন ? বাবা জানলে কি বলবেন !"—এর চেয়ে বেশী আর বড় কোন ভাবিবার বিষয় তাহার কাছে ছিল না।—

শুভেন্দু মৃদুস্বরে দরওয়ানজীর অনেক স্তবস্তুতিই করিতেছিল, কিন্তু সে সমস্ত ভস্মে ঘৃতার্পণের ন্যায় একান্ত ব্যর্থ করিয়া চৌরোদ্ধরণিকের দল যখন পরমোৎসাহে লক্ষ-শীকার লইয়া কুইক মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে, এমন সময় সেই অর্দ্ধ অন্ধকারচ্ছায়াচ্ছন্ন বন-বীথির মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র দীপশিখার ন্যায় ক্ষদাবয়ব বালিকা দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "বাজপেয়ীজি ! হামকো একঠো পাখী ধরকে দিজিয়ে ! এ-কাঁহা চল্‌তা হায়, জেরা শুনিয়ে তো থোড়া খাড়া হোকে।"

বাজপেয়ী ঈষৎ বিপন্নভাবে খাড়া হইয়া বলিল, "দেখিয়েনা খোঁকিজী ! দোঠো চোট্টা আপনা কলমকা পেড়সে বহের চোরাতে রহা, ময় আভি মহারাজকা হুকুম তালিম করনেকে ওয়াস্তে থানে পর দুষমন্ লোগকো লে চল্‌তে গেঁ, আভি মায় কেইসে পাখী ধরুঙ্গা ?"

'খোঁকী' দ্রুতপদে উহাদের সম্মুখে আসিয়াই যেন বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। পরে সন্দিগ্ধ মৃদুস্বরে সে বাজপেয়ীকে বলিল, "ঝুটা বাত নেহি কহনা ! ই তো বাবু লোক হায়, চোট্টা কাহে কহা ?"

বাজপেয়ী হস্তবদ্ধ আনতবদন ছেলেদুইটির প্রতি টিটকারী দিয়া রসিকতা করিয়া জবাব দিল, "আরে খোঁকিজি ! আপতো লেড়কা-আদমি হি, হামকো মালুম নেহি হায়, আজকাল বাবু লোক সব চোট্টা ঔর ডাকু বড়ে হোতা

যায়। চল্ বাবু! থানেপর চল্। এইসা বহোত বাবুলোক আজকাল থানেপর যাতেউতে হেঁ।”

মেয়েটি সহসা বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া তীব্র গম্ভীর আদেশের স্বরে উচ্চারণ করিল, “খবরদার! ছিনাই খাড়া রহনা, মায় পিতাজীকো পাশ চলতে হে।”—যেমনই অকস্মাৎ সে কাননভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল, তেমনই করিয়াই আবার নিমেষ-মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। অপরাধিদ্বয় যদি নিজ নিজ দুঃখভারে অত বেশী অবসন্ন না হইয়া পড়িত, বয়স আর একটু অধিক হইত, তাহাদের হয় ত বা কাননবিহারিণী কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ হওয়া বিচিত্র ছিল না।

* * * *

“বাজপেয়ি!”

“গোদানন্দ!”

“চোর লোগকো দো দো বেত লাগাকর্ ছোড় দেনা।”

“যো হুকুম মহারাজ!”

হুকুম শুনিয়া শুভেন্দুর চোখ জ্বলিয়া উঠিলেও সুশীলের অবসন্নতায় প্রায় বিচেতনদেহে যেন তৎক্ষণাৎ জীবনীশক্তি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। দুই বেত! দুই বেত কেন, থানায় যাওয়ার পরিবর্ত্তে সে যে সহস্রবারও বেত্রাহত হইতে প্রস্তুত আছে।

থানায় গেলে তাহার পিতা যে সকল কথা জানিতে পারিবেন, আর জানিলে পর? সুশীল ভাবিতেও পারে না যে, তার পর কি হইবে বা কি হইবে না! সুশীলকে তিনি যে কিছুই বলিবেন না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু তাঁহার বুক যে কেমন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িবে, সে কথা সুশীল ছেলেমানুষ হইলেও তাহার অজ্ঞাত নয়। সে যথাসম্ভব দৃঢ় ও স্থিরচিত্তে দণ্ড লইতে প্রস্তুত হইল।

“বাজপেয়ীজি! বহোত আস্তেসে বেত লাগানা, ভাইয়া! মায় আপকো একঠো রূপেয়া দেঙ্গে।”

অত্যন্ত মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ এই করুণাপ্লাবিত শব্দকয়টি অপরাধীদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। সুশীল ইহাতে বারেক সকৃতজ্ঞনেত্রে সেই ক্ষুদ্র করুণাময়ীর করুণা-কাতর স্নিগ্ধমুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল।

“বাপ্ রে বাপ!” বেত্রাহত সুশীল লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার বেত উঠাইতেই কাতরস্বরে আর্ত্তধ্বনি করিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী মেয়েটি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া আগুলিয়া ধরিল। জলভরাচোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল, “খবরদার!”

বাজপেয়ীর হাতের বেত যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

শুভেন্দুকে অটল দাঁড়াইয়া বেত খাইতে দেখিয়া, বিশেষ এই অপরিচিতার পূর্ব্ব প্রলোভনবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীল মনে করিয়াছিল, বেত খাওয়া জিনিষটা সন্দেশ খাওয়ার চেয়ে খুব বেশী তফাৎ নয়; কিন্তু নিজের পিঠে উহারই একটি ঘা পড়িতেই তাহার সমস্ত ধারণাটাই উল্টাইয়া গেল। উঃ, বাজপেয়ীর হাতে আস্তে-মারা বেতেরই এই জ্বালা,—না জানি, তাহার পূরাদমে কতখানি বেদম হইতে হইত!—যে সুশীল কখন কাহারও নিকট একটা চড়চাপড়ও খায় নাই, তাহার পক্ষে এ যে একেবারেই অসহ্য! ইহার দ্বিতীয় আক্রমণের ভয়েই তাহার মূর্চ্ছা যাইবারও উপক্রম হইল।

“বাজপেয়ি! জলদি পানি লাও, দোঠো বয়েরকে ওয়াস্তে তোম ভালা আদমীকো জান্ লে লেঙ্গে?”

বাজপেয়ীর এই ক্ষুদ্র মনিব-কন্যাটির এ প্রকার প্রভুত্ব দেখা অভ্যাস আছে, ইহাকে সে নানা কারণে অসন্তুষ্টও করিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং সেইজন্য শুভেন্দু ও সুশীলকে সে একটু হাতে রাখিয়াই বেত লাগাইয়াছিল, ইহাতেও যদি ননীর পুতুল চোরকে মূর্চ্ছা যাইতে হয়, তাহা হইলে সে আর করিবে কি? ঘুষের টাকাটা তাহার নষ্ট হইল দেখিয়া উহাদের উপর তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না, মনে মনে আপশোষ হইতে লাগিল যে, এর চেয়ে বেত দিয়া উহাদের পিঠের চামড়া খানিকটা উঠাইয়া আনিতে পারিলে তবু হাতের কিছু সুখও হইত; আর বাদ-চোরদেরও তাহার কথা চিরকাল স্মরণ থাকিতে পারিত। ঈষৎ বিরক্তিস্বরে সে তাই প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “ভালা-আদমী কভি দোসরাকো বাগিচামে চোরী করনে নেহি আতেহে দিদি-সাহাব! এ দেখিয়ে! ভাকুলোগ মর্ নেহি গয়ি! দেখিয়ে উঁহকে খাড়া হো গিয়া। বাস্! অভি হাম দোনোকো বাহার নিকালকর দোসরা কামপর চলতে হেঁ।”

মেয়েটি কিছু না বলিয়া তাহার অভ্যস্ত চঞ্চল ত্রস্তপদে আর একদিকে চলিয়া গেল, এবং ফটকের প্রায় কাছাকাছি

আসিয়া শুভেন্দু ও সুশীল দেখিল, সে এক ঘটী জল লইয়া ছুটাছুটী করিয়া আসিতেছে।—

"খাবার জিনিষ কিছু নেই,—শুধু খাবার জল এনেছি, নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে! একটু জল খান।"

শুভেন্দু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু সুশীল বারেক নিঃশব্দ-কৃতজ্ঞতায় আবার তাহার সেই করুণাবিগলিতমুখের পানে চাহিয়া প্রায় পূরা একসেরী ঘটীর এক ঘটী জল পান করিয়া ফেলিল। তৃষ্ণায় তাহার গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অনুকূলচন্দ্রের যে কথা, কাজও সেই। বাস্তবিকই ইহার ঠিক পরের দিন এলবার্ট বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই সেণ্ট পিটার্স-মিসন স্কুলের একটি বলদযোজিত যানপান আসিয়া নীলিমাকে তাহাদের স্কুলবাড়ীতে লইয়া চলিয়া গেল। এদিকে এলবার্ট স্কুলের গাড়ী আসিয়া স্কুলের দাই যখন তাহার অভ্যাসমত ডাকাডাকি করিতেছিল, "নীলি বউয়া! হো নীলি বউয়া! আপ কেত্তা-দের করবে বউয়া! আইয়েছি! জলদী আইয়ে!"

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া নীলিমার পিতা তাঁহার হরিদ্র-প্রভ দন্তপংক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন জীব-বিশেষের ন্যায় যেন উহাকে দংশনোদ্যত ভাবেই চেঁচাইয়া বলিলেন: "এই তোম কুত্তাকো মাফিক এইসা কাহে চিল্লাচিল্লি করকে কান খাতা হায়! নিকালো, নিকালো; —হিঁয়াসে নিকাল যাও।"

প্রত্যক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দাই-বেচারী হতভম্ব হইয়া পড়িল, মাথার কাপড় একটু সংযত করিয়া লইয়া স্বর নামাইয়া বলিল, 'বউয়াকো বোলাতে হেঁ, বাবুজী! জেরা মেহেরবাণী কর্‌কর্ বোলা দিজিয়ে বাবু! বের হোগিয়া।"

অনুকূল তাঁহার খিঁচান মুখকে অধিকতর খিঁচাইয়া পঞ্চমের স্বরকে সপ্তমে চড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন, "বউয়াকো বোলা দিজিয়ে! নেই নেই, বউয়া ঔর কভি হুঁয়া পড়নে নেহি যায়েগি, তোমহরা বিবিসাহেব লোগ্‌কো বোল দেনা কি ঐসা খারাব ইস্কুলমে খারাপ জানানা লোগকা পাশ হামারা লেড়কীকো হাম ঔর কভি নেহি ভেজেঙ্গি। হুঁয়া পড়ানা ঠিক নেহি হোতি হায়, শুকনা লোগ্‌কো দেখ্‌কর বহোত বেচাল শিখ যাতা হায়। তুম লোগ্‌কো নকরী ছোড়ানেকে ওয়াস্তে হাম গবর্ণমিণ্টমে দর-খাস্ দেতে হেঁ; যব দোস্‌রা মাইজী লোক আবেঙ্গে, তব ফিন্ হামারা লেড়কী হুঁয়া পর পড়নে যাবেঙ্গে—"

শকটারোহিণী বালিকাবৃন্দ উৎসুক-আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উৎকর্ণা হইয়া এই বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে পরস্পরের মুখ চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে অকস্মাৎ চলার ঝাঁকানী বাঁচাইয়া লইয়া যে যাহার নিজস্থানে আসন লইয়া বসিল। সর্ব্বপ্রথম মনোরমা তাহার জুইকাঠির বোনা হাতে লইয়া সুষমার দিকে চাহিয়া হাসিল, "বুঝলি সুষি! নীলির বাবার নামে সেই যে চিঠি সুলোচনাদি' পাঠিয়েছিলেন, তার জন্যেই নীলিবেচারীর আপার প্রাইমারীটা দেওয়া হ'লো না। হয় ত স্কলার শিপটাও পেত।"

সুষমার পূর্ব্বেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর সুলোচনাদি' মনোরমাদি'দের চাকরী শুদ্ধ না যায়। বল্লেন যে, 'গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতেহে' দেখ বেচারারা বুঝি বিপদে পড়লেন বা!"

মনোরমা ঠোঁট বাঁকাইয়া অবজ্ঞাসূচকস্বরে উত্তর করিল, —"ইঃ, নীলির বাবা তো ভা—রী এক জন মাতব্বর লোক! উনি দরখাস্ দিয়ে সুলোচনাদি'দের চাকরী ছাড়াবেন! আহ্লাদ আর কি! বড়জোর একদিন ইন স্পেকট্রেস্ এসে ওঁদের একটা কৈফিয়ৎ তলব করবেন।"

প্রতিমা মন্তব্য করিল, "তব তো সে একটা অপমান। আর সুলোচনাদি' ভাই যে রকম তেজালো মানুষ—"

মনো ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "কিসের অপমান! তা হ'লেই ত আসল কথাটা ধরা প'ড়ে যাবে, যিনি "দরখাস্" দিচ্ছেন, তাঁর কাছে যে স্কুলের এক গাদা টাকা পাওনা, সেটাও ওঁরা জেনে যাবেন! অপমানটা কার? সুলোচনাদি' কাঁচা মেয়ে নন, সব চিঠিরই তিনি নকল রাখেন। লোকসান হ'লো নীলি-বেচারীরই। আর একটা মাসও ছিল না মোটে এই চব্বিশটা না পঁচিশটা দিন বাদ—পরীক্ষাটা দিলে ও নিশ্চয়ই স্কলারশিপটা পেয়ে যেত।"

অনুকা কহিল "তখন ত ও নিজেই ভাই, ওর মাইনের টাকা দিয়ে দিতে পারতো। সুলোচনাদি' এত তাড়াতাড়ি না ক'রে যদি একটু দেরী করিতেন, তা হ'লে হয় ত ওর পরীক্ষাটা দেওয়া হ'ত।"

সাবিত্রী এতক্ষণের পর 'হুঁঃ' করিয়া উঠিল - "সুলোচনাদি' ত আর 'জান' নন, কেমন ক'রে জানবেন বল যে, পাওনা টাকা দিতে বল্লেই নীলির বাবা মেয়ে আটকাবে। এমন ছোটলোক ত কখন দেখেননি তিনি।"

সাবিত্রীর মুখের ভয়ে সব মেয়েই মনে মনে উহাকে সমীহ করিত, শুধু করিত না মনোরমা। সে এখন উহার মন্তব্যের বিরুদ্ধে টিপ্পনী কাটিল, "এমন ছোটলোক যে আর কক্ষণোই দেখেননি, তা বলতে পারিনে। তবে নীলির বাবার তবু একটা আক্কেল আছে যে, মাইনে যখন দেবে না, তখন মেয়েও পড়াবে না; কারু কারু আবার সেটুকুও নেই।"

সুষমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ভাই, নীলির বাবা সুলোচনাদি'দের সম্বন্ধে কি রকম অপমানের কথা সব বলেছেন, আমার তখন কিন্তু ভয়ানক রাগ ধরছিল; আমি ওঁদের কিন্তু সব ব'লে দেব।"

প্রতিমা বলিল, "আমিও।"

সাবিত্রী কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করিয়াই মনোরমার দিকে ভ্রুকুটি-কুটিল মুখ তুলিয়া সরোষে কহিল, "খবরদার বল্‌ছি, আমার সঙ্গে লাগতে আসবে না। কেন, আমি তোর খাই না পরি যে, যখন তখন তুই আমাকেই টিপ্‌পনী কাটতে আসিস?"

গাড়ী আসিয়া বিদ্যালয়ের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আজিকার এই সকল অভিনব কাহিনী সর্ব্বপ্রথম সুলোচনাদি'র কর্ণগোচর করণার্থ আগে নামিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহারই ঠেলাঠেলিতে একটি সিক্সথ ক্লাসের ছোট মেয়ে গাড়ীর পাদান হইতে কাঁকরবিছান পথের উপর পড়িয়া নাকমুখ ছেঁচিয়া কান্না জুড়িয়া দেওয়াতে সুসমাচার-প্রচারিকাদের প্রথম উৎসাহের মধ্যে শীতল চাপা পড়িয়া গেল।

স্কুলের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল; সকল মেয়েই নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছে; কেবল দুঃসাহসিকা মনোরমা সুলোচনাদি'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্কুলের দাই এতবারিয়ার সাক্ষ্যর মধ্যে কোথায় কি ত্রুটী থাকিয়া যাইতেছে, তাহারই হিসাব রাখিয়া যাইতেছিল। এতবারিয়ার খানিকটা বলা হইয়া গেলে সে হঠাৎ ফোঁস করিয়া উঠিল, "গবর্ণমেণ্টমে দরখাস্ দেঙ্গে,—ওই কথাটা বড় যে বাদ দিয়ে যাচ্ছিস? আচ্ছা মজার লোক ত তুই দেখি! শুনুন সুলোচনাদি'! নীলির বাবা আরও যে কত কথাই বল্লেন, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো! আপনাকে দেখে নাকি মেয়েরা সব বেচাল শিখছে, আপনাদের বদলে অন্য টিচার এলে তখন ওর মেয়ে পড়তে আসবে—আরও ঢের কথা—"

ইনফ্যাণ্ট ক্লাসের মেয়েদের শ্লেটের উপর পেনসিল দিয়া যুক্তাক্ষর লিখিতে বসাইয়া থার্ড টিচার ব্রহ্মবালা দে কৌতূহলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পায়ে পায়ে আসিয়া মনোরমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল; মনোরমাকে এবার 'কমা' দিতে দেখিয়াই অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আরও কি কথা বলে রে মনোরমা?"

মনোরমা সমুৎসাহিত হইয়া--ঢের কথা বলিবার জন্য উহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সুলোচনা গম্ভীরমুখে মিস্ দে'র দিকে চাহিয়া বলিলেন "That is impertinent" বালু। মনো! তোমার নিজের যায়গায় গিয়ে বসগে।"—

খট খট করিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া রেজিষ্টার বাহির করিয়া খসখস করিয়া নীলিমার নামটা কাটিয়া দিলেন। পাশের ঘরের মেয়েরা খোলা বইএর পাতার পাশ দিয়া আড়চোখে উক্ত কার্য্য দর্শনান্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলাবলি করিল, "ওরে, নীলি আজ থেকে নাম-কাটা সেপাই হয়ে গেল!"

ইতোমধ্যে মনোরমা আসিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। থার্ড টিচার প্রেমকুসুম দাস কয়েকটি মেয়েকে একটা নূতন আঁক দেখাইয়া দিতেছিলেন, ইঙ্গিতে মনোরমাকে কাছে ডাকিলেন। মনো আসিলে স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কই, সে চিকনটা কেনা হয়ে এসেছে?"

মনো ঘাড় দুলাইয়া জবাব করিল, "উঁহু, সে আজকে মোটে কেনা হবে, কাল আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।"

"ইউ আর এ নটী গার্ল! রোজই তো কাল, কাল বলো, কবে তোমার কাল হবে শুনি?"

মিস্ দাসের এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—"ওর কাল' হ'তে এখনও অনেককাল লাগবে, প্রেমকুসুমদি' ! দেখছেন না কি মোটা।"

মনোরমা ভ্রূভঙ্গি করিয়া রুখিয়া উঠিল, "তোর মতন ত আর সব্বাই পাক্‌তাড়ানী—কাক তাড়ানী তা' ব'লে হ'তে পারে না। না সত্যি প্রেমকুসুমদি' ! কাল ঠিক এসে যাবে দেখবেন। মাকে আমিও ক'দিন ধ'রেই তাড়া দিচ্ছি, তা মা কি বলেন জানেন ?"

"কি ?" বলিয়া প্রেমকুসুম একটি মেয়ের আনা কষা অঙ্ক দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

"মা এমন দুষ্টু !—না, আমি সে কথা বল্‌বো না !—সে আপনি শুনলে রাগ করবেন !—মা, মা বলে, তোর প্রেমকুসুমদি'র তো আর বিয়ে বন্ধ যাচ্ছে না—এত তাড়াতাড়ি কিসের ? দোবই এখন আনিয়ে।" এই কথাটি বলিয়া মনোরমা মুখ নামাইয়া একটু টিপিয়া হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়ের ঠোঁটেই হাসি দেখা দিল।

প্রেমকুসুম হাতের পেন্‌সিল্‌টা দিয়া মনোরমাকে ছুঁড়িয়া মারিলেন,—তাহার পর ভাঙ্গা পেন্‌সিলটা কুড়াইয়া লইয়া চকুম দিয়া উহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, "কত সব ডেঁপো হয়ে যে উঠছেন ! দাঁড়াও না, মিস বোসকে সব বিস্তের কথা শুনিয়ে দিচ্ছি ! এই মেয়ে ! তোর কানেও কিসের দুল রে ? সিরোপার্ল ? সুন্দর ত ! কত্তয় কেনা হয়েছে ? কোথা থেকে আনানো হ'লো ? দাম জানিস ?—উঃ ! মোটে কুড়ি টাকা ! এক্সেলেণ্ট ! এই মেয়ে ! আমায় একজোড়া আনিয়ে দে' না ?"

অলকারা দুই বোন—অলকা ও অনুকা একসঙ্গেই সমুৎসুককণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"আজই বাড়ী গিয়ে মাকে বল্‌বো'খন আমি, নিশ্চয় কল্‌কাতায় দাদাকে লিখে দেবে।"

তখন অপর ক্লাশ হইতেও একটি দুইটি বড়মেয়ে উৎসাহচঞ্চললোভাকুলকণ্ঠে ইহার প্রতিধ্বনি তুলিল—"ও ভাই সত্যি ! আমিও মাকে ব'লে টাকা দেবো ভাই ! আমাকেও একজোড়া দুল আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু।"

যে মেয়ের অঙ্কের তিন ভাগ ভুল হইয়াছিল, তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক শ্লেটখানা ফিরাইয়া দিয়া প্রেমকুসুম ঐ মেয়ের উদ্দেশ্যে কহিলেন, "তোকে আবার এখনি কানের দুল কিনে দিয়ে কি হবে রে, মেয়ে ? আবার তো বিয়ের সময় দিতেই হবে।"

মেয়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ, তা' বই কি ! আর আপনার, আপনার বুঝি পরতে দোষ হয় না ? আপনারও তো "

"কি ? বিয়ের সময় হবে ? কে দেবে ? দেবার যদি কেউ থাকতো তো কি এইখানে গোরু চরাতে আসি রে ? এই সুধা ! কতক্ষণ লাগে একটা ভাগ রাখতে ? ভারি চালাকি হচ্ছে !"

"এই যে হয়ে গেছে—প্রেমকুসুমদি' !"

"আচ্ছা প্রেমকুসুমদি' !—না বাপু, বল্‌বো না আপনি হয় ত রাগ করবেন !"

"না, যা, বলিস্‌নি, ডেঁপোর শেষ হয়েছে এই মেয়েগুলো ! একদিন মিস্ বোসের কাছে না এই, সব শাগগির ভাল ক'রে বোস, মিস্ বোস আস্‌ছেন যে ! সুপভা ! চার সতেরং কত হয় ?—তবে যে এখানে চৌমট্টী লিখেছিস ?"

* * * *

নীলিমা যতক্ষণ সেই ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে আমোদিত বন্ধ গাড়ীর ভিতরে বসিয়া ছিল, সমানেই সে রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া যতদূর্‌ তঃ চোখ মুছিয়াছে। তাহার নিতান্ত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গোশকটের মধ্যে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে উপস্থিত ছিল না, তাই তাহার এই অনাহূত অশ্রুজলের বেগ সামলাইয়া রাখার অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও যে ছিটাফোঁটাটা জোর করিয়া বহির্ম্মুখী হইতেছিল, সেটার জন্য আর কৈফিয়তের দায়ে পড়িতে হয় নাই। সারা পথই এমন করিয়া কাটিয়াছে ; বিশেষতঃ যখন এলবার্ট স্কুলের গাড়ীখানা তাহার নূতন গাড়ীর পাশ দিয়া ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া গমগম্ শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল, গাড়ীর মধ্য হইতে প্রতিদিনকার মতই মেয়েদের কল্‌কল্ করিয়া কথার শব্দ, হাসির স্রোতঃ বায়ুতরঙ্গে মিশিয়া ভাসিয়া আসিল। মনোরমার তীক্ষ্ণ হাস্যের সহিত অনুকার ঝঙ্কারী-কলহাস্য একত্র মিশ্রিত হইয়া নীলিমার বুকের বাধাপদ্দায় যেন একটা ঘা দিয়াই কতকগুলা পুরাতন সুর বাজাইয়া তুলিল। কত সুদূর দিনের স্মৃতির ভাণ্ডার একসঙ্গে উলটিয়া পড়িল ; আর যেন নিজেকে সামলান গেল না !—প'ছে উহারা তাহাকে

দেখিতে পায়, এই সম্ভাবনার ভয়ে গাড়ীখানাকে দেখিয়াই সে তাহার সম্মুখের টানা ঝিলমিলি কয়টা নামাইয়া দিয়াছিল, আবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেও তাহার এই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানাকে আজিকার সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই সকল সঙ্গিনীদের দেখাইতে হয়। নীলিমা বিপন্নভাবে অবশেষে নিজের দুই জানুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ এই অত বড় গাড়ীখানার—অতগুলি মেয়ের মধ্যে শুধু তাহারই এতটুকু যায়গা খালি হইয়া গিয়াছে! না জানি, তাহার কথা উহারা কত কি-ই বলাবলি করিতেছে? হয় ত তাহাকে আনিতে আজও গাড়ীখানা তাহাদের বাড়ীর দরজার কাছে গিয়াছিল? কে না জানি কি বলিয়া ফেরং দিল? ভাগ্যে এ সময় তাহার বাবা বাড়ী থাকেন না! কিন্তু আজ তো নীলিমা তাঁহাকে আসার সময় বাড়ীতেই দেখিয়া আসিয়াছিল, তবেই হইয়াছে? গাড়ী তো ঐ দিক দিয়াই আসিল? বাবা না জানি দাইকে কি কথা বলিলেন? ঐ যে মেয়েরা অত কল্‌কল্ করিয়া কত কথাই বলাবলি করিতেছিল, অত হাসাহাসি করিতেছিল, সে তাহার, আর তাহার বাবার কথাই নহে ত?

লজ্জায় নীলিমার চোখের জল শুষ্ক হইয়া গেল, এতক্ষণ স্কুলে পৌঁছিয়া দাই—তাহার সঙ্গে মেয়েরা পর্য্যন্ত যোগ দিয়া তাহাদের কথা কি ভাবেই বলাবলি হইতেছে? বাকি টাকা ফাঁকি দিয়া নীলিমা স্কুল ছাড়িয়া দিল শুনিয়া সুলোচনাদি' কত বড় ঘৃণার সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। আর ত দেখাও হইবে না যে, সে তাঁহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, এ কার্য্য সে একেবারেই নিজে ইচ্ছা করিয়া করে নাই! কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব? সুলোচনাদি'র গম্ভীর মুখ দেখিলেই যে ভয় করে, তাঁহার সঙ্গে কি সহজভাবে কথা কহা যায় যে, সে তাঁহাকে সুবিধা পাইলেও বুঝাইয়া দিবে যে, সে দোষী নয়? না না, সে কখনই হইবে না, দোষী হইয়াই উঁহাদের নিকট হইতে তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইল!—আবার চোখের জলে তাহার বুক ভাসিতে লাগিল এবং তাহার পারিপার্শ্বিকগণ তাহার এই মেঘ-বৃষ্টির ক্ষণিক খেলা অবাঙ্মুখে নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া বিশেষ কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না। দুই এক জন পরস্পরকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল, "ই-বাঙ্গালীন্ কাহাঁসে-আয়া?—ই-রোতা কাহে হ্যায়?" কিন্তু উভয় প্রশ্নেরই "কা' জানে।" এই উত্তর মাত্র পাওয়া গেল। অগত্যা তাহারা তাহাদের মধ্যে আকস্মিক সমাগতা এই নূতন ও অদ্ভুত জীবটি সম্বন্ধে অনর্থ কৌতূহলকে সম্পূর্ণরূপেই বিসর্জ্জন দিয়া সম উচ্চস্বরে এক যিশু-ভজন আরম্ভ করিয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া চলিল:—

"—হে মেরা যেশু! হে মেরা প্রভু?
আইসিও মেরা লগ্‌গে,—ছোড়িও না কভু।"

স্কুলের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন মন ঈষৎ একটুখানি সুস্থ হইলেও দেশী ও বিলাতী মেম এবং অবশিষ্ট বহুসংখ্যক ময়লা ন্যাকড়াপরা বেহারী হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীলিমার সমস্ত শরীর মন আবার যেন সঙ্কোচে গুটাইয়া এতটুকু হইয়া আসিল। ইহাদের মধ্যেই তাহাকে সারাদিন যাপন করিতে হইবে?—ইহাদের কাছেই পড়া লইতে ও দিতে হইবে? ওঃ, কোথায় মিস্ দে' প্রেমকুসুমদি'—এমন কি, সুলোচনাদি'র সেই গম্ভীর কঠিন মুখখানাও আজ তাহার মনের মধ্যে যেন মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। অপ্রিয়ভাষিণী সাবিত্রী-মনোরমাকে তাহার যেন আজ স্বর্গবাসিনী দেবকন্যার দল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। কি করিলে, ওগো, কি পুণ্য করিলে ইহারা তাহারা হইয়া যাইতে পারিত!

সঙ্গের দাই কি বলিয়া দিল, চিঠি দিল, শুনিয়া ও পাঠ করিয়া এক জন মেম আসিয়া হতবুদ্ধি নীলিমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। একটি অপূর্ব্ব-দর্শন সুসজ্জিত কক্ষে আর এক জন স্থূলাঙ্গী রক্তবদনা মেম প্রকাণ্ড একটা চৌকিতে বসিয়া কি লিখাপড়া করিতেছিলেন; নীলিমার সমভিব্যাহারিণী মেমটি তাঁহাকে ইংরাজীতে কি সব বলিতে তিনি একটা খাতা বাহির করিয়া নীলিমার দিকে ক্ষুদ্র ও কপিলবর্ণের চক্ষুর্দ্বয় ফিরাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন, "হে আমার প্রিয় বালিকা! তোমারই নাম কি নীলিমা চাকারভারটী?"

নীলিমা ঘাড় বাঁকাইয়া ইহার জবাব দিলে পুনঃ প্রশ্ন হইল—"তুমি এক্ষণে কত দিনের বৃদ্ধ হইয়াছ?"

নীলিমা এ প্রশ্নের অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নীরব থাকিলে মেম ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া

উঠিলেন, "ও হায় হায় বেচারা বালিকা! তুমি যদি তোমার নিজের মাতৃ-জিহ্বাকে 'ইওর মাদার টং' ভুল কর, তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।"

এইরূপে নীলিমাকে মিসন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া তাহাকে 'বেঙ্গলী ক্লাশে' পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই মিসনের সঙ্গে যে অনাথাশ্রম (অরফ্যানেজ) ছিল, তাহাতেই দুইটি বাঙ্গালীর মেয়ে এবং স্থানীয় দুই এক জন নিতান্ত দরিদ্রাবস্থার বাঙ্গালীর মেয়েকে ইহারা 'ভজন-সজন' দিয়া আনিয়াছে, ইহাদের লইয়া মিসেস্ গুঁই টিচারের অধীনে এক 'বেঙ্গলী ক্লাশ' খোলা হইয়াছিল। নীলিমা তাহারই অন্যতমা ছাত্রী হইয়া একটুখানি দলপুষ্ট করিল।

সে যখন ক্লাশে ঢুকিল, তখন সেই ক্লাশের পড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা ভূমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চোখ মুদিয়া প্রার্থনা করিতেছিল; কেবল মিসেস্ গুঁইই মধ্যে মধ্যে মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন যে, মেয়েরা কেহ চোখ চাহিতেছে কি না। নীলিমাও উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সকলের মুখে শুনিয়া শুনিয়া যতটা পারিল, আবৃত্তি করিল :—

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,—তোমার ইচ্ছা আইসুক। আমাদের দিবসের আহার এই দিবসে আমাদিগকে দাও এবং আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরা নিজ অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া থাকি। আমেন।"

প্রার্থনা শেষ হইতেই মেয়েরাই সমস্বরে হুহু করিয়া গান ধরিয়া বসিল। নীলিমা অজ্ঞতাবশতঃ হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মিসেস গুঁই তাহার দিকে চাহিয়া গাহিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—

"চেষ্টা করতে পারতে।"

নীলিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।—

"বল না ভারত ঘুমাবে কত, পড়িয়া পাপের ঘোরে।
দেখ না চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে, ত্রাণ-ভানু ওই অ-দূরে,
হরি রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু যাও ভুলে,
নোড়া-নুড়ি ফেল সাগরের জলে,
যদি পার চাহ ভবার্ণবকূলে, সার কর তবে যিশুরে।"

এই গানটি শেষ করিয়া পড়ার পালা। মিসেস গুঁই নিজের বাঙ্গালা বাইবেলখানি খুলিয়া আরম্ভ করিলেন—"ঈশ্বর বলেন, শেষ যুগে এইরূপ হইবে।—আমি সমস্ত সংসারের উপর আমার আত্মার বর্ষণ করিব।"

সঙ্গে সঙ্গে সকল মেয়েই নিজ নিজ বাইবেলের পাতা আঙ্গুলে থুথু মাখিতে মাখিতে খুলিয়া ফেলিল ও সেইরূপ সমস্বরে আরম্ভ করিল;—

"আর তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ প্রবচন বলিবে।

"আর তোমাদের যুবকরা দর্শন দেখিবে।

"আর তোমাদের প্রাচীনরা স্বপ্ন দেখিবে।

"হাঁ, আর সেই যুগে আমার দাসদের উপরে আর আমার দাসীদের উপরে আমার আত্মার বর্ষণ করিব ও তাহারা প্রবচন বলিবে।"

ছুটীর পূর্ব্বে পুনশ্চ প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া ছুটী হইল। এবারকার গানটি না গাহিয়া পাছে নীলিমার আত্মার অনন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে, সেই ভয়ে উহা নীলিমাকে একখানি কাগজে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহার আর ভুল করিবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। সে গানটি এইরূপ :—

"ওরে পাতকি!
ভবপারে যাবার উপায় কর্‌লি কি?
ও তোর ব্রহ্মা সুরেন্দ্র, আর কৃষ্ণ গিরীন্দ্র,—
তারা আপন পাপেই হাবুডুবু তোমার উপায় কর্‌বে কি!"

ছুটী হইয়া গেলে মেয়েরা কপালে হাত ঠেকাইয়া "গুরুমা! নমস্কার!" বলিয়া বিদায় লইতেছিল; মিসেস গুঁই তাহাদের ফিরিয়া ডাকিলেন।

নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই মেয়েটি আজ কোথা থেকে এলো? এই! তোমার নাম কি?"

নীলিমা বিজড়িত স্বরে উত্তর করিল—"শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্ত্তী।"

"হাঁ হাঁ, হিঁদুরা অর্থ না বুঝেই নাম রেখে বসে। তোমার এমন ফরসা রং অথচ নাম রাখলো নীলিমা। আমি হিঁদু বাড়ীতে এক জন ঘোর কালো রংয়ের মেয়ের বিদ্যুৎলতা নাম রাখতে শুনেছি। নীলিমা! আচ্ছা, আমি তোকে নেলী ব'লে ডাকবো—এই নেলি! তোরা পুতুলপূজো করিস ত?"—নীলিমাকে নতমুখ ও নীরব দেখিয়া বলিলেন—"খবরদার, আর কখনও করিসনে, নরকের কথা শুনেছিস? সেখানে দিনরাত আগুনে পোড়ায়?—পুতুলপূজো করলে ত

অনন্ত নরক হয়, আর—নরকের যে কি যন্ত্রণা, সে সব আমি কাল তোকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব এখন; আজ আর আমার সময় নেই। মনে কর, মৃত্যুর পর আর অনন্তকাল ধ'রে সেই রকম যন্ত্রণা ভোগ হবে। অথচ যিশুকে যদি ভজনা করিস্, শেষ বিচারের সময় যিশু তোমায় কোলে ক'রে নেবেন। স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী হ'তে পারবে,—কেমন, পুতুলপূজো ত্যাগ ক'রে এখন থেকে যিশুকে মানবি ত?"

অনন্ত নরকের ভয়েই হউক, আর মিসেস গুই-এর বিরাট বপু ও তীক্ষ্ণ রসনার ভয়েই হউক; নীলিমা মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, সে যিশুকেই মানিবে এবং এই কথাটা স্বীকার করিবার সময় তাহার মাথার চুলের গোড়া হইতে পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত বারবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, যেন কিসের একটা তাড়নায় সে এবার আর মিসেস গুইকে "নমস্কার" না বলিয়াই দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অনন্ত সুখের প্রলোভনদাত্রী মিসেস গুই-এর কদাকার ও প্রকাণ্ড মুখখানাকে হঠাৎ তাহার সেই নরকের দ্বারপালেরই বিকট মুখের মত ভীষণ বোধ হইল, সেই নরকেরই একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা কুমীরের মতই ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, সেই মুখটা যেন তাহাকে গ্রাস করিতে তাহার দিকে ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।—সে যখন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, মন্থরগতি গো-যান যখন চলিয়া চলিয়া মিসনবাড়ীর প্রশস্ত ময়দান ছাড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল;—তখন সে একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে জোর করিয়া যেন ঠেলিয়া ফেলিল; ভরসা করিয়া যেন সেই অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বিলুপ্ত-চিহ্ন বাড়ীটার পানে চাহিতে সাহসী হইল; কিন্তু তখনও তাহার শরীরের ভিতরে ভিতরে কম্পনের বেগটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই; তখনও তাহার কপাল দিয়া শীতের দিনে টসটস করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। কেন, বা কি জন্য এরূপ একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়না সে খাইল, তাহা তাহার নিকট বেশ সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু তাহার জীবনে কিছু যেন একটা অভাবনীয়—একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের সূচনা আজ এইখানে দেখা দিয়াছে, বালিকা হইলেও ইহা তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বুঝিতে পারিয়াই অমন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

পুনর্মিলন

(হেসে ও কেঁদে)

[Tennyson]

প্রিয়ার সঙ্গে কাজিয়া করিনু আমি
কথা কওয়াকয়ি তাও গেল ক্রমে থামি'।
ঝাঁপাঝাঁপি খেলা করিতে যাইয়া খুকু
মিটাইয়া দিল মোদের বিবাদটুক।

সেবার কলহ ঘটিল কঠিনতর,
সেবার মোদের রাগ অভিমান বড়,
ঘর-সংসার না করিলে নয়, তাই
এক সাথে রই, এক সাথে খাই দাই।

মোর কোল হ'তে ঝাঁপ দিয়ে মা'র কোলে,
তা'র কোল হ'তে মোর কোলে এল চ'লে,
খুকুরে আদরে চুমিতে চুমিতে শেষে
প্রিয়ারেই চুমু খেয়ে ফেলিলাম হেসে।

সেদিন বড়ই দুঃখের দিন, হায়
গেলাম যথায় খোকাটি নিদ্রা যায়,
সেখানে ক্ষুদ্র সমাধির পরে আসি
চুমিনু প্রিয়ারে নয়ন-আসারে ভাসি।

শ্রীকালিদাস রায়।

কৈলাস-যাত্রা

ষোড়শ অধ্যায়

কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া দারচিনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক লাদাকদেশীয় যাত্রীতে স্থানটি পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহাদের শিবিরে গমন করিয়াছিলাম। এই যাত্রীদিগের মধ্যে লাদাকের রাজাও আগমন করিয়াছেন। ইনি কাশ্মীরাধিপতির এক জন সামন্ত নরপতি, আর সে অঞ্চলের বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগুরু। তাঁহার সহিত প্রায় ২০।৩০ জন অনুচর আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিবিরে গমন করি। তিনি শিবিরের অভ্যন্তরভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার উপস্থিতির কথা অবগত হইয়া তিনি পূজার গৃহে আগমন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই ক্ষুদ্র তাঁবুর মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। ধূপ সকল প্রজ্বলিত হওয়ায় স্থানটি বেশ সুগন্ধযুক্ত হইয়াছিল। হিন্দীভাষার সাহায্যে তাঁহার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চোখ একটু টেরা। কাশ্মীরের মহারাজের সহিত আমার একটু পরিচয় আছে, অবগত হইয়া তিনি আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। লোকটি বেশ ধার্ম্মিক। আমার অবস্থানকালে তাঁহার নিকট তাঁহার বহু ভক্ত আগমন করিয়া ঔষধ ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। আগমনকালে তিনি আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে লাদাকের শুষ্ক ফল খোবাণী প্রদান করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর-মহারাজের এক জন বৌদ্ধ কর্ম্মচারীর সহিত আমি পরিচিত হই। তাঁহার সহিত কয়েক জন ব্যবসায়ীও আসিয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ীদের এক জনের নিকট হইতে আমি পট্টুর কয়টি থান ক্রয় করিয়াছিলাম; শুনিলাম, উহা তাঁহার গৃহেই প্রস্তুত হইয়াছে। কৈলাসের চিহ্নস্বরূপ এই বস্ত্র আমার কাছে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। দেখিলাম, এই যাত্রীদিগের মধ্যে সকলেই সহৃদয়।

ইঁহাদিগের নিকট হইতে আমি আমার বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। প্রাতঃকালে ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন—আমাদিগকে আজ এ স্থানে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমার সঙ্গীটি শিরঃপীড়ায় ও জ্বরে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং প্রত্যাগমনবিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়। লাদাকের রাজার নিকট হইতে কিছু ঔষধ আনিয়া তাহাকে দিয়াছিলাম, আর আশ্বাস দিয়াছিলাম, "তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, আমার নিকট প্রচুর অর্থ আছে, প্রয়োজন হইলে মানুষের কাঁধে তুলিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" ভগবৎকৃপায় অনতিকালের মধ্যে সে আরোগ্যলাভ করে। এ স্থানের জ্বরের একটু বৈশিষ্ট্য আছে; জ্বরের সময় শরীরের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আর খুব শীঘ্র বিজ্বর হয়।

মনে করিয়াছিলাম, এ স্থান হইতে তীর্থপুরী গমন করিব। দারচিন হইতে ইহা বেশী দূর নহে। আমাদের দলের কেহ তীর্থপুরী গমন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা আমাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। এ স্থানে মহাদেবের সহিত ভস্মাসুরের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ভস্মাসুর যুদ্ধে পরাজয় ও পঞ্চত্ব লাভ করেন। ভস্মাসুরের শরীরের অবশেষ চূর্ণের পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীরা সেই চূর্ণ বা ভস্ম ভক্তির সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এক জন ভক্ত আমাকে কিছু ভস্ম-প্রসাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

পরম পবিত্র অনির্ব্বচনীয় কৈলাস পরিদর্শন—পরিক্রমণ আর ইহার পাদদেশে পঞ্চরাত্রি অতিবাহিত করিলাম। এ স্থানের অপূর্ব্ব জল, বায়ু, আকাশমণ্ডল ও অলৌকিক দৃশ্যের তুলনা নাই। অনন্তকাল হইতে অসংখ্য লোক এ স্থানে আগমন করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছেন। কোটি কোটি লোক এই স্থানে আগমন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া থাকেন। কোটি কোটি লোক অবিকৃতচিত্তে এই দুর্গম ভয়াল পথের অতুলনীয়

ক্লেশ সহ্য করিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এখন প্রত্যাগমনের জন্ত আমরা প্রস্তুত হইলাম। ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু দিন এ স্থানে অবস্থান করিয়া এ প্রদেশের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করি; কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। একটা কথা আছে—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং", আমি পরবশ, দলের অধীন; সুতরাং দলের মতানুসারে আমাকে কার্য্য করিতে হইল। দলের অধিকাংশের মত, শীঘ্র শীঘ্র দেশে প্রত্যাগমন করা। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হৃদয়ে এরূপ আশা পোষণ করেন যে, পুনরায় তাঁহারা কৈলাস দর্শন করিবেন। তাঁহারা কৈলাসের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করেন। আমার ভাগ্যে পুনরায় যে কৈলাস-দর্শন হইবে, তাহা স্বপ্নের অতীত। তবে ভগবানের ইচ্ছা হইলে জগতে অসম্ভব কিছুই নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

২৮শে জুলাই রবিবার ভোজনের পর আমরা দারচিন পরিত্যাগ করি। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের বিষয় ঝব্বুরাও অবগত হইয়া যেন আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরাও যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মনে করিতে লাগিলাম, গৃহের তত নিকটতর হইতেছি। অপরাহ্নকালে আমরা বর্খার প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করি। মনে করিলে আমরা আরও খানিকটা অগ্রসর হইতে পারিতাম, কিন্তু নেতা মহাশয় এই স্থানেই অবস্থান করিবার স্থান-নির্ব্বাচন করেন। অনতিকালমধ্যে আমাদের তাঁবু তোলা হইল, রন্ধনেরও উদ্যোগ হইতে লাগিল। কেহ কেহ এ স্থানের জম্বু নামক সুগন্ধী তৃণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহা রন্ধনের মশলারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; মাংসপ্রিয় ব্যক্তিরা ইহা সাগ্রহে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আকাশমণ্ডল বেশ পরিষ্কার ছিল, জলঝড়জনিত কোনরূপ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সায়ংকালে কৈলাসের বিশ্ববিমোহন অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ক্রমে কৈলাসের শিরোপরি প্রতিভাত সূর্য্যের শেষ কিরণ অন্ধকারে লীন হইয়া গেল। কিরণের হ্রাসের সহিত কৈলাসের বর্ণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমরাও যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম।

বর্খার প্রান্তরের নাম আমাদের ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। সেনানী জোরাবর সিং-পরিচালিত অল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বহুসংখ্যক তিব্বতী সৈন্যের উপর অনন্যসাধারণ বিজয়লাভ করায় তিনি তিব্বতীদের নৈতিকবল ও বাহুবল পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। যে স্থান এক দিন তিব্বতী সেনার মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল—যে স্থান এক দিন আহত সৈনিকের আর্ত্তস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যে স্থান এক দিন ভারতীয় সৈন্যের বিজয়দর্পে, আর পলায়নপর বিভীষিকাগ্রস্ত তিব্বতী সেনার পদশব্দে ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ সে স্থান শান্তরসে পরিপূর্ণ। আমরা নিরুদ্বেগে বর্খার যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে আবার আমরা গমন করিতে লাগিলাম, মধ্যাহ্নের পর মানস-সরোবরের তটে যু গুম্ফার পাদদেশে কতিপয় উষ্ণপ্রস্রবণের নিকটে উপনীত হইয়া আমরা রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। যু গুম্ফা পিরামিডের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর থাকায়—এই স্থান হইতে মানসের, কৈলাসের এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য উপভোগ্য। এক সময় মানস-সরোবরের সহিত রাবণহ্রদ একটি স্রোতের দ্বারা সংযুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রণালী না থাকিলেও সেই প্রণালীর চিহ্ন বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনেক দিন আমি স্নান করি নাই, শরীরের লোমে এক প্রকার কীট জন্মিয়াছিল, তাহাতে অস্বস্তি বোধ হইত। আজ গরম জলে স্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; কয়েকটি অত্যন্ত উষ্ণ। যেটির জলে আমরা স্নান করি, তাহা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ থাকায় আর আচ্ছাদনযুক্ত হওয়ায় আনন্দে স্নান করিয়াছিলাম। উষ্ণ প্রস্রবণগুলির সম্মিলিত জল একটি ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে বহুসংখ্যক বালহংস আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। মানস-সরোবর ও রাক্ষসতালে এই সকল বালহংস প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এ স্থানে রাজহংসের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশে যাহাকে রাজহংস বলে, সেইরূপ হংস এ প্রদেশের কোথাও দেখিতে পাই নাই।

সন্ধ্যার পর আমি মানসের তটে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত। দিবাভাগে

রাসিং ও রাওরাং।

যে সৌন্দর্য্যের সুষমা লইয়া মানস আপন মনে লীলা করিয়াছিলেন, এখন সে সৌন্দর্য্য হইতে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে লাগিল। উপরের পরিষ্কার সুনীল আকাশমণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া মানস যেন অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিতেছেন। নক্ষত্রভূষিত অম্বর মানসকে যেন কৃষ্ণাম্বরে সজ্জিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভূষণ দিয়া জড়িত করিয়াছেন। কবি ইহা কল্পনার চক্ষুতে দেখিলেন—প্রস্ফুটিত কমনীয় কনক-কমল মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে কম্পিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন আত্মগোপন করিতেছেন। সুখস্পর্শ সমীরণ-স্পর্শে মানসের বিশালবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল আবির্ভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রচনা করিতেছিল। এ সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেন প্রাণের সখাকে এই সুমধুর সঙ্গীত শুনাইবার জন্য অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতসারে তরঙ্গ সকল আলাপ করিতেছে। এই অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকের দেশে সকলই অদ্ভুত। নিশীথ নিস্তব্ধতা ঐন্দ্রজালিকের হস্তের যেন সম্মোহন দণ্ড! দর্শককে এই সম্মোহনদণ্ডপ্রভাবে অভিভূত করিয়া ঐন্দ্রজালিক প্রখর কল্পনাকে কুণ্ঠিত করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়া আপন মনে স্বচ্ছন্দচিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন। আমার বামদিকে যু গুম্ফার পাহাড় যেন কালপুরুষের মত অবস্থান করিয়া কামরূপ মানস-সরের মধুর লীলা সম্ভোগ করিতেছেন। সকল সৌন্দর্য্যের আধার ব্রহ্মার মানস-সৃষ্টি, দেবতাদিগের লীলানিকেতনে মানুষের অধিকক্ষণ অবস্থিতি বোধ হয় তাঁহাদের ঈপ্সিত নহে। তাই বুঝি তাঁহারা আমাকে অভিভূত করিয়া আমার অনিচ্ছায় আমাকে আমার শয্যার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন!

প্রাতঃকালে আবার আমরা গমনে প্রবৃত্ত হইলাম। মানসের তটে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন মানস কৃষ্ণাম্বর পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নীলাম্বর-পরিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ম্লান চন্দ্রের কিরণজাল সরোবর-বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে, সূর্য্যের প্রথম রশ্মি, চন্দ্রালোককে দূর করিয়া স্বীয় আধিপত্যস্থাপনে প্রযত্ন করিতেছে। উষার এই অলৌকিক দৃশ্য—মান্ধাতা ও কৈলাসের স্বর্ণ-জলে প্রাতঃস্নান—এই মিলিত দৃশ্য এ প্রদেশকে অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার করিয়া তুলিয়াছিল। সূর্য্যকিরণের উজ্জ্বলতার সহিত মানসও ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন শোভাসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। মানস যদি বিশাল জলরাশিসহ এ স্থানে অবস্থান না করিতেন, তাহা হইলে গরলামান্ধাতা বা কৈলাস অলৌকিক বিস্ময়কর শোভার আধার হইতে কখনই সমর্থ হইতেন না। আর উত্তরে ও দক্ষিণে স্বচ্ছ স্ফটিক পর্ব্বতদ্বয় যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে মানসও এই কমনীয় কান্তি ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন কি না, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব জলরাশি সূর্য্য-কিরণ ও নিত্য পরিবর্তনশীল জলধরের প্রতিবিম্বসহ মিলিত হইয়া প্রতিক্ষণে অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন স্ত্রীসুলভ চপলতা প্রকাশ করিতেছিলেন; আর উভয় দিক হইতে পর্ব্বতদ্বয় কৌতূহলপরবশ হইয়া—মানসের ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হইয়া—অচল হইয়া একদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! মানসের এই লোকোত্তর সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির পক্ষে রজোহীন বিমল আকাশমণ্ডল আর এ প্রদেশের দৃষ্টিবিভ্রমকারী বায়ুমণ্ডলও কম সহায়তা করে নাই। পৃথিবীর এই উচ্চতম প্রদেশে অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যস্থলে ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি অনন্তকাল মানবমনকে বিস্ময়াপন্ন করিবে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই ইহা দর্শন করিয়া অদ্ভুত রসে আপ্লুত হইবেন। ভগবানের এই মানস-রচনা দেখিবার

জন্য বিশ্বপাতার সত্তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অনন্তকাল ধরিয়া জনপ্রবাহ ইহার তটে আগমন করিয়াছেন। কত মহদাত্মা ইহার তটে উপবেশন করিয়া --দণ্ডায়মান হইয়া-- শয়ন করিয়া চকিত-হৃদয়ে--ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলাম, জানি না, কত শত পবিত্র হৃদয় ব্যক্তি কত দূরপ্রদেশ হইতে, অচিন্ত্যনীয় কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সেই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন! আজ এই পবিত্র পথের অনুসরণ করিয়া পবিত্র হইলাম; জন্ম সার্থক হইল বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

মানসের পরিধি প্রায় ৫০ মাইল হইবে, দেখিতে বৃত্তাকার। ইহার অতি দূরের তট বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তগণ মানসের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া ইহার পরিক্রমা করিয়া থাকেন। ইহার তটে অনেকগুলি মঠ আছে; তথায় সাধুসন্ন্যাসী লামারা অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিয়া থাকেন। এই উচ্চ প্রদেশ সাধনের পক্ষে বড় উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। শরীর নিশ্চল হইলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান শরীরকে নিশ্চল করিবার পক্ষে বড়ই উপযোগী। অল্পশ্রমেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃতিদেবী যেন ইঙ্গিত করিতেছেন, চঞ্চল হইও না, স্থির হইয়া থাক! ধ্যানপরায়ণ হও! স্বীয় অপূর্ব্ব শক্তির সহিত পরিচিত হও! এ প্রদেশে অল্পপ্রয়াসে মন যেরূপ স্থিরতা লাভ করে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানে সেরূপ হয় কি না, তাহা জানি না। মননশীল ব্যক্তির পক্ষে এ স্থান বড়ই উপযোগী। মনঃসংযমে অভ্যস্ত হইবার পক্ষেও ইহা অনুকূল। যে পর্য্যন্ত না মন একাগ্র হয়, অচঞ্চল হয়, এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত জাতিগত হিসাবেই বলুন, আর ব্যক্তিগত হিসাবেই বলুন, সে জাতি বা ব্যক্তি বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

মানসের জলের মত সুস্বাদু জল--স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল জল--কীটাণুবর্জ্জিত পবিত্র জল জগতে দুর্লভ। ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে জল আনিয়াছিলাম, আজও তাহা স্ফটিক-নির্ম্মল--কীটাণুবিহীন হইয়া রহিয়াছে! মানস হইতে যে সময় আমি জল সংগ্রহ করি, সে সময় তরঙ্গ হইতেছিল, সেই তরঙ্গের সহিত শৈবাল-কণিকা জলের সহিত আসিয়াছিল। তাহা আসিলেও জলের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় নাই।

মানসের জলের অনতিদূরে তট দিয়া পরিক্রমার পথ। এই রাস্তা দিয়া আমাদিগকে দক্ষিণের প্রায় শেষ সীমায় গমন করিতে হইয়াছিল। গমনকালে মানসের মনোমোহন দৃশ্য, রক্তচঞ্চু কলহংসের ক্রীড়া, দীর্ঘপথ অতিক্রমণ-জনিত কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করিতে দেয় নাই, ইহার পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ পাড়ের স্থানে স্থানে কয়টি গুহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। জলঝড়ের সময় আশ্রয়হীন যাত্রী ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কখন পদব্রজে, কখন বৃষভে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। এই অপূর্ব্ব যাত্রা সুখের হইলেও সূর্য্যের প্রখরকিরণ দেহকে তাপিত করিয়াছিল। আমাদের নিম্নভূমিতে আমরা যে সূর্য্যকিরণ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা ধূলিকণা-পরিপূর্ণ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া আপতিত হওয়ায় তাহার তীক্ষ্ণতা আর তাহার রোগ দূর করিবার শক্তি অনেকটা মন্দীভূত হইয়া যায়। এ উচ্চ ভূমিতে

রাক্সিং বা রাওয়াং।

তাহার কোনরূপ আশঙ্কা না থাকায় বিশুদ্ধ সূর্য্য-কিরণ সম্ভোগ করা যায়। আমরা মলিন দেশের লোক এরূপ বিশুদ্ধ কিরণ সেবনে অভ্যস্ত নহি বলিয়া তাপিত হইয়াছিলাম। বিশুদ্ধ বায়ু আর সূর্য্যের বিশুদ্ধ কিরণ সেবন করায় বোধ হয়, এ দেশের লোক দীর্ঘায়ু হয়। সাধারণ তিব্বতীদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি।

প্রায় ১০টার সময় আমরা গোসল গুম্ফার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এই গোসল গুম্ফার মঠে অবস্থান করিয়া স্বেন হেডিন মানস, কৈলাস ও মান্ধাতার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন—তন্ময় হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, এ দেশে বন্দি-জীবন যাপন করিতে হইলে, অবস্থানের জন্য এই রমণীয় স্থান তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন! স্থানটি উন্নত পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া এ স্থানের রমণীয় দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানসের পবিত্র জলে অবগাহন করিলাম। সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হয়, ইহা আমাদের চিরন্তন প্রথা। যখন সঙ্কল্প করি, তখন দারাপুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সখাসখী, কাহারও কথা মনে আসিল না, ভগবান্ ভারতের কল্যাণ করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া স্নান করিয়াছিলাম। স্নানের পর কিছু মিশ্রী আর ৩।৪ গেলাস সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ জল পান করিয়াছিলাম। এই পবিত্র জল পান করাতে আমার সমস্ত শরীরে এক অননুভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল—এতদিনের পথক্লেশজনিত অবসাদ যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। শরীর যেন অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইল। সেদিন আমি কিঞ্চিৎ মিশ্রীখণ্ড আর মানসের ৩।৪ গেলাস জল ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করি নাই। অন্নগ্রহণ না করাতে কোনরূপ অবসাদ বোধ হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বপ্রধান উপাদেয় পেয়, শ্যামপেন নামক মদ্যের সহিত তুলনা করিয়া, স্বেন হেডিন, মানসের জল শ্যামপেন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা প্রাচীবাসী, আমাদের নিকট এ তুলনা বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মানস-সরোবর আমাদের নিকট পবিত্র। আর এই প্রদেশ হইতে শতদ্রু-ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু ও গঙ্গা প্রভৃতি পরম পবিত্র নদনদী উৎপন্ন হইয়া ভারতাভিমুখে গমন করিয়াছেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে এ প্রদেশ অত্যন্ত পবিত্র এবং ভক্তিভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানসের সবই বিচিত্র। শীতকালে এক দিনেই মানসের নীলবর্ণের জলরাশি শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইয়া থাকে। আবার এক দিনেই শ্বেত নীলে পরিণত হয়। শীতকালে তুষার এরূপ কঠিন হয় যে, পশু সকল তাহার উপর গমনাগমন করিয়া থাকে। মানসশোভা হংসাদি জলচর পক্ষিসকল শীত-সমাগম বুঝিতে পারিয়া ভারতে গমন করিয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিয়া থাকে।

এই শান্ত মধুর প্রকৃতির মানস-সরোবর যখন বাতাহত হয়েন, যখন ক্ষুব্ধ হয়েন, তখন উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া যেন পার্শ্বস্থ প্রদেশ সকল গ্রাস করিবার জন্য দ্রুতবেগে তটাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে যে নয়নাভিরাম তরঙ্গ সকল শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতে শ্রোতার হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহারা এমন ভয়াল রূপ ধরে যে, সে সময় হৃদয় বিভীষিকাগ্রস্ত করিয়া দেয়।

গোসল গুম্ফা পরিদর্শন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। গমনকালে এক স্থানে কতিপয় লাসাবাসী যাত্রী মানসের জলে শক্তু সিক্ত করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, মানসের জল লইয়া যাওয়া বড়ই অসুবিধাজনক। কাচপাত্র এ দেশে সুলভ নহে—ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ও যথেষ্ট আছে। অন্য ধাতুময় পাত্রেরও নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা। এরূপ অবস্থায় ছাতু সহযোগে জল লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত। বুদ্ধিমান্ তিব্বতবাসী এই অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া সুদূর প্রদেশে, গৃহে আত্মীয়-স্বজনকে মানসের প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন।

তরঙ্গতাড়িত মানসের মৎস্য সকল তীরে নিক্ষিপ্ত হইলে যাত্রীরা যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। মানসের শুষ্ক মৎস্যের ধূম বালকদের রোগের পক্ষে হিতকর। আমাদের দলের এক জন ভুটিয়া একটি মৎস্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মানসের তট পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একবার মানসের জলে আচমন করিয়া লইলাম। রাবণ-হ্রদ যেমন ক্রূরপ্রকৃতির, ইহার আকৃতিও তেমনই বিষম, ইহা

সেইরূপই দুরবগাহ। ভুটিয়াদের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে, প্রথমে রাবণ-হ্রদে স্নানাদি করিয়া পরে মানসে স্নান করা উচিত। ইহার বিপরীত কার্য্য করা তাঁহারা পুণ্যহর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

অপরাহ্ণকালে আমরা মানসের তট পরিত্যাগ করিয়া উন্নত পাড়ের উপর আরোহণ করিলাম, এই স্থান হইতে মানস ও কৈলাসকে অন্তরে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমরা যে সময় মানসের পাহাড়ের উপর উপস্থিত হই, সে সময় এক দল অশ্বারোহীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহারা সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল। ইহাদিগকে আমরা ডাকাইত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম; ইহাদের সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। আমাদের দলের বন্দুকধারী ২ জন অগ্রে ছিল, সম্ভবতঃ আমাদিগকে অস্ত্রধারী দেখিয়া আমাদিগকে তাহারা আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। যাহা হউক, ইহাতে আমাদের দলের ভিতর বেশ একটা আতঙ্ক আসিয়াছিল। যখন তাহারা আমাদের প্রতি কোনরূপ কুমতলব না দেখাইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের গন্তব্য স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল, তখন আমরাও শঙ্কাহীন হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ থাকায় হাঁটিয়া যাঁহারা যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে রাস্তা বড় ক্লেশকর হইয়াছিল। আজিকার দীর্ঘপথ আমাদের সকলের পক্ষেই ক্লেশকর হইয়াছিল; সকলেই শ্রান্ত হইয়াছিলেন--বিশ্রামের জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দল অবস্থানের জন্য গরলা মান্ধাতার পদতলে স্থান নির্ব্বাচন করেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় শ্রান্ত হইয়া অন্ধকারে অবস্থান-স্থানে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম, তাঁবু খাটান হয় নাই বিছানা পাতিয়া কেহ কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ বা শয়নের উপক্রম করিতেছে। আমিও বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলাম। সঙ্গে রুচিকর খাদ্য না থাকায় খাইবার ইচ্ছাও ছিল না। আমাদের দলের প্রায় সকলেই আগমন করিয়াছেন, আমার সঙ্গীটি আর দুই এক জন স্ত্রী-যাত্রী উপস্থিত হয়েন নাই। তাঁহাদের জন্য আমরা ভাবিত হইলাম, কিন্তু তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য কাহাকে পাঠান যায়? এক জন লোক একটু দূরে গিয়া কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া প্রত্যাগমন করিল, কোন সন্ধান পাইল না। তাঁহাদের সঙ্গে যথেষ্ট শীতবস্ত্র না থাকায় একটু বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। শীতার্ত্ত হইয়া রাত্রি ১টার সময় আমার যুবক সঙ্গীটি উপস্থিত হয়। আজ যেরূপ শীত ভোগ করিয়াছিলাম, সেরূপ শীত কখন ভোগ করি নাই। আজ জুতা পরিয়া শয়ন করিয়াছিলাম; যাহা কিছু গরম কাপড় ছিল, সমস্তই গায়ে দিয়াছিলাম। তাহার উপর সকলের শরীর ঢাকা দিয়া তাঁবুর কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ সকল উপায়েও শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় নাই। দুই একবার গালের উপর হাত দিতে হইয়াছিল, সে সময় এরূপ শীত বোধ হইয়াছিল, যেন হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। শীত যেন মেরুপ্রদেশের শীত। কিন্তু এরূপ দুঃসহ শীত ভোগ করিলেও শরীর অসুস্থ হয় নাই।

লাদাক পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত গরলামান্ধাতা। আমাদের দেশের পুরাকালের ভৌগোলিকরা এই সকল পর্ব্বতমালার সাধারণ নাম হিমালয় প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজরা এই সকল পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালার ইচ্ছানুরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কৈলাসশ্রেণীতে কৈলাস পর্ব্বত সর্ব্বোচ্চ। ইহার নামানুসারে এই শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। লাদাক-শ্রেণীতে তাহার বিপরীত লক্ষিত হয়। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার লংগা পর্ব্বত ব্যতীত এমন মহিমান্বিত পর্ব্বত এসিয়ার মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। অনির্ব্বচনীয় পার্ব্বত্য শোভার আধার তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর ভারতে যত আছে, তত আর পৃথিবীর কোথাও নাই, ইহারা যেন সকলের উপর অখণ্ড প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে।

অখণ্ড প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও ইহাদের নামকরণ কিন্তু বিদেশীর দ্বারা সাধিত হইতেছে! পরাধীন দেশে নামবিভ্রাটটা একটু বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। বিদেশী জিহ্বায় ভাল উচ্চারণ না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। যবন (গ্রীক) হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজপ্রদত্ত নদ-নদী গ্রাম-নগরের নাম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বিষয়, "সাহেব লোক" কিছু অনুশীলন করিলেই তাঁহাদের প্রদত্ত নাম আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকি। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম একটা বিদেশী নাম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতরা এরূপ অত্যাচারের ঘোর

প্রতিবাদ করিলেও ইংরাজ ইহার লোভ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আমরাও দাসের দল, পাঠ্য পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া কথোপকথনে বিদেশি-প্রদত্ত নাম উল্লেখ করিয়া উগ্র দাসত্বের পরিচয় প্রদান করি। কেহ যদি কহেন, উহার নাম গৌরীশঙ্কর, তখন য়ুরোপীয়রা ও তাঁহাদের সেবকের দল বলেন, উহা অনামা - উহার কোন নাম নাই। গৌরীশঙ্কর বল,—ধবলগিরি বল, উহার আশ-পাশের শৃঙ্গের নাম! সুতরাং তোমাদিগকে বিদেশী নামই বহন করিতে হইবে! জুলুম মন্দ নহে!

এই নাম-প্রসঙ্গে আর একটা হাস্যোদ্দীপক কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মণ্টগোমারী নামক একজন ভদ্র অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় কেরাকোরম পর্ব্বত-শ্রেণীকে K আর ইহার শৃঙ্গকে K_1, K_2 এইরূপ ভাবে নাম দেন। ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। টানার প্রভৃতি এ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের নামের আদ্য অক্ষর দিয়া নামকরণ করেন। যেমন T45, T57, ইত্যাদি। অন্য য়ুরোপীয় সেই শৃঙ্গকেই নিজের নামের আদ্য অক্ষর দিয়া বিষম বিভ্রাট আনয়ন করেন। য়ুরোপীয়রা যাহাদের নাম নাই মনে করেন, সেই সকল শৃঙ্গের উচ্চতাই তাহাদের নাম হইতে পারে। যেমন ২০ হাজারী, ২২ হাজারী, এ প্রস্তাব নিতান্ত মন্দ নহে।

প্রাতঃকালে গরলা-মান্ধাতা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে একটি জলধারার তটে অবস্থান করি। ১লা আগষ্ট মধ্যাহ্নকালে আমাদের ভুটিয়ানেতার পরিচিত এক তিব্বতী গৃহস্থের গৃহে বহুদিনের পর দধি-ঘোল তৃপ্তির সহিত পান করিয়াছিলাম। আমাদের গমনপথে মটর-শুটির ক্ষেত্র হইতে মটর সংগ্রহ করা হয়, কাঁচা মটর আর চাল-ভাজা বড়ই মুখরোচক হইয়াছিল! গৃহে যাইবার জন্য ঝব্বুরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আমরাও তাহাদের অপেক্ষা কম ব্যগ্র ছিলাম না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

রাহুমুক্ত চন্দ্র

১

বিশ্বনাথে প্রণাম করে
　　গ্রহণ শেষের চন্দ্র আজি,
উঠছে গৃহে হুলুধ্বনি
　　মন্দিরেতে শঙ্খ বাজি'।
　উৎসব আজ গঙ্গাতীরে,
　উল্লাস আজ গঙ্গা-নীরে,
　নৌকা থেকে উজল চাঁদে
　　প্রণাম করে মাল্লা-মাঝি।

২

বুক যে ফাটে ম্লান সুধাকর
　　দেখলে পরে রাহুর গ্রাসে,
চন্দ্রহারা আকাশ দেখে
　　চক্ষু ফেটে জল যে আসে।
　দৈত্য নাচে উল্লাসেতে
　চাঁদকে চাহে নিঙ্গড়ে নিতে,
　অন্ধকারে নৃত্য করে
　　দানবগুলা মানব সাজি।

৩

মহাকালের ভাল থেকে হায়
　　মুছতে চাহ চন্দ্র-লেখা,
মরবে জটায় জাহ্নবী যে
　　চলবে ভালের অগ্নি দেখা।
　ডমরু আর বাজবে না রে
　ভুজঙ্গ আর নাচবে না রে,
　আকাশ-গাঙ্গে ফুটবে নাক
　　কহ্লার আর কুমুদরাজি।

৪

করাল রাহুর কবল-মাঝে
　　শশধর না পড়লে পরে,
গঙ্গাবেলায় কুম্ভমেলার
　　সৃষ্টি হবে কেমন ক'রে,
　অমৃত সে মরবে কেন
　অন্ধকারে ডরবে কেন,
　ধরার আঁধার ধ্বংস করা
　　জনম ভ'রে তাহার কাযই।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পুরী-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গুণ্ডিচা বাড়ীকে "গুপ্তা বাড়ী" বা জগন্নাথের মাসীর বাড়ী কহে। যে স্থানে ইহা অবস্থিত, তাহার নাম জনকপুর। ঠাকুররা সাত দিন মাসীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আদর-আপ্যায়ন ও অতিথি-সৎকারে তৃপ্ত হইয়া দশমী তিথিতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহারই নাম "পুনর্যাত্রা" বা "উল্টারথ।" এই স্থানে মন্দিরের অভ্যন্তরে "গুণ্ডিচা মাসীর" একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

গুণ্ডিচা বাড়ী বা জগন্নাথের মাসীর বাড়ী।

এই কয় দিন গুণ্ডিচা বাড়ীতে মহাড়ম্বরের সহিত রথোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। গুণ্ডিচা বাড়ী সমস্ত বৎসর খালি পড়িয়া থাকে, রথের সময়ে উহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া দেবতাদিগের বাসের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। পুরীর রাজা স্বয়ং এবং পুরীর অধিবাসী ও যাত্রিগণ অনেকে রথের পূর্ব্বদিন গুণ্ডিচা বাড়ীতে আগমনপূর্ব্বক মন্দির প্রকাশ্যভাবে পরিষ্কার করেন। এই শুদ্ধিকার্য্য "গুণ্ডিচা-মার্জ্জন" নামে অভিহিত।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।

সাত দিন এই স্থানে ঠাকুরদিগের দৈনিক সেবা, ভোগ, পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের ন্যায় গুণ্ডিচা বাড়ীতেও ঠাকুরের সুবৃহৎ মন্দির সংস্থাপিত আছে এবং এই মন্দিরও শ্রীমন্দিরের ন্যায় মূল মন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ নামে চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিবিধ তরুরাজিশোভিত উদ্যানবাটিকা এবং প্রকাণ্ড অঙ্গন চতুর্দ্দিকে ফটকসমন্বিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের গাত্রে বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বিচিত্র পৌরাণিক দৃশ্যাবলী শোভা পাইতেছে। স্থানটি নির্জ্জন ও অতি মনোরম। তবে সমস্ত বৎসর অযত্নে পড়িয়া থাকে বলিয়া অন্য সময়ে ইহা ধূলা, আবর্জ্জনা, আগাছা, চামচিকা ও কীট-পতঙ্গাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। ইহার বহির্ভাগে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

রথ পৌঁছিবার তিন দিন পরে লক্ষ্মীঠাকুরাণী বাহকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা বাড়ীর বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসা হয় নাই, এই অভিমানে গুণ্ডিচা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত জগন্নাথের রথের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমন করেন।

দশমীর দিন তিন ঠাকুর ও ঠাকুরাণী পুনরায় রথে চড়িয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আইসেন। ইতঃপূর্ব্বেই বহু যাত্রী পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং সে দিন রথ টানিবার লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে অল্পসংখ্যক যাত্রী উপস্থিত থাকে, তাহারা এবং কতকগুলি বেতনভোগী লোক রথগুলি টানিয়া মন্দিরে পৌঁছাইয়া দেয়।

পুনর্যাত্রা।

ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তখনও লক্ষ্মীঠাকুরাণীর অভিমান প্রশমিত হয় নাই। তাঁহার আদেশে ঠাকুর আসিবার পূর্ব্বে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহা হউক, অনেক সাধ্য-সাধনার পর মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং ঠাকুররা মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করেন।

এইরূপে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে পুরীর প্রধান উৎসব "রথযাত্রা" সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসের উৎসব "ঝুলন-যাত্রা।" শুক্লা নবমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে মন্দিরমধ্যে নিত্য পূজা, এবং ভোগাদি নৃত্যগীতের সহিত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঝুলন-যাত্রা।

ভাদ্র মাসে "জন্ম-যাত্রা" বা জন্মাষ্টমী উৎসব। কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হইতে সাত দিন ঠাকুরকে "গোপাল-বেশ", "রাখাল-বেশ", "বন-বেশ" প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্রবেশে সজ্জিত করিয়া ভক্তগণের মনে গোকুলে সখাসঙ্গে ভগবানের গোচারণ-লীলার ভাব উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়। পূতনা-বধ,

জন্ম যাত্রা।

গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বাল্যলীলার অভিনয় যাত্রার আকারে এই কয় দিন প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আশ্বিন মাসের উৎসবের নাম "বিজয়-যাত্রা" বা "দুর্গা-মাধব-যাত্রা।" পুরীতে ইহা বাঙ্গালার শারদীয়া মহাপূজার সমকালিক শক্তিপূজা। এই উৎসব উপলক্ষে ষোল দিন ব্যাপিয়া মহাড়ম্বরের সহিত "বিমলা" দেবীর পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরী পুরাণোক্ত বাহান্ন পীঠের অন্যতম। এই স্থানে দেবীর নাভিখণ্ড পতিত হইয়াছিল। দেবীপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিমলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে মেষ বলি প্রদান করা হয়। জগন্নাথের মন্দিরে বলিদান নিষিদ্ধ, অথচ বিমলা শক্তির মূর্ত্তি বলিয়া বলিদান ব্যতীত তাঁহার পূজা সম্পন্ন হইলে উহা অঙ্গহীন হয়। এই দুই বিরোধী ব্যাপারের সামঞ্জস্যহেতু ভক্তরা মনে করিয়া লয়েন যে, এই তিন দিন জগন্নাথদেব ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, সুতরাং বলিদানের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছায় না। এই তিন দিন বিমলা দেবীকে মৎস্যভোগ নিবেদন করা হয়।

দুর্গামাধব-যাত্রা।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম উৎসবটি বাৎসল্য রসের পরিচায়ক। এই সময়ে ঠাকুর, মাতা যশোদার আদরে অবস্থান করেন এবং বিবিধ প্রকারের বাল্য-ভোগ সেবারূপে গ্রহণ করিয়া জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। যদি রাসপূর্ণিমা এই মাসে পড়ে, তাহা হইলে ধুমধামের সহিত এই মাসেই রাসলীলা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকোৎসব।

কার্ত্তিক মাসে রাস-যাত্রা না হইলে অগ্রহায়ণ মাসে উহা আড়ম্বরের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই এই মাসের প্রধান উৎসব।

রাসলীলা।

কার্ত্তিক মাসের উৎসবে যেমন যশোদার অধিকার, পৌষের উৎসবে সেইরূপ লক্ষ্মীঠাকুরাণীর একাধিপত্য। এই মাসে ঠাকুর লক্ষ্মীদেবীর আদর-আপ্যায়ন উপভোগ করিয়া থাকেন। প্রভাতসময়ে বেলা সাতটার মধ্যে ঠাকুরের "পহলীভোগ" সম্পন্ন হয় এবং রাত্রিতে তিনি "বরশৃঙ্গার বেশ" ধারণ করিয়া দেব-দাসীগণ কর্ত্তৃক গীত শ্রীজয়দেবের পদাবলী শ্রবণ করেন।

পৌষের উৎসব।

মাঘ মাসে ঠাকুরের "পদ্মবেশ।" শ্রীপঞ্চমীর দিনে বিগ্রহত্রয়কে অসংখ্য পদ্মফুল দিয়া সুন্দররূপে সাজান হইয়া থাকে। মাঘী পূর্ণিমার দিন ঠাকুর "গজোদ্ধারণ-বেশ" ধারণ করেন। স্বর্ণ, মণি, মুক্তা ও হীরকখচিত বিবিধ বিচিত্র অলঙ্কার পরাইয়া জগন্নাথদেবকে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী মোহনবেশে সজ্জিত করা হয়। এই বেশের আর একটি নাম "আর্ত্তত্রাণ বেশ।" ইহা দর্শন করিবার জন্য ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। সেই সময় পুরীর উৎসব দর্শনীয় এবং উপভোগ্য।

পদ্ম-বেশ ও গজোদ্ধারণ-বেশ।

"ফাল্গুন মাসে দোল-যাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।" এই মাসে দোল-পূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুরের প্রতিনিধি "মদনমোহন"কে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত উচ্চ দোল-মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দোল দেওয়া হয় এবং ঠাকুরের সহিত আবির খেলার ধুম পড়িয়া যায়। এই উৎসবোপলক্ষে বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী যাত্রীর সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।

দোল-যাত্রা।

চৈত্র মাসে "রামনবমী" উপলক্ষে বিমলা দেবীর পূজা হয়। ইহা শক্তিপূজা এবং আমাদের দেশের বাসন্তীপূজার অনুরূপ। বাঙ্গালার শক্তিপূজার বৈশিষ্ট্য এই অনুষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামনবমী-যাত্রা।

উপরি-উক্ত প্রধান উৎসবগুলি ব্যতীত প্রতি মাসেই দুই একটি ক্ষুদ্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি যে বলিয়াছিলাম, পুরীতে পার্ব্বণের সংখ্যা বার মাসে ১৩র অধিক, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

পুরীতে বিভিন্ন হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিস্তর মঠ অবস্থিত রহিয়াছে। অধিকাংশ মঠভবনই অতি সুপ্রশস্ত, বহু গৃহ ও চত্বর-সমন্বিত এবং বহু লোকের বাসের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। কয়েকটি প্রধান মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

পুরীর মঠ।

অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের মঠের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মঠই প্রাচীন। ইহার অপর নাম "গোবর্দ্ধন মঠ।" এইরূপ কথিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এই মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মঠে তাঁহার এক অতি সুন্দর শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত,

শঙ্করাচার্য্যের মঠ।

প্রতিভা ও তেজোমণ্ডিত, আসনপরিগ্রাহী সৌম্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীমন্দির হইতে স্বর্গদ্বারের পথ সমুদ্র-উপকূলে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, সেই অতি মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত। বাহির হইতে মঠের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভিতরে প্রবেশ করিলে মঠটি অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের মধ্যে প্রোথিত বলিয়া মনে হয়। খরচ-খরচা বাদ দিয়া মঠের আয় বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার টাকা। এই স্থানে "গোপালের" একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাতঃকালে "গোপাল"কে যে অন্নভোগ দেওয়া হয়, ছাত্রমণ্ডলী ও অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবার জন্য তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মঠ হইতে প্রতিদিন চাউল, দাল, তরকারী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী কাঁচা অবস্থায়

পুরীর স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতট।

জগন্নাথের ভোগের জন্য শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীমন্দির হইতে অপরাহ্নে জগন্নাথের অন্নভোগ প্রেরিত হয় এবং তাহার দ্বারাই মঠাধিবাসিগণের রাত্রির সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগের নিকট হইতে কিছু লওয়া হয় না। এই মঠে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের ছাত্র গৃহীত হয় না।

এই মঠের অধিস্বামী এক জন সন্ন্যাসী। আমি যখন এই মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন সন্ন্যাসী শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী এই মঠের অধিনায়ক ছিলেন। তখন প্রায় বিশ বৎসর তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মীরট প্রদেশবাসী, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি এক জন সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ও সদালাপী। মঠের মধ্যে একটি পুস্তকাগার দেখিলাম, তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রায় ২০ জন ছাত্র মঠে নিয়ত অধ্যয়নকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ছাত্রদিগের মধ্যে উড়িষ্যাবাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। বেদান্ত, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই মঠে যথারীতি অধীত হইয়া থাকে। ছাত্রদিগের যাবতীয় ব্যয়ভার মঠই বহন করিয়া থাকে। ভূসম্পত্তি হইতে

চৈতন্য মঠ এবং পশ্চাদ্বর্ণিত দুই একটি মঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইহাদিগের মোহান্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব। এই

চৈতন্য বা রাধাকান্ত মঠ।

মঠ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক উড়িষ্যাবাসী ভক্ত রাধাকান্ত মিশ্রের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা "সিদ্ধ বকুলের" সান্নিধ্যে অবস্থিত। চৈতন্যদেব পুরীতে আগমন করিয়া এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার কন্থা, কাষ্ঠপাদুকা ও কমণ্ডলু অতি যত্নের সহিত এই মঠে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মঠে "গোপাল"-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মহাপ্রভুর লীলা ও

সংকীর্ত্তনের কতিপয় তৈলচিত্র এই মঠস্থিত গৃহগুলির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

টোটা গোপীনাথের মঠ।

ইহাও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঠ। পশ্চাদ্বর্ণিত "হরিদাসের মঠ" এই মঠের অধীন। এই মঠে "গোপীনাথের" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে একগাছি স্বর্ণনির্ম্মিত বলয় সংলগ্ন আছে। প্রবাদ এই যে, চৈতন্যদেব দেবদেহের এই বলয়-চিহ্নিত স্থানে সশরীরে প্রবেশ করিয়া তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর মতে তিনি মহোদধির নীলাম্বুরাশির মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর এই মঠের সেবার জন্য নিজ হইতে বাৎসরিক প্রায় ৮০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হরিদাসের মঠ।

হরিদাসের মঠ একটি সমাধি। ইহা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী 'স্বর্গদ্বারের' নিকট অবস্থিত। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান। এই স্থানে হরিভক্তচূড়ামণি যবন হরিদাসের নশ্বরদেহ সমাধিস্থ রহিয়াছে। এই মঠের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রতিদিন এই সকল মূর্ত্তির যথারীতি পূজা, ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে এবং সেই ভোগ দ্বারা সাধু-বৈষ্ণবগণের সেবা সম্পন্ন হয়।

জগন্নাথবল্লভ মঠ।

ইহা রামানন্দ-সম্প্রদায়ের মঠ। দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়শিষ্য রামানন্দ এই মঠ স্থাপন করেন। যখন মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিতেছিলেন, তখন রামানন্দ এই স্থানে বাস করিয়া প্রভুর সহিত সর্ব্বদা মিলিত হইতেন। কথিত আছে যে, রামানন্দই শ্রীমন্দিরের মধ্যে দেব-দাসী কর্তৃক নৃত্য-গীতের প্রবর্ত্তন করেন। এই মঠের বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এই মঠ পরিচালনের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত আছে। ইহা জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-সম্পত্তিভুক্ত। এই মঠের অধিবাসিগণের জন্য প্রত্যহ শ্রীমন্দির হইতে ভোগ প্রেরিত হয়।

রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠগুলির মধ্যে এমার মঠ ও রামদাসের মঠ, এই দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমার মঠ।

এমার মঠ শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। এই মঠে বিবিধ আহার্য্য সামগ্রী এত প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত থাকে যে, পুরীতে বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও ইহার মধ্যে সঞ্চিত খাদ্য হইতে প্রত্যেক অধিবাসীর অন্নের ব্যবস্থা হইতে পারে। আমি যখন পুরীতে গমন করিয়াছিলাম, তখন এই মঠের মোহান্ত আত্মীয়-স্বজনবর্গের সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোহান্তগণের উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিষয়সুখভোগে বঞ্চিত থাকেন না। তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের নিকট আত্মীয় কোন ব্যক্তি তাঁহাদের গদি অধিকার করিয়া থাকেন। এই মঠে টাকা ধার দিবারও ব্যবস্থা আছে। শুনিলাম, প্রতি টাকায় এক আনা সুদে টাকা ধার দেওয়া হয় এবং আদায় সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত। মঠের সম্পত্তির আয় বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা। মঠে প্রত্যহ প্রায় এক শত দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রাতঃকালে এই মঠের মধ্যেই যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; বৈকালে শ্রীমন্দির হইতে ভোগ আসিবার ব্যবস্থা আছে। মঠে এক জন পণ্ডিত এবং তাঁহার কয়েকজন ছাত্রকে অবস্থান করিতে দেখিলাম। অবশ্য তাঁহাদের যাবতীয় খরচ মঠের আয় হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মোহান্তের সাজসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে বিষয়ী লোক বলিয়াই মনে হইল। ভোগবিলাসের উপকরণ যে নাই, এমন মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। মঠের গদি তাঁহারই সম্পর্কীয় লোকের অধিকারভুক্ত।

রামদাসের মঠ।

ইহাও রামানুজ সম্প্রদায়ের অধীন একটি সুবৃহৎ মঠ। এই মঠের তদানীন্তন মোহান্তের সহিত আলাপ করিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তখন চল্লিশের অধিক নহে। তিনি অতি সজ্জন, পণ্ডিত ও সদালাপী। এই মঠের মধ্যে দশ অবতারের বৃহৎ চিত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিলাম। চিত্রগুলি দর্শনীয় এবং মনের মধ্যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে। এই চিত্রে নবম অবতারের বুদ্ধদেব জগন্নাথরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, দশাবতারের চিত্রে জগন্নাথদেবকে হস্তপদবিশিষ্ট করা হইয়াছে।

গীতায় বর্ণিত ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি এই মঠের একটি গৃহের প্রাচীরে চিত্রিত থাকিতে দেখিলাম। বিরাট মূর্ত্তির বহুসংখ্যক মস্তক এবং ঐগুলি বিবিধ প্রাণীর মস্তকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যস্থলে একটি সিংহের বৃহৎ মুণ্ড অবস্থিত এবং দুই পার্শ্বে ব্যাঘ্র, বরাহ, ঘোটক, মহাবীর (হনুমান) প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণীর মুণ্ড বিরাজ করিতেছে। তদুপরি মনুষ্য, বানর, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীর মস্তক বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত হইয়া বিরাটমূর্ত্তির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিরাট পুরুষের নাভিকূপে ব্রহ্মা এবং তদূর্দ্ধে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। চিত্রে কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত অর্জ্জুনের রথ এবং তৎসন্নিকটে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম যে, একটি মূর্ত্তি রামানুজের এবং অপরটি তাঁহার এক জন ভাষ্যকারের। অনেকে অনুমান করেন যে, এই দুইটি মূর্ত্তি রামানুজের কোন শিষ্য দ্বারা পরে চিত্রমধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই বহুহস্তবিশিষ্ট এবং হস্তসমূহে বিবিধ সামগ্রী ধৃত।

এখানে পঞ্চমুণ্ড এবং দশহস্তবিশিষ্ট এক নূতন গণেশ-মূর্ত্তির চিত্র দেখিলাম। ইহা ব্যতীত একশীর্ষ ও দুই হস্ত-বিশিষ্ট সাধারণ গণেশের মূর্ত্তি ও চিত্র বিস্তর রহিয়াছে।

দক্ষিণপার্শ্ব ও উত্তরপার্শ্ব শ্রীরাম মঠ।

এই দুইটি মঠের ব্যবস্থা এমার মঠের ন্যায়, তবে পরিসরে ও ঐশ্বর্য্যে উহা অপেক্ষা ছোট। দক্ষিণপার্শ্ব শ্রীরাম মঠের বাৎসরিক আয় প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

উপরি-উক্ত কয়েকটি মঠ ব্যতীত "গঙ্গামাতার মঠ," "বেঙ্কটাচার্য্য মঠ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি মঠ রামানুজ-সম্প্রদায়ের অধীন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা "জটে বাবাজীর" মঠ।

এই মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরমভক্ত স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধিমন্দির। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরতীরে ইহা অবস্থিত। গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈতাচার্য্যবংশের সন্তান। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রচারকরূপে এক-নিষ্ঠভাবে বহুদিন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলধর্ম্ম পুনরায় গ্রহণ করেন এবং বহুশিষ্যসমন্বিত হইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তপ, জপ, আরাধনা ও হরিনামকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি শিষ্যপরিবৃত হইয়া বহুদিন পুরীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক জটাবৃত এবং মুখমণ্ডল ঘনদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুতে আবৃত ছিল। এই জন্য তিনি পুরীর লোকের নিকট 'জটে বাবাজী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি পুরীতেই ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার পুত্র পরলোকগত যোগজীবন গোস্বামী কর্ত্তৃক নরেন্দ্র সরোবরের তীরে এই সমাধি স্থাপিত হয়। যোগজীবন পিতৃ-আজ্ঞানুসারে দেহ দাহ না করিয়া এই স্থানে সমাধিস্থ করেন। ক্রমে উহার চতুষ্পার্শ্বের জমী ক্রয় করিয়া এই মঠ প্রস্তুত হইয়াছে। এখন মঠের ভূমির পরিমাণ প্রায় তিন একার (Acre)। প্রথমতঃ এই জমীর উপর কয়েকখানি খড়ের চালের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে কলিকাতার ধাত্রী শ্রীমতী বদনমণির অর্থ-সাহায্যে টালির ঘর প্রস্তুত করা হয়। যোগজীবন গোস্বামীর দেহরক্ষার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বদান্যতায় বর্ত্তমান সৌষ্ঠবসম্পন্ন পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মন্দিরটি পঞ্চচূড়াসম্পন্ন। ইহার সম্মুখস্থ ও সংলগ্ন জগমোহন (দালান) প্রশস্ত ও মর্ম্মরপ্রস্তরখচিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাণ্ডাগণ গোস্বামী মহাশয়কে জগন্নাথ দেবের একটি কুণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও বাঁধাইয়া এই মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। সমাধি-পীঠ তাঁহার নামাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই স্থানে নিত্য পূজা, আরতি ও ভোগ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভোগের প্রসাদ অতিথি, অভ্যাগত ও শিষ্যবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। মন্দিরটি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার তিনটি ফটক আছে। মঠ-সংলগ্ন উদ্যানে ফুল ও বিবিধ ফলের গাছ ব্যতীত চারিটি ভূর্জ্জপত্রের গাছ আছে। শ্রীব্রজেন্দ্র দাস মন্দিরমধ্যে একটি কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন; ঐ কূপের জল এই স্থানে পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের পাঠ্য পুস্তক এবং তাঁহার বসনাদি সমস্তই অতি যত্নে এই মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠের ভূতপূর্ব্ব সেবায়েত শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থসংগ্রহ দ্বারা এই মঠের যথেষ্ট

উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় এই মঠে একটি লাইব্রেরী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর এই মঠে গোস্বামী মহাশয়ের তিরোভাব-তিথিতে মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রায় দুই সহস্র দরিদ্রনারায়ণ, ১৫ শত ব্রাহ্মণ ও ৩ শত ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ এই দিন মঠে সেবা গ্রহণ করেন। ঐই উপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায় এবং সাধু-সন্ন্যাসিগণকে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। শ্রীকুলদা ব্রহ্মচারী এই মঠের বর্ত্তমান সেবায়েৎ। এই স্থানে তাঁহার একটি বাড়ী আছে, তাহাকে "ঠাকুরবাড়ী" বলে।

এই মঠ সাধন-ভজনের উপযুক্ত স্থান। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এই মঠে যাইয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীচুণিলাল বসু।

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার

ইনি দীর্ঘকাল সরকারী হিসাব-বিভাগে উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিদায় লইলেন।

বিদ্রোহী এসিয়া

জার্ম্মাণ যুদ্ধের বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে লর্ড কার্জ্জনের শাসনের সমালোচনা করিতে যাইয়া লোভাট ফ্রেজার বলিয়াছিলেন, প্রতীচ্য জাতিরা যেরূপ দারুণ অবজ্ঞা সহকারে অন্যান্য জাতির কালক্রমাগত অধিকারাদি উপেক্ষা করে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। আমেরিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতীচ্য জাতিরা যে সকল দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সে সকল দেশে বিস্তৃত ভূভাগে অধিবাসিসংখ্যা অতি অল্প ছিল। আফ্রিকায় তাহারা যে জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের উন্নতি বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া বিকসিত হইতে পায় নাই। এসিয়ার অবস্থা অন্যরূপ। তথায় প্রতীচ্য জাতিরা যে সব জাতির সম্মুখীন হইয়াছিল—তাহারা অতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রতীচী অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। প্রাচীতে শ্বেতাঙ্গদিগের আবির্ভাব মোটের উপর এসিয়ার পক্ষে হিতকর হইলেও তাহাদের আবির্ভাবে অনেক ক্ষেত্রে যে লুণ্ঠন হইয়াছে, এসিয়া যদি তাহার তীব্র প্রতিশোধ লয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

লর্ড কার্জ্জন

লর্ড কার্জ্জনের পর ভারতের শাসনভার লইয়া লর্ড মিণ্টো আসিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সমগ্র প্রাচীর উপর দিয়া নবজাগরণের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল—তাহাতে অনেক পুরাতন ভাবাদি ভাসিয়া যাইতেছিল—আর সেই তরঙ্গচূড়ায় নূতন ভাব আসিতেছিল।

তাহার পর পৃথিবীর ইতিহাস নূতন করিয়া গঠন করিবার জন্য ও পৃথিবীর মানচিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত করিবার জন্য জার্ম্মাণীর জগজ্জয়বাসনা কৈশর দ্বিতীয় উইলিয়মে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের মত সমগ্র পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল। সে যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল য়ুরোপ। কিন্তু এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা কোন মহাদেশই তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। এই যুদ্ধে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগ যেরূপে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যেরূপে পরস্পরের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই যুদ্ধে আমেরিকা য়ুরোপে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু এই যুদ্ধেই য়ুরোপের সঙ্গে আমেরিকার যে সদ্ভাবের অভাব ঘটিয়াছে, তাহা যেমন অতর্কিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত। এই যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে ও এসিয়ায় যে সম্বন্ধবিপর্য্যয় হইয়াছে, তাহা আরও বিস্ময়কর।

ফরাসী অধ্যাপক ফেরেরো এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যখন কোন সাম্রাজ্য বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করে, তখন সে তাহার প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে অধিক ভীতির ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে, কিন্তু এবার তাহা হয় নাই—

(১) যুদ্ধবিরতির অত্যল্পকাল পরেই আফগানিস্থানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব উদ্ভূত হয় এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহাতে ইংরাজকে আফগানিস্থানে প্রভুত্বাধিকার ত্যাগ করিতে হয় এবং তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয়। এখন আফগানিস্থান ভারতের পথে যথেচ্ছ যুদ্ধোপকরণ আমদানী করিতে পারে।

(২) জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ শান্ত ছিল এবং ইংলণ্ডকে সাহায্য করিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে তথায় যে জাতীয় আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে, সামান্য অধিকারদানে বা দলননীতিতে তাহার গতিরোধ করা যাইতেছে না।

কৈশর দ্বিতীয় উইলিয়ম

জগলুল পাশা

(৩) অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও চীন তাহার অখণ্ড সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব দাবি করিয়াছে এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে ও জাপানকে প্রদত্ত কতকগুলি অধিকার নিজ ক্ষমতায় বাতিলও করিয়া দিয়াছে।

(৪) ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড পারস্যের উপর একরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল এবং সে সন্ধির সর্ত্তানুসারে পারস্যের শাসনপ্রণালীর ও সেনাদলের ব্যবস্থা ইংরাজের অধীন হইয়াছিল, তাহাতে য়ুরোপে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ঈর্ষ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। পারস্য তখন নিরস্ত্র ও রুসিয়ার সাহায্যে বঞ্চিত হওয়ায় সে সন্ধিসর্ত্তপ্রয়োগ অনিবার্য্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু আর তাহা প্রযুক্ত হইতেছে না।

(৫) রাজনীতিক হিসাবে মিশরের সম্বন্ধ আফ্রিকা অপেক্ষা এসিয়ার সহিতই ঘনিষ্ঠ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইংলণ্ড তথায় আপনাকে রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় মিশর সেই ব্যবস্থা সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর জগলুল পাশা প্রভৃতির নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলন আরব্ধ হয়, তাহার ফলে ইংলণ্ড অনেক বিষয়ে মিশরের অধিকার স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে।

(৬) মেসোপোটেমিয়া আর শান্ত নহে। ইংরাজ কর্তৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত রাজা ফৈজুলের ও ইংরাজের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে তুর্কীর বিরুদ্ধে এবং পরোক্ষভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করিবার জন্য ইংরাজ যে আরব রাজ্য গঠিত করিয়াছিল, তাহাকে বিশ্বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র দেশীয় লোকদিগের য়ুরোপীয় প্রাধান্যে বিরক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

(৭) তুর্কীর ব্যাপার বিস্ময়কর। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মনে হইয়াছিল, তুর্কীর প্রাধান্য শেষ হইয়াছে। সেভরের সন্ধিতে অটমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের রাজনীতিক ও সামরিক ক্ষমতা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। আজ তুর্কী কামালের নেতৃত্বে পূর্ব্বাপেক্ষাও বলশালী হইয়াছে। খিলাফতের য়ুরোপীয়বিদ্বেষ ও খৃষ্টানঘৃণা বুঝি কখনও এত প্রবল হয় নাই।

এক কথায় এসিয়া যখন য়ুরোপীয় ভাবের অনুবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তখনই সে য়ুরোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। এসিয়াবাসীরা য়ুরোপের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় ও আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ও মত প্রযুক্ত করিতেছে। মিশরীরা রাষ্ট্রপতি উইলসনের মতের প্রতিধ্বনি করিতেছে। তুর্কীর নূতন খালিফ জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেছেন। চীনে ফরাসী গণতন্ত্রের আদর্শে গঠিত গণতন্ত্র য়ুরোপীয়দিগকে চীন ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিতেছে।

রাজা ফৈজুল

এই সব ঘটনার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ফেরেরো জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেন এমন হইল? তিনি বলেন, প্রাচীতে বিশাল রুস-সাম্রাজ্য যে দলিত লুণ্ঠিত, তাহা ভুলিয়া কায করিয়াই য়ুরোপের আজ এই দুর্দ্দশা। প্রতীচ্যে মিত্রশক্তিরা—ইটালী, ফ্রান্স,

ইংলণ্ড ও আমেরিকা—অষ্ট্রিয়াকে ও জার্ম্মাণীকে বিনষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণী রুসিয়াকে বিনষ্ট করিয়া গিয়াছে, তাহাই এ অবস্থার নিদান। রুসিয়ার ধ্বংসে প্রাচীতে প্রতীচ্য জাতিসমূহের সম্ভ্রম বিলুপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জাপান-যুদ্ধে যাহার আরম্ভ, জার্ম্মাণ-যুদ্ধে তাহার শেষ। ১৯১৪

কামাল পাশা

যত দিন বিপুলকায় দানবের মত রুসিয়া এসিয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তত দিন তুর্কীতে, পারস্যে, আফগানিস্থানে, ভারতে, চীনে, জাপানে এক দল ইংরাজের অধিকার-বিস্তারে সহায় হইয়াছিল। দুই বিপদের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত অল্প, সেইটিই স্বীকার্য্য। সব ব্যাপারেই রুসিয়ার সম্বন্ধ ছিল। যখন

খৃষ্টাব্দে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষে জর্জ্জরিত হইলেও য়ুরোপের যে একতা ছিল, তাহাতেই তাহার অসীম বল ছিল। এসিয়ায় ইংলণ্ডে ও রুসিয়ায় প্রতিযোগিতা ছিল। ইংরাজের, ফরাসীর, জার্ম্মাণের, রুসিয়ার প্রভাব পরস্পরবিরোধী হইলেও তাহাতেই পরস্পরের শক্তি ছিল। আজ তাহা আর নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কনষ্টাণ্টিনোপলে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের অমিত ক্ষমতার কারণ তুর্কীর রুসিয়াভীতি। তাহার পর তথায় জার্ম্মাণীর প্রভাব বর্দ্ধিত হইবার কারণ রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের সন্ধিস্থাপন ও ইংলণ্ডের মিশর অধিকার। জাপান কি জন্য ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়াছিল? রুসিয়ার ভয়ে। চীন কেন সুদূর ইংলণ্ডকে ও ফ্রান্সকে নানা অধিকার দিয়াছিল? রুসিয়া তাহাকে পদানত করিবার চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া।

রুসিয়ার সর্ব্বনাশ হইল তখন সে বিপদের সম্ভাবনা আর রহিল না। অধিকন্তু রুসিয়া যেন ঘটোৎকচের মত প্রাচীতে য়ুরোপের সম্ভ্রম চাপিয়া পড়িল। জাপানে ইংলণ্ডে মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হইল; আফগানিস্থান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়াসী হইল; ভারতে ও চীনে মুক্তিকামনা প্রোজ্জ্বল হইল; পারস্যে আর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত্ত প্রয়োগ করা সম্ভব হইল না; এঙ্গোরার সরকার তুর্কীতে নূতন সেনাবল গড়িয়া তুলিতে পারিল, রুসিয়ার শক্তিলোপে সেভরের সন্ধি চোথা কাগজ হইয়া পড়িল। রুসিয়ার জারের সেনাবল থাকিলে এঙ্গোরার সরকার যে কল্পনাতীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা সংসাধনের সময় বা সুবিধা পাইত না।

অধ্যাপক ফেরেরো তাঁহার অনুসন্ধানফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এসিয়ার স্বাধীনতাকামনা আজ যে

কনষ্টাণ্টিনোপল
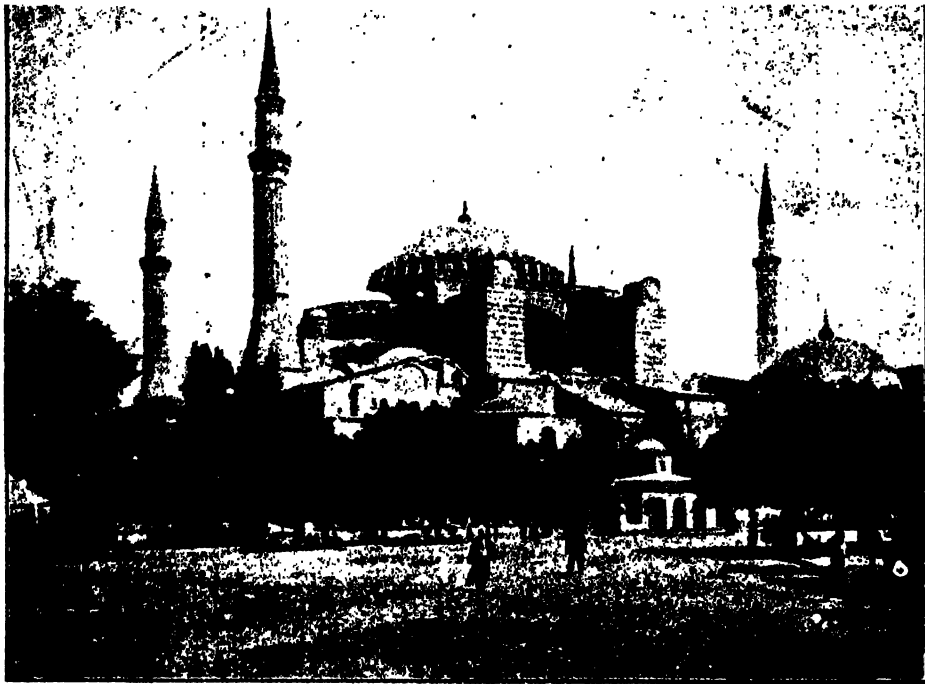
পুনরুদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ য়ুরোপের প্রতি ঘৃণা। যাঁহারা য়ুরোপকে ভালরূপ জানেন, এমন অনেক এশিয়াবাসী য়ুরোপীয়দিগকে বর্ব্বর নামে অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কু-হুং-মিংও সেই মত প্রচার করেন। তিনি য়ুরোপে শিক্ষিত। তিনি বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার যদি উদ্ধারসাধন করিতে হয়, তবে য়ুরোপে নৈতিক ভিত্তির উপর অধিকার ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। চীন ব্যতীত আর কুত্রাপি য়ুরোপ সে আদর্শ লাভ করিতে পারিবে না। খৃষ্টধর্ম্ম ব্যক্তির নৈতিক পূর্ণ পরিণতিসাধনের চেষ্টা করে—কনফিউসিয়শের ধর্ম্মমত উৎকৃষ্ট মানুষ গড়িয়াই নিরস্ত হয় না, পরন্তু সমাজের হিসাবেও তাহার উৎকর্ষসাধন করে। ইহার মূল মন্ত্র—"ক্ষমতার নৈতিক মূল্য।" এই মতেই য়ুরোপের উদ্ধার সাধিত হইতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই বিষয়ই য়ুরোপের আলোচ্য হইয়াছিল। কিন্তু য়ুরোপ ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই এবং মীমাংসার প্রাক্কালে য়ুরোপ ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়াছিল। য়ুরোপ মনে করিয়াছিল, তাহাতেই সে তাহার ঈপ্সিত পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ এশিয়াবাসীরা তাহার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বিভীষিকা, পুণ্যের সঙ্গে পাপ ও উন্নতির সঙ্গে ত্রুটি লক্ষ্য করিতেছে।

আজ এশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে। এশিয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে কি জটিল সমস্যারই সমাধান হইবে! গত কয় শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপ দেবতা বলিয়া—দেবতাভ্রমে এক উপদেবতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ক্ষমতা অসাধারণ, কিন্তু সে সেই ক্ষমতার স্বরূপ না প্রয়োগপ্রণালী জানে না। য়ুরোপ তাহাকে পূজা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সে সংহারের আনন্দে জগৎ সন্ত্রাসিত করিতেছে। কে তাহার মুদিত চক্ষু উন্মীলিত করাইবে? কে তাহাকে সংযম শিখাইবে? সে উপায় য়ুরোপ কি এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সন্ধান করিলে পাইবে? এশিয়া যদি তাহার প্রাচীন সভ্যতার সার সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, অস্ত্রশস্ত্রে অভ্যস্ত হয়—তবে সে অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের উদ্ভব করিতে

পারিবে। সেই সার সত্যের জন্যই তাহার সভ্যতা কালজয়ী হইয়াছে।

এসিয়ার ভাবপরিবর্ত্তনেরও কারণ আছে। ফ্রেডিয়া হাট বলিয়াছেন—"শ্বেতাঙ্গদিগের সভ্যতাবিস্তারের ইতিহাসে অনেক কদর্য্য ব্যাপার আছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়, লাভ, লোভ ও লুণ্ঠন অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। তবে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক ও কর্ম্মচারীরা সঙ্গীনধারীদিগের কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আজ প্রাচীর জনগণের মনে তাই শ্বেতাঙ্গদিগের সম্বন্ধে নূতন ভাবের উদ্ভব হইয়াছে।"

আমাদের বিশ্বাস, রুসিয়ার পতনই এসিয়ার এই বিদ্রোহের একমাত্র কারণ নহে। য়ুরোপের ঔদ্ধত্য, য়ুরোপের ঐহিক-সর্ব্বস্বতা, এসিয়ার প্রতি য়ুরোপের অনাচার—এই সকলের অবশ্যম্ভাবী ফলেও এসিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। অর্থগৃধ্নু, ক্ষমতা-গর্ব্বিত, উদ্ধত য়ুরোপীয় জাতিসমূহ মনে করিয়াছে, তাহারাই জগতের সর্ব্বের অধিকারী—জগতের প্রভুত্বে তাহাদের অধিকার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। ইহাতে এসিয়ার আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং এসিয়ার অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপানের জয় বুঝাইয়া দেয় যে, বাহুবল সম্বন্ধেও য়ুরোপের আত্মশক্তিতে অতিপ্রত্যয় ভ্রমাত্মক। কিন্তু তখনও য়ুরোপ তাহা বুঝিতে পারে নাই। আর জাপান যে তখন প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন না করিয়া সর্ব্ববিষয়ে য়ুরোপের অনুকরণে আগ্রহশীল হইয়াছিল, তাহাতেও য়ুরোপের ভ্রম দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর এসিয়ায় দুঃখপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মহাত্মা গন্ধীর, তুর্কীতে কামালের ও মিশরে জগলুলের আবির্ভাব নবযুগসূচনা। তাই কামালের বিজয়ে এসিয়ায় আনন্দপ্লাবন। তাই ভারতে ও মিশরে মুক্তির চেষ্টা কিরূপ সাফল্যলাভ করে, সমগ্র এসিয়া উদ্গ্রীব হইয়া তাহা লক্ষ্য করিতেছে। আজ সমগ্র এসিয়ায় প্রবাহিত হইয়াছে—মুক্তির ও সাম্যের প্রবল প্রবাহ, গণতন্ত্রের ও জাতীয়তার স্নিগ্ধ সমীরণ, জাতীয় আত্ম-সম্মানের ও দেশাত্মবোধের অনুভূতি। আজ প্রাচীর এই ভাবপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক চাঞ্চল্যের ঘন মেঘমালা দেখা দিয়াছে আর জাতিবিদ্বেষের বিষবাষ্পে সে সকল পুষ্ট হইতেছে। বর্ষণের পূর্ব্বে সাবধান না হইলে প্রাচী ও প্রতীচী কাহারও মঙ্গল হইবে না। সে জন্য উভয়কেই সাবধান হইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুদ্ধে পরাভূত রুসিয়া আজ য়ুরোপে ও আমেরিকায় অবজ্ঞাত হইয়া প্রাচীর সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। জাপানের সঙ্গে তাহার এক দিন যুদ্ধ হইয়াছিল—আজ দুই দেশ একসঙ্গে প্রাচীর প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। রুসিয়া আজ সেই চেষ্টা করিতেছে। আর যে জার্ম্মাণী এক দিন পীতাতঙ্কে শঙ্কিত হইয়া চীনকে চূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, সেই জার্ম্মাণী রুসিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়াছে। 'এসিয়া' পত্রে আপটন কেলাজ দেখাইয়াছেন—সোভিয়েট বা বলসেভিকরা চীনকে তাহাদের পক্ষে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পূর্ব্ব-এসিয়াকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য জফ (Joffe) চীনে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

এ দিকে ইংরাজও বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ইংরাজ সিঙ্গাপুরে যে নৌসেনার ঘাঁটি করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? বিলাতের হাউস অব লর্ডসে ভাইকাউণ্ট গ্রে বলিয়াছেন—সুদূর-ভবিষ্যতে জাপানের সঙ্গে যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধ হয়, সেই জন্যই এই ঘাঁটি রচনা; সে যুদ্ধ জাতিগত সমর হইবে এবং তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকা এক পক্ষে যুদ্ধ করিবে।

এক দিকে ইংলণ্ডের এই কথা। আর এক দিকে সিঙ্গাপুরে ইংরাজের যুদ্ধজাহাজের ঘাঁটিতে জাপানের আপত্তি। জাপানের টোকিয়ো 'আশাহী' পত্র এ বিষয়ের আলোচনায় বলিতেছেন—

"জাপানের লোকসংখ্যা দেশের তুলনায় অধিক। তাই জাপানকে অতিরিক্ত অধিবাসীদিগের জন্য হয় বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে, নহে ত তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। বৃটেন ও আমেরিকা শেষোক্ত উপায়ের বিরোধী। তাহারা জাপানীদিগকে অন্য জাতির সহিত তুল্যাধিকার দিতে অসম্মত। স্বল্প সংখ্যক শ্বেতাঙ্গের জন্য ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া রাখিয়া দিতেছে, আবার মাঞ্চুরিয়ায় ও মঙ্গোলিয়ায় জাপানের বিস্তারে বিরক্ত! * * * এসিয়ার যে সকল দুর্ব্বল জাতি স্বায়ত্ত-শাসনে সুশাসিত হইতে পারে, তাহাদিগের সহিত জাপানের সহানুভূতি স্বাভাবিক। (য়ুরোপীয় ও মার্কিণ) জাতিসমূহ সকল

জফ—(দক্ষিণে)

জাতির তুল্যাধিকার স্বীকার করিতে অসম্মত, তাহাতে জাপান অসন্তুষ্ট হইয়াছে। * * যদি বৃটেন ও আমেরিকা স্বৈরাচারী হয়, তবে জাপান জার্ম্মাণী ও রুসিয়ার সহিত একযোগে সে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে বা চীনের সহিত যোগ দিতে পারে।"

জাপানের 'টাইমস এণ্ড মেল' পত্র বলিয়াছেন—জাপান সর্ব্বদেশে সকল জাতির তুল্যাধিকার চাহে—"She desires the elimination of recial discrimination in every country which censcience and human sense of jutstice and equity denounces to be against the law of God or Heavan."

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া অপসৃত হইতেছে; আর প্রাচীর বিগতাম্বু গগনে অম্লানোজ্জ্বল রবিকর দেখা দিতেছে।

প্রাচী হইতে এক দিন সভ্যতার আলোক প্রতীচীতে গিয়াছিল; আজ আবার প্রাচীর আকাশে নবসূর্য্যোদয় হইতেছে। ভারতবর্ষে সেই আলোকপাতে নূতন জীবনের চেতনা অনুভূত হইতেছে। আশা হইতেছে, রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জাপানের জয়ে যে দিবালোকবিকাশ সূচিত হইয়াছিল, তুর্কীর অভ্যুদয়ে তাহাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। সমগ্র প্রাচী আবার উন্নতির আলোকে প্রদীপ্ত হইবে। সেই আশা বুকে লইয়া ভারতবাসী আমরা জয়যাত্রার পাথেয়রূপে আমাদের জনকজননীজননী ভারতভূমির গৌরবস্মৃতি স্মরণ করি!

সিঙ্গাপুর

এসিয়াকে এই তুল্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া য়ুরোপ যে অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারই ফলে এসিয়ায় অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহারই ফলে এসিয়া আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার অধিকার সন্ধান করিতেছে। প্রাচী আজ তাহার আত্মার সন্ধান পাইয়াছে—মোহমুক্ত হইয়া সে তাহার দৌর্ব্বল্য ও জাড্য পরিহার করিয়া নূতন ভাবে উন্নতির পথে জয়যাত্রা করিয়াছে। প্রাচীর আকাশে এতদিন যে দুর্দ্দশার জলদজাল দিনকর-কিরণবিকাশপথ রোধ করিয়াছিল, আজ সে সকল

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে;
প্রথম সামরব তব তপোবনে।
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

যিনি জননীর জননী যাঁহার অঙ্কে কত সাধুর, কত বীরের, কত সাধকের, কত কবির, কত ত্যাগীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাকেই বন্দনা করিয়া আমরা আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হই।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর হাসির মা-দিদিমা নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, হাসি কিন্তু দিনের বেলা ঘুমায় না,—সে তাহার পাঠগৃহে এই শীত-বাদল দিনে গায়ে শাল চাপা দিয়া, কৌচে শুইয়া টেনিসনের Idylls of the King নামক কাব্যগ্রন্থখানার পাতা আনমনে উল্টাইয়া যাইতেছিল, আর প্রেমিকার স্থায় আগ্রহে রাজকুমারীর প্রতীক্ষায় বারবার দেয়ালের ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। 'গুড়ুম' করিয়া তোপ পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঘড়ীটিও ইংরাজ-সরস্বের প্রস্তাবে দেশীয় লোকের অনুমোদনস্বরূপ 'টুং' শব্দে সেই অভ্রান্ত কাল-নির্দেশ মানিয়া লইল।

হাসি বইখানা বন্ধ করিয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিল—"এখনো এলেন না ত তিনি? কখন্ যে আসবেন?"

অদূরে মোটরগাড়ীর ভেঁপু বাজিল—সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ-মন্থনকারী টায়ারচক্রের গুরুগম্ভীর নির্ঘোষও হইল। হাসি বইখানা হাতে লইয়াই গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল,—গাড়ীবারান্দা যে এই গৃহ হইতে দূরে নহে, তাহা পাঠক জানেন। মোটর কিন্তু কম্পাউণ্ডে না ঢুকিয়া রাস্তা দিয়াই চলিয়া গেল; হাসি তখন নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিল। পড়িতে কিন্তু তাহার আর মন লাগিল না। গৃহমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র টেবলের উপর বইখানা রাখিয়া সে নিকটের চৌকিতে আসিয়া বসিল। তাহার পর বহির প্রথম পাতাটা খুলিয়া রাজা আর্থারের ছবি দেখিতে লাগিল? দেখিতে দেখিতে সে বলিয়া উঠিল,—"অনেকটা একই রকম দেখতে,—দু'জনের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য্য রকম মিল। বিশেষ মুখের ভাবটুকু ত অবিকল যেন একই! ছবির চোখ দু'টিকে তাঁরই চোখ ব'লে মনে হচ্ছে! আমার দিকে চেয়ে যেন ইনি কি বলছেন; কি বলছেন, তা কিন্তু বুঝতে পারছিনে। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি! আশীর্ব্বাদ করছেন আমাকে।" হাসি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ছবিখানা দেখিয়া দেখিয়া আবার বলিয়া উঠিল,—"মঙ্গল-আশীর্ব্বাদে ভরা যেন এ চোখ দুটি! হায় রে, এ হেন দেবতুল্য স্বামীর মর্য্যাদা রাণী Guinevere বুঝতে পারলে না? কি দুর্ভাগ্য তার! তাঁর সাফাই বাক্য হচ্ছে,—মর্ত্ত্যের মানবী বলেই, স্বর্গের দুর্গ্যাতেজ তিনি সইতে পারেন নি।" বহুবার পড়া পাতাটা বাহির করিয়া হাসি আবার পড়িল;—

"But who can gaze upon the sun in heaven!
"He is all fault who hath no fault at all—
"For who loves me must have a
touch of earth—
"The low sun makes the colour—"

আর পড়িতে পারিল না; বইখানা মুড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"এমন রাগ ধরে!" তাহার পর টেবলের উপর কুনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া মনে মনে ভাবিল—"কথাটা কিন্তু ঠিকই—পাঁক ত স্বচ্ছ জলের সঙ্গে মিশ খায় না, হাজার মেশাও, নিজের ভারে নীচের দিকেই নেমে পড়ে। আর্থার সত্যই কি মহাপুরুষ! যে স্ত্রী এমন অবিশ্বাসিনী, পাপীয়সী, যে তাঁর জীবনের সমস্ত উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ, উচ্ছেদ ক'রে দিলে—তার জন্যও তাঁর কতখানি ব্যথা—কত মমতা! অধম স্বামীকেও যে স্ত্রী আঁকড়ে ধ'রে থাকে, তার অর্থ বোঝা যায়,—স্ত্রীর পক্ষে এরূপ ভালবাসা অনেকটা স্বাভাবিক; কেন না, স্ত্রী স্বামীর একান্ত অধীন, স্বামী ভর্ত্তা, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর গত্যন্তর নাই,—কিন্তু পুরুষের পক্ষে এরূপ মহত্ব একান্তই দেবদুর্ল্লভ খাঁটি মহত্ব; কল্পনাতেও এই উদার মহাপ্রেমিকের দর্শনলাভে প্রাণে মন্দাকিনীর আনন্দতরঙ্গ ছোটে!"

বইখানার সেই স্থানটা সে খুলিল। রাণীর কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তিনি পলাইয়া নান্‌দিগের ধর্ম্মগৃহে গোপনে আশ্রয় লইয়াছেন। রাজা তাঁহার সন্ধানে সেইখানে গিয়া পত্নীর সহিত অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কি মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! কি অনুরাগদীপ্ত ভাষা! অনেক কথাই তাহার কণ্ঠস্থ, তবু সে আবার পড়িল,—

Yet think not that I came to urge thy crimes,
I did not come to curse thee, Guinevere,
I, whose vast pity almost makes me die,
To see thee, laying there thy golden head,
My pride in happier summers, at my feet.

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

The pang—which while, weighed thy heart
　　　　　　　　　　　with one—
Too wholly true to dream in truth in thee,
Made my tears burn—is also past—in part.
And all is past, the sin is sinn'd, and I,
So I forgive thee, as Eternal God
Forgives *　　*　　*　I love thee still

*　　*　　*

Hereafter in that world where all are pure
We two may meet before high God and thou
Wilt spring to me, and claim me thine.

পড়িতে পড়িতে হাসির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল—সে বইখানা বন্ধ করিয়া অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল- "রাজা, এইটুকু কেন বুঝলেন না যে, পরলোকের অপেক্ষায় আর তাঁকে থাকতে হবে না,—যে মুহূর্ত্তে রাণী তার অনুতপ্ত হৃদয়ের অশ্রু নিবেদন ক'রে দিয়ে স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়েছেন—সেই মুহূর্ত্তে এই লোকেই রাজার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেছে! সেই পুণ্যমুহূর্ত্তে শাপমুক্ত অহল্যাদেবীরই ন্যায় রাণী পাপতাপমুক্ত হয়ে গভীর পবিত্র প্রেমেই স্বামি-বন্দনা করেছেন। আহা, এইটুকু রাজা যদি তখন বুঝতেন? কেন যে তা বুঝলেন না, আমার এমন দুঃখ হয়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দিনটা সকাল হইতে মেঘলা;—কিছু পূর্ব্বে অল্প একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তাহার পর সহসা চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ ম্লান আধফোটা একটুখানি রৌদ্র—জানালার মধ্য দিয়া ঘরখানা একবার চমকিত করিয়া তুলিয়া দুই চারি মিনিটের মধ্যেই আবার মেঘের কোলে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। হাসি উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, তাহার নয়নবর্ত্তী ধূসরবর্ণ আকাশখানার উপরে কালো মেঘের ঢেউগুলা একটার পর একটা ভাসিয়া চলিতেছে। টেনিসনের বিষাদভরা কাব্যগাথাই যেন তাহারা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। সেই অভিনয়-গীতি শুনিতে শুনিতে সে আপন মনে বলিয়া উঠিল—"রাণ ধরে—কিন্তু মায়াও করে। ল্যান্সিলটকে আগার ভেবে নিয়েই রাণী প্রথমে তাকে ভালবেসেছিল—

Sir Lancelot went ambassador at first
To fetch her, and she watched him
　　　　　　　　　　from her window,
And she took him for the King
So foiled her fancy for him."

রাণীর অন্যায় আচরণে হাসি নিজের প্রাণের মধ্যে যখনই তীব্র জ্বালা অনুভব করে, তখনই এই কথাগুলি আওড়াইয়া মনকে মার্জ্জনা-স্নিগ্ধ করিতে চাহে; কিন্তু তবুও তা ঠিক পারে কই?

"না হয় ল্যান্সিলেটকে রাণী রাজাই ভেবেছিলেন—না হয় ভুল ক'রে তাই ভালইবেসে ফেলেছিলেন তাকে,—কিন্তু এমনি কি ছাই সে ভালবাসা যে, বিয়ের পরেও সেজন্য স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসী হ'তে হবে? আমাদের দেশের মেয়ে হ'লে কখনই এমনতর হ'ত না; আমি নিজের মন থেকেই এটা ঠিক বুঝতে পারি। শরদাকে কি আমি ভালবাসতুম না, না এখনো বাসিনে? অবশ্য এটা যদিও উপন্যাসের মারাত্মক 'প্রেম' নয়—তাঁকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থও হয়ে যায়নি, আর চিরকুমারী ব্রতও আমি গ্রহণ করিনি; তা নাই হোক, তাঁ'র সঙ্গে বিয়ে হ'লে যে আমি সুখী হতুম—আর শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই সহজ বন্ধুত্বই যে দাম্পত্য-প্রেমে পরিণত হ'ত, এটা ত

বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তবুও ত আমি কর্ত্তব্য ভুলতে পারিনি। শরদাকে বিদায় দিতে আমার মনে তখন খুবই কষ্ট হয়েছিল—তবুও ত মায়ের অমত জেনে শরদার ঐকান্তিক প্রার্থনাও গ্রাহ্য করতে পারলুম না? ভালই হয়েছে,—ভালই করেছি! তখন যদি অত শত না ভেবে লজ্জা-সরম খুইয়ে ইংরাজ-মেয়ের মত গোঁ ধ'রে বসতুম যে, শরদাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না; ওগো, মা-বাবা, শরদার সঙ্গেই আমার বিয়ে দাও গো,—তা হ'লে আজ শরদার অবস্থাটাই বা কি রকম দাঁড়াত? এমন রাজকন্যা লাভ ত তাঁর অদৃষ্টে ঘটতো না! ভাগ্যিস—ভাগ্যিস! কিন্তু শরদা এখানে থাকলে বোধ হয়, এ কথাটা ঘুরিয়ে আমার উপরই ফেলতেন।"

গৃহটিকটিকিটা এই সময় টিক টিক করিয়া উঠিল। হাসি বলিল, "টিক টিক বল্লেই হ'ল কিনা অমনি ঠিক! রাজরাণী হই আগে, তখন সে কথা। আমি কিন্তু এখন একশবার বলব ভাগ্যিস—শরদা ভাগ্যিস্।"

শরৎকুমারের সৌভাগ্য ভাবিয়া তাহার মনঃপ্রাণ আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠিল। মেঘের চলাচল দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে সে ভাবিল—"ঔপন্যাসিকরা ব'লে থাকেন, প্রেম নাকি জীবনে একবারই জন্মায়, আর জন্মাবামাত্র—সমুদ্রবিছার মত তার শত দাঁড়া দিয়ে প্রাণটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন আঁকড়ে ধরে যে, প্রাণ যায়, তবুও প্রেম যায় না। আমার কিন্তু কথাটা ঠিক মনে লাগে না—আমার মনে হয়, দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধেই এ কথাটা ঠিক খাটে। স্বাতিনক্ষত্রের জলেই যেমন শুক্তিতে মুক্তার জন্ম—সেইরূপ বিবাহের—শুভদৃষ্টিপাতেই নরনারীর হৃদয়ে শুভ্র অটল প্রেমের প্রতিষ্ঠা। অন্ততঃ আমার ত এইরূপই ধারণা। তার আগে, ঐ মেঘগুলার মতই মানুষের প্রেম—তার জীবনপথে সঙ্গীর খোঁজে পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শরদা এতদিনে তাঁর মনের মানুষ পেয়েছেন,—আর আমি? আমি সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আছি।" সে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"'ওগো,—মনের মত সেই ত হবে—
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও?'

কবি ঠিক কথাই বলেছেন—এইটেই আসল সত্য!" হাসি পিয়ানোর নিকট আসিয়া তাহার ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিল, নিকটে দাঁড়াইয়াই একবার ঠুংঠাং করিল, তাহার পর বাজাইবার চৌপায়ার উপর বসিয়া অন্যমনে উদ্দেশ্যহীনভাবে সা রে গা মা সুরলহরীর উপর ধীরে ধীরে আঙ্গুল চালাইয়া দিল। হঠাৎ একটা বেসুরো সুর তাহার কানে খট করিয়া উঠিল—সে হাত গুটাইয়া লইল; হাসিতে হাসিতে ভাবিল,—"সে দিনও অন্যমনে এই রকম একটা বেয়াড়া বেসুরো ভুল ক'রে বসেছিলুম! Guinevere যেমন ল্যান্সিলটকে ভেবেছিলেন রাজা, আমিও তেমনি রাজার ছায়া-মূর্ত্তিকে ভেবেছিলুম অনাদি-দা।"

সে দিনকার দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে আলোকোজ্জ্বল কাননতলে সুগন্ধ-হিল্লোল ছুটিয়াছে, হ্রদবক্ষে মৃদুমনোহর কল্লোল তুলিয়া তরী ভাসিয়াছে—তাহারা দুই সখী তরীযাত্রী—হৃদয়ের লুক্কায়িত আবেগ খুলিয়া দিয়া তাহারা গান ধরিয়াছে,—নিজেদের সে প্রেমসঙ্গীতে নিজেরাই তন্ময়, মাতোয়ারা—মনঃপ্রাণহারা। সহসা কোন্ প্রেমিক পথিকের কর্ণে সেই সঙ্গীতধ্বনি পৌঁছিল, তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন! অণুভা বলিল, তিনি রাজপুত্র—কুমার অনাদি-দা।—

হাসির স্বপ্নমোহাবেশ চূড়ান্ত সীমায় উঠিল, সে নেশায় বিভোর হইল। কিন্তু পরদিন অনাদিকে দেখিবার আশায় দেখিল এ কাহাকে! ইনি ত তাহার কল্পনার প্রেমিক রাজপুত্র নহেন—ইনি যে দেবশ্রী মহাপুরুষ! স্বপ্নের মোহ স্বপ্নে লীন হইয়া গেল—শ্রদ্ধা-ভক্তিভরে এই দেবপুরুষের চরণে সে প্রণতা হইল।

তাহার পর এই স্বপ্নের কথা আবার এক দিন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—যে দিন সে প্রথম অনাদিকে প্রত্যক্ষ করিল।—কিন্তু স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেলে, স্বপ্নের কথা প্রায়ই হাসির বিষয় হইয়া পড়ে—হাসিও তখন সেই কথা মনে করিয়া গোপনে হাসিয়াছিল, আজও হাসিল। হাসিয়া ভাবিল, "অণুভাদির যেমন কথার শ্রী! একদম ছেলেমানুষ! ছোড়দার চেয়েও দেখায় ছোট! দেখলেই মনে বাৎসল্যের উদয় হয়, বন্ধুতার পক্ষে বেশ ছেলেটে—কিন্তু ওর সঙ্গে আবার বিয়ে কি! যখনি মনে করি, হাসিতে দম ফেটে ওঠে। স্বামী যে হবে, তাকে একটু মান্য করতে

হবে ত? এর প্রতি কোন দিন মাস্তের ভাব ত মনে উদয় হয় নি—হবেও না।"

তাহার পর হাসি—হাসি থামাইয়া বলিল, "বাপ্‌রে, আর হাস্‌তে পারিনে—তবে এটা ঠিক, আর যাকেই বিয়ে করি—এঁকে কখনও করব না।"

হাসি বাজাইয়া আবার গান ধরিল—

"ওগো মনের মত সেই ত হবে—
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও?"

একবারমাত্র এই দুই লাইন গাহিয়াই আবার সে থামিয়া ভাবিল—"আচ্ছা, রাজার প্রতি ত আমার শ্রদ্ধা-ভক্তির কিছুমাত্র অভাব নেই, কিন্তু তাঁকে ত আমি প্রেমের পূজা দিতে পারছিনে? তাঁকে দেখলেই বুদ্ধদেবের ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি আমার মনে প'ড়ে যায়। রাণী গুনিভিয়ার যে কথা বলেছিলেন, এক হিসাবে কিন্তু খুবই ঠিক,—মানুষ মানুষকেই চায়। তাই শেষ বিদায়-দিনে—রাজার দেবমহত্ত্বের মধ্য থেকে আসল মানুষটি যখন রাণীর চোখে পড়ল—তখনই তাঁর মনের প্রেম-ফোয়ারা রাজার প্রতি উথলে উঠেছিল। কিন্তু হায়! তখন too late? রাণী যখন মনে মনে বল্লেন—

Now I see what thou art,
Thou art the highest and most
humane too—

তখন রাজা চ'লে গেছেন; হয় ত বা আমারও সে শুভক্ষণ আসবে, কিন্তু কে জানে, আমারও পক্ষে সে সৌভাগ্য—too late হবে কি না!"

ঘড়িতে ঠুং ঠুং করিয়া দুইটা বাজিল, হাসি চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এতক্ষণে আবার তাহার রাজকুমারীকে মনে পড়িয়া গেল; বলিয়া উঠিল,—"কই, এলেন না ত তিনি এখনও? দু'টো যে বেজে গেল!" আবার তাহার চিন্তাস্রোত উজানে বহিল—"আচ্ছা, সবাই বলছে বিয়ে কর—বিয়ে কর! অমন রাজার রাণী হয়ে জীবন সার্থক কর। অমন স্বামিলাভ বহু পুণ্যেই স্ত্রীলোকের ভাগ্যে ঘটে! তা ঠিকই। কিন্তু আমার দিক্‌টাই সবাই দেখছে—তাঁর দিক্ ত কেউ দেখে না। আমি যে তাঁর একেবারেই যোগ্য নই। মা, দিদিমা যাই বলুন, তাঁর রাণী হবার মত না আছে আমার রূপ—না আছে গুণ। হ'তে পারে না—তা হ'তে পারে না—মন বল্‌ছে—এ কাযটা ঠিক হবে না।" হাসি পিয়ানোর নিকট হইতে উঠিয়া টেবলের ধারে বসিয়া কাব্যগ্রন্থখানার পাতা খুলিয়া আর্থারের ছবি আর একবার দেখিল, তাহার পর বইখানা বন্ধ করিয়া আপন মনে বলিল—"সে দিন কিন্তু কি সুন্দরভাবেই তিনি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন! তাঁকে আর সে দিন রাজা ব'লে মনে হচ্ছিল না। হব—আমি তাঁরই রাণী হব, চেষ্টা করব তাঁর মনের মত হ'তে, তাঁকে সুখী করতে—রাজারই রাণী হব আমি।"

গাড়ীর শব্দ হইল, সে উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে মনোনিবেশ করিল, মোটরের ভেপু বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানা যেন ভিতরেই প্রবেশ করিল, হাসি তাড়াতাড়ি গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

— —

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনাদি মোটর হইতে নামিয়া দোতালার উপর উঠিতে না উঠিতে, হাসি সিঁড়ির রেলিঙ্গের ধারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী এলেন না যে, অনাদি-দা?"

সিঁড়ির শেষ ধাপটার উপরে চড়িয়া লইয়া অনাদি উত্তর করিল, "আস্‌তে পার্‌লেন না তিনি! তাই আমি তোমাদের নিতে এসেছি।"

বহুবচনবাচ্যে হাসি টীকা করিল—"বাবাও যাবেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, তাঁরও ডাক পড়েছে।"

হাসি আশ্চর্য্য হইল না। কৃষ্ণলাল বাবু এক জন সুদক্ষ দাবাখেলোয়াড়। যেরূপ তন্ময়ভাবে তিনি ওঙ্কারতত্ত্ব লিখেন, খেলিতে বসিলে প্রায় সেইরূপই তদ্গতচিত্তে তিনি দাবার বোড়ে টেপেন। রাজা বাহাদুরেরও দাবাখেলার বেশ একটু সখ আছে—তিনি যে দিন মৃগয়োবাড়ী আসেন, প্রায়ই এক হাত দাবা না খেলিয়া ফেরেন না। আর মাঝে মাঝে মৃগয়োমহাশয়কে এ জন্য স্বভবনে নিমন্ত্রণ করেন।

"আচ্ছা অনাদি-দা, তুমি তবে বাবার ঘরে গিয়ে একটু বোসো, দু' মিনিটের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।"

এই বলিয়াই হাসি এমন তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল যে, অনাদির বিষণ্ণতা তাহার নজরেই পড়িল না।

কৃষ্ণলালের ঘরে গিয়া অনাদি দেখিল, তিনি মুদ্রিত-নয়নে চৌকিতে বসিয়া আছেন। নিকটের টেবলের উপর একরাশ খাতাপত্র, খাতাপত্রের উপর কলমটা গড়াগড়ি যাইতেছে, সম্ভবতঃ হাত হইতে সেটা পড়িয়া গিয়াছে; তিনি বাঁহাতের কনুই দিয়া কতকগুলা কাগজপত্র চাপিয়া ডানহাতখানা খোলা খাতার উপর রাখিয়া ধ্যানস্থ হইয়া ভাবিতেছেন ওঙ্কার শব্দের নিগূঢ়তত্ত্ব। ঋষিগণ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে প্রতিচ্ছায়া এই ক্ষুদ্র ওঙ্কারমন্ত্রের ধ্বনিতে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহারই উজ্জ্বল মহিমা হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত দেখিয়া লিখিতে বসিয়া তিনি লেখার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

অনাদি একবার কাসিল, কোন ফল হইল না, জোরে জোরে দুই একবার পা নাড়িয়া চটিজুতার আওয়াজ করিল, তাহাও কৃষ্ণলালের কানে পৌঁছিল না, তিনি তখন এমনই ভাবভোর, কিন্তু অনাদিও ত বেশী বিলম্ব করিতে পারে না, সে তখন টেবলের ইলেক্ট্রিক ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিল। এ ঘণ্টাটি রাজা বাহাদুরের টেবলের ঘণ্টা—কৃষ্ণলাল এক দিন ইহার তারিফ করায় রাজা তাঁহাকে এটি উপহার প্রদান করিয়াছেন। ঘরে আনিয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণলাল কিন্তু ইহার ব্যবহার করেন নাই। ভৃত্য শম্ভুকে ডাকিবার সময় তাঁহার চিরভ্যস্ত আদরবুলিগুলি কণ্ঠে আসিয়া বহির্গত হইবার জন্য এমনই ঠাসাঠাসি করে যে, তাহাদের শান্ত করিতে গিয়া হাতের কাছের ঘণ্টার কথা একেবারেই তিনি ভুলিয়া যায়েন। ঘণ্টার মৃদুমধুর অবিশ্রান্ত আওয়াজে কৃষ্ণলালের এইবার ধ্যানভঙ্গ হইল। নিকটে অনাদিকে দেখিয়া, আহ্লাদে বিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এসেছ, বাবা! কতক্ষণ কতক্ষণ? বসো বাবা, বসো, খবর সব ভাল ত?"

অনাদি কোন ভণিতা না করিয়া একেবারেই বলিল, "খবর বড় ভাল নয়।"

কৃষ্ণলাল ব্যাকুলভাবে একবার ওঙ্কার-ধ্বনি করিলেন তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খবর ভাল নয়? কারো কি অসুখ বিসুখ হয়েছে?"

"আজ্ঞে না। পুলিস এসেছে রাজাবাহাদুরকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে।"

"পুলিস এসেছে রাজাবাহাদুরকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে?" ভীতিবিহ্বল কণ্ঠ হইতে এই প্রশ্ন উঠিল।

অনাদি বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।" অতঃপর এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহার বলিবার ছিল, সংক্ষেপে শেষ করিয়া বলিল, "হাসিকে ও আপনাকে আমি নিতে এসেছি, তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

বৃদ্ধের গণ্ড বাহিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু নীচে পড়িল—তিনি ওঙ্কারধ্বনি করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"চল বাবা চল, এখনি যাচ্ছি হাসি কোথা? ডাক তাকে?"

"সিঁড়িতে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে তিনি কাপড় ছাড়তে গেলেন, আসছেন এখনি।"

"তাকে এ সব কথা বলেছ কি?"

"না।"

"কিন্তু বাড়ীর ভিতরেও একবার এ খবরটা ত জানানো দরকার। আমার ত, বাবা, মুখে কথা আসছে না। তুমি গিয়ে বরঞ্চ খবরটা দিয়ে হাসিকে নিয়ে এস—আমি ততক্ষণ গাড়ীতে গিয়েই বসছি।"

এই সময় হেমচন্দ্রের আবির্ভাব হওয়াতে এ সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া গেল। কর্ত্তাবাবু বলিয়া উঠিলেন, —"এই যে হেম এসেছেন! হেম, তুমিই ভাই তা' হলে গিয়ে এ খবরটা বাড়ীর ভিতরে জানিয়ে এস।"

হেম বলিল "কি খবর?"

"ও:, তুমি যে এখনো শোননি,—অনাদি, বল বাবা, সব কথা হেমকে। আমি গাড়ীতে গিয়ে বসি।"

দুই এক কথায় অনাদি আসল খবর সবই হেমকে জানাইয়া দিল,—শুনিয়া হেম বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল, হাসিও ইত্যবসরে সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া অনাদির সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

হেম অন্তঃপুরে ঢুকিয়া প্রথমে গেল দিদিমার দালানে। সেখানে তাঁহাকে না পাইয়া হাসির মা'র মহলে আসিয়া গিন্নীর ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় মা দিদিমা দুই জনকেই দেখিতে পাইল। হাসির মা সেখানে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, আর তাঁহার পাশে বসিয়া দিদিমা সন্দেশের ছানা মলিতেছিলেন। হেম মস্তক নত করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিল। তাহাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া দিদিমা
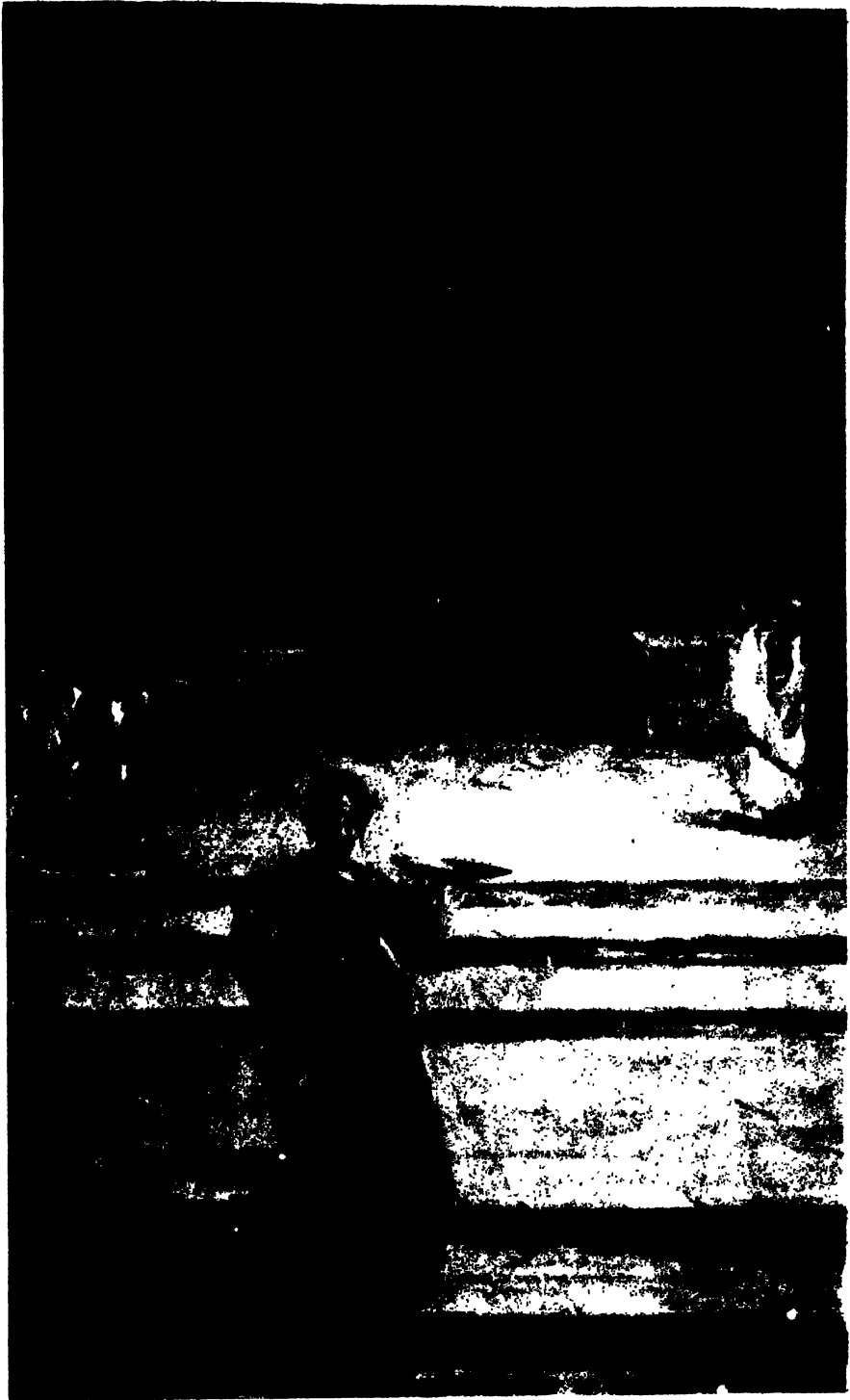
হাত গুটাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে হেমবাবু, কি খবর?" গৃহিণীও বেগুনটা ফালি করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় নীরবে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন। হেম বলিল—"ভাল খবর নয়, মা" উভয়েরই মুখ অজ্ঞাত বিপদ-চিন্তায় পরিম্লান হইয়া উঠিল। দিদিমা বলিয়া উঠিলেন,—"রাজকুমারীর ত কোন অসুখ করেনি? তিনি আজ এখনো এলেন না—তাই আগে থাকতেই আমার কেমন ভাবনা হচ্ছিল।"

হেম বলিল,—"না, তা নয়; শারীরিক ভাল আছেন সকলে—"

"তবে?"

দিদিমার এই প্রশ্নে হেম কহিল—"রাজাবাহাদুর গ্রেপ্তার হয়েছেন।"

"রাজাবাহাদুর গ্রেপ্তার? কেন—কি জন্য?"

মা—দিদিমা উভয়েই ব্যাকুলভাবে এই প্রশ্ন করিলেন।

হেম বলিল, "অভিযোগ গুরু—রাজবিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা ষড়যন্ত্রের Charge!"

দিদিমা শুনিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, হাসির মা গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আজকাল বিদ্রোহী হচ্ছে ত অনেকে! কেন বাপু এ সব কায করা? বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছি আমরা,—কি যে সব খেয়াল!"

দিদিমা বলিলেন,—"কিন্তু রাজা ত আর এ কায করেন নি—এ যে মিথ্যে কথা!"

হেম বলিল,—"হাঁ, তা ঠিক, রাজা বিদ্রোহী নন নিশ্চয়ই—তবে তাঁর কতকগুলা অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহী ছেলেদের আড্ডায় পাওয়া গেছে—তাতেই এতটা বিপদ।"

দিদিমা বলিলেন,—"রাজার হাতিয়ারশালা থেকে ছেলেরা যে অস্ত্র চুরী করেছে, এ কথা ত আমরাও শুনেছি, তোমরা পুলিসকে এটা জানিয়ে দাও।—"

হেম একটু হাসিয়া বলিল,—"শুধু এ কথা বল্লেই ত হবে না; প্রমাণ করতে হবে,—"

মা বলিলেন,—"যদি ধর রাজা এরূপ প্রমাণ করতে না পারেন? তা' হলে?"

"তা' হলে দণ্ড পাবেন।"

"কিরূপ দণ্ড?"

"ঠিক বলতে পারিনে—যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হবারই অধিক সম্ভাবনা! প্রাণদণ্ড হতেও আটক নেই।"

দিদিমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবান্ রক্ষা কর—রক্ষা কর।"

হাসির মা'র হাত হইতে বেগুণের ফালিটা নীচে পড়িয়া গেল—তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, একটু পরে, যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ আমাদের সময়ে রক্ষা করেছেন,—সর্ব্বপ্রাণে তাঁকে নমস্কার করি। আচ্ছা, তিনি যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হন যদি, তাঁর রাজ্য ধনসম্পদ কে পাবে? শুনেছি নাকি রাজবিদ্রোহীদের সম্পত্তি গভরমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে?"

হেম বলিল,—"ইচ্ছা করলে তা' পারে বটে—তবে ওয়ারিস থাকলে তাকেই গদিতে বসিয়ে সরকার রাজ্য চালান।"

"তা' হ'লে রাজকুমারীই রাজ্য পাবেন—তবু ভাল?"

"নাও পেতে পারেন, সুজন রায় অনেক দিন থেকেই বলছে, এ রাজ্যের অধিকারী তারাই। ম্যাজিষ্ট্রেট শুনছি তার উপর খুব সদয়, সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট বিজনকেই গদিতে বসাবে।"

গৃহিণী স্থির হইয়া তাহার কথা শুনিলেন—শুনিয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"চিরদিনই ত আমি বলছি—বিজন রায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও, তা' না—যত রাজ্যের আজগুবি ভাবনায় কর্ত্তা মেতে আছেন! হেমদা চেষ্টা করবে একটু, ভাই, তুমি?"

হেম বলিল,—"আরো কিছু দিন যাক না? রাজা ত মুক্তিলাভও করতে পারেন। আমার মনে হয়, তারই অধিক সম্ভাবনা।"

বলিয়া হেম চলিয়া গেল; দিদিমা ছানা ও চিনি সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া নামজপ করিতে করিতে ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন; গৃহিণী অন্যমনোযোগ সত্ত্বেও তরকারী কোটায় মনোনিবেশ করিলেন।

— —

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হাসি গাড়ীতে উঠিয়া লক্ষ্য করিল, অনাদি বড় বিমর্ষ, গম্ভীর। কৃষ্ণলাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিমর্ষতা সে জন্য

সে ধরিতে পারিল না। এরূপ ধ্যানাবস্থা তাঁহার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নহে, যখন তখন নিমীলিত নয়নে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অনাদিকে মনে করিতে হাসিখুসী স্ফূর্ত্তিই হাসির মনে জাগিয়া উঠে—আজ তাহার অন্ধকার মুখ দেখিয়া হাসি বড়ই ভীত ও ভাবিত হইয়া পড়িল। বাড়ীর অন্য সকলের ন্যায় তাহারও প্রথমেই মনে হইল—হয় ত বা তবে রাজকুমারীর কোন অসুখ করিয়াছে; সেই জন্যই বা তিনি আসিতে পারেন নাই। ব্যাকুল মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজকুমারী ভাল আছেন ত, অনাদি-দা?" এতক্ষণ অন্য কাহারও এরূপ প্রশ্নে অনাদি অপ্রকৃতিস্থ হয় নাই—হাসির এই ব্যথাভরা ব্যাকুলতায় তাহার মনের প্রচ্ছন্ন বেদনা সহানুভূতিচঞ্চল হইয়া উঠিল। অনাদি পড়'পড়' অশ্রু নয়নে ধরিয়া, বাতায়নদ্বারে মুখ বাড়াইয়া দিল, তাহার পর সংযত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল—"না, হাসি, তিনি ভাল আছেন।"

"তবে—তবে?" হাসির হঠাৎ মনে হইল, হয় ত বা ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন, কিন্তু সে কথা ত জিজ্ঞাসা করা যায় না। সে কেবল অনাদির অকথিত বেদনা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে নীরব হইয়া গেল, অনাদিও কোন উত্তর করিল না।

আকাশের মেঘগুলা তখন ঘনীভূত হইয়া দিনকে সন্ধ্যা করিয়া তুলিয়াছিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু বাতাস নাই, শীতও কম, আদ্রতায় চাপা পড়িয়া শৈত্য মৃদুতর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সহসা কেমন একটা কন্‌কনে শীতে হাসির হৃৎপিণ্ডে কম্পন উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। হাসির পিঠের শালখানা স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, অনাদি উঠিয়া ধীরে ধীরে শালখানা তাহার গায়ে উঠাইয়া দিল। মোটর রাজবাড়ীর গাড়ীবারান্দায় লাগিবামাত্র এক জন হরকরা নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন করিল—রাজাবাহাদুর এবং রাজকন্যা সঙ্গীত-ঘরে আছেন।

রাজার বসিবার ঘরের পাশেই সঙ্গীতগৃহ। সেই ঘরে মছলন্দ বিছানায় বসিয়া ভজন গাহিয়া পিতা পুত্রী সুখ দুঃখদাতা ভগবানকেই ডাকিতেছিলেন। বিপদের সময় আমরা যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হই, সুখের সময় তাহা পারি কই? তাই বুঝি প্রেম-লোলুপ হরি বিপদের মধ্য দিয়া ভক্তজনকে তাঁহার কাছে ডাকেন।

রাজা তানপুরা বাজাইয়া গান করিতেছিলেন—রাজকুমারী অবনত-মস্তকে, করযোড়ে তাহা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে এক একটি কলিতে যোগদান করিতেছিলেন।

বহুক ঝটিকা ঝড়, কাঁপায়ে চেতনজড়
ভবের তরঙ্গে যেন না বিচলে এ হৃদয়!
ধরিয়া চরণ যাঁর বিচরি এ পারাবার
পুণ্য শক্তিমান্ তিনি পরম মঙ্গলময়!

দয়া কর—দয়া কর—দয়া কর দয়াময়!

রাজকুমারীর বুকফাটা করুণস্বর রাজার গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির সহিত শেষ ছত্রে মিলিত হইল। রাজা দ্বিতীয় অংশ ধরিলেন—

ঘিরুক নিবিড় ঘন সংসারগগন;
ধ্রুবরূপে দীপ্ত যেন রহে প্রাণ-মন।
আশ্রয় অভয়দাতা হেলায় ঠেলিয়া বাধা
ভেলায় হইব পার তরঙ্গেতে কিবা ভয়!
দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর, দয়াময়!

উভয়ের এই মর্ম্মভেদী সম্মিলিত প্রার্থনায় ভগবান্ যদি তাঁহাদের প্রতি দয়াবর্ষণ না করেন—তবে তাঁহার দয়াময় নামের সার্থকতা কোথায়?

গানটি শেষ করিয়া রাজা তানপুরা রাখিয়া দিলেন, কন্যাও অবনত মস্তক উন্নত করিয়া পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরের বেদনা, তাহার আননে কি প্রগাঢ় কালিমাচ্ছায়া প্রকটিত করিয়াছিল! রাজকন্যা ভাবিতেছিলেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পিতার এই দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ, তাঁহার জন্যই পিতার এই লাঞ্ছনা—অপমান—কষ্টভোগ!

রাজা ভাবিতেছিলেন, নিজের সব কষ্ট তিনি সহিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার মাতাকন্যার কষ্ট যে তাঁহার পক্ষে অসহ্য। কি বলিয়া কি ভাষায় কন্যাকে সান্ত্বনা দান করিবেন, তিনি তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। তানপুরাটা আবার হাতে লইয়া কন্যাকে বলিলেন—"আজই আমি এই গানটি রচনা করেছি—শোন্ দেখি, রাণি—"

রাণী নীরব হইয়া রহিল—তিনি গাহিতে লাগিলেন—

ওহে প্রভু নিঠুর রাজন,
যাহা কিছু ছিল মোর সুন্দর রতন—

পুণ্যপ্রীতি আশা ধ্রুব, উজ্জ্বল বাসনা শুভ,
সব ত পূজায় তব করেছি অর্পণ !
পারিনি পারিনি শুধু উপাড়িয়া দিতে,
ব্যথার শৈবালে যেটি ফুটেছিল চিতে।
একটু ত ভালো নয়, মলিন পঙ্কিলময়—
লাজে ভয়ে করেছিনু তাই সঙ্গোপন।
জেনেছ তা অন্তর্যামী রাজা।
তারি তরে এত দণ্ড এ দারুণ সাজা !
লও তবে তাও লও, হে রুদ্র প্রসন্ন হও,
আপনা নিঃশেষে করি আত্মনিবেদন।

অনাদির সহিত শঙ্কিত, সন্তর্পিত নিঃশব্দচরণে কৃষ্ণলাল যখন কন্যাকে লইয়া ভজনস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাজা গানটি একবার শেষ করিয়া শেষ কলিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার করিয়া গাহিতেছিলেন -

লও তবে সব লও, হে রুদ্র প্রসন্ন হও,
নিঃশেষে চরণে করি আত্মনিবেদন।

ইঁহাদের উভয়কেই সুস্থ শরীরে দেখিয়া হাসি অনেকটা আরাম বোধ করিল। কৃষ্ণলাল ও অনাদি মছলন্দের শেষ দিকে বসিলেন - হাসি রাজকন্যার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। রাজা গান শেষ করিয়া চোখ খুলিতেই হাসির প্রতি তাঁহার নজর পড়িল -তানপুরাটা তিনি নামাইয়া রাখিলেন, একটা শোকনীরবতায় সহসা যেন গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটু পরে কৃষ্ণলালের দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন, "কখন্ এলেন আপনারা ?"

"এই—এই এখনি।"

"খবর শুনেছেন ?"

"শুনেছি।"

হাসি রাজকন্যার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি খবর ? আমি ত কিছু জানিনে।"

রাজা তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "জান না, হাসি ? আমি আর রাজা নই !"

রাজা কি ঠাট্টা করিতেছেন নাকি ? কিন্তু ইহা ত ব্যঙ্গের স্বর নহে, হাসির বিস্ময়-কাতরদৃষ্টি নীরবে রাজাকে যে প্রশ্ন করিল—তাহার উত্তরস্বরূপ তিনি কহিলেন, "এত-দিন ছিলাম বটে রাজা, এখন সত্যই ভিখারীর চেয়েও দীনহীন আমি। ভিখারীরও যে অধিকার -যে স্বাধীনতা আছে, আমার তাও নেই—আমি বন্দী।"

এ কথার অর্থ হাসির হৃদয়ঙ্গম হইল না—কিন্তু অর্থ না বুঝিয়াও তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা কন্যাকে বলিলেন, "তুমি হাসিকে সব কথা খুলে বল - রাণি।" বলি-য়াই রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলালকে বলিলেন, "ও ঘরে যাবেন -- মুখুয্যেমশায় ? আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

রাজা কৃষ্ণলালকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া বসি-লেন, অনাদিও প্রসাদপুরে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল—শ্যামাচরণ রাজাদেশে অন্য কার্যে গিয়াছিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে --হাসি অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, রাজকুমারি ?"

রাজকন্যা ধীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বাবা বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেতে এসেছে।"

"সত্যই তবে রাজা বাহাদুর বন্দী ?"

অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাসির বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সেদিন-কার কথায় হাসি রাজার মনে কিরূপ কষ্ট দিয়াছে, আজ তাহা সে বুঝিল, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও রাজা তাহ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে সেই কথারই উল্লেখ করিলেন। হাসি রাজকন্যার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর প্রার্থনায় মনে মনে কহিল, "হে ভগবান্ অন্তর্যামী পুরুষ, এ কি করিলে তুমি ? তুমি ত জান আমার প্রাণের কথা ! আমার মনের ত্রিসীমায় ত কোন অভিশাপকল্পনা ছিল না, আমার সর্ব্বস্ব লইয়া সেই অবোধ বাক্যকে নিরর্থক করিয়া দাও, প্রভু, তোমার বজ্রদণ্ড আমার উপর ফেলিয়া ইঁহাদিগকে রক্ষা কর, প্রভু !"

রাজকন্যা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "অধীর হয়ো না, হাসি, বাবা নির্দ্দোষ ; যদি সংসারে ন্যায়-সত্যের জয় এতটুকুও থাকে, তবে তিনি মুক্ত হবেনই।"

রাজকন্যার সংযম দেখিয়া হাসি অবাক্ হইয়া গেল, অনেকটা প্রশান্ত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। রাজকন্যা বলিলেন, "দোষী আসলে আমি। কার্য্যতঃ না হ'লেও মনে মনে অনেকদিন থেকেই আমি বিদ্রোহী—রাজপক্ষের অন্যায় শাসনে মর্ম্মে মর্ম্মে আমি আহত। এর প্রতীকারচেষ্টায় যদি দোষ হয়ে থাকে ত দোষ সম্পূর্ণভাবে আমারই

আমার কার্য্যোদ্ধার জন্যই বাবাকে তাঁর কল্পনার রাজ্য থেকে টেনে এনে আমি পাশে বসিয়েছি। কিন্তু কিছুই হ'ল না, হাসি, দেশের মঙ্গল বা বিশ্বের মঙ্গল কিছুই আমা হ'তে হোল না, হাসি, কেবল পিতৃঘাতকের কাষ করলুম। সকলই তাঁর ইচ্ছা! হয় ত বা এরও ফল আছে, সুফল আছে, এই অমঙ্গলের পশ্চাতে হয় ত কল্যাণ দাঁড়িয়ে আছে সন্তান যেমন ভূমিষ্ঠ হবার আগে মাতৃগর্ভে অপেক্ষা করে, সেই রকম। হোক্, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

রাজকন্যা নীরব হইয়া রহিলেন, তাঁহার বিশ্বাসবলে হাসির চঞ্চল হৃদয়ও সবল হইয়া উঠিল। রাজকুমারী আবার বলিলেন, "আমার কি ইচ্ছা হয় জান ভাই, হাসি?"

উৎসুকদৃষ্টিতে হাসি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; রাজকন্যা বলিলেন, "পুরাণে পড়া যায়, দেবতারা বলিতে সন্তুষ্ট হয়ে মঙ্গলবর দান করতেন, এখনও সেই বিশ্বাসে লোকে কালীর কাছে বলির মানত করে। এ কথাটায় আমার কিন্তু কোন দিন প্রত্যয় জন্মায় নি। এর গূঢ় তাৎপর্য্যই আমি ভেবে নিতুম। বলি অর্থে ভক্তিরই বলিদান বুঝেছি। কিন্তু আজ সহজভাবেই এ কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার। ভগবান্ যদি দেশমঙ্গলে আমাকে বলি গ্রহণ করেন তবে আমার জীবন সার্থক -- ধন্য হয়। হে ভগবান্, মঙ্গল কর কল্যাণ কর, পিতা মুক্ত হোন, দেশ মুক্ত হোক -আর—আর "

শরৎকুমারের নাম তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া থামিয়া পড়িল, তিনি ত অন্তর্দেবতারই মত তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত - মুখে আর তাঁহার কথা কি বলিবেন। তিনি মনে মনেই তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আবার বলিলেন "ভারতভূমি কর্ম্মে এক হোক্, ধর্ম্মে দৃঢ় হোক্, বিশ্বসংসারে ন্যায় সাম্যের প্রতিষ্ঠা হোক্, বলি গ্রহণ কর প্রভু আমাকে, আমার জীবন সুখ-শান্তি সর্ব্বস্ব তোমাতে সমর্পণ করি - আমার প্রার্থনা সফল কর প্রভু, এই মঙ্গলবর দান কর।" বলিয়া তিনি যখন থামিলেন, তখন তাঁহার গলা জড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে হাসি বলিল, "অমন ক'রে বলো না, রাজকুমারি --বল বল, অমন ক'রে বলির কথা ভাববে না তুমি?"

রাজকুমারী একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার যখন কষ্ট হয়, তখন অমন ক'রে আর বলব না, হাসি!"

আজ আর রাজকন্যা একবারও তাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন না, হাসির কিন্তু এই আদরের ডাক আজ শুনিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছিল। হাসি রাজকন্যার গলা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় নিয়ে যাবে তাঁকে?"

রাজকন্যা বলিলেন---"প্রসাদপুরে।"

"সেখানেই কি রাখবে?"

"বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বোধ হয় সেখানেই রাখবে, তাহার পর যদি মুক্তিলাভ করেন ত ভাল —নইলে—"

হাসি নীরবে চাহিয়া রহিল --রাজকন্যা একটু থামিয়া দম লইয়া বলিলেন, "দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারে।"

প্রাণদণ্ডের কথাটা রাজকন্যা মুখে আনিতে পারিলেন না; তাঁহার মনের বল --সাহস এখানে কুলাইল না। হাসি তাঁহার প্রতিধ্বনির মত বলিল, "দ্বীপান্তরে? কোথায় সে— কোন্ দেশ? আমরাও সঙ্গে যেতে পারব ত?"

রাজকন্যা কোন উত্তর করিলেন না---এ প্রশ্ন তাঁহার কানে পৌঁছিল কি না, তাহাও ঠিক বোঝা গেল না তিনি তখন স্তিমিত নেত্রে গুণ্ গুণ্ করিয়া স্তোত্রগান ধরিয়াছেন—

তুঁহি একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য সুন্দর শিব!
দেহ করুণা —কর করুণা বিভো!
তুমি অরূপ অপরূপ, সনাতন সৎস্বরূপ
তব প্রেমরূপেভরা --নিখিল ভব।
তুঁহি রুদ্র ভয়ঙ্কর, দণ্ডপতি;
হও শঙ্কর সুখকর, তুষ্টমতি।
দেহ কর্ম্মে পুণ্য, কর ধর্ম্মে ধন্য
ন্যায় বন্দিত হোক্ নিশিদিব!

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

তারযোগে গোপন-সংবাদ প্রেরণ

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সেনাবিভাগ সম্প্রতি গোপনে তার-যোগে সংবাদ প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। একই আধারে 'টেলিফোন' ও 'টেলিগ্রাফ'—উভয় প্রকারে সংবাদ-প্রেরণ ব্যবস্থার উপযোগী যন্ত্রাদি আছে। এই আধারটি যে কোনও ব্যক্তি অনায়াসে স্কন্ধদেশে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই আধারস্থিত যন্ত্র এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, সংবাদ প্রেরণকালে গুপ্তশ্রোতা প্রেরিত সংবাদ কিছুই শুনিতে পায় না। সমগ্র যন্ত্রটি এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, গুঞ্জনবহ যন্ত্র বা buzzerphone যোগে কথা বলিবার সময় তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণ করিলে একের সহিত অপরের সংঘর্ষ হইবার কোনও আশঙ্কাই থাকে না। তাড়িতবার্ত্তা পাঠাইবার সময় কোনও টেলিগ্রাফতারের সহিত এই যন্ত্রাধারটিকে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়; তখন ইচ্ছামত সংবাদ প্রেরণ করিলে সাঙ্কেতিক শব্দ মধ্যপথে অন্য কেহ সংগ্রহ করিতে পারে না। গুপ্তচর-গণের উপদ্রব হইতে সংবাদ গোপনের জন্যই মার্কিণ সেনা-বিভাগ এই প্রকার বিচিত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেও শব্দবহ যন্ত্রযোগে কথা বলিবার সময় মধ্যপথে গুপ্তশ্রোতা যদি সে আলোচনা জানিতে ইচ্ছা করে, এই অভিনব প্রণালীতে তাহার প্রতীকারের অনুরূপ ব্যবস্থা এখনও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই।
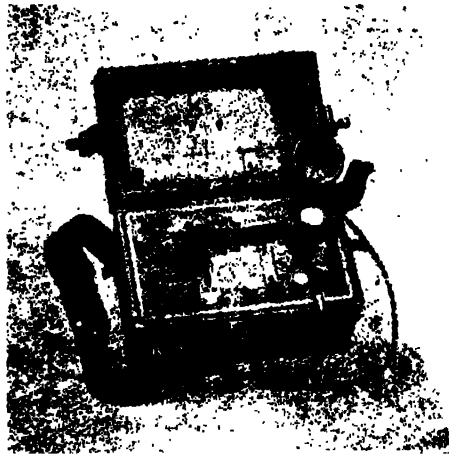
মার্কিণ সেনাবিভাগের উদ্ভাবিত গোপন সংবাদ প্রেরণের অভিনব গুঞ্জনবহ ও তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্র।

ঘণ্টা পাখী

দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলে এক প্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কণ্ঠস্বর বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ পক্ষি-তত্ত্ববিদ্ ওয়াটারটন এই পাখীর সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিহঙ্গজাতির মধ্যে এই পক্ষীর কণ্ঠস্বরই সর্ব্বাপেক্ষা বহুদূর-প্রসারী। যখন এই পক্ষী গান করে, মনে হয় যেন কোথাও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। ৫ কিলো-মিটার বা ৩ মাইলেরও অধিক দূর হইতে এই পাখীর গান শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ঘণ্টা-পাখীর গায়ের রঙ্গ শুভ্র, সাধারণ পারাবতের ন্যায়ই আকৃতি। পাখীর মাথার চূড়ায় শৃঙ্গাকার একটি কঠিন পদার্থ আছে; গান করিবার সময় এই পদার্থটি সামান্য উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার সহিত মুখবিবরের উপরিভাগের সংযোগ আছে—তাহারই ফলে পাখী যখন গান গাহে, সেই সময় ঘণ্টাধ্বনির মত মধুর শব্দ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। যিনি পূর্ব্বে কখনও এই বিচিত্র পক্ষীর গান শুনেন নাই, তাঁহার কর্ণে উহার সঙ্গীত-তরঙ্গ প্রবিষ্ট হইবামাত্র মনে হইবে, বহুদূরে কোনও গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই, যখন অন্য কোনও পাখীর কণ্ঠরব শ্রুত হয় না, ঠিক সেই সময়েই ঘণ্টা-পাখী গান গাহিতে থাকে।

কাম্বোডিয়ায় প্রাচীনযুগের হিন্দু-মন্দির

ফরাসীর অধিকৃত চীনরাজ্যের (Indo-China) কাম্বো-ডিয়া নগরের সন্নিহিত বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্যমধ্যে সংপ্রতি

একটি অতি প্রাচীনযুগের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অরণ্যবহুল বিস্তীর্ণ স্থানটি পূর্ব্বযুগে কোনও রাজার রাজধানী ছিল, সে সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মনে কোনও সন্দেহ নাই। নবাবিষ্কৃত মন্দিরের স্থপতিশিল্প ও মন্দিরসংলগ্ন বারান্দা প্রভৃতি দেখিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। যেন একটা বৃহৎ পাহাড় কাটিয়া এই অপূর্ব্ব মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের সুদৃশ্য চূড়া, সোপানাবলী এবং স্থপতিশিল্প-নৈপুণ্য-দর্শনে কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কাম্বোডিয়া প্রাচীনযুগে হিন্দু-রাজ্যের অধিকারে ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, মন্দিরের নির্ম্মাতা হিন্দু না হইলেও, হিন্দুর অধিকারভুক্ত কোনও সামন্ত রাজা হিন্দু আদর্শে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, এই নগরটি সমত্রিকোণাকারভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রত্যেক দিকেই ২ মাইল দীর্ঘ। নগরের প্রাচীর ৯০ হইতে ৫৮ ফুট উচ্চ। এই প্রাচীরে ৫০টি প্রকাণ্ড উচ্চচূড় প্রাকারে বেষ্টিত দুর্গ—সর্ব্বত্রই প্রাচীন দেবতাদিগের মুখমণ্ডল

প্রাচীন মন্দিরগাত্রে আবিষ্কৃত প্রস্তরক্ষোদিত দেবতা-মূর্ত্তি।

ক্ষোদিত। বৃহৎ দুর্গম অরণ্যমধ্যে বহুশত বৎসর ধরিয়া এই অপূর্ব্ব নগরের ধ্বংসাবশেষ ও মন্দির আত্মগোপন করিয়া ছিল। যেখানে প্রাচীন যুগে কত বিচিত্র ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল, প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্য-বৈভবের লীলা যে স্থানকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা কালক্রমে পক্ষী, সরীসৃপ ও শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে পর্য্যবসিত। এক দিন নগরস্থ প্রাসাদে শক্তিশালী নৃপতিগণ বিহার করিতেন, তাঁহাদের বর্ম্মাবৃত সৈনিকগণের পদভারে অঙ্গনতল শব্দায়মান হইয়া উঠিত, নর্ত্তকীর নূপুর-নিক্কণে প্রমোদাগার মুখরিত হইত; আজ সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অতীতের কঙ্কাল সংগ্রহ করিতেছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে এই নগরীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত।

কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত প্রাচীন মন্দির।

পর্ত্তুগীজ মিশনারীরা বহু শতাব্দী পরে এই প্রাচীন নগরটি আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ

যুবতী নর্ত্তকীদিগকে স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার উপহৃত হইতেছে।

নানা গবেষণার পর ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতজাতির অস্তিত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। ধ্বংসস্তূপ হইতে মন্দিরটিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহারা উহার সংস্কার করিতেছেন।

বিচিত্র শিলালিপি, প্রাচীর-ক্ষোদিত লেখমালা ও স্থপতি-শিল্প হইতে তাঁহারা এই স্থানের প্রাচীনতম যুগের অধিবাসীদিগের রীতিনীতি প্রভৃতির আবিষ্কারে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অনুসারে দেখা যায়, প্রথম নগর পত্তনের পর, এই স্থানে আর একটি নগর গঠিত হইয়াছিল। উহার নাম 'অঙ্কর থল'। উভয় নগরই ক্মার নৃপতিদিগের অধিকারে ছিল। পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানফলের খণ্ডাংশগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে দেখা যায় যে, নৃপতিদিগের প্রাসাদ যুবতী নর্ত্তকীদিগের ললিতলাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিত। প্রত্যেক নর্ত্তকীই অপূর্ব্ব সুন্দরী। ছয় সাত বৎসরের বালিকারা পর্য্যন্ত নর্ত্তকীরূপে প্রাসাদে স্থান পাইত। তাহাদের জনক-জননীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদিগকে রাজার প্রাসাদে রাখিয়া যাইত। সৌন্দর্য্য ও বয়সের অনুপাতে কন্যার পিতামাতা অর্থলাভ করিত। বালিকারা প্রাসাদে নীতা হইবার পর হইতে আর বাহিরে যাইতে পারিত না—পিতামাতার সহিত চিরদিনের জন্য তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, দেখা-সাক্ষাৎ করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইত। নৃত্যশিক্ষয়িত্রীর হস্তে তাহাদের শিক্ষার ভার পড়িত। এই সকল শিক্ষয়িত্রীও প্রাসাদের নর্ত্তকী।

বালিকারা শুধু নৃত্যগীত শিখিত না, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষাও করিতে হইত। শিক্ষাপ্রণালী এমনই ছিল যে, তাহাদিগকে প্রত্যেক গানকে মূর্ত্তি দিতে হইত— নৃত্য ও সঙ্গীতে রাগরাগিণী যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীনযুগের কীর্ত্তিকথা তাহাদের গানে যেন শরীরী হইয়া উঠিত। তাহাদের দেহে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমাণিক্যখচিত বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ শোভা পাইত—প্রত্যেকের দেহে অলঙ্কারের ওজন প্রায় ৩ সের পর্য্যন্ত হইত। মন্দিরের আদর্শে তাহাদের মাথায় মুকুট শোভা পাইত।

ক্মার নৃত্যপরায়ণা সুন্দরী নর্ত্তকীবৃন্দ।

নৃত্য শিক্ষার জন্য বালিকাদিগকে দীর্ঘকাল কঠোর দৈহিক কষ্টও সহ্য করিতে হইত। কমনীয় দেহলতাকে যদৃচ্ছ নমনীয় করিবার জন্য, বাহু ও পদদ্বয়কে সঙ্গীত-বাদ্যের তালে তালে নিপুণভাবে চালনা করিবার জন্য বহু পরিশ্রম ও আয়াসস্বীকার অনিবার্য্য ছিল। হস্ত, পদ, অঙ্গুলী—দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাহাতে সম্পূর্ণ নমনীয় হয়, সে জন্য দেহের উপর কঠোর পীড়ন হইত। কাম্বোডিয়ার রাজসভায় এখনও এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী বিদ্যমান আছে।

মন্দিরটিকে সংস্কৃত ও পূর্ব্বাবস্থায় আনিবার পর ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ এখনও নূতন তথ্য আবিষ্কারে ভগ্নস্তূপ-মধ্যে পরিশ্রম করিতেছেন। এই রহস্যময় নগরের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছেন। যে জাতি সর্ব্বপ্রথম এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যে উপনীত না হইয়া তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন না।

আকাশপথে বৈদ্যুতিক আলো

রাত্রিকালে বিমানসমূহ যাহাতে নিরাপদে কোনও ষ্টেশনে অবতরণ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আমেরিকায়, আকাশপথ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ওহিও—ডেটনে এ বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একটি মোটরযুক্ত গাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদনের সরঞ্জাম সন্নিবিষ্ট; উহা হইতে ৩০ কোটি বাতির শক্তিবিশিষ্ট বিপুল আলোক-প্লাবন নির্গত হইয়া আকাশ-পথে প্রবাহিত হয়। আলোক-রশ্মি যন্ত্রপথে বহির্গত হইয়া একটি বড় reflector বা দর্পণ-বৎ পদার্থে প্রতিহত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; প্রত্যেক রশ্মির আয়তন ৩৬ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট। রাত্রিকালে যে সকল বিমানপোত আকাশপথে ধাবিত হইবে, তাহাদের পরিচালকগণ বহুদূর হইতে এই আলোকরশ্মি নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব পোতকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন হইলে নিরাপদে উপযুক্ত স্থানে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবে। পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ৭৫ হইতে ১ শত মাইল দূর হইতে এই আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইবে। যুদ্ধজাহাজের জন্য অনুরূপ আলোক-বিকীর্ণ করিবার ব্যবস্থা সমুদ্রবক্ষে ইতঃপূর্ব্বে হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থলপথে এইরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম হইল। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ডাক বিভাগ আকাশপথে ডাক পাঠাইবার কল্পনা করিতেছেন; রাত্রিকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিমানপোত হইতে ডাক বিলি করিবার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। বিমান হইতে নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে রাত্রিকালে ডাকের দ্রব্যাদি নামাইয়া দিতে গেলে সেই স্থানে উজ্জ্বল আলোক রাখিবার প্রয়োজন হইবে, এই কল্পনা হইতেই উল্লিখিতভাবে আকাশপথকে আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত হয়। প্রতি শত মাইল দূরে এক একটি ষ্টেশন রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

চৌদ্দপোয়া মানুষের ছয় হাত দাড়ী

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের মিসিগ্যান প্রদেশের ব্রাইটন নগরে জন, জে, ট্যানার নামে এক ব্যক্তির জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই ছিল যে, সে তাহার শ্মশ্রুর দীর্ঘতায় জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ট্যানারের বয়স এখন ৮৪ বৎসর। ৫০ বৎসর বয়স হইতে সে অতি যত্নে এই শ্মশ্রু রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে তাহা ৯ ফুট দীর্ঘ হইয়াছে। তাহার আশা আছে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা ১২ ফুটে পরিণত হইবে। যাহাতে শ্মশ্রুর জন্য কায-কর্ম্মে বিঘ্ন না ঘটে, এই জন্য ট্যানার উহা তাহার পেণ্টালুনের কোমরবন্ধে আঁটিয়া রাখে। অনেক সার্কাসওয়ালা ও অন্যান্য ক্রীড়া-তামাসাপ্রদর্শক ট্যানারকে তাহাদিগের রঙ্গালয়ে গিয়া দাড়ী দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে এবং সে জন্য অনেক টাকার লোভও দেখাইয়াছে; কিন্তু ট্যানার তাহাদের সাধ্যসাধনায় কোনমতে সম্মত হয় নাই। টাকা লইয়া সে তাহার শ্মশ্রু-শোভিত মুখমণ্ডল কাহাকেও দেখাইবে না। তাহার বয়স শতবর্ষ পূর্ণ হইলে এবং শ্মশ্রু ১২ ফুট দীর্ঘ হইলে সে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক আবার নূতন জীবনের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইবে।

অপূর্ব্ব প্রতিযোগিতা

মার্কিণদেশের কোনও প্রসিদ্ধ সার্কাসে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। উল্লিখিত সার্কাসে এক জন খর্ব্বকায়া

নারী ও এক বিরাটদেহ পুরুষ আছে। পুরুষটি দৈর্ঘ্যে ৮ ফুট ১ ইঞ্চি এবং নারী মাত্র ২ ফুট। উভয়েরই চেষ্টা কে কত বেশী সংখ্যক লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিদ্বেষের অবকাশ নাই। সার্কাসের দর্শকদল উভয়কেই এ পর্য্যন্ত সমান সম্মান দিয়া আসিয়াছে। বালক-বালিকার দল অতিকায় পুরুষটির ভক্ত; কিন্তু বয়োবৃদ্ধের দল এই ক্ষুদ্র মানবিকার পক্ষপাতী। সার্কাস-কর্তৃপক্ষ অধুনা উভয়কেই এক সঙ্গে রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। একটি প্রশস্ত ও দীর্ঘ তক্তার উপর পিয়ানো রক্ষিত হয়; মানবিকা আসনে বসিয়া পিয়ানো বাজাইতে থাকে; বিরাটকায় পুরুষটি দুই হস্তে তক্তাটি তুলিয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করে। দর্শকদলের করতালিধ্বনিতে সমগ্র সার্কাস তখন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এই বিচিত্রদর্শনা মানবিকার বয়স ২৩ বৎসর।

বিরাটদেহ পুরুষ ও মানবিকা—খর্ব্বকায়া নারী পিয়ানো বাজাইতেছে।
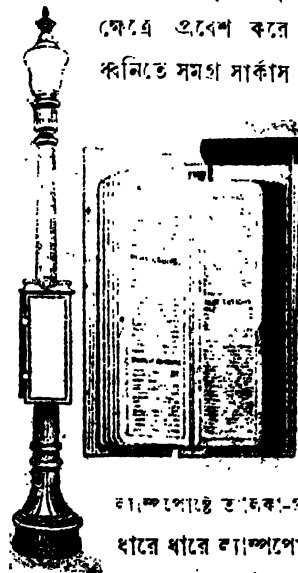
ল্যাম্পপোষ্টে তালিকা বহি

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী নগর-সমূহে, রাজপথের ধারে ধারে ল্যাম্পপোষ্টে ডাইরেক্টারী বহি রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে প্রহরীদিগের কাযের সুবিধা বেশী হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই নগরসংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, সকল বিষয়ের সংবাদ ডাইরেক্টারী বহিতে থাকে। ল্যাম্পপোষ্টে ক্ষুদ্রাকার 'ডাইরেক্টারী' সন্নিবিষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে। এলুমিনিয়ম নির্ম্মিত ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বহির পাতাগুলি ৬ ইঞ্চ প্রশস্ত ও ২০ ইঞ্চ দীর্ঘ। ছাপার অক্ষরগুলি এমনভাবে মুদ্রিত যে, জল-ঝড়ে শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। কেহ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, রাজপথের প্রহরী উহার সাহায্যে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে। যখন প্রয়োজন না থাকে, বইখানি ল্যাম্পপোষ্টের আধারে বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও আছে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য আমেরিকা সকল বিষয়েই অগ্রণী।

ল্যাম্পপোষ্টে তালিকা-গ্রন্থ।

প্রকাণ্ড ক্ষুর ও কাঁচি

জনৈক শিল্পী একখানা কাঁচি ও একটি ক্ষুর প্রদর্শনীর জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহাদের প্রত্যেকের ওজন ১ শত ৫৬ পাউণ্ড বা ২ মণের কাছাকাছি। যন্ত্রগুলিতে খুঁটিনাটি সকল অংশই লক্ষিত হইবে; কাঁচি যেমন খুলা ও মোড়া যায়, ক্ষুর যেমন মুড়িয়া খাপের মধ্যে রাখা যায়, শিল্পী সে সকল অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখেন নাই। ক্ষুর ও কাঁচি তীক্ষ্ণধার।

বিরাট ক্ষুর ও কাঁচি।

দশ ফুট প্রশস্ত জমীর উপর পাঁচতল গৃহ

লণ্ডন সহরে মাত্র ১০ ফুট প্রশস্ত জমীর উপর একটি পাঁচতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পৃথিবীতে এত স্বল্প-পরিসর ভূমির উপর এরূপ অট্টালিকা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। লণ্ডনের রেল-কোম্পানী এই ভবনের মালিক। দূর হইতে দেখিলে মনে হইবে যেন একটি উন্নতশীর্ষ প্রাচীর দাঁড়াইয়া আছে। এই বিচিত্র অট্টালিকার এক পার্শ্বে রাজপথ, অন্য পার্শ্বে রেলপথ। ১০ ফুটের অধিক প্রশস্ত ভূমি পাইবার উপায় ছিল না, অথচ এই সঙ্কীর্ণ জমী এতই মূল্যবান্ যে, রেল-কোম্পানী অনর্থক তাহা ফেলিয়া রাখিতে পারেন নাই। লণ্ডন-সেতুর সন্নিহিত এই অট্টালিকা দেখিবার জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শক সমবেত হয়।
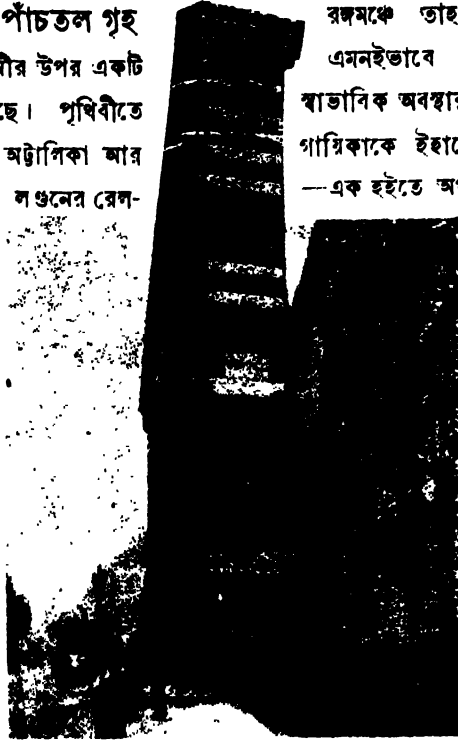
বিচিত্রদর্শন অট্টালিকা।

অভিনব মুখোস

আমেরিকার কোনও রঙ্গালয়ে ১২ জন গায়িকাকে সমান পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া সমান আকারবিশিষ্ট দেখাইবার জন্য আয়োজন হইয়াছে। একই আকারের মুখোস পরিয়া রঙ্গমঞ্চে তাহারা গান গাহিবে। এই মুখোস এমনইভাবে নির্ম্মিত যে, প্রত্যেকের মুখভঙ্গী স্বাভাবিক অবস্থার মত প্রকাশ পাইবে। দ্বাদশ জন গায়িকাকে ইহাতে দেখিতে একই প্রকার হইবে —এক হইতে অপরের পার্থক্য কোনওমতে লক্ষিত হইবে না। সৌন্দর্য্যের লীলা, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি যাবতীয় মনোবৃত্তির বিকাশ এই বিচিত্র মুখোস থাকা সত্ত্বেও প্রতিফলিত হইবে।

গায়িকাদিগের মুখে বিচিত্র মুখোস পরান হইতেছে।

জলেভাসা চেয়ার

গ্রীষ্মকালে জলের উপর ভাসিয়া আরাম করা, ধূমপান করা, সংবাদপত্র পড়া আজকাল একটা 'ফ্যাসান' হইয়াছে। এ জন্য মার্কিণ মুলুকে 'কর্কের' অপেক্ষাও লঘুভার এক প্রকার কাষ্ঠ হইতে চেয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার হাতল দুইটি অশ্বক্ষুরাকৃতি, সমস্তটাই মোটা "ক্যাম্বিস" দিয়া আবৃত। কেদারায় বসিয়া বাহুতে হাত রাখিয়া স্নানার্থী জলে ভাসিতে থাকে; করপল্লবের সাহায্যে জল কাটিয়া যে দিকে ইচ্ছা ভাসিয়া যাওয়া চলে।

চেয়ারে বসিয়া স্নানার্থী যদৃচ্ছ ভাসিয়া চলিয়াছে।

দৃষ্টিলাভ

১

একটা মাঝারি পেতে করিয়া বাজার হইতে তোলা লইয়া ভজহরি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল—"ও গো, ও গিন্নি, বাজার রাখ।—শুনছ, কোথায় গেলে, ও গো!"

ভজহরির দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী অচলকুমারী তখন রান্নাঘরে এটা ওটা গুছাইতেছিল ও মনে মনে রাগ করিতেছিল। এত বেলা হইল, তবু স্বামী বাজার হইতে ফিরিলেন না; তরি-তরকারি ঘরে একটাও নাই যে, রান্না চড়াইয়া দেওয়া হইবে। ভাতকয়টি রাঁধিয়া বসিয়া আছে। মাছ আইসে কি না দেখিয়া তবে ডালের ব্যবস্থা হইবে। এমন সময় স্বামীর ব্যগ্র-আহ্বান অচলকুমারীর কানে গেল।

ইচ্ছা করিয়াই একটু দেরী করিয়া—যেন কত কাজে ব্যস্ত এই ভাবটি দেখাইয়া—অচলকুমারী দুয়ারের গোড়ায় আসিয়া বলিল—"অত চীৎকার ক'রে গাঁ মাথায় কচ্ছ কেন গা? কি বাজার এনেছ যে, একেবারে সাতটা মুটে দরকার হবে!"

স্বামীর হাত হইতে সে বাজারের পেতেটি লইল। বাজার দেখিয়াই অচলকুমারীর পিত্ত জ্বলিয়া গেল। বেলা ১২টার সময় স্বামী বাজার হইতে আনিয়াছেন, চারটা বেগুন, আধখানা থোঁড়, দুই মুঠা শাক, একটা অপুরস্ত কাঁচকলা, একটি পাকা কলা এবং এক ইঞ্চি চওড়া ও ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একখণ্ড বিলাতী কুমড়া।

বাজারের পেতেটি রান্নাঘরের মেঝেয় আছড়াইয়া অচলকুমারী বলিল—"ঠিক দুপুর বেলা এই বাজারের ছিরি! আমি এখন কি দিয়ে কি করি? তাও কি সময়ে আসবে একটু! আর এরি জন্য এত জাঁক ক'রে ডাক!"

ভজহরি গৃহিণীর এই রাগটুকু গায়ে না মাখিয়াই বলিল—"কি করি, গিন্নি! তোমার জিনিষ বউনি না হ'লে কি কেউ দিতে চায়! সবারই কিছু কিছু বিক্রি হবে, তবে তো দেবে!"

"তবে আর কি, কেতার্থ হয়ে গেলাম আমি! মানুষে বাজার করে একটা হিসেব ক'রে। তা নয়, আধখানা থোঁড়, একটা বেগুন, সিকিখানা কুমড়ো; এতে কি বাজারের সুবিধে হয়, না মানুষে খেতে পারে?"

অচলকুমারীর শেষের কথাগুলায় রাগের চেয়ে দুঃখের ভাগটাই বেশী ছিল।

ভজহরি এবার দুঃখিত হইয়া বলিল—"যে যেমন দেবে, তাই তো নেব। এ তো নিজের ইচ্ছায় নেওয়া নয় যে, বেছে ক'রে বা ভাল দেখে নেব।"

"কিনে আনলেই পার; কোন্ দু'পয়সার কুচো চিংড়ি আনতে পারলে! বাজারে ত আগুন লাগেনি! দু'টো পয়সারও মুরোদ নেই?"

কথাগুলা যেমন রূঢ়, বলিবার ভঙ্গীও তেমনই রুক্ষ। ভজহরি আর কোন উত্তর না করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষাকাল। বাহিরের রোয়াকটি ভিজিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে সেওলা জন্মিয়াছে। বাহিরের ঘরের বদলে ভজহরি বাহিরে একটা ছোট রোয়াক গাঁথিয়া তাহার উপর একখানা ছোট চালা তুলিয়াছিল; বাহিরের লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে সেইখানেই করিত। গৃহিণীর নিকট হইতে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া ভজহরি সেইখানে গিয়া বসিয়া পড়িল।

ভজহরি বাহিরে আসিলে ১৬ বৎসর বয়সের একটি মেয়ে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া চোখের উপর হাত রাখিয়া রান্নাঘরে আসিল। এটি ভজহরির প্রথম পক্ষের কন্যা; নাম দুর্গা।

অচলকুমারী স্বামীকে কতকগুলি দুর্ব্বাক্য বলিয়া একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল; দুর্গাকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"তুমি আবার ধোঁয়ার মধ্যে কেন এলে, দুর্গা? এখনিই চোখ বাড়বে।"

দুর্গা তাহার কোন উত্তর না দিয়া তাহার আঁচলের এক প্রান্ত হইতে কতকগুলি বড়ি বাহির করিয়া বলিল—"বউমা, বড়ি তুমি তো ভালবাস, এই বড়িকটা কাঁচকলা

আর দুটো ছোলাভিজে দিয়ে ডাল্নার মত কর; আর শাক কটি ভাজ। ডাল চড়িয়ে দাও দেখি! আমি কুট্নো কুটে দিচ্ছি।"

অচলকুমারী লোক নেহাৎ খারাপ ছিল না, কিন্তু একটু বদ্‌রাগী ও আহারটা নেহাৎ খারাপ হইলে বড়ই চটিয়া যাইত। বড়ি দেখিয়া তাহার রাগও একটু কমিল। দুর্গাকে দেখিয়া একটু লজ্জিতও হইল। সে বলিল—"তোমাকে আর কুট্নো কুট্তে হবে না, ভারি তো কুট্নো, আমিই কুটে নেব এখন।— ইস, চোখ যে আজ বড্ড লাল হয়েছে।"

দুর্গা ততক্ষণ বঁটি লইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। অচলকুমারী তাহার হাত হইতে বঁটি লইতে আসিল। দুর্গা বঁটিটা সরাইয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"থাম দেখি, বউমা, অত ব্যস্ত হোয়ো না। একটু চোখ লাল হ'লে মেয়ে মানুষ মরে না।"

একটু আগে অচল স্বামীকে যে দুর্বাক্য বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়াই যে দুর্গা রাগ করিয়াছে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু দুইজনের কেহই সে কথার উল্লেখ করিল না। অচলকুমারী চুপ করিয়া ডাল চড়াইয়া দিল; দুর্গা কুট্না কুটিয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিতার শয়ন ঘরে আসিয়া দুর্গা কলিকায় বেশ করিয়া তামাক সাজিয়া রান্নাঘরে আর একবার আসিয়া উনুন হইতে একখণ্ড জলন্ত কাঠ তুলিয়া লইল ও তাহার অগ্রভাগ মাটীতে আঘাত করিয়া আগুন ভাঙ্গিয়া লইল; তাহার পর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির সাহায্যে সেগুলি কলিকায় তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিল।

ভজহরি বড়ই ম্রিয়মান হইয়া বাহিরে বসিয়া ছিল। দুর্গা হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে সেখানে গিয়া পিতার হাতে হুঁকা দিল।

হুঁকা হাতে লইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিতেই ভজহরি শিহরিয়া বলিয়া উঠিল —"এ কি, চোখ কি হয়েছে, মা! আর এই চোখ নিয়ে আগুনে ফুঁ দিচ্ছ?"

আঁচল দিয়া চোখটা একবার মুছিয়া ফেলিয়া দুর্গা বলিল —"তেমন যন্ত্রণা হচ্ছে না, বাবা! আপনি তামাক খেয়ে ভিতরে আসুন; নাইবেন। পূজোর জায়গা কখন হয়েছে।"

ভজহরি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল —"এই দেখ, মা, ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা নিয়ে আস্‌বো, তাও ভুলে গেছি! বাজারে গেলেই তিনচার ঘণ্টা কেটে যায়। এখন তো ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।"

ভজহরি আপনার কাছে আপনি বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল।

দুর্গা সে কথায় কান না দিয়া বলিল—"দেরী করবেন না, বাবা! নেয়ে পূজো ক'রে একটু জল মুখে দিন্; বেলা বারোটা বেজে গেছে।"—বলিয়া ধীরপদে দুর্গা ভিতরে চলিয়া আসিল।

রোয়াকের এক কোণে ভজহরি স্নান করেন। সেখানে ছোট পাতরের বাটিতে আধবাটি সরিষার তৈল ও গামছা এবং জানালার উপর বহু পুরাতন রঙ্গ উঠা একখানা চেলির কাপড় রাখিয়া দিয়া দুর্গা চোখের যন্ত্রণায় ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল।

২

ভজহরি বন্দ্যোপাধ্যায় নৈকষ্য কুলীন। নিবাস— চাকদহ।

ভজহরির পূর্ব্বপুরুষের কৌলিন্যের এমন প্রচণ্ড ইতিহাস আছে, যাহা শুনিলে এখনও নাকি রোমাঞ্চ হয়। তাহারই পিতামহের দুই ভগিনীর বিবাহযোগ্য বর না পাওয়ায় ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিতে হয়, অবশেষে মরণাপন্ন এক সুযোগ্য বৃদ্ধের সহিত একই রাত্রিতে, একই সময়ে তাহাদের দুইজনেরই—উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং প্রভাতেই তাহাদের বৈধব্যদশা ঘটে। বেশী দূর যাইতে হইবে না, ভজহরির পিতার পর্য্যন্ত তিন বিবাহ; এখনও নদীয়া জিলায় নাশরফুলি গ্রামে তাহার এক বিমাতা পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন।

কিন্তু ভজহরির সময় দিনকাল অল্প খারাপ হইয়া আসিয়াছিল এবং তাহার ফলে ভজহরিকে একসঙ্গে মাত্র একটি বিবাহ করিয়া পরিতুষ্ট হইতে হইয়াছিল। দিনকাল ছাড়া ইহার আরও একটি কারণ ছিল। ভজহরির দাদা নরহরি বিবাহের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং তো বিবাহ করেনই নাই, উপরন্তু ভজহরিকেও একাধিক বিবাহ করিতে দেন নাই। সেই গ্রামেরই হাইস্কুলে তিনি মাষ্টারী করিতেন ও লিখাপড়া লইয়াই থাকিতেন। তিনি দুর্গাকে পর্য্যন্ত অল্প বয়সে অনেক লিখাপড়া শিখাইয়া

ছিলেন। দুর্গার বয়স যখন ১২ বৎসর সেই সময়ে নরহরি-বাবু মারা যায়েন। তাহার এক মাস পরেই ভজহরির স্ত্রীবিয়োগ হয়।

দুইটি শোক পাইয়া ভজহরি পাগলের মত হইয়া যায়। মাস কয়েক পরে ষোড়শী অচলকুমারীকে বিবাহ করিয়া তবে সে অনেকটা শান্ত হয়।

কিন্তু ভজহরি আদৌ লিখাপড়া শিখে নাই এবং অপর এমন কোন গুণই তাহার ছিল না, যাহার দ্বারা সে দরকার মত পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। পৈতৃক জমীজমা হইতে যেটুকু উপস্বত্ব মিলিত, তাহাতে এবং গ্রামের জমীদারের দেওয়া 'তোলায়' অতি কষ্টে তাহার দিন কাটিত; কোন গতিকে দুইটি ভাতের সংস্থান ছিল এই মাত্র।

অচলকুমারীর পিতা জমীদার বাড়ীর গোমস্তা ছিলেন; কাজেই উপরি পাওনা কিছু ছিল। আর জমীদার কায়স্থ হওয়ায় সিধাটা আশটার প্রসাদে খাওয়াটা বেশ ভালই হইত। তোলার তরকারীতে সে সুবিধা ছিল না। যদিও একটু বেশী বয়সেই অচলকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের পর চারিটা বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি খারাপ খাওয়াটা সে এখনও অভ্যাস করিতে পারে নাই এবং নেহাৎ ছেলে মানুষের মত এখনও সে রাগ করিয়া থাকে।

কাল মাছ না থাকার জন্য অচলকুমারী বড়ই রাগ করিয়াছিল, সেজন্য ভজহরি সকালে উঠিয়াই জেলে পাড়ায় গিয়াছিল। উদ্দেশ্য, ২।১ জন ব্রাহ্মণ-ভক্ত ধীবরের নিকট হইতে অবশ্যই দুই একটি মৎস্য উপহার পাওয়া যাইবে।

বেলা ৮ টার সময় ভজহরি হাস্যবিকশিতমুখে গামছায় বাঁধিয়া অনেক গুলি মৌরলা মাছ লইয়া বাড়ী ঢুকিতেই অচলকুমারী বলিয়া উঠিল—"হ্যাগা, তোমার কি আক্কেল গা? মেয়েটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে, আর তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?"

ভজহরির মনে পড়িয়া গেল, তাই তো মেয়েটির ঔষধের কোন ব্যবস্থাই যে করা হয় নাই! মাছের পাত্রে মাছগুলি কোন গতিকে রাখিয়া দিয়া হাত ধুইয়া দ্বার হইতে শয্যার উপর মেয়েটির লুণ্ঠিত দেহের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। পরমুহূর্ত্তে "যাই ডাক্তারকে একবার ডেকে আনি" বলিয়া সে যেমন বাহির হইবে, অচলকুমারী জানাইয়া দিল যে, এখন ডাক্তারখানায় যাইতে হইবে না; সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"কে ব্যবস্থা করলে?" সঙ্কুচিত হইয়া ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল।

ঠিক সেই সময়ে খুড়ীমা বলিয়া সাড়া দিয়া তাহাদেরই গ্রামের যুবক প্রিয়ব্রত বাড়ীর ভিতর আসিল। তাহার হাতে কাগজে মোড়া Boric cottonএর একটা বাণ্ডিল।

ভজহরিকে সম্মুখে দেখিয়া প্রিয়ব্রত তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন, কাকা?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি তো ভালই আছি। দুর্গার আমার চোখের বড্ড অসুখ। আমিও দেখ্‌তে পারিনে! মায়ের বড় কষ্ট হচ্চে।"

কথাগুলি বলিয়া ভজহরি কাঁদিয়া ফেলিল।

ভজহরি লোকটি যখন যাহা সম্মুখে পড়ে, তাহাই বড় করিয়া দেখে এবং তাহাতেই অভিভূত হইয়া পড়ে; ইহাই তাহার স্বভাব।

প্রিয়ব্রত ভজহরিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল -"ডাক্তার বাবুকে আমি ডেকে এসেছি, তিনি আসছেন। আপনি ভাব্‌বেন না।"

তার পর অচলকুমারীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "খুড়ী-মা, চট্ ক'রে একটু জল গরম ক'রে দিন তো, আমি চোখটায় একটু compress দিয়ে দেব।"

ভজহরি ব্যাকুল হইয়া বলিল—"সে কি, বাবা?"

প্রিয়ব্রত বুঝাইয়া দিল—"গরম জলে তুলো ভিজিয়ে নিংড়ে চোখে তাপ দেওয়া হবে।"

"ওতে কি হবে?"

"চোখের যন্ত্রণা কম্‌বে।"

প্রিয়ব্রত বাহিরে জুতা রাখিয়া, যে ঘরে দুর্গা শুইয়া ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

এটি দুর্গার শয়ন-ঘর; পুরাতন জীর্ণ ঘর, কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের একটা সামান্য জিনিষও অগোছাল নাই। মাথার শিয়রে একটি ছোট আলমারীতে খানকয়েক বাছা বাছা সরল ও সুন্দর ইংরাজী বই, অনেকগুলি বাঙ্গালা বই, দুইখানি সুদৃশ্য বাঁধান খাতা। ঘরের দেওয়ালে ভাল ভাল কবিতার দুই একটি ছত্র কার্পেটে বুনিয়া লিখিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রিয়ব্রত দুর্গার মাথার কাছে একটা দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দুর্গা, এখনও সেই রকম কষ্ট হচ্ছে?"

চক্ষু মুদিয়া অসহ্য যন্ত্রণাতেও দুর্গা নীরবে পড়িয়া ছিল। অতি ধীরে সে বলিল—"সেই রকমই।"

ভজহরি আসিয়া শয্যার উপর মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

অচলকুমারী গরম জল আনিয়া দিতেই প্রিয়ব্রত সব ঠিক করিয়া লইয়া শুশ্রূষায় রত হইল।

অসহ্য যন্ত্রণার উপর কোমল উষ্ণ তুলার আদ্র উত্তাপে একটু একটু করিয়া যন্ত্রণার উপশম হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে দুর্গা একবার বলিল—"আঃ!"

প্রিয়ব্রত চোখের উপর তুলার চাপ নরম করিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কমেছে একটু?"

"অনেক কমেছে। উঃ, কি যন্ত্রণাই হচ্ছিল ক'দিন!"—বলিয়াই কথাটা তাহার পিতাকে আঘাত দিতেছে মনে করিয়া দুর্গা চুপ করিল।

ভজহরি উঠিয়া আসিয়া রান্নঘরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাগা, টাকা আছে তো ভিজিটের?"

অচলকুমারী বলিল "টাকা কোথায় গা? মোটে তো আট আনা পয়সা ছিল আমার হাতে, তারও তো তিন আনা খরচ হয়ে গিয়েছে।"

"তা হ'লে ভিজিটের কি হবে!"—ভজহরি অকূল পাথারে পড়িল।

অচলকুমারী বলিল-"তোমার টাকার ভরসা ক'রে প্রিয় যেন ডাক্তার আনছে! দুদিন বাদে ওই তো জামাই হবে, তা বুঝি মনে নেই?"

ভজহরি আশ্বস্ত হইল।

এ দিকে দুর্গা অনেকখানি আরাম পাইয়া বলিল—"থাক্ আর দিতে হবে না। উঃ! তোমার হাত দু'খানা যে একেবারে লাল হয়ে গেছে। আর দিও না, ফোস্কা হবে যে!"

"ভয় নেই, ননীর শরীর নয় আমার। আর একটু দিই!"

"না, আমি আর দেব না!" বলিয়া দুর্গা জোর করিয়া উঠিয়া বসিল।

বাহির হইতে ডাক আসিল—"বাঁড়ুয্যে মশাই কোথায়?"

"এই যে ডাক্তার বাবু এসেছেন।" বলিয়া প্রিয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

৩

প্রিয়ব্রত এই গ্রামেরই ছেলে; কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, পড়ে। সে বাল্যেই পিতৃহীন হইয়া মায়ের দ্বারা লালিতপালিত হয়। কেহ দেখিবার ছিল না, তাই প্রথম দিকে প্রিয়ব্রতের পড়াশুনায় মোটেই লক্ষ্য ছিল না। দুর্গার জ্যেঠামহাশয় নরহরি ছেলেটিকে বুদ্ধিমান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি স্কুলে ছেলেটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, বাড়ী আসিয়া তাঁহার কাছে পড়িতে।

সে সময়ে তাহার বয়স বার বৎসর ও দুর্গার বয়স ছয়। সেই হইতে দুই জনে এক সঙ্গে নরহরির কাছে পড়িতে আরম্ভ করে। দুই জনের ভিতরে সেই হইতেই একটি প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল। একটু বেশী বয়সে পড়া আরম্ভ করার জন্য এণ্ট্রান্স পাশ করিতে প্রিয়ব্রতের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। ১৯ বৎসর বয়সে সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় এফ, এ পড়িতে গেল। ঠিক সেই সময়ে নরহরি মারা যায়েন এবং ভজহরির কষ্টের অবধি থাকে না। ভজহরির স্ত্রীবিয়োগের ও দ্বিতীয়বার বিবাহের বৎসর খানেক পরই দুর্গার বিবাহের বয়স হইয়া উঠিল; পাড়াগাঁয়ের হিসাবে ছাড়াইয়া গেল। দুর্গার বয়স পনের উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন আর ভজহরিরও চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। অনেক চেষ্টা করিয়া একটি পাত্র সে হস্তগত করিল। পাত্রের বয়স ৪৫ বৎসর; দুইটি স্ত্রী পরলোকগত হইবার পর তিনি দুর্গাকে মাত্র ৫ শত টাকা লইয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই ৫ শত টাকা বসতবাটী ও ধানের জমী-বন্ধক দিয়া ভজহরিকে সংগ্রহ করিতে হইত।

প্রিয় কলিকাতা হইতে এক শনিবারে আসিয়া সব শুনিল। দুর্গার শেষটা এইরূপ বিবাহ হইবে, সে সহিতে পারিল না। মায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সে দুর্গাকে বিবাহ করাই স্থির করিল। প্রিয়ব্রতের মা আসিয়া কথাটা পাড়িলেন এবং জমী ও বাড়ী বন্ধক দিতে নিষেধ করিলেন।

ভজহরির পিতার প্রাণ উহাতে পুলকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবারও কিছু ছিল। বংশ-গরিমায় প্রিয়ব্রত ভজহরির অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু

অচলকুমারী তাহার স্ত্রীবুদ্ধিতে, বোধ করি বা, স্নীহদয় দিয়া বেশ করিয়া বুঝাইল যে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মেয়েটাকে আর বুড়ার হাতে দিয়া কায নাই। মেয়েটা বাঁচুক, তুমিও রক্ষা পাও, প্রিয়ব্রতের হাতেই ওকে দাও।

অপর দুই এক জন হিতৈষীও তাহাকে বলিল—"তোমার তো ছেলে নেই, কার জন্য কুল রাখ্‌তে যাবে?"

কথাগুলির ভিতর অনেকখানি যুক্তি ছিল। ভজহরি এক প্রকার সাগ্রহেই সম্মতি দিয়াছিল। বিবাহের দিন স্থির হইবে, এমন সময় প্রিয়ব্রতের মা হঠাৎ মারা গেলেন। কাযেই বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রহিল। কেহ কেহ বিধান দিয়াছিলেন, তিন মাসের পর সপিণ্ডকরণ সারিয়া লইয়া বিবাহ চলিতে পারে। কিন্তু এ বিধান প্রিয়ব্রত ও দুর্গা উভয়ের কাহারও মনোমত হয় নাই। তাহারা কর্ত্তব্যবোধে কালাশৌচের জন্য অপেক্ষা করাই স্থির করিয়াছিল। বিবাহের আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে।

মাসে দুইবার করিয়া প্রিয়ব্রত বাড়ী আইসে; কিন্তু এবার এক মাস আসিতে পারে নাই। এক মাসের পর আসিয়া দেখিল, দুর্গার চোখের অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। চোখউঠা প্রিয় এক মাস আগেই দেখিয়া গিয়াছিল; সেটা যে অযত্নে এমন বাড়িয়া যাইবে, ইহা সে ভাবে নাই। তাহার উপর দুর্গা নিজহাতে পত্র লিখিয়াছিল, তাহারা বেশ ভাল আছে।

ডাক্তার চক্ষু দেখিয়া যাহা বলিলেন, তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে। চোখ বেশীর ভাগ বন্ধ রাখার জন্য এবং আরও অন্যান্য কারণে ভিতরে Keratitis— এখন যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞকে দেখান দরকার; নহিলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবারই আশঙ্কা বেশী।

কলিকাতা লইয়া গিয়া দেখানই স্থির হইল অর্থাৎ প্রিয় স্থির করিল।

ভজহরি বলিল—"যা কিছু করতে হয়, তুমিই কর, বাবা! আমি ও-সবের কি জানি বল? কিন্তু মেয়েটার চোখ দুটো যেন থাকে।"

সে দিন আর যাওয়া ঘটিল না। পরদিন সকালে প্রিয় বাড়ীতে গাড়ী ডাকিয়া আনিল ও সব ব্যবস্থা করিয়া দুর্গাকে গাড়ীতে উঠাইল। প্রিয়ব্রতের এই আগ্রহ, তাহার এই সঙ্গ চোখের অসুখের মধ্যেও দুর্গার বেশ ভাল লাগিতেছিল। ষ্টেশনে পৌছিয়া প্রিয় দুর্গাকে ওয়েটিং রুমে বসাইয়া টিকিট করিতে গেল।

ওয়েটিং রুমে এক জন মধ্যবয়সের স্ত্রীলোক পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া ছিলেন। দুর্গা আসিতেই তিনি আদর করিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন—"এস মা, সেই কখন থেকে একলাটি মুখ বুজে ব'সে আছি, দুটো কথা কয়ে বাঁচি।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"—দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল।

"আমি যাব হালিসহর, মা। সেখানে আমার মেয়ের বাড়ী। সে খালাস হবে এই মাসে। সংসারে আর কেউ নেই; তাই জামাই নিতে এসেছিলেন। তোমার সঙ্গে উনি বুঝি জামাই? শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বুঝি?"

দুর্গা সলজ্জভাবে জানাইল যে, উনি এখনও তাহার স্বামী হয়েন নাই, তবে শীঘ্রই হইবেন; সে কলিকাতায় যাইতেছে চোখ দেখাইতে।

ইত্যবসরে গাড়ী দেখা দিল। প্রিয় আসিয়া মেয়েদের গাড়ীতে দুর্গাকে তুলিয়া দিয়া নিজে পাশের গাড়ীতে উঠিল।

সেই প্রাচীনাও দুর্গার সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিলেন। সমস্ত পথ দুই জন এক সঙ্গে বসিলেন, তাহার মধ্যে প্রাচীনাটি দুর্গার সম্বন্ধে সব সংবাদ জানিয়া লইলেন।

সব শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভাল কর নি, মা, বিয়েটা তোমরা এতদিন পেছিয়ে দিয়ে ভাল কর নি। আজকালকার দিনকাল, আর ব্যাটাছেলের মন তোমরা ত' জান না, মা, ভগবান্ না করুন, যদি চোখ না সারে, তা হ'লে উনি আর বিয়ে করতে চাইবেন না, কল্লেও আর সে টান থাকবে!"

হালিসহরে যখন প্রবীণা নামিলেন, তখন আর এক বার ঐ কথাটা দুর্গাকে বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন; বলিলেন—"লজ্জা ক'রো না, মা; বাড়ী ফিরে গিয়েই বিয়ের ব্যবস্থাটি আগে করবে, মা।"

দুর্গা সারা পথ এই চিন্তা লইয়াই চলিল এই কি ঠিক কথা! সে যদি আজ অন্ধ হইয়া যায়, প্রিয়ব্রতের ভালবাসাও কি তাহার দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইবে!

যদি তাহাই হয়, হয় তো পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া প্রিয় বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে না, কিন্তু মনে মনে হয় তো তাহাকে গলগ্রহ বলিয়াই স্থির করিবে। সে ক্ষেত্রে দুর্গার

কি উচিত হইবে, প্রিয়কে বিবাহ করিতে বাধ্য করা—এক দিন না বুঝিয়া না জানিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া?

না, দুর্গা প্রিয়কে বিপদে ফেলিবে না; যাহাকে ভালবাসে, তাহার গলগ্রহ হইবে না। কিন্তু যদি দৃষ্টিশক্তি হারায় এবং সেই সঙ্গে যদি প্রিয়কেও হারাইতে হয়, কি লইয়া সে থাকিবে?

দুর্গা এই সব ভাবনায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। গাড়ী শিয়ালদহে পৌঁছিলে প্রিয় যখন দুর্গাকে ডাকিতে গেল, তখন তাহার দুই চোখ বাহিয়া জলের ধারা বহিতেছে।

বিস্মিত হইয়া প্রিয় বলিল—"এ কি দুর্গা! কি হয়েছে?"

দুর্গার সামলাইয়া লইতে একটু দেরী হইল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া নামিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুর্গা বলিল—"গাড়ীতে হওয়া লেগে বেড়ে গেল যে, জলও পড়ছে তারই জন্যে।"

৪

কলিকাতা হইতে যখন দুই জনে আসিল, তখন দুই জনের উপর দিয়াই যেন একটা ভীষণ দুর্য্যোগ চলিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসককে চোখ দেখান হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, চোখের অবস্থা বিশেষ খারাপ। অস্ত্র করা ছাড়া আর উপায় নাই, তাও এখন হইবে না। এক বৎসর পরে চোখের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিলে অস্ত্র করিলে একটা চোখ বাঁচিতে পারে।

এই চক্ষু—যাহা সর্ব্বকার্য্যের মূলাধার, যাহা সৌন্দর্য্যের উৎস, যাহা দৃষ্টিতে অমৃত বর্ষণ করে, যাহা প্রিয়জনকে দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তাহা চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া আসিবে! ভাগ্য আসিয়া তাহার সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা বিছাইয়া দিবে! এই সুন্দর পৃথিবী, সুন্দরতর প্রিয়জনের মুখ—সব অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া যাইবে, থাকিবে শুধু জীবনব্যাপী গাঢ় অন্ধকার, পরানুগ্রহের বিভীষিকা, আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার দুর্ভাগ্য!

দুর্গার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। একটি দিনে তাহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গেল।

দুই মাস কাটিয়া গেল। প্রিয় বিবাহের কথা তুলিল দুর্গা বলিল, সে বিবাহ করিবে না।

ভজহরি কত করিয়া বুঝাইল। অচলকুমারী অনেক অনুরোধ করিল। প্রিয় কাতর হইয়া হাতে ধরিল। দুর্গা অটল রহিল; বলিল—আজ বাদে কাল যে অন্ধ হইবে, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। তাহার পিতা নৈকষ্য কুলীন; কুলীনের ঘরের মেয়ে কুমারী থাকিলে দোষ কি?

প্রিয় অনুনয় বিনয় করিল, রাগ করিল, ভয় দেখাইল—সে আর কখনও দেশে আসিবে না। দুর্গা উত্তর দিল, তুমি অন্যত্র বিবাহ করিও, কলিকাতায় তোমার যোগ্য পাত্রী অনেক পাইবে।

তখন প্রিয় রাগ করিল। বলিল, তাহার অহঙ্কার হইয়াছে; তাহাকে সে যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করে না, তাই এ সমস্ত মিথ্যা ওজর। সে দুর্গার কেহই নহে, সে-ও এবার ইহার প্রতিশোধ লইবে।

রাগ করিয়া প্রিয় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

দুর্গা কাঁদিয়া আপন মনে বলিল, আমি সব দুঃখ সহিতে পারিব; কিন্তু তোমার চক্ষুতে অন্ধ-স্ত্রীর উপর যে ঘৃণা ফুটিয়া উঠিবে—তোমার মনে যে নৈরাশ্য দেখা দিবে, সে কল্পনাও আমি সহিতে পারিব না।

মাস দুই পরে দুর্গা সংবাদ পাইল যে, প্রিয় লিখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া নন্-কো-অপারেশনে যোগ দিয়াছে, খদ্দর পরিয়া খালি পায়ে কলিকাতায় শুধু পিকেটিং করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রিয় কেন যে এমন করিল, দুর্গার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দেশময় তখন অসহযোগীদের উপর অনাচার চলিতেছিল। দলে দলে অসহযোগী যুবক নীরবে অনাচার সহ্য করিয়া হাসিমুখে জেলে যাইতেছিল।

ভয় পাইয়া দুর্গা প্রিয়কে চিঠি লিখিল—

"শ্রীচরণেষু,

আমায় ক্ষমা কর, তুমি ফিরিয়া এস। আমায় বিবাহ করিলে হয় তো তোমার জীবন ব্যর্থ হইবে বলিয়া আমি বিবাহে রাজী হই নাই। এখন ভুল বুঝিয়াছি। আমার চোখ থাকুক আর যাউক, আমি তোমারই হইব। নিজেকে আর বিপদে ফেলিও না। আমার উপর এমন করিয়া প্রতিশোধ লইও না! তোমার পায়ে পড়ি চলিয়া এস।

প্রণতা দাসী—দুর্গা।"

৫

এই চিঠি যখন কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল, প্রিয় তখন জেলে। পিকেটিং করিতে গিয়া তাহাদের দলের ২৫ জনের এক সঙ্গে জেল হইয়াছিল। তাহাদের দলপতির দয়ায় জেলে বসিয়াই সে এই পত্রখানি পাইয়াছিল। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না। তাহার অনুশোচনা হইতে লাগিল, কেন সে ব্যস্ত হইয়া এমন পন্থা গ্রহণ করিল—যাহা হইতে ফিরিবার আর উপায় নাই। অনুশোচনা তখন ফলহীন। প্রত্যহ সে পত্রখানি পড়িত আর চোখের জল ফেলিত।

দেড় বৎসর জেল খাটিয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া প্রিয় বাহির হইল। জেল হইতে বাহির হইয়াই প্রিয় দেখিল, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর দুয়ার ধরিয়া ভজহরি দাঁড়াইয়া, আর গাড়ীর ভিতর দুর্গা বসিয়া।

"আপনি এখানে, কাকা!"

ভজহরি প্রিয়ব্রতের শীর্ণ আকৃতির দিকে একবার চাহিয়া বলিল—"দুর্গা ছাড়লে না, বাবা! বল্লে খালাস পেলেই আবার কোথায় চ'লে যাবে; তুমি চল, বাবা। কি করি, তাই নিয়ে এলাম। জান তো একে, বাবা, যা একবার ধরে, তা আর ছাড়ে না। এখন গাড়ীতে ওঠ, বাবা!"

প্রিয় ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিল। দুর্গার চোখের পানে চাহিয়া সে চমকিত হইয়া গেল। সে চক্ষুতে দৃষ্টি নাই! তাহার হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। একটা সন্দেহ প্রিয়ব্রতের মনে উদিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"এক বছর পরে কল্‌কাতার সে ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিল?"

"কাকে দেখানোর কথা বলছ, বাবা?"—ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল।

"দুর্গাকে দেখানোর কথা।"

"আর, বাবা! তুমি চ'লে এলে, কে দেখাবে বল? আর এ মেয়ে কি সেই থেকে কারু সঙ্গে কথা কয়েছে, না, কারু সাম্‌নে বেরিয়েছে?"

"বলেন কি! সর্ব্বনাশ করেছেন!"—প্রিয় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে গাড়োয়ান পর্য্যন্ত নামিয়া পড়িয়াছিল।

পরে প্রিয় একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছেন এখন?"

ভজহরি বলিল—"দুর্গার এক মেসোমশায় সিম্‌লায় থাকেন। সিমলায় আমরা দুই দিন থেকে এসে রয়েছি। পাছে তুমি আবার কোথাও চলে যাও, সেই হয়েছিল দুর্গার ভাবনা।"

সিম্‌লায় দুর্গার মেসো মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াই প্রিয় একবার বাহির হইয়া তাহার এক পুরাতন বন্ধুর নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল। আহারাদি নামমাত্র সমাধা করিয়া প্রিয় দুর্গাকে লইয়া সেই ডাক্তারের কাছে গেল। যদি এখনও আশা থাকে! একটা চোখও কি হইবে না?

ডাক্তার মিত্রকে সে ভিজিটের টাকা দিয়া পূর্ব্বে তিনি রোগিণীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিল। ডাক্তারের যেন একটু একটু মনে পড়িল। দুর্গার উভয় চক্ষু তিনি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। চোখের পাতা ধরিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বারকয়েক খুলিলেন ও বন্ধ করিলেন। চোখের তারার কোন আকুঞ্চন বা প্রসারণ হইল না। সেই অক্ষিগোলকের উপর তিমিরহরণ আলোকের আর বিন্দুমাত্র প্রভাব ছিল না।

যতক্ষণ ডাক্তার দেখিতেছিলেন, প্রিয়ব্রত নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া ছিল। কি ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে আশার না নিরাশার? বিচারকের আদেশ শুনিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে অপরাধীর মত প্রিয়ব্রতের বুকে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ঝড় বহিতেছিল।

চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন—"না, আর আশা নেই।"

আতঙ্কে শিহরিয়া প্রিয় জিজ্ঞাসা করিল—"একটি চোখ? একটাও হ'তে পারে না?"

"না, কোন চোখেরই কোন আশা নেই। মাসকয়েক আগে এলে একটা হয় তো বাঁচত!"

তীব্র অনুশোচনা প্রিয়ব্রতের মুখে ফুটিয়া উঠিল। দুর্গার মুখখানি ক্ষণকালের জন্য একবার বিবর্ণ হইয়া আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিল।

সেই দিনই তাহারা চাকদহ রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌঁছিল। সারা পথ প্রিয়ব্রত নীরব ছিল। এই যে দুর্গাকে অন্ধ হইতে হইল, ইহাতে সে আপনার দোষই বেশী

করিয়া অনুভব করিতেছিল। কেন সে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল? না হউক বিবাহ, কেন সে দুর্গার চোখের চিকিৎসার জন্য দেশে থাকিল না?

বাড়ী পৌঁছিয়া ভজহরি অচলকুমারীর কথামত তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে গেল। অচলকুমারী রান্নার ব্যবস্থা দেখিতে লাগিল।

গৃহান্তরে প্রিয়ব্রত ও দুর্গা পাশাপাশি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। দুই জনের মধ্যে একটা যেন মীমাংসা ইহারই মধ্যে হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রিয়ব্রতের মন হইতে অনুতাপের মেঘ এখনও কাটে নাই।

দুর্গার দৃষ্টিহীন চক্ষুর পানে গভীর দুঃখের সহিত চাহিয়া প্রিয় বলিল—"যত দিন বেঁচে থাকব, কখন ভুলব না যে, আমারই দোষে তোমাকে এত বড় দুঃখ পেতে হ'ল।"

দুর্গা প্রিয়ব্রতের একখানি হাত হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"আর এর জন্য দুঃখ কেন করছ! আমার চোখ তো ফিরে পেয়েছি!"

কিছু না বুঝিয়া প্রিয় দুর্গার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা মিষ্ট হাসিয়া বলিল—"আজ থেকে আজীবন তোমার এই চোখ দুটি দিয়ে দেখ্‌ব!"

অনুমানে হাত দিয়া প্রিয়ব্রতের চোখ দুইটি খুঁজিয়া লইয়া সে সেই সজল চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে চুম্বন করিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

প্রেম

তোমায় নমি তোমায় নমি হে প্রেমসুন্দর,
দেহমনের মধুর মিলে অর্দ্ধনারীশ্বর।
অর্দ্ধ তোমার কঠোর ধবল,
অর্দ্ধ তোমার গৌর কোমল,
অর্দ্ধভালে তিলক, আধে খণ্ডশশধর।

(তোমার)—ভোলানাথের ভাবে বিভোর ঢুলু ঢুলু মন,
ঝরছে তাহে কুলু কুলু জাহ্নবী পাবন।
তারুণ্যময় তনু তোমার
তাহে উমার রূপ সুকুমার,
আধা উশীরাক্ত, আধা বিভূতি-ধূসর।

তোমার হারে হাড়ের সাথে গাথা মাণিক-মতি,
তোমার মাঝে ত্যাগের ভোগের অপূর্ব্ব সংহতি।
এক হাত তব ভুবন গড়ে,
অন্য তাহাই ধ্বংস করে;
ভাঙ্গা গড়ার মাঝে তুমি অখণ্ড অক্ষর।

শ্রীকালিদাস রায়

প্রাচ্য সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ

যবদ্বীপের অন্তর্গত বলিদ্বীপের নর্ত্তকী।

প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত সমুদ্রকে যে দ্বীপপুঞ্জ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, ইতিহাস ও ভূগোল-পাঠকগণ তাহাদের নামের সহিত সুপরিচিত। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালাক্কা প্রভৃতির পরিসর মাপিয়া দেখিলে বড় কম হইবে না। দ্বীপগুলিকে পরস্পর-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডরূপে পরিমাপ করিলে সমগ্র ভূমিভাগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গ মাইল দাঁড়াইবে। রুসিয়াকে বাদ দিয়া য়ুরোপের আয়তন বলিতে যাহা বুঝায়, এই দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টিগত ভূমির পরিমাণ ঠিক তাহার একার্দ্ধ। বিমানযোগে রস্ স্মিথ্ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত পোতচালনা করিয়া ৪ দিনে এই দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই দ্বীপপুঞ্জের দৈর্ঘ্যের কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রতীচ্যের রাজনীতিকগণ প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জের উপর ইদানীং খরদৃষ্টি রাখিতেছেন। কোহেন্ ষ্টুয়ার্ট প্রমুখ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কোন কোন মার্কিণ সাময়িক পত্রে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশও করিয়াছেন। এই সকল দ্বীপের ব্যাপার লইয়া ভবিষ্যতে অনেক জটিল রাজনীতিক সমস্যার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনাও বিরল নহে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

ভারত সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা যোগসূত্র ছিল। সুতরাং এই দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধে আলোচনা নবযুগের ভারতবাসীর পক্ষে অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বীপপুঞ্জের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটি ৮০ লক্ষ; তন্মধ্যে এক যবদ্বীপেই ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক বাস করে। যবদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নহে। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর যত বড়, এই দ্বীপের আকার অনেকটা সেইরূপ। যবদ্বীপের প্রতি অর্দ্ধবর্গমাইলব্যাপী স্থানে ২ শত ৫০ জন লোক

বলিদ্বীপের রাজা গুস্তি বেগসস্; এই অঞ্চলে এখনও হিন্দু-প্রভাব, হিন্দুর শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোচনা বিদ্যমান।

বাস করে। অন্যান্য দ্বীপে অনুরূপ স্থানে অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ১০।

যবদ্বীপের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার য়ুরোপীয় খাঁটি নহে, বর্ণসঙ্কর; ৮ লক্ষ প্রাচ্যদেশীয় তন্মধ্যে চীনার সংখ্যাই অধিক; দ্বীপ-পুঞ্জের পূর্ব্বাংশে পপুয়া জাতির সংখ্যাই বেশী। দেশীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ হইবে; এতদ্ব্যতীত অধিকাংশই মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকে।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করিলে দুইটি প্রধান কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। দ্বীপগুলি অত্যন্ত উর্ব্বর, নানাবিধ দ্রব্য তথায় উৎপাদিত হইয়া থাকে। চারিদিক হইতে এই দ্বীপ-পুঞ্জে যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা—অর্থাৎ আদৌ দুরধিগম্য নহে। এতদঞ্চলের সমুদ্র ঝটিকাসঙ্কুল নহে, বৎসরের অধিকাংশকালই সমুদ্র স্থির, ধীর, প্রশান্ত অবাধবায়ুপ্রবাহের প্রভাবে দ্বীপে গ্রীষ্মের তেমন প্রখরতা নাই। এই সকল কারণে যাহারা ভাগ্য-লক্ষ্মীর সন্ধানে বিপদের সম্মুখীন হইতে ভীত নহে; এরূপ ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও উপনিবেশপন্থী নর-নারী সহজেই এই প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জের আকর্ষণে লুব্ধ হইয়া তথায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। ধনসম্প-দের প্রত্যাশায় বীরপুরুষগণ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিতে আসিয়া এই মনোরম স্থানে স্থায়িভাবে থাকিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস আলো-চনা করিলে এই সকল কারণকেই মূল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনকালে এসিয়া হইতে ব্যব-সায়ীরা ও ভ্রমণকারীরা অকস্মাৎ এই সকল দ্বীপে আসিবার পর স্বদেশে ফিরিয়া যায়েন নাই, এমন বহুদৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক যুগেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে য়ুরোপীয়-গণ 'মলয়-মারুত'সেবিত প্রকৃতির এই রম্যরাজ্যে আসিয়া, দ্বীপের রমণীয় শোভায় ও প্রচুর ধনসম্পদের

স্থান সর্দার—পত্নীসহ দাঁড়াইয়া।

মোহে আকৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা এই, মূলতঃ ও প্রধানতঃ মহাদেশসমূহ হইতে দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের ভাষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মমত প্রভৃতি উদ্ভূত হইলেও দ্বীপপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব হেতু তাহাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

বাটাভিয়া বন্দরের দৃশ্য—পোতাশ্রয়।

মালয়-পলিনেসীয় অধিবাসিবৃন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ভারতীয় ও চীনবাসীদিগের সংমিশ্রণজাত সঙ্কর জাতি ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের এইরূপই ধারণা। বৈদেশিক জাতির আক্রমণ হেতু বাধ্য হইয়া তাঁহারা স্বদেশ হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সেই

কোহেন্ ষ্টুয়ার্ট প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্য-দ্বীপপুঞ্জের উল্লিখিতপ্রকার বৈষম্য দূরীভূত করিয়া যাবতীয় দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে একটা একজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইদানীং বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। হলাণ্ড সরকার না কি এ বিষয়ে অগ্রণী। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৃথিবীর যাবতীয় দেশের নরনারীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এমন সর্ব্বজাতির সমাবেশ আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না। সমাজ-তত্ত্বান্বেষীরা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিলে গবেষণার পর্য্যাপ্ত উপাদান পাইতে পারেন। বাস্তবিক এমন জটিলতাপূর্ণ সামাজিক সমস্যা অন্যত্র দুর্লভ। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এই সকল দ্বীপে ঔপনিবেশিক শাসনসংরক্ষণও অত্যন্ত জটিল।

সঙ্গে স্বদেশীয় সভ্যতা ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি তাঁহারা দ্বীপসমূহে আমদানী করিয়াছিলেন; মালয়-পলিনেসীয় অধিবাসীদিগের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বকালে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক একটি বৃহৎ ভবনে অনেকগুলি পরিবার বাস করিত; সম্ভবতঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই সকল গৃহ কাষ্ঠ ও বংশ নির্ম্মিত। তাহাদের আহার্য্য ছিল, মৎস্য ও অন্ন। ডোঙ্গায় চড়িয়া তাহারা সমুদ্র হইতে মৎস্য শিকার করিত। প্রাচীনযুগের পদ্ধতি অনুসারে তাহারা ধান্য চাষ করিত। মহিস শূকর প্রভৃতি পশু প্রতিপালন করিত। বংশ-নির্ম্মিত চোঙ্গা হইতে ফুৎকারের সাহায্যে বিষাক্ত

জোসজাকার্ট—সুলতানের শরীররক্ষী সেনাদল; ওলন্দাজ সরকার কর্ম্মময় কর্তা; সুলতান নামে জোবজার অধিপতি।

বাটাভিয়া পার্লামেণ্ট বা 'ভল্কস্রাদে'র প্রথম অধিবেশন।

তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহারা মৃগয়ার সাধ চরিতার্থ করিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে লৌহ-অস্ত্রের ব্যবহারও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। আত্মার বিদ্যমানতা তাহারা মানিত, প্রকৃতির অদৃশ্যশক্তি আছে, এ বিশ্বাস তাহাদের ছিল, পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না—তাহারও একটা শক্তি আছে, ইহা সেই প্রাচীনযুগের দ্বীপ-প্রবাসীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এইটুকু বুঝা যায় যে, মনুষ্যবাসের উপযুক্ত ভূমির মধ্যে যে যে স্থান স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর উর্ব্বরাশক্তিবিশিষ্ট, তথা হইতে প্রথম উপনিবেশিকগণকে, অধিকতর শক্তিশালী আধুনিক সম্প্রদায় বা জাতির আগমনের ফলে, অরণ্যবহুল প্রদেশে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল। তথায় নিরুপদ্রবে তাহারা আপনাদের প্রাচীন রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও সংস্কার লইয়া বসবাস করিত। ঐতিহাসিক কোহেন ষ্টুয়াট লিখিয়াছেন যে, কতিপয় দ্বীপে ঐ প্রকার আদিমভাবাপন্ন সম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান আছে; তাহারা এখনও নব সভ্যতার আলোক লাভ করিতে পারে নাই।

অন্যত্র যেরূপ দেখা যায় যে, দলপতিই সেই সম্প্রদায়ের নেতা, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কোন কোন গ্রামে গণতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতিও অধুনা বিদ্যমান আছে। আবার কোন কোন স্থানে প্রাচীন গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে একের প্রভুত্বের প্রচুর নিদর্শনও পাওয়া যায়। যবদ্বীপে শেষোক্তরূপ শাসনপ্রণালীই প্রচলিত। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দু উপনিবেশিকগণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া সাম্রাজ্যগঠন করিয়া একের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়, হিন্দু বণিকগণ অতি প্রাচীনযুগে যবদ্বীপে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টজন্মের কয়েক বৎসরের মধ্যে, যবদ্বীপের জল-বায়ু ও তত্রত্য ভূমির উর্ব্বরাশক্তি ও বৈভবের লোভে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুগণ তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মিশরবাসী প্রসিদ্ধ গ্রীক ভূগোলবেত্তা টলেমস্ (Ptolemaeus) খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যবদ্বীপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বর্ণনাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, সেই সময়েই যবদ্বীপ উর্ব্বরাশক্তির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ যবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত অনেকগুলি স্মৃতিসৌধ আবিষ্কার করিয়াছেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা অনুমান করেন, পঞ্চম শতাব্দীতে এতদঞ্চলে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। উচ্চতর সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুগণ তত্রত্য অধিবাসীদিগের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ অনুসারে হিন্দুগণ যে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয়

নাই। পুরোহিত, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়, কৃষিব্যবসায়ী, শ্রমজীবী ও বণিক সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনসংঘ—এই ভাবে যবদ্বীপে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছিল। দ্বীপের আদিম অধিবাসীদিগকে হিন্দুগণ সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সুমাত্রায় বৌদ্ধরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। যবদ্বীপের পূর্ব্বাংশে অতঃপর আর একটি হিন্দুরাজ্যের পত্তন হইয়াছিল—ব্রাহ্মণগণই তাহার মেরুদণ্ড ছিলেন। সেই সময়ে সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির ও স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সে সকল বিদ্যমান। এই সকল কীর্ত্তি দেখিলেই সে যুগের উচ্চাদর্শ, ধর্ম্মপ্রভাব, শক্তিমত্তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রজাসাধারণ যে দরিদ্র ছিল—অতি কষ্টে দিন-যাপন করিত, এমন অনুমানও অসঙ্গত নহে।

৬৪৭ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের কোনও হিন্দুনরপতি, চীনদেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে চীন-সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। সে সময়ে চীনদেশে ট্যাং বংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। চীনের সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চ্চা তখন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। চীনের ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে যবদ্বীপ এক রাজ্ঞীর দ্বারা শাসিত হইত। এই নারীর সুশাসনের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাণীর নাম, সীমিয়া। শুনা যায়, তাঁহার শাসনকালে দেশমধ্যে চৌরভয় পর্য্যন্ত ছিল না, একদিনও রাজ্যমধ্যে চুরী বা ডাকাইতী হয় নাই। কোনও বৈদেশিক রাজকুমার এই জনশ্রুতির সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য যবদ্বীপে আসিয়া স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক বৃহৎ মুদ্রাধার রাজপথের মধ্যে, প্রকাশ্য স্থলে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মুদ্রাপূর্ণ আধারটি ৩ বৎসর যথাস্থানেই রক্ষিত ছিল, ভ্রমেও কেহ এক দিনও তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। ইহা কিম্বদন্তী নহে, চীনের ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। আধুনিক সভ্যতাভিমানী জাতির পক্ষে এই ঘটনা আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর মত অলীক বলিয়া মনে হইলেও ঘটনাটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যাপার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের মজপাহিৎ নামক বিরাট হিন্দুসাম্রাজ্য সমগ্র ভারতীয় দ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই আরববণিকগণ দ্বীপমধ্যে ইস্লামধর্ম্মের ব্যাখ্যা
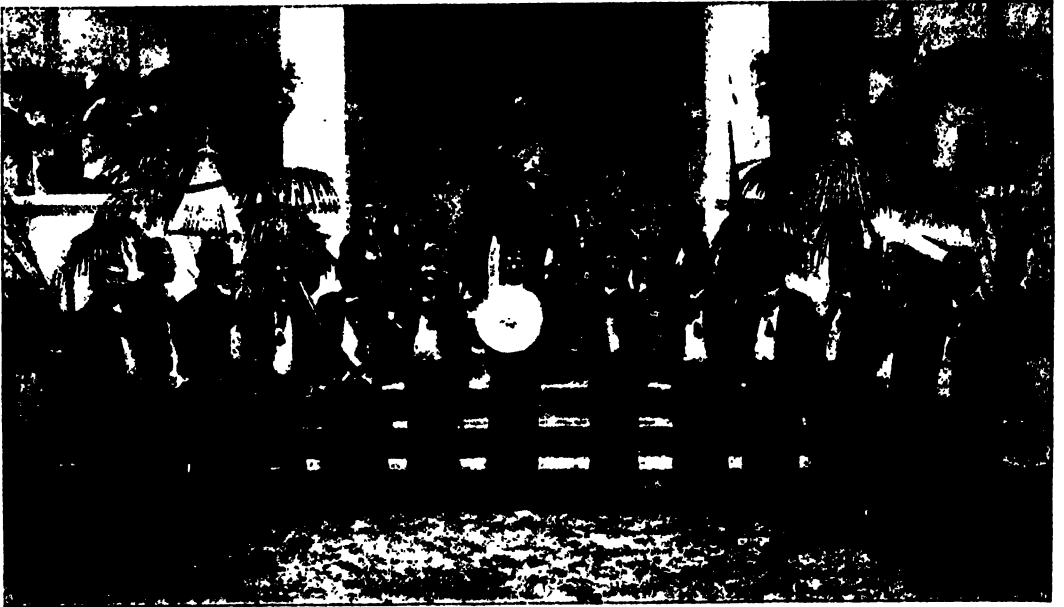
যবদ্বীপের অন্তর্গত সুরাকার্তার প্রিন্স মাংকু নেগর—বিবাহের পরিচ্ছদে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যোগ্যাকার্তা ও সুরাকার্তার মধ্যে ভীষণ গৃহবিবাদ চলিতেছিল। এই বিবাহে দুইটি বিবদমান রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

করিতে থাকেন। উপকূলবর্ত্তী কোন কোন স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণ ইস্লামধর্ম্মের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। ইহার ফলে ইসলামের প্রভাব দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাচীন মজপাহিৎ হিন্দু-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়; সেই স্থানে মুসলমান-রাজ্যের উদ্ভব হইতে থাকে। যবদ্বীপে যতগুলি মুসলমান-রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ষোড়শ খৃষ্টাব্দে 'মাতারাম্' রাজ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

যবদ্বীপের বাটিক শিল্প—নক্সার একটি নমুনা।

প্রাচ্যসমুদ্রে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকগণের আবির্ভাবে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রমশঃ বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া একটা তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। ওলন্দাজবণিকগণ হলাণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় এই প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাভূত করেন এবং দ্বীপপুঞ্জস্থ দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ও সর্দ্দারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বাণিজ্যবিষয়ে একাতপত্র প্রভুত্বলাভের সুযোগ লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজগণ—কখনও বা কোনও রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, কখনও বা অপরের সহিত যুদ্ধে সামরিক সাহায্যপ্রদানের পুরস্কারস্বরূপ—সমগ্র যবদ্বীপে ও সন্নিহিত অন্যান্য দ্বীপে প্রভুত্বের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু অধিককাল হলাণ্ডের 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র বাণিজ্যসংক্রান্ত ও রাজনীতিক কার্য্য সুপরিচালিত হইতে পায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত
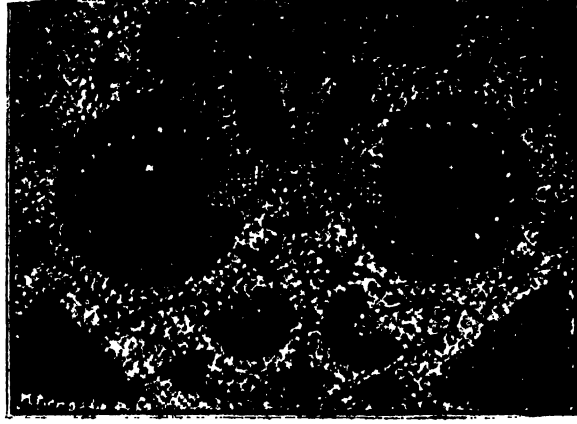
যবদ্বীপে বৌদ্ধ মন্দির; এই মন্দির নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু ইস্লাম ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে, পাছে প্রাচীন শিল্পচাতুর্য্য ধ্বংস হয়, এই আশঙ্কায় ষোড়শ শতাব্দীতে মন্দিরটিকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। সার ষ্টামফোর্ড রাফল্‌স্ ইহা আবিষ্কার করেন।

'কোম্পানী' কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন; তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকার হলাণ্ডের সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সময় ফরাসীবিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র হলাণ্ড প্রভাবিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের অন্যতম ভ্রাতা লুই হলাণ্ডের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে সুশাসিত করিবার জন্য ডেন্ডেল্‌স্ নামক জনৈক ওলন্দাজ তথায় শাসনকর্ত্তৃরূপে প্রেরিত হয়েন। তাঁহারই চেষ্টায় আধুনিক প্রণালীতে দ্বীপপুঞ্জে শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হয়, প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জও সেই সূত্রে ইংরাজ দখল করিয়া লয়েন। ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড রাফল্‌স্ কিছুকাল দ্বীপপুঞ্জ শাসন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডকে আবার দ্বীপগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বলিদ্বীপের যুবতীরা পূজার উপচার মন্দিরে লইয়া যাইতেছে।

দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস হইতেই জানা যায়, প্রথম যুগে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' শুধু অর্থসঞ্চয়ের দিকেই অবহিত ছিলেন; শাসনসংরক্ষণের ভার পাইয়া, বাণিজ্যব্যাপারে কি উপায়ে অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়, সেইদিকেই কর্ত্তৃপক্ষ আরও মনোযোগী হইয়াছিলেন। শুধু বাটাভিয়া ও সন্নিহিত প্রদেশগুলি য়ুরোপীয় শাসনপ্রভাবের অন্তর্গত ছিল। এই সকল স্থানে ওলন্দাজ-সভ্যতার নিদর্শন পরিস্ফুট। কিন্তু অন্যত্র যবদ্বীপের প্রাচীন শাসনরীতিকেই ওলন্দাজ কোম্পানী

বাটিক শিল্পীরা কাপড়ের উপর নক্সা করিতেছে।

যবদ্বীপের স্বর্ণপাতের উপর নক্সা কাটিতেছে।
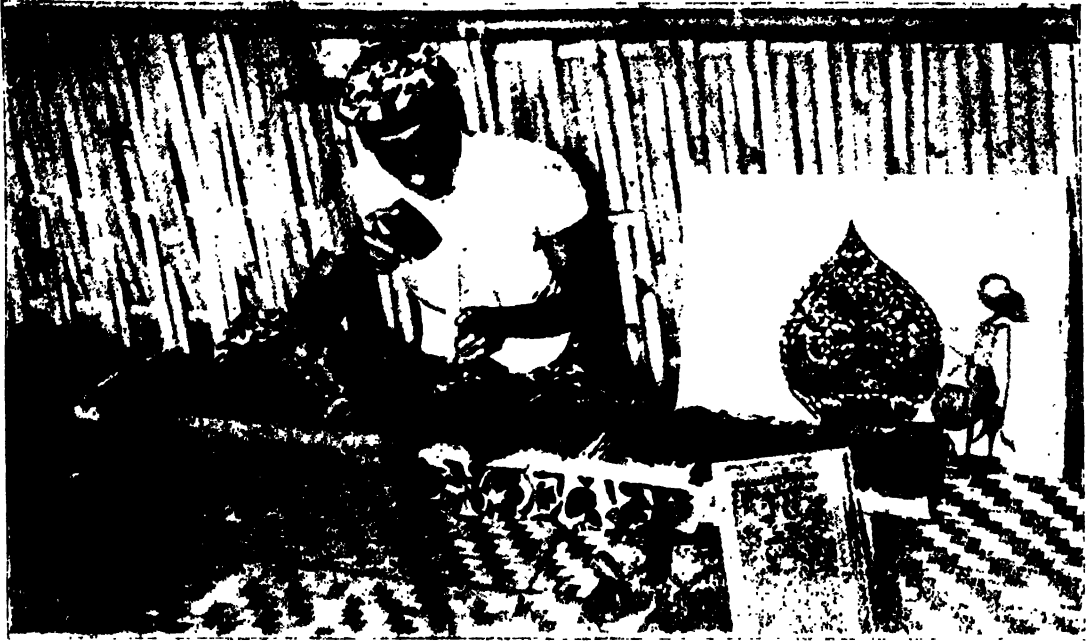
মানিয়া চলিতেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজা বা সর্দারগণ 'ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'কে নির্দ্দিষ্ট ভাবে দেশের উৎপন্ন চিনি, কফি প্রভৃতি খাজানাস্বরূপ দিয়া স্ব স্ব রাজ্য বা প্রদেশ শাসন করিতেন- ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাতে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। উল্লিখিত সর্দ্দার, ওমরাহ বা রাজারা প্রজার দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা কি উপায়ে প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া লইতেন বা তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, 'কোম্পানী' কোনও দিন সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিতেন না। তাহার পর— অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানে, সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকা শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে একটা নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। মনীষীরা বলিতে লাগিলেন, প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন, স্বাধীনতায় প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, সকলেই সমান – উচ্চ নীচ নাই, প্রভু ভৃত্য নাই! একের উপর অপরের প্রভুত্ব প্রাচীনযুগেই চলিতে পারিত, নবযুগের মানব সে আদর্শকে পরিত্যাগ করিবে। অনেকেরই মনে এমন বিশ্বাস জাগিয়া উঠিল যে, সভ্যতার অর্থ বিশ্বপ্রেম সৌভ্রাত্র, বিশ্বের যাবতীয় নর নারী পরস্পরের ভাই ভগিনী, কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য নাই। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাণিজ্যে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল, কি উপায়ে অবাধবাণিজ্যনীতি সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে পারে, তাহার উপায়নির্দ্ধারণে য়ুরোপ ও আমেরিকা আত্মনিয়োগ করিলেন।

সেই সময় ডেনডেল্‌স্ যবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। তিনি তথায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন। সমগ্র দ্বীপ য়ুরোপীয় শাসন-প্রণালীতে যাহাতে শাসিত হয়, সেই চেষ্টাই তাঁহার ছিল। দৃঢ় ও কঠোরহস্তে শাসনদণ্ড ধারণ না করিলে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহকে সুশাসিত করা যাইবে না মনে করিয়া তিনি শাসনকর্ত্তার শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, প্রতিনিধি হিসাবে যে সকল ওমরাহ ও সর্দ্দার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সরকারের কর্ম্মচারী, য়ুরোপীয়গণ তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর উপর খরদৃষ্টি রাখিবেন। যবদ্বীপের রাজ্যগুলিও যাহাতে সুশাসিত হয়, সে দিকেও তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। প্রজাবর্গ যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সুখে জীবনযাপন করিতে পারে, সে দিকেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যবদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইল; এতকাল তাহা ছিল না, সুতরাং এই পথ নির্ম্মিত হওয়ায় উভয় প্রান্তবর্ত্তী জনগণের মধ্যে সম্মিলনের অবাধ অবসর তাঁহারই সময়ে ঘটিয়াছিল। ইহার পর যবদ্বীপ যে কয় বৎসর বৃটিশের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সময়ে মিঃ রাফল্‌স্ দ্বীপমধ্যে শাসনসংস্কারের ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার সময়েই জমীর খাজনা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। দেশীয় কৃষকগণ ভূমি কর্ষণ করিয়া ফসল উৎপাদন করিলে সে ভূমিতে তাহারই অধিকার থাকিবে, এই প্রথা তিনিই সেথায় প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপূর্ব্বে এইরূপ কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম সে দেশে প্রচলিত ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হলাণ্ড যখন একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, তখন হইতে রাজাই উপনিবেশশাসনব্যাপারে একমাত্র মালিক, ইহা স্বীকৃত হয়। তদনুসারে রাজার আদেশ-পালনকল্পে যবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তথায় দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের পার্লামেণ্টই ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৬৭ অব্দে হলাণ্ডে একটি নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা উপনিবেশসংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রতিবৎসরই পার্লামেণ্ট নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। উপনিবেশশাসনব্যাপারে হলাণ্ড উদারনীতির অনুসরণ করিতেছেন, এই ভাবটা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শাসননীতির সামান্য পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা গিয়াছে।

হিন্দুরাজত্বের সময়েও যবদ্বীপের পল্লীর মধ্যে গণতন্ত্রমূলক স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান ব্যক্তি (প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের নাম—'লোরা', 'বেকেল্' বা 'পেটিঙ্গী') নির্ব্বাচনে গ্রামবাসীদিগেরই অধিকার ছিল। এই প্রধান ব্যক্তিই বিপদে-আপদে—সকল কার্য্যেই গ্রামবাসিগণকে সুপরামর্শ প্রদান করিত; তাহারাও নির্ব্বিচারে গ্রাম্য-মণ্ডলের উপদেশ ও মীমাংসা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত

সুমাত্রা দ্বীপের আদিম নিবাসীরা বনভোজন করিতেছে।

হওয়ায় যবদ্বীপের বড় বড় নগরে ও প্রদেশে অনেকটা স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনপদ্ধতির প্রচলন হয়। তথায় সরকারের মনোনীত এবং জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্তবৃন্দ লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়, চৈনিক, দেশীয় ও আরবীয়দিগের পক্ষ হইতে কতগুলি করিয়া সভ্য মন্ত্রণাপরিষদে স্থান পাইবেন, তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে সে সংখ্যা এমনই ভাবে নির্দ্দিষ্ট যে, য়ুরোপীয়দিগের প্রাধান্য সর্ব্বাংশে বজায় আছে। বিশেষতঃ বড় বড় সহরের স্বাস্থ্য ও শাসনসংরক্ষণ সম্বন্ধে আধুনিক য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাহাতে কার্য্য হইতে পারে, এ ব্যবস্থা নূতন বিধানের ফলে নষ্ট হইতে পায় নাই। তবে জিলা-পরিষদে দেশীয়দিগের সংখ্যাই অধিক।

মিঃ কোহেন্ ষ্টুয়ার্ট এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ওলন্দাজ-অধিকৃত প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও সর্ব্বত্র এই নীতি অনুসারে এখনও কার্য্যারম্ভ হয় নাই। সমগ্র দ্বীপের অধিকাংশ স্থানেই পূর্ব্বপ্রণালীতে শাসনকার্য্য চলিতেছে। এখনও দেশের লোকের ধারণা যে, স্বায়ত্ত-শাসনসংস্কারসত্ত্বে প্রধান শাসনকর্ত্তাই একচ্ছত্র সম্রাটের ন্যায় শাসনক্ষমত পরিচালন করিতেছেন। অবস্থা অধিকাংশস্থলেই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। কতিপয় দেশীয় রাজ্যে ও জিলাতে স্বাধীনভাবে শাসন-পালনের ভার দেশের লোকের হস্তে দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু সকল বিষয়ে নহে—সে সম্বন্ধে সীমারেখারও নির্দ্দেশ আছে। তবে লেখক আশা রাখেন যে, কালে আরও পরিবর্ত্তন হইবে এবং দেশীয়গণ অদূর ভবিষ্যতে স্বদেশের শাসন-পালনব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

ইদানীং সমগ্র উপনিবেশে ওলন্দাজ সরকার প্রতিনিধি-মূলক শাসন পরিষদ্ গঠনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের প্রধান নগর বাটাভিয়াতে 'ভল্কস্‌রাদ্' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা অনেকটা পার্লামেণ্টের মত। এই সভায় সরকার-পক্ষ হইতে অর্দ্ধেক সভ্য নির্ব্বাচিত হয় এবং অপরার্দ্ধ স্থানীয় জনগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। 'ভল্কস্‌রাদ'কে পার্লামেণ্টের ন্যায় কতকটা মনে করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বৎসরের আয়ব্যয়, জনগণের উপর কোনও সামরিক ব্যয়সংক্রান্ত বিল পাশ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইলে ভল্ক্‌স্‌রাদের পরামর্শ অবশ্য-গ্রহণীয়; কিন্তু তথাপি উহাকে এখনও পার্লামেণ্টের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। তবে হলাণ্ড সরকার শীঘ্রই উহার হস্তে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করিবার কথা ভাবিতেছেন।

মালাক্কা দ্বীপের নারী তাঁতে কাপড় তৈয়ার করিতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে রাজনীতিক আন্দোলন বা সভাসমিতির
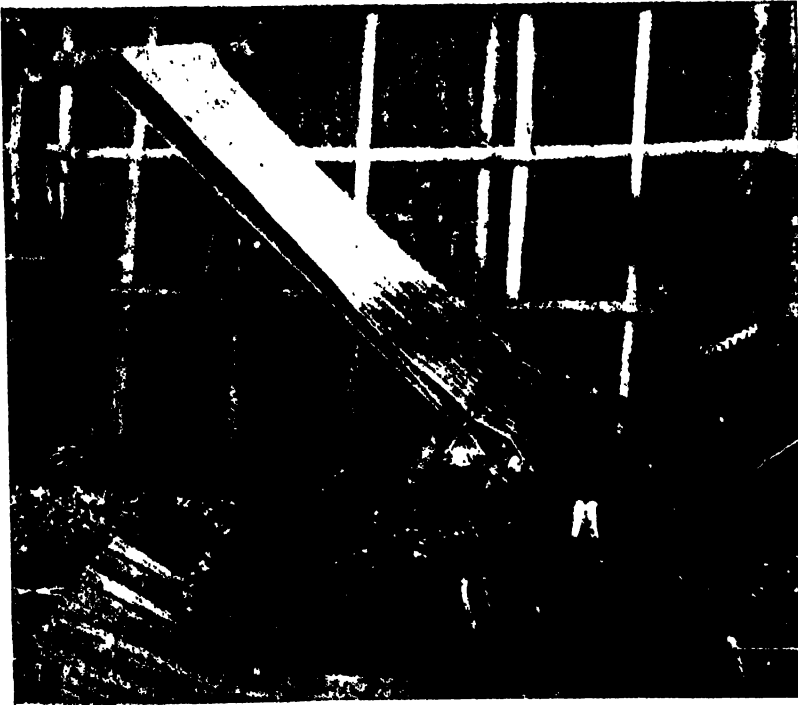
প্রতিষ্ঠা প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জে নিষিদ্ধ ছিল। কয়েক বৎসর হইতে সে নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়াছে। সংবাদপত্রনিচয় এখন তথায় অনেকটা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে বহু সংবাদপত্র-সম্পাদক বা লেখককে, স্বাধীন মত অকুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করার জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল, রাজনীতিক নেতৃবৃন্দকেও শাসনশৃঙ্খলার নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। দেশীয় সেনাদলের মধ্যে বলশেভিক পক্ষের প্রচারকগণ নানাভাবে রাজদ্রোহের প্রচার করিয়াছিল। লেখক বলিতেছেন যে, ইদানীং নব সম্প্রদায়ের নেতৃগণ অত্যন্ত ধীরভাবে দেশের কার্য্যে মন দিয়াছেন।

যবদ্বীপের কৃষকগণ তালের রস জ্বাল দিচ্ছে

যবদ্বীপে নানাবিধ দলের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে জাতীয়দল ও মুসলমানদলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদলে মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকসংখ্যাই অধিক। বলশেভিকদলও তথায় আছে। তাহারা শ্রমিক-আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত থাকে। প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জে বিচারের ভার সর্ব্বত্রই য়ুরোপীয় বিচারকের উপর ন্যস্ত। দেশীয়দিগের আদালতে (ল্যান্‌ড্রাড্‌) য়ুরোপীয় বিচারক তাঁহার সহকারী দেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা। এখন ব্যবস্থা হইয়াছে যে, দেশীয়গণ কালক্রমে য়ুরোপীয়দিগের স্থান অধিকার করিবেন।

পনের বৎসর পূর্ব্বে দেশীয়দিগের জন্য বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শিক্ষাবিস্তারের ফলে, সমগ্র দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ক্রমশঃ একজাতীয়তার সুযোগ মিলিতে পারে। এখন সহস্র সহস্র বালকবালিকা প্রাথমিক-শিক্ষা লাভ করিতেছে। নানাস্থানে পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ডচ্ ও মালয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই দুই ভাষাই কালক্রমে সমগ্র দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা ও জাতীয়ভাবৃদ্ধিব্যাপারে প্রধান অবলম্বন হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে ইংরাজী ভাষাও অন্যতম।
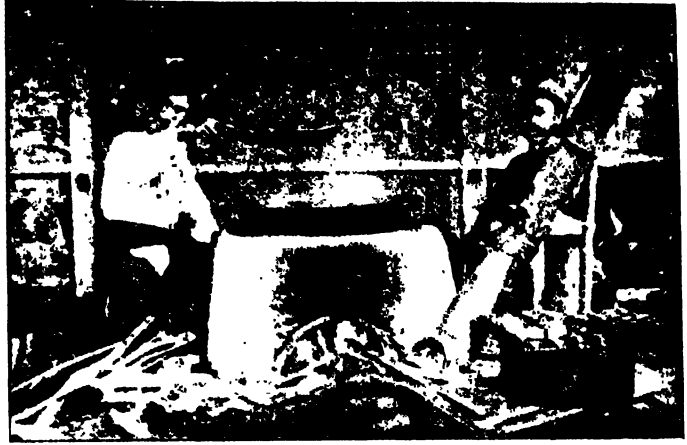
ঔপনিবেশিক সরকারের নীতির বৈশিষ্ট্য এইটি, "অবাধবাণিজ্য ও ব্যবসা।" বিগত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে উপনিবেশবন্দরে বৈদেশিক-পতাকা ও ওলন্দাজ-পতাকা সমভাবে সমাদৃত হইতেছে; অবশ্য ওলন্দাজের বাণিজ্য জাহাজ অন্য বৈদেশিক বন্দরে গিয়া সমতুল্য ব্যবহার না পাইলে, সে ক্ষেত্রে সেই বৈদেশিক জাহাজের বাণিজ্যপোত যবদ্বীপের বন্দরে আসিলে, তাহার পতাকার সম্মান সেরূপ ভাবে রক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে হলাণ্ড হইতে যে সকল পণ্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিক্রয়ার্থ আসিত, তাহাদের বাণিজ্যশুল্ক অত্যন্ত কমই ছিল নানারূপ সুবিধা ও সুযোগ হলাণ্ডের ব্যবসায়ীদিগের ছিল; কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে হলাণ্ড সরকার সে নীতির পরিহার করিয়াছেন। এখন সকল জাতির সম্বন্ধে সমান ব্যবস্থা-সকলেই সমভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই গমনাগমন ও সংবাদের আদান-প্রদানের উন্নতি ঘটিয়াছে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গতায়াত করিবার জন্য সর্ব্বদাই জাহাজ ও ষ্টীমার প্রস্তুত। যবদ্বীপে বহুসংখ্যক রাজপথ ও রেলবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। পাছে বৈদেশিক জাতি অভাবপীড়িত দেশীয় কৃষকদিগের জমী ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়া পড়ে, এজন্য একটি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে

বালিও দ্বীপের সর্দারগণ।

যে, কোনও কৃষকের জমী বৈদেশিক কোনও ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিবে না। ইহার ফলে দেশীয় কৃষকদিগের চাষের জমী হস্তান্তরিত হইতে পায় না। য়ুরোপীয় ও চৈনিক ধনিসম্প্রদায়ের লোলুপ গ্রাস হইতে স্থানীয় সরকার দেশীয়গণকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দেশীয়দিগের অধিকারে যে সকল ভূমিভাগ নাই, সেই সকল জমী সরকারপক্ষ হইতে বৈদেশিকগণকে বিলি করিবার জন্য

সুমাত্রার মালয়নারীরা ধীরে সুস্থে ক্রয় বিক্রয়ের কায করিতেছে।

ব্যবস্থাও আছে। যে সকল জমীর আবাদ পূর্ব্বে হয় নাই, বাৎসরিক নিয়মিত হারে খাজানা দিয়া সেই সমুদায় জমী যে কেহ লইতে পারেন।

সমগ্র দ্বীপে কৃষির উন্নতি দ্রুত সম্পাদিত হইতেছে। য়ুরোপীয় ও দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ কৃষি ও সেচের খালের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বীপপুঞ্জে পেট্রল ও কয়লার যে সকল খনি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার স্বত্ব সরকার সাধারণের ব্যবহারের জন্য আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছেন। অনেকগুলি কয়লা, টিন ও স্বর্ণখনির কায অধুনা সরকার হইতেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। সিঙ্কোনা, রবার ও গটাপার্চ্চার আবাদও এই শিল্পচাতুর্য্য যেমন বিচিত্র, তেমনই অননুকরণীয়। এ বিষয়ে তাহারা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

মিনি ক্রস্‌ট্ র‍্যান্‌ডস্ নাম্নী কোনও মহিলা লেখিকা 'বটিক'সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ কোনও সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যবদ্বীপের বটিকশিল্পের গুণ-কীর্ত্তনে যেন পঞ্চমুখ। তিনি লিখিয়াছেন যে, যবদ্বীপ-বাসীরা এই শিল্প অন্য কোনও প্রাচীন জাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, অথবা ইহাতে তাহাদের মৌলিকতা আছে, ইহা নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না; তবে যবদ্বীপের শিল্পীরা যে এ বিষয়ে অসাধারণ,

সিলিবস্ দ্বীপের দেশীয়গণ শব বহন করিতেছে।

সরকারপক্ষ করিতেছেন। শ্রমজাত শিল্পের উন্নতিবিধানের বিশেষ প্রচেষ্টা তথায় চলিতেছে।

যবদ্বীপ 'বটিক' শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। সূতার কাপড়ের উপর যবদ্বীপবাসীরা যেরূপ চমৎকার নক্সা করিতে পারে, তেমন আর কোথাও হয় না। এই নক্সার প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। যবদ্বীপের বটিক শিল্পীরা সূতার কাপড়ের উপর গরম মোম ঢালিয়া তাহার উপর নক্সা করে, মোম-কাপড় বারংবার গাছগাছড়া হইতে উদ্ভূত রঙ্গের পাত্রে ডুবাইয়া লয়। তাহাদের তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন, ধর্ম্ম, ললিতকলা, সাহিত্য, প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়েই যবদ্বীপ হিন্দুজাতির নিকট ঋণী। এই সকল সম্পদ যবদ্বীপ-বাসীরা হিন্দুর নিকট হইতেই পাইয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষে যে প্রণালীতে কাপড়ের উপর নক্সা তুলা হয়, তাহার সহিত যবদ্বীপের বটিকশিল্পের তেমন সাদৃশ্য নাই। তবে সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারত হইতেই কাপড়ের উপর নক্সা করিবার কল্পনাটা তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বোম্বাইয়ে রুথ পিতার শূন্য গৃহে রহিল। রাব্বী তাহাকে কন্যার মত স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সেই জন্যই তাহার জন্য তাঁহার চিন্তার অবধি রহিল না। সে একা—যুবতী রূপসী—প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। অভিভাবকশূন্য অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি সে বিষয়ে ইমামের ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনিও কোন সুমীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেন না। শেষে উভয়ে স্থির করিলেন, রুথ যদি রাব্বীর গৃহে যায়, তবে বড়ই ভাল হয়। উভয়ে রুথকে সেই অনুরোধ করিলেন।

রুথ কাঁদিয়া ফেলিল বলিল, "আমাকে আর যে আদেশ করিতে হয়, করুন; আমি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইব না।"

পিতা যে গৃহে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন এবং দায়দও যে গৃহে ছিল, সে গৃহে বাস করিতে তাহার আগ্রহ যে স্বাভাবিক, উভয়েই তাহা বুঝিলেন।

এক উপায়, রাব্বী যদি সপরিবারে আসিয়া তথায় বাস করেন। আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; বিশেষ তিনি মনে করিলেন, তাহাতে লোক হয় ত তাঁহার নিন্দা করিবে তিনি ইহুদীদিগের দুর্নাম-রটনার সুযোগ দিবেন টাকা বাঁচিবে বলিয়া তিনি স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া রুথের গৃহে আসিয়াছেন।

কি হইবে—জিজ্ঞাসা করিলে রুথ বলিল, সে একাই থাকিবে; কোন ভয় নাই। বাস্তবিক সে একা থাকিতেই ভালবাসিত। তাহার তখন মনের যে অবস্থা, তাহাতে কেবল ভাবিতে ভাল লাগে; একা থাকিলে ভাবিবার যত অবসর পাওয়া যায়, লোকসঙ্গে তত পাওয়া যায় না।

শেষে রাব্বী তাহার জন্য কয়জন বৃদ্ধা দাসী রাখিয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন আসিয়া রুথের সংবাদ লইয়া যাইতেন।

যুদ্ধের জন্য ইমামেরও দেশে যাওয়া ঘটিল না। তিনিও প্রায়ই রুথের সংবাদ লইতে আসিতেন; যখনই আসিতেন, তখনই তাহাকে নানারূপ সদুপদেশ দিতেন।

রুথ বোম্বাইয়ে আসিয়া একটা বড় অসুবিধা বোধ করিতেছিল—সে বোম্বাইয়ের লোকের সঙ্গে কথা কহিতে পারিত না—তাহাদের ভাষা জানিত না। সে কথা সে রাব্বীকে জানাইলে তিনি তাহাকে হিন্দী ও ইংরাজী শিখাইবার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মনে করিলেন, ভালই হইল—রুথের সময় কাটাইবার একটা উপায় হইল।

হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষায় রুথ এত দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল যে, তাহাতে সে আপনিই বিস্মিত হইতে লাগিল। তাহার কারণ, অন্য কোন কাজে তাহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইত না এবং তাহার যে বয়স, সে বয়সে একাগ্রতা স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ হয়।

খৃষ্টান মিশনের যে য়ুরোপীয় মহিলা তাহাকে ইংরাজী পড়াইতেন, তাঁহার ভ্রাতাও মেসোপোটেমিয়ায় ইংরাজের সেনাদলে—জেনারল টাউনসেণ্ডের সহকারী ছিলেন। ইরাক কেমন দেশ, তথায় তাঁহার ভ্রাতা কি করিতেছে, কষ্ট পাইতেছে কিনা—সে সব কথার আলোচনা তিনি

অনেক সময় তাঁহার ছাত্রীর সঙ্গে করিতেন। রুথ বাগ্‌দাদের কথা ও বসোরার কথা যাহা জানিত, তাঁহাকে বলিত।

রুথ স্বয়ং তুর্কীর উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। সে বিষয়ে শিক্ষয়িত্রীর সহিত ছাত্রীর মতের যে ঐক্য ছিল, তাহাতে উভয়ের আলোচনা যেন ঘনীভূত হইত।

তখনও জেনারল টাউনসেণ্ড বিজয়ী সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। প্রতিদিন সংবাদপত্রে সে সব বিবরণ প্রকাশিত হইত; আর প্রতিদিন শিক্ষয়িত্রী রুথকে সে সব পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সংবাদপত্রপাঠ করাও একটা নেশা—একবার ধরিলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুদ্ধবার্ত্তার আলোচনা করিতে করিতে রুথ সংবাদপত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

শিক্ষয়িত্রী যে দিন তাঁহার ভ্রাতার পত্র আনিতেন, সে দিন উভয়ে আলোচনা খুবই জমিত। শিক্ষয়িত্রীর ভ্রাতার দীর্ঘ পত্র লিখার অভ্যাস ছিল। তিনি ভগিনীকে নানা কথা লিখিতেন; কেবল সামরিক নিয়মানুসারে সব স্থানাদির নাম দিতেন না। রুথ ও শিক্ষয়িত্রী মিস ব্রক সংবাদপত্র পড়িয়া মানচিত্র মিলাইয়া সে সব নাম স্থির করিয়া লইতেন। মিস ব্রকের ভ্রাতা মেজর ব্রকের ফটো সংগ্রহ করা একটা বাতিক ছিল। তিনি নানা স্থানের ও নানা শ্রেণীর আরবের ও ইহুদীর ফটো ভগিনীকে পাঠাইয়া দিতেন। সে সব রুথের পরিচিত। রুথ সে সকলের কথা আবার মিস ব্রককে বলিত। এইরূপ আলোচনায় অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

রুথ মিস ব্রককে বলিত, ইহুদীরা তুর্কীর বিরুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিবে। মনে মনে তাহারা তুর্কীর উপর বিরক্ত—কেবল ভয়ে প্রকাশ্যভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না। তুর্ক ও আরব ভদ্রলোকরা যাহাই কেন বলুন না—নিম্নশ্রেণীর লোক ইহুদীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে।

মিস ব্রক বলিতেন, "সে দোষ খৃষ্টানদেরও যে নাই, এমন নহে। খৃষ্টানরাও অনেকে ইহুদীদিগকে ঘৃণা করে।"

"কেন?"

"কোন সঙ্গত কারণ নাই। একটা সংস্কার মাত্র—তাহাকে সংস্কার না বলিয়া কুসংস্কার বলিলেই ঠিক হয়।"

"আমাদের উপর বিধাতার একি অভিশাপ!"

"অবশ্য এ ভাব থাকিবে না। দেখ না, শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয়রা প্রাচীর লোককে ঘৃণা করে; অথচ যিশুখৃষ্ট—ত্রাণকর্ত্তা স্বয়ং প্রাচীর পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

সময় সময় সংবাদপত্রে ইরাকের যুদ্ধের যে সংবাদ প্রকাশিত হইত, তাহাতেও বুঝা যাইত, ইহুদীরা ইংরাজের প্রতিই অনুরক্ত।

একদিন মিস ব্রক তাঁহার ভ্রাতার পত্র পাঠ করিতে করিতে পড়িলেন, "আমাদের সৌভাগ্যে আর আমাদের কোন সন্দেহ নাই। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা এক জন ইহুদী সাহায্যকারী পাইয়াছি। সে ইংরাজী জানে—এ দেশের পথঘাট সব চিনে; আর সে তুর্কীর পরম শত্রু। কোন পারিবারিক কারণে সে, তুর্কীর সর্ব্বনাশসাধনের উদ্দেশ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসিয়াছে। তাহার বিবরণ সে জেনারলকে বলিয়াছে; তিনিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। সে যাহা বলিতেছে, যদি তাহা করিতে পারে, তবে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই বাগ্‌দাদে বৃটিশ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে পারিব। লোকটি অল্পদিনের মধ্যেই সব এমন গুছাইয়া লইয়াছে যে, মনে হয়, সে জেনারলের দক্ষিণ হস্ত হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা বাগদাদ বিজয় করিবার পর যখন এ দেশে মহিলাদিগকে আসিতে দেওয়া হইবে তখন, ভগিনি, তুমি একবার আসিও। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, এ দেশে আমরা এক জন স্ত্রীলোকের অভিজ্ঞতায় অসাধারণ সাহায্য লাভ করিয়াছি ও করিতেছি। তিনি এ দেশ পায় হাঁটিয়া ঘুরিয়াছেন। তিনি মিস বেল। তাঁহার অভিজ্ঞতা উপন্যাসকেও পরাজিত করে।"

মিস ব্রক হাসিয়া বলিলেন, "তখন আমরা দুই জন একসঙ্গে ইরাকে যাইব। তখন তুমি হইবে আমার শিক্ষয়িত্রী, আর আমি হইব তোমার ছাত্রী। কি বল?"

রুথ বলিল, "ইরাকে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি, তাহার পর আর ইরাকের ধূলি স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি এখন সর্ব্বতোভাবে পরাধীন—কি জানি, ভাগ্য আবার কোথায় লইবে।"

মিস ব্রক কথাটা রুথের কাছে প্রীতিপ্রদ নহে বুঝিয়া ঘুরাইয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"এই যে মিস বেল, ইনি যেমন আরবদিগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি অধ্যয়ন করিবার জন্য তোমাদের দেশে কত বিপদ তুচ্ছ করিয়া ঘুরিয়াছেন, তোমাদের দেশের মহিলারা কি তেমন করেন?"

"না। তাঁহাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না। সেরূপ শিক্ষা দিলে জাতির কত উপকার হয়, তাহা এবার বিলাতে দেখা গিয়াছে। আপনি সে দিন যে সংবাদপত্রখানা ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে বিলাতের কতকগুলি কারখানার ছবি ছিল; সে সব কারখানায় স্ত্রীলোকরাই সব কায করিতেছে।"

"ওঃ—তুমি সচিত্র 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার' কথা বলিতেছ?"

"হাঁ।"

"আমি তোমাকে আরও কয়খানা সংবাদপত্র আনিয়া দিব। দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে, এ যুদ্ধে বিলাতে মহিলারা কিরূপ কায করিতেছেন।"

পরদিন মিস ব্রক কতকগুলি পুরাতন সচিত্র পত্র আনিলেন; আর সেই সঙ্গে সেই দিন প্রাপ্ত একখানি পত্রও আনিলেন। একখানি কাগজে একখানি ছবি ছিল। সে ছবিতে জেনারল টাউনসেণ্ডের পার্শ্বে দায়ুদ—তাহারই প্রতিলিপি। দায়ুদ তাহার প্রচার বন্ধ করিতে বলিবার পূর্ব্বেই কতকগুলি ছবি প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল, এবং বোধ হয়, কোন সৈনিক তাহা আনিয়া সংবাদপত্র কার্য্যালয়ে দিয়াছিল।

চিত্রের নিম্নে চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিত ছিল—জেনারল টাউনসেণ্ডের পার্শ্বে দায়ুদ হারুন; ইহাকে ইংরাজের বন্ধু।

সেই চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিস ব্রকের ভ্রাতাও ছিলেন। রুথকে তাহাই দেখাইবার জন্য মিস ব্রক সে কাগজখানা আনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার ছবি দেখাইবার সময় দায়ুদের ছবির দিকে রুথের দৃষ্টি পড়িল।

সহসা তাহার মুখ বিবর্ণ ও নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সে সংজ্ঞা হারাইয়া শোফার উপর ঢলিয়া পড়িল।

মিস ব্রক আপনাকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিলেন; তিনি ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন, তাহারা আসিলে এক জনকে ট্যাক্সী লইয়া ডাক্তার আনিতে ও আর এক জনকে রাব্বীকে সংবাদ দিতে বলিলেন। তিনি নিজে রুথের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার মুখে ও চক্ষুতে জল দিয়া তিনি তাঁহার ব্যাগের মধ্য হইতে স্মেলিংসল্টের শিশি বাহির করিয়া রুথের নাসিকার সম্মুখে ধরিলেন। সেই উগ্র গন্ধে রুথ চমকিয়া উঠিল। যেন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

জ্ঞান পাইয়াই সে সেই কাগজখানার জন্য হাত বাড়াইল এবং পাইলে সেখানা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; সে ক্রন্দনের যেন শেষ নাই!

মিস ব্রক দুই একবার প্রশ্ন করিলেন, কোন উত্তর না পাইয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ডাক্তারের ও রাব্বীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রাব্বী তাঁহার পত্নীকে ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ততক্ষণ কাঁদিয়া রুথের ব্যাকুলতা কতকটা কমিয়াছে রাব্বীর স্ত্রী যখন তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সস্নেহে তাঁহার বক্ষে টানিয়া লইয়া—তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, রুথ—শঙ্কিতা পাখীটিকে আমার কে আবার শঙ্কা দিয়াছে?" তখন সে সেই ছবিখানি দেখাইয়া বলিল—"দায়ুদ!—দায়ুদ!"

ব্যাপারটা কি তিনি বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই রাব্বী বুঝিতে পারিলেন; তিনি কাগজখানি লইয়া দেখিলেন, তাহাতে দায়ুদের প্রতিকৃতিই রহিয়াছে বটে। তিনি বিস্মিত হইলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলে মিস ব্রক বলিলেন, ঐ চিত্রে তাঁহার ভ্রাতার প্রতিকৃতি থাকায় তিনি রুথকে উহা দেখাইতে আনিয়াছিলেন—দেখিয়াই রুথ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি কোন অন্যায় কায করিয়াছি?"

রাব্বী বলিলেন, "না। ঐ চিত্রেই রুথের নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর প্রতিকৃতি আছে। আপনি আমাদের বিশেষ উপকারই করিলেন; তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল।"

রাব্বী তখন ভাল করিয়া চিত্রখানি দেখিলেন এবং সেই সঙ্গে লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেন।

মিস ব্রক তাঁহার ভ্রাতার পত্রের কথা রাব্বীকে জানাইলেন। সে পত্রে ভ্রাতা ভগিনীকে লিখিয়াছিলেন, জেনারল

টাউনসেণ্ড এক জন ইহুদী সাহায্যকারী পাইয়াছেন ; তিনি কোন পারিবারিক কারণে তুর্কীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। এখন চিত্র দেখিয়া মনে হইতেছে, দায়ুদই সেই ইহুদী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি কোন পারিবারিক কারণে তুর্কীর উপর বিরক্ত হইয়াছেন ?"

রাব্বী বলিলেন, "হাঁ ; সে দীর্ঘ কথা আপনাকে আর এক দিন বলিব।"

"তবে, বোধ হয়, আর সন্দেহ নাই।"

রাব্বী রুথকে বলিলেন, "মা, এ ত ভালই হইল ; আমরা দায়ুদের সন্ধান পাইলাম। এইবার তাঁহাকে লিখিয়া দিব, ভগবানের কৃপায় তুমি নিরাপদে আসিয়া তোমার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছ। তিনি ফিরিয়া আসিবেন।"

রুথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি দায়ুদের কাছে যাইব।"

"যাইবে ; কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ; সহসা ত সে স্থানে যাইতে পাইবে না! দেখিতে পাইতেছ, ইমামের ভ্রাতা বোম্বাইয়ে আসিয়া আর যাইতে পারিতেছেন না!"

রুথ কাতরদৃষ্টিতে রাব্বীর দিকে চাহিয়া বলিল "আমাকে যাইতে দিতেই হইবে।"

তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

রুথ মিস ব্রকের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার ভ্রাতাও সেথায় আছেন ; আপনি চেষ্টা করিলেই আমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন।"

মিস ব্রক বলিলেন, "আমি আজই সামরিক বিভাগে যাইতেছি—আমার দ্বারা যাহা কিছু করা সম্ভব, তাহা অবশ্যই করিব।"

রুথ সাগ্রহে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।"

অগত্যা রাব্বীর মোটর লইয়া মিস ব্রক চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রুথ বলিল, "আমাকে যাইতেই হইবে।"

এক ঘণ্টা পরে মিস ব্রক ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, জেনারল টাউনসেণ্ড সংবাদ দিয়াছেন, দায়ুদ ডাক্তার বোম্বাই হইতে বিলাতের পথে তুর্কী হইয়া ইরাকে গিয়াছেন। তুর্কীর রাজ্যে তিনি তাঁহার পত্নীকে হারাইয়াছেন, সেই জন্য তুর্কীর সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি এখন জেনারলের সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। জেনারলকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দায়ুদকে তাঁহার পত্নীর বোম্বাইয়ে আগমন সংবাদ দেওয়া সেনাপতি সঙ্গত বিবেচনা করেন না ; কারণ, সে সংবাদ পাইয়া দায়ুদ যদি চলিয়া আইসেন, তবে সহসা সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের সব বন্দোবস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। তবে আমরা বলিলে, তিনি জেনারলের কাছে গোপনে এ সংবাদ পাঠাইতে পারেন তিনি যাহা ভাল মনে করেন, করিবেন।

শুনিয়া রুথ বলিল, "কোন সংবাদ দিতে হইবে না। আমি তাঁহার কাছে যাইব।"

মিস ব্রক বলিলেন, "সে কথাও আমি বলিয়াছি। এখন যুদ্ধের সময় ; যুদ্ধের প্রয়োজনে 'ট্রান্সপোর্ট' জাহাজ ব্যতীত কোন জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে ইরাকে যাইতে পায় না। সে সব জাহাজে মহিলা-যাত্রী লইবার অনুমতি নাই। তবে যদি আমরা বলি, সেনাপতি ইরাকে জেনারলকে লিখিয়া অনুমতি পাইলে তোমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। কিছুতেই এখনই যাওয়া হয় না।"

রুথ অন্যমনস্ক ও হতাশভাবে বলিল, "আরও বিলম্ব!"

রাব্বীর স্ত্রী বলিলেন, "তুমি যত সহ্য করিয়াছ, তত বুঝি আর কেহ করে নাই। তবে এখন এত অধীর হইতেছ কেন ?"

রুথ চুপ করিয়া রহিল।

পর দিন রাব্বী ও ইমামের ভ্রাতা মিস ব্রকের সহিত পরামর্শ করিলেন। মিস ব্রক একে ইংরাজমহিলা, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা জেনারল টাউনসেণ্ডের সহকারী—কাযেই সামরিক বিভাগে তাঁহার একটু সম্মান ছিল। বিশেষ তিনি যে দায়ুদের স্ত্রীর কথা লইয়া গিয়াছিলেন, সেই দায়ুদ এখন ইরাকে ইংরাজের বন্ধু। কাযেই মিস ব্রকের কাছে সব শুনিয়া সেনাপতি শেষে জেনারল টাউনসেণ্ডকে সব কথা ব্যক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ করিলেন।

তৃতীয় দিন উত্তর আসিল, জেনারল সেনাপতির মতে মত দিয়াছেন : এখন দায়ুদ চলিয়া গেলে, ইংরাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। দায়ুদের পত্নী যদি সত্য সত্যই তাঁহার কাছে আসিতে চাহেন, এবং তাঁহাকে পাঠান সেনাপতি সঙ্গত বিবেচনা করেন, তবে যেন সাদরে তাঁহাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। কারণ, ততদিনে ইংরাজ বাগদাদ বিজয় করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস জেনারলের আছে। বাগদাদে পৌঁছিতে

পারিলে দায়ুদের পত্নীর আর তত কষ্ট হইবে না। কিন্তু তিনি এ অবস্থায় ইহাকে না আসিলেই ভাল হয়। তাহার পর জেনারল উপদেশ দিয়াছেন, ডাকঘরে যেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হয়—দায়ুদের পত্নীর কোন সংবাদ ভারতবর্ষ হইতে কাহারও কাছে প্রেরিত না হয়।

সেনাপতি সব সংবাদ লইলেন, স্বয়ং আসিয়া রুথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; পুলিসের রিপোর্ট পাঠ করিলেন—তাহার পর মিস রুথকে বলিলেন, "আগামী সপ্তাহের প্রথ সেই 'এরণ্ডা' জাহাজ যুদ্ধোপকরণ লইয়া বোম্বাই হইতে করাচী হইয়া বসোরায় যাইবে—জাহাজখানি ভাল; আমি তাহাতেই দায়ুদ-পত্নীর বসোরা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব কিন্তু তাঁহাকে বলিবেন, যুদ্ধের সময় যাইতে যদি কোন বিপদ ঘটে, সে জন্য আমি কোনরূপ দায়িত্ব লইতে পারি না।"

শুনিয়া রুথ যেন কতকটা আশ্বস্তা হইল।

বাল্যের বেসাতি

পয়সা ট্যাঁকে ঘোড়ের বাঁকে কিনতে গেলুম মুড়ি।
উড়ে গেছে 'কাঁদা' করে, দোকান দেখছে বুড়ী॥
ট্যারচা গোছের উলুর চালা কাঠের পাটা তায়;
ঢুলছে না তো ঝুলছে তবু একটি কোণের গায়॥
আটটা বেলায় তপ্ত খোলায় ভাজছে খ'য়ে ধান।
খুরসী পিঁড়েয় ব'সে বুড়ী চিবিয়ে দোক্তা পান॥
সামনে আছে দাম নে খাড়া মেয়ে মদ্দ ছেলে।
দাঁড়িয়ে রোদে বস্তি বোদে ভোঁদা নোদো কেলে॥
কেউ চাচ্ছে চিঁড়েভাজা গুড়ে গজা কেউ বা ভাজা কড়াই।
সবার আগে নেবার জন্যে কচ্ছে সবাই লড়াই॥
জগার জ্বলছে জঠর চাচ্ছে মটর চাঁচি গুড়ের মুড়কি।
উড়ে বুড়ী দিচ্ছে কা'কে রেকে মেপে কা'কেও ভ'রে উড়কী॥
"দিইছন্তি দিইছন্তি টিকা ঠার, স্বপ্ন কাঁইকি গলা।"
বড়র বড়র বকছে বুড়ী "পনকি নিয়ে কৌঠি গিয়ে মলা॥"
কৌঠি মৌঠি পনকি শুনে ছেলেরা খুন হেসে।
বলে আমার বাড়ী চল না বুড়ী পঁকাড় ভাত খেসে॥
বুড়ীকে নিয়ে নিত্যি রঙ্গ করে ছেলের দল।
মা বল্লেই রেগে মরে মৌসী বল্লে জল॥
মা বাকো তুষ্ট সবাই শুনি রুষ্ট কেবল উড়ে।
আর আজকালকার মেয়ে মাষ্টার দেন পড় নীদের খুড়ে॥
অবাক্ চোখে ছেলেরা দেখে বাকোস ভরা বাহার।
শুষ্ক রুটীতে মন উঠে না সামনে মিঠে আহার॥
কড়া কড়া ডালবড়া আর মোলামগড়া ফুলুরি;
গুড় পো বেগ্নি গুড়ে পকান গরম গরম ডালপুরি॥
রসনার রস গিয়েছে বাবু ভোজন করেন শ্রবণে।
তাই জানেন না কি মজাদার তাজা মুড়ি শ্রাবণে॥
নুন লঙ্কা তেল মেখে কাঁচা মূলোর সঙ্গে।
পৌষ মাসে রোদে ব'সে সখের আহার বঙ্গে॥
আগে মুড়ি-মুড়কি জলপান করতো প্রজা-জমিদার।
জলপান কথা তাই আজও ব্যবহার॥

এলো বিলেত থেকে পাউণ্ড পাউণ্ড ওয়ান ওয়ান টিন।
ওয়ান শিলিং সিক্স পেন্সে চায়ের চাট চলতো এত দিন॥
খোলায় ভেজে তোলায় কুনকে মাপে ঢালে।
সাত বাসটে বিস্কুট তাই বাবুরা পোরেন গালে॥
ইংরিজিতে ভিজে ভিজে প্যাঁজের গন্ধ প্রতিপদে।
অশন বসন বাসন-ভাষণ সব নিবেদন সাদা-পদে॥
জিনের জায়গায় খদ্দর বটে কোটটি কিন্তু ঠিক বজায়।
মড়ো মড়োনো গোপ জোড়াটি নাকের নীচে মন মজায়॥
ম্যানচেষ্টারের দ্বেষ্টা বটে দেন না তারে তিন টাকা।
বিশ হাজারের রোল্‌স্ রয়েস গ্যারেজেতে হয় রাখা॥
আবহাওয়াতে খেতাব মেশা নেশা গেছে ধোরে।
লাটখেতাবে নাম কাটিয়ে গড়ে নতুন ঠাটে ঘরে॥
স্বদেশ স্বদেশ স্বরাজ স্বরাজ যতই মুখে ফুটছে।
দিশি খাদ্য দিশি বাদ্য দিশি গদ্য ততই শিকেয় উঠছে॥
হারমোনিয়ম নিয়ম এখন হয়েছে হরিনামে।
গুমর ক'রে কুমর গড়ে দেবী বিবিঠামে॥
ইউনিটি ইউনিটি ক'রে ভিরকুটী করি মুখে।
বিদ্বেষের উদ্দেশে আগুন ধকধকাচ্ছে বুকে॥
চাপকান ত খাপ খায় না অফিস বাবুর অঙ্গে।
ঠেসাঠেসি ট্যাস ফিরিঙ্গি ট্রামে দেখি রঙ্গে॥
কপাটীতে কপাট বন্ধ, মজে ফুটবলেতে মন।
হয় বাঙ্গালা বুঝতে খুঁজতে আজ ইংরিজি বচন॥
আয় রে আয় ছেলেবেলা বগলে তাড়িপাত।
কোঁচড়ভরা মুড়ি-মুড়কি আক ছাড়ান দাঁত॥
আয় নিয়ে আয় গুলিডাণ্ডা ছেল্‌ডিগডিগ খেলা।
আরম্ভতে মহানন্দ খুলুক পান্তা ভাতের মেলা॥
মায়ের অন্নের জন্যে দি ধন্না রান্নাঘরে।
দেখাই বাবুয়ানার বোল-বোলাটা জোণার কাপড় প'রে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু

জাপানে ভূমিকম্প

পৃথিবীর ইতিহাসে নানা দেশে ভূমিকম্পের বিবরণ পাওয়া যায়। সে সকলের মধ্যে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের লিসবনের ভূমিকম্পই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সে ভূমিকম্পে লিসবন সহর ৮ মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায় এবং অনুমান ৫০ হাজার লোকের জীবনান্ত হয়।

পরবর্ত্তী প্রধান ভূমিকম্পগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকায় ভূমিকম্প। ইহাতে কুইটো সহর নষ্ট হইয়া যায় এবং ১ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ৪০ হাজার লোক প্রাণ হারায়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-ভারতের ভূমিকম্পে কচ্ছ জিলা সমুদ্রসলিলে আচ্ছাদিত হইয়া যায়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে ভূমিকম্পে টোকিও কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ অল্প হয় নাই—সে ক্ষতির পূরণেও সময় লাগিয়াছিল।

ফুজী-আমা পর্ব্বত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর শ্রীনগরে ভূমিকম্পে ৭০ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভূমিকম্পে চার্লসটাউন বিধ্বস্ত হইয়া যায়; কিন্তু লোকক্ষয় অতি অল্পই হইয়াছিল।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাপানে ভূমিকম্পে ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সানফ্রানসিস্কো ভূমিকম্পে নষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ সহস্র মানবজীবন ও ৯০ কোটি টাকার সম্পত্তি।

এই বৎসরেই চিলীতে প্রবল ভূমিকম্প হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ও অগ্নিদাহে জামেকায় বিশেষ ক্ষতি হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ও সাগরতরঙ্গোচ্ছ্বাসে

টোকিও সহর।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ভূমিকম্পে শিলং সহর ধ্বংস হয় এবং আসামে ও বঙ্গদেশে বহু গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তুর্কীস্থানে ভূমিকম্পে ১০ হাজার লোক প্রাণ হারায়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে ভূমিকম্পে ধরমশালা সহর ভাঙ্গিয়া যায়—লাহোরে ও অমৃতসরেও গৃহাদির ক্ষতি হয়। এই ভূমিকম্পে প্রায় ১৯ হাজার লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

ইটালীতে মেসিনা নষ্ট হয় এবং লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। কিন্তু এবার জাপান হইতে ভূমিকম্পে ক্ষতির যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত বুঝি এ সকলের তুলনা হয় না। জাপানে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হয়। তথায় যে আগ্নেয়গিরি বৈজ্ঞানিকরা নির্ব্বাপিতাগ্নি বলিয়া মনে করিতেন, তাহার ছিদ্র হইতে প্রায়ই বাষ্প নির্গত হয়! সেই ফুজী-আমা পর্ব্বতের কাছেই বর্ত্তমান ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলিয়া মনে হয়।

মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হয় বলিয়া জাপানীরা সাধারণতঃ গৃহ-নির্ম্মাণে গুরুভার উপকরণ ব্যবহার করিতে চাহে না।

চীনের ও জাপানের সমুদ্রকূলে কয় মাস মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড় বহিয়া যায়। এবার সেইরূপ প্রবল টাইফুন প্রবাহিত হইবার পরই ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ১লা সেপ্টেম্বর সংবাদ পাওয়া যায়, ভূমিকম্পের পর ইয়োকোহামা সহরে অগ্নিদাহে বারুদখানা উড়িয়া গিয়াছে এবং জাপানের রেলের বৃহৎ সুড়ঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ায় ৬ শত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ভূমিকম্পের সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং বাতাসও প্রবল ছিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে লোক ভয়ে পলায়নপর হয়—সেই ভীড়ে অনেক লোকের জীবনান্ত হইয়াছে এবং সহর দুইটির শেষ যাহা ছিল, তাহা অগ্নি ভস্মীভূত করিয়াছে।
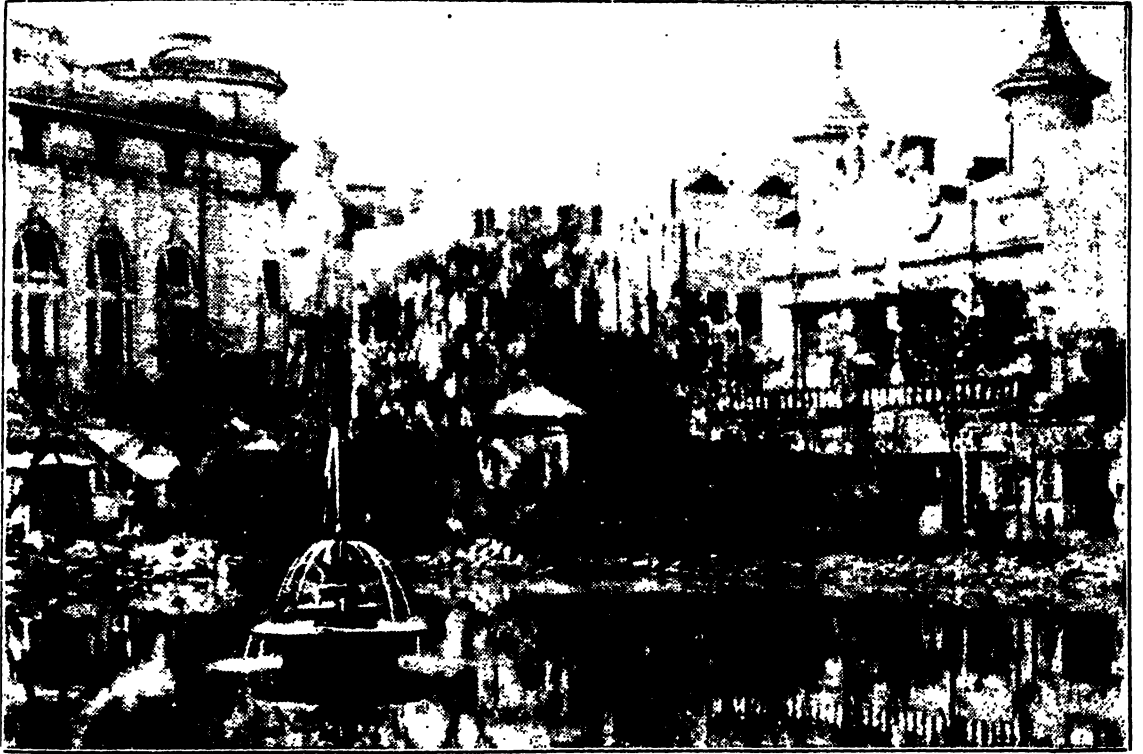
টোকিও সহরের ওসাকুশা পার্কের মনোহর পুষ্করিণী। ভূমিকম্পের পরবর্ত্তী অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে পলায়িত মহিলা ও শিশুদিগের মৃতদেহে এখন উহা পূর্ণ হইয়াছে।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া গৃহ গ্রাস করিতেছে, আর টোকিও সহরের রাজপথ শবে পূর্ণ।

তাহার পর যত দিন যাইতেছে এবং যতই আবার সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, ততই প্রকৃত ব্যাপার জানা যাইতেছে।

২রা তারিখের সংবাদে প্রকাশ পায়, ইয়োকোহামায় ও টোকিওয় প্রায় ১ লক্ষ লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে;

পরবর্ত্তী সংবাদে বুঝিতে পারা যায়, ৫ লক্ষাধিক লোক এই বিষম দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। গ্যাসের নল ভাঙ্গিয়া গ্যাস বাহির হয় এবং তাহা জ্বলিয়া উঠাতেই ইয়োকোহামায় অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১টি হাসপাতালেই ৭ শত চিকিৎসার্থীর মৃত্যু হইয়াছে। অগ্নির তাপেও বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছে। প্রকৃত মৃতের সংখ্যা স্থির করা দুষ্কর।

শেষ সংবাদে মনে হয়, ২ লক্ষ ৩০ হাজার লোক নিহত ও ৪ লক্ষ ৫০ হাজার আহত হইয়াছে। ৬০ লক্ষ লোক গৃহহীন। টোকিওয় যাহারা আহার্য্য পাইবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে, তাহারা দৈর্ঘ্যে ২ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে!

তাহার জনবহুল রাজপথ শবে পূর্ণ। রাজধানী টোকিওর সেই অবস্থা।

আজ জাপানীদিগকে বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া তবে বিপন্ন জনগণের উদ্ধার-সাধন করিতে হইতেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের নৃপতি জাপানের এই

টোকিওর প্রধান রাজপথ—গিঞ্জা। এই সকল দোকান ও অট্টালিকা তাসের ঘরের মত পড়িয়া গিয়াছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভূমিকম্পে এরূপ ক্ষতির বিবরণ আর কখন পাঠ করা যায় নাই। বাত্যা, ভূমিকম্প ও অগ্নিদাহ সভ্য জগতে লোকের যত ক্ষতি করে, অসভ্যদিগের মধ্যে তত ক্ষতি করিতে পারে না। কেন না, মানুষ যত সভ্য হয়, সে ততই সহরে এক সঙ্গে বাস করে এবং তাহার শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র ততই ধনসম্পদে পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়। জাপানে এই ৩ বিপদ একযোগে জাপানের বৃহৎ বন্দর ও রাজধানী ধ্বংস করিয়াছে। জাপানের যে প্রদেশে জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ব্যবসার কেন্দ্র বৃহৎ, সেই প্রদেশেই এই সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়াছে। যেন অদৃষ্টের বিশাল হাতুড়ী পড়িয়া সমগ্র প্রদেশটি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ইয়োকোহামার বৃহৎ বন্দরে পোতাশ্রয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—জাহাজ নষ্ট হইয়াছে—রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিষম বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের যে সব রণতরী জাপানের কাছে ছিল, সে সকল কেবল যে উদ্ধারকার্য্যেই সাহায্য করিয়াছে তাহা নহে; পরন্তু চাউলও বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

জাপানীরা যেরূপ শ্রমশীল, ধীরপ্রকৃতি ও কর্ম্মপটু, তাহাতে এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায় যে, অল্পকাল মধ্যেই ইয়োকোহামা বন্দর আবার বাণিজ্যের কলরবে মুখরিত হইবে এবং টোকিওর পুরপথ আবার পার্শ্বস্থিত সৌধশ্রেণীর শোভায় লোককে মুগ্ধ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানের যে ক্ষতি হইল, কত দিনে তাহার পূরণ হইবে, বলা যায় না। জাপানীরাও ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

জাপানের এই আকস্মিক বিপদ প্রকারান্তরে এসিয়ার দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসিয়ার সৌভাগ্য-সূর্য্য আবার জাপানেই তাহার অরুণ-কিরণ বিকশিত করিয়া উদিত হইয়াছিল। সমগ্র প্রাচী সেই কিরণে নূতন জাগরণে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া জাপান প্রথম জগতের শক্তিপুঞ্জমধ্যে আপনার আসন লাভ করে। তদবধি সে প্রতীচ্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রে, জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনার উন্নতি-সাধন করিতেছিল। জার্ম্মাণ যুদ্ধে প্রাচীর জলপথ রক্ষার ভার লইয়া জাপান মিত্রশক্তিপুঞ্জকে নিঃশঙ্ক

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত পাঁচতালা বৌদ্ধ-চৈত্য। টোকিওর শুধু এই গৃহটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয় নাই।

করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় জাপানই রুসিয়াকে যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছিল।

জাপানের এই উন্নতির মূলে ছিল স্বত্যাগ। জাপানের অভিজাত সম্প্রদায় এক দিনে আপনাদের সব বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর জাপান প্রতীচীর কর্ম্মক্ষেত্রে দলে দলে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া আনিয়াছে। জাপান স্বদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। জাপান সরকার হইতে সাহায্য দিয়া বিরাট নৌবাহিনী গঠিত করিয়াছে এবং নৌশিল্প নিরাপদ করিয়াছে।

চীনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার বাসনাও জাপানের আছে।

আসামা-য়ামা—জাপানের বর্ত্তমান সর্ব্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি।

জাপানের এই বিপদে আজ সভ্যজগতের নানা স্থানে সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। সে সাহায্যের জন্য কেবল যে জাপানই কৃতজ্ঞ থাকিবে, তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র এসিয়া সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে।

জাতিগত বৈষম্য

যে সময় ইংরাজ কেনিয়ায় ভারতবাসীদিগকে শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত তুল্যাধিকার দিতে অস্বীকার করিয়া ভারতবাসীর জাতীয় আত্ম-সম্মানে আঘাত করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে সংবাদ আসিয়াছে, ফ্রান্স তাহার শ্বেতাঙ্গাতিরিক্ত প্রজাদিগের শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত তুল্যাধিকার স্বীকার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। মার্কিণের ও অন্যান্য দেশের শ্বেতাঙ্গরা ফ্রান্সে আসিয়া কালাদিগকে শ্বেতাঙ্গ সুন্দরীদিগের সহিত আহার করিতে ও নাচিতে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহাদিগকে অপমান করিবার চেষ্টা করে। সেই জন্য ফ্রান্স সেরূপ অশিষ্টাচার নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে· ফ্রান্স তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

পরে জানা গিয়াছে, ২টি ঘটনায় ফরাসী সরকার এই ইস্তাহার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক দিন কয় জন আমেরিকান পর্য্যটক যুদ্ধক্ষেত্র দেখিবার জন্য যে মোটরযানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ২ জন কৃষ্ণকায় ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। মার্কিণ পর্য্যটকরা তাঁহাদিগের সহিত এক যানে যাইতে আপত্তি করেন। কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারীরা উভয়েই যুদ্ধের সময় অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কৃষ্ণকায় কর্ম্মচারীরা অন্য যানে গমন করেন—তাহাতে কেবল ফরাসীরা ছিলেন। আর একদিন কয়জন আমেরিকান যে হোটেলে আহার করিতেছিল, সেই হোটেলে একজন পদস্থ আফ্রিকান যাইলে তাহারা তাঁহাকে বাহির করিয়া দিতে বলে।

এই সব ব্যাপারে ফরাসীরা আমেরিকানদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন এবং ফরাসী সরকার পূর্ব্বোক্ত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

ইহাতে বিখ্যাত ইংরাজ সংবাদপত্রসেবক মিষ্টার গার্ভিন তাহার 'অবজারভার' পত্রে এক প্রবন্ধে ফরাসীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ফরাসী সভ্যতা আজ কৃষ্ণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, কৃষ্ণ এ স্থলে ২ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কৃষ্ণকায়ের শক্তি, আর নিন্দনীয়—ঘৃণিত শক্তি)। শান্তির সময়ও ফ্রান্স ৩ লক্ষ কৃষ্ণকায় সৈনিক রাখে—যাহাতে প্রয়োজন হইলে আরও কৃষ্ণকায় সৈনিক পাওয়া যায়, সে ব্যবস্থাও করিতেছে। ইহাই ফরাসীর রাজনীতির মূলসূত্র—ইহাই য়ুরোপের ভাগ্যলিপি! আফ্রিকা য়ুরোপে এইভাবে প্রাধান্য করিতেছে—আর এই যে সব সৈনিক ইহারা ভাড়াটিয়া নহে। ইহাই ফরাসী রাজনীতিক পোঁয়াকারের নীতি!

য়ুরোপে কৃষ্ণকায় জাতির প্রাধান্য কল্পনা করিয়া মিষ্টার গার্ভিন এতই বিচলিত হইয়াছেন যে, ফরাসী গণতন্ত্রের প্রজাদিগকেও ভাড়াটিয়া বলিয়া অপমান করিতে কুণ্ঠানুভব করেন নাই। চীনে—এমন কি য়ুরোপেও ইংরাজ কি করিয়াছে? ভারতবর্ষ হইতে যে সব কৃষ্ণকায় সৈনিক, শিখ, গুর্খা, পাঠান ফ্লাণ্ডার্সে যাইয়া প্রাণদান করিয়া ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা কি "ভাড়াটিয়া" নহে? ফ্রান্সের কৃষ্ণকায় সৈনিকরা ফরাসী গণতন্ত্রের নাগরিক শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত তুল্যাধিকারে অধিকারী। আর ইংলণ্ডের ভারতীয় সৈনিকরা বিজিত প্রজা—ব্যবসা বা চাকরী হিসাবে সৈনিকের কায করিয়া থাকে। কে ভাড়াটিয়া? আর বেতন লইলেই যদি ভাড়াটিয়া হয়, তবে ভারতে বর্ত্তমান ইহুদী বড়লাট লর্ড রেডিংকেও কি ভাড়াটিয়া বলা চলে না? ফ্রান্স বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল নাগরিককে তুল্যাধিকার প্রদান করিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজ বাঙ্গালীকে স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার অধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; ফ্রান্স তখন চন্দননগরের বাঙ্গালীদিগকে বলিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে সে শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত সর্ব্ববিষয়ে তুল্যাধিকারী হইবে। ফরাসী সরকারের সেই ইস্তাহারের পার্শ্বে ইংরাজের ব্যবহার রক্ষা করিলে কি মনে হয় না, দুই জাতির মনোভাবেই প্রভেদ আছে?

তবে ফ্রান্স কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যে বলবতী বাসনা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মূলে আত্মরক্ষার সহজাতসংস্কার থাকিতে যে পারে না, এমন নহে। য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবল ফ্রান্সেরই জনসংখ্যা বাড়িতেছে না। অন্যান্য দেশ জনসংখ্যার আধিক্যে বরং বিব্রত হইয়া পড়িতেছে এবং বৎসর বৎসর শত শত লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া আমেরিকায়, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে গমন করিতেছে। য়ুরোপের এই আমদানী ব্যাপারে বিব্রত হইয়া আমেরিকা তাহাদের স্রোতঃ নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস করিতেছে। কেবল ফ্রান্স হইতে লোক আমেরিকায় যায় না; কেন না, কিছুকাল হইতে বিলাসী ফ্রান্সের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই। যদি এখন স্বাভাবিকভাবে ফ্রান্সের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তথাপি যুদ্ধে তাহার যে লোকক্ষয় হইয়াছে, তাহাই পূরণ করিতে ফ্রান্সের ২০ বৎসর লাগিবে। ফ্রান্সের জনসংখ্যা অধিকও নহে। তাহার জনসংখ্যা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ আর জার্ম্মাণীর ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। আবার জার্ম্মাণ জাতির প্রজননশক্তি এত প্রবল যে, যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী জনসংখ্যা পাইতে ফ্রান্সের যখন অন্ততঃ ২০ বৎসর লাগিবে, তখন জার্ম্মাণীর জনসংখ্যা এই কয় বৎসরেই যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী জনসংখ্যা অপেক্ষা ২০ লক্ষ বাড়িয়াছে! কাজেই ফ্রান্সের পক্ষে এ শঙ্কা অস্বাভাবিক নহে যে, আবার জনবলে বলী হইয়া জার্ম্মাণী তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে এবং তখন আবার তাহাকে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইতে পারে। যে জার্ম্মাণ জাতির জনসংখ্যা এইরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কোথায়? কাজেই ফ্রান্সকে তাহার উপনিবেশ ও অন্যান্য স্থানের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই সব স্থানে অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়। সুতরাং এই সব কৃষ্ণকায় নাগরিকেই ফ্রান্সের সামরিক দায়িত্ব অনেকাংশে বহন করিতে হইতেছে—হইবেও। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চলে ইহারা যে কায করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। য়ুরোপের অন্যান্য দেশ জার্ম্মাণীর শত্রু হইলেও তাহার বিরুদ্ধে কৃষ্ণকায় সৈনিক ব্যবহারের জন্য ফ্রান্সকে নিন্দা করিয়াছে। এমনই তাহাদের কৃষ্ণাঙ্গ ঘৃণা!

কিন্তু ফ্রান্সের উপায় কি? আত্মরক্ষার জন্যও তাহাকে এই সব কৃষ্ণকায় সৈনিক ব্যবহার করিতেই হইবে। আর সে জন্য ফ্রান্স যদি শূন্যগর্ভ বাক্যের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে

প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার প্রদান করে, সেইজন্য ফ্রান্সের প্রশংসাই করিতে হয়। ভারতেও ভারতীয় সৈনিকরা ইংরাজের রাজ্যরক্ষা করে—কেবল স্বদেশে নহে, বিদেশেও তাহারা ইংরাজের জন্য প্রাণ দেয়, অথচ তাহারা সামরিক বিভাগেও ইংরাজের সহিত তুল্যাধিকার লাভ করিবার কল্পনা করিতে পারে না! বৃটিশ "টমী" শ্বেতাঙ্গ বলিয়া সকল বিষয়েই বিশেষ অধিকার লাভ করে আর ভারতীয় "সিপাহী" তাহার তাঁবেদার ব্যতীত আর কিছুই নহে। অথচ যোদ্ধা হিসাবে সিপাহী কোনরূপে টমীর অপেক্ষা হীন নহে। আর ভারতবর্ষে য়ুরোপীয়দিগের নানা অধিকার আজও ভারতবাসীর পক্ষে অনধিগম্যই রহিয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার এই যে ভাব, ইহাতেই কি তাহার নিহিত দৌর্ব্বল্য পরিলক্ষিত হয় না?

কিন্তু ফ্রান্সের এই যে সাম্যবাদ, ইহার আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কারণও থাকিতে পারে। যে দার্শনিকোচিত আদর্শানুসরণপ্রিয়তায় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স **সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীর** বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া পুরাতন সংস্কারের জীর্ণ দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া—যুগ-যুগসঞ্চিত অন্ধকারে আলোকবিকাশপথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যে সেই দার্শনিকোচিত আদর্শানুসরণ-প্রিয়তা আজও বিদ্যমান থাকা বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পরন্তু এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, আত্মরক্ষার প্রয়োজন সেই উন্নত ও উদার ভাবকে প্রবল করিতে সহায় হইয়াছে।

যে কারণেই এই ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকুক না কেন, ইহার জন্য প্রাচ্যজাতিসমূহ—কৃষ্ণাঙ্গ ও পীতকায় জাতিরা সকলেই ফ্রান্সের প্রশংসা করিবে। যে আমেরিকা ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল বলিয়া গর্ব্ব করে, সেই আমেরিকাতেই কৃষ্ণকায়দিগের দাসত্ব দূর হয় নাই। সেই আমেরিকাতেই এখনও কৃষ্ণাঙ্গকে শ্বেতাঙ্গরা যথেচ্ছ লাঞ্ছিত করিয়া থাকে—বেত্রাঘাত প্রভৃতি বর্ব্বরোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করে। ইংরাজের উপনিবেশসমূহে কৃষ্ণকায়দিগের লাঞ্ছনার সীমা নাই—দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরা যান হইতে পদাঘাতে ভারতবাসীকে ফেলিয়া দিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে, এমনও জানা যায়। এবারও বৃটিশ সরকার কেনিয়ায় ভারতবাসীকে শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত সমান অধিকার দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও ভারতবাসীরা নানা বিষয়ে শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে তুল্যাধিকার পায় না।

যে সময় নানাদেশে শ্বেতাঙ্গরা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বে অকারণ বিশ্বাসবশে কৃষ্ণকায়দিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার করে, সে সময় তাহাদিগের তুল্যাধিকার রক্ষার জন্য ফ্রান্সের এই চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

কাপ্তেন অমরনাথ গুপ্ত

ডাক্তার অমরনাথ গুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিগত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু-দিন অস্থায়ীভাবে সামরিক বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন অমরনাথ গুপ্ত।

কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও সীমান্ত-প্রদেশে যাইতে হইয়াছিল। এডেনেও তিনি দুই বৎসর-কাল চিকিৎসা-কার্য্যের ভার লইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ত্বগ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংপ্রতি লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন। Dermatology বা ত্বগ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি 'চেষ্টারফিল্ড' পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

জলপ্লাবন

বিগত বর্ষের উত্তরবঙ্গ ভীষণ জলপ্লাবনের জের না মিটিতেই এ বৎসর মেদিনীপুর, বিহার, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের নানা স্থানে প্রবল বন্যার ধ্বংসলীলা দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশে —বেসিনে জলপ্লাবন দেখা দেয়। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বেসিন অঞ্চলের ২ লক্ষ ২৩ হাজার একর ভূমি জলমগ্ন, শস্যক্ষেত্রসমূহ প্লাবনবেগে ধ্বংসপ্রাপ্ত। একটি নগরের ৯ হাজার গৃহের মধ্যে ৪ হাজার গৃহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস পাইয়াছে, ১ হাজার ২ শত গৃহ পতনোন্মুখ। বন্যার প্রকোপে বহু শস্যহানি হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস এখনই দেখা দিয়াছে।

বিহারের বন্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ছাপরা হইতে শোণপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের সমগ্র পল্লী সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। শোণনদের উভয় কূল ছাপাইয়া বন্যার প্রবল জলস্রোত যে ধ্বংসলীলার অভিনয় করিয়াছে, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা কঠিন। আরা ও দানাপুরের মধ্যস্থ স্থান জলমগ্ন। সাহাবাদ জিলার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রায় ১ শত

পাটনা সহরের উত্তরদিকের সীমা—"বেলি রোড"।

গৃহ সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। বন্যাও অনেকবার ব্রহ্মদেশে দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু এবারের ধ্বংসলীলা অতি ভীষণ। লোকক্ষয়ের সঠিক বিবরণ এখনও পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

কাসাই নদীতে বন্যা আসিয়া মেদিনীপুর ভাসাইয়া দিয়াছে। ৫ শতাধিক গ্রাম বন্যার জলে নিমগ্ন, জলের উচ্চতা ৭।৮ ফুট হইবে। সহস্র সহস্র নরনারী গৃহশূন্য, নিরাশ্রয়। সংগৃহীত বিবরণে দেখা যায়, ১ হাজার ৮ শত বর্গমাইল স্থান বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। রেলপথ বহু স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় পঞ্জাব ও বোম্বাই মেল একসঙ্গে গয়ার পথ দিয়া চলিতেছে।

বিহারের প্রবল বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়, শতকরা ৭৫খানা গৃহ জলমগ্ন। চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িতের আর্ত্ত চীৎকার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জলমগ্ন অঞ্চলের হাঁসপাতাল-গৃহ প্রভৃতি বন্যার স্রোতে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। কোথাও বা ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় কোন কোন

বাঁকীপুর ফুটবল ময়দান।

অট্টালিকা বিপুল জলবিস্তারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। ভাগলপুর অঞ্চল হইতেও প্রবল বন্যার সংবাদ আসিয়াছে।

মাদ্রাজও বন্যার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পায় নাই। উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া প্লাবন জলে ভাসিয়াছে। দক্ষিণ কানাড়ার ২৫ মাইলব্যাপী স্থান সম্পূর্ণরূপে জলপ্লাবিত। ৯ হাজার ৬ শতাধিক গৃহ বন্যার স্রোতে ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০ হাজার নরনারী আশ্রয়হীন।

পুণ্যধাম বারাণসীতেও এবার বন্যা প্রবল হইয়াছে। কাশীর প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটে পূর্ব্বে কখনও বন্যার জল উঠিতে পারে নাই, এবার ভাগীরথীতে বন্যা আসায় সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরে বন্যার জল উঠিয়া স্থানটিকে জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানই জলপ্লাবিত হইয়াছিল।

আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন—আশ্রয়বিহীন হইয়া সমগ্র ভারতবাসীর দিকে সাহায্যের প্রত্যাশায় চাহিয়া

বোর্ড অব রেভেনিউ আফিসের কর্মচারিবৃন্দের সরকারী বাসা।

কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটের সম্মুখস্থ রাজপথ।

আছে। চারিদিক হইতে সাহায্য প্রার্থনা আসিতেছে। দেশের বিপন্ন জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ও কংগ্রেসকর্ম্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জনসাধারণকেও এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মেদিনীপুর হইতে শাসমল মহাশয় বন্যা-পীড়িতদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী

বিগত ২৯শে আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্য ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ

মৌলানা মহম্মদ আলী ঝান্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বিজাপুর জেল হইতে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে ঝান্সী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি মহাত্মার পত্নীর নিকট তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন, "যারবেদা জেলের চাবী অনুসন্ধান করিতেছি। ভগবান্ ও দেশবাসীকে বিশ্বাস করুন।" সংপ্রতি তিনি দিল্লীতে গিয়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হউক। মহাত্মা জেলে থাকায় তিনি আপনার মুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

মৌলানা মহম্মদ আলী।

জিতেন্দ্রলালের কারামুক্তি

ভারতের মুক্তিযজ্ঞের অন্যতম হোতা, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন। প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে উৎসব বয়কট করিবার জন্য বক্তৃতাপ্রদানের অপরাধেই তাঁহার কারাদণ্ড হয়। বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পরই ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি রামপুরহাটে গমন করেন। দেশবাসী তাঁহাকে পুষ্পমাল্য ও জয়গানে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। জিতেন্দ্রলাল কলিকাতা হইয়া বিগত মঙ্গলবার ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লীযাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বিবাদসম্বন্ধে পণ্ডিত মালব্যের সিদ্ধান্ত নাকচ করা হউক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী – তাঁহার কার্য্য সমর্থন ও অনুমোদন করা হউক, এইরূপ প্রস্তাব তিনি দিল্লীর অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন।
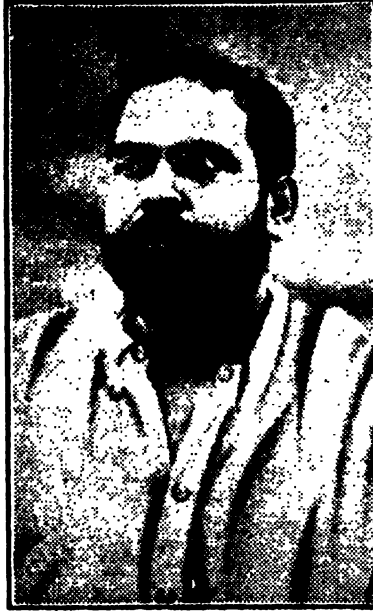
রামপুরহাটে জিতেন্দ্রলালের সংবর্দ্ধনা।

১লা শ্রাবণ—

মৃজাকালুর গুলীমারা কাণ্ডের স্মৃতি-রক্ষার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের এ দিন লবণ-ত্যাগ। লক্ষ্ণৌয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে বক্তৃতা করিতে নিষেধ, ১৪৪ ধারা জারী। হুগলী জেলে শ্রীযুত রামসুন্দর সিংহের প্রায়োপবেশন, "পরোয়ানা" পাইয়া জেলে তাঁহার ভ্রাতাদের সাক্ষাৎ করিতে গমন। নাগপুরে রেল-ষ্টেশনে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। কলিকাতায় গন্ধী পুণ্যাহের সভায় শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তার 'সত্যাগ্রহ স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগদান ও তিলক ভাণ্ডারে হাতের বালা খুলিয়া প্রদান। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কেনিয়ার সিদ্ধান্ত জানিতে চাহিলেও উহা অপ্রকাশ রাখা, শাসন-সংস্কার বিস্তারের প্রস্তাবে সরকার পক্ষের পরাজয়, কেনিয়া সমস্যার আলোচনা প্রস্তাবে বাধা। যুক্তপ্রদেশের করবার রাজ্যের রাণী মহাদয়ার প্রতি স্থানীয় ডেপুটা কমিশনারের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ। বেজওয়াদা মিউনিসিপ্যালিটীতে মদ্য-বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত। লসেনে প্রতিনিধিগণের পুরা বৈঠক। বিলাতে ভারতের জন্য ঋণ-গ্রহণে শতকরা ৭৫ টাকার জিনিষ বিলাতে কিনিবার প্রস্তাব, বিদেশে কেনা মালের শতকরা ৯৫ ভাগ এখনই বিলাত হইতে লওয়া হইতে থাকে বলায় প্রস্তাবটির আর প্রয়োজন হয় নাই।

২রা শ্রাবণ—

বোম্বাই কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ স্পেশ্যাল কংগ্রেসের জন্য স্থানীয় ইম-প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিকট ময়দান চাহিয়াছিলেন, সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য। কারাগারে লালা লাজপৎ রায়ের প্রতি আরও কড়াকড়ি। গন্ধী পুণ্যাহে নাগপুরে জাতীয় পতাকার পূজা, ২৮ জন দর্শক, ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও রেল-ষ্টেশনে ৩২ জন গ্রেপ্তার। মথুরায় জাতীয় পতাকা দিনে শোভা-যাত্রা বন্ধ, দোকান-পাটে উত্তোলিত পতাকা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। গন্ধী পুণ্যাহে বোম্বায়ে মহিলাদের শোভাযাত্রা, সিংহলে সভায় খদ্দর-গ্রহণের অনুরোধ। রাঁচী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পি পি মিত্র ১৮৬১ অব্দের ৫ আইনে জাতীয় পতাকার শোভাযাত্রারম্ভ ব্য ধৃত। চাঁদপুর, নূতনবাজারে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ক্ষতি। নাভা শাসনের জন্য কাশুরের ভূতপূর্ব্ব মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জগলতী নিযুক্ত। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এলায়েন্স ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ভারত সরকারের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত। সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গন্ধীর পালিতা কন্যা কতিমা বিবির লোকান্তর। বোম্বাই কংগ্রেস-কমিটী আলিগড়ের মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করিলেন। ঘুষ লওয়ার ও এক ব্যক্তিকে আটক রাখার অপরাধে বরিশালে মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক জন দারোগার কারাদণ্ড। শ্রীযুত জে এন রায় বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বদলী। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, কেনিয়ার খাসভূমি ও ভোটাধিকার সমস্যায় ভারতীয়দের প্রতিকূল সমাধান হইয়াছে।

৩রা শ্রাবণ—

মুন্সীগঞ্জে গবর্ণর গমনে হরতাল। নাভার মহারাজার দেরাদুন-বাসের সংবাদ। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দন্তচিকিৎসার জন্য আলিপুর জেলে আসিয়াছেন। শ্রীযুত বাজাজের জরিমানা আদায়ে তাঁহার মোটরগাড়ী ক্রোক। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ, মালাবার হাঙ্গামায় ২৩৬৯ মোপলা নিহত, ১৬৫২ আহত, ৫৯৯৫ ধৃত হইয়াছে ও ৩৯৩৪৮ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা গুরবারা গ্রামের রাজপুত টুনা রায় পৈতা লওয়ায় তাহার বাড়ী লুঠ, সেই অভিযোগে মামলা আরম্ভ। পিরোজপুরের কংগ্রেস কর্মী সুভাষিণী গোস্বামীর লোকান্তর।

৪ঠা শ্রাবণ—

নাগপুর জেলে মহাত্মা ভগবান্ দীনের প্রতি নির্ম্মম কঠোরতার সংবাদ। স্বামী বিশ্বানন্দের শিখধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মাদ্রাজ শাখায় হিসাবের গোলমালে ৮ লক্ষ টাকা উধাও। শ্রীযুত হরকিষেণলালের পুত্র শ্রীযুত কানাইয়ালালের এক মুসলমান যুবতী —ব্যারিষ্টার কন্যার পাণিগ্রহণ। তুরস্কের প্রণালী পথ সম্বন্ধে লসেনের ব্যবস্থায় রুসিয়ার প্রতিবাদ। পারস্যের ভূমিকম্পের সঠিক সংবাদ— ৯৬০ জনের মৃত্যু, ৪০০ গৃহ ধ্বংস। ফিজীর ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় প্রতিনিধির স্থানীয় জিজিয়া-করের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন।

৫ই শ্রাবণ—

কারাগারে মহাত্মার সহিত তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাক্ষাৎ, মহাত্মা-পত্নীর কারাবরণে মহাত্মার ইচ্ছা। বোম্বায়ে এক দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে বেশ্যাকে কন্যা বিক্রয় করায় দণ্ডিত। কলিকাতায় সিভিল বনাম মিলি-টারীর চ্যারিটি ম্যাচে ৬৭০৬ টাকা প্রাপ্তি।

৬ই শ্রাবণ—

বিহার জেলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থানীয় প্রচার বিভাগের সংবাদে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার প্রতিবাদ। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর পৌত্রীর মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের চেষ্টা। কোকনদে শ্রীযুত বেঙ্কটপায়া পণ্টলু নিখিলভারত কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত। শ্রীযুত বল্লভ ভাই পটেল কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির আদেশে নাগপুর সত্যাগ্রহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। বুলগেরিয়ায় বলশেভিকদল ধৃত। জার্ম্মাণীতে ২৪ হাজার কোটি মার্ক মূল্যের এলুমিনিয়ম মুদ্রা বাহির করার ব্যবস্থা। জার্ম্মাণীকে দুই কোটি পাউণ্ড শস্ত্র-শস্ত্র যোগাইবার সর্ত্তে রুসিয়ার চুক্তি। কেনিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী কর্তৃক বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষার দাবী।

৭ই শ্রাবণ—

নাগপুরে সত্যাগ্রহ প্রচার বিভাগের শ্রীযুত জৈনেন্দ্রকুমার এক বৎসর সশ্রম ও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মাদুরায় ৩৫ জন

স্বেচ্ছাসেবকের পিকেটিং করার অপরাধে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। শ্রীরামপুরে জাল সেটেলমেণ্ট অফিসার সুকুমার সেন ট্রেণ হইতে পলায়ন চেষ্টার অপরাধে ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আর্য্য-সমাজ কর্ত্তৃক আবার চারখানি গ্রাম শুদ্ধ। কুচবিহারের মহারাজকুমারী প্রতিভা দেবীর লোকান্তর। ভারতে কয়লার ব্যবসায় ক্ষতির কারণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ঝরিয়ায় কয়লা ব্যবসায়ীদের সম্মেলন। জগলুল পাশাকে মিশর হইতে যুরোপ ভ্রমণে যাইবার ছাড়পত্র প্রদান।

৮ই শ্রাবণ—

হুগলী জেলে সতীন্দ্রনাথের প্রায়োপবেশনের ২২শ দিন। ইরাক-বীর আহমদ বের নোয়াখালীতে হাজীসাহেবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ। বোম্বায়ে দৈনিক খেলাফতের সম্পাদক আবদুল গণি রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। লাহোরের জমীদারপত্রের মুদ্রাকর রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। পঞ্জাবে বিশালপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে গানার গেনস্ফোর্ট গো-শকটচালক এভিমুল্লাকে হত্যা করার অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইল। ঘুস আদায়ের চেষ্টায় আটক রাখার অপরাধে বারাসতের দারোগা পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড। বাঙ্গালার ব্যয়-সঙ্কোচ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ। সিঙ্গাপুরে রণপোতের আড্ডা স্থাপন প্রস্তাবে জাপানের অসম্মতির সংবাদ। লসেনে তুর্ক সন্ধি স্বাক্ষরিত।

৯ই শ্রাবণ—

পার্লামেণ্ট মহাসভায় কেনিয়ার ব্যবস্থার সমর্থন। তুরস্কে মার্কিণের নূতন (ব্যবসার) অধিকারে তুর্ক-মার্কিণ কোম্পানী গঠিত। নাটালেও পৃথক বাসের ব্যবস্থার কথা। ইরাক হইতে তিন দল সৈন্য সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

১০ই শ্রাবণ —

বাঙ্গালোর কংগেস-কমিটীর তুর্ক-সন্ধি উৎসবের আয়োজনে ছুই মাসের জন্য সভা ও মিছিল বন্ধের আদেশ, কয় জন অভিযুক্ত। লাহোরের 'প্রতাপ' পত্রের মুদ্রাকর রাজদ্রোহ ও জাতি-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে পুলিসের হস্তে। পঞ্জাব সারগোধায় মহাবীর দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মামলা। কচ্ছের প্রজাসঙ্ঘের সভাপতি মুনি শ্রীজয়-বিজয় নির্ব্বাসিত। কলিকাতার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে আসাম, গৌরীপুরের রাজাবাহাদুর শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার ১০ হাজার টাকা সাহায্য। তুর্কীসন্ধি উৎসবে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলিকাতা টাউনহলে সভা। মোপলা বিদ্রোহের সময় অনাচারের অভিযোগে দারোগা ময়দিন বরখাস্ত, গোবিন্দ মেনন নামে আর এক দারোগাকে পদত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। পাটনা, পগোলের ধোপারা ব্রাহ্মণদিগকে বয়কট করিয়াছে, কারণ, ব্রাহ্মণরা তাহাদের পূজা করে না। মীরাটে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, সৈন্যের সাহায্যে শান্তি স্থাপিত, ৩৬ জন আহত। উদয়পুর রাজ্যে অনাচারের সংবাদ। লর্ড সভায় কেনিয়ার কথা, ভারত-সচিব কর্ত্তৃক ব্যবস্থার সমর্থন।

১১ই শ্রাবণ —

নাগপুর জেলে ডাঃ হার্দ্দিকরের ওজন-হ্রাস। সালেমের ডাঃ বরদা-রাজলু নাইডু ১৪৪ ধারা অমান্য করায় গ্রেপ্তার। যারবেদা জেলে বেত্র-দণ্ডের প্রতিবাদে প্রায়োপবেশনে মহাত্মার আপোষ ব্যবস্থা, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমাপ্রার্থনার সংবাদ। কলিকাতায় যুগান্তরের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও মুদ্রাকর শ্রীযুত গিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড। বরিশাল, খরিসার বন্দরে কাপড়ের দোকানে ৫ জন মহিলার পিকেটিং। অমৃতবাজার পত্রিকা মিঃ কিডের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইল। রেঙ্গুনে রাজনীতিক দলাদলিতে দাঙ্গায় ১৮ জন গ্রেপ্তার। এলাহাবাদ, নবাবগঞ্জ থানায় হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামায় ২ জন নিহত ও ৬ জন আহত। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বৃষ্টি-দেবতার তৃপ্তির জন্য নরবলি দেওয়ায় ৬ জনের ফাঁসির সংবাদ। কেনিয়ার অপমানে বিলাতস্থিত ভারতের প্রতিনিধিদের ভারত সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে সাম্রাজ্য প্রদর্শনী ও সাম্রাজ্য বৈঠকের সম্পর্কত্যাগের কথা।

১২ই শ্রাবণ —

ধারিয়ালায় পুলিস অনাচারের অভিযোগে সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা। কেনিয়া মীমাংসার প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ৪৪ জন সদস্যের তীব্র মন্তব্য প্রকাশ। আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে হুগলী জেলে সতীন্দ্রনাথের প্রায়োপবেশন ভঙ্গ। কানপুরে গবর্ণর-গমনে হরতাল। বোম্বায়ে বিশাপুর জেলে কয়েদীদের প্রতি অনাচারে জেলার ও জেল ডাক্তার বিভাগীয় দণ্ডে দণ্ডিত। কলিকাতায় শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের পরাজয়, ক্যালকাটার জয়। মৌলমীনে ঘূর্ণী বায়ুতে অনেকে হতাহত, ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট।

১৩ই শ্রাবণ —

রায়পুর জেলে নাগপুরের স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত মাকুর শা আবারী খদ্দর পোষাক না পাইয়া প্রায়োপবেশন করিতেছেন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় উল্টা রথে পুলিসের লাঠী চলার সংবাদ, জনতা রথ টানিতে অসম্মত হয়, শেষে পুলিস ক্ষমাপ্রার্থনা করে। চট্টগ্রামে চক্রশালা গ্রামে হিন্দু-বিগ্রহভঙ্গে কতিপয় মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। লালবাজারের মোড়ে পকেট কাটিয়া ১৪।০ হাজার টাকা চুরী।

১৪ই শ্রাবণ —

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের সংবর্দ্ধনায় ময়মনসিং মিউনিসিপালিটীতে মতভেদ। কাণপুর মিউনিসিপালিটী তিলক মহারাজের মৃত্যু সাম্বৎসরিক দিবসে—১লা আগষ্ট ছুটী দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। উত্তর কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে শ্রীযুত কোঠারীজীর উৎসাহে নাগপুর সত্যাগ্রহের নূতন আয়োজন। ডাঃ ঘিয়াসের নেতৃত্বাধীন একদল গুজরাটী স্বেচ্ছাসেবক নাগপুরের পথে রেল-ষ্টেশনে গ্রেপ্তার। শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হুগলী হইতে বৰ্দ্ধমানে স্থানান্তরিত। ২৪ পরগণা জেলাবোর্ডের অধিবেশনে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সমিতি গঠন। রাঁচির গুর্খা সামরিক পুলিসের অস্ত্রাগার হইতে ইন্সপেক্টার-জেনারেলের পিস্তল অপহৃত। চট্টগ্রামে জাতীয় মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা। বেলারি জেল হইতে মোট ১৯২৬ জন মোপলার মুক্তি। পাণিপথে হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামায় ৯ জন আহত। লাট গমনে কুমিল্লায় হরতাল।

১৫ই শ্রাবণ—

কলিকাতায় শ্রীযুত মণিলাল কোঠারীজীর মুখে কংগ্রেসকার্য্যে শ্রীযুত বাজাজের ২।০ লক্ষ টাকা দানের সংবাদ। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য বিহারের শ্রীযুত দেবকীপ্রসাদ সিংহ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী-সংক্রান্ত স্থানীয় কমিটীর সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। নাভায় কেশরী ও আকালী-তে-পরদেশী পত্রের প্রবেশে বাধা। নাগপুরে শ্রীযুত জৈনেন্দ্রকুমার (প্রচার বিভাগের কর্ত্তা) প্রভৃতি নেতাদের কারাদণ্ড; সত্যাগ্রহের অন্যতম নেতা শ্রীযুত দেশমুখের জরিমানা আদায়ে তাঁহার বাটীতে টাকার বাক্স প্রভৃতি ক্রোক। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সমস্যায় বৃটিশ মন্ত্রি-সভায় ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উত্তর, ফ্রান্সের পূর্ব্ব জেদ বজায়। সাম্রাজ্য বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিসংখ্যা (৩ জন) স্থির

১৬ই শ্রাবণ—

গত জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে গুজরাট খাদীমণ্ডল তিন লাখ টাকার খাদী বিক্রয় করিয়াছেন। শ্রীযুত বাজাজের কারাদণ্ডে ওয়ার্দ্ধার ব্যবসায়ীদের বিলাতী বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত। তিলক সাম্বৎসরিক উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ ও সকল মিউনিসিপ্যালিটির ছুটী। নাগপুরে রেল-ষ্টেশনে বাঙ্গালার ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। ভাগলপুরে গবর্ণর গমন উপলক্ষে হরতালের ব্যবস্থায় ৮ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ধৃত। অমৃতসরের কৃপাণ বাহাদুর পত্র রাজদ্রোহে অভিযুক্ত। শ্রীযুত শেঠ যমুনালালের মোটর নীলামের চেষ্টা ব্যর্থ। তারণ-তারণে আকালী নামধারী হাঙ্গামায় অমৃতসর কংগ্রেসের তদন্ত কমিটী গঠন। কলিকাতা সেণ্ট পল্‌স্ কলেজ হইতে এক অন্ধ যুবকের সসম্মানে বি, এ পাশ। কলিকাতা কর্পোরেশন এতীমখানার বিপদে এককালীন ১০ হাজার টাকা দান করিবেন। বোম্বায়ের ভারতীয় সওদাগর সভার সভাপতি সার ফজল, ভাই করিম ভাই কেনিয়ার অপমানে বড়লাটের নিকট সভার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

১৭ই শ্রাবণ—

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় মৌলানা সৌকৎ আলির কথা, তিনি জেলে কাষ করিতে অসম্মত হওয়ায় পত্র লিখিবার অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। হুগলীতে রাজনীতিক কয়েদীদের সহিত আপোষে হুগলী ও বহরমপুর জেলে প্রায়োপবেশনের অবসান। নাভার মহারাজের পদত্যাগ স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, সে সম্বন্ধে শিরোমণি কমিটীর বড়লাটের নিকট স্পষ্ট কথা। ব্রহ্মে বেবো ষড়যন্ত্র মামলায় ৷ জনের কারাদণ্ড। ঝালকাঠী থানায় পুলিসের সহিত ডাকাত দলের লড়াই, ডাকাত সর্দ্দার আলি হোসেন নিহত। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব কয়লা-নিয়ামক মিঃ চার্চ্চ ঘুস লওয়ার অভিযোগে বিলাত হইতে কলিকাতায় আনীত।

১৮ই শ্রাবণ—

নাগপুরে ডাঃ খিয়াস ও তাঁহার অধীন ৪৮ জন গুজরাটী স্বেচ্ছাসেবকের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড। কেনিয়ার অপমানে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির হরতাল করিবার ব্যবস্থা। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় বেত্রদণ্ড তুলিয়া দিবার প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য। ভিজিগাপত্তনে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন। মালাবারের দুর্দ্দশা মোচনে নিজামের ৫০ হাজার টাকা দান। শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায় ডাকাতের গুলীতে নিহত, বরেন্দ্র ঘোষ নামে এক যুবক ধৃত, সহর-মফঃস্বলে চারিদিকে খানাতল্লাসের ধুম ও দলে দলে গ্রেপ্তার আরম্ভ। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে প্রেসিডেণ্ট মিঃ হার্ডিংয়ের লোকান্তর; নূতন প্রেসিডেণ্ট মিঃ কলভিন কুলিজের শপথ গ্রহণ।

১৯শে শ্রাবণ—

নাগপুরে সাদা কাগজে নাম সহি করাইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ক্ষমাপ্রার্থনার নামে মুক্তি প্রদানের সংবাদ। ডাঃ বরদারাজলু নাইডু ১৪৪ ধারা অমান্য করায় ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ভাগলপুরের ধৃত কংগ্রেসকর্ম্মীদের মুক্তি। নাগপুরের সত্যাগ্রহে শ্রীযুক্ত কস্তুরীবাঈ গন্ধীর মহিলাদল সহ যোগদানের সঙ্কল্প। হুগলী জেলে শ্রীযুত রামসুন্দর সিংহের প্রায়োপবেশন ভাঙ্গিতে সম্মতি। ঢাকা উকীল সভায় স্বরাজ পাতাকা উত্তোলনে আপত্তি। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় অস্পৃশ্যদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা। আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশে কালা আদমীদের সহিত বিবিদের আমোদ-প্রমোদে অন্যান্য দেশের কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করায় ফ্রান্সের ধমক।

২০শে শ্রাবণ—

নাগপুরে রেল-ষ্টেশনে বাঙ্গালার ১৪জন গ্রেপ্তার। বিহার-লাট গমনে পূর্ণিয়ায় হরতাল। যুক্তপ্রদেশ বড়বাঁকী জেলায় ডাকাতিতে দোকান লুট, পুলিসের উপর গুলী, ডাকাত সর্দ্দার অশ্বপৃষ্ঠে। বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক আবার ২০০ বাঙ্গালী সৈন্য (টেরিটোরিয়াল) গ্রহণের ব্যবস্থা। মুলতানের একটি ১৪ বৎসরের বালক একটি বালিকাকে জলে ডুবাইয়া মারায় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। নাভার রাজভক্ত সরকারী কর্মচারীদের পদচ্যুতির সংবাদ। শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসের প্যাকার হরিপ্রসাদ উড়িয়া এক জন ডাকাত ধরিবার পক্ষে সাহায্য করায়, টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ৩০০ টাকা পুরস্কার প্রদান। ডুসেলডর্ফে জার্ম্মাণ পুলিসের কর্ত্তা গ্রেপ্তার, এসেনে কয়লার খনি দখল। ইংলিশ চ্যানেলে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় হেনরি সালিভান (মার্কিণ) প্রথম হইয়াছেন।

২১শে শ্রাবণ—

মুঙ্গেরীতে পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর লোকান্তর। দিল্লীতে বিশেষ কংগ্রেস বসাইবার কথা স্থির। ব্রহ্মে বহু 'গুপ্ত' সমিতি বে-আইনী সাব্যস্ত। কুমাপুর জেল হইতে জনাব ইয়াকুব হাসানের মুক্তি। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় লাটের মুখে অসহযোগের নিন্দা। বোম্বায়ে ১ জন ভূ-পর্য্যটক, ২ জন প্রাগ্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তৃতীয়টি মার্কিণ। আলিগড় হাঙ্গামায় আপোষ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পুলিসের প্রতি নানা সর্ত্ত। মধ্যপ্রদেশে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ। টাটা ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সভায় দেয় টাকা পরিশোধের জন্য লোক নিয়োগ। লণ্ডন ও প্যারিসের জন্য মিশরের মন্ত্রী নিয়োগ।

২২শে শ্রাবণ -

শাঁখারীটোলার খুনের সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ১১০ জায়গায় খানাতল্লাস ও ৫০ জন গ্রেপ্তার। আমেদাবাদ হইতে পদব্রজে নাগপুর-যাত্রী সত্যাগ্রহী দলের সুরাটে উপস্থিতি। অমৃতসরের আকালী পরদেশী পত্রের সম্পাদক রাজদ্রোহে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ফৈজাবাদে চলন্ত ট্রেণে য়ুরোপীয় মহিলা হত্যাকারীর ২০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। শ্রীযুত শিবপ্রসাদ বড়ুয়ার জোড়হাটে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বিষ্ণুরামের একটি ওয়ার্ড নির্ম্মাণে ১৯ হাজার প্রদানের সংবাদ। খুলনার জেলাবোর্ড কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য আইন জারী করিয়াছেন। হুসেনী নামে লক্ষ্ণৌয়ের এক প্রসিদ্ধ জুয়াড়ী গ্রেপ্তার।

২৩শে শ্রাবণ—

নাগপুরের সত্যাগ্রহী নেতা মহাত্মা ভগবানদীন দুই দিন প্রায়োপবেশন করায় জেলে খদ্দরের কাপড় পরিবার অনুমতি পাইলেন। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় ১৪৪ ধারার প্রত্যাহারের প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটের জোরে গৃহীত। নাভার আকালী হাঙ্গামায় এ পর্য্যন্ত ৯১ জন গ্রেপ্তার, তন্মধ্যে আট জন রাজার সাক্ষী হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের সাতটি জেলায় প্রবল বন্যার সংবাদ। আমীর তাঁহার হিন্দু প্রজার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য গো-কোর্ব্বাণী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

২৪শে শ্রাবণ—

রেঙ্গুন করপোরেশনের প্রায় সকল ব্রহ্ম সদস্যই বড়লাটের অভ্যর্থনা কমিটিতে যোগদানে অসম্মতি জানাইয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বরেন্দ্র ঘোষের বিচার আরম্ভ। মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সত্যাগ্রহ মামলাগুলির প্রত্যাহার ও সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি-প্রস্তাব ভোটের জোরে গৃহীত। সার মাইকেল ওডোয়ারের মামলা

সম্পর্কে সার শঙ্করণ নায়ারের ভারতে আগমন। মার্কিণে ভারতবাসীর নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ভারত-প্রবাসী মার্কিণ পাদরীদের প্রতিবাদ। লণ্ডন হইতে কেনিয়ায় (ভারতীয়) ও ভারতের প্রতিনিধিদের স্বদেশ-যাত্রা। শাংহাই বন্দরে জাপানী সংবাদপত্রে মহাত্মার উপদেশাবলীর আলোচনা।

২৫শে শ্রাবণ—

নাগপুর সত্যাগ্রহে আপোষ চেষ্টা। সার সি পি রামস্বামী আয়ারের?

নাগপুর সত্যাগ্রহে আপোষ চেষ্টা। সার সি রাজাগোপালাচারী বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসের কাযে যোগদানে সম্মত। কেনিয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সার সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ভারত-সভাগৃহে জনসভা। শাঁখারীটোলার নিহত পোষ্টমাষ্টারের স্মৃতি-রক্ষার আয়োজন, ষ্টেটস্‌ম্যান চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। বিলাতে শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর প্রতি আর্ল উইণ্টারটনের ঔদ্ধত্য প্রকাশে ভাইকাউণ্ট পীলের ত্রুটি-স্বীকার। জার্ম্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট ভাব প্রবেশে হামবার্গের জাহাজ-কারখানায় ১২ হাজার শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত।

২৬শে শ্রাবণ—

নাগপুরের পথে ইতওয়ারী ষ্টেশনে বাঙ্গালার ১৯ জন গ্রেপ্তার। ডাঃ কিচলুর কারামুক্তি। শাঁখারীটোলা মামলায় বরেন্দ্র ঘোষ হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ। কুন্দাপুর জেলে অসুস্থ পণ্ডিত বাজপেয়ীর সহিত চিকিৎসকের সাক্ষাতেও আপত্তি। অমৃতবাজার পত্রের সম্পাদকের ক্ষমাপ্রার্থনায় রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি। নাগপুর সত্যাগ্রহে ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারের পরামর্শের আশ্বাস। কলিকাতায় সিংহ-সরকার কোম্পানীর বিপণ সিংহ জার্ম্মাণ ছোরা আমদানী ও বিক্রয় করিতে থাকায় অস্ত্র আইন অনুসারে ৯০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। সিন্ধুর হিন্দুপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাঃ চৈৎরামের কারামুক্তি। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সমস্যায় ফরাসী ও বেলজিয়ম সরকারের পত্রে বৃটিশের উত্তর। মার্কের মূল্য-হ্রাসে জার্ম্মাণীতে নূতন করের আইন। পারস্যের শাহের পল্লীপ্রাসাদে বোমা বাহির।

২৭শে শ্রাবণ—

কলিকাতা হইতে আরও ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাগপুর যাত্রা। য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে নির্ব্বাচন সভায় শ্রীযুত এস আর দাশের বক্তৃতায় শ্রোতাদের আপত্তি। জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে গবর্মেণ্টের প্রতি সোস্যালিষ্টদের অবিশ্বাস প্রকাশ।

২৮শে শ্রাবণ—

নাভায় চিঠিপত্রে সেন্সারী কড়াকড়ি ও আকালী দলের অভিযোগ। নাগপুরে সত্যাগ্রহ প্রচার বিভাগের কর্ত্তা শ্রীযুত খাণ্ডেকর (সাগরের উকীল) ও সাগরের আর ২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী (১ জন মিউনিসিপ্যালিটীর প্রেসিডেণ্ট) এই ৩ জন সাগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে অভিযুক্ত। নরসিংপুরে শ্রীযুত শঙ্করলালজী প্রমুখ ৪ জন নেতার সশ্রম কারাদণ্ড। বাঙ্গালোরের বন্যায় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি, বেসিনে ১১ হাজার লোক নিরাশ্রয়। বরিশাল জেলের ২ জন ওয়ার্ডার ঘুষ লওয়ায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পাণিপথে ৬টি মসজিদ ও ৪টি মন্দিরে পুলিসের আদেশে নমাজ ও পূজা বন্ধ। ভারতীয় কলগুলির ৫০ কোটি টাকার কাপড় অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকার সংবাদ। আফগানিস্থানে স্বদেশি-প্রচারে আমীরের ঘোষণা। মক্কা শেরিফ কর্ত্তৃক হজ-যাত্রীদের নিকট নূতন নূতন ট্যাক্স লওয়ার ও দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদ।

২৯শে শ্রাবণ—

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রেঙ্গুন মেলের সম্পাদক পদগ্রহণে কংগ্রেসের কার্য্য ত্যাগ। নাগপুরে ৫ জন আকালী স্বেচ্ছাসেবকের গমন; রেল-ষ্টেশনে বাঙ্গালার ২৩ জন গ্রেপ্তার; স্থানীয় লাটের সহিত শ্রীযুত ভিঠলভাই প্যাটেলের পরামর্শ। সাগরের শ্রীযুত খাণ্ডেকর প্রভৃতি সকলের মুক্তি। নাগপুর বন্দীদের জন্ম ব্যবস্থাপক সভায় লক্ষ টাকা বরাদ্দ। দিল্লীর তেজ পত্র অভিযুক্ত। শাঁখারীটোলার ব্যাপারে করোনারের তদন্ত শেষ, মৃত্যু কাহার গুলীতে, তাহা নির্ণীত হয় নাই; বরেন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা স্থগিত। বহরমপুর, শান্তিপুরে হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামায় আপোষ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা গঠন, শ্রীযুত পীযুষকান্তি ঘোষ ও শ্রীরাম শর্ম্মা সম্পাদক মনোনীত। কুমারী সুধাংশুবালা হাজরা পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। কাবুলে কয়লার খনি বাহির হওয়ার সংবাদ। মিশরের জাতীয় দলের সংবাদপত্র আললেওয়ায় মহাত্মার গুণ-কীর্ত্তন। জার্ম্মাণীতে নূতন মন্ত্রিসভা। মুস্তাফা কামাল এঙ্গোরার জাতীয় পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য নূতন সদস্যগণ নির্ব্বাচিত।

৩০শে শ্রাবণ—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভায় নূতন স্বরাজ্যদল ও পুরাতনদলে বিরোধ। সরকারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাণপুর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক পণ্ডিত নেহেরুর অভিনন্দনের ব্যবস্থা। লালা লাজপৎ রায়ের কারামুক্তি। সার্জেণ্ট মানহানি মামলায় সরকারের ১৩ হাজার টাকা খরচ হইবার হিসাব প্রকাশ। গত জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪ মাসে বাঙ্গালায় ডাকাতিতে ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা লুণ্ঠনের (সরকারী) হিসাব। ক্লেয়ার জেলায় এনিস নগরে প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা করিবার সময় সরকারী সৈন্যের হস্তে ডি ভ্যালেরা গ্রেপ্তার।

৩১শে শ্রাবণ—

নাগপুরে ১৪৪ ধারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুলিস আইন জারী। নাগপুরের তার পাইয়া কলিকাতা হইতে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ স্থগিত। নাভার রাজার রাজ্যত্যাগের সময় বড় মহারাণীর অন্দর মহলে পলিটিক্যাল এজেণ্টের খানাতল্লাস ও পুলিস প্রহরী মোতায়েনের অভিযোগ। মাদুরা জেলে ডাঃ নাইডুর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদ। হাইকোর্টে বরেন্দ্রের মামলা আরম্ভ। দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান বিবাদে সরকারী ও বে-সরকারী লোকজনের কমিটীতে আপোষের চেষ্টা। অনুন্নতদের শিক্ষার জন্য সরকারের ২০ হাজার টাকা দানের কথা।

৩২শে শ্রাবণ—

বোম্বাই, মালিগাঁওয়ের পিউনিটিভ ট্যাক্সের বিরোধীরা মামলায় পরাজিত। হাইকোর্টে মিঃ পেজের বিচারে বরেন্দ্র ঘোষের ফাঁসীর হুকুম। নাগপুর জেলে জৈনেন্দ্রকুমারের সহিত সাক্ষাতে আপত্তি। আবার ডাঃ নাইডুর প্রায়োপবেশন। শ্রীযুত যুগলকিশোর বিরলা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে ১ শত ছাত্রবৃত্তি দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীতে কম বয়সের গাভী ও বলদ হত্যা বন্ধ। হিন্দু মহাসভার প্রতি মহাত্মা-পত্নীর সহানুভূতি প্রদর্শন। বারাণসীতে সনাতন ধর্ম্ম-সভা। চীন দস্যুদল কর্ত্তৃক সাও-সি নগর আক্রমণ, গীর্জ্জা ও মিশন হাঁসপাতালে অগ্নি-প্রদান। আয়র্ল্যাণ্ডের গৃহ-যুদ্ধে নষ্ট বৃটিশ সম্পত্তির জন্য আর ক্ষতিপূরণ লওয়া হইবে না।

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন-যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী প্রেস।

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

গণেশ-জননী
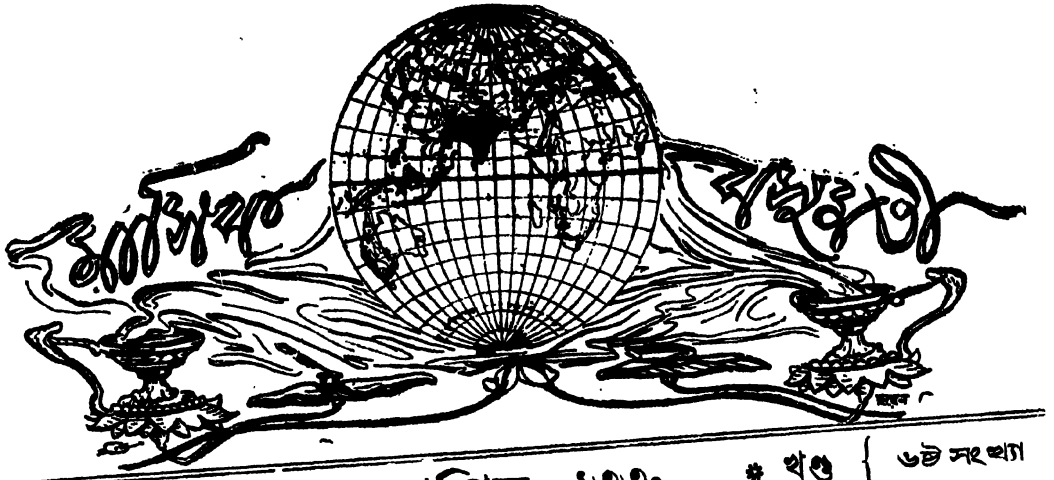
২য় বর্ষ } ১ম * খণ্ড { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৩০

শরৎ

এস জলদ-মলিন গগন ভরিয়া
রবির কনক-কিরণে ;
এস বর্ষণ-লঘু ধবল অভ্রে
রঞ্জিত করি' বরণে।
এস শেফালীর মূল ভরি' ঝরা ফুলে,
মুকুতা ছড়ায়ে শিশিরে ;
এস চারু ছায়াপথ সীঁথিটি রচিয়া
সাজায়ে স্নিগ্ধ নিশিরে।
এস কূলে কূলে ভরা তটিনীর জল
কম্পিত করি' সমীরে ;
এস মধু জ্যোছনার আঁচল লুটায়ে
আলোকিত করি' তিমিরে।
এস সরসী-সলিল খচিত করিয়া
বিকচ কুমুদ কমলে ;
এস পাদপলতায় হরিৎ মিশায়ে
কাশের অমল ধবলে।
এস মাঠে মাঠে ধানে হরিতের শির
সাজায়ে সতনে হিরণে ;
এস শালি-সৌরভে আমোদিত করি'—
স্নিগ্ধ-পরশ পবনে।

এস স্থল-কমলের বিকসিত ফুলে
পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে ;
এস নিঃশেষ-বারি মেঘ গুরু-গুরু
আরতি-শঙ্খ বাজায়ে।
এস রক্ত জবায় যাবকের রেখা
আঁকিয়া মাতার চরণে ;
এস স্ফটিক ধারায় ঝর্ঝর বারি
অনিবার ঢালি' ঝরণে।
এস বেণুবন-মাঝে জোনাকী ছড়ায়ে
তারকা ছড়ায়ে গগনে ;
এস আলোতে হাসিতে জাগায়ে তুলিয়া
গভীর নিদ্রামগনে।
এস শূন্য যা' ছিল পূর্ণ করিয়া
অভাবের ছায়া ঘুচায়ে ;
এস কিরণের তুলি বুলায়ে তোমার
বিষাদ-গ্লানিমা মুছায়ে।
এস চিরমধুময় অগাধ তৃপ্তি
শক্তি আন এ ভবনে ;
এস ভক্তি-সরস স্নিগ্ধ করিয়া
বঙ্গ গগন পবনে।

———

প্রাণদণ্ড

১

কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা এজলাসে লোক আর ধরে না ; ব্যারিষ্টার, উকীল ও তাঁহাদের মুহুরীরাই ঘরের অর্দ্ধাংশের অধিক ভরিয়া উপস্থিত—তাহার পর বাহিরের লোক। ঘর ভরিয়া সম্মুখের বারান্দাও ভরিয়া গিয়াছে। সার্জ্জেণ্টরা কেবলই গোল থামাইবার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু যে স্থলে বহু লোক-সমাগমে "ফিস ফিস" জমিয়া "গম গম" হয়, সে স্থলে গোল থামান কত দুষ্কর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

হিরণকুমারী ওরফে "সাহেব হিরণের" মামলা। যে প্রসিদ্ধ গায়িকার অম্লানোজ্জ্বল রূপের অনলশিখায় গত বিশ বৎসর বহু বিলাসী ধনীর বিপুল সম্পদ ভস্ম হইয়া গিয়াছে, পাপপঙ্কিল চঞ্চল জীবনও যাহার রূপের বহ্নি নিস্তেজ করিতে পারে নাই, সে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। নিহত যুবক কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত পরিবারের একমাত্র সন্তান—যেন মোহমুগ্ধ হইয়া হিরণের চরণে চরিত্র হইতে অর্থ পর্য্যন্ত সবই ঢালিয়া দিয়াছিল—শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে। এই রূপসীকে লইয়া বিলাসিসমাজে গত বিশ বৎসর কত কলহ, কত হিংসাদ্বেষ, কত পাপ হইয়া গিয়াছে। আর সে সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে কেবল আদর ও অর্থ লাভ করিয়াছে—আগুনের মধ্যে থাকিলেও তাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই! সে যেন বিলাসসম্ভোগের জন্যই রূপরাশি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে যেন বিদ্যুৎ—আপনি দগ্ধ হয় না, কিন্তু যে তাহাকে স্পর্শ করে, সে-ই দগ্ধ হয়। গ্রীক পুরাণের হেলেন যেন বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছিল।

তাহার অতীত ইতিহাস সে কখন প্রকাশ করে নাই—কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। তাহার কথার "টানে" কেহ অনুমান করিত, সে নদীয়া জিলার লোক—কেহ বলিত, চব্বিশ পরগণার—ইত্যাদি। কিন্তু সে সবই অনুমান। কোথা হইতে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, সে কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, সে জোয়ারের জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার রূপমুগ্ধ কোন যুবক এক দিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল, "রূপের জোয়ারে?" সে মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিয়াছিল, "না ; মানুষের পাপপ্রবৃত্তির—পশুবৃত্তির জোয়ার আমাকে ভাসিয়ে এনে এই কলকাতায় দিয়ে গিয়েছে—এই কলির সহরই সব আবর্জ্জনা জমবার উপযুক্ত যায়গা, এ-ই পাপের, লালসার, বিলাসের নরককুণ্ড। তাই ত এখানে যে স্ত্রীলোকের দেহে রূপযৌবন বা কণ্ঠে সুর আছে, তা'রই চারিদিকে নরকের কীট কিল-বিল করে।"

এমন উত্তর সে যখন তখন যাহাকে তাহাকে দিত। তাহার দৃষ্টিতে যেমন হীরকের দীপ্তি ছিল, কথায় তেমনই "হীরার ধার" ছিল।

তাহার এইরূপ কথায় তাহার "হিতাকাঙ্ক্ষিণী" পরিচারিকা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে সে বলিত, "ভয় কি, রঙ্গণ? জান না—'কমলে থাকলে মধু আসবে কত ভোমরা-বঁধু।' তা'র পর যা' সবারই হয়, তাই হ'বে—পাপের পরিণাম নরকভোগ—এ জন্মেও বটে, পরজন্মেও বটে। এ সব তুলা থাকবে। ফাঁকি দেবার উপায় নেই, রঙ্গণ, উপায় নেই।"

রঙ্গণ এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "এত যদি ধর্ম্ম জ্ঞান, তবে এ পথে পা দিয়েছিলে কেন?"

হিরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, "ইচ্ছে ক'রে পা দিই নি—আমায় জোর ক'রে ঠেলে দিয়েছিল ; তা'র পর এ পথে এলে যে আর ফিরবার কোন উপায় সমাজ রাখে নি ; এরা যে সমাজের কাছে শেয়াল-কুকুরেরও অধম—সাপের চেয়েও ভয়ানক। রাগ না ক'রে, নিজের কথাটাই ভাল ক'রে ভেবে দেখ না কেন? যত দিন রঙ্গণের রং ছিল, তত দিন কত আদর ছিল ; আর আজ তুমি আমার পায় রং দিয়ে রেখা টেনে দিচ্ছ, রেখা একটু বাঁকা হ'লে বকুনী খাচ্ছ—কেবল পোড়া পেটের জন্য। পয়সা এক দিন তোমার হাতেও এসেছিল, রাখতে পার নি ; কেন না, সে পাপের পয়সা।"

"পাপ কি কেবল আমরাই করি?"

"না। পুরুষের কথা বলছ? তা'দের সকলের এমন দুর্দ্দশা দেখতে পাই নে বলেই ত' পরকালে বিশ্বাসটা আঁকড়ে ধরতে হয়। নইলে—যা'দের ইহকালও নেই, পরকালও নেই, তা'দের আবার পরকালে বিশ্বাস!"

আজ এই হিরণকুমারীর মামলা। অভিযোগ—সে তাহার রূপমুগ্ধ এক যুবককে বাড়ীর ছাত হইতে ফেলিয়া মারিয়াছে। যুবকের মোটর তাহার গৃহদ্বারে ছিল; চালক সাক্ষ্য দিয়াছে, সে দেখিয়াছে, হিরণ তাহার মনিবকে ছাত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। একটা বড়ঘরের কুৎসা; চাপা দিবার উপায় থাকিলে আত্মীয়-স্বজনরা চাপা দিতেন; কেন না, এমনও শুনা গিয়াছে, কোন বড়ঘরের ছেলে বারাঙ্গনালয়ে মরিলে শব গোপনে বাড়ীতে আনিয়া—শয্যায় তুলিয়া তবে কান্নার রোল তুলা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার উপায় ছিল না। কারণ, মোটর-চালকের ডাকাডাকিতে লোক জড় হইয়াছিল—পুলিস আসিয়া পড়িয়াছিল এবং লাশ লইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে গিয়াছিল।

জজ এজলাসে আসিবার কয় মিনিট পূর্ব্বে আসামীর কাঠগড়ার মেঝের তক্তা সরান হইল; সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসামী কাঠগড়ায় প্রবেশ করিল। সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। লোক মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল—রূপ বটে! বুঝি এমনই রূপ লইয়া ক্লিওপেট্রা সিজারদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল—বুঝি এমনই রূপ লইয়া শচী সকল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। আসামীর পরণে একখানা ফিরোজা রঙ্গের রেশমী শাড়ী—গায় একখানা সেই রঙ্গের পাড়দার কাশ্মীরী শাল। কাঠগড়ায় প্রবেশ করিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

এই সময় জজ এজলাসে প্রবেশ করিলেন। হাইকোর্টে দায়রায় এখনও একটু সেকালের জাঁক-জমক আছে। জজের সঙ্গে আসাসোটা লইয়া চোপদার চলে—নকীব ফুকরায়—সেরিফ তাঁহার দণ্ড লইয়া আইসেন—জজের গাউন লাল কাপড়ের। জজ এজলাসে প্রবেশ করিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। আসন গ্রহণ করিয়া জজ আসামীর দিকে চাহিলেন। জজ বাঙ্গালী—কাযেই আসামীর "খ্যাতি" তাঁহার অবিদিত থাকিবার কথা নহে। ইহার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এমন অনেক ধনীর সম্পত্তিঘটিত মামলায় তিনি ব্যারিষ্টার অবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন—"ঘরপোড়ার বাঁশ" হিসাবে কাহারও কিছু রক্ষা করিতে পারিয়াছেন; কাহারও বা শেষ সম্বল তাঁহার ফী যোগাইতেই শেষ হইয়াছে। মামলামোকর্দ্দমার কাগজপত্রে যাহার নাম এত দিন তাঁহার শ্রুতিগোচরমাত্র ছিল, আজ সে তাঁহার সম্মুখে। তাই আসামীর দিকে চাহিবার সময় তাঁহার দৃষ্টিতেও কৌতূহল আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারিল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইল না।

জুরী বাছাই হইতে লাগিল।

এ দিকে উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টাররা মোকর্দ্দমার নথী ও নজীরের পুস্তক নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। যে ব্যারিষ্টারের যশ ও পশার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই হিরণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে হিরণ অপরাধ অস্বীকার করিয়াছিল। প্রমাণ যত প্রবলই হউক না কেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন—আসামীকে খালাস করিতে পারিবেন। প্রকৃত সাক্ষী কেবল মোটর-চালক। সে ছাড়া আর কেহ মৃত যুবককে হিরণের গৃহে প্রবেশ করিতে দেখে নাই—সে ছাড়া আর কেহ সাক্ষ্য দিতে পারে নাই—হিরণই তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল; ছাতের আলিসার খানিকটা যে মেরামতের জন্য সে দিন ভাঙ্গা ছিল, তাহাতে হিরণের এই অপরাধ প্রতিপন্ন হয় না; চালক যদি মোটরে বসিয়া ছিল, তবে সে কেমন করিয়া সঠিক সব দেখিতে পারে?—তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার "বাঘা" জেরায় সে দুই চারিটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিবেই; আর তাহা হইলেই তিনি আসামীকে খালাস করিয়া আনিবেন। এমন কায তিনি অনেকবারই করিয়াছেন।

দ্বিভাষী উঠিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে অপরাধী কি না?

হিরণ স্পষ্ট করিয়া বলিল, "না"।

দ্বিভাষী লোকটি অসাধারণ ও অকারণ গম্ভীর। তিনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক—সংসারে তাঁহার কেহ নাই। তাঁহার বয়স ঠিক করা দুষ্কর; কিন্তু কেশ ও শ্মশ্রু অধিকাংশই শ্বেত হইয়াছে; তাই তাঁহাকে হয় ত বয়স অপেক্ষা বড় দেখায়। তিনি কাহারও সঙ্গে বড় মিশেন না—আপনার কাযের জন্য যাহার সঙ্গে যেটুকু কথা না বলিলে নহে, কেবল সেইটুকু বলেন।

২

আসামী অপরাধ অস্বীকার করার পর সাক্ষী তলব হইল। প্রথমে পুলিসের ডাক্তার সাক্ষ্য দিলেন—পতনে মাথার খুলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে যুবকের মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বিতীয় সাক্ষী মোটর-চালক।

ব্যারিষ্টার তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দ্বিভাষী ব্যারিষ্টারের ইংরাজী প্রশ্ন বাঙ্গালায় সাক্ষীকে ও সাক্ষীর বাঙ্গালা উত্তর ইংরাজীতে জজকে বলিতে লাগিলেন।

হিরণ যেন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। কিন্তু সে ব্যারিষ্টারের প্রশ্ন বা সাক্ষীর উত্তর শুনিতেছিল না। সে শুনিতেছিল—বিশ বৎসরেরও অধিক কাল অশান্ত-বিস্মৃতির রুদ্ধদার ভাঙ্গিয়া আজ এ কি—? সে তাহার বুকের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন অনুভব করিতেছিল, পুলিসের হাতে গেপ্তার হইয়া—নরহত্যার জন্য আসামী হইয়া সে ত তেমন তুমুল আন্দোলন অনুভব করে নাই! সে অনেককে বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু নিজে কখন বিচলিত হয় নাই, সে যেন আজ নিজেকে আর স্থির ও সংযত রাখিতে পারিতেছিল না। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল; তাহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইতেছিল। তাহার শ্বাস যেন ঘন ঘন বহিতেছিল। তাহার অনঙ্গযৌবন-পুলকিত দেহ কম্পিত হইতেছিল।

হিরণের মনে হইতেছিল—এই যে দীর্ঘ বিশ বৎসরের কলুষিত জীবন, এ দুঃস্বপ্নমাত্র; এই আদালত, এই বিচার—এ সব মায়া—এ সব মিথ্যা। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উপকথার রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িলে যেমন রাজপুত্রের সোনার কাঠীর স্পর্শ ব্যতীত আর কিছুই তাহাকে জাগাইতে পারে নাই, তেমনই বিশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে যে স্বর সে কর্ণ ভরিয়া পান করিয়াছিল, সেই স্বর এত দিন পরে তাহাকে তাহার নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছে—আজ তাহার দুঃস্বপ্নঘোর দূর হইয়া গিয়াছে। ভোগে, বিলাসে, পাপে তাহার নারীহৃদয়ের যে তৃষ্ণার শান্তি হয় নাই; পরন্তু যাহা দিন দিন বাড়িয়াছে—আজ সেই তৃষ্ণা যেন তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। সে আজ জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল; যাহা সত্য, তাহাই যেন স্বপ্ন।

সে বার বার আপনাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য কেবলই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এই ভাবে—বাহ্যজ্ঞানহত অবস্থায় কাঠগড়ার রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে জানে না। তাহাকে সেইরূপে চিত্রার্পিতার মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে মুগ্ধ হইতেছিল, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

সহসা দ্বিভাষীর একটি কথায় সে যেন চমকিয়া উঠিল। তখন সরকারী ব্যারিষ্টার মোটর-চালককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শেষ করিয়াছেন। তাহার পক্ষের ব্যারিষ্টার জেরা করিতে উঠিয়া প্রথম প্রশ্ন করিয়াছেন, "তোমাকে কে এই সব মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়াছে?" দ্বিভাষী সেই প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইলেন।

শরতের আকাশে বিনামেঘেও কখন কখন যেমন গর্জ্জন শুনা যায়—সে গর্জ্জনে আকাশ যেমন কাঁপিয়া উঠে, তেমনই সহসা এজলাসের গাম্ভীর্য্য বিদীর্ণ করিয়া হিরণ বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়। সব সত্য।"

সকলের দৃষ্টি কাঠগড়ায় আসামীর মুখে পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু যেন জ্বলিতেছে; তাহার মুখমণ্ডল উত্তেজনায় রক্তাভা ধারণ করিয়াছে; সে কাঁপিতেছে। এজলাসে জনতার গুঞ্জন শ্রুত হইল।

বিচারক আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া সকলকে চুপ করিতে আদেশ করিলেন; তাহার পর আসন গ্রহণ করিয়া আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ, তাহা জান?"

উত্তেজিতভাবে হিরণ বলিল, "জানি; খুব জানি।"

"জান, তুমি অস্বীকার করিয়াছ যে, তুমি হত্যা করিয়াছ?"

"তা'ও জানি।"

"জান, স্বীকার করিলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে?"

"জানি।"

"জানিয়াও তুমি বলিতেছ, সাক্ষী যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে—সত্য? ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে উত্তর কর।"

মুহূর্ত্তমাত্র হিরণ চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর বিচারকের দিকে চাহিল। তখন তাহার মুখে আর সে উত্তেজনার রক্তাভা নাই—যেন দিনান্ততপনের রক্তরাগ মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে; তাহার চক্ষু আর জ্বলিতেছে না, তাহা আর্দ্র হইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, "আমি সব কথা বল্‌তে চাই। বিশ বৎসরের এই যে জীবন; মিথ্যায় এর আরম্ভ—মিথ্যায় এ পূর্ণ; মিথ্যায় এর শেষ কর্‌তে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আমি সত্য কথা বল্‌তে চাই।"

অপরাধ অস্বীকার করিবার পর আসামী কোনরূপ একরার করিতে পারে কি না, উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টারে তাহা লইয়া তর্ক আরম্ভ হইল। হিরণের পক্ষের ব্যারিষ্টার মোটরচালকের সাক্ষ্যের বর্ম্মে এত ছিদ্র পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল—সেই সব ছিদ্রপথে জেরার বাণ নিক্ষেপ করিলেই তিনি তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া আসামীকে খালাস করিতে পারিবেন। তিনি দ্বিভাষীকে বলিলেন, আসামীকে বুঝাইয়া বলা হউক, সে এখন কোন একরার করিলে তাহারই অনিষ্ট হইবে।

দ্বিভাষী তাহা বলিলে হিরণ বিচারককে বলিল, "হুজুর বিচারক। আমি আসামী, ফাঁসি যাই আমি যা'ব। পয়সা খরচ ক'রে উকীল-ব্যারিষ্টার দেওয়া কি এত বড় বিপদ যে, সত্য কথা বল্‌বার আর উপায় থাকে না—অনিচ্ছায় হ'লেও সত্যের মুখ চাপা দিয়ে তা'কে মেরে ফেল্‌তে হ'বে—ঠিক যেমন ক'রে আমরা ধর্ম্মজ্ঞান—বিবেক সব মেরে ফেলি?"

শুনিয়া জজ একটু হাসিলেন। তিনি বলিলেন, "এক হিসাবে তাহাই বটে। আমরা সমাজের শরীরে পরগাছা ভিন্ন আর কিছুই নহি।"

"সে যা'ই কেন হ'ক না, আজ আমার বুক ফেটে যে কথা বাইরে আস্‌তে চাইছে, আমার গলা টিপে আমাকে খুন না করলে আমি কিছুতেই তা কে চেপে রাখ্‌তে পারব না—পারব না।"

হিরণের মুখে ও চক্ষুতে যে উত্তেজনার ভাব আত্মবিকাশ করিল, তাহাতে তাহাকে যেন পাগলের মত দেখাইল।

ততক্ষণে হিরণের পক্ষের ব্যারিষ্টার একখানা পুস্তক হইতে একটা নজির হাজির করিয়াছেন। তিনি সেটা জজের গোচর করিলেন।

উচ্চকণ্ঠে হিরণ বলিল, "ও সব রেখে দিন, হুজুর; বিচারকের আসনে ব'সে আজ সত্যকেই তা'র উপযুক্ত আদর দেখান। বিশ বছরের এই পাপজীবনের আগে আপনাদেরই বাড়ীর মেয়েদের মত আমিও ঐ সত্যকে আদর করতে শিখেছিলাম। আজ মরবার আগে আবার তা'কেই আদর করতে চাই। আপনি তা'তে বাধা দেবেন না।"

দুই পক্ষের ব্যারিষ্টারে ও জজে এ বিষয়ের আলোচনা হইল। কাঠগড়ায় আসামী কেবলই অধীর ও অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার পর জজ বলিলেন, "আসামী কি বলিতে চাহে, শুনিতে দোষ কি?"

হিরণের ব্যারিষ্টার বলিলেন, "মানসিক কষ্টে, উদ্বেগে ও আশঙ্কায় উহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। ও এমন কথা বলিতে পারে, যাহাতে উহার নিজেরই অপকার হইবে।"

"সে কথা উহাকে একবার বলা হইয়াছে; না হয় আরও একবার বলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু আসামী কোন কথা বলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে।"

হিরণের ব্যারিষ্টার হতাশভাবে বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার আদেশ হয়, তাহাই হউক।" তিনি কাগজ পত্র গুছাইয়া লইতে লাগিলেন।—আর এজলাসে থাকিয়া ফল কি? আর এক এজলাসে-আইনেষ্ট ৫০০ টাকা।

জজ আবার হিরণকে সাবধান করিয়া দিলেন যে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার প্রাণদণ্ডও হইতে পারে।"

হিরণ বলিল, "তা' আমি জানি। আর জেনেই আজ সব কথা বলব।"

৩

হিরণ বলিতে লাগিল :—

"পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী ছিল—রেলের ষ্টেশন থেকে দু' ক্রোশ, আড়াই ক্রোশ তফাতে। আমার বয়স তের পার হয়ে গেলেও আমার বিয়ে হয়নি। তা'র দুই কারণ ছিল। প্রথম কারণ—বাড়ীতে বাবা, মা, আর আমি; মা চিররুগ্না; তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতেও আমার বাড়ী থাকা দরকার ছিল। দ্বিতীয় কারণ—আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক

হয়েই ছিল। আমাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়েই মা'র 'মকরের' বাড়ী। দু'জনে এক গাঁ'র মেয়ে—ছেলেবেলা 'মকর' পাতান। মকর-মা মা'কে সত্যবদ্ধ ক'রে নিয়েছিলেন, তাঁ'র একমাত্র ছেলের সঙ্গে—বিধবার সংসারে সম্বলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। আমি বড় হয়ে উঠলে মা যখন বল্‌তেন, 'মকর, আর দেরী ক'রে কাজ নেই; বিয়ে হয়ে যা'ক। নইলে আমি দেখে যেতে পারব না তুই হিরণকে নিয়ে গেলি।' —মকর-মা তখন উত্তর দিতেন, 'তুই কি পাগল হয়েছিস। ওকে আমি ত নিয়েইছি -কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলেই কি এখন নিয়ে যেতে পারব? তোকে দেখবে কে?' মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলতেন, 'কতদিন যে এমন হয়ে বেঁচে থাকব!'

"মা মরবার পরই মকর-মা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তা'র একটা কারণ, আমি তখন যত বড় হয়ে উঠেছিলাম, তত বড় আইবুড় মেয়ে সে গাঁয় আর ছিল না। আর একটা কারণ, তাঁ'র ছেলে পড়ায় যত অগ্রসর হচ্ছিলেন, সংসারে তত নির্লিপ্ত হচ্ছিলেন; তিনি গীতা পড়তেন, তেল মাখতেন না, মাছমাংস ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁ'র মা ব্যস্ত হয়েছিলেন; মনে করেছিলেন, রূপসী বৌ ঘরে এলেই সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য দূর হয়ে যা'বে।

"বাবার সে প্রস্তাবে কোন আপত্তি হ'ল না। আমার যে রূপ আমার কাল হয়েছে, তা'রই জন্য আরও অনেক সম্বন্ধ এসেছিল। কিন্তু মা'র কথাতেই বাবা সে সব ত্যাগ করেছিলেন। মা'র মরবার তিন মাস পরে তাঁ'র অরক্ষণীয়া কন্যা স্বামীর ঘর করতে গেল। যা'বার সময় মা'র জন্য কাঁদতে কাঁদতে গেলাম। মা যে আমার কি ছিলেন, তা যেন বাড়ী ছেড়ে যাবার দিনই ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি আমার মা ছিলেন; আবার আমিই তাঁ'র মা হয়ে ক' বছর তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

"দীর্ঘকাল মা'র চিকিৎসায় বাবার অর্থাভাব হয়েছিল। আমাকে পাত্রস্থা ক'রে তিনি চাকরীর চেষ্টায় বা'র হয়েছিলেন; কিন্তু বেশী দূর যেতে পারেন নি। নৌকাডুবীতে নদী তাঁ'কে দারিদ্র্য ও চাকরী দুই হ'তেই অব্যাহতি দিয়েছিল।

"শাশুড়ী বড় স্নেহে ও বড় আশায় আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে বড় হতাশ করলেন তিনি—যাঁ'র কাছে সব চেয়ে বড় আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। বিয়ের পর হ'তে স্বামীর কৃচ্ছ্রসাধন কেবলই বাড়তে লাগল। তিনি ভয় করলেন, পাছে আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'লে তাঁ'র সাধনার পথে বাধা পড়ে। তখনও তিনি কলেজে পড়েন। ছুটীতে তিনি বাড়ী আসবেন—আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকতাম; মনে কত আশা নিয়ে, বুকে কত তৃষ্ণা নিয়ে, রূপকে সাজসজ্জায় কত উজ্জ্বল ক'রে তাঁ'র কাছে যেতাম। তিনি যেন সাপ দেখে চমকে উঠতেন—আমি মায়াবিনী, তাঁ'র সাধনপথে কণ্টক! রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমি সারারাত শয্যায় প'ড়ে কাঁদতাম; তিনি প্রদীপের কাছে ব'সে একমনে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তেন।

"আমার কখন মনে হ'ত, বইগুলো পুড়িয়ে দেই; কখন মনে হ'ত, ছুটে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গনে বেঁধে তাঁ'র তপস্যা শেষ ক'রে দেই। কিন্তু কোনটাই আমি করতে পারতাম না, কেবল বুকের মধ্যে বিষম ব্যথায় আপনি ছটফট করতাম। ধর্ম্ম! কেন, স্ত্রীকে তা'র প্রাপ্য দেওয়া কি স্বামীর ধর্ম্ম নয়? স্বামীকে তাঁ'র প্রাপ্য দেওয়া কি স্ত্রীর ধর্ম্ম নয়? সংসার কি কেবল মায়া? ধর্ম্ম কি কেবল কঠোর ত্যাগে?

"কিছুই বুঝতে পারতাম না। তবে অনন্তশয়নে নারায়ণ লক্ষ্মীর সেবা গ্রহণ করেন কেন? তবে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁ'র মৃতদেহ স্কন্ধে তুলে নিয়ে আর সব ত্যাগ করেছিলেন কেন? তবে বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশী রাধানামে সাধা ছিল কেন? স্ত্রীর জন্য স্বামীর যে ত্যাগ বা স্বামীর জন্য স্ত্রীর যে ত্যাগ, তা'ও কি ধর্ম্ম নয়? এক একবার মনে হ'ত, তাঁ'কে এ কথা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু লজ্জা—আর লজ্জার চাইতেও অভিমান এসে আমার মুখ চেপে ধরত—স্বামী, যা'কে ইহকালের ও পরকালের সর্ব্বস্ব ব'লে মনে করতে শিখেছি—যাঁ'র চাইতে আমার আপনার আর কেউ হ'তে পারে না—তাঁ'র ভালবাসা কি ভিক্ষা ক'রে পেতে হ'বে। তা' পারব না। কোন তরুণী তা' পারে না।

"সমবয়সীরা তাঁ'র কথা তুলে ঠাট্টা করত, আমার বুক ফেটে যেত। শাশুড়ী 'তুকতাক' ওষুধ করতে বলতেন, আমার কান্না পেত। শাশুড়ীও কাঁদতেন। তাঁ'র ব্যথা ছিল—দু দিকেই। ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছেন, তা'তেও তাঁ'র ব্যথা। আবার আমাকে তিনি মেয়ের মতই দেখতেন,

আমার জন্যও তাঁ'র ব্যথা। তিনিও যে বড় আশায় হতাশ হয়েছিলেন! তাঁ'র দুঃখ দেখে আমার দুঃখ হ'ত। কত দিন তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে কেঁদেছেন—তিনিও কেঁদেছেন, আমিও কেঁদেছি! আমার মনে হ'ত—আমি না হয়, সাধনপথের বাধা, কিন্তু মা? মা'কে এমন ক'রে কাঁদান, এ যদি ধর্ম্ম হয়, তবে অধর্ম্ম কা'কে বলে? আমাদের শাস্ত্রেই না বলেছে—পিতা স্বর্গ আর মাতা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী?' তিনি জন্তুর জন্য যে দয়া দেখাতেন—আমি কি সেটুকুও আশা করতে পারি না? এতই ঘৃণ্য আমি? আমার দুই চোখ ফেটে জল বেরত।

"এক এক বার আমি মনে করতে চেষ্টা করতাম, আমিই কেন বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করি না? এক জন ইচ্ছা ক'রে যদি ত্যাগস্বীকার করতে পারে; তবে আর এক জন চেষ্টা ক'রে তা' পারবে না কেন? কিন্তু আমি তা' পারতাম না।

"তখনই আমার মনে হ'ত, আমি আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্ত ত্যাগের ও বৈরাগ্যের উপর বিমুখ—বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

"এমনই ক'রে এক বৎসরের পর আর এক বৎসর কেটে গেল। আমার দেহে ও মনে যেটুকু পূর্ণতা অবশিষ্ট ছিল, যৌবন তা' দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যা' পাইনি, তা'রই জন্য—স্বামীর আদর, স্বামীর ভালবাসা, আসঙ্গলিপ্সা পাবার বাসনাও যেন বেড়ে উঠল।

"সেই সময় একদিন—"

কয় মিনিট হিরণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অন্তরে যে উদ্বেগ ও আন্দোলন চলিতেছিল, সে যেন তাহারই চাঞ্চল্য সংযত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর সে বলিতে লাগিল—

"সে দিন তিনি কলকাতা হ'তে এসেছেন—পরীক্ষা শেষ ক'রে বাড়ী ফিরেছেন। পাঠ্যাবস্থায় যদি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করেই থাকেন, তা'রও আর কোন কারণ ছিল না। সে দিনও আমার মনে কত আশা! কিন্তু কই, তাঁ'র ব্যবহারে ত বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তনের পরিচয় পেলাম না! কাঁদতে কাঁদতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তিনি তখনও শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিলেন। শেষরাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি, তিনি মেঝের মাদুরের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গ্রীষ্মকাল—শেষরাত্রির বাতাস স্নিগ্ধ, আর তা'তে নানা-ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না এসে তাঁ'র সুপ্ত মুখের উপর পড়েছিল। আমি চেয়ে দেখলাম—আপনাকে আর সামলাতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে—আমার তৃষ্ণাতুর হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাবার জন্য তাঁ'র মুখে চোখে চুম্বন দিলাম।

"তিনি জেগে উঠলেন। তাঁ'র চোখে যে ভীতির দৃষ্টি ফুটে উঠল, তা' আমি আজও ভুলতে পারিনি। সেই দৃষ্টির সম্মুখে আমার ব্যাকুলতা যেন স্তম্ভিত হয়ে পাথরে পরিণত হ'ল! মন ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে গেল। ছিঃ—ছিঃ!

"পরদিন 'কাম আছে' ব'লে তিনি কলিকাতায় চ'লে গেলেন।

"তিন দিন পরে মা'র কাছে তাঁ'র পত্র এল—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন; আর ফিরবেন না। মা মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন। আমার মনে হ'ল, আমি তাঁ'র বুকে ছুরী মেরেছি—তাঁ'র হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

সহসা দ্বিভাষী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আদালতে একটা গোল উঠিল। আসামী কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

জজ বলিলেন, "আমি লক্ষ্য করিতেছি, উঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। নিশ্চয়ই কোনরূপ অসুখ করিয়াছে। তিনি বিশ্রাম করুন।" তিনি আর এক জন দ্বিভাষীকে আনাইলেন।

৪

হিরণ বলিতে লাগিল :—

"তা'র পর থেকেই পাপের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। স্বামী সব ত্যাগ ক'রে পুণ্যের সন্ধানে গেলেন; আর ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে যা'কে বিবাহ করেছিলেন—যা'র শুভাশুভের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, পাপকে যে তাঁ'র দ্বার দেখিয়ে গেলেন, তা' বুঝলেন না। পাপের যেমন উত্তেজনা আছে, পুণ্যেরও বুঝি তেমনই উত্তেজনা আছে; নহিলে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়েও তিনি তেমন অন্ধ হ'বেন কেন?

"স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণ ও অন্তর্ধান আমাদের দু'জনকে যে আঘাত দিয়েছিল, তা' হ'তে আমরা সামলে উঠবার

আগেই আর এক দিক থেকে আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। কেহ বা সংবাদ নেবার ছলে, কেহ বা সহানুভূতি জানাবার ছলে —আমাদের বাড়ী যাতায়াত করতে লাগলেন। মা বুঝলেন; আমাকে সাবধান ক'রে দিলেন - আমাকে আগলে রাখতে লাগ্‌লেন। তিনি দুঃখ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'অভাগী, যদি এত রূপ না পেয়ে—একটু সোভাগ্য পেতিস!'

"এই সংসার! মানুষকে পথভ্রষ্ট করবার জন্য মানুষের এই প্রবল চেষ্টা! ভেবে শিউরে উঠলাম। রূপ! এক একবার মনে হ'ত, মুখখানা পুড়িয়ে ফেলি—নখ দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলি! রূপ! কিন্তু কই যিনি চেয়ে দেখলে এ রূপ সার্থক হ'ত, তিনি ত তা'কে ভয় করেই পালিয়ে গেলেন! তবে?

"সময় কাটান ভার হয়ে উঠেছিল। দু'বৎসর স্বামীর রেখে যাওয়া পুস্তকগুলো পড়ে লিখাপড়ায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলাম। সেইগুলোই নাড়াচাড়া করতাম।

"কিন্তু বিপদ দিন দিন বেশী হয়ে আসছিল; শেষে একবারে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল—দরজায় ধাক্কা মেরে আমাকে চাইলে। যে গাঁয়ে আমার বাপের বাড়ী ছিল, সেই গাঁয়ের জমীদার আগে আমায় দেখেছিল—এখন আবার শিকারের ছল করে এসে আমাকে দেখে গিয়েছিল—আমাকেই তা'র শিকার ধরতে চাইলে। তা'র ধনবল ও জনবল দুই-ই ছিল। সে প্রথম প্রলোভন দেখাতে লাগল তা'তে কায সিদ্ধ হ'ল না দেখে, অত্যাচারের ভয় দেখাল ছোটখাট অত্যাচারের পরিচয়ও আমরা পেতে লাগলাম। খাজনা শোধ থাকলেও আমাদের নামে বাকি খাজনার নালিশ হ'ল আমাদের জমী আর একজন জোর করে দখল করলে—এমনই হ'তে লাগল। শেষে শুনা গেল, লেঠেল দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যা'বে। শাশুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'সে কি সর্ব্বনাশ করে গেল! তুমি তা'র স্ত্রী—আমার মেয়ের চাইতে বেশী! মনে করেছিলাম, যে ক' দিন দেহে প্রাণ থাকবে, তোমাকে বুকে করে রাখব। কিন্তু তা' আর হ'ল না। তোমাকে আর রাখতে পারলাম না'।—কিন্তু আমি কোথায় যা'ব? অনেক ভেবে দেখা গেল, আছেন এক মামা! শাশুড়ী বললেন, তিনিও আর পাপ গাঁয়ে থাকবেন না—তীর্থস্থানে চলে যা'বেন; কিন্তু যা'বার অন্তরায়—জমীজমা সব ছেলের নামে, সে সব বেচবারও উপায় নেই; হাতেও পয়সা নেই। কিন্তু তিনি ভিক্ষা করে খাবেন সেও ভাল, তবুও আর এ গাঁয়ে থাকবেন না।

"মামা নদে জিলায় আদালতে চাকরী করতেন। শাশুড়ী আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন। মামা মামী কিন্তু কিছুতেই এ ভার ঘাড়ে করতে চাইলেন না। শাশুড়ী কান্নাকাটি করেও যখন তাঁ'দের মন ভিজাতে পারলেন না, তখন আমাকে তাঁদের কাছে ফেলে রেখে রাত্রিকালে পালিয়ে গেলেন। সকালে তা' জেনে মামী তাঁ'কে আর আমাকে আর আমাদের যে যেখানে ছিলেন, তাঁ'দের ইতর ভাষায় গালি দিতে লাগলেন। আমি চুপ করে রইলাম। আপনার উপর—সংসারের উপর আমার ঘৃণা হ'ল।

"যে ঘাড়ে এসে পড়ে আর যা'কে তাড়ানও যায় না—তা'কে দিয়ে কতটুকু কায পাওয়া যায়, মানুষ তাই ভাবে। মামীও তা'ই ভাবলেন। বাড়ীতে একজন ঝি ছিল—তার জবাব হয়ে গেল; বাসনমাজা, ছেলে ধরা, রান্না সবই আমি করতে লাগলাম। আমি মুখটি বুজে কায করতাম, মামীর কথা যত অন্যায় কেন হ'ক না, উত্তর করতাম না। পাপের দাসত্ব করতে হবে না, এই ভেবে এ দাসত্বে আমি আপত্তি করলাম না। ভাবলাম, এও ভাল।

"কিন্তু আমি যখন এই কথা ভাবছিলাম, আমার অদৃষ্ট-দেবতা বুঝি তখন আমার ভুল দেখে হাসছিলেন! পাপ কেবল আমার গাঁয়েই আমাকে আক্রমণ করতে আসে নি—সে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। মামার বাড়ী আমার দু'মাস কাটতে না কাটতে সে মামার শালার মূর্ত্তি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মামার বাড়ী আমি তাঁ'র ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে সময় সময় আমার সব দুঃখ কষ্ট ভুলতে চেষ্টা করতাম। একদিন দুপুর বেলা—মামা আফিসে গেছেন, মামী ঘুমুচ্ছেন, আমি ছেলেদের খেলা দিচ্ছি, এমন সময় মামার শালা এসে দাঁড়ালেন। আমি তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরে যাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় তিনি ঘুরে গিয়ে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, 'পালাচ্ছ কেন? আমি বাঘ না ভালুক?' তাঁ'র কথার চেয়েও ভয়ানক তাঁ'র চাহনী। আমি খেলা

দিতে দিতে উঠে গিয়েছিলাম ; তাই মামার ছোট ছেলেটি কেঁদে উঠল। মামীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল ; তিনি 'কি মেয়ে বাবা! দু'দণ্ড ছেলেটাকে রাখতে পারেন না—কেবল ভাত গেলবার যম'—বলতে বলতে এসে তাঁ'র ভাইকে দেখে আর কিছু বল্লেন না। কারণ, ভাইটির স্বভাব তাঁ'র খুবই জানা ছিল।

"সেই দিন থেকে মামার শালার যখন তখন আমার সামনে আসা আরম্ভ হ'ল। মামী কিছু দেখেও দেখতেন না। তাই দেখে তাঁ'র স্পর্দ্ধা ও সাহস বেড়ে গেল। শেষে তাঁ'র কথাবার্ত্তা আর সংযত রইল না। তখন, আর না পেরে, মামীকে সে কথা বল্লাম। মামী যা' বল্লেন, তা'তে আমার উত্তর দেবার আর কিছু রইল না—'দাগু পুরুষ মানুষ—তোমারও ত আর তিনকুলে কেউ নেই, সন্ন্যাসিনীও হ'তে পারবে না—' মামী বোধ হয়, মনে করেছিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হ'লেও যদি তাঁর ভাই একটু কম উচ্ছৃঙ্খল হ'ন, সেও ভাল। কেন না, তিনি ভাই—আমি তাঁ'র গলগ্রহ। আমার ইষ্টানিষ্ট দেখা অনাবশ্যক।

"মামীর কথা শুনে মাথাটা যেন ঘুরে গেল! এ-ই সংসার! আর এ'রাই সতী—সাধ্বী—গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী—যাঁ'রা মনে করেন, অপরের ধর্ম্ম নাই, সতীত্ব নাই! যাঁ'রা আপনাদের এতটুকু স্বার্থের জন্য অপরের সর্ব্বনাশে এতটুকু বিচলিত হ'ন না! সেদিন আর আমার চোখে জল এল না—মনে কেবল ঘৃণার আগুন জ্ব'লে উঠল। হায়—সে আগুন যদি আমাকে সেই দিন পুড়িয়ে মারতে পারত!

"কিন্তু পারলাম না—সতী সাধ্বী মামীর সদুপদেশ মাথা পেতে নিতে পারলাম না। আমার মা'র কাছে—আর তা'র পরে আমার শাশুড়ীর কাছে সংসারকে যে চোখে দেখতে শিখেছিলাম, তা'তে মামীর কথায় তা'কে নরক মনে ক'রে উঠতে পারলাম না। মামী সংসারকে নরকের অংশ মনে করতে পারেন ; আমি পারব না। সংসারকে যদি নরক মনে করা যায়, তবে শাশুড়ী নরকের হাওয়া পাছে আমার গায় লাগে—সেই ভয়ে আমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন কেন? কিন্তু হায়, তিনি আমাকে কোথায় এনেছিলেন! তবু আমি সংসারকে নরক মনে করতে পারলাম না। মনে করলাম, যদি নরকেই যেতে হয়—আর পথ না থাকে, যা'ব ; কিন্তু কা'রও সংসারে নরক সৃষ্টি করব না, পুণ্যের আবরণ দিয়ে পাপকে আবৃত করব না—অসত্য দিয়ে সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করব না। দেহপণ্য নিয়ে যদি অন্ন উপার্জ্জন করতে হয়, তবে যেখানে তা'রই কেনাবেচা হয়, সেখানে যা'ব—সেখানে দর যাচাই ক'রে নেব। সেই সঙ্কল্পের উত্তেজনায় আমার মন ঝড়ের বেগে ছোট নদীর মত চঞ্চল হয়ে উঠল।

"রাত্রিকাল—আকাশে জ্যোৎস্না বিধবার পুণ্য বসনের মত দেখাচ্ছিল। আমি সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে—অতীতের সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে অজানাপথের পথিক হ'লাম। আমার অদৃষ্ট আর সমাজের দুর্ব্ব্যবহার যেন ষড়যন্ত্র ক'রে অসহায়া আমাকে পাপের পিচ্ছিল পথে ঠেলে দিয়ে বাড়ীর দোর বন্ধ ক'রে দিল। পথে দাঁড়াবার সময় কেবল এক জনের কথা মনে হ'ল—যিনি আমার স্বামী। মনে হ'ল, অপরাধ তাঁ'র—না আমার? মনে হ'ল গীতায় আর গৈরিকে মুক্তির সন্ধান করতে গিয়ে যদি আর সব কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হয়—আর সেই অবহেলার ফলে নন্দনে নরকের সৃষ্টি হয়, তবে—তবুও কি সেই মুক্তি বড়?"

জজ লক্ষ্য করিলেন, প্রথম স্বিভাবীর মুখ যেন যন্ত্রণায় কুঞ্চিত—বিকৃত হইতেছে। তিনি তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে—হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলেন। স্বিভাবী বলিলেন, তিনি একটু বিশ্রাম করিলেই সুস্থ হইবেন! কোন আশঙ্কা নাই।

৫

হিরণ বলিতে লাগিল :—

"তা'র পর? যে পথে এসে দাঁড়ালাম সে পথে যাত্রীর—সঙ্গীর অভাব নেই। তা'দের সঙ্গে এলাম। কলকাতায় এসে আমার কথা যে কেমন ক'রে কোন উপায়ে প্রকাশ পেল, তা' বুঝলেই বুঝতে পারা যায়, এই সহরে পাপের ব্যবসা কত বড় হয়ে উঠেছে ; সে ব্যবসায় যা'রা মহাজন, তা'দের ব্যবস্থা কেমন চমৎকার।

"তা'র পর বিশ বৎসর। এ কি জীবন! শরীর আর মন ভাল থাক আর না থাক, বিচার করবার অধিকার নাই—কারণ, অর্থের বিনিময়ে তা'দের বেচা হয়েছে ; যে

দাম দিয়েছে। সে যত অপ্রীতিকরই কেন হ'ক না, সে তা'দের মালিক, সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। অর্থ পেয়েছি, কিন্তু বুকে নরকের আগুন একবারও নিবে নি।

"ভাবলে যেন জ্ঞানহারা হ'তে হয়! কত রকমের কত লোক আকৃষ্ট হয়ে এসেছে: বৃদ্ধ—যিনি আমার পিতার বয়সী, যাঁ'কে দেখে ভক্তি করতে ইচ্ছা হয়, তিনিও প্রবৃত্তির তাড়নায় স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলকে ত্যাগ ক'রে এসে আমার পায় সর্ব্বস্ব দিয়ে তা'দের পথের ভিখারী করেছেন! কি এ মোহ! তরুণ যুবক—যার বয়সী ছেলে আমার থাকতে পারত—যা'কে দেখলে আমার বুকেও বাৎসল্য জেগে উঠতে চায়, সে আমার জন্য আপনার সর্ব্বনাশ করেছে? সর্ব্বনাশ করেছে কেবল কি আপনার? আমি এক দিন যেমন ক'রে পিপাসিত হৃদয় নিয়ে আমার স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকতাম, তেমনই ক'রে যে তরুণী তা'র পথ চেয়ে থাকে, তা'র কি সর্ব্বনাশ করেছে! মনে এতটুকু গ্লানি উপস্থিত হয় নি? পুস্তকে পড়েছি, মিশরের মরুভূমির মধ্যে পাষাণে গড়া এক অদ্ভুত নারীমূর্ত্তি আছে। তা'র মুখ দেখে কেহ তা'র মনের ভাব কি, তা' বুঝতে পারে না; কিন্তু সকলেই তা'র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারে না। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, আমিও যেন তেমনই। কত সংসার মরুভূমি ক'রে তা'র মধ্যে আমি রয়েছি—যা'রা আমার জন্য মুগ্ধ, তা'রা আমার মুখের প্রশংসা করে, মনের ভাব বুঝতে পারে না। যা'রা আমার জন্য সংসারের ও আপনাদের সর্ব্বনাশ করেছে, তা'রা আমায় কি ভেবেছে—আমাতে কি দেখেছে? তা'রা যদি একবার আমার মনের ভিতরটা দেখতে পেত!

"বিশ বৎসর কেটে গেল—পাপে আর বিলাসে। তা'র পর সেই দিন।

"অন্য দিনের মত সে দিন বৈকালে আমি মোটরে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে মোটর যাচ্ছিল। যেখানে রাস্তার মুখে হাওড়ার পুল, সেখানে গাড়ীর ভিড়ে মোটর মন্থরগতিতে চলল—ঠিক সেই সময় কনষ্টেবলের বারণ না মেনে একখানা মোটর সহরের দিক থেকে পুলের দিকে ছুটছিল। এক বুড়ী—ভিখারিণী অতি কষ্টে রাস্তা পার হচ্ছিল—মোটরখানা তা'র উপর এসে পড়ল। দেখতে দেখতে কাণ্ডটা হয়ে গেল। লোকের ভিড় জমল—মোটরখানা ধরা পড়ল—উত্তেজিত জনতা তা'র চালক ফিরিঙ্গীটাকে ঘাড় ধ'রে নামিয়ে এমন মার দিল যে, মনে হ'ল, তা'রা প্রাণের বদলে প্রাণই নেবে; গাড়ীখানাও তা'রা ভেঙ্গে দিল। কিন্তু বুড়ীর দিকে তখন কেউ চাইল না। আমি পাহারাওয়ালাকে ডেকে বল্লাম, 'ওকে আমার গাড়ীতে তুলে নিয়ে চল—হাঁসপাতালে।' সে তা'ই করল।

"তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নি। বুড়ীর রক্তাক্ত—দলিত দেহ আমার গাড়ীতে তুলে নিয়ে আমি তা'র দিকে চাইলাম। সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল—সূর্য্যের আলো নিবে গেল। বুড়ীর চোখের সেই দৃষ্টি! এতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল—আমাকে দেখে, সেই আঘাতেই বুঝি প্রাণ সেই দৃষ্টি দিয়ে বার হয়ে গেল—শব আমার পাশে প'ড়ে রইল।"

"বুড়ী আর কেউ নয়—আমার শাশুড়ী। যিনি আমাকে পাপের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করবার জন্য কত ব্যাকুল হয়েছিলেন, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে মাতৃহৃদয়ে কত ভাবনা ভেবেছিলেন—তাঁ'র মৃত্যু হ'ল—এই পাপবিলাসিনীর কোলে!"

হিরণের দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আর কাঠগড়ার পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া দ্বিভাষী যেন বুকভাঙ্গা যাতনায় কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর হিরণ বলিল:—

"এইবার শেষ। হাঁসপাতালে মৃতদেহ নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। সেই চোখের দৃষ্টি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আমার বুকের মধ্যে পোড়াতে লাগল। দৃষ্টি দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়—সে কি দৃশ্য!

"সে দিন আমার অবস্থা আমি কেমন ক'রে বুঝাব? বুঝি কাউকে যদি পুনঃ পুনঃ সাপ কামড়ায়, তবে তা'র এমনই অবস্থা হয়। আমি ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়লাম—টিঁকতে পারলাম না। মনে হ'তে লাগল, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি ছাতে গেলাম; ব'লে গেলাম, যেন কেউ আমার কাছে না যায়। আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, ভাবতে পারলাম না। মনে হ'তে লাগল—চারিদিক থেকে আগুনের শিখা এসে আমাকে স্পর্শ করছে। সব যেন জ্ব'লে যাচ্ছে। আর উপরে হাসছে নীল আকাশ—তা'র স্নিগ্ধ প্রশান্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না! যে দিন

পাপপথে পা দিয়েছিলাম, সে দিনও সে এমনই হাসছিল—আজও তা'ই।

"দাসী বার দুই এসে গেল—আমার তিরস্কারে আর আসতে সাহস করলে না। খানিক রাত্রিতে নীচের গোলমাল শুনা গেল—যুবক এসেছে! তা'র কথার শব্দে বুঝা গেল, সে প্রকৃতিস্থ নয়। দাসদাসীর বারণ সে মানলে না; কেন না, সে তখন আমাকে কিনেছে। সে একেবারে উপরে ছাতে উঠে এল, বল্লে—'এ আবার কি ঢং?' আমি উত্তর দিলাম, 'আজ আমার শরীর ভা'ল নেই—মনও ভাল নেই; আজ তুমি যাও।' সে বল্লে, 'তোমার হুকুমে?' আমি বল্লাম, 'না। আমার মিনতিতে।'—সে হাসতে হাসতে জড়িতকণ্ঠে বল্লে, 'কেন—কোন নূতন নাগর আসবে না কি?' আমি বিরক্ত হয়ে একটু কঠোর ভাবে বল্লাম, 'তুমি যাও।' 'বটে!'—ব'লে সে এসে আমার হাত ধরল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স'রে এলাম আমার মনে হ'ল, সাপের গায় হাত পড়েছিল। সে আবার আমার দিকে এসে বল্লে, 'সেটি হচ্ছে না'।

"তখন আমি 'মোরিয়া' হয়ে উঠেছি। আমার সমস্ত দেহ-মন তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি আর সহ্য করব না।—কিছুতেই না।

"সে আবার অগ্রসর হয়ে জোর ক'রে আমার হাত ধরলে, আমাকে আসনের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল। আমার ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার দেহে সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় যেন অসীম বল-সঞ্চার হয়েছিল। আমি আবার হাত ছাড়িয়ে নিলাম—আমার হাতের অলঙ্কার বেঁকে গেল।

"তা'র পর সে আবার আমার দিকে আসতেই আমি তা'কে ঠেলে দিলাম—ঠেলাঠেলিতে ছাতের যে যায়গাটায় আলিসার খানিকটা ভাঙ্গা ছিল, সেই যায়গায় প'লে আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তা'কে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম।

"আমি তাকে খুন ক'রে তবে যেন কতকটা শান্ত হ'তে পারলাম। আমি তা'কে খুন করলাম।"

হিরণের দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছিল—তাহার মুখ দেখিলে ভয় হয়—যেন নৃশংস হত্যা তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

সে মূর্ত্তি দেখিয়া আদালতে সব লোক যেন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

৬

আসামীর এই স্বীকারোক্তির পর কোন পক্ষের ব্যারিষ্টারের বলিবার আর কিছু ছিল না।

জজ জুরীকে মামলা বুঝাইয়া দিলেন। জুরাররা বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশের জন্য পাশের কামরায় চলিয়া গেলেন। জজও খাস কামরায় গেলেন। এজলাসে জনতা, শাস্তি কিরূপ হইবে, তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল।

জুরারদিগের মধ্যে এক জন যৌবনে এক কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া পৈতৃক-সম্পত্তির ভার লঘু করিয়াছিলেন; আর এক জনের পুত্র সেই পথের পথিক হইয়াছিল। তাঁহারা কঠোরতম দণ্ডেরই পক্ষে মত দিলেন। দুই জন য়ুরোপীয় আসামীকে একটু দয়া দেখাইবার জন্য জজকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা তাহাতেও সম্মতি দিলেন না; বলিলেন—আসামী নিজেই স্বীকার করিয়াছে, সে খুন করিয়াছে; তাহার পক্ষে সহসা উত্তেজিত হইয়া কায করিবার কোন কারণই নাই। তাঁহারা বলিলেন, ইহারা সমাজের সর্ব্বনাশ করে—ইহাদের দণ্ড কঠোর হইলে ভবিষ্যতে ইহার সমব্যবসায়ীরা সতর্ক হইবে।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে জুরীর প্রধান ব্যক্তি আসিয়া জানাইলেন, তাঁহারা প্রস্তুত। জজ এজলাসে আসিয়া বসিলেন। জুরীর নায়ক বলিলেন, তাঁহারা সকলে একমত হইয়াছেন—আসামী খুনের অপরাধে অপরাধী।

জজ তখন রায় দিলেন। তিনি আসামীকে বলিলেন, সে স্বীকার করিয়াছে—সে যুবককে খুন করিয়াছে; জুরাররা কাযেই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাহার পর তিনি একটা কাল টুপী মাথায় দিয়া আসামীর মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন।

আদালতে সব লোক বলাবলি করিতে লাগিল,—দণ্ড অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে। খিভাসী চেয়ারে যেন ঢলিয়া পড়িলেন।

কিন্তু কাঠগড়ায় আসামীর মুখে এতটুকু বিকৃতি লক্ষিত হইল না। সে খিভাষীর দিকে চাহিয়া ছিল।

৭

ফাঁসির পূর্ব্বে হিরণকুমারী জেলখানায় ছিল।

এক দিন জেলার আসিয়া বলিলেন, এক জন লোক তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। হিরণ ভাবিল, আবার কে? এটর্ণী?—সে দরখাস্ত করিয়া সরকারী এটর্ণীকে আনাইয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে দিয়াছিল—সে টাকায় আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাহার শাশুড়ীর নামে সে আশ্রমের নামকরণ হইবে; আর জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল স্ত্রীলোক তাহাতে আশ্রয় পাইতে পারিবে। সেই লিখাপড়া সম্পর্কে কয় দিন এটর্ণী, রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি জেলে গতায়াত করিয়াছেন। সে কায শেষ হইয়াছে। হিরণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

আগন্তুককে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল—তিনি আদালতের দ্বিভাষী। হিরণের দুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

আগন্তুক বলিলেন, "হিরণ, আমাকে ক্ষমা কর।"

হিরণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর সে বলিল, "আমার এই অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে?"

"অপরাধ তোমার নয়—সব অপরাধ আমার।"

"যদি ক্ষমা কর, তবে অনুমতি দাও, তোমার পায়ের ধুলা নেব।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্বামীর চরণে পড়িয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপিত করিল; তাহার পর বলিল, "যে দিন তোমার পত্র পেয়েছিলাম, তুমি সন্ন্যাসী হ'লে, সে দিন মনে করেছিলাম, যদি সত্যসত্যই তোমায় ভালবেসে থাকি, তবে তুমি আবার আসবে। তুমি এলে—কিন্তু—"

সে আবার কাঁদিতে লাগিল।

তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া তাহার স্বামী বলিলেন, "সন্ন্যাসী হয়ে গুরুর আশ্রমে তিন বৎসর কাটিয়েছিলাম। কিন্তু মনের সন্দেহ মিটত না। প্রথমে উৎসাহের আধিক্যে যা' চোখে পড়েনি, যত দিন যেতে লাগল, তত তা' চোখে পড়তে লাগল। গুরুর উপদেশে আর আদর্শে সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হ'তে লাগল। তিনি আমাদের ত্যাগের উপদেশ দিতেন, কিন্তু দেখতাম, তাঁ'র 'গীতার ব্যাখ্যা' বেচা টাকা থেকে শিষ্যদের প্রণামী পর্য্যন্ত সব টাকা 'মা ঠাকরুণ' যত্ন ক'রে তুলতেন। দেখতাম, তাঁ'র ছেলের নাম যোগব্রত হ'লেও তার যোগ-বিয়োগ কেবল খরচের খাতায়। দেখতাম, তাঁ'র মেয়েদের ও পুত্রবধূর জন্য 'হেজলিন স্নো' থেকে সুগন্ধী তেল ও সাবান আসত। দেখতাম, তাঁ'র মেয়ের বিয়েতে ধনী পাত্রই ঠিক করা হ'ত। সন্ন্যাসের বা বৈরাগ্যের আঁচ তাঁ'দের গায় লাগতে পেত না। সে সব কেবল আমাদের জন্য! তাঁ'র শিষ্যদের অনেকে গৃহী—ধনী শিষ্যদের আদরও বেশী। তাঁ'দের সকলেই যে সচ্চরিত্র, এমনও মনে হ'ত না। এক শিষ্যা তাঁ'র 'আশ্রম'বাড়ীর একটা অংশ ক'রে দিয়েছিলেন, তিনি যে অর্থ দিয়ে তা' করিয়েছিলেন, সে পাপের অর্থ—তখনও তিনি পাপপথ পরিত্যাগ করেন নি। এই সব দেখে সন্দেহ যখন দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল, তখন কুম্ভস্নানে গুরুর সঙ্গে এলাহাবাদে গেলাম। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম। এক জনের বেদান্ত-ব্যাখ্যায় আমি আকৃষ্ট হয়ে তাঁ'র কাছে গতায়াত করতে লাগলাম। ক'দিন পরে তিনি আমার সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করতে করতে আমার সন্ন্যাসী হ'বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সব কথা বললাম। শুনে তাঁ'র মুখ গম্ভীর হ'ল। তিনি বললেন, 'ভুল করেছ, বাবা! তোমরা লিখাপড়া শিখে মূর্খ। ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর—ধর্ম্ম কি? গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কি বলেছিলেন? যা'র যা' কর্ত্তব্য, তা'র তা'ই ধর্ম্ম। তুমি সংসারী, সংসার ফেলে এসেছ—গর্ভধারিণী মা'র কোন ব্যবস্থা না ক'রে গুরু-পত্নীর সেবা করছ! মা'র জন্য কষ্ট হয় না? তুমি বিবাহ করেছ—স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন কর নি। সেটা তোমার ধর্ম? না—অধর্ম্ম? যাও—ফিরে যাও। তোমার ধর্ম্ম ঘরেই প'ড়ে আছে।' মনে হ'ল, ভগবান্ স্বয়ং আমাকে আদেশ করলেন—'যাও! ফিরে যাও!'—তোমাদের কথা মনে ক'রে আর বিলম্ব করতে পারলাম না। ফিরে এসে গুরুকে বললাম, আমি ফিরে যা'ব। তিনি তিরস্কার করলেন; বললেন, তাঁ'র সব উপদেশ ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়েছে। আমি উত্তর করলাম না—চ'লে এলাম। দেশে গিয়ে শুনলাম, মা তোমাকে কোথায় রেখে এসেছিলেন, কেউ জানে

না। তা'র পর জমীদার তাঁ'কে ভিটা ছাড়া-করেছে। কারও সন্ধান পেলাম না। এত দিন পরে—"

বক্তার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; কণ্ঠ বন্ধ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "সব পাপ আমার—এ পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

হিরণবালা বলিল, "তা আমি জানি না। আমার অনুরোধ, একবার তুমি বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।"

"আমি ক্ষমা কর্‌বারও অধিকারী নই। কিন্তু যিনি অধিকারী, যিনি মানুষের পাপপুণ্যের বিচারক, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করেছেন।"

"আমার মনে হচ্ছে, তোমার মুখ দিয়েই তিনি জানালেন, তিনি ক্ষমা কর্‌বেন। আমি আর কিছুই চাই না।"

হিরণকুমারী আবার স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

জেলার আসিয়া বলিলেন, "নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে।"

অগত্যা হিরণ স্বামীর পা ছাড়িয়া দিল। তাহার মনের ভার দূর হইয়া গেল। সে সানন্দে মৃত্যুকে মুক্তি বলিয়া মনে করিল।

আর তাহার স্বামী? আপনার কৃত কার্য্যের ফল দেখিয়া বক্ষে নরকানল জালিয়া লইয়া তিনি ধীরপদে—উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীন জীবনে ফিরিয়া গেলেন। যেন তিনিই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত!

মহিলা রাজনীতিক

শ্রীমতী ষ্টানকিঅফ—আমেরিকায় বুলগেরিয়ান দূতের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার পিতা বিলাতে বুলগেরিয়ান দূত। তিনি ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান, রুসিয়ান, জার্ম্মাণ ও তাঁহার মাতৃভাষা জানেন। তিনি রাজনীতি-বিভাগে চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন।

কামাখ্যা

১০ই আগষ্ট, (১৯২১) দার্জ্জিলিং মেলে আমরা শিলং যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার পর "সারা ব্রিজ্", "সারা ব্রিজ্" শব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। পদ্মাবক্ষে অগণ্য দীপাবলী সারি সারি শোভা পাইতেছে, মনে হইল, যেন জোনাকী পোকারা স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। এই আলোগুলি জেলেদের ছোট ছোট নৌকা হইতে আসিতেছে, তাহারা রাত্রিতে পদ্মায় মাছ ধরিতেছে; এই সমস্ত মাছ বরফ ঢাকা দিয়া পরদিন শিয়ালদহে আসিয়া পৌছাইবে। পুলের উপর আসিয়া গাড়ীর গতি মন্থর হইল। পুলের উপর হইতে দূরে উত্তরদিকে পুরাতন ষ্টীমার-ঘাটের আলো দেখা যায়। পুল পার হইলাম, ক্রমে অন্ধকারে সব মিলাইয়া গেল। সান্তাহারে গাড়ী বদল করিয়া শিলং মেলে উঠিলাম। পরদিন প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখি, আমরা আসামের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছি। আসামের সীমানা গোলোকগঞ্জ ষ্টেশন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তখন রাত্রি প্রায় ৩টা হইবে। আসামেও প্রকৃতিদেবী তাঁহার সেই বাঙ্গালার সাজে সজ্জিতা, সে স্থানেও তিনি তাঁহার সেই আশমানী রঙ্গের পাড়যুক্ত হরিৎশাড়ী পরিধান করিয়া আছেন। প্রত্যূষে মাতৃদেবীর কমনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম। ১১ই আগষ্ট বেলা প্রায় ১১॥০টার সময় শিলং মেল আমাদের আমিনগাঁও পৌছাইয়া দিল। আমিনগাঁও ষ্টেশন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপারে। পূর্ব্বপারে পাণ্ডঘাট ষ্টেশন। মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ। এই স্থানে ষ্টীমারে উঠিয়া পার হইতে হয়। পার হইবার সময়ে দেখিলাম, অসংখ্য কুম্ভীর নির্ভয়ে জলের উপর ভাসিতেছে, ষ্টীমার সশব্দে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। ষ্টীমারে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে পরপারে কামাখ্যা পাহাড় দেখিলাম—পর্ব্বতগাত্রে তরঙ্গায়িত তরুগুল্মলতা সূর্য্যকিরণে হাসিতেছে, আর অভ্রভেদী গিরিনিচয় গম্ভীর মূর্ত্তিতে নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে আমাদের চতুষ্পার্শে কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডা মহাপ্রভুদের আবির্ভাবে চাহিয়া দেখি, যেমন জলে কুম্ভীরগুলি নিজ নিজ শীকার অন্বেষণে ব্যস্ত, ইঁহারাও সেইরূপ চেষ্টায় আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরী কামাখ্যার মাহাত্ম্য উল্টাপাল্টা করিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, মহাবিপদ উপস্থিত, জলে কুম্ভীর, ষ্টীমারে পাণ্ডা! শেষে ইঁহাদের এক জনের শরণাপন্ন হইয়া নিস্কৃতি পাওয়া গেল। এ স্থানে পাণ্ডাদের বৈশিষ্ট্য দেখিলাম যে, অন্যান্য স্থানের পাণ্ডা মহাপ্রভুদের ন্যায় "দেহি দেহি" রব নাই; "দাতার ইচ্ছায় দান" এই মহাবাক্যটি তাঁহারা কথঞ্চিৎ পালন করেন বলিয়া বোধ হইল। ষ্টীমার হইতে পাণ্ডুঘাটে নামিয়াই দেখি, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। প্রবাদ আছে, পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকালে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতার এবং শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর মূর্ত্তি পাণ্ডুঘাট ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ব্রহ্মপুত্রনদকূলে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের নামানুসারে এই স্থানের নাম পাণ্ডুঘাট হইয়াছে। বেলা ১টা আন্দাজ সময় পাণ্ডুঘাট হইতে গাড়ী ছাড়িল, প্রায় ১।২০ মিনিটের সময় আমরা কামাখ্যা ষ্টেশনে নামিলাম। ইচ্ছা, শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া যাইব; কারণ, হিন্দু-সন্তানের আজন্মের সংস্কার তীর্থদর্শনে পুণ্য। তাহা ভিন্ন কামাখ্যার মন্দির সম্বন্ধে শুনা ছিল যে, সে স্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর ও দর্শনযোগ্য।

কামাখ্যা ষ্টেশনটি ঠিক কামাখ্যা পাহাড়ের নিম্নেই অবস্থিত। পাহাড়ের ধারে ষ্টেশনের নিকটেই একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে, যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে তথায় থাকিতে পারেন। ষ্টেশন ও কামাখ্যা পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটি ট্রাঙ্ক রোড গিয়াছে, তাহা পাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া গৌহাটী হইয়া শিলং পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাহাড়ে উঠিতে ৩টি রাস্তা আছে; তন্মধ্যে উত্তরদিকের রাস্তাটি লোকজন চলাচলের অভাবে ও বে-মেরামতে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে যে রাস্তাটি উপরে উঠিয়াছে, পথিক ও যাত্রিবর্গ সেই পথেই প্রায় যাতায়াত করেন। আমরা সেই পথ ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই পথে ৪টি চড়াই

পড়ে, তন্মধ্যে শেষ চড়াইটি খুব বড় ও খাড়াই বেশী। আমরা মন্দিরের নিকট পৌছাইলাম। ষ্টেশন হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রায় ১ মাইল পথ হইবে। আমরা সে দিন পাণ্ডাজীর গৃহে অতিথি হইলাম। স্নানাদি সমাপনান্তে মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। কামাখ্যা দেবীর মন্দির ছাড়া এই স্থানে ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, কালিকা ভুবনেশ্বরী, কমলা, ধুমাবতী ও ত্রিপুরা (ষোড়শী) বিভিন্ন মন্দিরে বিগুমান আছেন। ইহা ভিন্ন কামেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, আম্রটকেশ্বর, কেদারেশ্বর, কোটিলিঙ্গ এই পঞ্চ শিব-মন্দির আছে।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির।

শুনিলাম, দুর্গমপথে ও গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গে বনদুর্গা, শিবদুর্গা, জয়দুর্গা প্রভৃতি অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবী আছেন। এতদ্ভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, এমনও অনেক বিগ্রহ নাকি এই কামাখ্যাক্ষেত্রে আছেন। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরটি পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত। ইহা অন্যান্য মন্দিরগুলি অপেক্ষা বিপুলকায় ও মনোহর কারুকার্য্যবিশিষ্ট। এই স্থানেই মহামায়া সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন এবং ইহা দর্শনে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া কথিত আছে।

"যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্তপাষাণরূপিণী॥
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোঽথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥"

এই মহাপীঠস্থান শাক্ত হিন্দুদের ৫১ পীঠের একটি প্রধান পীঠ এবং ইহার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, সতীদেবীর অঙ্গ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া যখন নীলাচলে পতিত হয়, তখন পর্ব্বত ভার বহনে অসমর্থ হইয়া রসাতলে গমনোদ্যত হয়েন, তখন ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই পর্ব্বত ধারণ করেন। পর্ব্বতটি ৩ শৃঙ্গবিশিষ্ট, ৩টি শৃঙ্গের নাম যথাক্রমে ব্রহ্মপর্ব্বত, বরাহপর্ব্বত ও শৈবপর্ব্বত। ভুবনেশ্বরী দেবী ব্রহ্মপর্ব্বতে, ঈশ্বরী কামাখ্যা দেবী শৈবপর্ব্বতে এবং বরাহপর্ব্বতে পাণ্ডশিলারূপে ভগবান্ বিষ্ণু আছেন। আবার ভগবতী কামাখ্যা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন মূর্ত্তির উপর বিরাজ করিতেছেন। সিংহরূপে ভগবান্ বিষ্ণু, শবরূপে শিব এবং পদ্মরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা,—তদুপরি দেবীমূর্ত্তি—দ্বাদশ হস্ত, অষ্টাদশ চক্ষু এবং ৬টি মুখবিশিষ্ট। মূর্ত্তিটি অষ্টধাতুনির্ম্মিত, প্রায় দেড় ফুট উচ্চ হইবে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই এই মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কামাখ্যা দেবীর মূর্ত্তির দক্ষিণভাগে অষ্টধাতুনির্ম্মিত, বৃষভারূঢ়, পঞ্চমুখ ও
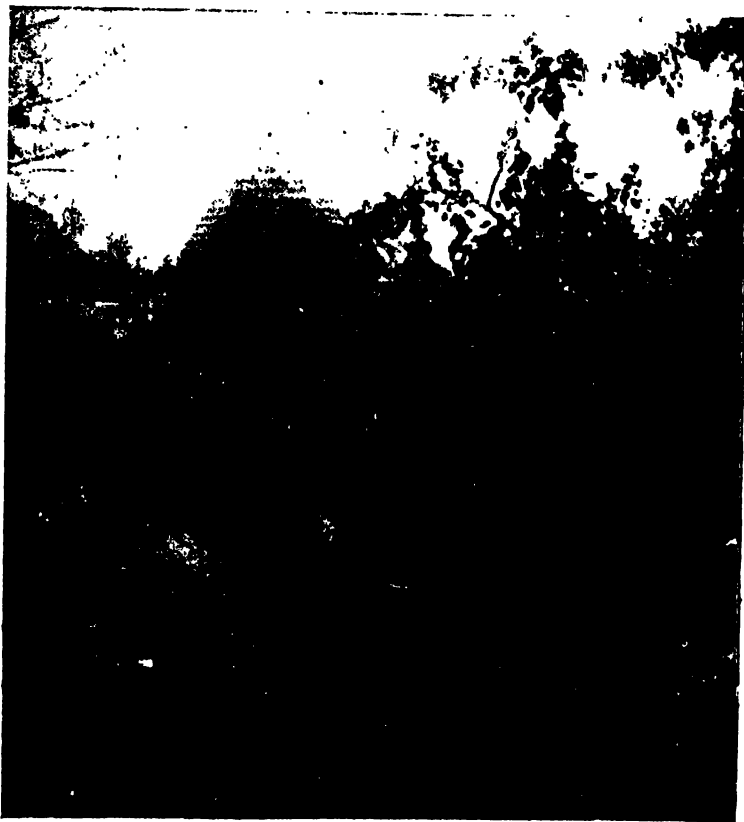
দশ হস্তযুক্ত একটি শিবমূর্ত্তি আছে। প্রথমে ইহা দর্শন করিয়া তৎপরে গহ্বরে সতীর যোনিমণ্ডল দর্শন করিতে হয়। একটি চতুষ্কোণ প্রস্তর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৮ হাত হইবে, তাহার মধ্যে এক হস্তপরিমিত লম্বা এবং দ্বাদশ অঙ্গুলী বিস্তৃত উনশত কোটি শিবলিঙ্গযুক্ত যোনিমণ্ডল। এই স্থানে হস্তমাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ একটি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র হইতে অবিরত ঝরণার ন্যায় জল নিঃসৃত হইতেছে। একটি সুবর্ণনির্ম্মিত গোলাকার (টোপরের ন্যায়) আচ্ছাদনী দিয়া ইহার অর্দ্ধেক আবৃত ও ভক্তগণের দর্শন ও স্পর্শনের জন্য অর্দ্ধেক উন্মুক্ত আছে। তন্ত্রে কথিত আছে, স্পর্শে নর জীবন্মুক্ত হয়। ইহার পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি আছে। গহ্বর হইতে উপরে উঠিয়া মন্দিরের ভিতরেই চতুস্পার্শে মঙ্গলচণ্ডী, বটুকভৈরব, দুর্গা, নীলকণ্ঠ ভৈরব, নন্দী, ভৃঙ্গী, নাগকন্যা, দ্রোণাচার্য্য এবং কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কামাখ্যা দেবীর পূজা দিনে ৩ বার হয়। প্রভাতে ষোড়শোপচারে একবার পূজা হয়, মধ্যাহ্নে ছাগ বলি দিয়া ভোগ হয় এবং সন্ধ্যাকালে দেবীর আরতি হয়। দৈনিক প্রায় ২০ মণ চাউল ভোগ হয়।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল উপরে ব্রহ্মপর্ব্বতে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। সন ১৩০৩ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এই মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, দ্বারবঙ্গের মহারাজ ইহা পুনরায় নির্ম্মিত করিয়া দেন। মন্দিরটি ছোট এবং কারুকার্য্যশোভিত না হইলেও স্থানটি বড় রমণীয়। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। উপর হইতে দূরে নদবক্ষে যতদূর দৃষ্টি যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন, সৌন্দর্য্যের চাদর বিছান রহিয়াছে, আর তাহার উপর নিপুণ চিত্রকর সযত্নে তুলি দিয়া সেই সৌন্দর্য্যরাশি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রগর্ভে উমানন্দ দ্বীপটি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা প্রাকৃতিক শোভায় কিরূপ অতুলনীয়, তাহা, বোধ হয়, লেখনীতে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না। দেবী কামাখ্যা ভৈরবীর ভৈরব উমানন্দ পর্ব্বতশিখর ছাড়িয়া এই দ্বীপে একটি মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। উমানন্দ ভৈরবের মূর্ত্তি পিত্তল-নির্ম্মিত, পঞ্চমুণ্ডবিশিষ্ট এবং মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহা যোগীশ্বরের বিহারের উপযুক্ত স্থান বটে। এই স্থান দর্শনে গিরিরাজ-তনয়ার আনন্দ হইয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। শান্তিপূর্ণ রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া—আশা আর মিটে না; যতই দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা করে। এই স্থান হইতে গৌহাটী সহরটি বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়া দূর হইতে এই সুন্দর সহরটি একখানি চিত্রপট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গোহাটী ব্রহ্মপুত্রের বামতীরে অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতে গোহাটী সহর ৩ মাইল এবং গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত। কামাখ্যা পাহাড়টি ব্রহ্মপুত্রের বামদিকে কামরূপ জিলার অন্তর্গত। কামরূপের উত্তরে ভুটান, দক্ষিণে খাসিয়া পাহাড়, পূর্ব্বে ডারাঙ্গ ও

উমানন্দ দ্বীপ।

নওগঙ্গ এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া। এই জিলায় ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার লোক বাস করে।

প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে) কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের উপরিভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পুরাতন মন্দিরের নিম্নভাগ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে কোচবিহারাধিপতি মল্লধ্বজ (মহারাজ নরনারায়ণ) ১৪৮৭ শকে (১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের) উপরিভাগ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই জন্য মন্দিরটির নিম্নভাগ প্রস্তর এবং উপরিভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। মন্দিরে প্রবেশ করিতে দ্বারের বামদিকে দেওয়ালের গাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে একটি সংস্কৃত শ্লোক ক্ষোদিত আছে। উহা পাঠে বুঝা যায় যে, ১৪৮৭ শকে (অর্থাৎ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা মল্লধ্বজ ও তাঁহার সহোদর রাজা শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে।

কামাখ্যা পাহাড়।

প্রবাদ আছে যে, সুদূর অতীতে বর্ত্তমান কোচবিহারাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ বিশ্বসিংহ কতিপয় ক্ষুদ্র রাজাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে গৌহাটীতে (গৌহাটীর প্রাচীন নাম —প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) আইসেন। তথায় একদা ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি পথভ্রষ্ট ও সঙ্গি-বিচ্যুত হইয়া নীলাচলোপরি উপস্থিত হয়েন। পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এক বটবৃক্ষতলে একটি মাটীর ঢিপির সম্মুখে এক বৃদ্ধা বসিয়া পূজা করিতেছেন। বৃদ্ধা রাজাকে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া মহামুদ্রার জল পান করাইয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন এবং কহিলেন, "আপনি এই দেবীর আরাধনা করুন, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।" অনন্তর দেবীর অর্চ্চনার ফলে কিয়ৎকাল পরে রাজা স্বীয় অনুচরবর্গকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেবী-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন যে, "আমি এই স্থানে দেবীর সুবর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিব"। পরে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইল, তবে সুবর্ণময় নহে, প্রতি ইষ্টকখণ্ডে একরতি করিয়া সুবর্ণ দেওয়া হইল। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর পূজাদিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তিনি মিথিলা, কান্যকুব্জ, কাশী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তথায় বসবাস করাইলেন।

কোচবিহারাধিপতিদের এত কীর্ত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদের বংশধরদের এই স্থানে আসা নিষিদ্ধ, আসিলে বংশ লোপ পাইবে। এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে আরতিপূর্ব্বক স্তোত্রপাঠ করিয়া ঘণ্টা বাজাইলে মহামায়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকেন, মহারাজ নরনারায়ণ লোকপরম্পরায় ইহা জ্ঞাত হইয়া ভগবতী দেবীর নিজমূর্ত্তি দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন এবং পুরোহিতকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "আমাকে একবার মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া দিতেই হইবে।" পুরোহিত ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমার দেখাইবার সাধ্য কি ? মা'র দয়া না হইলে কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখিবেন? ঐকান্তিক ভক্তির সহিত মা'র আরাধনা করুন, নিশ্চয়ই দেখা পাইবেন।" রাজা কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, পুরোহিতকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া সম্মত করাইলেন যে, তিনি যে কোন প্রকারেই হউক, দর্শন করিবেন, তাহাতে পুরোহিত যেন বাধা প্রদান না করেন। অতঃপর নিয়মিত আরতির পর ঘণ্টা বাজাইয়া স্তোত্রপাঠের সময়ে রাজা গোপনে দেবীকে উলঙ্গ নৃত্য করিতে দর্শন করেন। দেবী সর্ব্বজ্ঞ; তিনি ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে অভিসম্পাৎ করিলেন—

"যদি তুমি কিংবা তোমার কোন বংশধর এই পীঠস্থান দর্শন করিতে আইস, এমন কি, এই পর্ব্বতে আরোহণ পর্য্যন্ত কর, তাহা হইলে তোমাদের বংশ লোপ হইবে।"

এই স্থানে বৎসরে ৩ বার মেলা হয়—দুর্গাপূজার সময়, অম্বুবাচীর সময় এবং অশোকাষ্টমীর সময়। তন্মধ্যে অম্বুবাচীর সময়ের মেলাটিতে সর্ব্বাপেক্ষা ধূমধাম বেশী হয়। মেলাতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়, রীতিমত বাজার ও দোকান-হাট অনেক বসে, আসামজাত এণ্ডি, মুগা, সূতা, বাসন, খেলানা প্রভৃতি এবং আরও অনেক দেশীয় পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট ক্রয়-বিক্রয় হয়। কামাখ্যা পাহাড়ে প্রায় ৩ শত কি সাড়ে ৩ শত ঘর লোকের বাস আছে, তাঁহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা সকলেই মাতার পাণ্ডা। এই পাণ্ডাগিরিই তাঁহাদের জীবিকা। এই পর্ব্বতটি দেবী কামাখ্যার দেবোত্তর সম্পত্তি, এ স্থানে কোন অধিবাসীকে খাজনা কিংবা ট্যাক্স দিতে হয় না। দ্বারবঙ্গের মহারাজা কতকগুলি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ এবং অনেক জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে পুষ্করিণী আছে, জল অতি পরিষ্কার এবং পুষ্করিণীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, তবে সম্বৎসর জল থাকে না, চৈত্র বৈশাখ মাসে শুষ্ক হইয়া যায়। সেই সময় এই স্থানে বড় জলকষ্ট হয়। এ স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, গরু, ছাগল প্রভৃতি ধরিয়া উৎপাত করে; তবে তাহা সাধারণ নহে। এই স্থানের ভাষা কামরূপী; একটু কষ্টে বুঝিতে হয়, কিন্তু পাণ্ডারা বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন। এই স্থানে মনসাপূজা প্রচলিত আছে, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ঘরে ঘরে পূজা হইয়া থাকে এবং কামরূপী ভাষায় মনসার গান ও কীর্ত্তন হইতে থাকে। কামাখ্যার ঘরবাড়ীগুলি প্রায়ই মৃত্তিকা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং টিনের ও খড়ের চালযুক্ত। একটি ডাকঘর, একটি সংস্কৃত টোল এবং আসামী-ভাষা শিখাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের একটি এম, ভি, স্কুল আছে। দেবীর ষ্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাণ্ডারাই এক ম্যানেজার নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে স্থানীয় লোক দলুই বলে।

শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়।

শ্মশান-গীতা

ফিরি ফিরি দিবানিশি মৃত্যুর মন্দিরে,
মাখি' শিখাতপ্ত দেহে চিতাভস্মরাশি,
বহ্নিব্যাপ্ত শব-মুখে হেরি কূট হাসি
বুঝেছি কি ব্যঙ্গ তারা করিছে দেহীরে।
ধু-ধু ধু-ধু—ফট্-ফট্—ফ্রেৎকারে ফ্রেঙ্কারে,—
শুনেছি শ্মশান-গীতা মহা অর্থভরা,
দেহবন্ধ কামবন্ধে পড়েছিস্ ধরা,
মৃত্যু টানিতেছে তোরে মহা-অন্ধকারে।
ফিরে যা রে কামদাস, ঘরে ফিরে যা রে!
শক্তির সন্তান তুই, অমৃত সম্ভব,
ছাড় সম্ভোগের ক্ষুধা—কামিনীর স্তব,
রাখিস্ নে উপবাসী অমর আত্মারে!
নে দীক্ষা অমৃত মন্ত্রে—মা যে সুধাময়ী,
শক্তি-সাধনায় হ'য়ে মৃত্যু-কামজয়ী।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শীতলা ঠাকরুণ

১

কোটবাটীর হরেকৃষ্ণ অধিকারীর মেয়ে নেত্যকালীকে গ্রামের লোক "শীতলা ঠাকরুণ" উপাধি দিয়াছিল। অবশ্য তাহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষে বামুন ঠাকরুণ বলিলেও পরোক্ষে শীতলা ঠাকরুণ নামেই অভিহিত করিত, এবং গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শীতলা দেবীর প্রাপ্য ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ না করিলেও ঠিক শীতলা দেবীর মতই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত।

অবশ্য, এই উপাধিদানের জন্য গ্রামের লোকদের কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না; কেন না, বামুন ঠাকরুণের প্রকৃতিতে সচরাচর যেরূপ ক্ষিপ্রতা দেখা যাইত, তাহা পুরাণ-বর্ণিত দেবদেবীগণের প্রকৃতির উগ্রতা হইতে কিছুমাত্র ন্যূন নহে। বরং তুচ্ছ কারণে দেবতারাও তাঁহার ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া এমন কঠোর অভিশাপ-বাণী প্রয়োগ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কাজেই গ্রামবাসীরা তাহাদের একমাত্র ভীতিস্থল শীতলা দেবীর সহিত তুলিত করিয়া তাঁহাকে শীতলা ঠাকরুণ উপাধি প্রদান করিয়াছিল।

তবে তাহারা মনে মনে ভয় করিয়া চলিলেও মুখে কিন্তু শীতলা ঠাকরুণের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কেন না, এই নিতান্ত রুক্ষপ্রকৃতি ব্রাহ্মণকন্যার নিকট তাহারা সময়ে সময়ে যেরূপ উপকার পাইত, অতি বড় আত্মীয়ের কাছেও অনেক সময়ে তেমন উপকার পাওয়া যাইত না। লোকের রোগে, শোকে, আপদে, বিপদে শীতলা ঠাকরুণ যেন বুক দিয়া পড়িতেন, টাকাকড়ি ধার দিয়া লোকের মান ইজ্জৎ রক্ষা করিতেন, অভাবে পড়িয়া কেহ কাঁদাকাটা করিলে নিজের ঘটীবাটি বাঁধা দিয়াও তাহার অভাবমোচনে যত্নবতী হইতেন। কেহ খাইতে পায় না, জানিতে পারিলে আঁচলে চাউল বাঁধিয়া লইয়া তাহার ঘরে ঢালিয়া দিয়া আসিতেন। বিপদের সময় তাঁহার করুণা দেখিয়া লোক তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দেবী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। কিন্তু তাহার পর কাহারও সামান্য ত্রুটিদর্শনে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি যখন নিদারুণ অভিশাপ বাণী প্রয়োগ করিতে থাকিতেন, তখন তাহাদের মনে হইত, যেন সাক্ষাৎ শীতলা দেবী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধানলে গ্রামখানাকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তবে শীতলা ঠাকরুণের এই গুণ ছিল যে, তিনি অল্পেই যেমন রাগিয়া উঠিতেন, তেমনই অল্পেই শান্ত হইতেন; একটু অনুনয়-বিনয় করিলেই তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধবহ্নি এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত;— ক্ষণপূর্ব্বে তীব্র অভিশাপবাণী প্রয়োগে যাহার সদ্যঃ ধ্বংস-কামনা করিতেন, ক্ষণপরে তাহারই কল্যাণকামনা করিয়া স্বীয় করুণ প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে থাকিতেন। কিন্তু তাহা দিলে কি হইবে, লোক তাঁহার করুণ প্রবৃত্তি অপেক্ষা ক্রোধপ্রবৃত্তিটাকেই বেশী বড় করিয়া দেখিত, এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে শুধু ভয় করিয়াই চলিত।

২

তা শীতলা ঠাকরুণের এরূপ আকস্মিক ক্রোধটা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক, তাহা বলা যায় না; জন্মাবধি সংসারের দুঃখের চাকাটা তাঁহার উপর দিয়া ক্রমাগত এমন নির্ম্মমভাবে চলিয়া গিয়াছিল যে, সেই চক্রতলে তাঁহার হৃদয়টাকে যাতার তলায় পিপড়াটির মত নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই নিষ্পিষ্ট হৃদয়ে দয়ামায়া, স্নেহমমতা প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলা সহজে স্থান পাইত না; একটুতেই তীব্র বিরক্তি, নিদারুণ ক্রোধ জাগিয়া উঠিয়া, নির্ম্মম সংসারটাকে পোড়াইয়া দিয়া তাহার উপর তীব্র প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইত।

শীতলা ঠাকরুণ জন্মিয়াই মা'কে খাইয়াছিলেন, সুতরাং শৈশবে তিনি পিতার, এমন কি, প্রতিবাসীদের পর্য্যন্ত স্নেহমমতা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, বিমাতার বিরক্তি ও অনাদরের মধ্য দিয়াই তাঁহার বাল্য জীবনটা অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর, একটি অপরিচিত হস্ত কবে যে তাঁহার সীমন্তে সিন্দূর পরাইয়া দিয়াছিল, এবং বিধাতা কবে যে সে সিন্দূর মুছিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আদৌ

স্মরণ হইত না ; জ্ঞানের বিকাশ হইতে তিনি এক দিনের জন্যও সিন্দুর কৌটা স্পর্শ করেন নাই।

তাহার পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীপতির বিবাহের সময় তিনি বাপের সঙ্গে একবারমাত্র শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন, এবং টিপ্ সই দিয়া স্বামীর জমীজায়গা ঘরভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন। ছেলেকে সংসারী করিয়া বাপ পরলোকযাত্রা করিলে শীতলা ঠাকরুণ যে ভাবে ভ্রাতার সংসারে মাথা গুঁজিয়া দিনযাপন করিতেছিলেন, কোন দাসদাসীও মনিবের সংসারে সেরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় আশ্রয় না থাকায় তাঁহাকে কিন্তু এই সকল নির্য্যাতন নীরবেই সহিয়া যাইতে হইত। নির্য্যাতন যখন চরমসীমায় উপস্থিত হইত, তখন আত্মহত্যা করিয়া এই নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শীতলা ঠাকরুণের প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইত, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র মণির মায়ায় আবদ্ধ হওয়ায় অন্তরের আগ্রহকে অন্তরেই দমন করিয়া রাখিতে হইত, মণিকে ছাড়িয়া কোন সুখের দেশে যাইতেই তাঁহার ইচ্ছা হইত না।

কিন্তু যে মণিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া শীতলা ঠাকরুণ অসহ্য নির্য্যাতনও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই মণিই এক দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল। সে শোকের তীব্রজ্বালা প্রশমিত না হইতেই ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া উভয়েই পরলোকগামী হইলেন। শীতলা ঠাকরুণ সংসার শূন্য দেখিলেন, এবং শূন্যসংসারে একা বাপের ভিটা জাগাইয়া রহিলেন। বাপের যে দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহারই আয়ে কোনরূপে দিনপাত হইতে লাগিল।

যাহাদের লইয়া সংসার, তাহারা চলিয়া গেলে সংসারটা যেন নিতান্ত ফাঁকা হইয়া আসিল, বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সেই শূন্য গৃহে শীতলা ঠাকরুণ একা টিকিতে পারিলেন না ; সারাদিন গ্রামের এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরিয়া, পাঁচজনের সুখদুঃখের তত্ত্ব লইয়া কাটাইয়া দিতেন। রাত্রিতে চোখ কান বুজিয়া কোন প্রকারে ঘরে পড়িয়া থাকিতেন। কিন্তু সেরূপে পড়িয়া থাকাও চলিল না। শীতলা ঠাকরুণের বয়স তখনও যায় নাই, রূপও যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। কাযেই গ্রামের দুই চারি জন যুবকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল, এবং তাহারা প্রায় প্রতি রাত্রিতেই দরজায় ধাক্কা দিয়া, জানালায় টোকা মারিয়া, বাড়ীতে ইটপাটকেল ফেলিয়া উৎপাত বাধাইয়া তুলিল। সে উৎপাতে ভীত ও উত্যক্ত হইয়া শীতলা ঠাকরুণ বাপের প্রজা সিধু বাগের শরণাপন্ন হইলেন, এবং সিধু বাগ মাথার শিয়রে মোটা লাঠি রাখিয়া, যে দিন হইতে শীতলা ঠাকরুণের দরজা চাপিয়া শয়ন করিল, সেই দিন হইতে সকল উৎপাতের নিবৃত্তি হইল।

ইহাতে শীতলা ঠাকরুণ যুবকদলের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু লোকনিন্দার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। মাস কয়েক পরে হঠাৎ এক দিন গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, সিধু বাগের সহিত অবৈধ সংস্রবহেতু গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রসমাজ হরেকৃষ্ণ অধিকারীর বিধবা মেয়ের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। শুনিয়া শীতলা ঠাকরুণ রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রসমাজকে গালাগালি দিলেন যে, তাহাতে ভদ্রসমাজ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহাকে অভদ্রশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইল ; এবং নানাপ্রকারে তাঁহার কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া আপনাদের ভদ্রতার পরিচয় দিতে লাগিল।

ইহাতে শীতলা ঠাকরুণের আর কিছু ক্ষতি না হইলেও তাঁহার মেজাজটা নিতান্তই রুক্ষ হইয়া উঠিল। একে ত দুঃখে কষ্টে, শোকে তাপে মাথার ঠিক ছিল না, তাহার উপর এই অহেতুক উৎপীড়নে তাঁহার মাথাটা এমনই গরম হইয়া উঠিল যে, কথায় কথায় রূঢ় ভাষা ভিন্ন আর কিছুই যেন তাঁহার মুখে আসিত না। কিছুদিন এমনই হইল যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহার সহিত কথা কহিতেও লোক ভীত হইত।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাথাটা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, এবং লোকের দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে স্বীয় দুঃখের গভীরতা স্মরণে প্রাণটা আর্দ্র হইতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু সম্ভব, তিনি লোকের দুঃখদূরীকরণে সহায়তা করিতে থাকিলেন। কিন্তু প্রকৃতির রূঢ়তাটুকু ত্যাগ করিতে পারিলেন না ; কেহ তিলমাত্র কথার অবাধ্য হইলে, সামান্যমাত্র অপরাধ করিলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্রোধাগ্নিটা একেবারেই যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, এবং তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, যাহা মুখে

আসিত, তাহাই বলিয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিতেন। ইহাতে ফল এই হইত যে, লোক তাঁহার উপকারজন্য কৃতজ্ঞতাটুকু বিস্মৃত হইয়া এই রূঢ়ভাষিণী রমণীর উপর বিরক্ত হইয়াই উঠিত, এবং পরোক্ষে তাঁহার নিন্দাবাদে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। শীতলা ঠাকরুণও এই সকল নিন্দুককে নির্ব্বংশ হইবার জন্য আদেশ দিয়া, তাহাদের ছেলেমেয়ের অসুখে বাক্স হইতে ডাক্তারখরচ বাহির করিয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না।

৩

"বেন্দা, ওরে মুখপোড়া, হতচ্ছাড়া, বলি মুখে কি তোর একেবারেই আগুন লেগেছে?"

আহারান্তে বেন্দা টোকাটি মাথায় দিয়া মাঠে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, এমন সময় ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে শীতলা ঠাকরুণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার উপর শীতলা ঠাকরুণের মুখনিঃসৃত এই শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ শ্রবণে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া শঙ্কিতস্বরে বলিল, "মা ঠাকরোণ যে! এই বিষ্টিতে ভিজে ভিজে—"

তর্জ্জনসহকারে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "বিষ্টিতে ভিজে ভিজে তোমার মাথা খেতে এসেছি। বলি, ছেলেটার আজ তিন দিন অসুখ, তা আমাকে খবর দিলে কি তোমার মুখটি খ'সে যেতো, না তোমার সাতগুষ্টীকে যমে বাঁধতো?"

বেন্দা টোকাটি এক পাশে রাখিয়া শীতলা ঠাকরুণকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "যাব যাব মনে কচ্ছি মা ঠাকরোণ, কিন্তু মাঠের কায এমনি পড়েছে যে—"

রোষবিকৃত মুখে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "কিন্তু ছেলেটার কায যখন ফর্সা হয়ে যাবে, তখন তোর মাঠের কায কোথায় থাকবে, শুনি।"

বেন্দা শঙ্কাবিবর্ণ মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। শীতলা ঠাকরুণ স্বরটাকে আরও একটু উচ্চে তুলিয়া রোষদীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোর কি করেছি বল্ তো, বেন্দা? তোর পাকাধানে মই দিয়েছি, না তোর ভাতের পাথর কেড়ে নিয়েছি রে, আমাকে ছেলের অসুখের খবর দিতে যাস্‌নি? আমি কি কখন তোদের কিছু করিনি?"

ক্রোধের সহিত খানিকটা অভিমান আসিয়া শীতলা ঠাকরুণের স্বরটাকে যেন গাঢ় করিয়া দিল। লজ্জিতভাবে বেন্দা বলিল, "তুমি কিছু করনি, মা ঠাকরোণ, এমন কথা কইতে গেলে জিভ খসে যাবে যে! বল্‌তে গেলে তোমার খেয়েই বেঁচে রয়েছি। তবে কি জান, মা ঠাকরোণ, তোমার যা নিয়েছি, তাই দিয়ে উঠতে পারি নে, আবার কোন্ মুখে তোমার কাছে গিয়ে হাত পাতবো?"

ভ্রূকুটী করিয়া শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "আমার যা নিয়েছ, তা ধর্ম্মে হয় দেবে, না হয় বামুনের পয়সা খেয়ে সুখে থাকবে। ঐ যে হীরে গয়লা, প্রায় সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা ডুবিয়ে দিলে। ম'রে গেল, তবু এক পয়সা দিলে না। তা আমার কি হ'লো তাতে? সে-ই জন্ম জন্ম আমার খেরো হয়ে থাকবে। এই যে কালও তার বৌটা এসে বল্‌লে, দিদি ঠাকরুণ, খেতে পাই নে। তা তোরা একজন্ম কি, সাতজন্ম খেতে পাবি না, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোবে না। বৌটা কেঁদে মরে; কি করি, আবার চার গণ্ডা পয়সা, আধসের চাল দিলুম।"

ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বেন্দা বলিল, "তুমি যে, মা ঠাকরোণ, আমাদের মা অন্নপুন্নো।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, দিতে পারলে অমন সবাই অন্নপূর্ণা, মা দুর্গা হয়; নয় তো নিতি বামনী। ছেলেটা কোথায়?"

"ঐ ঘরে পড়ে রয়েছে।"

শীতলা ঠাকরুণ ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, একখানা ছেঁড়া চাটাইএর উপর সাত বছরের ছেলে খেলারাম পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বিছানার কাছে সরিয়া গিয়া শীতলা ঠাকরুণ ডাকিলেন, "খেলা, ওরে খেলা!"

খেলা তখন জ্বরে বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া ছিল, কথা কহিবার শক্তি ছিল না। দিদি ঠাকরুণের সাড়া পাইয়া একবার চোখ মেলিয়া চাহিল মাত্র। শীতলা ঠাকরুণ তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়াই জ্বরের প্রাবল্য বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া বেন্দাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খেতে দিয়েছিস্ আজ?"

বেন্দা বলিল, "কি আর খেতে দেব? মাগী সাবু মিছরী আনতে ব'লেছিল। তা তেল নুনের পয়সা নেই, সাবু মিছরী আসবে কোত্থেকে? ঘরে একমুঠো ক্ষুদ ছিল, তাই ভেজে জলে ভিজিয়ে খেতে দিয়েছিল।"

তীব্র তিরস্কারের স্বরে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "বেশ করেছিস, তার সঙ্গে গোটাকতক তিলকুশ ছড়িয়ে দিতে পারলি না? একেবারে সব কাজ শেষ হয়ে যেতো।"

বেন্দা নিরুত্তরে, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। শীতলা ঠাকরুণ তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোন্ চুলোয় যাচ্ছিস্?"

বেন্দা বলিল, "মাঠে।"

মুখ খিঁচাইয়া শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "তার চাইতে যমালয়ে যাও না।"

বেন্দা মাথা চুলকাইতে লাগিল। শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "একবার চারু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় দেখি।"

বেন্দা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল। শীতলা ঠাকরুণ ডাকিলেন, "থাকি, ওলো থাকি! আ মরণ, মাগীও যমালয়ে গেল নাকি? ওলো থাকি, ও পোড়ারমুখি!"

খান দুই কাচা কাপড় কাঁধে ফেলিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে থাক উত্তর দিল, "কে গা, মা ঠাক্রোণ নাকি?"

"হাঁ, তোর যম। যমের বাড়ী গিয়েছিলি নাকি?"

দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে থাক বলিল, "না, মা ঠাকরোণ, কাপড়গুলো বড্ড ময়লা হয়েছিল, তা আধ পয়সার সাজীমাটী এনে "

মুখ খিঁচাইয়া শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "তোদের মাগী মিন্সেদের ছরাদ কত্তে গিয়েছিলি। মুখে আগুন, ছেলেটা মত্তে বসেছে, আর তুই গিয়েছিলি কাপড় কাচতে, সে যাচ্ছিল মাঠে! আর এদিকে ছেলেটা যেতে বসেছে যমের বাড়ী। শীগ্গীর কাপড় ছেড়ে ছেলেটার মাথায় বাতাস কর্ দেখি।"

তাঁহার কথায় আতঙ্কিত হইয়া থাক সত্বর কাপড় ছাড়িয়া একখানা ভাঙ্গা পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "শক্ত অসুখ, টাইফয়েড ফিবার। কি হয় বলা যায় না।"

সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে সামান্য জ্বর নয়! বেন্দা শীতলা ঠাকরুণের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা ঠাকরোণ গো, আমার খেলাকে বাঁচাও গো!"

শীতলা ঠাকরুণ তাহাকে আশ্বাস দিয়া ডাক্তারকে যথাবিধি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

৪

বেন্দার ঘর হইতে ফিরিয়া, কাপড় কাচিয়া, এই অসময়ে কাপড় কাচার জন্য পোড়া লোকের বংশের উচ্ছেদ কামনা করিতে করিতে শীতলা ঠাকরুণ বাড়ীর দরজার চাবী খুলিতেছিলেন, এমন সময় নিতে বাগদীর স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া সকাতরে জানাইল যে, তাহাদের আজ উপবাসে দিন কাটিয়াছে; ছেলেগুলা ক্ষুধায় কিল্ কিল্ করিতেছে। এখন মা ঠাকরুণ যদি দয়া করেন, তবেই ছেলেগুলার মুখে কিছু দিয়া তাহাদের ক্ষুধানল কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে পারে।

শুনিয়া শীতলা ঠাকরুণ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; কর্কশকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কেন লা, তোদের উপোস যাবে তা আমার কি? আমি তোদের দিতে যাব কেন?"

কেন যে দিতে যাইবে, তাহা নিতায়ের স্ত্রী জানে না; শুধু সে পাইবে বলিয়াই চাহিতে আসিয়াছে। সুতরাং মা ঠাকরুণের রূঢ় উত্তরে সে নীরবে সকাতরনেত্রে মা ঠাক্রুণের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শীতলা ঠাকরুণ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপোস যাবে কেন? নিতে কোন্ চুলোয় গিয়েছে?"

নিতের স্ত্রী বলিল, "সে কথা কও কেনে, মা ঠাকরুণ, আজ পাঁচ দিন হ'লো, মিন্সে বাতে ভুঁই ধরে পড়ে রয়েছে।"

রোষপ্রদীপ্ত মুখে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "তা থাকবে না? পাঁচ দিন কি, পাঁচ বচ্ছর বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সে দিন বল্লুম, ওরে নিতে, দু'খানা বাঁশ কেটে আমার লাউ গাছের মাচাটা বেঁধে দিবি? তা জবাব দিলে, ঘোষেদের মাটী কেটে গা গতরে ব্যথা হয়েছে। হোক্ গা গতরে বেদনা! তোর পক্ষাঘাত হোক্। তা আমার টাকাগুলো ফেলে দে তো। দু'বছর

হ'তে যায়, পাঁচটা টাকা নিয়েছিস্, তার সুদই হ'লো কত একটি পয়সা দেবার নাম নেই !"

নিতায়ের স্ত্রী সবিনয়ে বলিল, "দেবে, মা, দেবে। কি করবো, কুলিয়ে ওঠে না। এবার ধানকাটার মরশুমে —"

তর্জ্জনসহকারে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "রেখে দে তোর ধানকাটার মরশুম ! এমন কত ধানকাটার, মাটী-কাটার মরশুম এলো গেলো। সে কি আর দেবে, না আমিই পাব ব'লে দিয়েছি ? তা নাই দিক, বামুনের পয়সা খেয়ে সুখে থাক্। আমার বৌ ব্যাটাপুত্তুর নেই, রোজগারী নাই, ভগবান্ আছেন আমার।"

আপন মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে শীতলা ঠাকরুণ বাড়ী ঢুকিলেন এবং কাপড় ছাড়িয়া হরিনামের মালা লইয়া বসিলেন। নিতায়ের স্ত্রী তাঁহার পশ্চাৎ বাড়ী ঢুকিয়া দাবার এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। এক্ষণে শীতলা ঠাকরুণকে হরিনামে মনঃসংযোগ করিতে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি হবে, মা ঠাকরুণ ?"

মালা সমেত হাতটা সবেগে নাড়িয়া তর্জ্জনসহকারে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "কি হবে আবার ? আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি পাব কোথায় ? আমার কি পাঁচটা ব্যাটা রোজগার কচ্ছে। আজ সারা দুপুরটা ঘুরে এলুম, পৈতে তোলা হ'লো না। কাল যে কি ক'রে নুণ, তেল আস্‌বে তারই ঠিক নাই।"

মুখটা ফিরাইয়া লইয়া শীতলা ঠাকরুণ বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক পুনরায় জপে মনোনিবেশ করিলেন। নিতায়ের স্ত্রী নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল।

কয়েকবার মালা ঘুরাইয়া শীতলা ঠাকরুণ মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব'সে রইলি যে ?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নিতায়ের স্ত্রী বলিল, "ঘরে গিয়েই বা কি করবো, মা ঠাকরুণ ? ঘরে গেলেই ছেলেগুলো কিল্ কিল্ ক'রে এসে ধরবে, কি এনেছিস্ মা ?"

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল। শীতলা ঠাকরুণ কিছুক্ষণ নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা কি করবো, বাগ্দী বৌ, পয়সা-কড়ি তো হাতে কিছুই নেই। দেড়টি টাকা ছিল, বেন্দার ছেলের অসুখ, তাকে দিয়ে এলুম।"

বাগ্দী বৌ বলিল, "পয়সা নিয়েই বা এমন সময় কি করবো মা ? চাল থাকে তো দাও।"

"চাল ? আচ্ছা দেখি, কতগুলি হয়।"

মালা ছড়া দেওয়ালের পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিয়া শীতলা ঠাকরুণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেরখানেক চাউল আনিয়া বাগ্দী বৌয়ের আঁচলে ঢালিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আর নেই, বাগ্দী বৌ ; থাক্‌লে তোকে দিতাম। এই এক সের চালেই বা তোর হবে কি ?"

হর্ষগদগদকণ্ঠে বাগ্দী বৌ বলিল, "ঢের হবে, মা, ঢের হবে। ছেলেগুলোর মুখে তো দিই, নিজেরা না হয় ফেন খেয়ে থাকবো।"

দুঃখিতভাবে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "তাই বা হয় করিস্। কিন্তু আর সেরখানেক দিতে পার্‌লে হ'তো। ছিল চাল, দুপুরবেলা মুখুয্যে গিন্নী এসে যে তিন সের চাল ধার নিয়ে গেল। মাগী প্রায়ই চাল ধার নিয়ে যায়, কিন্তু দিয়ে যায় না কখনও। আমিও চাই না, বলি, মরুক্ গে, বামুনে তো খাচ্ছে।"

বাগ্দী বৌ বলিল, "কেনে গা, ওনাদের অভাব কি ?"

সহাস্যমুখে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "ওলো যার যত থাকে, তার তত অভাব। আমার কিছু নাই, অভাবও নাই। তা বলি, ভগবান্, আমার কিছু থাক্ বা নাই থাক্, পরের যেন নিতে না হয় ; পরের মুখে এক মুঠো দিতে দিতেই যেন ম'রতে পারি।"

প্রশংসাগদগদকণ্ঠে বাগ্দী বৌ বলিল, "তা তুমি খুব দিচ্ছো, মা ! গরীবকে তুমি যেমন দাও—"

তাহার প্রশংসায় বাধা দিয়া শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাগ্দী বৌ, আর দেরী করিস্ নে। এর পর তো গিয়ে রেঁধে দিলে তবে ছেলেগুলো খেতে পাবে।"

"হ্যাঁ মা, যাই" বলিয়া মা ঠাকরুণকে প্রণাম করিয়া বাগ্দী বৌ প্রস্থান করিল।

পথে যাইতে যাইতে মুখুয্যে গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মুখুয্যে গিন্নী কাপড় কাচিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন ; বাগ্দী বৌকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলি বাগ্দী বৌ ?"

বাগ্দী বৌ বলিল, "এই গিয়েছিলুম মা, শেতলা ঠাকরুণের কাছে ; বলি, যদি গণ্ডা কতক পয়সা ধার পাই। তা

মা, যে মুখের ছিরি! সাত জন্মে দোর মাড়াতে ইচ্ছে করে না।”

মুখুয্যে গিন্নী ঘাড় নাড়িয়া তাহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, “ও কথা আর বলিস্ না, বাগ্দী বৌ, মাগী যেন বাগ্দীর মেয়ে। ওর দোরেও মানুষে যায়! আজ চাল বাড়ন্ত, তা বলি দেখি, যদি সের দুই চাল ধার পাওয়া যায়। তা গিয়ে মনে করি, কি অকুমারিই করেছি। ধার নেব, ধার দেব, তার এত মুখ কেন গা?”

বাগ্দী বৌ ঘৃণায় মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “কে জানে, মা, ভদ্দর লোকের মেয়ের মুখের ছিরি অমন কেন? এই তো তোমরাও ভদ্দর লোকের মেয়ে; তা তোমাদের কথা শুনলে পরাণ ঠাণ্ডা হয়।”

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখুয্যে গিন্নী বলিলেন, “আরে ও আবার ভদ্দর লোকের মেয়ে। বলে, কত কীর্ত্তিই হ’য়ে গেল, কত ধ্বজাই ওড়ালে। যেমনকে তেমন; যেমন মুখের ছিরি, হয়েও আছেন তেমনি একঘরে। ম’লে শেয়াল কুকুরে টেনে খাবে, একটু আগুন পর্য্যন্ত পাবে না।”

৫

মুখুয্যে গিন্নী যখন বাগ্দী বৌয়ের সম্মুখে দুর্ম্মুখা শীতলা ঠাকরুণের পরিণাম ব্যক্ত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছিলেন, শীতলা ঠাকরুণ তখন আপনার ঘরের দাবায় বসিয়া হরিনামের মালা হাতে ভাবিতেছিলেন, আঃ, এই ছোটলোকগুলা কি জ্বালাতনই করে! আজ ব্যারাম হয়েছে, ডাক্তারখরচ দাও, আজ খেতে পাই না চাল দাও, আজ কাপড় পরতে পাই না, টাকা দাও। মুখে আগুন, শুধু কাঁদুনি, শুধু দাও দাও। যেন কত জুগিয়ে রেখেছে।

সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিয়া লইয়া শীতলা ঠাকরুণ শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু সকালে উঠিতেই মনে হইল, বেন্দার ছেলেটা কেমন আছে কে জানে; একবার দেখিয়া আসিলে হয়। দূর হউক, আবার সেই পরের ভাবনা। এ ভাবনাকে দূর করিবই করিব।

গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া শীতলা ঠাকরুণ সকাল সকাল স্নান করিতে চলিলেন। বেলায় স্নান করিলে পূজা আহ্নিকটা তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতে হয়। আজ বেশ মনোযোগ দিয়া ভাল করিয়া পূজা আহ্নিক করিবেন; তাহার পর এক মুঠা রাঁধিয়া খাইয়া পৈতা তুলিতে বসিবেন। আজ দুই দিন পৈতা তোলা হয় নাই, হাতে খুচরা পয়সাও একটি নাই। আজ দু’পুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পৈতা তুলিতেই হইবে।

স্নান করিতে যাইতে যাইতে মনে হইল, এই সময় একবার ছেলেটাকে দেখিয়া আসিলে হয়। আজ কি খাইবে, ডাক্তার আসিল কি না, জ্বর কমিল না বাড়িল, জানা দরকার। বেন্দা ত সেই মানুষ; সে হয় ত সকালে উঠিয়া কাযে চলিয়া গিয়াছে, আর থাকি নিজের কায লইয়া রহিয়াছে। নিজে একবার গিয়া সকল কাযের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলে ভাল হয়।

ভাল হয়, না নিতি বাম্‌নীর শ্রাদ্ধ পিণ্ডী হয়! কোথায় সকাল সকাল গিয়া পূজায় বসিব, না ডোমের ছেলেটাকে দেখিতে ছুটিয়াছি! ইহাকেই বলে, ‘স্বভাব যায় না ম’লে।’ এ পোড়া স্বভাবকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

স্বভাবের উপর রাগে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া শীতলা ঠাকরুণ দ্রুতপদে স্নানের ঘাটে গিয়া নামিলেন।

সে দিন শীতলা ঠাকরুণ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া পূজা করিলেন। তবে ইহার মধ্যে কতটা সময় পূজায় এবং কতটা সময় বেন্দার ছেলের চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। পূজা শেষে ঠাকুরের নিকট বেন্দার ছেলের আরোগ্য কামনা করিতে করিতে যখন তিনি উঠিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চোখে মুখে সঙ্কল্পসিদ্ধিজনিত হর্ষের চিহ্ন বিদ্যমান।

৬

উনান জ্বালিয়া শীতলা ঠাকরুণ সবেমাত্র হাঁড়ীটি উনানে চাপাইয়াছেন, এমন সময় বৃন্দাবনের জ্ঞাতি-খুড়া গোলোক আসিয়া ডাকিল, “দিদি ঠাকরোণ!”

“কে, গোলোক?” বলিয়া শীতলা ঠাকরুণ রন্ধনশালার বাহিরে আসিলেন। গোলোক দূর হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “আশীর্ব্বাদ কর, দিদি ঠাকরোণ! হাঁ, বামুনের মেয়ে বটে তুমি। মুখ দিয়ে যা বেরোবে, তা একেবারে বেদবাক্যি!”

শীতলা ঠাকরুণ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে গোলোকের হর্ষপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিলেন। গোলোক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া

বলিল, "ঢের ঢের বামুন দেখেছি, বামুনের মেয়েও দেখেছি, কিন্তু এমন জলজ্যান্ত বামুনের মেয়ে কক্ষনো দেখি নি। মুখে যা ব'লে এলে, তাই হুবহু ফ'লে গেল।"

শীতলা ঠাকরুণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ফ'লে গেল গোলোক?"

গোলোক বলিল, "সেই যে মাসখানেক আগে টাকার তাগাদায় গিয়ে তুমি বেন্দাকে শাপ দিয়ে এলে, আমি যদি বামুনের মেয়ে হই, তবে তুই ব্যাটার মাথা খাবি, খাবি, খাবি।"

শীতলা ঠাকরুণ শিহরিয়া উঠিলেন; রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটা কেমন আছে?"

মুখ মচ্‌কাইয়া গোলোক বলিল, "আর কেমন আছে! আজ তো চারু ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল। ব'লে গেল, হাতী আড় কর্‌লেও বাঁচবে না।"

শীতলা ঠাকরুণের বিস্ময়স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "বাঁচবে না?"

গোলোক বলিল, "বামুনের মেয়ের বেদবাক্যি, এও কি মিছে হয়? ঠিক হয়েছে, যেমন কম্ম, তেমন ফল। বেন্দা কি সহজ লোক গা, আমি খুড়ো, আমাকে যা মুখে আসে, তাই বলে। সে দিন লাঠী নিয়ে মারেই গেল। তা থাক্, দিবা-রাত্তিরের কত্তা তো এক জন আছে।"

শীতলা ঠাকরুণের মুখে কথা নাই। সর্ব্বনাশ! তবে কি তাঁহারই শাপে বেন্দার ছেলেটা মরিতে বসিয়াছে? এমন শাপ—এমন গালি ত তিনি অনেককেই দিয়া থাকেন, কাহারও ত কিছুই হয় না? তবে কি বেন্দার ভাগ্যেই শাপটা ফলিয়া গেল! হায় ভগবান্, এ কি করিলে? শীতলা ঠাকরুণ স্তব্ধ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোলোক তাঁহার মনোভাব কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না; সুতরাং সে প্রশংসার দ্বারা দিদি ঠাকরুণের মনটা বেশ ভিজিয়া গিয়াছে মনে করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আমি এসেছি একটু দরকারে। আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দিতে হবে, দিদিঠাকরোণ। আমাকে তুমি বেন্দার মত পাও নি, চেঙ্গারি বেচে এসেই তোমার টাকা মায় সুদ ফেলে দেব।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "আজ আমার হাতে টাকা নেই।"

গোলোক বলিল, "আজ চাই না, দু'চার দিন পরে হ'লেও চল্‌বে।"

রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে করিতে শীতলা ঠাকরুণ বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

আশ্বাস পাইয়া গোলোক প্রস্থান করিল। শীতলা ঠাকরুণ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া হাঁড়ীটা উনান হইতে নামাইয়া রাখিলেন। তার পর ক্ষিপ্রহস্তে দরজায় চাবী দিয়া বেন্দার বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া বেন্দা তাঁহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মাঠাকরোণ গো, আমার খেলার উপর এমন বাজ কেন হানলে গো? আমার খেলা যে আর বাঁচবে না গো!"

শীতলা ঠাকরুণ তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "আ মরণ, কে বলে তোর খেলা বাঁচবে না? বাঁচবেই বাঁচবে, বাঁচাতেই হবে ওকে। আমি ঘটী বাটি বেচবো, ঘর ভিটে বেচবো, ছুটে গিয়ে হরিশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।"

বেন্দা উঠিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। শীতলা ঠাকরুণ গিয়া খেলার মাথার শিয়রে বসিলেন। এ কি অবস্থা হইয়াছে? ও ভগবান, আমার মণিরও চোখ মুখের ভাব যে এমনই হইয়া গিয়াছিল! শীতলা ঠাকরুণ ডাকিলেন, "খেলা, খেলারাম!"

খেলা যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ক্ষীণ অস্পষ্টকণ্ঠে বলিল, "আগুন গো, আগুন! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল!"

ঊর্দ্ধে সজল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আকুলকণ্ঠে শীতলা ঠাকরুণ ডাকিলেন, "বাঁচাও ভগবান্, বাঁচাও! এ কলঙ্ক হ'তে আমায় উদ্ধার কর।"

ভগবান্ কিন্তু সে প্রার্থনা শুনিলেন না; সাত দিন জীবন ও মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া খেলারাম অবসন্নভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল। শাক ও বেন্দার আর্ত্ত চীৎকারে ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। শীতলা ঠাকরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইলেন।

* * * *

বাগ্দী বৌ সহানুভূতির অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে বলিল, "আহা, কি ভুমুখো বাম্‌নী গা, যে শাপ দিলে, তাই ফ'লে গেল।"

পাকি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঐ বামনীই আমার বাছাকে খেয়ে ফেল্‌লে গা, খেয়ে ফেল্‌লে!"

গোলোকের স্ত্রী অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বলিল, "ও বামনী নয় গো, রাক্ষসী—রাক্ষসী! সাক্ষাৎ ডাকিনী!"

শীতলা ঠাকরুণ তখন নিজের ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুধারায় কক্ষতল সিক্ত করিতে করিতে মনে মনে বলিতেছিলেন, "নণির মরণ আছে, খেলার মরণ আছে, এ পোড়ারমুখীর কি মরণ নাই, ভগবান্!"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্বরাজ্যদল
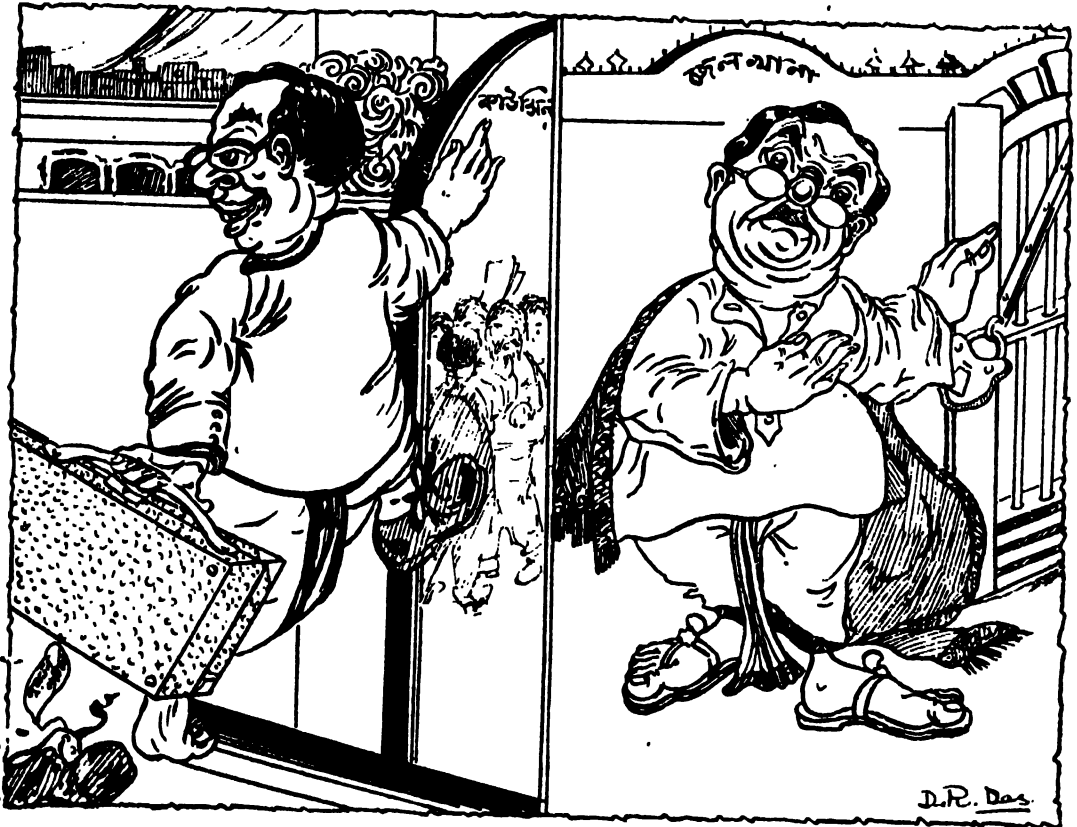
যেমন করিয়া হউক, কাউন্সিলে যাইতেই হইবে। আমি কাউন্সিলে চলিলাম।

কাউন্সিলে যাওয়া অপেক্ষা জেলে যাওয়া ভাল আমি জেলেই চলিলাম।

রোগশয্যার খেয়াল

(পূজার তত্ত্ব)

"Expect no healthy conclusions from me this month, reader ; I can offer you only sick men's dreams"—LAMB : '*The Convalescent*' in the *Last Essays of Elia.*

জন্মখণ্ড

বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া যখনই কাশীবাসের অবকাশ পাইয়াছি—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশে এই অধমের সে সৌভাগ্যলাভ বহুবার হইয়াছে—তখনই ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার কৃপায় স্বাস্থ্যের উন্নতি, মনের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এমন কি, কৃতবিদ্য কৃতী সদ্যোবিবাহিত যুবক জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুজনিত নিদারুণ শোকে এই 'আনন্দকাননে' আসিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু এবার প্রায় বৎসরাবধি রোগভোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ও (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সদ্যঃ যশোভাগী) অষ্টাদশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুজনিত মহাশোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া, কাশী ও কাশীশ্বরের শরণ লইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে উৎকট অশান্তি ভোগ করিয়াছি; এবং তাহাও অল্পদিনের জন্য নহে—দীর্ঘ চাতুর্ম্মাস্য রোগভোগ। তবে লাভের মধ্যে এইটুকু যে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিলেও রোগযন্ত্রণার মধ্যে কল্পনার লীলার বিরাম ছিল না; বরং একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা বা উন্মাদনাবশে বন্যাস্রোতের ন্যায় নব নব ভাবোচ্ছ্বাস মনসমুদ্রে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিত। (কবির ভাষায় বলিতে গেলে, 'শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস, কলাপের মত করেছে বিকাশ।') সামলানই দায় হইত। সেই সব নব নব ভাবের অধিকাংশই তখনই তখনই সংগ্রহের অভাবে উপিয়া গিয়াছে, মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; নরলোকে সেগুলির প্রচার হইল না। (অবশ্য দেবলোকে প্রচার হইবার আটক নাই, যেহেতু, 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।') সবনির্দ্ধারিত নিবণ-কর লইয়া একটা নাতিদীর্ঘ বিদ্রূপাত্মক (satirical) প্রবন্ধ, হোমিওপ্যাথি লইয়া তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ-নাটিকা (লেখকের প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয়, তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতেই নাটিকার উৎপত্তি), এক টুকরা গবেষণা (কি বিষয় অবলম্বনে, তাহা পর্য্যন্ত বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছি)—এইগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। অথচ এইগুলি লেখকের প্রকাশিত রচনাবলি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। (Methinks I hear the Cynic say) বিশ্বনিন্দুক অবশ্য টিপ্পনী কাটিবেন, 'যে মাছটা পালায়, সেইটাই বড় হয়।' যাহা হউক, দুই একটি প্রবন্ধ ও কয়েকটি 'খেয়াল' স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া উদ্ধার (rescue) করিতে পারিয়াছি; একটু সুস্থ হইয়াই খসড়া-আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; অদ্য পূজার বাজারে "খেয়াল" কয়টি 'বসুমতী'র পাঠকবর্গকে নবরত্ন-উপঢৌকন (!) দিতেছি। বোধ হয়, সব কয়টিতেই রোগশয্যার গন্ধ পাওয়া যাইবে।

"জানি না এর কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা নয়।
জানি না কে কোন্‌টা রাখে, কোন্‌টা লয়॥"

[ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি কোলরিজ (Coleridge) স্বপ্নে কবিতা রচনা করিয়া তাহা জাগ্রদবস্থায় অসম্পূর্ণ আকারে ('Kubla Khan') লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; স্কটল্যাণ্ডের খ্যাতনামা আখ্যায়িকাকার ষ্টীভেন্‌সন্ (Stevenson) তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার ('The strange case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde') মূল কথাটি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন (স্বপ্নাস্য উপন্যাসের চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার!) বাঙ্গালা সাহিত্যেও দেখা যায়, একাধিক কবি স্বপ্নে দেবদেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়া কাব্য লিখিয়াছেন। আর অভাগা আমার ভাগ্যে জ্বরের ঘোরে ফলিয়াছে এই খেয়ালগুলি। 'মৌক্তিকং ন গজে গজে।'] ইতি জন্মখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

১। কাশীতে নববর্ষা

[জ্যৈষ্ঠের, জ্বরের, ফোড়ার, যথা (?) পরিমাণ কুইনিনের, এবং পশ্চিম-মুখো ঘরের—এই পাঁচ রকমের গরমে পঞ্চতপাঃ হইয়া যখন আমি 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতে করিতে চাতকের মত শুষ্ককণ্ঠে 'স্ফটিকজলে'র যাচক, তখন সস্ত্রীক 'অলকা'-সম্পাদক দেখা করিতে আসিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'এখানে বর্ষা আরম্ভ হয় কোন্ সময়ে, বলিতে পারেন?' তিনি বলিলেন, '১লা আষাঢ়।' একেবারে আস্ত 'মেঘদূত!' আর তাঁহার অবস্থা কালিদাসের যক্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়। (যাক্ সে দুঃখের কথা।) তাঁহার এই ব্রহ্মবাক্য যথাসময়ে ফলিয়াছিল।] কাশীতে ঠিক 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' 'বর্ষা এসেছে তা'র মেঘময় বেণী।' তবে এ অঞ্চলের মহিলাকুলের চুলের গোছ বঙ্গাঙ্গনাগণের কেশকলাপের মত ঘন ও দীর্ঘ হয় না, তাই হেথায় বর্ষা-বোমার বেণী হইতে জল ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিতেছে না, ঝির-ঝির করিয়া পড়িতেছে। (১) মুষলধারে অর্থাৎ ঝম্-ঝম্ করিয়া হইতেছে না, সূচিধারে অর্থাৎ ফিস্ ফিস্ করিয়া হইতেছে। যা হোক, ইহাতেই এবারকার জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর বসুমতী ঠাণ্ডা হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দুই ডিগ্রী নামিয়া গেল। এই জ্বরতপ্ত কুইনিন-জর্জ্জর রোগীর দগ্ধপ্রাণে আষাঢ়ের আসারধারার আসার সঙ্গে সঙ্গে আশার সঞ্চার হইল। 'কাশী-তলবাহিনী' গঙ্গা কাশীর পাষাণময়ী পুরী শীতল করিতে পারেন নাই; দু'ফোঁটা আকাশের জল তাহা করিল। এ যে স্বর্গের ধারা, আর সুরধুনী স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যের মাটীতে পড়িয়াই মাটী হইয়াছেন। (সত্যই তো তিনি আমাদের মা-টি, 'মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।')

(১) শেষ পর্যন্ত না দেখিয়াই কথাটা লিখিয়া ফেলিয়াছি ও পাঞ্জাবিনীদের মাথার চুল লইয়া খোঁটা দিয়াছি। পিছে মানুষ হো[illegible] দিয়া শ্রাবণের বৃষ্টিবারিধারার কি প্রবল তোড়! দার্জিলিং চেরাপুঞ্জি কোথায় লাগে? ইহাকে মুষলধারে বলিলেও কম করিয়া বলা হয়; একেবারে উদ্দণ্ডধারে, অথবা গুরুচাণ্ডালী ভাষায়, [illegible]ধারে। ইংরাজীতে বলিতে হইলে 'It rains cats and dogs' নহে। 'It rains bulls and buffaloes'! আর মা-গঙ্গাও খুব শোধ তুলিলেন ফলে সদর রাস্তা গলিরাস্তা পাথার—'ইন্দ্রদমন', 'পুষ্কর', 'কুরুক্ষেত্র', কিছুই এবার বাকী রহিল না। (এগুলি কাশীর গঙ্গার জলস্তম্ভ'র মাপান, ঠিক কি শাস্ত্রোক্ত বস্তু, জানি না।)

২। মা-সরস্বতীর শাপ?

জ্ঞানোদয় হইতে একনিষ্ঠ হইয়া মা-সরস্বতীর সাধনা করিয়াছি, অন্য দেবদেবীর ধার ধারিতাম না, শুধু ঠাকুর-দেখা হিসাবে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়াছি। মা-সরস্বতীও একনিষ্ঠ সাধনায় প্রসন্না হইয়া এই অধমকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, (৴০) অধ্যাপনা-প্রিয়তা, (৶০) রচনা-শক্তি। ইহা হইতেই আমার যা' কিছু ধনমান যশোভাগ্য। (বেশ একটু অহমিকা প্রকাশ করিলাম; কিন্তু ভবের হাট হইতে দোকানপাট তুলিতে বসিয়াছি, এখন ইহার জন্য বোধ হয় ক্ষমার্হ বিবেচিত হইব।) পুনঃ পুনঃ উপযুক্ত পুত্রের অকাল-বিয়োগজনিত শোকে পঠন-পাঠনে, রচনায় ও ছাত্র-মণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতায় বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, আজীবন-সঞ্চিত রাজ-ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে, বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 'চন্দ্রশেখরে'র মত অগ্নিতে আহুতি দিতে ঝোঁক হইত। ইহাতেই তো মা-সরস্বতী রুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার উপর আবার মায়ের পার্থিব পীঠস্থান (কাগজ) পীড়াকালে শুধু দু'পা দিয়া মাড়াইয়াই ক্ষান্ত হই নাই, তদপেক্ষাও কদর্য্য কার্য্যে লাগাইয়াছি। (২) তাই মা অধিকতর কুপিত হইয়া দক্ষিণ করতলে (Carbuncle) কার্ব্বঙ্কলের উদ্ভব করিয়া দিয়া হাতটি আড়ষ্ট করিলেন, 'বাহু-প্রতিষ্টম্ভেন' 'বিবৃদ্ধমন্যু' প্রকাশ করিলেন, ফলে রচনাশক্তি রহিত হইল। মায়ের শাপ হইতে কোন্ দেবতা রক্ষা করিতে পারেন?

এই মন্তব্য খসড়া-অবস্থায় দেখিয়া আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, "এটা আপনার বিষম ভুল; 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়।' ছেলে বেসামাল হইয়া যদি মায়ের কোল নোংরা করিয়া দেয়, তাহাতে কি মা রাগ করেন? রাগ করিয়া তিনি কি শাপ-মন্যি দিতে পারেন? আর মায়ের শাপ তো ছেলের লাগে না।"

এখন দেখিতেছি, আত্মীয়বর আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্তোকবাক্য প্রয়োগ করেন নাই, কথাগুলি খাঁটি

(২) একটু বীভৎস-রসের সঞ্চার করিলাম। রোগের ক্ষেত্রে কাধাটা অপরিহার্য্য, সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেও একটু গড়াইয়া পড়িলে উপায় কি?
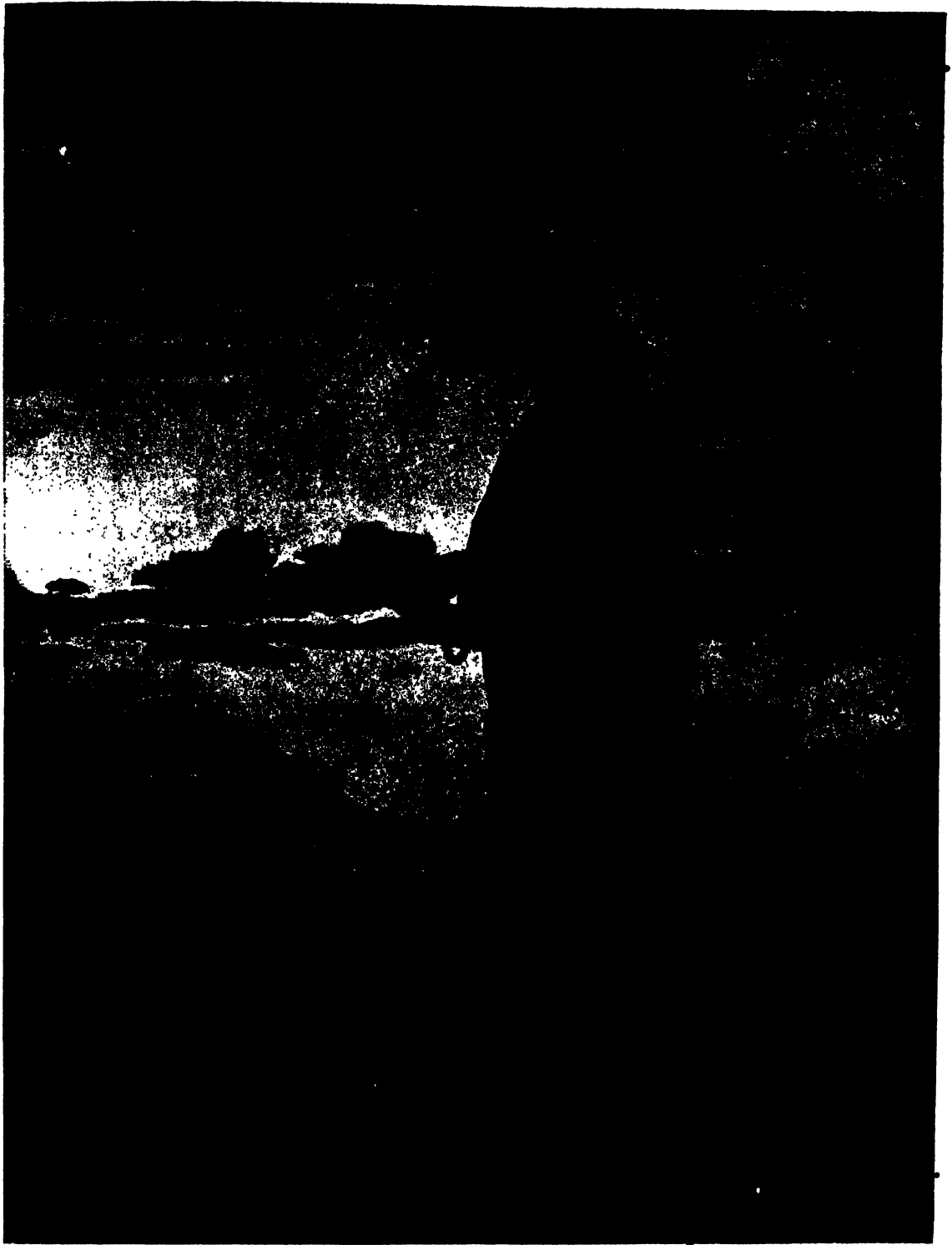
সত্য। কার্ব্বঙ্কল্ সারিলে প্রথমেই লেখন-কুশলতা ফিরাইয়া পাইয়াছি; তখনও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখে অন্নগ্রাস তুলিতে পারি না, অথচ লেখনী-চালনায় হস্ত বেশ তৎপর হইয়াছিল। ধন্য মায়ের অবিকারী স্নেহ, ধন্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপা!

পুনশ্চ।—কার্ব্বঙ্কলের ক্ষত ও বেদনা সারিয়াছে, কিন্তু হাত আড়ষ্টই আছে, তা' আবার ডা'ন হাত। সুতরাং পদে পদে পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি। এমন কি, 'দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারে'র জন্যও (মুখে অন্নের গ্রাস তুলিবার জন্য, ভাত মাখিবার জন্য) পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (অবশ্য সাহায্যকারিণী ঠিক 'পর' নহেন।) জ্যোতিষীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এই যে বৎসরাধিককাল রোগে ভুগিতেছি, ইহা গ্রহনিগ্রহ। আচ্ছা, এই পরাধীনতা কোন্ গ্রহের প্রকোপে? তিনিই বুঝি ভারতেরও ভাগ্য-বিধাতা?

পুনশ্চ পুনশ্চ।—জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ঘা, ফোড়া ইত্যাদি 'মঙ্গলে'র প্রকোপে ঘটে। আশ্চর্য্য বটে, 'মঙ্গল' অমঙ্গল ঘটান! যাহার যেমন অদৃষ্ট! আজন্ম দুঃখিনী সীতাদেবীর ভাগ্যে 'অশোকের বন' 'শোকের ভবন' হইয়াছিল। আর বাল্যে মাতৃহারা, যৌবনকাল হইতে এই অকাল-বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পুত্রহারা, হতভাগ্য আমার অদৃষ্টে 'মঙ্গল' অমঙ্গল বিধান করিতেছেন, 'আনন্দ-কাননে' আসিয়াও নিরানন্দ নিবারণ হইতেছে না, প্রত্যুত কায়িক ও মানসিক যন্ত্রণা 'দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা' হইতেছে। কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—'বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।' 'যদবিধের্মনসি স্থিতম্' বলিয়াই বুক বাঁধিতে হইবে।

৩। ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ

[দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যস্নানের দিন ক্ষৌর-কার্য্যের সময় মনে এই খেয়ালটির উদয় হইয়াছিল।]

পহেলা দশা। প্রথম প্রথম যৌবনারম্ভে যখন ঠোঁটের উপর অল্প অল্প গোঁফ ওঠে, যেন ইট-পাথরের আশে-পাশে ভিজা জমিতে দূর্ব্বাঘাস গজায়—'বদনমণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষৎ গোঁফের রেখা'—তখন সেই গোঁফের তোয়াজ দেখে কে? 'সাহেবদের' গৃহপ্রাঙ্গণস্থ (Lawn) 'লনে' 'সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি' নবদূর্ব্বাদল জন্মাইবার জন্য মালীর যত্নও ইহার কাছে হারি মানে। 'দণ্ডে শতবার' আয়না ধরিয়া দেখা, সেই কোমল, মসৃণ, রোমরাজির (soft down of youth) উপর সাদরে আঙ্গুল বুলান (যেন নবীনা জননী ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে সস্নেহে হাত বুলাইয়া অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন); আর কিরূপে নিবিড়কৃষ্ণ 'ভ্রমরপাতির দেখা' অগোণে মিলিবে, 'সেই ভাবনা রাত্রিদিনে।' অশৌচান্তে কামাইতে হইলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়, বলিতে চাহে—'শির দেঙ্গে, মোচ নেহি দেঙ্গে।' বার বার কামাইলে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, ঘন (কিন্তু কর্কশ!) হয় বলিয়া আশ্বাস দিলেও মন মানে না, দু'দিনেরও বিরহ সহ্য হয় না (নৈষধ পুরুষের প্রাণেশ্বরীকে প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে প্রেরণের ন্যায়।) (৩)

দোসরা দশা। পরে যৌবন ভাটাইয়া আসিলে নির্ব্বেদের সঞ্চার আরম্ভ হয়, মুসলমান-খৃষ্টানের চিহ্ন জবর-জঙ্গ দাড়ী কামাইয়া ফেলা হয়। (দাড়ী চশমা ব্রাহ্মের লক্ষণ, এরূপ একটা ধারণাও এক সময়ে ছিল।) দাড়ী ফেলায় চেহারাটা বেশ ছিমছাম, ভদ্র, সভ্য, দেখায়। (৪)

(৩) গোঁফ-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দাড়ী সম্বন্ধেও কতকটা সেই কথা বলা চলে। অবশ্য আমাদের যৌবনকালের কথা বলিতেছি, হালের ছোকরা-বাবুদের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদের ধুতী, চূড়ীদার লপেটা, মাথার চুলে সিঁথি কাটা, সবই মেয়েলি ঢংএ (effeminate); তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া স্বহস্তে 'নিরাপদ' ক্ষুর (safety razor) চালাইয়া তাঁহারা মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমূলে কেশকুল ধ্বংস করিয়া (Kruppএর ক্ষুরে crop up করিয়া), থাঁদার দলের সখী সাজেন, (কি ভাগ্যে ভ্রূ কামান না!) কেবল মাথার সামনে এক থকা ঝাঁকড়া চুল রাখেন, (ইংরেজী Time's forelockএর নজিরে?) ইহাই হইল হালফ্যাশান। (ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মস্তকের মধ্যস্থলে চূলশিখা রাখারই যত অপরাধ!) সম্মুখ দেখিলে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশের জীববিশেষের সহিত সাদৃশ্যই চোখে ঠেকে। (তবে প্রৌঢ়দের, বিশেষতঃ 'চতুর্থে' চতুর্থপক্ষাশ্রয়ীদের বলি, এরূপ চাঁচিয়া পুঁছিয়া কামানর একটা মস্ত সুবিধা—৭৪ বৎসরেও ১৪ বৎসরের অধাতশ্মশ্রু বালক সাজা যায়!)

(৪) সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে (Every rule has its exception); কাহারও কাহারও মুখে দাড়ী দিব্য মানায়। উহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দাড়ীর তরফে ওকালতী করিবার একটা প্রবল ঝোঁক হইতেছে, কিন্তু ঝোঁকটা কষ্টেসৃষ্টে দমন করিলাম। কেন না, তাহাতে দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ীর ভারে ফুটনোট বেজায় বাড়িয়া যাইবে; ছোট প্যারার পিছনে প্রকাণ্ড পাদটীকা নিতান্তই বেমানান হইবে—সেই আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত (খলীফার ভ্রাতা) দেড় ফুট খাড়াই লোকটির ত্রিশ ফুট লম্বা দাড়ীর মতই দেখাইবে। আর পাদটীকায় সম্মানাস্পদ ব্যক্তিদিগকে স্থান দেওয়া শিষ্টাচারসম্মত নহে। অতএব দোসরা দশার নজিরে দাড়ী বর্জ্জন করিলাম। তবে যাহারা সম্প্রদায়

তেসরা দশা। প্রৌঢ় বয়সে, পাকা প্রবীণ হইলে, গোঁফের মায়াও কাটিয়া যায়, ক্রমে নির্ব্বেদ ঘনীভূত হয়। (৫) তখন গোঁফ ফেলার ধুম পড়ে। (শত্রুপক্ষ বলেন, নির্ব্বেদ-ফির্ব্বেদ ও সব বাজে কথা। মাথার চুলের আগে গোঁফ পাকিতে সুরু করে, গোঁফ গোয়েন্দাগিরি করিয়া বয়স ধরাইয়া দেয়, তাই গৃহশত্রু বিভীষণ গোঁফের ধ্বংস।)

চৌঠা দশা। দাড়ী গেল, গোঁফ গেল, বাকী রহিল মাথার চুল। এ দিকে বার্দ্ধক্যও আসিল; এখন 'চতুর্থে কিং করিষ্যতি', দেখা যাউক। কিন্তু এ যে বুনো, আর নির্ব্বেদের দাঁত ফুটে না, সে বড় কঠিন ঠাঁই। জরায় জরায় জরিয়া শিরোদেশ বিরলকেশ হইয়া পড়ে, মাথাময় টাকে টাকে, তথাপি সেই পাতলা দু'চার গাছ চুলের মায়া যায় না। সেই কয়গাছিই যেন (thread of life) গ্রীক-পুরাণোক্ত দেবীর হস্তধৃত জীবনসূত্র, অথবা য়িহুদি-বীর (Samson) স্যামসনের ঝাঁকড়া চুলের মত পুরুষত্বের আধার। হায় রে মায়া! তখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বা বৌদ্ধশ্রমণের মত মস্তক মুণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ফল কথা, বাঙ্গালী হিন্দুর নির্ব্বেদ মুখেই (দাড়ী-গোঁফে) থাকিয়া যায়, মাথায় কখনও উঠে না, শিরোধার্য্য হয় না। এমন কি, কেহ কেহ মহাগুরুনিপাতেও মস্তক মুণ্ডন না করিয়া পুরোহিতকে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ধরিয়া দিয়া প্রতিনিধিতে সারেন। (নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।) ইঁহারা বোধ হয়, ভয় করেন, মাথা মুড়াইলে লোকে ঘোল ঢালিয়া দিবে বা গোচোর ঠাওরাইবে!

৪। দশ আনা ছয় আনা

[এ কালের ছোকরাবাবুদের চুলছাঁটার কথা বলিতেছি না, শাহান মুড়া তো আগেভাগেই মারিয়া রাখিয়াছি —(৫) ফুটনোট দেখুন। জমিদারীর সরিকানা স্বত্বের কথাও বলিতেছি না। নিছক দেহতত্ত্ব, রোগভোগের কথা লইয়াই আছি।]

এক দিন জনৈক দূরপ্রবাসী বন্ধুর পত্র পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন, 'আপনার পত্র পড়িয়া বুঝিতেছি, দশ আনা রকম সারিয়াছেন।' বন্ধুটি দেখিলাম, দূরবাসী হইয়া দূরদর্শীও সাজিতে চাহেন, নতুবা রোগীকে না দেখিয়া, শুধু রোকায় সংবাদ জানিয়া, অত দূর হইতে কিরূপে—কোন্ শুভঙ্করী প্রণালীতে—আমার আরোগ্য-কথা আয়ত্ত করিলেন এবং এরূপ শব্দভেদী বাণ ঝাড়িলেন? যাহা হউক, বন্ধুবর শেষটা অদূরদর্শী বা অপরিণামদর্শীই প্রমাণিত হইলেন। কেন না, যখন তাঁহার পত্র পাইলাম, তখন বার বার তিনবার পড়িয়াছি। আমি উত্তরে লিখিলাম, "আপনার অঙ্কটা হয় তো মূলে ঠিক কথা হইয়াছে, কিন্তু জানেন তো, দশ আনা (৷৷৶০) ছয় আনা (৷৶০) হইতে বেশীক্ষণ লাগে না—একটা চোখের ওয়াস্তা!" এক জন তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীর সহিত সে দিন বহুকাল পরে দেখা হওয়াতে তিনি খাঁ করিয়া বলিয়া বসিলেন, 'আপনার চেহারা দেখিয়া বেশ সারিয়া উঠিতেছেন বুঝা যায়।' আর যাবে কোথা? পরদিনই ঘাড়মুড় ভাঙ্গিয়া ডেঙ্গুর আক্রমণ। সেই যে চোখ লাগিল, তাহাতেই বিপত্তি ঘটিল। এক চোখের ওয়াস্তা নহে কি?

শুভানুধ্যায়ীটি একচোখোও বটে; কেন না, তিনি সারার লক্ষণটুকুই বড় করিয়া দেখিলেন, আর দীর্ঘকাল রোগভোগে যে দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, দেখিলে চেনা যায় না, এত রোগা হইয়া গিয়াছি, সে দিকে তাঁহার নজর পড়িল না। লোকটি বোধ হয় optimist, সব জিনিসের ভাল দিক্‌টাই দেখেন। অথবা খোসখবর দিয়া আমাকে খুসী করিতে, আমার চমক লাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছার জন্য অবশ্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু শনির দৃষ্টির মত তাঁহার দৃষ্টিই যে আমাকে কাবু করিয়া ফেলিল, সে কথাও তো ভুলিতে পারিতেছি না, আমি যে সেইটাই বড় করিয়া দেখিতেছি। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।'

৫। ঝিঙ্গের ঝোলে বৈচিত্র্য (৬)

[ছানার জল বা হোয়ে (whey) ও দুধসাগুর সঙ্গে সঙ্গে যখন মুখের একটু 'যুত' করিবার ইচ্ছায় কোনওরূপ

দাড়ীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার 'জানান' দিয়া রাখিলাম। দাড়ীধারী সম্পাদক ও পাঠক সাবধান হউন।

(৫) যুবাদের বেলায় গোঁফ ফেলাও যদি কেহ নির্ব্বেদের লক্ষণ বলিয়া ধরেন এবং "পূর্ব্বে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ। ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শম কস্য ন জায়তে॥" এই শ্লোক ঝাড়িয়া বাহবা দেন, তবে নাচার।

(৬) এইটি ও ইহার পরবর্ত্তী তিনটি আমার 'খেয়াল' নহে; যে ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহারই খোসখবর। তবে রোগীর

'মোনতা' খাইবার জন্ম উমেদারি করিতে লাগিলাম, তখন সদাশয় ডাক্তার বাবু মূলা, ডুমুর, কাঁচা পেঁপে, খোসা ও বীচি ফেলিয়া (ল্যাজামুড়া বাদ দিয়া!) কচি পটোল ও পলতা, এই পাঁচ আনাজের নিরামিষ ঝোল, পলতার ঝোল, সুক্ত খাইবার অনুমতি দিলেন; তবে শুধু ঝোলটুকুই পেটে পড়িবে, আনাজগুলি নহে, এ বিষয়েও সাবধান করিয়া দিলেন—(বাবাজীর পাঁঠার মাংস একধারে সরাইয়া রাখিয়া ঝোলের বাটিতে চুমুক দেওয়ার ন্যায়)। ইহা নিতান্ত একঘেয়ে হইবে, এইরূপ মৃদু আপত্তি করাতে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, 'ইহাতেই যথেষ্ট রকমারি (variety) হইবে' এবং সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গল্পটি করিলেন।]

"এক মুনসেফ বাবু সস্তার সওদা-হিসাবে নিত্য 'অখদে' ঝিঙ্গের ঝোল খাইতেন। তাঁহার এক জন বন্ধু এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, রোজ রোজই এক আনাজ খাও, একঘেয়ে লাগে না?' মুনসেফ বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'এক ঝিঙ্গেকেই কোনও দিন ফালা ফালা করিয়া কুটি, কোনও দিন চাকা চাকা করিয়া কুটি, কোনও দিন চৌকো চৌকো করিয়া কুটি, এতেই তো দিন দিন রকমারি হয়। আর কি চাই?' বন্ধুবর নিরুত্তর।" গল্পটি বলিয়া ডাক্তার-বাবু উচ্চহাস্য করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু আমার পলতার স্মরণে 'তিতায় তিতিল দেহ।'

৬। 'গিরিশ যদি থাক্ত?'

[যখন ঝোলের একধাপ উপরে আনাজে উঠিয়াছি, পেঁপের ডাল্না, ডুমুরের ডাল্না, নিমুয়ার ঘণ্ট, পটোল-ভাতে খাইতে অনুমতি পাইয়াছি, তখন এক দিন ডাক্তার বাবুর কাছে আরজি পেশ করিলাম, 'একটু যদি নৈনিতাল আলু-ভাতে খেতে পেতাম।' তিনি অবশ্য বুঝাইলেন, 'আলু আর বিলিতী কুমড়ো পেট গরম করে, হজম হ'তেও কষ্ট, ও সব তো চল্‌বে না।' আমি বলিলাম, 'তা' বটে, তবু।' এই 'তবু' শুনিয়া তিনি বলিলেন] "আপনার দেখ্ছি, সেই গিরিশের পিসির মত হ'ল। পিসির বাড়ী একটা পেয়ারা-গাছ ছিল। যখন তখন এসে পাড়ার ছোঁড়ারা পেয়ারা পাড়্‌ত। বুড়ী তাড়া দিলে তা'রা কেয়ার কর্‌ত না। নিরুপায় হ'য়ে বুড়ী তাদের ভয় দেখাবার জন্যে বল্‌ত, 'দাঁড়া তো রে, গিরিশকে ডাকি।' ছেলেরা বল্‌ত, 'সে কি পিসি মা? গিরিশ তো কল্‌কাতায় কালেজে পড়্‌তে গিয়েছে।' পিসি মা তখন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌তেন, 'তা' বটে, বাবা, তা' বটে, কিন্তু—গিরিশ যদি থাক্‌ত?' আলুও যদি আপনার খেতে থাক্‌ত!"

৭। 'পাল্‌কী উঠাও—জাহান্নম্ যাও।'

[দুর্ব্বল শরীরে হাঁটিতে কেন, উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি না, অথচ ডাক্তার বাবুর অভিমত - নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিলে শরীর শীঘ্র সুস্থ হইবে না; এই জন্য তিনি আমাকে সকালে-বিকালে পাল্কী চড়িয়া পার্কে গিয়া তথায় ঘণ্টা-খানেক করিয়া শুইয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া নিম্ন-লিখিত গল্পটি তুলিলেন।]

জেলার মেজেষ্টার 'সাহেব' বেজায় স্থূলকায়, স্বাস্থ্যের দিকে খর নজর, হাওয়া খাওয়া রীতিমত চাই; কিন্তু না পারেন হাঁটিতে, না পারেন ঘোড়ায় বা সাইকে চাপিতে। ব্যবস্থা হইল, পাল্কী চড়িয়া প্রাতে বায়ুসেবন করিবেন। 'সাহেবের' দুইটি বুলি, পাল্কীতে উঠিয়াই বলেন, 'পাল্কী উঠাও', আর বেহারারা 'হুজুর, কাঁহা লে যায়ে গা' জিজ্ঞাসা করিলে হুকুম ঝাড়েন, 'জাহান্নম্ যাও।' 'সাহেব' দিব্য আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছেন, বেহারারা গুরুভার-বহনে গলদঘর্ম্ম, অথচ থামিবার, বোঝা নামাইবারও হুকুম মিলে না। এই রকম করিয়া রোজ ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেচারারা হায়রান। যে দল এক দিন আসে, সে দল আর দ্বিতীয় দিন আসে না। কিন্তু নাজির পেশকার আবার এক দল সন্ধান করিয়া আনে। কিছুদিন এই ভাবে চলিল। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া কাহাররা এক যুক্তি করিল। পরদিন তাহারা 'সাহেবকে' ঘণ্টা খানেক বহিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'হুজুর, আউর কাঁহা লে যায়ে গা', তিনি তাঁহার সেই বাঁধা বুলি আওড়াইলেন। তাহারা সটান একটা মজা বিলে পাল্কী লইয়া গিয়া যেন পা হড়কাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, এই ভান করিয়া, 'সাহেবকে' একেবারে কাত করিয়া ফেলিয়া

ঔষধ-পথ্যের ন্যায় যখন তিনি এই গোসগল্প কয়টিও আমার রোগের উপলক্ষেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন এগুলি আমারই সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এই লম্বোদরের (সম্প্রতি রোগভোগে কৃশোদরের) লেখনী-সাহায্যে এগুলির নরলোকে প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু শাস্ত্রীয় উপাখ্যানই তো অপরের মারফত প্রচারিত হইয়াছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

দিয়া, যেন বেঙ্গাকুবের মত দাঁড়াইল। 'সাহেব' একে স্থূল-কায়, তাহাতে 'মগ্নঃ পঙ্কে সুতুস্তরে', 'পঞ্চতন্ত্রে'র হাতীর মত দশা হইবার উপক্রম। অনেক চেষ্টায় বেহারারা তাঁহাকে টানিয়া ছেঁচড়াইয়া শুক্না ডাঙ্গায় তুলিল। সেই দিন হইতে 'সাহেবের' জাহান্নমে যাইবার সাধ ফুরাইল, পাল্কী চড়ার সখও মিটিল (৭)।

৮। 'তুম্ হাম্‌সে বহুৎ জাস্তি করকে কাঁঠাল খায়া ?'

মেজেষ্টার 'সাহেব' সখ করিয়া 'নয়া চিজ' পাকা কাঁঠাল খাইয়া গোঁফদাড়ীতে কাঁঠালের আঠা লাগাতে বিব্রত হইলেন। পেশকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে আঠা উঠে। সে সরিষার তেলের কথা বলিল। 'সাহেব' তো ও (ন্যাস্‌টি, Nasty) নোংরা জিনিষ কিছুতেই ছুঁইবেন না। শেষে গোঁফদাড়ী কামাইয়া অব্যাহতি পাইলেন।

কিছুদিন পরে পেশকারের পিতৃশ্রাদ্ধে 'সাহেব' নিমন্ত্রিত হইলেন। 'সভাস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন, পেশকারের শুধু গোঁফদাড়ী নহে, মস্তক পর্য্যন্ত মুণ্ডিত, কেবল কাঁঠালের বোঁটার মত স্থূল একগোছা চুল মাথার মধ্যস্থলে রহিয়াছে। 'সাহেব' কুশাগ্রীয়ধী, চট করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া সপ্রতিভভাবে বলিলেন, '(Well) ওয়েল্, পেশকার, তুম্ হাম্‌সে বহুৎ জাস্তি করকে কাঁঠাল খায়া ?' কাঁঠাল না খাইলে যে মানুষের এ রকম তেলগোল করিয়া কামাইবার প্রয়োজন হয়, ইহা অবশ্য 'সাহেবের' বুদ্ধির অগম্য।

[লেখকের দৌহিত্রের ফোড়া অস্ত্র করিবার সময় বালককে অন্যমনস্ক করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিতবুদ্ধি ডাক্তার-বাবু পাকা কাঁঠালের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন, পূর্ব্বের গল্প-গুলির মত লেখককে পথ্য দেওয়ার প্রসঙ্গে নহে। যাক্, পাকা কাঁঠাল খাইতে না দিলেও (কাশীতে উহা অখাদ্য) করুণাসিন্ধু ডাক্তার বাবু লেখককে সুপক্ব বোম্বাই ও ল্যাংড়া আম, পাকা পেঁপে এবং লিচু, তরমুজ, খরমুজার সরবত এলাচি খাইতে দিয়াছিলেন (বেলের সরবত, আনারসের সরবতের তো কথাই নাই)। এমন সুব্যবস্থা কয়জন ডাক্তারে করে ? ভোজনবিলাসী রোগীর ধাতটি তিনি ঠিক ধরিয়াছিলেন। তাই প্রথম প্রথম রাশ টানিয়া ধরিলেও তাহার পরে সময় বুঝিয়া নানা মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদি দিন পাই তো গুণের ডাক্তার বাবুর কথা সময়ান্তরে বিস্তারিতভাবে বলিব।]

৯। ঘরজামাই

জামাই-জাতটা খুব মানী, অল্পেতেই তাঁহাদের রাগ-অভিমান হয়, 'পাণের থেকে চূণ খসিলেই' শ্বশুরবাড়ীর সকলকে প্রমাদ গণিতে হয়; এই জন্যই পণ্ডিতজনে বলিয়া থাকেন, 'জামাতা দশমো গ্রহঃ।' একটুতেই বাবাজীরা ফোঁস করিয়া উঠেন—যেন জাতসাপ, গোখুরা। কিন্তু ঘরজামাইএর সে তেজ, সে ঝাঁঝ, সে রোক, সে দর্পদম্ভ কিছুই থাকে না, 'বরটি নয় যেন চোরটি!' (৮) একেবারে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া—যেন সাপুড়ের ঘরের বিষদাঁত-ভাঙ্গা গোখুরা।

সরীসৃপের সহিত তুলনা করাতে আশা করি, এই সম্প্রদায় রাগ করিবেন না। একটি চল্‌তি হিন্দী প্রবচনে ইঁহাদিগকে চতুষ্পদের কোঠায় ফেলিয়া 'চৌঠা কুত্তা ঘর-জামাই' (৯) বলা হইয়াছে। আমি তো তাহার তুলনায় 'ভেতো' বাঙ্গালীর ভাষায় অনেক কম করিয়া বলিলাম। হিন্দী করিয়া বলিলেই যে গালাগালিতে জোর ধরে!

[অন্য 'পেয়াল'গুলির লেখকের পীড়ার ব্যাপারের সহিত একটা না একটা যোগসূত্র আছে। প্রত্যেকটির বেলায় যথাস্থানে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু রাজা চার্ল্‌সের মাথার মত ('King Charles's head') 'ঘর-জামাই' এই পেয়াল'গুলির ভিতর কি করিয়া ঢুকিল, তাহার কোনই হদিশ পাইলাম না। যা হোক্, খসড়ায় 'যদ্‌দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকে দোষো নাস্তি কশ্চন।' এইটা দিয়া নবরত্নের নয় (৯) মিলিল; তবে এটার পীড়ার

(৭) এই গল্প-সম্বন্ধে লেখকের একটু খোঁকা আছে। প্রবল-প্রতাপ মেজেষ্টার 'সাহেব'কে বিপন্ন করিয়া বেহারারা কি এত সহজেই পার পাইল ? তবে এ সব আপত্তি তুলিলে গল্পের রসভঙ্গ হয়।

(৮) 'হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥'
এই শ্লোকটি বোধ হয় অনেকে জানেন। এই চারি জামাইএর মধ্যে 'ধনঞ্জয়'ই আদর্শ (domesticated) 'গৃহজামাতা।' তবে সংস্কৃত-ভাষায় রচিত শ্লোকে যাহাই থাকুক, শ্বশুরবাড়ীর লোক তাচ্ছিল্য করিয়া এই ঘরজামাইটিকে নিশ্চিতই 'ধনা' বলিত! ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

(৯) 'পহেলা কুত্তা কুত্তা-বালা (?) দোসরা কুত্তা কুত্তা-পালা।
তেসরা কুত্তা বহিন-ঘর ভাই, চৌঠা কুত্তা ঘরজামাই।

সহিত যোগ না থাকাতে যদি পাঠক এটাকে নাকচ করেন, তা' বেশ, এটা নয় (নহে); নবরত্নের স্থলে অষ্টবসু মিলিল ; বসু-শব্দেরও গো-শব্দের মত 'নানা অর্থ অভিধানে ভণে', তন্মধ্যে একটি অর্থ 'রত্ন' ('বসুমতী'ই তাহার প্রমাণ)। অতএব পাঠক আশ্বস্ত হউন, পূজার বাজারে তাঁহার রত্নলাভই বজায় থাকিল। 'অষ্টরম্ভা'—প্রাপ্তির ভয় নাই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥]

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুর্কী-সন্ধি

তুর্কী।—(য়ুরোপকে) ফ—র—র ! কেমন মজা !

ত্যাজ্যপুত্র

৮

"ভজা!"

মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর ডাক শুনিয়া নিদ্রালস ভজহরি খানসামার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। সে দ্রুতপদে মনিবের সম্মুখে আসিয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

"চন্দ্র বাবুকে পাঠিয়ে দে।"

প্রভুর ভ্রূভঙ্গিভীষণ মুখ হইতে এই সংক্ষিপ্ত আদেশ শুনিয়া অনাগত আশঙ্কায় প্রাচীন ভৃত্যের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল জমীদারবাড়ীর কাজে তাহার মাথার কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। হরমোহন বাবুর পিতার আমল হইতে সে এই বাড়ীতেই মানুষ। সে বর্ত্তমান মনিবের 'হালচাল' ভালই জানিত। শঙ্কিতচিত্তে সে আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল।

অল্পকাল পরে চন্দ্রনাথ পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল। ২৫ বৎসরের যুবা, এম. এ. ও বি. এল পরীক্ষা পাশ করিবার পর হাইকোর্টে নাম লিখাইলেও, পিতার সম্মুখে আসিতে তাহার চরণযুগল যেন কুণ্ঠিত হইতেছিল।

পুত্রকে দেখিয়া পিতা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘভরা আকাশের মত তাহার আনন গম্ভীর। হরমোহন হাসিতে জানিতেন না বলিয়া একটা অপবাদ ছিল, অন্ততঃ ভদ্রলোক তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপই রটনা করিত। তাঁহার কাছে হাসিটা ঘোর অসভ্যতা ও পশুত্বভাবের পরিচায়ক—বিশেষতঃ শব্দময় উচ্চহাস্য। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু বন্ধু কেহ ছিল কি না, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই জানিতেন, জমীদার হরমোহন সুরুচির অবতার, অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং নৈতিক নিষ্ঠার মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার কাছে হাস্য অশ্লীল, বড় করিয়া কথা বলা অসভ্যতা, গুরুলঘুর পার্থক্য মানিয়া না চলা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। বনিয়াদি জমীদার হইলেও আবগারী বিভাগের সহিত কুটুম্বিতা করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে কোনও দিন ধূমপান পর্য্যন্ত করিতে দেখে নাই। তাম্বূলচর্ব্বণকে তিনি বিলাসিতার দ্যোতক বলিয়া ঘৃণা করিতেন।

পিতার হাস্যলেশহীন, অপ্রসন্ন মুখের গম্ভীর দৃশ্য চন্দ্রনাথ চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজ যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অমানিশার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছিল।

সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আমায় ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ, কথা আছে।"

চন্দ্রনাথ ফরাসের এক প্রান্তে উপবেশন করিল।

কক্ষমধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। কিছুমাত্র ভণিতা না করিয়াই হরমোহন বলিলেন, "শুনলাম, মা না কি তাঁ'র সব সম্পত্তি তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছেন?"

কথাটা সহজভাবে উচ্চারিত হইলেও চন্দ্রনাথের কানে যেন একটু বেসুরে বাজিল। সে সংক্ষেপে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা কথাটা আমার কাছে লুকিয়েছ কেন?"

বিস্মিতভাবে চন্দ্রনাথ বলিল, "লুকোব কেন?—সে ইচ্ছে ত আমার ছিল না, বাবা! আজ সকালে সবে দেশ থেকে ফিরে এসেছি, তার পরই কোর্টে গিয়েছিলুম। এই ত কতক্ষণ সেখান থেকে আসছি।"

"ও! তাই বুঝি ইষ্টারের ছুটীতে দেশে যাওয়া হয়েছিল! কি রকম লেখাপড়া হ'ল? তাঁ'র সব সম্পত্তিই দান করেছেন?"

চন্দ্রনাথ ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাহার পিতার কথার অন্তরালে শুধুই কৌতূহল, অথবা শ্লেষের তীক্ষ্মমুখ কাঁটাগুলি মাথা উঁচু করিয়া আছে কি না! সবিস্ময়ে সে মুহূর্ত্ত পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর বলিল, "তাঁ'র সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছেন।"

"বটে! -সব!—কিন্তু তুমি ত জান, আমি তাঁ'র ছেলে,—আমাকে না দিয়ে, পৌত্রকে, শুধু একা তোমাকে দেওয়া তাঁ'র ঘোর অন্যায়! তাঁর নিজের দুই ছেলে থাকৃতে, এক জনের এক সন্তানকে সব দেওয়া গুরুতর

পক্ষপাতিতা, অবিচার! তোমারও কিন্তু নেওয়া উচিত হয় নি।"

চন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিবার পর বলিল, "আমিও তাঁকে বলেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম; কিন্তু আমার কোন কথা তিনি শোনেন নি। তিনি বলেছিলেন, তাঁ'র সব সম্পত্তি বিলিয়ে দেবেন, তবু কাকাবাবু বা তাঁ'র ছেলেদের দেবেন না। কাকাবাবু তাঁ'র সঙ্গে কোন দিন ভাল ব্যবহার করেন নি, আজকাল নাকি আরও নানা রকমে কষ্ট দিয়েছেন, তাই তিনি এত নারাজ আর—"

যুবক সহসা রসনাকে সংযত করিল। যে কথাটা জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, তাহা উচ্চারণ করা সঙ্গত নহে। তাহার পিতাও যে তাহার পিতামহীর সহিত কোন দিন পুত্রের যোগ্য ব্যবহার করেন নাই, পিতামহের মৃত্যুর পর নানা কার্য্যে মাতার নয়নে অশ্রুর স্রোত বহাইয়াছিলেন, সত্য হইলেও তাহার মুখ হইতে সে কথাটা বাহির হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

পিতা হরমোহন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি বলছিলে?"

চন্দ্রনাথ কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "ঠাকুর-মা মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন। তিনি আর কাকেও সম্পত্তি দিতে চান না। মৃত্যুর পর পাছে সকলে ভাগাভাগি ক'রে নেয়, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না, বলেছেন। আমি প্রথমে নিতে চাইনি; শেষে দেখলাম, তাঁ'কে অসুখী করা আমার উচিত নয়। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন, যদি এ কাযে তাঁ'র তৃপ্তি হয়, কেন করব না! তা ছাড়া ন্যায়সঙ্গত অধিকারও ত আছে!"

গর্জ্জন করিয়া হরমোহন বলিলেন, "অধিকার!—আমরা থাকতে তোমার কিসের অধিকার? আমরা ছেলে—মায়ের জিনিষে ছেলের অধিকার আগে। ছেলের পর ত পৌত্র। আমাদের না দিয়ে তোমাকে কেন দিলেন? তাঁ'র আরও পৌত্র ত আছে!"

চন্দ্রনাথ ধীরভাবে বলিল, "আমার ভাইদের বঞ্চিত রেখে একা আমি ত সে সম্পত্তি ভোগ করব না, বাবা!"

"সে অভিপ্রায় তোমার যদি না হবে, তবে একা তোমার নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে নিলে কেন?—সব তোমার চালাকি।"

পিতা ক্রমেই উষ্ণ হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া চন্দ্রনাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তিনি সেই ভাবেই দানপত্র লিখিয়েছিলেন।"

"তুমি প্রতিবাদ করতে পারতে।—ও সব কিছু নয়; তুমি উকীল হয়েছ, ঘোর স্বার্থপর তুমি সকলকে ফাঁকি দেবার জন্য, তাঁ'র কাছ থেকে সব তুমি লিখিয়ে নিয়েছ।"

চন্দ্রনাথের সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। পিতার স্নেহ হইতে সে চিরদিনই বঞ্চিত। জ্ঞানসঞ্চারের পর, পিতার স্নেহলাভ দূরে থাকুক, দুই দণ্ডও সে কোনও দিন পিতার সঙ্গ পাইয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হয় না। পিতামহ ও পিতামহীর স্নেহক্রোড়েই সে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পিতামহ যত দিন জীবিত ছিলেন, অধিকাংশকাল সে তাঁহারই সঙ্গলাভ করিয়াছিল। সে তাঁহার নয়নপুত্তলী ছিল; তাহার কোন সাধ, কোন বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। বড় হইয়া সে প্রতিমাসে ৫ শত টাকা খরচ করিলেও কাহারও কাছে কোনও দিন কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। পিতামহের দান, মুক্তহস্ততা তাহার চিত্তে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, অর্থব্যয় সম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্কোচ কোনও দিন তাহার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে নাই। জমীদারীর আয় যে পরিমাণ ছিল, বংশানুক্রমিক ব্যবসায়ের আয় তদপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, কাযেই অর্থের অভাব তাহাকে কোন দিন বোধ করিতে হয় নাই। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ললিতকলার চর্চ্চায় তাহার খরচ খুবই বেশী ছিল। তাহার এই প্রকার সংযমহীন অর্থব্যয় দেখিয়া হরমোহন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহার সমস্ত জীবনে নীতিজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া পুত্রের ব্যবহারে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কা করিতেন কিন্তু অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেও পুত্রকে এ বিষয়ে তিনি শাসন করিতে পারিতেন না। পিতাকে তিনি ভক্তি না করুন, অত্যন্ত ভয় করিতেন। সহৃদয়, তেজস্বী পিতার কৃত কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না এবং নীতিজ্ঞানের সংস্কারবশতঃ পিতার কার্য্যের সমালোচনা করাকে তিনি গুরু অপরাধ বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং মতের বিরোধী হইলেও পিতার অভিমতকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইত।

পাঁচ বৎসর সেই পিতা পরলোকে। সমগ্র সম্পত্তির প্রভু এখন তিনি। পিতৃবিয়োগের পর হইতেই পুত্রকে

তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য হরমোহন চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও তাহাকে বালকের ন্যায় শাসন করিবার স্পৃহা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ যে শুধু শাসক ও শাসিতের তথাকথিত সম্বন্ধ নহে, তাহাতে যে বন্ধুত্বেরও অবকাশ আছে, এ কথা হরমোহনের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল—তিনি তাহা স্বীকারও করিতেন না। পুত্র পিতাকে ভয় করিবে, সম্মান দেখাইবে—নতমস্তকে শুধু আদেশপালনে তৎপর হইবে। তাহা ছাড়া আর কিছু নহে। সুতরাং পুত্রের হৃদয় তিনি জয় করিতে পারেন নাই। পিতামহের অপরিসীম স্নেহ, অপরিমেয় বিশ্বাস ও নির্ভরতায় যে তরুণ হৃদয় গঠিত হইয়াছিল, বিপরীতমুখী শাসনপদ্ধতি তাহাকে বশ করা দূরে থাকুক, দিন দিন বিক্ষুব্ধ করিয়াই তুলিয়াছিল।

পিতার নীরস, স্নেহহীন, কঠোর বাক্য তাই আজ উচ্চশিক্ষিত যুবকের মনে বিদ্রোহের সঞ্চার করিল। কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্যসহকারে চন্দ্রনাথ উদ্যত বাণীকে জিহ্বাগ্র হইতে সরাইয়া দিয়া ধীরভাবে বলিল, "আপনি অন্যায় কথা বলছেন।"

হরমোহন আপনাকে সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে! লেখাপড়া শিখে এই জ্ঞান বুঝি তোমার হয়েছে? গুরুলঘুজ্ঞান নেই—বাপের সঙ্গে কি ক'রে কথা বলতে হয়, শেখনি! যাক একটা কথা জেনে রাখ, আমার মা'র সম্পত্তিতে তোমার এখন কোন অধিকার জন্মে নি। আমাদের ও'ভায়ের নামে সব রেজেষ্ট্রী ক'রে লিখে দাও। বুঝেছ?"

উত্তরাধিকারসূত্রে চন্দ্রনাথও অদমনীয় ঔদ্ধত্য লাভ করিয়াছিল। পিতা যদি স্নেহের সহিত আদেশ করিতেন, তাহা হয় ত সে আপত্তি করিত না; কিন্তু চির-পিতৃস্নেহবঞ্চিত যুবক আপনাকে আর সংযত করিতে পারিল না। সে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া বলিল, "ঠাকুরমা আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন। আমি তা পেরে উঠব না।"

অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র হরমোহন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর কঠোরকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি জান, সমস্ত সম্পত্তির আমি মালিক? আমার বড় ছেলে হ'লেও আমি ইচ্ছা করলে তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করতে পারি।"

দৃঢ় ওষ্ঠ চাপিয়া চন্দ্রনাথ নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"যদি নিজের ভাল চাও, কালই সব রেজেষ্ট্রী ক'রে দেবে।"

কম্পিত ওষ্ঠাধরকে কষ্টে কিছু সংযত করিয়া চন্দ্রনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "অসম্ভব!—আমায় ক্ষমা করুন।"

বজ্রকঠোরকণ্ঠে হরমোহন বলিলেন, "অবাধ্য সন্তান! যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না। আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই। আজ হ'তে কোন সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে নেই!—তুমি ত্যাজ্যপুত্র।"

সমগ্র অট্টালিকা যেন সেই গুরুগর্জ্জনে শিহরিয়া উঠিল। স্তম্ভিত চন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যই কি তাহার পিতা, জন্মদাতার সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া? এই কি সংসার?—পুত্রস্নেহ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ এমনই ক্ষণভঙ্গুর?

দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইতেই প্রাচীরবিলম্বিত পিতামহের স্নেহমণ্ডিত সৌম্য প্রতিকৃতি তাহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। ঐ দেবোপম, উদারহৃদয় পিতামহের স্নেহশীতল বক্ষে তাহার একাধিপত্য ছিল বলিয়াই কি আজ সে লাঞ্ছিত, গৃহবিতাড়িত?

তাহার জিহ্বাগ্রে কঠোর প্রতিবাদ জমা হইয়াছিল, নয়নে ক্ষোভ ও অভিমানের অশ্রু অগ্নিকণার ন্যায় জ্বলিয়া গলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। প্রবল শক্তিতে সে তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া নীরবে কক্ষত্যাগ করিল।

২

"চিঠি আছে, বাবু!"

প্রভাতে খোলা জানালার ধারে বসিয়া চন্দ্রনাথ একখানা আইনের বই পড়িতেছিল। হরকরার ডাকে হাত বাড়াইয়া সে খামে আঁটা পত্রখানা লইল। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, চিঠিখানা তাহারই নামে। হস্তাক্ষর সুপরিচিত; সে বুঝিল, কে তাহাকে লিখিয়াছে। কিন্তু খাম খুলিয়া পত্র পড়িবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না। যদি কেহ সে সময় ঘরের মধ্যে থাকিত, তবে দেখিতে পাইত মৃদু, ম্লান হাস্যরেখা তাহার অধরপ্রান্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

চা লইয়া ভৃত্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এক চুমুক চা পান করিয়া সে মুহূর্ত্ত নয়ন নিমীলিত করিল; তাহার

পর টেবলের উপর হইতে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। পত্রে এইরূপ লিখা ছিল !—

"শ্রীচরণেষু,

দাদা, তুমি ত আমাদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছ। বড় দেখিতে ইচ্ছা করে : কিন্তু তুমি ত এখানে আসিবে না। আসিতে বলিবারও পথ নাই। শ্বশুরবাড়ী যখন থাকি, সেখানেও তুমি যাইতে চাহ নাই। তবে দেখা কেমন করিয়া হইবে? তোমার ওখানে যাইতে পারিলে দেখা হয়, কিন্তু বাবার কঠোর আদেশ—সে হইবে না। তাঁহার নিষেধ না মানিয়া যাইতে পারি ; কিন্তু মন দুর্ব্বল---কোন দিন আদেশ লঙ্ঘন করিতে শিখি নাই। তাঁহার কাযের বিচার করিবার শক্তিও আমাদের নাই ; অভাগিনী ছোট বোন্‌কে সেজন্য ক্ষমা করিও। অদৃষ্ট ছাড়া কাহাকে দোষ দিব? বউদিদিকে লইয়া কত আমোদ-আহ্লাদ করিব, বরাবরই এ সাধ ছিল ; কিন্তু এমনই ভাগ্য, তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগও ঘটিল না।

আজ একটা কথা জানাইতেছি। এ বাড়ীর কেহ তাহা তোমাকে জানাইবে না, সে সাহস ও অধিকার কাহারও নাই ; মা'র পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু আমি ত আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাবার কঠিন পীড়া সে শরীর আর নাই। ডাক্তার বলিতেছেন, জীবনের আশা অল্প। আমরা মেয়েমানুষ শুধু কাঁদিতেই জানি, কাঁদিয়া পাহাড় ভাসাইতে পারি। হেম ও তারানাথ এখনও কিছু বুঝে না। সংসারেও নানা বিশৃঙ্খলা। তোমাকে কি বলিব, তুমি বড় ভাই, তোমাকে উপদেশ দিবার অধিকারও নাই। তুমি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্—তোমার কর্ত্তব্য তুমিই ভাল বুঝিবে। প্রণাম লও। ইতি -

স্নেহের বোন্ লীলা।"

পত্রখানা ধীরে ধীরে টেবলের উপর রাখিয়া চন্দ্রনাথ মনোযোগসহকারে চা-পান করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিতেছিল। তাহা বিজয়ীর আনন্দ-গর্ব্ব, অথবা দীর্ণপ্রাণের ব্যথার রেখা !

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া দিয়া একটা সিগার ধরাইয়া চন্দ্রনাথ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল। তিন বৎসরের কঠোর জীবন-যাত্রার মর্ম্মান্তিক স্মৃতিগুলি কি সিগারের ধূমের মত উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর?

স্কলারশিপলব্ধ অর্থের দ্বারা ক্রীত কতকগুলি আইন-গ্রন্থ, শয্যা ও একটি ট্রাঙ্ক লইয়া স্মরণীয় রজনীতে প্রায় রিক্তহস্তে সেই যে সে আশৈশবের স্মৃতিভরা গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ইতিহাস ত জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে স্মৃতি কি ভুলিতে পারা যায়?

ভোগায়তন দেহ, চির-সুখাভ্যস্ত জীবন – অভাবের সহিত কোন পরিচয় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহার ছিল না, তাহার পক্ষে প্রতিদিনের অন্নসংস্থান করিবার বিপুল প্রয়াস কি কষ্টকর, কি ভীষণ, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের কল্পনার অতীত। আলো-বাতাসবিহীন মেসের ঘরে বাস, অশন-বসনের দারুণ বিভীষিকা! অভাব, দীনতা তাহার যৌবনের সকল সুখ-স্বপ্নকে যবনিকার অন্তরালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। হাইকোর্টে নাম লিখা থাকিলেও, আশু উপার্জ্জনের আশায় পুলিশকোর্টে সমস্ত দিন মক্কেলের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি সে হতাশ হয় নাই। প্রতি পদে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

পিতামহীপ্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে আইনের বলে সে স্বল্পায়াসে টাকা লইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত ; কিন্তু চন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে অনাহারে মরিলে, তথাপি সে টাকা নিজের জন্য ব্যয় করিবে না। জিদ ও শপথের বশে সে তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ত্যাগ করে নাই, সে জন্য তাহাকে পিতৃদ্রোহী হইতেও হইয়াছে ; কিন্তু অন্যের দানলব্ধ অর্থের দ্বারা সে আর আপনাকে রক্ষা করিবে না, কখনই নহে। নিজের শক্তি ও সাধনার বলে যদি সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, পায় ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, তবেই সে দাঁড়াইবে, নচেৎ জীবন সংগ্রামে সে আত্মবিসর্জ্জন করিবে। কাপুরুষের, অপদার্থের জন্য সংসার নহে, তাহাদের মরাই ভাল। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অটুট স্বাস্থ্য লইয়া যদি সে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হয়, তবে তেমন জীবন ধারণের প্রয়োজন কি?

একাগ্র সাধনা, প্রাণপাত পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা সে জীবনসংগ্রামে টিকিয়া গিয়াছিল। প্রচুর ধনাগম না হইলেও ওকালতী ও সাহিত্যচর্চ্চার দ্বারা স্বাধীনভাবে

সে কলিকাতার খরচ চালাইয়া লইতেছে। বিজয়মুকুটের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নহে।

সিগারের ধূম কুণ্ডলাকারে উঠিয়া বাতায়নপথে বাহির হইতে লাগিল।

কিন্তু জন্মদাতা পিতা ও আত্মীয়স্বজনের ব্যবহার দুঃস্বপ্নের মত চিরদিনই তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার কয়েকমাস পরে পিতামহীকে লইয়া পিতা ও পিতৃব্যের সহিত যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহা সম্রান্ত ও ভদ্রপরিবারের পক্ষে শ্লাঘা নহে। আজ সেই পুরাতন কাহিনীর স্মৃতি তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। কোনও বন্ধুর প্রেরিত তারের সংবাদে সে জানিতে পারিয়াছিল, দেশে গিয়া পিতা ও পিতৃব্য তাহার স্নেহময়ী পিতামহীকে দানপত্র নাকচ করিবার জন্য পীড়ন করিতেছেন, নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। সে ঘটনার কথা মনে করিতেও আজ তাহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। ধনসম্পত্তির লোভ মানুষকে এমনই হেয় করিয়া তুলে? পিতামহীকে রক্ষা করিবার বাসনায় দেশে-গ্রামে উপস্থিত হওয়ায় যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার পরিণাম কি ভীষণই না হইত! একদিকে পিতা ও পিতৃব্যের ধনবল, জনবল এবং অদম্য প্রতাপ; অপরদিকে সে একা, সহায়হীন, সম্পদহীন যুবকমাত্র। তথাপি তাহাকে দেশের লোক যমের ন্যায় ভয় করিত। পিতামহের আমলে দেশস্থ ইতরভদ্র সকলেই তাহার দুঃসাহস, বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশলের অনেক পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং তাহার আগমনে দেশমধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। সুবিধা পাইলে তাহাকে প্রাণে মারিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হইবে না, এ সংবাদও সে পাইয়াছিল। কিন্তু সে ত বলপ্রকাশ করিতে যায় নাই। তথাপি জিলা-হাকিমের আদেশে চন্দ্রনাথকে দারোগা নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল পাছে অশান্তি বা গোলযোগ ঘটে। জিলার য়ুরোপীয় হাকিম গোপনে সরেজমীনে তদন্ত করিতে আসিতেছেন পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিয়া অন্যের অগোচরে সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় হাঙ্গামা অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। নির্ভীক চন্দ্রনাথ অকপটে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিল। হাকিম তাহাকে সঙ্গে লইয়া অতর্কিতভাবে জমীদারবাটীতে উপস্থিত হয়েন—প্রাঙ্গণে তখনও লাঠিয়ালের দল জমায়েৎ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল; বুদ্ধিমান্ হাকিম চন্দ্রনাথের কথার যাথার্থ্য তখনই বুঝিয়াছিলেন। তাহার পর সূক্ষ্মযবনিকার অন্তরালে অবস্থিতা বৃদ্ধার জবানবন্দী লইয়া 'সাহেব' যখন জানিতে পারিলেন, তিনি পুত্রদিগের কাছে থাকিতে চাহেন না—পৌত্রের কাছে যাইতে চাহেন, তখন পিতা ও পিতৃব্যের পরাজয়ে চন্দ্রনাথ হৃষ্ট হইলেও সুখী হইতে পারে নাই। ইচ্ছা করিলে সে তাঁহাদিগকে অবৈধ আটকের ধারায় ফেলিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিত; কিন্তু তাহার ফৌজদারী আইনজ্ঞান এমনভাবে প্রশ্নজালের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, আইনের ফাঁদে কাহাকেও জড়িত করা চলে না। সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহিরে আসিয়া এজন্য তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে পিতামহীকে মুক্ত করিতেই আসিয়াছিল, উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছিল।

চুরুটের আগুন নিবিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ উহা ধরাইয়া লইল।

বাস্তবিক, পিতার সহিত সংঘর্ষ হওয়াই কি তাহার অদৃষ্টলিপি! এমন দুর্ভাগ্য লইয়া কয় জন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে? কোন দরিদ্রঘরের সুলক্ষণা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে বহুপূর্ব্বে তাহার পিতামহ কথা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু না হইলে সেইখানেই তাহার বিবাহ হইত। কিন্তু তাহার পিতা মনে মনে এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কালাশৌচ গত হইলে যখন বিবাহের পুনরায় প্রস্তাব হইল, হরমোহন বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। রাজাবাবুর ঘরে (দেশে সকলেই তাঁহাদিগকে রাজাবাবু বলিত) দরিদ্রের কন্যা আসিবে? হরমোহন তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন না। ধনবানের অসামান্য সুন্দরী কন্যার সন্ধান মিলিল। তখন চন্দ্রনাথ বাঁকিয়া বসিল, সে বিবাহ করিবে না। যে পিতামহ তাহার কোনও সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই, তিনি পরলোকগত হইলেও তাঁহার সাধ, শপথ ভাঙ্গিয়া যাইবে—অসম্ভব! সে কখনই তাঁহার পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করিবে না। এই বিষয় লইয়া যখন তৃতীয় ব্যক্তির মারফতে বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময়েই চন্দ্রনাথ গৃহবিতাড়িত হয়।

কিন্তু পিতামহের অন্তিম সাধ সে পূর্ণ করিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে, আয়ের স্বচ্ছলতা হইবার পর, নানা বাধাবিঘ্ন

সত্ত্বেও পিতামহের নির্দ্দিষ্ট পাত্রীকে সে গৃহলক্ষ্মী করিয়া আনিয়াছে। সে সময়েও তাহার পিতা কি কম প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিলেন? কিন্তু—

সহসা দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। চন্দ্রনাথের চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে দেখিল, শুভ্রবসনা পিতামহী দাঁড়াইয়া।

ঘরে কেহ নাই দেখিয়া তিনি পৌত্রের কাছে আসিলেন। টেবলের উপর খোলা চিঠি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কে লিখেছে, দাদা?"

"লীলা।"

"লীলা?—কি লিখেছে সে?"

"অনেক কথা, বাবার অসুখ—অবস্থা ভাল নয়। প'ড়ে দেখ।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার চশমা নেই, তুই প'ড়ে শোনা।"

চন্দ্রনাথ পড়িয়া গেল। বৃদ্ধার আননে ছায়াপাত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমায় একখানা গাড়ী আনিয়ে দিবি, দাদা?"

"এখনই যাবে, ঠাকুর-মা?"

পাংশুমুখে বৃদ্ধা বলিলেন, "যাই সে করুক, আমি ত মা! মায়ের প্রাণ—"

কথা সমাপ্ত হইল না; তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ছয় মাস আগে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে কাল হরণ করিয়া লইয়াছিল।

চন্দ্রনাথ বাহিরে—আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ভজা দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি যাও, আমি গাড়ী আনতে পাঠাচ্ছি।"

ভজহরি চন্দ্রনাথের পিতামহের আদরের ভৃত্য ছিল। চন্দ্রনাথকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। গৃহবিতাড়িত চন্দ্রনাথের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া কিছু দিন পরে সে তাহার কাছে আসিয়া জোর করিয়া আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

"তুই ত যাবি নে, দাদা?"

"আমি?—ঠাকুর-মা, তোমাদের মায়ের প্রাণ—কথাটা ঠিক। কিন্তু সব মায়ের প্রাণ কি এক?—বাপের প্রাণ,—থাক্, তুমি যাবার যোগাড় কর গে।"

পৌত্রের কেশরাজির উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "ভুলতে পারিস্ নি, ভাই? অভিমান হবারই কথা।"

"অভিমান?—"

চন্দ্রনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্যুদবিকাশের মত হাস্যরেখা একবার খেলা করিয়া গেল।

বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। এই স্বল্পভাষী, গভীর-হৃদয়, ভাবপ্রবণ পৌত্রের অন্তরের কোন্ কথা তাঁহার অগোচর ছিল? তরুণ যুবকের দেহে তিনি স্বামীর যৌবনকালের প্রতিচ্ছবি দেখিতেন, পিতামহের প্রকৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে সে যেন সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছিল।

অন্যমনস্কভাবে চন্দ্রনাথ বলিল, "ঠাকুর-মা, তোমার দানপত্রটা নিয়ে যাও। বাবা ও কাকাবাবুর ছেলেদের নামে সব লেখাপড়া ক'রে দিও।"

পৌত্রের আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পিতামহী মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "প্রাণটা মায়ের সত্য; কিন্তু চন্দ্র, আমি যা করেছি, ভেবে-চিন্তেই করেছি। এ বিষয়ে আমায় তুই কোন কথা বলিস্ নে, ভাই।"

বৃদ্ধা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

৩

চুপ!—কোন শব্দ যেন না হয়! রোগ যেখানে মৃত্যুরূপ ধরিয়া সতর্ক ও অমোঘ গতিতে অগ্রসর হইতেছে, সেখানে দীর্ঘশ্বাসকেও চাপিয়া রাখিতে হইবে; পাছে সে শব্দেও মরণপথযাত্রীর দীর্ঘকালের সংসারমায়ামুগ্ধচিত্তের সঞ্চিত সংস্কার স্পন্দিত হইয়া উঠে! ধীরে, সাবধানে পদক্ষেপ কর—হৃদয়ের আলোড়নকে চাপিয়া, পিষিয়া ফেল!

অতি লঘুগতিতে, নিঃশব্দপদসঞ্চারে চন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের বিস্তৃত রোগ-গৃহে প্রবেশ করিল। কত কাল পরে?

পারিবারিক প্রবীণ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দ্বারের নিকট আসিতেই চন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেন। এ বাড়ীর ইতিহাস প্রবীণ ডাক্তারের অগোচর ছিল না। সস্নেহে চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া তিনি বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন; মৃদুস্বরে বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

জীবনপ্রবাহ যেরূপ ক্ষীণধারায় বহিতেছে, তাহাতে যে কোনও সময়ে অন্তিম-যবনিকা নামিয়া আসিতে পারে।

চন্দ্রনাথ নীরবে ডাক্তারের সতর্ক বাণী ও উপদেশ শুনিল; প্রতিবাদ অথবা অনুমোদন তাহার বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। চিকিৎসক তপনকার মত চলিয়া গেলে চন্দ্রনাথ রোগীর কক্ষে ছায়ামূর্ত্তির মত প্রবেশ করিল। গৃহের এক কোণে একটিমাত্র বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল। সেই নিস্তব্ধ স্বল্পালোকদীপ্ত গৃহের মধ্যে যাহারা বসিয়া ছিল, সকলেরই দৃষ্টি যুগপৎ তাহার দিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

কিশোর কনিষ্ঠযুগল ও সহোদরার অশ্রুম্লান আননের প্রতি একবার চাহিয়াই চন্দ্রনাথ রোগশয্যার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। শিরোদেশে ও পদতলে ক্ষোদিত পাষাণমূর্ত্তির মত দুই জন রমণী বসিয়া ছিলেন। বৃদ্ধার আনন গম্ভীর, ম্লান। জননীর নয়নে নৈরাশ্য ও আসন্ন শোকের পূর্ব্বাভাস।

রোগীর পদতলের দিক্ হইতে জমাট দীর্ঘশ্বাস ও চাপা ক্রন্দনের অস্ফুটধ্বনি নির্গত হইতেই চন্দ্রনাথ স্বীয় ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিল। অমনই মন্ত্রবলে যেন সব থামিয়া গেল।

রোগীর মাথার দিকের দেওয়ালে যে সুস্থ, সবলদেহ, গম্ভীরাকৃতি পুরুষের প্রতিকৃতি দুলিতেছিল, শয্যাশায়ী, কঙ্কালসার এই রোগীর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য কতটুকু? আসন্নমৃত্যুর তুষার-শীতল অঙ্গুলীর স্পর্শে স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সকল সম্পদ এমনই নিশ্চিহ্নভাবে অপহৃত হইয়াছে! প্রশস্ত ললাটের সে প্রবল ভ্রূকুটিরেখা কোথায় গেল? মুখের সে দৃঢ়, অবিচলিত গাম্ভীর্য্য?

চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিস্পন্দভাবে, চেতনাহীন অথবা আশু-সুপ্ত রোগীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতার অবগুণ্ঠন-মুক্ত মাথার উপর, সীমন্তদেশে চওড়া লালপাড় শাড়ীর অগ্রভাগ যেন জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল। রক্তলেশহীন পাণ্ডুর মুখের দিকে সে চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

কান্না বড়? স্বাভাবিক সংস্কারের প্রভাব, না কর্ত্তব্যের প্রেরণা? চন্দ্রনাথ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। হৃদয় উদ্যানে সুন্দর ও গন্ধভরা ফুলগুলি কোমল দলরাজি বিকসিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই কয় বৎসরে সবই কি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে?

সে ত্যজ্যপুত্র, পুত্রের কোন অধিকারই তাহার নাই। শুধু কর্ত্তব্য, মানুষের কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই তাহার অদৃষ্টলিপি।

যেমন নীরবে সে আসিয়াছিল, ঠিক তেমনই নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিল। সে বারান্দায় আসিতেই কনিষ্ঠ সহোদর-যুগল তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মধ্যম হেমনাথ অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বলিল, "দাদা, আমাদের অপরাধী করো না। বাবার অবস্থা দেখ্‌লে ত, এবার ধনে-প্রাণে আমরা মারা যাব।"

অশ্রুহীননেত্রে চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের দিকে চাহিল, কিন্তু সান্ত্বনার কোন কথা সে বলিল না।

"ব্যবসা ও বিষয়ের সব কথা তুমি বোধ হয় জান না। বাবা সেই শোকেই বুঝি চ'লে যাচ্ছেন।"

চন্দ্রনাথ এবার কথা কহিল, বলিল, "সব শুনেছি। এখন ঘরে যাও, ছেলের কর্ত্তব্য-পালন কর গে, ভাই।"

"তুমি কি চ'লে যাচ্ছ, দাদা?"

আবার ম্লান হাস্য ক্ষণিকের জন্য চন্দ্রনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করিয়া গেল।

অধোবদনে দাঁড়াইয়া হেমনাথ চেষ্টা করিয়া বলিল, "তবু, দাদা, তুমি থাক্‌লে—"

হস্তেঙ্গিতে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া চন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বলিল, "তোমাদের প্রধান কায বাবার সেবা করা, তাই ভাল ক'রে কর।"

উভয়ে মুহ্যমানভাবে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। সহসা পার্শ্বের ঘরের খোলা দ্বারপথে এক তরুণী সুন্দরী বাহির হইয়া আসিল।

"দাদা!—"

লীলার গণ্ড বহিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

"সেই এলে, যদি আর কিছু দিন আগে আস্‌তে, দাদা!"

চন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, "সব ভুলে গেছিস্, বোন্? বাবার জ্ঞান থাক্‌তে এলে, জোর ক'রে তাঁকে মেরে

ফেলা হ'ত না কি? তাঁকে কি এত দিনেও চিন্‌তে পারিস্ নি?"

লীলা বুঝিল, বুঝিয়া দৃষ্টি নত করিল।

"বৌদিকে একবার আন্‌লে না কেন?"

কেন?—এই 'কেন'র উত্তর কে দিবে? ইহার উত্তর আছে কি?

চন্দ্রনাথ শুধু বলিল, "যেখানে তোর নিজের কোন অধিকার নেই, যেখানে তুই অনাদৃতা, উপেক্ষিতা—তোর স্বামীকে সেখানে তুই নিয়ে যেতে পারিস্?"

লীলা আর কথা বলিল না।

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

৪

ত্যাজ্যপুত্র হইলেও চন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগের পর যথারীতি কাছা গলায় লইয়া অশৌচ পালন ও হবিষ্য করিতে লাগিল। মুখাগ্নির সময় স্বার্থপর আত্মীয়গণ তাহাকে সংবাদ দেয় নাই, দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। শোকবিহ্বল, অপরিণতবুদ্ধি কনিষ্ঠযুগল সে অবস্থায় প্রবীণ আত্মীয়গণের উপদেশানুসারেই যন্ত্রচালিতবৎ কায করিয়া গিয়াছিল। পিতৃবিয়োগশোকে কাতর হইলেও শুধু লীলা কয়েকবার তাহার দাদার কথা তুলিয়াছিল; কিন্তু আত্মীয়গণের প্রচণ্ড কলরব ও বিতণ্ডার স্রোতোধারার বিভীষণ গর্জ্জনে তাহার শোককাতর কণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ কোথায় ডুবিয়া গিয়াছিল! পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা পিতামহী ভূমিশয্যা লইয়াছিলেন, আর সদ্যোস্বামিবিয়োগবিধুরা জননীর ত কথাই ছিল না—সংসারে কি ঘটিতেছিল, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁহার ছিল না।

যথাসময়ে আত্মীয়গণের ব্যবহারের কথা সবই চন্দ্রনাথের কানে গিয়াছিল; কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য সে প্রকাশ করে নাই। সে যখন ত্যাজ্যপুত্র, তখন তাহার বলিবার কি-ই বা ছিল? পিতৃবিয়োগের পর শোকাতুরা মাতা প্রভৃতিকে দেখিতে যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু নানাদিক্ ভাবিয়া সে মনের আবেগ সংবরণ করিয়াছিল।

কিন্তু যে দিন হেমনাথ ও তারানাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিল, সে দিন চন্দ্রনাথকে যাইতে হইল। কনিষ্ঠদিগের অশ্রুভরা কণ্ঠের মিনতি সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আইনব্যবসায়ী, সেই হিসাবেই সে পিতৃগৃহে গমন করিল।

বাহিরের ঘরে যেখানে তাহার পিতামহ, পিতা প্রভৃতি বিষয়সংক্রান্ত কায বা পরামর্শ করিতেন, সেই সুপ্রশস্ত কক্ষে সকলে সমবেত হইয়াছিল। বাহিরের কোন লোক অথবা অন্য কোন আত্মীয়কে হেমনাথ সেখানে আহ্বান করে নাই। তাহারা কয় ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা ও পিতামহী মাত্র তথায় ছিলেন। আজ যে সকল কথা আলোচনা হইবে, তাহা অন্য ব্যক্তির নিকট বলিবার নহে। হিতৈষী আত্মীয়গণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেও হেমনাথ এ বিষয়ে দৃঢ়তা দেখাইতে ভুলিল না।

চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হেমনাথ বিষয় ও ব্যবসাসংক্রান্ত বর্ত্তমান অবস্থার কথা যতদূর জানিত, সমস্ত বলিল। পিতা ও পিতামহের বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধ ধারণা, এবং কর্ম্মচারীদিগের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফলে, অথবা যে কোন কারণেই হউক, ঋণ যেরূপ বাড়িয়াছে, ব্যবসায়ে যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, এমন কি, একশত বৎসরের প্রচলিত 'ট্রেডমার্ক' অন্যপক্ষ কৌশলে হস্তগত করিয়া লইয়া যে মহা ক্ষতি করিয়াছে, তাহাতে সমূহ বিপদ আসন্ন। কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণ মৌখিক আত্মীয়তা দেখাইলেও ঘোর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহারা ব্যবসা ও জমীদারীর কায কিছুই বুঝে না, এখনও কলেজের পড়াশুনা লইয়া আছে। এ অবস্থায় চন্দ্রনাথ যদি কর্ণধারণ না করে, তবে তরী ঝটিকাপ্রভাবে মাঝদরিয়ায় ডুবিয়া যাইবে।

চন্দ্রনাথ নীরবে সকল কথা শুনিয়া গেল। অনেক কথা সে নিজেই জানিত।

হেমনাথ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে আশাপূর্ণনেত্রে চাহিয়াছিল; কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন কোন কথাই বলিল না, তখন নিরাশভাবে সে বলিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি ভার না নিলে সব যাবে। আমরা তোমার অংশ তোমাকে রেজেষ্ট্রী—"

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "চুপ কর, হেম। দেনার হিসাব দেখাতে পার?"

হেমনাথ বলিল যে, কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে সে কোন সঠিক হিসাব এখনও পায় নাই। তবে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে পিতা তাহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি একটা

মোটামুটি হিসাব করিয়া রাখিয়াছিলেন, লোহার আলমারীতে তাহা আছে। পীড়ার প্রথম অবস্থায় কিছু দিন তিনি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আলমারী খোলা হইল। ব্যবসায়ীর মত গম্ভীরভাবে চন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট হিসাবের পাতাগুলি টানিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে দেখিল, বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে পিতার তেমন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও শেষদিকে সত্যই তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দেনাপাওনার মোট হিসাব মন্তব্য সহ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্যবসায়ে কি ভাবে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া যেখানে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথের দৃষ্টি তথায় পড়িল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ব্রজমোহন ও আমার কাহারই বিষয়বুদ্ধি নাই। ব্রজ ত চলিয়া গিয়াছে। আমিও রুগ্ন, অসমর্থ। যদি আগে এ সব দেখিতাম! যাহারা এমন করিয়া ঠকাইয়াছে, তাহাদিগকে পরাজিত করা এখন অসম্ভব। এক জন— শুধু এক জন চেষ্টা করিলে আবার সব উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু আমি তাহাকে ত্যজ্য পুত্র করিয়াছি। বাবার বিষয়বুদ্ধি, তেজ ও কৌশল তাহাতে আছে। কিন্তু সেই স্বার্থপর, বিদ্রোহী সন্তানকে আমি ক্ষমা করিতে পারি না।"

চন্দ্রনাথ পাতা উল্টাইয়া গেল। বহুক্ষণ পরীক্ষার পর সে বুঝিল, তাহাদের বংশগৌরব, সম্মান, প্রতিপত্তি আর কয়েকবৎসরের মধ্যে শুধু কিংবদন্তীতেই পর্য্যবসিত হইবে।

হেমনাথ অধীরভাবে বলিল, "বাবার উইল আমরা নাকচ ক'রে দেব। তিনি ভারী অন্যায় করে গেছেন।"

সুপ্তোত্থিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "হেম, যাঁ'রা এখন পরলোকে, তাঁ'দের কাযের সমালোচনা করা অপরাধ।"

লীলা পিতার লিখিত খাতাখানা পড়িতেছিল। সে জমীদারের কন্যা, জমীদারের গৃহিণী। আপনার সংসারে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, স্বামীর মন্ত্রণাদাত্রী। সে বলিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি থাকতে সব যাবে? আমাদের পিতৃবংশের নাম ডুবে যাবে?"

চন্দ্রনাথ গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

পিতামহী এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। গাঢ়স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্র, রায়বংশের মান রক্ষা কর, ভাই!"

রায়বংশের মান? হাঁ, তাহাতে ত তাহার জন্মগত অধিকার। সেই মহাবংশের সম্মান—যে বংশে তাহার পিতামহ জন্মিয়াছেন, যে বংশের রক্তস্রোত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে মহদ্‌বংশের মহৎ কীর্ত্তিকথা দেশের লোক আজও গান করিয়া বেড়ায়, কতকগুলি ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ সেই বংশগৌরবকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে?

সেই বিস্তৃত গৃহমধ্যে, প্রাচীরগাত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের তৈলচিত্রসমূহ ঝুলিতেছিল। সম্মুখেই তাহার পিতামহের প্রতিভাদীপ্ত, হাস্যময় আননের প্রতিচ্ছবি! বহুক্ষণ সে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা সন্নিকটে দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। পার্শ্বে তাহার জননীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি! শ্বেতবসনা, বিষাদিনী প্রতিমাকে যেন তাহার ভিন্নলোকবাসিনী দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিল। জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতেই যে সীমন্তে নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদরেখার রক্তরাগ সে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা শুধু শ্বেতরেখায় পর্য্যবসিত। স্বামীর আজ্ঞানুসারিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা জননীকে সে ভালরূপেই জানিত। স্বামীর আদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে গিয়া কিরূপে ক্রমেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার সংবাদ সে যে একেবারে পায় নাই, তাহা নহে।

জ্যেষ্ঠপুত্রের হাত ধরিয়া বিষাদিনী মাতা বলিলেন, "তিনি যাই ক'রে থাকুন, চন্দ্র, তোর ছোট ভাই দু'টিকে আমি তোরই হাতে সঁপে দিলুম, বাবা!"

হৃদয় ও হস্তের কম্পনবেগকে অতি কষ্টে সংযত করিয়া অস্ফুটস্বরে সে বলিল, "আচ্ছা, দেখি।"

৮

রায়ভবনে উৎসবের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। চারি বৎসরের কঠোর পরিশ্রম, প্রাণপণ চেষ্টা ও বুদ্ধিকৌশলের প্রভাবে পরলোকগত হরমোহনের সম্পত্তির ঋণ প্রায় শোধ হইয়াছিল। শত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়কে

জ্ঞাতিশত্রুদিগের কবল হইতে উদ্ধার করার ফলেই আজ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

চন্দ্রনাথকে সকলেই ভয় করিত। জনরব রটিয়াছিল, পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতারা তাহাকে ভাগ করিয়া দিয়াছে; বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় ও কর্ম্মচারীরা তাহার কূটবুদ্ধি ও শাসনক্ষমতার প্রভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তাহার ব্যবস্থাগুণে ও কর্ম্মতৎপরতায় আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। অনাদায়ী টাকা আদায় করা চন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। আয় বাড়াইয়া, ব্যয় কমাইয়া সে এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, নিঃস্বার্থ আত্মীয়-বান্ধবগণ তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। এমন সুযোগ্য সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা যে হরমোহনের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তাহা একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। সুদূর পল্লী হইতেও হিতৈষী আত্মীয় ও প্রজাবৃন্দ চন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন পাঠাইতে লাগিল; জয় ও সাফল্যের আনন্দকে মূর্ত্তি দিবার উদ্দেশ্যেই মাতা ও সহোদরদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে চন্দ্রনাথকে এই উৎসব অনুষ্ঠান অনুমোদন করিতে হইয়াছিল।

লীলা তাহার স্বামীর সহিত এ উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল। অপরাহ্নে চন্দ্রনাথ যখন একা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখন লীলা বলিল, "কই, বৌদিকে আনলে না, দাদা?"

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "খোকার জ্বর হয়েছে, তাঁকে নিয়ে এই গণ্ডগোলে আসা উচিত কি, বোন্?"

"জ্বর ত সবে আজ হয়েছে। কালই যদি বৌদিকে পাঠাতে, চল্‌ত না কি?"

চন্দ্রনাথ এ পর্য্যন্ত তাহার নিজের বাসাতেই ছিল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে পিতৃভবনে বাস করিতে আইসে নাই।

চন্দ্রনাথ ভগিনীকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "তা তুই চল্ না, কালকে আমাদের ওখানে গিয়ে থাকবি।"

লীলা অভিমানভরে বলিল, "তাঁকে এখানে আনতেই যত দোষ, দাদা?"

মৃদু হাসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "পাগ্‌লি!"

উৎসবের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে, দেখিবার জন্য চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া গেল। লীলার সুন্দর ললাট কুঞ্চিত হইল। তাহার দাদার হৃদয়ের রহস্য কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল?

* * * *

উৎসবশেষে—পান—ভোজন ও আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া নিমন্ত্রিতরা চলিয়া গেলেন। কেহই চন্দ্রনাথের প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে ভুলিলেন না। হেমনাথ ও তারানাথ হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সকলকেই বলিয়া বেড়াইল, দাদা ছিলেন বলিয়া আজ তাহাদের এই সৌভাগ্য।

সকলকে—বাড়ীর দাসদাসী ও ভিখারীদিগকে পরিতোষরূপে খাওয়াইয়া চন্দ্রনাথ যখন দ্বিতলে উঠিল, তখন রাত্রি ১টা। এক চন্দ্রনাথ ছাড়া অভুক্ত আর কেহই ছিল না। সে কর্ম্মকর্ত্তা। একটি প্রাণী অভুক্ত থাকিতে জলগ্রহণ করিতে নাই, পিতামহের জীবনে সেই আদর্শের শিক্ষাই সে পাইয়াছিল।

অত রাত্রিতে স্নানশেষে চন্দ্রনাথ যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল, লীলা বলিল, "চল দাদা, এইবার তুমি খাবে এস।"

চন্দ্রনাথ পাঞ্জাবীর বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "হাঁ রে, এই ক'বছরে তোরা আমাকে একেবারেই ভুলে ব'সে আছিস? লোকজন খাওয়ানর পর কোন দিন আমাকে জলস্পর্শ করতে দেখেছিস তোরা? আচ্ছা, মা, তুমিই বল!"

সমবেত সকলকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইল। লীলাও যে তাহা না জানিত, তাহা নহে।

বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া চন্দ্রনাথ পকেট হইতে একখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিল। সহোদর ও খুল্লতাতভ্রাতাকে কাছে টানিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "ঠাকুরমা যে সম্পত্তি আমায় দান ক'রে গিয়েছেন—যা নিয়ে এত বিবাদ, তোদের সকলকে তা এই দলিলে আমি সমান অংশে ভাগ করে দিয়েছি; রেজেষ্টরী করা হয়েছে। আজ আমার কাযের শেষ।"

জোর করিয়া হেমনাথের হস্তের মুঠায় দলিলখানি দিয়া চন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমনাথ ও তারানাথ অশ্রুসিক্তনেত্রে বলিয়া উঠিল, "দাদা, আমরাও যে রেজেষ্টরী ক'রে তোমার অংশ তোমাকে লিখে দিয়েছি। দাদা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না।"

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভুল করেছ, ভাই! ও সম্পত্তিতে আমার অধিকার নেই, আমি ত্যজ্যপুত্র, তোমরা দিলেও আমি নিতে পারি না।"

"বাবা যদি অন্যায় ক'রে থাকেন—"

"চুপ কর, তারানাথ! গুরুনিন্দা করতে নেই—বিশেষতঃ বাবা এখন স্বর্গে গেছেন। তাঁর কাযের বিচার করবার অধিকার কারও নেই। গুরুজনের আদেশ মাথা পেতে নিতে হবে।"

লীলা বলিয়া উঠিল, "দাদা—"

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "বুঝেছি, বোন তবে আমি কেন বাবার আদেশ পালন করিনি, এই কথা তুমি বলতে চাও? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, লীলা, বাবা আমার গুরু; কিন্তু ঠাকুর্দা, ঠাকুর-মা তাঁরও গুরু। আমি আমার বাবার আদেশ সম্পূর্ণ পালন করতে পারিনি—তাঁর যাঁরা গুরু, তাঁদের আদেশ পালন করেছি মাত্র। বাবা আমায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন, তাঁর সে আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি আমার নেই; কোন মতেই তা পারব না। তোমরা সুখী হও, ভাই।"

সেই উন্নতশীর্ষ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ যুবকের মুখমণ্ডলে সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও চরিত্রগর্ব্বের একটা তেজ নির্গত হইতেছিল। কেহ প্রতিবাদে সমর্থ হইল না।

বিধবা জননী ধীরে ধীরে সন্তানের সমীপবর্ত্তী হইলেন; পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা!"

"মা!"

নত হইয়া মাতার চরণধূলি মাথায় লইয়া ত্যজ্যপুত্র দৃঢ়চরণে কক্ষত্যাগ করিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সমুদ্রের খেদ

অম্বুধিমাঝে যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত নিধি কত
সুরাসুর মিলি হরি নিল তাহা মন্থনে অবিরত;
বঞ্চিত হ'ল সন্তান তার লুণ্ঠিত হ'ল ধন-ভাণ্ডার—
কৌস্তভমণি রত্নের সার বিত্ত বিভব যত!

শ্রেষ্ঠ তুরগ উচ্চৈঃশ্রবা লভেছে অমররাজ,
হ্রেষাধ্বনি তা'র পশে না ক আর কল কল্লোলমাঝ—
ঐরাবতের বিরাট শরীর হেরিয়া নাচে না উর্ম্মি অধীর,
বৃংহণ আর হাস্যে মিশিয়া শঙ্খ ঘোষে না আজ!

তথন প্রাসাদে চলেছে নিত্য হেলা-অশতন লীলা,
অরুণ-নয়নী বারুণী বহে না সলিল-কুসুম ডালা;
স্বর্ণ নূপুরে নাহি গুঞ্জনা মুক্তা আঁকিয়া নাহি আলিপনা,
আঁধার কক্ষে জ্বালে না লক্ষ্মী প্রবাল-প্রদীপ-মালা!

স্বর্গ-আলোক, অলকার ভোগ-লিপ্সা জেগেছে মনে,
তাই কি সাধক ধন্বন্তরি গেছে নন্দনবনে?
মিথ্যা তাহার কৃচ্ছ্রসাধন, মিথ্যা তাহার ব্রত অনশন,
জ্ঞান আরাধনা মিথ্যা সকলি সাগরের তপোবনে!

পলিতশ্মশ্রু বিশ্বাসঘাতী খুলিয়া গোপন দ্বার,
স্থবির হস্তে ল'য়ে গেছে সে যে অমৃতের উপহার।
হৈম ভাণ্ড কাণায় কাণায় উছলি উঠিল সুধার ফেনায়,
গন্ধে বর্ণে মুগ্ধ করিয়া অন্তর দেবতার।

সাগরের বুকে ছিল না কি মণি শতদল পারিজাত?
ছিল না কি মুনি মলয়ের স্থলে উর্ম্মির অভিঘাত?
ছিল না কি সেথা মরকতপ্রভা শ্যাম আলোকের অমলিন শোভা
উচ্ছল নৃত্যে দুলিত না কি গো নীর-তরু দিবারাত?

সে অমৃত-ভাগ ছড়ায়ে পড়েছে ধরণীর আঙ্গিনায়,
শস্য-হৃদয়ে কলমূলনীরে পীযূষ বহিয়া যায়,
হোথায় জলধি দীর্ণ বক্ষে বিগলিত-ধার নীরব চক্ষে,
হেরিছে তনয়ে লক্ষে লক্ষে অনশনে মৃতপ্রায়।

জলধি হয়েছে বধির কর্ণে ক্রন্দন পশে পাছে—
ক্ষুধার তাড়নে শিশু তরঙ্গ ছুটে পৃথিবীর কাছে;
চঞ্চল কেশ দুলে সমীরণে কোমলকণ্ঠে যাচে প্রাণপণে
'অন্ন অন্ন কোথায় অন্ন অন্ন কোথায় আছে?'

দেবের প্রসাদে পেয়েছ ধরণি চিত্তে গরব ধরি,
জননী হইয়া বুঝিলে না তুমি শিশুর বেদন, নারী!
শত নদীমুখে ঢাল অবিরত কঙ্করময় কর্দম-স্রোত,
চাহিল অন্ন সাগর-অঙ্ক পঙ্কে দিলে কি ভরি?

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ফিলিপাইনে মুক্তিমন্ত্র

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বর্ত্তমানে রাজনীতিক কারণে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। আমেরিকা এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর তথায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এখন সেই দ্বীপের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা এক জাতীয় নহে; পরন্তু তাহাদের মধ্যে নানা জাতির সংমিশ্রণোদ্ভূত লোকও তথায় অনেক আছে, কাজেই নানা-ভাষা ব্যবহৃত হয়। দেশের জলবায়ু বৃক্ষলতার পক্ষে অনুকূল হওয়ায় দ্বীপে নানারূপ বৃক্ষলতার শ্যামশোভা। বর্ষাকালে প্রচুর বারিবর্ষণে নদী সমূহ পুষ্ট হয় এবং সময় সময় প্রবল বাত্যায় বৃক্ষাদি বিনষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পে দ্বীপপুঞ্জ প্রকম্পিত হয় এবং গৃহাদির অনিষ্টও হইয়া থাকে।

ফিলিপাইন সুন্দরী

স্পেনের কর্ম্মচারী ম্যগেলান (Magellan) নামক একজন পর্ত্তুগীজ এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের কি পর্ত্তুগালের অধিকারভুক্ত হইবে, বহুদিন তাহার মীমাংসা হয় নাই। তখন রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী য়ুরোপে ধর্ম্মগুরু পোপের অসাধারণ প্রভুত্ব। তিনি স্পেনকেই ফিলিপাইনের অধিকারী বলিয়া মত দেন এবং স্পেন তথায় রাজত্ব করিতে থাকে। কিন্তু দেশবাসীরা স্পেনের প্রভুত্বে সন্তুষ্ট থাকে নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের যুদ্ধঘোষণা হইলে ইংরাজরা মেনিলা অধিকার করে। কিন্তু প্যারিসে শান্তির সর্ত্ত স্থির হইয়া গেলে ইংলণ্ড ফিলিপাইন ছাড়িয়া দেয়। মেনিলায় এই "বৃটিশ বহিষ্কার" স্মরণীয় করিবার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফিলিপাইনের অধিবাসীরা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। স্পেনের শাসনপদ্ধতি নানারূপ নিষ্ঠুরতায় কলঙ্কিত ছিল। বিজয়ী প্রতীচ্য জাতিসমূহের শাসনে সেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় নূতন নহে বটে, কিন্তু পুরাতন হইলেও তাহা সভ্যতার কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যোসে রিজাল য়ুরোপে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে আসিয়া স্বদেশীদিগের সহিত যোগ দিলে তাঁহাকে গুলী করিয়া মারা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনীয়ার্ডরা সন্দেহবশে অনেককে গুলী করে এবং ১ শত ৬০ জনকে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করায় নিদাঘানিশায় তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সিরাজদ্দৌলার আমলের অন্ধকূপহত্যার ও ইংরাজশাসনে ভারতে মোপলা-মৃত্যুর সহিত তুলনীয়, সন্দেহ নাই।

আগুইনালডো নামক একজন ফিলিপাইনবাসী এই সব অত্যাচার অনাচারের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হয়েন। কিউবা লইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত স্পেনের যুদ্ধঘোষণা হইবার ১ সপ্তাহের মধ্যে এডমিরাল ডিউই আমেরিকার পক্ষে মেনিলার বন্দরে যাইয়া স্পেনের নৌবহর পরাভূত করিয়া ফিলিপাইন দখল করেন। এই সময় আগুইনালডো মার্কিণের পক্ষাবলম্বন করেন।

আগুইনালডো বলেন, জয়ী আমেরিকানদিগের পক্ষে তাঁহার দেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমেরিকানরা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে এবং শেষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আগুইনালডো পরাভূত হইয়া বন্দী হয়েন। কিন্তু আগুইনালডোর পরাভবে ফিলিপাইনবাসীরা পরাভব স্বীকার করিলেও তাহাদের অসন্তোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

এ দেশের অধিবাসীরা অলস ও উদ্যমহীন। ইহারা সকলেই সঙ্গীতপ্রিয় এবং বাজী পোড়াইতে ভালবাসে। ইহারা আনারসের আঁশ হইতে যে কাপড় বয়ন করে, তাহা অতি উপাদেয় এবং তাহাই বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মহিলাদিগের অঙ্গে শোভা পায়। পুরুষরা আজকাল য়ুরোপীয়দিগের বেশের অনুকরণ করিতেছে। এ দেশে উৎকৃষ্ট চুরুট প্রস্তুত হয় এবং এক প্রকার কদলীবৃক্ষের আঁশ হইতে যে দৃঢ় রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহা সমগ্র জগতে সুপরিচিত ও সমাদৃত। চিত্রবিদ্যায়ও ইহাদের অনুরাগ আছে।

মেনিলা এই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বন্দর। সহরে নানা জাতীয় লোক বাস করে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মেনিলার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। তদবধি অপেক্ষাকৃত লঘু উপাদানে গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। একবার দূরস্থিত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমে একটি হ্রদের জল উত্তপ্ত হইয়া মৎস্য নষ্ট হয়—তাহারই ফলে সে প্রদেশে ব্যাধিবিস্তারহেতু ৭০ হাজার অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দেও একটি ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমে ১ হাজার ৪ শত লোকের মৃত্যু হয়। সময় সময় জলস্তম্ভেও দ্বীপপুঞ্জের ক্ষতি হয়।

মার্কিণ এই দেশ অধিকার করিবার পর ইহার বন্দরাদির বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে। স্পেনের অধীন থাকিবার সময় এ দেশের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। মার্কিণ সে বিষয়ে অবহিত হইয়াছে। গোমড়কে কৃষিকার্য্যোপযোগী পশু নষ্ট হইলে ভারতবর্ষ হইতে পশু আমদানী করা হইয়াছে।

রজ্জুর জন্য আঁশ শুকান হইতেছে।

এ দেশে বিষধর সর্প, মাকড়শা, ইন্দুর, আরশুলা ও পিপীলিকার বাহুল্য। অন্য দেশে লোক যেমন ইন্দুর মারিবার জন্য বিড়াল পুষে, ফিলিপাইনে তেমনই লোক বাড়ীর ছাতে সাপ রাখে!

আগুইনালডোর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয়, তাহা দমিত হইবার পর হইতে আমেরিকা এই বিজিত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টিত হইয়াছে। অন্য শ্বেতাঙ্গ জাতিরা মার্কিণের এই চেষ্টায় বিদ্রূপের হাসি হাসিলেও মার্কিণ তাহার আরব্ধ কার্য্যে শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই। পরন্তু রাষ্ট্রপতি উইলসন ফিলিপাইন-বাসীদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের মনে হইয়াছে, তাহারা অচিরেই স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে পারিবে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইনের শাসনভার ৫ জন আমেরিকান সদস্যে গঠিত সিভিল কমিশনের হস্তে ন্যস্ত হয়। জেনারল টাফট তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি পরে মার্কিণের রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন। অল্পদিন পরে এই কমিশনে ৪ জন ফিলিপাইনবাসীকে সদস্য করা হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান অধিবাসীদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করিয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হয় এবং কমিশন বিলাতের হাউস অব লর্ডসের এবং ভারতে কাউন্সিল অব ষ্টেটের মত থাকে।

মহিষের পৃষ্ঠে ফিলিপিনো।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা একযোগে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবি করেন এবং বলেন, তাঁহাদিগকে সে অধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

এখন আমেরিকা ফিলিপাইনের গভর্ণর ও প্রধান রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেও গণতন্ত্রের প্রসারে তথায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনকল্পে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদলে গঠিত ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় পার্লামেণ্ট হইতে আমেরিকার কংগ্রেসে ২ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় এবং শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকিলে ফিলিপাইনবাসীরা সিভিল সার্ভিসে সকল পদই লাভ করিয়া থাকেন। সিভিল সার্ভিসে তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

আমেরিকা হইতে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষক পাঠাইয়া ফিলিপাইনে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং নানা ভাষাভাষী ফিলিপাইনবাসীরা এখন ইংরাজী শিখিয়া এক ভাষায় পরস্পরের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেছে। বিচারালয়ে মার্কিণ বিচারকের সহিত ফিলিপাইনবাসী বিচারক বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করেন। সংবাদ-পত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানফলে ফিলিপাইনে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে মার্কিণের সৈনিকরা ফিলিপাইনবাসীদিগকে আপনাদের সমান বলিয়া মনে করিত না। একটা চলিত গান ছিল, "ফিলিপিনো রাষ্ট্রপতি টাফটের ভাই হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করি না।"

"He may be a brother of William H Taft,
But he ain't no brother of mine."

কিন্তু মার্কিণ রাজনীতিকরা কখনই মনে এরূপ ভাব পোষণ করেন নাই। ফিলিপাইনবাসীরাও ইহাতে বিরক্ত হয়। সংপ্রতি গভর্ণর জেনারল উডের স্বেচ্ছাচারে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদকল্পে তাঁহার কাউন্সিল অব ষ্টেটের ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা পদত্যাগ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি হার্ডিং যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে ফিলিপাইনবাসীদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা ছিল—"হনোজ দিল্লী দূর-অস্ত"—স্বায়ত্ত-শাসনের পথ এখনও দীর্ঘ। ফিলিপাইনবাসীরা ইহাতে বিরক্ত হয়।

গভর্ণর জেনারল উড ও আগুইনালডো।

ফিলিপাইনের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ম্যাহুয়েল কোয়েজোন (Manuel Quejon) গভর্ণর জেনারলের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে অগ্রণী। তিনি বলেন, এই আন্দোলনে মার্কিণের প্রাধান্য সম্বন্ধে কোন কথা উঠিতেছে না—ফিলিপাইনবাসীরা মার্কিণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে; কিন্তু গভর্ণর জেনারল ফিলিপাইনবাসীদিগের স্বায়ত্ত-শাসনক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।

এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে ফিলিপাইন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও প্রেসব্যুরোর সেক্রেটারী সামশন বলেন :—

(১) ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্থির হইয়াছিল, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ফিলিপাইনবাসীদিগকে যথাসম্ভব স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা হইবে।

(২) গভর্ণর জেনারল উডের কায এই নীতির বিরোধী।

(৩) ফিলিপাইন সরকারের মেনিলা রেলরোড কোম্পানীটি নিউইয়র্কের এক কোম্পানীকে ভাড়া দেওয়াইবার জন্য উড চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফিলিপাইন নেতাদের চেষ্টায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

(৪) গভর্ণর জেনারল ফিলিপাইন সরকারকে জাতীয় ব্যাঙ্ক ত্যাগ করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

যে ব্যাপার লইয়া ফিলিপাইনে পদত্যাগ হইয়াছে, সেরূপ ব্যাপার ভারতবর্ষেও হইয়াছে এবং তাহারই ফলে যুক্ত-প্রদেশে অপমানিত মন্ত্রী শ্রীযুত চিন্তামণি ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ পদত্যাগ করিয়াছেন। মেনিলার গোয়েন্দা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী অভিযুক্ত হইয়া আদালতের বিচারে অব্যাহতি লাভ করিলে গভর্ণর জেনারল তাহার অব্যবহিত উপরিস্থিত কর্ম্মচারীর মত না লইয়াই তাহাকে চাকরীতে বহাল করেন। সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পদত্যাগ হয়। তাহার পূর্ব্বে আর্থিক ব্যবস্থা লইয়াও উভয়দলে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। পদত্যাগ করিয়া কর্ম্মচারী ও সদস্যরা আমেরিকায় তাঁহাদের কথা জানাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করেন। ব্যবস্থাপক সভা Commission of Independence রূপে গঠিত হইয়া পদত্যাগ সমর্থন করেন, গভর্ণর জেনারলকে সরাইয়া দিতে বলেন এবং ফিলিপাইনে অবিলম্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা দাবি করেন।

ম্যানুয়েল কোয়েজোন।

(৫) উভ ফিলিপাইনবাসীদিগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

উভয় পক্ষের লোকের কথা—গভর্ণর-জেনারল হ্যারিসন ফিলিপাইন সরকারের কায সে দেশের লোকের উপর দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাযে ও রাষ্ট্রপতি উইলসনের কথায় ফিলিপাইনবাসীরা মনে করিয়াছিল, তাহাদের দেশে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

বাস্তবিক ফিলিপাইনবাসীদিগকে স্বদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা করাই রাষ্ট্রপতি উইলসনের উদ্দেশ্য ছিল এবং ফিলিপাইন-বাসীরাও সেই জন্য মার্কিণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া স্বদেশে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

কেহ করিয়াছেন। আমেরিকা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন জয় করিয়া তাহার আনুষঙ্গিক বিদ্রোহ দমন করিয়াই অবিলম্বে তথায় গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তিস্থাপন করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কমিশন নিযুক্ত করিয়া কয় বৎসরের মধ্যেই ৯ জন সদস্যের ৪ জন ফিলিপাইনবাসী করা হয়। তাহার পর বৎসর যাইতে না যাইতে পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ফিলিপাইনবাসীরা এখন সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করিতেছে।

আর ভারতে? ভারতবাসীরা ইচ্ছা করিয়া বণিক ইংরাজের হস্তে রাজদণ্ড তুলিয়া দিয়াছিল। ১ শত ৫০ বৎসর শাসনের পর ইংরাজ ঘোষণা করিয়াছে—এ দেশে

[illegible]

ফিলিপাইনে মহিলারাও মুক্তির আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। গত বৎসর তাঁহারা জাতীয় সঙ্ঘ গঠিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহারা দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার ও মহিলাদিগের অধিকার-বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান ব্যাপারে ইঁহারা বলিতেছেন, ফিলিপাইনবাসীরা আইনের দ্বারা শাসিত হইবে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নহে।

ফিলিপাইনে আমেরিকা যে ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষে ইংরাজপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার তুলনা কেহ

দায়িত্বশীল শাসনের প্রতিষ্ঠা করাই ভারতে ইংরাজশাসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কত কালে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা বলা হয় নাই। আর সেই কথা বলিবার পরই বিলাতের প্রধান মন্ত্রী হইতে ভারতসচিব পর্য্যন্ত যে ভাবের কথা বলিতেছেন এবং বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর যে লাঞ্ছনা অবাধে চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ যে বিনা চেষ্টায় স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে, সে সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত।

আত্মদান

নেলী কতক্ষণ জাফরির ধারে বসিয়াছিল, জানে না। বাহিরে বর্ষার বারিধারাপাতের দিকে তাহার আয়ত নয়ন দুইটি পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেও সে বারিপতনের দিকে দেখিতেছিল না। কোলের উপর বোনার কার্পেট-খানা অনাদরে পড়িয়া ছিল; হাতের কুরুশকাঠিটা হাতে ছিল বটে, কিন্তু সে বোনার কায কিছুই করিতেছিল না। খোলার ঘরের চতুঃসীমার মধ্যে নেলীর দেহটা অবস্থান করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটি কোথায় কোন্ দেশে বিচরণ করিতেছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না।

নেলী আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। রাজার হালের সুখের চাকুরী সে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে, এখন খাইবে কি? রুগ্না জননীকে খাওয়াইবে কি? তাহার পিতা জন হরনাথ ঘোষ কত কষ্টে খিদিরপুর ডকে একটি চাকরী জুটাইয়া সে তাহাদিকে ইটালির এই খোলার ঘরে "মানুষ" করিয়াছে—রুগ্না পত্নীকে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহা সে-ই জানে। সেই দুর্জ্জয় সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গত বৎসর জন তাহাদের নিকট ইহজন্মের ছুটী লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আহা, অভাগা সে—চাপাহাটির সম্ভ্রান্ত ঘোষেদের ছেলে সে—যৌবনের ক্ষণিক মোহে সে স্বজাতীয়া এক বালবিধবাকে কুলত্যাগিনী করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছিল, আনিয়া সমাজের তাড়নাতেও সে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই, খৃষ্টান হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু দাম্পত্যসুখ এক দিনও বিধাতা তাহার কপালে লিখেন নাই, পুত্রকন্যাকে এক দিনও সে মনের সাধ মিটাইয়া খাওয়াইতে পারে নাই। প্রথমে পল, তাহার পর নেলী—নেলীর জন্মের পরই তাহার পত্নী শয্যা লইয়াছিল—সেই রুগ্নার সেবায় জনের জীবন ব্যর্থ হইয়াছিল। একে চিরদারিদ্র্য, তাহার উপর সংসারে নিত্য দুঃখ,—জনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, জন যে শয্যা লইল, তাহা হইতে মহাযাত্রা করিল। জন ছেলেমেয়েকে অনাথ খৃষ্টান বালকবালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লিখাপড়া শিখাইয়াছিল। পল পাড়ার অসৎসঙ্গে মিশিয়া অল্প-বয়স হইতেই নেশা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু নেলী যেমন লিখাপড়ায়, তেমনই স্বভাবচরিত্রে ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। সে যখন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই, এ, পড়িতেছে, সেই সময়ে জনের মৃত্যু হয়। আর লিখাপড়া হইল না। পল বহুপূর্ব্বেই লিখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, জন বহু সাধ্যসুপারিশ করিয়া তাহাকে নিজের আফিসে ঢুকাইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু পল প্রায়ই মাতাল হইয়া আফিসে যাইত, প্রায়ই কামাই করিত, কাযেই অধিক দিন তাহাকে চাকুরী করিতে হইল না। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডা-বদমাসদের সহিত মিশিয়া ক্রমশঃ অধঃপাতের চরমসীমায় যাইতে লাগিল, অথচ দুই বেলা দরিদ্র পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না।

পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুর পর নেলী চারিদিক আঁধার দেখিল। সংসারে রুগ্না জননী, কুপোষ্য ভ্রাতা, সে স্বয়ং—মোট তিনটি প্রাণী খাইতে, অথচ আয় এক পয়সা নাই। সে স্কুলের পড়ুয়া, পড়াশুনাই করে, সংসারের ধার ধারিত না। অবশ্য ইদানীং সংসারের রান্নাবান্না গোছগাছ তাহাকেই সব করিতে হইত বটে, কিন্তু পয়সা উপার্জ্জনের সঙ্গে তাহার সংস্রব ছিল না। তবে নেলী কাপড়ের কাটছাঁট এবং সেলাই ও নানারূপ বোনার কায শিখিয়াছিল বলিয়া পাড়ার দুই চারি ঘর ফিরিঙ্গীবাড়ীর সেমিজ, জ্যাকেট সরবরাহ করিয়া যাহা কিছু উপায় করিত, তাহা হইতে রুগ্না জননীর পথ্য ও মুখরোচক খাদ্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু সংসারের খরচ যোগান?—সে যে বিষম কথা। পেটের ভাত জুটে না, স্কুলের খরচা যোগায় কে?—কাযেই নেলীকে স্কুল ছাড়িতে হইল। পলের চুলের টিকি দেখা যায় না, কিন্তু আহারের সময় পল ঠিক হাজিরা দেয়। রুগ্না জননী চোখের জলে ভাসিয়া হাতে ধরিয়া বুঝাইলে সে তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল; নেলী তাহাকে বাড়ীর বাহির

হইতে বাধা দিতে গেলে সে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে গিয়াছিল। নেলী উপায়ান্তর না দেখিয়া এই বালিকাবয়সেই নিজের কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরু বোঝা চাপাইয়া লইল, অনেক চেষ্টার পর স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীর সুপারিসে সার্কুলার রোডের বিখ্যাত ধনকুবের রায় বাহাদুর রমানাথ মজুমদারের বাড়ী একটা প্রাইভেট টিউটারী জুটাইয়া লইল। রায় বাহাদুরের বালিকা কন্যা লাবণ্যকে দ্বিপ্রহরে শিক্ষাদান করিতে হইবে—লিখাপড়া, ড্রয়িং আর হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজান, বেতন ৫০, টাকা। নেলী যে দিন প্রথম বেতন পাইল, সেই দিন ঘরে ফিরিয়া ভূতলে জানু পাতিয়া প্রেমময় ভগবানের কাছে তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল, তাহার নয়ন দিয়া দরদর ধারে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আজ তাহার সেই বড় সাধের—বড় সুখের চাকুরী আর নাই। যাহা তাহার একমাত্র ভরসা ছিল, একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহা সে স্বেচ্ছায় ঘুচাইয়াছে। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। পথে কচিৎ দুই এক জন লোক ছাতা মাথায় দিয়া কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে চলাচল করিতেছিল। গলিটা সঙ্কীর্ণ, সে পথে গাড়ী চলে না, কাজেই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। নেলীর দৃষ্টি জাফরির বাহিরে থাকিলেও সে কিছুই দেখিতেছিল না, কেবল আপনার অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ নেলীর তন্দ্রাবিষ্ট মনের দ্বারে আঘাত করিয়া কে ডাকিল, "নেলী!" নেলী চমকিয়া উঠিয়া জাফরির বাহিরে দৃষ্টি আবদ্ধ করিবামাত্র দেখিল, জাফরির সম্মুখভাগ অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া এক মনুষ্যমূর্ত্তি। তাহার মাথায় ছাতা নাই, তাহার মস্তকের কুঞ্চিত অযত্ন বিন্যস্ত কেশপাশ হইতে পদতলের মূল্যবান ভেলভেটের জুতা পর্য্যন্ত সমস্তটা বর্ষার জলে স্নাত হইতেছিল। তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নেলীর সমস্ত দেহ থরথর কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানি একবার রক্তাভ হইয়া পরক্ষণেই ম্লান হইয়া গেল, সে বেতের মোড়া হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার পা দুইটি এতই কাঁপিতে লাগিল যে, অন্যত্র যাওয়া তাহার পক্ষে তখন অসম্ভব হইয়া পড়িল।

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিল, "নেলী, এখানে আমায় দেখে খুবই আশ্চর্য্য হচ্চ বোধ হয়, তা তুমি আমার না ব'লে এমন ক'রে চোরের মত চুপি চুপি পালিয়ে এলে কেন? ভেবেছিলে, ঠিকানা খুঁজে বা'র করতে পারব না? কেমন, না?"

নেলী কথার জবাব দিল না।

আগন্তুক আবার বলিল, "বেশ যা হ'ক, কথার একটা জবাবও নেই? জলে দাঁড়িয়ে ভিজছি, একবার ভিতরে আসতেও বললে না? বেশ ভদ্রলোক যা হ'ক।"

এই সময়ে নেলীর মা কামরার পর্দ্দার আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে নেলী?"

এতক্ষণে নেলীর চমক ভাঙ্গিল, সে পর্দ্দার অপর পার্শ্বে গিয়া মায়ের কাছে চুপি চুপি একটা কথা বলিল। নেলীর মা সেই কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "ও মা, সে কি রে, ভদ্দরলোকের ছেলে পথে দাঁড়িয়ে ভিজছে! দে, দে, দরজা খুলে দে।"

নেলী খিল খুলিতে গেল, নেলীর মা কেশ ও বসন সংযত করিয়া, পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া, নেলীর 'ড্রয়িংরুমে' আসিয়া একখানা ভাঙ্গা বাঁশের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। নেলী আগন্তুককে লইয়া কামরায় প্রবেশ করিলে নেলীর মা বলিলেন, "ও মা, একবারে নেয়ে গেছ, বাবা? ছি: ছি:, অসুখ করবে যে। যা না নেলী, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে, একখানা তোয়ালে আর কাপড় এনে দে।"

নেলী পর্দ্দার ভিতরে চলিয়া গেল।

আগন্তুক যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল, "না না, ও সব দরকার হবে না। আমরা ফুটবল খেলতে গিয়ে অমন কত ভিজে থাকি। দিন দিকি চট্ ক'রে একটু চা তৈরী ক'রে, ও সব সেরে যাবে'খন।"

নেলীর মা'র মুখ শুকাইল। পেটে ভাত জুটে না তার আবার চা! চা ত একলা নয়, চায়ের সঙ্গী চাই দুধ, চিনি—সে সব কোথায় জুটিবে?

নেলী কাপড় তোয়ালে রাখিয়া পর্দ্দার আড়ালে চলিয়া যাইতেছিল, মা বলিলেন, "যা না মা, ন্যাথানিয়েলের মা'র কাছে যদি একটু দুধ-চিনি পাস, আন না।"

যুবক ভিজা কাপড় ছাড়িবার জন্য বাহিরের রোয়াকে যাইতেছিল, কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কাপড় তোয়ালে রাখিয়া বলিল, "কিছু আনতে হবে না, মা, এক দৌড়ে আমি সব আনছি, এই দু পা দূরে গলিটার মোড়েই একটা মুদীর

দোকান দেখে এসেছি।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে একলম্ফে রাস্তায় নামিয়া দৌড় দিল, মা ও মেয়ে অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

মেয়ে একটু ক্রোধাভিমানজড়িত স্বরে বলিল, "সব জান ত, মা, তবে কেন ডেকে ঘরে বসালে?"

মা বলিলেন, "ও, মা, শোন কথা! ছেলেটা ভিজে নেয়ে এসেছে, বসতে বোলবো না?"

মেয়েও সমান ওজনে জবাব দিল, "না, বলবে না। আমরা গরীব চাষী, বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আমাদের মাখামাখি কেন?"

মা এ 'কেন'র জবাব দিতে না দিতে যুবক ঘরে হাজির। দুই হাতে কোটের বোঝাই পকেট হইতে চায়ের কৌটা, জমাট দুধের টিন ও চিনির প্যাকেট খালাস করিতে করিতে বলিল, "ভাল জিনিস কি এখানে পাওয়া যায়, যা পেলুম, নিয়ে এলুম। লক্ষীটি নেলী, বেশ গরম গরম এক পেয়ালা চা খাওয়াও দেখি।"

নেলী ততক্ষণ পর্দ্দার আড়ালে গিয়াছিল। নেলীর মা বলিলেন, "এত সব কি এনেছ, বাবা, এ সব কি হবে? এক পেয়ালা চা বই ত নয়।"

যুবক বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিল, "বাঃ, আমি বুঝি একলাই খাব, এতটা স্বার্থপর আমায় ভাববেন না।"

নেলী চা লইতে আসিয়াছিল, কথাটা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তবে কি গরীব ব'লে আমাদের এ সব ভিক্ষে দিতে এসেছেন?"

আহত যুবকের মুখখানা একেবারে ম্লান হইয়া গেল, সে কাতরস্বরে বলিল, "নেলী, তুমি কি আমায় পর ভাব?"

নেলী তখন চা চিনি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। নেলীর মা বলিলেন, "বেশ করেছ, বাবা, এখন কাপড় ছেড়ে এই মোড়াটায় ব'স। গরীবের কুঁড়ে, কোথায় বসতে দেব, বাবা?"

যুবক মোড়ায় বসিয়া বলিল, "কেন, এই ত বেশ আরামে বসেছি। দেখুন, মা, আমি নেলীকে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।"

মা বলিলেন, "সে কি, বাবা, ভিক্ষে আবার কি?"

যুবক বলিল, "জানেন না বোধ হয়, নেলী আমার বোনকে পড়াত। আজ ১ দিন হ'ল, কি জানি কেন, আমাদের উপর রাগ ক'রে চ'লে এসেছে। লাবি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, বাবা-মা আশ্চর্য্য হয়েছেন, কেন নেলী কায ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসেছে? আপনি বলুন, নেলী আবার যেমন কায করছিল, তেমনই করবে, না হ'লে আজ আমি এখান থেকে উঠবো না।"

নেলীর মায়ের মুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, বাবা, কথা যখন পাড়লে, তখন সব খোলাখুলিই বলাই ভাল। নেলী তোমার ভয়ে কায ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, সে ত আর কাযে যেতে পারে না।"

যুবক বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "আমার ভয়ে?"

"হাঁ, তোমার ভয়ে। আমরা গরীব, তার উপর খৃষ্টান। তোমরা বড়লোক, হিন্দু। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক সম্ভব হ'তে পারে?"

যুবক বলিল, "আমি ও-সব মানি না।"

"তুমি না মানতে পার, কিন্তু তোমাদের সমাজ মানে, তোমার বাপ-মা মানেন, তুমি কি ব'লে নেলীকে ভালবাসার কথা বল? নেলীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'তে পারে না, তবে তুমি কোন সাহসে নেলীর কাছে ভালবাসার কথা মুখে আন? দেখ, রাগ কোরো না, তোমার ও চোখের নেশা দু'দিনে কেটে যাবে, মাঝে হ'তে এই গরীবের মেয়ের মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছ কেন?"

"চোখের নেশা? আমি এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌ছি, নেলীকে ছাড়া আমি কাউকে বিবাহ কোর্‌বো না।"

নেলীর মা পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, যা রাখ্‌তে পারবে না, তা শপথ করতে নেই। বাবা, নেলী আর যা হ'ক, বড় অভিমানিনী; তুমি এমন ক'রে অন্যায় অত্যাচার করলে হয় ত আত্মহত্যা করতে পারে।"

যুবক দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "নেলী আত্মহত্যা করবে? কেন, কি দুঃখে? যদি আপনার মত হয়, বলুন, আজই আমি নেলীকে বিবাহ করছি।"

এই সময়ে নেলী চা লইয়া হাজির হইল। চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়া নেলী দৃঢ়স্বরে বলিল, "দেখুন, আপনি পাগল হ'তে পারেন, আমরা পাগল নই। আজ যা

করেছেন, তার আর উপায় নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন ক'রে উৎপীড়ন করলে আমরা পুলিসের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।"

যুবকের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে চায়ের পেয়ালা মাটীতে রাখিয়া ব্যথিত অভিমানাহত স্বরে বলিল, "নেলী, সত্যই কি তুমি আমায় অবিশ্বাসের চোখে দেখ্‌তে অভ্যাস করেছ? তোমার জন্যে আমি পিতা-মাতা, সমাজ, স্বজন সমস্ত ছাড়তে প্রস্তুত হয়েছি, আর তুমি আমায় এত হীন, এত নীচ ভাব যে, আমি তোমায় উৎপীড়ন কোরবো ব'লে এইখানে এসেছি মনে করছ? নেলী, তা হ'লে বোলবো, তুমি আমায় বুঝ্‌তে পারনি। এর একমাত্র উত্তর, আমি তোমায় যে চোখে দেখেছি, তুমি আমায় সে চোখে দেখ না। বেশ, আমি আর আসবো না, বাড়ী ফিরেও যাব না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কোরো, লাবণ্যকে যেমন পড়াচ্ছিলে, তেমনই পড়িও, আমি তোমার ত্রিসীমায় যাব না।"

যুবক এই কথা বলিয়া ভিজা কাপড়েই ঘরের বাহির হইয়া গেল। চায়ের পেয়ালা যেমন, তেমনই পড়িয়া রহিল। যাত্রাকালে তাহার ব্যথিত অভিমানাহত নয়ন যে দৃষ্টিতে নেলীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, নেলী তাহা জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

নেলীর মা নেলীকে বুকে টানিয়া লইয়া সযত্নে মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বুঝেছি, মা, কি বেদনা বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিস্। কিন্তু, মা, ত্যাগেই সুখ।"

নেলীর ঝর্‌ঝর্ অশ্রুপাতে তাহার বক্ষঃস্থল ভিজিয়া গেল।

২

রায় বাহাদুরের বাড়ী আজ মহাসমারোহ, আজ লাবণ্যের জন্মতিথির উৎসব। বিস্তর সম্ভ্রান্ত ধনিগৃহের স্ত্রী পুরুষ আমন্ত্রিত, দেশী বিদেশী নানা প্রকার খানাপিনার আয়োজন। আগন্তুক নিমন্ত্রিতগণের হাস্যকোলাহলে বাড়ীটি মুখরিত। এমন আনন্দের দিনে কর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্বামী মহা বিষণ্ণভাবে অন্দরের শয়নগৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে গভীর চিন্তারেখা প্রকটিত, একখানি পত্র তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ, তিনি অনন্যদৃষ্টি হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছেন।

এই সময়ে গৃহিণী কক্ষে দেখা দিলেন। তিনি মহা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "বেশ যা হ'ক্, কন্মবাড়ী, আমার কি এক দণ্ড মরবার অবকাশ আছে? এ সময়ে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?"

কর্ত্তা কিছু জবাব না দিয়া পত্রখানি হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

কর্ত্তার ভাবগতিক দেখিয়া গৃহিণীরও মুখ গম্ভীর হইল। তিনিও আর কোন কথা না বলিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন স্পষ্ট প্রকটিত হইয়া উঠিল। পাঠ শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "এই চিঠি, এমন দিনে?"

"হাঁ, এমন দিনে। এই জন্যেই কি ওকে গর্ভে ধারণ করেছিলে? হতভাগা মুখে চুণকালি দিলে! বলে কি না, খিষ্টানীটার সঙ্গে বিয়ে না দিলে সংসারে থাকবে না! নির্লজ্জ বেহায়া, বাপকে এমন চিঠি লিখ্‌তে লজ্জা হ'ল না? খিষ্টানীটাকে আজই দূর ক'রে দাও, যত নষ্টের গোড়া ঐ ছুঁড়ীটা!"

"অমন কথা বোলো না। পেটের ছেলে হ'লে কি হয়, দোষ ত ওরই। ওর ভয়ে নেলী কাজ ছেড়ে পালিয়েছিল। আহা, গরীব, চাকরী ছেড়ে কি খাবে, একবারও ভাবে নি।"

"হাঁ, হাঁ, তুমিও যেমন, ও সব সমজাতীয় তোমরা কি জানবে, ওরা মিট্‌মিটে ডান।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু এ কাজে তোমার ছেলেই যে দোষী, তাতে সন্দেহ নেই। মেয়েটা ত চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল, তুমী ঝাবিয়ায় চ'লে গেল ব'লে না আবার ডাক্‌লে, এল।"

"তা ব'লে ছেলেটা বিগ্‌ড়ে যাবে? দেখ না, বোনের জন্মোৎসব, এতেও আস্‌তে চায় না, বলে, ওর কথায় অনুমতি না দিলে আর বাড়ী ফিরবে না। অনুমতি দেবে—ওর মুণ্ডু দেবে! হতভাগা! লেখাপড়া শিখে বানর হোলো!"

"তা তোমারই ত দোষ। তোমরা কেন খিষ্টানের মেড়ে মেয়ে মাইনে ক'রে বাড়ীতে রাখ?"

"বাঃ, তা কেন রাখ্‌বো না মেয়েটা মুখ্যু হয়ে থাক্!"

"তবে আবার গজগজ্ কর কেন? আগুন আর ঘি একত্তর করবে, জ'লে উঠলে খাউ খাউ করবে, বেশ যা হ'ক্।"

কর্ত্তা নীরবে বসিয়া রহিলেন, অনবরত গোঁফের অগ্রভাগ মুচড়াইতে লাগিলেন, পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "খিষ্টানীটা কোথায় ? তাকেও মেমস্থন্ন করেছ বোধ হয় ?"

"আমায় করতে হয়নি, সে লাবিই করেছে। কেন, তাকে তোমার কি দরকার, সে এখন লাবির ঘরে ব'সে আছে, সেখানে লাবির ল্যাভেণ্ডার, ওডিকলোনরা খেলাধূলো করছে।"

"এইখানে পাঠিয়ে দাও তাকে একবার : মিসেস্ ওলিভার খুব মাষ্টারণী বেছে দিয়েছিল বটে !"

গৃহিণী বলিলেন, "তা দিচ্ছি, কিন্তু রাগের মাথায় তা'কে যেন কিছু বোলো না, সে ভদ্দরলোকের মেয়ে, তা'র মান অপমানজ্ঞান খুবই আছে।"

"ওঃ, ভদ্দরলোকের মেয়ে ! যাও, যাও, পাঠিয়ে দাও, আজ তা'র সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।"

"দেখ, যা বলতে হয়, আমায় দিয়ে বলাও। তোমরা পুরুষমানুষ, কি বলতে কি বলবে "

"আঃ ! পাঠিয়েই দাও না, আমি কি তা'কে শাঁখা-বাজুবন্ধ কোরবো, না মারবো-ধোরবো ! ভাল জ্বালা বটে !"

"কি জানি বাপু, কি যে হবে," গৃহিণী এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা পত্রখানা পুনরায় একবার পাঠ করিলেন। পড়িতে পড়িতে দুই একবার ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত আপনা আপনি বলিলেন, "ড্যাম ফুল ! ইডিয়ট ! বোকা গাড়ল !"

ইত্যবসরে নেলী আসিয়া ঘরের দেবাজের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পশ্চাতে রায় বাহাদুরকে গম্ভীরভাবে নিমগ্ন দেখিয়া কোনও কথা কহে নাই। সে নিঃশব্দপদ সঞ্চারে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কাজেই সে দিকে রায় বাহাদুরের দৃষ্টি পড়ে নাই।

পত্র হইতে চোখ উঠাইয়া তিনি সম্মুখে নেলীকে দেখিতেই নেলী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছেন ?"

রায় বাহাদুর গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "হঁ, ডেকেছি। তোমার মতলব কি ?"

ভয়ে নেলীর প্রাণ উড়িয়া গেল। বস্তুতঃ একেই সে স্বভাবতঃ ভীরু, তাহার উপর এই রাশভারী স্বভাবতঃ গম্ভীর রায় বাহাদুরকে সে যমের মত ভয় করিত। সে তাঁহার বেতনভুক্ কর্ম্মচারী বটে, কিন্তু কচিৎ কখনও মনিবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত, বাড়ীর মেয়েদেরই সহিত তাহার উঠাবসা কথাবার্ত্তা হইত। যদি কখনও দৈবাৎ সে গৃহে যাতায়াতকালে রায় বাহাদুরের সম্মুখে পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার দিকে না চাহিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইত।

এখন তাঁহার মুখে 'তোমার মতলব কি' শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইল। সে ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন, বুঝতে পারছি না।"

"তা পারবে কেন, আমার ছেলেটার মাথা খাবার সময় ত বেশ টনটনে বুঝতে পার ! দুধ-কলা দিয়ে বাড়ীতে কালসাপ পুষছি বটে !"

নেলী প্রথমটা সব কথা তলাইয়া বুঝিতে পারে নাই ; তাহার পর বুঝিলে তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত চনচন করিয়া উঠিল, মাথাটা ঘুরিয়া গেল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দারুণ অপমানে তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল, সে গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি ত চাকুরী ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলুম, আপনারা আমায় ডেকে আনলেন কেন ? যদি আপনার ইচ্ছা না থাকে, আমি আজই চ'লে যাচ্ছি।"

"আহা হা, শোন না, রাগ কর কেন, আমি কি তোমায় জবাব দিচ্ছি ? এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ দেখি, ছুঁপে লিখেছে ; বাপের মনে এতে কি হয় ?"

"চিঠিখানি আমি পড়তে চাই না, আমার সঙ্গে ও চিঠির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি চ'লে যাচ্ছি।"

নেলী কক্ষত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর দ্রুতপদে দ্বারসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, কর্কশস্বরে বলিলেন, "কোথা যাবে, তোমার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে। ইচ্ছামত 'যাব' বললেই হ'ল ? যতক্ষণ মাইনে খাবে, ততক্ষণ আমার হুকুম শুনতে হবে।"

কর্ত্তা নেলীকে টানিয়া লইয়া গিয়া একখানা সোফার উপর বসাইয়া দিলেন। নেলী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, অতিরিক্ত ভয়ে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, তাহার মুখে একটি কথাও সরিল না।

হঠাৎ এই সময়ে গৃহিণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কি, হয়েছে কি ? তুমি বুঝি নেলীকে বকেছো ? ছিঃ ছিঃ, তোমার একটু আক্কেল নেই ? ওর দোষ কি ?"

গৃহিণী আসিয়া নেলীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইতেই নেলী তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া ঝর্-ঝর্ কাঁদিয়া ফেলিল। তিনি সস্নেহে নেলীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ছি, মা, কাঁদে না। চল যাই, দাবি ডাকছে।"

কর্তার রাগ পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি বোধ হয়, এতক্ষণে নিজের হঠকারিতা ও অভদ্রতায় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, যাবে কেন? স্বীকার করছি, আমার অন্যায় হয়েছে। তা, দেখ ত প'ড়ে চিঠিখানা, রাস্কেল যা লিখেছে, তাতে মরা মানুষেরও রাগ হয়। বলে কি না, তা'র হুকুমমত বিয়ে না দিলে দেশে-ঘরে ফিরবে না, সংসার-ধর্ম্ম করবে না। ইডিয়ট!"

গৃহিণীও এইবার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তা সত্যি বাপু। যা হিঁদুর ঘরে হয় না, হ'তে পারে না, তাই করতে হবে, এমন কি জেদ? ভূপীর আর সব ভাল, ঐ যে কেমন অন্যায় জেদ, যা গোঁ ধরবে, ছাড়বে না।"

কর্ত্তা মনের মত কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এইবার প্রফুল্লমনে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তাই বলছিলুম, আমাদের এই পাগলামিতে মত নেই, তোমারও দেখছি তাই, না হ'লে তুমি চিঠির সংস্পর্শেও আসতে চাইবে না কেন? তা, আমি বলছিলুম কি, তুমিই তোমাদের খৃষ্টানদের ভিতর একটা বিয়ে ক'রে ফেল না, তোমার ত বয়েস হয়েছে। জানা শোনা যদি বিয়ের যুগ্যি ছেলে থাকে—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "আঃ, তুমি নেলীকে ও-সব কথা বলছ কেন? ও কি নিজের কর্ত্তা?"

"হাঁ, হাঁ, তা বটে, তা বটে। তা, তোমার মা আছে শুনেছি না? তা, এক দিন তাকেই এইখানে আসতে বোলো না, তোমার বিয়ের কথা-টথা কওয়া যাবে—যা খরচা পড়বে, আমি না হয় সেটা দিয়ে দেব। তোমার বিয়ের কথা শুনলে হতভাগাটার যদি চৈতন্য হয়।"

গৃহিণীও সায় দিয়া বলিলেন, "তা সত্যি বাপু।"

এতক্ষণ নেলীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল। এই বড়মানুষগুলোর প্রাণ বলিয়া কি কোন একটা জিনিষ নাই? ইহারা গরীবকে কি ভাবে? বাড়ীর কুকুর-বিড়ালকে অথবা ঘটীটা বাটিটাকে ইহারা যে ভাবে ব্যবহার করে, আজ পরের মেয়ে নেলীর সঙ্গেও তাহারা সেইরূপ করিতে চায়। কেন, গরীব বলিয়া ত? তাহাদের আদুরে ছেলে একটা অন্যায় বায়না ধরিয়াছে বলিয়া তাহার স্বার্থের হাড়িকাঠে গরীবের মেয়ে নেলীকে মাথাটা বাড়াইয়া দিতে হইবে—সেই গরীব মেয়ের মা'কে বড়মানুষের বাড়ী এত্তেলা দিয়া ভিক্ষা সাধিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে! কেন বল দেখি? নেলীর সমস্ত প্রাণটা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গরীব বলিয়া কি সে খেলার পুতুল—ইচ্ছামত বড়লোক তাহার প্রাণটা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে, ইচ্ছামত বড়লোক তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবে?

নেলী কিছু কাল ক্রোধে কথা কহিতে পারিল না, তাহার দীপ্ত আয়ত নয়ন কেবল একবার ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। মুহূর্ত্ত পরেই সে মনের উপর রীতিমত সংযমের বল্গা চাপিয়া ধরিয়া অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, আপনারা যা ইচ্ছে করছেন, আমারও তা'তে কোন অমত নেই। আমি আজই এখানকার কায ছেড়ে দিচ্ছি, যাতে আর এক দিনও আপনাদের সংস্রবে না আসতে হয়, তাই করব। আমি ফিরে—"

বাধা দিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কায ছেড়ে চ'লে গেলে কি হবে? তা হ'লেই কি সেই বাঁদরটা তোমার আশা ছেড়ে দেবে? তা হবে না, তোমাকে একটা বিয়ে করতেই হবে, তুমি বিয়ে করেছ শুনলে যদি সে ঘরে ফেরে।"

নেলী এইবার আর রাগ সামলাইতে পারিল না, বলিল, "আপনাদের চাকুরী করি ব'লে আমায় কি কেনা গোলাম মনে করেছেন—আপনাদের হুকুমমত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে হবে?"

নেলীর গলাটা ক্রোধে কম্পিত হইয়াছিল, চোখ দুটাও ছল্-ছল্ করিয়াছিল। কিন্তু এবার গৃহিণীর মন তাহাতে ভিজিল না, তিনি এবার কর্ত্তার পক্ষসমর্থন করিয়াই বলিলেন, "কেন, বাপু, তোমার ভালর জন্যেই ত বলা হচ্ছে। বিয়ে তোমায় করতেই হবে, তোমার মা কিছু চিরদিন থাকবে না, তা না হয় দুদিন আগেই করলে। আর পয়সা-কড়ির অভাবে বিয়ে আটকে থাকবে, তাও নয়, কর্ত্তা ত সকল খরচাই দিতে চাচ্ছেন। মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে মা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এর পর এক দিন কথা পেড়ো, যা ভাল হয়, করা যাবে।"

এই সময়ে কর্ত্তা-গিন্নীকে সদর অন্দর হইতে খুব কড়া ডাকের উপর ডাক পড়িল, মাঝেও দুই একবার পড়িয়াছিল। কর্ত্তা যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন, "ভাই ভাল, এর পর এর দিন তোমার মা'কে সঙ্গে ক'রে গিন্নীর কাছে এস। এবং মধ্যে একটা সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেল, টাকার জন্যে ভেবো না, আমি হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেব—"

ক্রোধে, ঘৃণায় নেলীর বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, না হইলে সে এতগুলা অপমানের কথা নীরবে হজম করিত না, সে সে ধাতুতে গড়া ছিল না। কোন জবাব না দিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল। গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "কোথা যাচ্ছ? আজ ত যেতে দেব না, খাবির আমোদের দিন।"

কর্ত্তা যাত্রাকালে কক্ষের বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া শেষ তীরটা ছুড়িয়া মারিলেন। বলিলেন, "দেখ, আমরা ব্যবসাদার লোক, কয়লা বেচে খাই, আমরা ও-সব কাবি-টাবিা বুঝিনি। সোজা কথা, দুটি হাজার টাকা দেব, মিছে কালবিলম্ব না ক'রে একটা বিয়ে ক'রে ফেল। না হ'লে বুঝেছ, আমাদের হাতে অন্য উপায়ও যে নেই, তা মনে কোরো না।"

নেলী এইবার কথা কহিল, সমান ওজনে জবাব দিল, "বলেছি ত, আপনারা বড়লোক হ'লেও আমার মনটাকে কিনে নিতে পারেন না। তবে ভয় দেখাচ্ছেন, বড়লোক আপনারা, সবই কর্‌তে পারেন।"

নেলী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কর্ত্তা বা গৃহিণী বাধা দিয়া রাখিতে পারিলেন না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কর্ত্তা ক্ষণপরে বলিলেন, "দেখেছ, ছোটলোকের একবার গুমোরটা দেখেছ? তবু যদি পেটের ভাত জুট্‌তো!"

গিন্নী বলিলেন, "ছোটলোকেরই আজকাল দিনকাল পড়েছে। ভাবছি, আর কিছু না, খাবিটা কান্নাকাটি করবে, খাবে না দাবে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ও দিনকতক, তা'র পর সেরে যাবে। কিন্তু ও ক্ষুদে কেউটেটাকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিও না। যা পাওনা হয়েছে, তার উপর ১ মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় ক'রে দিও। হাঁ, ভাল কথা, খবর দিয়ে ওর মা'কে একবার আনাতে পার?"

"আচ্ছা, সে তখন হবে" এই কথা বলিয়া গৃহিণীও কর্ত্তার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

৬

ভূপেন্দ্রনাথ ঝরিয়ায় যাইয়া একদণ্ডও ভাল ছিল না। সেখানে তাহার সেবা বা যত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না, কেন না, মনিবের একমাত্র ছেলে কোলিয়ারি তদারকে আসিয়াছেন, কাষেই যে যেরূপে পারে, তাহার মনস্তুষ্টি-সাধনে তৎপরতা দেখাইতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিতেছিল না। কিন্তু স্বদেশ-স্বজন হইতে এই তাহার প্রথম দূরে আসা,—কাযেই এত যত্ন ও সেবার মধ্যে থাকিয়াও তাহার মনটা অনুক্ষণ একটা বিষম অভাব অনুভব করিত। বিশেষতঃ এই সময়ে তাহার মনের প্রায় পনেরো আনা ভাগ একটি মানসী প্রতিমা-পূজায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত—বস্তুতঃ নিদ্রার সময় ব্যতীত অহরহঃ তাহার মনটা নেলীর চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত। উহা যে ভূপেন্দ্রনাথের বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বয়সে কাম্য জিনিষ করায়ত্ত না হইলে লোকের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভূপেন্দ্র ধনীর সন্তান, ধনীর দৌহিত্র; সুতরাং ভূপেন্দ্রের এই ২১ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা বা আবদার, বায়না অপূর্ণ রহিয়া যায় নাই, অভাব বলিয়া তাহাকে কখনও কিছু অনুভব করিতে হয় নাই। চাহিবার পূর্ব্বেই সে বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইয়াছে, তাহার মুখের কথাটি খসিবার পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আজ তাহার নবীন গোলাপী-জীবনে এই প্রথম বাধা পাইয়া সে একরূপ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিল, না হইলে তাহার মত আজীবন বিলাসে ও আয়াসে লালিত-পালিত ছেলে স্বেচ্ছায় বিদেশে আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে কষ্টময় জীবন যাপন করিতে আসিত না।

প্রথম মাস দুই সে কাযে খুবই মন দিয়াছিল, কাযের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সে নেলীর কথা ভুলিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই কার্য্যসংগ্রামে অহরহঃ লিপ্ত থাকিয়াও তাহার মনটি এক চিন্তা হইতে কখনও নিস্তার পাইত না। সে প্রায়ই স্নেহময়ী ভগিনীর পত্র পাইত, তাহাতে আর সকলের সংবাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে নেলীর খবরও থাকিত।

মাঝে মাঝে মনটা উড়ু-উড়ু করিত বটে, মাঝে মাঝে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত বটে ; কিন্তু তাহার মনোবল নিতান্ত অল্প ছিল না, প্রবল ইচ্ছাকেও সে অনেক সময়ে দমন করিয়া রাখিতে পারিত।

তিন মাস হইতে সে একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিল, লাবণ্য এখন আর তাহার পত্রের উত্তর দেয় না, উত্তর দেন স্বয়ং জননী। অবশ্য সেই উত্তরে লাবণ্যের সকল কথা থাকে, সংসারের অন্য কথাও থাকে, তবে যে কথাটা শুনিবার জন্য তাহার মনটা সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকিত, সে কথাটা সে জননীর পত্রে কখনও খুঁজিয়া পাইত না।

এক মাস এই ভাবে লাবণ্যের চিঠি হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং নেলীর ভালমন্দ কোনও খবর না পাইয়া ভূপেন্দ্র বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার এক ভাবনা, নেলী এখনও তাহাদের বাড়ীতে কাম করিতেছে কি না, যদি না করে, তবে তাহাদের এখন কি অবস্থা হইয়াছে। নেলী পাছে তাহাদের বাড়ী কাম না করে, এই ভয়ে সে বাড়ী ছাড়িয়া এই কয় মাস সাহারায় পড়িয়া আছে, অথচ নেলী যদি ইতোবসরে বিতাড়িত হইয়া থাকে? তাহা হইলে তাহার এই সাহারায় পড়িয়া থাকা ত বৃথা হইতেছে। ভূপেন্দ্র বিষম বিচলিত হইয়া পড়িল। লাবণ্যই বা নিজে চিঠি দেয় না কেন? ভিতরে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে, সে ত বুঝিতে পারিতেছে না।

চারি মাস প্রবাসে অতিবাহিত হয়, এমনই সময়ে ভূপেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না, কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সেখানে আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে সে একবারে হতাশ হইয়া পড়িল। সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে স্বকর্ণে নেলীর কাছে সকল কথা শুনিবার জন্য ছুটিল গেল ; কিন্তু নেলীদের ঘরে তালাবন্ধ। পরদিনও গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল, সে দিনও তালাবন্ধ। তৃতীয় দিন সে বেলা থাকিতে গেল। সেই পরিচিত সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে সে দিন যেমনই সে পদার্পণ করিল, তেমনই দেখিতে পাইল, ফিরিঙ্গীদের মত পেণ্টালুন ও পেণ্টপরা একটা যুবক নেলীদের ঘর হইতে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। দারুণ ক্ষোভে ও রোষে ভূপেন্দ্রনাথের মনটা জ্বলিয়া উঠিল। সে একবার ভাবিল, ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু পরক্ষণেই নেলীকে দুই কথা শুনাইয়া দিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নেলীদের ঘরে আসিয়া উঠিল। ঘরের দ্বার তখনও মুক্ত ছিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূপেন্দ্র দেখিল, 'ড্রয়িং রুমে' কেহ নাই। তখন সে কাহাকেও না ডাকিয়া, কোন সাড়া না দিয়া, পরদার আড়ালে কামরার অপরার্দ্ধে প্রবেশ করিল। সেখানে ভূপেন্দ্র দেখিল, নেলী ক্যাম্পখাটের বিছানার উপর বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। ভূপেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল, নেলীকে কত কি ভর্ৎসনা করিবে বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল, সমস্ত মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল, একটা অদমনীয় আকাঙ্ক্ষায় তাহার প্রাণটা ভরপুর হইয়া উঠিল—সে ভাবিতেছিল, তখনই ছুটিয়া গিয়া নেলীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া সে তাহার বহুদিনের রুদ্ধ হৃদয়ের কথা নিবেদন করে।

নেলী তাহার জুতার শব্দ শুনিয়াছিল। সে মুখ হইতে হাত না সরাইয়াই বলিল, "এমন কর্‌লে তোমায় আমায় একসঙ্গে বাস করা দায় হ'য়ে উঠ্‌বে। তুমি এমনই ক'রে ব'সে ব'সে খাবে, আর মাতাল হ'য়ে ঘরে আস্‌বে—"

কথাটা শেষ হইল না, ভূপেন্দ্র গম্ভীরস্বরে ডাকিল, "নেলী!"

নেলী চমকিত হইয়া চোখ মেলিল, সম্মুখে হঠাৎ সর্প দেখিলে লোক যেমন চমকিত হয়, তেমনই করিয়া একবারে ধড়মড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বিস্ময়ে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

ভূপেন্দ্র বলিতে লাগিল, "ক'দিন এসে ফিরে গেছি, ঘরে তালাবন্ধ। তুমি যে আজ ৩ মাস তোমার মা'কে হারিয়েছ, তাও শুনেছি। তাই বড় আশায় বুক বেঁধে তোমার এই শোকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি। সন্ধ্যার সময় কোথায় যাও, তা ত কেউ বল্‌তে পারে না। পাশের ঘরে কে এক জন অ্যাগ্‌নিয়েলের মা আছে, সে কিছু বল্‌লে না, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, হাসে আর বলে, তার অ্যাগ্‌নিয়েলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ সব ঠিক্‌ঠাক হ'য়ে গিয়েছে। সত্য?"

নেলী নতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপেন্দ্র ক্ষণপরে আবার বলিল, "বল্‌বে না? বেশ। তা না বল্‌লেও ত কিছু চাপা থাক্‌ছে না। এই গলিতে ঢোক্‌বার সময় একটা ফিরিঙ্গীর মত মাতাল ছোঁড়াকে টল্‌তে টল্‌তে যেতে দেখ্‌লুম। সেই কি তোমার অ্যাগ্‌নিয়েল?"

ভূপেন্দ্র যাহাকে দেখিয়াছিল, সে পল। সে এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নেলীকে ধাক্কাধুক্কি করিয়া ৫টা টাকা মদ খাইবার জন্য কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ভূপেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলে নেলী মনে করিয়াছিল, পলই ফিরিয়া আসিয়াছে, এত দিন পরে ভূপেন্দ্র যে হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে, সে স্বপ্নেও তাহা মনে করিতে পারে নাই। ভূপেন্দ্র পলকে ভুল বুঝিলেও নেলী কোন প্রতিবাদ করিল না, নীরবে রহিল।

ভূপেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি, মুখে কি একটা কথাও নেই? তা হ'লে বাড়ীতে মা'র কাছে যা শুনে এসেছি, তার একটা কথাও মিথ্যে নয়। ওঃ, এই মেয়েমানুষ জাতটাই এমনই পাজী বটে! হাঃ হাঃ, এরই জন্যে আমি ৪ মাস বনবাস কচ্ছিলুম বটে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

নেলী কাঠ হইয়া এই কঠিন পরুষ ভর্ৎসনা শুনিয়া গেল, কোনও জবাব দিল না, কেবল বসনাঞ্চল লইয়া গ্রন্থি দিতে লাগিল, সে সময়ে তাহার হাত দুইটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ভূপেন্দ্র খাটের একধারে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে মৃত্তিকার দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ উঠিয়া নেলীর হাত দুইখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল, "নেলী, আমি ক্রোধের বশে কি বল্‌তে কি বলেছি, আমার মাথার ঠিক নেই। বল আমায় ক্ষমা করলে! নেলী, আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না, বল, আমায় আর কষ্ট দেবে না, বল ন্যাথানিয়েল তোমার কেউ নয়।"

নেলীর দেহটা তখন বাতাহত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল, তাহার মনে তখন কি হইতেছিল, তাহা সে ভিন্ন কে বলিতে পারিবে? কিন্তু মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া সে হস্ত মুক্ত করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিল, "দেখুন, আপনারা বড়লোক, আমাদের গরীবের ঘরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি? ন্যাথানিয়েলের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধই থাক্ না কেন, তাতে আপনাদের কি? আজ আমার মা থাকলে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। আপনাদের তাতে কথা কইবার অধিকার কি?"

ভূপেন্দ্র দুঃখিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমানাহত স্বরে বলিল, "বেশ, তাই হোক, আমার যখন কোন অধিকার নেই, তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরবো না। আমি চ'লে যাচ্ছি। তবে যাবার সময় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাব। এই আমার হাত ছুঁয়ে বল, আমায় ভালবাস না, কখনও বাসনি, ন্যাথানিয়েলই তোমার সব?"

নেলী এবারও কোন জবাব দিল না, হাতে হাত দিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভূপেন্দ্র কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় আশান্বিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন কক্ষের নীরবতা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন গম্ভীরস্বরে বলিল, "জবাব দেবে না? বেশ!" তাহার পর ভূপেন্দ্র নেলীর হাত দুইখানা সজোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভগবান্ তোমাদের সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন কেন? তোমাদের বাইরেটা দেখতে এত ভাল কেন? ভেতরটা এত খল, এত নীচ? তুমি কি ভাব, মুখ ফুটে আমায় কখনও কিছু জানাওনি ব'লে আমি বুঝতে পারিনি, তুমি আমায় ভালবাসতে? এখন যাই বল, তোমার খুঁটিনাটি কত ব্যবহারে জেনেছি, তুমি নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসতে। না হ'লে তুমি কি মনে কর, আমি এত বড় নীচ, এত বড় পাজী যে, তোমার মন বুঝতে না পেরে তোমায় ভালবাসার কথা বলতে সাহস পেয়েছিলুম? যাক, যা ভাল বুঝেছ, করেছ। তুমিও তোমার পথ ঠিক ক'রে নিয়েছ, আমিও এবার তাই কোরবো। যাতে তোমার আর আমার মুখদর্শন করতে না হয়, আমারও তোমার কোনও সংস্রবে না আসতে হয়, এবার থেকে তাই কোরবো। আশা করি, ন্যাথানিয়েলকে নিয়ে সুখে থেকো।"

ভূপেন্দ্র ক্রোধ-ত্বরিতপদে ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নেলী যেমন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই রহিল, তাহার চোখের পলক পর্য্যন্ত পড়িল না। একবার চীৎকার করিয়া উঠিবার প্রবল ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু কে যেন তাহার গলাটা সজোরে চাপিয়া ধরিল। এই অবস্থায় সে কতক্ষণ ছিল, জানে না, হঠাৎ এক জনের সম্ভাষণে তাহার তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল, যে কথা কহিতেছিল, সে ন্যাথানিয়েলের মা। সে বলিতেছিল,—"বলি, মা-ই না হয় ম'রে গেছে, তা ব'লে আর কি কেউ নেই? এটা গেরস্থর বাড়ী ত বটে, তবে এ সব হচ্ছে কি? এই যে ফুটফুটে ছোঁড়াটা ক'দিন হাটাহাটি

করছে, তাতে লোক জানাজানি হচ্ছে না? আমাদেরও ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়, ওসব এ বাসায় চলবে না বাপু ব'লে দিচ্ছি। নাথানি শুনলে অনর্থ করবে, বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে বলছি, বাপু!"

নেলী একবারমাত্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "তোমরা কি আমায় বাঁচতে দেবে না? তুমি যাও এখান থেকে। আমার কর্ত্তব্য আমায় কাউকে বোঝাতে হবে না।"

নেলী এই কথা বলিয়া পাকের কামরায় প্রবেশ করিল, নাথানিয়েলের মা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

৪.

ক্রোধে, ক্ষোভে এবং অভিমানে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা না হইলে ভূপেন্দ্র নিশ্চিতই নেলীকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিত না—সে কোথায় কি কাজ করিতেছে, কেমন করিয়া তাহার দিন চলিতেছে। সে পরের মুখে ঝাল খাইয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, নেলী এখন ন্যাথানিয়েলদের সংসারের একজন হইয়া দিনযাপন করিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ নেলী উহাদের কৃপার ভিখারিণী ছিল না, সে নিজে এখনও নিজের পেটের অন্ন সংস্থান করিত এবং ভ্রাতাকেও পালন করিত। রায় বাহাদুরের বাড়ীর চাকুরী ছাড়িবার পর প্রথমে কয় দিন তাহার বড় কষ্টে কাটিয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময়ে তাহার রুগ্না জননী একবারে শয্যাশায়িনী হইয়াছিলেন। একে চাকুরী নাই, তাহার উপর ভ্রাতা বেকার বসিয়া আছে, পরন্তু জননীর চিকিৎসা ও পথ্য সরবরাহের প্রয়োজন, নেলী অকূলপাথারে ভাসিল। কিন্তু সে সে জন্য এক দিনও হালছাড়া হয় নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে দুঃখবিপদের পাঠশালায় হাতেখড়ি দিয়াছিল, এই জন্য সামান্য আয় হইতেও সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। পরন্তু সেলাই ও বোনার কার্য্যেও সে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। এইরূপে অতি কষ্টের মধ্যেও সে জননীর চিকিৎসা ও সেবার কোনও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে জননীকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। চাকুরী ছাড়িবার এক মাসের মধ্যেই তাহার জননী তাহাকে একরূপ অনাথা করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কয়দিন পরে সে চোখের জল চোখেই চাপিয়া চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিল। বহু চেষ্টার পর খৃষ্টান মহিলা-সমিতির সুপারিশে সে এক বায়স্কোপ কোম্পানীর পিয়ানো বাজাইবার চাকুরী পাইল—বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা। সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তাহার চাকুরীর সময়। এতদ্ব্যতীত প্রাতে ২ ঘণ্টা সে খৃষ্টান মহিলা-সমিতির সভ্যাদের মধ্যে কয়েক জনকে সমিতিগৃহে পিয়ানো ও হারমোনিয়াম বাজনা শিখাইবারও ভার পাইয়াছিল, উহাতেও সে কিছু অর্জ্জন করিত। এইরূপে সে নিজের অবস্থা অনেকটা ভাল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইয়াও কিন্তু সে সম্পূর্ণ আনন্দে কালহরণ করিতে পারিত না। সে প্রায়ই কি এক চিন্তায় অভিভূত হইয়া থাকিত, সে সময়ে তাহার মুখে যাতনারেখা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিত। ইহার উপর অধুনা তাহার আর এক বিপদ হইয়াছিল। ইদানীং পল প্রায়ই টাকা লইয়া ঘরে আসিত এবং ঝমঝম আওয়াজ করিয়া হাসিয়া বলিত, সে এক বড় চাকুরী পাইয়াছে, তাহাদের আর ভাবনা নাই, শীঘ্রই সে নেলীর বিবাহ দিবে। সে মাঝে মাঝে পাত্রের নামোল্লেখও করিত। নেলী শুনিল, পল তাহার পাত্র ঠিক করিয়াছে—সে ন্যাথানিয়েল। নাথানিয়েলের মাও এই সম্বন্ধের কথা তুলিয়া অধুনা তাহাকে প্রায়ই জ্বালাতন করিত। ন্যাথানিয়েল পোর্ট কমিশনারের খেয়ার জাহাজে সারেঙ্গের কাজ করিত।

ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া নেলী এক দিন ন্যাথানিয়েলের মা ও পলকে স্পষ্টই বলিয়াছিল, সে বিবাহ করিবে না, যদি তাহারা এইরূপে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাহা হইলে তাহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবে। এই স্পষ্ট কথার পর উৎপাত কিছু দিন কমিয়াছিল। এক বিষয়ে নেলী সুখী ছিল। ন্যাথানিয়েল অতি ভদ্র ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিল। নেলী তাহাকে মনের ভাব জানাইলে সে বলিয়াছিল, সে নেলীকে সহোদরার মত দেখে, তাহার নিকট নেলীর কোনও ভয় নাই। নেলী সজলনয়নে ন্যাথানিয়েলের হাত দুইটি ধরিয়া তাহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিল। এক দিন নেলী দ্বিপ্রহরে ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময় একটা বেয়ারা একখানা

পত্র আনিয়া বাড়ীতে দিয়া গেল। পত্রখানা পলের নামে। পত্রখানার খামের উপর প্রেরকের নামধাম মুদ্রিত ছিল। নামধাম দেখিয়াই নেলী শিহরিয়া উঠিল—উহা আসিতেছে সার্কুলার রোডের রায় বাহাদুরের গৃহ হইতে। উৎকট ঔৎসুক্যে নেলীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল, রায় বাহাদুরের গৃহ হইতে তাহার ভ্রাতার নামে পত্র আসে কেন? নেলী বিষম চিন্তান্বিত হইল, তাহার মনে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল —পত্র খুলিয়া পাঠ করা উচিত কি না। শেষে ঔৎসুক্য এত প্রবল হইল যে, সে আর বিবেকের মানা মানিতে পারিল না। পত্র পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও ঘৃণায় তাহার অন্তরটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর অর্থ দিয়া পলকে ও ন্যাথানিয়েলের মাকে বশীভূত করিয়াছেন, এখনও মাঝে মাঝে অর্থসাহায্য করিয়া উহাদিগকে তাঁহার যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিয়াছেন, পত্রের মধ্যেও উহাদিগকে অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন এবং নেলীকে যত শীঘ্র সম্ভব ন্যাথানিয়েলের হস্তে অর্পণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, করিলে প্রত্যেককে থোক হাজার টাকা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন।

এত দিনে নেলী ভ্রাতার ও ন্যাথানিয়েলের মা'র দুষ্ট-বুদ্ধির উৎস খুঁজিয়া পাইল। এই জন্য উহাদের এত পীড়াপীড়ি! ভ্রাতার চাকুরীর মর্ম্মও নেলী এত দিনে খুঁজিয়া পাইল। নেলী ক্রোধে ঘৃণায় পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং নোট কয়খানি আর এক খামে পুরিয়া রায় বাহাদুরের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল। উহার মধ্যে মাত্র এইটুকু লিখিয়া দিল, "আপনার সয়তানী বুদ্ধি ধরা পড়িয়াছে। অনর্থক অর্থ নষ্ট করিয়া ফল নাই। আমি স্বয়ং আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আপনার পুত্রকে আমি বিবাহ করিব না। বিশ্বাস না হয়, আমি রীতিমত লেখাপড়া করিয়া দিতেও প্রস্তুত আছি। আপনার ভস্মে ঘি-ঢালা হইতেছে। টাকা পাঠান, তাহা সয়তানীতে ব্যয় হয়।"

ইহার পর হইতে পলের নামে টাকা পাঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পল এক দিন রায় বাহাদুরের বাড়ীতে সকল কথা শুনিয়া নেলীর সঙ্গে খুব ঝগড়া করিল এবং ঐ সময় হইতে জোরজবরদস্তি করিয়া নেলীর নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। ন্যাথানিয়েলের মাও ইহাতে পলের সহায়তা করিতে লাগিল। কেবল ভালমানুষ ন্যাথানিয়েল যে দুই এক দিন ছুটী পাইয়া বাড়ী আসিত, সেই সময়ে নেলীর হইয়া মা ও পলের সঙ্গে সে খুব ঝগড়া করিত। এই ভাবেই নেলীর দিন কাটিতেছিল। ঠিক এই সময়ে ভূপেন্দ্র আসিয়া তাহার জীবনটা আর এক ভাবে ওলটপালট করিয়া দিল।

ভূপেনের সহিত সাক্ষাতের কয়দিন পরে নেলী এক রাত্রিতে বায়স্কোপের চাকুরী করিয়া ঘরে ফিরিতেছে, এমন সময়ে দেখিল, অতিরিক্ত জাঁকজমকে সজ্জিতা সালঙ্কারা দুইটি নারীকে লইয়া বায়স্কোপ দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ একখানা ট্যাক্সি গাড়ীতে উঠিতেছে, ভূপেনের রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয় দেখিয়া নেলীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ভূপেন্দ্রনাথ মদ্যপ হইয়াছে। সঙ্গে রমণী দুইটি কে, তাহাও নেলী অনুমানে বুঝিয়া লইল। নেলীর মুখখানা একবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। নেলী যখন ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন ভূপেন্দ্রনাথ গাড়ীতে একটি রমণীর স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া, অপরার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। সে দেখা মুহূর্ত্তমাত্র, ট্যাক্সি নিমেষে ভূপেন্দ্রনাথকে লইয়া ঝড়ের মত উড়িয়া গেল।

নেলীর পা আর চলে না। ছিঃ ছিঃ, এত লেখাপড়া শিখার এই পরিণাম! পিতামাতার যে নয়নানন্দ, স্নেহময়ী ভগিনীর যে আরাধ্যদেবতা, আত্মীয়স্বজন ও ভৃত্যপরিজনের যে পরম প্রিয়পাত্র, তাহার এই জঘন্য ঘৃণিত জীবন! ছিঃ ছিঃ, ইহাও দেখিতে হইল!

নেলী গৃহাভিমুখে চলিল। সে কত কি আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। নেলীকে এ দৃশ্য দেখিতে হইল, ইহা কি বড় বিস্ময়ের কথা? ভূপেন্দ্রনাথের এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল, কে ঘটাইয়াছে? না, না, ভাবিয়া কাম নাই। কোথাকার ভূপেন্দ্রনাথ, তাহার দুঃখের জীবনের সহিত ধনীর পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের সম্পর্ক কি? সে যাহা ইচ্ছা করুক না, তাহাতে তাহার কি? কিন্তু, কিন্তু —দূর হউক, এ সব অনর্থক চিন্তায় ফল নাই। নেলী ঘরে ফিরিয়া সে রাত্রিতে জলস্পর্শ করিল না, সারারাত একরূপ বিনিদ্র হইয়া কাটাইল।

এক দিন নেলী দেখিল, একখানা দৈনিক সংবাদপত্রে ভূপেন্দ্রনাথ ও থিয়েটারের অভিনেত্রীকে জড়াইয়া বিদ্রূপের

কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। নেলীর সমস্ত মনটা ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আর এক দিন রাত্রিতে নেলী চাকুরী করিয়া ঘরে ফিরিতেছে, এমন সময়ে দেখিল, একটা সুসজ্জিত সাহেবী হোটেল হইতে ভূপেন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে বাহির হইতেছে, হোটেলের চাকরগুলা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। নেলীর মনটা কেমন করিয়া উঠিল, যেন তাহার হৃদয়ের সমস্ত জমাট ক্রন্দন হৃদয়ের কপাট ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিল। কোথা হইতে কি হইয়া গেল। হঠাৎ নেলী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া ভূপেন্দ্রনাথের একখানা হাত ধরিয়া ডাকিল, "ভূপেন বাবু!"

ভূপেন মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিল, তাহার নয়নের দৃষ্টি যেন তাহাকে দেখিয়াও দেখিতেছিল না। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। ভূপেন্দ্রনাথ সপ্রতিভ হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া, দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিল, "আমায় ছুঁয়ো না নেলী, আমি মাতাল।" পথে লোক জমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে দিকে নেলীর দৃষ্টি ছিল না, সে পুনরপি ভূপেনের হাত ধরিয়া বলিল, "ভূপেন বাবু, আমার কথা রাখবেন, চলুন বাড়ী যাই।"

ভূপেন এইবার নেলীকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল। নিকটেই একটা গোরা সার্জ্জেণ্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যাপার দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভূপেন্দ্রনাথকে ধরিতে আসিল— লেডীর অপমান!

নেলী তাহাকে ইংরাজীতে বলিল, "তোমার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, আমি এঁকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "ওঃ, মাপ করবেন। ইনি কে?"

নেলী অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার স্বামী!"

সার্জ্জেণ্ট সরিয়া গেল।

নেলী একখানা ট্যাক্সি ডাকিল এবং ভূপেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে তুলিল, নিজেও তাহার পাশে বসিল। তাহার পর সোজা-গলায় হুকুম দিল, "যাও ইটিলি।"

যতক্ষণ গাড়ী চলিল, ততক্ষণ উভয়ে একটি কথা কহিল না। ভূপেন্দ্রনাথ এক কোণে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, নেলী তখনও তাহার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল।

ঘরে ঢুকিয়া নেলী কামরার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর আলোক জ্বালিয়া ভাঙ্গা চেয়ারখানার উপর ভূপেন্দ্রনাথকে বসাইল; নিজেও বেতের মোড়ার উপর বসিয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "ভূপেন বাবু, এ সব হচ্ছে কি?"

ভূপেন্দ্র সে কথার জবাব দিল না, এমন কি, নেলীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না।

নেলী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কথার জবাব দেবেন না?"

এইবার ভূপেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখে-চোখে কি অব্যক্ত যাতনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল! তাহার সে কান্তি আর নাই, চক্ষু কোটরগত, রক্তবর্ণ, দেহ শীর্ণ, মুখ ম্লান। একবার চাহিয়া সে মুখ নত করিল, তাহার পর হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া নেলীর হাতে হাত রাখিয়া বলিল, "রোসো, আমায় দেখতে দাও। সত্যই কি তুমি নেলী, সত্যই কি আমি তোমার হাত ধ'রে রয়েছি, না আর কেউ নেলীর রূপ ধ'রে এসে আমায় ছলনা করছ? বল, রাত্দিন তোমায় যেমন দেখি অথচ স্পর্শ করতে গেলেই ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে যাও, তেমনই ক'রে মিলিয়ে যাবে না? বল, তুমি সত্যই নেলী?"

নেলীর নয়নপ্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে প্রাণপণে বাধিত হৃদয়ের উদ্বেল অশ্রুর প্রবাহ রোধ করিয়া বলিল, "হাঁ, আমিই নেলী। কিন্তু আপনার এ সব কি হচ্ছে?"

ভূপেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, না, আমি যাই, এখানে আমার থাকা হবে না।"

নেলী আবার তাহার হাত ধরিয়া বসাইল, স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, "ভূপেন বাবু, আপনি না লেখাপড়া শিখেছেন? মা-বোনের মনে কষ্ট দিয়ে এই ক'রে বেড়াচ্ছেন—"

ভূপেন্দ্র বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "মা বোন? হাঃ হাঃ, কে মা-বোন? যারা আমার দুঃখ বোঝে না, আমি তাদের দুঃখ বুঝবো কি দরকারে?"

নেলী দয়ার হাসি হাসিয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ ভূপেন বাবু, আপনি এত স্বার্থপর? আপনি নিজের সুখ স্বার্থ গুছিয়ে ক'রে তবে পরের দুঃখ ঘোচাবেন? আগে ত এমন ছিলেন না—"

ভূপেন্দ্র আবার নেলীর হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "না, ছিলুম না, তুমিই আমায় করেছ। দোষ তোমার।"

নেলী মাথা নত করিল। ভূপেন্দ্র তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। এইবার নেলীর চোখে জল দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল, নেলীর দুইখানি হস্ত বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল নেলী আমার হবে? বল, স্থাপানিয়েল তোমার কেউ নয়? বল, আমায় জীয়ন্তে নরক থেকে বাঁচাবে?"

বহুদিনের শক্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, নেলী আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাই যদি হয় তা হ'লে—তা হ'লে—"

ভূপেন্দ্র নেলীকে কথা শেষ করিতে দিল না, তাড়াতাড়ি নেলীর মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "সত্য বলছ নেলী, আমায় দয়া করবে?" বিপুল আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, লোক বহু তপস্যার পর ইষ্টফল পাইলে যেমন অবস্থা হয়, ভূপেন্দ্রের তেমনই অবস্থা হইয়াছিল। নেলীও তখন জগৎ-সংসার সকলই ভুলিয়াছিল, সে তখন দেখিতেছিল, সে জগতে সে আর ভূপেন্দ্র, আর কেহ নাই। তখন দুই জনে সেই শয্যায় বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভূপেন্দ্রনাথের দুই হাতে হাত রাখিয়া হাসিকান্নার মাঝে নেলী তাহার হৃদয়ের গুহ্যতম কথা খুলিয়া বলিল। স্থাপানিয়েল তাহার কেহই নহে, তবে ছেলেবেলা হইতে তাহারা দুই জনে ভাই-বোনের মত পালিত হইয়াছে। সে দিন ভূপেন যাহাকে দেখিয়াছে, সে স্থাপানিয়েল নহে, পল, তাহার ভাই। সে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র। নেলী ভূপেন্দ্রনাথেরই মঙ্গলের জন্য এ সব কথা গোপন করিয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, তাহার মঙ্গল যাহাতে, সে তাহা এতদিনে পাইয়াছে, এতদিন সে মঙ্গলের আশায় অমঙ্গলের পশ্চাতেই ছুটাছুটি করিয়াছে। তাহার মাতামহের বিষয়সম্পত্তির সেই একমাত্র অধিকারী হইয়াছে, সুতরাং সে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, অতএব নেলী সম্মত হইলেই সে আপনার সুখের সংসার পাতিয়া বসে।

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল, তবুও কথা ফুরায় না। স্থাপানিয়েলের মা যখন ভূপেন্দ্রের বিদায়ের পরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, তখনও নেলী যেমন করিয়া গোরা সার্জ্জেণ্টের সম্মুখে বলিয়াছিল, তেমনই দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমার স্বামী।" সে কথায় তাহার হৃদয়ের বিপুল আনন্দ ও গর্ব্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, স্থাপানিয়েলের মা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

৮

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই উভয়ের বিবাহ। ভূপেন্দ্র কাহারও মুখ চাহিল না। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অনুরোধ করিলেও সে বলিল, "জানি, আমি পিতামাতার মনঃকষ্ট দিয়া মহাপাতক করিতেছি, কিন্তু আত্মহত্যা অপেক্ষা সে পাপকে আমি বড় বলিয়া মনে করি না। দুই দিন পরে পিতামাতার ক্রোধ দূর হইবে, কিন্তু সেই আশঙ্কায় সারা জীবনটাকে ব্যর্থ করিতে পারি না।" সকলেই তাহাকে স্বার্থপর, নিজের সুখান্বেষী বলিয়া গালি পাড়িল; কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না, স্বয়ং নিজের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। নেলী তাহার কথামত হিন্দুমতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল, সে বলিল, স্বামীর ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম, স্বামী হইতে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এ কয়দিন সে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। এই সময়ে তাহার মুখে-চোখে যে অপার্থিব হাসি অনুক্ষণ ফুটিয়া থাকিত, তাহাতে তাহাকে কি সুন্দরই দেখাইত! একেই সে ভুবনসুন্দরী, তাহার উপর তাহার হৃদয়াকাশ হইতে দুঃখ-মেঘ সরিয়া গেলে পর যখন মেঘমুক্ত শশীর মত তাহার মন প্রাণ হাসিয়া উঠিল, তখন সে হাসির লাবণ্য তাহার সারা অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে যে শোভায় শোভান্বিত করিল, তাহার তুলনা ভূপেন্দ্রনাথ জগতে খুঁজিয়া পাইল না। এই কয়দিনে তাহারও কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল! তাহার সেই শ্রান্ত অবসন্ন অকাল-বার্দ্ধক্যের ভাব একবারে মুখমণ্ডল হইতে অপসারিত হইল—সে যেন কোন সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে, এমনই মনে হইতে লাগিল। নেলী ইহাতে যে তৃপ্তি—যে সন্তোষ লাভ করিল, তাহা ইহজীবনে কখনও পায় নাই।

পলকে সঙ্গে লইয়া ভূপেন্দ্র বিবাহের বাজার করিতে বাহির হইল। যখন সে নেলীর জন্য মহামূল্য অলঙ্কার ও বসন-ভূষণ খরিদ করিয়া আনিল, তখন পলের আর আনন্দ ধরে না। স্থাপানিয়েলের মারও মহা আহ্লাদ, সে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্র উহাদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিল। বিবাহের জিনিষপত্র দেখিয়া নেলীর মনে কি হইল, তাহা

সে-ই বলিতে পারে। কেবলমাত্র সে ভূপেনের বুকে মাথা রাখিয়া একবার চুপি চুপি বলিয়াছিল, "ভুলে গেছ কি আমি গরীবের মেয়ে?" ভূপেন্দ্র নেলীর কথা শেষ করিবার অবসর দান করে নাই।

বিবাহের আর সপ্তাহমাত্র বিলম্ব আছে, এমন সময়ে এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে একখানা প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া নেলীদের সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ে দাঁড়াইল। নেলী ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। এখন নেলী সারাদিন বাড়ী থাকিত, কেন না, ভূপেন বিবাহের কথা স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সকল চাকুরী ছাড়াইয়া দিয়াছিল। মোটরের আওয়াজ শুনিয়া নেলী উৎকর্ণ হইয়া জাফরির বাহিরে চাহিয়া রহিল—তাহাদের এই ভাঙ্গা খোলার বস্তিতে মোটরে আসে কে? ভূপেন মাতামহের দরজিপাড়ার বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত নেলী খোলার বাড়ী ছাড়িতে চাহে নাই।

দিবা দ্বিপ্রহর, সঙ্কীর্ণ গলির পথে লোকচলাচল নাই বলিলেও হয়। খোলার বাড়ীর যে যাহার কাযে বাহির হইয়াছে যাহারা আছে, তাহারা ঘুমাইতেছে। মোটর থামিবার ক্ষণপরে নেলীদের দরজার কড়া বাজিয়া উঠিল। নেলী জাফরি দিয়া দেখিয়াছিল, দরজায় দাঁড়াইয়া আপাদমস্তক-মণ্ডিতা একটি রমণীমূর্ত্তি। বিস্ময়ে ভয়ে নেলীর অন্তরাত্মা গুরু-গুরু করিয়া উঠিল—কে এই রমণী?

নেলী উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুক রমণী মুখের আবরণ উন্মোচন না করিয়া কামরায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে আর কেউ নাই ত, নিরিবিলি আমাদের কথা হ'তে পারবে ত?"

গলার আওয়াজ শুনিয়া নেলী চমকিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, ভাঙ্গা টেবলটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং বাক্-শক্তিরহিত হইয়া একদৃষ্টে আগন্তুকার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আগন্তুকা নিজেই কামরার দ্বার আঁটিয়া দিয়া মোড়ার উপর বসিয়া পড়িল এবং এইবার মুখের ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,"আমায় এখানে দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ? কিন্তু মা, তুমিই ত আমায় এখানে টেনে এনেছ!"

বলা বাহুল্য, আগন্তুকা ভূপেনের জননী, স্বয়ং রায় বাহাদুরের ঘরণী। নেলী বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, সে তখনও তাহার নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। গৃহিণী নেলীকে নীরব দেখিয়া আবার নিজেই বলিতে লাগিলেন, "কেন এসেছি, তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। আমি ঝগড়া করতে আসিনি, তর্ক করতে আসিনি, এসেছি কেবল তোমার দয়া চাইতে। বল, আমার কথা রাখ্‌বে?"

গৃহিণী এই কথা বলিয়া সাগ্রহে সোৎসুক নয়নে নেলীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন।

নেলী তখনও নীরব—তাহার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছিল। গৃহিণীর মুখে ভয় ও উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি নেলীর নীরবতা অন্যভাবে লইয়াছিলেন। কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমার ছেলে পাগল হ'তে পারে, কিন্তু তুমি ত মা অবুঝ নও। তুমি কি জান না, মা-বাপের মনে ব্যথা দিলে ভূপী এক দিনও সুখী হ'তে পারবে না, তুমিও এক দিনও সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবে না। এই পাগলামি ছেড়ে দাও, আমি নিজে তোমার মনের মত ঘর-সংসারী ক'রে দেব। তুমি ত বোঝ, তোমাতে আর তাতে কত তফাৎ?"

নেলী এতক্ষণে আপনাকে খুঁজিয়া পাইল। তাহার ঈষৎ স্ফুরিত অধর দেখিয়াই বোধ হইতেছিল, তাহার মনটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে একটু উত্তেজিতস্বরে বলিল, "জানি, আপনারা বড়লোক, আর আমরা আপনাদের পায়ের তলার ধুলো। কিন্তু আমি ত আপনাদের দোরে দয়াভিক্ষে করতে যাইনি।"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "তা জানি, আমরা সব খবরই জানি। তুমি যে ভূপীর কাছ হ'তে দূরে থেকে কত বড় মহত্ব দেখিয়েছ, তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু সে ত তোমায় দূরে রাখ্‌তে চায় না—তাকে তুমি দয়া ক'রে মুক্তি দাও।"

নেলী উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, তা কখনই হবে না। আপনাদের স্বার্থের হাড়িকাঠে আমাদের ইহজীবনের সুখ কেন বলি দেব? আপনারা যদি মানুষের মত আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন, তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত কি করতুম, বলতে পারি না, কিন্তু আপনারা তা করতে দিলেন না। আপনারা নিজেদের স্বার্থ টি খুব বোঝেন, আমাদের মুখ কি একবারও চেয়েছেন?

মৃদুভাষিণী শান্ত ভীরু নেলীর মুখে এতগুলা কড়া কথা শুনিয়া গৃহিণী বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, দুই চারিটা মৃদু ভর্ৎসনার পরেই নেলী তাঁহার কথা ঠেলিতে পারিবে না। সুতরাং নিজেই অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর মা, আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝে তোমায় অন্যায় বোঝাতে গিয়েছিলুম। তোমায় আমি খুবই বুঝি। এই দেখ, তাই কর্ত্তা তোমায় ঘুস দিয়ে তফাৎ করতে চাইলেও আমি তোমায় ঘুষের ইঙ্গিত পর্য্যন্তও করি নি। কর্ত্তা এই চুক্তিপত্রে তোমার নামে ২০ হাজার টাকার ওয়ার-বণ্ড কিনে দিতে চেয়েছেন; তা ছাড়া তাঁর কাঁকুড়গাছির বাগান বাড়ীটাও—যা বেচলে এখনই ১৫ হাজার টাকায় বিক্রী হয়—সেই বাড়ীটাও তোমায় লিখাপড়া ক'রে দিতে চেয়েছেন—যদি তুমি দয়া ক'রে তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দাও।"

নেলী জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল, কিন্তু গৃহিণী তাহার অবসর না দিয়াই আবার বলিলেন, "দেখ, তোমার দয়ার উপর সবই নির্ভর করছে। তুমিই ভেবে দেখ, বিবাহ ক'রে ভূপেন কি সুখী হবে, তুমিই কি সুখী হবে? তোমায় বিবাহ করলে, ভূপেন যে সমাজে ছেলেবেলা থেকে ঘুরেছে ফিরেছে, সে সমাজ তাকে ঘৃণার চোখে দেখবে, বিষের মত দূরে ত্যাগ করবে। ছেলেবেলা হ'তে যে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মেশামেশা করে আনন্দ পেয়ে আসছে, সে আনন্দ হ'তে দূরে থেকে সে কি একদিনও সুখী হবে? সে সুখী না হ'লে তুমিও কি সুখী হবে?"

নেলীর কানে আর কিছু বাজিতেছিল না, কেবল হৃদয়ের উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল,—'সে সুখী না হ'লে তুমিও কি সুখী হবে!' এ কি কথা—এ কথায় প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে কেন?

গৃহিণী বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে, তাই এবার আরও সুর নরম করিয়া বলিলেন, "বিয়ের পর দু'চার দিন খুব সুখে কাটতে পারে, কিন্তু তার পর? সারা জীবনটা ত প'ড়ে রয়েছে, তখন কি হবে? যখন তোমাদের মিলনের প্রথম মোহটা কেটে যাবে, যখন আবার গোলাপী চসমাটা খুলে সত্যিকারের জগৎ দেখবে, তখন? যখন ভূপী তোমাদের একঘেঁয়ে ঘরকন্না হ'তে চোখ ফিরিয়ে তার আজন্ম অভ্যাসের পথ খোঁজ করবে—যখন সে তার সমাজ, তার আপনার জনদের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে, তখন? তখন তুমি কি তাকে সুখী করতে পারবে? সে অবস্থাটার কথা একবার ভেবে দেখেছ কি? তার চেয়ে তুমি যদি তোমার সমান ঘরে-বরে বিয়ে কর, আর ভূপী যদি তা শুনতে পায়, তা হ'লে—"

নেলীর মনটা যথার্থই ভিজিয়া আসিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় তাহার আপাদমস্তক আবার জ্বলিয়া উঠিল, মনটা ঘোর বিদ্রোহী হইয়া বলিল, "আপনারা আমাদের মত গরীবের মনটাকে খেলার জিনিষ বলে মনে করতে পারেন—যখন যেমন ইচ্ছে তেমনই ভাঙ্গতে গড়তে পারেন, কিন্তু গরীব হলেও আমাদের একটা মন আছে—যা খেলার জিনিষ নয়—আপনাদের শত স্বার্থের হাড়িকাঠে ফেলে তাকে বলি দিলেও সেটা আপনাদের ইচ্ছামত ভাঙ্গবে গড়বে না। আপনি যান, এ গরীবের কুঁড়েয় এসেছেন, এ জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু জেনে রাখুন, আমার গরীব মন যা করতে চাইবে, আমি তাই কোরবো—এতে শত বড়মানুষের বাধা প্রতিবাদী হলেও কোরবো।"

গৃহিণী এইবার যথার্থই ভীত হইলেন। একরূপ নতজানু হইয়া নেলীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "ভিক্ষা দাও, নেলী, আমার ভূপীকে ভিক্ষা দাও। এই দেখ, বড়-মানুষ আমি তোমার পায়ের তলায় ধূলোয় লুটিয়ে ভিক্ষে চাইছি। দয়া কর, ভিক্ষা দাও।"

দরবিগলিতধারে গৃহিণীর নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল। নেলী তাঁহাকে আসনে বসাইয়া দিল।

নেলীর মনে পড়িল, এই কামরায় আর এক দিন তাহার ভূপেন্দ্রনাথ এমনই করিয়া তাহার মায়ের কাছে তাহাকে ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আর আজ? তাহার হৃদয়ের মধ্যে ভাবতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছিল, সে কিছুক্ষণ কোন জবাব দিতে পারিল না। পরে ক্ষীণস্বরে বলিল, "বলুন, কি করতে হবে।"

গৃহিণী যেন হাতে স্বর্গ ফিরিয়া পাইলেন। হাসি-কান্নার মধ্যে অবস্থিত হইয়া নেলীর হাত দুইটি হাতে ধরিয়া বলিলেন, "পারবি মা, পারবি? আমি জানি, কি মনের বল তোমার। আমি জানি, কি ভালবাস তুমি আমার ভূপীকে। কিন্তু যথার্থ ভালবাসা আপনার সুখ খুঁজে না, আপনার তৃপ্তির জন্য লালায়িত হয় না, বাঞ্ছিতের সুখেই তার সুখ।"

নেলীর বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সে তাঁহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অবিকম্পিত স্বরে বলিল, "আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি এখন যেতে পারেন।"

গৃহিণীর প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। বধার্থ নীত পশুর মুখে যে অব্যক্ত যাতনা ফুটিয়া উঠে, নেলীর মুখে তাহারই ঘন ছায়া পড়িয়াছিল, গৃহিণী সে দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। কামরার বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সিক্ত-নয়নে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাবি মা, আমায় কি মায়ের ভারও নিতে দিবি নি?"

নেলী দ্বারের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "যান।"

গৃহিণী চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ নেলী শূন্যদৃষ্টিতে দ্বারপথে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

৬

ভূপেন্দ্রনাথ সেই দিন এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে সহরের বাহিরে গিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে সহরে ফিরিয়াই সে ষ্টেশন হইতে সরাসরি নেলীদের বাড়ী যাত্রা করিল। তাহার মনটা আনন্দে ভরপুর—তাহার বন্ধু নেলীকে যে মহামূল্য মতির মালা বিবাহের যৌতুকরূপে দান করিয়াছেন, তাহাই নেলীকে দেখাইবে—এই আনন্দে বিভোর হইয়া সে তিন চারি লাফে গলি অতিক্রম করিয়া নেলীদের কামরার দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাহার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল,—সে দেখিল, কামরা বাহির হইতে তালাবন্ধ। পাশের স্তাথানিয়েলদের কামরাও তালাবন্ধ—কেহ কোথাও নাই। নেলীদের কি কোনও বিপদ হইয়াছে? অতিরিক্ত আনন্দের পর ভয়ের সঞ্চারে তাহার দেহ টলিয়া পড়িল, সে দ্বারে দেহভার রক্ষা করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "নেলী!"

নিকার-বোকারপরা একটি ছোট ছেলে গলির অপর পার্শ্বের খোলার ঘর হইতে উঁকি মারিয়া একছুটে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "মা, মা, দেখ, নেলীদের কে ডাক্‌ছে।"

মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কাকে খুঁজ্‌ছেন, নেলীকে? তারা কা'ল বিকেলে জিনিষপত্র নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে চ'লে গেছে। আপনি ভাড়া নেবেন ঘর?"

ভূপেন্দ্র স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কথাগুলি শুনিতেছিল, শেষ হইলে বলিল, "তারা কোথা গেছে, বল্‌তে পারেন? স্তাথানিয়েলের মা'রাই বা কোথায় গেল?"

খৃষ্টান মহিলাটি বলিলেন, "তারা সবাই একসঙ্গে উঠে গেছে, কোথায় গেছে, কাউকে ব'লে যায়নি, তবে আমার কাছে একখানা চিঠি রেখে গেছে। আপনার নাম কি ভূপেন বাবু?"

ভূপেন্দ্র সাগ্রহে বলিল, "হাঁ।" তাহার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "কৈ দেখি।"

নেলীর কামরার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভূপেন্দ্র পত্র পাঠ করিল। মাত্র ২।৩ ছত্র, আশ্চর্য্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভালবাসার কথা নাই!

পত্রে লেখা ছিল,—আমি মিথ্যাবাদী, আগাগোড়া মিথ্যা কথায় আপনাকে ভুলিয়ে এসেছি। স্তাথানিয়েলের সঙ্গে আমার বিয়ে অনেক দিন ঠিক হ'য়ে আছে। আমরা গরীব ব'লে আপনারা আমাদের যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করেন, আপনার বাপ-মাও তাই ক'রেছিলেন। তারই শোধ দেবার জন্য আমিও দিনকতক আপনার সঙ্গে এক খেলা খেললুম। আপনার দেওয়া সব জিনিষপত্র আমি আপনাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। কা'ল সকালেই স্তাথানিয়েলের সঙ্গে আমার বিবাহ। আমরা বিবাহের পরই বিদেশে যাচ্ছি। ইতি—নেলী।

পৃথিবীটা এত ঘোরে কেন? ভূপেন্দ্র কামরার দ্বারটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার পায়ের তলা হইতে যেন বাড়ীর রোয়াকটা সরিয়া যাইতেছে। দিনের আলোটা এত বিশ্রী দেখাইতেছে কেন? রাস্তার মানুষগুলাকে এত সয়তান বলিয়া মনে হইতেছে কেন? ভূপেন্দ্রের মনে হইতেছিল, তাহার সব যেন ওলটপালট হইয়া গিয়াছে।

গৃহে ফিরিয়া ভূপেন্দ্র প্রথমেই মা'র কাছে গেল; হাসিমুখে বলিল, "মা, আস্‌ছে মাসের প্রথমেই কোথায় না একটা বিয়ের সম্বন্ধ ক'রেছিলে। ঐখানেই ঠিক কর, ঐ দিনই বিয়ে কোর্‌বো।"

পুত্রের মুখের সেই বিকট হাসি দেখিয়া জননী ভীত হইলেন। তাহার মাথাটা কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বাবা, তোমারই ভালর জন্যে ঐ সম্বন্ধ ঠিক করেছি। শ্যামপুকুরের বোসেদের মেয়ে, নিখুঁত সুন্দরী, তারা সাধাসাধি করছে। সত্যিই বিয়ে করবি ?"

ছেলে মাথা তুলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বললুম ত, হাঁ।"

* * * * *

আজ সারকুলার রোডে মহা সমারোহ। খুব ধূমধামে ধনবান ব্যবসাদার রায় বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের বিবাহ, রাজপথে এক মাইল ব্যাপিয়া শোভাযাত্রা সুসজ্জিত। মোটর, ল্যাণ্ডো, জুড়ি, লরি, ব্যাণ্ড, কনসার্ট, রোশনাই, শানাই, কিছুরই ত্রুটি নাই।

পথের অপর পার্শ্বের ফুটপাতে—যেখানে ঠাসাঠাসি করিয়া গরীব-দুঃখী লোক তামাসা ও রোশনাই দেখিতে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে একটি হাটকোটধারী কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীকে বলিতেছিল, "চল নেলী, এইবার ঘরে ফিরি।"

নেলী অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল, "এ্যাঁ, কি বলছ, ড্যানি দাদা ?"

ড্যানিয়েল বলিল, "চল ভাই, ঘরে যাই, দেখা ত হ'ল।"

নেলীর অঙ্গ কাঁপিতেছিল, সে ড্যানির হাতটি ধরিয়া বলিল, "আর একটু দাঁড়াও।"

এই সময়ে ঘোর রবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, বর সুসজ্জিত হইয়া আসিয়া মোটরে চড়িল। বরের মুখে রোশনাইয়ের আলো পড়িয়াছিল, সে আলোকে তাহার বহু মূল্যবান্ পোষাক ঝকমক করিতেছিল। কিন্তু নেলী স্পষ্ট দেখিল, বরের মুখে হাসি নাই, মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর, চোখে কালি পড়িয়াছে, দৃষ্টি উদাস। নেলী একবার সেই মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণপণে হৃদয়ের জমাট কান্না চাপিয়া রাখিয়া আপনিই ব্যগ্র হইয়া বলিল, "চল দাদা, ঘরে যাই।"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

ত্রিকাল

হে দেশ-জননী মম,
'অতীত' তোমার, পুঞ্জিত হিমশৈলে তুঙ্গতম,
যত অবদান কীর্ত্তি-গরিমা মৃত-কঙ্কালসার,
উত্তরে তব শ্মশানক্ষেত্রে ধরেছে শৈলাকার।
সমাধির পরে সমাধি উঠেছে তার পরে রাশি রাশি,
তুষারের রূপে স্তূপীকৃত মহাকালের অট্টহাসি।

পীড়িত আর্ত্ত প্রাণ,
আসমুদ্রে দাক্ষিণাত্যে তোমার 'বর্ত্তমান'।
মন্বন্তরে দৈন্যে পিষ্ট কাতর-মৌন-মূক,
রোগে শোকে দাহে জর্জ্জর দেহে প্রাণটুকু ধুক-ধুক।
পদলাঞ্ছিত সদা ধিক্কৃত সব-সম্পদহারা
হৃতগৌরব শ্রিহৃতগৌরব আসিন্ধুকটকারা।

জগতের শাবকবৎ,
দক্ষিণে মহাসিন্ধুগর্ভে তোমারি 'ভবিষ্যৎ'।
তথা নাগেন্দ্র ফণা-সহস্রে মণি-মরীচির মাঝে
নবজীবনের উষার স্বপ্ন অসীম ধৈর্য্যে রাজে।
তথা বরুণের রত্নবেদীতে বিদ্রুম বনছায়
আছে কমলার সূতিকানিলয়ে সুদিনের ভরসায়।

শ্রীকালিদাস রায়

মানুষমারা কল

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার কিরূপ গুরু ও স্বাস্থ্যহানিকর, তাহা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং কোনও বন্ধুর সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমেরিকা যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতিত্বকে মানুষমারা কল বলা যাইতে পারে।" বিগত শত ৩০ বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাজ্যে যে সকল বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিরাট ভার যুক্তরাজ্যের কর্ণধারকে বহন করিতে হয়। সহস্র প্রকারের গুরু দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত, সে সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে; সুতরাং অল্পদিনেই যে মানুষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার অবকাশ নাই।

হার্ডিং যখন উড্রো উইলসনের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন উইলসন্ অথর্ব্ব, শক্তিহীন। মিঃ উইলসন্ এখনও জীবিত আছেন বটে; কিন্তু 'ইভনিং-পোষ্ট' পত্রে ওয়াশিংটন হইতে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, অথর্ব্ব; গুরু কার্য্যভারই তাঁহাকে কয় বৎসরে এই অবস্থায় আনিয়াছে।" মার্কিণ সংবাদপত্রসম্পাদকগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, মিঃ উইলসনের ন্যায় মিঃ হার্ডিং এই নায়কত্বের চাপেই প্রচণ্ড কর্ম্মভারেই অবসন্ন, অথর্ব্ব এবং জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'পবলিক্ লেজার' পত্রে লিখিত হইয়াছে, "আড়াই বৎসরের শ্রান্তিশূন্য, প্রচণ্ড কর্ম্মভারের চাপেই মিঃ হার্ডিংকে অসময়ে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে।" এই ঘটনা হইতে সরকারী কর্ম্মচারীরা

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফটো।
কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং।

২ বৎসর কাজের পর আলাস্কা-প্রত্যাগত প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং।

বুঝিয়াছেন, যুক্তরাজ্যের কর্ণধারের বিপুল কার্য্যভার লাঘব না করিলেই আর চলিবে না।

'ইভনিংপোষ্ট' পত্রে সামুয়েল ব্লাইথ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিনলির সময়ে নায়কের কার্য্যভার যেরূপ ছিল, এখন তাহার ৫ গুণ বাড়িয়াছে; রুজভেল্টের সময়ে যাহা ছিল, তাহার ২ গুণ হইয়াছে। মিঃ হার্ডিং যখন রোগশয্যায় শায়িত, সেই সময় তাঁহার পত্নী এই প্রবন্ধটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। 'ইভ্‌নিংমেল,' 'আটলাণ্টা জর্ণাল,' 'ট্রিবিউন,' 'হেরাল্ড,' ও ওয়াশিংটন হইতে

কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে মিঃ রুজভেল্ট।
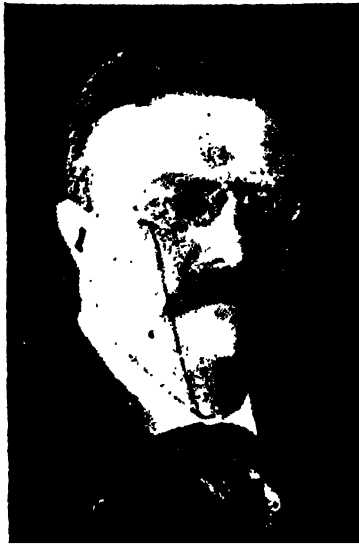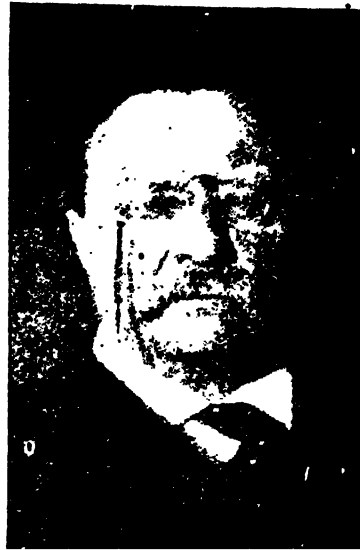
১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

স্বয়ং এই কথা 'নিউজ' পত্রের সম্পাদকের নিকট লিখিয়াছিলেন।

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'আমেরিকান,' পত্র লিখিয়াছেন, "ওয়াশিংটন ব্যাপারের পর রুজভেল্টের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। সে স্বাস্থ্য তিনি আর ফিরাইয়া পায়েন নাই।" যুক্তরাজ্যের নায়কপদ গ্রহণের পূর্ব্বে উড্রো উইলসন্ তাঁহার 'কনষ্টিটিউশনাল গভমেণ্ট' শীর্ষক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, "সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রেসিডেণ্টের পদের উপযুক্ত নহেন—সেরূপ ব্যক্তি কার্য্যভার গ্রহণ করিলে অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইবেন। এরূপ অবস্থায় কার্য্যভার লাঘব করা কর্ত্তব্য।" মিঃ যোসেফ্

প্রকাশিত 'ষ্টার' এবং অন্যান্য সংবাদপত্র স্পষ্টভাবেই বলিতেছেন যে, প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার না কমাইলে চলিবে না।

আলোচনাপ্রসঙ্গে ক্রমেই হোয়াইট হাউসের কার্য্যপ্রণালীর অনেক কথাই জনসাধারণ জানিতে পারিয়াছে।

প্রভিডেন্স সহর হইতে প্রকাশিত 'নিউজ' পত্র লিখিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট ক্লেভ লাণ্ড দ্বিতীয় বার নায়কত্ব করিয়া অকাল বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েন। তিনি কোন দিন্ স্বপ্নে ভাবিতে পারেন নাই যে, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে জীবনীশক্তি হারাইতে হইবে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

১৯১২ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি উইলসন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্য অপর্ব্ব মিঃ উইল

টিউমল্‌টি মিঃ উইলসনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতিকে কিরূপ গুরু পরিশ্রম করিতে হয়, দেশের লোক তাহা কিছুই অবগত নহেন।" আমেরিকার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিউ বলিয়াছেন, "যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্রেসিডেণ্টকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুকার্য্যভার বহন করিতে হয়—এত পরিশ্রম আর কাহাকেও করিতে হয় না।" বোষ্টন হইতে প্রকাশিত 'গ্লোব' লিখিয়াছেন, "জগতের মধ্যে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য।" সেনেটর ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ মিঃ হার্ডিংএর অনেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের অবকাশ পাইয়াছিলেন; তিনি উইলসন্‌ ও প্রেসিডেণ্ট হার্ডিংএর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, যুক্তরাজ্যের প্রধান নায়কের স্কন্ধে যে গুরুভার অর্পিত আছে, তাহার লাঘব করিতে হইবে।" বাস্তবিক যে বয়সে রাজ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রেসিডেণ্টের স্কন্ধে অর্পিত হইয়া থাকে, তখন শরীরে যৌবনের তেজ ও শক্তি থাকে না। এরূপ অবস্থায় প্রেসিডেণ্টের কর্ম্মসংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, মার্কিণের যাবতীয় সংবাদপত্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

নিউহেভেন হইতে প্রচারিত 'জর্ণাল কুরিয়ার'পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট হার্ডিংএর এই
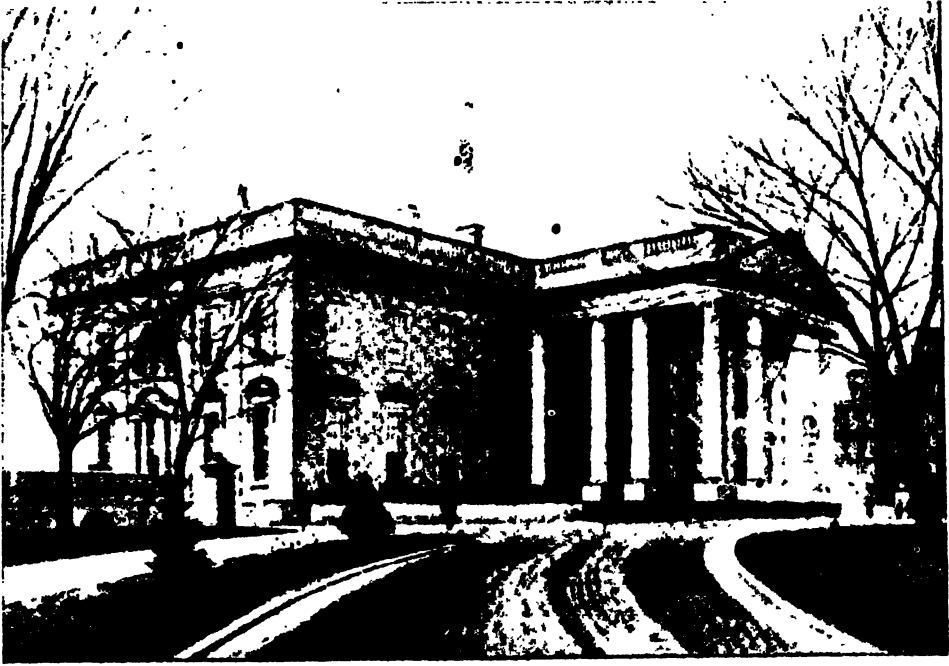
হোয়াইট হাউস।

বলিয়াছেন, "গত দেড় বৎসরে আমাদের প্রেসিডেণ্টের বয়স ১০ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।" বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট কুলিজ (ইনি তখন সহকারী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন) মিঃ হার্ডিংএর অসুস্থাবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "দেশের কার্য্যেই তাঁহাকে (হার্ডিং) রোগশয্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।"

ফিলাডেলফিয়া হইতে প্রকাশিত 'পব্লিক লেজার' এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া মার্কিণগণ কি নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে, অনেকেই অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে না কি?" প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহোদরা শ্রীমতী ডগলাস্‌ রবিন্‌সন বলিয়াছেন, "আমেরিকাবাসী তাঁহাদের প্রেসিডেণ্টগণকে এমন ভাবে হত্যা করিতে বিরত হউন।"

রাষ্ট্রপতিকে বৎসরে ৫০ হাজার কাগজ সহি করিতে হয়। এই ৫০ হাজার কাগজ সহি করিবার পূর্ব্বে তাঁহাতে

কি আছে, তাহা তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে হইবে। মানুষের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় কোন মানুষই এত পরিশ্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

নিউইয়র্ক 'ট্রিবিউন' আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বহু দিন হইতেই মার্কিণজাতি বুঝিয়াছে, তাহাদের প্রেসিডেণ্ট গুরুকার্য্যভারে অবসন্ন। তাঁহার কর্ম্মভারকে লাঘব করিবার প্রস্তাবও অনেকবার হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় নাই। বাল্টিমোর 'সন্' লিখিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট হার্ডিংএর এই অকালমৃত্যুর পর জনসাধারণ স্তম্ভিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের জীবন মহামূল্যবান্। ভবিষ্যতে তাঁহাদের জীবনরক্ষার জন্য অসাধারণ যত্ন লইতে হইবে; চিকিৎসকগণ সাধারণের কার্য্য হইতে প্রেসিডেণ্টকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন; আর প্রয়োজন হইলে জনসাধারণও প্রেসিডেণ্টকে—চিকিৎসকের নিষেধ না মানিয়া গুরু, শ্রমজনক কার্য্য করিতে গেলে, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে।"

নিউইয়র্কের 'আমেরিকান্' পত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সহকারী প্রেসিডেণ্টকে অনেক কায করিতে দিবার ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে প্রেসিডেণ্টের কার্য্য-ভার অনেক লাঘব হইবে। সেনেটর এজ্ প্রেসিডেণ্টের কায কমাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া লিখিয়াছেন, "আফিসের কার্য্যের গুরুত্ব কমাইয়া প্রেসিডেণ্ট যাহাতে শুধু আন্তর্জ্জাতিক ও জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করিবার চিন্তা ও ব্যবস্থা লইয়া থাকিতে পারেন, তাহাই বাঞ্ছনীয়।"

মার্কিণ সংবাদপত্রনিচয়ের অভিমত সংগ্রহ করিলে এইটুকু বুঝা যায় যে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টকে যে বক্তৃতা করিতে হয়, ভবিষ্যতে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। এইরূপ ভীষণ শ্রান্তিজনক অনুষ্ঠানের ফলে উইলসনকে ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট হার্ডিংকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছে; দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে হার্ডিংএর স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। বোষ্টন 'পোষ্ট' এই ভ্রমণব্যাপার উপলক্ষে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

ওয়াশিংটন দপ্তরখানা।

"তিনি (হার্ডিং) ৭ হাজার ৫ শত মাইল পথ নানা ঋতুর মধ্যে যাপন করিয়াছেন। স্পেশাল ট্রেণের সংলগ্ন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক স্থানেই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। ৩৯ দিনের মধ্যে মাত্র ৩ দিন গাড়ী

বা আহারে তাঁহাকে যাপন করিতে হয় নাই। সাধারণের কার্য্যে তাঁহাকে এতই বিব্রত থাকিতে হইত যে, প্রত্যহ বিশ্রাম বা অবসরযাপনের বিন্দুমাত্র অবকাশ পাইতেন না। যাহারা যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ভাবে কায করা অসম্ভব। প্রেসিডেণ্ট হইলেও তাঁহারা মানুষ ত বটেন! মনুষ্যাতীত শক্তি তাঁহাদের আছে, কেহ কেহ এমন আশাও রাখে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!

"মাঝে মাঝে এখানে ওখানে যাওয়া আসা ভ্রমণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে; কিন্তু এখন সংবাদ প্রেরণের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আজিকার সংবাদ কল্য সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এমন ক্লান্তিজনক, কষ্টকর দেশপর্য্যটনের ব্যবস্থা রহিত করাই কর্ত্তব্য।"

নিউইয়র্ক 'টাইমস্' এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, "বক্তৃতা-ভ্রমণের ফল দেখিয়া অবশ্যই বলিব, এ ব্যবস্থা বন্ধ করা হউক। অন্ততঃ চিকিৎসকগণের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ না লইয়া ব্যবস্থা করা সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে না। আমরা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সময়েও ইহার অব্যবহিত পরিণাম দেখিয়াছি। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিংএর পরিণাম দেখিলাম। অনাবশ্যক ভাবে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। নায়কের কার্য্যভার গ্রহণকালে অধিকাংশেরই যৌবন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কোনও স্থানে যাওয়া এক কথা, আর এমন ভাবে দীর্ঘপর্য্যটন আর এক কথা। ইহাতে মনের শান্তি, দেহের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। এ ব্যবস্থা যে সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, এখন তাহার প্রয়োজন নাই। সুতরাং এ ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিতে হইবে।"

যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মার্কিণগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যভার লাঘবের প্রচেষ্টা হইতেছে।

উদ্ভট-সাগর

কোনও এক ভক্ত কবি বেদশাস্ত্র-মুখে শুনিয়াছিলেন যে, 'মুক্তি'-নাম্নী এক পরম সুন্দরী কন্যা তদীয় পিতা 'তত্ত্ববোধের' আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহার প্রণয়ার্থী হইয়া 'তত্ত্ববোধের' নিকট গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, তত্ত্ববোধ কহিতে লাগিলেন যে, আমি যখন স্বয়ং 'মুক্তির' পিতা, তখন দৌত্যভার লইয়া কিরূপে তোমার সহিত তাঁহার প্রণয়-সংঘটন করিয়া দিতে পারি? তবে তুমি যদি আমার মাতা 'ভক্তির' নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইতে পার, তাহা হইলে তিনি তাঁহার নাতিনীকে পরিহাস-চ্ছলে দুই চারিটি মিষ্ট কথা বলিয়া তোমার সহিত তাঁহার প্রণয় সংঘটন করিয়া দিতে পারিবেন। 'তত্ত্ববোধের' এই কথাগুলির মর্ম্ম, ভক্তির নিকট গিয়া কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে জ্ঞাপন করিতেছেন। মুক্তিলাভের পক্ষে তত্ত্ববোধ অপেক্ষা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই সমধিক প্রার্থনীয়, ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থঃ—

সুব্যক্তা বেদভাগৈশ্চরমদুরিতজধ্বংসরূপা হি মুক্তি,
স্তত্তাতস্তত্ত্ববোধো নমু জনকতয়া তস্য দৌত্যং ন যুক্তম্।
ত্বং মাতা তত্ত্ববোধস্য হি নিখিলচিতা ধর্ম্মতঃ সাপি নপ্ত্রী
যত্নৈঃ পরৈশ্চর্বচোভিঃ পরিহসনবিধৌ ত্বং হি বক্তুং সমর্থা॥

অনন্ত-চরম-দুঃখ-বিনাশ-রূপিণী
আছে নাকি এ জগতে এ হেন রমণী।
মুক্তি নাকি নাম তার, চারি বেদে কয়,
ইচ্ছা হয় পাই তারে! তার কেবা নয়?
তত্ত্ববোধ পিতা হ'য়ে কিরূপে কন্যার
নিকটে বা গিয়া বলে ল'য়ে দৌত্যভার!
তত্ত্ববোধ-মাতা তুমি, ভক্তি-ঠাকুরাণি!
ধর্ম্মতঃ মুক্তিও দেখি তোমার নাতিনী।
নাতিনীর প্রণয়ের লবে দৌত্যভার,
এ কথা দোষের নয়,—জানে ত্রিসংসার।
তাই বলি, দু'চারিটি পরিহাস-চ্ছলে
মুক্তিরে মিলায়ে দাও, তুমিই কৌশলে!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর।

বিদায়

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

দুই বন্ধুর সায়ংভোজন শেষ হইয়াছে। কাফি-গৃহের গবাক্ষ হইতে উহারা দেখিল, "বুল্‌ভার" বেড়াইবার রাস্তা লোকাকীর্ণ। মধুর গ্রীষ্ম-রাত্রিতে পারীনগরের ভিতর দিয়া যে মৃদু অনিল শ্বাস বহিতে থাকে, তাহার স্পর্শ যেন উহারা বেশ অনুভব করিতে লাগিল। এই মন্দানিলের মধুর স্পর্শে পথ-চল্‌তি লোকদিগের মনে একটা ফূর্ত্তি আসিল; কোথাও যাইবার জন্য উহারা উৎসুক হইয়া উঠিল—কিন্তু কোথায় যাইবে, তাহা জানে না। ঐ ওখানে—যেখানে নিবিড় গাছপালা, ছায়া বিস্তার করিয়াছে অথবা জ্যোৎস্না-দীপ্ত নদী যেখানে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে জোনাকি ঝিকমিক করিতেছে, যেখানে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনা যাইতেছে। এইরূপ কত কল্পনাই উহাদের মনে উদিত হইতে লাগিল।

উক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে এক জন—হাঁরি-সিমো, একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল :—"ওহে! আমি বুড়িয়ে গেছি। বড় দুঃখের বিষয়। সেকালে, এই রকমের কোন সন্ধ্যায়, আমার শরীরে যেন একটা দৈত্যের বল আসত। আর আজ—পরিতাপ ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারছিনে। চলৎ জীবনযৌবনম্‌!"

লোকটা ইহারই মধ্যে একটু বেশী মোটা হইয়া পড়িয়াছে; ৪৫ বৎসর আন্দাজ বয়স, কিন্তু দেখিতে বুড়ার মত। মাথায় খুব টাক পড়িয়াছে।

অন্যটি—পিএর্-বার্ণিয়ে, বয়স একটু বেশী; কিন্তু উহার অপেক্ষা শীর্ণকায় ও ফূর্ত্তিবাজ; সে বলিল :—"ওহে! আমিও বুড়া হইয়া গিয়াছি, কিন্তু বুড়া হইয়াছি বলিয়া একটুও অনুভব করিতে পারি নাই। আমি চিরকালই আমোদপ্রিয়, সখের প্রাণ, ফূর্ত্তিবাজ, বলিষ্ঠ...যখন প্রতিদিন আয়নাতে মুখ দেখা যায়, তখন বুঝা যায় না, দুরন্ত কালের কায কতটা সম্পন্ন হইয়াছে; কেন না, কালের গতি বড়ই বিলম্বিত ও নিয়মিত; তাই কাল, এমন আস্তে আস্তে মানুষের মুখ একটু একটু করিয়া বদল করিয়া দেয় যে, এই পরিবর্ত্তন আমরা ধরিতে পারি না। এই জন্যই, শুধু দুই তিন বৎসরের ক্ষতির কায দেখিয়া, আমরা একেবারে দুঃখে মরিয়া যাই না। কারণ, তাহা আমরা ধরিতে পারি না। যদি এই ক্ষতির হিসাব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে ৬ মাসকাল আয়নায় মুখ দেখিও না—তাহার পরই দেখিবে কি কাণ্ড হইয়াছে!

"আর, ভাই, স্ত্রীলোকদের কথা যদি ধর,—তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আমার বড় মায়া হয়; তাহারা নিতান্তই কৃপাপাত্র। তাহাদের সমস্ত সুখ, তাহাদের সমস্ত শক্তি, তাহাদের সমস্ত জীবন,—তাহাদের রূপ-লাবণ্যের ভিতরেই অবস্থিত; আর এই রূপলাবণ্য হদ্দ ১০ বৎসর থাকে বৈ ত নয়।

"আমি বুড়া হইয়াছি সত্য; কিন্তু বুড়া হইয়াছি বলিয়া আমার কখনো একটু সন্দেহও হয় নাই; আমার যখন ৫০ বৎসর বয়স, তখনও আপনাকে যুবা বলিয়া মনে করিতাম। কোন প্রকার ক্ষীণতা বা দুর্ব্বলতা অনুভব করি নাই; জীবনটা বেশ সুখে—শান্তিতে কাটাইয়াছি।

"আমার শরীর যে ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা হঠাৎ একটা ঘটনায় আমি অতি সহজে জানিতে পারিলাম—এই ভয়ানক কথাটা জানিতে পারিয়া অবধি আমি প্রায় ৬ মাসকাল একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম—তাহার পর মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিলাম।

"অন্য পুরুষদের মত আমিও অনেকবার প্রেমে পড়িয়াছি; কিন্তু বেশী রকম—একবার।

"প্রায় ১২ বৎসর হইল, যুদ্ধটার পরে, একটা যায়গায়, সমুদ্রের ধারে এই ঘটনাটা হইয়াছিল। স্নানের সময়, প্রভাতকালে, এই সমুদ্রের বেলাভূমি বড়ই মনোরম। এই ভূখণ্ডটি আয়তনে ক্ষুদ্র, ঘোড়ার নালের মত গোলাকার, তাহার চারিদিকে সাদা সাদা উচ্চ শৈলখণ্ড ফ্রেমের মত ঘিরিয়া আছে। এই সব শৈলের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের কতকগুলা গর্ত্ত আছে; এই গর্ত্তগুলাকে সেখানে 'শৈলদ্বার' বলে। ইহারই অন্তর্ভুক্ত একটা প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড, তাহার দৈত্যের মত লম্বা একটা পা সমুদ্রের ধার দিয়া বরাবর

ছড়াইয়া দিয়াছে ; সম্মুখে আর এক শৈলখণ্ড গট্ হইয়া যেন বসিয়া আছে—গোলাকার ; এইস্থানে স্ত্রীলোকের ভীড় হইয়াছে। উহারা এই উপলময় সংকীর্ণ ভূখণ্ডে সমবেত হইয়াছে—উহাদের বিচিত্র প্রসাধন-সরঞ্জামে আচ্ছন্ন হইয়া স্থানটা উদ্যানের শোভা ধারণ করিয়াছে—উচ্চ শৈলখণ্ড ফ্রেমের মত ঘিরিয়া আছে। সূর্যাকিরণ গিরি-পার্শ্বে পড়িয়াছে, বিচিত্র বর্ণের আতপত্রের উপর পড়িয়াছে, নীল-হরিতাভ সমুদ্রের উপর পড়িয়াছে ; সমস্তই হর্ষোজ্জ্বল, সুরম্য, নয়নানন্দকর, হাস্যময়। ঠিক জলের ধারে বসিলে, এই সব স্নানকারিণীদিগকে বেশ দেখা যায়। উহারা পশমী স্নানের কাপড় পরিয়া নামিতেছে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনিল তরঙ্গের ধারে আসিবামাত্র সুন্দর গতিভঙ্গী সহকারে কেমন চট্ করিয়া উহাদের বসন ত্যাগ করিয়া, সমুদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিতেছে ; কখন কখন শীতের কাঁপুনীতে শিহরিয়া উঠিয়া থামিয়া পড়িতেছে ; এক একবার যেন দম্ আটকাইয়া যাইতেছে।

"এই সময় উহাদের পায়ের ডিম হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত বেশ বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে ; জল হইতে বাহির হইলেই, কে ক্ষীণকায়, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

"এই প্রথমবার এইরূপ একটি তরুণীকে দেখিয়া আমি চিত্তহারা ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তরুণী বেশ সুগঠিত ও দৃঢ়কায়। এক এক জনের মুখে কি একটা 'মোহিনী' থাকে, যাহা চট্ করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে। মনে হয় যেন, এ এমন একটি নারী, ভালবাসা পাইবার জন্যই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার ভিতর এই রকম একটা অনুভূতির সঞ্চার হইয়া আমার হৃদয়কে খুব একটা নাড়া দিল।

"আমি কাহারও দ্বারা তাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইলাম ; তাহার একটু পরেই স্মর-শরে এমনি বিদ্ধ হইয়া পড়িলাম, জীবনে যাহা আমার কখনও হয় নাই। তরুণী আমার হৃদয়কে একেবারে লুঠিয়া লইল। এইরূপ কোন রমণীর প্রভাবাধীনে থাকা এক দিকে যেমন ভয়ানক, তেমনই আবার বড়ই মধুর। ইহাকে একটা শাস্তি বলিলেও হয়, সুখ বলিলেও হয়। তাহার দৃষ্টি, তাহার মুখের মৃদুহাসি, তাহার গ্রীবার বায়ু-চঞ্চল কেশগুচ্ছ, তাহার মুখের ক্ষুদ্র রেখাবলী, তাহার মুখাবয়বের ঈষৎ চাঞ্চল্য, আমাকে আত্মহারা করিত, বিপর্যাস্ত করিত, উন্মত্ত করিত। তাহার সমস্ত শরীর, সমস্ত ভাবভঙ্গী, সমস্ত গতিভঙ্গী আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার সমস্ত জিনিষই আমাকে যেন যাদু করিল। একটা আসবাবের উপর তাহার অবগুণ্ঠন রহিয়াছে দেখিলে, একটা আরাম-কেদারার উপর তাহার দস্তানা পড়িয়া আছে দেখিলে আমার মনটা যেন একটু রসার্দ্র হইয়া উঠিত। সে যেরূপ প্রসাধন করিত, আমার মনে হইত, তাহার তুলনা নাই। তাহার টুপীর মত এমন সুন্দর টুপী আর কাহারও নাই।

সে বিবাহিতা। তাহার স্বামী প্রতি শনিবারে আসিত সোমবারে চলিয়া যাইত। সে আমার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। জানি না কেন, আমারও তাহার উপর একটুও ঈর্ষা হইত না। তাহাকে আমি নগণ্যের মধ্যেই ভাবিতাম। তাহার দিকে আমি একটুও মনোযোগ দিতাম না।

সেই মেয়েটিকে আমি কি ভালই না বাসিতাম ! আহা, কি রূপমাধুরী, কি সৌন্দর্য্য, কি তারুণ্য ! সে যেন যৌবনশ্রী, লালিত্য ও মূর্ত্তিমতী নবীনতা। এরূপ অনুভূতি আমার জীবনে কখনও হয় নাই। কপোলের সুবঙ্কিম রেখায়, ওষ্ঠাধরের ঈষৎ স্ফুরণে, ছোট কান দুইটির সুগোল ভাঁজের ভিতর, নাকের গঠনে যে এমন একটা চিত্তহারী সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না।

তিন মাস কাল এই ব্যাপারটা চলিয়াছিল। তাহার পর আশা-ভয় হৃদয়ে আমি আমেরিকায় যাত্রা করিলাম। কিন্তু তবু এই চিন্তাটা আমার ভিতর সমান চলিতে লাগিল ; আমার উপর একাধিপত্য করিতে লাগিল ; আমাকে এক দণ্ডও ছাড়িল না নিকটে যেরূপ দূর-দেশেও সেইরূপ আমাকে দখল করিয়া বসিল। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল ; আমি তাহাকে ভুলিলাম না। তাহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার চোখের সম্মুখে, আমার হৃদয়ের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার উপর আমার ভালবাসা সমান রহিল ; কিন্তু এ ভালবাসায় আর সে প্রখরতা নাই ; এখন বেশ শান্ত। যে সুন্দর জিনিষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই, আমার সেই আরাধ্য দেবতার সুন্দর প্রতিমার যেন স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই ভালবাসা আমার হৃদয়-মন্দিরে পোষণ করিতে লাগিল।

"১১ বৎসর, এক জন মানুষের জীবনে কিছুই না বলিলেও হয়! উহার গতি অনুভব করা যায় না। একটার পর একটা বৎসর চলিয়া যায়—ধীরে মন্থরগামী অথচ দ্রুত, বিলম্বিত অথচ ত্বরান্বিত; প্রত্যেক বৎসরটা দীর্ঘ অথচ মনে হয় যেন, শীঘ্র শেষ হইয়া গেল! বৎসরগুলা যোগের পর যোগ হইয়া এত শীঘ্র বাড়িয়া চলিয়াছে,—অথচ পশ্চাতে কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না;—একেবারেই যেন বিলুপ্ত হইতেছে। অনেক দিনের পর এই অতিবাহিতকালের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে উহার কিছুই আর উপলব্ধি হয় না; বুঝা যায় না, কি করিয়া বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল। সেই উপলময় বেলাভূমি-সমীপস্থ ভবনে যে সুখের জীবনযাপন করিয়াছিলাম, তখন হইতে গণনা করিলে ৬ মাসও হয় নাই, এইরূপ আমার যেন অনুভব হইতেছে।

"গত বসন্তকালে, আমার বন্ধুদের বাড়ীতে আমি ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম।

"যখন ট্রেণের যাত্রা সুরু হইল, ছোট ছোট চারজন মেয়ের সহিত এক স্থূলকায়া মহিলা আমার গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। এই বালিকাদিগের মা'কে এক নজরে দেখিয়া লইলাম। দেহখানা খুব চওড়া, খুব গোলাকার; পূর্ণচন্দ্রের মত গোল মুখ, একটা ফিতা-বদল টুপির দ্বারা বেষ্টিত।

"তাড়াতাড়ি চলার দরুণ উহার হাঁপ লাগিয়াছে—খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে। শিশুগুলা বরড়-বরড় করিতে আরম্ভ করিল। আমি আমার খবরের কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম।

'আসনিয়েরে' ষ্টেশন পার হইয়াছি, এমন সময় আমার প্রতিবেশিনী হঠাৎ আমাকে বলিলেন:—'আমার রূঢ়তা ক্ষমা করবেন,—আপনি কি মোসিও বার্ণিয়ে নন?'

"হাঁ, মাদাম, আমিই মোসিও বার্ণিয়ে।"

"তখন মহিলা হাসিতে লাগিলেন। এ হাসি সাধ্বী-সুলভ পরিতোষের হাসি; তবে, এই হাসির মধ্যে একটু বিষাদের ভাবও ছিল।

"আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?"

আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন, কোথাও এই মুখখানা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; কিন্তু কোথায়?—কিন্তু কখন? আমি উত্তর করিলাম:—"হাঁ...না, না... আমি নিশ্চয়ই আপনাকে চিনি, কিন্তু নামটা মনে আসছে না।"

"মহিলার মুখ লজ্জায় একটু লাল হইয়া উঠিল।

"আমার নাম, শ্রীমতী জুলি-লেফেবর্।"

জীবনে এমন আঘাত আমি আর কখনও পাই নাই। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনে হইল, যেন আমার সব শেষ হইয়া গিয়াছে! আমি কেবল অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন আমার চোখের সম্মুখে একটা আবরণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; এখন কত কি ভয়ানক জিনিষ, হৃদয়বিদারক জিনিষ আমাকে দেখিতে হইবে!

"এ কি সেই! সাধারণ স্ত্রীলোকের মত এই মোটা রমণীটি কি সেই? ইতোমধ্যে সে কি চার মেয়ের মা হইয়া পড়িয়াছে? মেয়েদের অপেক্ষা উহাদের মা'কে দেখিয়াই আমার বেশী আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। মেয়েরা ইহার মধ্যেই বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে, জীবনক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

"পক্ষান্তরে, পূর্ব্বে যাহার রূপলাবণ্য উছলিয়া পড়িত, এখন সে রমণী ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। আমার মনে হইল, যেন এই সেদিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, আর এখন তাহাকে এই রকম দেখিতেছি! এ কি সম্ভব? একটা দারুণ বেদনা শূলের মত আমার হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল—এমন কি, বিশ্বপ্রকৃতির উপরেও আমার একটা বিদ্রোহভাব উপস্থিত হইল—এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য, তাহার এই জঘন্য ধ্বংস-কার্য্যের জন্য প্রকৃতির উপর আমার ভয়ানক রাগ হইল।

"হতবুদ্ধি হইয়া আমি ঐ রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর তাহার হস্ত ধারণ করিলাম। আমার চোখে জল আসিল। তাহার অতীত যৌবনের জন্য কাঁদিলাম; তাহার এক প্রকার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া কাঁদিলাম। কারণ, এই স্থূলকায়া রমণীকে আমার সেই মনোমোহিনী তরুণী বলিয়া চিনিতে পারিলাম না।

"সেও আবেগভরে এই কথাগুলি মৃদুস্বরে বলিল:—'আমি খুব বদলে গেছি—না? উপায় কি?—সবই চ'লে যায়। তুমি ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ, আমি এখন মা হয়েছি, এখন ভাল মা হয়েছি—মা ছাড়া আমি এখন আর কিছুই নই। আর বাকী যা কিছু—সকলের কাছ থেকেই বিদায় নিয়েছি। সব ফুরিয়ে গেছে। আমারও মনে হয়েছিল,

আবার যদি কখনও দেখা হয়, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। তা' ছাড়া তুমিও—তুমিও বদলে গেছ। আমার ভুল হয়েছে কি না, স্থির করতে কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তুমি একেবারেই সাদা হয়ে গেছ। ভেবে দেখ, আজ ১২ বৎসর হ'ল!—১২ বৎসর! আমার বড় মেয়ের বয়স এরই মধ্যে ১০ বৎসর হয়েছে।"

আমি ঐ মেয়েটিকে তাকাইয়া দেখিলাম। তাহার মায়ের পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের কিছু কিছু যেন তাহার মধ্যে আবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু "এই কিছু-কিছু" এখনও একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই—ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। আর আমার জীবনটা মনে হইল, যেন একটা চলন্ত রেলগাড়ী—ছুটিয়া চলিয়াছে।

"আমি বাড়ী ফিরিলাম। আমার পুরাতন বন্ধুর হস্ত চুম্বন করিলাম। সাদামাটা ভদ্রতার কথা ছাড়া তাহাকে বলিবার আমার আর কিছুই ছিল না। সব এমন ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছিল যে, কথা কহিবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না।

"সায়াহ্নে আমি একলাটি আমার বাড়ীতে আছি। অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়নায় মুখ দেখিলাম। শেষে মনে পড়িল, আমি এক সময় কি রকম ছিলাম। আমার সেই কালো গোঁফ, কালো চুল আর নাই; আমার মুখের সেই তরুণভাব আর নাই। আমি এখন বুড়া হইয়াছি। বিদায়!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগমনী

আসিছ বরদে, আবার ভারতে
কিরণের রথে শোভন শরতে,
শুভ — সূচনা তা'র মা জেগেছে সুষমাপ্রশ্নে,
স্নেহ যে তোমার আগে হ'তে গলি
কূলে কূলে জলে উঠিছে উছলি'
কিবা — মরি ফুলে ফুলে মুকুলে ফুটেছে কুঞ্জে।

স্তন্য-সুধার ফেনায় তোমার
ভরিয়া উঠেছে বন কান্তার,
সারা — দিগ্‌দিগন্ত, দূরদূরান্ত ক্ষেত্র,
বায়ুলাঞ্ছিত মৃদু চঞ্চল
লভিয়া তোমার গাত্র-অঞ্চল
তায় — মুছেছে প্রকৃতি শোকছলছল নেত্র

সঙ্গে আনিছ ইন্দিরা মায়,
ইঙ্গিতে মহানন্দে জানায়
চারু — শ্যামল উদার স্নিগ্ধ কেদার কুঞ্জ,
বাণীরেও সাথে আনিছ ঈশানি,
ঘোষণা করেছে মরালেরা জানি'
তারা — বিসকিসলয়ে রচে উপায়ন গুচ্ছ

সবার লাগিয়া কৃপাসম্ভার
আনিছ আশিস্ স্নেহ উপহার,
মা গো — বিশ্বম্ভরা ভরিবে সকল শূন্য,

মোদের কাম্য স্পৃহণীয় ধন
আনিবে না? বৃথা রোদনে রোদন?
মা গো — মোরা কি রহিব চির-বঞ্চিত ক্ষুণ্ণ?

আনিছ ঝরণা পল্লব আপীনে
সঙ্গীত নব বেণুর বিপিনে
মা গো — কবির বীণায় আনিছ নবীন ছন্দ;
কপোতকণ্ঠে সুষমা পেলব,
কেশরীর শিরে কেশর কোমল,
চল — মদির সমীরে আনিছ মধুর গন্ধ।

করীর কপোলে মদযৌবন,
হ্রদ-নদী-নদে মীন-বৈভব,
সত — পক্ষিমাতার গর্ভে নবীন ডিম্ব,
সন্ধ্যার তরে সিন্দূররেখা
ইন্দ্রধনুর ললাটিকা লেখা,
দীন — গোষ্পদ বুকে রুচির চন্দ্রবিম্ব।

লভিতেছে উষা পদ্মমুকুতাল
কোকনদভূষা তড়াগ কাসার,
পুন — লভিছ মুক্তা রূপপুটতলে শুক্তি
লভিছে মুক্তি শশী তারকারা,
লভিছে মুক্তি মধুমদধারা
মা গো — আনিবে না শুধু মোদের লাগিয়া মুক্তি?

শ্রীকালিদাস রায়

বলাইদা'র রোগ-লক্ষণ

১

শরীর ব্যাধিমন্দির। অনেক সময় অনেকে এই ব্যাধিমন্দিরের লক্ষণ দেখিয়া জীবনের ইতিহাস নির্ণয় করিয়া থাকেন। আত্মার সঙ্গে দেহের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, উভয়ের বিশ্লেষণ নিতান্ত শ্রমসাধ্য। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে (বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের) এহেন বিশ্লেষণ ক্রমশঃ সোজা হইয়া পড়িবে। এই প্রবন্ধে একটি খ্যাতনামা পুরুষের উদাহরণ প্রদত্ত হইল। লক্ষণগুলি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

বলাইচাঁদের জন্ম বঙ্গদেশে। নামকরণ এবং অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত তাঁহার দৈহিক ক্রিয়ার বিশেষ বিকাশ হয় নাই। তবে সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাঁহার মাথার অংশ শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বড়, এবং নিদ্রাকালে ঘর্মাক্ত হইয়া বালিস ভিজিয়া যাইত (ক্যালকেরিয়া কার্ব)। ভবিষ্যতে তিনি এক জন দিগ্‌গজ মেধাশালী ব্যক্তি হইবেন, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। যাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে সময় লাগে, তাহাদের দন্তোদ্গমে কষ্ট হয় এবং তজ্জনিত বহু পীড়া হয়, যেমন, পেটের অসুখ (ক্যামোমিলা), অত্যন্ত ভয়াবহ পেটের অসুখ ও জ্বর (পডোফিলম), অনেকে পা ফাটিতে শিখে না (ক্যালকেরিয়া ফস)। কিন্তু আমাদের বলাইদা'র সে সকল কষ্ট হয় নাই, কারণ, তাঁহার মস্তিষ্কের লক্ষণের সঙ্গে দেহের লক্ষণের বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল না। দুই বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি দৌড়াইতে শিখিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমিক বাতের রোগের ফলে তিনি মধ্যে মধ্যে অস্থির হইতেন বটে (রস টক্স), কিন্তু সে অস্থিরতার কারণ সকলে বুঝিত না।

মিষ্টান্ন ভক্ষণে ছেলেপুলে প্রসিদ্ধ, বলাইদা'র মাত্রাও খুব বেশী ছিল (ইপিকাক)। দুগ্ধ খাওয়াইতে গেলে তিনি অতিশয় চীৎকার করিতেন এবং এক ঘণ্টা পরে তুলিয়া ফেলিতেন, এমন কি, তাঁহার জন্য মধ্যে মধ্যে তড়্‌কা হইত (ইথুজা)। পিপাসা তাঁহার ছিল না বলিলেও হয় (পলসেটিলা), তবে জ্ঞান-পিপাসা খুব। মাথা বড় এবং দেহ খর্ব্বকায় সত্ত্বে তিনি প্রায়ই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতেন এবং ম্যাট্রিক পাশ পর্য্যন্ত এই রকম অনেক হোঁচট খাওয়াতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় জর্জ্জরিত ছিল এবং মুখমণ্ডলে ও মাথায় স্ফোটক ক্রমাগত বাহির হইত (আর্ণিকা)।

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বলাইদা' কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, এবং সেই সময় ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত ব্যায়াম সুরু করিয়া দেহের উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন। সেই কালে পূর্ব্বলক্ষণগুলি ক্রমে অপসৃত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ স্বরভঙ্গ (কষ্টিকম্)। তাহার বিশেষ কারণ বোধ হয় গলা-সাধা। মেসের ম্যানেজারের একটা পুরাণো ভাঙ্গা এবং বেসুরা হার্ম্মোনিয়াম ছিল, সময় পাইলে সেটার সঙ্গে গলা মিলাইয়া বলাইদা' তিন অক্টেভের সা রি গ ম অর্থাৎ প্রায় বাইশখানি সুর খাদ হইতে তারার সপ্তক পর্য্যন্ত কসরৎ করিয়া ফেলিতেন। মধ্যে মধ্যে খুব চড়া গ্রামের দিকে গিয়া আর অবরোহণ করিতে পারিতেন না। বোধ হয়, সুরগুলি মাথায় কিংবা গলায় বসিয়া যাইত। তাহার ফলে মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া (ব্রাইওনিয়া) এবং কোষ্ঠবদ্ধ।

আহারের মধ্যে বলাইদা'র মৎস্যের দিকেই বিশেষ টান, তজ্জন্য চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হন (ইকুপিওন)। মেজাজও ক্রমে খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে (ব্রাইওনিয়া), এমন কি, মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া হাত-পা ছুড়িতেন (ফেরম ফস)।

বলা বাহুল্য, বলাইদা' আর্ট কোর্স লইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ধ্যানমগ্ন হইয়া দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে গিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইতেন, এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া শিরঃপীড়ায় অস্থির হইতেন, তখন বোধ হইত যে, সংসার অলীক এবং মানব উন্মাদগ্রস্ত পশুবিশেষ (ল্যাকেসিস)। তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন প্রশংসা-বাক্য উত্থাপিত হইলে বলাইদাদা নিতান্ত খুসী হইতেন (প্যালেডিয়ম্)। মধ্যে মধ্যে মনস্তত্ত্বের বিচার করিতে গিয়া হিক্কার আধিক্য হইত (রাটানহিয়া), এমন কি, লিভারে বেদনা হইয়া নাসিকার গোড়া পর্য্যন্ত টাটাইয়া উঠিত

(টেলিয়া), দাঁতের গোড়াতেও বিষম ব্যথা হইত (প্ল্যানটাগো)। অনেক সময় সাতিশয় ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং চক্ষুর সম্মুখে অসংখ্য শ্বেতবিন্দু দেখিতে পাইতেন (পাইলোকার্পাস)।

যাহা হউক, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৮, অর্থাৎ যখন তিনি এম, এ পাশ করিয়া (দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী) অধ্যাপকের কায লইবেন এহেন চিন্তায় দিনপাত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননীর আজ্ঞা হইল যে, বিবাহ করিতে হইবে, কারণ, বিবাহ একটা ধর্ম্মবিশেষ এবং শরীর-পতন হইলে আর কিছুই সঙ্গে যায় না, কেবল ধর্ম্মই যায়।

২.

বলাইদাদা, ধর্ম্ম ও স্ত্রীলোক উভয় পদার্থকেই ভয় করিতেন, এমন কি, আতঙ্কের আধিক্যে তাঁহার জ্ঞানলোপ হইত (ইগ্নেসিয়া)। অনেকে বলিত যে, তিনি এ সম্বন্ধে স্ত্রীলোক হইতেও ভীরুস্বভাব। সুতরাং জননীর আজ্ঞা-পালনার্থ যদিও বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু দুর্ভাবনা আরও বদ্ধমূল হইল। নানাবিধ দুর্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে বলাইদা'র একমাত্র বন্ধু জানকীবাবু এলাহাবাদ হইতে কাশীধামে আসিলেন (বলাইদা তখন কাশীধামে বায়ুপরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন)।

প্রথম বিপদ কন্যা দেখিতে যাওয়া। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, কন্যা দেখিতে স্বয়ং কিংবা কোন বন্ধুর কলিকাতায় যাওয়া অসম্ভব। বলাইদা'র মতে কন্যা পছন্দ করিতে যাওয়াই অসভ্যতা। যেন হাটে একটা গরু দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করিবার মত। ইহা সমূহ ভাবী সহধর্ম্মিণীর অপমান করা। বরং গরু দেখিবার সার্থকতা আছে, কারণ, শিং এবং ভাবভঙ্গী দেখিয়া 'মারখাণ্ডি' হইবে কি না বুঝা যায়। কন্যার সম্পর্কে তাহা কিছুই হয় না। বরং এই অস্বাভাবিক উদ্বেগে কন্যা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা হয় (নক্স মোস্কাটা)।

জানকী বাবু বুঝাইয়া বলিলেন যে, ইহা পুরাতন প্রথা। আমাদের ভারতবর্ষের স্ত্রীলোক বড়ই দুঃখিনী। প্রথম দৃষ্টিতে সেই দুঃখ দেখিয়া যদি করুণার উৎপত্তি হয়, তবেই মাকারিঙ্গাছ সুন্দরী কিংবা কালো মেয়ের বিবাহ অনেকটা সম্ভব, নচেৎ সাত হাত জল কিংবা সাত হাজার টাকার দাবী। বলাইদাদার মতে, এমত স্থলে অতদূর গিয়া পছন্দ না করিয়া আসা এবং একটা নিরীহ জীবহত্যা করা একই কথ। বলাইদা'র জননী কখনও টাকার প্রত্যাশা করেন না। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বলাইদা পছন্দ করিয়াছেন। তবে যদি কন্যার কিংবা তাঁহার তরফের কেহ পছন্দ করিতে চাহেন, তবে কাশীধামে আসিলে মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে।

ফলে তাহাই হইল। কন্যার বড়দিদি বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক দিন মোটরকারে আসিয়া বলাইদাকে দেখিয়া বলিলেন, ছেলেটি বেশ, তবে 'বেতো রুগী।' যা হোক, চারুবালার সঙ্গে মানাবে ভাল। সে একরত্তি মেয়ে। বুকের কাছে মিশিয়ে যাবে।' এই সব কথায় প্রতিপন্ন হইল যে, মেয়েটি ছোট এবং ভূতপূর্ব্ব জনষ্টন হফম্যানের ফটোগ্রাফেও সেই প্রকার দেখা গেল।

বিবাহের শুভলগ্নের কিছু দিন পূর্ব্বে বলাইদা প্রথমে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিষাদে ও নিরাশায় রাত্রিতে ঘুম হইত না (কষ্টিকম)। বিবাহের দিন ঢাক-ঢোলের শব্দে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল (বেলাডোনা), কিন্তু কানে তালা লাগে নাই। বাসরঘরের উজ্জ্বল সাজসজ্জা এবং মহিলাগণের সমাগম তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া জ্বর হইয়া পড়ে এবং সেই জ্বরে তিনি ছন্দোবদ্ধে প্রলাপ বকিয়াছিলেন (এন্টিমনিয়ম ক্রুডম), তাহা শুনিয়া সকলে প্রীতা; মহিলারা বলিয়াছিলেন, 'ইনি এক জন দার্শনিক কবি।'

নববধূ গৃহে আসিলে বলাই-দা তাহার রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া পড়েন এবং এত খুসী হইয়াছিলেন যে, তিন রাত্রি নিদ্রা হয় নাই (কফিয়া), কিন্তু নববধূ ক্রমাগত নিদ্রাবিহ্বলা হইতেন (এনটিমনিয়ম টার্ট)। নববধূ চারুবালা সাতিশয় ক্ষীণা এবং এত সলজ্জা যে, আদর করিলে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িত এবং আদরের অবসানে রক্তবর্ণ হইত (ফেরম), কারণ, তিনি বংশানুক্রমে ম্যালেরিয়া-পীড়িতা।

এ সম্বন্ধে জানকী বাবু বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'এক এক দেশে এক একটা ব্যায়রাম হয় কেবল আর্টের কিংবা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য। রোগ না হইলে কেহ সুন্দর

হইতে পারে না। কাঠপোট্টার শরীরে সৌন্দর্য্যবিকাশ স্বাস্থ্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা রমণীয় হইলেও মানসোপভোগ্য নহে। এই জন্য স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই রুগ্ন হইলে সমবেদনার প্রাচুর্য্যে ভালবাসা প্রগাঢ় হইয়া পড়ে।

বলাইদাদারও মত অনেকটা সেই রকম। ভারতবর্ষে এত রোগের প্রাদুর্ভাব কেবল সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পূর্ব্বলক্ষণ। তাই সকল দেশের লক্ষ্য এই দেশ। সকল দেশের লোকই এই দেশে যখন আসে, তখন দেখিতে অনেকটা বানরের মত। ক্রমে নানাবিধ রোগের কীটাণু তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিলে তাহারা খানিকটা মানুষের মত দাঁড়ায়। আদিমকালে বোধ হয়, এই দেশ এক সময় আদর্শসৌন্দর্য্যের আকর ছিল, ক্রমে পলী পড়িয়া সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেগুলি পরিষ্কার করিতে গেলে প্রথমতঃ রোগের প্রাদুর্ভাব স্বতঃসিদ্ধ। আর একটা বিশেষ কথা, ধর্ম্ম কি জিনিষ, তাহা কেবল স্ত্রীলোকরাই জানে এবং তাহাদের স্বভাবেই সেটা ফুটিয়া উঠে (পল্‌সেটিলা)। পুরুষ হিংস্রক জন্তবিশেষ এবং স্বভাবও সেই রকম (নক্স ভমিকা)।

স্বদেশপ্রিয়তা বলাইদার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ এবং বিবাহের পর তাহা সম্যক্‌ভাবে বিকাশ পাইয়াছিল। তিনি আবার গীতার কথা মনে করিলেন, 'ধর্ম্মই আত্মার সঙ্গে পরলোকে যায় আর কিছুই যায় না।' অতএব সহধর্ম্মিণীর মধ্যে যদি ধর্ম্ম লুক্কায়িত থাকে, তবে সহমরণ অনিবার্য্য।

৩

জানকী বাবু খুব বিজ্ঞানবিশারদ। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে স্ত্রী ও পুরুষ জীবদেহের একই আধারে বিরাজ করিত। কালক্রমে অস্থি এবং মজ্জার নেক্রোসিস্ হইয়া একটা আক্ষেপজনক বিশ্লেষণ হইয়া পড়ে (সাইলিশিয়া)। এটা সমুদ্রের ধারে হয় সেই সময় হইতে স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত। প্রকৃতির এই অভাবনীয় ব্যবহারে পুরুষের মস্তিষ্কবিকার হইয়া পড়িলে তিনি দেহকে দ্বিখণ্ড মনে করিতেন (ষ্ট্রামোনিয়ম্‌-ধুতুরা)। যে অংশ বিশ্লেষিত হইয়াছিল, তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টার নাম বিবাহ। হেকেলের মতে, কোন কালে পুরুষেরই স্তন্য তাঁহাদের বংশধরগণ পান করিতেন। এটা আদিম মানবের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এই সুন্দর প্রথা কবে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। বোধ হয়, এক সময় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইয়া পুরুষ জয়লাভ করেন এবং স্ত্রীপ্রকৃতি অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবনের দুঃখভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু যুগব্যাপী শোকে ক্রমশঃ মস্তকের কেশগুচ্ছ বিলম্বিত হইয়াছিল এবং শিশুসন্তানের সাদর চুম্বন প্রভৃতির গুণে মুখমণ্ডলের—কোমলতা ও সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বিকাশ পাইয়াছিল।

বলাইদাদার মনে হইত যে, হয় ত তাহা অনেকটা সত্য। আত্মা যদি অমর হয়েন এবং যদি পরলোক থাকে, তবে নিশ্চয় সহধর্ম্মিণীকে স্কন্ধে করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে তিনি বাধ্য, এবং যখন পুনর্জ্জন্ম হয়, তখনও ফিরিয়া লইয়া আসিতে বাধ্য। বোধ হয়, এই জন্যই এক সময় সহমরণ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তর্কস্থলে কথা উঠিতে পারে যে, একসঙ্গে জন্মানোর প্রথা পরলোকে প্রবর্ত্তিত হয় নাই কেন? এই জন্য পুরুষ স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ করেন (হাইওসাইয়েমাস্) এবং সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে অন্য পুরুষ বাক্যালাপ করিলে গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষই তর্কস্থলে এই রকম বিচার করিতে পারেন। আরও একটা কথা, আত্মা যদি অমর হয়, তবে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কাহারও আত্মহত্যা করিবার উপায় নাই। এ কেমন কথা? মনের দুঃখে যদি আত্মহত্যা না করিতে পারে, তবে স্বাধীনতা কোথায়? এবং ইহলোকে আত্মহত্যা করিয়াও যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ নিষ্কৃতি না পায়, তবে যথার্থই একটা শোচনীয় ব্যাপার (অরম্); যাহা হউক, বাস্তবিক পক্ষে মনের মধ্যে একটা উক্ত প্রকারের বিজাতীয় আন্দোলন ঘটিয়া বলাইদা'র চক্ষুর কোণে কালি পড়িয়াছিল এবং বোধ হয়, ক্রিমিরোগও হইয়াছিল (সিনা)। সুতরাং প্রথমতঃ রন্ধনশালারই ভার চারুবালার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষুধাবৃদ্ধিই ক্রিমির লক্ষণ।

পুরুষের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয় বৈঠকখানায় এবং স্ত্রীলোকের রন্ধনশালায় (কার্ব্বো)। ডিনার টেবলেই হউক, কিংবা আসনে বসিয়াই হউক, কাহার সৌন্দর্য্য বেশী, ইহারই পরীক্ষার জন্য সমাজ। সুতরাং প্রতীচ্য প্রথা অনুসরণ করিয়া বলাইদাদা সহধর্ম্মিণী নববধূকে লইয়া আহার করিতে বসিতেন। উভয়ের পক্ষেই প্রথমে আহার করা মুস্কিল হইয়াছিল,

কারণ, আহারপ্রক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে চলিলে মুখের দিকে মুদ্রাদোষ দাঁড়ায় (ওপিয়ম্) এবং সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইয়া পড়ে এবং বৃহৎ গ্রাসের উপযোগী খাদ্য একেবারে গলাধঃকরণ করা অসভ্যতা, সুতরাং কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকাইতেন না। ফলে বলাইদাদা বেশী ক্ষুধা লইয়া বসিলেও, অতিশয় কম খাইতেন (লাইকোপোডিয়ম্) এবং নববধূ ক্ষুধাহীনতা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ আহার করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বৈকালে নববধূর তৈয়ারি কচুরি প্রভৃতি সম্বন্ধে বলাইদা' সাতিশয় উদার ছিলেন, অর্থাৎ বেলা ৪টা হইতে সেগুলি কখন্ সুসজ্জিত হইয়া আসিবে, সেই আশায় উৎসাহিত হইয়া তাঁহার কম্পজ্বরের মত হইয়া পড়িত। যেমন কবিকুলের কোনও নূতন ভাব আসিলে কম্পজ্বরের মত হয় (ল্যাকোসিস্) এবং ছন্দোবদ্ধ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

এইরূপে খানিকটা ভয় উভয়পক্ষে ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রিয়তমাকে সঙ্গীত শুনাইতে এবং প্রিয়তমার গান শুনিতে বলাইদা'র অনিবার্য্য উত্তম প্রকাশ পাইয়াছিল। মেসে নিবাসকালীন বলাইদা'র গলা এবং এখনকার গলা অবশ্য অনেক তফাৎ। সেকালে, মনের ভাব বুঝাইবার সাক্ষী ছিল না। এখন ইহকাল এবং পরকালের সাক্ষী সম্মুখে। সুতরাং গলার সুর ভাবের সঙ্গে একত্র হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে নববধূর চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিত, বিশেষতঃ পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া রোগে শরীর জর্জ্জরিত হইয়া যে রুদ্ধ শোকটুকু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহা বাহির হইত (নেট্রম্ মিউর), এবং সেই শোক দূরীকরণার্থ কোনও আশ্বাস-বাণী প্রয়োগ করিলে তাহার দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইত।

নববধূর গলা সাধিতে বেশী সময় লাগে নাই, বলাইদাদা ডি শার্পে (গান্ধার কোমলে) সুর ধরিলে, চারুবালা নিষাদ কোমলে, অর্থাৎ তাহারই পঞ্চমে, সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেন। এবম্প্রকারে সুন্দর 'হারমনির' উৎপত্তি হইয়া জীবনের সেই মুহূর্ত্তগুলি মধুময় হইয়া পড়িত। বন্ধু জানকী বাবু মধ্যে মধ্যে তাহাই শুনিয়া ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিতেন যে, উভয়ে চিরকাল বাঁচিয়া থাকুন এবং প্রাচ্যসঙ্গীতমধ্যে প্রতীচ্য হারমনির প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক।

অনেক দিন উভয়ে আকাশের দিকে তাকাইয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন (সল্ফর) এবং বোধ হইত যে, জীবনের শেষ দিন এইরূপ ঘটিবে।

৪

কিন্তু মানবজীবনের অভিনয় গন্ধর্ব্ব-কিন্নরের মত কখনই নয়। প্রেমিক এবং প্রেমিকা পরস্পরের মনের কথাগুলি বাহির করিয়া মিলাইতে চাহে। কিন্তু মনের কথা সচরাচর মনেই থাকে। সুতরাং উভয়েরই মনে নানাবিধ ভয়, সন্দেহ এবং দুঃখ-শোকের হিল্লোল আসিত।

নববধূ ভাবিত যে, সে খাঁচার পাখীর মত অবরুদ্ধ (রুটা)। দৌড়াইবার ইচ্ছা হইলে দৌড়াইতে পারিত না। যেন মৃত্যু সন্নিকট (প্লাটিনা)। যেন সংসারে তাহার কোন অধিকার নাই (অরম্)। যেন দূরদেশে গেলে পরিত্রাণ হয় (মর্‌কিউরিয়স্)। বলাইদাদা বাহিরে দর্শনশাস্ত্র লইয়া তিন চারি ঘণ্টা বসিয়া থাকিলে চারুবালা নিতান্ত অপমানিত বোধে অস্থির হইয়া পড়িত (ক্যামোমিলা), কিংবা জলে ডুবিয়া মরা নিতান্ত সুখের মনে হইত (পলসেটিলা)। বলাইদাদার সেই লক্ষণগুলি দেখিয়া ক্রমশঃ একটা অস্বাভাবিক সন্দেহের উদয় হইয়াছিল (হাইওসায়েমাস্)। মানব-চরিত্রে কল্পনাই বারো আনা। ব্যাধির ফলে যে পূর্ব্বসংস্কারগুলির অঙ্কুর হয়, তাহা কল্পনায় ভীষণাকার ধারণ করে। তিনি স্বপ্ন দেখিতেন যে, চারুবালার কোন ভূতপূর্ব্ব প্রেমিক দস্যুর মত ঘরে প্রবেশ করিবে (জিংক্), কিংবা অপদেবতার মত ছাতের আলিশা হইতে উঁকি মারিবে (ফস্‌ফোরস্)। প্রিয়তমার দীর্ঘ-নিশ্বাসের (ইগ্‌নেশিয়া) আধিক্য দেখিয়া তাঁহার স্থির-বিশ্বাস হইতে সুরু হইল যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার হৃদয় কাহারও সঙ্গে বিনিময় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি হতাশ্বাস এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। অল্প অল্প জ্বর দেখা গেল এবং নিশাকালে শীতকাল সত্ত্বেও অঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দুর প্রকাশ হইল (ফস্‌ফোরিক্ আসিড্)।

ডাক্তার আসিয়া সন্দেহ করিলেন যে, অনেকটা যক্ষ্মাকাশের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু রক্তপরীক্ষায় কিছুই স্থির হইল না। আপাততঃ তাঁহার স্মৃতিশক্তির হ্রাস দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন যে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়াই তদানীন্তন অবস্থার প্রধান কারণ।

জানকী বাবু দুই চারি জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অনেকে অনেক রকম ঔষধ স্থির করিল। কেহ

বলিল, আহারের পর কেবল সোডা খাইবেন। কিন্তু বোতল খুলিবার শব্দে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়, সেই জন্য কেহ বলিলেন, কাঁচা সোডাই জলে গুলিয়া খাওয়া ভাল। কেহ বলিল, রোজ দুই ক্রোশ হাঁটিয়া বেড়ানই আসল ঔষধ, যদি বুটজুতায় কষ্ট হয়, তবে চটিজুতাই প্রশস্ত। কাহারও মতে পুরী কিংবা দেওঘর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া হিতকর।

জানকী বাবু বলিলেন যে, সেখানেই যান্ বৌ-মাকে ফেলিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। প্রথম কারণ, তিনি এক-জন ম্যালেরিয়া-রোগী, এবং দ্বিতীয় কারণ, ম্যালেরিয়া-রোগী ছাড়া স্বামীর শুশ্রূষা করিতে পারে, এমত স্ত্রীলোক ভারতে বিরল (চিনিমম সলফ্)। ম্যালেরিয়া বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব, এবং যিনি ম্যালেরিয়াতে ভোগেন নাই, তিনি মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। যিনি ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়াছেন, তিনিই পরের কষ্ট বুঝেন।

অবশেষে স্থির হইল যে, মধুপুরে যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর। বিশেষতঃ, বলাইদাদা বেশী দিন বাহিরে থাকিতে পারিবেন না; কারণ, এলাহাবাদে একটি নূতন কলেজ খুলিয়াছিল, তাহার দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে বলাইদাদাকেই কর্ত্তৃপক্ষগণ মনোনীত করিয়াছিলেন। মনোনীত করার বিশেষ কারণ ইহাই যে, যাহার যত ডিস্‌পেপসিয়ার ফলে স্মৃতিশক্তির লোপ হয়, তাহার তত শক্তি-শক্তির এবং দর্শন শক্তির বিকাশ হয় (এনেকার্ডিয়ম)।

বলাইদাদা প্রতীচ্য এবং প্রাচ্য বহুবিধ দর্শন-শাস্ত্র লইয়া নববধূ সমভিব্যাহারে মধপুরে হাওয়া বদলাইতে গিয়া সেখানে দুই মাস পঞ্চবিংশতি দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কতকটা কথা প্রতিবাসী ভবতোষ বাবুর নিকট জানা গিয়াছে।

পক্ষে বেদনার জন্য (ইসকুলস) বলাইদাদাকে দুই জন সাঁওতাল প্রত্যহ প্রাতে ইজিচেয়ারে বসাইয়া দিত, এবং চা খাওয়া সাঙ্গ হইলে তিনি ইচ্ছাশক্তির অভাবেও একবার চমবেল ভাঁজিয়া লইতেন (জেলসিমিয়ম) এবং কতকটা সুস্থ হইলে চারুবালা তাঁহাকে 'ভারতবর্ষ', 'বসু-মতী' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার পাতা-উলটাইয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা-সম্বন্ধে অনেক কথা পড়িয়া শুনাইতেন। সেগুলি বলাইদাদা নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চক্ষু বুঝিয়া শুনিতেন, এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইতেন যে, নববধূর ওষ্ঠ এবং চিবুক ঈষৎ হাস্যরসে কম্পিত হইত (এন্টিমনিয়ম টাট) এবং সেই ভাবে অধীর হইয়া তিনি তন্দ্রাগত হইলে বধূ বঁধুর মুখ রুমালে আচ্ছাদিত করিয়া রন্ধনশালায় চলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে উভয়ের ঈষৎ বিরহের জ্বালা উপস্থিত হইতে (আর্সেনিক) এবং উভয়ে মধ্যে মধ্যে অল্প পিপাসাতুর হইলে সামান্য জলপান করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কথা পাড়িতেন এবং ভবিষ্যতের অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িতেন।

এইরূপে মধুপুরে মধুমাস অতিবাহিত করিয়া নবদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, মানবের শরীরটা কিছুই নয়। আত্মাই আসল। দৈহিক রোগের ফলে মন অস্থির হইয়া স্থির হইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। মনের সংসর্গে আত্মারও বিকার উপস্থিত হয়। অথচ আত্মা নির্বিকার, স্বাধীন, প্রফুল্ল। শৈশবে অনেকবার হোঁচট খাইয়া পড়াতে বলাই-দা'র মনে হইত, ভারতবর্ষ পতিত দেশ, এবং ক্রমাগত কম্পজ্বরে ভুগিয়া নববধূর মনে হইত যে, এ দেশে অবরুদ্ধা স্ত্রীলোক স্বাধীনতা হইতে চিরবঞ্চিতা। কিন্তু ক্রমে উভয়ের ভ্রম অপসৃত হইতেছিল। তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল এলাহাবাদে।

অর্থাৎ কর্ম্মস্থলে গিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে জ্ঞানের সম্যক্ বিস্তার করাই তাঁহার জীবনের প্রথম ব্রত। তাহারই চিন্তায় তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। জ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সকলেরই মাথায় আধ্যাত্মিকভাবে গাঁথা, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সেগুলির ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ জরা ও ব্যাধি। জরা ও ব্যাধির প্রধান কারণ বিলাসপ্রিয়তা এবং আলস্য। ইহারই দোষে মনের যত বিকৃতি হয়, ততই মনস্তত্ত্ব জটিল হইয়া পড়ে, এবং সেই বিকারগুলি লক্ষ্য করিয়া রাশীকৃত উপন্যাসেরও উপ-করণ জুটিয়া যায়। ভারতের শত ও সহস্রমুখী ধর্ম্মবিপ্লব কেবল পূর্ব্বকালের রোগসমূহের প্রতীকারের জন্য ঘটিয়া-ছিল। রোগ ছিল, কিন্তু রোগ-নিবারণের উপায় ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যেই ছিল। সেই কর্ম্মের মধ্যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিত, যেমন ম্যালেরিয়াসঙ্কুল জলার মধ্যে পদ্ম এবং বনের

মধ্যে শেফালিকা ফুটিয়া উঠে। যদি আত্মা স্বাধীন হইয়া রোগ তাড়াইতে না পারে, তবে রোগের প্রকোপে আত্মা-কেই দেহত্যাগ করিয়া মাথায় উঠিতে হয় (আণিকা)।

চারুবালা হাসিয়া বলিলেন, "কোন কাযকর্ম্ম না থাকিলে বোধ হয় আমরা অধীন, কাযকর্ম্মে লাগিয়া গেলে স্বাধীনতার ফুরসৎ থাকে না। আমি মাঝে মাঝে মনে করি, নিরুপমাদের বাড়ী যাব, কিন্তু সময় পাই না।"

বলাইদা। তুমি খুব বেড়িয়ে বেড়াও, সকলের সঙ্গে মেশ,' হাওয়া খেয়ে বেড়াও, আমার কোন আপত্তি নাই।

চারুবালা। আমিও তাই মনে করেছিলেম, কিন্তু সময় নাই। প্রথমে এক জন রাঁধুনি বামন রাখতে হবে, টাকা নাই। ভদ্রলোকের বাড়ী বেড়াতে গেলে খুব ফরসা কাপড় চাই, কাপড়ও নাই ও ধোপার দাবী টাকায় এক কুড়ি ক'রে। যা ঈশ্বর দিয়েছেন, তারই মধ্যে হাত-পা নেড়ে দেখ্‌ছি যে, জীবনটা সুখে কাটে কি না।

বলাইদা। সেটা ভয়ানক শক্ত কথা। তোমার কি বিশ্বাস যে, আমাদের কপালে সুখ আছে?

চারুবালা। দুঃখ ত আছে? সেইটুকুই জীবনের সুখ। যেটুকু তোমরা বল দুঃখ, আমরা বলি সুখ। তোমা-দের মতের বিপরীত আমাদের। আমরা যখন স্বাধীনতা চাই, তখন তোমরা মনে কর যে, হাওয়া খেয়ে উড়ে বেড়াব, ঠিক তা' নয়। আমরা চাই ছোট-খাটো সংসারের দুঃখ গুলি একত্র করতে, ও সেইগুলো যাতে নষ্ট না হয়, তাহার বিধান করতে। কেন না, দুঃখের অঙ্কুর থেকে যে গাছ হয়, তার ফলই সুখের, ও সেই ফল ইষ্টদেবতা হাতে ক'রে নিয়ে আসেন।

বলাইদা। এখন তোমার মতলবটা কি?

চারুবালা একখানা ছোট কোদালি ভাণ্ডার ঘর হইতে আনিয়া স্বামীকে দেখাইলেন। "এইখানা দিয়ে আমি রোজ বাগান খুঁড়ি, খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক ধনরত্ন পেয়েছি। তোমার যদি দেখতে ইচ্ছা হয় ত এস।"

বলাইদা স্মিতমুখে সহধর্ম্মিণীর অনুসরণ করিলেন। তাঁহাদের বাসা ছিল প্রয়াগসঙ্গমের সন্নিকটে। একটা খাপরার বাড়ী; কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে অনেকটা জমী। সেই জমী এক মাসের মধ্যে নববধূ প্রায় সমস্তটা খুঁড়িয়াছিলেন।

বধূ স্বামীর হাত ধরিয়া দেখাইতে লাগিলেন—"এই স্থানটা ছিল এক সময় শ্মশান। এখন পল্লী প'ড়ে গিয়েছে। হয় ত তারও পূর্ব্বে ছিল দেবতাদের বাসস্থান। এক পাশে জল জ'মে গিয়ে মশার আড্ডা হয়েছে। আমি যখন সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসি, তখন তারা আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসে, কিন্তু কামড়ায় না। হয় ত আমার পূজার ঘরের তুলসীপাতা ও চন্দনের গন্ধে তারা বিভোর হয়ে পড়ে। খানিকটা এগিয়ে এলেই দেখতে পাবে, কতকগুলো জীবজন্তুর কঙ্কাল। একটা মানুষের মাথাও আছে, কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি এক সময় সেই মাথার মধ্যে ঘর বেঁধে এখানে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু শেষে কেবল এক কলসী আকবরি মোহর ঐ গর্ত্তের মধ্যে পুঁতে রেখে গিয়েছিল। কলসীর চারি-পাশে কতকগুলো সোনা ব্যাং থাকে। তারা ছোট ছোট পোকা ধ'রে খায়। এত রকম পোকা যে, তার সংখ্যা নাই।"

বলাইচাঁদ নববধূকে বুকে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার মতলব কি?"

নববধূ খুব সন্তর্পণে বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "আমরা দুজনে এইখানে একসঙ্গে মরি" (ট্যারেণ্ট্‌লা)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

যে দেশে পাখী নেই

রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র আর সদাগরপুত্র দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিন জনেরই পোষাক এক রকম, খুব জাঁকালও নয়, খুব খেলোও নয়। তিন জনের বয়স প্রায় সমান; তবে তিন জনে দেখতে তিন রকম। রাজপুত্র দেখতে রাজপুত্রের মত, বেশ দোহারা শরীর। মন্ত্রিপুত্র রোগা, মুখ বেশ টিকল। সদাগরপুত্র দেখতে সব চেয়ে ভাল আর সদাই হাস্যমুখ। রাজপুত্রের সঙ্গে একটা মস্ত কুকুর, মন্ত্রিপুত্রের কিছু নেই, সদাগরপুত্রের হাতে পিতলের খাঁচায় লাল-মখমলের ঢাকা দেওয়া টিয়ে পাখী। পাখীর জন্য একটা সোনার দাঁড়ও আছে। পড়া পাখী, পথে যেতে যেতে অনেক নতুন কথা শিখেছে।

তিন বন্ধু কত দেশ দেখলেন, কত নদী পার হলেন, কত দেশের কত কথা শুনলেন, কতবার কত বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। এই রকম যেতে যেতে, যেতে যেতে এক নতুন দেশে উপস্থিত হলেন। সহরের চারিদিকে বড় বড় বাগান, তাতে কত রকম ফুল-ফলের গাছ। তিন বন্ধুতে একটা বাগানের ভিতর গিয়ে একটা বড় গাছতলায় বসলেন। সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়। বড় বড় গাছের ছায়া লম্বা হয়ে বন্ধুদের অনেক পিছনে পড়েছে। পুকুরের এক কোণে সূর্য্যের আলো ঝিকমিক করছে।

মন্ত্রিপুত্র বল্লেন, তোমরা দু'জনে এখানে ব'স, আমি সহরের একটু দেখে এখনি ফিরে আসছি।

রাজপুত্র বললেন, তুমি একা যাবে কেন? চল, তিন জনে একসঙ্গে যাওয়া যাক।

মন্ত্রিপুত্র বল্লেন, মাঝে মাঝে একটু সাবধান হওয়া ভাল। তোমরা কিছু ভেব না, আমি এই ফিরে এলাম ব'লে।

ঘোড়া ত রইল বাঁধা গাছে, মন্ত্রিপুত্র হেঁটে সহরে প্রবেশ করলেন। সহরে রাস্তায় লোকজন চুপচাপ চলেছে, বড় একটা কথাবার্ত্তা কইছে না। মন্ত্রিপুত্র ভাবলেন, তাই ত, এমন সময় এমন ক'রে সব চুপ ক'রে আছে কেন? রাজার কিছু হয় নি ত?

সামনে এক জন বুড়ো মানুষকে দেখে মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, মশায়, আমি বিদেশী, কাছাকাছি কোথাও ভাল পান্থনিবাস নেই?

বৃদ্ধ মন্ত্রিপুত্রের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভাল ক'রে দেখলেন, তার পর রাস্তার সামনের দিকে আর পিছনদিকে চেয়ে দেখে বল্লেন, মোড়ের মাথায় ঐ লাল বাড়ী—সরাই।

বলেই তিনি চ'লে গেলেন, আর পিছনে ফিরে চাইলেন না।

সরাইয়ের সুমুখে গিয়ে মন্ত্রিপুত্র দেখলেন, মস্ত বড় দরজা, তার ভিতর বড় উঠান। উঠানের এক দিকে ঘোড়া বাঁধবার আস্তাবল, আর এক দিকে বাঁধান কুয়া। ভিতরে ঢুকবার দরজার কাছে এক জন আধাবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। সরাই তার। মন্ত্রিপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিদেশী, এখানে থাকবার যায়গা আছে?

প্রৌঢ়া হেসে বল্লে, আছে বই কি, এ অতিথিশালা, বিদেশীদের থাকবার যায়গা।

—আমরা তিন বন্ধু, তিন জনের থাকবার স্থান চাই।

—আর দু জন কোথায়?

—তারা সহরের বাইরে আছে। থাকবার যায়গা হ'লে তাদের নিয়ে আসব।

—ঘর দেখ, দেখে পসন্দ হয় ত তাদের নিয়ে এস।

মন্ত্রিপুত্র রমণীর সঙ্গে গিয়ে ঘর দেখলেন। ছোট বড় ঘর কয়েকটা দেখে বল্লেন, আমাদের একটা বড় ঘর হলেই হবে, তিন জনে এক ঘরে থাকব।

প্রৌঢ়া একটা বড় ভাল ঘর দেখিয়ে বল্লে, এ ঘরের ভাড়া রোজ দু' টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা, কেউ এখানে খায়, কেউ বাজারে খায়।

মন্ত্রিপুত্র তার হাতে দশটি টাকা দিয়ে বল্লেন, এই পাঁচ দিনের ঘরভাড়া নাও। আমাদের খাবার ভাল ক'রে দিও, তার জন্য আলাদা টাকা দেব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সহরের লোক সব এমন চুপচাপ ক'রে আছে কেন, কোন গোলমাল নেই।

—তা বুঝি শোন নি? তুমি বিদেশী, সবে এখানে এসেছ, কেমন করেই বা জানবে? কাল পাঁচ জন বিদেশী যুবকের মাথা কাটা যাবে, তাই সহরের লোক দুঃখিত হয়ে আছে।

—কেন, তাদের কি অপরাধ?

—তারা বলেছিল, রাজকন্যাকে তারা হাসাবে, তা হাসাতে পারে নি ব'লে তাদের প্রাণদণ্ড হবে।

—এ কি রকম কথা?

—আমাদের রাজকন্যা অনেক দিন থেকে হাসেন না। রাজা বললেন, রাজকন্যাকে যে হাসাতে পারবে, তাকে অনেক পুরস্কার দেবেন। তা কেউ পারলে না। তার পর রাজা বললেন, যে রাজকন্যাকে হাসাতে পারবে, তাকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন আর অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবেন। তাতেও কেউ রাজকন্যাকে হাসাতে পারলে না। তার পর রাজা রেগে পণ করলেন যে, যদি কেউ রাজকন্যাকে হাসাতে পারে ত ভাল, সে যা চাইবে, তাই দেবেন, আর যদি না পারে, তা হ'লে তার গর্দ্দান যাবে। আহা, বিদেশে এসে পাঁচ জনের প্রাণ যাবে!

২

এই কথা শুনে মন্ত্রিপুত্র সহরের বাইরে বাগানে গিয়ে দুই বন্ধুকে বললেন। তিন বন্ধু এই কথা বলাবলি করতে করতে সরাইয়ে এসে উঠলেন। তাঁদের ঘরের দরজার সামনে সরাইওয়ালীর কিশোরী সুন্দরী কন্যা দাঁড়িয়ে ছিল। রাজপুত্রের কুকুর তাকে দেখে ল্যাজ নেড়ে তার কাছে গেল। রাজপুত্র হেসে বললেন, আমার কুকুর মানুষ ঠিক চেনে। তোমাকে যখন বন্ধু ঠাউরেছে, তখন নিশ্চয় তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে। তোমার নাম কি?

কিশোরী কুকুরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, আমার নাম আবিদা। উপকারের মধ্যে আমি তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।

মন্ত্রিপুত্র বললেন, এর চেয়ে উপকার আর কি হ'তে পারে?

সদাগরপুত্রের হাতে ঢাকা খাঁচা দেখে আবিদা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার হাতে কি?

—ও একটা পাখী।

অমনই আবিদার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বললে, কি সর্ব্বনাশ! রাজার লোক জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না! এখানে দাঁড়িয়ে কায নেই, কেউ দেখতে পাবে; ঘরের ভিতর এস।

সকলে ঘরের ভিতর গেলে আবিদা দরজা ভেজিয়ে দিলে। সদাগরপুত্র বললেন, এ ত নতুন রকম দেশ দেখছি। রাজকন্যাকে হাসাতে না পারলে মাথা কাটা যায়, আর খাঁচায় পাখী রাখলে সর্ব্বনাশ হয়। ব্যাপারখানা কি?

এমন সময় আবিদার মা এল। দরজা খুলে বললে, কি হয়েছে?

আবিদা বললে, মা, এদের সঙ্গে একটা পাখী!

—সর্ব্বরক্ষের মাথায় পা! এ দেশে কি পাখী আনতে আছে?

রাজপুত্র বললেন, কথাটাই কি শুনি।

আবিদা বললে, এখানে কারুর পাখী রাখবার হুকুম নেই। সহরের বাইরে কোথাও পাখী দেখেছিলে?

—তাই ত, বাগানে ত একটাও পাখী দেখি নি!

আবিদার মা বললে, এখানে রাজসভায় দু'জন সর্ব্বজ্ঞ আছেন, তাঁদের মতেই সব হয়। তাঁরা বলেন, পাখীর কি দরকার? হয় বধ না হয় বন্ধন, এই দুইয়ের জন্য পাখীর সৃষ্টি। পাখীর ডাক বড় অশুভ, শেষ রাত্রিতে পাখীর ডাকের জ্বালায় কেউ ঘুমোতে পায় না। এমন কি, কারুর সর্ব্বনাশ কামনা করলে তাকে বলে, তোর ভিটেয় ঘুঘু চরবে! সহরের ত্রিসীমায় পাখী নেই। ব্যাধেরা সব রকম পাখী ধ'রে এনে সর্ব্বজ্ঞদের সামনে মেরে ফেলে। বন্ধ ক'রে রাখলে খাওয়াবার খরচ, আবার খাঁচার ভিতরও পাখী ডাকে। তোমরা খাঁচায় ক'রে পাখী এনেছ শুনতে পেলে আমাদের শুদ্ধ ধ'রে নিয়ে যাবে।

সদাগরপুত্র বললেন, আমরা দু'দিন পরে চ'লে যাব। আমাদের একটা পাখী আছে, তোমরা না বললে কেউ টের পাবে না। খাঁচা ঢাকা থাকলে পাখী ডাকে না। তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

আবিদার মা বললে, শুধু পাখী নয়, তোমাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর। রাত্রিতে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকবে

আর কেউ ঘুমুতে পারবে না। সকলে জিজ্ঞাসা করবে কার কুকুর, তখন একটা হৈ চৈ হবে আর সব কথা বেরিয়ে পড়বে।

আবিদা বললে, না, না, বেশ শান্ত কুকুর, এখানে এসে অবধি ত ডাকে নি।

রাজপুত্র বললেন, কুকুরের জন্য তোমরা ভেব না। রাত্রিতে আমাদের ঘরে থাকবে, একবারও ডাকবে না।

রান্নাবান্না হ'লে পর তিন বন্ধু নিজের ঘরে গেলেন। আবিদা তাঁদের খাবার নিয়ে এল। তাঁদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তার আহ্লাদ কত! তাঁদের খাওয়া হ'লে আবিদা বললে, তোমাদের পাখীটি একবার দেখাবে না? কত দিন যে পাখী দেখি নি। রাত্রিতে ডাকে না ত?

সদাগরপুত্র হেসে বললেন, এ কি পেঁচা যে রাত্রিতে ডাকবে? এ পাখী রাত্তিরে ডাকে না।

খাঁচার ঢাকা খুলে সদাগরপুত্র পাখী বের করেন। বেশ বড় চন্দনা পাখী, মাথা টুকটুকে লাল, দুই দিকে ডানার পাশে লাল, ল্যাজ খুব লম্বা। তাকে হাতে বসিয়ে সদাগর-পুত্র মুখের কাছে তুলে ধরলেন। রাত্তিরে পাখী ভাল দেখতে পায় না, তবু সদাগরপুত্রের গালে মাথা বুলোতে লাগল।

আবিদা দুই হাত একত্র করে নিশ্বাস টেনে বললে, ও মা, কি সুন্দর পাখী! কেমন পোষ মেনেছে! আমি যদি ওর গায় হাত দি, তা হ'লে কি কামড়াবে?

—দুষ্ট লোক না হ'লে কামড়ায় না। তুমি ওর গায় হাত দিয়ে দেখ!

এই ব'লে সদাগরপুত্র পাখীসুদ্ধ হাত আবিদার দিকে বাড়িয়ে ছিলেন। আবিদা ভয়ে ভয়ে একটি আঙ্গুলের আগা দিয়ে পাখীর মাথা বুলিয়ে দিতে লাগল, পাখী মাথা কাৎ ক'রে চোখ বুজে রইল।

সদাগরপুত্র বললেন, কিছু ভয় নেই, এই নাও তোমার হাতে বসিয়ে দিচ্ছি।

আবিদার আঙ্গুলে ব'সে তার হাতে চকচকে চুড়ী দেখে পাখী দু একবার ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকরে দেখলে। ক্রমে ভয় ভেঙ্গে গেলে আবিদা পাখীকে মুখের কাছে তুলে ধরলে, সেও আবিদার গালে মাথা দিয়ে আরাম পেয়ে চুপ ক'রে রইল।

আবিদা বললে, কি চমৎকার পাখী! আমার যদি এমন একটি পাখী থাকত!

সদাগরপুত্র বললেন, এইটেই তুমি নাও না কেন? তোমাকে এই পাখী দিয়ে যাব।

—বাপ রে, এ দেশে কি পাখী রাখবার যো আছে! একে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে আর হয় ত আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

আবিদা চ'লে গেলে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তিন বন্ধু অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন। তাঁদের শুতে অনেক রাত হ'ল।

৩

সকালবেলা মুখ-হাত ধুয়ে তিন বন্ধু কুকুর সঙ্গে ক'রে নগরে যাবেন। পাখী ঘরের ভিতর বন্ধ রইল। ঘরে তালা বন্ধ ক'রে মন্ত্রিপুত্র চাবি নিজের কাছে রাখলেন।

বাইরে যেতে সিঁড়ির কাছে দেখা হ'ল আবিদার মা'র সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

রাজপুত্র বললেন, রাজসভায়।

—সেখানে কেন?

—রাজকন্যাকে কেউ হাসাতে পারে নি, দেখি, আমরা পারি কি না।

আবিদা, ও আবিদা! ব'লে তার মা চেঁচিয়ে উঠল।

আবিদা ছুটে এসে বললে, কি হয়েছে, মা?

—শুনেছিস কথা, এরা রাজকন্যাকে হাসাবার জন্য রাজসভায় যেতে চাইছে! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণ যাবে!

আবিদার দুই চক্ষু জলে পূরে এল। সে কেঁদে বললে, না, না, তা কিছুতেই হবে না। তোমরা আর যেখানেই যাও, রাজসভাতে কিছুতে যেতে পাবে না। বিদেশে তোমরা বেড়াতে এসেছ, না মিছিমিছি প্রাণ দিতে এসেছ?

রাজপুত্র বললেন, আমরা বুঝে সুঝে এ কাজ করছি, তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? যে কাজ কেউ পারে না, আমরা তা পারি। রাজকন্যাকে কেউ যদি হাসাতে পারে ত আমরা পারব।

আবিদা তাদের কিছুতেই যেতে দেবে না। বললে, তোমরা এখানে মোটে এক দিন এসেছ, তবু আমাদের মনে হচ্ছে যেন, কত দিন থেকে তোমাদের জানি। এই

ত পাঁচ জনের আজ মাথা কাটা যাবে। তোমাদের এই অল্প বয়স, রাজকন্যাকে তোমরা কখন চোখে দেখ নি, সে তোমাদের কোথাকার কে যে, তার জন্য তোমরা প্রাণ দেবে?

মন্ত্রিপুত্র বল্লেন, তোমরা মায়ে ঝিয়ে যে আমাদের কুশল কামনা কর, সেটা আমাদের সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু আমরা গোঁয়ারের মত কিছু করছি নে। রাজকন্যাকে আমরা দেখিনি আর আমাদের কোন লোভও নেই। আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, রাজকন্যাকে হাসানো কিছুই শক্ত কায নয়। আর এই যে পাঁচ জনের মাথা কাটা যাবে, এদেরও আমরা রক্ষা করব। আমরা ঠিক জানি, এ কায পারব।

আবিদা আর তার মা কিছুতে তাদের থামাতে পার্লে না। শেষে আবিদা বল্লে, তোমরা কি তিন জনে মিলে রাজকন্যাকে হাসাবার চেষ্টা করবে?

সদাগরপুত্র বল্লেন, না, আমি একা, এঁরা দু'জন কিছু করবেন না।

আবিদার চোখের জল আরও উথলে উঠল। বল্লে, কেন, তুমি কেন?

—হাসাবার কৌশল আমি জানি ব'লে। বল ত তোমাকে এখনি হাসাতে পারি।

রাগ দুঃখে ক'রে আবিদা চ'লে গেল।

তিন বন্ধু তখন হাসতে হাসতে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তা সোজা রাজবাড়ী চ'লে গিয়েছে। সিংহ-দরজায় খাপখোলা তলওয়ার হাতে প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজার পাশে প্রকাণ্ড ডঙ্কা, তার পাশে দেয়ালে ডঙ্কার কাঠি ঝোলান। সদাগরপুত্র প্রহরীকে কিছু অবজ্ঞার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ট্যামটেমিটা কিসের জন্য?

সেপাই মশায় ভারি গরম। কোথাকার উজবুগ আনাড়ী মূর্খলোক, জয়ঢাককে বলে কি না ট্যামটেমি! দুই চক্ষু লাল ক'রে কটমট ক'রে চেয়ে বল্লে, তোমরা কোন্ দেশের লোক হে, রাজডঙ্কা চেন না? যারা রাজকন্যাকে হাসাতে চায়, তারা এই ঢাকে কাঠি দেয়। তোমাদের মত পাঁচ জন এই ঢাক বাজিয়ে আজ চাঁড়ালের হাতে যাবে। পাঁচটা কাঁচা মাথা আজ কাটা যাবে।

বটে? ব'লে সদাগরপুত্র কাঠি পেড়ে ডঙ্কায় সজোরে তিন ঘা বসিয়ে দিলে। সে শব্দে রাজবাড়ী, হাটবাজার কেঁপে উঠল।

প্রহরী বল্লে, ডঙ্কায় এক ঘা দেবার কথা, তুমি যে বড় তিনবার বাজালে? তোমার কি তিনটে মাথা আছে?

—না হয় আমার মাথা তিনবার ক'রে কাটবে।

রাজসভা থেকে আর চার পাঁচ জন প্রহরী ছুটে এল; বল্লে, ডঙ্কা এতবার বাজায় কে?

দরজার প্রহরী সদাগরপুত্রকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, এই কোথাকার একটা পাড়াগেঁয়ে লোক, আমাকে কোন কথা না বলেই তিনবার ডঙ্কা বাজিয়েছে।

সদাগরপুত্র নেহাত ভালমানুষের মত বল্লে, আমরা তিন বন্ধু কি না, তাই তিন ঘা!

—চল রাজার হুজুরে।

—সেই জন্য ত আমরা এসেছি।

—তোমাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর দেখছি। রাজসভায় কুকুর নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

—আমরা যেখানে যাই, আমাদের কুকুরও সেখানে যায়। একটা কুকুর সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিল জান? আমাদের কুকুর রাজদরবারে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

—কি, আমাদের সঙ্গে তামাসা?

অত সাহস আমাদের হয় নি। কিন্তু কুকুর সঙ্গে না থাকলে আমরা রাজকন্যাকে হাসাতে পারব না। এ ত আর যে সে কুকুর নয়।

এক জন প্রহরী জিজ্ঞাসা করতে ভিতরে গেল; ফিরে এসে বল্লে, সব সুদ্ধ যাবার হুকুম।

সামনে পিছনে প্রহরী, মাঝখানে তিন বন্ধু, তাদের পাশে কুকুর। রাজসভায় সিংহাসনে রাজা ব'সে আছেন, চারদিকে অমাত্য, সভাসদ, সিংহাসনের সামনে ব'সে দুই সভাজ্ঞ। এক জনের হাড়পাঁজরা গণা যায়, আর এক জন ভরা তেলের কুপোর মত, এক জন কাণা, এক চক্ষু নেই, আর এক জন টেরা। দু'জনেই কিন্তু দেখায় গম্ভীর।

তিন বন্ধু রাজাকে অভিবাদন ক'রে সভায় বসলেন। কুকুর তাঁদের পাশে বসল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? এখানে কি জন্য আসা?

রাজপুত্র বললেন, আমরা বিদেশী। কেন এসেছি, তা ডঙ্কা বাজিয়ে জানিয়েছি।

—যে কায করতে চাও, তার পণ জান?

—জানি। আমাদের পণ প্রাণ, রাজার পক্ষে কি?

—অর্দ্ধেক রাজত্ব আর আমার কন্যা দিতে স্বীকৃত আছি।

—আর এক কথা আছে। আমরা শুনলাম, পণে পরাজিত হয়েছে ব'লে আজ পাঁচ জনের প্রাণদণ্ড হবে। এ আদেশ তিন দিন স্থগিত রাখতে হবে।

প্রথম সর্ব্বজ্ঞ হাত নেড়ে বললেন, তোমরা মনে কর, তোমাদের শুধু ধড় আছে, মাথাটা নেই।

রাজা বললেন, তোমরা নিজের কথা বল, যাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে, তাদের কথা কেন?

রাজপুত্র বললেন, প্রথম কারণ, এ সময় রক্তপাত করলে রাজকন্যার অকল্যাণ হবে, দ্বিতীয় কারণ, রাজকন্যার জন্য গোপনে আমরা যে মন্ত্র-সাধন করব, তার বিঘ্ন হবে, তৃতীয় কারণ, আপনার প্রধান উদ্দেশ্য আপনার কন্যার নীরোগতা লাভ, নিরপরাধীর প্রাণহত্যা নয়। রাজকন্যাকে যদি আমরা না হাসাতে পারি, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে ঐ পাঁচ জনের প্রাণদণ্ড হবে।

সভাস্থ লোকরা বলতে লাগল, এ কথা যুক্তিযুক্ত।

রাজা বললেন, তোমরা ক' দিন সময় চাও?

—তিন দিন। তিন দিনের দিন সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর পরে আমরা নগরবাসী সকলের সমক্ষে রাজকন্যাকে হাসাব। না পারি, সেই দিনই আমাদের প্রাণদণ্ড হবে।

রাজা বললেন, তাই হবে।

আর এক নিবেদন। আমাদের তিন জনের মধ্যে যিনি রাজকন্যাকে হাসাবেন, তিনি পরীক্ষার পূর্ব্বে এখন একবার রাজকন্যাকে দেখতে চান।

কে তিনি?

রাজপুত্র সদাগরপুত্রকে দেখিয়ে দিলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এইখানে দেখতে চান?

সদাগরপুত্র বললেন, না মহারাজ, এত লোকের সাক্ষাতে নয়, শুধু আপনার কিংবা আর কারও সাক্ষাতে।

রাজা আদেশ করলেন, প্রতিহারী, এঁকে রাজকন্যার মহলে নিয়ে যাও। সখীর সাক্ষাতে কিংবা ধাত্রীর সাক্ষাতে ইনি একবার রাজকন্যাকে দেখতে চান।

প্রতিহারী সদাগরপুত্রকে সঙ্গে ক'রে রাজকন্যার মহলে নিয়ে গেল। সেখানে সকলেই বিমর্ষ, সকলেই মুখ চূণ ক'রে আছে। বুড়ী ধাত্রী বসেছিল, তার কাছে রাজকন্যার দুই জন সখী। প্রতিহারী বললে, মহারাজের আদেশ, এঁকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাব। ইনি রাজকন্যাকে একবার দেখতে চান।

এক জন সখী জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—ইনি রাজকন্যাকে হাসাবেন।

সখী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সদাগরপুত্রকে বললে, কেন এই বয়সে তুমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এসেছ?

সদাগরপুত্র বললেন, রাজকন্যার মুখের হাসির জন্য তুমি কি প্রাণ দিতে পার না?

—এখনি। রাজকন্যা আমার সখী, তাঁকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। তুমি বিদেশী, বাপ-মা'র আদরের ছেলে, হয় ত বিয়ে করেছ, তুমি কেন প্রাণ দিতে গেলে?

—আমি বিয়ে করিনি, পরের জন্য প্রাণ দিলে জীবন সার্থক হয়, আর তোমাকে সত্যি বলছি, তোমার সখীর মুখে হাসি তোমরা দেখতে পাবে। আমার দৈব ক্ষমতা আছে, যারা রাজকন্যাকে হাসাতে পারেনি, তাদের তা নেই। এখন আমাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে চল।

সদাগরপুত্র রাজকন্যার সখীর সঙ্গে গিয়ে দেখলেন, একটি ঘরের ভিতর মহামূল্য আসনে রাজকন্যা ব'সে রয়েছেন। শৈবালাচ্ছন্ন কমলিনীর ন্যায় তাঁর রূপ ম্লান, মুখে বিষাদের ছায়া, চক্ষুর জ্যোতি নিবে গিয়েছে। সখীর সঙ্গে সদাগরপুত্রকে প্রবেশ করতে দেখে একটি কথাও কইলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সদাগরপুত্র সখীকে বললেন, তুমি দরজার কাছে দাঁড়াও, আর কেউ যেন এ ঘরে না আসে। রাজকন্যাকে কিছুক্ষণ দেখলে আমি বুঝতে পারব, ওঁর কি হয়েছে। আমরা তিন বন্ধু যে প্রাণপণ করেছি, সে জন্য কিছু বলছি নে, তবে তোমার সখী যদি ভাল হয়ে ওঠেন, তা হ'লে তোমাদেরও আহ্লাদ হবে।

রাজকন্যার সখী দরজাগোড়ায় গিয়ে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সদাগরপুত্র রাজকন্যার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন, রাজকন্যে, আমার দিকে তাকাও।

রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলেন। সদাগরপুত্র স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বারকয়েক আঙ্গুল চালনা কর্লেন। রাজকন্যারও দৃষ্টি স্থির হ'ল। সদাগরপুত্র মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, রাজকন্যে!

রাজকন্যা ঠিক সেই রকম কণ্ঠে বল্লেন, কি?

—তুমি আমার কথা শুন্‌বে?

—শুন্‌ব।

—উঠে দাঁড়াও।

রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন।

—তুমি হাস্‌তে পার?

—তুমি বল্লে পারি।

—তবে হাস। জোরে নয়, কোন শব্দ হবে না, মুচ্‌কে একটু হাস।

মেঘের আড়াল থেকে একটু ফাঁক পেলে চন্দ্র যেমন হেসে উঁকি মারে, সেই রকম রাজকন্যার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি উঁকি মেরে গেল। সদাগরপুত্র রাজকন্যার সখীকে ডাক্‌লেন। সে এসে দেখলে, রাজকন্যার মুখে হাসি নেই বটে, কিন্তু একটা উজ্জ্বল প্রফুল্ল আভা রয়েছে। সে এসেই রাজকন্যার গলা জড়িয়ে বল্লে, এমনতর ত অনেকদিন দেখিনি, তবে বুঝি সখী আমাদের আবার ভাল হয়ে উঠবেন!

সদাগরপুত্র আবার দুই চারবার রাজকন্যার মুখের সম্মুখে অঙ্গুলি চালনা কর্লেন। রাজকন্যার আগে যেমন বিষণ্ণ মুখ ছিল, সেই রকম হয়ে গেল। সদাগরপুত্র বল্লেন, এখন কাউকে কিছু বলো না, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, রাজকন্যা সেরে উঠবেন।

রাজসভায় ফিরে এসে সদাগরপুত্র দুই বন্ধুর সঙ্গে উঠে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে চার জন প্রহরী গেল, সবাইয়ের দরজায় পাহারা বস্‌ল।

৪

আজ পরীক্ষার দিন। রাজসভায় লোকারণ্য। তিন বন্ধুর পক্ষ থেকে রাজপুত্র রাজাকে বলেছিলেন, পরীক্ষা সকলের সামনে হবে, প্রহরীরা যেন কাউকে নিষেধ না করে। যে পাঁচ জন বিদেশীর প্রাণদণ্ড হয়েছিল, তারাও রাজপুত্রের অনুরোধে রাজসভায় আসবার অনুমতি পেলে। আবিদা আর তার মাও এল। রাজা যেমন সিংহাসনে বস্‌তেন, সেই রকম বসলেন, সর্ব্বজ্ঞ দুই জন যেখানে বসেন, সেইখানে ব'সে বল্‌তে লাগলেন, আজ এদেরও মাথা কাটা যাবে। সিংহাসনের সামনে কিছু দূরে একটা উঁচু যায়গায় রাজকন্যার আসন, যাতে তাঁকে সকলে দেখতে পায়। তাঁর দুই পাশে দু'জন সখী। সদাগরপুত্র একটা মস্ত ঝলঝলে চোগার মত গায় দিয়ে তাঁর সামনে বসেছেন, কুকুর তাঁর পিছনে ব'সে। রাজপুত্র আর মন্ত্রিপুত্র আরও পিছনে একটু দূরে বসেছেন। চারিদিকে নগরের নরনারী স্থির হয়ে ব'সে দেখছে, কারুর মুখে একটি কথা নেই।

সদাগরপুত্র বড় গলা ক'রে সকলকে শুনিয়ে রাজাকে বল্লেন, রাজকন্যাকে ভাল করতে পারা না পারা আমার দায়, আমার দুই বন্ধুর এতে কোন সংস্রব নেই।

রাজপুত্র আর মন্ত্রিপুত্র বল্লেন, তা কেন? আমাদের সকলের সমান দায়।

সর্ব্বজ্ঞ দু'জন মাথা নেড়ে বল্লেন, অবিশ্যি, অবিশ্যি! তিন জনেরই মাথা কাটা যাবে।

রাজা বল্লেন, যে রাজকন্যাকে হাসাতে স্বীকার করেছে, পুরস্কার কিংবা দণ্ড শুধু তারই প্রাপ্য, তার সঙ্গে অপর লোক থাকলে তাদের লাভ কিংবা শাস্তি হ'তে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞরা বল্লেন, সে কি রকম কথা? এক যাত্রায় পৃথক ফল?

সদাগরপুত্র আবার সকলকে শুনিয়ে বল্লেন, রোগ কি, জানতে পার্‌লে ব্যবস্থা করা সহজ হয়। রাজকন্যার কি হয়েছে, কেউ জানে?

প্রথম সর্ব্বজ্ঞ বল্লেন, অপদেবতার কাণ্ড! তা আমি বেশ জানি।

দ্বিতীয় বল্লেন, আসল রোগই তাই! অপদেবতার সঙ্গে কে পার্‌বে?

সদাগরপুত্র বল্লেন, কেন, আপনারা! এত মন্ত্রতন্ত্র জানেন, অপদেবতার শাস্তি কর্‌তে পারেন না?

সর্ব্বজ্ঞরা কানে হাত দিয়ে বললেন, শুনলে দুষ্টের কথা! অপদেবতার সঙ্গে তুলাবল হ'তে চায়। তা মরণের আগেই পিপীলিকার পাখা ওঠে বটে!

সদাগরপুত্র রাজাকে বল্লেন, রাজকন্যার কি হয়েছে, তিনি এখনি নিজের মুখে বলবেন। তার পর আমি রোগের প্রতিবিধান করব। রাজকন্যার মুখে আজ সকলেই হাসি দেখতে পাবে।

রাজা বল্লেন, রাজকন্যা ত কারুর সঙ্গে কথাই কন না।

সর্ব্বজ্ঞরা বল্লেন, ও দাম্ভিকটার কথা শোনেন কেন? ওর সব বিদ্যা এখনি জানা যাবে।

সদাগরপুত্র রাজকন্যার চক্ষুর দিকে চেয়ে অঙ্গুলি চালনা করতে লাগলেন। সর্ব্বজ্ঞরা চেঁচিয়ে উঠলেন, ও কি ও? অঙ্গুলি বা হস্তচালনা কি রকম?

সদাগরপুত্র রাজাকে বল্লেন, এ সময় যদি কেউ গোল করে কিংবা আমাকে বাধা দেয়, তা হ'লে আমার চেষ্টা বৃথা হবে।

রাজা চোখ পাকিয়ে সর্ব্বজ্ঞদের বল্লেন, চুপ ক'রে থাক!

রাজকন্যার দৃষ্টি স্থির হয়েছে দেখে সদাগরপুত্র বল্লেন, রাজকন্যে, আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার উত্তর দিতে পারবে?

—পারব।

—তোমার কি অপদেবতার দৃষ্টি লেগেছে?

—না।

—তবে তুমি কথা কও না কেন, হাস না কেন?

—যে দেশে পাখী ডাকে না, সেখানে সব নিরানন্দ, কিসে আমার হাসি আসবে?

—এ দেশ থেকে কারা পাখী বিদায় ক'রে দিয়েছে?

—ওই সর্ব্বজ্ঞ দু' জন। ওরা বলে, বধ আর বন্ধন ছাড়া পাখীর আর কোন দরকার নেই।

পাখী দেখলে তোমার আনন্দ হয়?

—কার না হয়?

—তুমি একটা পাখী পেলে কি কর?

—পুষি আর তাকে পড়তে শেখাই।

সদাগরপুত্র রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজবাড়ীতে পাখী নেই?

রাজার মুখ শুকিয়ে গেল, বল্লেন, কই, এখানে ত কোথাও পাখী নেই।

—আমি যদি একটি পাখী আনতে পারি?

—তা হ'লে হয় ত রাজকন্যা খুসী হবেন।

হঠাৎ কোথা থেকে কে বল্লে, সর্ব্বজ্ঞ বিটলে!

সর্ব্বজ্ঞ দু' জন চ'টে উঠে বল্লেন, শুনছেন, মহারাজ, আমাদের গাল দিচ্ছে!

রাজা বল্লেন, কে দিচ্ছে, দেখিয়ে দাও।

—এইখানে কোথাও হরবোলা আছে।

আবার কে বল্লে, চুপ বিটলে!

চারিদিকে সকলে চেয়ে দেখে, কে যে কথা কইছে, কিছুই বুঝতে পারা যায় না। তখন সদাগরপুত্র কাপড়ের ভিতর থেকে সোনার দাঁড়ে বসান পাখী বের করলেন। রাজকন্যা হাত বাড়িয়ে বল্লেন, দেখি, দেখি! আমার হাতে দাও!

পাখী বল্লে, রাজকন্যে, হাস দেখি!

সদাগরপুত্র বল্লেন, রাজকন্যে, তুমি হাসলে এই পাখী পাবে।

গোলাপফুল যেমন ফোটে, সেই রকম রাজকন্যার রাঙ্গা ঠোঁটে হাসি ফুটল। তার পর তিনি খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর মুখে আনন্দের আলো ফুটে উঠল, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থেকে আনন্দের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'ল। রাজার কানে, রাজার প্রাণে যেন অমৃতবৃষ্টি হ'ল, সখী দুই জনের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হ'ল, সভাশুদ্ধ লোকের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কেবল সর্ব্বজ্ঞ দুই জনের মুখ কালিমায় ঢেকে গেল।

সদাগরপুত্র দাঁড়শুদ্ধ পাখী রাজকন্যার হাতে দিলেন। পাখী অনর্গল কথা কইতে লাগল।

সদাগরপুত্র বল্লেন, রাজকন্যে, এখন এ দেশে কি করা উচিত?

—পাখীর বধ বন্ধন নিবারণ হবে। মুক্ত পাখী সর্ব্বত্র উড়ে গান গেয়ে বেড়াবে, নিরানন্দ রাজ্য আনন্দপূর্ণ হবে!

—আর কি?

—সর্ব্বজ্ঞ দু' জনের মাথা মুড়িয়ে এক জনের গলায় একটা মরা কাক, আর এক জনের গলায় একটা মরা বাদুড় ঝুলিয়ে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন ক'রে দেবে।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজকন্যার হাত ধ'রে তুল্‌লেন। সদাগরপুত্রকে বল্‌লেন, এই কন্যা আর আমার অর্দ্ধেক রাজ্য তোমার।

—না, মহারাজ, রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজ্য রাজপুত্রের প্রাপ্য।

—রাজপুত্র কোথায়? তুমি কি রাজপুত্র?

—রাজপুত্র এই যে আপনার সম্মুখে।

রাজপুত্র উঠে এলেন। কুকুর এসে রাজকন্যার কাছে ল্যাজ নাড়তে লাগল। রাজকন্যা বল্‌লেন, আমি এই কুকুরটাও নেব।

সদাগরপুত্র বল্‌লেন, এ কুকুর, আর যার কুকুর দুই তোমার।

রাজপুত্রের দিকে চেয়ে রাজকন্যা মাথা হেঁট কর্‌লেন।

ক'দিন পরেই রাজবাড়ীতে বিয়ের বাদ্য বেজে উঠল। সর্ব্বজ্ঞ দু' জনের মাথা মুড়িয়ে গলায় মরা কাক আর বাদুড় ঝুলিয়ে কুলো পিটিয়ে রাজ্য থেকে বের ক'রে দেওয়া হ'ল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়

পাটনা কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি বিলাত হইতে বি, এস, সি উপাধি লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম, এস, সি উপাধি পাইয়া কিছুদিন টাটা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করিয়াছিলেন।, পরে কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর বিহারের শিক্ষা-বিভাগে প্রবিষ্ট হয়েন। বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পাটনা কলেজ হইতে অবকাশ লইয়া ইনি লণ্ডনের 'যুনিভারসিটী কলেজে' রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। বোরন্ ও সিলিকা (Boron and Silica) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইনি সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ প্রশংসিত হওয়ায় লণ্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার রমেশচন্দ্র আপাততঃ পাটনা কলেজেই অধ্যাপনা করিতেছেন।

নর-ঘাতুকের দ্বীপ।

মিঃ এডওয়ার্ড সলসবরি নামক জনৈক মার্কিণ পরিব্রাজক আন্দামান দ্বীপ দেখিয়া তত্রত্য আদিম অধিবাসী ও কয়েদী দিগের সম্বন্ধে পত্রান্তরে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। আন্দামানকে তিনি হত্যাকারীর দ্বীপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যাহারা নরহত্যা বা অন্যান্য গুরু অপরাধ করিয়া থাকে, এখানে নির্ব্বাসিত হইয়া কিছু দিন কারাবাসের পর তাহাদের অনেকেই সন্নিহিত গ্রামে বসবাস করিয়া থাকে।

আন্দামানী আদিমনিবাসী তীরধনুক লইয়া মৎস্য শীকার করিতেছে। ইহারা দৈর্ঘ্যে ৪॥ ফুটের অধিক উচ্চ।

মিঃ সলসবরি যে সময়ে আন্দামানে গিয়াছিলেন, তখন তথায় এইরূপ অপরাধীর সংখ্যা অন্যূন ১২ হাজার। কর্তৃপক্ষ যাহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্করপ্রকৃতি বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ অপরাধীই কারাগারের পাষাণ বেষ্টনে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

আন্দামানের শাসনকর্ত্তা শুধু অপরাধীদিগের শাসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। দ্বীপের গহন অরণ মধ্যে খর্ব্বকায় সকল অসভ্য আ বাসী আছে, তাহ দের আক্রমণে অনেক সম তাঁহাকে বিব্র হইতে হয়। মার্কি পর্য্যটকের বিবর অনুসারে জানা যা যে, উপনিবেশ কয়েক মাইল দূ বর্ত্তী অরণ্যে এক দ বর্ব্বর জাতির বা আছে, তাহাদিগে ধরা দূরে, থাকুব তাহাদের সন্ধা পাওয়াই কঠিন অরণ্যমধ্যে এম কৌশলে তাহার আত্মগোপন করি থাকে যে, কদাচি কাহাকেও দেখিত পাওয়া যায়। এক বার গভীর নিশী তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া ঔপনিবেশিক অপরাধীদিগে কয়েক জনকে হত্যা করিয়া অনায়াসে দুর্গম অরণ্যমধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা ছাড়া আর কখনও তাহাদে কথা শুনা যায় নাই।

মার্কিণ পর্য্যটকের বিবরণ অনুসারে জানা যায়, আন্দামানে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই অত্যধিক। অপরাধিনী নারীদিগকে বিবাহ করিয়া বহু দাগী আসামী সংসার-যাত্র

নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নারী আসামীদিগের মধ্য হইতে কর্ত্তৃপক্ষ বাছিয়া বাছিয়া যাহাদিগকে বিবাহের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রতি শনিবারে তাহাদিগকে শ্রেণী-বদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। তাহার পর নির্ব্বাসিত পুরুষগণ নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমবেত হয়। নারীলাভের জন্য তাহাদের নয়নে, আননে ও ব্যবহারে যে বীভৎস ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা উপভোগ্য বলিয়া পর্য্যটক মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে স্ত্রীলাভ যে হয় না, তাহা বলাই

উলঙ্গ দেবতারা শ্বেত কর্দ্দম-চিত্রিত দেহে দণ্ডায়মান।

বাহুল্য। শত শত বিবাহার্থীর মধ্যে হয় ত ১০।১২ জনের ভাগ্যে নারীলাভ ঘটিয়া থাকে। তাহারা পত্নীলাভ করিয়া যখন চলিয়া যায়, নৈরাশ্যপীড়িতদিগের তীব্রদৃষ্টি তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে। এজন্য প্রায়ই বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় ঘটিয়া থাকে। স্বামী যখন মাঠে কার্য্যান্তরে লিপ্ত, স্ত্রীর পার্শ্বে শত শত প্রণয়প্রার্থী সমবেত হইয়া তাহার একটা কোমল কটাক্ষের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইতে থাকে। ফলে, অন্ধকারে ছুরিকাঘাতে কাহারও ইহজীবনের সকল সাধ মিটিয়া যায়, অথবা প্রকাশ্য-ভাবে নারী ও তাহার প্রণয়প্রার্থীর জীবনান্ত হয়—স্বামীকেও ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য। হত্যাকারীকে বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শিত হয় না। হত্যাকাণ্ডের কয়েক দণ্ড পরেই কারাগারের মধ্যে ফাঁসীর আয়োজন হইয়া থাকে, ঘাতুক সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত।

মার্কিণ পর্য্যটক কারাগার পরিদর্শন করিবার সুযোগ

পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য।

পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জনৈক মার্কিণ ঘাতুক তথায় নিযুক্ত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, এই ব্যক্তিকে কয়েদীরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত। লোকটি মেক্সিকো দেশের অধিবাসী। সে কি করিয়া আন্দামানে ঘাতুকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও নাকি জানিতে পারেন নাই। প্রতি ব্যক্তিকে ফাঁসী দিবার জন্য সে ১০ টাকা করিয়া সরকার হইতে

পুরস্কার পাইত, বেত্রদণ্ড প্রদানের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ কিছু কম।

লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কারাগারে আমি এক জন কয়েদীকে দেখিয়াছিলাম, তাহার গলায় কাষ্ঠের বন্ধনী ঝুলিতেছিল। তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, এই ব্যক্তি তিন বার মুক্তির জন্য পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। ইহজীবনে সে আর কখনও বাহিরের আলোক দেখিতে পাইবে না। যাহারা পলায়নের চেষ্টা করে, তাহাদের শাস্তি যেমন কঠোর, তেমনই অমোঘ। কারাগৃহের অন্ধকারেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।"

আন্দামান হইতে মুক্তিচেষ্টা করিয়া কেহ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। দুস্তর জলধি পার হইবার চেষ্টা করিয়া অনেক কয়েদীকে জীবন হারাইতে হইয়াছে। যাহারা সমুদ্রপথে চেষ্টা না করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লয়, বর্ব্বর অধিবাসীদিগের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে তাহাদের জীবনান্ত হয়। কোন কোন সময়ে পলাতক কয়েদীর কোন সংবাদই কর্তৃপক্ষের গোচর হয় না, গভীর অরণ্যের অধিবাসীরাই তাহার পরিণামের ইতিহাস অবগত আছে।

আন্দামানে জওয়ারা বলিয়া এক দল অসভ্য আছে। ইংরাজ শত চেষ্টাতে এই খর্ব্বকায় বর্ব্বরদিগকে বশে আনিতে পারেন নাই। দয়াপ্রকাশ অথবা বলপ্রয়োগ - ইহারা উভয়েরই অতীত। মার্কিণ পর্য্যটক যে সময়ে আন্দামান দ্বীপে ছিলেন, তখন ইহাদিগের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহব্যাপী চেষ্টার পর সেনাদলকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছি[ল।] তাহারা জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পায় নাই। ব্রহ্মদে[শীয়] ডাকাইত কয়েদীদিগকে একবার বড় বড় ছুরিকা ও খাদ্য ব্যাগসহ অরণ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। একবারম[াত্র] তাহারা এক খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুণ্ড লইয়া ফি[রিয়া] আসিয়াছিল এবং সেজন্য পুরস্কারও পাইয়াছিল। অন্য[ান্য] বার তাহাদের আর কোনও উদ্দেশ মিলে নাই।

মানবজাতির মধ্যে এই খর্ব্বকায় বর্ব্বরগণই সর্ব্বাপে[ক্ষা] আদিম জাতি বলি[য়া] নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণ[া।] কিন্তু ইহাদের সহি[ত] মিলামিশা ত দূরের কথা, দেখাসাক্ষাৎ হওয়াই অস[ম্ভ]ব। তবে কারাগারে তিন মাইল দূরে একটি দ্বীপে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কতিপয় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন সময়ে এই ক্ষুদ্রকায় বন্য অধিবাসীদিগের কেহ কেহ তথায় আসিয়া থাকে। ইহাদিগকে সভ্যভব্য করিয়া তুলিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ অবশেষে হতাশ হইয়া সম্প্রতি হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বিধবা আন্দামানী রমণী গলদেশে স্বামীর মুণ্ড ঝুলাইতেছে।

সম্পূর্ণ হতাশ হইবার পূর্ব্বে, যখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষ আদিম অধিবাসীদিগকে সুসভ্য করিবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নাই, সেই সময় মিঃ সলস্‌বরি আন্দামান-প্রবাসী কোন ইংরাজের সহিত উল্লিখিত কুটীরে গমন করেন। সে সময় তিনি কয়েক জন নরনারীকে সেই কুটীরমধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক মানুষ যে এত খর্ব্ব হইতে পারে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না। এক জন রমণী মাত্র ৩ ফুট ৩ ইঞ্চ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দেখিয়া তৎপ্রতি

মাতা পুত্রের দেহ চিরিয়া ভূতযোনি তাড়াইতেছে।

তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তাহার গলদেশে একটা প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণের পদার্থ ঝুলিতেছিল। নিকটে গিয়া দেখিতেই ভয়ে, বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হইয়া থাকেন। এই অলঙ্কারটি নরকপাল! সেই কৃষ্ণবর্ণ নগ্নবক্ষে শ্বেত নর কপাল দেখিলে মনে বিভীষিকার সঞ্চার হওয়া অনিবার্য্য।

সঙ্গী শ্বেতাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ—উক্ত রমণী পরলোকগত স্বামীর মুণ্ডটিকে দেহের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছে। আন্দামানী অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথাই প্রচলিত আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারা মৃতদেহকে সমাহিত করিয়া রাখে এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়। কয়েক মাস পরে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া অস্থিগুলি সমুদ্রজলে ধৌত করিয়া লয়। অবশেষে নরকপালকে শ্বেত ও লোহিত কর্দ্দমের দ্বারা রঞ্জিত করে এবং নৃত্য করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার পর মৃতের নিকটতম আত্মীয়কে উক্ত নরকপাল ও অন্যান্য অস্থি প্রদান করে। শোকার্ত্ত পুরুষ বা নারী গাছের সুদৃঢ় ত্বকের সাহায্যে উহা গলদেশে পুষ্পহারের ন্যায় ধারণ করিয়া থাকে।

লেখক আর একটি দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। একটি বালকের সম্মুখে এক জন নারী উপবিষ্টা। বালক ও তাহার মাতা উভয়েই নগ্নদেহ। বালকটির সর্ব্বদেহে ক্ষতচিহ্ন। আন্দামানবাসীদিগের বিশ্বাস, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শিশুর দেহে দুষ্ট ভূতযোনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতি দুই বা তিন মাস অন্তর মাতা শিশুর দেহ চিরিয়া ভূতযোনিকে তাড়াইয়া দেয়। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক নরনারীর দেহে ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মিঃ সলস্‌বরির সঙ্গী শ্বেতাঙ্গটি বহুদিন ধরিয়া উহাদের সহিত মিলামিশা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে উহারা চিনিত। তাঁহারই অনুরোধে উহারা বিবাহব্যাপারের কৃত্রিম অভিনয় তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছিল। দলের মধ্যে সংপ্রতি দুই জন নরনারী বিবাহিত হইয়াছিল। তাহারাই বরকনের অভিনয়ের ভূমিকা লইল। প্রথমেই নৃত্যারম্ভ। তাহার পর বর যেন অরণ্যে পলায়ন করিতেছে, এমনই ভাব দেখাইল। অন্যান্য পুরুষ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল এবং তাহাকে ধরিয়া লইয়া, কন্যা যেখানে অন্যান্য নারীর সহিত বসিয়া ছিল, তথায় আসিল। উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে বরকে বলপূর্ব্বক তাহার কন্যার ক্রোড়ে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বর ও কন্যার ঘাড়ে গড়াইয়া পড়িল। বলের উপর খেলোয়াড়রা যেমন ঝুঁকিয়া পড়ে (রাগবী খেলায়), দৃশ্যটি ঠিক তেমনই।

বিবাহ-দৃশ্য—বলের ন্যায় গোলাকার।

চারিদিক্ হইতে তখন ক্রন্দনের রোল উঠিতে থাকে। পঞ্চাশ গজ দূর হইতে এ দৃশ্যটি দেখিলেই মনে হইবে, একটা বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ বল ভূমিতলে গড়াইতেছে।

লেখক বলিতেছেন, "আমি যখন এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তখন এক জন যুবতী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত বর্ণরেখা। একা সে-ই শুধু সেই রঙ্গদৃশ্যে যোগদান করে নাই। সঙ্গীকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, শুধু অনাহারে থাকিতে হয়; তাহার ঘুমাইবারও উপায় নাই। তিন দিন পরে যে কোন পুষ্পিত আরণ্যলতা বা বৃক্ষের নামে তাহাকে অভিহিত করা হয়। নারীদেহের বিকাশ প্রস্ফুটিত ফুলের মতই তাহারা মনে করিয়া থাকে। এই সময় হইতেই বাল্যের নামের সহিত আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না।"

আন্দামানের আদিম নিবাসীরা কিরূপে অগ্নি প্রজ্বালিত

মিঃ মলম্বরি আন্দামানী সর্ব্বকায়া নারীদিগকে লইয়া ফটো তুলিতেছেন।

এই যুবতীর শীঘ্রই বিবাহ হইবে; সুতরাং সে এই কৃত্রিম বিবাহব্যাপারে যোগ দিতে চাহে না। সম্প্রতি সে পুষ্প নাম পাইয়াছে। যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক নারীকে কোন না কোন ফুলের নামে অভিহিত করাই তাহাদের প্রথা। এই নাম পাইবার পূর্ব্বে ত্রিরাত্রি ধরিয়া একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে যুবতীকে

করিতে হয়, তাহা জানে না। প্রত্যেক পরিবারে সর্ব্বদাই আগুন জ্বালা থাকে। তাহারা কোনও ক্রমে তাহা নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না। স্থানান্তরে যাইতে হইলে তাহারা চির প্রজ্বলিত অগ্নি সঙ্গে লইয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস, আগুন নিবিয়া গেলে সর্ব্বনাশ হইবে। উহা বিধাতার দান, নিবিয়া গেলে আর প্রজ্বলিত করা অসম্ভব।

নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা

পূজোর নম্বর 'বসুমতীর' জন্য একটি গল্প লিখে দিতে, বহু দিন থেকে প্রতিশ্রুত আছি। নানা কাযে ব্যস্ত থাকায় এতদিন লেখায় হাত দিতে পারিনি।

আজ ঘুম থেকে উঠেই সংকল্প করলুম যে, যা থাকে কুলকপালে, একটা গল্প সূর্য্য ডোববার আগেই লিখে শেষ করব।

তা'র পর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি সুধু পড়তে, লিখতে নয়। কেন না, দিল্লীতে আমি যাইনি।

এ অবস্থায় নিজের মাথা থেকে গল্প বা'র করা অসম্ভব দেখে, একটা অপরের জানা না হোক; আমার শোনা গল্প লেখাই স্থির করলুম।

এ গল্পটি আমি নীললোহিতের মুখে শুনেছিলুম। নীললোহিত লোকটি যে কে, তা অবশ্য আপনি জানেন গত বৎসর এই সময়ে তাঁ'র সবিশেষ পরিচয় 'মাসিক বসুমতী'তে দিয়েছি। আর আপনার কাগজের পাঠকসম্প্রদায়েরও অনেকেরই বোধ হয়, নীললোহিতের কথা স্মরণ আছে।

আমার জনৈক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বন্ধু এক দিন আমার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, বর্ত্তমান "বেদ" জাল আর এ জাল ব্রাহ্মণরা করেছে। তা'র বক্তব্য ছিল এই যে, মূল বেদ যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন অবশ্য তা'র বেবাক অক্ষর জলে ধুয়ে গেছল। এ অকাট্য যুক্তি শুনে আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনি। ফলে বন্ধুবর একেবারে উগ্রক্ষত্রিয় হয়ে উঠে আমাকে সরোষে বল্লেন যে, তাঁ'র কথা আমি বুঝতে পারব না, যেহেতু, আমরা—ব্রাহ্মণরা বাস করি ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতে, আর তাঁ'রা বাস করেন বিশ্বামিত্রের জগতে। কথাটা শুনে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তা'র পর ভেবে দেখেছি যে, কথাটা সত্য। আমাদের সকলের দেহ সুধু একই মাটীর পৃথিবীতে অবস্থান করে, কিন্তু প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা বিশ্বে বাস করে। আমি বাস করি মর্ত্তলোকে আর নীললোহিত বাস করতেন কল্পলোকে। সাদা কথায় আমি বাস করি বৃটিশ রাজ্যে, নীললোহিত বাস করতেন কল্পনারাজ্যে। সুতরাং আমার মুখে নীললোহিতের গল্প শুনে শ্রোতাদের দুধের স্বাধ (স্বাদ ?) ঘোলে মেটাতে হবে। তখন সবে সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গেছে। কলকাতায় আর কোন কথা নেই। পাঁচ জন একত্র হলেই সে কংগ্রেস কেন ভাঙ্গল, কি ক'রে ভাঙ্গল, যে জুতোটা উড়ে এসে প্রেসিডেন্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, সেটা বিলেতি "পম্প" কি পাঞ্জাবী নাগরা, মারহাট্টি চটি কি মাদ্রাজী "চাপলি" এই সব নিয়ে তখন আমাদের মধ্যে ঘোর গবেষণা ও মহা বাদানুবাদ চলছে।

এক দিন আমরা সকলে আড্ডায় ব'সে, উক্ত যুগপ্রবর্ত্তক জুতোটির জাতি-নির্ণয় করতে ব্যস্ত আছি, এমন সময় নীললোহিত হঠাৎ ব'লে উঠলেন যে, তিনি স্বয়ং সশরীরে সুরাটে উপস্থিত ছিলেন এবং ভিতরকার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জানে, প্রাণ গেলেও সে রহস্য সে ফাঁস করবে না। এ কথা শুনে এক জন eye-witness এর কথা শোনবার জন্য আমরা সকলে ব্যগ্র হয়ে উঠলুম, যদিচ আমরা সবাই জানতুম যে, সে কথার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। নীললোহিত বল্লেন—"তোমরা যদি তর্ক থামাও ত, গল্প বলি।" অমনি আমরা সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করলুম। তিনি তাঁ'র সুরাট অভিযানের বর্ণনা সুরু করলেন। তাঁ'র কথার অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করতে হ'লে গল্প একটা নভেল হয়ে উঠবে। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারি, তাঁ'র মোদ্দা কথা আপনাদের শোনাচ্ছি, অর্থাৎ মাছ বাদ দিয়ে তা'র কাঁটা সুধু আপনাদের কাছে ধ'রে দিচ্ছি।

(২)

নীললোহিত সুরাট গেছলেন B. N. R. দিয়ে একটি প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে, অর্থাৎ একেবারে একলা, তাই তাঁ'র

সঙ্গে অপর কোন বাঙ্গালী ডেলিগেটের সাক্ষাৎ হয় নি। গাড়ী ঢিকুতে ঢিকুতে দু'দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় সুরাট গিয়ে পৌঁছল। নীললোহিত সুরাট ষ্টেসনে নেমে একখানি টঙ্গা ভাড়া ক'রে Congress-Camp এর দিকে রওনা হলেন। গুজরাটে টঙ্গা অবশ্য একরকম গরুর গাড়ী, কিন্তু গুজরাটের গরু বাঙ্গলার ঘোড়ার চাইতে ঢের মজবুত ও তেজী। তা'রা ঠিক তাঞ্জি-ঘোড়ার মত কদমে চলে, আর তাদের গলার ঘণ্টা গীর্জ্জের ঘণ্টার মত— সা-র গ-ম নাদে আর বাইজির পায়ের ঘুঙ্গুরের মত তালে বাজে। গাড়ীতে দু'দিন নীললোহিতকে এক রকম অনশনেই কাটাতে হয়েছিল। সকালবেলায় এক গেলাস কাঁচা দুধ ও রাত্রিরে এক মুঠো কাঁচা ছোলার বেশি তাঁ'র ভাগ্যে আর কিছু আহার জোটেনি। ষ্টেসনে ষ্টেসনে অবশ্য "লাড্ড" পাওয়া যায়, কিন্তু সে লাড্ড আকারে ভাঁটার মত আর সে চিজ দাঁতে ভাঙ্গবার যো নেই, গিলে খেতে হয়, আর তা গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন পাইপের মত মোটা। আর "পুরি?" তা'র একখানা ছুঁড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেণ্টকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। পৃথিবীতে নাকি এমন জুতো নেই যা'র সুখতলা, আকারে ও কাঠিন্যে তা'র কাছেও ঘেঁসতে পারে। এক একখানা "পুরি" যেন এক একখানা খড়ম। সুতরাং নীললোহিত অনশনে যদিচ মৃতপ্রায় হয়ে ছিলেন, তবুও সুরাটের বড় রাস্তার দৃশ্য দেখে, তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা একদম ভুলে গেলেন। যত দূর যাও, পথের দু'পাশে সব জানালাতে যেন সব পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গুজরাটে অবরোধপ্রথা নেই। আর গুজরাটরমণীদের তুল্য সুন্দরী সুরপুরীতেও মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁ'র মোহ উপস্থিত হ'ল। তাঁ'র মনে হ'ল, যেন প্রতি জানালায় একটি ক'রে Juliet দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি হচ্ছেন স্বয়ং Romeo, কিন্তু টঙ্গা এমনি ছুটে চলেছে যে, তিনি কারও কাছে kill the envious moon, এ কটি কথা বলবারও অবকাশ পেলেন না। তা'র পরে এক সময়ে তাঁ'র মনে হ'ল যে, টঙ্গা এক যায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে—আর তাঁ'র দক্ষিণ ও বাম দুপাশ দিয়েই অসংখ্য সুন্দরীর শোভাযাত্রা চলেছে। নীললোহিত যে পথিমধ্যে কারও ভালবাসায় প'ড়ে যান নি, তাঁ'র একমাত্র কারণ, এই নাগরীর হাটে কাকে ছেড়ে কার ভালবাসায় তিনি পড়বেন? বিবাহ অবশ্য—একসঙ্গে দু'শ তিন'শ করা যায়, কিন্তু ভালবাসায় পড়তে হয় মাত্র এক জনের সঙ্গে— অন্তত এক সময়ে ত তাই।—এ দিকে পেট খালি; ওদিকে হৃদয় পূর্ণ, এই অবস্থায় নীললোহিত কংগ্রেস ক্যাম্পে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হবামাত্র তাঁ'র রূপের নেশা ছুটে গেল। তিনি প্রথমে গিয়েই টিকিট কিনলেন, তাতেই তাঁ'র পকেট প্রায় খালি হয়ে এল। তা'র পর শোনেন যে, কংগ্রেস ক্যাম্পে আর যায়গা নেই, যা'র কাছেই যান, তিনিই বল্লেন, "ন স্থানং তিলধারণে।" দু'দিন পেটে ভাত নেই, দু'রাত্তির চোখে ঘুম নেই, তা'র উপর আবার যদি সুরাটের পথে পথে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে হয়—তা হলেই ত নির্ঘাত মৃত্যু। নীললোহিত একেবারে জলে পড়লেন, আর ভেবে কোনও কূলকিনারা করতে পারলেন না। তাঁ'র এই দুরবস্থা দেখে টঙ্গাওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁ'কে Extremist ক্যাম্পে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে। নীললোহিতের নাড়ীতে আবার রক্ত ফিরে এল। টঙ্গা যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চল্লো। এবার কিন্তু কোনও বাড়ীর কোনও গবাক্ষ আর তাঁ'র নয়ন আকর্ষণ করতে পারলে না যদিচ প্রতি গবাক্ষেই এক একটি সন্ধ্যাতারা ফুটে ছিল। তিনি অকারণে সমস্ত সুরাট-সুন্দরীদের উপর মহা চ'টে গেলেন, যেন তা'রাই তাঁ'র কংগ্রেসের প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়েছে। শেষটা রাত আট্‌টায় তিনি কংগ্রেসের মহারাষ্ট্র-শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন এবং পৌঁছেই পকেটে যে কটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, সেই কটি টঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে বিদেয় করলেন। মহারাষ্ট্র-শিবিরে লোকের ভিড় দেখে সেখানে রাত কাটাতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। সে যেন একটা Black hole, এক একটা ছোট্ট ঘরে পঞ্চাশ ষাট জন ক'রে জোয়ান। "শুতে না পাই, অন্ততঃ খেতে পাব," এই আশায় তিনি সেখানে থাকাই স্থির করলেন। কিন্তু খাবার আয়োজন দেখে তাঁ'র চক্ষুস্থির। চারদিকে তাকিয়ে দেখেন, সুধু লঙ্কা—লঙ্কা আর লঙ্কা। সে লঙ্কা কেউ কুটছে, কেউ বাটছে, কেউ পিষছে, কেউ ছেঁছচে। তা'র গন্ধতেই তাঁ'র মুখ জ্বালা করতে লাগল। তিনি ঢোক গিলে মনে মনে বল্লেন, "এখন উপায় কি, মুণ্ড দিয়েই

ভাত খাব।" কিন্তু ভাত সে দিন তাঁ'র আর কপালে লেখা ছিল না। সে ক্যাম্পেও তাঁ'র স্থান হ'ল না। সকলে ধ'রে নিলে যে, তিনি এক জন Spy। তাঁ'র যে এ কূল ওকূল দুকূল গেল, তা'র প্রথম কারণ—তিনি অজ্ঞাত-কুলশীল, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁ'র সঙ্গে ব্যাগ-বিছানা কিছুই ছিল না। তিনি ঘর থেকে একছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন সুরাটে লোকের কাছে এই প্রমাণ করবার জন্য যে, তিনি হচ্ছেন এক জন স্বদেশপ্রেমের মাতোয়ারা সন্ন্যাসী।

নীললোহিত মহারাষ্ট্র-শিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। আর তাঁ'র অবস্থা তখন এই যে, পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই, সুরাটে একটি পরিচিত লোক নেই। সভ্যসমাজের মধ্যে তিনি পড়লেন দ্বিতীয় Robinson Crusoe'র অবস্থায়। ঘোর বিপদের মধ্যে না পড়লে নীললোহিতের বলবুদ্ধি খুলত না। সহজ অবস্থায় নীললোহিত ছিলেন আর পাঁচ জনের মত; কিন্তু বিপদে পড়লেই তিনি হয়ে উঠতেন একটি Superman, সংস্কৃতে যাকে বলে অতিমানুষ। তাই পথে বেরিয়েই তাঁ'র শরীর মনে, কে জানে, কোত্থেকে অলৌকিক শক্তি ও সাহস এসে জুটল। তিনি তাঁ'র মনকে বোঝালেন যে, তিনি hunger-strike করছেন সভ্যসমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে। অমনি তাঁ'র ক্ষুধা তৃষ্ণা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় উড়ে গেল। তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, এ বিপদ থেকে তিনি আত্মবলে উদ্ধার লাভ করবেন। কি ক'রে যে তা করবেন, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁ'র মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু তাঁ'র ছিল আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিচারে সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁ'র সমান অভক্তি জন্মাল, কারণ, তা'রা যা করতে যায়, তা দল বেঁধে ও পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে। একলা কিছু করবার সাহস ও শক্তি তাদের কারও শরীরে নেই। নীললোহিত তাই "একলা চলবে" ব'লে সেই অমানিশার অন্ধকারের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবার তিনি রাজপথ ছেড়ে সুরাটের গলি-ঘুঁচিতে ঢুকে পড়লেন। সে সব গলিতে যেন অন্ধকারের বান ডেকেছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলোর দুয়োর, জানালা, সব জেলের ফটকের মত কষে বন্ধ। চারপাশে সব নির্জ্জন, সব নীরব, নিস্তব্ধ। যেন সমগ্র সুরাট সহরটা রাত্তিরে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা বাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই আলো, সেখানেই কান্নার সুর। সুরাটে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল। নীললোহিত ছাড়া অপর কেউ এই শ্মশানপুরীর মধ্যে ঢুকলে ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি ঘণ্টা দুই এই অন্ধকারের ভিতর সাঁতরাতে সাঁতরাতে শেষটা কূলে গিয়ে ঠেকলেন। হঠাৎ তিনি এমন একটা বাড়ীর সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যা'র দোতালার ঘরে দেদার ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলছে, আর যা'র ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে শ্রীকণ্ঠের অতি সুমধুর সঙ্গীত। নীললোহিত তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে নিজের মাথার পাগড়িটি খুলে সেই বাড়ীর বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে লাগিয়ে দিয়ে সেই পাগড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে গেলেন। তাঁ'র পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে একটি অপ্সরোপম রমণী বেরিয়ে এলেন। তা'র পর দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে রইলেন। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক নীললোহিত জীবনে কিংবা কল্পনাতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নি। নীললোহিতের মনে হ'ল যে, রমণীটি সুরাটের সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্তসার। তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গ একেবারে হীরে-মাণিকে ঝক্ ঝক্ করছিল। নীললোহিতের চোখ সে রূপের তেজে ঝলসে যাবার উপক্রম হ'ল, তিনি মাটীর দিকে চোখ নামালেন। প্রথম কথা কইলেন স্ত্রীলোকটি। তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

নীললোহিত উত্তর করলেন, "বাঙ্গালী।"

"সুরাটে কেন এসেছ?"

"কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে।"

"কংগ্রেসক্যাম্পে না গিয়ে এখানে কেন এলে?"

"পথ ভুলে।"

"টঙ্গায় চড়লে টঙ্গাওয়ালা ত তোমাকে ঠিক যায়গায় নিয়ে যেত।"

"আমার ব্যাগ, বিছানা সব ষ্টেশনে হারিয়ে গিয়েছে। টাকাকড়ি সব ব্যাগের ভিতর ছিল। তাই টঙ্গা ভাড়া করবার পয়সা কাছে না থাকায় হেঁটে বেরিয়েছিলুম। তা'র পর তিন চার ঘণ্টা ঘোরবার পর এখানে এসে পৌঁচেছি।"

"এ বাড়ীতে ঢুকলে কিসের জন্য?"

"আলো দেখে ও সঙ্গীত শুনে।"

"পরের বাড়ীতে না বলা-কওয়া প্রবেশ করতে তোমার দ্বিধা হ'ল না?"

"যে জলে ডোবে, সে বাঁচবার জন্য হাতের গোড়ায় যা পায়, তাই চেপে ধরে। আমি উপবাসে মৃতপ্রায়। তাই যদি কিছু খেতে পাই, তাই দেখবার জন্য এখানে প্রবেশ করেছি—বাড়ী কার, তা ভাববার আমার সময় ছিল না। ঝাড়-লণ্ঠন দেখে বুঝলুম—এ বাড়ীতে অন্নকষ্ট নেই, আর গান শুনে বুঝলুম, এ বাড়ীতে প্লেগ নেই।"

নীললোহিতের কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মনে করুণার উদয় হ'ল। তিনি তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। আর দাসীদের ডেকে বল্লেন, নীললোহিতের জন্য খাবার আনতে। তাই শুনে নীললোহিতের ধড়ে আবার প্রাণ এল। তিনি এক নজরে ঘরটি দেখে নিলেন। নীচে কাশ্মীরী গালিচা পাতা আর ঘর পোরা বাদ্যযন্ত্র। তিনি গৃহকর্ত্রীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে উত্তর করলেন,—

"তোমরা যা হ'তে চাচ্চ, আমি তাই।"

"অর্থাৎ?

"আমি স্বাধীন।"

এর পর বড় বড় রূপোর থালায় ক'রে দাসীরা দেদার ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির করলে। নীললোহিত আহারে ব'সে গেলেন। সে আহারের বর্ণনা করতে হ'লে, দু'খানি বড় বড় কাটালগ তৈরি করতে হয়। একখানি ফলের, আরখানি মিষ্টান্নের। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সকল ঋতুর ফল আর সকল প্রদেশের মিষ্টান্ন নীললোহিতের সুমুখে স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হ'ল। তিনিও তাঁর এক সপ্তাহের ক্ষুধা মেটাতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি সে দিন আহারে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও হারিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ফটকে কে অতি আস্তে ঘা দিলে। গৃহকর্ত্রী একটি দাসীকে নীচে গিয়ে দুয়োর খুলে দিতে আদেশ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি ভদ্রলোক এসে সেখানে উপস্থিত। নীললোহিত দেখেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি বম্বে অঞ্চলের এক জন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি যে অগাধ ধনী, তা তাঁর উদরেই প্রকাশ। ভদ্রলোক নীললোহিতকে দেখেই আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তা'র পর সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর অনেকক্ষণ ধ'রে গুজরাটিতে কি কথাবার্ত্তা হ'ল। তার পর সেই ভদ্রলোকটি, নীললোহিতকে সম্বোধন ক'রে অতি অভদ্র হিন্দিতে বল্লেন যে, আহারান্তে তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নচেৎ তিনি তাঁকে পুলিসের হাতে সঁপে দেবেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বল্লেন যে, তা কখনই হ'তে পারে না। সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরে বেড়ালে বাঙালী ছোকরাটি প্লেগে মারা যাবে। আর ছোকরাটি যে চোর-ডাকাত নয়, তার প্রমাণ তা'র চেহারা। "এইসা খোপসুরত" ছোকরা চোর-ডাকাত কখনই হ'তে পারে না। এ কথা শুনে, ভদ্রলোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। আবার দু'জনে বাগবিতণ্ডা সুরু হ'ল। শেষটা উভয়ের মধ্যে এই আপোষ হ'ল যে, রাত্তির নীললোহিতকে চাকরদের সঙ্গে থাকতে হবে, কিন্তু সকালে উঠেই তাঁকে এ বাড়ী থেকে চ'লে যেতে হবে। ঘুমে নীললোহিতের চোখ বুজে আসছিল, তাই তিনি দ্বিরুক্তি না ক'রে নীচে গিয়ে চাকরদের ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন যে, ঐ বোম্বেটের অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নীললোহিত চোখ তাকিয়ে দেখেন যে, বেলা দশটা বেজে গিয়েছে। তিনি সবে মুখ-হাত ধুয়ে, সবে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় উপর থেকে হুকুম এল যে—"বাইজি বোলাতা।" উপরে গিয়ে দেখেন যে, স্ত্রীলোকটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। সাজসজ্জা সব বাঙালী রমণীর ন্যায়। শরীরে জহরতের সম্পর্ক নেই, গহনা আগাগোড়া সোনার, আর তাঁ'র পরণে ঢাকাই শাড়ী, গায়ে একখানি বুটোদার ঢাকাই চাদর। তিনি নীললোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি এখন কোথায় যেতে চান। নীললোহিত উত্তর করলে কংগ্রেস-ক্যাম্পে। স্ত্রীলোকটি বল্লেন, সে হ'তেই পারে না। গত রাত্তিরের আগন্তুক ভদ্রলোকটি যদি তাঁ'র সাক্ষাৎ পান, তা হ'লে তাঁর বিপদ ঘটবে, হয় গুণ্ডা, নয় পাহারাওয়ালার হাতে তাঁকে বিড়ম্বিত হ'তে হবে। অতএব পত্রপাঠ দেশে ফিরে যাওয়া তাঁ'র পক্ষে কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকটি তাঁ'র জন্য ব্যাগ, বিছানা, দেশে ফেরবার রেল-ভাড়ার টাকা ইত্যাদি সব ঠিক রেখেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস যাওয়ায় বিপদ আছে, এ কথা শুনে নীললোহিত জেদ ধ'রে বসলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাবেনই যাবেন। সেই সুন্দরী তাঁ'কে অনেক কাকুতি-মিনতি করলে; কিন্তু নীললোহিত কিছুতেই তাঁ'র গো ছাড়লেন না। "ভয় পেয়েছি," এ কথা স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার, পুরুষমানুষ সহজে করে না। আর উক্ত স্ত্রীলোকটি ছিলেন যেমন সুন্দরী, নীললোহিতও ছিল তেমনি বীরপুরুষ। অনেক বকাবকির পর শেষটা স্থির হ'ল যে, উক্ত স্ত্রীলোকটি নীললোহিতকে স্বয়ং সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যাবেন,--নিজের দাসী সাজিয়ে। তিনি বল্লেন যে, তিনি সঙ্গে থাকলে কেউ নীললোহিতের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না। মধ্যাহ্নভোজনের পর নীললোহিতকে পাঞ্জাবী রমণীর বেশ ধারণ করতে হ'ল। পরণে চুড়িদার পাজামা, পায়ে নাগরা, গায়ে কুর্ত্তা ও মাথামুখ-ঢাকা ওড়না। এ সব সাজসজ্জা গৃহকর্ত্রীর একটি পাঞ্জাবী দাসীর কাছ থেকেই পাওয়া গেল। আর সে সব কাপড় নীললোহিতের গায়ে ঠিক ব'সে গেল। কেন না, পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক ও বাঙ্গালী পুরুষ মাপে প্রায় এক। তা'র পর দু'জনে একটি আধ-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে কংগ্রেসে গিয়ে মেয়েদের গ্যালারিতে বসলেন। কংগ্রেসের কাষ সুরু হ'ল, এমন সময় হঠাৎ নীললোহিত দেখতে পেলেন যে, উক্ত ভদ্রলোক কংগ্রেসের তোমরা-চোমরাদের মধ্যে ব'সে আছেন। এ দেখে তিনি আর তাঁ'র রাগ সামলাতে পারলেন না, ডান পায়ের নাগরা খুলে তাঁ'কে ছুঁড়ে মারলেন। সেই নাগরাটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রেসিডেণ্টের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মহা হৈচৈ প'ড়ে গেল--কংগ্রেস ভেঙ্গে গেল। নীললোহিতের কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটি মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হয়ে রইলেন। তাঁ'র পরই নিজেকে সামলে নিয়ে নীললোহিতের হাত ধ'রে তিনি কংগ্রেসের তাঁবুর বাইরে এসে গাড়ীতে চ'ড়ে বাড়ী ফিরলেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার নীললোহিতকে বাঙ্গালী সাজিয়ে ব্যাগ-বিছানা সমেত সেই গাড়ীতেই তাঁ'কে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে নীললোহিত ব্যাগ খুলে দেখেন, তা'র ভিতর পাঁচশ' টাকার নোট আর সেই স্ত্রীলোকটির একখানি ছবি রয়েছে। সেই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তিনি দেশে ফিরলেন। সুরাট-কংগ্রেসের যুগপ্রবর্ত্তক জুতো যে নীললোহিতের পাদুকা, এ কথা শুনে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

নীললোহিতের মুখে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনে আমরা সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলুম--কেন না, তার এ গল্প-সম্বন্ধে কি বলব, কেউ তা ঠাওরাতে পারলুম না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর রামযাদব তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি সেই সুরাট-সুন্দরীর পাঁচ শত টাকা বেমালুম হজম ক'রে ফেললেন? নীললোহিত উত্তর করলেন--"না। আমি কাশীতে গিয়ে সেই পাঁচশ' টাকা দিয়ে অন্নপূর্ণার পূজো দিয়ে এসেছি।" আবার সকলে চুপ করলেন। তা'র পর মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, "সে ছবিখানা তোমার কাছে আছে?" নীললোহিত উত্তর করলেন "হাঁ, আছে।" দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল "সেখানি দেখাতে পার?" উত্তর--"দেখতে ইচ্ছে হয়, কিনে দেখতে পারো।" প্রশ্ন--"সে ছবি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়?" উত্তর--"দেদার।" প্রশ্ন--"কি রকম?" উত্তর "নূরজাহানের ছবি দেখলেই সেই সুরাট-সুন্দরীকে দেখতে পাবে। এ দুটি স্ত্রীলোকই এক ছাঁচে ঢালাই।"

এর পর কিছু বলা বৃথা দেখে আমরা সভাভঙ্গ ক'রে চ'লে গেলুম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ছত্রভঙ্গ

(নিছক নক্সা)

১

এবার পূজোর প্রণামী আপনাদিগের ভোট।

পূজার নিমন্ত্রণ-পত্রের তলদেশে ঐ কথা কয়টা যোগ করিয়া প্রেসে পাঠাইবার সময় পুরোহিত জিজ্ঞাসিলেন, এটা কি রকম হ'ল? পূজার প্রণামীতে আমার আধা-আধি বখরা। ভোট নিয়ে ত আমার পেট ভরবে না!

কর্ত্তা চটিয়া উত্তর দিলেন, তোমার পেট ত কিছুতেই ভর্‌বে না।

বিশাল নাসিকাযুক্ত এক মোসাহেব প্রতিধ্বনি করিল, কিছুতেই না।

অতি করাল এক জোড়া গোঁফের অধিকারী বলিল, তুমি আর গোল কোর না, ঠাকুর! কর্ত্তাকে অনেক ব'লে কয়ে রাজি করা গিয়েছে, তুমি আর ভাংচি দিয়ো না। বরং স্বস্ত্যয়ন কর, ভালয় ভালয় কৌন্‌সিলার হন। তোমার এত মূলোর ক্ষেত নয় যে, একচোটে ওপোড় ক'রে তুলবে।

আরে, মূলোর ক্ষেত নয় ব'লে তোমরা যে পটল তোলাবার চেষ্টা কর্‌ছ! এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনে ছেলে-পুলেকে খাওয়াব কি?

এবার একপাটি দাঁত নড়িয়া উঠিল, সেই উপায়ই ত করা হচ্ছে, ঠাকুর! কর্ত্তা কৌন্‌সিলার হ'লে, তুমি একলা নয়, সারা দেশের লোকগুলো খেয়ে-প'রে বাঁচবে। এখন যে নুণ আন্‌তে পান্তা নেই, তা আর থাকছে না। তখন পান্তাও খাবে, নুণও খাবে।

নাক বলিল, হাঁ হাঁ, যখন মুটোমুটো নুণ খাবে, তখন বুঝবে কর্ত্তার গুণ!

খালি নুণ খেয়ে ত আর পেট ভরবে না।

কর্ত্তা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, তোমার পেট ভরে কেবল অষ্টরম্ভায়। একটা শুভ কায করতে যাচ্ছি, খালি বাগ্‌ড়া দিচ্ছ! তুমি পুরুত!

গোঁফ কর্ত্তাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য কোঁচার খুঁট দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দাঁত চেঁচাইয়া উঠিল, পাখার সুইচ্ খুলে দাও। নাক তদুদ্দেশে দাঁড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল। বৈদ্যুতিক বাতাসের বাজে-খরচে কর্ত্তা বড় ব্যাজার। অবশেষে বলিল, ঠাকুর! স্বস্ত্যয়ন কর কর্ত্তা আমাদের দেশের কৌন্‌সিলার হ'লে কি কাণ্ডটা হবে বুঝতে পারছ না।

পুরোহিত ইতিপূর্ব্বেই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বলিলেন, না বুঝিয়ে দিলে বুঝব কি ক'রে?

গোঁফ বলিল, আমরাই কি সব বুঝেছি যে, তোমাকে বোঝাব?

দাঁত বলিল, তবে মোটামুটি ক'টা কথা জেনে রাখ। দেশের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ঘুচ্‌বে; নুণ সস্তা হবে; নূতন ক'রে টেক্স বসবে না; অন্যায় খরচ ক'মে যাবে।

ক্রিয়া-কাণ্ড সব লোপ হবে না কি?

কর্ত্তা কহিলেন, তা কমাতে হবে বৈ কি! নিজের সংসার-খরচ না কমিয়ে কি ক'রে সরকার বাহাদুরকে বলব যে, তোমরাও সব খরচ কমাও।

বল্‌লে শুনবে কেন?

গোঁফ আস্ফালিয়া উঠিল, শুনবে না? ইস্! একবার কেমন না শোনে দেখি! কর্ত্তা যখন স্বরাজের রাজা হবেন, তখন হাতে মাথা কাটা যাবে। সে ভয় নেই, ঠাকুর! কর্ত্তার পরামর্শ না নিয়ে দেশের কোন কাযই হবে না। খরচ বন্ধ করতে বল্‌লেই করতে হবে?

বাপ-পিতামোর শ্রাদ্ধ বন্ধ হবে?

ভয় নেই, পন্‌শাই! খুব ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ হবে, বলিতে বলিতে নসীরাম ওরফে নসে-সয়তান বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

পুরোহিত সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, কার শ্রাদ্ধ হে?

নসী বলিল, দেখেছ। খুব মৎলব বা'র করেছেন, সার! —এবার পুজোয় প্রণামী আপনাদের ভোট। পনশাই, তুমি এক কায করবে। যারা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আসবে, তাদের ঠাকুরের সামনে পৈতে ছুঁয়ে বলিয়ে নেবে যে, আমার যজমানকে ভোট দিতে হবে! এবার কুম্মাণ্ডখণ্ড মানকচুর মণ্ড খাবে। হাজরাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেবার ত কিছু করতেই পারেনি। এবার তাও পারবে না!

কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, নসীরাম, নেশার ঝোঁকে কি যে বল! সে হ'ল জমীদার।

নসী বলিল, জমীদার? জমীদার যদি কেউ থাকে ত আমি!

পুরোহিত কহিলেন, তা বটে! মদ খেয়ে জমী ত নিয়েই আছ! কর্ত্তা, আপনি ঐ সয়তানের মতলবে চলছেন, দেখবেন, ও আপনাকে দয়ে মজাবে!

কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, কেমন ক'রে জানলে?

আমি জানিনি? অত বড় সয়তান—

বলিতে বলিতে পুরোহিতের ঠোঁটদুখানি যেন কৃপণের দরজার মত বন্ধ হইয়া গেল। কর্ত্তা বলিলেন, বলতে বলতে থামলে কেন? বল না!

পুরোহিত নিরুত্তর। কৌতূহল কর্ত্তাকে অতিশয় তাড়না করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাকে চাপিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুঝেছি।

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি বুঝেছ?

বোঝা গেছে। নইলে বলছ না কেন?

সে, মশাই, পুরানো কাসুন্দি! ঘেঁটে কোন লাভ নেই।

খামকা মিথ্যে এক জনকে সয়তান ব'লে লাভ আছে?

পুরোহিত আরও রাগিয়া বলিলেন, খামকা! মিথ্যে? ওকেই জিজ্ঞাসা কর না।

নসীরাম তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কোন কথা বলব না। উনি আমার গুরু। পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করেছি।

আহা হা! গুরুর মান ত কেমন রেখেছ! মশাই, আমি তখন নর্থ সুবার্বন্ ইস্কুলে পণ্ডিতি করি। ঐ সয়তান সেখানে পড়ত।

তা'র পর?

তা'র পর আর কি? কাযে ইস্তফা দিতে হ'ল।

কেন, কি হ'ল?

হবে আবার কি! ক্লাসে এক দিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

নসী বলিল, এক দিন নয়, পণ্ডিতমশাই! রোজই নাক ডাকত।

রোজই ডাকত? কাকে ডাকত রে বেটা?

যম জানে!

শুনলে মশাই? বেটা বলে, যমকে ডাকত। ডাকত ডাকত! তুই সয়তান আমার টিকিতে—

পুরোহিত আবার চুপ করিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, তা'র পর?

আমি, মশাই, নিরীহ লোক। কিছুই জানিনি। চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঐ সয়তান একটা রবারের বেলুন কিনে এনে একেবারে টিকিতে বেঁধে দিলে? হা-হা-হা! ভারি হাসির কথা হয়েছে—না?

কর্ত্তা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, বল কি?

হাঁ, মশাই! ছেলেদের হাতে দেখেছেন ত? সে হতভাগা বেলুনগুলো উঁচু হয়ে হাওয়ায় ভাসে। কিছুতেই ঝোলে না। আমার টিকিও যে, মশাই, তার সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠেছে, তা কেমন ক'রে জানব, বলুন।

তুমি টেরও পেলে না?

পাব কেমন ক'রে, মশাই? সেগুলো হাওয়া-পোরা—শোলার চেয়েও হাল্কা।

তা বটে, তা বটে! তা'র পর?

ছেলেগুলো ত এক পায়, আর চায়।

তা চায় বৈ কি! খুব হাসতে লাগল বুঝি?

সে হাসি ব'লে হাসি! মশাই, যেন গুড়গুড় ক'রে মার্টিন কোম্পানীর রেল চলেছে? আমি যত বেত-হাতে ঘুরে-ফিরে তর্জ্জন গর্জ্জন করি, সেই লক্ষ্মীছাড়া বেলুনটা, বোধ করি, তত নড়েচড়ে ছেলেবেটারাও তত হাসে। শেষে হেডমাষ্টার পর্য্যন্ত ছুটে এসে-

সব বেত লাগালে?

হুঁ! বেত লাগাবে! হেসে পালাল। আমার আর সহ্য হ'ল না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এই

আগুন লেগে গেল আর কি! আমার মাথাটা যেন আময়দা মাঠ, বেটা ফূর্ত্তির হাওয়া পেয়ে নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

বল কি?

হাঁ মশাই! সে যত নাচে, পথের লোকগুলোও তত হাসে। মুটে ঝাঁকা নামিয়ে হাসে। দোকানী দোকান ফেলে পাছু পাছু আসে। বাসায় উঠানে গিয়ে দাঁড়াতেই ব্রাহ্মণী ছুটে গিয়ে ঘরের কপাট এঁটে দিলে। অনেক সাধ্য-সাধনায় বেরিয়ে এল—একেবারে কাঁচি হাতে ক'রে।

তা'র পর?

তা'র পর আমাকে সেই উঠানে বসিয়ে—কচাৎ! আমি জিজ্ঞাসলাম, কাট্‌লি কি? বললে, ঐ দেখ। চেয়ে দেখি, আমার শিখার গোছা নিয়ে বেলুনটা আকাশে উঠে চোঁচা দৌড় মারছে। ভারি রাগ হ'ল। বল্‌লাম, বেলুনের সূতটা কাট্‌লেই হ'ত, টিকি কাট্‌লি কেন? বল্‌লে, ওটাকে যদি তুমি ফের গজাও, আমি গলায় দড়ি দেব। টোলের এক স্মার্ত্ত বল্‌লেন, ব্রাহ্মণ-সন্তান, শিখাচ্ছেদন!

তুমি কি বল্‌লে?

বল্‌লাম, তোমার মুণ্ডচ্ছেদন কর্‌তে পারলে আরও সুখী হতাম।

বেশ বলেছ!

বললে হবে কি, মশাই! রাস্তায় বের হলেই ছেলে-গুলো বলে, বেলুন! সব ঐ সয়তানের কাণ্ড! লোক দেখতে পাইনি, চারদিকে আওয়াজ শুনি, বেলুন। দুই প্রহর রাতে দরজায় ধাক্কা মেরে বলে—বেলুন। শেষ বাস উঠিয়ে এলাম!

নসীরামকে কিছু বল্‌লে না?

বল্‌লাম বৈ কি! বাবা, আমার পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি কর, এ কথা আর কল্‌কাতায় প্রকাশ করবে না।

প্রকাশ করেছি, পণ্ডিত মশাই? ধর্ম্মকথা ক'য়ো।

পুরোহিত নিরুত্তরে উঠিলেন।

সে সব কথা এখনও মনে ক'রে রেখেছ, পন্‌শাই? বলিয়া নসীরাম তাঁ'র পায়ের কাছে পাঁচটি টাকা রাখিয়া ভক্তিভরে পায়ের ধূলা লইল।

তোর টাকার আমি—

সে কি, পন্‌শাই! টাকা যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ টাকা কয়টি মাথায় ঠেকাইয়া ট্যাঁকে গুঁজিলেন।

গোঁফ বলিল, টাকা শুধু ট্যাঁকে গুঁজলে হবে না, ঠাকুর! ভাল ক'রে সস্তেন্ কোরো।

নসীরাম জিজ্ঞাসিল, কিসের?

নাক বলিল, কৌন্‌সিলার হবার জন্যে।

নসী বলিল, শুধু কাউন্সিলার নয়, পন্‌শাই! আয়েন্দা সনে কর্ত্তা যাতে কল্‌কেতার মেয়র হ'তে পারেন, তা'র জন্যেও দুটো তুলসী দিয়ো।

পুরোহিত জিজ্ঞাসিলেন, মায়র আবার কি?

ম্যাও ধরবার লোক, গো! কলকাতায় সব আছে, কেবল ম্যাও ধরবার কেউ নেই।

কর্ত্তা কহিলেন, বেশী হাঙ্গাম্ বাধিয়ো না, নসীরাম! আমাকে তোমরা ধ'রে-ক'রে দাঁড় করিয়েছ! আবার নিধি-রামও ক্ষেপেছে।

সার, দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে! কে যে কখন ক্ষ্যাপে, কিছুই বোঝা যায় না।

দাঁত প্রশ্ন করিল, সম্বন্ধীবাবুও দাঁড়িয়েছেন না কি?

দাঁড়াবেন না! এ কি যে-সে নিধিরাম! সদারামের সম্বন্ধী নিধিরাম। রামে রাম! চার-চারটে পাশ! তা'র ওপর উকীল! একেবারে পাতরে পাঁচ কীল! বাকী কেবল গোঁজামিল!

অর্থাৎ?

অর্থাৎ একটি বৌ।

কর্ত্তা বলিলেন, সে ত তোমারই হাত হে! মেয়েটা তোমার কথা শোনে। রাজি ক'রে ফেল না। তা হ'লে ইলেক্‌সনের আগেই তাক্-তাকসিন বাজিয়ে দি।

সেটি হবার যো নেই, সার, মেয়েটা বেজায় ধড়ীবাজ। বলে, বিয়ে ত আমায় করতে চায় না, আমার বিষয়কে দেখি কি না, আমিও বাজিয়ে নেব দেখাই যাক না, কার কেমন যোগ্যতা। ইলেক্‌সনে সিলেক্‌সন্ হবে।

কর্ত্তা একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, নিধির বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছে, সে ছোক্‌রাও

আজ্ঞে হাঁ! সে ছোক্‌রাও—

ক্ষেপেছে?

ক্ষেপেছে।

ঐ মেয়েকে বে করবার জন্য?

আর কাউকে নয়। ঐ মেয়েকে!

কেন বল দিকি?

ঐ মেয়েই দু'জনকে ক্ষেপিয়েছে।

তা'র কমিশনার বে করবার সখ বুঝি?

না, সার, তা নয়! ঐ ছোক্‌রা মেয়েটার খেলুনী ছিল। আমার ভায়া মেয়েটির এগজিকিউটার কি না! তিনি দেখ্‌লেন, বিপদ! বল্‌লেন, এক জন কমিশনারি করতে করতে স্বর্গে গিয়েছে—তার যায়গায় সে গিয়ে বস্‌বে—এ কালে ত আর রাজা নেই—এগজিকিউটার মশায় তাকে দেবেন—অর্দ্ধেক রাজকন্যা আর এক বাজত্বি।

তা হ'লে?

ইলেক্‌সনে যেমন ফলে!

তা হ'লে ত আড়ে হাতে লাগ্‌তে হচ্ছে।

নাক, দাঁত, গোঁফ সমস্বরে ঐকতান বাদন করিল, নিশ্চয় হচ্ছে।

ওহে, নিশ্চয় নয়—আদাজল খেয়ে লেগে যাও! আমার দেরি আছে। এটা হাল্‌ফিল্! তোমরাই আমার ভরসা। বুঝ্‌ছ ত? বিদুষী মেয়ে—কন্যাবহ। তা'র উপর অগাধ বিষয়।

এই সময় বৈঠকখানার বাহিরে একটা সোর-গোল উঠিল—দেখিস, যেন পড়ে না। বাতাস দে! আহা, বাছা রে! পরক্ষণেই তাগা, বালা, হেঁসোহার-পরা—তাতে একপল মাদুলি ঝোলানো,—একটি বছর আষ্টেকের ছেলে ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল, ভোলা দা! আমি দু-দু খাব না, বোতু খাব!

ভৈরব বলিল, শুনুন, একবার কথা! এখনও দুদে দাঁত ভাঙ্গে নি, এরই মধ্যে বল্‌ছে—ভোট খাব!

ভৈরবের গ্রহ! কথা কহিতেই বালক বলিল, বৈলব, ভোল্ গোঁপ ধলে ধুল্‌বো!

ভৈরব খোকাকে চিনিত। একবার বায়না নিলে আর রক্ষা নাই! কষ্টে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, আরে খোকাবাবু, ঝুল্‌বে বৈ কি! আগে দুদু খাও!

খোকা বলিল, না, আগে ধুল্‌বো!

ভৈরবের লাঞ্ছিত গোঁফ পরিত্রাহি ডাকিতেছে, ইতিমধ্যে খোকাবাবুর দৃষ্টি পড়িল নাকের উপর। ভৈরবের গোঁফ ছাড়িয়া বলিল, ভোল্ নাক্‌তা দে, বাঁশি বাদাবো!

নাকের উপর টানাটানি জুলুম দেখিয়া দাঁত অনেক করিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু খোকাবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। বলিল, আমি বাঁশি বাদাব না। ভল্ দাঁত ভান্‌বো!

নসীরাম বলিল, সার, খোকা আপনার নাম রাখ্‌বে! বাপকি বেটা, সিপাই কি ঘোড়া!

খোকা বলিল, আমি দাঁত ভান্‌বো না, গোলা তোল্‌বো! বৈলব, তুই গোলা হ!

অগত্যা ভৈরবকে ঘোড়া হইতে হইল। খোকা তাহার পিঠের উপর সওয়ার হইয়া বলিল, তগাবগ্ তগাবগ্! লাথ কৈ? বৈলব, তুই মুখ তোল্, গোঁপ ধলে গোলা হাঁকাবো!

ভৈরব ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কর্ত্তা ধমক দিয়া বলিলেন, আহা, তোল না ঘাড়টা! ছেলে বায়না নিয়েছে! গোঁফ নিয়ে কি স্বর্গে যাবে?

খোকা বলিল, আমি গোলা তোলে থগ্‌গে দাবো! তগাবগ, তগাবগ্! গোপ, এক্‌তা পিপ্‌তি আনি!

খোকা চিপটি আনিতে ছুটিল। ইতিমধ্যে কয়জনেই অন্তর্ধান করিল। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, বুঝ্‌লে নসীরাম, ছেলেবেলা আমিও অমনি আমুদে ছিলুম!

নসী বলিল, নইলে, সার, এত সব থাক্‌তে কাউন্সিলার হবার জন্যে লোক আপনাকে এত সাধাসাধি কর্‌ছে কেন?

সে তাদের অনুগ্রহ। এখন নিধিরামের উপায় কি?

ভাবনা কি, সার? কোন্ সম্বন্ধী কর্ত্তার সম্বন্ধীকে ভোট দেবে না?

ওহে, সে দিন আর নেই!

সার, এত বয়স হ'ল, দিনকে ত থাক্‌তে কখন দেখ্‌লুম না। ওটার স্বভাবই ঐ, আসে আর চ'লে যায়।

তা ত যায়। তা'র সঙ্গে মেয়েটাও না হাতছাড়া হয়ে যায়।

ভয় কি? তার এগজিকিউটার পয়সার পক্ষ।

সেও ত তোমার দাদা, কে! সে ছোঁড়ার কিছু আছে-টাছে?

কাণা-কড়ি না। কিন্তু ছোঁড়ার আস্পর্দ্ধা দেখুন, সার! নাম দিয়েছে ধনপতি!

কাণাকড়ি নেই। তবে পড়বে কিসের জোরে?

শিংএর জোরে।

তা'র মানে? কটা পাস্?

সার, সেনেট হলে ঢুকে সেই যে চিৎপাৎ হয়ে পড়ল, আর পাস ফিরতে পারলে না।

তবে?

তবে আর কি? ভেতরের খড়-মাটী রংচং দিয়ে ঢেকে রাখে।

তা'র মানে? বেজায় বাবু বুঝি?

বাবু ব'লে বাবু? সিকি পয়সার মুরদ নেই; বেটাচ্ছেলে, সার, মোজা পরে, তাও দুপায়ে!

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, মোজা আবার কে এক পায় প'রে থাকে! দেখ, নসীরাম, ঠাট্টা করতে করতে যেন সত্যি দরে মজিয়ো না। তুমি সব পার! তোমার ত চক্ষুলজ্জা নেই।

সে কি, সার! বিলিতি বেগুনের মত চক্ষু আমার চব্বিশ ঘণ্টা লজ্জায় লাল হয়েই রয়েছে।

২

সে সেকালের কথা। এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেন, সবকা বিচমে একঠো আওরাৎ হ্যায়। এ আখ্যায়িকার মূলে যে আওরাৎ আছেন, তাঁ'র নাম—মিস্ বিউটী-বিজলী। মেয়েটির বাপ ছিলেন স্বভাবে—সাহেব, মা হিন্দু। কোষ্ঠীতে কন্যার নামের আদ্যক্ষর উঠিল বি। মা বলিলেন, খুকীর নাম হবে বিজলী। বাপ বলিলেন, ছোঃ! নাম হবে বিউটী। এই দ্বন্দ্বের ফলে সমাস হইল—বিউটী-বিজলী। এখন সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই, আছে কেবল নাম। সে মাতা-পিতা গত। কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে নামে। এখনও যে এই নাম লইয়া বিবাদ ঘুচিয়াছে, তাহা বলা যায় না।' মেয়েটির অছি ডাকেন—বিউটী। তাঁহার সহোদর নসীরাম বলে, অছি, না, ছি ছি! বিজলী! আমি হয় বলব জলি, নয় বিলী। ইচ্ছে হ'লে বিল্লীও বলব।

আজ সকালবেলা চা-পানের পর আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। বিউটী বলিল, লজ্জার কথা! খাতিরে ভোট! এ কি—এ কি—এ কি—

হারপি, ওরফে হরিপ্রিয়া, জোগান দিল, সন্দেশ খাওয়া! যে দশটা খেয়েছি, তা'র ওপর আর গোটাকয়েক না হয় উপরোধে গিললুম! কি বল, রাঙা-দি?

রাঙ্গা-দিদি ছোট কথা বড় কানে তুলেন না। সকল কথাতেই সায় দেন! এ জন্যও বটে, আর কতকটা তাঁহার প্রৌঢ়ত্বের অধিকারেও বটে, সকল বিষয়েই তাঁহাকে মধ্যস্থ মানা হয়। রাঙ্গা-দিদি বলিলেন, নিশ্চয়।

মিস্ সরসী বলিল, কিন্তু তোমাদের অন্নরত্ন-পিসী যে মহিলামহলে বড় উৎপাত বাধিয়েছেন। কাউকে নিশ্চিন্তে খাবার শোবার অবসর দেন না। সদারাম-নিধিরামের জন্য যে রকম ক'রে বাড়ী বাড়ী ভোট সেধে বেড়াচ্ছেন, বারোয়ারির চাঁদা-সাধারও তত উৎসাহ দেখা যায় না। ফ্র্যানচাইজ্ পেয়ে ত ট্যাকা ছক্কর হ'ল, দেখ্ছি!

মিস শরৎশশী বলিল, তা হক! ভোট দেবার যে অধিকার আমরা পেয়েছি, তা'র সদ্ব্যবহার করতে হবে। বড়লোক বলেই ভোট দেব? গুণ চাই। কি বল, রাঙা দি! খালি টাকাকড়ি ঘরবাড়ী—ছাই, ছাই!

রাঙ্গা-দিদি বলিলেন, বল কি! চচ্চড়িতে বড়ী চাই বৈ কি!

সরসী বলিল, কি বোঝাচ্ছে, জানো? মানীর মান!

শশী বলিল, এখানে মানী মানে টাকা! অর্থাৎ মানিড-ম্যান্। কি বল, রাঙা-দি! মানীর মান নয়, গুণের আদর! কোয়ালিটী!

রাঙ্গা-দিদি কহিলেন, হাঁ! হনুমান্, বাঁদর—বেগুন, কলা সবাই খায়!

এই সময় নিধিরাম সহ এগ্‌জিকিউটার মহাশয় আসরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, বিউটী, মিষ্টার নিধিরাম এসেছেন, তোমার ভোট ভিক্ষা করতে!

আসুন, আসুন, বসুন, বলিয়া সকলের অভ্যর্থনা এবং নিধিরামের আসন গ্রহণ।

শরৎশশী প্রশ্ন করিল, মহিলাদের ভোট দেবার অধিকার সম্বন্ধে আপনার কি মত?

সে সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত প্রকাণ্ড মত। আমাদিগের অশিক্ষিত অর্ব্বাচীনগণ বলিয়া থাকেন যে, মহিলাগণের অধিকার সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত; কেন না, অতি বিশাল পুরাকাল হইতে নারীত্বের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু, বিশ্বাস করুন! আমি উকীল, আইন আদালতে বিশেষজ্ঞ। আমি সকল দেশের সকল আইন তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, সময়ের অজুহাতে নারীর নারীত্ব কখন বার্ বাই-লিমিটেশন্ কি না 'অধিকার-বঞ্চিত' অর্থাৎ তামাদি হয় না! বন্ধকী কোবালা, অথবা যে ঋণ, মনুষ্য ধর্ম্মতঃ শোধ করিতে বাধ্য, তিন বৎসর অতীত হইলে তাহাও অমনি নিষ্ফল হইয়া যায়। এমন কি, পিতৃ-ঋণ ও মাতৃ-ঋণের একটা সীমা আছে। নারীর নারীত্ব! সে অতি পবিত্র, বিচিত্র।

সরসী বলিল, আপনি অতি চমৎকার বল্‌তে পারেন ত! মিউনিসিপালিটীতে এ রকম বক্তৃতা করতে পারলে আপনার জয় জয়কার হবে। আপনিই কমিশনার হবার যোগ্য।

আমি চলিত ভাষাতেও কথা-বার্ত্তা বল্‌তে পারি এবং বলি। তবে সে যেরো লোকের সঙ্গে। উন্নতা মহিলা-সমাজে নয়। মহিলাগণের উপর আমার বিশেষ প্রীতি আছে। বলিয়া বিউটী-বিজলীর উপর সানুনয় সকাতর কটাক্ষপাত।

শশী প্রশ্ন করিল, কিন্তু মহিলাদের সম্বন্ধে কি আপনার সত্য এই মত?

কতকটা।

বিউটী জিজ্ঞাসিল, কতকটা কি রকম?

আপনার প্রশ্নে আমি দগ্ধ হলুম। কতকটা কেমন জানেন? অবস্থান্তর হ'লে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। নারী যখন কুমারী, তখন তিনি স্বেচ্ছাচারী; যখন বিবাহিতা, তখন তাঁর অধিকার স্বভাবতই কিঞ্চিৎ গণ্ডীকৃতা অর্থাৎ তখন যে ঘর-সংসার ফেলে সাফ্রেগেটের মতন ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াবে, সেটা আমি একেবারেই পছন্দ করিনি।

বিউটী বলিল, তা হ'লে ত নারীদের ঘর-সংসার করাই উচিত নয়।

আতঙ্কে নিধিরামের বুক ধুক্-ধুক্ করিতে লাগিল। বলিল, এমন কথা আমি মুখেও আন্‌ব না। কি জানেন, আমরা দীপ। আপনারা ওয়াকেন, আমরা জ্বল্‌ব, এই হচ্ছে স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

শশী বলিল, কেন, আমাদের কি জ্বলতে নাই?

কে বলে নাই! তবে, একেবারে জ্বলে যাওয়া ভাল নয়। তা হ'লে কেবল ছাইটুকু বাকী থাক্‌বে—

আর সে ছাই পড়বে আপনাদের বাড়া ভাতে বলিয়া শশী প্রকাণ্ড একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

এগ্‌জিকিউটার দেখিলেন, বড় বিপদ উপস্থিত। বলিলেন, না হে, নিধিরাম, তোমার মত ও নয়। যে জ্বলতে চায়, তাকে জ্বলতে দাও। নইলে বেজায় জ্বালাবে। ওদের তুমি জান না; যতক্ষণ বাইরে জ্বলে, ততক্ষণই মঙ্গল। ঘরে জ্বল্‌লে রক্ষে আছে! আগুন লাগাবে। কটা তার সাম্‌লাবে বল? থিয়েটার, বায়স্কোপ, রেস, ব্রাস্‌লেট্, নেকলেস জ্বালার একশেষ ক'রে তুলবে। ও কেন তোমার সওয়াকার মত হ'তে যাবে?

নিধিরাম হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, ঠিক, ঠিক, আপনি ঠিক বলেছেন! কি জানেন, আমরা উকীল। আমাদের কোন নিজস্ব মত নেই। দরকার হলেই বদলাতে পারি। মক্কেল আমাদের আক্কেল। এ ক্ষেত্রে তাই প্রয়োজন। আমি আপনাদের প্রতিনিধি বৈ ত নই।

সমস্বরে মহিলাগণ বলিলেন, তা যদি হয়, তা বটে, তা বটে!

সেন্সিবল্! বুদ্ধিমানের কথা! নিধিরাম, যে জন্যে এসেছ, এইবার প্রস্তাব কর।

দেখুন, আমি একটা ছোট ম্যানিফেষ্টো লিখেছি। পোষ্ট কার্ডে ছাপিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করতে চাই। তাতে সই করতে হবে আপনাকে, আর আমার ভগ্নীপতি সদারাম বাবুকে। অবশ্য আপনি যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন ঐ ঘোষণাপত্রে সেই কথা সাধারণকে বল্‌বেন।

বিউটী জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখা হবে?

এগ্‌জিকিউটার বলিলেন, দাও না হে! দেখতে দাও না। এনেছ ত?

এনেছি বৈ কি! বলিয়া নিধিরাম এগ্‌জিকিউটার মহাশয়ের হাতে একখানি ভাঁজ করা কাগজ দিল।

এগ্‌জিকিউট্যর সে ভাঁজ না খুলিয়াই রাঙ্গা-দিদির হাতে দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন পড় ত, রাঙা-দি! সবাই শুনুন!

রাঙ্গা-দিদি চশমা নহিলে ভাল দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু লোকের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন। উঠিয়া ভাঁজ খুলিয়া পড়িলেন, সস্তার কচুরি।

নিধিরাম বলিয়া উঠিল, ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে।

রাঙ্গা-দিদি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—সস্তার নয়, খাস্তার।

নিধিরাম এগ্‌জিকিউটারের কানে কানে ফিস্ ফিস করিয়া বলিল, মশাই, ওটা পোলিংডেতে ভোটারদের খাওয়াবার ফর্দ্দ। যেমন যেমন মনে হয়েছে, টুকে রেখেছি। চাকর বেটা কোন্‌টা দিতে কোন্‌টা দিয়েছে। ওটা প'ড়ে কায নেই। ফিরে নিন্।

ফিরাইয়া দিবার জন্য এগ্‌জিকিউটার রাঙ্গা-দিদিকে ইসারা করিলেন। রাঙ্গা-দিদি বুঝিলেন, আরও চেঁচাইয়া পড়িতে হইবে। তিনি আর এক পর্দ্দা স্বর তুলিলেন, খাস্তার কচুরি।

পুনশ্চ ইঙ্গিতে আরও এক গ্রাম উঠিল—খাস্তার কচুরি।

আবার ইসারা দেখিয়া অবশেষে বলিলেন, আর আমি চেঁচাতে পারিনি, যাঃ। তা'র পর শোন—শিংনাড়া, কিন্তু খাস্তার কি না, লিখা নেই।

নিধিরাম বলিল, কি আপদ! শিংনাড়া নয়—শিঙ্গাড়া। ফর্দ্দটা ফিরিয়ে নিন্ না।

এগ্‌জিকিউটার বলিলেন, না দিলে করি কি! স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি হাত-কাড়াকাড়ি করা যায়?

রাঙ্গা-দিদি পড়িলেন, তার পর—জাব।

নিধিরাম বলিল, কি মুস্কিল! জাব নয় ডাব। জাব খাবে কি? ইলেক্‌টাররা কি—

রাঙ্গা-দিদি আবার আওয়াজ ছাড়িলেন—খোল্!

এবার আর নিধিরামের ধৈর্য্য রহিল না। মহিলার সম্মান ভুলিয়া, খোল নয়—ঘোল, বলিয়া রাঙ্গা-দিদির হাত হইতে ফর্দ্দ ছিনাইয়া লইলেন—কিন্তু আধখানা মাত্র বাকীটা রাঙ্গা-দিদির হাতে রহিয়া গেল।

বিউটী প্রশ্ন করিল, আপনার ঘোষণাতে কি লিখা থাক্‌বে?

বেশী কথা নয়। দু' একটা কায যা করবার ইচ্ছে আছে, তারই উল্লেখ থাক্‌বে।

কি কায?

এই ধরুন, আমার প্রথম কায হবে, ভিখিরীদের ওপর একটা লাইসেন্স বসাবার চেষ্টা।

বিস্ফারিত চক্ষে বিউটী প্রশ্ন করিল, বলেন কি, মিষ্টার নিধিরাম?

কেন? আপনিই কি তা বলেন না? শুধু লাইসেন্স নয়, এমন লাইসেন্স বসাতে হবে, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হয়।

বলেন কি! ভিক্ষা যে ভাল, আমি তা বলি না। মানুষকে অত হীন আর কিছুতে করে না; কিন্তু, তবু এই অন্নকষ্টের দিনে ভিক্ষা বন্ধ?

কল্‌কাতায় ভিখারীর সংখ্যা কত বেড়েছে জানেন?

জানি। যেখানে রোজগার বেশী, সেইখানেই ভিখারী বেশী। নইলে কোথা যাবে?

খেটে খাক্ না!

কোন দিন তাদের কোন কায দিয়েছেন? খেটে খেতে পারে, এমন কোন উপায় করেছেন? তা ক'রে তবে কথা কইবেন। নইলে হঠাৎ ভিক্ষা বন্ধ হ'লে চুরি-ডাকাতি আরও বাড়বে। আগে তাদের মানুষ হ'তে শেখান, অবস্থার উন্নতি হয়, এমন উপায় ক'রে দিন, তবে ত? তা ছাড়া কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর এদের কি উপায় হবে?

ওরা মরুক। ম'লেই সমাজের মঙ্গল। যে অন্ন পরিশ্রমীর প্রাপ্য, সেই অন্ন কুড়েয় ধ্বংস করে, এ কি কম আপশোষ! আবার বলে অন্নকষ্ট! দেশের অন্ন—ভিক্ষা দিয়ে বরবাদ করলে, অন্নকষ্ট হবে না? আমি বলি, যারা ভিক্ষা দেয়, তাদের ওপরও টেক্স বসা উচিত। তারা দেশের শত্রু। খাটুনীর পথ বন্ধ কচ্ছে।

কেবল খাটুনীতেই কি এই বিধি-বিড়ম্বিত দেশের অন্ন-সমস্যা মিটবে?

দেখুন, ঐ কথাটা আমি বুঝিনি। অন্নসমস্যা ত এ পর্য্যন্ত চোখে দেখতে পেলুম না।

আমাকে মাপ করবেন, মিষ্টার—মিষ্টার—

নিধিরাম।

আচ্ছা, বেশ! মিষ্টার নিধিরাম! সদারাম, বাবুর কৃপায় অন্ন-সমস্যা আপনি দেখবেন কি ক'রে? কিন্তু কখন

অনুসন্ধান করেছেন কি, এ দেশে শতকরা নব্বই জন লোক ভাল ক'রে খেতে পায় না ? দুধ-ঘি ত স্বপ্নরাজ্যের কথা, শাক-ভাত—তাও পেট ভ'রে জোটে না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দিন দিন ক্ষীণ, শরীর দুর্ব্বল হয়ে এ হতভাগা জাতি স্থির-ধীরপদে ধ্বংসের মুখে চলেছে। জানেন কি, এ দেশের বাপ-মা ছেলে-মেয়ের অকালমৃত্যুর জন্য দু'দিন প্রাণ ভ'রে কাঁদতেও পায় না ?

নিধিরাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন ?

কেন ? শোকের অবসর পায় না। যারা বেঁচে আছে, তাদের মুখে কি দেবে, সেই চিন্তায়। জানেন কি, ছেলে যখন আধপেটা খেয়ে আর দুটি ভাতের জন্য মায়ের মুখপানে চায়, সাহস ক'রে বল্‌তে পারে না, তখন মা'র প্রাণে কি হয় ? এ চিত্র দেখে পাতরের অন্নপূর্ণাও ঘেমে ওঠে।

বিজলীর দুই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাবাস, মা লক্ষ্মী, সাবাস ! বলিতে বলিতে নসীরাম আসিয়া একখানা চেয়ারে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর বলিল, সাবাস ! যারা দু' হাতে বেঁধে দশ হাতে বিলোয়, তারা নইলে এ দুঃখ-কষ্ট বুঝবে কে ! আমাদের মা চাই ! মাটীর মা নয়, জীয়ন্ত মা ! ছিন্নমস্তা হয়ে আপনার রক্ত সন্তানকে পান করাবে। সভা-সমিতির মা নয়, সত্যিকার মা, সাক্ষাৎ মা ! যে ক্ষুধায় অন্ন দেবে, দুঃখে সান্ত্বনা। যে অন্যায়ে বাধা দেবে, সৎকর্ম্মে প্রেরণা। যে বাহুতে দেবে বল, বুকে সাহস পায় দেবে দাঁড়াবার শক্তি, মনে আত্মনির্ভর। যে প্রাণে দেবে সহিষ্ণুতা, কানে দেবে গুরুমন্ত্র—তোরা মানুষ।

কেন, আমরা কি মানুষ নই ?

না, তোমরা ফানুস !

আমরা ফানুষ ?

হাঁ, অন্তঃসার-শূন্য !

দেখুন, মিষ্টার নসীরাম !

খবরদার বেটা ! বাবু বল !

আচ্ছা নসীরাম বাবু ! আমি ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে চাই—

পারবে ? পারবে ? তা হ'লে বল্‌ব, তুমি বাপের বেটা ! তোমাকে কাঁধে ক'রে নাচ্‌ব—যদি না প'ড়ে যাই ! চরবে ! থ্রী চিয়ার্স ফর্ নিধিরাম ! সমুদ্ধী অফ্ সদারাম ! বাবা, ভিখিরীতে দেশ ছেয়ে ফেলেছে ! কেউ ভিক্ষা করছেন মান, কেউ স্থান, কেউ টাকা, কেউ প্রতিষ্ঠা, কেউ ভোট !

ও আবার কি কথা ! এ সব কি ভিক্ষা না কি ?

তবে কি, বাবা, যারা কেবল দুটো ভাতের কাঙ্গাল, তারাই ভিখিরী ? তা নয়, সোনারচাঁদ ! আমরা জাত-ভিখিরী ! খালি দেহি-দেহি ! দেহি মে বক্তৃতায় কানং, দেহি মে মানং, দেহি মে অন্নং, দেহি মে বস্ত্রং, দেহি মে আসনং, দেহি মে শাসনং, দেহি মে কার্য্যং, দেহি মে রাজ্যং ! ভিখারী আওয়াজ ছাড়ছে—দেহি দেহি। দাতা মনে মনে হাস্‌ছে আর ঘাড় নাড়ছে, নেহি-নেহি, আভি নেহি ! একটু সবুর কর ! আয় চাঁদ বায় দিয়ে ! সোনার নূপুর পায় দিয়ে। নাচ শিখলে চুড়ো দোব ! হাঁ করলে গুঁড়ো দোব ! মাছ কুট্‌লে মুড়ো দোব, ধান ভানলে কুঁড়ো দোব, বুড়ো হ'লে খুড়ো দোব, কিন্তু খুড়ো যদি ল্যাজ নাড়ো, তা হ'লে হুড়ো দোব।

আপনি স্বরাজও চান্ না নাকি ?

নিমে দস্তুর ভাষায় একটা প্রশ্ন করি, তিনি হ'ন কে ?

কি ? স্বরাজ ? স্বরাজ—স্বরাজ—

বুঝেছি, বাবা ! জান না বস্তুটা কি। শুনেছিলাম, চরণামৃত, না জানি সে কি অমৃত, খেয়ে দেখি না একটুখানি জল ! তোমার স্বরাজ যদি দরাজ খানা হয়, তা হ'লে রাজি আছি, খুব চাই। মিউনিসিপ্যালিটীতে ঢোকবার চেষ্টা করছ, বাবা, এই উপকারটা কর। যত ড্রেণ করেছে, বুজিয়ে আবার সহরময় বড় বড় খানা কেটে দাও।

তাতে কি হবে ?

খানায় প'ড়ে নিরিবিলি দু'দণ্ড আরাম করি, আর কি ?

নসীবাবু, আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি মিউনিসিপ্যালিটীর এক জন ভক্ত।

কেন, বাবা ! বাড়ী ভেঙ্গে উদবাস্ত ক'রে রাস্তা বা'র করছে ব'লে ? স্বায়ত্ত-শাসন করায়ত্ত ক'রে সবাইকে, ফাঁদে ফেলেছে ব'লে ? আমার পয়সায় লোক রেখেছে, আমার কান মলবে ব'লে ? ড্রেণ ভ'রে মশা পয়দা ক'রে, মারবার তরে কামান পাতছে ব'লে ? জল খরচের মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য মিটার বসিয়েছে ব'লে ? ওঃ, বেটা কি

বদমায়েস ; এক কোণে গুড়ি-শুড়ি মেরে ব'সে থাকে যেন কত ভালমানুষটি। কিন্তু সব্বক্ষীর পেটে পেটে একেবারে গ্যালন গ্যালন সয়তানি!

তা হ'ক। আপনি স্বীকার করেছেন, আমার পক্ষ নেবেন।

তুমি ঐ কলের জলের মিতারের মতই মিথ্যাবাদী আমার কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, কোন পক্ষই নেই!

নসীরাম বাবু, আপনার কি গাম্ভীর্য্য ব'লে কিছু নেই? সবই মস্করা!

মস্করা করছি আমি, না তোমরা? বাবা, নিছক নক্সা চালিয়েছ, একটু হাসব না?

৩

নসীরাম ডাকিল, আয়রত্ন-পিসি!

রান্নাঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসিল, কে? ভাই-পো?

হাঁ দিদি!

মুখে আগুন! সকালবেলা মুখ পুড়িয়ে এসেছে!

আগে দেখ, কি এনেছি! তার পর গাল দিয়ো।

ব্রাহ্মণী বাহিরে আসিয়া শিহরিলেন, ও মা, এ যে পাটার মুড়ি! কি সর্ব্বনাশ!

সর্ব্বনাশ ব'লে সর্ব্বনাশ! সিঁদুরের কৌটা দিয়ে হাড় কাঠে ফেলে একেবারে ঘ্যাচাং ক'রে সর্ব্বনাশ! পনশাই মন্তর যা পড়লে, পিসি!

খাদয় খাদয়, ছেদয় ছেদয়,
কিলি কিলি চিকি চিকি
পিব পিব রুধিরং

আঃ, বললে না প্রত্যয় যাবে, ঠাকরুণ! সে কি মন্তর আওড়াতে পারে! অর্দ্ধেক ত ভুলেই গেল! বাদ্‌বাকী যেটুকু আবোল-তাবোল বেরুল, তা তোমায় বললুম!

আঁ! আমি বামুনের ঘরের বিধবা, তায় বোষ্টুমবংশের বৌ, আমার বাড়ী পাটার মুড়ি! মাংসাস্মোর আর যায়গা পাওনি!

আমার দোষ কি, ঠাকরুন! কর্ত্তা বললেন, নিয়ে যা! নিধিরামের জন্যে কালীপুজো হ'ল। যারা ভোট সাধ্‌ছে, বাজির পাটা তাদের বাড়ী বাড়ী বিলি হচ্ছে। কাউকে ছাল, কাউকে চামড়া, কাউকে ল্যাজ, কাউকে খুর, কাউকে শিং। হাড়, মাস, মেটুলি সব পড়েছে কর্ত্তার ভাগে—বৃহৎ গোষ্ঠী কি না!

গুষ্টীর পিণ্ডি দেওয়াচ্ছি! সাঁঝ নেই, সকাল নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই, ইষ্টিপুজো নেই, নিধের জন্যে ভোট সেধে বেড়াচ্ছি, আর আমাকে এই অপমান!

অপমান কি, আয়রত্ন-পিসি! তুমি সব্বার চেয়ে বেশী ক'রে করছ ব'লে, তোমার ভাগে মুড়ি!

কর্ত্তার কি ভীমরথি হয়েছে? যমের অরুচি ধরেছে?

কি যে বল, পিসি! যম কি বোষ্টুম, না, বামুনের ঘরের বিধবা যে, মুড়িতে অরুচি ধরবে? কার মুণ্ডু না খাচ্ছে বল! পিসি, অগ্নির মন্দাগ্নি হয় না, যমেরও অরুচি ধরে না।

মুখে আগুন যমের! তুই বল্ গে যা নসে! ভটচায্যি পাড়ার একটা ভোট যদি পায় ত, আমি বামুনের মেয়ে নই!

আচ্ছা, বোঝা যাবে, তুমি কেমন বাপের বেটী এখন এটার যা হয় বিহিত কর! তুমিই ত ব'লে বেড়াচ্ছ যে, মানীর মান রাখতে হয়। মুড়ির অপমান কোর না। না হয় গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নাও! কা'ল সকাল হলেই বাসীমড়া হবে।

তোর মুখে আগুন! তোর গঙ্গাজলের মুখে—

ব'লে যাও, পিসি, ব'লে যাও! আমাকে ত গিয়ে আবার কর্ত্তার কাছে সব বলতে হবে।

বল্ গে যা! আমি কি ভয় করি নাকি! আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা! বেরো আমার বাড়ী থেকে!

তা হ'লে মানীর মান রাখবে না?

রাখ্‌বো বৈ কি! ভাল ক'রে ভোট খাওয়াব। তুই বলিস গিয়ে

নসীরাম আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এ দিকে ভোট লইয়া মহা ঘোট, সহর সরগরম। তিন ভাগ ভোট বাধিয়াছে, নিধে নয়, ধনপতি আমাদের প্রতিনিধি। নাক, দাঁত, গোঁফ, পাড়া চষিতেছে, মাঝে মাঝে পানের দোকানে বসিতেছে, লেমনেডে গলা ভিজাইতেছে, আবার ছুটিতেছে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান

ইহাদের এক জনকে দেখিলেই, ঐ নাক আসছে ব'লে কষে বলদের লেজ মলে। ছক্কড়ের গাড়োয়ান ঐ গোঁফ আসছে ব'লে ভাড়া ফেলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে। ফেরিওয়ালা, ঐ দাঁত আসছে ব'লে তাড়াতাড়ি মাল গুটিয়ে নিয়ে ছুটে পালায়। সহরে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া এক দিন তিন জনে এককাট্টা হইয়া গঙ্গার ধারে উপস্থিত। অন্ততঃ আজ একটা ভোট যোগাড় না করিয়া কর্ত্তার কাছে মুখ দেখান দায়।

গঙ্গাতীরে আসিয়া ত্রিমূর্ত্তি দেখিল, কাশী মিত্রের শ্মশান পার্শ্বে বসিয়া নসীরাম মদ্যপান করিতে করিতে আপন মনে বিজ্‌বিজ্ করিয়া কি বকিতেছে। মূর্ত্তিত্রয় একটু অন্তরালে দাঁড়াইল। মাতাল বলিতেছে,,মা, শুনছ? না আপন মনে গান গেয়েই চলেছ? গুন্-গুন্-গুন্-গুন্ কল্-কল্-ছল্-ছল্ ও কি বল? ঐ একই কথা আজন্মকাল ব'লে আসছ, কেউ বুঝলে না—না? কিন্তু নসে-সয়তান বুঝেছে। চল-চল্-চল-চল্। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, চল-চল্-চল চল্! সব ভেসে যাচ্ছে! ভাসিয়ে নে যাচ্ছ! কিন্তু যে সত্য হিন্দু, সে তোমার ভাষা বোঝে! সে জানে, তুমি বহ্মবারি, তোমার স্পর্শে সকল জ্বালা শীতল হয়। কিন্তু, মা! আমার জ্বালা জুড়ুয় কৈ? সে দিন তোমার কূলে—সেই যে ঐ চিতায়—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব অনলে ঢেলে দিয়েছি, সে দিন থেকে যে আগুন বুকে জ্বেলেছি, তা ত আর নিবল না! তখন নূতন বয়স, নূতন সাথী। ওঃ, সে ভাব কত! মনে হ'ত, এক তিল না দেখলে বাঁচব না। কিন্তু আজ বিশ বছর কেটে গেল, বেশ ত বেঁচে আছি! মদ খেয়ে, সয়তানী ক'রে বেশ বেঁচে আছি, কৈ, এক দিনও ত মলুম না! কিন্তু সে গেল কোথা? তাকে দেখব ব'লে সেই থেকে আশায় আশায়, যে নিত্য এখানে এসে ব'সে থাকি, কৈ, এক দিনও ত দেখা পেলুম না! সে গেল কোথা! মরেছে? মরেছে? কখন না! মাটীর দেহ পুড়ে ছাই হয়েছে—পঞ্চভূত পঞ্চে মিশেছে! পঞ্চ নয়, অনেক ভূত! হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্ব্বন্—এক একটা তুর্দ্দান্ত ভূত! ভূতের মেলায় হর্ষ,শোক,আনন্দ,উচ্ছ্বাস—সব ভূতের খেলা! আবার কথা উঠেছে, তা নয়, সব পোকা! এই সাড়ে ছ'ফুট দেহ—রাশীকৃত পোকা! পোকার পর্ব্বত, পোকার প্রজাতন্ত্র, পোকার স্বরাজ! পোকায় পোকায় বকাবকি, ঠোকাঠুকি করছে! ভিতরে এক জন সাক্ষিগোপাল চুপ ক'রে ব'সে আছেন! তার পর এক দিন আসবে, চল্-চল্-চল্—তুমি সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কোথায় নিয়ে যাও? স্বর্গে? স্বর্গে কি মিউনিসিপ্যালিটী আছে? আছে বৈ কি! নইলে কমিশনার, কাউন্সিলর সব কি করবে! ঢেঁকি ত স্বর্গেও ধান ভানে! আমি যেমন বজ্জাতি ক'রে বেড়াই, তেমনি ঢেঁকির কায ধান ভানা। আমার সব কেড়ে নিয়েছ, কেবল বজ্জাতিটুকু রেখেছ। ঐটুকু তোমার জলে ভাসিয়ে দিয়ে, শেষ 'অন্তে-গঙ্গা নারায়ণ-ব্রহ্ম' ব'লে যাত্রা করব। কিন্তু, দোহাই, মা! মুন্সিপালের রাজত্বে আমি যেতে চাইনি! ওঃ, মরেও নিশ্চিন্দি নেই! এ দেখ না, তিন পোকা এসে দাঁড়িয়েছে, মড়ার ভোট আদায় করবে ব'লে না কি? ভয় কি, বাবা, আমি নসে পোকা! ও দিকে একদৃষ্টে কি দেখছ? ঐ মাল্লার চাপদাড়ি? বাবা গোঁফ! ঐ চাপদাড়িতে একটা টোপ ফেল! ছুটো একটা ভোট গাঁথলেও গাঁথতে পার!

এ দিকে মাল্লা তীরে আসিয়া ত্রিমূর্ত্তির নাক, দাঁত ও গোঁফের ঘটা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং আপনা হইতে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, আঃ! খোদা যারে দেন, তারে একেবারে আস্তিল ক'রে দেন!

ত্রিমূর্ত্তি ভাবিল, লোকটা তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া সটকাইবার চেষ্টায় আছে। তিন জনে তিন দিক দিয়া পাকড়াও। দাঁত প্রশ্ন করিল, তোর বোট (ভোট) আছে?

আছে না? হাজার-মুনে বোট! লুকায়ে চাপায়ে দেড় হাজারও লইতে পারা যায়। টোল আপিসে কিঞ্চিৎ পাণ খেতে দিলেই ব্যস!

গোঁফ বলিল, টোল্ নয়, মিয়া, পোল্!

নাক বলিল, আর আপিস নয়, ডে। পোলিং ডে। বেশ ত! যা পাণ খেতে দিতে হয়, দেওয়া যাবে। কি বল, হে? দেড় হাজার ভোট! কিন্তু এক জন ত একটার বেশী দিতে পারে না, শুনি।

আরে, তুমি আবার এই সময় তর্ক তুলছ। চাক্ষুষ দেখছ, স্বকর্ণে শুনছ! তবু কথা কচ্ছ? এ যদি হেড মাঝি হয়, আর এর অত লোক থাকে, তা হ'লে হ'ল না?

ঠিকই ত! এক এক জন কুলীর সর্দার আছে, তার তাঁবে যে দু'দশ হাজার ক'রে কুলী খাটে। ভাব দিকি, একটাকে বাগাতে পারলে কত যোগাড় হয়।

গোঁফ বলিল, কিন্তু, ভাই, এটায় আমরা তিন জনে লেগেছি, তিন জনের সমান বখরা—পাঁচ-শ' ক'রে। ওহে শোন! তোমাকে ভোট দিতে হবে নিধিরাম বাবুকে!

বেশ ত কর্ত্তা! বোটখানা একবার চক্ষে দেখেন! টৈ লি-লি করছে।

ভোট লি-লি কর্‌ছে কি? তুমি কি ভোটের কথা কইছ?

আপনারা কি বোট বল্‌ছেন?

আমরা বল্‌ছি, মুন্সিপালের ভোট।

আমি কইছি গদাই পালের গাধা বোট।

সম্মুখেই গঙ্গা। তিন জনেরই ইচ্ছা হইল,—ডুবিয়া মরিতে! কিন্তু কর্ত্তা তাহাতেও ছাড়িবেন না ভাবিয়া তিন জনে ছুটিয়া পলাইল।

নিধিরাম কর্ত্তাকে গিয়া বলিল, এদের কর্ম্ম নয়। যে রকম জোট বেঁধেছে, তা ভাঙতে বিলিতি ট্যাকটিক্স দরকার। দেশী চাল-চুলের কাজ নয়। যারা বিলেতে গিয়ে বিলিতি ইলেক্‌শন্ দেখেছে, তেমনি লোক চাই।

কর্ত্তা নিরুৎসাহ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, সে লোক কোথা পাব?

কা'ল আস্‌বে, কিন্তু অমনি হবে না।

তার মানে? পয়সা দিতে হবে? দূর শালা! বড়লোক কি কাকেও কিছু দেয়! শুধু লোভ দেখায়, আশা দেয়!

তাতে হবে না! এরা বিলেত-ফেরত!

গজেন্দ্রবাড়ীর ফেরত হোক না! ভাল, তোমার লোক ত আসুক!

কা'লই আস্‌বে।

কা'লও আসিল। লোকও আসিল। এক জন নয়, দুজন—হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, বুট সায় নেকটাই, ছড়ি, একেবারে সম্পূর্ণ সংস্করণ! এ আবার এক মুস্কিল! বাছিয়া লওয়া যায় কাকে? নিধিরামটা ভাল গোল বাধাইতে পারে! কিন্তু নিধিরামের তত দোষ নাই। লোকের জন্ত দুই বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিল—দুই নমুনা আসিয়াছে। পাছে ঠকিতে হয়, কর্ত্তা এই আশঙ্কায় উভয়কেই সসম্মানে চেয়ার দিয়া জেরা সুরু করিলেন, বিলেত যায়গা কেমন, বলুন!

যিনি সেখানে যাবার কল্পনা করেছিলেন, তিনি গদগদ হইয়া বলিলেন, চমৎকার!

যিনি যাইবার জন্ত কয়েক পা মাত্র বাড়াইয়াছিলেন, অর্থাৎ বোম্বাই অবধি, তিনি বলিলেন, স্বর্গ, স্বর্গ!

প্রথম ভাবিল, ইহার কাছে ঠকিয়া গেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, কিছুতেই ঠকা হইবে না।

দ্বিতীয় তাহার সাশ্রু দৃষ্টি দেখিয়া অনায়াসে অন্তরের ভাবটা বুঝিয়া লইল এবং মনে মনে একটু হাসিল।

কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, কি রকম স্বর্গ?

প্রথম বলিল, যেমন সোনার কাশী শোনেন নি? তেমনি আর কি?

দ্বিতীয় কহিল, একটু তফাৎ আছে। সোনার কাশী কেবল কানেই শোনা যায়। কিন্তু লণ্ডন- একেবারে গোল্ডেন্—সোনা দিয়ে গড়া!

কর্ত্তা। চোখে দেখা যায় নাকি?

১ম। চোখ থাক্‌লেই দেখা যায়।

২য়। সে কি! কে বলে এ কথা! সেথা গেলে অন্ধও দেখতে পায়!

নিধিরাম জিজ্ঞাসিল, সেখানকার আবহাওয়া কেমন?

১ম। গরমীর সময় গরম আর—

২য়। শীতের সময় ঠাণ্ডা।

প্রথম গম্ভীরভাবে বলিল, মুখ থেকে কথা কেড়ে নেওয়া ভদ্রতা নয়।

দ্বিতীয় সমান গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল, কথার কি একচেটে ব্যবসা হয়?

কর্ত্তা কহিলেন, যাক্ যাক্! গরম কি সেথা খুব পড়ে নাকি?

২য়। উনিই বলুন।

১ম। বলব বৈ কি! গরমের কথা বলছিলেন। উঃ, সে কথা মনে হ'লে এখনও ঘেমে উঠ্‌তে হয়! আমি যেবার প্রথম যাই, সেবার এমন হীট হ'ল যে, নবাবী আমলের তাওয়াখানার মত মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করতে হ'ত! হাতে কাঁটা-চামচে ধরা যেত না, ছুঁলেই ফোস্কা!

দ্বিতীয় কহিল, ছুট্‌! যেবার কয়লা সস্তা হয়, মনে আছে? তার কারণ কিছু জানেন? লণ্ডনে এত হীট হয়েছিল যে, উনুন জাল্‌বার দরকার হ'ত না। হাঁড়িতে মাংস দিয়ে একটু রোদে রাখলেই গ'লে একেবারে মাখম্‌!

নিধি বলিল, বলেন কি, মশাই?

প্রথম কহিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! আমি দেখেছি, পাল পাল ভেড়া মাঠে চরতে চরতে রোষ্ট হয়ে যেত! কতটা সুবিধা বুঝুন! সন্ধ্যার সময় খোঁয়াড়ে ফিরে এলে একেবারে মাটন-রোষ্ট—রাই মাখাও আর খাও!

কর্ত্তা। বলেন কি, মশাই! ভেড়া মাটন-রোষ্ট হয়ে হেঁটে খোঁয়াড়ে চ'লে এল!

২য়। আস্‌বে বৈ কি! তারা ত টের পায়নি যে, ভেতরে ভেতরে রোষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু আমি এক-বার বড় বিপদে পড়েছিলুম, মশাই! বাংলার সব খবর নেবার জন্যে কোন নামজাদা এডিটর একবার আমাকে তাঁর আপিসে দেখা করতে অনুরোধ করেন। আমি দুপুর-বেলা মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে রাস্তায় বেরিয়ে ছাতাটি যেমন খোলা, অমনি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে যাওয়া।

নিধি জিজ্ঞাসা করিল, শীতও কি এমনি জোর পড়ে নাকি?

দ্বিতীয় বলিল, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন!

প্রথম কহিল, আঃ, মশাই, সে কি যেমন তেমন শীত! কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন ক্ষুরের ধার। কানঢাকা টুপি না প'রে রাস্তায় বেরুলে কচকচ ক'রে কানগুলো উড়ে যায়!

কর্ত্তা কহিলেন, কও কথা!

দ্বিতীয় কহিল, আজ্ঞে হাঁ! লম্বা লম্বা দাড়ী মুড়িয়ে দেয়, যেন ছাগলে খেয়েছে! রাস্তায় টুপী খুল্‌লে সঙ্গে সঙ্গে টাক্‌ প'ড়ে যায়।

১ম। ও ত কি, মশাই! সেবার শীতকালে ক্যান্‌-ভ্যাস্‌ করবার জন্যে লর্ড হাৎটান্‌ যখন আমায় ডেকে পাঠালেন, গিয়ে দেখি, ইলেক্‌সন্‌ যত জমুক না জমুক, মাখম এমন জ'মে গেছে যে, চোখ বাঁচানো দায়!

নিধি। কি রকম?

১ম। বাটালী দিয়ে কেটে পাতে পাতে দিতে হ'চ্ছ কি না! মাখমের কুচি চোখে লাগত!

কর্ত্তা দ্বিতীয়ের মুখ চাহিলেন।

দ্বিতীয় বলিল, ও ত কি, মশাই! প্রিন্স পকেট-মারার ইলেকসনে যেবার স্পীচ দি, রিপোর্টাররা আমার সাম্‌নে ঝুড়ি পেতে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল—পকেটে হাত পুরে। বক্তৃতা যে জম্‌ল, মশাই! প্রত্যেক কথাটি যেমন মুখ দিয়ে বেরয় আর ঠাণ্ডায় জ'মে জ'মে পড়ে। দেখতে দেখতে ঝুড়ি ভ'রে ওঠে!

তার পর?

ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা প্রেসে পাঠিয়ে দিলে। ছাপা হ'ল।

নিধিরাম বলিল, আশ্চর্য্য! কর্ত্তা ভাবিলেন, প্রথম উপযুক্ত বটে, কিন্তু দ্বিতীয়—অদ্বিতীয়!

ইতিমধ্যে বাড়ীর সরকার একটা লোকের গলায় গামছা দিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া কহিল, হুজুর, এ বেটা চোর, দেউড়ীর ভিতর ঢুকে চারদিকে উঁকি মারছিল।

কর্ত্তা সরাসরি হুকুম দিলেন, পুলিসে দাও।

লোকটা কাঁদিয়া কহিল, দোহাই কর্ত্তা, আমি নকড়ি পাড়ুয়ের কাছে এসেছিলাম।

বেটা বদ্‌মাইস! নোক্‌ড়ো আজ তিন দিন হ'ল, এখান থেকে চ'লে গেছে।

তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব!

অত জানাজানিতে কায কি, পুলিসে দাও।

ইতিমধ্যে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত প্রথম প্রার্থী কর্ত্তাকে চুপি চুপি কহিল, দেখুন, হঠাৎ কিছু ক'রে কায নেই! লোকটার ভোট থাকতে পারে।

কর্ত্তা কহিলেন, কে জানে, মশাই, করিত-কর্ম্মা লোক না হ'লে কি ও-সব কথা চট ক'রে মাথায় আসে! ঠিকই ত! এই হারামজাদা! ঠিক ক'রে বল, তোর ভোট আছে?

লোক ভাবিল, চোরাই মালের জেরা হইতেছে। বলিল, দোহাই, কর্ত্তা! না কর্ত্তা, নেই কর্ত্তা!

নেই কি রে বেটা! আলবৎ আছে।

আজ্ঞে কর্ত্তা! আমার কাছা, কোঁচা, ট্যাঁক, গামছা, সব খানাতল্লাসি কর, যদি আমার ঠাঁই একটা ভোট পাও, পঁচিশ পয়জার গ'ণে খাব।

প্রথমের প্রথম মন্ত্রণা নিষ্ফল হওয়াতে মনে মনে ভারি অপ্রতিভ হইল। ভাবিল, আমি ত গেছিই! বেটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। সাবধানে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

দ্বিতীয় বলিল, আমি কিছু বলছিনি। চেয়ারে ব'সে খালি দেখছি আর মনে মনে হাসছি!

প্রথম বলিল, মনে মনে হাসা কি! যে বাপের ব্যাটা হবে, সে দাঁত বা'র ক'রে হাসবে!

দেখলেন, মিষ্টার সদারাম! বলা নেই, কওয়া নেই, ব্যাটা ফস্ ক'রে বাপ তুললে! সার, আপনি অন্নদাতা, আপনার সামনে ধৃষ্টতা করতে পারি নি! কিন্তু একটি অনুমতি আমায় দিন, ব্যাটাকে ধ'রে একটা আছাড় আমি মারি! একটার বেশী দুটি নয়! বলিয়া দ্বিতীয় কর্ত্তার পা ধরিল।

ছাড়ুন মশায়! বেজায় শুড়শুড়ি লাগছে!

মিষ্টার সদারাম! ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোন রকম হাঙ্গাম বাধানো উচিত নয়, কিন্তু একটা হুকুম আমায় দিন, সার, ব্যাটাকে জানলা গলিয়ে ফেলে দি, একটিবার জবাব ফেলব না। বলিয়া প্রথমও কর্ত্তার অপর পা ধরিয়া শুড়শুড়ি দিতে আরম্ভ করিল।

ফ্যাল্ না রে ব্যাটা, ফ্যাল্ না।

তোর কথায় ফেলবো রে ব্যাটা! কর্ত্তা আগে হুকুম দিক না।

কর্ত্তা আর সহ্য করিতে না পারিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে টেবলটা উল্টাইয়া গেল। তিনিও পপাত। অনেক কষ্টে দাঁড়াইয়া পায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, করেন কি! করেন কি! আপনাদের দুজনকে রাখলে ত এমনি মারামারি ক'রে মরবেন!

ওহে, দুজনকেই!

ওহে, দুজনকেই!

উভয়ে শেকহাণ্ড।

কর্ত্তা বলিলেন, এ কি কাণ্ড আপনাদের!

প্রথম দ্বিতীয়ের গালপাট্টায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ও কিছু নয়।

দ্বিতীয় প্রথমের টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ও কিছু নয়।

নিধিরাম জিজ্ঞাসিল, এও কি ইলেকসন্ ট্যাক্‌টিক্‌স্ না কি?

আপনি ঠিক বুঝেছেন!

ঠিক!

কর্ত্তা বলিলেন, দেখুন, আপনি থাকবেন নিধিরামের তরফ, আর আপনি থাকবেন আমার।

আমরা দুজনেই থাকব, দুজনের তরফ, কি বল হে!

নিশ্চয়! এটা জানবেন, আমরা নচ্ছার, নেমখারাম নই।

কর্ত্তা বলিলেন, রাম রাম! তা কি জানিনি! এখন কায আরম্ভ করবেন কি ক'রে? সহর সুদ্ধ সব ত আমাদের বিপক্ষ।

নিধিরাম বাবুর প্রতিপক্ষ কে?

ধনপতি।

প্ল্যাকার্ড মারছে?

প্ল্যাকার্ড কি? তার প্রতিজ্ঞা, কারুর কাছে যাবে না, কাউকে কিছু বলবে না লোকে তাকে দাঁড় করিয়েছে, এখন লোক বুঝুক।

কেন বলুন ত? কি গুণে লোকে তাকে চায়?

সরফরাজ ব'লে। ব্যাটা খালি পরোপকার করবার ফন্দিতে ফেরে পাড়ায় পাড়ায় ছেলে ক্ষেপায়, বলে মানুষ হ!

ঐ ব'লে প্যাম্‌ফ্লেট ছাপাচ্ছে নাকি?

ও, ছাপাবে! সে যোত্তর যোগা? উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই—লম্বা লম্বা কথা! বলে, সত্য'ই আমাদের ধর্ম্ম, সেবা আমাদের কর্ম্ম, সংযম আমাদের বর্ম্ম, বিলাস আমাদের শত্রু, চরিত্র আমাদের মিত্র, সহানুভূতি আমাদের বল। বাপ মরে কেরাণীগিরি ক'রে, ব্যাটার বাক্যি-সাক্যি যেন ফুলঝুরি ঝরে।

ঝরে ঝরুক। আপনি পাল তুলে দিন, আমরা ক'ষে দাঁড় টানব।

শেষ বানচাল হব না ত? তাই ভাবছি, আপনারা কি ক'রে কি করবেন?

প্রথম বলিল, কি করব! ফুসফুস কানাকানি, ঠ্যাং ধ'রে টানাটানি। হাত ধ'রে খিঁচ, কাছা টেনে প্যাঁচ! হাত-পা-মাথা-চালা, কানদুটো ঝালাপালা—

এতে ভোট না দেবে, সে শালার ঘরের শালা—বলিয়া দ্বিতীয় চারিদিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করিল।

কর্ত্তা বলিলেন, কি জানো, তবু! যদি শেষ পর্য্যন্ত পাড়ি না জমে—

দাড়ি ওপড়াতে হবে।

কেমন ক'রে?

তার কৌশল আছে। আপনি আমাদের ওপর নির্ভর করুন।

যা ভাল বোঝ, কর। কি জানেন, একটা ভারি দাঁও আছে। নিধিরাম জিতলে একটা বেও হয়, একটা বিষয়ও হাত লাগে! আর বুঝুন না কেন, স্বরাজ-স্বরাজ ঢেউ উঠেছে! তাতে আমিও ত রাজা হ'তে পারি। ও ত বেশী কথা নয়, কেবল ভোটের যোগাড়।

এই সময় দূরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। অনতিপরেই নাক-দাঁত গোঁফ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কর্ত্তা, রাস্তায় বেজায় রগড় বেবেছে!

কর্ত্তা ও নিধিরাম সমস্বরে কি, কি?

সেই ষাঁড়টা, কর্ত্তা!

কোন্ ষাঁড়, নাম ক'রে বল্ না, নইলে চিনব কি ক'রে? সহরশুদ্ধ ষাঁড়ের সঙ্গে কি আমি পরিচয় ক'রে ব'সে আছি না কি?

ষাঁড়ের ত নাম নেই, কর্ত্তা? স্বর্গীয় কর্ত্তার বৃষোৎসর্গে যখন তাকে দাগা হয়, তখন কোন নাম তাকে দেওয়া হয়নি।

প্রথম বলিল, সভ্য দেশে এমন হবার যো নেই! সেখানে বড় বড় ষাঁড়ের বড় বড় নাম আছে।

নিধিরাম কহিল, এখানেও একটা আইন করতে হবে। যে ব্যক্তি বৃষ উৎসর্গ করবে, ষাঁড়ের পিঠে তার নাম দেগে দেওয়া চাই, শুধু ত্রিশূল দাগলে চলবে না।

প্রথম কহিল, শুধু তাই নয়। তার ভরণপোষণের খরচ দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করতে হবে।

কেন?

দ্বিতীয় কহিল, দেশের কাযে।

নিধিরাম কহিল, ঠিক ঠিক! অতি উত্তম পরামর্শ! মাল বইবে—ময়লা-ফেলা গাড়ী টানবে। ঠিক!

কর্ত্তা কহিলেন, সে না হয় পরামর্শ করো। কার নাম দেগেছে বলতে পার? আমার?

শুধু আপনার নয়, কর্ত্তা! সম্বন্ধী বাবুরও। সদারাম, নিধিরাম—দুই নামই দুই দিকে দেগেছে। রাস্তার এধারের লোক বলছে সদারাম, ওধারের লোক বলছে নিধিরাম। দন্ত্য স, দয়ে আকার দিলে সদারাম হয় রে হাঁদারাম! এ পারের এরা বলে শালা চ, ওপারের ওরা বলে শালার ব্যাটা শালা। সে, মশাই, হাতাহাতির উপক্রম।

এ দিকে ষাঁড়টা সহরময় দাবড়ে বেড়াতে লাগল যেন— হিমালয় পাহাড়!

তোমরা সেটাকে ধ'রে খোঁয়াড়ে পোরবার চেষ্টা করলে না?

করলুম না! গেট্ থেকে দশ টাকা বকশিস পর্য্যন্ত কবলালুম যে ধরতে পারবে।

তার পর?

এ দিকে তাড়া খায় ত ওদিকে যায়। শেষ মাঠের দিকে ছুটল। আমরাও ছুটলুম। মাঠে গিয়ে সেই বড় অশত্থ গাছটার তলায় দাঁড়াল। আমরা দেখছি, ও কচি পাতাগুলো চোখ পাকিয়ে দেখছে। আমি মনে করলুম, সেই গাছের গরুর মত গাছেই বা ওঠে।

গরু গাছে উঠবে?

সবটা শুনুন আগে। আমরা যোগাড় করেছি, সেই সময় ষাঁড় গুঁজে ল্যাজ তুলে ছেড়ে এল, যেন বেয়নেট উঁচানো গোরা! দুধারি লোক পথ দিলে। বেটাছেলে উঠল গে ঠেলে মুন্সিপালের আপিসে।

দূর! তা কি হয়!

হয় না! সে ষাঁড়কে ত জানেন না, কর্ত্তা! সহরশুদ্ধ দোকানী তার জ্বালায় অস্থির। সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে প্রাতরাশ করবেন—ময়রার দোকানে গিয়ে এক চাঙ্গারি মুড়কি। তা কি বলা-কওয়া আছে! পিঠে বাড়ি পড়লে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কেড়ে নিতে গেলে এমন শিং নাড়ে যে, এগয় কার বাপের! তার পর এর ওর দোকান থেকে কয়েক খাবল ত আছেই বাজারে মাছ-তরকারি মাগ্যি ক'রে দিলে মশাই

• মাছ মাগ্যি ক'রে দিলে ?

আজ্ঞে ! সে দিন একটা মেছুনি গায়ে আঁশজল দিয়ে দূর দূর করেছিল। তখন কিছু বললে না। ভাল মানুষটির মতন চ'লে গেল। তার পর এক দিন বাগে পেয়ে টপ্ ক'রে তার একটা আস্ত ইলিশ্ গিল্লে !

ঐ ষাঁড়টা ?

আজ্ঞে হ্যা—ঐ শালার ষাঁড়।

এ কখন হ'তে পারে না।

পারে না ? বাজী রাখুন ! এতক্ষণে দেখুন গিয়ে, হয় ত চেয়ারে ব'সে সই মারছে !

তর্ক রাখ ! তুমি তারে কোথায় ছেড়ে এলে, বল ?

সে আপিস তদারক ক'রে বেড়াতে লাগল, আমরা ছুটে এলুম আপনাকে খবর দিতে, কর্ত্তা !

আমাকে খবর দিতে এলে ! কেন ? বড় খুসীর খবর মনে ক'রে ? যাও ! সোজায় না বাগ্ মানে, গুলী ক'রে মার গে !

সে কি, কর্ত্তা ! গোহত্যা হবে যে !

তার প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে পরে বিধান নিয়ে ! উঃ, কি ভয়ানক ! সদারাম—নিধিরাম ষাঁড়ের পিঠে ! এ সেই নচ্ছে সয়তানের কাণ্ড !

দ্বিতীয় কহিল, সেই করুক, সার ! সে আপনার হিতৈষী।

কি রকম ?

প্রথম কহিল, আর রকম কি ? আপনি রাজপোষাক ফরমাস দিন !

'কি হয়েছে, বলুন না ?

এতে একটা গভীর মনস্তত্ব আছে। ভারি মর‍্যাল এফেক্ট্ হবে।

ষাঁড়ের আবার মনস্তত্ব কি ?

আছে, আছে ! ক্রমে বুঝবেন ! ঐ ষাঁড় যত নড়ছে চড়ছে, সহরশুদ্ধ লোকের মনের ওপর তত সদারাম-নিধিরাম নামের ছাপ্ পড়ছে। লোকে ইষ্ট-দেবতার নাম জপ করতে ব'সে, জপ্ করছে সদারাম-নিধিরাম ! ভোট দেবার সময় সব নাম ভুলে যাবে, মনে জাগবে কেবল সদারাম-নিধিরাম। বাপের নাম ভুলে যাবে তার ধনপতি ! আপনি টোপর ফরমাস দিন, মিষ্টার নিধিরাম !

কিন্তু নিধিরাম নীরবে এক আঁটি খড় ও একগাছা মোটা দড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

৪

আজ রবিবার। ভোটসাধনার পক্ষে পুণ্যাহ। দুই বিলাতী এজেন্ট সহ নিধিরাম বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই সেই রাঙ্গা-দিদির বাড়ী উপস্থিত। নিধিরাম হাসিয়া সৌজন্য করিয়া জিজ্ঞাসিল, আমায় চিন্তে পারছেন ?

রাঙ্গা-দিদি বলিলেন, চিনির পানা নয়, আমি মিছরি খাই।

নিধিরাম হতাশ হইয়া চুপ করিল। প্রথম জিজ্ঞাসিল, অবশ্য উচ্চ গলায়, আপনার ভোট আছে ত ?

রাঙ্গা-দি' উত্তর দিলেন, আমার ভাত এখনও চড়ে নি, আমি বেলায় খাই।

দ্বিতীয় কহিল, ভাত নয়, ভোট ভোট—এ বাড়ীর একটা ভোট আছে ত ?

রাঙ্গা-দি' বলিলেন, রাম, রাম ! এ বাড়ীতে ভূত ! দশ বছর আছি, কখন ত দেখিনি।

নিধিরাম বলিল, চলুন, মশাই, এখানে মিছে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে ! উনি কোন কথাই কানে তোলেন না।

তার মানে ? কালা না কি !

দেখতে পাচ্ছেন না। কি শোনে কি বলে !

দাঁড়ান ! সত্যি কালা হয় ত কানের পোকা বা'র ক'রে দিয়ে যাই—বলিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় রাঙ্গা-দির দুই কান ঘেঁষিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল, ভোট—ভোট—ভো-ও-ট—ভো-ও-ট !

রাঙ্গা-দিদি দুই জনকে দুই কনুয়ের গুঁতো দিয়া ধরাশায়ী করিয়া বলিলেন, যাঃ, তোদের মতন ঢের ভূত আমি দেখেছি ! আমাকে ভূতের ভয় দেখাতে এসেছেন !

নিরুপায় হইয়া তিন জনে অন্য এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, গৌরাঙ্গবাবু বাড়ী আছেন ?

হঠাৎ মড়া কান্না উঠিল, ও বাপ গৌরাঙ্গ রে ! তুই কোথায় গেলি রে বাপ !

তিন জনেরই মনে হইল, আঃ, মরবার আর সময় পেলে না !

প্রথম কহিল, কিন্তু ভোটটা ভারি ফাত-ফসকে গেল।

দ্বিতীয় কহিল, কিন্তু এক সান্ত্বনা, ওরাও পাবে না।

নিধিরাম কহিল, বলা যায় না, মশাই! নসে সয়তানের অসাধ্য কায নেই। চলুন এখন, গিরিধারী রায়ের ওখানে যাই। তিনি আবার আছেন কি গেছেন, দেখা যাক্!

পথে চাটুয্যেমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিধিরাম বলিল, এই যে চাটুয্যেমশাই!

চাটুয্যে হন্ হন্ করিয়া বাজারে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল।

১ম। ও হে, চাটুয্যে মশাই!

২য়। ও হে, চাটুয্যে-মশাই!

চাটুয্যে বলিল, হঁ, তা কি!

তাই বল্‌ছি, কাকে ভোট দেবেন, স্থির করেছেন?

যমকে!

কিন্তু তার চেয়ে যদি ভাল ক্যাণ্ডিডেট্ থাকে? বলিয়া দ্বিতীয় চাটুয্যের হাতের চুপড়ি ধরিল।

চাটুয্যে চটিয়া বলিল, ছাড় মশাই! আমার ছোট ছেলে পথ্য করবে, মাগুর মাছ আন্‌তে যাচ্ছি।

নিধিরামবাবুকে ভোট দিলে আর পথ্য করবার দরকার হবে না।

কেন বল দিকি? জলের ট্যাপ দিয়ে মাছ পড়বে না কি? একবার যেমন সাপ পড়েছিল?

ও হে, খুব রসিক লোক! তা নয়, মশাই! উনি কাউন্সিলার হ'লে সহরে আর ব্যায়রাম থাক্‌বে না!

কোথায় যাবে?

কোথায় যাবে কি, মশাই?

তাই জিজ্ঞাসা করছি! সহরের বড় মিউনিসিপ্যালিটী! এক জন ধন্বন্তরি রয়েছেন—গঙ্গা-যাত্রার বিধান দেবার জন্য। তাঁর মস্ত বড় আপিস—হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে! এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, বৃষোৎসর্গের ঘটা, ফলারের আয়োজন ফেলে রোগ ব্যাটারা কোথায় যাবে মর্‌তে?

ও হে, বেজায় রসিক! ছাড়ছি নি, মশাই, আপনাকে। নিধিরামবাবুকে ভোট দিতেই হবে। ওহে, দাও হে দাও, কালীঘাটের ফুল-বিল্বিপত্র হাতে দাও! সত্য করিয়ে নাও।

ওরে বাপ রে! বলিয়া চাটুয্যে ছুটিয়া পলাইল। প্রথম ডাকিল, যাবেন না মশাই, আপনার চুপড়ি নিয়ে যান!

নিধিরাম—উকীল, বলিল, ডাকুন, ডাকুন! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। হয় ত থানায় গিয়ে রাহাজানির চার্জ্জ দেবে। নসে সব পারে!

ও মশায়, ফিরুন, চুপড়ি নিয়ে যান!

চাটুয্যে দূর হইতে বলিল, দরকার নেই। গামছায় বেঁধে আনব।

তাই ত হে! সাহেবী ড্রেস্ প'রে এটা হাতে ক'রে ঘোরা যায় কেমন ক'রে? বিপদ হ'ল ত!

তাই ত হে, বেজায় আঁষ্টে গন্ধ!

তার উপায় কি! দিন, আমিই হাতে ক'রে নিচ্ছি, ওর বাড়ী খুঁজে দিয়ে আস্‌তে হবে, নইলে চুরির দাবী দিয়ে ফ্যাসাদ বাধাতে পারে।

ঐ আঁষ-চুপড়ি!

আশ্চর্য্য কি! নসে সয়তান না পারে, এমন কায নেই! পেটি লারসেনি, ক্রিমিন্যাল মিস্ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, সব হ'তে পারে।

গিরিধারী রায়ের বাড়ীর সামনে এক জন প্রশ্ন করিল, কি নিধিবাবু, ভোটের চুপড়ি না কি?

তিন জনেই চট করিয়া গিরিধারী রায়ের বাটীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

মিষ্টার রায় বাড়ী আছেন?

আজ্ঞে, না! আমি বাড়ী নেই।

সে কি, মশাই, এই ত রয়েছেন!

কে বল্‌লে?

আমি বল্‌ছি।

তুমি মিথ্যাবাদী।

নিধিরাম স্তম্ভিত! মশাই ব'সে রয়েছেন, কথা কচ্ছেন, আর বল্‌ছেন মিথ্যাবাদী? এ কি ভদ্রতা?

সাহেবী পোষাক পরলেই সাহেব হয় না। ভদ্রতা শিখে এস, তখন ভদ্রতা করব! জান না, বাড়ী বসেও নট্ অ্যাট্-হোম হয়!

প্রথম কহিল, আচ্ছা মশাই, তর্কের দরকার নেই। স্বীকার করছি, আপনি নেই। কিন্তু কাকে ভোট দেবেন, স্থির করেছেন?

ব'লে যাও, ব'লে যাও। আমি তোমাদের একটা কথাও শুনছিনি!

আচ্ছা, আপনি শুনবেন কেন, মশাই! আপনার কান শুনবে। না শোনে ত তাকে ধ'রে জবরদস্তি ক'রে শোনাতে পারি।

তা হ'লে আমার হাত কি ক'রে বসবে, তার দায়ী আমি হব না।

তাই ত হে! এখানে বড় সুবিধে হবে না। লোকটা পাগল!

নিধিরাম কহিল, কায কি ও কথায়! মানহানির দাবী আনতে পারে।

দ্বিতীয় কহিল, কে আনবে। উনি ত বাড়ী নেই। কা'ল তখন আবার আসা যাবে।

অতঃপর তিন মূর্ত্তি গিয়া যখন এক ভদ্রলোকের গৃহে উঠিল, তিনি তখন সেরেস্তা দাখিল হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মশাই গো!

কে গো, টেক্স সরকার নাকি?

আজ্ঞে না। ভয় নেই।

তবে কে?

সদারাম বাবুর সম্বন্ধী।

ও, সদারাম বাবুর সম্বন্ধী, তবে ত আমারও! মশাইরা ভোট ভোট ক'রে কি মানুষকে একটু ঘুমুতে দেবেন না?

তিন জনে সবে চাপিয়া একেবারে মৌরসি পাট্টা লইয়া বসিল।

মশায়, ভোট সম্বন্ধে কিছু স্থির করেছেন?

আজ্ঞে হা! অস্থির ক'রে তুলেছে।

তা হ'লে এই যে ফ্রাঞ্চাইজ, আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার অধিকার এ কি মন্দ বলেন?

আজ্ঞে না। তবে নির্ব্বাচন করতে দেন কৈ? গুরু-পুরুতের পৈতা জড়ানো, বন্ধু বান্ধবের গায়ে মাথে চড়ানো, শালা সম্বন্ধীর ঠেলা, শ্বশুর-শাশুড়ীর মড়-কান্না, বৈবাহিকের দন্না, মনিবের চোখ-রাঙ্গানো, পাওনাদারের গুড়ো, এক হাতে খোঁচা এক হাতে খাচ্ছের মাড়া, এ সব যদি নির্ব্বাচন হয়, তা হ'লে গেলেব পাঁচনই বসগোল্লার রস। ভোট দেবার যে স্বাধীনতাটুকু দিয়েছেন, টানাটানির চোটে যে তার প্রাণ ধুক ধুক করছে।

কি জানেন, যারা পরোপকার করবার জন্ম কোমর বেঁধেছেন, তাঁদের কি কিছুতে পেছপাও হ'লে চলে? আপনি ভোট না দেন, কেড়ে নেব।

নিদেন ষণ্ডা দিয়ে। তার পর পরোপকার করবার জন্ম খুব লম্বা লম্বা বিল হবে ত?

কে আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় বলুন? তবে কি জানেন, অনেকেই বলেছেন, কিছু নেবেন, কিঞ্চিৎ দেশের কাযে ব্যয় করবেন।

দেশের কি কায?

ঐ তাঁদেরই ইলেকসন্ বাবদে খরচ হবে। সেটা কি দেশের কায ব'লে মনে করেন না?

কে, আমি? আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি গয়ায় পিণ্ডদানকেও দেশের কায ব'লে মনে করি।

কেন মশায়?

অনেকগুলো ভূত উদ্ধার হয়ে যায়। দেশে উৎপাত কমে।

যাক মশাই! রহস্য নয়! আপনি কাকে ভোট দিচ্ছেন, বলুন।

কি জানেন, দুদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আজ একটু অবসর পেয়েছি। একটু ভাল ক'রে ঘুমুতে দিন। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বিবেচনা করব।

সে কি মশাই! দেশসম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, আর আপনি ঘুমুতে যাচ্ছেন? আপনি কি দেশের কল্যাণ চান না?

আমি একটু ঘুমুলেই কি দেশ উচ্ছন্ন যাবে, মশাই? এ ত ভারি বিপদ হ'ল দেখছি! কি দেশের কায করবেন, বলুন ত? দেশের কায ত ডিটো—আর ডিটো না দিলেই ভিটো।

তবে আপনি কি করতে বলেন?

আমি কি বলি? আমি যা বলি, শুনবেন? সুস্থ শরীরকে মিছামিছি ব্যস্ত করবেন না। রাস্তা বেশ চলছে, চ'লে যাক! ইতিমধ্যে আপনারাও হামাগুড়ি ছেড়ে একটু একটু চলতে শিখুন। সাবালক হন। তখন আর অভির সাহায্য না পেলেও আপনার বিষয় আপনি দেখতে পারবেন। নইলে তিন দিনে নয়-ছয় হয়ে যাবে, পাঁচ জনে ভোগা দিয়ে নেবে যে, বাবা!

আপনি দেখছি, স্বরাজ চান না।

কেন চাব না? রাজা হবে কে?

আপনারা যাকে ভোট দেবেন।

তা হ'লে আমি আমাকেই ভোট দোব। আমি হিন্দু, আমি স্বরাজ চাই নি? আমার গুরু কি বলেন, জানো?

কে আপনার গুরু?

ঐ সেই নসে-সয়তান। তিনি বলেন, হিন্দুর স্বরাজ এইখানে—বুকের ভিতর। সত্যে তার প্রতিষ্ঠা। সংযমে তার দৃঢ়তা। পবিত্রতায় তার পালন। ন্যায় তার মন্ত্রী। ধর্ম্ম তার রাজনীতি। অহিংসা তার শাসন। আত্মজয় তার সাধনা। সর্ব্বভূতে ভালবাসা তার সিদ্ধি। হিন্দুর স্বরাজ—জীবন্মুক্তি। অভ্যাসের দাসত্ব, পাঁচ ভূতের গোলামী, অষ্টপাশে আপনাকে বেঁধে রেখে হিন্দুর স্বরাজ হয় না। মন রোগে জরা, ময়লা ভরা। বাইরের ড্রেণ সাফ, আর স্বাস্থ্যবিভাগ নিয়ে ছড়োহুড়ি করলে কি হবে?

নিধিরাম বলিল, তিনি বলেন, ড্রেণ বুজিয়ে আবার খানা কেটে দিতে। তাই করতে হবে না কি?

তা কি হয়! তলায় ড্রেণ না হ'লে সভ্যতার ময়লা বেরুবে কোথায় দিয়ে! যে বিধাতা রোগ সৃষ্টি করেন, ওষুধও তাঁরই দান। এখন আমাকে অবসর দান করুন, আমি একটু ঘুমুই।

প্রস্থানকালে প্রথম প্রশ্ন করিল, আঁসচুপড়িটার কি হবে? দরজায় প'ড়ে থাকবে?

নিধিরাম কহিল, থাক প'ড়ে। চাটুর্য্যে চার্জ্জ দেয়, চোরাই মাল এর বাড়ী থেকেই বেরুবে।

ক্রমে ইলেকসনের দিন নিকট হইয়া আসিল। আজ পোলিং-ডে। আজ সবাই অতি ব্যস্ত এবং ব্যতিব্যস্ত। কর্ত্তা সরে-জমিনে উপস্থিত। পাঠকের সেই পূর্ব্বপরিচিত খোকাও আসিয়াছে—ভোট খাবে ব'লে। কর্ত্তা বলিলেন, নসীরাম, আজকের দিনটা নিধিরামকে একটু দেখ।

নসীরাম নিধিরামকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, দেখ্‌ব বৈ কি, সার, নসীরাম নেমখারাম নয়। কর্ত্তা, মিউনিসিপ্যালিটাকে টেলিফো ক'রে দিন, রাস্তায় ভাল ক'রে জল দেয়। আপনার পক্ষের ভোটার সব বড়লোক। তাঁদের এখন এইখানে জমিয়ে রাখুন, শেষাশেষি একেবারে একজোট হয়ে ভোট দেবেন। ইতিমধ্যে ধোনার ভোট চলুক। আমরা তাদের ভাঙ্গাবার চেষ্টা করি।

কর্ত্তা বলিলেন, খুব ভাল যুক্তি।

ক্রমে পোলিং আরম্ভ হইল। ধনপতির ক্যান্‌ভ্যাসার-সংখ্যা অতি অল্প। বড় নামজাদাও কেহ নয়,—এই হরে, প্যালা, পঞ্চা, ফটকে, এমনি সব। ভোটারদিগের জলযোগের যোগাড়ও অতি সামান্য। এ পক্ষে খাস্তার কচুরি, শিঙ্গাড়া, ভীম নাগের সন্দেশ, ডাব, ঘোল, সোডা, লেমনেড্ প্রভৃতির অঢেল্ আয়োজন। বেলার সঙ্গে সঙ্গে পোলিং ক্রমে সরগরম হইয়া উঠিল। এমন সময় রব উঠিল, ওরে, ভুঁড়ে-ময়রা আস্‌ছে, ভুঁড়ে-ময়রা! সে ব্যক্তি হাঁসফাঁস করিতে করিতে সেই পোলিং-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত, অমনি দুই পক্ষ টানাটানি।

গোঁফ বলিল, আরে, তুমি ত কর্ত্তার মশালদার। সম্বৎসর তাঁর বাড়ী সন্দেশ যোগাও। কর্ত্তার সম্বন্ধী ছাড়া তুমি আর কারে ভোট দেবে?

সে ত বটেই! তবে কি না--

হরে, প্যালা, পঞ্চা সমস্বরে তাহার কানের কাছে সুর ধরিল, তবে কি না,--তবে কি না--তবে কি না,—তবে কি না--

ইহার একটা গূঢ় অর্থ আছে এবং তাহা প্রণিধান করিতেও মোটা-ময়রার বেশী বিলম্ব হইল না। যদি না নিধিরামকে ভোট দেয়, অত বড় খদ্দের হাতছাড়া হয়, আর ধনপতিকে ভোট না দিলে, এই দুর্দ্দান্ত বওয়াটের দল যাহা করিবে, তাহা ভাবিলেও গা শিহরিয়া উঠে! তৈয়ারী খোলাভরা পানতুয়া রাতারাতি গোময় হইয়া যাইবে! সন্দেশের বারকোস সহসা ডিগ্‌বাজী খাইবে—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ময়রার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। সেও হরে, প্যালা, পঞ্চার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলিতে লাগিল, তবে কি না--তবে কি না

এর আবার তবে কি না কি? তুমি এস এ দিকে। ভোট দেবার আগে একটা লেমনেড খেয়ে গলা ভিজিয়ে নাও।

ময়রার মানসিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে দুই হাত লইয়া দুই দিক্ হইতে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

ছাড়ুন, মশাই, মড়া ছিঁড়ে গেল যে! কি বিপদ বলুন ত!

তুমি লেমনেড খাবে এস, কিসের বিপদ!

ও পক্ষ বলিল, আজ লেমনেড খাও, কা'ল ঘোল খেয়ো।

গোঁফ বলিল, ঘোল আমাদেরও আছে।

ও পক্ষ বলিল, থাকে—নিজেরা খাও গে।

ক্রমে উভয় পক্ষই ময়রাকে টানিয়া লইয়া পোলিং-অফিসারের নিকট উপস্থিত। ময়রা বলিল, হাকিম যারে ভোট দিতে বল্‌বেন, আমি তাকেই দোব।

হাকিম বলিলেন, তার মানে? তুমি কাকে ভোট দিতে চাও?

দু'পক্ষকেই।

সে হবে না, এক পক্ষকে দিতে হবে।

তবে কাউকে না। বলিয়া ময়রা নিষ্ক্রান্ত।

ইতিমধ্যে দাঁত আর এক জনকে লইয়া উপস্থিত। হাকিম প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

নিমাই মাইতি।

পক্কা বলিল, তুমি নিমাই মাইতি! ও বাবা! দিনকে রাত করতে পার যে!

গোঁফ বলিল, আমি জানি, ও নিমাই মাইতি।

প্যালা বলিল, কখন না। আমি জানি, ও সীতে গয়লা।

হাকিম জিজ্ঞাসিলেন, কি হে বাপু, তুমি কে?

আজ্ঞে, আমি নিমাই মাইতিই বটে।

বললেই হ'ল, তুমি নিমাই মাইতি?

অফিসার বলিলেন, প্রমাণ দিতে পার?

হুজুর, আমি—আমি, তার আবার প্রমাণ কি দোব?

প্রমাণ না দিলে তোমার ভোট লেখা হবে না।

না হ'ল ত বয়েই গেল—বলিয়া সে রাগিয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে বাহিরে এক কাণ্ড উপস্থিত। নিধিরামের সেই বন্ধু—যিনি প্রথম পক্ষকে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আসিবামাত্র হয়ে-প্যালা-পক্কা গ্রেপ্তার করিল, আপনি কাকে ভোট দেবেন, মশাই?

বাবুটির পোষাকও সাহেবী, মেজাজও সাহেবী, বলিলেন, সে কথা তোমাদের দরকার? আমার যাকে ইচ্ছা দোব।

নসীরাম নিকটেই ছিল, বলিল, সে হবে না, সার! আপনাকে নিধিরামবাবুকে ভোট দিতেই হবে।

কেন বল দিকি? তোমার কথায় না কি? আমার বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই নেই? তুমি ব'লে দেবে, তবে ভোট দোব?

না দেন, সার, আপনার পা ধ'রে প'ড়ে থাক্‌ব। কিছুতেই ছাড়ব না। বলিয়া নসীরাম পা ধরিল।

ছেড়ে দাও বলছি! নইলে—

আপনার পায়ের জুতো খাবো। বলিয়া জুতা ধরিয়া টানাটানি। কাছে কোন অবলম্বন ছিল না, আর জুতা-জোড়াটাও ছিল হাল্টিং। নসীরামের হ্যাঁচকা টানে জুতা খুলিয়া আসিল, কিন্তু সাহেবও আছাড় খাইলেন—কাদার উপর! নসীরাম বলিল, যতক্ষণ না, সার, নিধিরামকে ভোট দিবেন, ততক্ষণ জুতো ছাড়বো না—বলিয়া ছুট!

সাহেব কাদা মাখিয়া খ্যাংচাইতে খ্যাংচাইতে জুতার পিছু ধাওয়া করিলেন।

খোকা দূর হইতে হাঁকিল, বাবাধোনা, বাবাধোনা, দোৎ নাৎতে দেৎবি আয়, দেৎবি আয়!

কর্ত্তা হাসিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন, ছেলেবেলা আমিও অমনি আদ্‌দে ছিলুম।

সাহেব চোখ রাঙ্গাইয়া যেমন মুখ ফিরাইলেন, সেই অবসরে নসীরাম জুতাটা দূরে ফেলিয়া দিয়া উড়িয়ার হাত হইতে হোজ্ কাড়িয়া লইয়া বলিল, সাহেবের গায় কাদা, দেখতে পাচ্ছিস নি, ব্যাটা!

নসীরাম নিজেই হোজ ধরিয়া বেশ করিয়া নিধিরামের বন্ধুকে স্নান করাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রথম এজেন্ট্ একখানি মোটরে এক দল ভোটার লইয়া আসিতেছিল। পথের মাঝখানে মুরুব্বির বেহাল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মোটর থামাইল। কি, কি হয়েছে? প্রশ্ন করিতেই নসীরাম হোজ ফিরাইল সেই দিকে। ভিজিয়া গোময় হইয়া প্রথম সহ ভোটারের দল রণে ভঙ্গ দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় মোটর করিয়া এক দল ভোটার আসিল। নিধিরাম স্বয়ং তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া জলযোগ করাইল ও ভোট দেওয়াইবার জন্য নিজে সঙ্গে গেল। ঘরে ঢুকিবার সময় নিধিরাম চুপি চুপি জিজ্ঞাসিল, মনে আছে? আছে বৈ কি,

বলিয়া ইঁহারা ভোট দিলেন, ধনপতিকে। নিধিরামের মুখে আর কথা সরিল না।

ইতিমধ্যে কয়দিন অসুখে ভুগিবার পর নাক আজ প্রথম রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত। নসীরাম তাহাকে দেখিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিয়া অতি দ্রুত বলিতে লাগিল, রাম—রাম—রাম—রাম—

ইত্যবসরে হরে, প্যালা, পঞ্চা, ফট্‌কে প্রভৃতিও সেইখানে আসিয়া জুটিল। নসীরাম বলিল, ওরে, সেই না?

হরে বলিল, সেই ত বটে! ঠিক্!

নাক ভাবিল, ইহারা আমার নাক লইয়া রঙ্গ করিতেছে। বলিল, এত বড় নাক কি কখন দেখনি নাকি যে, হাঁ ক'রে চেয়ে আছ?

নসী বলিল, শুন্‌ছিস, আওয়াজটা একটু খোনা-খোনা!

কেন, আমি কি ভূত?

নসী বলিল, দেখ্‌ছিস, অনেক ভূত জানে না যে, তারা ভূত!

জানে না কি রকম? আমি কি মরেছি?

একটু আধটু নয়, সমস্তটাই মরেছ।

চ'! তোর কথায় মরেছি!

নির্ঘাৎ!

আজ সকালে এক রাশ মুড়ি খেলুম, আর এর মধ্যে মলুম?

মরেছ—তার আর চায় কি?

আমি মরেছি কি না, আমি জানিনি তুই জানিস? কি ক'রে মলুম?

হার্ট ফেল্ ক'রে।

হার্ট ফেল্ ক'রে? সে ত ভোচ্‌কানি লেগেছিল। মিথ্যেবাদী!

মিথ্যেবাদী! কা'ল রাত্রে হরিবোল দিয়ে তোমার সৎকার ক'রে এলুম! কর্ত্তা ঘাট-খরচ দিলেন।

এ কথা ভজিয়ে দিতে পারবি?

এখনি। কাশী মিত্রের ঘাটে গিয়ে দেখ গে, মড়ার খাতায় তোমার নাম জমা আছে।

জমা আছে? আমি মরেছি? ভূত হয়ে এয়েছি? আমি তা হ'লে হাওয়া? এই হাত নাড়ছি, পা নাড়ছি, মাথা চাল্‌ছি—এ সব হাওয়া? আচ্ছা, কেমন হাওয়া দেখি—বলিয়া ফট্‌কের মাথায় এক চড়।

নসী জিজ্ঞাসিল, কি রে, লাগ্‌ল?

কিছু না।

কেমন, প্রমাণ পেলে?

ওর মিছে কথা।

মিছে কথা! আচ্ছা, তোমার শরীরেই তোমাকে প্রমাণ দি। তোমার সে নাক গেল কোথা?

এই এই—এই ত রয়েছে। বলিয়া নাক হাত দিয়া নাক ঘষিতে লাগিল।

নসী বলিল, ও ত হাওয়ার নাক! তোমার মনে হচ্চে যে, ওখানে নাক আছে! বরাবরের অভ্যাস, মানুষ মলেই কি ভোলে! আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্চি যে, তোমার নাক আর ওখানে নেই।

ওখানে নেই ত গেল কোথা?

স্বর্গে। তার সাক্ষী দেখ, কামড়ালে তোমার নাকে দাঁত বস্‌বে না।

আচ্ছা, কেমন না বসে দেখি! কামড়া।

নসীরাম নাকের নাসিকায় বিকট দংশন করিল।

ওরে বাপ রে! বলিয়া নাক নাক ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

ইত্যবসরে নসীরাম তাড়াতাড়ি গিয়া কর্ত্তাকে বলিল, সার, নাক এসেছে।

দলপুষ্টির উৎসাহে সদারাম বলিয়া উঠিলেন, কৈ, কৈ?

এখনি আস্‌বে, সার। কিন্তু আপনিও ওকে ছোঁবেন না, খোকাকেও ছুঁতে দেবেন না।

কেন, কি হয়েছে?

ওর গাল-গলা ফুলে প্লেগের মতন হয়েছিল, সার, ডাক্তার পর্য্যন্ত ওকে ছুঁত না। ওর পরিবারের হাত দেখে ওকে ওষুধ দিত।

কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, পরিবারের হাত দেখে, কি রকম?

ও যে বলে—অর্দ্ধাঙ্গ। যা হ'ক্, সাবধানের মার নেই, আমি আস্‌ছি।

কোথায় চল্‌লে?

মামার বাড়ী।

সকলে বুঝিল, নসীরাম শুঁড়ির দোকানে চলিল। একটু পরে নাক আসিতেই কর্ত্তা একটু পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, এগিয়ো না! এগিয়ো না!

এই দেখুন, কর্ত্তা!

যেখানে আছ, ঐখানে থাক, কাছে এস না!

কাছে না গেলে দেখাব কি ক'রে?

তোমার দেখাবারও দরকার নেই, আমার দেখবারও দরকার নেই।

নাক নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া নাসিকায় হাত বুলাইতে লাগিল। খোকা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওলে, তোল্ নাৎতা দে ত! ধক্কাইকে বয় দেখাই! বোং দেবে!

নাক কি আছে খোকাবাবু! এই দেখ –

খবরদার! খোকাকে ছুঁয়ো না—

চিরকাল ছুঁয়ে আস্‌ছি, আর আজ ছোঁব না?

না। ছুঁতে হয় ত ও-পক্ষকে ছোঁও গে।

কেন ছোঁব না? আমার কি হয়েছে?

তোমার মরণ হয়েছে। তুমি ভূত হয়েছ। বুঝতে পারছ না। গাল-গলা ফুলে মরেছ, জান না?

মাইরি মরিনি, কর্ত্তা, আপনার পায় হাত দিয়ে—

খবরদার বেটা, ছুঁস্‌নি! প্লেগের মড়া—

মহা আতান্তরে পড়িয়া নাক উপস্থিত সকলের কাছে আপীল করিল, কি বিপদ বলুন ত? কি ক'রে বোঝাই, আমি মরি নি?

তোমায় বোঝাতে হবে না, স'রে পড়।

কোথায় যাব?

যেখানে ইচ্ছে! ও-পক্ষের ঘাড়ে চাপ গে!

ও-পক্ষ, কর্ত্তা, আমার নাক কামড়ে দিয়েছে।

বেড়ে হয়েছে! বেটারা সব প্লেগে মরবে। কে কামড়ালে?

নসীরাম।

নসীরাম ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন না, সার! ও আপনার নাক আপনি কামড়ে আমার নামে বদনাম রটাচ্ছে!

একটা চাপা হাসির শব্দ থামিতে না থামিতে খোকা দুই হাতে দুই ছুঁচোবাজী ধরাইয়া ভোটারদলের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, এ কি কাণ্ড!

নসী বলিল, ও কিছু নয়, খোকা একটু আমোদ করছে? চল, খোকা, আমরা খালি বোতলে লেমনেড্ ভ'রে রাখি গে।

ত্রস্ত ভোটারদল একটু ঠাণ্ডা হইয়া বসিতে না বসিতে ঘরের ভিতর একটা দোদমা ফাটিল। এক বাণ্ডিল চীনে পটকা পট্ পট্ করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নসীরাম ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আগুন, আগুন, বাড়ীর দাদায় আগুন লেগেছে। নিমেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ভোটারের দল অবিলম্বে কে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তাহার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পরেই বিপুল রোল উঠল্ -হুররে! থ্রী চিয়ার্স ফর ধনপতি! হিপ-হিপ-হুররে!

নিধিরামের পক্ষ এক জন ভোটার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, আমি আপনাদের পক্ষে ভোট দিয়েছি, মশাই! ওহে, বড় গলা শুকিয়েছে, একটা লেমনেড দাও ত।

নসীরাম জলভরা একটা লেমনেডের বোতল খুলিবার ভাণ করিয়া তৃষিতের হাতে তুলিয়া দিতে, সে বলিল, কি রকম লেমনেড! কৈ, ফচ্ করলে না ত!

ভোটের পর আর ফচ্ করে না, বাবা!

পরদিন বিউটী-বিজলী ধনপতির গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিল। হারপি, শরৎশশী, সরসী উলুধ্বনি করিল। রাঙ্গা-দিদি শাঁথ বাজাইলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
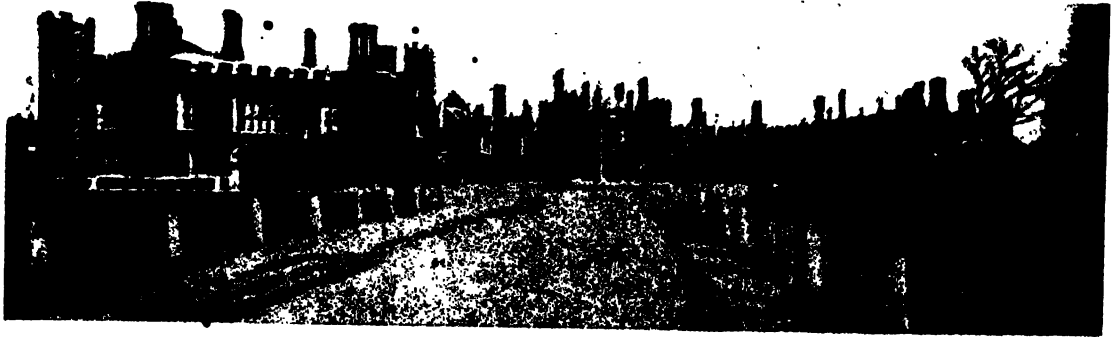
হ্যাম্পটন কোর্ট

হ্যাম্পটন কোর্ট।

লণ্ডনের উপকণ্ঠে—হাইড পার্ক কর্ণার হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে—টেমস নদীর তীরে হ্যাম্পটন একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে নদীর কূলে হ্যাম্পটন কোর্ট একটি রমণীয় প্রাসাদ। সেকালে—বিলাতে টিউডরদিগের সময় যে প্রকার স্থাপত্য ইংলণ্ডে আদৃত হইয়াছিল, ইহা তাহারই নিদর্শন,—কাজেই স্থাপত্য শিল্পালোচকদিগের কাছে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কার্ডিনাল উলসী ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ৯৯ বৎসরের মেয়াদী পাট্টায় এই স্থান ইজারা লইয়া গৃহনির্ম্মাণ করেন। কিন্তু অতিলোভী রাজা অষ্টম হেনরী ইহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বুঝিতে পারিয়া বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন চতুর ধর্ম্মযাজক রাজাকে গৃহটি উপহার দেন। সে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের কথা। বাধ্য হইয়া গৃহ না দিয়া তিনি উপহার দেন। গৃহটি উপহার পাইয়া হেনরী ইহাতে কয়টি অংশ যোগ করেন এবং অনেক সময় এই প্রাসাদেই বাস করিতে থাকেন।

প্রথমে এই গৃহে যে ৫টি চক ছিল, তাহার ২টি মাত্র এখন বিদ্যমান। কিন্তু প্রসিদ্ধ স্থপতি সার ক্রিষ্টোফার রেন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের জন্য আর ১টি চক রচিত করিয়াছিলেন। উইলিয়মের নির্দ্দেশে উদ্যানটি ডাচ প্রণালীতে রচিত হইয়াছিল থাকে থাকে সাজান—ছায়াসুশীতল পথ—১টা গোলকধাঁধার মত ব্যাপার। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট গৃহটি বিক্রয় করেন, কিন্তু পরে

হ্যাম্পটন কোর্ট।

লেডী ডেনহাম।

ইহা ক্রমওয়েলের হস্তগত হয়। তাহার পরও কিছুকাল ইংলণ্ডের রাজারা এই প্রাসাদে সময় সময় বাস করিতেন এবং রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এই প্রাসাদেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে কোন কোন দরিদ্র অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি এই প্রাসাদের অংশবিশেষে বাস করিতে পায়েন। কিন্তু ইহার উদ্যান, ইহার যে সব কক্ষ রাজারাণীদিগের বাসগৃহ ছিল এবং যে সব কক্ষে চিত্র রক্ষিত, সে সব সাধারণের দর্শন জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য, সে তাহার ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগাইয়া রাখে— তাহা বিস্মৃতির অতলতলগত হইতে দেয়

না। আমাদের দেশে ইংরাজ সাহজাহানের দিল্লীর প্রস্তর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন; আর বিলাতে চেষ্টার প্রাচীরটি সংস্কার করিয়া রাখা হইয়াছে—সে প্রাচীরের কোথায় দাঁড়াইয়া রাজা যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, প্রস্তরফলকে তাহার পরিচয় লিখিয়া রাখা হইয়াছে

প্রায় ৪ শত বৎসর যে প্রাসাদে বহু রাজারাণীর, রাজপুত্র-রাজপুত্রীর বাস হইয়াছে, সে প্রাসাদে রাজসজ্জার অভাব থাকিতে পারে না। ৪ শত বৎসরে গৃহসজ্জার ও বাসপদ্ধতির কত পরিবর্তন হইয়াছে; আর সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের স্থান নূতন আসিয়া অধিকার করিয়াছে! কিন্তু

লেডী বিলাসীস্।

সেই সব পুরাতন সাজসজ্জা পরিত্যক্ত হয় নাই। সে সব সযত্নে রক্ষিত হইয়া ইতিহাসের অমূল্য উপকরণরূপে বিরাজ করিতেছে। সে সকলের সহিত ইংরাজের ইতিহাসের কত নৃপান্তর, কত রাজসোহাগিনী রূপসীর স্মৃতি বিজড়িত। তাঁহাদের পালঙ্ক, শয্যা, আসন, সে সব আজও তাঁহাদের স্মৃতি বক্ষে লইয়া এই প্রাসাদের পরিত্যক্ত কক্ষে রহিয়াছে সে সকলে আর কাহারও অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হয় না; কেবল কৌতূহলদীপ্ত দর্শকচক্ষু তাহাদিগকে দেখিয়া একালে সেকালের ছবি মনের পটে আঁকিয়া লইবার চেষ্টা করে। তাহারা যেন মিশরের শব— "মামী"—স্মৃতির কঙ্কালমাত্র।

কাউণ্টেস্ অ। রচেষ্টার

এই প্রাসাদে সেকালের পর্দা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উদ্যানে একটি বিপুলকায় আঙ্গুরলতা আছে; সেটি নাকি বহুকালের কতকালের, ঠিক বলা যায় না; তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ফলিয়া থাকে। ইহার একটি কক্ষে রক্ষী আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "তাহাই বটে। সে প্রশ্ন কেন?" সে বলিল, সে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ছিল· মথুরার গোরাবারাকে সে সৈনিক ছিল; ভারতের রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ, উষ্ণ বাতাস আর বর্ণের বৈচিত্র্য সে আজও ভুলিতে পারে নাই।

মিসেস মিড্লটন

কিন্তু এই যে প্রাসাদ, এখনও ইহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সজ্জা ও সম্পদ—বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র। সেগুলির মধ্যে সার পিটার লেলীর চিত্রের সংখ্যাই অধিক। ভ্যান ডাইক প্রভৃতির অমর তুলিকাপাতে অঙ্কিত চিত্রও যে নাই এমন নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে।

সার পিটার রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজসভার রঙ্গিণীদিগের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সাহিত্যে ঐতিহাসিক টেন বলিয়াছেন, প্রথম চার্লসের রাজসভা শিল্পীদিগের চিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লসের রাজসভার শিল্পীদিগের চিত্রের তুলনা করিলে—ভ্যান ডাইকের অঙ্কি-

কাউণ্টেস অব নরদাম্বারল্যাণ্ড।

চিত্রের সঙ্গে লেলীর চিত্রের তুলনা করিলে বুঝা যায়, অধঃপতন কত গভীর। মনে হয়, আমরা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনাবিলাসকুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছি। আর সেই রাজোচিত সৌন্দর্য্যময়ী অথচ বিনয়সঙ্কুচিতা নারীদিগের দর্শন পাই না; সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এক দল বিপজ্জনক বারাঙ্গনা, তাহারা যেন মানুষকে আকর্ষণ করিতেই চাহে; তাহাদের মুখভাব হীনভাবাত্মক—তাহাতে লজ্জা বা অনুতাপ বিকশিত হইতে পারে না। তাহাদের কর মাংসল, অঙ্গুলী কোমল; তাহাদের অনাবৃত স্কন্ধের উপর তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়াছে; তাহাদের সলিলতরল

কাউণ্টেস ডি গ্রামণ্ট।

দৃষ্টি লালসাকলুষিত; তাহাদের লালসাপূর্ণ অধরে অর্থহীন মৃদুহাসি লাগিয়া আছে। কেহ অবেণীবদ্ধ বিস্রস্ত কেশ-রাশি তুলিতেছে; কেহ বা অলসভাবে অসংযমসহকারে জামার হাতা খুলিয়া বাহুর অমলশ্বেত ত্বক দেখাইতেছে। প্রায় সকলেই অসমগ্রবসনা। অনেককে দেখিলেই মনে হয়—তাহারা এইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছে—শয্যায় পোষাক বিমর্দ্দিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল রজনীযাপন জানাই-তেছে। কটিতট হইতে পোষাক যেন শ্রোণীর উপর আসিয়া পড়িতেছে। তাহারা লজ্জাহীনা—পীবরযৌবনের পিশিতপিণ্ড অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু অঙ্গে

বারাঙ্গনাদিগের মত মূল্যবান অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য। রত্ন, স্বর্ণ, মূল্যবান পরিচ্ছদ—এ সকলের অভাব নাই। শুদ্ধকক্ষের প্রাচীরের মত পর্দ্দার মধ্যে তাহারা বসিয়া আছে—দূরে বিস্তৃত উদ্যান, সেই নির্জ্জন উদ্যান তাহাদের বিলাসকুঞ্জ হইবার উপযুক্ত—তাহাদের কেলীকুঞ্জের উপযোগী বটে।

রাজা প্রথম চার্লস নিহত হইবার পর ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের ভাগ্যবিধাতা হইয়া ভারতবর্ষে ঔরঙ্গজেবের মত আমোদপ্রমোদ বন্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষের স্বাভাবিক আমোদপ্রিয়তা বাধা পাইয়া—প্রাচীর-রুদ্ধগতি প্রবল প্রবাহের মত বলসঞ্চয় করিতেছিল। তাহার পর চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস রাজা হইলে তাহা সংযমের, শ্লীলতার ও শিষ্টাচারের সব সংস্কার ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সে সময়ের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। ক্রমওয়েলের গলিত শব সমাধি হইতে তুলিয়া আনিয়া মস্তক দেহচ্যুত করা হয় ও শূলবিদ্ধ করিয়া ওয়েষ্টমিনষ্টার হলের উপর রাখিয়া লোককে দেখান হয়। মহিলারাও তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন!

সর্ব্বত্র দুর্নীতির স্রোতঃ বহিতে লাগিল আর চরিত্রহীন রাজা ব্যভিচারিণী-বিলাসে সমাজে হীন আদর্শ স্থাপন করিতে লাগিলেন। যে দিন ডাচ জাহাজ টেমস নদীতে প্রবেশ করিয়া ইংরাজ তরী পুড়াইয়া দেয়, সে দিন রাজা ডাচেস অব মনমাউথের সঙ্গে নৈশ আহারে রত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে—বহু লোকসমক্ষে তাঁহার অবৈধ প্রণয়িনীর সঙ্গে কলহ করিতেন। সে তাঁহাকে "আহাম্মুক" বলিত; তিনি তাহাকে গালি দিতেন। সে সব কথা প্রহরীরাও বলাবলি করিত। সে তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিত। একবার তিনি তাহাকে বলেন, তিনি তাহার গর্ভস্থ শিশুর জনক নহেন। সে নির্লজ্জভাবে উত্তর দেয়, "সে যাহাই হউক, তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, তুমিই তাহার পিতা।" তিনি শিশুকে তাঁহারই শিশু বলিয়া স্বীকার করেন এবং দুই জন অভিনেত্রী লইয়া আমোদ করিতে থাকেন।

রাজার বিবাহিতা পত্নী ক্যাথারিন উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার সহচরীদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অবৈধ প্রণয়ের পাত্রীর সহিত পরিচিতা করেন।

রাজার সম্বন্ধে যে সব কথা তাঁহার সমসাময়িক লেখকরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে সব উদ্ধৃত করিতে লজ্জা বোধ হয়। তিনি বহু রমণীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেন এবং তাঁহার লালসা চরিতার্থ করিবার পাত্রদিগকে অর্থ ও উপাধি দিতেন। ঐতিহাসিক গ্রীন বলিয়াছেন—"Mistress followed mistress, and the guilt of a troop of profligate women was blazoned to the world by the gift of titles and estates." তাঁহার জারজ পুত্ররা অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত হইত।

বারবারা পামাও নাম্নী রমণীর সহিত তাঁহার অবৈধ ঘনিষ্ঠতার ফলে গ্রাফটন ডিউক পরিবারের উদ্ভব। নেল গুয়েন নাম্নী অভিনেত্রী ও বারাঙ্গনার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার ফলে সেণ্ট আলবানসের ডিউকদিগের উৎপত্তি। রাজা তাঁহার এক জন প্রণয়িনীকে পোর্টসমাউথের ডাচেস করিয়াছিলেন। নেলী যখন বালিকা, তখন সে একটি পানশালায় পরিচারিকার কায করিত। ক্রমে সে রঙ্গালয়ে কমলালেবু বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং তখন রঙ্গালয়ে নারীর ভূমিকায় পুরুষের পরিবর্তে নারীরা অভিনয় আরম্ভ করিলে অভিনেত্রী হয়। শেষে সে চার্লসের অঙ্কশায়িনী হইয়া তাঁহার দুই পুত্রের জননী হইয়াছিল।

চার্লসের রাজসভা সুন্দরীবৃন্দে সুশোভিত ছিল। সার পিটার লেলী সেই সুন্দরীদিগের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

হ্যাম্পটন কোর্টে তাহার অধিকাংশ রক্ষিত।

এই চিত্রসম্পদে হ্যাম্পটন কোর্ট সমৃদ্ধ এবং এই চিত্রগুলি দেখিবার জন্যই নানা স্থান হইতে শিল্পী ও শিল্পরসিকরা হ্যাম্পটন কোর্টে আসিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রাসাদে সার পিটার লেলী ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের অঙ্কিত চিত্রও আছে। সে সকলের মধ্যে ভ্যান ডাইকের অঙ্কিত তাঁহার প্রণয়িনীর চিত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লণ্ডনের উপকণ্ঠে পল্লীশোভার মধ্যে অবস্থিত নদীকূলে দণ্ডায়মান এই প্রাসাদটি সত্য সত্যই মনোরম।

ষষ্ঠীর প্রভাত

পূজার ছুটীতে চার জনে আমরা একত্র বাড়ী যাচ্ছি। প্রতাপ ও আমার বাড়ী একই গ্রামে, উমাকান্তদের গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ী আরও ক্রোশ দেড়েক যেতে হয়, সেখান থেকে প্রায় ১২ ক্রোশ পরে শ্রীগোবিন্দদের বাড়ী। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেণ হ'তে কুষ্টিয়ায় নেমে ষ্টীমারে উঠ্লাম। সারা রাত্রিটাই ষ্টীমারে কাটাতে হবে, পরদিন প্রায় বেলা ৯টার সময় পাবনায় পৌছুবে। জাহাজে ভয়ানক ভীড় হয়েছে, বিছানা পেতে যে চার জনে শোব, তার ত কোন উপায় দেখলাম না; ভীড় ঠেলে খুঁজে খুঁজে দেখি যে, জাহাজের মুখের কাছে একটু যায়গা খালি আছে, জলের উপর ঠাণ্ডা লাগতে পারে মনে ক'রে উমাকান্ত একখানা র‍্যাপার বের ক'রে রেখেছিল, সেইখানা বিছিয়ে সেইখানে চার জনে ব'সে পড়লুম। যদি ও মেসে রীতিমত আহার ক'রে শিয়ালদহ ট্রেণে উঠেছিলুম, তবু কাঁচড়াপাড়া না ছাড়াতে ছাড়াতেই আমার আবার একটু-একটু ক্ষিদে পেতে লাগল; এঞ্জিনের আগুনে আর জঠরের আগুনে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন বোধ হয়, একটু সহানুভূতির সম্বন্ধ আছে, নইলে রেলে চড়লেই আমার ক্ষিদে পায় কেন? এর উপর আবার জাহাজে জলের হাওয়ায় সেই ক্ষিদেটা যেন আরও চাগিয়ে উঠলো; ক্ষুধা, তন্দ্রা এ-সব সংক্রামক; আমি ক্ষিদের কথা বল্তে-ই উমাকান্ত বল্লে, "মিথ্যে নয়, কিছু খাবার হ'লে হ'ত।" প্রতাপ-ও বল্লে, "আমিও নারাজ নই।" শ্রীগোবিন্দ কোন কথা না ব'লেই ট্রাঙ্কের চাবি খুলে একটা পিকফ্রিনের বিস্কুটের খালি বাক্স বা'র কর্লে, তার ভেতরে ছিল স্লাইসকরা খানকতক রুটী, গোটা আষ্টেক দশ আলুচিপ্স আর কাগজে মোড়া একটু নুণ-মরিচের গুঁড়ো; চার জনে মিলে সেগুলো সব নিঃশেষ করলাম; একে জাহাজ, তার ওপর পাউরুটী, সুতরাং এক এক কপ্ গরম চা'র কথা যে মনে পড়েছিল, তা বলাই বাহুল্য, তবে অত রাত্রে তা'র ত কোন উপায়ই নাই। এখন ভাবনা হ'ল, শুধু ব'সে ব'সে কি ক'রে রাতটা কাটান যায়? আমি বল্লাম, "এস, একটু গল্প-সল্প করা যাক।" প্রতাপ বল্লে, "কি আর গল্প করা যায়?" শ্রীগোবিন্দ বল্লে, "আত্ম-প্রশংসা আর পরনিন্দা, এর চেয়ে রুচিকর ও পোষ্টাই গল্প পৃথিবীতে নাই, এস, তাই করা যাক্।"

প্রথমেই সুরু হ'ল, আমাদের নিজের কলেজের প্রশংসা আর প্রেসিডেন্সি কলেজের নিন্দা। মিনিট দশেকের ভিতরেই আমরা সম্পূর্ণ সন্তোষপ্রদভাবে প্রমাণ ক'রে ফেল্লাম যে, প্রেসিডেন্সিটা কেবল জাঁকজমক দেখানো আর বাবুগিরির আড্ডো, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ অথচ পড়াশুনো কিছু-ই হয়-না; বড়মানুষের ছেলেরা কেউ কেউ কাঠের উপর বসলে কষ্ট হয় ব'লে বাড়ী থেকে কুশন্ এনে বেঞ্চির উপর পেতে বসেন, ডেপুটীদের ছেলেরা আট আনা গ্লাস ঘোলের সরবৎ আর চার চার আনার গোলাপজলভরা তালশাঁস সন্দেশ খান, উকীল-পুত্তুরদের জ্বালায় হোটেলে আর চিকেনরোষ্ট পাওয়া যায় না, আর প্রোফেসররা-ও সব ফাঁকি-ই মারেন, তবে সায়েন্সটা — — —মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রতাপ বল্লে, "ছাই! ছাই! ওই ল্যাবোরেটরীর-ই যা বার-ফট্কাই, টাকা আছে, যন্তর-কন্তর ঢের আনিয়েছে, কিন্তু আমাদের ওখানে কেমিষ্ট্রী যা পড়ানো হয়, কোথাও আর তা হয় না, তা ভাঙ্গা টেষ্ট-টিউব-ই হোক্ আর মরটারের পেশল-ই না থাক।" প্রেসিডেন্সির নিন্দে কর্তে কর্তে সার আশুতোষকে নিয়ে পড়া গেল। আশুবাবুর দ্বারা দেশের অন্য উপকার হোক্ না হোক্, তাঁ'র কৃপায় এই বাঙ্গালায় দিনের পর দিন অনেক নব-রসিক তয়ের হয়ে উঠ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; খবরের কাগজে কাপির অকুলান হ'লেই আছেন সার আশুতোষ মুখুয্যে! ব্যঙ্গের ছবির নতুন রঙ্গ না পেলে-ই দাও একটা তানপুরা হাতে গোঁপের উপর নোলক ঝুলিয়ে মুখুয্যে মশাইকে সরস্বতী সাজিয়ে! আমরা-ও ষ্টীমারে ব'সে মাতৃভাষার অঙ্গে অঙ্গে ইংরিজি লবেজ জোড়া দিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলাম যে, আশুবাবুর জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা— অ-কালীঘাট কাশীপুর বিশ্বসংসার অধঃপাতে যাচ্ছে;

আজ যদি মুখুয্যে মহাশয় বৃন্দাবনবাস করেন, তা হ'লে শতকরা দশ জন বই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হবে না, বি, এ, একজামিনের ফি হবে ১৫ সিকে, আর কমার্শিয়াল ক্লাশ খুলে বছর বছর ২।৩ শত গ্লাডষ্টোনওয়ালি, রেলি-ব্রাদার, বার্ক মায়ার, হরেক্সম গোয়েস্কা, ওয়ারমল ঝুনঝুনওয়ালা, ত্রিভুবন দাস, রেবতীমোহন পাল চৌধুরী, মথুর কুণ্ডু প্রভৃতি মার্চ্চেণ্ট বেরিয়ে পড়বে, ফি জনের ব্যাঙ্কের খাতায় স্কলারসিপ জমা ২।০ লাখ টাকা ক'রে।

অমৃতে-ও অরুচি হয়, যখন এক দিন মহাপ্রলয়ের-ও সম্ভাবনা আছে, তখন আশুবাবুর নিন্দার বন্দনায়-ও বেদব্যাস অবশ্য বিশ্রাম লইতে পারেন। কাজে-ই আমাদের ও আলাপাভিনয়ের পালা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হ'ল; কে এক জন বল্লে, "এস, খানিক সুরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে পড়া যাক্।" প্রতাপ বল্লে, "না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে জিভ কামড়ে ফেলবেন, এখন আর তাঁকে ঘেঁটিয়ে কাব নেই, কা'ল সকালে সময় পাই ত দেখা যাবে।" আমি বল্লাম, "যাক্ ভাই, ওসব ছেড়ে দিয়ে একটু গল্প-সল্প করা যাক্।" শ্রীগোবিন্দ বল্লে, "মুখে মুখে আর কি গল্প করা যাবে, একটা আলোফালো থাক্‌লে রবিবাবুর নষ্টনীড় খানা বা'র ক'রে একটু পড়া যেত।"

আমি। দুর্গার ইচ্ছেয় ভালই হয়েছে, আলো নেই; একে আমরা নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবক, ক'মাস বাদে আজ নীড়ে ফিরছি, সেটা গিয়ে আর নষ্ট ক'রে কায নেই। তা ছাড়া এ কি! খালি বই বই বই —পড়া পড়া পড়া! একে ত একজামিনের পড়া নিয়েই হাড় জ্বালাতন, তা'র ওপর প্রার্থনা করবে —বই খোলো, রাঁধবে বই খোলো, স্ত্রীকে পত্তর লিখবে—বই খোলো, বাসরঘরে বসে দুটো কথা কইবে—বই খোলো, বসবে দাঁড়াবে হাঁটু গাড়বে সেকৃষ্ণা ও করবে, বই খোলো; একটা রূপকথা বলবার জন্যেও বই চাই!

শ্রীগোবিন্দ। গল্প কোন্ জন্মে শুনেছি যে, বলব ভাই; এখনকার মা-ঠাকুরমারা-ও রূপকথা বলেন না। গল্প বল্‌বার শক্তিটে-ও যেন সকল দেশে ক'মে আসছে। আজকালকার ইংরিজী নভেলে-ও আগেকার স্কট, ইলিয়ট, হাইডা, জেমস, পেইন, উইল্‌কি, কলিন্স টলিন্সের মত গল্পের জমাট দেখা যায় না; সেকালে ইংরাজদের মধ্যে গল্প বলতে পারা একটা সামাজিক গুণ ব'লে গণ্য হ'ত।

উমাকান্ত। শুনেছি, বিদ্যাসাগর মশায় খুব গল্প বলতে পারতেন; কেউ শুনতে চাইলে নাকি বলতেন, "কি রকম গল্প শুনবি? দু'মিনিটে, পাঁচ-মিনিটে, না আধ-ঘণ্টে?"

প্রতাপ। আচ্ছা, একটা তিন-মিনিটে গল্প শোন যদি আমি বলতে পারি, কিন্তু দেখো কোকন, নিন্দে-টিন্দে ক'র না কেউ।

আমি। রসনাগ্রে মুদ্রিত ও হাঁমার-ডেকে প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত উপন্যাসের সমালোচনা নিষেধ, তুমি নির্ভয়ে ব'লে যাও।

প্রতাপের গল্প

আমতাড়া গাঁয়ে নদে বদে দুই ভাই একসঙ্গে বাস ক'রে সংসার করত। অবশ্য বাপ আদর ক'রে নাম রেখেছিল নবদ্বীপচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ। কিন্তু একে জাতে তাঁতি, তার পর নিজের হাতে সূতো টানা দেয়, মাজা করে, মাকু ঠেলে, তাঁত বোনে, তার ওপর আবার সেই কাপড় মাথায় ব'য়ে হাটে গিয়ে বেচে আসে! এমন শ্রমশীল কষ্টপটু লোককে ভদ্রলোক না বাবুরা নবদ্বীপচন্দ্র বা বৈদ্যনাথ ব'লে ডাকলে মহামান্য চাকরী-পেশার বা পরমুখাপেক্ষী আলস্যের অবমাননা করা হয়; সুতরাং নদে বদে ব'লেই তারা গাঁয়ের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত ছিল। দুই ভাই-ই বিবাহিত, ছেলেপুলে এখন-ও কারুর কিছু হয় নি। বড়র পরিবারকে সকলে বোল্‌ত পুনি বৌ অর্থাৎ পূর্ণিমা; ছোট বৌয়ের নাম ছিল সুখময়ী, লোকে ডাকত সুখি-বৌ ব'লে।

মেটে ঘর, খড়ের চালা, গোলপাতার গোয়াল আর ঢেঁকিশালা, রান্নাঘরখানি-ও গোলপাতার, কিন্তু সব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গুছন-গাছান, নিত্য গোবর দিয়ে নিকন-চিকন, ডান দু পাশে দুটি দুটি ক'রে চারটি মরাই, দেখলে মনে হ'ত, যেন মাদ্রাজীর পর্ণ-কুটীর। উঠানের মাঝখানে একটি তুলসীমঞ্চ, এককোণে একটি শিউলিফুলের গাছ, দরজায় ঢুকেই বাঁ পাশে একটি আতাগাছ; ধারে নানা রঙের কতকগুলি কল্কাকলির গাছ, দুটো একটা বেলফুলের চারা, আর সমস্তে সমস্ত রঙবেরঙের দোপাটি ফুল

ফুটে উঠানখানি যেন আলো ক'রে রেখে দেয়। গোয়ালটি দুভাগ করা, এক ভাগে থাকে দুটো হেলেগরু আর এক ভাগে দুটি দুধোলো গাই ও গুটি তিনেক বাছুর। খিড়কীতে ঘরের কানাচে নদে নিজেদের ব্যবহারের জন্যে খানিকটে ভুঁয়ে কিছু তামাকগাছ দেয়, একটি বড়রকমের ডোবা আছে, পাড়ে একটা তালগাছ, দুটো খেজুর গাছ, গোটা ছয়েক আম, গোটা তিনেক পেয়ারা, দুটো কুল আর দুটো কাঁঠাল, একটা সজনে আর ঝাড় কতক কলাগাছও আছে; পূবদিক আর দক্ষিণ-দিকে দুটো মাচা আছে, তাতে লাউ, কুমড়ো, শিম, পুঁই, শশা প্রভৃতি যখনকার যা তরিতরকারী জন্মায়; একটুখানি বেগুনবাড়ীরও মত আছে, নাচে ঢুকতে বাঁ দিকে মস্ত একটা তেঁতুল গাছ। তাঁতশালখানি তারই উত্তরে, একধারে দুখানি তাঁত, অন্যধারে একখানি আমকাঠের চৌকি, লোক-জন এলে সেইখানেই বসে।

এই লক্ষীর শ্রীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যে দুই ভাইয়েতে যেমন ভাব, দুই যায়ের মধ্যেও তেমনি মায়ের পেটের বোনের মতন প্রাণের টান। এই কুঁড়ের মধ্যে কুড়েম নেই, লাগালাগি ভাঙ্গাভাঙ্গি নেই, হিংসে নেই, খিচখিচি কচকচি ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি নিত্য ব্যামোর বায়না প্রভৃতি কোন হাঙ্গাম-ই নেই। নদে-বদে দু'ভাই মিলে হাসিমুখে ধানজমীটুকু চষে, মাথায় ক'রে ধান-বিচলী ঘরে তোলে, চাষের অবকাশে ধুতি বোনে, শাড়ী বোনে, গামছা বোনে, আর কিছু কাপড় জমলে দু'ভাইয়ে একসঙ্গে হাটে গিয়ে বেচে আসে।

দুই বৌ ঝাঁটপাট দেয়, ঘর নিকয়, গোয়ালের পাট করে, আর রান্নাবান্না সারা হ'লে এক ঘুমের পর দুই যায়ে-টেকো নিয়ে ব'সে যায়, বৌয়েদের কাটা সুতোয় নিজেদের ঘরের ব্যবহারের কাপড় গামছা-টামছা তৈরী হয় আর বিক্রীর কাপড়ের জন্যে মিহি সুতো মরদেরা হাট থেকে কিনে আনে। নদের হাতের 'জন্ম-এয়ো-স্ত্রী' ডুরে, আর বদের পাড়ওয়ালা গামছার একটা নামডাক আছে, বাবুদের বাড়ীর জোগান থাকতে-সে শাড়ীগামছা আর হাট পর্য্যন্ত পৌঁছুতে-ই পায় না।

সুতা কাটা ছাড়া বৌ দু'টি সময় পেলেই ঘরের ব্যবহারের জন্য কাঁথা সেলাই করে, বালিসের ওয়াড় তৈরী করে আর বিক্রীর জন্য রঙিন্ সুতো মিলিয়ে শিকে বোনে, কড়ির ঝাঁপি তৈরী করে, বছরে দু'একখানা রঙিন ফুলকাটা বা গাছপাখী এবং রাম-রাবণের ছবি তোলা বাহারে কাঁথা-ও প্রস্তুত হয়। কখন কখন বা মাটীর চাঁদ, চৌক, মাছটাছ গ'ড়ে তা'র ওপর নরুণ দিয়ে ঝাঁপ ক'রে, ক্ষীরের খাবার সন্দেশ প্রভৃতির ছাঁচ প্রস্তুত করে। এই সব জিনিষ আর উদ্বৃত্ত ঘুঁটে বিক্রী ক'রে যা কিছু জমে, তা' থেকে বছরে বৌয়েদের দু'একখানা রূপার গহনা তৈরী হয়।

দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান ক'রে অহোরাত্র সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে বেড়ান, জীব কিসে তাঁ'রই মতন একমাত্র হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়, এই তাঁ'র অস্তিত্বের উদ্দেশ্য; কিন্তু তিনি দেখেন যে, মহামায়ার প্রভাবে মানব সংসারে ম'জে আপনা-আপনি প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে এমন বিহ্বল হয় যে, উচ্চাঙ্গের প্রেমের জন্যে তাদের প্রাণে আর পিপাসা জাগে না। কোথাও পিতাপুত্রে, কোথাও মাতা-কন্যায়, কোথাও শাশুড়ী-বৌয়ে, কোথাও ভাইয়ে-ভাইয়ে, কোথাও যা'য়ে-যা'য়ে এমনি ভাব যে, মড়া না ঘাড়ে কল্লে কেউ আর "হরিবোল, হরিবোল" বলে না। দেবর্ষি ভাবলেন যে, এই মানব-প্রেমের উচ্ছেদ না ঘটালে দেব-প্রেমের মর্ম্মভেদ মানব আর কিছুতেই করতে পারবে না। তখন তিনি যোগ-বলে নিজদেহ হ'তে আর একটি মূর্ত্তি উৎপাদন করলেন; আবির্ভূত হইয়াই মূর্ত্তিটি কর-যোড়ে দেবর্ষির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, -ইনি অত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, সাদা বাঙ্গালাতেই বল্লেন,—"ভায়া হে, খবর কি, আমাকে কেন আর টেনে বা'র কল্লে?" দেবর্ষি বল্লেন, "আমি একা সকল কার্য্য দেখে উঠতে পারি না, তাই আমার একটি ডেপুটীর প্রয়োজন, তুমি-ই সেই ডেপুটী, আমার নাম হ'ল দেবর্ষি নারদ, আর তুমি হ'লে নারদ মুনি; আমি বাজাই বীণা, আর তোমায় বাজনা দিলুম এই দুটি কাঠী, ঠকাঠক বোল বাজাবে, আর ঐ কোণে যে ঢেঁকির আকার একটি বস্তু প'ড়ে আছে, ঐটি আরোহণে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে কলহের সৃষ্টি কর, ঐ ঢেঁকির প্রভাবে তুমি লোকের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে, কলহের বীজবপনের জন্য অমন সারগ্রাহী ক্ষেত্র আর কোথাও পাবে না; মানুষ

মানুষের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে দগ্ধ হচ্ছে, তুমি তাদের সেই প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাও, পরে আমি তাদের হরিপ্রেম দিয়ে উদ্ধার করব।" ডেপুটী নারদ বল্লেন, "প্রভু, যে আজ্ঞে, কিন্তু এই ঢেঁকিযানটি আপনি কিরূপে আবিষ্কার কল্লেন?" দেবর্ষি বল্লেন, "যখন আমি বিষকন্যা কলহদেবীকে আকর্ষণ ক'রে বক্ষ হ'তে তোমায় উৎপাদন কল্লুম, সেই সময়ে আমার জটাদেশ হ'তে ঐ ঢেঁকিযান নির্গত হ'ল, কলির শেষে এই যানের নাম হবে 'বাই-প্লেন'; এই 'বাই-প্লেন' পৃথিবীতে প্রচলিত হ'লে আধিভৌতিক প্রেমের একেবারে গয়ার শ্রাদ্ধ হয়ে যাবে।"

সেই অবধি ডেপুটী নারদমুনি কখন বৈঠকখানায়, কখন রান্নাঘরে, কখন কলতলায়, কখন পুকুরঘাটে, কখন থানায়, কখন আদালতে, কখন সভায়, কখন সম্মিলনীতে, কখন কাউন্সিলে, কখন কংগ্রেসে দু'কাঠী বাজাইয়া ঢেঁকি চড়িয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন।

এই শ্রমশীল পরিবারে অবসরবিনোদনের জন্য আমোদ-আহ্লাদ-ও আছে। ইহারা বৈষ্ণব, প্রায়ই দুই ভাই সন্ধ্যার পর গোপীযন্ত্র ও খঞ্জনী বাজিয়ে গান করে, এক এক দিন পাড়ার আর পাঁচ জন জুটলে খোলখোল বাজিয়ে কীর্ত্তন-ও হয়। বৌ দু'টির-ও কুমোর-ঠাকুরঝি, নাপিতদিদি গোছ ইয়ার-বন্ধুরা আছেন; এক এক দিন দুপুরবেলা সবাই মিলে তাস বা দশপঁচিশ খেলে আর মরদেরা ক্ষেতে খামারে থাকলে একটু গানটান-ও হয়; বৌয়েদের বড় একটি সখের গান ছিল :—

সে দিন গেছে ব'য়ে বঁধু,
সে দিন গেছে ব'য়ে।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি,
করতে আমায় নিয়ে॥
আমার লেগে বনের বাগে
ছুটতে লুঠতে ফুল,
আপন হাতে তাই দে' মোর
বাঁইদে দিতে চুল,
আর বাঁশী থুয়ে হাসি মুয়ে
থাকতে বঁধু দাসীর বদনাপনে চেয়ে॥
ইত্যাদি।

বছর চার পাঁচ আগে ভাদ্র মাসের অপর পক্ষের আরম্ভে এক দিন দুই ভাই সকাল সকাল কচুশাক-সিদ্ধ দিয়ে দুটি পান্তাভাত খেয়ে কাপড়ের বোচকা ঘাড়ে ক'রে হাটে যায়। হাটে তখন পূজার বেচা-কেনা আরম্ভ হয়েছে, হেটো-ও বেশী, খদ্দের-ও বেশী। তোলো, ভিজেল, কলসী, ভাঁড় প্রভৃতি কুমোর-সজ্জা, ধামা ধুচুনী কুলো ডালা চাঙ্গারী ওড়া প্রভৃতি ডোম-সজ্জা, বঁটী কুরুণী হাতা বেড়ী পিঁড়া দেরকো কেরোসিনের ডিবে কাজলনাতা আরসী চিরুণী রুলী তুলসী মালা গিল্‌টার আংটী চীনের সিঁদুর চুলের ফিতে শাঁখা রং-বে-রংএর কাচের চুড়ী, গেঞ্জী ছিটের জামা পিনে রঙীন টুপী; চাল, ডাল, ঝুনো নারিকেল, মধু, মাদুর আর ধুতি সাড়ী গামছার ত কথা নেই—সার সার দোকান ব'সে গেছে। হেটো বেচ্‌চে, খদ্দের কিন্‌চে, ভাল্লুকওয়ালা ভাল্লুকনাচ দেখাচ্ছে, জুয়ারী ছক পেতে ঘূরণী ঘুরাচ্ছে, বৌরূপী কালী সেজে দোকানে দোকানে প্রণামী আদায় কচ্চে, চোররা তক্কে তক্কে ফিরচে, ভিখারীরা আশীর্ব্বাদ-ও কচ্চে, গালা-গালি ও দিচ্চে। চৌকিদার ল ও অর্ডার বজায় রাখার খাজনা আদায় কচ্চে; নটীরা নিমতলায় ব'সে পানের খিলি বেচ্চে আর তারই পাশে নাপিতেরা ব'সে নগদ দাড়ি কামাচ্ছে, ঢোকরা ছুতরদের ঘাড় ছেঁটে দিচ্চে। বেলা তিন প'হর পোয়াতেই নদে-বদের মজুদ মাল সব বিক্রী হয়ে গেল। দুই ভাই হাটের কাছের পুকুরে গিয়ে দিব্যি ক'রে মুখ-হাত ধুয়ে কিছু ছোলা সিদ্ধ, মুড়ি আর তেলেভাজা কচুরী কিনে জলপান করতে ব'সে গেল, সে দিন মুনাফাটা ভাল রকম হয়েছিল ব'লে একটু বাজে খরচ ক'রে ফেল্লে—দুভায়ে দু'পয়সার পরম নানখাতাই কিনে।

জলপান সেরে দু'ভায়ে একত্রে ঘরে ফিরচে; দু'চারটা জিনিষ যা' সওদা করেচে, ছোটই তা হাতে ক'রে নিয়েচে, একটি লম্বা সরু থলের ভিতর টাকা পয়সা পুরে বড় সেটি কোমরের কাপড়ের নীচে জড়িয়ে রেখেছে; দাড়ি কামাবার একটি পয়সা পর্য্যন্ত দরকার হ'লে ছোট তা চেয়ে নেয়, নিজের হাতে রাখে না। বড় কতবার নিজের মুখে বলেচে, "বদে, এক আধটা ট্যাকা হাতখরচা নিজের কাছে রাখিস্ না," ছোট উত্তর দিয়েচে, "দাদা, ও সব হিসেবপত্তর আমি বুঝি না, দরকার হলেই ত তুমি

দাও, তার আবার কি।" বদে ও কখন মনে করে না যে, আমি দাদার হাততোলায় আছি, সুখি-বৌ-ও মনে করে না যে, আমি বড় দিদির পিত্যিশী। ভায়ে-ভায়ে এত ভাব, ডেপুটী নারদের প্রাণে সইতে পারে না; সুতরাং এরা যখন ফিরি পথে, তিনিও তখন অম্বরীক্ষে ঢেঁকি-রথে। গল্প না করলে পথ চলা যায় না, দুই ভায়ে নানান কথা নিয়ে গল্প সুরু হ'ল। হাটে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কে কেমন লোক, ছিচরণের এ হাটে সব কাপড় বিক্রী হ'ল না, একটা পয়সা যেন বেশী পড়ল মনে হচ্ছে, কিন্তু চিনিবাসের হাতের ধ মা যেমন সুটপ, তেমনি টেঁক-সই, এই সাড়ে সতের টাকার মধ্যে চৌকীদারী দিয়ে দু'টাকা সপাঁচ আনা খাজনা দিতে হবে, এই রকম সব কথাবার্ত্তা চলছে। খাজনার কথা কইতে কইতে জমীদারের কথা এসে পড়ল; তখন তারা পাঁচপাড়ার কাছাকাছি এসেছে। আর পোয়া পাঁচেক পথ গেলেই পদ্মবিলের পরে আমতাড়া গাঁ। প্রথমেই নিজেদের জমীদারের সুখ্যাতি-অখ্যাতি, আয়-ব্যয়, দানখয়রাত, ক্রিয়াকর্ম্ম, লাঠির জোর, মামলা মকদ্দমার জেরখোর থেকে আরম্ভ ক'রে সাতক্ষীরে,নড়াল,তাড়াস, লোহজঙ্গ, ভাগ্যকুল প্রভৃতি বাঙ্গালার বিবিধ জমীদারের কথা হ'তে লাগলো; কথায় কথায় বদে ব'লে ফেললে, "যা বল তা বল দাদা, শুনেছি, গঙ্গামণ্ডলের মত জমীদারী ভূভারতে নেই।" নদে বল্লে, "দূর বোকা, জমীদারীর মত জমীদারী যদি বলতে হয় ত বার-বন্দ, বেহ্মাণ্ড ঘুরে দেখ্, অমন মহল আর কোথায় দেখ্‌বি না।" (ও হরি! বেহ্মাণ্ড নবনে কি, বাহারবন্দই বা কোথায় আর গঙ্গামণ্ডলই বা কোথায়, দু'ভায়ের কেউ-ই তা কিছু জানে না, লোকের মুখে দু'টো নাম শুনেছে মাত্র; কেউ যদি বোলতো, গঙ্গামণ্ডল মেদিনীপুর জেলায় শ্রীরাম-পুরের গোসাইদের জমীদারী আর বারবন্দটা খড়দার বিশ্বাসদের বৰ্দ্ধমানের এলাকায়, তাতে নদে-বদের আপত্তি করবার কিছুমাত্র দলিল ছিল না।) কিন্তু নদে যখন কথার উপর ব'লে ফেলেছে, গঙ্গামণ্ডলের চেয়ে বারবন্দ বড়, তখন আর কথা পালটাতে রাজী নয়; বদে ও নিজের মত পরিবর্ত্তন করতে কোন মতে-ই প্রস্তুত নয়। এ বলে বারবন্দ বড়, ও বলে গঙ্গামণ্ডল বড়। সংসারে মতের দ্বন্দ্ব বড় শক্ত দ্বন্দ্ব; জিতের জিদ কেউ-ই ছাড়তে রাজী নয়; স্নেহের খাতিরে, ভালবাসার নেশায় ভাইকে ভদ্রাসনের ভদ্র ভাগ ছেড়ে দেওয়া যায়, বাগান জমীদারী দেবসেবা নগদ অর্থ সবের শ্রেষ্ঠ অংশ সহজেই দেওয়া যায়, কিন্তু মতের আধিপত্যের, জিতের আধিপত্যের, জিদের দম্ভের সূচ্যগ্রপরিমিত অংশাণু ও ত্যাগ করা যায় না। জিতের জিদ বজায় রাখবার জন্যই স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত পাশা খেলায় সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ও সহধর্ম্মিণীর উপর স্বামিত্বের স্বত্ব ত্যাগ ক'রে বসেছিলেন, তা নদে-বদের কা কথা!

বদে বল্লে, "ঐ দাদা তোমার কেমন একটা গোঁ, তুমি জান, গঙ্গামণ্ডলের সালিয়ানা মুনফা সাত কোড় টাকা!"

নদে। কি কোড় ফোড় দেখাচ্ছিস্ রে ছোঁড়া, বারবন্দের জবানবন্দী হচ্ছে পচিশ লাখ টাকা।

বদে। কিন্তু সদর খাজনা দাখিল ক'রে হস্তবুদ কি থাকে, তা জান? কিন্তু গঙ্গামণ্ডলে সদর খাজনা একেবারে মাফ্, তার উপর সাত খুন রেহাই।

নদে। ওঃ, বারবন্দের এলেকাটাই কি! উত্তুরে ঢোল সুমুদ্দুর আর দক্ষিণে কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির।

বদে। দাদা যে ঢোল সুমুদ্দুর ঢোলসুমুদ্দুর করছ, ঢোলসুমুদ্দুর কোথায়, তা জান?

নদে। নে, হয়েছে হয়েছে, তুই খুব পণ্ডিত হইচিস্ বদে, পিতের তত্তুল্লি বড় ভাই, এলি কি না তাকে জ্ঞান দিতে, ঢোলসুমুদ্দুর দেখাতে। নবদ্বীপে গেছিস্ কখন ও, যদি কখন পুণ্যি ক'রে থাকিস্, নবদ্বীপে গিয়ে দেখে আসিস্, সুমুদ্দুর কাকে বলে।

বদে। দাদা, তোমার পুণ্যি দেখানটা ভাল হয়নি, পাপমুখে বল্‌তে নেই, আমি বরং একবার আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দর্শন ক'রে এইছি, তোমার বরাতে যে তা ও ঘটে নি।

নদে। কি ছারকপালে, তুই আমার বরাৎ দেখাস্? কার বরাতে খাস্, তা জানিস্?

হাট থেকে যাত্রা করেছিল দু'ভাই, পাশাপাশি ঘেঁসা-ঘেঁসি চল্‌তে চল্‌তে, খানিক পথ এসেই একটু একটু সরতে সরতে এখন রাস্তার এ কিনারায় এক জন ও কিনারায় আর এক জন। নদের ঘাড় বেঁকেছে পূর্ব্বমুখো, আর বদের বেঁকেছে পশ্চিমমুখো। আর উপরে বাই-প্লেনে চ'ড়ে ডেপুটী নারদ ঠকাঠক্ দো'কাঠী বাজাচ্ছেন। খাওয়ার

খোঁটা খেয়েই বৈদ্যনাথ মুখ বন্ধ ক'রে ফেল্‌ল ; নবদ্বীপচন্দ্র তাইকে উল্লেখ ক'রে আরও দু'চারটে কথা বলবার পর কোন উত্তর না পেয়ে, মুখ গোঁজ ক'রে হন্ হন ক'রে এগিয়ে প'ড়ে একেবারে বাড়ী ঢুকলো ; প্রায় দশ মিনিট পরে বৈদ্যনাথ-ও আস্তে আস্তে ঢুকে খিড়কী থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

রান্না ভাতবেন্নুন হেঁসেলে পড়ে-ই পচতে লাগলো, সে রাত্রে বড়বৌ একবার এঘর একবার ওঘর ক'রে স্বামীকে দেওরকে কত সাধ্যসাধনা কল্লে, কত মাথার দিব্বি দিলে, কিন্তু কিছুতে-ই কিছু হ'ল না, কাকে-ও উঠিয়ে দু'গাল ভাত মুখে দেওয়াতে পাল্লে না। 'কি হয়েছে গো ?' 'কেন অমন ক'রে রয়েছ ?' 'মুখে জলটা দিলে না, শুয়ে পড়লে ?' এর উত্তরে না রাম না গঙ্গা ! বড় একবার বলেছিলো, 'বড্ড মাথা ধরেছে,' আর ছোটর বুঝি বুকে ব্যথা। কাযেই বউ দুটো-ও উপসী থেকে খানিক ব'সে কেঁদে কেঁদে যে যার ঘরের মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কত বৎসর পরে উষাসমাগমে সূর্য্যদেব বঙ্গের একটি পল্লীকুটীরে নিত্য-অভ্যাসমত সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির পবিত্র চিত্র দর্শন করিয়া দৈনিক যাত্রা আরম্ভ করিবার আশায় আকাশপ্রান্ত হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সুখি-বৌ যেন দুঃখের বোঝায় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া মাত্র অভ্যাসের বশে উঠানে ঝাঁটা বুলাইতেছে আর পুনি-বৌ এক হস্তে গোয়াল আর অপর হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছে ; গাইটা যেন করুণ দৃষ্টিতে বড়-বৌর মুখের পানে চেয়ে আছে, আজ প্রভাতে বাছুরগুলির কচি অঙ্গে আর সে চাঞ্চল্য নাই, চালের বাতায় টাঙ্গান দাঁড়ের উপর টিয়া পাখীটি ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে আছে, সে না খুঁটছে বাসী ছোলা, না বলছে রাধাকৃষ্ণ, বাড়ী যেন একেবারে নিঃসাড়া, কেবল তেঁতুলগাছের একটা ডালে ব'সে একটা কাক বিকৃত ক্রন্দনস্বরে মাঝে মাঝে একটা অমঙ্গলের ডাক ডাকছে।

নবদ্বীপ ভোর না হ'তে বাহিরে কোথায় গিয়েছিল, ফিরে বাড়ী ঢুকেই দাওয়ায় ব'সে ভারী গলায় ডাক দিলে, 'বৈদ্যনাথ !' (আজ আর বদে নয়, সে স্নেহের সম্ভাষণ ফুরিয়ে গেছে) ; বৈদ্যনাথ রুক্ষমুখে কাছে এসে এক পাশে দাঁড়াল ; নবদ্বীপ বল্লে, 'ব'স না ঐখানে,' বৈদ্যনাথ মুখ ফিরিয়ে দাওয়ার কিনারায় আধ-বসা আধ-দাঁড়ান অবস্থায় অঙ্গ রক্ষা করিল। নবদ্বীপ এইবার বল্লে, 'সব ডেকে এয়েছি. গোবিন্দ ভুঁইয়া, রসিক চক্রবর্ত্তী, মাহিন্দির পাঁজা আর-ও দু' পাঁচজন আসছে, তোমার যা' যা' পেরাপ্তি অংশ ; লেহ্যমত ভাগবাটরা ক'রে লাও ; জমী আছে, ভিটে আছে, বাগান পুকুর তৈজসপত্তর আর নগদ আমার কাছে সবই আছে, বুঝে সুঝে লাও ; এদ্দিন যাহ'ক একসঙ্গে থাকা গেছলো, আর চলছে না।"

ঢেঁকি-বাহন ডেপুটী নারদ স্বকার্য্য সমাধান কবলেন। সুখের বাসা ভেঙ্গে গেল—আনন্দকুটীরে আগুন লাগল। ভায়ে-ভায়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ'ল, যা'য়ে যা'য়ে ভালবাসার ভাসান হ'ল, কিন্তু দেবর্ষি নারদের আশা পূর্ণ হ'ল কৈ ! সাঁজের বেলা আর সেই গোপীযন্ত্র বাজে না, সঙ্কীর্ত্তনের সে আকড়া আর বসে না ! তাহাদের মন থেকে মানুষের প্রেম-ও পালাল—হরিপ্রেম-ও পালাল। রইল কেবল একটা বিদ্বেষের ঘা, একটা বিষাদের আঁধার !

আমি। চুপ কল্লে যে ?

প্রতাপ। ফুরিয়ে গেল, গল্প হয়ে গেল।

আমি। দূর ছুঁপিট, কতকগুলো বক্‌বক্ ত কল্লি, তোর গল্প কৈ ?

প্রতাপ। গল্পের শুদ্ধ প্রতিবাক্য হচ্ছে কথা-সাহিত্য ; তিন মিনিটের স্থলে ক'রে মিনিট আট দশ ধ'রে এতগুলো কথা কইলুম, এতে-ও যদি গল্প না হয় ত আমি নাচার। তেমন পাকা লোকের হাতে পড়লে যেটুকু বলেছি, এ থেকে-ই এক সুন্দর কাপড়ে বাঁধা ত্রিবর্ণ চিত্র-সংবলিত প্রিয়তমাকে উপহার দিবার উপযুক্ত সর্ব্বজনপ্রশংসিত উপন্যাস রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'তে পারত।

আমি। ঐ ক্যাটামিষ্ট করতে পারিস্। নাও উমাকান্ত, তুমি এবার সুরু কর।

উমা। তোমার বকসিসের বহর দেখেই যে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যাচ্ছে। তা যখন বলতে-ই হবে, তা ভাই, সেরে ফেলি।

উমাকান্তের গল্প

একটা ছোটরকম সেকেলে গল্প বলি, শোন। এতে এলোকেশ, ঝড়ের মত প্রবেশ, বৈকালিক চা-পান, চুম্বনের

দৃষ্টিতে মান, এ সব কিছু পাবে না। নবাবী আমলের কথা। মোগল-দরবারে যেমন কেতাব-দোরস্ত আদব-কায়দা ছিল, কোন কালে কোন রাজসভায় ঠিক তেমন যে ছিল, তা কোন ইতিহাস বলে না। কোর্ট-এটিকেট দেখে-ই সাধারণ ভদ্রলোক এটিকেট শেখে, ইংলণ্ড-ও রাজসভা আছে, রাজসভার আদব-কায়দা-ও আছে; এ দেশে আমরা যে সব ইংরেজ দেখি, তা'রা চাকুরে, মহাজন বা দোকানদার, তাদের শিষ্টাচারের মধ্যে আমরা সেকহ্যাণ্ড, 'হা'-'ডু'-ডু, মাই-ডিয়ার আর থ্যাঙ্ক ইউ এই চারটি মাত্র দেখতে পাই, আর সেই চারটে-ই শিখেছি। সকল জিনিষেরই বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে, আদব কায়দা সম্বন্ধে-ও মুসলমানদের মধ্যেও অনেকটা তা' হয়ে পড়েছিল; ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে-ও শুনিছি, কল্‌কাতার রাস্তায় জল-দেওয়া ভিস্তিরা 'জানিস আমরা নবাবের জাত' ব'লে পথের লোককে শাসাতো। বেগুন পোড়াকে বায়গানক্বা কাবাব, কুচো চিংড়ির ঝোলকে ঝিঙা মচ্ছিকা কালিয়া বলা বোধ হয় আজ-ও অনেক যায়গায় প্রচলিত আছে।

জবরগঞ্জের নবাব সার্ফরাজ শা বড় ভাল লোক ছিলেন। নিজধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ থাকলে-ও তিনি অপর কোন ধর্ম্মের নিন্দা করতেন না, হিন্দুকে কাফের বলতেন না, কর্ম্মচারি-নিয়োগে দক্ষতা ভিন্ন অন্য কোন সুপারিশ তাঁর কাছে চলতো না, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অতি সরল, মিষ্টভাষী, দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার দরবারের দ্বার সকল প্রজারই নিকট অবারিত ছিল।

শ্রাবণ মাস প'ড়ে অবধি হিন্দুদের ঘরে ঘরে দোলনা খাটানো হয়েছে, সকাল, সন্ধ্যা, দুপর অবসর পেলে-ই বালক-বালিকা যুবক-যুবতী দোলায় দোলে আর কাজরী গায়, গেরস্ত গরীবদের মেয়েরা রাত্তির চারটের সময় উঠে আটা পেশা চাকি ঘুরয় আর সবাই মিলে একসঙ্গে কাজরী গান ধ'রে নগর, গ্রাম, পল্লী সব মধুময় কোরে তোলে।

এই শাহোণ উৎসবে হিন্দুদের সঙ্গে অনেক মুসলমান পরিবার-ও যোগ দিয়া থাকেন, দোলায় দোলা ও কাজরীর আমোদ তাঁহারা তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেন। তখন ইউরোপীয় মনুষ্য কতক কতক এ দেশে আমদানী হইয়াছে, তাদের নীল, লাল, সবুজ বনাত, চীনে মাটীর পেয়ালা-পিরিচ, কাচের ঝাড়-লণ্ঠন ছুরী কাঁচি পিস্তল বন্দুক শেরি-পোর্টের বোতল ক্যালোমেলের পিল ফোড়াকাটা বেলকার প্রেমাস্নার মাছ কাতুর তেরেস্তা প্রভৃতি অনেকগুলা ইউরোপীয় মাল এ দেশে আমদানী হোলে-ও এত রকম বেলাতী জিনিষের ছড়াছড়ি হয়নি। আর ইউনিটি ব'লে কথাটা মোটে-ই আমদানী হয়নি; সুতরাং ইউনিটির অভাবে হিন্দু-মুসলমানের ভেতর বেশ একটা সদ্ভাব ছিল, একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করায় আপনা আপনি-ই একটা সহজ আত্মীয়তা জন্মে গিয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে ভাই, দাদা, চাচা, মামু, ফুফু, মাসী এই রকম সম্বন্ধ পাতান চলতো, সত্যপীরকে হিন্দুরা সত্যনারায়ণ ব'লে পূজা করতো, গাই বিয়ুলে প্রথম দুধ মাণিক-পীরের দর্গায় পাঠাতো, মহরমের সময় অনেক হিন্দু সমারোহ ক'রে তাজিয়া বা'র করতেন, আবার মুসলমানরা-ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন না বটে, কিন্তু শ্রাবণ মাসে কাজরী গাইতেন, হিন্দোলায় দুলতেন; ফাল্গুন মাসে হোলি গাইতেন, ফাগ খেলতেন, পরস্পরের বাড়ী বাদাম পেস্তা কিসমিস মনোক্কা মিশ্রী মরব্বার ভেট পাঠান-ও চলতো।

গত রাত্রে শুক্লা একাদশী তিথিতে হিন্দুদের সব ঠাকুর-বাড়ীতে ঝুলোন ব'সে গেছে, নবাব-বাড়ীতে-ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাইনাচের মজলিস চলেছে; আজ সকালে তফসীর জশন্‌। জবরগঞ্জের উত্তরপ্রান্তে একটি কুঁড়ের ভেতর একটি মুসলমানের বাস ছিল; তিনি যখন নিজের কুঁড়েয় একখানি খাটো লুঙ্গি প'রে বারান্দায় মাদুর পেতে বসতেন, তখন তাঁ'র নাম হোত কুদ্‌রুৎউল্লো, যখন একটি ঢিলে পাজামা, সাদা আচকান প'রে মাথায় একটি সুতোর কাজ-করা টুপী দিয়ে রাস্তায় বেরুতেন, তখন মুন্সী কুদরুৎ মামুদ ব'লে নিজের পরিচয় দিতেন, আর যখন দশ কলিয়ার ওপর কাবা-জুব্বা চড়িয়ে, ছাতির ওপর একটি কলাপত্তর কাজ-করা লাল মখমলের অতি পুরাতন সদ্রি এঁটে আঁচড়ান বাবরি চুলের ওপর জরি-লাগান আমামা প'রে দাড়িতে আতর মেখে রেশমী রুমাল হাতে ক'রে দরবারে তসরিফ নিয়ে যেতেন, তখন তাঁ'র 'ইসম্ সরিফ' হোত মৌলবী মহম্মদ কুদ্‌রুৎউদ্দীন সাহেব। কুদ্‌রুৎউল্লোর ঘরে বিবি ছিল না, ছাবাল ছিল না, অন্ত কোন রকম রেস্তাদার ছিল না, কেবল তাজু মিঞা ব'লে এক জন অবশ্যপোষ্য বস্তু সেবক ছিল।

সকালে কি দিয়ে নাস্তা করবে, যে কুদ্‌রুৎউল্লো রাত্রে তা বুঝতে পারতো না, তার চাকর তাস্কুর যে নিজের কত দুর্দ্দশা, তা বেশই বোঝা যাচ্ছে, তবু সে তার মিঞা সাহেবকে বড় ভালবাসতো—অত্যন্ত মান্য করতো। এই প্রভুভক্তির পুরস্কারস্বরূপ কুদ্‌রুৎ মিঞা তাস্কুর নাম রেখেছিলেন তামিজ খাঁ।

কুদ্‌রুৎ সাহেবের অবস্থা ত এই, কিন্তু কখনো তিনি খাটো চালে চলিতেন না, ছোট কথা কহিতেন না। কুঁড়েটুকু তাঁর দৌলতখানা, বসবার চালাটুকু দেওয়ানখানা, রান্নার পরচালা বাবুর্চ্চিখানা, তাস্কুর ঘর তোষাখানা, ঘরের পেছনের ছাতিমতলা সাফাখানা, পেয়ারাতলা গোসলখানা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বাগাল্লার মাদুর পেতে দস্তরখানা বিছুতেন, তার ওপর মাটীর শানক পেতে আধপোড়া ভুষির রুটী খেতেন, বাখরখানি ব'লে, তরুইকা কাবাব ব'লে ধুঁধুলছেঁচকি খেতেন আর জুটলে আখ্‌নি খেতেন টেংরির ঝোল।

ক্ষিদে পেলে তাস্কু বাবুর্চ্চি, তেষ্টায় আব্‌দার, বাসন মাজতে মসাল্‌চি, ফুর্সি এগিয়ে দিতে হুকাবর্দার আর ফাইফরমাস খাটতে বান্দা।

সাহেব ধুঁধুলছেঁচকিই খান আর লাউসিদ্ধই খান, ঘরে ছেঁড়া লুঙ্গিই পরুন আর গামছাই কোমরে জড়ান, তিন চার দফা বেরোবার অতি পুরাতন জীর্ণ দামী পোষাক তাঁর আমকাঠের সিন্দুকের ভেতর রাখতেন, একটু আতর, খানিকটে গোলাপ সর্ব্বদাই তাঁর মজুত থাকত; এক ফোঁয়া আতর কানে না গুঁজে তিনি কখন ই বাড়ীর বা'র হতেন না।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে এই সামান্য পয়সাও কুদ্‌রুৎ মিঞা যে কোত্থেকে যোগাড় করতেন, তা কেউ বুঝতে পারত না। নিন্দুকেরা বল্‌তো যে, মিঞা ঘরের আগড় বন্ধ কোরে টুপি সেলাই করে, ভাল লোক বোলতো, মিঞা ছুঁচের কায খুব ভালই জানেন, এমন কি, ভাল ঢাকাই মখমল তাজাব প্রভৃতি ছিঁড়ে গেলে তিনি বেমালুম রিপু ক'রে দিতে পারতেন। মিঞা যখন ঝাঁপ বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর একলা থাকতেন, তাস্কু কিন্তু তখন লোককে বোলতো, "খামিন আব সের সাদি সাহেবকা কেতাব নকল করতেহেঁ।"

মহম্মদ কুদ্‌রুৎউদ্দীন সাহেব প্রতি জুম্মার দিন প্রাতঃকালে দরবারে যেতেন। দেউড়ীতে পাহারাদার, ঘড়িওয়াল থেকে সুরু ক'রে মহলের পর মহল যেতে যেতে জমাদার, দারগা, মুন্সী, বক্সী, দোয়ার-মোক্তার প্রভৃতি যাকে দেখতেন, তাকে-ই মৌলবী সাহেব দুহাতে আদাব করতেন, কিন্তু সেই আদাবের মধ্যে এমন একটু কায়দা ছিল যে, মৌলবী সাহেবের পিঠ ছেলামের সময় যদি পনোরা ডিগ্রী নত হোত, অভিবাদনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা মুসাহেব প্রতি-অভিবাদনে নিজ নিজ মেরুদণ্ড চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অবনত করিতে বাধ্য হইতেন। মসনদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হাতে তিনবার ভূমিস্পর্শ করিয়া তিনি কুর্ণিশ করিতেন। বলিয়াছি, নবাব সাহেব অমায়িক লোক ছিলেন; তিনি-ও প্রসন্নমুখে মৌলবী সাহেবের পানে চাহিয়া ললাটে করস্পর্শ করিতেন এবং কখন-ও কখন-ও ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করিতে ও অনুমতি করিতেন; এইরূপে হজরতের সঙ্গে মৌলবী সাহেবের বেশ একটু মুখ-চেনা-চেনি হয়ে গিয়েছিল।

খুলোনের রাত্রে মহফেলের সময় মৌলবী সাহেব নাচ-মহলে উপস্থিত ছিলেন; গানের সময় কায়দামত মধ্যে মধ্যে তালে তালে ঘাড় নাড়িয়াছেন, 'ক্যা তোফা!' 'ক্যা সহৎ কা তরে আওয়াজ!' পার্শ্বস্থ উপবিষ্টের দিকে চাহিয়া 'ক্যা গন্ধার লাগায়া!' প্রভৃতি মজলিসিবুলি সমঝদারের স্বরে জাহির করিয়াছেন।

পরদিন প্রাতে তাঁহাকে জলসে উপস্থিত থাকিতে হইবে। শেষ রাত্রে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, সকালে বেগ কমেছে, কিন্তু বৃষ্টি থামে নাই। মৌলবী সাহেব একটি পুরাতন বিদ্‌রীর বদনা লইয়া ছাতিমতলায় উজু করিতে বসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গত নিশায় শ্রুত একটি লক্ষ্ণৌ ঠুংরির আস্তাইয়ের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন, আর মনে মনে দিবসের খানার অভাবের কথা চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় দেখলেন যে, সামনে একটা ছোট গর্ত্তে কতকটা জল জমেছে আর তার ভেতর একটা কুঁচে ন'ড়ে ন'ড়ে পালাবার পথ খুঁজছে। "খোদা মেহেরবান্! বেগরদিন দীনকা খোরাক আউর কোন্ পৌঁছাওয়ে, গরীবখানামে বন্দাকা ওয়াস্তে গোস্ত আপসে চলা আয়া!" ব'লে মৌলবী সাহেব দুটা কাঠি কুড়াইয়া লইয়া কুঁচেটি মৃগয়া করিলেন। ঘরে গিয়ে তাস্কুকে ডাক দিয়া বলিলেন, "দেখ বাবুর্চ্চি, আজ খানার বড় জবর জোগাড় হয়েছে, আজ বাগিচাতে এই একটা শীকার পাওয়া

গেল, আচ্ছি তরে ইস্কো দোপেঁয়েজি বানাইয়ো, বেহেতের খানা বন্ যাগা।" এই ব'লে সে দিকে দেয়ালের গায়ে একটি তাক ছিল, তার-ই কাছে একটা আড়কাঠায় ঝুলান শিকের হাঁড়িতে কুঁচেটি রেখে একখানি সরা চাপা দিলেন।

হতশ্রী পুরাতন পোষাকের মধ্যে পুরাকালে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ছিল, সেইটির সাহায্যে দীনদেহকে আমীরের অবয়বে পরিণত করিয়া মৌলবী সাহেব নবাববাড়ীর উদ্দেশে শুভযাত্রা করিলেন; যাইবার সময় তাজুকে খানার তদ্‌বিরের কথা আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

মৌলবী সাহেব যতক্ষণ বাড়ীর ভেতর থাকতেন, ততক্ষণ তাজু একটু কোঁড়া হয়েই উঠতো, বসতো, চলতো, কিন্তু মালিকের অনুপস্থিতিতে তাজু একেবারে নায়েব মালিক তালিজ খাঁ; ইন্‌টারোগেশান তাজু একদম খাড়া ইনটারজেকসন্! দেওয়ানখানা, দপ্তরখানা, তোষাখানা, চৌতার, আঙ্গিনা সব ঝাড়ু দিচ্ছে, তালাও থেকে ঠিলিয়া ভ'রে কাঁধে ক'রে জল আনছে, বদনা, ফুর্সি, শানক মাজছে আর বড় গলায় কল্পনাপ্রসূত চক্ক মেথর, উমেদ ভিস্তি, নসীবন্ দাই প্রভৃতি গর্‌হাজির বেতমিজদের তলব কাটবে, জরমানা করবে, বরখাস্ত করবে ব'লে লোকজনকে শুনিয়ে শাসাচ্ছে। খানা পাকাবার মতলবে লকড়ী শীকার করতে গিয়ে তাজু দেখলে যে, নিকটবর্ত্তী বাগিচাগুলিতে যার যার কাঠ প'ড়ে আছে, সে সব-ই ভিজে, তখন সে খানকতক ঘুঁটে খাজনা ভাবে আদায় করবার জন্য জোলাপাড়ার দিকে গেল। কুদ্‌রুৎউল্লোর ঘর বার্গলার-প্রুফ; সে আমকাঠের সিন্দুকে নেপালী কুলুপ ভেঙ্গে পুরাণো পোষাক চুরি করার মেহনত পোষায় না, সহরের চোররা তা খুব জানে; হস্তকৌশলে কুদ্‌রুৎ সাহেব সেই পোষাক কটি এত কাল আস্ত রেখে চালিয়ে আসছেন। অপরে তা নাড়তে চাড়তে গেলে-ই পোষাক যে পরিবর্ত্তন লাভ করবে, তাতে শলতে পাকান-ও চলতে পারে না।

ধুচুনি ভ'রে ঘুঁটে নিয়ে এসে তাজু দেখে যে, একটা কাল বেরাল তাকের উপর উঠে শিকের দিকে চেয়ে জিমন্যাষ্টিকটা কেমন ক'রে করবে, তার-ই মতলব আঁটছে। "ডাকু দুষমন, কাবাবদান লুঠনে আয়া? আজ তোমকো কোতল করেগা!" ইজ্জত বজায় রাখবার জন্য কুদ্‌রুৎ বদ্‌রুৎ মখমলে-জড়ান খাপের ভেতর ভরা যে অর্দ্ধফলকবিশিষ্ট তরোয়ালের বাট তাজুকে দিয়েছিলেন, সেখানি নিয়ে ফিরে এসে তাজু দেখে যে, শিকের হাঁড়ি সরা মাটীতে প'ড়ে ভেঙ্গে রয়েছে আর কুঁচে মুখে করে-ই বেরাল পালাক কি বেরাল মুখে ক'রে কুঁচে পালাক, যা হোক্ একটা কিছু ঘটেছে।

সর্ব্বনাশ! গোস্ত পগার পার, এখন উপায়? মৌলবী আজ পান্তার নাস্তা না করে-ই দরবারে তসরীপ নিয়ে গেছেন, ওয়াপস ক'রে খানা না পেলে একেবারে তো মগজ বেজায় গরম হয়ে যাবে, তাজু এখন কি করে? খানিক উবু হয়ে ব'সে এক কল্কে তামাক খাবার পর তাজুর বুদ্ধি জাগরিত হ'ল; সে বাঁদীপোতার অকচ্ছ কটিবাস বদলে তাজু তখন তামিজ খাঁর উর্দ্দি পরলে, মাথায় শোলার উপর সবুজ সালু-মোড়া পাগড়ী, কোমরে রাঙ্গা প'-জামা, গায়ে পা পর্য্যন্ত ঝুল্ হলদে চাপকান, আর বাঁদীপোতাখানিতে যো সো ক'রে তরোয়ালখানা ঝুলিয়ে কোমরবন্ধ ক'রে বেঁধে নিয়ে তাজু শ্রীদুর্গা ব'লে (শ্রীবিষ্ণুঃ পাঁচপীরকে সেলাম ক'রে) দরবারের দিকে রওনা হ'ল।

আজ সীসমহলের আঙ্গিনার মাঝখানে লাল পাতরের থামওয়ালা চাঁদনীর তলায় গানের মজলিস বসেছে, মেঁজে-মোড়া ইরাণী গালচে পাতা, আর এক দিকে সোনার জরিতে গাঁথা মতির ঝালর দেওয়া লাল-মখমলের মসনদের ওপর জরির কাম করা মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে প্রফুল্লমুখে নবাব সাহেব ব'সে আছেন, ডাহিনে এক জন লোক একটি সোনার পিকদান হাতে ব'সে আর তার পাশে আর এক জন ঢাকাই মলমলের দু'তিনটে থান নিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে; নবাব সাহেব ঘাড় ফিরুলেই পিক্‌দানওয়ালা মুখের কাছে পিকদানটি ধরছে আর দোস্‌রা লোক গজখানেক ক'রে নতুন মলমল জনাব আলীর হাতে দিচ্ছে, নবাব সাহেব মুখ মুছে টুকরোটুকু ফেলে দিলে সে আবার নতুন টুকুরো ঠিক ক'রে রাখছে। নবাবেরা দু'বার এক রুমালে মুখ মুছতেন না, উচ্ছিষ্ট টুক্‌রাগুলি ভৃত্যদের প্রাপ্য; বাঁদিকে এক জন বহুমূল্য রত্নখচিত পানদান, আর এক জন চুণি-পান্নার কাযকরা আল্‌বোলার নল এগিয়ে ধ'রে আছে; মসনদের সামনে আতরদান, গোলাপপাশ, এলাচদান, গোলাপের কটোরা, পিচকারী প্রভৃতি, সব

গুলো-ই স্বর্ণ-শিল্পীর কলা-কৌশলের পরিচায়ক; আর মসনদের পশ্চাতে জমকাল পোষাকপরা দুটি সুন্দর ছোকরা মোর্চ্ছহাতে মক্ষিকার উৎপাত নিবারণ কচ্ছে।

গালিচার মধ্যে কতকটা স্থানে ধপধপে সাদা চাদরের ফরাস পাতা, তার উপরে নাচ-গানের আসর। অসিতা, সিতা, পীতা, গৌরী, শ্যামা, ক্ষীণা, পীনা, তন্বী, তরলা কলকণ্ঠীগণের সমবেত সুরঝঙ্কারের কম্পনতরঙ্গ চন্দ্রাতপতললম্বিত সিতোপল-আলোকাধারের দুলগুলিকে পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিয়াছে। পেশোয়াজের সাজ, ঘুঙুরের আওয়াজ, গহনার চমক, নাচের যমক রাত্রেই চুকিয়া গিয়াছে। প্রভাতের আসরে বীণাপাণির একাধিপত্য, রূপের আদর অবশ্যই আছে, কিন্তু রূপ আজ গুণের বশ্য, সেই জন্য গায়িকারা সভজনব্যবহার্য্য পরিধেয় মাত্র পরিয়া আসিয়াছে; হীরা, মুক্তা, মর্ম্তাজ, ময়না, তৌকী শাহাজাদীর দল পাজামা, জামা ও মাত্র রঙ্গীন ওড়না-সজ্জিতা; জীবন, জানকী, গণেশী, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, যমুনার দল ভূষিতা মাত্র ওড়নাসাড়ীতে।

চাপকান-পাগড়ী চড়িয়ে মহম্মদ কুদরুৎউদ্দীন সাহেবের চরকরা যখন আসরের ধারে উপস্থিত হ'ল, তখন—

"যব যৌবন কি ধুমধাম—আরে—
ধুমধাম—আরে ধুমধাম।
ধুমধাম যৌবনকী—"

ব'লে গণেশী একখানি দেহাতী ভৈরবীর আলাপ কর্‌ছিল, একদৃষ্টে অনন্যমনে সমস্ত সমজদার গায়িকার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনেক চোখ মুখ হাতের ইসারা ক'রেও তামিজ খাঁ তার মুনিবের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষিত করতে পারলে না। গান থামল, আসরে উত্থিত 'বাহবা বাহবা!' 'কেয়াবাৎ,' 'কেয়াবাৎ!' 'শোভস্থরি, শোভস্থরি'র উচ্ছ্বাস কতকটা মন্দীভূত হ'ল, তখন নিরুপায় তামিজ খাঁ মোরিয়া হয়ে দুকদম এগিয়ে ভূমি স্পর্শ ক'রে নবাব আলীকে তিনবার সেলাম করলে আর জোড়হাতে দাঁড়িয়ে মৌলবী সাহেবের দিকে চেয়ে বল্লে, "বান্দা হাজির!" মৌলবী সাহেব কতকটা অপ্রস্তুত, কতকটা বিরক্ত হয়ে আপনার ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি ক'রে বল্লেন, "কেঁও বেতমিজ, হিঁয়া তোমকো কোন্ বোলায়া?"

তাজু। জনাব! গোস্তাকী মাফ হোয়, খবর আচ্ছা নেহি।

কুদ্। কেঁও আচ্ছা নেহি? ক্যা হুয়া?

তাজু কুঁচে বেরালে নিয়ে গেছে, এ কথাটা প্রকাশ্যে আর কি ক'রে আসরের মাঝখানে বলে, তাই মনে মনে একটা আমিরী সাট বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল; এখন বল্লে,—"কুচ মহলনে লুঠ লিয়া।"

কোডওয়ার্ড প্রস্তুতে ও ব্যাখ্যায় কুদরুৎ সিদ্ধ-মস্তিষ্ক, সুতরাং তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন হ'ল, "কুচমহল লুঠ লিয়া—কোন্ লুঠ লিয়া?"

তাজু। বিল্লার খাঁ নে লুঠ লিয়া। (অর্থাৎ বেরালে কুচে নিয়ে গেছে)।

কুদ্। বিল্লার খাঁ! কেঁও, সিকন্দার সা কাঁহা [illegible] (অর্থাৎ শিকের ওপর ত ছিল)।

তাজু। খামিন্! সেকেন্দার শাকো কুচ কসুর নেহি, লেকিন্ তাকান্দার খাঁনে নিমকহারামী কিয়া। (অর্থাৎ শিকের আর দোষ কি, তাকের উপর উঠেই বেরালটা এই কায করেছে)।

কুদরুৎউদ্দীন খুব মুখ ভারি ক'রে মনে মনে খানিকটা উপায় যেন চিন্তা ক'রে নিলে, তার পর তাজুর দিকে তাকিয়ে বললে,—"খয়ের, যো গিয়া সো গিয়া, বে-ফয়দা আপশোষ! তোম যাও, মসুর খাঁকে বোলায়কে সব বন্দবস্ত ঠিক কর।" (অর্থাৎ চারটি মসুরডাল গিয়ে জোগাড় ক'রে ফেল)

কুদরুৎকে তিনবার আর নবাব সাহেবকে তিন তিরিক্কে ন'বার সেলাম ঠুকে তাজু স্বস্থানে প্রস্থান করলে। পুনর্যাত্রার সময় পথে তাজুকে যে দেখেছে, সেই বুঝেছে যে, মিয়ার ছাতি আর তার পচা চাপকানের ভেতর আঁটচে না।

নবাব ভাবলেন, এ লোকটা কে, প্রায়ই আমার এখানে আসা-যাওয়া করে, আদব-কায়দা দুরস্ত অথচ পোষাক-আসাক দেখে তেমন রেস্তদার ব'লে বোধ হয় না, ভাবতেম, কোন দেউলিয়া রইস্! এখন দেখছি, এর মহল-টহল আছে, লোক-লস্কর রেসেলা আছে, আর দৌলতও বোধ হয় বহুৎ,—একটা মহল লুঠ হয়ে গেল, তার জন্যে বললে 'ক্যা আপশোষ'—যেন খবরে এলো না

মজলিস বরখাস্ত হয়েছে, দু'চার জন অন্তরঙ্গ মুসাহেব সঙ্গে নবাব হামামে গিয়ে বসেছেন, এমন সময় এক জন চোপদার মামুদ কুদরুৎউদ্দীন সাহেবকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে হুজুরের সামনে হাজির করলে। নবাব বল্লেন, "আপনার ইজ্জতের মতন খাতের আপনাকে করা হয় নি, এতে বক্সী, পেশকার প্রভৃতির যে কশুর হয়েছে, তার জন্য আপনি তাদের মাফ করবেন, আমার সুবার ভেতর এত বড় এক জন রইস তালুকদারকে দস্তরমত দরবারে পেশ না করা গুস্তাকি।"

কুদ্। ম্যয় হুজুরালীকা কদমকা জুতি বরাবর, গোলাম, সরকারকে হুকুম তামিল করনেকো ওয়াস্তে জিন্দিকীভর তৈয়ার হৈঁ।

নবাব। আপকা ইসম্ সরিফ ?

কুদ্। ম্যয় জানতা হুঁ, ম্যয় নবাব আলীকা গোলাম, লেকেন সবকোই হামকো মহম্মদ কুদরুৎউদ্দীন কহতে হৈঁ।

নবাব। আজসে সবকোই আপকো সরদার কুদরুৎ-উদ্দীন বাহাদুর কহকে সেলাম করেগা। আপশোষ আপকা ইজ্জৎকা বরাবর আওল দরজাকা কাম মুচকো কুচ আব ইয়াদ আতা নেহি; খয়রাতখানাকা কায়মোকাম দেওয়ান তরক্কি পা কর দোসরা যাগামে যাতে হৈঁ, আগর আপ মেহেরবাণী করকে ওই দেওয়ানী পসন্দ কিজিয়েগা, তব ম্যয়নে বহুত খুস হোগা।

কুদ্। জনাব আলীকা হুকুমসে ম্যয়নে সরকারকো জুতি উঠানে আস্তে তৈয়ার হুঁ।

নবাব। সুকর! আপকা দৌলতখানাসে এতনা দূর যানা-আনা তকলীফ হায়, মছলিবাগমে আপ ডেরা লিজিয়ে, সামান-ওমান হুঁয়া সবকুছ মজুত হায়, এক সোয়ারীকা ইন্তজাম্‌ভি আপকো দিয়া গিয়া, ঘোড়ে-ওড়ে-বি তৈয়ার রহেগা, ঔর শাল শাল সাত হাজার সিক্কা রুপেয়া তনখা খাজানজিখানাকা মারফৎ পৌঁছ যাগা।

পরদিন হইতে সরদার বাহাদুর কুদরুৎউদ্দীন মছলি-বাগে বসিয়া নবাবী বরাদ্দ দৌলত দু'হাতে খয়রাৎ করিতে লাগিলেন, তামিজ খাঁ নূতন জমকাল উর্দী পরিয়া অন্যান্য নোকরের উপর নায়েব-সর্দ্দারী করিতে লাগিল, খাসীর কোর্ম্মা, মুরগীর কোপ্তা, জরদা পোলাও, চাঁদির বর্ত্তনে বসিয়া কুচের ঝোলমাখা পান্তা-ভাত ও বেগুনপোড়াকে বিদায় দিল; বিল্লার খাঁর জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে "ম্যাও ম্যাও" শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই সরদার বাহাদুর তামিজকে হুকুম দিতেন, বিল্লীকো আচ্ছী-তরে মচ্ছী খিলাও।

আমি। হয়ে গেল নাকি ?

উমা। আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো—

শ্রীগোবিন্দ। পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল—

প্রতাপ। তাই ত! যা হ'লে, যাত্রীরে সব গোলমাল বাধিয়েছে, আর ত গল্প হ'ল না। কোকন খুব ফাঁকি দিলে যা হোক।

উমা। আচ্ছা, বাড়ীতে পূজোর-আমোদ-আহ্লাদ সেরে ফেরবার সময় দেখা যাবে।

কোকন বল্লে, তখন কি জান—

"Lave from love towards
School with heavy looks."

শ্রীগোবিন্দ বল্লে, "ঐ ডাঙ্গার দিকে কান পেতে শোন, ঢাক, ঢোল, শাণাই প্রাণে আনন্দের তুফান তুলে দিচ্ছে,—আজ সপ্তমীর প্রভাত।"

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

রূপের মোহ

"শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ" ২য় খণ্ড হইতে গৃহীত

বিনোদিনীর আত্মকথা

(গল্প)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,*

জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে আমি অবগত হইয়াছি যে, অদ্য হইতে দশ বৎসর পরে এম্-বি উপাধিধারী কলিকাতার কোনও বাঙ্গালী চিকিৎসক, "মাসিক বসুমতী" কার্য্যালয়ে গিয়া আপনার হস্তে একতাড়া পাণ্ডুলিপি প্রদান করিবেন। তিনি বলিবেন, যে স্ত্রীলোকটি উহা লিখিয়াছিল, সে গত ছয় মাস তাঁহারই চিকিৎসাধীনে থাকিয়া, সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছে; তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে, তিনি যেন উদ্যোগী হইয়া, জনসমাজের মঙ্গলার্থ লেখাটি কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করেন। আপনি অবকাশমত রচনাটি পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, উহা কোনও পতিতা রমণীর আত্মচরিত। প্রথমে আপনি উহা অমনোনীত করাই স্থির করিবেন; পরে, উহার রিয়ালিষ্টিক অংশগুলি বাদসাদ দিয়া লেখাটি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিবেন। যে আকারে ১০ বৎসর পরে উহা জনসমাজে প্রচারিত হইবে, তাহার আদর্শ এতৎসহ আপনাকে আমি প্রেরণ করিলাম। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এখন এক দফা ইহা ছাপিয়া দেন, তবে ১০ বৎসর পরে জগৎসমক্ষে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারিবে যে, জ্যোতিষিগণ হাম্বাগ নহে এবং জ্যোতিষশাস্ত্র যথার্থই একটা শাস্ত্রপদবাচ্য। ইতি

বিনীত

শ্রীকমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব।

দর্জ্জিপাড়া।

(মাসিক বসুমতী, ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪০ সাল)

বিনোদিনীর আত্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য-কাহিনী

আমার নাম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। হাল সাকিম কলিকাতা। মৃত্যু নিকট জানিয়া, আমি নিজ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা যদি কোনও দিন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তবে আমার মত অবস্থাপন্না বঙ্গরমণীগণ সাবধান হইতে পারিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক আশা ও অভিপ্রায়। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল কোনও কুলই আমি উজ্জ্বল করি নাই—সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত নামধামগুলির পরিবর্ত্তে আমি কাল্পনিক নামধামই ব্যবহার করিয়াছি। তবে আমার আসল নাম বিনোদিনীই বটে।

আমি, বলিতে গেলে, জন্মদুর্ভাগিনী। আমার শৈশবেই, প্রথমে মাতা এবং বৎসর না ঘুরিতেই আমার পিতা পরলোকগমন করেন। আমার অন্য কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন ছিল না, কেবল এক জ্যেঠা মহাশয় ছিলেন, তিনি পুরুলিয়াতে চাকরী করিতেন। তিনিই আসিয়া গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে আমার পিতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করেন। জিনিষপত্র কতক বেচিয়া, কতক বিতরণ করিয়া, পৈতৃক বাটীতে তালা লাগাইয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া পুরুলিয়া চলিয়া যান। তখন আমার বয়স চারি বৎসর মাত্র।

জ্যেঠা মহাশয়ের একটি পুত্র ছাড়া তিনটি কন্যা ছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, আমাকে পৌঁছিতে দেখিয়া জ্যেঠাই-মা নাকি বলিয়াছিলেন, "বেশ হ'ল, এবার গণ্ডা ভর্ত্তি হ'ল।"

আমার জ্যেঠতুতো বোন তিনটির নাম—নীহারবালা, শৈলবালা এবং ননীবালা। শৈল ছিল আমার সমবয়সী—কিন্তু তথাপি তাহার সহিত আমার তেমন ভাব হয় নাই। আমি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলাম বলিয়া শৈলবালা আমার হিংসা করিত; জ্যেঠাই-মা আমাকে লুকাইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে এটা ওটা খাওয়াইতেন বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম। আর একটু বয়স হইলে, যখন আমরা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম, তখন সে আমার চেয়ে ভাল পড়া বলিতে পারিত, ভাল প্রাইজ পাইত বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম; এবং তার চেয়ে আমার রং ফরসা বলিয়া সে আমার হিংসা করিত।

নীহার দিদি আমাদের চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিল। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইল। জ্যেঠা মহাশয়ের

পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহার বেশীর ভাগই এই বিবাহে নিঃশেষিত হইয়া গেল। জ্যেঠাইমা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একটির বিয়েতেই যা কিছু ছিল, সব খরচ ক'রে ফেল্লে, বাকীগুলির বেলায় কি উপায় করবে, তা কিছু ভেবেছ ?" জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছিলেন, "উপায় করার মালিক আমিও নই, তুমিও নও। যে উপায় করণেওয়ালা, সেই উপায় করবে, তুমি দেখে নিও।"

নীহার দিদির ত কিনারা হইয়া গেল, এবার আমার ও শৈলর পালা। একযোড়া ভাল পাত্রের সন্ধান করিবার জন্য জ্যেঠা মহাশয় নানা স্থানে চিঠি লিখিলেন ; দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ অন্বেষণ চলিল, কিন্তু একযোড়া ত দূরের কথা, মনের মত অথচ দামে সস্তা একটি পাত্রও মিলিল না। আমাদের দুই বোনকে তেরো বছরের ধিঙ্গি দেখিয়া, জ্যেঠাই-মা সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন এবং এক এক দিন জ্যেঠা মহাশয়ের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেন।

— —

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শচীন আসিল

এই সময় নীহার দিদির শ্বশুর, জ্যেঠামহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ (জামাই বাবুর ছোট ভাই) গত ভাদ্র মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে ; কলেজে তাহার পার্সেণ্টেজ গিয়াছে, সে এবার পরীক্ষা দিতে পাইবে না ; ডাক্তার বায়ুপরিবর্ত্তন করাইতে উপদেশ দেন ; অতএব বৈবাহিক মহাশয়ের যদি অসুবিধা না হয়, তবে শীতের কয়টা মাস শচীন পুরুলিয়াতে থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে।

জ্যেঠাইমার সহিত পরামর্শ করিয়া, জ্যেঠা মহাশয় শচীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করিবার জন্য তাঁহারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই ; এই উপকারটুকুর বদলে, শচীনের পিতাকে চক্ষুলজ্জার ফেরে ফেলিয়া, সস্তায় শচীনকে জামাই করিয়া লইতে চেষ্টা করাই তাঁহাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল। নীহার দিদি অনেক দিন পিত্রালয়ে আসেন নাই ; তাঁহাকেও শচীনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। যথাদিনে দেবর সহ নীহার দিদি আসিয়া পৌঁছিলেন।

শচীনের বয়স তখন ১৮।১৯ বৎসর, রংটি বেশ পরিষ্কার, মুখ-চোখও সুগঠিত—এক কথায়, বেশ সুশ্রী যুবা পুরুষ। তবে রোগে ভুগিয়া তাহার দেহকান্তি অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মাসখানেক পুরুলিয়ায় থাকিয়াই, শচীন তাহার স্বাস্থ্য, বল, কান্তি আবার ফিরিয়া পাইল। জ্যেঠাই-মার সঙ্গে মাঝে নীহার দিদির পরামর্শ হইতে লাগিল, শচীনের সহিত শৈলবালার বিবাহটি হইলেই বেশ হয়। শৈল আমার চেয়ে তিন মাসের বড় ছিল, সুতরাং প্রথম দাবী তাহারই সন্দেহ নাই ; আমার কিন্তু সে কথাটা শুনিতে ভাল লাগিত না। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিতে করিতে আমি মনে মনে বলিতাম—"হে ঠাকুর, শৈলর সঙ্গে যেন শচীনের বিয়ে না হয়।"

প্রার্থনা আশ্চর্য্যভাবে অতি সত্বর সফল হইয়া গেল। এক ভদ্রলোক সপরিবারে পুরুলিয়াতে বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন ; শৈলকে দেখিয়া এবং তাহার কোষ্ঠী নিজ পুত্রের কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া শৈলকে তাঁহার এমনই পছন্দ হইয়া গেল যে, একরূপ বিনা পণেই অগ্রহায়ণ মাসেই শৈলকে তিনি নিজ পুত্রবধূ করিয়া লইলেন।

তখন "আমিই শুধু রইনু বাকী।" (ননীবালা ৮ বৎসরের বালিকামাত্র, তাহার কথা ধর্ত্তব্য নহে)। শৈল পুরুলিয়াতে শ্বশুর-শাশুড়ীর বাসায় থাকিতে লাগিল ; মাঝে মাঝে অন্নসময়ের জন্য এ বাড়ীতে আসিত। তাহার স্বামী, কলেজ কামাই হইবে বলিয়া বিবাহের এক সপ্তাহ পরেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল।

এখন জ্যেঠাই-মা ও নীহার দিদিতে পরামর্শ হইত, "বিনির সঙ্গে শচীনের বিয়েটি হ'লে বেশ হয়।" যে দিন কথাটি আমি শুনিলাম, সে দিন কানে যেন আমার মধুবর্ষণ হইল।

পরামর্শ, ক্রমে মেয়ে-মহল ছাড়াইয়া, পুরুষ-মহলে পৌঁছিল। পৌষ মাসে, জ্যেঠামহাশয় শচীনের পিতাকে পত্র লিখিয়া, আমার সহিত শচীনের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন।

এই পত্র রওয়ানা হইবার পর হইতে, শৈল আসিয়া, শচীনকে আমার বর উল্লেখ করিয়া আমায় 'ক্ষেপাইতে"

সুরু করিল ; দিদির মুখে ঐরূপ শুনিয়া আট বছরের ননীবালা ছুঁড়ীটাও, ঐ বলিয়া আমায় ক্ষেপাইত। শৈল তবু শচীনের অসাক্ষাতে বলিত ; নির্বোধ ননীবালা একদিন তাহার সামনেই বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া শচীন আমার দিকে চাহিয়া, ফিক করিয়া একটু হাসিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম- ছি ছি !

পত্রোত্তর আসিল। শুনিলাম, দিদির শ্বশুর লিখিয়াছেন, মেয়েটির রূপগুণের কথা বধূমাতার প্রমুখাৎ পূর্ব্বাবধিই তিনি শ্রুত আছেন, পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহার অমত নাই, তবে "ন্যূনসংখ্যা" কত টাকা জ্যেঠা মহাশয় দিতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কয়েক দিন কর্ত্তা গিন্নীতে পরামর্শ চলিল। অবশেষে জ্যেঠা মহাশয় উত্তর দিলেন; (চিঠিখানি রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে লুকাইয়া আমি দেখিয়াছিলাম)—"বড় মেয়েটিকে যখন আপনার পুত্রবধূ করিয়াছিলাম, তখনই আমার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তার পর, সম্প্রতি আর একটি মেয়ে পার করিয়াছি। তবে, এ বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপা ও উদারতাগুণে, এবার অল্পেই রেহাই পাইয়াছি—তাই ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিব—নচেৎ তাহাও আমার উপস্থিত ক্ষমতায় কুলাইত না। জানিবেন, এই টাকাও সমস্ত আমার ঘরে নাই, কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে। আশা করি, নিজগুণে"— ইত্যাদি।

আমার ঘাড়ে যে কি ভূত চাপিল, শচীন শচীন করিয়া আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। সুবিধা পাইলেই আড়াল হইতে আমি তাহার পানে চাহিয়া থাকিতাম। আমার এই "চুরি ক'রে চাওয়া" দুই এক দিন শৈল আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়া আমায় ঠাট্টাও করিয়াছিল।

আজকালকার নভেলে দেখিতে পাই, হিন্দুঘরের "ধেড়েকেষ্ট" মেয়েরা প্রায়ই অমুক"দার" সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া কোর্টশিপ চালাইতেছে ; সেই "দাদা"র সহিত কাহারও বা বিবাহ হইতেছে, কাহারও বা ফস্কাইয়া যাইতেছে। আমাদের বাড়ীতে কিন্তু সেরূপ হইতে পাইত না। শৈল, আমি, দুই জনেই 'সোমত্ত' মেয়ে, শচীনের সামনে আমরা বাহির হইতাম, তাহার সহিত আবশুক-মত দুই একটি কথা কহিতাম বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। জ্যেঠাইমার সর্ব্বদা সজাগ সাবধানতা ও কড়া শাসনে, শচীনের সহিত আমাদের কিছুমাত্র মেলামেশার অবসর ছিল না ; তথাপি শচীন এমনই দুষ্ট যে, সুযোগ পাইলেই, অন্যের অলক্ষিতে আমার পানে চাহিয়া হাসিত। এক দিন বৈকালে, ঘটনাক্রমে তাহার সহিত আমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দিন শচীন শুধু হাসিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই—আমার গাল টিপিয়া দিয়াছিল। আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম, "ও কি !" শচীন হাসিয়া বলিয়াছিল, "দোষ কি ? আমি যে তোর বর।" আমি মনের আহ্লাদ মনেই গোপন করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধভরে সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম।

শচীনকেই আমার স্বামী কল্পনা করিয়া, অবোধ বালিকা আমি কত সুখের স্বপ্নই যে দেখিতাম, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এমন সময় আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। শচীনের পিতা উত্তর দিলেন, তিন হাজার টাকার কমে কিছুতেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে পারিবেন না। শচীনকেও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে তিনি কড়া হুকুম জারি করিলেন।

পরদিন শচীন তাহার জিনিষপত্র বাঁধিয়া, আমাদের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যাত্রার পূর্ব্বে, একটিবারও তাহার সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ হয় নাই। সে চলিয়া যাওয়ার পর, আমি দ্বিতলের একটি জানালা দিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চেষ্টা করিলাম। দেখাও হইল। তাহার উৎসুক চক্ষু সেই জানালার মাঝেই আমাকে খুঁজিতেছিল বোধ হয়। তাহার সেই ছলছল চোখ দুটি আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সে দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, আমি বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন নীচে সবাই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত—কেহ আসিয়া এ অবস্থায় যে আমায় দেখিতে পাইবে, এ সম্ভাবনামাত্র আমার মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার পৃষ্ঠদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, শৈল। শৈল আমার অশ্রুমাখা মুখ দেখিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "বাঃ, বেড়ে ! এতদূর !

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই

পরাণে বাঁচে না বাঁচে !"

—বলিয়া গা দুলাইয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহির হইয়া গেল। কথাটা শৈল বাড়ীতে প্রচারও করিয়া দিয়াছিল।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার বিবাহ

মাসখানেক পরে শুনিলাম, পাত্র ঠিক হইয়াছে, সোনা-পুরে তাঁহার বাড়ী, নিঃসন্তান, দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স ৪০ ... র, গ্রামে ঘি ও ময়দার দোকান আছে, অবস্থা স্বচ্ছল। এক দিন পাত্র আমাকে দেখিতে আসিলেন, দেখিয়া পছন্দও করিলেন। অল্প টাকায় হইবে বলিয়া, জ্যেঠামহাশয় এই পাত্রই স্থির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১৩২৩ সাল, ৫ই বৈশাখ আমার শুভ (?) বিবাহ হইয়া গেল; আমি শ্বশুর-বাড়ী গেলাম। আমি তখন চৌদ্দ বছরে পড়িয়াছি।

সেখানে গিয়া দেখিলাম, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নাই। বিধবা পিস্শাশুড়ী আছেন, তিনিই ঘরের গৃহিণী।

স্বামিভক্তি, স্বামিপূজা, স্বামিসেবাই নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, এই শিক্ষাই আবাল্য পাইয়া আসিতে-ছিলাম। এক দিন মনে মনেও যে আমি অন্য পুরুষকে কামনা করিয়াছিলাম, সে জন্য লজ্জায় ধিক্কারে মরিয়া যাইতাম। শচীন এক দিন আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, আমার গাল টিপিয়া দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনের ক্ষোভে আমার ইচ্ছা করিত, এক খণ্ড লোহা পোড়াইয়া-বেশ লাল করিয়া, তাহা গালের উপর টিপিয়া ধরিয়া, ঐ স্থানটা অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লই।

স্বামী আমাকে যথেষ্ট স্নেহযত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার পোড়া মন এমনই অপদার্থ যে, শচীনকে আমি ভুলিতে পারিতাম না। শচীনের চিন্তাও যে আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা বেশ জানিতাম; কিন্তু মনকে বশে আনিতে পারিতাম না। এই সময় "চন্দ্রশেখর" পুস্তকখানি আমার হাতে পড়িল। জ্যেঠামহাশয়ের গৃহে থাকিতে আমরা সকল বোনই বাঙ্গালা লিখাপড়া ভাল রকমই শিখিয়াছিলাম; কিন্তু জ্যেঠামহাশয় মেয়েদের উপন্যাস পড়ার বিরোধী ছিলেন বলিয়া, উপন্যাস বেশী পড়িবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাই এতখানি বয়স পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আমার অপঠিত ছিল।

বহিখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। কপালদোষে বিবাহের পূর্ব্বেই কোনও মেয়ের যদি অন্য পুরুষের প্রতি মন গিয়া থাকে, তবে বিবাহের পর তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহা চন্দ্রশেখর পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম। অধিকাংশ হিন্দু মেয়েই পতিভক্তি বিনা-সাধনায় লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার মত দুর্ভাগিনী যাহারা, তাহাদের ঐ বস্তুটি লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনায় রত হইতে হইবে,—হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ইহাই চন্দ্রশেখরের উপদেশ বলিয়া বুঝিলাম এবং তদনুসারেই নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিব স্থির করিলাম।

আমি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকি দেখিয়া, স্বামী এক দিন বলিলেন, "সমবয়সী সঙ্গী সাথী একটি নেই, একলা তোমার বড় কষ্ট হয়, না?"—শচীনের কথা তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই, পরে জানিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, "না, কষ্ট আর কি?"

তিনি বলিলেন, "কষ্ট হয় বৈ কি। তোমার যদি দুই একটি যা কি ননদ থাকত, তাদের সঙ্গে হাসিতে গল্পেতে দিন কাটাতে পারতে। কিন্তু সে সব কিছু ত নেই। আচ্ছা, একটা কায না হয় কর না।"

"কি?"

"বই পড়তে তুমি খুব ভালবাস। একখানি বই পেলে, তুমি খুব আগ্রহে সেখানি পড় দেখতে পাই। আমাদের গ্রামে একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। অনেক বাঙ্গালা বই আছে, কত সব মাসিকপত্র আসে,—নূতন নূতন বইও প্রায় তারা কিনে আনায়। আমি সেই লাইব্রেরীর মেম্বর হব,—যত তুমি পড়তে পার, তত বই তোমায় এনে দেবো। তা হ'লে তোমার সময় কাটাবার বেশ একটা উপায় হবে; কি বল?"

আমি উৎসাহের সহিত এ বিষয়ে সম্মতি জানাই-লাম।

স্বামী মেম্বর হইলেন, এবং লাইব্রেরী হইতে কৃত্রিম সিল্কের চকচকে মলাটযুক্ত নূতন নূতন উপন্যাস-গ্রন্থ আনাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম নিজে তিনি দুই একখানা বহি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভালো লাগে নাই বলিয়া সে চেষ্টা আর করিতেন

না। তিনি ছিলেন "দাতাকর্ণ" যুগের মানুষ। আমি কিন্তু সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম

এইরূপ কিছু দিন চলিতে চলিতে আমার মনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন আসিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এত কাল মা-দিদিমা'র কাছে পতিভক্তি সম্বন্ধে যে শিক্ষা আমি পাইয়া আসিয়াছি, তাহা নিতান্তই ভুল শিক্ষা। পতির প্রতি যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ভক্তি বা সেবা করিলেও ততটা দোষ নাই। কিন্তু যে পতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসি না, তাঁহাকে ভক্তি করা নিজেকে অপমান করা মাত্র। দেখিলাম, আজকালকার বড় বড় লেখকগণের মতে, বঙ্কিমবাবু নিতান্তই সেকেলে লেখক। প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই নারীর "নারীত্ব" সফল হয়, তাহার জীবন-যৌবন ধন্য হয়, সকল যুবতীরই এই বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকা উচিত। নবযুগের নবীন আলোক-আমদানীকারক এই ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে কাহারও হস্তে যদি 'চন্দ্রশেখর' সংশোধনের ভার থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই গভীর জলে সন্তরণকালে, প্রতাপকে দিয়া শৈবলিনীকে ওরূপ দারুণ শপথ করাইতেন না; তাহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া, কোনও নিভৃত কুটীরে স্থাপন করিয়া, আর্টের "নগ্নচিত্র" আঁকিয়া, যুবক ও যুবতীগণকে মোহিত করিয়া দিতেন।

সে যাহা হউক, আমিও মূর্খ সেকেলে স্ত্রীলোকদের মত, পতিভক্তিকে জীবনের সার বলিয়া আর গ্রহণ করিলাম না; শচীনের চিন্তাকে আর খিলবৎ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিলাম না; এক দিন নিজগালে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবার বাসনা করিয়াছিলাম বলিয়া, নিজ মূর্খতায় মনে মনে লজ্জিত হইলাম।

আমি অনেক সময় ভাবিতাম, শচীন বিবাহ করিয়াছে কি না। মনে করিতাম, করিয়া থাকে, করুক; —আমার শচীন আমার অন্তরের ধন; আপন অন্তরমধ্যে তাহাকে লুকাইয়া আমি নিত্য তাহার পূজা করিব। কিন্তু এ জীবনে আমার "নারীত্ব" বিফল হইয়া গেল, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

একবার পুরুলিয়ায় গিয়া নীহার দিদির দেখা পাইলাম। শুনিলাম, শচীন কলিকাতায় আইন পড়িতেছে; এখনও বিবাহ করে নাই, বিবাহে তাহার মন নাই। ছেলে এম-এ, বি-এল পাশ করিলে পর বিবাহের বাজারে তাহাকে নীলামে তুলিবেন, এই অভিপ্রায়ে পিতাও পীড়াপীড়ি করেন না। পিতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, শচীনের যে বিবাহে কোনও আগ্রহ নাই, ইহা হইতে বুঝিলাম, আমি যেমন তাহাকে ভুলিতে পারি নাই, সে-ও তেমনই আজিও আমাকে ভুলে নাই। মনে বড় আহ্লাদ হইল।

এবার পুরুলিয়ায় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমি মাসখানেক সেখানে থাকিবার পর স্বামী আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন; সেই সময় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শচীন আমাদের বাড়ীতে থাকিত, তাহার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, আমি আড়ালে থাকিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া শচীনকে দেখিতাম, এবং বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়া সে চলিয়া যাওয়ার পর আমি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। ননীবালা তাঁহাকে এই খবরগুলি দিয়াছিল,—সম্ভবতঃ শৈলরই শিক্ষানুসারে। সেই অবধি স্বামী মাঝে মাঝে শচীন সম্বন্ধে আমাকে রূঢ় কথা বলিতেন; একটা কুৎসিত সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আচরণে, তাঁহার প্রতি ভক্তি ত আমার ছিলই না—একটু স্নেহমমতা যাহা ছিল, তাহাও সমূলে নষ্ট হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাস্নান

বাঙ্গালা ১৩২৯ সালে, আষাঢ় মাসে, সূর্য্যগ্রহণের সঙ্গে আরও কি কি সব যোগ একত্র হইয়াছিল; পিসীমা আমার স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "চল বাবা, কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে আসা যাক্।" —গঙ্গাহীন দেশে আমাদের বসতি, গঙ্গাস্নানের সুযোগ আমাদের দুর্লভ, সুতরাং স্বামী সম্মত হইলেন।

সমস্ত রাত্রি রেল-গাড়ীতে কাটাইয়া, পরদিন বেলা ৯টার সময় আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলাম। বেলা ১০টায় গ্রহণ লাগিবে, এক ঘণ্টা কাল স্থিতি। পরামর্শ ছিল, প্রথমে আমরা জগন্নাথ ঘাটে গিয়া গ্রহণের স্নান সারিয়া, তা'র পর সোজা কালীঘাটে চলিয়া যাইব। সেখানে মা'কে দর্শন করিয়া, একটা বাসা ঠিক করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা

হইবে। দুই তিন দিন সেই বাসায় থাকিয়া, পশুশালা, যাদুঘর, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া বাড়ী ফিরিব।

শিয়ালদহে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসি নাই; গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়া কলিকাতার বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যতই আমরা গঙ্গার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, মানুষের ভিড় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—আমাদের নামিতে হইল। স্বামী বলিলেন, উহা বড়বাজার—গঙ্গার ঘাট আর বেশী দূরে নহে, এইটুকু পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

গাড়ী বিদায় করিয়া, আমাকে মধ্যে রাখিয়া, স্বামী ও পিসীমা সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রথমটা আমরা তিন জনেই হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছিলাম। কিন্তু ভিড় বাড়িয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। অনেক কষ্টে আমরা পুনরায় একত্র হইলাম। কিন্তু হইলে কি হইবে, খানিক অগ্রসর হইয়া দেখি, রাস্তার মাঝখানে দড়ি খাটাইয়া, মেয়ে-পুরুষের পথ পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। খাকী কোটের বুকে লাল কাপড়ের ফুল আঁটা কয়েক জন যুবক দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বামী আমাদের লইয়া, পুরুষগণের রাস্তা দিয়াই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই বাবুরা বলিয়া উঠিল—"মা-লক্ষ্মীরা, এই দিকে—এই দিকে"—এবং বলপূর্ব্বক আমাদের পৃথক্ করিয়া দিল। পুরুষের সারি পুরুষদিগের ঘাটে যাইবে, স্ত্রীলোকের সারি স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে যাইবে, এই প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে আমার স্বামী জানিতেন না; এখন জানিয়া তিনি চীৎকার করিয়া আমাদের বলিয়া দিলেন—"চান ক'রে উঠে ঘাটের চাঁদনিতে তোমরা দাঁড়িয়ে থেক, কোথাও যেও না, এক পা নোড়ো না, ভিড় কমলে আমি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবো।" পিসীমা উচ্চস্বরে উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।"

প্রথমটা আমি পিসীমা'র হাত ধরিয়া ছিলাম—ক্রমে ভিড়ের চাপে হাত ছাড়িয়া গেল। পিসীমা একটু পিছাইয়া পড়িলেন। আমি মাঝে মাঝে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। খানিক পরে আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমে ভিড়ের চাপ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন আর আমি চলিতেছিলাম না, ভিড় আমাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভিড়ের চাপে মাঝে মাঝে পা দু'টি আমার রাস্তা ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িতেছে,—সেই অবস্থায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পা আবার মাটীতে ঠেকিতেছে। ভাগ্যিস ইহা স্ত্রীলোকের ভিড়—এই ভিড় পুরুষের হইলে কি কেলেঙ্কারীই হইত, ছি ছি!

শুনিয়াছিলাম, ঘাট অধিক দূরে নহে—কিন্তু অনেকক্ষণ চলিলাম—চালিত হইলাম বলিলেই ঠিক হয়। কোথায় যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একটা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রাণটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখিলাম, ঘাটের উপরে চাঁদনি রহিয়াছে; বুঝিলাম, স্নানান্তে এইখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া পিসীমা'র আশায় চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি জলে নামিলাম; অন্য সকলের সঙ্গে আমিও স্নান করিতে লাগিলাম, এবং চারিদিকে চাহিয়া পিসীমা'কে খুঁজিতে লাগিলাম। আসিবার সময়, ভিড়ের মধ্যে ২।৩ জন স্ত্রীলোকের সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়াছিল, দেখিয়াছিলাম, খাকী কোটের উপর লাল ফুল-পরা যুবকরা ভিড় সরাইয়া তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছিল। ভাবিলাম, পিসীমারও কি সেইরূপ হইল না কি? আহা, বুড়া মানুষ, দুর্ব্বল শরীর, হায় হায়, এইরূপ অপঘাত-মৃত্যুই কি শেষে তাঁহার অদৃষ্টে লেখা ছিল!

যাহা হউক, আমি স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া, চাঁদনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও হুড় হুড় করিয়া স্নানার্থিনী রমণীরা আসিতেছে। আমি ভিজা কাপড়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া, দুরু দুরু ব্যাকুলহৃদয়ে পিসীমা'কে খুঁজিতে লাগিলাম।

ক্রমে দেখিলাম, স্নানার্থিনীর প্রবাহ মন্দীভূত হইল, স্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তবে আর পিসীমা'র আসিবার আশা কি? ভয়ে আমার কান্না পাইতে লাগিল, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমি সেইখানে শাণের উপর বসিয়া পড়িলাম

বোধ হয়, পুরা আধঘণ্টাকাল আমি এই ভাবে সেই চাঁদনিতে বসিয়া রহিলাম। কখনও মুখ ঢাকিয়া কাঁদি, কখনও ব্যাকুলনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখি। স্বামী যে বলিয়াছিলেন, স্নানান্তে আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবেন, তিনিই বা বিলম্ব করিতেছেন কেন? এইরূপ দুশ্চিন্তায়, ক্রন্দনে ও অন্বেষণে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা আর আমার হুঁস রহিল না।

আমি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিলাম, হঠাৎ আমার কানে গেল, "কে গো তুমি ব'সে কাঁদছ? তুমি কি হারিয়ে গেছ?"

পরিচিত কণ্ঠস্বর—আমি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে হঠাৎ আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যদি ইহা স্বপ্ন না হয়,—তবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শচীন। গায়ে তা'র খকী রঙের কোট, বুকে লাল কাপড়ের ফুল সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটা, পায়ে বুট জুতা, ধুতিখানি মালকোঁচা বাঁধা। আমরা উভয়ে অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া আছি—হঠাৎ শচীন বলিয়া উঠিল—"বিনোদিনী?"

তিন বৎসর পরে আবার তাহাকে দেখিলাম। সজল নেত্রযুগল তাহার পানে স্থাপন করিয়া বলিলাম—"শচীন!"

শচীন বলিল, "ব্যাপার কি, শীঘ্র বল। এখানে তুমি কি ক'রে এলে?"

আমি ব্যাপারটা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। সে শুনিয়া বলিল, "কিন্তু এ ত জগন্নাথঘাট নয়, এ যে বাবুঘাট! বুঝেছি, ভিড়ের মধ্যে প'ড়ে জগন্নাথঘাট ছাড়িয়ে তুমি এত দূরে চ'লে এসেছ। তোমার স্বামী তোমায় জগন্নাথঘাটেই খুঁজবেন, এখানে ত আসবেন না!"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলাম, "তা হ'লে কি হবে শচীন?"

শচীন বলিল, "ভয় কি? আমি একটা ব্যবস্থা করছি। তোমার স্বামীকে খুঁজে দিতে পারি না পারি, দেশে ত তোমায় পৌঁছে দিতে পারবো! তুমি এক কায কর, এইখানে একটু ব'সে থাক, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি। খবর্দ্দার, এখান থেকে এক পা নোড়ো না, তা হ'লে আর আমি তোমায় খুঁজে পাব না।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন গাড়ী আনিয়া আমায় বলিল, "এস। গাড়ীতে ওঠ।"

আমি উঠিলে, গাড়োয়ানকে "জগন্নাথঘাট" আদেশ দিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমি যে দিকে বসিয়াছিলাম, তাহার উল্টা দিকে সে বসিল।

গাড়ী জগন্নাথঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন নামিয়া, গাড়ীর নম্বর তাহার পকেটবুকে টুকিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "তুম্ ঠিয়া খাড়া রহো। হাম আভি আতা হায়।"—বলিয়া সে ঘাটের দিকে নামিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি ঘাটে গিয়ে 'মশাই, কার পরিবার হারিয়েছে—কার পরিবার হারিয়েছে'—ব'লে কত চীৎকার করলাম, কৈ, কেউ ত কোনও উত্তর দিলে না। তোমার স্বামী এখানে নেই। বোধ হয়, তোমায় খুঁজে না পেয়ে তিনি চ'লে গিয়ে থাকবেন।"

কি বলিব, কি করিব, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল। আমি মাথাটি হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

শচীন রাস্তায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার পর, গাড়ীর খড়খড়িগুলা একে একে সব উঠাইয়া দিয়া, গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো বউবাজার।" বলিয়া সে উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্ধুর আশ্রয়ে

আমি যে দিক্‌টায় বসিয়াছিলাম, শচীন এবারও তাহার বিপরীত দিকেই বসিল। বসিয়া বলিল, "বিনি, তুই বড় হয়েছিস্। আমি প্রথমটা তোকে দেখে চিনতেই পারিনি রে!"—পূর্ব্বদিনের ইদানী শচীন আমাকে, ছেলেবেলাকার মত 'তুই' বলিয়াই কথা কহিত।

উত্তর করিলাম, "চিরকালই কি ছোট থাকবো?"

শচীন বলিল, "তোর বিয়ের খবর আমি বউদিদির কাছেই শুনেছিলাম। ছেলেপিলে হয়েছে?"

"না।"

"কেন?"

এই, 'কেন'র আমি কি উত্তর দিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, নীরবে অবনত মুখে বসিয়া রহিলাম।

খড়খড়িগুলার কোন কোনও পাখী ভাঙ্গা ছিল, তাই সেগুলি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে কিছু আলো ছিল। আমি একবার মুখ তুলিয়া দেখিলাম, শচীন আমার পানে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাড়ী কোথায় যাচ্ছে?"

"আমার বাসায়।"

"তোমার ত মেসের বাসা। সেখানে পাঁচ জন পুরুষ-মেের মধ্যে আমায় রাখবে কোথায়?"

শচীন বলিল, "না রে, সেখানে কি তোকে রাখবো? আমার জিনিষপত্র কতক নেবার জন্তে যাচ্ছি। তার পর আর এক যায়গায় নিয়ে গিয়ে তোকে খাওয়াব-দাওয়াব, তার পর ছ'জনে পরামর্শ ক'রে যা করতে হয় করা যাবে।"

ভাবিলাম, শচীন আমায় কোথায় লইয়া চলিল? ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা গুর-গুর করিতে লাগিল।

শচীন খড়খড়ির ফাঁক দিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হাঁকিল, "এই কোচমান, ঐ সামনে বাড়ী, রাখখো।"

গাড়ী দাঁড়াইল। শচীন বলিল, "তুমি চুপটি ক'রে গাড়ীর মধ্যে ব'সে থাক। আমি উপরে গিয়ে, আমার বাক্স আর বিছানাটা নিয়ে আসি।"

গাড়ীর দরজা খুলিয়া শচীন নামিয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। খড়খড়ির ফাঁকে দেখিলাম, এক জন চাকর একটা মাঝারি আকারের বাক্স ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছে। বাক্সটা সে গাড়ীর ছাদে তুলিয়া দিল শচীন তাহাকে বলিল, "বিছানা আউর সোরাইঠো লে আও জলদি।" চাকর চলিয়া গেলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "আব কাঁহা যানে হোগা বাবু?" শচীন বলিল, "শেয়ালদা ষ্টেশনকে পাশ।" চাকর ফিরিয়া আসিলে, বিছানার বাণ্ডিলটা গাড়ীর ছাদে দিয়া, সোরাই হাতে করিয়া শচীন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

শচীন বলিল, "শেয়ালদা ষ্টেশনের কাছে যাত্রিনিবাস ব'লে একটা বাঙ্গালী হোটেল আছে; কেউ পরিবার নিয়ে এলে, তাদের থাকবারও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। তোমার স্বামীকে খোঁজবার জন্তে ২।১ দিন যে কলকাতায় থাকতে হবে, সেইখানেই তোমায় রেখে দেবো। আর ত কোনও স্থান নেই। সেখানকার কোনও ঝি-টি তোমায় যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি আমাকে স্বামী ব'লে পরিচয় দিও। নইলে, তারা অজ্ঞ লোক, অকারণ একটা মন্দ কিছু ভাবতে পারে। বুঝেছ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, শচীনের মৎলবটা কি?

কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শচীন বলিল, "সকালে এক পেয়ালা চা আর একটু মোহনভোগ খেয়ে ভলন্টিয়ারি করতে বেরিয়েছিলাম। তুমি ত তাও খাওনি, তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়?"

আমি বলিলাম, "মেয়েমানুষের আবার ক্ষিদে!"

শচীন বলিল, "নাঃ, তারা ত আর মানুষ নয়!"

আমি বলিলাম, "ক্ষিদে-তেষ্টা তাদের দমন করতে শিখতে হয়।"

শচীন বলিল, "বিনি, তুই এই ১৩২৯ সালে, নবযুগের নতুন আলোর দিনে বল্লি, মেয়েমানুষকে ক্ষিদে-তেষ্টা দমন করতে শিখতে হয়? কেন তারা দমন করবে? কি অপরাধে, শুনি? ও সব মতটত্ত মহাভুল—অত্যন্ত সেকেলে। 'নারী-সমস্যা'র ত এখন মীমাংসাই হয়ে গেছে। দেহধর্ম্মের বা মনোধর্ম্মের কোনও ক্ষুধা দমন করার চেষ্টাই মহামূর্খতা; তার তৃপ্তিসাধনই পুরুষের যথার্থ পুরুষত্ব, নারীর আদর্শ নারীত্ব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি বই লেখ না কি?"

"কেন?"

"বইয়ে এই রকম সব কথা দেখতে পাই।"

শচীন বলিল, "লিখি না, পড়ি। আজকাল কত সব ভাল ভাল বই বেরুচ্ছে, সে সব তুই পড়িস্? হাঁ—তুই যখন পুরুলিয়াতে ছিলি, তখনই ত তোরা ক' বোনে বেশ লিখাপড়া করতিস্ দেখেছি"—বলিয়া কয়েকখানা পুস্তকের নাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সব বই তুই পড়েছিস?"

আমি বলিলাম, "পড়েছি। দু'বার তিনবার ক'রে পড়েছি।"—বহিগুলির নাম আজ সাত বৎসর পরে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, যদিও তখন সেগুলি সাহিত্যাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, নবযুগের বিজয়স্তম্ভ, বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, লেখকগণ "অমর" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির নাম এখন আর শুনা যায় না। এমন কি, কোনও পুস্তকের দোকানের ক্যাটালগে অথবা চৈতন্য লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকাতেও দেখিতে পাই না।

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নারীর অধিকার সম্বন্ধে তোর মত কি, বল্। আমাদের সেই মা-দিদিমাদের, বঙ্কিমবাবু-টাবুদের মতই ঠিক, না আজকাল এই এঁদের মতই ঠিক?"

আমি বলিলাম, "আজকালকার মতই ত আমার ঠিক ব'লে মনে হয়।"

শচীন পুলকিত হইয়া বলিল, "বেশ বেশ! শুনে সত্যি বড় সুখী হলাম, বিনি"—বলিয়া সে আমার স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া দিল।

ক্রমে গাড়ী যাত্রিনিবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন আমাকে গাড়ীতে রাখিয়া, ঘর ঠিক করিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে হোটেলের এক জন ভৃত্য সহ ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য গাড়ীর ছাত হইতে বাক্স বিছানা নামাইল। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া শচীন আমাকে নামাইয়া লইল। আমি ঘোমটা দিয়া, তাহার স্ত্রী সাজিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তেতালায় উঠিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, যাহা সাজিয়াছি, সত্যই যদি আমি তাহাই হইতাম, তবে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর কে থাকিত?

উপর-ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘোমটা তুলিলাম। দেখিলাম, ঘরখানি মাঝারি আকারের; এক ধারে একখানি কেওড়া-কাঠের তক্তপোষ, অপর দিকে একটি ছোট গোল টেবল, একখানি চেয়ার, দেওয়ালে একটি আরসি টাঙ্গানো। রাস্তার ধারে চিক-ফেলা ছোট বারান্দাটি এই ঘরখানিরই নিজস্ব; অন্য কোনও ঘরের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।

চাকর বিছানা-বাক্স নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, খাবারটাবার কিছু আনতে হবে কি?"

শচীন বলিল, "আনতে হবে বৈ কি। তোদের ম্যানেজার বাবু ত বল্লে, এত বেলায় ভাত কোথা পাব। এই টাকা নে।"—বলিয়া, কি কি আনিতে হইবে, শচীন তাহা বলিয়া দিল।

চাকর টাকা লইয়া চলিয়া গেল। এক জন মধ্যবয়স্কা কপালে উল্কিপরা ঝি আসিয়া বলিল, "বউমা, চানটান করবে কি?"

আমি বলিলাম, "না, এই তো আমরা গঙ্গাস্নান ক'রে আসছি।"

ঝি বলিল, "কত দিন তোমাদের থাকা হবে?"

শচীন বলিল, "এই এক দিন। কা'ল কি পরশু আমরা দেশে ফিরে যাব। এই সোরাইটেতে জল ভ'রে এনে দাও ত, ঝি!"

ঝি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ, বউমা, খাবার-টাবার দরকার হ'লে আমাকেই বরং আনতে দিও। খোট্টা বেটারা আমাদের বাঙ্গালী-পছন্দ খাবার কি কিনতে জানে?"—বলিয়া সোরাই লইয়া চলিয়া গেল।

শচীন জামা ছাড়িয়া, বিছানার বাণ্ডিলের দড়ি খুলিতেছিল; বলিল, "দেখ, আমি স্নান করবো। যদিও সকালবেলা বাসা থেকে স্নান ক'রে বেরিয়েছিলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে ভলণ্টিয়ারি ক'রে ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। তুমি আমার কোটটা আর গেঞ্জিটা ঐ বারান্দায় টাঙ্গিয়ে দাও। আর এই চাবি নাও, বাক্স থেকে আমার ধুতি, তোয়ালে, সাবান বের করে দাও।"

বাক্স খুলিয়া জিনিসগুলি বাহির করিয়া দিলাম, শচীন স্নানার্থ গমন করিল। আমি নিজ বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, আধময়লা একখানি মিলের সাড়ী পরিয়া সমস্ত রাত্রি রেলে আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গায়েই শুকাইয়াছি; এ রকম পেত্নীর মত বেশে শচীনের সামনে থাকিতে আমার লজ্জা করিতেছিল। তাই আমি তার বাক্স হইতে একখানি কালো ফিতাপাড় দেশী ধুতি বাহির করিয়া পরিলাম; সোরাইয়ের জলে মুখটা, হাত দু'খানা ধুইয়া ফেলিলাম, শচীনের চিরুণী ব্রুস লইয়া, দেওয়ালে টাঙ্গানো সেই আরসির সামনে দাঁড়াইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া, শচীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শচীন ভিজা তোয়ালে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাসিভরা চোখে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "বাঃ, ধুতি প'রে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে! ও ধুতির আজ

জন্ম সার্থক হ'ল!"—তাহার কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলাম।

চাকর খাবার আনিল। ঝি আসন, থালা প্রভৃতি দিয়া গিয়াছিল। শচীনকে খাবার দিলাম। আহারান্তে তক্তপোষের উপর বসিয়া সে পাণ ও সিগারেট খাইতে বসিল।

তাহার পাতে আমি খাইতে বসিলাম। আমার খাওয়া হইলে, শচীন বলিল, "এইবার আমি বেরুই, তুমি দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে একটু ঘুমাও।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথা যাবে?"

"থানায় থানায় গিয়ে একবার খোঁজ নিতে হবে, তোমার স্বামী কোনও থানে ডায়েরি করিয়েছেন কি না। যদি করিয়ে থাকেন, তবে তাঁ'র ঠিকানাও পাব। কিংবা পুলিসকে জানিয়ে আসতে পারবো, তুমি অমুক ঠিকানায় আছ।"

আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি এখানে একলা থাক্‌বো?"

"দিনের বেলা, ভয় কিসের?"—বলিয়া শচীন বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুকের হার

আমি ঘুমাইলাম। কা'ল সারারাত্রি জাগরণ, আজ ভিড়ে কষ্টের পর শরীর আমার অবশ হইয়া গিয়াছিল—খুব ঘুমাইলাম।

ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া, শচীনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা হইল, ঝি আসিয়া ঘরে বাতি জালিয়া দিয়া গেল। প্রায় ৮টার সময় শচীন ফিরিল। বলিল, কোনও থানায় কেহ আমার সম্বন্ধে কোনও ডায়েরি করায় নাই। অবশেষে সে কালীঘাটে গিয়াছিল। প্রত্যেকটি যাত্রিবাসা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিয়াছে, কোথাও আমার স্বামীর সাক্ষাৎ পায় নাই।

চাকরকে ডাকিয়া শচীন দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া শচীন বলিল, "এখন উপায়? তোমায় কি তোমার স্বামীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে আসবো?" আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, "যদি বল, আমাদের বাড়ীতে, নীহার বউদির কাছেও তোমায় রেখে আসতে পারি।"

তথাপি আমি চুপ করিয়া আছি দেখিয়া শচীন বলিল, "কি ভাবছ তুমি?"

"আমি ভাবছি, তুমি আমায় স্বামীর বাড়ীতেই রেখে এস আর নীহারদির কাছেই রেখে এস, তুমি আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ, এক দিন এক রাত তোমার সঙ্গেই আমি ছিলাম, এ কথা শুনলে আমার স্বামী কি ভাববেন?"

চা আসিল। শচীন এক পাত্র লইয়া অন্য পাত্র আমায় দিতে চাহিল। আমি চা খাই না শুনিয়া সে নিজেই উভয় পাত্র গ্রহণ করিয়া বলিল, "এতে আর দোষটা কি? এক জন ভদ্রলোক যদি এ রকম অসহায় অবস্থায় কোনও বিপন্না স্ত্রীলোককে পায়, সে কি তাকে তার বাড়ী পৌঁছে দেবে না?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু, তুমি যে!"

"কেন, আমি কি দোষ করেছি?"

"তুমি না কর, আমি যে করেছিলাম। আর, সে কথা যে আমার স্বামীর কানেও উঠেছে।"

শচীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

আমার ভারি লজ্জা করিতেছিল, তথাপি কোনও মতে আমি বলিলাম, "বিয়ের পর, আমার স্বামী একবার পুরুলিয়াতে এসেছিলেন। ননীবালা তখন ৫ বছরের। আমার স্বামী রঙ্গ ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর বিনোদ দিদি আমাকে কি রকম ভালবাসে বল দেখি।' ননী বলেছিল, 'না, তোমাকে ভালবাসে না, শচীনদাকে ভালবাসে।' স্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শচীনদা কে?' ননী বলেছিল, 'সেই যে আমাদের বাড়ী থাক্‌তো। তার সঙ্গে বিনোদদিদির বিয়ে হবার কথা হয়েছিল কি না। দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখত, দু'জনে হাসাহাসি করত, তার পর যখন বিয়ে ভেঙে গেল, সে চ'লে গেল, দিদি সেদিন কেঁদে একবারে ভাসিয়ে দিয়েছিল তার পরেই ত তোমার সঙ্গে দিদির বিয়ে হ'ল কি না!

শচীন বলিল, "আচ্ছা দুষ্ট মেয়ে ত! তা, এ রকম সব কথা সে বানিয়ে বল্লে কেন?"

"বানিয়ে বলবে কেন?"

"তবে কি সত্যিই তুমি—

সত্যিই আমি—" বলিয়া মুখ নত করিলাম; বোধ হয়, আমার গাল দুটিও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে আমিও বলি। সেই পুরুলিয়াতে, যখন আমি সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে দিন দিন সুস্থ সবল হয়ে উঠ্ছিলাম, তোমায় আমি যে কি চোখে দেখেছিলাম, তা বলতে পারিনে। বাবা যখন চিঠি লিখলেন যে, তিনি হাজার টাকার কমে তিনি কিছুতেই আমার বিয়ে দেবেন না, আমায় চ'লে আসতে হুকুম দিলেন, তখন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। তোমার আশা জন্মের মত ছেড়ে, আমিও চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সেখান থেকে চ'লে এসেছিলাম। এত দিনেও কি আমি তোমায় ভুলতে পেরেছি? এ তিন বছরের মধ্যে বোধ হয় এমন একটি দিন যায় নি, যে দিন তোমার কথা আমার মনে পড়েনি।"

শচীনের মুখে এই কথা শুনিয়া, পুলকে আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর আশা আমি একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিলাম। শচীন যদি তাঁহাকে খুঁজিয়াও পায়, অথবা সঙ্গে করিয়া আমায় দেশে রাখিয়া আসে, তথাপি তিনি যে আমায় আর গ্রহণ করিবেন, এ সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে আর মিছা কেন সে চেষ্টা? বিশেষ, সেই স্বামী! কেন? মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, নিজেকে তাঁহারই পায়ে বলি দিতে হইবে নাকি? "নারী-সমস্যা"র ত মীমাংসাই হইয়া গিয়াছে; "নারীর অধিকার" সম্বন্ধে এখন আর কোনও সন্দেহই ত নাই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, শচীন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবা আমার বিয়ে দেবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোমায় ভুলতে পারিনি বলেই আমি বিয়ে করতে রাজি হই নি। কিন্তু তুমি ত বেশ মনের সুখে স্বামীর ঘর করছিলে!"

আমি বলিলাম, "তা তুমি বলবে বৈ কি!"

"বল্‌বো না কেন? তবে কি, তুমিও কি আমায় ভুলতে পারনি, বিনোদ?"

ইচ্ছা হইল বলি, "ভোলা কি যায় প্রিয়তম?"—কিন্তু লজ্জায় শেষ শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "ভোলা কি যায়? পতিভক্তি পতিসেবা করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি, পারি নি। বিজয়ার রাতে যখন তাঁ'কে প্রণাম করেছি, মনে হয়েছে, যেন তোমায় প্রণাম করছি। তিনি যদি কখনও আমায় আদর করেছেন, তখন চোখ বুজে কল্পনা করেছি, যেন তুমিই আমায় আদর করছ।"

শচীন আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখে বোধ হয় জল আসিতেছিল, ল্যাম্পের আলোকে সে দু'টি চক্‌চকে দেখাইল।

ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ভাত আনবে কি? রান্না-বান্না হয়ে গেছে।"

রাত্রি প্রায় তখন ৯টা। শচীন ভাত আনিতে বলিল। ঝি, ঠাকুরকে বলিয়া, আবার ফিরিয়া আসিল, ঠাঁই করিয়া, আসন বিছাইয়া দিল। ক্ষণকাল পরে ঠাকুর অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দুই থালা ভাত আনিয়া, ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে শচীন বলিল, "আচ্ছা, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, আমি তবে এখন বাসায় যাই। তুমি পেয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে থেক। কা'ল সকালে আবার আমি আসবো; কি করা উচিত, দু'জনে ব'সে পরামর্শ করা যাবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার বিছানা ত এখানে। সেখানে গিয়ে তুমি শোবে কিসে?"

শচীন বলিল, "সেখানে আর একটা তোষক, বালিস আমার আছে।"

আমি বলিলাম, "তা যেন আছে। কিন্তু, আমি কি এখানে একলা কখনও থাকতে পারি? আমার ভয় করবে না বুঝি?"

শচীন বলিল, "তোমার ভয় করবে?"

আমি অভিমানের স্বরে বলিলাম, "না, করবে না! আচ্ছা, তুমি যাও না, কা'ল এসে দেখবে, চোরে আমায় গলা টিপে মেরে রেখে গেছে।"—বলিয়া আমি চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইতে লাগিলাম। ইহা আমার অভিনয় নহে,—এই অপরিচিত বিন্ধাবব স্থানে রাত্রিতে একা থাকিতে

হইবে শুনিয়া সত্যই ভয়ে আমার শরীর কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া শচীন বলিল, "ছিঃ, কেঁদ না। একথা যদি তোমার ভয় করে, আমি থাকছি না হয়, তা'র জন্যে আর কি? কেঁদ না, কেঁদ না, চুপ কর!"—বলিয়া চক্ষু হইতে আমার হস্ত অপসারিত করিয়া লইল।

আমি চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আমি ত জন্মের মতই গেছি। বাপ নেই, মা নেই, স্বামীর ঘরে আমার যায়গা নেই। এখন তুমিও যদি আমায় ত্যাগ ক'রে যাও, তা হ'লে আমার দশা কি হবে?"

শচীন আমার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া, আবেগকম্পিত স্বরে বলিল,"তোমায় আমি ত্যাগ করবো, বিনোদ? কখনই নয়। আজ তিন বৎসর তোমার নাম জপ ক'রে কাটিয়েছি, দেবতা যদি সদয় হয়ে তোমায় মিলিয়ে দিলেন, তোমায় আমি ত্যাগ করব? নিশ্চয়ই না। তোমাকে আমি বুকের হার ক'রে রেখে দেবো।"

শেষের দিকের কথাগুলা বলিবার সময় শচীনের গলা ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি বুঝিলাম, বিধাতা সদয় হইয়া এত দিনে আমার "নারীত্ব" সফল করিয়া দিলেন।

এই পরিচ্ছেদের বাকী অংশ এবং পরবর্ত্তী একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ সম্পাদক মহাশয় কাটিয়া দিয়া অষ্টমকে করিয়াছেন—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শচীনের মৃত্যু

সে দিন—সেই সর্ব্বনাশের দিন—২২শে বৈশাখ, বাঙ্গালা ১৩১১ সাল। তিনটি বৎসর মাত্র শচীনকে পাইয়াছিলাম, সুখের মুখ দেখিয়াছিলাম,—কিন্তু সে সুখে আমার বাজ পড়িল।

এক দিন তুমি বলিয়াছিলে, আমায় তোমার বুকের হার করিয়া রাখিবে—রাখিয়াছিলেও তাই তবে আজ তোমার সেই কত সাধের কত গর্ব্বের বুকের হারকে, পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়া কোথায় চলিলে, প্রাণাধিক?

আর কি লিখিব? কিছুতেই কিছু হইল না। ভোরবেলা, আমার জগৎ আঁধার করিয়া,আমায় অকূল সাগরে ভাসাইয়া, শচীন চক্ষু বুজিল। আমি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, মাটীতে লুটাইয়া পড়িলাম। সে চীৎকার শুনিতে পাইয়া, নবীন বাবুর স্ত্রী কমলা দিদি, কেদার বাবুর স্ত্রী নিরুপমা ছুটিয়া আসিয়া আমায় তুলিয়া, জড়াইয়া ধরিল।

সারাটা দিন যে কি করিলাম, কি হইল, সে সকল আমি ভাল স্মরণ করিতে পারি না। দাহকার্য্য সমাধা হইবার পর নিমতলার ঘাটে আমায় স্নান করাইয়া, কমলা দিদি আমার হাতের কাচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া সীঁথির সিন্দুরের দাগ গঙ্গামৃত্তিকা ঘষিয়া ধুইয়া দিয়া, ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া, আমায় সাদা থান পরাইয়াছিল, তাহা বেশ স্মরণ আছে। তাহার পর গাড়ী করিয়া আমায় বাড়ী আনিয়াছিল এবং পীড়াপীড়ি করিয়া আমায় একটু গরম দুধ খাওয়াইয়াছিল, তাহাও আমার মনে আছে।

দুই তিন দিন পরে কমলা দিদি বলিল, "যা অদৃষ্টে ছিল, তা তো হয়ে গেল। তোমার শ্বশুরকেই না হয় একখানা চিঠি লেখ। এ বিপদ শুনলে কি এখনও তাঁর মনে দয়া হবে না?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিয়ালদহ যাত্রিনিবাস হইতে যখন এই চোরবাগানের বাড়ীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া আমরা আসিয়া স্বামি-স্ত্রী পরিচয়ে বাস করিতে লাগিলাম, তখন সে বাড়ীর অন্য ভাড়াটিয়া গৃহস্থদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বাপ-মা'র অমতে আমার স্বামী আমাকে বিবাহ করায়, তাঁহার পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন; তখন তিনি চাকরী যোগাড় করিয়া এখানে কলেজে পড়িতে থাকেন, বিবাহের পর এ কয় বৎসর আমি বিধবা মা'র কাছে থাকিতাম। স্বামী মাঝে মাঝে গিয়া আমায় দেখিয়া আসিতেন। সম্প্রতি মা'র মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ায় তিনি আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন।—আমার এই কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মত হইয়াছিল। তখন অবশ্য শচীনের পিতা কিছুই জানিতে পারেন নাই; পরে জানিয়াছিলেন, এবং জানিয়া শচীনকে সত্যই তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

কমলার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "তাই না হয় লিখি তাঁ'কে চিঠি।"

কমলা বলিল, "তোমার স্বামী টাকা-কড়ি কি রেখে গেছেন, বল দেখি?"

আমি বলিলাম, "কি আর রেখে যাবেন, দিদি? নতুন উকীল, এই ত এক বছরমাত্র পাশ ক'রে ছোট আদালতে বেরুচ্ছিলেন। যা আনছিলেন, তাতে ভাত-কাপড় ঘর-ভাড়া কুলোতো না, তাই সন্ধ্যেবেলা প্রাইভেট টিউসনি করতেন। আমার গায়ে ২।৩খানি যা গহনা ছিল, তাও তাঁ'র অসুখের সময় বিক্রী ক'রে ডাক্তার দেখাতে হ'ল। সবই ত জান, দিদি!"

কিন্তু, কাহাকেও আমি পত্র লিখিলাম না, কোন্ মুখে লিখিব? কি করিয়া নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইব, ইহাই আমি দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম। অবশেষে স্থির করিলাম, কোনও ভদ্রপরিবারে ঝি-গিরি করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলা কাটাইয়া দিব।

যে নাপিতানী আমাদের কামাইতে আসিত, তাহারই সাহায্যে আমি একটি চাকরীর যোগাড় করিলাম। জিনিস-পত্র যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া, ঘরভাড়া মিটাইয়া দিয়া, সেই নাপিতানীর সহিত আমি গিয়া ঝি-গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। অদৃষ্টে শেষে এও ছিল!

গৃহস্বামী প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁহার কয়লার আড়ত ছিল। বড় ছেলে মণিমোহনকে তিনি একটি স্বতন্ত্র কারবার করিয়া দিয়াছিলেন। সে-ও দুই পয়সা আনিত। গৃহে তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুসন্তান ছিল। তাহার আর দুইটি ভাই ছিল, তাহারা তখন নাবালক। সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। গৃহিণী আমায় বেশ যত্ন করিতেন; কিন্তু বউঠাকুরাণী আমাকে দেখিতে পারিত না। সর্ব্বদা আমার কাজে দোষ ধরিত এবং কড়া কড়া শুনাইয়া দিত। তাহার কারণ বোধ হয়, অন্য সকলে আমায় ঝি বলিয়া ডাকিলেও, তাহার স্বামী মণিবাবু আমায় নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এক দিন আমি আড়ালে থাকিয়া শুনিলাম, গৃহিণী তাঁহার ছেলেকে এই কারণে তিরস্কার করিতেছেন। মণিবাবু বলিলেন, "আহা, ভদ্রলোকের মেয়ে, এক দিন এক জন উকীলের পরিবার ছিল, অবস্থাগতিকে এসে ঝি-গিরি করছে, ওকে ঝি ঝি ব'লে ডাকাটা কি উচিত, মা?" আমার প্রতি মণিবাবুর এই অনুকম্পায়, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনটি ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতেই মণিবাবুর এই অনুকম্পা ভিন্ন আকার ধারণ করিল। এক দিন, অন্যের অসাক্ষাতে, তিনি আমার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিলেন।

(এইখানে দুই পৃষ্ঠা সম্পাদক মহাশয় কাটিয়া দিয়াছেন)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন।

(প্রথম ৩ পৃষ্ঠা কাটা)

"পিতৃ-আদেশে কারবার সম্পর্কে এক সপ্তাহের জন্য বোম্বাই যাইতেছি" বলিয়া সেই যে মণি চলিয়া গেল, আর ত আসিল না! যখন দেখিলাম, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সে আর আসে না, তখন সংবাদ জানিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইলাম। দুই তিন দিন পরে চর আসিয়া জানাইল, বোম্বাই যাইবার কথা তাহা মিথ্যা, মণিবাবু কোথাও যান নাই, বরাবর কলিকাতাতেই আছেন, তাঁহার এক জন নূতন জুটিয়াছে। আমি তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম; বুঝিলাম, সে আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম—তাহার বিরহে নহে—কারণ, তাহার প্রতি আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা বা স্নেহ ছিল না। তাহাদের বাড়ী থাকিতে, তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাটুকু এবং প্রথম প্রথম তাহার প্রতি যে আকর্ষণটুকু জন্মিয়াছিল, এখানে আসিয়া, এই এক বৎসর তাহার ব্যবহারে, দিনে দিনে আমার মন হইতে সে সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি কাঁদিতেছিলাম,—আমি কি ছিলাম, কি হইলাম ভাবিয়া—আমার উপায় এখন কি হইবে ভাবিয়া।

বাড়ীউলী এবং এই গৃহের অন্যান্য ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকগণ আমার কাছে আসিয়া সর্ব্বদা আমায় সান্ত্বনা দিত এবং উপায় নির্দ্দেশ করিত।

ক্রমে আমার টাকা ফুরাইল। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

এই স্থান হইতে ছয়টি পরিচ্ছেদ সম্পাদক মহাশয় নির্ম্মমভাবে কাটিয়া দিয়াছেন এবং মূলের ষোড়শ অথবা শেষ পরিচ্ছেদকে করিয়াছেন—

নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

জীবনের শেষ সাতটি বৎসর কি দুঃখেই যে আমার কাটিল, তাহা সেই সর্ব্বলোকসাক্ষী ব্যতীত আর কে জানিবে? শেষ বৈ কি, কারণ, ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, আমার এ রোগ শিবের অসাধ্য—তিন মাসের মধ্যেই সব ইহলোকের সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। ইহ-লোকের যন্ত্রণা ত শেষ হইবে;—কিন্তু পরলোকে? পর-লোক আছে কি না, কে জানে? যদি থাকে? তবে সেখানে আমার কি দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, দেহের স্বল্পাবশিষ্ট রক্ত যেন জল হইয়া যায়।

শেষের এ কয় বৎসর আমি অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাই নাই —বরং সাধারণ গৃহস্থবধূর অপেক্ষা সে বিষয়ে প্রাচুর্য্যই ভোগ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব নহি। কিন্তু মনের সুখ? গহনা গায়ে দিয়া আড়ং-ধোলাই জড়িপাড় শাড়ী-ব্লাউজ পরিয়া থাকিয়াও মনে সর্ব্বদা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ডাক্তারবাবু বলেন, শুধু শারীরিক অত্যাচার নহে, উহাও আমার এই ক্ষয়রোগের একটা প্রধান কারণ।

দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রহণে যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলাম, তখন হারাইয়া না গিয়া, গঙ্গায় যদি ডুবিয়া যাইতাম—তাহা হইলে, উঃ—কি সৌভাগ্যই আমার হইত! ডুবিলাম না—"নারীর অধিকার"—অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার অধিকার লাভ করিলাম।

কলিকাতায় প্রথম তিন বৎসর, শচীনের স্ত্রী সাজিয়া যে তিন বৎসর যাপন করিয়াছি, সেই সময়টা আমার সুখেই কাটিয়াছিল সত্য। কিন্তু সে-ও অনাবিল সুখ নহে। আধুনিক মতানুযায়ী, আমি আমার "নারীত্ব সফল" করিতেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি সর্ব্বদা বহিয়া যাইত, তাহার হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতাম না। আমাদেরই মত গরীব যে কয়টি গৃহস্থ-পরিবার সে বাড়ীতে ঘরভাড়া লইয়া বাস করিত, তাহাদের নিকট আমাদের যে কাল্পনিক পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিল—অবিশ্বাসের কোনও কারণই বর্ত্তমান ছিল না। তথাপি আমার মনে হইত, হায়, ইহারা যাহা, আমি ত তাহা নহি!

যাক্, সে সকল কথার অনুশোচনায় আর ফল কি? এখন আমার এই দুঃখময় লজ্জাময় জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করি। ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর ইহা যেন তিনি জনসমাজে প্রচারিত করিবার জন্য যত্ন করেন। "নবযুগের নূতন আলোক" বলিয়া যাহা কথিত হই-তেছে, তাহা যে "আলোক" নহে—তাহা যে আগুন, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই, আমার সেই আগুনে পুড়িয়া মরিবার ইতিহাস আমি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি; ইহা পাঠ করিয়া, যদি বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের একটি মেয়েও ভুলপথে পা দিতে দিতে, পা উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসে, তবে পরলোকে আমার আত্মা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কান্তিবাবুর খোসনাম

শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র নবনামকরণে কবিব্যসন; লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া তিনি কবিতা লিখিতেছিলেন এবং দুই চারি ছত্র শেষ করিয়া, মনের আনন্দে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। কবিতাটি অদ্য সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের নব সাহিত্য-সভায় পঠিত হইবে।

"মরি আজ দখিণা হাওয়ায়
কোন্ কাননের বিদেশিনী কোন্ সুরে গান গায়?
কম্পিত থর-থর—পল্লব মর-মর,
হৃদয় হা-হুতাশে করে হায় হায়!
মরি দখিণা হাওয়ায়।
মধুর চাঁদিনী আজি
ফুটেছে ফুলের সাজি
যেন স্তব্ধ ভোজবাজি—
নিশার দিশায়!
মরি দখিণা হাওয়ায়।
আমার প্রাণের ফুলটি কেন—
শুকাইয়ে যায়!
ওরে বাতাস দে রে আশাস
দে রে রঙিন দোল,
মনকে আমার মদির রসে
মাতাইয়ে তোল।
কলি ফুটুক মুঞ্জরিয়া—
অলি উঠুক গুঞ্জরিয়া
নদী ছুটুক কল্লোলিয়া
প্রেমের মমতায়,
মরি দখিণা হাওয়ায়।
আয় বসন্ত আয় রে ভুমা
ছড়িয়ে দে রে রঙ্গে চুমা—
অঙ্গ আঙ্গিনায়,
ছল-ছলিয়ে কল-কলিয়ে
প্রাণের কলস দে ভরিয়ে
কাণায় কাণায়—
মরি দখিণা হাওয়ায়।"

কান্তিচন্দ্রের দক্ষিণ হাওয়ার কবিতা দক্ষিণ হাওয়াতে কিন্তু মিলাইয়া যায় নাই, আরও এক জনের কানের মধ্য দিয়া মরমে পশিতেছিল।

এখন সবেমাত্র বেলা দুইটা, কিন্তু পাশের খালি বাড়ীর মালীমহলে সন্ধ্যাবেলা আজ সুমিত্রা দাসীর নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে আজ মালীরা সখের কৃষ্ণযাত্রা করিবে;—নাম্ উড়ে কনসার্টওয়ালারাও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহারা যাত্রার পর্ব্বে পর্ব্বে হারমোনিয়ম-বেহালাতে গড়ের বাদ্য বাজাইবে, যাত্রা অপেক্ষা ইহা শুনিবার লোভই সুমিত্রার অধিক। তাই আজ বেলাবেলি সান্ধ্যপাট শেষ করিবার অভিপ্রায়ে দাদাবাবুর ঘরের কিরোসিন-বাতিটা সে লইতে আসিয়াছিল। আসিয়া কবিতাপাঠ শুনিয়া—সুমিত্রা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া গেল; পড়া থামিলে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"বড় ভাল লাগে মোর দাদাবাবুর গান—শুনিকিরি খালি কান্না পায়।" বলিয়া সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুমিত্রা উড়েনী, আধাবয়সী; কিন্তু সাজসজ্জার আড়ম্বরে বয়সটাকে একান্তই কাঁচাইয়া তুলিয়াছে সে। তাহার খাট চুলের ঝুঁটিটি শাড়ীর ছেঁড়া পাড় দিয়া অতি মনোমোহনরূপে বাঁধা,—দুঃখের বিষয়, এই যত্ন-রচিত কেশ-বিন্যাস তাহার সচরাচর লোকের নজরে পড়ে না মাথার কাপড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু সীঁতির দুই পাশ হইতে তাহার সম্মুখের কপালের উপর তেল-জব-জবে পেটে-পাড়ান চুলের যে বাহার খুলিয়াছে, তদ্দর্শনে বৃদ্ধ কুণ্ডলিমালীর অন্ধ নয়নেও সহসা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়াছে। সুমিত্রাকে দেখিলেই সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যেও বার বার সেই মনমাতানো রূপ-সজ্জার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারে না। সুমিত্রার পরণে লালপেড়ে শাড়ী, গলায় পুঁথির মালা, কানে সোনার চ্যাকতি, নাকে ঝুটা মুক্তার নাকছাবি, হাতে রূপার বাউটি, এতদ্ব্যতীত বাকী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উল্কিভূষণে ভূষিত। সহসা সুমিত্রার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া, চমকিয়া কান্তিচন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুই এলি কোথা

থেকে, চ'লে যা বলছি—আমাকে বিরক্ত করিস্ নে।" সুমিত্রা দাদাবাবুর বকুনিতে বিন্দুমাত্র না টলিয়া, উল্কির উপর রসকলিকাটা 'চেপটা-চোপটা' মুখখানা দেরাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আরসির প্রতিবিম্বে একবার দেখিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "আহা মরি—সীতে ঠাকুরাণী অশোকবনে হায় হায় করুছেন—শুনি বুক ফাটিকিরি উঠিছে।"

কান্তি আবার রুদ্ধস্বরে বলিল—"হাসি হচ্ছে দেখ না, যা বলছি এখান থেকে!"

সুমিত্রা দমিবার পাত্রী নয়—বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর করিল, "হাসুছি না দাদাবাবু—কান্নায় মোর বুক ফাটিকিরি যাউছি—হায় রে সীতে ঠাকরুণ জনমদুখিনী জনক-কন্তে!"

কান্তিচন্দ্র আবার তাহাকে একটা তাড়া দিল—তাড়া খাইয়া সে অনুরোধের স্বরে বলিল—"দাদাবাবু গো, আর একবার গানটি বল না গো।"

এই সময় কান্তির এক জন বয়স্য যদি না আসিয়া দেখা দিত, তবে আরও কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ অভিনয় চলিত, কে জানে। নবাগতকে দেখিয়া, ঝুঁটির উপরকার অঞ্চলটা মাথার উপরে আর একটু টানিয়া দিয়া, তেলের বাতিটা মেজের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। গৃহের বাহিরে গিয়াই এমন অপরূপ স্বরে হাসিয়া উঠিল যে, তাহা হাসি বা কান্না, নিপুণ দার্শনিকই তাহা বলিতে পারেন।

বিনয় কান্তিবাবুর কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া টেবলের কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "লিখছ তা হ'লে? আমি তোমাকে তাড়া দিতে এসেছিলুম—বন্ধু!"

"এসেছ, বেশ করেছ—শোন দেখি একবার—বল দেখি, কেমন লাগে?"

বিনয় বলিল, "একবারে রাত্রেই শোনা যাবে; একটু কায আছে—এখনি যেতে হবে।" কান্তি চৌকি হইতে উঠিয়া—বন্ধুর হাত ধরিয়া তৈলমলিনতায় প্রতিদ্বন্দ্বিপরায়ণ পাশের চৌকিখানার উপর তাহাকে বসাইয়া বলিল—"ছোট্ট কবিতা, বেশী সময় যাবে না, শুনতেই হবে বিনদা? যদি তোমার ভাল লাগে, তবেই কমপিটিসনে যেতে মন যাবে।"

কবিতাটি সে সুরে-লয়ে-তানে আবৃত্তি করিয়া বন্ধুবরকে শুনাইল। শুনিয়া বিনয় মাথা নাড়িয়া প্রশংসিতদৃষ্টিতে কহিল, "হ্যাঁ, হয়েছে ভাল, ছন্দটা ঠিক যেন রবিবাবুরই—আর অনেক কথাও এর মধ্যে তাঁর,—অথচ ঠিক অনুকরণও নয়—আজ সন্ধ্যে থেকে নিশ্চয়ই তুমি উপাধিভূষিত হবে। ভাল কথা, ভারতলক্ষ্মীর বিজ্ঞাপনটা কি দেখেছ?"

"না, সময় কই? কাগজখানাও ত আমি এখনও পাইনি।"

"প'ড়ে দেখিস্ তবে সুবিধামত। রেখে যাচ্ছি কাগজ-খানা—আমি এখন চল্লুম।"

বিনয় চলিয়া গেল, সগর্ব্বে সানন্দে কান্তি আর একবার কবিতাটা পড়িল—তাহার পর খাতাখানা যথাস্থানে রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, এইবার দেখা যাক্, কি খুঁৎ ধরেন আমার বিদুষী ভগিনী,—তাঁর কাছ থেকে ত এক দিনও একটু মন-খোলা প্রশংসা পেলুম না। এণ্ট্রেন্স পাশ করেছেন তিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে, এই গরবেই গেলেন—প্রশংসা যা কিছু সব যেন তাঁরই প্রাপ্য। আরে, কবিতা লেখা—আর পাশ করা কি এক কথা না কি? পাশ হচ্ছে ত লাখো লোক—আর কবিতা লিখতে পারে ক'জন। তিনিও কবিতা লিখতে সুরু করেছেন—তা যদিও বুঝতে পেরেছি—ছেঁড়াগোড়া দু' একটা কাগজের টুকরতে তার নমুনা পাওয়া গেছে, ভাঙ্গা টুকরিতে স্থান পাবারই তা জিনিষ বটে। যা হ'ক্, এটা যদি ভাল না বলে ত নিশ্চয় বুঝব jealousy—সেরেফ jealousy! তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।"

২

শান্তির বিধবা মাতা শান্তিকে লইয়া ভ্রাতার বাড়ীতেই থাকেন। কান্তিচন্দ্র শান্তির মামাতো ভাই। উভয়ে প্রায় একইবয়সী,কান্তি বছরখানেকের মাত্র বড়। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াছিল দুই জনে একই সঙ্গে, কিন্তু শান্তি পাশ হইল প্রথম বিভাগে—আর কান্তিচন্দ্র টায়টোয়ে দুই চার নম্বর গ্রেসে—থার্ড ডিভিসনে পাশ-নাম রক্ষা করিল। পরীক্ষক-দিগের একান্ত পক্ষপাতিতাবশতঃই যে এমনটা হইল, মেয়ে বলিয়াই যে শান্তি তাঁহাদের নেকনজরে পড়িয়াছে, ইহাতে কান্তিচন্দ্রের বা তাহার বন্ধুগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই উপলক্ষে কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যেক পরীক্ষকের আদ্যশ্রাদ্ধের

আলোচনায় কান্তিচন্দ্রের মজলিসঘরটি বেশ সরগরম হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পর কান্তিবাবু যখন শুনিলেন, শান্তি এম্-এ পরীক্ষায় দাঁড়াইবারও সঙ্কল্প করিতেছে, তখন তাঁহার মন এতই খারাপ হইয়া গেল যে, বন্ধুদিগের খাস মজলিস এবং খোসগল্প কিছুই আর তাঁহাকে খুশী করিতে পারিল না। বে-ইজ্জৎ হইবার ভয়ে, স্কুল-কলেজের সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া—গান্ধী মহারাজের জয়গানে মাতিয়া তিনি ননকো-নিশান ধরিলেন।

পিতা অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, "গান্ধী মহারাজার জয়গান গাচ্ছিস—গা বাবা,বেশ; আমরাও ত গাচ্ছি—বিশ্ব-সংসারশুদ্ধ সবাই গাচ্ছে, কিন্তু স্কুল-কলেজ ছাড়বি কেন বাবা সে জন্য, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকবি।"

ছেলে উত্তর করিল, "গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকা ত আমার উদ্দেশ্য না,—পড়াশুনা আমি ঘরেই করব, পরীক্ষা না দিলে কি আর লোকে বিদ্বান্ হয় না? রবিবাবু ত এত বড় বিদ্বান্ লোক, তিনি ক'টা পাশ করেছেন, বলুন ত?"

কান্তিচন্দ্র পিতা-মাতার সবেধন নীলমণি! কি জানি, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে যদি বা সে বিবাগীই হইয়া যায়, অতএব আর উচ্চবাচ্য না করিয়া ছেলের পড়ার জন্য ঘরে মাষ্টার রাখিয়া দিয়াই তিনি মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিলেন।

এ দিকে দৈবনির্ব্বন্ধে, শান্তির ভাগ্যবলে,—হইতে পারে কান্তিরও অদৃষ্টজোরে—হঠাৎ শান্তির একটি ভাল বর জুটিয়া গেল, ফলে পাশের সংকল্পে তাহার এইখানেই ইতি পড়িল। কান্তিচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন! ননকোর কৈফিয়ৎ যতই টামুন না, তিনি বি-এ এম্-এ-ধারী বোনের পাশে এণ্ট্রেন্স পাশ ভাই! কথাটা এমন বিশ্রী শুনাইত! এ পর্ব্বতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া বন্ধুদের লইয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়া সে এক দিন পিক্‌নিক করিয়া আসিল।

পাশের পড়া ছাড়িল বলিয়া শান্তি কিন্তু লিখাপড়া ছাড়িল না। বিবাহের অল্পদিন পরেই ইঞ্জিনিয়ার হইবার মানসে স্বামী বিলাতে চলিয়া গেলেন—আর শান্তি স্বামীর মনের মত হইবার মানসে ঘরে বসিয়া যথাসম্ভব বিদ্যাবুদ্ধির পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইল। ছেলেবেলা হইতেই শান্তির গল্প-কবিতা লিখার দিকে ঝোঁক ছিল, যত্ন-পরিশ্রমে তাহার রচনা-প্রতিভা দিব্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটি গল্প-কবিতা বেনামা সহীতে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট সে পাঠাইয়া দিত এবং পরে আনন্দ-বিস্ময়ে দেখিত, কোন কোনটি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এ খবর কিন্তু শান্তি কান্তিবাবুকে কোন দিন জানায় নাই, কারণ, সে জানিত—দাদা এ কথা শুনিলে সন্তুষ্ট হইবেন না। হইলে কি হয়—সত্যের মহিমা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুই একখানা ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা কান্তিবাবুর হাতে আসিয়া পড়ায় তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন,—মাথা নাড়িয়া ভাবিলেন, "শান্তি দেখছি পরীক্ষার পড়া ছেড়ে চুপচাপ ব'সে নাই—ভিতরে ভিতরে একটা কাণ্ডকারখানা বাধাবার চেষ্টায় আছে। যাক্, এ ক্ষেত্রে আমাকে হার মানাতে পারবে না। দেখা যাক্, তার বিদ্যার কত দৌড়।"

কান্তিচন্দ্রও স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন, এবার রীতিমত উদ্যমে লিখা আরম্ভ করিলেন। রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থে তার সেল্‌ফ, আলমারি ভরিয়া গেল এবং অবিলম্বে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার পিতা ভাবিলেন, ননকো দলে মিশিয়া পিকেটিং করিয়া কোন্ দিন ছেলে জেলে যাইত—তাহার অপেক্ষা ইহা ভালই হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ তিনি এই সভায় দান করিলেন।

শান্তি তাহার লিখার কথা দাদার কাছে প্রকাশ করে নাই, কিন্তু কান্তি কবিতা লিখিয়াই সগর্ব্বে বোনকে শুনাইতে আসিত। এ ক্ষেত্রে যশোলাভের প্রত্যাশা সে বড় একটা করিত না; জানিত, এ বড় কঠিন ঠাঁই, কিন্তু শেলি, বায়রণের ন্যায় তাহার কবিত্ব-প্রতিভা যে সমালোচনা এবং সমালোচকের বহু ঊর্দ্ধে,নিন্দা-প্রশংসার অতীত অমরশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাই সে শান্তিকে অনুভব করাইতে আসিত।

কান্তি যখন শান্তির ঘরে ঢুকিল, তখন সে লিখিতেছিল। কান্তিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলা দেরাজবন্দী করিল—কিন্তু দীর্ঘ কাগজের লিখা পৃষ্ঠাটা কান্তির নজর এড়াইল না। কান্তি হাসিয়া বলিল, "কি লিখা হচ্ছিল। আমাকে দেখেই অমনি ঢাক গুড়-গুড়! কা'ল বুঝি মেল-ডে?"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "সে খবরটাও ত রাখ দেখছি।"

কান্তি বলিল, "তোর জন্তে রাখিনে—আমার টিটবিটটা আসে যে। কিন্তু কা'ল মেল আস্‌বে—মেল যাবে ত সেই পরশু। বাস্ রে, কি বড় বড় চিঠি। ফেল করবি দেখছি তুই জামাইবাবুকে। কি যে মাথামুণ্ড এত লিখিস, আমি ত ভেবেই পাইনে।"

"আচ্ছা, তোমার সময় আসুক না, দেখা যাবে তখন তুমি কি কর।"

"আমাকে এমন fool পাস্‌নি। সে সময়টা কবিতা লিখলে আমার পরকালের কায হবে। একটা নতুন কবিতা লিখেছি—শোন্ দেখি!" ভাবসহযোগে কবিতা পাঠ করিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগলো?"

শান্তি বলিল, "বেশ।"

অপ্রত্যাশিতভাবেও কান্তি এই উত্তরই প্রত্যাশা করিতেছিল। শান্তি ঠেকিয়া শিখিয়াছে, দাদার কবিতার প্রশংসা করিতে পারে না—তাই দাদা এমন চটিয়াছে তাহার উপর যে, লাইব্রেরীর বই একখানা চাহিয়া আর সে পায় না। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অতএব আজ আর সে অপ্রিয় সত্য কথা কহিল না; আরও এক কথা, তাহার পূর্ব্বের কবিতা হইতে ইহা অনেক ভাল।

কান্তি শান্তির প্রশংসালাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "বিনয়েরও এ কবিতাটা খুব ভাল লেগেছে।"

"সেই আসল কথা। আমি আর সত্যি কবিতার মর্ম্ম কি বুঝি। শুনে কি বল্লে বিনয়?"

"সে ত একেবারে মসগুল! বল্লে, ঠিক যেন রবিবাবুর কবিতাই সে শুনছে।"

এতটা বাড়াবাড়ি শান্তির সহ্য হইল না; বলিয়া ফেলিল, "তোমরা দশে মিলে দেখছি রবিবাবুর অস্তিত্বটাই লোপ ক'রে ফেলবে।"

কান্তি কিন্তু এ কথায় রাগ না করিয়া প্রসন্নমুখেই বলিল, "কি যে বলিস? তাঁর অনুকরণে তাঁকে ত আমরা বাড়িয়েই তুলছি।"

"তা সত্য! কাকের রব নইলে ত সূর্য্য প্রকাশ হয় না! আচ্ছা, তোমার সে কবিতাটা 'ভারতী' কি নিয়েছে!"

"ভারতী? সে হ'ল মেয়ের কাগজ, হাড়হদ্দ পক্ষপাতী! যদি তোর নাম দিয়ে দিতুম, তা হ'লে হয় ত বা নিত।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "কোনও এক সময়ে মেয়ের কাগজ ছিল বটে 'ভারতী', কিন্তু এখন ত তোমার স্বজাতিরাই 'ভারতী'র সম্পাদক।"

"আমার স্বজাতিদের ত বিজাতির প্রতি আরও বেশী মায়া, 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় আমাদের আশা-ভরসা বড়ই কম।" বলিতে বলিতে কান্তির হাতের কাগজখানা হঠাৎ নীচে পড়িয়া গেল, সে তুলিতে গিয়া দেখিল—আরও একখানা কাগজ সেখানে পড়িয়া আছে। শান্তির খাতা হইতে সেখানা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, শান্তি তাহা লক্ষ্য করে নাই। কাগজখানা হাতে লইয়া কান্তি বলিল, "এও যে কবিতা, তুইও দেখছি আমার দেখাদেখি কবিতা লিখতে ধরেছিস্—তা ভাল।"

শান্তি অনুনয় করিয়া কাগজখানা ফিরিয়া চাহিল, কান্তি না দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"সত্য কহি সখি সত্য কহি,
চঞ্চল বায়ু আমি চপল নহি।
আমি ভালবাসি, ভালবাসাতে
ভালবাসি সবে হাসাতে
পুলক রঙ্গে ভাসাতে
আমি অধীরে বহি।

আমি কাহারও দুঃখ ভুলি না,
কাহারে কভু ত ছলি না,
কুসুমে ফোটাই গন্ধে
পাখীরে ডাকাই ছন্দে
তরঙ্গে নাচায়ে তটিনী
রসেতে ভরায়ে ধরণী
প্রমোদমত্ত রহি।

আমি প্রেমের নিপুণ সারথি,
চির-কৈশোরে চির-নিপুণগতি।
যৌবন-মদ-রঙ্গে, বরণ ফুটায়ে অঙ্গে
মিলনে বিরহ আনিয়া
সুখেতে দুঃখ টানিয়া

জীবন স্বপনে মোহি
কৌতুক-নট আমি কপট নহি।
সখি কপট নহি।"

পড়িয়া কান্তি বলিয়া উঠিল, "ভারী মজা ত। আমরা দু'জনেই লিখেছি বাতাসের কবিতা। আচ্ছা, মজা করবি একটু, ভাই?"

"কি মজা?"

"তোরটা আমার নামে—আর আমারটা তোর নামে 'ভারতী'তে পাঠান যাক্—দেখ, কোন্‌টা তারা নেন? নামের মাহাত্ম্যে তারা চলে কি না, এতেই বুঝতে পারবি।"

"বেশ! আমার তাতে আপত্তি নেই।"

রাত্রিতে সাহিত্য-সভায় দুই কবিতাই কান্তি তাহার বলিয়া পাঠ করিল। সভায় বাহবা রব পড়িয়া গেল এবং সাহিত্যিকরা মিলিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন, অমৃতাম্বুজনিধি কবিব্যসন।

৩

'ভারতলক্ষ্মী' কাগজে কান্তি বিজ্ঞাপন দেখিল—একটি ভাল গল্পের জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার!

এত দিন সে কবিতাই লিখিতেছিল—এইবার সে গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। শুধু কবিতা লিখিয়া বাহিরে সে সাহিত্যিক নাম লাভ করিতে পারিবে না—গল্পও লিখিতে হইবে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু গল্প লিখিতে বসিয়া সে দেখিল, কবিতা লিখা তাহার পক্ষে যতটা সহজ, গল্প লিখাটা সে রকম নয়। প্লটগুলি মাথায় যেমন আসে, কাগজে কলমে লিখিতে গেলেই অন্যরকম হইয়া যায়, একের মুণ্ডু অন্যের ধড়ে গিয়া পড়ে। অনেক কষ্টে একটি গল্প শেষ করিয়া সে বিনয়কে শুনাইল; কিন্তু এ হেন বন্ধু বিনয়—যে তাহার কবিতা চোখ বুজিয়া শুনিয়া আহা উহু করে; সেও কিন্তু আজ কান্তির গল্পের প্রশংসা করিতে পারিল না। অগত্যা কান্তি আর একটা লিখিল, খ্যাত-নামা লেখকদিগের রচনাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া নিজের আখ্যানটি কোন রকমে সাজাইয়া তুলিল। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, শান্তি যদি গল্পটি দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনের মত করিয়া লিখিয়া দেয়—তবে ইহার শ্রী ফিরিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ত শান্তির কাছে ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়! তবে দায়ে পড়িয়া মানুষ কি না করে! অনিচ্ছাসত্ত্বেও গল্পটা হাতে লইয়া সে শান্তির ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, শান্তি ঘরে নাই—টেবলের উপর তাহার অসমাপ্ত একখানা চিঠি পড়িয়া আছে। বুঝিল—লিখিতে লিখিতে সে কোথাও এখনি আসিবে। চিঠিটা সে পড়িতে আরম্ভ করি

"প্রিয়তম—"

এ কি রকম সম্বোধন? বন্ধু বিনয় তার স্ত্রীর দিক হইতে যে সব চিঠি পায়—তাহাতে সম্বোধনের কি চমৎকার ঘটা।—প্রাণ আমার, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, হৃদয়সর্ব্বস্ব, এইরূপ কত অপরূপ মনমাতান ডাকে ভরা সে চিঠি! আর শান্তি লিখিতেছে শুধু—ছোট্ট একটি প্রিয়তম শব্দ! "ছিঃ!" নিমেষের মধ্যে এইরূপ ভাবিয়া লইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"প্রতি সপ্তাহে তোমার চিঠিখানির জন্য কিরূপ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকি, তা কি বুঝতে পার না তুমি? নিশ্চয়ই তা পার না। পারলে হাজার কাযের মধ্যেও একটু সময় ক'রে নিয়ে দু'লাইনও লিখতে। কেন বল দেখি, গত মেলে চিঠি পেলুম না? অসুখ করেনি ত? কত রকম ভাবনাই যে হচ্ছে। আসছে মেলে যদি চিঠি না পাই ত কি যে করব জানি না। মিস ক্রিষ্টিকে তা হ'লে চিঠি লিখব। হয় ত বা তার সঙ্গেই তুমি আমোদ ক'রে কোথাও বেড়াতে গেছ—আর আমি এ দিকে ভেবে মরছি। তা যদি শুনি, তা হ'লে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব।

"আগের চিঠিতে লিখেছিলে, টাকার টানাটানি পড়েছে তোমার। বাড়ী থেকে যত টাকা পাবার আশা ক'রছিলে, তা পাওনি। টাকা পেলে কি না, জানার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে আছি। আমি যদি তোমাকে এ সময় কিছু পাঠাতে পারতুম! বার বার সেই কথাই ভাবছি। ভাবছি শুধু তা নয়—প্রাণপণ চেষ্টাও করছি।

"আমার ছোট গল্পগুলি সংগ্রহ ক'রে পাঠালে 'বসুমতী' ছাপতে রাজি আছেন, কিন্তু তার সঙ্গে দু' একটা নতুন গল্পও দিতে হবে! একটা শেষ ক'রে ফেলেছি। আজ রাতে দু'টা পরিচ্ছেদ লিখে ফেলতে পারলে আরও একটা শেষ হয়ে যাবে। আমি তা হ'লে কালই সমস্তগুলা একসঙ্গে

ডাকে দিতে পারব।' গল্পগুলা পেলেই তাঁরা আমাকে তিনশ' টাকা পাঠাবেন বলেছেন। তোমার জন্মদিনে শ্রীচরণে সে উপহার গিয়ে পৌঁছবে। ভাবতেও এত আনন্দ হচ্ছে।

কথা, 'ভারতী'খানা পেয়েছ কি না, লিখলে না মার কেমন লাগলো, জান্‌বার জন্য আমি যে ...কে ছটফট করছি—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া পিয়নের হাঁকে তাড়াতাড়ি শান্তি চে মেল-চিঠি আনিতে গিয়াছিল। পদশব্দ শুনিয়া, । গৃহে ফিরিবার আগেই কান্তি সরিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ভাবিল—"বাহা রে মেয়ে! তলে তলে কত কাণ্ডই করছ তুমি, পুরুষদের হার মানালে দেখছি! এবার আমাদেরই হাতাবেড়ি নিয়ে রান্না-ঘরে গিয়ে বসতে হবে—আর তোমরা নিখিল কাব্যের ম্যানেজারি করবে। সেটি কিন্তু হঠাৎ করতে দিচ্ছিনে, ঠাকরুণ।"

* * * *

"ও সুমিত্রা, বলি ও সুমিত্রা রাণি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

সুমিত্রা দাদাবাবুর এই আদরের ডাকে গলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল—"দিদিমণির চিঠিপত্র ডাকে দিতে যাউছি, দাদাবাবু।"

"কি চিঠিপত্র দেখি।" এই বলিয়া সুমিত্রার হাতের কাগজপত্রগুলা কান্তি নিজের হাতে উঠাইয়া লইল।

সুমিত্রা ফিস ফিস করিয়া বলিল—"দিদিমণি রাগ করবে দাদাবাবু, বলো না—তুমি দেখিছ চিঠিপত্তর।"

"তা কেন বলব; সুমিত্রারাণীকে কি আমি বকুনি খাওয়াতে পারি।"

গল্পগুলি হাতে পাইয়া কান্তির হৃদয় আশানন্দে কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, "তা তুমি আর কেন যাবে, আমিই ত ডাকঘরে যাচ্ছি—অমনি এগুলোও ডাকে দিয়ে দেব।"

"তা দিও দাদাবাবু, দিদিমণিকে বলিব, মুই ডাকে দিউছি। মালী ডাকুছি কেন, শুনিকিরি আসি।"

কম্পাউণ্ড হইতে ঘরে আসিবার সময় কান্তি আকাশ-পথে চিঁহি চিঁহি কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিল। উপরে চাহিয়া দেখিল, উড়ন্ত চিলের মুখে একটা মুরগির বাচ্ছা? তাহার বক্ষে একটা করুণ কম্পন উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা মিলাইয়া গেল!

* * * *

শান্তি হা-প্রত্যাশা করিয়া দিন গণিতে লাগিল, সপ্তাহ কাটিল—মাস যায়, কই, 'বসুমতী'র নিকট হইতে ত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। স্বামীর জন্মদিন আসিতেও ত আর বেশী বিলম্ব নাই—শান্তি সম্পাদককে আর একখানি পত্র লিখিল। উত্তর আসিল—লেখিকা শান্তিবালার কোন গল্পই আফিসে পৌঁছে নাই। শান্তির বুকের পাঁজরাখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিছুদিন পরে ভারতলক্ষ্মীতে প্রকাশিত "চৌর্য্য-মাহাত্ম্য" নামে একটি গল্পের প্রশংসা নানা কাগজে বাহির হইতে লাগিল। আর কোন গল্প যদি লেখক নাও লিখেন— এই গল্পটিতেই তিনি সাহিত্যজগতে অমর নাম লাভ করিবেন, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। ভারতলক্ষ্মী একখানা কিনিয়া শান্তি গল্পটি পড়িল, এ কি! এ যে তাহারই গল্প, কেবল নামের বদল—এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটা কথার পরিবর্ত্তন।—লেখক স্বনামধন্য শ্রীকমলাকান্ত মর্ম্ম-মথিত অমৃতাধুক্তকণ্ঠ কবিব্যসন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন-যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।